১ম বর্ষ]　　　　**বিষয়ানুক্রমিক সূচী।**　　　　[২য় খণ্ড

[কার্ত্তিক হইতে চৈত্র, ১৩২৯]

চিত্রসূচী—কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

চৈত্র

শিল্পী — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

"নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে"

১ম বর্ষ } দ্বিতীয় ❊ কার্ত্তিক, ১৩২৯ ❊ খণ্ড { ১ম সংখ্যা

চতুরাশ্রমের প্রাচীনত্ব।

হিন্দুর জীবন কতকাল পূর্ব্বে চতুরাশ্রমে বিভক্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন,— প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির আলোচনা করিলে জানা যায় যে,তৎকালে চতুরাশ্রম-কল্পনার প্রারম্ভ মাত্র হইয়াছিল। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮,১৫) কেবল 'ব্রহ্মচারী' ও 'গৃহস্থের' উল্লেখ পাওয়া যায়; ঐ গ্রন্থেই এক স্থলে (২,২৩,১) তপস্যাও ধর্ম্মের একটি অঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকে (৪,৪,২২) অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠাতা ভিন্ন 'মুনি' বা 'প্রব্রাজির' নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপশ্চরণের মধ্যে কোনরূপ ক্রমিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই; এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না (Phil. of the Up. pp. 367-68)। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিজ্‌ডেভিড্‌সের মতে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে এমন কি 'পিটক' সঙ্কলনেরও পরে আশ্রমের প্রবর্ত্তন হইয়াছে; কারণ, 'পিটক' গ্রন্থে চতুরাশ্রমের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে চারিটি আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। 'ব্রহ্মচারী' কথাটি বহুস্থলে বিদ্যার্থীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দুই তিন স্থলে 'যতি' শব্দও সন্ন্যাসী অর্থে পাওয়া যায়; কিন্তু 'গৃহস্থ', 'বানপ্রস্থ' এবং 'ভিক্ষু' এই তিনটি শব্দের উল্লেখ নাই। তিনি গৌতম ও আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রেই চতুরাশ্রমের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাইয়াছেন; কিন্তু তখনও ইহার ক্রম ও বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। আরও পরবর্ত্তী কালে বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আশ্রম-নিয়ম স্থিরভাবে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে (Dialogues of the Buddha, pp. 212–13)। কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত জেকবি তাঁহার জৈন সূত্রের অনুবাদের ভূমিকায় (S. B. E. xxii, p. xxix) স্বীকার করিয়াছেন যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেও হিন্দুর আশ্রম-বিভাগ বর্ত্তমান ছিল।

আমরাও জেকবির মত সমর্থন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রাচীনতম উপনিষদের সময়েই আশ্রম-বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই চারি আশ্রমের ক্রমিক সম্বন্ধও স্থির ছিল।

চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বিদ্যাভ্যাস, সংসারধর্ম্ম-পালন ও সংসার-ত্যাগের কল্পনা হইতেই হিন্দুর আশ্রম-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। 'আশ্রম' নামটি প্রচলিত না থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে, আর্য্য সমাজে বিদ্যার্থী, সংসারী এবং সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মুনি ও যতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, মুনিধর্ম্ম ও যতিধর্ম্মের মধ্যে তখনও কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল

কি না, সে বিষয় বিচার না করিয়া অগ্রে আমরা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌গ্রন্থে ঐ অবস্থাগুলির যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহারই আলোচনা করিব।

নিয়মিতভাবে বিদ্যাভ্যাসের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য'। সংহিতা-যুগেও যে এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে (১,১১২,২ । ১,১১২,৪) দেখা যায় যে, তৎকালে শিষ্যগণ গুরুর নিকট পাঠাভ্যাস করিত (১); শিক্ষা অন্তে সমবেত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সভায় খ্যাতিলাভ করিত (২); এবং উপযুক্ত জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইলে নিন্দিত হইত (৩)। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদের সময়ে বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়মবদ্ধ পদ্ধতি ছিল। ঋক্‌-সংহিতায় (১০,১০৯,৫) এক স্থলে 'ব্রহ্মচারী' শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহস্পতি বিপত্নীক অবস্থায় বাস করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'ব্রহ্মচারী' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের অর্থ বেদ এবং ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বেদাভ্যাস। বেদাভ্যাসের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযম অবশ্যপালনীয় বলিয়াই 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দে ইন্দ্রিয়সংযমও বুঝাইয়া থাকে। উপরি-উক্ত বৃহস্পতির উপাখ্যানে 'ব্রহ্মচারী' শব্দটি এই গৌণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের সময় 'ব্রহ্মচর্য্য' পালন অর্থাৎ নিয়মিত-ভাবে বেদাভ্যাস ত করাই হইত, অধিকন্তু তাহার আনুষঙ্গিক সংযমাদিও প্রতিপালিত হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬ষ্ঠ কাণ্ডে (৩,১০,৫) 'ব্রহ্মচর্য্য' ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থলে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণবালক জন্মকালেই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদিগের ঋণ, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের ঋণ, এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট বিধান আর কি হইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এইরূপ বিধান থাকিতেও কেহ কেহ (*) বলেন যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের সময় পর্য্যন্তও বেদ-পাঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদে পূর্ণ তিনটি সূক্তে (১১,৭,৩-৫) ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, প্রথমাশ্রমের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল কর্ত্তব্য বিহিত হইয়াছে, অথর্ব্ববেদের সময়েই ব্রহ্মচারীকে সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত; সুতরাং ঋক্‌, যজু ও অথর্ব্ব এই তিন বেদের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সংহিতা-যুগেই ব্রাহ্মণ-বালক নিয়মিতভাবে 'ব্রহ্মচর্য্যবাস' করিয়া প্রথম আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিত। তখন যে গৃহস্থও বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬,৩,১০,৫) দেখিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্যের পর পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য ব্রাহ্মণকে দার পরিগ্রহ করিতে হইত।

তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম সম্বন্ধে বেদ সংহিতায় কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় কি না, এখন তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদে বহু স্থলে তপস্যা, তপস্বান্‌ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এই তপস্যার সহিত বানপ্রস্থের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না বলা কঠিন। কিন্তু এই গ্রন্থে যাঁহারা 'মুনি' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা যে সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা অন্য শ্রেণীর লোক, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাঁহারা স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন (৭,৫৬,৮)), ইন্দ্র তাঁহাদের সখা (৮,১৭,১৪), তাঁহারা সকল দেবতার প্রিয় এবং অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শূন্য-পথে বিচরণ করেন (১০,১৩৬)। একটি সূক্তে (১০,১৩৬) 'কেশি'গণের বর্ণনা আছে।—দীর্ঘকেশ মুনিরাই 'কেশী' আখ্যা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। জার্ম্মাণ পণ্ডিত রোট তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে (১৬৪ পৃঃ) বলিয়াছেন—এই সূক্তের কেশীর সহিত পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে বর্ণিত মুনিগণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়; এই মুনিগণের মধ্যে কেহ দিগম্বর (বাতরশনার) থাকিতেন; কেহ বা পিঙ্গলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং ইঁহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। অথর্ব্ববেদেও (৭,৭৪,১) মুনির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (৭,৩,৯ , ৭,৬,১৮) 'যতি' নামটিরও উল্লেখ আছে; কিন্তু বিশেষ বর্ণনা না থাকায় ইঁহাদের পরিচয় জানিবার কোন উপায় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২,৪,৯,২; ৬,২,৭,৫), কাঠক সংহিতায় (৮,৫,১২,১০; ২৫,৬,৩৬,৭) এবং অথর্ব্ব সংহিতায় (২,৫,৩) একই প্রকার এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে যে, ইন্দ্র যতিদিগকে 'শালাবৃক' নামক জন্তুর মুখে দিয়া বধ করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদে পঞ্চদশ কাণ্ডে মুনি ও যতি ভিন্ন 'ব্রাত্য' নামে আর এক শ্রেণীর সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। মুনিগণ সংসার ত্যাগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও মুনিদিগকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া উল্লেখ করায়

(*) Deussen, Phil. of the Up., p, 369.

(ঋগ্বেদ ১০,১৩৭) এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত বানপ্রস্থের সহিত মুনির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—ইঁহারা সংসারত্যাগী ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারাও আমরা দেখিতে পাইব যে, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে বর্ণিত মুনি ও যতির সহিত, সংহিতা ও ব্রাহ্মণে উল্লিখিত মুনি ও যতির মূলে কোন ভেদ ছিল না। যাহা হউক, বেদ সংহিতায় বিচ্ছিন্নভাবে আশ্রমের চারিটি অবস্থারই নাম থাকিলেও মুনি ও যতির আচার-ব্যবহার-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তেমন কিছু সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকায় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না এবং চারিটি নাম একই স্থলে উল্লিখিত না হওয়ায় উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন-রূপ সম্বন্ধ ছিল কি না বলা যায় না।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও উক্ত চারিটি নামই পাওয়া যায়, শতপথ ব্রাহ্মণের (৯১,৩,৩) বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মচারীকে সমিদাহরণ, ভিক্ষাচর্য্যা, গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি নিয়মগুলি পালন করিতে হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (২২,৯) নাভানেদিষ্ট গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্যবাস করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৪,৪,৭) এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে যে, অসুররা ইন্দ্রের প্রিয় বৈখানস ঋষিগণকে 'মুনি-মরণ' স্থানে লইয়া যাইয়া হত্যা করিলে ইন্দ্র তাঁহা-দিগকে বাঁচাইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে (৮,১৭,১৪) আমরা ইন্দ্রকে মুনিদিগের সখারূপে দেখিয়াছি। এই স্থলেও দেখা যাইতেছে, ইন্দ্র বৈখানসদিগের সখা এবং তাঁহারা 'মুনিমরণ' স্থানে অর্থাৎ মুনিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্মশানভূমিতে নিহত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সংহিতার মুনিরাই ব্রাহ্মণে বৈখানস নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের যতি-বধের আখ্যায়িকাটিও ব্রাহ্মণগ্রন্থে (*) পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩,১) একই স্থলে বিভিন্ন আশ্রমের সূচনাও দেখিতে পাই। ঐ স্থলে নারদ ঋষিপুত্রের প্রশংসা করিতে যাইয়া আশ্রমের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এগুলির দ্বারা কি হইবে? হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা পুত্র কামনা কর; পুত্র অনিন্দনীয় লোকস্বরূপ।"

সায়ণ বলিয়াছেন, "মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এই চারিটি শব্দে চতুরাশ্রম বুঝাইতেছে। মলরূপ শুক্র-শোণিত-সংযোগ হেতু মল শব্দে গার্হস্থ্য, 'কৃষ্ণাজিন' ব্যবহৃত হয় বলিয়া অজিন শব্দে ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধহেতু শ্মশ্রু শব্দে বানপ্রস্থ এবং ইন্দ্রিয়সংযম হেতু তপস্যা শব্দে পারিব্রাজ্য বুঝাইতেছে।" হাউগ 'সাহেব'ও তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেও ঐরূপ ব্যাখ্যা ভিন্ন ঐ চারিটি শব্দের কোন অর্থই হয় না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে চতুরা-শ্রমের অনুরূপ চারিটি অবস্থারই উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সংহিতা বা ব্রাহ্মণে যতিদিগের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাই নাই। এই যতিদিগের বধের আখ্যায়িকা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, ইঁহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন এবং সেই জন্যই বেদে ইঁহাদের বিনা-শের কথা বারংবার নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্ম-ণের (৩৫,২) আখ্যায়িকাটি আলোচনা করিলেই এই অনু-মানের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে। গল্পটিতে দেখা যায় যে, পাঁচটি কুকার্য্যের জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জ্জন করেন, তাঁহার সোমপান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়। এই পাঁচটির মধ্যে যতিহত্যা অন্যতম পাপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যতিরা বেদবিরোধী হইলে বেদেই তাঁহাদের বধের জন্য ঐরূপ দণ্ডের উল্লেখ থাকিত না। সুতরাং সংহিতার সময় হইতেই যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, মুনিধর্ম্ম ও যতিধর্ম্ম বেদানু-মোদিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই অবস্থাগুলির মধ্যে কোন্ সময়ে ক্রমিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬,৩,১০,৫) একই ব্যক্তির জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যের বিধান রহিয়াছে; এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১১,৩,৩,৭) গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি উপদেশ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের পর স্নাতক হইয়া আর ভিক্ষা করিতে নাই। ইহা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের ও গার্হ-স্থ্যের ক্রমিক সম্বন্ধ স্থির করা যায়। তাহার পর সে যুগে গার্হস্থ্যের পরিণত বয়সে সংসারত্যাগের বিধান ছিল কি না, সে সম্বন্ধে তেমন কোন স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায় যে, মনু তাঁহার জীবদ্দশায়ই পুত্রদিগকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র নাভানেদিষ্টের ব্রহ্মচর্য্যবাসকালে তাহার অনুপস্থিতিতেই এই বণ্টন হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতার (৩,১,৯) মতে মনু স্বয়ংই ভাগ করিয়াছিলেন; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (২২,৯) মতে অগ্রজরা বণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন। নাভানেদিষ্ট

(*) ঐত ব্রা ৩৫,২ পঞ্চবিংশ ব্রা ৮,১,৪,১৩,৪,১৬।

ফিরিয়া আসিলে পিতা বলিলেন, উহার জন্য দুঃখ করিও না, তুমি নিজেই অর্থোর্জ্জন করিতে পারিবে। এই আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, মনু পরিণতবয়সে বিষয়-সম্পত্তি পুত্রদিগের হাতে দিয়া স্বয়ং অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। সংসারত্যাগের সময় হইয়াছে দেখিয়া আর কনিষ্ঠের জন্য অপেক্ষা করিতেও পারেন নাই। মনু হয় ত বনে না যাইয়া পুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাকেও তৃতীয় বা চতুর্থ আশ্রম বলা যায়। পরবর্ত্তী কালেও মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে (৪,২৫৭-৫৮। ৬, ৯৪-৯৫) এবং বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে (১০, ২৬) এরূপ ব্যক্তিদিগকে আশ্রমী বলা হইয়াছে। সুতরাং এই নাভানেদিষ্টের উপাখ্যান হইতে ব্রহ্মচর্য্য, সংসারপালন এবং সংসারানুরক্তি এই তিনটি অবস্থাই অনুমান করা যাইতে পারে। এই তিন অবস্থাই আশ্রমের মূল তত্ত্ব। এখন আমরা বলিতে পারি যে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মুনি বা বৈখানস এবং যতির নাম পাওয়া যায় এবং কয়েকটি স্থানে ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বনের উদাহরণ রহিয়াছে; আবার গৃহস্থের শেষজীবনে অনাসক্তির ভাবও দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক স্থলেই চারিটি আশ্রমের উল্লেখও দেখা যায়। সুতরাং সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সময় পরবর্ত্তী কালের মতই ক্রম অনুসারে আশ্রমবিধান পালিত হইত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

উপনিষদের সময় চতুরাশ্রম কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এখন তাহাই আমাদের আলোচ্য। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং কেবল এই দুইখানি গ্রন্থের প্রমাণই আমরা গ্রহণ করিব। প্রথমেই দেখা যায়, ছান্দোগ্যে (২, ২৩, ১) ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এক ভাগ, তপস্যা আর এক ভাগ, এবং আজীবন গুরুগৃহে বাস ইহার তৃতীয় ভাগ। ইহার মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান গৃহস্থের ধর্ম্ম, তপস্যা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য হইলেও বানপ্রস্থীরই বিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং চিরকাল গুরুগৃহে অবস্থান নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। উপনিষদের সময় হইতে দুই প্রকার ব্রহ্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি আচার্য্যকুলে যথাবিধি গুরুশুশ্রূষা করিয়া বেদ অধ্যয়নের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (ছান্দোগ্য ৮,১৫,১), তাঁহার নাম উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী, আর যিনি গুরুগৃহে থাকিয়াই জীবন শেষ করেন (ছান্দোগ্য ২, ২৩, ১), তাঁহার নাম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। এইরূপে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উল্লেখের পর বলা হইয়াছে—ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোক পাইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। তিন আশ্রমের অতিরিক্ত ব্রহ্মসংস্থই চতুরাশ্রমী। সুতরাং একই স্থলে চারিটি আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। আবার বৃহদারণ্যকেও (৪,৪,২২) আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ইঁহাকে (আত্মাকে) জানিতে ইচ্ছা করেন এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা ইঁহাকে জানিয়া মুনিত্ব লাভ করেন।" এই স্থানে বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা গার্হস্থ্য, এবং অনাসক্তি ও মুনি শব্দ দ্বারা বৈরাগ্যের সূচনা করা হইয়াছে। ঠিক ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, "এবং ইঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রিাজকরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।" সুতরাং এই স্থলেও একসঙ্গে চারিটি আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণে চারিটি অবস্থারই নাম পাইলেও সন্ন্যাসীদিগের অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমীর স্বরূপ উপনিষদেই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। উপনিষদে পরলোকে প্রয়াণের জন্য দুইরূপ পথের নির্দ্দেশ আছে। যাঁহারা গ্রামে বাস করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, কূপাদি খনন প্রভৃতি সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা পিতৃযানপথে ঊর্দ্ধলোকে যাইয়া আবার সংসারে ফিরিয়া আইসেন (ছান্দোগ্য ৫,১০,৩। বৃহদারণ্যক ৬,২,১৬) এবং যাঁহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা, সত্য, ও তপস্যা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না (ছান্দোগ্য ৫,১০,১। বৃহদারণ্যক ৬,২,১৫)। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যাঁহারা গ্রামে থাকেন, তাঁহারা গৃহস্থ, এবং অরণ্যবাসিগণ সন্ন্যাসী। অন্যত্র দেখিতে পাই, সন্ন্যাসী ভিক্ষা করেন (*) এবং ভ্রমণ করিয়া বেড়ান (†)। তাহা হইলেই পাওয়া গেল যে, অরণ্যবাস, ভিক্ষাচর্য্যা ও ভ্রমণ সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। সংহিতা ও ব্রাহ্মণে মনুর সম্পত্তি ভাগের আখ্যায়িকা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তিনি গার্হস্থ্যের পর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনে স্পষ্টই গার্হস্থ্যের পর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত

(*) বৃহদারণ্যক ৩,৫,১। (†) বৃহদারণ্যক ৪,৪,২২।

দেখা যায়; এখানে আর অনুমান আবশ্যক হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব (*)। সংসারত্যাগ সকলের পক্ষেই এত পরিচিত ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই কথা বলিতে স্বামী কোনরূপ ভূমিকা করিলেন না। স্ত্রীও ইহাতে বিস্মিত হইলেন না। একই ব্যক্তি যে জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্রম অবলম্বন করিতেন, উপনিষদেই সে সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুর জীবন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে (৫,৩,৩) একটি 'বিদ্যা' সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, বিদ্যাটি বালক এবং 'তৃতীয়'কে শিখাইবে না ('ন বৎসে ন চ তৃতীয়ে'); এখানে 'তৃতীয়' শব্দ দ্বারা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বয়সের বিভাগ সম্বন্ধে উপনিষদে আরও প্রমাণ পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩,১৬) পুরুষকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর যজ্ঞের প্রাতঃসবন, পরবর্ত্তী চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন এবং তৎপরবর্ত্তী আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন। কি নিয়মে বয়সের এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা ততটা স্পষ্ট নহে, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ধর্ম্মশাস্ত্রে (মনু ৯,৯৪)। সাধারণতঃ চব্বিশ বৎসর বয়সেই গৃহস্থ হইবার বিধান দেখা যায়; এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬,১,১) শ্বেতকেতুও চব্বিশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পরে যজ্ঞের সহিত পুরুষের তুলনাটি এইরূপে শেষ করা হইয়াছে—পান ও আহারের ইচ্ছা হইলেও যে সে ইচ্ছা পূরণ করে না, তাহাই হইল যজ্ঞের 'দীক্ষা'; পান, আহার, মৈথুন প্রভৃতি সংসার-সম্ভোগই যজ্ঞের 'উপসদ্', 'স্তোত্র', ও 'শস্ত্র'; তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা, ও সত্যবচনই ইহার 'দক্ষিণা' এবং মৃত্যুই পুরুষযজ্ঞের অবভৃথস্নান (ছান্দোগ্য ৩,১৭)। এখানে পান আহারের ইচ্ছা হইলেও যে সেই ইচ্ছা পুরণ করে না, এই বাক্যে ব্রহ্মচর্য্যের কথাই বলা হইয়াছে; দীক্ষায় যজ্ঞের আরম্ভ। সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে পুরুষের জীবনের আরম্ভ হয়। তাহার পর পান, আহার, মৈথুন প্রভৃতি গৃহস্থেরই ধর্ম্ম, এবং যেমন মধ্য-জীবনে গৃহস্থ-ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, সেইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যভাগে উপসদ, স্তোত্র-গান, ও শস্ত্রপাঠ সম্পাদিত হয়; ইহাই হইল এই তুলনার কারণ। তপস্যা, দান, অহিংসা ও সত্যবচন সন্ন্যাসীর লক্ষণ। ধর্ম্মশাস্ত্রে দান (বশিষ্ঠ ৯,৮) ও অহিংসা (বশিষ্ঠ ১০,৩) সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপনিষদেও দেখিয়াছি, সন্ন্যাসীরা অরণ্যে শ্রদ্ধা, তপস্যা ও সত্যের অনুশীলন করেন এবং সন্ন্যাস যেমন জীবনের শেষ ভাগে অবলম্বনীয়, দক্ষিণাও সেইরূপ যজ্ঞের শেষেই দিতে হয়। তাহার পর যজ্ঞের একেবারে অন্তিম-কৃত্য স্নানের সহিত পুরুষের মৃত্যুর তুলনা করা হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই স্থলে পুরুষের জীবনকে বিভিন্ন আশ্রমে ভাগ করিয়া যজ্ঞের এক একটি অনুষ্ঠানের সহিত তাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

উপরি-উক্ত যজ্ঞ ও পুরুষের তুলনায় মানুষের জীবন তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনেও তিন আশ্রম অবলম্বনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; সুতরাং উপনিষদের সময় তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল কি না দেখা আবশ্যক। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২, ২৩, ১) দেখিতে পাই—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও তপস্বীদিগের পুণ্যলোকে গতি হয়; আর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। বৃহদারণ্যকেও (৪, ৪, ২২) একই স্থলে মুনি ও প্রব্রাজী দুইটি নামই পাই এবং জানা যায় যে, শেষোক্ত সন্ন্যাসীরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বৃহদারণ্যকের (৪, ৩, ২২) আর এক স্থলেও শ্রমণ ও তাপস দুইটি নাম পৃথক ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে এবং উপনিষদেই এইরূপ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে তপস্যা করিতেন (ছান্দোগ্য ৫, ১০), কেহ বা সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন (বৃহদারণ্যক ৩, ৫, ১)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীনতর উপনিষদের সময়েই গৃহস্থাশ্রমের পরে অবলম্বনীয় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আশ্রম বর্ত্তমান ছিল এবং উহাই যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম। আমরা যথাস্থানে দেখাইয়াছি যে, সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও মুনি ও যতি দুইটি নামই পাওয়া যায়; পরস্পর ভেদ থাকিলেও উভয় আশ্রমই বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—একটি সন্ন্যাসের প্রথম অবস্থা, অন্যটি শেষ অবস্থা। এই ভাবে দুই অবস্থাকে এক করিয়াই বোধ হয়, উপনিষদে পুরুষের জীবন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং এই জন্যই বোধ

(*) বৃহদারণ্যক ৪,৫,১।

হয়, কোন কোন্ স্থলে মুনি প্রভৃতি শব্দ উভয় আশ্রমকেই বুঝাইয়া থাকে। বানপ্রস্থী অরণ্যে বাস করিয়া তপস্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মানুশীলন করিতেন; কিন্তু যতি কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস না করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসংস্থ হইতেন। উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম হইতেই 'প্রব্রজ্যা' অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমরা মনে করিতে পারি না যে, তৎকালে সকলেই তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন না করিয়াই একেবারে চতুর্থ আশ্রমে যাইতেন; প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্যের তীব্রতা অনুসারে কেহ বা বানপ্রস্থের মধ্য দিয়া যতিধর্ম্মে প্রবেশ করিতেন, কেহ বা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সন্ন্যাসী হইতেন। ক্রিয়াকাণ্ডবহুল গৃহস্থাশ্রমের মধ্য হইতে যাইয়া একেবারে সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ সকলের পক্ষে সহজসাধ্য না হইতে পারে, এই জন্য অল্প অনুষ্ঠানযুক্ত বানপ্রস্থাশ্রমের পর যতিধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায় না যে, উপনিষদের সময় তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে কোনও ভেদ ছিল না। পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে এই দুই আশ্রমে যেমন ভেদ পাওয়া যায়, প্রাচীনতর উপনিষদের সময়ে উভয়ের মধ্যে তদপেক্ষা কম ভেদ ছিল, এমন কোনও প্রমাণ নাই। জাবালোপনিষদে (৪) চতুরাশ্রমের ক্রমিক সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে—"ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" আবার ঠিক ইহার পরেই ঐ উপনিষদে উক্ত ক্রমের এইরূপে বিকল্প-বিধান করা হইয়াছে যে, "ব্রহ্মচর্য্য, গৃহ বা বন যে কোনও আশ্রম হইতে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করা যায়।" ধর্ম্মসূত্রকার বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন বলিয়াছেন—ইচ্ছানুসারে যে কোনও আশ্রম অবলম্বন করিতে পারা যায় [বশিষ্ঠ (৭,৩); আপস্তম্ব (২,৯,২১,১); বৌধায়ন (২,১০,১৭,২—৬)] মনুও (৬,৩৮) বিকল্পে গৃহস্থাশ্রম হইতে একেবারে প্রব্রজ্যার বিধান দিয়াছেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য (৩,৫৬) বলেন 'বনাৎ গৃহাদ্বা'। কিন্তু বিপরীত ক্রম অনুসারে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবার বিধান বা দৃষ্টান্ত দেখি না; বরং পরবর্ত্তী কালে দক্ষ-সংহিতায় (১,১২) ইহার নিষেধই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীনতর উপনিষদের পরবর্ত্তী কালে যথাক্রমে চতুরাশ্রম গ্রহণ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের পর (আপস্তম্ব ২,৯,২১, ৪) ইচ্ছানুসারে যে কোনও আশ্রমে প্রবেশ করার পক্ষে বাধা ছিল না। প্রাচীনতর উপনিষদের সময়েও আমরা এইরূপ নিয়মই লক্ষ্য করি; তখন কেহ চির-ব্রহ্মচারী থাকিতেন (ছান্দোগ্য ২,২৩,১), কেহ ব্রহ্মচর্য্যপালনের পর যাবজ্জীবন গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াই ব্রহ্ম উপাসনা করিতেন (ছান্দোগ্য ৮,১৫), কেহ বা বিবাহাদি না করিয়া প্রথম হইতেই বীতরাগ হইয়া (ব্যুত্থায়) যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, (বৃহদারণ্যক ৪,৪,২২); আবার যাজ্ঞবল্ক্য যথাক্রমে তিন আশ্রমের নিয়মই পালন করিয়াছিলেন, (বৃহদারণ্যক ৪,৫,১)। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই প্রাচীনতম উপনিষদ দুইখানির সময়েই চতুরাশ্রম পরবর্ত্তী কালের মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

পুষ্পবিকাশ।

আমার হৃদয়-কুঞ্জ-বনে ফুটেছে ফুল ফুটেছে
সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত তার দলের বাঁধন টুটেছে।
স্বপনভরা ঘুমের শেষে
হৃদয় আঁখি মেল্‌ল হেসে,
আনন্দেরি অশ্রু হ'য়ে নীহার তাহে লুটেছে।

বিজ্ঞঠাকুর! ব্যঙ্গভরে হেসে কি আর করবে?
জানি, এ ফুল দু'দিন রবে, মানি, এ ফুল ঝরবে
ঝরবে ব'লেই মধুর এত
এমন মোহন তাই গো সে ত,
তাই ত এত তাড়াতাড়ি মলয় অলি জুটেছে

মৌমাছিরা মৌচাকে মোর মধু তাহায় রাখবে,
আমার প্রাণের আতরদানে গন্ধ তাহায় থাকবে।
হাসছে আমার কল্পলতা,
গেছে তাহার দোহদ ব্যথা,
নীরব ব্যাকুল বাসনা তার সফল হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কয়লা-কুঠী।

১

কয়লা খাদের মুখ হইতে কয়লা-টানা ছোট ছোট গাড়ীর সরু ট্রাম-লাইন, আঁকিয়া বাঁকিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া দূরে একটা 'ডিপো'র কাছে শেষ হইয়াছে। সেই ঘন-বিন্যস্ত আম-বাগানের ভিতর, ট্রাম লাইনের এক পাশে,একটা ছোট কদম গাছের তলায় বিলাসী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; থম্‌থমে আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘগুলার এক পাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। আমগাছের কচি কচি নূতন পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পথ দেখিয়া সাঁওতাল ও বাউরী কুলীগুলা কয়লা-বোঝাই ট্রাম গাড়ী লাইনের উপর ঠেলিয়া আনিতেছিল। এক দিকে কুলী-রমণীরা 'সাইডিং'এর উপর বড় বড় মাল গাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিতেছিল। কয়লা ফেলার ধুপ্ ধাপ্ শব্দ এবং ট্রাম লাইনের ঘড়ঘড়ানির তালে তালে তাহাদের অপূর্ব্ব মেঠো সুরের আনন্দ-সঙ্গীত বর্ষার জলো হাওয়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুদূরের শূন্য প্রান্তরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

বিলাসীর এ সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু নান্‌কুর উপর অভিমান করিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া একমনে একটা কদম ফুলের শুভ্র কেশর ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মাটীতে ফেলিতেছিল, আর উদাস, চঞ্চল দৃষ্টিতে এক একবার খাদের মুখের পাল্লার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল,—যদি নান্‌কু তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য উঠিয়া আসে! বিলাসীর সারা অঙ্গে ঢল-ঢল যৌবনের চমক্-চঞ্চল গতির আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছাপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার পরনের সাড়ীখানা কালো কয়লার বিশ্রী ময়লায় সামান্য মলিন হইলেও, গায়ের রংএর জৌলুস এতটুকু মলিন হয় নাই—জলে ধোয়া কচি পাতার মতই জ্যোৎস্নালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকগুচ্ছের সাঁওতালী খোঁপার ফাঁকে কদম ও টগর ফুলের শুভ্র পাপ্‌ড়ি ও কেশরগুলি দেখা যাইতেছিল। বিলাসী হতাশ হইয়া একমনে ভাবিতেছিল,—যার জন্যে চুরী করি, সেই বলে চোর!

এক দল সাঁওতাল কুলী কয়লার টব ঠেলিতে ঠেলিতে সেই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক জনের দৃষ্টি বিলাসীর উপর পড়িতেই, সে ট্রাম লাইনের ধারে এক মুঠি কয়লার গুঁড়া কুড়াইয়া লইয়া বিলাসীর দিকে ছুড়িয়া দিয়া আড়্‌চোখে কয়েকবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বিলাসী ঠোঁট ফুলাইয়া তাহার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া, হাতের কদম ফুলটা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল,—"আ মর্, খাল্‌ভরা!"

বিলাসী ঝরিয়া ছাড়িয়া যে দিন হইতে নান্‌কুর সাথে জোড়জানকী কয়লা-কুঠীতে কায করিতে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই সময়ে অসময়ে আফিসের বড় বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া কুলী, খালাসী, ঠিকাদারের নিকট হইতে এমনই বিদ্রূপ উপহাস এবং একটা বক্র কটাক্ষ নিয়মিত ভাবে পাইয়া আসিতেছিল। সে-ও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিত না। কাহারও চুল ধরিয়া টানিয়া, কাহাকেও মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া, কাহাকেও ঢিল ছুড়িয়া এই সবের প্রতিশোধ আদায় করিয়া লইত; তা সে বাবুই হউক আর মাল-কাটা কুলীই হউক।

এমনই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। টুপ্ টুপ্ করিয়া কদম ফুলের পাপ্‌ড়ি-ঝরা মেঘের জল বিলাসীর মাথার উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্রায় দশ বারো খানা কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী পার হইয়া গেল, তথাপি নান্‌কু আসিল না। বিলাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় দেখিল, লাইনের পাশে পাশে এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে নান্‌কু তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি;—কালো রঙ্গের উপর কয়লার গুঁড়ি পড়িয়া সে এক অদ্ভুত রকমের দেখাইতেছে। বলিষ্ঠ বাহুর মাংস-পেশীগুলা বেশ দৃঢ় হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। মাথার থোপা থোপা কোঁকড়া চুলগুলার দুই একটা গুচ্ছ কালো সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মশেষে তাহার ভরা যৌবনের মাদকতা-ভরা দৃষ্টির ভিতর একটা শান্ত সুন্দর দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বিলাসী মুখ বাঁকাইয়া গাছের এক পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইল। নান্‌কু কাছে আসিয়া

বিলাসীর আঁচল ধরিয়া টান মারিয়া বলিল, "রাগ করেছিস, বিলাসী, চল্ ধাওড়ায় যাই—আজ ছুটি নিয়ে এসেছি।"

বিলাসী তেমনি ভাবেই উত্তর দিল,—"যা না তুই! তোর মাইনু পিয়ারীকে নিয়ে যা, আমার সাথে কি বেটে?"

নান্কু আদর করিয়া তাহার কয়লা-মাখা ময়লা হাতখানা বাড়াইয়া বিলাসীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আয়, রাগ করিস্ না, আয়!"

অনেক কষ্টে বিলাসীর রাগ ভাঙ্গাইয়া নান্কু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া বিলাসী বলিল,—"তুই যদি বেইমানী করিস্, নান্কু, তা হ'লে আমিও করব ব'লে রাখ্‌ছি।"

নান্কু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"ইস্! তোর সাধ্যি আছে?"

বিলাসী মুখখানা পুনরায় যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিল, "না,—নাই! দেখে' লিস্ তা হ'লে। রমনা খালাসীকে—"

নান্কু উত্তেজিত হইয়া বিলাসীর হাতটা টানিয়া ধরিয়া বলিল,—"খবরদার! রমনার সঙ্গে কথা কইবি আর আমি সাঁওতালের পুত্ হয়ে দাঁড়ায়ে দেখ্‌ব? তোকে কুচি কুচি ক'রে কেটে 'সিঙ্গারণের' জলে ভাসায়ে দিব তা হ'লে।"

বিলাসী তাড়াতাড়ি নান্কুর হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কহিয়া উঠিল,—"বাহারে! তুই মাইনুর সাথে হাস্‌বি আর আমার কিছু কইবার জো নাই!........আয়, তুই এখনি আয়, আমাকে খাদ-ভস্‌কায় ঠেলে দিসে আয়, আমি ম'রে যাই, জালা-জঞ্জাল চুকে যাক্। আয়, আয় বল্‌ছি; তোর দিব্যি তোর মাইনুর দিব্যি!"

নান্কু একটু নরম হইয়া বিলাসীকে বুঝাইয়া বলিল যে, আর সে কখনও মাইনুর সঙ্গে হাসিবে না, তাহাকে চোখে দেখিবে না।

বিলাসী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কসম্ খা বল্, আমার রক্তে চান্ করিস্, বল্ থাল্‌ভরা মিন্‌সে, বল্।"

নান্কু তাহাই করিল। বিলাসী বলিল, "চল্ যাই তা হ'লে।"

ডাঙ্গালপাড়ার বাগান ধাওড়ার একটা খড়ো ঘরে নান্কু ও বিলাসী থাকিত। বিলাসী ছিল বাউরীর মেয়ে আর নান্কু ছিল জাতিতে সাঁওতাল। চার বৎসর আগে নান্কু বিলাসীকে লইয়া ঝরিয়া হইতে রাণীগঞ্জে আসিয়াছিল। বিলাসীও মা, বাপ, ভাই, বোন্ ছাড়িয়া নান্কুকে সাদি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বের দিনগুলা চুরী করিয়া গোপন দেখা-শুনার ভিতর দিয়া বেশ আনন্দেই কাটিত। বাপ্ মাকে লুকাইয়া কোন দিন খাদের সুড়ঙ্গের ভিতর, কোন দিন চানকের পাশে কোন দিন বা বহু কালের পুরাতন খাদের জরাজীর্ণ ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা পড়ো বাড়ীর ধারে তাহাদের দেখাশুনা হইত, মুখে-মুখে চোখে চোখে তাকাইয়া তাহারা দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া থাকিত, অতর্কিত ভাবে হঠাৎ কোন দিন নান্কুর কালো হাতখানা বিলাসীর শুভ্র অঙ্গে ঠেকিয়া গেলে, সেই যে একটা প্রথম যৌবনের বিদ্যুৎশিহরণ তাহাদের সারা অঙ্গের শিরায় শিরায় বহিয়া যাইত, সেই ক্ষণিক পাওয়ার অপরিসীম আনন্দে উভয়ে বিভোর হইয়া থাকিত। তাহাদের স্তব্ধ নীরবতা,যেন বেণুবীণের অশ্রান্ত কলঝঙ্কারে শব্দময় হইয়া উঠিত। বিলাসীর মনে হইত, কোন্ উৎসব-রজনীর মাদলের শব্দ কাজরী নৃত্যের তালে তালে তাহার বুকের ভিতরে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, থামিতেছে, আবার বাজিতেছে। তাহার পরে বিবাহিত জীবনের দুইটা বৎসর রাণীগঞ্জের নিকটে কি একটা কলিয়ারীতে মন্দ কাটে নাই; কিন্তু যখন হইতে তাহারা জোড়জানকীতে আসিয়াছে, তখন হইতেই কোথা হইতে তাহাদের সেই বিরাট বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের উচ্ছল-ছল ছল গতির বেগ প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল। এই দুর্নিবার গতিবেগের মুখে কোথায় বাধ পড়িয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে গিয়া বিলাসীর চোখ পড়িল—মাইনুর প্রতি। সে-ও এক জন তাহারই মত কুলী-রমণী। বিলাসীকে গোপন করিয়া নান্কু তাহারই সহিত শুঁড়িখানায় গিয়া মদ খাইয়া আইসে,কাছে বসিয়া কথা কয়, হাসে, গল্প করে। বিলাসী যে দিন আপনি এই ব্যাপারটা দেখিল, সে দিন নান্কুর উপর তাহার রাগের মাত্রাটা অসহ্য হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মাইনুকে কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর হইতেই সেই যে একটা দুরন্ত অভিমান বিলাসীকে পাইয়া বসিল, কোন প্রকারেই সে তাহার হাত এড়াইতে পারিল না। নান্কুর সহিত এই কথা লইয়া বিলাসীর ঝগড়া প্রায় প্রত্যহই হইত, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে সে সব ভুলিয়া যাইত। এমনি করিয়াই ক্ষণিক মিলন-বিরহের মধ্য দিয়া তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

সে দিন বিলাসীর রাগ ভাঙ্গাইয়া নান্‌কু ধাওড়ায় ফিরিবার পথে শুঁড়িখানা হইতে খানিকটা মদ কিনিয়া লইল। নান্‌কু বলিল, "বিলাসী, আজ তোর তরে ভাল ধেনো মদের রসি কিনে এনেছি, খুব মস্তে খাবি চল্।"

যদিও তাহাদের কলহ সে দিন রাস্তার মাঝেই চুকিয়া গিয়াছিল, তথাপি বিলাসীর মনের ভিতর একটা গোপন বেদনা কেবলই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতেছিল। নান্‌কু বেইমানী করিয়া তাহাকে যে দাগা দিবে, এমন কথা সে ত' কোন দিনই ভাবে নাই—তবে? মনের দুঃখে বিলাসী সে দিন পেট ভরিয়া পচাই মদের রসি গিলিয়া ভাবিল, আজ সে সব ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এ কি, মদের নেশায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও রঙ্গিন্ হইয়া সেই পুরাণ দিনের হাজার কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল যে! না, না, নান্‌কু তাহার পর হইতে পারে না গো,—নান্‌কুর তরে সে যে তার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছে!...

বাহিরে চাঁদের আলোতে ব্যানার্জ্জী সন্তানের কুঠী যাইবার পাকা রাস্তাটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। টব-গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি তখনও থামে নাই। অদূরে কয়েকটা লোক অর্জ্জুন আর শিমুল গাছের নীচে কতকগুলা কয়লায় আগুন জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। আগুনের লাল শিখায় তাহাদের কালো কালো মুখগুলা এক একবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বিলাসী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া একটা টব-ঠেলা সাঁওতালী গানের সুর ধরিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। নান্‌কু কহিল, "চুপ্ কর্‌লি কেন বিলাসী, মাদলটা আন্‌ব?"

বিলাসী পার্শ্বের মলিন বিছানায় কাৎ হইয়া পড়িয়া নান্‌কুর গায়ের উপর একটা হাত দিয়া বলিল, "বাবুদের মতন বড় লোক হ'তে পারিস্, নান্‌কু? দিন-রাত্ত বিলাতী মদ খাই তা হ'লে।"

নান্‌কু সাদরে বিলাসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,— "কেনে রে? আমাদের ত সকলই আছে, খা না কত মদ খাবি।" কিয়ৎক্ষণ থামিয়া অদূরে হ্যারিকেন্ লণ্ঠনটা দেখাইয়া সে বলিল, "এই ছাখ, সে দিন রাণীগঞ্জ থেকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে ন্যাংটেং এনেছি, ছাতা কিনেছি, তোর তরে কস্তা পেড়ে গান্ধী কাপড়,—আর কি চাস্?"

বাহিরের বৃক্ষবহুল প্রাঙ্গণে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে থামিয়া গেল। কয়লার গাড়ী বোঝাইএর ঠাঁই ঠাঁই, ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ তখনও কানে আসিয়া বাজিতেছিল।

বিলাসী নান্‌কুর গলা জড়াইয়া মদের নেশায় বিভোর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

২

রথযাত্রার দিন কুঠীর সব কায বন্ধ, কাযেই সে দিন তাহাদের আনন্দের দিন। বিলাসী বাবুদের অফিসে 'বশ্-কিশ্' আনিতে গিয়া প্রায় তিন টাকা পাইল। নান্‌কু তাহার পূর্ব্বেই শঙ্কর খাজাঞ্চির কাছে হাজিরার পয়সা মিটাইয়া আনিয়াছিল। বিলাসী হাসিতে হাসিতে আঁচলে বাঁধা পয়সাগুলা দেখাইয়া বলিল, "চল্ নান্‌কু, শিয়াড়শোলে রথ দেখে আসি—উঠ্, এখনই যাই।"

নান্‌কুর মেজাজটা আজ বেশ ভাল ছিল না। কিছু পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ার সাঁওতালী নাচের দলে মাদল বাজাইবার জন্য বিষণ সর্দ্দার ডাকিতে আসিয়াছিল,—নান্‌কু যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে জবাব দিয়া বিলাসীর অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। শালপাতার লম্বা তামাকের চুটিটা আগুনে ধরাইয়া লইয়া নান্‌কু বলিল,—"চল্ যাই।" বিলাসী চুটি টানিতে পারিত না, একটা বিড়ি ধরাইয়া লইয়া সে-ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিছুদূর গিয়া যে স্থানে গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্ ধরিয়া রাণীগঞ্জের রাস্তায় যাইতে হয়, সেই স্থানে গিয়া নান্‌কু বলিল, "তুই ওদের সঙ্গে চল্, বিলাসী, আমি এই রোণাইএ একটুকু তাড়ি খেয়ে আসি।"

বিলাসী বলিল, "তাড়ি খাবি কেনে, মাঝি? রাণীগঞ্জে ফটকে খাবি চল্—আজ এনেক্ পয়সা।"

নান্‌কু কিছুতেই শুনিল না। বিলাসীকে বুঝাইয়া বলিল, তাড়ি খাইতে তাহার বেশী সময় লাগিবে না এবং এখনই পথেই তাহার সঙ্গ ধরিবে।

বিলাসী ক্ষুন্নমনে একা-একা রথতলার দিকে চলিতে লাগিল। পথে সঙ্গ লওয়া দূরে থাকুক, বিলাসী রথতলায় পৌঁছিয়া তাহার জন্য পথের ধারে প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিল, তবুও নান্‌কুর দেখা পাইল না।......সন্ধ্যা হয় হয়। যাহারা বিলাসীর অনেক আগেই রথ দেখিতে আসিয়াছিল,

তাহারাও একে একে কুঠী ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিলাসী হতাশভাবে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। নান্কু সঙ্গে থাকিলে এতক্ষণ হয় ত সে পান খাইয়া, বিড়ি টানিয়া, সাঁওতালী নাচ করিয়া, গান গাহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িত; কিন্তু আজ সে নিরাশমনে মাত্র এদিক্ ওদিক্ দুই একবার ঘুরিয়া একটা পানের দোকানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েকটা পয়সা বাহির করিয়া দোকান হইতে একটা দিয়াশলাই, কতকগুলা বিড়ি ও পয়সা দুইএর পান কিনিয়া বিলাসী ভাবিল, জল-বাদলের দিন, এইবার ঘর যাওয়া যাক্। তাহার চক্ষু দুইটা কিন্তু তখনও ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া নান্কুর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল,—যদি সে এখনও আসে! দু এক পা করিয়া লোকজনের ভিড় হইতে বাহির হইয়াই বিলাসীর কি একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল; তাড়াতাড়ি পুনরায় ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দেখিল, অদূরে একটা লোক বাঁশের ধুচনি, মাছ ধরিবার পলুই, ঘুগি, তালপাতার ছাতি ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে; এবং দু'চার জন ইতর-ভদ্র তাহার নিকট দাঁড়াইয়া এটা-সেটা পরীক্ষা করিতেছে। ভাল দেখিয়া একটা মাছ ধরিবার পলুই বাছিয়া লইয়া বিলাসী বলিল, "এই! কৎকে দিবি?"

লোকটা বলিল, "বার আনার এক ছিদাম্ কম লয়।"

বিলাসী ঠোঁট দুইটা বাঁকাইয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "এঃ, বাবা লো!......আট আনায় দিবি?"

"—মাইরি বল্‌ছি, বার আনা ক'রে তিন তিনটে চ'লে গেল।"

অগত্যা বারো আনা পয়সা লোকটার হাতে গণিয়া দিয়া বিলাসী পলুইটা হাতে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিলাসী ভাবিতে লাগিল, নানকু আসিল না কেন? সে কি তবে তাড়ি খাইতে যায় নাই?—যাক্, সে হয় ত এতক্ষণ ধাওড়ায় ফিরিয়াছে—পলুইটা দেখিয়া নিশ্চয়ই খুব খুসী হইবে।

বিলাসী অন্ধকারে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রাস্তা হাঁটিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া দেখিল, নান্কু আসে নাই। ধীরে ধীরে পলুইটা কাঁধ হইতে ঘরের ভিতর নামাইয়া রাখিয়া সে ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। নান্কু তখনও আসিল না দেখিয়া বিলাসীর মনে বড় ভয় হইতেছিল। ঘুমে তাহার চোখ দুইটা জড়াইয়া আসিতেছিল, ক্ষুধাও পাইয়াছিল। বিলাসী ঘরের মেঝের উপর শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

উঠানে কুকুরটা খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেই চট্ করিয়া বিলাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিল, নান্কু আসিয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিল,—কেহ কোথাও নাই। কোথাও একটু শব্দ হইলেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এমনই করিয়া আধ ঘুম আধ চেতনায় বিলাসী রাত্রিটা প্রায় জাগিয়াই কাটাইল। চারিদিক ফর্সা হইবার পূর্ব্বে, রাত্রির অন্ধকারটা বেশ ঘনাইয়া জমাট বাঁধিতেছিল—দূরে পিয়াশবনের ঝোপটাও অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। বর্ষাকালের ঠাণ্ডা জলোহাওয়া, শির্ শির্ করিয়া গাছের পাতাগুলা নাড়াইয়া, বিলাসীর দরজা-বিহীন উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেছিল। মোটা কাপড়টা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া, বিলাসী উঠিয়া, বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া, জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল।......সিঙ্গারণ নদীর পাশে, কিছু দূরে একটা মেঠো রাস্তার ধারে হঠাৎ একটা সাঁওতালী আড়-বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ভোরের বাতাস চিরিয়া বিলাসীর কানে সে বাঁশীর আওয়াজ পৌঁছিতেই তাহার বুকটা চম্ করিয়া উঠিল,—এই তো নান্কুর বাঁশী! বিলাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া, অন্ধকার ঘরের দেওয়াল হাতড়াইয়া দেখিল, প্রতিদিনকার মত নান্কুর তেল-মাখানো আড়-বাঁশীখানি দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকের উপর ঝুলানো রহিয়াছে,—সে ত' আজ বাঁশী লইয়া বাহির হয় নাই! হতাশ হইয়া বিলাসী আবার দরজার একপাশে বসিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৩

পরদিন প্রভাতে যে সংবাদ বিলাসীর নিকট পৌঁছিল, তাহা শুনিয়া প্রথমতঃ সে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই। কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? লোক বলিতেছে, মাইনুকে লইয়া গতকল্য নান্কু রথ দেখিবার অছিলায় বৈকালে কোন্ দেশে পলাইয়াছে—কেহ জানে না। কিছুদিন আগে হইলেও বা সে এ সংবাদ শ্রবণমাত্রেই বিশ্বাস করিতে পারিত; কিন্তু যে নান্কু তাহার সাক্ষাতে এমন করিয়া কসম

খাইয়াছে, যে নানকু কসম খাওয়ার পরদিন হইতে মাইনুর মুখ পর্য্যন্ত দেখে নাই, সে কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে তাহাকে এমন ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিল? বিশ্বাস না করিয়াও ত সে পারে না! প্রথম যৌবনের সুখ-স্মৃতিগুলা বিলাসীর মনে পড়িতে লাগিল;—সেই নানকু আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! বিলাসী যে তাকে চিরকাল ইমান্‌দার বলিয়াই জানে!......ক্ষুব্ধ অভিমানে তাহার মনে হইতে লাগিল, তুই বেইমানী করতে পারিস্, নানকু, আর আমি পারি না?...বিলাসী প্রাণপণে অশ্রুনিরোধ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

মাইনুর মা-বাপ সংবাদ পাইয়া নানকুর খোঁজ করিতে আসিল;—অকথ্য ভাষায় নানকুকে গালাগালি করিয়া চলিয়া গেল। বিলাসী একটি কথাও কহিল না—মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছে,—একফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পারে নাই।

বিলাসী সারাদিন কিছু না খাইয়া মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া ছিল; সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রমনা খালাসী ইঞ্জিনের কাযে ছুটী পাইয়া তাহার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমনা মাঝে মাঝে বিলাসীর কাছে আসা-যাওয়া করিত, তাহাকে ভালও বাসিত, ভয়ও করিত, কাযেই কোন দিন মুখ ফুটিয়া তাহাকে কোন কথা আজ পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই। বিলাসী তাহা বিলক্ষণ জানিত এবং কোন দিন কথায় কথায় মাইনুর কথা উঠিলেই নানকুর সাক্ষাতে এই রমনার কাছে চলিয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইত।

রমনা আসিয়া বলিল,—"বিলাসী, দেখ্‌লি ত' তোর নানকুর কায! এইবার চল্, আমার ঘরে চল্।...... এ কি রে, তুই আজ সারাদিন খাস্ নাই—উনোনে আগুন দিস্ নাই যে!"......

বিলাসী শুইয়া ছিল। নীচের দিকে মুখ রাখিয়াই বলিল, "না,—খাব নাই—তুই আবার কি সাওকারী করতে এলি, হতভাগা?"

রমনা ভয়ে-ভয়ে বিলাসীর কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বেঁচে থাকতে চা'স্ তো আমার ঘরে চল্ বিলাসী, নইলে জানিস্ তো, তোর পিছনে—"

রমনাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাসী একেবারে রাগে উত্তেজিত হইয়া, তাহার হাতটা ঝাকানি দিয়া সরাইয়া দিয়া কহিল, "বেরে বল্‌ছি, খাল্‌ভরা, ঝাঁটা দিয়ে বিষ নামিয়ে দিব তা না হ'লে। পাকা কাঁঠাল পেয়েছিস আমাকে, লয়?—বেরে!"

রমনা তথাপি সে স্থান হইতে নড়িতেছে না দেখিয়া বিলাসী আরও জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "তুই কি বল্‌তে চাস্ তা জানি রে জানি, মুখপোড়া। তুই আমাকে পা—বি—না।"

রমনা বিলাসীর কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। বিলাসী সমস্তটা রাত্রি অন্ধকার ঘরের মেঝেয় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দু'তিন দিন পরে, সে দিন রবিবার সন্ধ্যাবেলা রমনা তাহার একা ঘরে বসিয়া বসিয়া একটা মদের বোতল শেষ করিয়া, গাঁজার ছিলুমটি সবেমাত্র সাজিয়া টানিতে বসিয়াছে, এমন সময় দেখিল, সুমুখে হাসিতে হাসিতে বিলাসী আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার কাঁধের উপর একটা মাছধরা পলুই! সে দিন যাহাকে কত সাধ্যসাধনা করিয়াও উঠাইতে পারে নাই, আজ তাহাকে নিজে হইতে তাহার বাড়ী বহিয়া সহাস্যমুখে আসিতে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে রমনা হাসিবে কি কাঁদিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বিলাসীর ভয়ে রমনা গাঁজার কলিকাটি তাড়াতাড়ি পশ্চাদ্দিকে লুকাইয়া রাখিতেছিল, বিলাসী পুনরায় হাসিয়া কহিল,—"তোর আর লাজে কায নাই, রমনা,—গাঁজা আবার কবে থেকে ধর্‌লি?"

রমনা হাসিয়া কহিল, "বাদলের দিনে একটান টান্‌ব মনে করেছি—এ শালার মদে ত' আর নেশাই হয় না ছাই ......এবারে বিষ খাব একটুকু ক'রে।" বলিয়া দন্তপংক্তি বিকাশিত করিয়া নেশার ঝোঁকে রমনা হাসিতে লাগিল।

বিলাসী ততক্ষণ ঘরের দরজায় বাঁশের পলুইটা নামাইয়া তাহারই উপর কাৎ হইয়া বসিয়াছিল। রমনা বলিল, "থাকবি ত?"

বিলাসী বলিল, "হাঁ, থাক্‌ব বেটে, কিন্তুক ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আমি আর কায করতে লার্‌ব, মাইরি। খেতে দিতে হবেক্।"

রমনা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল, এই দু'দিনের মধ্যে সে নানকুকে এমনভাবে ভুলিয়া গেল কেমন করিয়া? দু'দিন

পূর্ব্বে যে বিলাসী এক জনের বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া কিছু না খাইয়া শুকাইয়া মরিতেছিল, তাহার বেদনার এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্তও সে তাহার মুখে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না; তাই আজ সাহস করিয়া রম্না বলিয়া ফেলিল, "বাবুদের দৌলতে এই রম্না থালাসীর পয়সার অভাব নাই, বুঝ্‌লি, বিলাসী! কিন্তুক্, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবেক্—আমাকে নিকা কর্‌বি ত?"

বিলাসীর মুখের হাসি এইবার মিলাইয়া গেল; বলিল, "উ কথা বল্‌বি ত' এই আমি চল্লাম।" বলিয়াই সে উঠিতে যাইতেছিল, রম্না বাধা দিয়া বলিল, "তোর দিব্যি রইল আমাকে, আর যদি তোকে উ-কথা বলি। তুই থাক্—পায়ে পা দিয়ে ব'সে ব'সে খা।"

সেই দিন হইতে বিলাসী রম্নার বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া খাইতে লাগিল। রম্না মাঝে মাঝে তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দু'জনে ঘর-কন্না করিবার কথা বলিত, কিন্তু বিলাসী কোনমতেই সম্মত হইত না—বিশ্রী গালাগালি করিয়া বলিত, "বাউরী হলেও আমি আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না, রম্না, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে ই-কথা বলিস্ না।"

এমনই করিয়া প্রায় বৎসর খানেক কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; এক দিন বর্ষার সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল। রম্না ঘরে ছিল না; বিলাসী ঘরের চালার একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া বসিয়া গত জীবনের মধুর স্মৃতির জ্বালায় অস্থির হইয়া আকাশের সেই অজস্র বর্ষণের ধারা দেখিতেছিল। এমন সময় রম্না কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বাঁশের পলুইটা লইয়া বলিল, "চট্ ক'রে মাছ ধ'রে নিয়ে আসি,—বাঁদে ইয়া বড় বড় মাছ উঠ্‌ছে। যত সব সাঁওতাল মাছ নিয়ে যেছে। চল্, তুই যাবি?"

যাহার জন্য সে কত সাধ করিয়া পলুই কিনিয়া আনিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত সেই নান্‌কুই এ পলুই দেখে নাই, আর আজ কি না তাহারই জিনিষ রম্না লইয়া যাইবে! না—না গো, না। বিলাসী রম্নার হাত হইতে পলুইটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "যাস্ না রম্না—এই জলে ভিজে কোন্ দিন তুইও ম'রে যাবি। আর যদিই যাস্—পলুই নিয়ে যেতে পাবি না।"

রম্না যখন কোন প্রকারেই পলুই লইয়া যাইতে পারিল না, তখন বলিল, "আজ বেশ টিপ্ টাপ্ ক'রে বাদল, আমি মাদলটা নিয়ে আসি, তুই গান কর্ দেখি?"

প্রবাদ ছিল, বিলাসী নাকি সাঁওতালী গান বেশ গাহিতে পারে। আজ তাহার মনটাও বড় খারাপ ছিল, তাই সম্মতি দিয়া বলিল, "নিয়ে আয়—গানই করি।" বিলাসী ভাবিতেছিল, তাহার মত মনের জ্বালা দুনিয়ায় বোধ হয় কাহারও নাই,—আর তাহাদের মত ছোট জাতের ব্যথা-বেদনা হইলেই বা কার কি আসে যায়! বাবুদের মত বড়লোক হই নাই কেন? তা হ'লে তো এত দুঃখু থাক্‌তো না! নান্‌কু!—উঃ, বে-ইমান্ নান্‌কু!...পীরিত জানিস্ না, খাল্‌ভরা?

রম্না মাদলটা নামাইয়া বলিল, "মদ আছে,—খাবি?"

বিলাসী যেন ইহারই জন্য এতক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই সাগ্রহে বলিল, "কই? রইছে নাকি?"

খানিকটা মদ খাইয়া, নেশার ঘোরে রম্না তড়াক্ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া, কাপড়টাকে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি মাদলটা লইয়া নাচিয়া নাচিয়া মাদলে চাপড় দিতে দিতে তালে তালে বলিতে লাগিল,—"তিং তাং তাং তাতিং লো—"

রম্নার তাণ্ডব নৃত্য এবং অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বিলাসী হাসিতে হাসিতে কহিল, "অমন কর্‌বি ত গাইব নাই। চুপ্ ক'রে ব'স্ কেনে, ক্ষ্যাপা ত' ল'স্!"

রম্না মাদলটা লইয়া চুপ করিয়া বসিলে, বিলাসী চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া বাহিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গাহিতে লাগিল—

"কোন্ সাঁঝে তুই গেছিস্ চ'লে আমার পিয়ারী,
আমি যে তার কিছুই জানি না লো
কিছুই জানি না।"

তাহার অপূর্ব্ব সুরের রেশ্ বর্ষার বাতাসে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। সে আজ আনন্দে ডুবিয়া থাকিবে ভাবিয়াছিল, তাই বুঝি তাহার চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা গানের সাথে বুক ছাপাইয়া গড়াইয়া আসিল! চোখের জল মুছিয়া ফেলিতে তাহার সাহস হইল না। ওগো, চোখের জলে যে ধরা দিয়াছে, মুছিয়া ফেলিলে সে যদি মন হইতেও সরিয়া যায়! তাই জল-ছল-ছল নয়নে সে আবার গাহিয়া উঠিল,—

"বল্ দেখি ভাই, আসবে কি সে ছাতা পরবে ?"

ভিজে মাটী ও ঘাসের সোঁদো গন্ধ আর্দ্র বাতাসে রহিয়া রহিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

৪

সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় আরও দুইটা মাস কাটিয়া গেল। সে দিন শরৎ-সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। রম্না আজ কয়েকদিন হইল, রাণীগঞ্জ হইতে একটা বিলাতী মদের বোতল কিনিয়া আনিয়া তেমনই কাগজ-মোড়া অবস্থাতেই অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছিল। দেশী মদ খাইয়া দিন কাটিতেছিল, তবুও উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ভাল মদের বোতলটির ছিপি খুলে নাই।···পরদিন ছিল রবিবার ;—কায বন্ধ। শনিবার সন্ধ্যায় ইঞ্জিন-ঘর হইতে ফিরিবার সময়েই রম্না ভাবিতেছিল, আজ একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে।

বিলাসী দিনের বেলা বড় বড় চিংড়ি মাছের চাট্নী রান্না করিয়াছিল ; একটা বড় বাটীতে তাহাই খানিকটা লইয়া, আট্‌চালায় একটা চাটাই বিছাইয়া, বিলাসীকে লইয়া রম্না বোতল খুলিতে বসিল।

ফুরফুরে বাতাস ও চাঁদের আলোয় বিলাতী মদের রঙ্গিন নেশা ধরিতে দেরী হইল না। বিলাসী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল ; এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, "আন্ মাদল—গান গাইব।......"

রম্না হাসিতে হাসিতে মাদল আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই, একটি তের চোদ্দ বছরের কালো কুচ্‌কুচে ছোক্‌রা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি লইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে ধীরে ধীরে উঠানের একপাশে দাঁড়াইয়া বিলাসীকে হাতের ইসারা করিয়া বলিল, "শোন্ !"

"—অই বিষণ যে রে ?" বলিয়া বিলাসী ধীরে ধীরে উঠানের জাম গাছটার পাশে উঠিয়া গেল।

এই বিষণ ছোক্‌রাটি জাতিতে সাঁওতাল। নান্‌কুকে লইয়া বিলাসী যখন ডাঙ্গালপাড়ার ধাওড়ায় বাস করিত, বিষণ তখন প্রতিবেশী ছিল। ছোট ভাইটির মতই বিলাসী তাহাকে ভালবাসিত, সে যখন যা বলিত, কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া বিষণ তাহাই করিত। নান্‌কু চলিয়া যাইবার পর হইতে বিলাসী রম্নার ঘরে আসিয়াছে, তাই এখানে তার যাওয়া আসা বড় একটা ছিল না বলিলেই হয়, কাযেই অনেক দিন পরে বিষণকে দেখিয়া বিলাসী একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিল, "তুই হেথা কোথা রে, বিষণ ?"

উঠানে জাম গাছের তলায় চাঁদের আলোতে একটা খাটিয়া বিছানো ছিল, বিষণ বিলাসীকে আরও খানিকটা দূরে লইয়া গিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল, "কাউকে না বলিস্ তো বলি।"

বিলাসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে কাহাকেও জানাইবে না।

বিষণ বলিল,—"তোর নান্‌কু এসেছে। আজ দুদিন সে চার নম্বরে কায কর্‌ছিল।"

বিষণ মনে করিয়াছিল, হঠাৎ এ সংবাদ শুনিয়া বিলাসী আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিবে হয় ত', কিন্তু গম্ভীর স্তব্ধভাবে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বিলাসী কহিল, "তার পর ?"

গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিষণ কহিল,—"আজ চাল ঝাড়াই কর্‌তে যেয়ে সে খুন হয়েছে—লাস্ এখনও পছিমদিকের চাঁদনীর কাছে প'ড়ে আছে।"

প্রিয়জনের অন্তিম শয্যায় বসিয়া বসিয়া তাহার মৃত্যু দেখিলে দর্শকের মুখখানা যেমন ক্রমেই ফ্যাকাসে ও মলিন হইয়া আইসে, অথচ সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না, মুখেও কিছু বলিতে পারে না, বিলাসীর অবস্থা ঠিক তাহাই হইল।

বিষণ আবার বলিল, "আমাদিকে তখনই খাদ থেকে উঠায়ে দিয়েছে,—দেখ্‌তে প্যায় নি। সাঁঝের আগু শুধালে বলেছিল, মাইন্সু ম'রে গেইছে।"

বিষণের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই বিলাসী কহিয়া উঠিল, "আ মর্ হতভাগা, সে ম'লো ত আমার কি ? নান্‌কুও মরেছে, বেশ হইছে। বেরে ! তুই আবার সাওকারী করে বল্‌তে এসেছিস্—বেরে যা, পালা—দূর হ'।" বলিয়া বিষণের ঘাড়ে ধরিয়া এক ধাক্কা দিতেই সে বিষণ্ণমুখে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

রম্না ইতোমধ্যে মাদল আনিয়া, মদের পাত্র ঢালিয়া বিলাসীর অপেক্ষায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, বিলাসী বিষণকে গলাগালি দিয়া বিদায় করিয়া রম্নার নিকট আসিয়া কাপড়টা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দে মদ দে,—ঢাল্, ঢাল্ আরও ঢাল্ !"

রম্না বিলাসীর হাসি দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া নেশার ঝোঁকে কম্পিত হস্তে আবার মদ ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "ও শা্লা কি জন্যে এসেছিল ?"

আসল কথাটা গোপন করিয়া বিলাসী হাসিয়া বলিল,—"উয়ার দেখ্ছিস্ কি ভ্যাংরাছি, বেড়াতে এসেছিল, আমি তেড়ে দিলম।"

আবার মদের পর মদ চলিতে লাগিল। বিলাসী কয়েক গ্লাস খাইয়া গান ধরিল—

"—আয় রে আমার, আয় রে আমার
খোকন্ ঘুম্ যায় রে
আয় রে আমার, আয় রে আমার।—"

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া, গানটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়াই বিলাসী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। রম্না সবে মাত্র খেয়ালের উপর মাদলে চাঁটি বসাইতে যাইতেছিল, এমন সময় নিতান্ত অরসিকের মত বিলাসীকে এরূপ ভাবে উঠিতে দেখিয়া বলিল, "যেছিস্ কোথা', বিলাসী ?"

"চট্ ক'রে আসি," বলিয়াই বিলাসী বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিসের ভীতি-উন্মাদনায়, দুঃখে-হর্ষে, দুইটা বিরুদ্ধ শক্তির অতর্কিত সংঘর্ষে তাহার বুকের ভিতরটা তখন বজ্রের ডাকের মতই গুরু গুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। কোন্ অজানিতের আকর্ষণ তাহাকে মরণ টান টানিতেছে—কোন্ দিকে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, পথ কোথায় ? ওগো—কোন্ দিকে সে যাইবে ?

শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোকে পথ-ঘাট সমস্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। চার নম্বর খাদের পাল্লাটা বিরাট দৈত্যের মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে ডিপোর কাছে প্রকাণ্ড নিমের গাছটা তেমনই হেলিয়া রহিয়াছে। কুঠীর সমস্ত কায বন্ধ ; কাযেই ট্রাম লাইন বা খাদের মুখে কেহ কোথাও নাই। কিছু দূরে একটা লাগ্ফেনী ও গেয়ান ঝোপের পাশে, কয়েক জন বিলাসপুরী মাল-কাটা, খানিকটা আগুন জ্বালাইয়া মদ খাইয়া 'হল্লা' করিতেছে,—এস্, চৌধুরীর কুঠীর পাশে এক দল সাঁওতাল মাদল বাজাইয়া তাহাদের মেয়েগুলাকে হাত ধরাধরি করিয়া নাচাইতেছে, বাঁশী বাজাইতেছে, মদ খাইতেছে, চীৎকার করিতেছে, আবার কেহ কেহ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।... কুকুরগুলা এখানে-ওখানে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে।...চারিদিকের এই সব অদ্ভুত কলরবের সৃষ্টি করিয়া একটা অনাবিল আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। বিলাসী খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই সব দেখিল—মদে তখন তাহার মাথাটাও বেশ রিম্ ঝিম্ করিতেছিল। যেখানে সাঁওতাল নাচ চলিতেছিল, বিলাসী সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ মেয়েদের সারির মধ্যে এক জনের হাত দুইটা ধরিয়া সে তাহাদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"নদীতে পড়েছে বান্ পার কর ভগবান্—
বল্ দাদা, কতদূরে জাম্তাড়া।—"

কিন্তু বিলাসীর পক্ষে এ সাধ করিয়া আনন্দের ফাঁসি বড় খাপ্ছাড়া মনে হইতে লাগিল !—কিসের যেন একটা পাষাণ-ভার তাহার বুকে এমনভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে, কণ্ঠ হইতে সে আনন্দ-সঙ্গীতের সুর যেন বাহির হইতেই চায় না। বাজনার তালে তালে পা ফেলিতে গিয়া তাহার মনে হইল, একটা গুরুভার লৌহ-শৃঙ্খলে চরণ দুইটা যেন বার বার জড়াইয়া যাইতেছে। বিলাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাই সে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রম্না তখন মদিরা-বিহ্বল নেত্রে তালপাতার চাটাইএর উপর শুইয়া শুইয়া মাদলটাকে বুকে চাপাইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আপন মনেই নানাপ্রকার অদ্ভুত বোলের আবিষ্কার করিতেছে।

বিলাসী টলিতে টলিতে তাহার নিকট আসিয়া মাদলটাকে তুলিয়া ফেলিয়া রম্নার হাত ধরিয়া চড়্চড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "শোন্ রম্না—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রম্না বলিল, "কি কথা, বল্।"

বিলাসী বলিল, "কালই তোকে নিকা করি, যদি তুই আমার একটা কথা রাখিস্।"

রম্না আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিলাসীর গায়ে হাত দিয়া বলিল,—"মাইরি, এই বত্রিশ বন্ধন ঘরে ব'সে বল্ছি, তুই যা বল্বি, তাই করব।"

বিলাসী দাঁড়াইয়া কহিল,—"ওঠ্ তবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।"

রমনা কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া বিলাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে কহিল,—"কোথা যাবি বল্ দেখি ?"

বিলাসী রমনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ইঞ্জিনটা খুলে আমাকে একবার চার নম্বরে নামিয়ে দিবি, চল্।"

নেশায় তখন রমনা চুর হইয়া আছে, তাহার উপর বিলাসী তখনও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া। জ্যোৎস্না-লোকে বিলাসীর মুখের পানে একবার তাকাইয়া রমনা বলিল, "ই বাবা! এই রেতে একলাটি খাদে নাম্‌বি ?—ধুৎ! ভূত আছে, ভূত!"

বিলাসী বলিল, "তোর মাথা আছে থাল্‌ভরা। নামাবি কি না বল্। বিষণ পঁচিশটা টাকা ফেলে এসেছে, নিয়ে এসে তোকেই দিব।"

চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধ আলোকে বিলাসীর বাহুবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে এলাইয়া দিয়া পথ চলিতে চলিতে গোলাবী নেশার ঝোঁকে রমনা কহিল, "চল্ তবে দুজনেই যাই।"

বিলাসী চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "উঠাবে কে ?"

রমনা বলিল, "কাল খদ বন্ধ, নয়? পরশু উঠ্‌ব।"

ততক্ষণে তাহারা খাদের মুখে আসিয়া পড়িল। বিলাসী বলিল, "দে ইষ্টিম দে, আমি ডুলিতে দাঁড়াই। ঘণ্টা বাজালে তুলে দিস্।"

...রমনা ইঞ্জিন-ঘর হইতে ইঞ্জিন ছাড়িল। বিলাসীকে লইয়া ডুলিখানা অন্ধকার খাদের মুখে সর্ সর্ ঝড়্ ঝড়্ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতে সুরু করিল। ইঞ্জিনটা সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়াছিল, ৪০।৫০ ফুট নীচে নামিয়া, ডুলিখানা হঠাৎ গাইড্‌রোপে আট্‌কাইয়া মাঝপথে থামিয়া গেল। বিলাসী নীচে নামিবার জন্য এত বেশী উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনে হইল, বুঝি বা ডুলিখানা নীচের মাটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাসী যেমনই নামিতে যাইবে, পায়ের নীচে কোন অবলম্বন ঠেকিল না—ঝপাস্ করিয়া একেবারে 'মা গো' বলিয়া সেই পঞ্চাশ ফুট উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেল।...

বিলাসী পড়িল বটে, কিন্তু মরিল না। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে,সে একটা মানুষের বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং যাহার উপর সে আসিয়া পড়িল, সে মুমূর্ষু লোকটা বোধ হয় এই গুরুভার পড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। বিলাসী তাহার বুকের উপর সজোরে আসিয়া বসিয়া পড়িবামাত্র লোকটা 'আঃ' বলিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার করিয়া শেষ হইয়া গেল।...বর্ষার বারিবর্ষণের মতই খাদের মুখে চানকের চারিপাশের অন্ধকারে কয়লার স্তরের উপর দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেই ছপ্‌ছপে জল-কাদার উপর হইতে অতি কষ্টে মৃত দেহটাকে টানিয়া টানিয়া সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখে লইয়া গিয়া বিলাসী পরীক্ষা করিতে লাগিল, এই তাহার নানকু বটে কি না! অন্ধকারে হাত দিয়া প্রথমে কোঁক্‌ড়া চুলের লম্বা গুচ্ছের উপর হাত পড়িতেই বিলাসী একটু চমকিয়া উঠিল; তাহার পর একে একে হাত দিয়া আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া,গলার কণ্ঠীর মালায় হাত পড়িতেই সে বুঝিল, এ তাহার নানকু ভিন্ন আর কেউ নয়! হোক্ না আঁধার; সে যদিও সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে নিজেকেই দেখিতে পাইতেছিল না,তথাপি যে নানকুর সাথে সে তাহার সারা জীবনটা কাটাইয়া আসিয়াছে, সেই নানকু দু'দিনের তরে মাইনুর কাছে গিয়াছিল বলিয়াই কি সে তাহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া গেছে যে, অন্ধকারে চিনিতে পারিবে না! বিলাসী যে তাহার শরীরের প্রতি গ্রন্থিটিকে ভাল করিয়া চিনে—কণ্ঠের স্বর,পায়ের ভাষা, বুকের উঠা-নামা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তো চিনিবেই! সে বার বার নাকের নিকট হাত রাখিয়া, বুকে কান পাতিয়া দেখিল,—যদি কোথাও এতটুকু জীবনের সাড়া পাওয়া যায়! নাঃ—সব শেষ। উঃ মা গো! একটা তিক্ত ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস বিলাসীর কণ্ঠ ছাপাইয়া উঠিয়া আসিল! ওগো নিষ্ঠুর পিয়ারী! যদি ঘুরিয়া ফিরিয়া আমারই কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে আসিলে, তবে আমারই উপরে শেষে তোমার হত্যার অপরাধ চাপাইলে কেন? তুমি ত বাঁচিয়া ছিলে—হয় ত যখন কয়লার চাল ভাঙ্গিয়া তোমার উপর পড়িয়াছিল, তখন যদি তোমাকে কেউ তুলিয়া লইত, তাহা হইলে আমি আমার নানকুকে আমার ঘরে ফিরিয়া পাইতাম! আর্ত্ত-কষ্টে হয় ত সেখান হইতে বুকে হাঁটিয়া উঠিয়া আসিয়া চানকের মুখে এই রাক্ষসীর অপেক্ষা করিতেছিলে?

বিলাসী নানকুর মাথাখানা বুকের উপর তুলিয়া লইয়া সেই অন্ধকারে তাহার মরা-মুখে হাজারবার চুম্বন করিল; হাত দিয়া দেখিল,—ইস্! বাঁ ধারের চোখটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাঁ হাতেরও খানিকটা অংশ একেবারে উড়িয়া গিয়াছে।

আঃ! দরদর করিয়া বিলাসীর চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এতক্ষণ পরে 'লিফ্‌টের' কেজ্‌খানা সর্‌ সর্‌ করিয়া নীচে নামিতে নামিতে ঝড়াং করিয়া মাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল!

বিলাসী একবার ভাবিল, নান্‌কুকে লইয়া উঠিয়া যাইবে না কি! আবার ভাবিল,—কথনই সে উঠিবে না! মরিবে গো—সে মরিবে!...সে ত বাঁচিবার তরে এ বিভীষিকাময়ী মৃত্যুগহ্বরে আইসে নাই!...উপরে উঠিবার টব-গাড়ীর প্রলোভনটা যতক্ষণ কাছে থাকিবে, ততক্ষণ হয় ত উঠিবার ইচ্ছা হইবে ভাবিয়া বিলাসী নান্‌কুর মৃতদেহটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই অন্ধকার পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের মুখে নির্ভীক-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে বিরাট সূচিভেদ্য অন্ধকারের মুখে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সেথান হইতে ছুটিয়া পলাইবার জন্য বিলাসী তাড়াতাড়ি সেই তমসাচ্ছন্ন খাদের মুখে ঢুকিয়া পড়িল। গুরুভার মৃতদেহটা স্কন্ধে লইয়া বিলাসী বেশী দূর ছুটিতে পারিল না—পাশে একটা কাঁথির গায়ে মাথা ঠোকাইয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। কালো আঁধারের ভিতর পথ ত খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না, তাহার উপর পাশের বড় বড় চাঁদনি ছাড়া 'গোফ'গুলার ভিতর কালো কয়লার স্তূপে স্তূপে যেন অন্ধকার আরও বেশী করিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। বিলাসী সেই ঘনীভূত বিরাট্‌ অন্ধকারে মৃত্যুর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। কত লোক চাঁদনীর কয়লা ছাড়াইতে গিয়া মরে, কত লোক কাটা 'কাঁথি' নড়াইতে গিয়া চাপা পড়ে, কিন্তু বিলাসী প্রায় চার পাঁচটা 'প্রপের' শাল খোঁটা প্রাণপণ চেষ্টায় ছাড়াইয়া ফেলিল, তথাপি কয়লার চাংড়া পড়া দূরে থাকুক,একটা ছোট কয়লার টুক্‌রাও ত কই মাথার উপর আসিয়া পড়িল না! বিলাসী শুনিয়াছিল, খাদের নীচে ভূত থাকে, তাই ভয়ে কেহ একা অন্ধকারে নামিতে পারে না। আজ ত সে একা নামিয়াছে, শুধু একা নয়, একটা মৃতদেহও কাঁধের উপর আছে, কিন্তু কোন ভূত বা প্রেতের চিহ্ন পর্য্যন্তও তো সে দেখিতেছে না! আচ্ছা, নান্‌কু জেগে উঠ্‌তে পারে না! ছোট ছেলেকে যেমন করিয়া আদর করে, তেম্‌নই করিয়া বুকের উপর নান্‌কুকে ধরিয়া তাহার ঠাণ্ডা গালে—যেখানে রক্তের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে সেই রক্তলিপ্ত গণ্ডের উপর নিজের গালটা রাখিয়া ডাকিয়া উঠিল, "নান্‌কু!"...আবার অজস্র ধারে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। কান্নাকাতর চাপা কণ্ঠে সে বলিল, "একটিবার চোখ চেয়ে ন্যাখ নান্‌কু,—আমি কে!...একবার ভূত হয়েও বেঁচে ওঠ্‌, যদি আঁৎকে উঠে মরে যাই—তাও ভাল!"

...কিন্তু নান্‌কু জাগিল না। চাপাকান্নায় বিলাসীর বুক-খানা আবার মোচড় খাইয়া উঠিল। কোন্‌ অশরীরী প্রেতাত্মার দীর্ঘনিশ্বাস হু হু করিয়া বড় বড় 'পিলার'গুলার আশে-পাশে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিলাসীর গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, কিন্তু তাহার বাঞ্ছিত মৃত্যু কই, মৃত্যু কই!

বিলাসী আবার অন্যদিকে ছুটিল। উন্মাদিনীর মত আলুলায়িতকেশা, বিস্রস্তবসনা—স্কন্ধে স্বামীর মৃতদেহ! সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব নাকি এমনই করিয়া মৃতদেহ স্কন্ধে ত্রিভুবন ঘুরিয়াছিলেন; আজও তেমনই মনে হইতেছিল, সতীই যেন শিবের শব স্কন্ধে লইয়া মসীগাঢ় অন্ধকারময় পাতালপুরীর গুহায় গুহায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!...তাহারই পাশে তিন নম্বর 'পিটে' আগুন হইয়াছিল। একটা গরম জলের স্রোত পাশের ড্রেণ দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বিলাসী জলে পা দিয়া দেখিল, নাঃ, বেশী গরম নয়। দূর ছাই! আবার, আবার ছুটিল। বেশী দূর যাইতে পারিল না, একটা কাঁথির গায়ে আঘাত লাগিয়া সশব্দে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। নান্‌কুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিলাসী ভাবিল, হয় ত সে মরিয়া গেল।...না—মরে নাই ত! মাথার খানিকটা কাটিয়া গেল মাত্র। গরম রক্তের স্রোত চোখের জলে আসিয়া মিশিল।...এতে ত কিছু হইবে না!

সম্মুখে তাকাইতেই দেখিল, কিছু দূরে একটা চাঁদনী এমন ভাবে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া ফাঁক হইয়া গিয়াছে যে, উপরের আকাশটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; আকাশে চাঁদের আলো। আলোর রশ্মিটা কিছু দূরে আসিয়া আটক খাইয়া গিয়াছে,—ভিতর পর্য্যন্ত আসিতে পারিতেছে না। ফাঁকের মুখে নরম মাটী এমনই এলোমেলো ভাবে নামিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার পাশে উপর হইতে ঢালের মুখে একটা জলের স্রোত ছল্‌ ছল্‌ করিয়া ভিতরে বহিয়া আসিয়াছে—মাঝে মাঝে জলে-ধোওয়া নরম মাটী ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া নীচে ছাড়িয়া ছাড়িয়া পড়িতেছে। সেই স্তূপাকার মাটীর পাশে বিলাসী নান্‌কুকে কাৎ করিয়া কোলের উপর শোওয়াইয়া বসিয়া পড়িল। কষ্টায় ও ব্যথায় তখন তাহার বুকখানা

ভরিয়া উঠিয়াছে। বিলাসী আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুর ধরিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"তুমি এসেছ কি এসো নাই, এখনো ন—জরে দেখি নাই, গো—"

না—না—আর ত থাকা যায় না। নানুকু রে! তোর মরা হাতে আমার গলাটা চেপে ধর্ একটিবার!...বিলাসী নানুকুকে তুলিয়া লইয়া আবার সেখান হইতে উঠিল। পাশেই একটা 'গোফে'র মুখে চাল ছাড়ার শব্দ হইল,—চড়্ চড়্— চড়াৎ!

এই—এই ত! বিলাসী এলোচুলে আলুথালু বেশে উন্মাদিনীর মত 'গোফে'র মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। নানুকুকে কাঁধে তুলিয়া দুই হাতে প্রাণপণ চেষ্টায় একটা 'প্রপ্' ছাড়াইতেই, উপরের ঝোলা কয়লার একটা মস্ত চাংড়া ধড়াস্ করিয়া ছাড়িয়া, তাহাদের মাথার উপর সশব্দে নামিয়া পড়িয়া একসঙ্গে দুই জনকে সেই বিরাট কয়লাস্তূপের নিম্নে সমাধিস্থ করিয়া দিল!

...এদিকে রমনা খালাসী ইঞ্জিনঘরে দুই হাতে 'ষ্ট্যারিং গিয়ার্' ও 'হুইল' ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া বসিয়া মদের নেশায় ঝিমাইতেছিল। বিলাসী ঘণ্টা বাজাইলেই ইঞ্জিন চালাইয়া তাহাকে তুলিয়া লইবে!

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

বিজয়া।

ধীর পবন বহে,— গগনে শরত শশী
হাসি রাশি মাখি কেলি করে;
শ্বাস ফেলিছে পুনঃ শরতে প্রকৃতি চারু
ভূষণ পরি বহুদিন পরে।
নীরদ নীর ছাড়ি আহ্বানে জগতে
বিজয়া পুলক সন্তোষ ভরে।
আইস সখা কুল, সন্তোষ,—সন্তোষি
উরসি আলিঙ্গন প্রেমভরে।
কুলু কুলু জাহ্নবী চুম্বিছে তটতৃণ,
ভাসিছে ফুলকুল নীর তরঙ্গে,
খেলিছে শততরি, সুন্দর জলচর,
সুন্দরী অবগাহে সহচরী সঙ্গে,
সরোজ হায় অই— সারদা বলিসার
ধীরি ধীরি আসে ভাসি চন্দন অঙ্গে,
বাল-বালিকা শত ধাইছে ধরিতে
পরিতে হৃদয়ে সে হার রঙ্গে।
আন সে চন্দন সরোজ আন অই
আন আরি ফুলকলি যত ফুটে
চরণে অদলিত দূর্ব্বাদল নব
যতনে চয়ন করি আনহ ছুটে।
কমলা-পীঠ হতে কাঞ্চন রজতকণ
শস্য সম্পদ সার আনহ লুটে।
পূত বাসর আজি মঙ্গল নাটে মিলি
আশীষ আহ্লাদে আশিব টুটে।
শ্যাম কেলি স্মৃতি, বৃন্দাবন হায়
নভ পট-শ্যামল যমুনা নীরে
আনহ কুম্ভ ভরি নর্ম্মদা নদজল—
বহিতে যে চুম্বিছে মর্ম্মর তীরে,
গোমতী গোদাবরী শতদ্রু স্মৃতি সহ
ব্রহ্মা-তনয় তোয় আনহ ধীরে
চলিতে না উছলে যেন পড়ে ভূতলে
জাহ্নবী জল আন পূত শরীরে।
সন্তোষ, সন্তোষি পুলকে আইস সখা
সারদা বলিসার সরোজ বক্ষে,
বাল-বালিকা যত পুলকে নাচিয়ে আয়
চুম্বিয়ে আশীষ করি, ধরি কক্ষে,
গুরুজন ব্রাহ্মণ পুলকে প্রণমি,
চঞ্চলচিত জনে রাখিও চক্ষে,
কলহ দ্বন্দ্বী যারা পুলকে ডাকি সবে,—
না রহে কলহ যেন অক্ষে পরোক্ষে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *

পাঠকালে (´) চিহ্নিত অক্ষরগুলি দীর্ঘ উচ্চারণ করা প্রয়োজন। ইহা লগী-রাগিণী যৎতালে গীত হইতে পারে।

---

* হেমচন্দ্রের জীবন-চরিতের উপাদান সংগ্রহকালে আমরা তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺সুশীলা দেবীর ও জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠির বাক্সে হেমচন্দ্রের অনেকগুলি পত্র পাই। একখানি ফুলস্কাপ কাগজে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এই কবিতাটিও প্রাপ্ত হই। উহার নিম্নে লিখা ছিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সম্প্রতি সুশীলা দেবীর কনিষ্ঠ দেবর অধুনা ৺কাশীধামে কৃতনিবাস বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়াছি যে তাঁহার পিতা,—কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান—৺রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের বাটীতে প্রথম শারদীয়া পূজার পর উহা হেমচন্দ্র কর্ত্তৃকই রচিত হয় এবং আমাদের অনুমান অমূলক নহে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কৈলাস-যাত্রা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপরাহ্নকালে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলাম। কোথায় অবস্থান করিব, ইহাই হইল প্রথম চিন্তা। কাঠগুদামে অবস্থানকালে এক জন আলমোড়াবাসী বলিয়াছিলেন, নৃসিংহদেবের মন্দিরে থাকিবার কোন অসুবিধা হইবে না। এই সূত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কয়েক জন সাধু ধুনী জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছেন। কুলীর পৃষ্ঠে বোঝা, অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া এক জন আমাকে "এ স্থানে থাকিবেন কি?"—প্রশ্ন করেন। আমার সম্মতি অবগত হইয়া তিনি একটা ঘর পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। সাধু, যে গৃহ আমার জন্য কল্পনা করেন, তাঁহা আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকায় "পিশু"-পরিপূর্ণ হইয়াছে। সংস্কৃত "পিশুন" শব্দ হইতে এই পাহাড়ী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের নামকরণ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু পিশুন হইতেও এই ক্ষুদ্র "পিশু" ভীষণতর, পিশুন পশ্চাদ্ভাগে দুই চারিটা নিন্দা করিয়া নিবৃত্ত হয়, কিন্তু পিশু পশ্চাৎ, সম্মুখ, উভয় ভাগে দংশন করিয়া বিব্রত করিয়া থাকে। কবি সুবন্ধু "কুলদেবী পিশুন" ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, আমাকে কিন্তু "পিশু"-ভয়ে গৃহত্যাগ করিতে হইল। আমাকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া পাশের এক জন বলিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন? উপরে ঐ ধর্ম্ম-সভার গৃহে সুখে অবস্থান করুন।" উত্তরে আমি কহিলাম, "সুখ ত গৃহে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কোনরূপে থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট বিবেচনা করিব।" ভদ্রলোকটি ঘরের চাবি আনিবার জন্য সম্পাদকের কাছে লোক প্রেরণ করিলেন; আমিও আশ্বস্ত হইলাম। এই অবসরে কুলীদের ৩৲ টাকা হিসাবে আর ঘোড়াওয়ালাকে ৭॥০ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া বিদায় প্রদান করিলাম। ইহার উপর কিছু বক্‌সিশও তাহারা আদায় করিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থানীয় ধর্ম্মমণ্ডলের সম্পাদক পণ্ডিত নন্দকিশোরজী উপস্থিত হইলেন। কাশীতে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের যে উৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আর নূতন করিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হইল না। দূর হইতে দেখিয়াই তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন; অবস্থানের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্থানটি মন্দ নহে। পাশেই গুর্খা সেনানিবাস। ইহার বাদ্যধ্বনি, সেনাদের উচ্চস্বর, বন্দুকের শব্দ প্রভৃতি প্রসুপ্ত সামরিক ভাবকে যেন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। সম্মুখের পাহাড়টি বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়ায় বেশ নয়নসুখকর হইয়াছিল। উত্তরদিকে চির-তুষারাবৃত নন্দাদেবী যেন শ্বেত-কেশ-মণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় আভিজাত্য আর ভারত-সাম্রাজ্যের ভিতর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। উত্তরে ত্রিশূল, পঞ্চচুলী আর পশ্চিমদিকে বদরীনাথের শিখর। এই সকল দেব-নিবাস পর্ব্বতমালা যেন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া বরাভয় প্রদান করিতেছেন, আর যেন মৌন ভাষায় বলিতেছেন—"আমাদের উপর কত শত বজ্রাঘাত, কত শত ঝটিকা আর কত যে তুষারপাত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু অটল অচল হইয়া সে সব সহ্য করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পরাভূত হইয়া প্রস্থান

পঞ্চচুলীর তুষারদৃশ্য।

করিয়াছে; সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়ের সহিত বিপদ্ অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে আর আমরাও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আছি।" এইরূপ কথা যেন আমার কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হিমালয়ের প্রত্যেক পর্ব্বত, প্রতেক স্থান পবিত্র, এবং কোন না কোন প্রাচীন স্মৃতির সহিত বিজড়িত। সে হিসাবে আলমোড়াও অতি পুণ্যভূমি। যে পর্ব্বতের উপর আলমোড়া সহর অবস্থিত, সে পর্ব্বত পুরাণে 'কাষায় পর্ব্বত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণনা স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত মানস খণ্ডের ৫২ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে:—

"কৌশিকিশাল্মলীমধ্যে পুণ্যঃ কাষায়পর্ব্বতঃ।"

কৌশিকী ও শাল্মলী নদীর মধ্যে পুণ্যজনক কাষায় পর্ব্বত অবস্থিত। কৌশিকী বর্ত্তমান কোশি আর শাল্মলী শোণ নামে কথিত হইয়া থাকে। আলমোড়া হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে কাষায়েশ্বর ও কাষায়েশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

আলমোড়ার নামকরণ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, "অম্ল" শব্দ হইতে আলমোড়া শব্দের পরিণতি হইয়াছে। এক মন্দিরের ধাতুপাত্র অম্ল দিয়া পরিষ্কারের জন্য এক ব্যক্তিকে কিছু ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, এই অম্ল শব্দ হইতে আলমোড়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হিমালয়প্রদেশ বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল ভোগ করিয়াছিলেন। রামগড় হইতে আসিবার সময় যে গাগর পর্ব্বতের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম গর্গাচল। এইরূপ প্রত্যেক পর্ব্বতের সহিত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই পর্ব্বত-মালার কিয়দংশ মহাভারত পর্ব্বত নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষত্রিয়রা এই সকল পর্ব্বতপুঞ্জ অধিকার করিয়া আপনাদের অধিকারের সীমাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে শ্বেতকায়রা বৎসরের কিয়দংশ সময় যেরূপ পর্ব্বতবাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেকালের ব্রাহ্মণরাও জীবনের কিছু সময় পর্ব্বতে বাস করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন। লোকালয়ের বৃদ্ধির সহিত ক্ষত্রিয়রা এই বিশাল হিমালয়প্রদেশে আপনাদের ভুজবলের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, কতিপয় সূর্য্যবংশীয় রাজপুত হিমালয়-প্রদেশে আগমন করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র জনপদবাসী গাড়বাল, আলমোড়া, কামায়ুন প্রভৃতি প্রদেশে শক্তি-বিস্তার করিয়াছিলেন। বদরীনারায়ণের পথে যে স্থানে যোশী মঠ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে তাঁহারা প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজবংশে শৈব ও বৈষ্ণব এই মতগত ভেদের ফলে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। এই বংশের এক ধারা গোমতী ও সরযূর মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা-ভূমিতে একটি নগর স্থাপন করেন। পুরাকালে এই নগর কার্ত্তিকেয়পুর নামে খ্যাতিলাভ করে। এই রাজবংশ কাতুর রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, কার্ত্তিকেয় শব্দ হইতে "কাতুর" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। আবার আর এক মতে এরূপ কথিত হয় যে, বর্ত্তমান বৈজনাথ নামক স্থানের নিকটে এই বংশীয়রা করবীরপুর নামক একটি নগর স্থাপন করেন। ইহার ভগ্নস্তূপ হইতে প্রস্তরাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এক সময় ইহা যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহা এই স্থানের ভগ্নস্তূপ দেখিলে বেশ বুঝা যায়। কালক্রমে এ স্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে লোকসকল ইহা পরিত্যাগ করে। এই বংশের শিলালেখ ও তাম্রলিপি বাগেশ্বরের পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরে এবং কতিপয় ভূস্বামীর নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন এই রাজপরিবার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পবিত্র জীবনযাপন করিয়াছেন, ততদিন তাঁহারা বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ব্যভিচারী ও প্রজাপীড়ক হওয়ায় তাঁহাদের রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। এই রাজবংশের বংশধররা আমকোট প্রভৃতি স্থানে এখনও পূর্ব্ব-গৌরবের নামমাত্র অবশেষ রক্ষা করিয়া পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া থাকেন।

কাতুর রাজবংশের হীন অবস্থার সহিত এ প্রদেশে চন্দ্র রাজবংশের আবির্ভাব হয়। এই বংশের আদিপুরুষ সোমচন্দ নামক চন্দ্রবংশীয় জনৈক ব্যক্তি প্রয়াগের নিকট হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আভিজাত্যের জন্য কামায়ুনাধিপতি তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে উত্তরাধিকারি-সূত্রে তিনি এ প্রদেশের সিংহাসন অধিকার করেন।

চন্দবংশে অনেক গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, শক্তিশালী, প্রজারঞ্জক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় ইঁহারাই প্রচলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে

অনেকে বৃহৎ বৃহৎ দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া এ দেশের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও বিদ্বান্‌দের সম্মান করিতেন। ভারতের সমতলভূমি হইতে ব্রাহ্মণাদি আনয়ন করিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিদ্যাপ্রচারপক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ রাজসভা হইতে ভূমি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন।

আলমোড়া সম্বন্ধে এরূপ কথিত হয় যে, এক সময় কল্যাণচন্দ নামক চন্দবংশীয় এক জন রাজা এই পর্ব্বতের অরণ্যে মৃগয়া করিতে আগমন করেন। মৃগয়াকালে এক শশককে অনুসরণকালে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শশককে ব্যাঘ্রাকারে পরিণত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। এই ঘটনা ব্রাহ্মণদের কাছে বিবৃত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণরা এ স্থানের দুর্গমতার কথা বিবৃত করিয়া এ স্থানে নগর স্থাপনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণদের কথা অনুসারে নগর স্থাপনের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। যজ্ঞীয় কীলক ব্রাহ্মণরা শেষ নাগের মস্তকে প্রোথিত করেন। রাজা এ কথায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া স্তম্ভ তুলিয়া ফেলেন ও দেখেন, স্তম্ভের শেষভাগে শোণিতচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণরা রাজার এই কার্য্যে ব্যথিত হইয়া কহেন, আপনার বংশ স্থায়ী করিবার জন্য আমরা যাহা করিলাম, আপনি তাহা স্বয়ংই নষ্ট করিয়া ফেলিলেন!

এই বংশে রুদ্রচন্দ নামে এক জন প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আলমোড়াতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষিত করেন। রুদ্রচন্দ শারীরিক ও মানসিক উভয় বলেই অসাধারণ ছিলেন। এক সময় মোগল সৈন্য ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, উভয় পক্ষের সৈন্য বৃথা ক্ষয় না করিয়া, উভয় পক্ষের দুই জন প্রধান পুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইঁহাদিগের জয়-পরাজয়ের সহিত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। মোগল পক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রুদ্রচন্দ স্বয়ং দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিজয়শ্রী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইল। রুদ্রচন্দ অপূর্ব্ব শারীরিক শক্তির প্রভাবে বিজয়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলেন। মোগল সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। সম্রাট আকবর লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পরিবর্ত্তে এইরূপে জয়-পরাজয় নির্ণীত হওয়াতে রুদ্রচন্দের উপর প্রসন্ন হয়েন, আর দরবারে আগমন করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। আল্‌মোড়াবাসীরা বলেন, সম্রাট সম্ভ্রমের সহিত রুদ্রচন্দকে গ্রহণ করিয়া পাহাড়ী সৈন্য সহ তাঁহাকে কোন এক স্থানে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। রুদ্রচন্দ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গুণ-গৌরব করিতেন। তাঁহার সময় আল্‌মোড়ায় এত অধিকসংখ্যক গুণবান ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন যে, ইহা কাশীর সহিত এ বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিত। এ কথা এখনও আল্‌মোড়াবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কবিবর ভূষণ যে সময় হিন্দুস্থানে মনোমত আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হয়েন, সে সময় তিনি এই হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে আগমন করিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশে রাজবাহাদুর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যজীবন দুঃখপরম্পরা-বিজড়িত। ইঁহার পিতৃদেব পাছে রাজ্যে উত্তরাধিকারী হয়েন, এই আশঙ্কায় রাজা বিজয়চন্দের পক্ষাবলম্বী কর্ত্তৃক উৎপাটিতনেত্র হইয়াছিলেন। আর এই বালকও উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অনুকূল বিধাতা বালককে রক্ষা করিলেন—সে কোনরূপে আহত হইল না। তেওয়ারী ব্রাহ্মণমহিলা কর্ত্তৃক তিনি পালিত হইলেন। অপত্যবিহীন ত্রিমলচন্দ একটি পুত্রকে দত্তক লইবার জন্য অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি রাজবাহাদুরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজবাহাদুরের উপর ভাগ্যদেবী প্রসন্না হইলেন। তিনি বিশৃঙ্খল রাজ্যকে সুশৃঙ্খল করিলেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফারমান আনাইয়া সিংহাসনে সুদৃঢ় হইলেন। তিব্বতীরা ভুটিয়া ব্যবসায়ী ও কৈলাস-মানসসরোবরযাত্রীদের উপর অত্যাচার করিত; ইহার প্রতীকার করিবার জন্য তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া তাকলাখর বা তাকলা কোট আক্রমণ করিয়া হুলিয়াদের বশীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিব্বতের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। ভীমতালের নিকট রাজবাহাদুরের নাম স্মরণ করাইয়া একটি মন্দির এখনও মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতেছে।

তিব্বত অভিযানে যে সময় রাজবাহাদুর নিযুক্ত ছিলেন, সে সময় শ্রীনগরাধিপতি গাড়ওয়ালী সৈন্য লইয়া রাজবাহাদুরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজবাহাদুর তিব্বত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গাড়ওয়ালীদিগকে আক্রমণ করিলেন।

তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়নপর হয়। তিনি তাহাদের রাজধানী শ্রীনগরে বিজয়ী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজিত শ্রীনগরাধিপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই বিজয়-সংবাদ আল্‌মোড়ায় প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীনগর হইতে আল্‌মোড়ার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখরভাগে তৃণপুঞ্জ প্রজ্বালিত করিয়া সঙ্কেতে বিজয়সংবাদ আল্‌মোড়ায় প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমান কালেও আল্‌মোড়াবাসীরা আশ্বিন মাসে পর্ব্বতশিখরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

চন্দ রাজবংশীয়দিগের মধ্যে অধার্ম্মিকতার সহিত নানাপ্রকার পাপাচরণ ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করে। প্রজাপীড়ন তাঁহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। রাজদ্বেষীর সংস্রবে যে কেহ আসিল, বিনা বিচারে তাহারা নিহত হইতে লাগিল। তাহাদের ভূসম্পত্তি রাজসম্পত্তির অন্তর্গত হইল। এইরূপে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবার ইঁহাদের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বংশে কল্যাণচন্দ নামে ক্রূরপ্রকৃতির এক জন রাজা ছিলেন। ইঁহার গুপ্তচর রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিত। এক সময় ব্রাহ্মণরা ইঁহার অত্যাচার প্রভৃতির আলোচনা করিয়া তাহার বিদূরণের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনি ব্রাহ্মণদের চক্ষু উৎপাটনের আদেশ করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণদের উৎপাটিত চক্ষুপূর্ণ সাতটি পাত্র বিনসর প্রাসাদে রাজার নিকট নীত হইয়াছিল!

ইঁহার রাজত্বকালে রোহিলারা কামায়ুন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া হিন্দুদেবালয় লুণ্ঠন ও অপবিত্র করিয়া বহুসংখ্যক প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছিল। তাহারা কামায়ুনের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির জাগেশ্বর লুণ্ঠন করিতে গমন করিলে বহু-সংখ্যক মধু-মক্ষিকা মধুচক্র হইতে নির্গত হইয়া মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করে। মনুষ্য যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই, মৌমাছি তাহা সম্পন্ন করিয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইয়া কল্যাণচন্দ ইহলীলা শেষ করেন।

চন্দ রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রূরপ্রকৃতির হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ভদ্রপ্রকৃতির লোকসংখ্যাও বড় কম ছিল না। এখনও আল্‌মোড়াবাসীরা দেবীচন্দনামক এক জন রাজার কথা আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইনি রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য অতীত রাজাদের সঞ্চিত ধনাগারের দ্বার অনর্গল করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বহু কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এরূপ উদারতার উদাহরণ ভারত ব্যতীত অন্যত্র আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি।

চন্দরাজবংশের দুর্ব্বলতার সহিত নেপালীরা কামায়ুন ও গাড়বাল প্রদেশ আক্রমণ করেন। নেপালের ইহা অভ্যুদয়ের সময়। নেপালরাজ-দরবার সমদর্শী হইলেও ইহার কর্ম্মচারীরা অনেক সময় অমানুষিক অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিল। এক সময় নেপালীরা তাহাদের উপর যাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদিগকে এক রাত্রিতে নিহত করিয়াছিল। যে রাত্রিতে এই ঘটনা সাধিত হয়, সে রাত্রির কথা কামায়ুনবাসীদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে। "মঙ্গল কিরাত" এ অঞ্চলের লোকরা এখনও বিভীষিকার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। এক সময় নেপালীরা কামায়ুনবাসীর উপর নূতন কর স্থাপন করেন। কামায়ুনীরা ইহা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করাতে নেপালী শাসনকর্ত্তা ১৫ শত গ্রামের মণ্ডলদের আল্‌মোড়ায় আসিবার জন্য আহ্বান করেন। গ্রামাধিপরা করবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আগমন করিলে তাহারা সকলে নিহত হইয়াছিল। ইহারা হরিদ্বারে প্রায় ২ লক্ষ পাহাড়ীকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে পর্ব্বতের অধিবাসীরা নিম্নভূমিতে গমন করিয়া জীবন রক্ষা করে। নেপাল যদি সে সময় নিপুণতার সহিত প্রজাপালন করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত হিমালয় যে আজ তাঁহাদের শাসনাধীন থাকিত, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ সময়কার ইংরাজ-চরিত্রের কথার একটু উল্লেখ না করিলে এ সময়ের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইংরাজ কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া নেপাল রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে একদলের অধিনায়ক General Gillespie; ইনি নেপালীদের কলিঙ্গ-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। দুর্গ আক্রমণকালে ইংরাজ সেনানী গোলকাঘাতে নিহত হয়েন। দুর্গবাসীরা দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইলে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই অবরোধকালে এক জন নেপালী সৈন্য দুর্গের ভগ্ন স্থান দিয়া অবতরণ করিয়া ইংরাজদিগের নিকট

হাত নাড়াইতে নাড়াইতে গমন করে। কিয়ৎক্ষণের জন্য সে দিকে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। দেখা যায়, এক জন গুর্খার দাঁতের নীচের পাটিতে গুলী লাগায় সে আহত হইয়াছে। ইংরাজ চিকিৎসক যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করেন। আরোগ্য হইলে সে তাহার সেনাদলের মধ্যে গমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ব্যক্তিগতভাবে সে ইংরাজকে বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু জাতিগতভাবে সে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এরূপ অনেক গুর্খা সৈন্য ইংরাজ হাসপাতালে গমন করিয়া ইংরাজের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস দেখাইয়াছে। অপর পক্ষে ইংরাজও নিজেদের সদাশয়তা দেখাইয়া ভারতবাসী শত্রু মিত্র উভয়ের হৃদয়ে চরিত্রবলে অসামান্য শ্রদ্ধা লাভ করিয়া এই অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

আল্‌মোড়া স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীর পক্ষে। এ স্থানের ভাড়াটে বাড়ীতে অনেক সময় অবস্থান করা নিরাপদ নহে। নানাস্থানের যক্ষ্মারোগী এ স্থানে আরোগ্যলাভাশায় আগমন করেন। এ জন্য ভাড়াটে বাড়ী প্রায়ই দূষিত। চীরের বায়ু ও বায়ুতে আর্দ্রতা না থাকা দুই কারণে এ স্থান ফুস্‌ফুস্‌-রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর। এ স্থানে প্রায় ৪০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, এজন্য এ স্থানের শুষ্কতা রোগীর পক্ষে অনুকূল। এ স্থানে একটি কুষ্ঠালয়ও আছে। আল্‌মোড়ার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বত থাকায় জলীয় মেঘ আগমনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৫ হাজার ৫ শত ফিট। শীতকালে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে সময় সময় তুষারপাত হইয়া থাকে। সে তুষার সূর্য্যোদয়ের সহিত অল্পসময়ের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপ জল-বায়ু ও প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত আল্‌মোড়াতে আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করিতে হইয়াছিল। অবস্থানকালে এক দিন চন্দ্রাজবংশের এক বংশধরের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার আকৃতি, ভদ্রতা এবং চরিত্রের মাধুর্য্য তাঁহার উচ্চবংশের অনুরূপ। তিনি আমাদের, দেশের অবস্থা অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন বাঙ্গালী সাধুর উপর তিনি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ নানা প্রশ্নে বুঝিলাম, বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অল্প নহে। তিনি আমাকে তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেন। তাঁহার সে অনুরোধ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমার দ্বারা পূরিত হয় নাই।

শ্রীযুত অম্বিরাম সা মহাশয় জাতিতে বৈশ্য; এ স্থানের এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। চন্দ্ররাজাদের সময় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা উচ্চপদ অধিকার করিতেন। তাঁহার পুত্ররা শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ। এক দিন তাঁহার দোকানে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতে উপস্থিত হই। তিনি আমার কৈলাস যাইবার সঙ্কল্প শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন ও তাঁহার বাড়ীতে পরদিবস ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। পরদিবস এক জন লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। সা মহাশয় আল্‌মোড়ার নানা প্রাচীন কাহিনী কহিয়া স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা অতি সম্ভ্রমের সহিত কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার বাড়ীতে অনেকবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট কৃপা ছিল—ইত্যাদি কহিতে লাগিলেন। সা মহাশয় আমাকে কয়েকখানি পরিচয়পত্র প্রদান করেন। সেই পত্র রাস্তায় আমার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছিল। আর দিয়াছিলেন, একগাছি দীর্ঘযষ্টি। এই যষ্টি হিমালয়ের দুর্গম দুরারোহ প্রদেশে বহুবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই যষ্টি প্রাণরক্ষকরূপে ৩।৪ মাস আমার সহচরের মত আমার পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিল।

আল্‌মোড়ায় অবস্থানকালে স্থানীয় কলেক্টারের হেড ক্লার্ক পালিত মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। আমার পিতৃদেব ডাঃ ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের এ পরিচয় বাঁকিপুরে। সে সময় আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম। পালিত মহাশয় সে সময়কার বাঁকিপুরের অনেক সামাজিক প্রথার গল্প করেন। বলদেব বাবু, নবীন বাবু (সরকারী উকীল), গুরুপ্রসন্ন বাবু, রামগতি বাবু প্রভৃতির সহিত আমার পিতাঠাকুরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা কহিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। জনক-জননী ও জন্মভূমির কথা এ সময় বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। দূরদেশে আসিয়া যে এ সব কথা শুনিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পালিত মহাশয়ও কয়েকখানি পরিচয়পত্র দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছিলেন।

আল্‌মোড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্‌ভাসিত হইলেও এ প্রদেশের হিন্দুরা সরলতা, অতিথি-প্রিয়তা, স্বধর্ম্মে

আস্থা প্রভৃতি সদ্‌গুণ জলাঞ্জলি প্রদান করে নাই। তাঁহাদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ধর্ম্ম-সভার গৃহে অবস্থানকালে সভার কতিপয় উদ্যোগী সভ্যের সহিত পরিচিত হই। তাঁহাদের আগ্রহে ভগবতী নন্দাদেবীর আঙ্গিনায় "তীর্থ-যাত্রা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা আসিতেছে। এক্ষণে বনের ভিতর গমন করিলে নিপীড়িত হইতেছে,। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কি কাহারও হৃদয় ব্যাকুলিত হয় না? বনপ্রদেশ দিয়া আগমনকালে অনেকের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ শুনিয়াছি; অনেককে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দ।

করিতে হইয়াছিল। সভ্যদের অনুরোধে পরদিবস "বর্ত্তমানকালে আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতাকালে আমি আলমোড়াবাসী নেতাদের উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলাম, "এ দেশের গো-মহিষ বহুকাল ধরিয়া হিমালয়ের তৃণপত্র উপভোগ করিয়া গভমেণ্টের নিয়ম অপেক্ষা আমাদের স্বদেশবাসীর কঠোর ব্যবহারে দরিদ্ররা অধিক পীড়িত হইতেছে। এজন্য দোষটা কিন্তু সরকারের উপর পতিত হইতেছে। আমাদের অনুরোধ সরকার বাহাদুর এই ঘোরযুদ্ধে বিশেষরূপে ব্যিব্রত হইলেও অনতিবিলম্বে এই অত্যাচারের প্রতীকার করুন। তাঁহা

হইলে সহস্র সহস্র প্রজার আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। যাঁহারা এরূপ অপ্রিয় সত্য সরকারের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারাই যথার্থ বন্ধু। একশ্রেণীর রাজপুরুষ আছেন, যাঁহারা ইঁহাদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন; ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধমুষ্টি। কতিপয় আল্‌মোড়াবাসী, স্বদেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই 'অপরাধে' তাঁহারা 'পাহাড়ের বাঙ্গালী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেশী হইলে বোধ হয়, নানা দেশীয় ভারতবাসী একদেশবাসিরূপে পরিণত হইবে।" এ স্থানে এক জন রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন,"মানুষে আমার দরকার নাই; তারপিনপ্রসূ গাছ থাকিলে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবে!" এইরূপ অদূরদর্শী ইংরাজ রাজপুরুষদের জন্য ইংরাজ জাতির উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

দুই দিনের বক্তৃতায় জনসাধারণ আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ অনেকে বাদাম, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, গেঞ্জী, ক্যাম্বিসের বস্ত্রাধার প্রভৃতি নানা প্রকার আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সভার যে গৃহে আমি ছিলাম, সেই গৃহের পাশের ঘরে এক জন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমার মানস-সরোবর, কৈলাস প্রভৃতি স্থানে গমনের সঙ্কল্প শুনিয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশের ভিতর একটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তিব্বতে ভোজনের বড়ই অসুবিধা, খাদ্যদ্রব্যের বড়ই অভাব। যাঁহারা মাংস ভোজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে তিব্বত অসুবিধার নহে। তথায় অতি উৎকৃষ্ট ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। য়ুরোপীয়রা অতি সমাদরে ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে মাংস-ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সে প্রদেশে অবস্থানকালে ইহা গ্রহণ করিতেন; তাহাতে দোষ নাই, ইত্যাদি কহিয়া আমাকে প্রলুব্ধ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কথামত আমি কার্য্য করিতে সমর্থ হই নাই।

নন্দা দেবীর মন্দির।

বুধবার ৫ই জুন প্রাতঃকাল ৭টার সময় আলমোড়া পরিত্যাগ করি। কুলীদের আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়াতে যাত্রা করিতে দেরী হইয়াছিল। সমাগত নূতন বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অজ্ঞাত প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

কাচের কথা।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট অধ্যাপক। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রিসার্চ কার্য্যে য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া জর্ম্মাণ দেশে গিয়াছেন। তিনি Optical scienceএ বিশেষজ্ঞ, দৃষ্টি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, সুতরাং য়ুরোপের Optical worksগুলি (পরকলার কারখানা) পরিদর্শন করিয়া নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে 'দৈনিক বসুমতীতে' অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথের পাদোবা (Padua) বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তশত সাংবৎসরিক উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি জর্ম্মাণ দেশের জেনা সহরের বিখ্যাত Lens (পরকলা) কারখানার একটি বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

জেনার লেন্স কারখানা।

জর্ম্মাণীর জেনা সহরের নাম ভুবনবিখ্যাত। ইহারই সান্নিধ্যে নেপোলিয়ন সম্মিলিত য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের বাহিনীকে রণে পরাস্ত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং ম্যা রেঙ্গো ও অষ্টার্লিজের ন্যায় জেনাও নেপোলিয়নের কীর্ত্তির নিদর্শন।

এখন জেনা অন্য কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে Carl Czeiss Worksএর (কারল জিসের কারখানার) বিখ্যাত Lens (পরকলা) লেন্স কারখানা আছে। এই কারখানায় চশমা, ষ্টিরিওস্কোপ, টেলিস্কোপ প্রভৃতি নানা যন্ত্রের লেন্স প্রস্তুত হয়।

অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ এই বিখ্যাত কারখানায় লেন্স প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি গত ৯ই ও ২৩শে জুলাই যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমরা এই স্থানে প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে বাঙ্গালী পাঠক জর্ম্মাণীর কারখানাসমূহের বিশালতা ও উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পত্র দুইখানি আসিতেছে জেনার হোটেল কাইজারহফ হইতে। মর্ম্ম এইরূপ :—

আমি Carl Czeiss Worksএর (কারল জিসের কারখানার) Microscope Departmentএর (অণুবীক্ষণ বিভাগের) অধ্যক্ষ Prof. Dr. Siedentopfএর (অধ্যাপক ডাক্তার সায়েডেনটফের) নিমন্ত্রণ পাইয়া জেনা সহরে আসিয়াছি। জেনা জর্ম্মাণীর থুরিঞ্জিয়া প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত।

থুরিঞ্জিয়া প্রদেশ চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত, জেনা তাহারই একটা উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। বাঙ্গালা যদি গরম দেশ না হইয়া ঠাণ্ডা হইত, তাহা হইলে জেনারই মত হইত। জেনাও সেঁতসেঁতে, শস্য-শ্যামলা, সুজলা, সুফলা।

কাচের ব্যবসায়।

প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে থুরিঞ্জিয়া কাচ নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এখানে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট বালুকা পাওয়া যায়; পরন্তু Limestone (চূণাপাতর) ও জ্বালানি কাঠও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই তিন উপাদানই কাচ-নির্ম্মাণে প্রয়োজন।

কাচ জিনিষটা বহুকাল হইতে মানুষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, ফিনীসীয় নাবিকগণ এক সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর 'কালি' নামক লতাবিশেষের সাহায্যে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে গিয়া দেখিয়াছিল, বালুকা এক স্বচ্ছ কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলে সত্য আছে কি না, জানি না। এক দল লোক বলেন, চীনেই প্রথম কাচ প্রস্তুত হয়। আবার রোমানরাও কাচ ব্যবহার করিত বলিয়া শুনা যায়। আমাদের পুরাণের 'স্ফটিকস্তম্ভ'—যাহা বিদীর্ণ করিয়া নরসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যাহার দ্বারা প্রস্তুত দ্বারে দুর্য্যোধন আঘাত পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন—সেই স্ফটিক বোধ হয় কাচকেই বুঝায়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইটালী প্রচুর পরিমাণে কাচ ব্যবহার করিত।

এ সব পুরাতন কথা। তবে গত এক শত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপে কাচের তৈজস যে ধাতব তৈজসের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ গেল গৃহস্থালীর তৈজসরূপে কাচের ব্যবহারের কথা। চশমা হিসাবে কাচের ব্যবহারও বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। চীনদেশে এবং ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাচের চশমা প্রচলিত। য়ুরোপীয়রা যে এই কাচের চশমা আমদানী করেন নাই, এ কথা নিশ্চিত। দিল্লী, আগ্রা ও বারাণসীতে বেলোয়ারিওয়ালারা এখন প্রাচীন পদ্ধতিতে কাচের চশমা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সাধারণ কাচ ছাড়া ইহারা যে স্ফটিক (Crystal, Rock Crystal, Pebbles, Quartz) ব্যবহার করে না, তাহা নহে। আবার রঙ্গীণ কাচ—বিশেষতঃ গোলাপী কাচই ইহারা অধিক প্রস্তুত করে। তিব্বতের লামারা চীন হইতে আনীত কাচের চশমা এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি। পারস্যেও কাচের ব্যবহার ছিল; সম্ভবতঃ চশমা কথাটাও ফার্সী।

জেনার বিশ্ববিদ্যালয়।

জেনার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে John Frederich the Magnanimous (মহানুভব জন ফ্রেডরিক) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি আজিও জেনার Market placeএ (বাজারে) দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের দিন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক ও কবি Gœthe (গেটে) ইহার পরিচালক এবং Fichte, Schelling, Hegel, Schiller (ফিকটে, স্কেলিং, হেগেল, শিলার) প্রভৃতি দিগ্গজ পণ্ডিতগণ ইহার আচার্য্যপদে বরিত হয়েন। জর্ম্মাণ Evolution theoryর (বিবর্ত্তনবাদের) আবিষ্কর্ত্তা Ernest Hæckel (আর্ণেষ্ট হেকেল) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া জীবনব্যাপী গবেষণা করিয়াছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮০০ ছাত্র এবং নিম্নলিখিত বিভাগ আছে :—

(১) দর্শন, (২) পুরাতত্ত্ব, (৩) Meteorology আবহাওয়া তত্ত্ব, (৪) Seismical ভূমিকম্পাদি তত্ত্ব, (৫) Astronomy জ্যোতিষ, (৬) পদার্থবিদ্যা, (৭) রসায়ন, (৮) ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা (Technische Physik), (৯) ব্যবহারিক রসায়ন (Technische Chemik), (১০) Pharmacy ভেষজবিদ্যা Chemistry for food-stuffs আহার্য্য বিষয়ক রসায়ন, (১১) Microscopy আণুবীক্ষণিক বিদ্যা, (১২) Mineralogy খনিজবিদ্যা, (১৩) Botany উদ্ভিদবিদ্যা, (১৪) Zoology প্রাণিতত্ত্ব, (১৫) Pedagogy বক্তৃতাবিদ্যা, (১৬) Agriculture কৃষিবিদ্যা, (১৭) Veterinary পশুচিকিৎসা বিদ্যা, (১৮) Anatomy and physiology শারীরবিদ্যা, (১৯) Pharmakology ভেষজ প্রকরণবিদ্যা, (২০) Hygiene স্বাস্থ্যতত্ত্ব, (২১) Pathology নিদান, (২২) Weaving and Textiles বয়নবিদ্যা, * (২৩) Applied Optics. ব্যবহারিক দৃষ্টি-বিজ্ঞান।

প্রত্যেক বিভাগের জন্য সহরময় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বলিতে কি, সারা জেনা সহরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যে হোটেলে আছি, সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আচার্য্য ও অধ্যাপকদের দাবার আড্ডা বসে এবং দাবাখেলার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়। ইহাতে পৃথিবীর কত যে জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ হয়, তাহা বলা যায় না। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি, ভট্টাচার্য্য-পল্লীতেও এমনই ভাবে ন্যায়, দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে নানা চর্চ্চা হইত। তবে প্রভেদ এই, আমাদের গ্রামের পণ্ডিতরা অতীত জ্ঞান লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন, আর জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা প্রকৃতির নানা খেলার সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা গবেষণার ধারাকে বহির্মুখী করিয়া সদা নূতন পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী।

ছাত্রগণ পাঠের কাল ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যায়ামক্রীড়া ও নৃত্যগীতাদিতে যৌবনের বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফুরণ হইবার অবসর দেয়। সকালে সন্ধ্যায় তাহারা দলে দলে পথে গান করিয়া বেড়ায়। উহাদের খেলিবার ও ব্যায়াম করিবার নিমিত্ত Saele (সেয়েল) নদীতটে প্রায় ১ মাইল ব্যাপী ক্রীড়াভূমি আছে; পরন্তু Saele নদীতে বাচ খেলিবার জন্য ছোট ছোট ডিঙ্গী ও পানসী আছে।

দৃষ্টি-বিজ্ঞান কারখানা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত Carl Zeissএর (কারল জিসের) বিখ্যাত Optical works দৃষ্টিবিজ্ঞান কারখানা

* পাঠক দেখিতেছেন, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়েও বয়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। কারল জিস বাভেরিয়ার মিউনিক সহরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Fraunhoferএর (ফ্রণহফারের) নিকট কার্য্য করিতেন। তিনি জেনার অধিবাসী, সুতরাং কায শিখিবার পর জেনাতেই আসিয়া এক ছোটখাট কারখানা স্থাপন করেন এবং প্রথমে Lens (পরকলা), Prism (প্রিস্‌ম্), Binocular (বাইনকিউলার), Spectacles (চশমা), Microscope (দূরবীক্ষণ) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরা তাঁহার পণ্যের খরিদদার হইয়াছিল। Optical Industryর (দৃষ্টি বিজ্ঞান ব্যবসায়ের) ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম উৎপত্তিস্থান হলাণ্ড, তাহার পর ইটালী। ইটালীর পর ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড এই ব্যবসায় গ্রহণ করেন। ধরিতে গেলে এক জন সুইসই প্রথমে Optical glass (দৃষ্টির কাচ) আবিষ্কার করেন। তাঁহার এক পৌত্র মিউনিকের অধ্যাপক ফ্রণহফারের সহিত একত্র কার্য্য করেন। তাঁহার আর এক পৌত্র ফ্রান্সের Parramantois (প্যারাম্যানটইস্) কোম্পানীর সহিত এবং আর এক পুত্র ইংলণ্ডের Chance Brothers (Birmingham) বার্মিংহাম সহরের চান্স ব্রাদারের সহিত যোগদান করিয়া Lens (পরকলা) ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়া দেন।

এই সুইস বা সুইটজারল্যাণ্ডদেশীয় লোকটি জাতিতে সূত্রধর, তাহার নাম Guignard (গুইগনার্ড) তাঁহার পৌত্রকে আনাইয়া মিউনিকের অধ্যাপক ফ্রণহফারের এক ছোট কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কারখানায় নানা-জাতীয় কাচ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কারল জিস এই কারখানার কারিগর ছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কারল নিজ জন্মভূমি জেনায় গিয়া এক-খানা ছোট ঘরে এক ছোট কাচের কারখানা খুলিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার আর্ণেষ্ট এ্যাবে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। সেই বৎসর হইতে অধ্যাপক এ্যাবের সহিত কারল জিসের আলাপ-পরিচয় হইল। ইহা হইতেই কারলের কারখানার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইল।

ডাক্তার এ্যাবে ক্রমে পরকলার সম্পর্কে নানা নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটনে গবেষণায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নিত্য নূতন গবেষণার ফলে কারখানার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বস্তুতঃ ডাক্তার এ্যাবে আধুনিক উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছুদিন পরে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কার্য্যে যখন নানা গুণসম্পন্ন কাচের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, তখন ভাগ্য-ক্রমে (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) ডাক্তার স্কট নামক আর এক জন পণ্ডিত ৩।৪ প্রকার বিভিন্ন কাচের নমুনা লইয়া ডাক্তার এ্যাবের নিকট উপস্থিত হয়েন। এ্যাবে ও স্কট ভিন্ন ভিন্ন কাচের গুণ পর্য্যালোচনার জন্য একটি Glastechniseho Laboratorium (কাচের কারিগরি বিজ্ঞানাগার) প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই হইল জেনার কাচের কারখানার যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দশ বৎসর পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাচের কারখানার স্থাপনা হইল, নাম হইল Glashutte Schott & Genossen (গ্লাসুটে স্কট এণ্ড জেনোসেন)। প্রায় ১ শত ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট কাচ প্রস্তুত হইল। জিসের অণুবীক্ষণ জগ-দ্বিখ্যাত হইল। ক্রমে Zeiss Optical Works (জিসের কারখানা) হইতে Photo Lens (ফটোর পরকলা), Field Glass (ফিল্ড গ্লাস), Telescope (দূরবীক্ষণ), Spectacle Lens (চশমার পরকলা), Stereoscope Lens, (ষ্টীরিওস্কোপের পরকলা) ইত্যাদি যাবতীয় Optical পণ্য উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ডাক্তার এ্যাবের বদান্যতা।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কারল জিসের মৃত্যু হয় এবং ডাক্তার এ্যাবে কারখানার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়েন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার এ্যাবে স্বেচ্ছায় এই বিশাল সম্পত্তি (Ziess Works এবং Schott & Genossen Works) দানপত্র লিখিয়া ঐ দুই কারখানার কর্ম্মী ও শ্রমিকদিগকে দান করিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকা উচিত। এমন নিঃস্বার্থ দান বিরল। ডাক্তার এ্যাবে কেবল কারখানা দান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি এক বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সাধারণের জন্য পাঠাগার, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে প্রচুর অর্থ দান করেন। কারখানার লোক তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন কারখানার সম্মুখে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করিয়াছে। এখন যে এই কারখানাঘরে কায

করিবে, সেই ইহার মালিক। বৎসরান্তে সমস্ত কারিগর লাভের টাকার ভাগ পায়। *

কারখানার কথা।

এই কারখানায় ৮ হাজার লোক কায করে। ৪০ জন অধ্যাপক পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিভাগের উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ইঁহাদের কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি :—

(১) Stereogrammetry বিভাগ। ৬০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার পুলফ্রিক ইহার কর্তা। কাচ ও এই জাতীয় বস্তুর Refractive index নির্দ্ধারণ করিবার ইনি এক অতি সহজ-ব্যবহার্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার নাম Pulfrich Refractometer. ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি Range finder (দূরতা-নির্ণায়ক) যন্ত্র প্রস্তুত করেন। উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দূরস্থিত বস্তু কোন্‌টা কত দূরে আছে, এক scaleর সাহায্যে নির্দ্ধারণ করা যায়। ফটো চিত্রের সাহায্যে Level যন্ত্রের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে Stereogrammetry যন্ত্র ব্যবহার করিবার সময় আসিয়াছে। ডাক্তার পুলফ্রিক এই যন্ত্রবিভাগের কর্তা। এই যন্ত্র-সাহায্যে এক প্রদেশের মানচিত্রে প্রত্যেক অংশের উচ্চতা নীচতা এক রেখা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার পুলফ্রিক আর এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আলোকের সমত্ব নির্দ্ধারিত হইবে, (ইহাকে Colour Photometry বলে)।

(২) Microscope অণুবীক্ষণ বিভাগ। অধ্যাপক ডাক্তার সাইডেনটপফ এই বিভাগের কর্তা। ইনি Ultramicroscopy এবং Dark Ground Illuminationর একরূপ authority বা সর্ব্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ বলিলেও চলে। যে সব বস্তু সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না, ইঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। Bacteria of Dental decay, Bacteria of Syphilis, Cholera Baccili প্রভৃতি সাধারণ অণুবীক্ষণে কষ্টে নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইঁহার যন্ত্রসাহায্যে বালকও তাহা দেখিতে পায়। ইনি এখন Micro-Cinematographyর উন্নতিবিধানে ব্যস্ত। গত সপ্তাহে sleeping sicknessএর (ঘুমের রোগের) Trypanossumএর এক চলচ্চিত্র (Cinema film) লওয়া হইয়াছে।

(৩) Field Glass বিভাগ। ইহাতে ডাক্তার আরফল কর্তা। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাধারণ Binocular ও Opera-glass রূপে কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলা কঠিন। তবে ফ্রান্সের এক ছোট কারিগর ইহার প্রচলন করে বলিয়া প্রবাদ। প্রথমে ধনীর গৃহে ইহা সৌখীন খেলানারূপে ব্যবহৃত হয়। থিয়েটার অপেরার আদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে Opera-glass (অপেরা গ্লাস) ইত্যাদির প্রচলন আরম্ভ হয়। আমি ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীতে থিয়েটারের টিকিটঘরে অপেরা গ্লাস ভাড়া পাইয়াছি—ভাড়া ৫ মার্ক।

এই যন্ত্রের Magnification দ্বিগুণ হইতে ত্রিগুণ; অর্থাৎ খালি চোখে দেখিলে যাহা দেখা যায়, তাহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ দেখা যায়। তবে ইহার অসুবিধাও আছে। খালি চোখে দেখিলে সমস্ত নাট্যশালা দেখা যায়, ইহাতে কিন্তু অভিনেতা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কিছু স্থান দেখা যায়। সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এক চক্ষুতে দেখিতে হয় বলিয়া সব জিনিষ এক স্থানে আছে বলিয়া মনে হয়। দুই চক্ষুর দ্বারা দেখিলে বিভিন্ন বস্তুর স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান হয়; তাহার উদাহরণ, Stereoscope নামক চিত্রদর্শন খেলানা যন্ত্র।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জিস কারখানায় প্রথমে prism binocular প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা magnification ৬ গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। জিনিষটা ছোট হইল, ভারি হইল, দৃষ্টিপথও বাড়িল। ইহার ৬ গুণ magnification ও ৩০ centimeter objective খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবার ডাক্তার আরফল এই বৎসর নূতন ৮ গুণ, ৪০ centemeter নূতন Field Glass নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে ক্ষীণালোকেও স্পষ্ট দেখা যায়। হাজার গজ দূরে ১৫ গজ দেশ সন্ধ্যার আলোকেও দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখা যায়। Dr. Erfle আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান কার্য্যের সমস্ত খবর রাখেন। জর্ম্মাণীতে আমাদের কার্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া মনে আনন্দ হইয়াছিল।

(৪) চশমা বিভাগ—Moritz von Rohr (মরিটজ ভন রহর) ইহার কর্ত্তা। সাধারণ চশমা লাগাইলে সম্মুখের বস্তু বেশ দেখা যায়, কিন্তু পার্শ্বের বস্তু দেখা যায় না।

* ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে এমন democracyর প্রতিষ্ঠার কথা নূতন শুনা গেল।

Rohr যে চশমা প্রস্তুত করিতেছেন, উহাতে সকল দিকের বস্তুই অবিকৃত দেখা যায়। পরকলা বিভাগে আমিও দুই দিন testing পরীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। সাধারণ নরচক্ষু যে এত চঞ্চল এবং পলকমাত্রে যে তাহার সমস্ত ভাবের এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এইবার দেখিলাম।

(৫) Photographic Lens department—ইহার কর্ত্তা Dr. Wanderslede (ডাক্তার ওয়ানডার্সলিড), ইনি দুরস্থিত বস্তুর উত্তম এবং অপেক্ষাকৃত বড় ছবি লইবার চেষ্টা করিতেছেন। যাহা এখন হইয়াছে, তাহাতে ১ মাইল দূরের বস্তুর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রেখা পর্য্যন্ত ছবিতে পাওয়া যায়। ইঁহার যন্ত্রের নাম new, teletersar.

এইগুলি প্রধান বিভাগ। ইহা ছাড়া আরও আনুষঙ্গিক ১০।১২টা অন্যান্য বিভাগ আছে।

আমার বক্তব্য এই যে, ধরিতে গেলে এই সমগ্র বিরাট ব্যাপার এক জনের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে! কারল জিস নামে কারখানার স্থাপয়িতা বটে, কিন্তু ডাক্তার এ্যাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কারলের অনুষ্ঠানটিকে কত বড় করিয়াছেন! আমাদের দেশে কবে এই ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা হইবে?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

উদ্ভট-সাগর।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে কেন, তাহাই এ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

কুটিলা লক্ষ্মীর্যত্র প্রভবতি ন সরস্বতী বসতি তত্র।
প্রায়ঃ শ্বশ্রূস্নুষয়োর্ন দৃশ্যতে সৌহৃদং লোকে॥

প্রবল হইয়া উঠে লক্ষ্মী যেই খানে,
কিছুতেই সরস্বতী না থাকে সেখানে।
হায় রে শাশুড়ী বৌ কারো ঘরে প্রায়
মিলে মিশে ঘর-কন্না করিতে না চায়!

ব্যাখ্যা। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর পুত্র বলা যায়। লক্ষ্মী বিষ্ণুর এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী, ইহাও চির প্রসিদ্ধ। এইরূপ সম্পর্ক ধরিয়াই কবি এই শ্লোকে সরস্বতীকে লক্ষ্মীর পুত্রবধূ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দরিদ্র পণ্ডিতগণের প্রতি কৃপা না রাখিয়া ধনাঢ্য মূর্খগণেরই প্রতি লক্ষ্মীদেবীর এত কৃপাদৃষ্টি কেন, তাহাই কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে নিরূপণ করিয়াছেন:—

গোভিঃ ক্রীড়িতবান্ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ।
ক্রীড়ত্যদ্যাপি সা লক্ষ্মীরহো দেবী পতিব্রতা॥

লইয়া গরুর পাল সুখে বৃন্দাবনে
খেলিয়াছিলেন কৃষ্ণ তাহাদের সনে।
আজিও গরুর মত যারা বুদ্ধি ধরে,
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘুরে মরে।
তাই বলি, ধন্য তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
রেখে দিলে পতিভক্তি,—হেন মনে গণি!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।
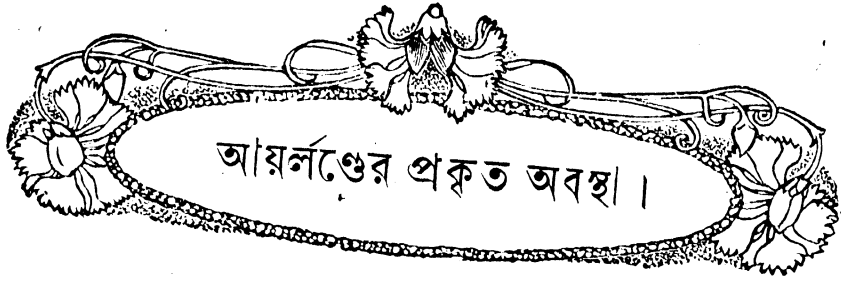
আয়র্লণ্ডের প্রকৃত অবস্থা।

(৩)

আয়র্লণ্ডের কয়লা।

কয়লাই এখন শ্রেষ্ঠ খনিজ পদার্থ। যে স্থানে কয়লার খনি বা কয়লার প্রাচুর্য্য আছে, সেই স্থানেই ইদানীং জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনকামী দল বলিয়া থাকেন যে, আয়র্লণ্ডে প্রচুর কয়লা বিদ্যমান; কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহাদিগের কয়লার খনির উন্নতিসাধনে বাধা দিতেছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর সংখ্যার সাপ্তাহিক 'সিন্‌ফিন্' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ লিখিয়াছিলেন, "লৌহ ও কয়লায় আয়র্লণ্ড পরিপূর্ণ। অধিকাংশ য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় এই দুই বিষয়ে আয়র্লণ্ড শ্রেষ্ঠ।"

মিঃ ম্যাক্‌লুর কয়লার সম্বন্ধে মিঃ গ্রিফিথের নিকট হইতে বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিঃ গ্রিফিথ তাঁহাকে সিন্‌ফিন্‌দিগের ধারণা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "কয়লা সম্বন্ধে অলষ্টার অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী; কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সমুদায় কয়লা স্কটলণ্ড হইতে পাইয়া থাকে। কোনও কারণে অকস্মাৎ যদি স্কটলণ্ড তাহাদিগকে কয়লা সরবরাহ করিতে না পারে, তাহা হইলে অলষ্টারের যাবতীয় শ্রমশিল্প, কলকারখানা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। আপনার দেশের কয়লার উন্নতিসাধনে তাহারা বিরত কেন, এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর তাহারা দিতে পারে না। বেলফাষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া লক্‌নে পর্য্যন্ত বিস্তৃত কয়লার ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। তত্রত্য কয়লা খুবই উৎকৃষ্ট।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ইসেপ্টেম্বর তারিখের "দি রিপাবলিক" পত্রে ডাঃরেল্ ফিগিস্ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'ষ্টাটিষ্ট' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বেলিকাশলের চতুঃপার্শ্বে ধাতুপূর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র বিদ্যমান।

"তন্মধ্যে প্রধানতঃ সহজদাহ্য কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের স্তর সর্ব্বত্র ছাইয়া আছে। খুব কম করিয়া ধরিলেও এই জাতীয় পদার্থ ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন পাওয়া যাইতে পারে। বেলিকাশলের ক্ষেত্রে যে সকল কয়লার খনিতে কায চলিতে পারে, তথায় সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৩ হাজার টন হইতে পারে।

"ঐ স্থানের মধ্যে লৌহও আছে। অতীত যুগে এই সকল খনিতে যথেষ্ট কায হইয়াছিল। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। পূর্ব্বে এ সকল খনিতে কায হইত বটে, কিন্তু এখন হয় না। তাহার কারণ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মাল চালান দিবার সুবিধা দিতে চাহেন না। আয়র্লণ্ড আত্মনির্ভরশীল হইবে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।"

বেলফাষ্ট বেলিকাশলের সন্নিহিত। তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ ফিগিস্ বলিয়াছেন :—

"এ দেশের অন্যান্য স্থানের প্রতি বেলফাষ্টের আনুরক্তি যেরূপ প্রবল, ইংলণ্ডের প্রতিও তদ্রূপ। ইহা তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আর একটা দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।"

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'ইভ্‌নিং জর্নাল' নামক পত্রের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মিঃ ডি ভেলেরা এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "আয়র্লণ্ডের উত্তরাংশে মৃত্তিকাগর্ভে বহুদূরব্যাপী সহজদাহ্য ধাতব পদার্থ বিদ্যমান; দক্ষিণাংশে anthracite এর (এক জাতীয় কয়লা, ইহা প্রজ্বলিত হইলে শিখা প্রায় দেখা যায় না, ধূম অথবা গন্ধ নির্গত হয় না। ইহাতে বেশীর ভাগ কার্ব্বন আছে এবং সহজে জ্বলিয়া উঠে না) পরিমাণ আরও বেশী। উত্তরাংশে যে দিকে সহজদাহ্য খনিজ পদার্থ বিদ্যমান—টাইরণ অঞ্চলেই উহা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া

জনৈক বিশেষজ্ঞ (মিঃ গ্রিফিথ্) বলিয়াছেন যে, এক স্থলে ১২০ ফুট মৃত্তিকার নিম্নে ২২ হইতে ৩২ ফুট পুরু কয়লার স্তর পাওয়া যাইতে পারে। কয়লা ব্যতীত তাহাতে কোনও দ্রব্য মিশ্রিত নাই। ইংরাজের অসংখ্য কয়লার খাদের কোথাও এত অল্প গভীর স্থানে এমন পুরু কয়লার স্তর নাই। তথাপি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ৮৪ হাজার টনের অধিক কয়লা আইরিশ খনি হইতে উত্তোলিত হয় নাই। তাহার মূল্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারও হইবে না। মাত্র ৭৯০ জন কুলী এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

"কেন এমন হয়? ইহার কারণ এই যে, যাঁহারা কয়লার ব্যবসায়ের প্রভু, তাঁহাদের জন্য আয়র্লণ্ডের বাজার মুক্ত রাখাই ইংলণ্ডের অভিপ্রেত। সেখানে লাভ খুবই বেশী। বৎসরে তথায় ৪০ লক্ষ টন কয়লা বিক্রীত হয়। কাঁচা ও জ্বালানী কয়লা বেচিয়া তাঁহারা ১ কোটি ৭০লক্ষ ডলার মুদ্রা পাইয়া থাকেন। যদি আয়র্লণ্ডের কয়লার খনি হইতে কয়লা উঠিতে থাকে, তবে এ টাকাটা তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রে এই সংবাদটি বাহির হইয়াছিল,—

"কয়লার পরিমাণ উপেক্ষণীয় নহে। নানাজাতীয় কয়লা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। তাহা ছাড়া তাম্র, সীসা, গন্ধক এবং প্রয়োজনীয় অপর্য্যাপ্ত প্রস্তরও বিদ্যমান। * * * আয়র্লণ্ডকে লোক দরিদ্র দেশ কহে। কিন্তু তাহা সত্য নহে।"

উইসকন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এ, এল, পি ডেনিস্ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর সংখ্যার 'লণ্ডন টাইম্‌স্' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে আছে—

"আয়র্লণ্ড এ পর্য্যন্ত আমদানী কয়লার উপরেই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক আয়র্লণ্ডে এখনও পর্য্যাপ্ত কয়লার খনি যদি অনাবিষ্কৃত অথবা অনুন্নত অবস্থায় থাকে, তবে সেটা ভাবিবার কথা। এখন দেখা কর্ত্তব্য, প্রকৃতই সে সকল খনিতে কায করিলে লাভ হইতে পারে কি না। যদি আংশিক ভাবেও এ বিষয়ে আয়র্লণ্ড আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তবে রাজনীতি এবং অর্থনীতি উভয় দিক দিয়াই সেটা প্রভূত মঙ্গলের কারণ হইবে। কারণ, বেলফাষ্টের শ্রমশিল্প এখনও বেশীর ভাগ বৈদেশিক; কয়লা, লৌহ, শণ প্রভৃতি সবই অন্যদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে।"

মিঃ আর্থার গ্রিফিথ্ তাঁহার সম্পাদিত 'ন্যাশনালিটী' পত্রে বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নবেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

"আনট্রিম্ জিলায় যথেষ্ট খনিজ পদার্থ আছে। কিন্তু সে সকল খনিজ পদার্থের আবিষ্কার অথবা উন্নতি-সাধন হয় নাই। আনট্রিম্ বেলফাষ্টের খুবই সন্নিহিত, তথায় অসংখ্য এঞ্জিনিয়ারের সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি কয়েক হাজার টন মাত্র কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে। কথাটা এই যে, বেলফাষ্টের ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান অবস্থায় আয়র্লণ্ডের শ্রমশিল্পের আন্দোলনের সহায়তা করিতে সাহস পায়েন না। তাঁহাদের আশঙ্কা, পাছে তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া মারা যায়েন।"

প্রবন্ধলেখক বলেন যে, এমন কথা উঠিতে পারে, ভূমিগর্ভে কি আছে, তাহা কেহ অনুমান করিয়া বলিতে পারে না। সে কথা সত্য; কিন্তু সে বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে কি না, তাহা ত জানা দরকার। খনিজ পদার্থ কি পরিমাণে দেশের মধ্য হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা ত করা যাইতে পারে। আনট্রিম জিলাতেই তাঁহার জন্মস্থান, এই স্থানেই কয়লার আধিক্য বলিয়া কথিত, সুতরাং সত্যনির্দ্ধারণ তাঁহার পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে।

তিনি বেলিকাশলে ৮ হাজার একর পরিমাণ ভূমিতে কয়লা আছে বলিয়া জানিতে পারেন। এই কয়লা-ক্ষেত্র ঠিক জলের ধারেই বিদ্যমান; এত নিকটে যে, কয়লা-খাদের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া লোষ্ট্রত্যাগ করিলে উহা সমুদ্রের গভীর জলে গিয়া পৌছে। এখানকার কয়লা উত্তোলনের সমুদায় কার্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এক বৎসরের জন্য এই ভূখণ্ড তাঁহাকে ৫ হাজার ২ শত ৫০ টাকায় জমা দিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সাড়ে ৪ হাজার টাকা বাৎসরিক হারে ৫০ বৎসরের জন্যও তিনি উক্ত ভূমিখণ্ড ইজারা পাইতে পারিতেন। সে বিষয়ে কোনও বাধাই ছিল না। পরিত্যক্ত জেটীটা নূতন করিয়া গঠন করিতে পারিলেই জাহাজে কয়লা বোঝাই করা যাইত। তথা হইতে বেলফাষ্ট বা অন্য বন্দরে কয়লা চালান দেওয়ারও সুবিধা হইত।

তিনি এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে বলিতেছেন,—"বেলফাষ্টের ব্যাবসায়িগণের নিকট আমি এই প্রস্তাব করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বেলি-কাশল কয়লার খনিতে বহু ধনী অসংখ্য টাকা লোকসান দিয়াছেন। বেলফাষ্ট বণিক-সভার সভাপতি মিঃ পোলক আমাকে বুঝাইয়া দেন, কি কারণে অলষ্টারের কয়লার খনির উৎকর্ষ সাধন হয় নাই। তাহা এই—

"মিঃ আর্থার গ্রিফিথ্ ও সিন্‌ফিনার-গণ প্রায়ই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, অলষ্টারবাসিগণ কয়লার খনির উন্নতিসাধনে বিরত। কিন্তু অলষ্টারের ব্যবসায়িগণ এমন বুদ্ধিহীন নহেন যে, সুবিধায় কয়লা পাইলে সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন। একাধিক ব্যক্তি কয়লার খাদ করিয়া বিশেষরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। বেলিকাশলের কয়লার খাদ-সমূহ অবশেষে স্কটলণ্ডের কোনও বিশিষ্ট ধনী কয়লার খনিওয়ালা কোম্পানীর হস্তগত হয়। এই কোম্পানী প্রভূত অর্থব্যয় করিবার পর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কায বন্ধ করিয়াছেন, এখন আর উহার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাই। আয়র্লণ্ডে কয়লা ও লৌহের খনির কার্য্যের উন্নতি-সাধনে কোন প্রকার আইনের প্রতিবন্ধক নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডেও যে সুবিধা, এখানেও তাহাই আছে।

"সত্য কথা বলিতে কি, মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আয়লণ্ডে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন। এখান হইতে কয়লা পাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল তেমন আশাপ্রদ হয় নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে কয়লার যে মূল্য ছিল, তাহাতে আয়র্লণ্ডের খনি হইতে কয়লা তুলিয়া এ বিষয়ে ইংলণ্ডের কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা করার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

"যদি আয়র্লণ্ডের খনি হইতে কয়লা তুলিয়া সাফল্যলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাতে আমরা উদাসীন থাকিব না। য়ুরোপে ক্রমেই যেরূপ কয়লার অভাব ঘটিতেছে, দিন দিন কয়লার প্রয়োজন যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাতে পরি-ণামে আয়র্লণ্ডে কয়লার খনি করিয়া ক্রমশঃ বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা।"

সার এডওয়ার্ড কারসন।

"বেলফাষ্টের এই সকল ব্যবসায়ী সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারেন না যে, এই ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের চসতি কার-বারকে কোনওরূপ নিয়ম-বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। মিঃ হিউ কেলি বেলফাষ্টের এক জন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী বণিক যুবক। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মাত্র ২খানি ষ্টীমার দিয়া গিয়া-ছিলেন। এক্ষণে এই যুবক ২২খানি ষ্টীমারের মালিক। সমুদ্র-উপকূলে এই সকল ষ্টীমার মাল বহন করিয়া বেড়ায়। ইঁহার বিস্তৃত কয়লার কারবার আছে। বেলফাষ্ট কয়লার খনির উন্নতির জন্য ইনি চেষ্টাও করিয়াছেন। আমার সহিত কথোপকথনপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন,—

'খনিজ-পদার্থে সত্যই কি আয়র্লণ্ড পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন? পর্-ট্রাশের সন্নিহিত স্থানে কয়লা কিছু আছে বটে, কিন্তু সে কয়লা ভাল নয়—সংগ্রহ করাও কঠিন। লক্ নের সন্নিহিত প্রদেশে কয়লা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে বটে, কিন্তু অনেক নীচে আছে।

'আয়র্লণ্ডে কয়লা আছে বটে, কিন্তু এখানে কিছু ওখানে কিছু এইভাবেই আছে। ধারাবাহিক ভাবে নাই। ইংলণ্ড আমাদের খনিজ-পদার্থের উন্নতি-সাধনে বাধা দিতেছেন বলিয়া যে কথা রটিয়াছে, উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।'

"বেলিকাশল কয়লা-ক্ষেত্রে যে অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ, কয়লা ধারাবাহিক ভাবে নাই। এখানে কিছু

ওখানে কিছু এইভাবে আছে বলিয়া। তাহা ছাড়া সমুদ্রের জল ক্রমাগতই গর্ত্তমধ্যে প্রবাহিত হয় বলিয়া সর্ব্বদা জল-নিকাশ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র পড়িয়া থাকে।

"সিন্‌ফিনগণ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দেশের খনিজ পদার্থের উৎকর্ষ-সাধনে বাধা দেওয়া হইতেছে। বেলফাষ্টের শ্রমশিল্পসমূহের নেতৃগণ এই অভিযোগকে এমনই ভিত্তিহীন বলিয়া বিবেচনা করেন যে, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিতে চাহেন না।

"আয়র্লণ্ডে জমীর অধিকারী খনিজ-পদার্থ সম্বন্ধে স্বাধীন-ভাবে ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্বত্বে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। জমী যখন যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তখন সে-ই উহার দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হইয়া থাকে। যাহার অধিকারে জমী থাকে, সে যদি উহা খাজনা করিয়া লয়, তবে ভূ-স্বামীই ভূমির অন্তর্গত খনিজ-পদার্থেরও মালিক। কেহই তাঁহার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। যদি ভূস্বামী খনিজ-পদার্থের উৎকর্ষসাধনের জন্য ঐ জমী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রজাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।"

জমীর স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিধান তথায় প্রচলিত আছে যে, ভূস্বামী কোনও জমী প্রজাবিলি করিলে তখনই সেই জমীদারের স্বত্ব প্রজার হইবে। সেই প্রজা কোনও খনি-সমিতির নিকট তাহার জমী বিক্রয় করিতে পারে অথবা প্রকৃত মালিকের ন্যায় 'রয়্যালটি' পকেটস্থ করিতেও পারে। আয়র্লণ্ডে জমী-বিলির এই নিয়ম ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ড অপেক্ষা ভাল। সুতরাং খনি সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবার কোনও আইন তথায় প্রচলিত হইয়া খনির উৎকর্ষ সাধনে বাধা দিতে পারে, ইহা আদৌ সত্য নহে।

মিঃ ম্যাক্‌লুরের কথায় বুঝা যায় যে, আয়র্লণ্ডে প্রচুর কয়লা আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কয়লার খনির উন্নতি-সাধন ভালরূপে হয় নাই, হইতে পারে নাই, তাহার পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। মিঃ ডি ভেলেরা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ইভনিং জর্নাল' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে রিচার্ড গ্রিফিথের (আর্থার গ্রিফিথ স্বতন্ত্র ব্যক্তি) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের যে যে স্থানে খনি আছে, সবই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। রিচার্ড গ্রিফিথ প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ এবং কার্য্যে পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার। এ সকল বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। রয়াল ডব্‌লিন সোসাইটীর তিনিই অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্ এবং খনি সমূহের ইনস্পেক্টার-জেনারেল। প্রত্যেক কয়লার খনি তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিভাশালী এঞ্জিনিয়ার উইলিয়ম্ চ্যাপ্‌ম্যান্ এবং জেম্‌স্ ব্রাউকে ইংরাজ ও স্কচ্ ব্যবসায়িগণ বহুবার এই স্থানে আনাইয়া এই সকল কয়লার খনির উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা রাশি রাশি অর্থও ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করিতে পারে নাই। টাইরন প্রদেশের অধিকাংশ কয়লা ক্ষেত্রের অধিস্বামী লর্ড ক্যালেডন্ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর-কাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ নানাস্থানে খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন; খনির কার্য্যে অভিজ্ঞ বহু শ্রেষ্ঠ ইংরাজ স্কচ্ এঞ্জিনিয়ারকেও তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাস্থানে কয়লা আছে বলিয়া সেই সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়াও দিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রিফিথ সেই সকল স্থান স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া টাইরন কয়লা-ক্ষেত্র-সংক্রান্ত জরীপ-বিষয়ক বিবরণের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এ চেষ্টা না করাই উচিত ছিল।" ডঙ্গাননের সন্নিহিত স্থানের কয়লার 'রেতি' কোথাও কোথাও দেড় ফুট হইতে চারি ফুট মাত্র পুরু।

কোয়ালিস্‌লাণ্ডে সঞ্চিত কয়লার সম্বন্ধে গ্রিফিথ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"এই স্থানের কয়লা অতি শীঘ্র পুড়িয়া যায়। এখানকার কয়লা তুলিতে গেলে অর্থব্যয় এবং বিপদও অধিক, কারণ, যদি খাদের ভিতর কোনওরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া উপরের ছাত রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে উপরের মৃত্তিকা ধ্বসিয়া পড়িয়া গহ্বর পূর্ণ করিয়া ফেলিবে।"

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কতকগুলি গুরু প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"কয়লা-স্তূপের ঠিক নিম্নে যে কর্দ্দম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এমনই কোমল যে, সামান্য জল পাইলেই উহার উপর দিয়া চলাফেরা করা বা কয়লা তোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বিপদের আশঙ্কা এই যে, যে কয়লার স্তম্ভের উপর ছাত থাকে, উপরের গুরুভারে তাহা বসিয়া যায়।

তাহা ছাড়া সমান্তরালভাবে সর্ব্বত্র কয়লাও নাই। কোন কোন স্থলে কয়লার স্তর অতিশয় ক্ষীণ ও মিশ্রিত। অধিকাংশ স্থলে ২০ হইতে ৩০ গজের অধিক স্থান ব্যাপিয়া কয়লাও নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌লুরএর মতে, মিঃ গ্রিফিথের সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পড়িলে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের তুলনায় আয়র্লণ্ডের কয়লার খনিগুলির উন্নতি কি কি কারণে সম্ভবপর নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তিনি বলিতেছেন, "আইরিশ জনসাধারণ অভিযোগগুলিকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে। দাবী দাওয়াগুলি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা দৃঢ়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লোক ভ্রান্ত ধারণাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে।"

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'টাইম্‌স' পত্রে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় কোনও গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, মিঃ ম্যাক্‌লুর তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :—

"আইরিস স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতীয় আন্দোলন যে যে স্থলে আরম্ভ হইয়াছে, সর্ব্বত্রই একই হেতু বিদ্যমান। অর্থাৎ অন্যের শাসনাধীন থাকার ফলে যে দেশের অধিবাসীদিগের আর্থনীতিক সুবিধা, অধিকার প্রভৃতি শাসকের করতলগত, সেই দেশের জনসংঘ তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যই আন্দোলন করিতেছে।"

ম্যাক্‌লুর বলেন, "এই মন্তব্য ভলিবার উক্তির ন্যায়ই মূল্যহীন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ লি বনের উক্তি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—'লোকের ধারণা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিচার না করিয়া, মানুষের উপর উহার প্রভাব কিরূপ, তাহাই দেখিতে হইবে। যখনই কোন একটা ধারণা, দীর্ঘকালের আন্দোলন আলোচনা, পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ইত্যাদির পর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে আসন পাতিয়া বসে, তখন তাহা সত্যের রূপই ধারণ করে। আলোচনার দ্বারা আর তখন তাহার সত্যতা নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না। তখন সেই ধারণাই জাতির অস্তিত্ব বিঘোষিত করে।"

লেখক পরিশেষে বলিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিচিত্র। এখানকার অধিবাসীদিগের চরিত্রমাধুর্য্য এবং আতিথেয়তা প্রশংসনীয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যদি কোনও পর্য্যটক আয়র্লণ্ড দর্শন করিতে যাইতেন, তবে তাঁহাকে অবশ্যই বলিতে হইত—

"সমগ্র জগতেই আজ দুঃখ, দুর্দ্দশার চিত্র; কিন্তু এখানে —আয়র্লণ্ডে শান্তি ও প্রাচুর্য্যের সমাবেশ আছে।"

আমাদের দেবতা।

আমাদের দেবতা যে চিরশ্যামসুন্দর,
নামে পাই পরশন, পুলকিত অন্তর।
অসি কি অশনি নাই বাঁশী তার করে গো,
মধুময় বঁধু তিনি সদা সুধা ক্ষরে গো।

আমাদের দেবতার সবই অনাসৃষ্টি,
সুখ চেয়ে দুখে তাঁর চির-লোভদৃষ্টি।
সুররাজ পদধূলি মাগি লন অঙ্গে,
কোলাকুলি তাঁর দীন 'সুদামার' সঙ্গে।

রূপহীনা কুবুজার প্রেমে হন বন্দী,
বিশ্বের সম্রাট অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
বিদুরের খুদ তাঁর বড় প্রিয় খাদ্য,
কালিয়ার শিরে তাঁর নূপুরের বাদ্য।

নামে নাচে দেব নর, কেঁপে মরে কংস,
জল নাই চোখে হেরি যদুকুল ধ্বংস।
বৃন্দারে হেরি তাঁর আসে জল চক্ষে,
মনে পড়ে ব্রজভূমি ব্যথা জাগে বক্ষে।

বেয়াকুলা দ্রৌপদীর নিবারেন লজ্জা,
ভকতের তরে তাঁর নিতি রণসজ্জা।
অর্চ্চনা প্রেমে তাঁর হোমে যাগে হবে না,
বুক বই সে মূরতি কোনোখানে রবে না।

দর্পহারী সে হরি—সেই দীনবন্ধু,
মুরহর মধুরিপু, মধুপুর-ইন্দু।
হেলা করি রাজসেবা আরতি ও বন্দন,
ভকতের কাছে লন তুলসী ও চন্দন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিলন-রাত্রি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজার ক্ষুব্ধ বাক্যের উত্তরে শরৎকুমার বিনীতস্বরে কহিলেন, "অবশ্য দেশ-ভক্তির দোহাই দিয়েও এরূপ দেশ-পীড়নকে সমর্থন ক'রা যায় না, তবুও তাদের পক্ষে এইটুকু বলার আছে যে, ডাকাতী করার জন্যই তারা ডাকাতী করছে না। সব কাযেই ত অর্থবল চাই। অনন্যোপায় হয়েই তারা ডাকাতী ধরেছে। আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের ত অর্থ যোগাবেন না।"

"দেশের কাযে সাধ্যমত অর্থ অনেকেই যোগাচ্ছেন, আমিও যুগিয়ে থাকি। মায়ের নামডাকে লোকের চাঁদা-দানে যে কিরূপ আগ্রহ, ন্যাসনাল-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার দিন তুমিও ত তা' দেখেছ? তবে মারপিটের জন্য চাঁদা তোলা দুষ্কর, এটা ঠিক।"

"আচ্ছা, আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বে-আদপি মাপ করবেন, বিনা অস্ত্রে বৃটিশ-কেশরীকে বশ করতে পারা গেছে, এমন কোন নজীর আপনি দেখাতে পারেন?"

রাজা অতি দুঃখেও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমিও তর্কের খাতিরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের অস্ত্র কোথায়—তাই তা' হলে দেখাও আগে? প্রসাদপুরের মর্চে-ধরা দু'চারখানা বন্দুক তলোয়ার, আর বমপটকা প্রস্তুতের একখানা শিশুশিক্ষা—এই ত অস্ত্র সম্বল তোমাদের! কিন্তু পুরাকালের দ্রোণশর্ম্মা স্বয়ং সশরীরে এসে আজ যদি তোমাদের আচার্য্য হয়ে দাঁড়ান, তা' হলে তাঁকেও পশ্চিমের প্রবল-প্রতাপ আধুনিক বিজ্ঞান-দৈত্যাচার্য্যের নিকট পরাভব মান্তেই হবে।"

"তা' হলে কি আপনি বলেন, এ দাস জাতির মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র. মার খেতেই আমরা জন্মেছি—অতএব মার খাওয়ারূপ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সাধনেই পতিত আমাদের স্বর্গলাভ?"

"না, তা' আমি বলিনে। এইখানেই আমাদের মতভেদ। চাই না রক্তপাত—আমরা কোর্ব্ব না আঘাত, ব্যর্থ করব অরির অস্ত্র ধর্ম্মকৃপাবলে—এ কথা আমার মুখের কথা নয়, মনের প্রকৃত ভাব। নিরস্ত্র আমরাও বলহীন নই, ধর্ম্মবল, আধ্যাত্মিকবলই আমাদের আত্মবল। এই বলের উৎকর্ষণে যে দেশাত্মবোধ-জ্যোতিঃ আমাদের মনে জ্বলে উঠ্‌বে—বাইরের ঝটিকা-ঝঞ্ঝায় তা'র নির্ব্বাণ নেই। সে মহালোক বিশ্ব-জাতির মধ্যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌বে। এই কথা তোমাকে গোড়াতেই বলেছি, আবার স্পষ্ট ক'রে বল্‌ছি।"

"দেখুন, এ রকম বড় বড় কথাগুলোকে ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না। বাহুবল বল্লেই বরঞ্চ আমরা মূর্ত্তিমন্ত একটা ভাব প্রত্যক্ষ করি—সে ভাবে ধর্ম্মবল, মনের বল সব কিছুই দেখ্‌তে পাই—কিন্তু অধ্যাত্মবল কথাটিতে প্রথমেই আমাদের মনে এসে দেখা দেয়—জটাজূটধারী যোগি-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামী, শুনা যায়, তাঁরা না কি অনেকে দুঃসাধ্যসাধনও করতে পারেন—কিন্তু চোখে কখনো সেরূপ কাণ্ড দেখিনি,—আর স্বরাজের পথে আমাদের তাঁরা এগিয়ে দিতে পার্ব্বেন ব'লে মনে বিশ্বাসও নেই। আপনি বুঝিয়ে দিন দেখি কৃপা ক'রে, সে অধ্যাত্মবলটা কি—যাতে ক'রে আমরা স্বরাজলাভ করতে পারব এবং তার সাধনপথই বা কোথায়?"

রাজা সহাস্যে বলিলেন, "আজকাল সারা পশ্চিম ভূরাজ্য ভারতকে অধ্যাত্মগুরু ব'লে স্বীকার করছে, আর ভারত-সন্তান তোমরাই এ শক্তিতে বিশ্বাসহীন! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?"

শরৎকুমারও হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু দেশের অধ্যাত্মগুরু যাঁ'রা, তাঁ'রা ত সকলেই আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে পশ্চিম-মুখে ধাবিত, কি করি বলুন?"

"এই যে সব ছেলেরা দেশকে ইংরাজের অধীনতামুক্ত করবার জন্য প্রাণপাত করছে—তাদের কি আত্মশক্তির কিছু অভাব আছে? কিন্তু শব-সাধনায় সে শক্তি প্রেতবল লাভ

করছে। তপস্যাবলে ঐ শক্তিই পুণ্যশক্তিতে পরিণত হ'বে বলা হচ্ছে অধ্যাত্মবল।"

"ভয় লাগিয়ে দিলেন যে! আগে মুনি ঋষিরা যুগযুগান্তর-ব্যাপী তপস্যায় কাম্যফল লাভ করতেন,—তাঁরা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু রাজপীড়িত দৈবপীড়িত মরণপথের পথিক আমাদের দেখ্‌ছি তা' হলে কোন আশাই নেই।"

শরৎকুমারের এই গম্ভীর কৌতুকে রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তবুও আশায় বুক বাঁধতে হ'বে। স্বরাজের অধিকারী যদি হ'তে চাও ত সঞ্জীবনী সুধার আবিষ্কারে উঠে প'ড়ে লাগ।"

"মা দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়াও যে ওর চেয়ে সহজ,রাজাবাহাদুর; আর পথও জানিনে, কথাটা শোনামাত্রই এক পা না বাড়িয়েও যে, গোলোকধাঁধার মধ্যে গিয়ে পড়েছি।"

"হ্যাঁ, একরূপ অসাধ্য-সাধন বই কি, চারিদিকের গভীর বন-জঙ্গল কেটে যদি পথ করতে পার—তবেই ত সেই মানস পাহাড়ের মধু-চাকের সন্ধান মিলবে, আর সে কষ্ট যদি স্বীকার করতে না চাও ত চিরকাল জঙ্গলেই প'ড়ে থাক। অনেকে আইরিশদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করেন; কিন্তু তাদের অধীনতা পরিপূর্ণভাবে বাইরের—বহিঃশত্রুর দমনেই তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমাদের মনঃপ্রাণ আত্মা পর্য্যন্ত যে অধীনতার ডোরে কষে বাঁধা! স্ত্রীজাতির উচ্চ অধিকার আমরা মানতে চাইনে—বর্ণবিভেদ আমরা ভুলতে পারিনে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন আমরা অসম্ভব জ্ঞান করি, বিলাতে গেলে আমাদের অধঃপতন হয়, নীচ জাত মন্দিরে ঢুকলে দেবতাও তা'কে নির্য্যাতন করেন, আর এই সব সংস্কার-মাহাত্ম্যে স্ফীত হয়ে ধরাখানাকে আমরা সরা জ্ঞান করি—হায় রে! মনের এই সব জঙ্গল সাফ্ না ক'রে দিলে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার স্থানই বা কোথায়, তাই বল ত?"

শরৎকুমারও এবার গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "আজকাল অনেকের মনেই এ সত্য জেগে উঠেছে—কিন্তু সারা দেশের মতি-গতিকে এইভাবে ফিরিয়ে তোলা একরূপ অসম্ভব বলেই মনে হয়। বুদ্ধ, চৈতন্যও যে এ চেষ্টায় হার মেনেছেন।"

"অসম্ভব নয় ডাক্তার অসম্ভব নয়। যখনই আমি মনে করি অসম্ভব, তৎক্ষণাৎ দৈববাণী শুনতে পাই—'না না, অসম্ভব নয়।' কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নির্ভীকতা, বাঙ্গালীর সাহস,হাস্যকর কৌতুক প্রহসনের বিষয় ছিল—আর এখন বীরত্বে বাঙ্গালী ইংরাজসিংহেরও ভয়ের কারণ হয়ে পড়েছে। যে সব শক্তিশালী যুবক বিপ্লব-চক্রান্তে মেতেছে—তারা যদি বোঝে সে পথে নয়, এই পথেই ভারতের মুক্তি—তা' হলে তাদের সমবেত চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হ'বে না।

তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যোগ্যতা-লাভের জন্য তোমরা উঠে পড়ে লাগো, ডাক্তার। ঘাতকের কায ছেড়ে মুক্তির লাঙল কাঁধে ক'রে—নবীন চাষার দল তোমরা, বৌদ্ধযুগের আদর্শে গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে তোমাদের মনঃশুদ্ধির উৎকর্ষণ-পদ্ধতি প্রচার কর, তা হ'লে তপস্যাতুষ্ট ভগবান্ এক দিন স্বয়ং হলধররূপে অভ্যুদিত হয়ে নিজ হাতে হাল ধরবেন।"

"তাঁ'র উদয়ে ত সকল সমস্যাই সমাধান হয়ে যা'বে। কে বলতে পারে, অস্ত্রচালনা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি স্বরাজ-লাভের পথ নির্দ্দেশ করবেন না? যুগান্তরকারী কল্কি-অবতারের বীররূপই ত আমাদের কল্পনাপটে মুদ্রিত।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি অস্ত্র না ধ'রে ছাড়বে না; লোকের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে ক'রে অস্ত্রের উপরই তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। নবীন হেলায় যদি স্বরাজ-লাভের জন্য অস্ত্রচালনায় উপদেশ দেন, তবে তিনিই পাঞ্চজন্য ঘোষণা ক'রে তোমাদের সারথি হবেন। কিন্তু এখনো সে সময় আসেনি, আমাদের আত্মশক্তি এখনও ভ্রূণরূপ অস্ফুট, অপূর্ণ। তোমাকে আমি এ কথা বোঝাতে পারছি কি না, জানি না; তবে তোমাদের অস্ত্র পাও। মাণিকতলার সেই বালকরা যে ধরা পড়ার সময় এ কথা বুঝেছে, তা'তে সন্দেহ নেই।"

রাজা মুহূর্ত্তকাল থামিলেন, তাহার পর অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া মনের জ্বালানিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যেন কহিলেন—"দেখ, ডাক্তার, এ দুঃখ আমি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারিনে, যে মহাপ্রাণ বালকদের আমরা হারিয়েছি; তাদের শোক আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে—তারা দিগ্‌ভ্রান্ত না হ'লে দেশের প্রাণে তারা ইন্দ্রধনু ফুটিয়ে তুলতে পারত। এত শক্তি তাদের বৃথা কাযে নষ্ট হ'ল?"

"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। ভুলই করুক, আর যাই করুক, তাদের আত্মোৎসর্গ বৃথা যায় নি।"

"তা ঠিক, এ সংসারে কোন energyই বৃথা যায় না—সব ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে থেকেই ভগবান্ পরাফল আদায় ক'রে নেন। কে বল্‌তে পারে—এই শিক্ষাই তাদের ভবিষ্য জীবন-গঠনের সোপানপথ নয়?"

বলিয়া রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তৃ পুরুষের উদ্দেশে মনে মনে কহিলেন,—"হে অকূলের কর্ণধার, তাদের রক্ষা কর, প্রভু, এই শিশুমতি বালকদের মোহকৃত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে কূলে তুলে নিয়ে এদের পুণ্য কাযের অবসর দাও।"

গৃহের স্তব্ধ বিষাদ মুহূর্ত্তমধ্যে দূরবিদূরিত করিয়া রাজা আশাদীপ্ত নয়নে শরৎকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আস্‌বে, তারা নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে, দেশ অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ তাদের জীবনদান করেছেন, সাধ্য কি সে জীবন অন্যে গ্রহণ করে!"

তকমাধারী ভৃত্য কিছুপূর্ব্বে এখানে আসিয়া বারান্দার পাশের বড় টেবলে চা'র সরঞ্জাম গুছাইতেছিল—সে মৃদু মধুর ধ্বনিতে ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইল—চা প্রস্তুত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চা-পানে যাইবার জন্য উঠিয়া রাজা শরৎকুমারকে বলিলেন,—"আসল কথাটাই তোমাকে এখনও বলা হয়নি, ডাক্তার, চল, চা খেতে খেতে বল্‌ছি। এতক্ষণ তর্কে-বিতর্কে বোধ হয় তোমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

তাঁহারা উভয়ে চা-টেবলের সম্মুখে আসিবামাত্র খানসামা চা-দানী হইতে দুই পেয়ালা চা ঢালিয়া উভয়ের নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট ধরিয়া পরে রাজ-ইঙ্গিতে ট্রে শুদ্ধ চা-দানী শরৎকুমারের হাতের কাছে রক্ষা করিল। রাজা বলিলেন,—"ব'স, ডাক্তার, তুমি খেতে আরম্ভ কর—আমি মুখে একটু জল দিয়ে আসি।"

রাজা স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"চা'র পেয়ালা নিয়ে চুপচাপ ব'সে আছ দেখ্‌ছি? আজ রাণী আসেন নি—বোধ হয়, সখী-বেষ্টিত আছেন, আজ তোমাকে নিজের আতিথ্যের কায নিজেই করতে হবে—বুঝ্‌লে ত, ডাক্তার?"

রাজকুমারী যে সখীবেষ্টিত নহেন—এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশে রাজার ভুল ভাঙ্গিতে প্রয়াস না করিয়া শরৎকুমার দাঁড়াইয়া উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আতিথ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হ'চ্ছে না, রাজাবাহাদুর, সেজন্য ব্যস্ত হবেন না, পেয়ালা যে চা-ভরা দেখ্‌ছেন, এ দ্বিতীয়বারের আয়োজন।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর খানসামা কেক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির থালা যথাক্রমে একটির পর একটি আনিয়া উভয়কে এক একবার দেখাইতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছামত পার্শ্বস্থিত নিজ নিজ রেকাবে ভোজ্যদ্রব্য কিছু কিছু উঠাইবার পর থালাগুলা পুনরায় টেবলে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভৃত্য অতঃপর দ্বারপ্রান্তে হরকরার নিকট গিয়া বসিল। আপাততঃ তাহার পরিবেষণ কার্য্য এইখানেই শেষ; চা মিষ্টান্ন সকলই তাঁহাদের হাতের কাছে, আবশ্যকমত নিজেরাই তুলিয়া লইতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বুঝিলে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাকে ডাকিবেন।

রাজা দু'এক ঢোক চা-পান করিবার পর বলিলেন,—"দেওয়ানের সঙ্গে আজই কি তুমি প্রসাদপুর যেতে পারবে? সন্তোষ গুলীর আঘাতে শয্যাগত, সেখানকার ডাক্তাররা তোমাকে চায়।"

শরৎকুমার চা'র পেয়ালাটা মুখ হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "অবশ্যই। আমিও কিন্তু, রাজাবাহাদুর, যে কথা আপনাকে বল্‌তে এসেছিলুম, এখনও বলা হয়নি।"

"বিলাত যাবার কথা নয় ত? ভয় হয় যে শুনে।"

শরৎকুমার সহাস্যে বলিলেন, "এ ভয় নয়, বিস্ময়! একটা ভেল্কীবাজির মধ্যে প'ড়ে গেছি, রাজাবাহাদুর!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পকেট হইতে রাজকুমারীর মুক্তার মালা বাহির করিয়া টেবলে রাখিয়া দিলেন।

রাজা মালাছড়া হাতে উঠাইয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "এ ত মনে হচ্ছে রাণীর মালা?"

"এই মালা আমার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেছে।"

শুনিবামাত্র রাজার মনে হইল, রাজকুমারীই এ মালা গোপনে ডাক্তারের বাক্সে রাখিয়া, যে কথা মুখে তাঁহাকে বলিতে পারেন নাই—প্রকারান্তরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজা মনের কথা মনেই রাখিয়া—মালাগাছি শরৎকুমারের হাতের কাছে রাখিয়া বলিলেন,—"এ মালা তুমি পেয়েছ, তুমিই রাখ; তবে যাঁ'র মালা, তিনিই যদি ফিরে চান ত তাঁ'কেই পরিয়ে দিও।"

এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে শরৎকুমারের মুখ লজ্জা-রক্তিম হইয়া উঠিল,—মালাগাছা টেবলেই পড়িয়া রহিল,—তিনি মনের ভাব ঢাকিবার অভিপ্রায়ে শূন্য পেয়ালাটা মুখে উঠাইয়া ধরিলেন। এই সময় সহসা শ্যামাচরণ গৃহাগত হইয়া টেবলে মতির মালা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, মতির মালা এখানে প'ড়ে যে? রাজকুমারীর মালা—না? এক পেয়ালা চা দে, শরতা।"

শরৎকুমার পেয়ালাতে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা জানেন, শ্যামাচরণ স্যাণ্ডউইচ-ভক্ত, তাহার থালাখানা তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া একটু চাপাহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ মালা ডাক্তারের লেখার বাক্সে পাওয়া গেছে।"

রাজা যা' মনে করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথা শ্যামাচরণের মনেও উদয় হইল। তিনিও মনে মনে হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "এমন বোকা ছেলে যদি দুটি দেখে থাকি! এ ছেলের যদি এ দিকে কাণাকড়ি বুদ্ধি ও সাহস থাক্‌ত, তা হ'লে কোন্ জন্মেই কায গুছিয়ে ফেল্‌তে পার্‌ত।"

মুখে বলিলেন, "আশ্চর্য্য কাণ্ড ত! যা' বাবা রাজকুমারীর কাছে, তিনি নিশ্চয়ই এর একটা explanation দিতে পার্‌বেন।"

তাঁহাদের উভয়ের ভাবগতিক বুঝিয়া শরৎকুমার লজ্জিতভাবেই বলিলেন, "সেখান থেকেই আস্‌ছি। আমার বাক্সে তাঁর মালা পাওয়া গেছে শুনে তিনিও খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন।"

তবুও এ কথায় শ্যামাচরণের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল না—বাঙ্গালা দেশের মেয়ে—তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না! রাজকুমারী হয় ত বা লজ্জায় কথাটা চাপিয়া গিয়াছেন!

সন্দিগ্ধভাবে তিনি কহিলেন, "রাজকুমারীও বল্‌তে পার্‌লেন না? আচ্ছা, আমরা তদারক ক'রে দেখ্‌ব এখন, তুই এখন যা', কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিগে,—বেশী দেরী কর্‌লে চল্‌বে না—দেখ্‌ছিস্ ত ৫টা বাজে।"

সকলেই ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা বলিলেন, "এত দেরী হয়ে গেছে—বুঝ্‌তে পারিনি।"

শরৎকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তবে ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে আসি, সময় বেশী যাবে না তা'তে। আমি ফিরে এসে মালাছড়া নিয়ে রাজকুমারীকে দিয়ে আস্‌ব এখন। এখন আপনার কাছেই থাক।"

শরৎকুমার চলিয়া গেলে রাজা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্যাপারখানা কি, গাঙ্গুলি মশায়, কিছুই ত বুঝে পার্‌ছিনে।" শ্যামাচরণ তখন দুই টুকরা রুটিই এক সঙ্গে মুখে পুরিয়াছিলেন, তার কতকটা গিলিয়া ফেলিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "তাই ত, আপনি একবার রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করুন না? কি জানি, লজ্জায় শরৎকুমারের কাছে কোন কথা যদি চেপে গিয়েই থাকেন।"

রাজা কহিলেন, "না, গাঙ্গুলি মহাশয়, রাণী যখন বলেছে সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন ঠিক কথাই বলেছে। এই যে ডাক্তার—এর মধ্যে কাপড় গোছান হয়ে গেল?"

শরৎকুমার গৃহাগত হইয়া বলিলেন, "না, রাজাবাহাদুর, এই দেখুন আর এক অদ্ভুত কাণ্ড!" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবলে রাখিয়া কহিলেন—"কাপড় গোছাতে গিয়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে এই পিস্তল পেয়েছি; এ ত আপনার পিস্তল, আমার বাক্সে রাখলে কে?" সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। পিস্তলটা কেস হইতে বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে দেখিতে রাজা বলিলেন, "এও দেখছি সন্তোষের কায; কল্‌কাতায় আসার দু' এক দিন আগে সন্তোষ একটি ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে চাঁদা চাইতে আসে। জান ত আমার চেক বইখানা লেখার টেবলের খোলা টানার মধ্যেই থাকে, সেই টানার মধ্যে এই পিস্তলটাও ছিল। চেকবই আমি যখন বার করি, সন্তোষ তা দেখেছিল—এবং পরে কোন সময়ে এসে সে চুরী ক'রে নিয়ে গেছে, তাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু চুরী ক'রে তোমার বাক্সে এটা রাখার উদ্দেশ্য কি?"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "তোর সঙ্গে কি তার শক্রতার কোন কারণ ঘটেছে?"

"কই, আমি ত কিছুই জানি নে। তবে তা'দের সমিতিতে যোগ দেবার জন্য সে আমাকে দেখা হলেই ডাক্‌ত, আমি তাতে রাজি হই নি—এতেই যদি তা'র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি।"

হঠাৎ শরৎকুমারের মনে পড়িল, সেই সন্ন্যাসীকে, তাহার সহিত এ ঘটনার কিছু যোগ আছে নাকি? বিচিত্র কি? কিন্তু এ কথা শরৎকুমার বাহিরে প্রকাশ করিলেন না—কেন না, রাজকুমারী এ সংস্রবে জড়িত।

শ্যামাচরণ বলিলেন, "স্পষ্টই ত তা' হ'লে বোঝা যাচ্ছে, কেন সে তোমার শক্র হয়েছে! বিপ্লবপন্থী ওরা, সোজা

লোক ত নয়? তোমাকে যে ওরা খুন ক'রে বসেনি, এই ঢের—এখন যা' বাবা, কাপড়চোপড় গুছিয়ে ফেল্‌গে।"

শরৎকুমার বলিলেন,—"যাচ্ছি, মামা, কাপড় গোছাতে আমার সময় বেশী লাগবে না, আপনি আশ্বস্ত থাকুন—আমি ঠিক সময়েই দেওয়ানের সঙ্গ ধর্‌ব।" তাহার পর রাজার উদ্দেশে কহিলেন, "আপনার পিস্তল আপনিই রাখুন তবে, আমি প্রসাদপুর যাচ্ছি—দেখি সন্তোষের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু খবর আদায় কর্‌তে পারি কি না?"

রাজা বলিলেন, "না, পিস্তলটা তুমিই কাছে রাখ—যে রকম ষড়্‌যন্ত্র চলেছে দেখছি—তোমার সতর্ক থাকা উচিত।"

শরৎকুমার পিস্তল উঠাইয়া লইয়া মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়া নীরব নমস্কারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

শ্যামাচরণ শরৎকুমারের পূর্ব্বকথার উত্তরে কহিলেন, "শুধু এ পিস্তল-রহস্যের কথা নয়—অনেক কথাই তা'র কাছ থেকে আদায় কর্‌তে হবে—বুঝলি, বাবা? এখন সারিয়ে তোল্ ত তাকে আগে সেখানে গিয়ে।"

রাজা বলিলেন,—"হ্যাঁ, যমের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই আপাততঃ প্রসাদপুরে তোমাকে পাঠান হচ্চে, ডাক্তার; বিয়েটার পরে আমরাও গিয়ে পড়্‌ব।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "দেখিস্ যেন হার মানিস নে, বাবা, তা হ'লে আমার মাথা হেঁট হ'বে—বুঝলি ত? বিয়ের সময়-টাই ঠিক তোর চ'লে যেতে হচ্ছে—অণুভার মনে খুবই দুঃখ হ'বে, কিন্তু চায় ত নেই?"

শ্যামাচরণের নিজের মনে যে ইহাতে কতটা দুঃখ হইতেছে, সে কথা আর তিনি বলিলেন না। কিন্তু শরৎকুমারের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। একটা বিষাদের ছায়া তাঁহার মনেও ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

হাসির আবরণে সে ভাব চাপিয়া তিনি বলিলেন, "আমি অণুকে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন। আর দেরী করব না, মামা, আমি চল্লুম,—কাপড় গু'ছিয়ে এখনই আবার আস্‌ছি।"

তা'র পর সলজ্জ দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিয়া আধোবাধো ভাবে তিনি কহিলেন, "মতির মালাগাছটিও তা'হলে নিয়ে যাই,—রাজকুমারীকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রসাদপুরে যাবার কথা তাঁকে ব'লে আসি।"

শরৎকুমার মালা লইয়া মৃদুহাস্যে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেলেন,—রাজা শ্যামাচরণকে বলিলেন,—"দেখুন, গাঙ্গুলি মহাশয়, প্রসাদপুরের অস্ত্র-চুরীর খবর এখন পুলিসকে জানিয়ে কায নেই—খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া এখন বন্ধ থাক। আমাদের বিরুদ্ধে একটা যে ষড়যন্ত্র চল্‌ছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—কিন্তু কি রকম ধরণের সে ষড়যন্ত্র, কোথা থেকে তা'র উৎপত্তি—যতদিন তা না জানা যায়—ততদিন খুব সাবধানে চল্‌তে হবে। পুলিস এখন এ খবর পেলেই—প্রথমেই সন্দেহ করবে শরৎকুমারকে এবং তা'র গ্রেপ্তারেই পুলিসের কর্ত্তব্য শেষ হ'বে।"

শ্যামাচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে আমি চল্লুম—যে ছোকরাকে বিজ্ঞাপনগুলা দিয়েছি—তা'র কাছ থেকে এখনই সেগুলো ফেরত নিই গিয়ে। অবশ্য সে বিজ্ঞাপন কাল যাবার কথা—আজ না,—তবুও সাবধানের মার নেই!"

শ্যামাচরণ চলিয়া গেলে রাজা রেলিঙের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হ্রদের পরপারে অতল দিগন্ততলে সূর্য্য-গোলক ডুবিয়া পড়িয়াছে;—পতির অনুগামিনী, সিন্দূর-সীমন্তিনী সতীর ন্যায় শীত-অপরাহ্ন বেলা, শেষ-গৌরবে হাসিয়া উঠিয়াছে। কাননের তরু-শিখরে, হ্রদের জলে, প্রস্তরমূর্ত্তির আননে ক্রীড়মান রক্তিমচ্ছটা ধীরে ধীরে মৃদু হইতে মৃদুতরভাবে সায়াহ্নের ছায়ালোকে কিরূপ অপরূপভাবে আত্মলোপ করিতেছিল, রাজা দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে সেই শোভা দেখিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া পিতার কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিলেন। কিছু পরে শরৎকুমারও অনাদির সহিত প্রসাদপুরযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার বিদায়-পদধূলি লইবার জন্য আগমন করিলেন।

একমাত্র অনাদি প্রসাদপুরের চৌর্য্য-রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখন প্রসাদপুর যে শরৎকুমারের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে, ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিল। কিন্তু শপথে তাহার মুখ বন্ধ, কোন কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিবার যো নাই; বন্ধুর এই সম্ভাবিত বিপদে নীরব রক্ষিরূপে সে তাঁহার সহযাত্রী হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কর্ম্মশক্তি।

১। আচার্য্যের মত।

বিচক্ষণ চিকিৎসক যেরূপ দেহের নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন, আচার্য্যগণ সেইরূপ ব্যক্তি ও জাতির মনের নাড়ী দেখিয়া ব্যবস্থা করেন। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামী বর্ত্তমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান ভারত ঘোর তমোচ্ছন্ন। সাধারণ ভারতবাসী সত্ত্বৃত্তির অহঙ্কার করে বটে, কিন্তু তাহার সত্ত্বৃত্তি খুব কম। সে জন্য তিনি ভারতে রজোগুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতবাসী দেহের জড়তায়, মনের জড়তায়, বুদ্ধির জড়তায়, জড় হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের বটে, কিন্তু তাহা এই তমোচ্ছন্ন লোকের কিছু উপকারে আসিতেছে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভাত বাসি হ'লে খাওয়া চলে, কিন্তু পোলাও বাসি হ'লে পচে' যায়। আমাদের পোলাও পচেছে।"

জড়তা বা তমোভাব নষ্ট হইয়া রজোগুণ প্রকাশ হইলে, তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্বামীজী এই জন্য বর্ত্তমান ভারতে কর্ম্মজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন।

২। বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য শান্তবৃত্তি। বৈরাগ্য খুব উপাদেয়; কারণ, জ্ঞানের সাহায্য করে। বৈরাগ্য মানে ভোগে বিরক্তি। সাধারণতঃ অনেকের ভোগে অনুরক্তি থাকে, ভোগে ঠিক বিরক্তি খুব কম দেখা যায়। তবে এ দেশে এটা খুব দেখা যায়, অধিকাংশের ভোগে বিশেষ অনুরক্তি, কিন্তু ভোগের উপায়ে বিরক্তি। ভোগের উপায়ে বিরক্তি হেতু ভোগে অনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও ভোগ লাভ হয় না। ভোগ কর্ম্মসাপেক্ষ। কর্ম্ম দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধিসাপেক্ষ। পরিশ্রম, উদ্যম সাহস, মস্তিষ্কচালনা প্রভৃতি ভোগের উপায়। যদিচ ভোগে খুব অনুরক্তি, কিন্তু এইগুলিতে বড় বিরক্তি, সে জন্য ভোগ লাভ হয় না। পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস, মস্তিষ্কচালনা এগুলি রজোগুণে হয়, আর জাড্য অনুদ্যম, ভয়, বুদ্ধির জড়তা এগুলি তমোগুণের লক্ষণ। বৈরাগ্য সত্ত্বগুণ হইতে হয়। আমরা তমোতে আচ্ছন্ন, কিন্তু বড়াই করি, বৈরাগ্যের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের; আর যাহারা রজোগুণী, তাহাদের নিন্দা করি; তাহাদের বলি,—Materialistic Civilization জড়বাদী। উদরে অন্ন নাই, কোমরে বস্ত্র নাই, পায়ে জুতা নাই, স্ত্রী-পুত্রের মুখ সর্ব্বদা মলিন, অন্তর দুঃখে দগ্ধ হইতেছে, আর বলিতেছি, আমরা অল্প ভোগেই সন্তুষ্ট, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ, আমাদের বৈরাগ্য মজ্জাগত। ইহা অপেক্ষা কপটতা আত্ম-বঞ্চনা আর নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করে না, অথচ মনে মনে বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত, সে ব্যক্তি কপটাচার।

সত্য বটে, যে অসন্তুষ্ট, সে দরিদ্র, যে সন্তুষ্ট, সে-ই ধনী। কিন্তু বাস্তবিকই কি তুমি সন্তুষ্ট? কখনই নও। তুমি উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেছ, "আর ভাই, এক রকম কোরে চলে গেলেই হোল, কটা দিন বই ত নয়।" তোমার এ সন্তুষ্টির কথা নয়, এ হতাশের কথা। "কটা দিন বই ত নয়" এটা বিষম ভুল। তোমার সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষান্তস্থায়ী, অতএব বলিতে হইবে, তুমি অনন্তকালস্থায়ী। যেমনটি আছ, ঠিক সেই রকমটি পুনরায় হইবে। আজ আমি যেমনটি আছি, নিদ্রার পর কল্যও আমি সেই রকমটি থাকিব। নিদ্রায় যেমন স্বভাব বদলায় না, মৃত্যুমোহেও তেমনই স্বভাব বদলায় না।

আর তোমার বৈরাগ্য কোথায়? তোমার হাতে যেটা আছে, সেটাতে তোমার ত বিরক্তি কিছু নাই। এ দেশে মেয়ে সস্তা, কই, মেয়েতে তোমার বৈরাগ্য ত নাই। পেটে অন্ন নাই, কিন্তু বিবাহ ত করিতেছ! আর বৎসর বৎসর ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ত ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আবার তোমার মুড়ো তেঁতুলগাছের একখানা তেঁতুল লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা প্রতিবেশীর সহিত বেশ বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত আছ! অতএব তোমার হাতে যেটা আছে, সেটাতে

ভোগেচ্ছা তোমার কম নাই, আর যেটা তোমার শক্তিতে কুলায় না, সেটিতে তোমার বৈরাগ্য। আর মনকে প্রবোধ দিতেছ, তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া আছ। তোমার এক তিলও বৈরাগ্য নাই। তোমার এ ক্লীবতা।

যে নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অন্নবস্ত্র জুটাইতে পারে না, সে পরিশ্রমের ভয়ে বৈরাগ্যের ভাণ করে, হাসির কথা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি বল, কোন উপায় নাই, তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? জান না কি, নারীরা মহামায়ার অংশ, তাঁহারা পূজা লইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বসন, ভূষণ, আহার্য্য, পানীয় দিয়া পূজা করিতে হয়। এই সব অন্নক্লিষ্টা বসন-ভূষণহীনা মহামায়াদের শ্বাসবহ্নিতে তোমার ইহকাল ত দগ্ধ হইলই, পরকালও দগ্ধ হইল। "কটা দিন" নয়। জীব অনন্তকালস্থায়ী, জীবের দায়িত্বও অনন্তকালস্থায়ী। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মা ক্লৈব্যং গমঃ" ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। তোমার এ সত্ত্বগুণ নহে, তোমার বিষম তমোগুণ। তম নাশ করিয়া রজ আন, তাহার পর সত্ত্বগুণ। সে অনেক দূরের কথা। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন,"যারা পেটের অন্ন জুটাতে পারে না, তাদের ঈশ্বরলাভ? তাদের বৈরাগ্য?"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যুবকদের বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন। বিবাহ না করিলেই গেরুয়া লইতে হইবে, এ কথা কেহ বলে না। বিবাহের দায়িত্ব বুঝিয়া বিবাহ করা উচিত। ইহাই তাঁহার কথার মর্ম্ম। যাহাদের অন্নের সংস্থান আছে বা যাহারা নিজে উপযুক্ত, তাহাদের বিবাহ করিতে কেহ নিষেধ করে না।

তাহার পর উপায়ের কথা। পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম, মস্তিষ্কচালনা করিলেই উপায় বাহির হইয়া পড়িবে। গতানুগতিক পথ অবলম্বন করা বুদ্ধিচালনা নহে। পূর্ব্বপুরুষ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিব, এ সঙ্কল্প বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। অথবা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ উপায় অবলম্বন লোকে করিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিব, এ সঙ্কল্পও বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, বর্ত্তমান কালের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, তবেই জীবন-সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারিবে। অত্যধিক পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম করিতে করিতে ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে করিতে উপায় বাহির হইবে।

প্রথম প্রথম অনেক উদ্যম নিষ্ফল হইবে, তাহাতে দমিলে চলিবে না। নিষ্ফল উদ্যম ভাবী সফলতার পথ দেখাইয়া দিবে। নিষ্ফল হওয়াও ব্যর্থ যাইবে না। কারণ, তুমি সত্যের সহিত, ন্যায়ের সহিত উদ্যম করিয়াছ, সে জন্য তোমার তমোভাব কাটিয়া গিয়াছে, তোমার রজোগুণ আসিয়াছে, ইহা তোমার মহালাভ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ হইবে, আর জয়লাভ করিলে মহীভোগ করিবে। অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে সত্যের সহিত—ন্যায়ের সহিত যদি কোন উদ্যম করিয়া থাক, আর যদি ঐ উদ্যম নিষ্ফল হয়, তাহা হইলেও তোমার তমোভাব কাটিয়া রজোগুণ আসিয়াছে, সেটা তোমার মহালাভ। তোমার ভাবী কল্যাণ নিশ্চয়। কারণ, ভিতরে মাল তৈয়ার হইয়া গেল, আর যদি সফল হও, তাহা হইলে যাহা চাহিতেছিলে, তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত, তুমি অনন্ত পথের পথিক, তোমার নাশ নাই। তুমি যাহা করিতেছ, কোনটাই ব্যর্থ নহে, সবই জমা থাকিতেছে। অতএব সকলের উচিত, ক্লীবতা ত্যাগ করা। কুড়েমী করিয়া জড় হইয়া যাইও না। জড়তা বৈরাগ্য নহে। জড়েরাই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকে। উদ্যমশীল পুরুষরাই লক্ষ্মীলাভ করে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।"

অল্পসুখ ইহলোকে অযাজ্ঞিকের অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মার স্থান নাই, আর বহুসুখ পরলোকে কি করিয়া তার স্থান হইবে?

৩। কর্ম্মের ছোট বড়।

অনেকের ধারণা, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কায খুব বড় কায; আর রাখালের গরু চরানো, কি মুদীর তেল-নুণ বেচা, কি চাকরের বাসন মাজা, খুব ছোট কায। ছোট বড় যদি ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে জজীয়তী নিশ্চয় বড় কায, আর মুটেগিরি খুব ছোট কায। কারণ, জজীয়তীতে বহু টাকা আইসে, আর মুটেগিরিতে উদরান্ন জোটান ভার। কর্ম্মের আর একটি দিক্ আছে, সেটি হইতেছে,—জগৎ মহামায়ার, কর্ম্ম-বিভাগও মহামায়ার। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

কর্ম্ম-বিভাগ তিনিই করিয়াছেন, ইহা জানিয়া যদি কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে জজীয়তী ও মুটেগিরি একই বোধ হইবে। মা যাহাকে যে কায দিয়াছেন, সে সেই কায করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিবে। জজীয়তী করায়ও যে ফল, মুটেগিরিতেও সেই ফল। জজীয়তী করিয়াও বেশী ফল হইবে না, মুটেগিরিতেও কম ফল হইবে না; কর্ম্মের এই ভাবটা স্বামীজী খুব নজরে আনিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীরা তাঁহার মঠে কেহ বাগান করিতেছে, কেহ গোয়াল সাফ করিতেছে, কেহ প্রবন্ধ লিখিতেছে, কেহ বাজার করিতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ বেদান্ত শিক্ষা দিতেছে, কেহ রোগীর সেবা করিতেছে, সকলেই জানে ঠাকুরের কায; নিজের জন্য কিছু করিতেছে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি যাহাই হউন, নিজ নিজ অধিকারবিহিত কর্ম্ম করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে; অতএব কর্ম্মের ছোট বড় নাই। সব কর্ম্মই মা'র। বেদ পড়ান, মুচির জুতা তৈয়ারী, মেথরের নর্দ্দামা সাফ, সবই মাঁ'র পূজার উপকরণ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"

কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। Work is worship। তবে কর্ম্মের একটি বিভাগ আছে, বৈধ ও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিশ্চয় খারাপ। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ অর্জ্জিত হয়। নিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু আবার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্ম করিতে গেলে কিছু না কিছু পাপ আছেই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত; যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকিবে। নির্ধূম পাবক যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অপাপস্পৃষ্ট কর্ম্মও অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগ বিধেয় নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"

তোমার জন্মের সঙ্গে কর্ম্মেরও জন্ম হইয়াছে। সেজন্য কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না।

৪। দীনহীন ভাব।

ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া জুতা দেখিলেই ঠাকুর চটিতেন। কারণ, এগুলি তমোভাবের পরিচয়। সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট চটপটে ভাব রজোগুণের পরিচয়। কাহারও কাহারও ধারণা, দীনহীন ভাব খুব ধর্ম্মের লক্ষণ। দীনহীন ভাবটা অতি খারাপ জিনিষ। স্বামীজী বলিতেন, "আমি কিছু না—কিছু না মনে কর্‌তে কর্‌তে সত্য সত্যই কিছু নয় হয়ে যায়।" নিরহঙ্কার ও দীনহীন ভাব এক জিনিষ নহে। মহাভারতে আছে,কর্ণ যখন রথী হইলেন, শল্য তাঁহার সারথি হইলেন; শল্য একটু বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবরা না-ও পারিয়া উঠিতে পারেন। তিনি মৎলব করিয়া কর্ণের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাধেয়, তোমার আবার শৌর্য্যবীর্য্য কি?" কর্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন, শল্য কিন্তু কিছুতেই থামিলেন না; অনবরত "তুমি রাধেয়, তোমার আবার কিসের শৌর্য্যবীর্য্য? অর্জ্জুন তোমা অপেক্ষা ঢের বড়" এইরূপ নিন্দা করাতে রণক্ষেত্রে কর্ণের বাস্তবিক শৌর্য্যবীর্য্যের হ্রাস হইয়া গেল, এবং ভুল হইতে লাগিল। নিন্দাবাদে তেজের হ্রাস হয়। কাহাকেও যদি রাত্রিদিন বলা যায়, "তুমি কিছু নও—তুমি কিছু নও," দিনকতক পরে তাহার মনে হয়, সত্যই আমি কিছু নই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাত্মানমবসাদয়েৎ।"

নিজেকে সেইরূপ দীন ভাবিতে নাই। উহাতে নিজের শক্তির হ্রাস হয়। ঠাকুর বলিতেন,—"সর্ব্বদা যে পাপী পাপী ভাবে, সে পাপী হয়ে যায়। যে সর্ব্বদা বদ্ধ বদ্ধ ভাবে, সে বদ্ধ হয়ে যায়। যে সর্ব্বদা মুক্ত মুক্ত ভাবে, সে মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।" আরও বলিতেন,—"সর্ব্বদা মুক্তাভিমান খুব ভাল।"

৫। শান্তি।

কেহ কেহ বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে লোকের বড় শান্তি ছিল। জমীতে ধান, পুকুরে মাছ, বাটীতে গাভী, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইত না; লোক পায়ের উপর

পা দিয়া বসিয়া খাইত। হাঁ! তখন জুতা-জামার রেওয়াজ ছিল না, আট হাতি একখানা কাপড়েই চলিত। এক্ষণে জুতা পরিতে হয়, জামা গায়ে দিতে হয়। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজে যাইতে হয়। বড় হইলে আফিস, আদালত, দোকান, কারখানায় যাইতে হয়। তাস, পাশা, দাবা, বার-ওয়ারির বাঁশ কাটার অবসর নাই। বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। প্রকৃতির আনুকূল্যে পেন্সন ভোগ করাটাই শান্তি বলিয়া এ দেশের সাধারণের ধারণা। দীর্ঘকাল এইরূপ জীবন যাপন করিয়া তাহারা একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে। একে-বারে ভুল হইয়া গিয়াছে,এটা কর্ম্মক্ষেত্র, খাটিবার জন্য এখানে আসা। জীবন মানে কর্ম্ম; বিশ্রাম মানে নিদ্রা বা মৃত্যু। যে দিন হইতে যুরোপীয় জাতির সহিত সন্নিকর্ষ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তোমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তোমার বহু শতাব্দীর তমোনিশা ধীরে ধীরে যাইতেছে। বর্ত্তমানে একটু রজো দেখা দিয়াছে। চেষ্টা, উদ্যম, সাহস একটু একটু আসিতেছে। এই রজোগুণকে Materialistic (জড়বাদ) বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম হইবে। যদি বল, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা তোমার ভুল। তোমার পূর্ব্বমীমাংসা এই রজোগুণবৃদ্ধি ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছে। যদি বল, অপর প্রবল জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। কর্ম্ম বা প্রতিযোগিতায় ভয় পাইলে চলিবে কেন? কাপুরুষ ক্লীবরাই ভয় পায়। সত্যের সহিত—ন্যায়ের সহিত সাহস, উদ্যম, বুদ্ধিচালনা করিলে সব বাধা চূর্ণ হইয়া যাইবে, ভগবান্ সহায় হইবেন। বিশেষতঃ তোমার বেদই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"

এই জীবই সর্ব্বেশ্বর—এই জীবই সর্ব্বজ্ঞ।

তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে, তোমার সব জানা আছে। তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া বলিতেছ, তুমি নিরুপায়। তোমার শক্তি—তোমার বুদ্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে, চেষ্টা কর, সব শক্তি প্রকট হইবে। অপর জাতি সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে বলিয়া কেবল ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন? তাহারা কত পরিশ্রম—কত উদ্যম করিয়া এই সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। তুমি বসিয়া বসিয়া সেই সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? তুমি যখন নিশ্চিন্ত মনে বহু শতাব্দী ধরিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইয়াছ, তখন এই সব জাতি প্রাণের মায়া না করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মায়া না করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। কিসে বাণিজ্যবিস্তার হয়, কোথায় যাইলে সুবিধা হয়, এই সব চিন্তা করিতে করিতে মাথা কুটিয়া ফেলিয়াছে। নীরবে কত জীবন সমুদ্রগর্ভে—বিদেশে—জঙ্গলে উৎসর্গ করিয়াছে, তাই তাহাদের বংশাবলী আজ সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। তাহাদের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় তুমি বলিতেছ, ওরা Materialistic (জড়বাদী) আর আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রকৃতির আনুকূল্যে নির্ব্বিঘ্ন সমাধা করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি খুব Spiritualistic (অধ্যাত্মপর) ছিলে। দুই এক জন ঠাকুরকে দোষ দিত, তিনি রজোগুণী লোককে ভালবাসেন, তাহাদের বাড়ীতে যায়েন। কিন্তু, তাহারা উদ্যমশীল, তাহাদের লক্ষ্মীশ্রী আছে, তাহাদের ঈশ্বরকথা দুই একটা বলিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে। তুমি লক্ষ্মীছাড়া, তমোচ্ছন্ন, তুমি মুখে 'হরি হরি' বলিলেই তোমার কি সত্বগুণ আছে বুঝিতে হইবে? মেয়েমানুষ তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। ঠাকুর অন্তর্দ্দর্শী, ঠাকুর তোমাকে কি ধর্ম্মকথা বলিবেন? তুমি তমোভাব ছাড়িয়া যাহাতে লক্ষ্মীশ্রী হয়, তাহার চেষ্টা আগে কর, তাহার পর ঈশ্বরকথা শুনিও। রজোদ্বারা আগে তম নাশ কর, তাহার পর সত্বগুণ বুঝিবে। ঠাকুর বলিতেন, "আচ্ছা, তবে নরেন্দ্রকে ভালবাসি কেন?" তাহার মানে নরেন্দ্র বালব্রহ্ম-চারী, তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য, তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা, তিনি শুদ্ধ সত্ব। এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ঈশ্বরকথা বলিলে তাঁহার ধারণা হইবে। তাঁহাকে শান্তি উপদেশ দিতেন। শান্তি ভোগে হয় না, শান্তি ত্যাগে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ত্যাগাৎ শান্তিঃ"

ত্যাগেই শান্তি। তাহা বলিয়া শান্তি জড়ের প্রাপ্য নহে। যাহারা জড়, তাহাদের শান্তিমার্গে অধিকার নাই; তাহাদের কর্ম্মমার্গে অধিকার।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

বলহীন জড়দের শান্তিলাভ করিবার অধিকার নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥"

নদ-নদী সমুদ্রে পড়িয়া যেমন বিলীন হয়, সেইরূপ যে মহাত্মা সমুদ্র-সদৃশ, তাঁহার মনে কাম সব বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তিলাভ করেন; ভোগ-কামনাশীল ব্যক্তি কখনও শান্তি-লাভ করে না।

৬। যুগ-নীতি বা জীবন-নীতি।

কেহ কেহ মনে করেন, পেটে দুইটি খাইতে পাইলে ও এক-খানা মোটা কাপড় হইলেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বেশী হাঙ্গামাতে দরকার কি? সাঁওতাল, টিপরা, ওরায়ন, গারো, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ত তাহাই যথেষ্ট ভাবে। আবার সেই দুইটি পেটের অন্ন ও মোটা কাপড় যোগাড় করাও কম ব্যাপার নহে। Plain Living High Thinking সাদা-সিধে চাল আর উচ্চচিন্তা খুব ভাল জিনিষ বটে, কিন্তু দেশ-শুদ্ধ লোকের সেটা কি সম্ভব? বিশেষতঃ পৃথিবীর হাওয়া এখন পরিবর্ত্তিত। সাধারণকে যুগ-নীতি Standard of the age মানিয়া চলিতেই হইবে। যিনি তেজস্বী মহাপুরুষ, তিনি যুগ-নীতি না মানিতে পারেন। কিন্তু সাধারণকে মানিতেই হইবে, না মানিলেই নাশ হইবে। তুমি শান্তশিষ্টভাবে ভগবানের নাম করিয়া জীবন-যাপন করিবে, কিন্তু ভারতেতর জাতিরা তোমাকে সেভাবে থাকিতে দিবে কেন? সমগ্র পৃথিবীতে যদি শান্তশিষ্ট লোক হয়, তাহা হইলে শান্তশিষ্টভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা ত নহে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় করিতে গেলেই অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য্য। সেই দ্বন্দ্বের উপযুক্ত হওয়া চাহি। তিন দিকে সমুদ্র, আর এক দিকে দুর্গম গিরি, বহিঃশত্রুর প্রবেশের পথ নাই,—সে ভারতবর্ষ আর নাই। দুর্গম হিমালয়ের স্থানবিশেষে ঋষির আশ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারত ঋষির আশ্রম Monastery নহে—ক্ষাত্রবল, বৈশ্যবল, শূদ্রবল একান্ত প্রয়োজন; তবে ব্রাহ্মণবল পরিরক্ষিত হইবে। ভগবান্ কর্ম্মযোগ সে জন্য ক্ষত্রিয়কে বলেন,—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।"

ক্ষাত্রবলের হ্রাসহেতু দেশে রাজশক্তির অভাব, বৈশ্যবলের হ্রাসহেতু বাণিজ্যশক্তির অভাব, শূদ্রবলের হ্রাসহেতু শ্রমশক্তির অভাব। ধর্ম্মশক্তি, রাজশক্তি, বাণিজ্যশক্তি, শ্রম-শক্তি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সহায় বুঝিতে হইবে। সমাজের বা দেশের এই চতুরঙ্গ বলের একটি বলের হ্রাস হইলে সে দেশ পতিত হইবেই। রাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, শ্রম-নীতি ত্যাগ করিয়া দেশশুদ্ধ লোক ধর্ম্ম-নীতির ছোব্‌ড়া লইয়া থাকিলে সে দেশ 'যাদশাপন্ন' হইবেই। কালের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-নীতি ও সমর-নীতির উৎকর্ষ হইতেছে, বাণিজ্য-নীতির উৎকর্ষ হইতেছে, শ্রম-নীতিরও উৎকর্ষ হইতেছে। আমরা যদি কালের সঙ্গে যাইতে না পারি, আমরা পশ্চাতে থাকিব। অন্যান্য দেশের মনীষীরা শাসন-নীতির—সমর-নীতির কিসে উৎকর্ষ হয়, কিসে পরিপুষ্টি হয়, রাত্রিদিন চিন্তা করেন; বাণিজ্য-নীতির কিসে উন্নতি হয়, রাত্রিদিন চিন্তা করিতেছেন; শ্রম-নীতির কিসে উৎকর্ষ হয়, রাত্রিদিন চিন্তা করেন। আর ভারত এ সব "লুপ্তবিদ্যা" বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। কাযেই ভারতের এই দুর্দ্দশা। ভারতের রাজ-নীতির উৎকর্ষ "আমি ক্ষত্রিয়বর্ণ," বাণিজ্যের উৎকর্ষ "আমি বৈশ্যবর্ণ," শ্রম-নীতির উৎকর্ষ "আমি অস্পৃশ্য," ধর্ম্ম-নীতির উৎকর্ষ "আমি ব্রাহ্মণ—পূজ্য" ইহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া কেবল জাতিবিচারে দাঁড়াইয়াছে। ভারতে ব্রাহ্মণশক্তি নাই, ক্ষত্রিয়শক্তি নাই, বৈশ্যশক্তি নাই, শূদ্রশক্তি নাই; তাই ভারত আজ অন্ন-বস্ত্রের জন্য পর-মুখাপেক্ষী।

সম্মুখে ভীষণ সমর দেখিয়া ভয় পাইলে কি চলে? তুমি যদি ও সব না লও, তোমাকে আরও শূদ্র হইতে শূদ্রতম হইতে হইবে। ভারতেতর জাতির রাজনীতি বা সমর-কৌশল তোমাকে লইতেই হইবে—তাহাদের বাণিজ্য-কৌশল তোমাকে লইতেই হইবে—তাহাদের শ্রম-কৌশল তোমাকে লইতেই হইবে। জগতের অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। তবে একটি কথা হইতেছে, শুধু বৈদেশিক সমর-নীতি লইলে চলিবে না—শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি লইলে চলিবে না—শুধু বৈদেশিক শ্রম-নীতি লইলে চলিবে না। তোমার নিজস্ব ধর্ম্ম-নীতির সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে তোমার স্বাতন্ত্র্য—নিজস্ব বজায় থাকিবে।

Standard of the age যুগনীতিতে পশ্চাতে থাকাতেই তোমার এই দশা। পশ্চাতে পড়িলে তোমাকে পড়িয়া যাইতেই হইবে—আরও পড়িয়া যাইবে। কেহ হ্যাটকোট পরিতে বলে না

বা ব্রাণ্ডী বীফ্ খাইতে বলে না বা খেতাঙ্গনা বিবাহ করিতে বলে না ; তবে ভারতেতর রাজনীতি—ভারতেতর বাণিজ্যনীতি —ভারতেতর শ্রমনীতি শিখিতে বলা হইতেছে। কারণ, তুমি নিজস্ব রক্ষা করিতে পারিতেছ না। কেবল ঋষির সন্তান, প্রাচীন সভ্যতা (Ancient Civilization) বলিয়া ঘরে দ্বার দিয়া বসিয়া থাক, হয় সৃষ্টি-প্রকরণ প্রভৃতি কতকগুলা কথা লইয়া থাক, আর নহে ত প্রত্নতত্ত্ব লইয়া থাক, অতীত লইয়া থাক, আর জগতের লোক বর্ত্তমান লইয়া থাকুক। তাহা হইলে তোমার বেশ কল্যাণ হইবে! বিদেশী ভাব বর্জ্জন নয়; বিদেশী ভাব গ্রহণ করিবার এখনও ঢের আছে, কিছুই হয় নাই। তোমার চক্ষুর সম্মুখে জাপান বিদেশী ভাব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া আজ পাঁচ জনের এক জন হইয়াছে। তাহারা Standard of the age যুগনীতি ধরিতে পারিয়াছে। যদি বল, যুগনীতি—Srandard of the age খুব খারাপ আদর্শ—Ideal। খারাপ হইলে করিবে কি ?

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"

তুমি এ কালে জন্মিয়াছ কেন ? জন্ম বন্ধ রাখিতে পার নাই ? যখন জন্মিয়াছ,সহজ অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এ কালের কর্ম্ম উপস্থিত রহিয়াছে ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপস্থিত। সে সব কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে, না করিলেই মৃত্যু। ভগবান্ বলিয়াছেন, যে কালের যে কর্ম্ম হাজির, সে কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও করিতে হইবে। কাল তোমার গড়া নহে, কাল আর এক জনের গড়া। তিনিই জানেন, কোন্ কালের কি কর্ম্ম ঠিক্। তুমি ভারতেতর ভাব বর্জ্জন করিয়া মনে করিতেছ খুব লাভ করিবে ? কিন্তু উৎকৃষ্ট শক্তির কাছে নিকৃষ্ট শক্তির চিরদিন বশে থাকিতেই হইবে। এই সব বর্জ্জন করিয়া দাসত্বের বন্ধন মোচন হওয়া দূরের কথা, আরও দৃঢ় হইবে।

অনেকে ভারতে অভাব, অনাটন, দুঃখ, দারিদ্র্য দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের এই অভাব-অনাটন বৃথা যাইবে না। এই বর্ত্তমান অমঙ্গলের মধ্যে ভাবী মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। ইহা হইতে এমন রজোগুণ আসিবে,যাহাতে ভারত অন্য রকম হইবে। এই অভাব-অনাটন দুঃখ-দারিদ্র্য ভারতের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিবে। ভারতের তম দূর হইবে, রজ আসিবে। ভারত-মাতার উপস্থিত তেমন সোনার খনি, রূপার খনি, লোহের খনি, টিনের খনি, কয়লার খনি, ধন-দৌলত নাই বটে, কিন্তু ভারত-মাতার প্রধান রত্ন তাঁহার ত্রিশ কোটি সন্তান। এই ত্রিশ কোটি সন্তান তমোচ্ছন্ন—নিদ্রামগ্ন। ইহারা জাগিলে ভারতের চেহারা অন্য রকম হইয়া যাইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, কেবল হল্লা করা জাগান নহে। কোন্ কর্ম্মের কি ফল, শান্তভাবে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট কঠিন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করানই জাগান ; কারণ, নিয়মিত প্রণালীতে না চালাইতে পারিলে কর্ম্মের ফল হয় না। এজন্য পূজ্যপাদ স্বামীজী ভারতে রজোগুণের পক্ষপাতী ছিলেন।

কর্ম্মশক্তি ভগবান্ চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন,—ধর্ম্মশক্তি, রাজশক্তি, বাণিজ্যশক্তি ও শ্রমশক্তি। এই এক একটি শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কোন্ কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কোন্ কোন্ শক্তি জাগান যায়, ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম ; এইগুলি ব্রাহ্মণকর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, রণ-কৌশল, যুদ্ধে অপলায়ন, ঔদার্য্য, নিয়মনশক্তি ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম ; এইগুলি ক্ষাত্রকর্ম্ম। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই কর্ম্ম ; এইগুলি বৈশ্যকর্ম্ম। পরিচর্য্যাও কর্ম্ম ; এইটি শূদ্রকর্ম্ম। এই এক একটি কর্ম্ম জাগাইলেই কর্ম্মজসিদ্ধি হইবে।

"ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।"

কর্ম্মজসিদ্ধি মানুষলোকেই শীঘ্র হয়।

কালের ইঙ্গিত লইতেই হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে যাহা চলিবে, সেটা চলিতে দিব না, এরূপ একঘরে (exclusive) হওয়ার বুদ্ধিতেই দেশের এই দুরবস্থা। 'কাণা গোরুর ভিন্ন গোঠ' করিয়া লাভ কি ? সর্ব্ববিষয়ে ভারতেতর জাতির সহিত নিজের স্বাতন্ত্র্য জাতীয়তা বজায় রাখিয়া মিশিতে হইবে এবং যে সব বিষয়ে ভারতবাসী হীন, সে সব বিষয় শিখিতে হইবে। জীবন-সংগ্রামে একটি অখণ্ডনীয় নীতি অনুসরণ করা চলে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে যখন যাহা দরকার, তাহাই করিতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রকৃতি পরিণামী, পরিবর্ত্তনশীলা; সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নীতিরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জীবন-নীতি যুগনীতির অনুযায়ী হইবে।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

অজিতা।

১

"অজিতা ?"

"আজ্ঞে।"

"আমাকে ক্ষমা ক'রো।"

বলিতে বলিতে হরিহরবাবু আরক্ত চক্ষুর ব্যথিত দৃষ্টি অজিতার মুখের উপরে স্থাপিত করিলেন—দুর্ব্বল কম্পিত হস্তখানি তুলিয়া তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন। মুখ এক দিকে একটু ফিরাইয়া লইয়া, হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া আবার পাখা নাড়িতে নাড়িতে অজিতা কহিল, "আপনি চুপ করুন, শান্ত হয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

"শান্ত হ'তেই যে পারছি না, অজিতা।" হরিহরবাবু গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"ডাক্তারবাবু কথা বলতেই আপনাকে নিষেধ করেছেন।"

"মন শান্ত হবার ওষুধ ত তাঁ'রা দিতে পারেন না। মুখের দুটো কথা—"

"চুপ করুন। চুপ করুন।—মাথা আবার গরম হয়ে উঠ্‌বে।" এক হাতে তাড়াতাড়ি পাখা করিতে করিতে আর একখানি হাত অজিতা হরিহরবাবুর কপালের উপরে রাখিল।

"আঃ!" স্নিগ্ধ কোমল হস্তের স্পর্শে হরিহরবাবু যেন বড় মধুর আরাম অনুভব করিলেন।

অজিতা কহিল, "এখন একটু ঘুমুন দেখি।"

"ঘুমোব! মনটা আগে শান্ত ক'রে দেও। বল, আমাকে ক্ষমা করবে।"

অজিতার চক্ষুতে জল আসিল। অতি আয়াসে কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "আপনার ত কোনও অপরাধ হয়নি। কি ক্ষমা করব?"

"এই বয়সে রুগ্নশরীরেও রূপমুগ্ধ হয়ে লালসার তাড়নায় তোমাকে বিবাহ করেছিলাম—"

"কিন্তু বিবাহ দিয়েছিলেন আমার বাবা।"

"হাঁ—আমার চেয়েও তাঁ'র অপরাধ বড়—অনেক বড়! কিন্তু তবু—আমি ত চেয়েছিলাম—অনেক টাকার দেনায় তিনি আমার হাতে বাঁধা ছিলেন—"

"চুপ করুন। এখন আর ও কথা কেন? ও সব ভাব্‌বেন না কিছু। অসুখ বেশী হবে।"

"অসুখ!—বেশী আর কি হবে? আমি ত চলেছি। দুই এক দিনের আগু-পিছু,—তা'তে কি এসে যায়?"

"না, না! আপনি সেরে উঠ্‌বেন—"

"সেরে উঠ্‌ব! না। আর তা উঠ্‌ব না।—কেউ আর আমাকে ওঠাতে পার্‌বে না।—যাবার আগে কেবল মনটা একটু হাল্‌কা ক'রে যেতে চাই।"

শেষের কথা কয়টি একটু জড়াইয়া আসিল, চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইয়া পড়িল—এই উত্তেজনাটুকুর প্রতিক্রিয়ায় হরিহরবাবু হঠাৎ যেন বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।—মাথায় অডিকলোনের জল দিয়া অপরাজিতা দ্রুত পাখা নাড়িতে লাগিল। একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল,—নিঃশ্বাস—ক্ষীণ হইলেও—নিয়মিত পড়িতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা গেল,—হঠাৎ হরিহরবাবু নড়িয়া উঠিলেন; শিথিল অবসন্ন দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "উঃ! একটু জল!"

কয়েক চামচ জল অজিতা তাঁহার মুখে দিল, তাহার পর ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। দিই?"

"দেও।"

অজিতা উঠিয়া যাইয়া ঔষধ আনিয়া একটু একটু করিয়া রোগীর মুখে ঢালিয়া দিল।

জলপান ও ঔষধ সেবনের পর হরিহরবাবু একটু যেন সবল বোধ করিলেন। কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, যেন কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া শেষে তিনি কহিলেন, "হাঁ, তোমার বাবার অপরাধ বড় বেশী——"

"চুপ করুন, চুপ করুন! একটু সুস্থ বোধ করছেন—"

"হাঁ, তাই কথা কয়টি বলতে এখনই চাই।—হয় ত আর পারব না।—না, বাধা দিও না, নিষেধ ক'রো না,

অজিতা। মনটা হাল্কা হ'লেই একটু স্বস্তি বোধ কর্‌ব, তখন—"

বলিতে বলিতে তিনি আবার হঠাৎ থামিয়া গেলেন; আর একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! শেষ দুটো কথা বল্‌তেও দেবে না, কাল! নিচ্ছই ত, নিও—নিও,—এখনই নিও! কিন্তু মনটা বড় ভারী,—একটু হাল্‌কা ক'রে নিতে দেও?"

মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া অজিতা জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।—হঠাৎ হরিহরবাবু চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন,—হাত তুলিয়া অজিতার হাতখানি ধরিলেন;—কহিলেন, "চুপ। কিছু ব'লো না,—নিষেধ ক'রো না, কথা কয়টি আমাকে ব'ল্‌তে দেও। হাঁ, তোমার বাবার অপরাধ খুব বেশী। ঢের দেনা ব্যবসার খেয়ালে ক'রেছিলেন। না হয় সব যেতো, নিজে জেলে যেতেন, কিন্তু তোমাকে এভাবে আমার মত রুগ্ন বৃদ্ধ লম্পটের লালসায় বলি দেওয়ার কোনও অধিকার তাঁর ছিল না।"

অজিতার চক্ষুতে জল আসিল, মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, "আমি ত আপত্তি করিনি!"

"সে তোমার মহত্ব! আমি আজ তাই আরও পরিতপ্ত। হাঁ, নির্ম্মম পিতা নিজের স্বার্থে এমন দেববালার ন্যায় কন্যা তোমাকে বলি দিয়েছেন। কিন্তু আমি কেন সে বলি দাবী ক'রেছিলাম! তাঁ'কে রেহাই দিলেও ত পার্‌তাম। আজ ত সব ফেলে যাচ্ছি,—ধন ভোগ-লালসা সব। নিয়ে যাচ্ছি কেবল—উঃ! না! আর পারিনে। অনেক পাপ জীবনে করেছি, সবাই করে—। ভাব্‌তাম না! কিন্তু শেষজীবনের এই মহাপাপ—"

চক্ষু মুছিয়া অজিতা কহিল, "ভগবানের পায়ে মন রাখুন,—তিনি শান্তি দেবেন।"

"দেবেন? দেবেন? দেবেন ত? তুমি ব'ল্‌ছ, অজিতা! দেবেন?—আঃ!"

বলিতে বলিতে হরিহরবাবু আবার অবসন্নভাবে চক্ষু মুদিলেন।

আরও কিয়ৎকাল গেল, হরিহরবাবু আবার একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। একটু হাঁ করিলেন,—অজিতা মুখে দুধ দিতে গেল। হরিহরবাবু মাথা নাড়িলেন, অজিতা জল দিল,—তিনি কয়েক চামচ পান করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থও তখন তাঁহাকে বোধ হইল। ধীরে ধীরে অজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ছেলেদের খবর পাঠাব?"

"না।"

"পাঠালে—ভাল হ'ত।"

"না। এখন নয়—"

"কখন্ তবে?"

"পরে।—যদি তা'রা আসে ভাল, নইলে একটু আগুন—সে তুমিই দিও।—"

"তাঁদের কি দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না?"

দুটি চক্ষুর কোণ হইতে দুইটি অশ্রুধারা নামিল। কোমল হস্তে অজিতা তাহা মুছিয়া দিল। আবার অশ্রু পড়িল,—আবার অজিতা মুছিল, আবার পড়িল।

অজিতা কহিল, "কেন নিষেধ কর্‌ছেন? তাঁদের খবর পাঠাই, তাঁ'রা আসুন।"

"না, এ মুখ তাদের আর দেখাব না! দেখাতে পারি না!"

"কেন? বাধা যা আছে, দূর করুন। এখনও সময় আছে।"

"সময় হয় ত আছে, অধিকার নাই। আমি পণে বদ্ধ। না, আর ওসব কথা তুলো না, অজিতা! আনন্দ কিছু আর চাই না, শান্তি—শান্তি—একটু শান্তি—"

তিনি আবার চক্ষু বুজিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল স্থিরদৃষ্টিতে অজিতা চাহিয়া রহিল, হঠাৎ তাহার কেমন একটা ভয় হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের দিকে একটি দরজা খুলিল। ডাক্তার ও অন্য দুই চারি জন লোক সেখানে বসিয়া ছিলেন। ইসারা করিয়া অজিতা ডাক্তারকে ডাকিল। পা টিপিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিলেন। নিশ্বাস, নাড়ী ও শরীরের তাপ পরীক্ষা করিলেন, ললাট ও ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ক্ষিপ্র-চরণক্ষেপে পাশের সেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কয়েকটি শিশি বাহির করিয়া তিনি একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিলেন। অজিতা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, ঔষধটি লইয়া ধীরে ধীরে স্বামীর মুখে ঢালিয়া দিল।

তাহার পর রোগীকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখা গেল। দরজার বাহিরে পুরাতন ভৃত্য দেবনাথ অপেক্ষা করিতেছিল, রোগীর কাছে আসিয়া তাহাকে একটু দাঁড়াইতে ও হাওয়া করিতে ইঙ্গিত করিয়া অজিতা পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

২

"ডাক্তারবাবু!"

"এই যে আসুন। আপনি অস্থির হবেন না। হাঁ, দেখুন—রাত অনেক হ'ল, একা আর কত পারবেন? বরং গিয়ে এখন একটু বিশ্রাম করুন, আর কেউ গিয়ে কাছে একটু বসুক—"

মাথা নাড়িয়া অজিতা কহিল, "না, আমার ক্লেশ কিছুই হ'চ্ছে না। একটু জাগেন যখন, আমাকেই ডাকেন।"

"তা বটে—তা বটে—তবে—"

"ওঁর অবস্থা এখন কেমন দেখ্‌লেন?"

"অবস্থা কি—জানেন বড্ড—ক্রাইসিস্ (Crisis)ই যাচ্ছে কি না! তা আপনি অস্থির হবেন না। রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে—"

"সে সম্ভাবনা বিশেষ আছে কি?"

ডাক্তার ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "দেখুন, সব ভগবানের হাত—"

"আমি ওঁর ছেলেদের একটা খবর দিতে চাই—"

পাশেই প্রবীণ বয়স্ক একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। নাম মহিমবাবু, রোগীর বৈষয়িক কর্ম্মাদির পরিচালনার প্রধান ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি কহিলেন, "সেটা ত ওঁর ইচ্ছা নয়, মা?"

"জানি। তবু তাঁদের একবার খবর দিতে আমি চাই।"

"আপনি যদি বলেন—"

"হাঁ, আমি বল্‌ছি। আপনি এখনই তাঁদের খবর পাঠান। ব্যারামের কথাও ত তাঁ'রা জানেন না। এখনই একটা চিঠি লিখে দিন। লিখে দিন, উনি মুমূর্ষু, অবিলম্বে তাঁ'রা চ'লে আসুন। মোটর তৈরী আছে। এখনই চিঠি নিয়ে কেউ যাক্।"

মহিমবাবু উঠিয়া গিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। কাগজ-কলম লইয়াই ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাবাকেও তবে খবর পাঠাই?"

"না।"

"তিনি কি বল্‌বেন?"

"না। দরকার নেই, তাঁ'কে খবর দেবেন না।"

অজিতার চোখ মুখ ভরিয়া কেমন একটা উত্তেজনার রক্তোচ্ছ্বাস উঠিল। তখনই আবার আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে সে কহিল, "না, আর কাউকে খবর দেবার কোনও দরকার নেই। শুধু ওঁর ছেলেদের কাছে এখনই লোক পাঠান।"

বলিয়াই অজিতা আবার রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল, ভৃত্যের হস্ত হইতে পাখাখানি টানিয়া নিল। দেবনাথ চক্ষু মুছিতে মুছিতে এক পাশের দিকে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অজিতা একবার চাহিয়া দেখিল; তাহাকে আর বাহিরে যাইতে বলিতে পারিল না।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল চলিয়া গেল। বাহিরে গাড়ী-বারান্দায় ভস্ ভস্ শব্দে কয়খানি মোটর আসিয়া লাগিল। অজিতার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল। প্রবল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। দেবনাথ দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

সিঁড়িতে মৃদু অথচ দ্রুত বহু পদশব্দ উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল, সকলে পাশের গৃহে প্রবেশ করিল। অজিতাও দরজা খুলিয়া তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঘর ভরিয়া গিয়াছে,—দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ঘর একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অজিতা একবার চাহিয়া দেখিল। লজ্জায়, দুঃখে তাহার মুখখানি নত হইয়া পড়িল। হায়, এ যে চাঁদের হাট! কি লোভে উনি সব ছাড়িয়া অভাগী কেবল তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। মনে হইল, ইহাদের কাছে অপরাধী আজ কেবল সে! সে-ই বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে তাঁহার এই উজ্জ্বল চাঁদের বাজার আঁধার করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! একবার চাহিয়াই সে মুখ নত করিল, চোখ তুলিয়া আর চাহিতে পারিল না। আগন্তুকরাও নীরবে অজিতার দিকে চাহিল। এই মোহিনীই তাহার যাদুবলে না, না, এত মোহিনী নয়, এ যে মহিমময়ী দেবী! আর যদি সামান্য মানবী হয়, তবে হায়, আজ কি অভাগী! কতক শ্রদ্ধায়, কতক করুণায় মিশ্রিত দৃষ্টিতে সকলে অজিতার দিকে আজ চাহিল, ইহার নামে এতদিন তাহারা সহস্র অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছে।

নতমুখে ডাক্তারের কাছে যাইয়া মৃদুস্বরে অজিতা কহিল, "ওঁরা এখন ওঘরে যেতে পারেন তবে?"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দরজা খুলিয়া দিয়া অজিতা সরিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, মুমূর্ষুর শয্যার চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

মিনিট পনের গেল, হরিহরবাবু একটু নড়িয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে ক্ষীণজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "ও কারা!—কারা সব এসেছে!—বাঃ!"

অজিতা কাছে আসিয়া মুখ একটু নীচু করিয়া কহিল, "চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখুন।"

হরিহরবাবু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন,—মুখ ভরিয়া কেমন একটা আনন্দের দীপ্তি ভাতিয়া উঠিল,—কিন্তু তখনই সে মুখখানি একেবারে নিষ্প্রভ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। শিথিল নয়ন দুইটি মুদিত হইয়া পড়িল, দুইটি অশ্রুধারা গড়াইয়া নামিল।

তাহার পর—তাহার পরেই—কাল তাহার কাল ছায়ার মধ্যে মরজগতের একটি বিভ্রান্ত জীবনকে টানিয়া নিল।—সেই ছায়ার আড়ালে অমৃতলোকের আলোর আনন্দ, বিরামের শান্তি এই ব্যথিত বিভ্রান্ত জীবের ভাগ্যে ঘটিল কি? সেই লোকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কর্ম্মফলদাতা ধর্ম্মরাজ যিনি, তিনিই জানেন।

৩

"আপনি আমাদের ডেকেছেন?"

"হাঁ, বসুন।—" সম্ভ্রমে অজিতা উঠিয়া হরিহরবাবুর পুত্রদ্বয় নরেশবাবু ও বীরেশবাবুকে বসিতে আসন দিল।—নীরবে তাঁহারা দুই জনে বসিলেন।

"তা—কি প্রয়োজনে আমাদের ডেকেছেন?"

অতি সঙ্কুচিতভাবে অজিতা কহিল, "উনি অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন—"

"হাঁ, শুনেছি তাই।"

"ওঁর উইলের কথাও শুনেছেন?"

"হাঁ, শুনেছি। সব সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

"বিবাহের সময় আমার পিতার কাছে এইরূপ পণ না কি উনি করেছিলেন—"

"আমাদের সঙ্গে ও সব কথার আলোচনার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

অজিতা উত্তর করিল, "তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেছেন। যা'ই ক'রে থাকুন, কোনও অসন্তোষ আমার কি আপনাদের কারুরই আর তাঁ'র সম্বন্ধে মনে রাখা উচিত হবে না।—"

বীরেশ কহিল, "আপনার সম্বন্ধে—আপনি যা উচিত মনে করেন, করবেন। তবে আমাদের সম্বন্ধে—সে যা'ই হ'ক, এই উপদেশ দেবার জন্যই কি আমাদের ডেকেছেন?"

"না। তা'র কি অধিকার আমার আছে? তবে—হাঁ, আমার সম্বন্ধে শেষ কর্ত্তব্য যা তিনি মনে করেছিলেন, ক'রে গেছেন। এখন আমার কর্ত্তব্যও আমাকে করতে হবে। এই তাঁর উইল।"

উইলখানি অজিতা সপত্নীপুত্রদ্বয়ের সম্মুখে সরাইয়া দিল।

নরেশ কহিলেন, "ও আর দেখে আমরা এখন কি করব?"

অজিতা উইলখানি আবার তুলিয়া লইল,—ছিঁড়িয়া দুই ভাগ করিয়া একটি দিয়াশলাই জ্বালাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল;—দপদপ করিয়া ছিন্ন কাগজখণ্ডগুলি জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

অজিতা কহিল, "উইল ঐ গেল,—আপনাদের পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন আপনারা!"

বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দুই ভাই চাহিয়া ছিলেন।—নরেশ শেষে কহিলেন, "ও কি করলেন আপনি?"

"ঠিকই করেছি। আপনারা তাঁ'র বংশধর,—সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী,—আমি কে যে বিপুল এই সম্পত্তি অধিকার ক'রে থাকব!"

"আপনি তাঁ'র স্ত্রী—"

"যা'ই হই, কোনও অধিকার আমার আছে ব'লে নিজে আমি মনে করি না।"

"কেন তা করবেন না? স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে আপনি প্রতিপালিত হ'তে পারেন, অন্ততঃ এ দাবী আপনার আছেই।—উইল আপনি নষ্ট ক'রে ফেল্লেন। তবে আর কিছু লেখাপড়া কি বন্দোবস্ত যদি থাকে—"

অজিতা উত্তর করিল, "জানি না। জানবার দরকারও কিছু নাই। দাবী? না, দাবীর কোনও কথা আর তুলবেন না।—দাবী আমি কিছুরই করি না, করব না। অলঙ্কার ত আমাকে অনেক দিয়েছিলেন, বউমা'দের দিয়ে দিচ্ছি, তাঁ'রা পরবেন, আমি সুখী হব।—" বলিতে বলিতে অজিতা থামিয়া গেল; যেন আর বলিতেই পারিল না।

নরেশ কহিলেন, "কিন্তু আপনার ভরণ-পোষণ—"

"ভরণ-পোষণ? একটা মেয়েমানুষ আমি,—বিধবা। দু' মুঠো আলো' চাল, আর দু'খানা থানের কাপড়—কতই আর তা'তে লাগ্‌বে? আপনারা বোধ হয় জানেন, বাবা আমার শিক্ষায় কিছু কার্পণ্য করেন নি—"

"জানি, আপনি সুশিক্ষিতা,—তবে কেন যে এই দুর্ভাগ্য আপনার হ'ল, তাই ভেবে পাই না। যা'ই হ'ক্‌, শিক্ষা যা লাভ ক'রেছেন, তাতে উপার্জ্জন ক'রে কেবল নিজেকে কেন, আরও দুই চার জনকে আপনি প্রতিপালন ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু কেন তা আপনাকে ক'র্‌তে হবে। বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বাবার কোনও সম্পত্তি আপনি নিজের প্রয়োজনে রাখ্‌তে চান না। তবে আপনি মা, আমরা সন্তান—আমাদের দাবী—"

কাঁদিয়া অজিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেশও হঠাৎ থামিয়া গেল। একটু পরে স্নেহ-কোমলকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে অজিতা উত্তর করিল, "বাবা!"

"সন্তানের দাবী কি উপেক্ষা ক'রে চ'লে যাবেন, মা?"

সকল বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল।—কাঁদিতে কাঁদিতে অজিতা কহিল, "মা! মা!—আমি মা! সন্তানের দাবী আপনারা কর্‌ছেন!—"

দুই ভাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আপনি মা; আমরা সন্তান!—সন্তানের দাবীই আজ আপনার উপরে কর্‌ছি। মা হয়ে, দেবী হয়ে সন্তানের সংসারে আপনি থাকুন।"

"থাক্‌ব।—তাই থাক্‌ব। বড় ছোট আমি,—মা কেমন হ'তে হয় জানিনে। মেয়ে হয়ে তোমাদের কাছে থাক্‌ব,—তোমরা বাবা,—মেয়ের মত স্নেহের একটু স্থান দিও,—আমি কৃতার্থ হ'ব!"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

কুণ্ঠিতা।

এনেছিলাম অর্ঘ্য আমি শ্রীচরণে,
তুমি আমায় তুলে নিলে সিংহাসনে।
কর্‌লে এ কি সবার মাঝে,
মরি যে সঙ্কোচে লাজে,
অযোগ্যারে কর্‌লে আদর অকারণে।

আমি ছিলাম সবার কাছে ছারকপালী,
সব হ'তে দীন ছিল আমার অর্ঘ্যডালি।
দল হ'তে তাই ছিলাম স'রে
মুখটি ঢেকে দুয়ার ধ'রে
কইনি কথা সাহস ক'রে তোমার সনে।

সঙ্গিনীরা রঙ্গভরে অবিরত,
ধূপে দীপে পুষ্পে পূজা কর্‌ল কত,
কত কথাই কইল সবে
তোমার সাথে কলরবে
আমি তোমায় পূজতেছিলাম মনে মনে।

তুমি আমায় কর্‌বে দয়া?—স্বপ্নাতীত,
বিস্ময়ে তাই দৃষ্টি সবার উচ্চকিত,
পান, সুপারী, ধূপ, ধূনা, খই,
পড়ছে খ'সে হাত হ'তে ঐ,
আমার পানে দৃষ্টি হানে বিষনয়নে।

তোমার এমন আদর পেয়ে ফির্‌লে ঘরে,
লজ্জা দেবে হিংসাভরে আপন পরে,
হাজার প্রশ্নে হায় কি কর?
এ কৃপা নয়,—দণ্ড তব,
প্রাণ যাবে যে বিষ-রসনার সাপের বনে।

মনে মানুষ কি না ভাবে? কত কি যে
ভেবেছি যে স্মর্‌তে লাজ আজ পাই যে নিজে।
কে জানে ছাই এমন ক'রে
বাঁধবে তুমি বাহুর ডোরে,
জান্‌বে তুমি যা' ছিল মোর সংগোপনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

দ'কারের দান।*

'দাতা শতং জীবতু।' আমিই সেই দাতা। দয়া-পরবশ হইয়া দেবলোক হইতে দু'দণ্ডের তরে আপনাদিগকে আমার দানের সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আপনারা এই দাতার অভিবাদন আদান করুন।

আমি দাতা; সুতরাং সে হিসাবে আমার দর্প-দম্ভটুকু আপনাদের মতই আছে। তবে আপনাদের দশ হাজারের মধ্যে দুই এক জন যেমন লুকাইয়া-ছাপাইয়া দান করেন—দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি বাম হস্তকে জানিতে দেন না—আমার কিন্তু আদৌ সে উদারতা নাই। আমি স্বয়ং দুন্দুভি-নিনাদে আমার দান-পত্র দিগ্ দিগন্তে প্রচার করিয়া দিই।

আমার নিবাস দন্তপুর। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ দেশপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষে আমার কুল-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রত্নবিদ্‌গণ ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন। তবে আমার দানের পরিচয় পাইতে হইলে একটু দিব্যদৃষ্টি থাকা দরকার; তাই আদিতে গলদের আশঙ্কায় আপনাদিগকে সেই দিব্যদৃষ্টিটুকু দিয়া রাখিলাম। দক্ষিণাদি বিদায়-কালীন স্বতন্ত্র দিব।

দেবলোক হইতে আসিলেও সকল লোকেই আমার দুর্দ্দমনীয় প্রাদুর্ভাব। মহদাণ্ডণু পর্য্যন্ত আমি। সমুদ্র-মন্থন করিয়া আমিই দেব-দানবের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছি। দুনিয়ায় আমার অদেয় কিছুই নাই। বিদ্যা-বুদ্ধি, ঋদ্ধি-সিদ্ধি আমিই প্রার্থীকে দান করিয়া থাকি। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে আমার দর্শন না মিলিলেও চতুর্দ্দশ ভুবনের দশদিকে আমি। ত্রিদিবের ইন্দ্র চন্দ্র মদন রুদ্র দুর্গা জগদ্ধাত্রী আদি দেব-দেবীর আমিই ঐশ্বর্য্যদাতা। সচ্চিদানন্দের আনন্দে আমি, আবার হ্লাদিনীর আহ্লাদে আমি। ধরণীর বিচিত্র সম্পদে আমারই দানশীলতা বিদ্যমান। পাতালে দৈত্যরাজ বলী আমারই প্রসাদে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" দাতা বলিয়া বিদিত।

বেদ-বেদাঙ্গ দর্শন উপনিষদে আমি দেদীপ্যমান। আমাকে বাদ দিয়া কোন কালে কোন ভাষা বা সাহিত্য এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। সংস্কৃতকে আমিই দিব্যদ্যুতিতে দ্যুতিমান করিয়া দেবভাষায় পরিণত করিয়াছি।

কদম্বগোলকন্যায়, গোবলীবর্দ্দন্যায়, দগ্ধপত্রন্যায়, দণ্ডচক্রাদিন্যায়, দণ্ডপূপন্যায়, দশমন্যায়, শতপত্রভেদন্যায়, সন্দংশপ্রাপিতন্যায়েও আমি, আবার ন্যায়ের অর্থ যখন স্বর-বিশেষ হয়, তখন উদাত্তে, অনুদাত্তেও আমি পরিদৃষ্ট। কণাদকে বৈশেষিক দর্শন রচনায় আমিই প্রবুদ্ধ করাই। পাতঞ্জলকে আমিই চারি পাদে বিভক্ত করিয়াছি। বেদান্ত সূত্রকার বাদরায়ণকে, আমিই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আখ্যা প্রদান করিয়াছি। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় "আদাবন্তে চ" আমারই দানের নিদর্শন। মীমাংসায় আমার অদম্য শক্তির চূড়ান্ত মীমাংসা নির্দ্ধারিত। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদে আমারই অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান।

শিক্ষাকল্পব্যাকরণেও আমারই দান দেখিবেন। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে, কবিকল্পদ্রুমে, শব্দশক্তি-প্রকাশিকায়, এমন কি, ব্যাকরণ-কৌমুদীতেও আমাকে পাইবেন। আমিই ক্রমদীশ্বরকে ও ভট্টোজিদীক্ষিতকে দীক্ষিত করিয়াছি। দ্বিবচনে, প্রতিপাদিকে, কৃদন্তে, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাসে, পরস্মৈপদে আত্মনেপদে, উভয়পদে, অদাদি, দিবাদি, তুদাদিগণীয় ধাতুতে, অদ্ ক্ষুদ্ খিদ্, চিদ্, তুদ্, নুদ্, পদ্, ভিদ্, বিদ্, বিন্দ্, শদ্, স্কন্দ্ স্বিদ্, আদি অনিট্ ধাতুতে আমাকে দেখিবেন। আবার লঙ ও লুঙের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে আমি নির্ব্বিকার অবস্থায় বিরাজ করিতেছি।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমার দখল আছে বলিয়া দিঙ্ নির্ণয়, দিবানিরূপণযন্ত্র বিদ্যমান—উদ্ভিদের জীবন দৃষ্ট হয়—ইন্দ্রধনু বিচিত্রবর্ণে সমুদ্ভাসিত—চন্দ্রের দাগ ও দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমারই দয়ায় দিবাকর দাহনে সিদ্ধ—ধরার দৈনিক-গতি ও কল্পিত মেরুদণ্ড উদ্ভাবিত—শব্দের বিচিত্র সম্পদ দৃশ্যমান।

ছন্দে ও অলঙ্কারেও আমার প্রভাব দেদীপ্যমান। দীর্ঘ-পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, দিগক্ষরা, দীর্ঘ একাবলী, দীর্ঘ চম্পকাবলীতেও আমার দাপট দেখিবেন। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতে

* মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত।

ক্রোড়ে আমিই ক্রীড়া করিয়া থাকি, আবার আমারই করুণায় মন্দাক্রান্তা "শোকভারাদলসগমনা।" আন্তযমক, দীপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, সন্দেহ আদি অলঙ্কারে আমি ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছি। নবরসের আদি, অদ্ভুত, রৌদ্রেও আমি বিদ্যমান।

জ্যোতির্বিদ্যায় আমার দাপট চিরপ্রসিদ্ধ। সিদ্ধান্ত-রহস্য, দিনচন্দ্রিকা, দিনকৌমুদী আদি জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি আমারই দিব্যজ্ঞান-প্রসূত।

নিদর্শন—দ মা রাম দ মা দিন্দু রা রাম মদ রা দ রা।
হরে রাম র মা রারি মা মদা গণ সূচকা॥

দীক্ষা, বিদ্যারম্ভ, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, রাজদর্শন, দ্বিরাগমন, ধান্যচ্ছেদন, ঋণদান, নবোদকশ্রাদ্ধ, ও গাত্রহরিদ্রাদি শুভদিনেও আমাকে দেখিবেন। অখণ্ডদানদ্বাদশী, অশূন্যশয়নাদ্বিতীয়া, অদ্বৈতসপ্তমী, ভৈমী একাদশী, নিত্যানন্দত্রয়োদশী, ভূতচতুর্দ্দশী, বলিদৈত্যরাজপূজা, দধিসংক্রান্তিব্রতাদি আমারই দান। দেওয়ালীর দীপদানে আমারই দীপ্তি প্রকাশ পায়। তিথির মধ্যে দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী—নক্ষত্রের মধ্যে আর্দ্রা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ—মাসের মধ্যে ভাদ্র—বর্ণের মধ্যে শূদ্র—গণের মধ্যে দেব—যুগের মধ্যে দ্বাপর আমার বিশেষ প্রিয়। দশদিকে আমি, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধে ও দক্ষিণে—আবার দশা ও অন্তর্দ্দশার অধিপতিও আমি। মাহেন্দ্র ও সিদ্ধিযোগে আমিই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করি, আবার দিক্‌শূল, বিষ্টিভদ্রা ঘাতচন্দ্রে ও দিনদগ্ধায় আমিই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলি। স্মৃতিতে আমার দর্শনাভাব হইলেও স্মৃতির শুদ্ধিতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্বের সকল সিদ্ধান্তে আমি বিদ্যমান। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে আমিই দীক্ষাদান করিয়াছি।

তীর্থে ও পীঠস্থানেও আমায় দৃশ্যতঃ না দেখিলেও অরূপে দেখিতে পাইবেন। দক্ষের দম্ভহেতু দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ করিলে, দেবাদিদেব মহাদেব দেবীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া রৌদ্রতাণ্ডবে দুলিয়া ঘুরিয়াছিলেন; দৈত্যনিসূদন সেই দেহ সুদর্শন দ্বারা ছেদন করিলে যে ৫১টি পীঠস্থানে সেই দেহখণ্ড পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে বৈদ্যনাথে হৃদয়, শুচিদেশে ঊর্দ্ধ-দন্তপংক্তি, গণ্ডকী নদীতে দক্ষিণ গণ্ড, অবন্তীদেশে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ এবং নন্দীপুরে, শোণনদে, কাঞ্চীদেশে ও বৃন্দাবনে যথাক্রমে হার, বাম নিতম্ব, কঙ্কাল ও কেশ আমারই প্রভাবে নিক্ষিপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, উমানন্দ, পাদগয়া, দণ্ডকারণ্য, পৃথূদক, বদরিকাশ্রম, কেদারখণ্ড, মন্দারপর্ব্বত, দ্বারকা, হর্ষদ্বীপ ও হরিদ্বারেও আমি দ্বার আগলাইয়া আছি। আমি নবদ্বীপে আছি বলিয়া শচীদুলাল গৌরাঙ্গ দেবকে পাইয়াছেন, বীরচন্দ্রপুরে আছি বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে জানিয়াছেন, উদ্ধারণপুরে আছি বলিয়া উদ্ধারণ দত্তকে লাভ করিয়াছেন এবং কেন্দুবিল্বে আছি বলিয়া জয়দেব গোস্বামীকে চিনিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভুও আমা ছাড়া নহেন। খড়দহ, এঁড়েদা, অগ্রদ্বীপ, দোগাছিয়া, দেন্দুড়, আদি স্থানে আমি আছি বলিয়াই তত্তৎস্থানে বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব ঘটিয়া থাকে।

পুরাণ উপপুরাণে আমার সাক্ষাৎ দর্শন না মিলিতে পারে; কিন্তু তথাপি দেখিবেন অষ্টাদশ মহাপুরাণের পদ্ম, নারদীয়, স্কন্দ পুরাণে, দেবী-ভাগবতে, অদ্ভুত রামায়ণে, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে আমি পুরাণ হইয়া আছি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দয়া করিয়া আমি তাঁহার পৃষ্ঠে দ্বিপাদ দিয়াছি বলিয়া মহাভারতে আমার সম্পূর্ণ দাবী-দাওয়া বিদ্যমান। রত্নাকর আদিতে দস্যু, সুতরাং আমারই উপাসক বলিয়াই রামায়ণ-রচনায় পারদর্শী ও আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক চরিত্রের নামকরণে আমার দানমাহাত্ম্য সুবিদিত। জামদগ্ন্য, ভরদ্বাজ, দধীচি, দত্তাত্রেয়, দন্তবক্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবদত্ত, উত্তানপাদ, দণ্ডী, দিলীপ, দশরথ, দশানন, দুর্য্যোধন, দ্রুপদ, দেবহূতি, দ্রোণাচার্য্য, আদিত্য, প্রহ্লাদ, বসুদেব, অঙ্গদ, উপানন্দ, পদ্মনাভ, মেঘনাদ, বীরভদ্র, জনার্দ্দন, সুদাম, শূদ্রক, অদিতি, দেবযানী, ইন্দুমতী, কালিন্দী, চিত্রাঙ্গদা, দময়ন্তী, দুঃশলা, মদালসা, মন্দোদরী, মাদ্রী, যশোদা, চন্দ্রাবলী, বৃন্দাদিতে আনন্দে আমি লীলা করিতেছি।

ইতিহাসের দরবার ও অন্দরমহলও আমার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। আদিশূর, বিক্রমাদিত্য, হর্ষদেব, শুদ্ধোদন, বিন্দুসার, সমুদ্রগুপ্ত, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপরুদ্র, দেবল আদি হিন্দু-নৃপতিগণ আমার নিকট দীক্ষিত। আবার আলাউদ্দিন, কুতবুদ্দিন, মহম্মদ, মামুদ, নাদিরশাহ, দারা, মুরাদ, সিরাজদ্দৌলা, সেকেন্দার, হায়দারআলি আদি মুসলমান রাজবৃন্দকে আমি দীক্ষা দান করিয়াছি। পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, চাঁদবিবি আদি বীরমহিলার দেশাত্মবোধে আমি, আবার বুদ্ধ মহম্মদ দীপঙ্কর রামানন্দ আদির দিব্যজ্ঞানেও আমি।

হিন্দু হরিদাস যবন হইয়াও আমারই দয়ায় দেশে দেশে শ্রদ্ধা লাভ করিতেছে।

কাব্যে নাট্যে উপন্যাসে আমার দশশালা বন্দোবস্ত সুবিদিত। সংস্কৃত কাব্যে স্বয়ং কালিদাস আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দশকুমারচরিতে, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকায়, করটদমনক কথায়, মেঘদূত, পদাঙ্কদূত, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী আদিতে আমি। আবার প্রিয়দর্শিকা, কামন্দকী, মকরন্দ, মদয়ন্তিকা, শূদ্রক আদিতেও আমি। প্রাচীন কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কাশীদাস, ক্ষেমানন্দ, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দদাস আমারই উপাসক। পদকল্পতরু, গোবিন্দমঙ্গল, চমৎকারচন্দ্রিকা, চৈতন্য-চন্দ্রিকা আমারই প্রসাদে বৈষ্ণবকর্ণে অমৃতনিঃস্যন্দিনী। বৈষ্ণবমাত্রেই আমার বড় প্রিয় বলিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' ও অমানিনা মানদেন' সূত্র অনুসারে আমি তাহাদিগকে 'দাস' পদবীভূষিত করিয়াছি এবং স্বয়ং দেবকীনন্দন বাসুদেব আমার এই দানের মর্য্যাদা বুঝিয়াই জয়দেবের গীতগোবিন্দে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখিয়া দিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণে অক্রুর-সংবাদে কালীয়দমনে আমি, আবার কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতক', ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর', দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা', রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', গিরিশচন্দ্রের 'দেলদার', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' এই কয়েক স্থলে লেখক ও পুস্তক উভয়ত্র আমি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠের' প্রসিদ্ধিলাভের নিদান আমিই। তাঁহার কুন্দনন্দিনী, দলনীবেগম, পদ্মাবতী, দিবা, নন্দা, ইন্দিরা ও দরিয়াবিবি এবং বিদ্যাদিগ্‌গজ, জীবানন্দ, চাঁদসাহ, হেমচন্দ্র, অমরপ্রসাদ, হরদেব, দেবেন্দ্র দত্ত, দিগ্বিজয় আমারই প্রসাদে দিগ্বিজয় করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের 'দেবদত্ত' 'উদয়াদিত্য', মধুসূদনের 'ভক্তপ্রসাদ' 'মদনিকা', গিরিশচন্দ্রের 'জ্ঞানদা', 'কাদম্বিনী', দীনবন্ধুর 'নদেরচাঁদ' 'নিমে দত্ত', আবার 'পদ্মলোচন' 'পদ্মিনয়রাণী', তারকনাথের 'প্রমদা' 'দিগম্বরী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল', ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দ' ও অমৃতলালের 'আমোদিনী' আমারই প্রসাদে নিত্য আমোদ প্রদান করে। প্রসিদ্ধ গদ্যপদ্যলেখকগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, দাশরথি, দামোদর, হরপ্রসাদ, দুর্গাদাস, সারদা, বরদা, দ্বিজেন্দ্র, যোগেন্দ্র, হীরেন্দ্র, হেমেন্দ্র, সুধীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জগদিন্দ্র, অবনীন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন আদি আমারই উপাসক; ক্ষীরোদপ্রসাদেত আমি যুঁজোড় হইয়া বসিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, জ্ঞানেন্দ্র, জগদানন্দ আমারই দয়ায় আনন্দ দান করেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে গুরুদাস, কালিকাদাস, রাধাকুমুদ, শশিপদ, দাদাভাই, দেউস্কর, বিজয়চাঁদ, মোহনচাঁদ, প্রদ্যোত, দিগম্বর, দ্বারকা, দুর্গাচরণ, মণীন্দ্র, মহেন্দ্র, বাপুদেব, যাদবেশ্বর, রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ, রামদুলাল, রামানন্দকে আমিই দেশবিখ্যাত করিয়াছি। 'আনন্দ' দলের সেকালের ভাস্করানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, দয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ হইতে একালের ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, শুদ্ধানন্দ আদি সকলকেই আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে আমি আছি বলিয়াই পরমহংস দেব দেশপ্রসিদ্ধ। আমিই 'নরেন্দ্র দত্তে' ছিলাম বলিয়া তাঁহাকে 'বিবেকানন্দ' করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। সাধক রামপ্রসাদ, রামদাসে আমিই বিদ্যমান; আমারই দয়ায় ঠাকুরবাড়ীর অনেক 'দেবী' নানা বিদ্যায় দীক্ষিতা।

নট ও বাদকসম্প্রদায়েও আমি। নটীগণের নামোল্লেখ নাই বা করিলাম, অর্দ্ধেন্দু, গিরিশচন্দ্র, নৃপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, অভয়াপদ, অমরেন্দ্র, হরিদাস, ধর্ম্মদাস, আমারই দাস। আবার দশমবর্ষীয় বালক 'মদন' আমাকে লাভ করিয়াই 'মাষ্টার' পদবী লাভে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাবিষয়ক উপাধি যথা:—বেদান্তবাগীশ, বেদান্তশাস্ত্রী, বৈদান্তিক, বিদ্যাদিত্য, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যার্ণব, বিদ্যারত্ন, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ আমারই প্রসাদজাত। আবার সাধারণ উপাধি যথা—দত্ত, দাঁ, দাস, দে, দেব, দিগর, দোবে, ভাদুড়ী, দণ্ডপাট, বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী আদি আমারই দান।

দেওয়ানী আদালতেও আমি, আবার ফৌজদারী আদালতেও আমি। দারোগার দপ্তরেও আমি, আবার দায়ভাগের দাবী-দাওয়ায়ও আমি। বাদী, বিবাদী, পদাতিক, দেনদার, দাদনদার, নীলাম-খরিদ্দার, দখলকার, জিম্মাদার, দলিলদাতা ও দরইজারদারে আমি। আবার জমাদার, গোয়েন্দা, গস্তিদার, চৌকিদার, দফাদার, পেয়াদা, পোদ্দার, দপ্তরী, চাইকি, সেরেস্তাদারেও আমি। আমিই সেটেলমেণ্টের দাগ দেখিয়া তদন্ত করিয়া, সীমা-সহরদ্দ বন্দোবস্ত করিয়া দিই,

আবার কোন দাদখাঁ দেবোত্তর সম্পত্তি উল্লেখে দাদফরিয়াদ করিলে দোকরা বিচারে, দলীল দস্তাবেজ দেখিয়া দস্তুর-মাফিক জমাবন্দী দুরস্ত করি। জমীদারের দেওয়ান, কার-পরদাজ, তহশীলদার, তাঁবেদার, নগদী, খিদমতগারে আমি— গদীয়ানের গুদামভরা মাল আমদানীতে আমি; আবার দুনিয়ার যত দম্‌বাজ, বদমাস, দাগাদার, দাঙ্গাকারীর দণ্ড-দানেও আমি। দিলদরিয়ার দেমাকেও আমি, আবার দর-বেশের দৈন্যেও আমি। রোখসোদে আমি, রদ্দজবাবে আমি, দক্ষিণদ্বারী সদরদরজায় আমি, পেয়াদার নিশানদিহীতে আমি —অধিক কি, হদ্দ-বেহদ্দে আমি।

প্রচলিত প্রবাদে আমার দখল দেখুন। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা', 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', 'দশপুত্র সম কন্যা', 'মানবের দশদশা', 'দশে লাগে ভূত ভাগে', 'দশের লাঠী একের বোঝা', 'দায়ে পড়লে বাবা বলে', 'দুষ্টলোকের মিষ্ট কথা', 'যেমন দেবা তেমনি দেবী', 'বৃন্দেদূতী', 'দাতাকর্ণ', 'দেশগুণে বেশ', 'দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ', 'দেবর লক্ষ্মণ', 'বিদুরের খুদ' আমারই দৌলত-খানার আমদানী। আবার আমি 'দণ্ডে' আছি বলিয়া "দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ" অর্থাৎ দণ্ডের দ্বারা গো-গর্দ্দভ বশীভূত হয়। 'দৈব'তে আছি বলিয়া 'দৈবী বিচিত্রা গতি' আর 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' 'দ্রব্যে' আছি বলিয়া 'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।' 'দারিদ্র্যে' আছি বলিয়া 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি-নাশী।' 'দ্বিজে' আছি বলিয়া 'অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা।' 'বুদ্ধি'তে আছি বলিয়া 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য', আবার 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।' 'ছিদ্রে' আছি বলিয়া 'ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি।' 'দানে' আছি বলিয়া উপদেশ দি 'যন্নষ্টং তন্ন দীয়তে।' 'দক্ষিণা'য় আছি বলিয়া দম্ভ করিয়া বলি 'হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।' 'দুঃখে' আছি বলিয়া 'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।' 'সিদ্ধি'তে আছি বলিয়া 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' 'বিদ্যায়' আছি বলিয়া 'বিদ্যারত্নং মহাধনম্', আবার 'স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।' 'বৃদ্ধে' আছি বলিয়া 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং', আবার 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরিয়সী', অধিক কি, আমি 'দারু'তে আছি বলিয়া 'দারুভূতো মুরারিঃ।'

সংবাদপত্রাদিতেও আমায় দেখিতে পাইবেন। দৈনিক চন্দ্রিকা, হিতবাদী, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান, কুশদহ, দেবা-লয়, ব্রহ্মবিদ্যা, সন্দেশ, দেশবন্ধু, সাহিত্য সংবাদ, উদ্বোধন, মোহম্মদী, হিন্দুপত্রিকা, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, ফরিদপুর হিতৈষিণী, মেদিনীবান্ধব, মেদিনীপুর-হিতৈষী, বীরভূম দর্পণ আমারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান। 'বসুমতী'তে ছিলাম না বলিয়া 'বসুমতী' দৈনিক সংস্করণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—অবশ্য আমারই দাপটে। আবার সম্পাদকেও আমি—যথা, পূর্ণেন্দু, রামানন্দ, হীরেন্দ্র, হেমেন্দ্র, সৌরীন্দ্র, ফণীন্দ্র, জগদিন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, চন্দ্রোদয়, রামদয়াল আদি।

দশবিধ সংস্কার দ্রব্যের মধ্যে আমি সিদ্ধি, সিন্দূর, চন্দন, দূর্ব্বা, হরিদ্রা, দধি, দুগ্ধ, কদলী, দর্ভ, দীপ, দর্পণ, উদূখল, বিল্বদণ্ড, দক্ষিণা ও নৈবেদ্যে বিদ্যমান; আবার এতদ্ব্যতিরেকে কাষ্ঠ পাদুকা, আকন্দপত্র, নারিকেলোদক, আচ্ছাদন বস্ত্র ও চাঁদমালায় আমি আলো করিয়া আছি।

আয়ুর্ব্বেদে আমার দান সুবিদিত। দন্তশূল, উদাবর্ত্ত, হৃদ্রোগ, উপদংশ, শ্লীপদ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্রদর, বাধক-বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, উন্মাদ, দদ্রু আদি রোগেও যেমন আছি, আবার দদ্রুদাবানল, মদনানন্দ মোদক, দ্রাক্ষারিষ্ট, নেত্রবিন্দু, ইচ্ছাভেদী রস, কদলীকন্দ ঘৃত, পূর্ণচন্দ্র রস, চন্দনাদি তৈল, বৃংদারক চূর্ণ, অগ্নিসন্দীপন মোদকেও আমি তদ্রূপ বিদ্যমান।

আমি 'ধনীতে' নাই, 'দরিদ্রে' আছি। 'করুণাময়ে' নাই, 'নির্দ্দয়ে' আছি। 'প্রশংসায়' নাই, 'নিন্দায়' আছি। 'ভিক্ষুকে' নাই, 'দাতায়' আছি। 'শান্তে' নাই, 'দুরন্তে' আছি। 'সুখে' নাই, 'দুঃখে' আছি। 'ভাল'য় নাই, 'মন্দে' আছি। 'তীক্ষ্ণে' নাই, 'মৃদু'তে আছি। 'হ্রস্বে' নাই, 'দীর্ঘে' আছি। 'তরুণে' নাই, 'বৃদ্ধে' আছি। 'জাগরণে' বা 'স্বপ্নে' নাই, কিন্তু 'নিদ্রা' ও 'তন্দ্রা'য় আছি। 'গ্রহণে' নাই, 'দানে' আছি। 'গুণে' নাই, 'দোষে' আছি; 'ইতরে' নাই, 'ভদ্রে' আছি। 'শুষ্কে' নাই, 'আর্দ্রে' আছি। 'আমায়ে' নাই, 'সিদ্ধান্তে' আছি। 'নাস্তিকে' নাই, 'ঈশ্বরবাদী'তে আছি। 'অস্তে' নাই, 'উদয়ে' আছি। 'হাস্যে' নাই, 'ক্রন্দনে' আছি। 'পুলকে' নাই, 'খেদে' আছি। 'অন্তে' নাই, 'আদিতে' আছি। 'ধারে' নাই, 'নগদে' আছি। 'অয়ে' নাই, 'জিয়াদায়' আছি। 'মায়তে' নাই, 'বে-কায়দায়' আছি। 'শিষ্টে' নাই, 'দুষ্টে' আছি। 'বিক্রয়ে' নাই, 'খরিদে' আছি। 'সুনামে' নাই, 'দুর্নামে' আছি। 'রপ্তানী'তে নাই, 'আমদানী'তে আছি। 'বাহিরে' নাই, 'অন্দরে' আছি। 'একপুরুষে' নাই, 'বুনি-য়াদী'তে আছি। 'বে-আবরু'তে নাই, 'পরদানসীনে' আছি।

আবার, 'মেথরে' নাই বলিয়া 'মুদ্দাফরাস সৃষ্টি করিয়াছি। 'লাঠিয়ালে' নাই বলিয়া 'বরকন্দাজ' গড়িয়াছি। 'ফসলে', নাই বলিয়া 'আবাদ' করিয়াছি, 'ঘাতকে' নাই বলিয়া 'জল্লাদে' প্রকাশ। 'পাইকে' নাই বলিয়া 'সর্দ্দারে' আছি। 'সাক্ষ্যে' নাই বলিয়া 'জবানবন্দী'তে হাজির। 'বলে' নাই বলিয়া 'জবরদস্তি'তে আছি। 'বিরহে' নাই বলিয়া 'বিচ্ছেদে' আছি; 'মুকুরে' নাই বলিয়া 'দর্পণ' গড়িয়াছি। 'বাস্তু'তে নাই বলিয়া 'উদ্বাস্তু' করিয়াছি। 'আসলে' নাই বলিয়া 'খাদে' রহিয়াছি। 'হাটবাজারে' ঠাঁই না পাইয়া 'বন্দর' পাতিয়াছি। 'মঠে' ঠাঁই না পাইয়া 'মন্দিরে' বসিয়া আছি। 'তালিকা'য় না দেখিলেও 'ফর্দ্দে' আমাকে দেখিবেন। সীমায় না পাইলেও 'চৌহদ্দী'তে পাইবেন। 'ত্রুটি'তে না পাইলেও 'গলদে' দেখিবেন। 'ফকিরে' না পাইলেও 'দরবেশে' দেখিবেন। 'তপনে' না থাকিলেও 'দিবাকরে' আছি। 'ভরসায়' না থাকিলেও 'উমেদে' আছি। 'স্মরণ' করাইতে না পারিলেও 'তাগিদ' করি। ভট্টাচার্য্যের 'মস্যাধারে' না দেখিলেও সাধারণ 'দোয়াতদানে' আমায় দেখিবেন। 'সুশ্রী'তে না পাইলেও 'সুন্দরে' পাইবেন। 'সাগরে' না পাইলেও 'দরিয়া'য় পাইবেন। 'বিশ্বে' না থাকিলেও 'দুনিয়া'য় বিরাজমান। 'আবশ্যকে' না থাকিলেও 'দরকারে' আছি। 'সহি'তে সাক্ষাৎ না পাইলেও 'দস্তখতে' আমার দর্শন মিলিবে। 'চিহ্নে' না পাইলেও 'দাগে' মিলিবে। 'মামলা'য় না থাকিলেও 'মোকর্দ্দমা'য় আছি। 'ডাক্তারে' না থাকিলেও 'বৈদ্যে' আছি। 'উপাধি' না দিলেও 'পদবী' দিয়া থাকি। 'খবরে' না থাকিলেও 'সংবাদে' আছি। 'বাজনায়' না থাকিলেও 'বাদ্যোদ্যমে' আছি। 'মণ্ডায়' না থাকিলেও 'সন্দেশে' বিদ্যমান। 'জ্যোতি'তে না রহিলেও 'দীপ্তি'তে বিরাজমান। 'ব্যসনে' নাই বলিয়া 'বিপদে' আছি। 'সেলামে' নাই বলিয়া 'আদাবে' আছি। 'সুর' ছাড়িয়া 'দেবতা' এবং 'অসুর' ছাড়িয়া 'দৈত্য' আমারই সৃষ্টি। 'শ্মশ্রু'তে স্থান না পাইয়া মনের দুঃখে 'দাড়ী'তে এবং 'শস্যে' না স্থান পাইয়া 'দানা'তে আমি আগে-ভাগে দখল করিয়াছি।

কখন কখন আমি দুই দিকেই বিদ্যমান। উদাহরণ—'আদান-প্রদান', 'বাদ-প্রতিবাদ, 'আপদ-সম্পদ', 'আনন্দ-বিষাদ, 'স্বদেশ বিদেশ', 'দেব-দেবী', 'দাস-দাসী' ইত্যাদি। বস্তুতঃ ধনীর ধনমদে আমি, ব্যথিতের বেদনায় আমি, দীনের দুঃখে আমি, ভোগীর দুর্ভাবনায় আমি, বিলাসীর ইন্দ্রিয়পরতায় আমি, যোগীর চিত্তদমনে আমি, সাধুর সদালাপে আমি, প্রেমিকের আত্ম-নিবেদনে আমি, উপদেষ্টার উপদেশে আমি, চরিত্রহীনের দুশ্চিন্তায় আমি, সম্ভ্রান্তের পদমর্য্যাদায় আমি। আবার শিশুর প্রফুল্ল চন্দ্র-বদনে আমি, যুবতীর ব্রীড়াবনত মুগ্ধ-দৃষ্টিতে আমি, জননীর স্নেহ-সোহাগ-মাখা আদরে আমি, জনকের বক্ষ-ভরা পুণ্য আশীর্ব্বাদে আমি। আদত কথা, দেশে আমি, দশে আমি, আবার সেই পরমপদের পদতলে আমি।

আমার দানের সংবাদ-শ্রবণে দেখিতেছি কাহারও কাহারও বদনচন্দ্রমা ঈষৎ দন্তরুচিকৌমুদী বিস্তার করিতেছে। দক্ষিণান্ত করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আপনাদের বিদ্রূপে বিরত হইলাম। তবে আমার প্রত্যাদেশে যিনি শব্দসমুদ্র মন্থন করিয়া এই দাতার দস্তুরমত ওস্তাদির পরিচয় প্রদান করিলেন, তাঁহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, দীন অকৃতী হইলেও তাঁহার নাম ও পদবীর সহিত আমার সম্বন্ধ চিরদিন অটুট রহিবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস।

ত্রিবিধ।

বৃক্ষের ডালে পক্ষী গাহিছে গান;
কবি ভাবাকুল, মুগ্ধ বিভোর প্রাণ,
—কি মধুর সুর তার;

শিল্পী রয়েছে তাকায়ে তাহার পানে,
আঁকিবে তাহারে চারু তুলিকার টানে,
—রং তার কি বাহার;

ঝোপের আড়ালে দাঁড়ায়ে শিকারী বীর,
বধিবে তাহারে,—হাতে বিষাক্ত তীর,—
—মাংস অতি সুতার।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

শিখের দীক্ষা।

প্রায় শতাধিক বর্ষ শান্তি-সুখ সম্ভোগের পর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতের সৌভাগ্যগগন আবার তমসাচ্ছন্ন হইল। সম্রাট আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতৃপিতামহের পন্থা ও উদারনীতি বর্জ্জন করিলেন। হিন্দু প্রজার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, প্রতি পদেই তিনি তাহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিধর্ম্মী পৌত্তলিক হিন্দু ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাটের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে পারে না, এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষও ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং ক্রমে উহা পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। বহু হিন্দু রাজকর্ম্মচারী রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইলেন। হিন্দু প্রজার উপর নিত্যই নূতন করভার স্থাপিত হইতে লাগিল। হিন্দুর পবিত্র তীর্থগুলি ক্রমে একে একে কলুষিত হইতে লাগিল এবং বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি স্থানের দেবমন্দির ও মূর্ত্তিগুলি সম্রাটের আদেশে বিচূর্ণিত হইল ও ঐ সকল স্থানে মুসলমানের মসজিদ স্থাপিত হইল। হিন্দুর তীর্থ-যাত্রা, পূজা সম্মিলন প্রভৃতিও নিষিদ্ধ হইল এবং অবশেষে ঘৃণিত জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত হইল।

আলমগীর।

চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী সম্রাটকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইতে ও তাঁহার মন হইতে বিদ্বেষ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। সম্রাট বুঝিয়াও বুঝিলেন না। বলদৃপ্ত নিজের শক্তির অপব্যবহারে অন্যের কষ্ট বুঝে না বা বুঝিতে চাহে না। সম্রাটও অটল অচল ভাবে নিজের ভ্রান্তনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত রহিলেন। ক্রমে প্রজার আবেদন অভিযোগও তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। সম্রাট তাহাদের মর্ম্মব্যথা বুঝিলেন না বা কাতর ক্রন্দন-ধ্বনিতে কর্ণপাত করিতে পারিলেন না। প্রাসাদদ্বারে সমবেত হিন্দুপ্রজার মর্ম্মপীড়াকাতর মুখের দিকে তিনি চাহিলেন না। রক্ষীদিগকে উহাদের বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সম্রাট কেবল হিন্দুর তীর্থ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। হিন্দু প্রজাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ দিলেন। প্রথমে নানা প্রলোভন দেখান হইল। প্রলোভনে যখন ফল হইল না, তখন বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা হইল। দিল্লীর শত শত ব্রাহ্মণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে বুঝান হইল যে, ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন তাঁহাদের মুক্তির আর উপায় নাই। তাঁহারাও নিরুপায় বুঝিয়া নীরবে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। আর্ত্তের অকারণ যন্ত্রণা

ভোগ বিফলে যায় না। আর্ত্তত্রাণের জন্যই এই যুগে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কথাই বলা হইবে।

হিন্দু সম্প্রদায়মাত্রেরই উপর এইরূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। ক্রমে পঞ্জাবের শিখদিগের উপরও সম্রাটের দৃষ্টি পড়িল। শিখরা এই সময় গুরু নানকের পবিত্র উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তভাবে কৃষি ও পশুপালনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

গুরু নানক।

নানক একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরে প্রেমই একমাত্র মুক্তির উপায়—এই পবিত্র নীতি শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে কোন প্রকার রাজনীতিক শিক্ষা ছিল না—উগ্রতার লেশমাত্রও ছিল না। তথাপি তাঁহার নিরীহ শিষ্যদিগের উপর মধ্যে মধ্যে অত্যাচার হইয়াছিল এবং ঐ অত্যাচারের ফলে দুই এক জন শিখগুরু মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গুরুদিগের মধ্যে অনেকেরই মনে যোদ্ধভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ সম্রাট সাহজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং দুই তিনটি যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত করিয়া নিজ দল-বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আরঙ্গজেবের রাজত্বের মধ্যসময়ে নবম গুরু টেগ বাহাদুর শিখদিগের নেতা ছিলেন। সামান্য হিন্দু সৈন্যও তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধনলিপ্সা বা রাজ্যলিপ্সা ছিল না। রাজদ্রোহাপরাধে আরঙ্গজেব একবার তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রমাণ পায়েন যে, তাঁহার বিদ্রোহের প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মুক্তির পর টেগ বাহাদুর পাঁচ ছয় বৎসর সপরিবারে পাটনা নগরে বাস করিয়াছিলেন এবং তাহার পর কিছু কাল ধরিয়া বঙ্গে ও আসামে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দপুর নামক স্থানে বাস করেন।

আরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল হইলে তিনি টেগ বাহাদুরকে দিল্লীতে আসিতে আহ্বান করেন এবং সম্রাটসৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আইসে।

রাজধানীতে কিছুকাল রাখিয়া সম্রাট তাঁহাকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ করেন—কিন্তু কিছুতেই যখন তাঁহার মন টলিল না, তখন তাঁহাকে বহু যাতনা দিয়া দিল্লীর চাঁদনী বাজারে সর্ব্বজনসমক্ষে হত্যা করা হয়। *

টেগ বাহাদুর দিল্লীতে যাইবার জন্য গৃহত্যাগের সময়ই জানিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আরঙ্গজেবের নীতি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। শিষ্য, ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুমাত্রই তাঁহাকে দিল্লীযাত্রায় নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, জগতে তিনি কাহারও বিদ্বেষ করেন না বা কেহ তাঁহার দ্বেষী নাই। ফল কথা, নিজের বিষয় চিন্তা তিনি করেন নাই।

গুরু টেগ বাহাদুর।

জানিয়া শুনিয়া, সামান্য প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া তিনি লোকের শিক্ষার জন্য এবং দেশের হিতের জন্য আত্ম-বলিদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মরিবার জন্যই দিল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আরও জানিতেন যে, মোগলের অনাচার পূর্ণ না হইলে আর এ দেশের উন্নতির অবকাশ নাই, দেশবাসীর জাগরণেরও আশা নাই। সেই জন্যই তিনি শিষ্যদিগকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "আপনা শির দে কুড়ো করে" অর্থাৎ নিজের মস্তক দিয়া তাহাদের পাপ পূর্ণ করি।

এইরূপে তিনি শিষ্যদিগকে বুঝাইয়াছিলেন; পুত্রের সহিত শেষ দেখা হইবার সময় তাহাকে নিজের কথা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; আর কারাগারে যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াছিলেন, তখন পুত্রকে উপদেশ পাঠাইয়াছিলেন—"বৎস, আমার মৃত্যুর পর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া আশ্রিত সেবকবর্গের রক্ষা করিবে ও অত্যাচারী তুর্কের ধ্বংস করিবে।" (বিনা দের্ তুরকণ্ প্রহারে সেবকন্ রচ্ছো বলঠান্") অত্যাচারক্লিষ্ট গুরুর পুত্রের নিকট এই অনুরোধ অন্যায় অনুরোধ নহে। অত্যাচার মানুষ চিরদিন সহ্য করিতে পারে না। তাহা জীবমাত্রেরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে সকলেই কিছু অস্ত্র ধারণ করিতে চাহে না বা পারে না। জ্ঞানী বা মুমুক্ষু নশ্বর পার্থিব দেহের উপর অত্যাচারকে বা অস্থায়ী সম্পদের নাশকে কোন অপকারই মনে করেন না। তাপস অত্যাচারীর প্রতিশোধ লইয়া তপস্যার ক্ষয় করিতে চাহেন না। সাধারণ লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করে না। তবে অত্যাচারের স্মৃতি সকলেরই মনে জাগরূক থাকে। অত্যাচারপীড়িতের আর্ত্তনাদে যোগীরও মন বিচলিত হয়। তাঁহারা অত্যাচারীর দমনার্থ ঐশী শক্তির আবাহন করেন, নিজের আদর্শে অন্যকে জানাইয়া দেন বা রজোগুণসম্পন্ন উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষা দান করিয়া অধর্ম্মের তিরোভাবের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

পিতার নিধনের সময় গুরুর পুত্র গোবিন্দ আনন্দপুরে ছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর ছিল। পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাঠাইবার কিছু পরেই এক জন দূত তাঁহাকে তাঁহার পিতার মৃত্যু-সংবাদ দেয় ও অন্য এক জন পিতার ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া দেয়।

উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দ পিতার মৃত্যুশোকে কাতর হইলেন,

* টেগ্ বাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে শিখরা বলেন যে, দিল্লীতে আনীত হইবার পর সম্রাট তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া মুসলমান হইতে বলেন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে নিজের অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে বলা হয়। তাহাতেও অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হওয়ায় তিনি ক্ষমতা দেখাইতে সম্মত হয়েন এবং বলেন যে,একখানি মন্ত্রপূত কাগজ তাঁহার গলায় বাঁধিয়া অস্ত্রাঘাত করিলে মন্ত্রের শক্তিতে অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ হইবে। অতঃপর তাঁহার কথামত গলায় কাগজ বাঁধিয়া তাহার উপর তরবারির আঘাত করা হয়। তরবারির আঘাতে মস্তক দেহচ্যুত হইলে দেখা যায় যে; তাহাতে লিখা আছে—"শির দিয়া—সার না দিয়া" অর্থাৎ মস্তক (প্রাণ) দিলাম—ধর্ম্ম ছাড়িলাম না।

না এবং ধীরচিত্তে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, পিতার আদেশ স্মরণ রাখিয়া সংসারের দায়িত্বপালনে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন এবং সংসারের যাহা যাহা কর্ত্তব্য সবই করিতে লাগিলেন। তিনি পার্ব্বত্য রাজগণের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। যুদ্ধের জন্য প্রত্যহই সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল; ক্রমে ব্যাপার আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। নিকটস্থ কোন পার্ব্বত্য রাজাকে রক্ষা করিতে গিয়া গুরুকে সম্রাটসৈন্যের গতিরোধ করিতে হইল। যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে জয়লাভও হইল।

গুরু গোবিন্দ।

এই সকলের মধ্যে তিনি নিজের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যায়েন নাই। ক্রমে তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যের দিকে চালিত হইতে হইল। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ, স্বদেশবাসী ও আশ্রিতের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের রক্ষণ এই তিনটি বিষয় লইয়া যে চিন্তা প্রতিনিয়তই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিল—উহার সফলতার দিকে এক অমানুষী শক্তি তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিল। ক্রমে চিন্তার অবসান হইল। বিপদের শঙ্কা ত্যাগ করিয়া, বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া মহাপুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ম্মের পথে অনেক বিঘ্ন। গোবিন্দের সফলতার অন্তরায়ও বড় কম ছিল না। একদিকে প্রবলপ্রতাপ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক দিল্লীশ্বর—অপর দিকে কয়েক সহস্র মাত্র অশিক্ষিত দীনহীন দরিদ্র কৃষক শ্রমজীবীর ধর্ম্ম-গুরু, পিতৃহীন, সহায়হীন ক্ষত্রিয় বালক। শক্তির প্রয়োজন। সাধনা ভিন্ন শক্তি আইসে না। আবার ঐশী শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তিই মানুষকে প্রকৃত বল দেয় না, সফলতায় সাহায্য করিতে পারে না। সব দিক্ ভাবিয়া গোবিন্দ শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে আচার্য্য, পুরোহিত সকলেই আসিয়া সমবেত হইলেন। পূজোপকরণও সংগৃহীত হইল, গুরু নয়নাদেবীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল। তথাপি দেবী-দর্শন হইল না, মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্যও দেখা দিল। গোবিন্দ কিন্তু সে সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া একমনে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। বারে বারে মনের প্রার্থনা জানাইলেন। *

দ্বার তোমার ঠাঢ হোঁ একবর দিজে মোয়।
পন্থ চলে ত জগতমে দুষ্ট খেপাবহ মোয়॥

* * * *

তুহি আশাপূরণ জগৎগুরু ভবানী।
ছত্র ছিন্ মোগল্‌কো কারা বেগ মায়নী॥
সকল হিন্দসে-ও তুরগ দুষ্ট বিদারহু।
ধরম কি ধ্বজা কো জগৎ মে ঝলা রহো॥

* * * *

এহী দেহ আজ্ঞা তুরকন্ গহি খাপাউঁ।
গো ঘাতকা দোষ জগৎ সেও মিটাউঁ॥
ছত্র তক্ত মোগলন্ কো করহু মার দূরে।
ঘুরেহেঁ তব জগৎমে যাতেহি ধর্ম্ম তুরে॥
তুমন্ দ্বার খাড়া দাস কর হে পুকারা।
তুরকন্ মেটকিজে জগৎ মেহি উজারা॥
তদ্ হিঁ গীত মঙ্গল যাতে কে শুনাউঁ।
তুমন্‌কো সিমর দুঃখ সকলে মিটাউঁ॥

* * * * *

* বর্ত্তমানে অনেক শিখ গোবিন্দের যজ্ঞবৃত্তান্ত অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ও অনেক শিখ ইতিবৃত্তকারের বর্ণনায় উহার কথা পাওয়া যায়। সূর্য্যপ্রকাশে যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা ও স্তবগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

কৃপা কিজে দাস পর কণ্ঠ নেয়াউচার।
নাম তোমারা যো জপে ভৈয় সিন্ধুভবপার ॥

অর্থাৎ হে দেবি, আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। আমায় একমাত্র বর দাও যে, জগতে তোমার পন্থ (পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার) চালাই। তুমি দুষ্ট নাশ কর। (অত্যাচারী) মোগলের রাজচ্ছত্র ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উহাদের নাশ করিয়া আশা পূর্ণ কর। সমস্ত হিন্দুস্থান হইতে তুর্ক বিদূরিত করিয়া দাও। জগতে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়ুক।

* * * * *

দাসকে এই আজ্ঞা দাও যে, তুর্ক নাশ করিয়া গোঘাতকের দোষ জগৎ হইতে বিলুপ্ত করি। মোগলের রাজচ্ছত্র চূর্ণ করি। তবে জগতে তোমার জয় শব্দ ঘোষিত হইবে। তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া দাস চীৎকার করিতেছে। তুর্কের দল উন্মূলিত করিয়া জগতে আলোক দাও। জয়-সঙ্গীত শুনাই। তোমাকে স্মরণ করিয়া দুঃখ মিটাই।

নমস্কার করিতেছি। দাসের প্রতি কৃপা কর। যে তোমার নাম জপ করে—সে ভবসমুদ্র পার হয়।

প্রার্থনা চলিতে লাগিল। ক্রমে এক বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইল। নানা বিভীষিকারও আবির্ভাব হইতে লাগিল। বিভীষিকা দর্শনে অনুচরবর্গ, এমন কি, পুরোহিতও পলায়ন করিলেন। গোবিন্দ একাই পূজায় রহিলেন এবং আত্মরক্ত ও বলি দ্বারা দেবীকে তৃপ্ত করিয়া দেবীর বর ও অস্ত্র লাভ করিলেন।

নিজের সিদ্ধির পর গুরু শিষ্যবৃন্দকে দীক্ষা দিবার মানস করিলেন। গুরুর হস্তে শিষ্যের দীক্ষা অনেক উচ্চ—উচ্চ অঙ্গের হইল। এ দীক্ষায় মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী প্রতিমার পূজার স্থান রহিল না। প্রতিমার পরিবর্ত্তে মানসপটে আদর্শের পূজাই একমাত্র পূজা হইল। গুরু কেবল আত্মার উৎকর্ষ-সাধনের উপায়, কঠোর সংযম ব্রত এবং ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফলে নশ্বর জগতের সুখের উপেক্ষা—ইহাই শিখাইলেন। ধর্ম্মের জন্য স্বার্থত্যাগ—গুরুর আদেশে ও সাধারণের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জ্জন, ইহাই শিষ্যদিগের মূলমন্ত্র হইল।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে গুরু পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞসমাপ্তির প্রায় দুই বৎসর পরে এক দিন বৈশাখী মেলার সময় তিনি সমস্ত শিষ্যকে আনন্দপুরে আহ্বান করিলেন। তিনি মণ্ডপ খাটাইয়া উহার মধ্যস্থলে নিজের সিংহাসন রাখিলেন। পার্শ্বের একটি তাঁবুতে ৫টি ছাগ অতি গোপনে রক্ষিত হইল। সে স্থলে প্রহরীর ব্যবস্থা রহিল, কেহই যাইবার অনুমতি পাইল না।

তাহার পর মধ্যাহ্নে সমবেত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া গুরু বলিলেন, "ধর্ম্মকার্য্যের সফলতার জন্য, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষ ভক্ত কয়েকজনের মস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে। যদি কেহ স্বেচ্ছায় গুরুর কার্য্যের জন্য আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত থাক, আইস।" প্রথম আহ্বানে তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। দ্বিতীয় আহ্বানেও সকলে ঐরূপ নীরব নিস্তব্ধ রহিয়া গেল। অবশেষে তৃতীয় আহ্বানে এক জন শিষ্য প্রাণদানে সম্মত হইয়া গুরুর নিকট অগ্রসর হইল। গুরু বহু প্রশংসার পর তাহাকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং একটি ছাগকে হত্যা করিয়া শোণিতসিক্ত অসিহস্তে আবার একটি শিষ্যের মস্তক প্রার্থনা করিলেন। এবারেও আর এক জন মস্তক দিতে স্বীকৃত হইল। গুরু তাহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁবুতে বসাইলেন ও অন্য একটি ছাগ বলি দিয়া বাহিরে আসিয়া আবার মস্তক প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ ৫ বার প্রার্থনায় ৫ জন শিখ প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পতা ও গুরুতে অচলা ভক্তি দেখাইল।

অতঃপর গুরু এই ৫ জনের ভূরি প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে নবপ্রবর্ত্তিত দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার জন্য একটি লৌহপাত্রে জল ও কিছু মিষ্টান্ন রাখিয়া উহাতে তরবারি ডুবাইয়া গুরু নিজে নানকোক্ত জপজী ও অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং এই মন্ত্রপূত জলকে "অমৃত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেককে ৫ গণ্ডূষ পান করিতে এবং মস্তকে ও চক্ষুতে দিতে বলিলেন।

ইহাই হইল গুরু গোবিন্দের প্রধান সংস্কার। ইহার নাম পহল। সংস্কারের পর গুরু শিষ্যদিগকে পূর্ব্ব নাম, নিবাস ও জাতি ভুলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। দীক্ষান্তে প্রত্যেক শিখেরই জন্মস্থান হইল পাঠনা। নিবাস হইল আনন্দপুর—পিতা হইলেন গুরু গোবিন্দ। প্রত্যেকেই সোঢ়ীবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইল এবং "সিংহ" উপাধি ধারণ করিল।

সংস্কারের পর শিষ্যরা গুরুর উপদেশ লাভ করিল। উপদেশগুলির কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধে, কতকগুলি

আচার-সম্বন্ধে ও কতকগুলি দুর্নীতি-বর্জ্জনের আদেশমাত্র। প্রধান উপদেশগুলি এই—

১। শিখমাত্রই পরমপিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবে।

২। শিখ গুরুতে অচলা ভক্তি রাখিবে। গুরুগ্রন্থকে ভক্তি করিবে ও উহাকেই গুরু মনে করিবে।

৩। প্রত্যেক শিখই প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে গুরুবাণী পাঠ করিবে, গুরুর উপদেশ স্মরণ রাখিবে ও প্রত্যহ গুরু-বাণী, জপজী, জাপজী, আনন্দজী, রহবাস, কীর্ত্তন ও খারতি পাঠ করিবে।

৪। গুরুসম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন শিখসম্প্রদায়ের লোকের সহিত শিখ মিশিবে না।

৫। শিখরা পরস্পর পরস্পরকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিবে। প্রত্যেকেই দীন-দরিদ্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। তুর্ককে বিশ্বাস করিবে না এবং গুরুনিন্দককে বধ করিবে।

৬। শিখ মন হইতে কাতরতা ত্যাগ করিবে; আদর্শ উচ্চ করিবে; মন নম্র রাখিবে।

৭। শিখ কাম, ক্রোধ, মিথ্যাকথা, কুতর্ক ত্যাগ করিবে।

৮। শিখ বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীগমন কথনও করিবে না।

৯। শিখ দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিবে।

১০। কন্যাহত্যাকারীদিগের সহিত শিখ মিশিবে না।

১১। শিখ জবাই করা মাংস, যবনের হস্তের মদ্য-মাংস ত্যাগ করিবে।

১২। শিখ কবর, শ্মশান, দেব-দেবী, পীর-ফকিরাদির পূজা করিবে না।

১৩। শিখমাত্রেই তরবারির উপর নির্ভর করিবে এবং মনে রাখিবে যে, যোদ্ধার বীরত্বের উপর লোকের ইহকাল পরকাল নির্ভর করে। শিখ কখনও যুদ্ধে পশ্চাৎ দেখা-ইবে না।

১৪। প্রত্যেক শিখই প্রতিনিয়ত পঞ্চকক্কার অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কচ্ছ, কাচ্ছা (চিরুণী) ও কড়া (লোহার বালা) নিজ অঙ্গে ধারণ করিবে।

১৫। শিখমাত্রই আশ্রিতের রক্ষা করিবে।

উপদেশের পর গুরু তাঁহার পঞ্চশিষ্যকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে—তাঁহাকে পহল সংস্কার দিতে আদেশ করিলেন তাহারা সঙ্কুচিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, ঈশ্বরের আদেশে তিনি তাহাদিগকে পবিত্র দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষিত হইবামাত্রই শিখরা খালসা বা পবিত্র নামে অভিহিত, তখন গুরুতে আর খালসাতে কোন ভেদ থাকে না। এই-রূপ বুঝাইয়া গুরু তাহাদের হস্তে নিজের দীক্ষা নিজেই গ্রহণ করিলেন এবং নিজের নাম গোবিন্দ রায় হইতে গোবিন্দ সিংহে পরিবর্ত্তিত করিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে ১৬৯৮ খৃঃ গোবিন্দের যজ্ঞ শেষ হয় এবং পহল দীক্ষা ১৭০০ খৃঃ শিষ্যগণকে প্রদত্ত হয়। ইহার কিছুদিন পরে জাতিভেদ প্রথাও উঠিয়া যায় এবং উপবীত বর্জ্জনেরও ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশীয় অনেক শিখ উহাতে গুরুর দল ত্যাগ করে।

অতঃপর গুরুর শেষ জীবনের কথা। দীক্ষাদানের পর কয়েক বৎসর যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া গেল। গুরুর সৈন্যসংখ্যাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল, কিন্তু পার্ব্বত্য শত্রু ও মোগলের দল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। গুরুর বাসস্থান আনন্দপুরও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। অন্নাভাবে ও কষ্টে ৪০ জন শিখ ব্যতীত অন্য সকলে গুরুর মাতা ও স্ত্রী পুত্রকে লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিল। গুরুও ইহার পর দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ও কিছুকাল পরে নিজ পরিবারের সহিত মিলিত হই-লেন। আবার শত্রুও পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল। তাঁহার মাতা তাঁহার দুই পুত্রকে লইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। পুত্র দুইটি শিরহিন্দের মোগলদিগের হস্তে পড়িয়া নিহত হইল এবং পৌত্রের শোকে গুরুমাতাও প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। গুরু এই সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গুরু কতিপয় অনুচরসহ দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তিনি বাহাদুর শাহের মঙ্গলার্থ দিল্লীযাত্রা করেন এবং তথা হইতে আগ্রা এবং আগ্রা হইতে পথে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে নন্দের নগরীতে কিছুদিন বাস করেন। দাক্ষিণাত্যে বাসের সময় তিনি বৈরাগী বান্দাকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে শিখ-দিগের নেতৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, নন্দেরে বাদশাহ বাহাদুর শাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করেন। ইহার কিছু দিন পরই গুরু দেহত্যাগ করেন। গুরুর জীবনের ন্যায়

দেহত্যাগের ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারই আদেশমত এক পাঠান-বালক তাঁহাকে বৈর-নির্যাতনার্থ অস্ত্রাঘাত করে। ক্ষতটি প্রায় সারিয়া গেলেও কারণ বশতঃ উহা আবার বাড়িয়া উঠে। গুরু শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর দিন ধার্য্য করিয়া শিষ্যদিগকে, বন্ধুবান্ধবাদির সংবর্দ্ধনার উপযোগী আহার্য্য ও চিতার উপযোগী কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। দেহত্যাগের দিন রাত্রিতে তাঁহার আদেশমত তাঁহার অশ্বও সুসজ্জিত হইল। যথাসময়ে রাত্রিশেষে গুরু বীরবেশে রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া চিতার উপর উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।

গুরুর আদেশমত চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। ক্রমে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সজ্জিত অশ্বও অন্তর্হিত হইল। শিষ্যদিগের কর্ণকুহরে তাঁহার পবিত্র ধ্বনি প্রবেশ করিল—"শোক করিও না—গুরুর নাম স্মরণ করিও।"

শিখদিগের মতে ১৭৫৭ সংবতের (১৭০৮ খৃঃ) কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন বৃহস্পতিবার গুরুর দেহত্যাগ হয়।

গুরু চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যে তেজোবহ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহার শিক্ষার গুণে, তাঁহারই মন্ত্রশক্তিতে অসভ্য জাঠের দল প্রবল জাতিতে পরিণত হয় এবং কালে সমস্ত বিদেশী শত্রুকে বিদূরিত করিয়া পঞ্চনদে বিশাল রাজ্য স্থাপন করে। এক সময়ে তাহাদের "ওয়া গুরুজীকি ফতে" শব্দে পঞ্চনদ কম্পিত হইয়াছিল এবং শত্রুমাত্রই ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন দুর্নীতির বশে তাহারা গুরুর প্রকৃত শিক্ষা ভুলিল, তখন আবার তাহাদের অধোগতি হইল।

গোবিন্দের দীক্ষা প্রকৃতই কর্ম্মসন্ন্যাসের পবিত্র দীক্ষা। উহাতে সাত্বিকতার অভাব নাই, কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে উহার রাজসিকতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে দোষ তাঁহার নহে। তিনি আত্ম-চিন্তারত নিভৃত সাধক ছিলেন না। যে যুগে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে অত্যাচারীর বিনাশ ও আর্ত্তের পরিত্রাণের শিক্ষাই তাঁহাকে শিখাইতে হইয়াছিল। অত্যাচার কখনও রোদনে বা স্তব-স্তুতিতে যায় না। কাযেই তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দানবদলনোপযোগী প্রত্যপকারনীতিও শিখাইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছিল। এ নীতি সাধু-তাপসের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে—কিন্তু জগতের চক্ষুতে নহে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের জন্ম।

কোথায় হ'তে এলে তুমি অসহায়া,
কাতর আঁখি হেরে আমার হলো মায়া।
ভাবিনি মোর পরাণপুরে
উড়ে' এসে বসবে জুড়ে,
কাঙাল বলে' দিয়েছিলাম কৃপার ছায়া।

কারুণ্যে যে জাগ্‌ল ক্রমে অহমিকা
তারুণ্য সই করল তোমায় সাহসিকা।
অনুগ্রহের অন্তরালে,
বিজয়-টীকা পর্‌লে ভালে,
করুণা যে ধর্‌ল শেষে প্রেমের কায়া।

ক্রমেই দেখি সাহস তোমার গেল বেড়ে,
ধীরে ধীরে সবই আমার নিলে কেড়ে,
যাচ' না আর, কর্‌ছ দাবি,
তোমার হাতেই হিয়ার চাবি,
বল্লভা যে হ'লে, ছিলে কেবল জায়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

গুহামধ্যে।

১৭

"কি গো মা, বাড়ী আছ ?"

"আসুন আসুন।"

আমি মেয়েটির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে ডাকিলাম। সে ঘর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া আমাকে উত্তর দিল। দেখিয়া বোধ হইল, সে রন্ধন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

আমি বলিলাম—"এখন আমি আসি না কেন, মা !"

"না—না।"

"আর এক সময় আস্‌বো।"

"তা হবে না।"

"বাসায় শীগ্‌গির ফের্‌বার আমার প্রয়োজন হয়েছে।"

"তা হ'ক, একবার আপনাকে উপরে পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বাবা আপনার অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

আমার উত্তর দিবার আর কথা রহিল না। আমার সম্মতি বুঝিয়াই আবার সে বলিল, "একটু দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি হাতটা ধুয়েই যাচ্ছি। সিঁড়িটা অন্ধকার, একা উঠ্‌তে আপনার কষ্ট হবে।" বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অন্তর্হিত হইল।

আমি সিঁড়ির দিকটা পিছনে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার জীর্ণতা ও লোকশূন্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে মেয়েটি আমাকে ডাকিল—"বাবা আসুন।"

কখন্, কেমন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া হঠাৎ সে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল!

পিঠে একরাশ ছড়ানো চুল, কোমল হাসিমাখা সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করিতে নীল তারা দুটির ভিতর হইতে গভীর বিষাদের ইঙ্গিতভরা যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রু মুছা দুটা পটল-চেরা চোখ, দীনবসনের সরলাবরণে অকুণ্ঠিত সুস্থ-সৌন্দর্য্য বহন করা দেহযষ্টি—তাই ত,গুরুর কথাই কি ঠিক? এই মেয়েটাকেই যে দু'টার মধ্যে বেশী সুন্দর মনে হইতেছে !

"হাঁ মা, এ বাড়ীতে আর কোন মেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন ?"

"নেই কেউ,কেমন ক'রে দেখবেন? বাবা আছেন আর আমি আছি। সেই ঝিটি পাট ক'রে দিয়ে যায়। এখন চ'লে গেছে, বাসন-কোসন মাজ্‌তে সেই বিকালে আবার আস্‌বে।"

"তোমার মা ?"

"বছরখানেক আগে মারা পড়েছেন।"

"এ বাড়ীতে অন্য লোক বাস কর্‌বারও ত ঢের জায়গা আছে।"

"এটা বাবার কেনা বাড়ী। তিনি দেশ থেকে এখানে কাশীবাস কর্‌তে এসেছেন। ভাড়াটে রাখেন না।"

"এমন অনেক গরীব বিধবা আছে, যারা অমনি বাস কর্‌বার ঘর পেলে ধন্য হয়ে যায়।"

মেয়েটি এ কথার কোনও উত্তর দিল না, আমাকে কেবল উপরে চলিতে অনুরোধ করিল। আমার কথাটা সে যেন শুনিতেই পাইল না।

"তা হ'লে পিতার সেবা কর্‌তে একমাত্র তুমি ?"

"আমি দিন পাঁচ সাত এখানে এসেছি।"

"এতদিন ?"

"এতদিন কে সেবা করেছে জানি না।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম। এ যাহা বলিল, তার অর্থ কি ?

"আমার এখানে আস্‌বার আগে, শুনেছি আমাদের দেশের এক কাশীবাসিনী বুড়ী বাবার পরিচর্য্যা কর্‌ত। আমি এখানে এসে কিন্তু তাকে দেখিনি।"

"তুমি কি স্বামীর ঘরে থাক্‌তে?"

বিদ্যুৎ-বিলাসের মত মেয়েটা কেবল একরাশ হাসি মুখে মাখিল।

"এতে হাসির কথা কি আছে, মা?"

"আপনি কি বাবা গুরুদেবের মুখে শোনেন নি?"

"কই না তো!"

"সবে মাত্র পাঁচদিন আমার বিয়ে হয়েছে। আমি কুলীন-কন্যা!"

"হুঁ—বুঝেছি,—চল।"

ফুলের মত কোমল হাতখানিতে আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সন্তর্পণে উপরে তুলিতে লাগিল। সে উপরের ধাপে, আমি নিম্নে। সিঁড়ির খানিকটা অংশ নিশীথের অন্ধকার কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সেই স্থানটায় পা দিতেই মেয়েটা যেন তার স্পর্শটুকু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রূপটা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল।

দুষ্ট শিহরণ কিন্তু এবারে আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে চোখ দুটা আমার সহসা সিক্ত হইল। হাজার না বুঝার ভিতর হইতে আমি কি যেন একটা বুঝিতে পারিয়াছি। দিবসের নিবিড় আঁধার আমার দৃষ্টি-হীন চোখে কি এক তত্ত্বের আলোক ঢালিয়া দিয়াছে।

"হাঁ, মা, তোমার নাম কি সিধু?"

"কে আপনাকে বল্‌লে?"

"আরে মর্, রাঁধতে রাঁধতে আবার কোন চুলোয় গেলি?" উপরের কোনও একটা ঘর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর বাহির হইল।

"তাড়াতাড়ি কর্‌বেন না, আস্তে আস্তে পা দিয়ে আসুন। আর অন্ধকার নেই।"

"ও সিধি, সিধি!" এমন একটা কঠোর ভাষা ঘরের সেই এখনো না দেখা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল যে, শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিশেষতঃ যখন মনে হইল, কি কথাটা পিতা তাহার কন্যার প্রতি প্রয়োগ করিল, তখন সেরূপ জ্ঞানহীন ক্রোধীর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর রহিল না।

উপরে উঠিতে একটি মাত্র ধাপ বাকি। না উঠিবার সঙ্কল্পে যেই আমি দাঁড়াইয়াছি, মেয়েটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—"দাঁড়ালেন কেন? আর যেতে কি আপনার ইচ্ছা নেই?"

"উনিই তোমার বাবা?"

"উনিই।"

"তোমার বাবা আমার অপেক্ষা করছেন বল্‌ছিলে যে?"

"ওঁর এ কথা শুনে দেখা করতে কি আপনার ভয় হচ্ছে?"

"আর দেখা কর্‌বারই বা দরকার কি!"

মেয়েটি আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে ক্ষুণ্ণ বুঝিয়া আমি বলিলাম,—"আর এক সময় দেখা কর্‌লে কি চল্‌বে না? গুরুদেব বাড়ীতে এসেছেন। আমার ওখানেই আজ তাঁর সেবা।"

"তবে—" ক্ষোভটা তাহার এতই বেশী বোধ হইল, বিদায়ের কথা সে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না। শেষে বলিল—"অন্ধকারে আপনি নাম্‌তে পারবেন?"

"খুব পার্‌ব, মা।"

"না হয় আমি সঙ্গে যাই।"

"প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা রাগ কচ্ছেন।"

"করুগ্‌গে?" বলিয়া আবার যেমনই সে এক পৈঠায় পদ দিয়াছে, দ্বিগুণ কঠোর স্বরে আবার তার পিতা তাহাকে ডাকিল।

"আর তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

"তবে আসুন। সাবধানে সিঁড়িতে পা দেবেন।"

"তোমার নাম—"

"সিদ্ধেশ্বরী।"

নীচে নামিতেই শুনিতে পাইলাম, সিদ্ধেশ্বরী তাহার পিতাকে তিরস্কারের ছলে বলিতেছে—"অমন ক'রে চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"আমার পিণ্ডি চট্‌কাবার জন্যে।"

"সাধু মানুষ দেখা কর্‌তে এসে ফিরে গেলেন।"

"কেন?"

"যে কথা মুখ দে বার কর্‌লেন, ওরূপ কথা শুন্‌লে, যার মর্য্যাদা বোধ আছে, সে কি আর দেখা কর্‌তে সাহস করে?"

"কড়া কথা শুনে যে ভয়ে পালিয়ে যায়, সে আবার সাধু কি? তুই যেমন সতী, সেও তেমনি সাধু।"

ঠিক বলিয়াছ বৃদ্ধ, আমি এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

২০

কর্ম্মের খেলা—আমি যেন আজ কি করিতে কি করিতেছি। ব্রহ্মচারীর যা একান্ত অকর্ত্তব্য, বাধ্য হইয়া যেন, আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে।

যে ঘরে পিতা-পুত্রীর কথোপকথন হইতেছিল, উপরে উঠিয়া সেখানে পৌঁছিতে অনেকটা বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়। আমি তাই করিলাম। ভাবিলাম, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ দুই একটা কথা কহিয়াই আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিব। বাসায় গুরুদেব আমার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছেন, ঘরে আমার অনেক কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে।

সিঁড়িতে উঠিবার সময় পিতা-পুত্রীর কি কথোপকথন হইতেছিল, আমি শুনি নাই। কিন্তু প্রতি সিঁড়ি হাত দিয়া ধরিয়া অন্ধকার ভেদিয়া যেই আমি উপরে উঠিলাম, অমনই সিদ্ধেশ্বরীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, এখনো ইহারা আমার কথাই কহিতেছে। কন্যা বলিতেছিল—"বাক্যির দোষে দু'দিন একটা মানুষ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম পিতার কর্কশকণ্ঠের উত্তর :—"মানুষ হ'লেই থাক্‌তে পারে।"

"এত বড় বাড়ীর ভিতরে মাত্র এক জন বুড়োমানুষ বাস করে, যে শোনে, সেই অবাক্ হয়ে যায়।"

"দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

"পৃথিবীশুদ্ধ লোক দুষ্টু, ভালর মধ্যে উনি একা।"

"তা তুই বুঝ্‌বি কি পাপিষ্ঠা!"

"কাশীতে ব'সে—সাধুর নিন্দা—"

"তুই বেটী যেমন সতী, সে বেটাও তেমনি সাধু।"

"দেখুন বাবা, দেখলেন না শুনলেন না, এমন ক'রে এক জনকে গাল দিচ্ছেন কেন?"

"সে না দেখেই আমার দেখা হয়েছে। ওরকম সাধু কাশীর গলিতে গলিতে গাদা হয়ে জমে আছে। সাধু এসেছেন ধর্ম্ম করতে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে! সঙ্গ করবার আর তিনি লোক পেলেন না! তোর কাছে চতুর্ব্বর্গ আছে, সেই লোভে এসেছিল—না?" এই বলিয়া অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বরে পিতা পুত্রীকে আরও দুই একটা কি কথা শুনাইল। বোধ হইল, কথা অতি তীব্র—অশ্রাব্য। ইহার পরে আবার উচ্চ কর্কশ-কণ্ঠ। সম্বোধনের কথাটা আপনাদের শুনাইতে পারিলাম না।

বৃদ্ধের মুখ হইতে—স্বর শুনিয়া আমি তাহাকে বৃদ্ধই অনুমান করিয়াছি—পাছে আমার সম্বন্ধে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শুনিতে হয়, আমি একবারে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ব্রাহ্মণ একখানা নামাবলী কাঁধে দিয়া একখানি আসনে বসিয়া আছেন। মুখ তাঁর বিপরীত দিকে। বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁর কন্যা। বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ এখনো পূজায় বসিয়া। পূজার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সকল কথা লইয়া তাঁহার আলাপ হইতেছে।

মুখ এখনও দেখি নাই। দেখা যাইতেছে শুধু তাঁর পৃষ্ঠের কিয়দংশ। বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ। কিন্তু পৃষ্ঠের লোলচর্ম্মের মধ্য দিয়া যৌবনের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখনও যেন লুকাইয়া লুকাইয়া এক একবার দেখা দিতেছে।

ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে বার দুই চার জপ সারিয়া লইলেন। তার পর আবার যেই কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, অমনি আমি দ্বার হইতে ডাকিলাম—"মা!"

"আসুন—আসুন।"

বৃদ্ধ বোধ হয় কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই, ধ্যান করিতে করিতে, বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত হতভাগী, অমন মহাত্মার কৃপা পেয়েও—"

"চুপ করুন।"

"তোর চৈতন্য হ'ল না!"

পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া একটু জোরগলায় সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"ঠাকুর মশাই এসেছেন।"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইলেন। আমি দেখিলাম, যেন বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, কালস্রোতে প্রায় সমস্ত মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া, মাটীতে পড়িয়াছে—কিন্তু আজিও মরে নাই। যা দুই একটি শিকড় অবশিষ্ট আছে, তাহাদেরই সাহায্যে ক্ষীণ জীবন লইয়া মাটী আঁকাড়িয়া পড়িয়া আছে।

বয়োবৃদ্ধ—মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি কোনও কথা না কহিয়া, তাঁর চসমার ভিতর

দিয়া, বোধ হইল, আমার যেন আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার কন্যার ইচ্ছা ছিল, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

সিদ্ধেশ্বরী ব্যগ্রতার সহিত একখানা আসন আনিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

"থাক্ মা, এখন আমি বস্‌তে পার্‌ব না।"

বৃদ্ধ তখনও নীরবে চসমার ভিতর দিয়া বাণ-নিক্ষেপের মত আমার পানে চাহিয়া।

আমি বলিতে লাগিলাম—"কিন্তু দেখার এ যোগ্য সময় নয়, বাসাতেও শীগ্‌গির ফেরবার আমার প্রয়োজন, এই ভেবে, অন্য এক সময়ে দেখা করব মনে ক'রে চলে যাচ্ছিলুম। আপনার কথা শুনে ফিরলুম।"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ মলিন হইয়া গেল।

দেখিয়া আমি বলিলাম—"মুখ মলিন করবার এতে কিছু নেই মা। তোমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, আমার পিতার তুল্য। ওঁর কথা শুনে বাস্তবিকই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

আপাদ-মস্তক দেখা শেষ করিয়া বৃদ্ধ এইবার মুখ খুলিলেন—"নাম কি তোমার?"

"অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।"

"উপাধি ব্রহ্মচারী?"

"আজ্ঞে না—আশ্রম। আসল নাম ব্রহ্মচারী অম্বিকা-চৈতন্য।

"আকুমার?"

"আজ্ঞে না বাবা, সংসার ছিল।"

"তার কি হ'ল?"

"গুরু-কৃপায় ভেঙ্গে গেছে।"

"কত দিন?"

"প্রায় দশ বৎসর।"

"কুল্লে দশ বৎসর? তা হ'লে এখনও সংসারের নেশা আছে?"

"মনে হচ্ছে ত নেই।"

মাথাটা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ দন্তশূন্য মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মর্কট-বৈরাগ্য! বুঝেছি। যাও বাবা, এদিক ওদিকে লোভ না ক'রে আবার গিয়ে সংসার কর।"

"তিনবার করেছিলুম বাবা, তিনবারই ভগবান্ তা ভেঙ্গে দিয়েছেন—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—আর সংসারের ইচ্ছা নেই।"

"তা তো নেই—তবে এ সব দিকে তীব্রদৃষ্টি কেন—পরের সংসারে?"

"আপনি এ কি বলছেন!"

"আর বলাবলি কি, এই যে সুমুখেই দাঁড়িয়েছে, দেখ না।"

কন্যা এই সময় পিতাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—"ছি বাবা, ছি—মর্‌তে চলেছেন, এখনও পর্য্যন্ত আপনার এত নীচ অন্তঃকরণ!"

বৃদ্ধ সে কথায় উত্তর না দিয়া আমাকেই বলিলেন—"দেখছ ব্রহ্মচারী?"

"দোহাই বাবা, সাধুর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন না"—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বৃদ্ধের পা দু'টা জড়াইয়া ধরিল।

"চুপ কেন হে তিন সংসার-ভাঙ্গা ব্রহ্মচারী?"

আমি উত্তর দেবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। একান্ত না বলিলে চলে না, তাই বলিলাম—"আপনি কি বল্‌তে চান, বলুন।"

"আগে আমার কথার উত্তরটাই দাও না।"

"দোহাই বাবা, ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র না।"

এইবারে আমাকে বলিতে হইল—"দেখেছি।"

বৃদ্ধ পদতলে পতিতা কন্যার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া ঈষৎ উন্নমিত করিয়া আমার চোখের দিকে ধরিলেন। ধরিয়াই আমাকে আর একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে আদেশ করিলেন। অতি বার্দ্ধক্যের জড়তা-বিজড়িত গম্ভীর স্বর—আমি আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশে সিদ্ধেশ্বরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে—আবদ্ধ নীলাভ তার তারা দুটা হঠাৎ বন্ধনে যেন বিরক্ত হইয়া মুক্ত হইবার জন্য পলক দুইটাকে কাঁপাইতেছে।

রূপের বর্ণনা করিতে বসি নাই, কিন্তু দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আমার চাঞ্চল্য আসে নাই, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিব না।

"দেখছ সাধু?"

"দেখছি বাবা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

উত্তরে বৃদ্ধ যেন কিছু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িলেন—

সহসা আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া গলাটা কিছু সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—"ভগবতী সে ত আমিও জানি, প্রত্যেক নারী ভগবতীর এক এক মূর্ত্তি।

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

আমিও তা জানি ব্রহ্মচারী, কিন্তু—"

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আমি বলিলাম—"আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিত থাকিলে এই মায়ের চেয়ে আট দশ বৎসরের বড় হইত।"

সেই দন্তহীন মুখ আবার রহস্যের হাসিতে ভরিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরীর মুখও তাঁহার হাত হইতে এইবারে মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু সে উঠিল না, পিতার আসনের পাশে বসিয়া বিস্মিতার মত যেন সে এ বিচিত্র কথোপকথন শুনিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, বামহাতে ভর দিয়া বসিল, সে স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া। দেখিয়া মনে হইল, আমার মুখ হইতে সে তার বাপের হাসির উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমি মিছে কইনি প্রভু, আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি।"

এবারে হো হো হাসি। সে হাসি, কি জানি কেন, আমাকে এমন অপ্রতিভ করিয়া তুলিল যে, সেই অতি-বৃদ্ধের কোটর-গত দৃষ্টির সম্মুখেও আমি মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ হাসি রাখিয়া আবার গম্ভীর হইলেন। সেই গম্ভীর-ভাব-মথিত স্বরে—এইবারে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বাক্য প্রয়োগ করিব, তাঁর সুন্দর-সুস্পষ্ট উচ্চারিত শ্লোক, তাঁর রহস্য-গর্ভ কথা আমাকে ক্রমে তাঁর আয়ত্তে আনিতেছে—গম্ভীর, ওঁকার নিনাদের মত ষড়জ-সংবাদিস্বরে তিনি বলিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবিত, তার বয়স তোমার চেয়ে বেশী—পূর্ব্ববঙ্গের বড় পণ্ডিত তারাদাস বাচস্পতির কথা শুনেছ?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "তিনিই আপনার পুত্র?"

"তার বয়স তোমারই মতন। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আমার এই মায়ের চেয়ে—ক' বছরের বড়, বল্ না রে হতভাগা মেয়ে!"

"দশ বারো বছরের বড়।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"তোমারই বয়সে—অনেক শাস্ত্র প'ড়ে—বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে আমি কাশীতে আসি। দেখতে পাচ্ছ"—আবার ব্রাহ্মণ কন্যার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন—"এই আমার বানপ্রস্থের ফল। আমি বড় কুলীন। এখানে আমার আসার কথা শুনেই, আমারই মত এক কাশীবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ—তাঁর এক পঁচিশ বৎসরের কুমারী কন্যা আমাকে গছিয়ে দিলে। কৌলীন্যের অভিমান—আমি 'না' বল্‌তে পার্‌লুম না। বুঝতে পারছ ব্রহ্মচারী, আমার অবস্থা?"

"আপনার ভাল অবস্থা।"

"কি, টাকার?"

"না প্রভু, মনের।"

আমি যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপই বলিয়াছি, চাটুবাক্যে তাঁকে তুষ্ট করিতে বলি নাই। কিন্তু কথাটা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ যেন সন্তুষ্ট হইলেন, এক মুহূর্ত্তে আমার প্রতি তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ব'স।"

আমি হাতযোড় করিয়া বলিলাম,—"ক্ষমা করুন, আজ বস্‌তে পারব না।"

কিন্তু পিতার মুখ হইতে বসিবার কথা বাহির হইতে না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী আসন আনিতে অন্য ঘরে ছুটিয়া গেল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"অনেককাল পরে আলাপ করবার এক জন লোক পেয়েছি।"

"এর পরে আস্‌ব—মাঝে মাঝে আস্‌ব!"

"এসো—যে ক'টা দিন বাঁচি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে বেশী দিন থাকৃতে পার্‌ব না প্রভু!"

"কেন?"

"গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে তাঁর তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী কর্‌তে চেয়েছেন।"

"কবে যাবার ইচ্ছা করেছ?"

"ইচ্ছা তাঁর। তবে বোধ হয়, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। কতকগুলো আমার ঝঞ্ঝাট আছে, এই সময়ের মধ্যে মিটিয়ে ফেল্‌বো।"

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরেই একটি গভীর

শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তিনি মাথা তুলিলেন। মর্ম্মে যেন তাঁর লুকানো তীব্রবেদনা—আমাকে জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশে তাঁর সাহস হইতেছে না।

"হুঁ! কবে ফির্‌বে?"

সিদ্ধেশ্বরী এই সময় আসন লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার আসনের পার্শ্বে পাতিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম—"বস্‌বার যে আর উপায় নেই, মা?"

"একটুখানি বস্‌তে পার্‌বেন না?"

"কেন পার্‌ব না, তুমি ত জান সিদ্ধেশ্বরী! এর অনেক পূর্ব্বে আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল।"

সিদ্ধেশ্বরী আর অনুরোধ করিল না।

বৃদ্ধও বসিতে অনুরোধ না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমিই বল গো, মা!"

সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আজ!"

"আজ!" প্রজ্বলিত দৃষ্টি দিয়া বৃদ্ধ উভয়েরই মুখ দেখিয়া লইলেন।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"গঙ্গাস্নান ক'রে ফের্‌বার সময় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। তখন আমি স্বামীর গুরুদেবের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনিই এ বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমার স্বামীর গুরুভাই।"

শুনিয়াই বৃদ্ধ একটু মৃদু-তীব্রকণ্ঠে কন্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! এ কথা আগে বল্‌লে ত তোকে কতকগুলো গাল খেতে হ'ত না!"

কন্যাও যেন সুযোগ পাইয়া অভিমানভরে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি বল্‌বার সময় দিলেন!" চক্ষু এইবারে তার জলভারাক্রান্ত হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ হইতে সে চোখে অঞ্চল দিল।

আর এ সব লক্ষ্য করিলে আমার চলে না। করযোড়ে এইবারে আবার আমি বৃদ্ধের কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম—"গুরুদেব আজ কৃপা ক'রে আমার ঘরে অতিথি।"

"তা হ'লে আর তোমাকে থাক্‌বার অনুরোধ কর্‌তে পারি না। দে সিদ্ধেশ্বরী বাবাজীকে হাত ধ'রে নীচে নামিয়ে দে সিঁড়িটায় বড় অন্ধকার।"

২১

সিদ্ধেশ্বরী দোরের কাছে আসিল।

আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম—"তোমারও ত আজ প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ আছে, মা!"

"যাব বাবা?" কন্যা পিতার অনুমতি চাহিল।

"নিশ্চয় যাবি।"—এমন উত্তর এত শীঘ্র পিতার কাছে পাইবে সে, আমি বুঝিতে পারি নাই।

অনুমতিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী স্মিত-বিগলিত কথায় আমাকে বলিল—"আর দণ্ডখানেক সময়ের জন্য আপনি দাঁড়াতে পার্‌বেন না?"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব। যাব ব'লে সকাল সকাল রান্না সেরেছি, বাবাকে দিয়ে যাই।"

"কেন, যোগিনী মা?"

"আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে ব'লে সেই যে তিনি চ'লে গেছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।"

"আপনার কি মত বাবা?" আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যই মনে করিলাম।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"তুমি ওর স্বামীর গুরুভাই—তার অনুপস্থিতিতে তুমিই ওর অভিভাবক।"

"তা হ'লে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না সিদ্ধেশ্বরী।"

"এই ঘরেই এনে দিই বাবা?"

"নিয়ে আয়, এইখানেই ঠাকুরকে নিবেদন করি।"

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পিতার আসন ও জলপাত্র রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহিরে যাইতেছিল। দোরের চৌকাঠে সে পা'টি দিয়াছে, এমন সময় আমি বলিলাম—হায়! কুক্ষণে আমি সে প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম—তার পর এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের সন্ন্যাস—এখনও পর্য্যন্ত সে দিনের স্মৃতি মাঝে মাঝে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মানলে আহুতি দিয়াছি, তথাপি সে স্মৃতির অগ্নি-রেখা আজিও পর্য্যন্ত মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, গৃহত্যাগমুখী সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া—"অনেকক্ষণ আগেই আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল।

[শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

পথে।

তোমার রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়েই আমার সব কায পণ্ড হয়ে গেল।"

বলিতেই দেখি, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ শুকাইয়া গেল। আমার দিকে না চাহিয়া, চাহিল সে পিতার মুখের দিকে। আমিও বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইলাম। উঃ! কি ক্রোধবিক্ষুব্ধ দৃষ্টি! "উনি আমাকে তাঁর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবা! আপুনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যাও, ঠাকুরের অন্ন নিয়ে এস। আর ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

সিদ্ধেশ্বরী তবু দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় আমার মুখের উত্তর শুনিবার জন্য। আমি কিন্তু নিরুত্তর। মেয়েটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সংশয় গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী, নিশ্চিত না জানিয়া কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে যখন মনেও আলোচনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমি দাঁড়াইয়া গুরুস্মরণে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুদেব বলিয়াছেন, 'কে কোথায় পড়িয়া আছে, কি করিতেছে, ভগবান্ তা দেখেন না, তিনি কেবল মন দেখেন। যদি ভগবানের কৃপা পাইতে চাও, তুমিও দেখিয়ো না।' আমি ত ইহাদের কাহারও মন দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইহাদের উপর সংশয় জাগাইয়া আমার তপস্যার হানি করি?

তবু ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না, আমি সিদ্ধেশ্বরীর মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সে হাস্যময়ী—পিতার ক্রোধ তাকে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ করে নাই।

"বলুন না আপনি, কি হয়েছিল?"

"আর বল্‌তে হবে না মা, তুমি যাও।"

বৃদ্ধ এইবারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমি যাও সিদ্ধেশ্বরী"—বলিয়া একটু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই সিদ্ধেশ্বরী আর দাঁড়াইতে পারিল না।

সে চলিয়া গেলে আমি বৃদ্ধকে প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"তুমি আগে বলই না, তার পর আমার যা বল্‌বার বল্‌ব।"

বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিলাম, বৃদ্ধের এখনও ক্রোধের নিবৃত্তি হয় নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এ অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। এতক্ষণ ব্রজমাধবের স্মৃতি মন হইতে একরূপ বিলুপ্তই হইয়াছিল। এই প্রশ্নে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডে আমি বেদনা অনুভব করিলাম। বলিলাম—"তিনবারমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—এই কাশীতে। একবার গুরুদেবের সুমুখে, একবার আমার বাসায়, আর তৃতীয়বার আজ, একটু আগে তাঁরই বাড়ীতে। পূর্ব্বে তাঁর পরিচয় জেনেছিলুম, তাঁর নাম ব্রজমাধববাবু, পাবনার জমীদার। 'রাজাবাবু' নাম আপনার কন্যার মুখেই আমার প্রথম শোনা।"

"মেয়ের কাছে তার নাম ওঠবার কখন্ আবশ্যক হ'ল?"

"তাঁর বাড়ীতে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।" এই বলিয়া রাজাবাবুর বাড়ীতে যাবার ইতিবৃত্তটা আমি বৃদ্ধকে শুনাইয়া দিলাম।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন। বোধ হইল, আমার কথায় তাঁর বিশ্বাস হইল না। আমি দেখিলাম, তাঁর সংশয় দূর করা আমার প্রয়োজন, নতুবা আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই ক্রোধী বৃদ্ধ কন্যাকে তিরস্কার করিবে। যাহা কাহাকেও জানাইব না স্থির করিয়াছিলাম, সেই কথা আমাকে বলিতে হইল—"পূর্ব্বের দু'বারের দেখায় তার ঠিক পরিচয় পাইনি প্রভু, আজ পেয়েছি।"

"কি রকম?"

আমি গণ্ড দেখাইলাম।

"কি ও?"

"দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?"

"সিদ্ধেশ্বরী!"

দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী আমাদের কথা শুনিবার কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে।

"থালা রেখে দেখ্ দেখি মা, বাবাজির গালটা।"

২২

"ও বাবা, এ কি!" আমার গণ্ড দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী শিহরিয়া উঠিল।

"কি রে?"

"এঁর গালে চড় মার্‌লে কে—আপনি থাবা, আপনি?"

"ব্যাপার কি অম্বিকাচৈতন্য, ব্যাপার কি বাবা?"

বৃদ্ধের কারুণ্যপূর্ণ প্রশ্নকথায় আমি ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কেন মার্‌লে ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। এ কথা আমি কাউকেও বলব না সঙ্কল্প করেছিলুম।"

"বুঝেছি। আমার এই হতভাগা কন্যাই হচ্ছে তোমার এই লাঞ্ছনার কারণ।"

কন্যা কোনও উত্তর দিল না। সে ম্লানমুখে আমার দিকে কেবল চাহিল। দেখিলাম, তার চোখের কোণে জল জড় হইয়াছে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিতে আমি বলিলাম—"সম্পূর্ণ কারণ নয়, কতক বটে। প্রথমবারে আপনার বাড়ী থেকে যখন আমি বা'র হই, তখন বোধ হয়, তাদের কোনও লোক কোন আড়াল থেকে আমাকে দেখেছিল। মা'র সম্বন্ধে একটা কথায় আমি সেটা অনুমান কর্‌ছিলুম।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলেছিল ?"

"সে কথা আর শোনবার দরকার কি বাবা!"

"বল না।"

কর দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া আমি বলিলাম—"দোহাই বাবা, আমাকে অনুরোধ করবেন না, আমি বল্‌ব না।"

"বুঝছিস্, পাপিষ্ঠা!"

"তবে, আগেই আপনাকে ত বলেছি, সম্পূর্ণ কারণ আপনার কন্যা নয়, আমাকে প্রহার কর্‌বার তাদের অন্য কারণও আছে।"

আমার গণ্ডে দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে তৈল আনিতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম—"প্রয়োজন নাই। আমাকে আর একবার গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে। কি অবস্থায় সে মুর্খটা আমাকে ছুঁয়েছে, আমার ত জানা নেই।"

"সে পাষণ্ডের কাছে কি কর্‌তে গিয়েছিলে বাবা!"

হায়, আর যদি কিছু না বলিতাম। আর কিছু না বলাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কি এক সংযমের অভাব—বলিতে আমার প্রবৃত্তি আসিল। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীকে সম্বোধন করিলাম—"মা! যদি কাউকে না বল্‌তে প্রতিশ্রুত হও, তা হ'লে বলি।"

"কাউকেও বল্‌ব না।"

পিতা কন্যাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক তুই, বুঝে বল্—ভাবে বোধ হচ্ছে, কোন গুহ্য কথা।"

আমি বলিলাম—"কথা প্রকাশ পায়, আমার ইচ্ছা নয়।"

সিদ্ধেশ্বরী আমার এ কথার পরও শুনিতে আগ্রহ দেখাইল—"কিছুতেই প্রকাশ পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি বলিতে লাগিলাম—"গত বৎসর প্রায় এমনি সময়ে—সে দিন ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে রাত্রিকালে আমি একটি সদ্যোজাত শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—একটি মেয়ে—"

বলিয়া, সিদ্ধেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, সেই রাত্রির অন্ধকারটা তার মুখটি আচ্ছন্ন করিবার জন্য যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

"আপনি বলুন।"

"সেই কন্যাকে ঘরে আনি। আজ প্রায় এক বৎসর সেই কন্যাকে পালন কর্‌ছি।"

উত্তেজিতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"সে বেঁচে আছে ?"

"শোন্ হতভাগী, কি বলে, আগে শোন্।" বৃদ্ধের সেইরূপই উত্তেজিত কণ্ঠ।

আমি বলিলাম—"বেঁচে আছে।"

"বাঁচিয়েছেন—আপনি তাকে বাঁচিয়েছেন ?" সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠে সহসা কি যেন এক জড়তা প্রবেশ করিল।

আমি বুঝিয়াও কেন বুঝিলাম না ? বলিতে আরম্ভ করিলাম—"আমি বাঁচাইনি মা, বাঁচিয়েছেন ওই রাজাবাবুর স্ত্রী। তিনিই এক বৎসর ধ'রে স্তন্য দিয়ে শিশুকে রক্ষা করেছেন। এমন ছদ্মবেশে তিনি আস্‌তেন—"

আর আমাকে বলিতে হইল না। হঠাৎ দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতে কাঁপিতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

একবারে পড়িলে, বোধ হয়, সেই সময়েই তার মৃত্যু হইত। প্রথমে সে বসিবার মত পড়িয়া গেল। তার পর টাল খাইয়া মেঝের উপর তার দেহ পতিত হইল।

পতনের সঙ্গে কপাল হইতে ছুটিল ফিন্‌কি দিয়া রক্ত। অন্নপাত্র, ব্রাহ্মণের বস্ত্র, আমারও বস্ত্রের দু' এক স্থান রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল। সাহায্যের জন্য মন আমার অস্থির হইলেও সম্মুখস্থ নিস্পন্দবৎ উপবিষ্ট বৃদ্ধের অসন্তোষ উৎপাদনের

ভয়ে আমি তাঁর কন্যার অনাবৃত দেহস্পর্শে সাহসী হইলাম না। কিন্তু রক্ষা—রক্ষা—চাই মেয়েটার রক্ষা - বৃদ্ধ নিস্পন্দ, প্রাণহীনবৎ—পরকোলার ভিতর দিয়া দু'টি যেন ভৌতিক চক্ষু পতিতা সংজ্ঞাহীনা কন্যার পানে চাহিয়া আছে!

আমি বলিলাম—"সিদ্ধেশ্বরীর মুখে একটু জল দিন।" উত্তর ত পাইলামই না, চোখ পর্য্যন্ত তার আমার দিকে ফিরিল না।

"আদেশ করুন, আমি সাহায্য করি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা, আমি সুস্থ হয়েছি" বলিয়াই সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া বসিল। নিজের আঘাত ভুলিয়া তার সরমরক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়া, আমি দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে আমি এখন কি করব মা?"

"আপনি আসুন, যোগীমা এলে, পারি যদি তাঁর সঙ্গে যাব।"

"মা! তোমাকে সুস্থ না দেখে, যেতে যে আমার মন সরছে না। এখনও রক্ত—"

"পড়ুক। কোন আশঙ্কা করবেন না বাবা, আমার মৃত্যু হবে না।" বলিয়া সে ক্ষতস্থানে একবার হাত দিল। দেখিলাম, সমস্ত হাতের পাতা তার রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

"যোগীমা কোথায় থাকেন বল, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা!"

"তবে আসি মা!"

ঘর হইতে বাহির হইবার মুখে ব্রাহ্মণের দিকে একবার চাহিলাম। বৃদ্ধ সেইরূপই জড়বৎ দেহ লইয়া বসিয়া আছেন।

"বাবা! বাবা—বাবা!" সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তিনবারমাত্র সিদ্ধেশ্বরীর কথা শুনিতে পাইলাম। দৃশ্য দেখিয়া আমিও জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। আর কিছু সে বলিয়াছে কি না শুনি নাই, অথবা আমার কানে প্রবেশ করে নাই।

সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেই পা দিয়াছি, অমনি শুনিলাম—"আপনি গেলেন কি?" উঠানে নামিয়া উপর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনাকে আর একবার উপরে আস্‌তে হবে।"

তার কথার ভাবে বুঝিলাম, আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।—

"যাচ্ছি মা!"

* * * * * *

দোরের মধ্যে মাথা প্রবেশ না করাইতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"বাবাকে একবার দেখুন দেখি।"

দেখিলাম। ব্রাহ্মণ সেইরূপই উপবিষ্ট। কিন্তু আমাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাঁর দেহ হইতে প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অন্তর্যামী।

মো কো কঁহা ঢুঁঢ়ো বন্দে মৈ তো তেরে পাসমেঁ।
নামৈঁ দেবল নামৈঁ মস্‌জিদ ন কাবে কৈলাসমেঁ।

—কবীর।

তাঁহায় মিছে খুঁজছ কোথায়
তিনি তোমার পাশে,
মস্‌জিদে নেই মন্দিরে নেই
কাবা বা কৈলাসে।
জপে নেইক যাগে নেইক
যোগে বা বৈরাগে,

তিনি আছেন তোমার সাথে
তিনি তোমার আগে।
গভীর সাগর রবি সোমে
নেই ব্যোমে বাতাসে,
কবীর কহে আছেন তোমার
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারতের বন-সম্পদ।

সকল দেশেই বন-ভূমি জাতীয় সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশাল বনস্পতি হইতে ক্ষুদ্রকায় তরু ও লতাগুল্ম পর্য্যন্ত সবই নানারূপে দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানুষের ধনলালসা হেতু অনেক দেশে বনভূমির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজ দেশের প্রয়োজনসাধনের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বন-রক্ষার প্রতি দেশবাসীদিগের দৃষ্টি ছিল, যেহেতু, প্রাচীন আর্য্যগণ বন-ভূমিকে আধ্যাত্মিক সম্পদের আলয় বলিয়া মনে করিতেন। মুনি, ঋষি, যোগী, তপস্বিগণ বনমধ্যে বাস করিয়া দেশের কল্যাণার্থ তথায় যাগ-যজ্ঞ তপশ্চরণ করিতেন; নৃপতিগণ বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। অদ্যাপি ভারতের বনভূমি সকল সেই প্রাচীন কালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। কত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা, কত পুরাণ ও তাহার ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা প্রভৃতি যে এ দেশের বনমধ্যে রচিত হইয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? এখনও সেই নৈমিষারণ্য বিদ্যমান আছে, যাহা দেখিলে শৌনকের মহাযজ্ঞ ও তথায় বৈশম্পায়নপুত্র সৌতি কর্ত্তৃক মহাভারত পাঠের কথা স্বতই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে, বাল্মীকির তপোবন দেখিলে তদ্রচিত মধুর রামায়ণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেইরূপ দণ্ডকারণ্য,পঞ্চবটী প্রভৃতি বনভূমি কত যুগের কত বিচিত্র কাহিনীই না মনে আনয়ন করে। এই জন্যই এ দেশবাসী বনকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র মনে করে এবং অদ্যাপি অনেক স্থলে বন-দেবতার পূজা না দিয়া তথায় কেহ কোন গাছ কাটে না। কিন্তু কালের গতিতে বনের প্রতি লোকের অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে,সুতরাং বহু বন বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালার সুন্দরবন তাহার দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে।

এ দেশে বৃটিশ-শাসনের প্রথম যুগ হইতেই বন-ভূমির উচ্ছেদ আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বৃটিশ দ্বীপের বৃহৎকায় ওক বৃক্ষ সকল বৃটিশের বাণিজ্যপোত ও নৌ-বহর নির্ম্মাণ কার্য্যে নিঃশেষিত হইয়া পড়ে, তখন ভারতবর্ষের বন-ভূমি ও তন্মধ্যস্থ বনস্পতি সকলের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়ে। তাঁহারা মালাবার ও কানারা প্রদেশের অরণ্য হইতে শত শত বৎসরের পুরাতন সেগুন গাছ সকল কাটিয়া ইংলণ্ডে চালান দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরের মধ্যে মালাবার ও কানারার বনে আর বৃহৎকায় বৃক্ষ রহিল না। তখন নবলব্ধ দক্ষিণ ব্রহ্মের অরণ্যের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িল। দক্ষিণ ভারতের মত দক্ষিণ ব্রহ্মেরও বন উজাড় হইতে লাগিল। ক্রমে পোতনির্ম্মাণ কার্য্যে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে লৌহ ব্যবহৃত হইতে থাকিলেও ভারতের বন-ভূমি কাঠুরিয়ার অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইল না। ভারতের শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ অট্টালিকার দ্বার, জানালা ও গৃহের আস্‌বাব নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে, এ দেশের ঐ সকল কাষ্ঠ বিলাতী ওক প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে লাগিল এবং তাহাতে ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

কাষ্ঠ ব্যতীত যে বন-ভূমির অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে, বৃটিশ বণিকরাজের মনে তখন তাহা প্রতিভাত হয় নাই। বন-ভূমির দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক কল্যাণ কিরূপ সাধিত হয়, তাঁহারা তাহা জানিতেন না। বনচ্ছায়াতলস্থ শৈত্যভূমি সূর্য্যকরে শুষ্ক হইয়া যে মেঘের সৃষ্টি করে—এবং যথাকালে সেই মেঘ বর্ষণ দ্বারা দেশ শস্যশালিনী হয়, এ তত্ত্ব তাঁহারা জানিতেন না; সুতরাং বনরক্ষার প্রতি তাঁহাদিগের কোনরূপ দৃষ্টি ছিল না। ফলে তাঁহাদিগের দেখাদেখি দেশের লোকও নিজ নিজ স্বার্থের জন্য মূল্যবান্ বৃক্ষ সকল মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহাদিগকে কাটিয়া জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। ঐ সকল

বৃক্ষকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কেহ তাহাদিগের ঐ কার্য্যে বাধা দিত না। রাজপুরুষরা মনে করিতেন, বন-ভূমির এইরূপে উচ্ছেদ সাধিত হইলে দেশে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং যতই বন নষ্ট হয়, ততই ভাল। ক্রমে আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল। এ দেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণের সূত্রপাত হইল, সুতরাং রেল লাইন পাতিবার জন্য কাঠের পাড়ন বা Sleeper প্রয়োজন হইল, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য বৃক্ষ সকল কর্ত্তিত হইতে লাগিল। বন উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে যে বন রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, এ কথা তখনও কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

অর্দ্ধশতাব্দী কাল এই ভাবে চলিয়া যায়। যে কোন ব্যবসায়ী উচ্চমূল্য দিয়া বৃক্ষচ্ছেদনের অধিকার প্রার্থনা করিত, সে-ই অনুমতি পাইত। কিন্তু সে ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, সেই সকল বৃক্ষের আর্থিক হিসাবে অন্য প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ক্রমশঃ যখন বহু অরণ্যানীর ঘনসন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ডকাণ্ড বৃক্ষ সকল নিঃশেষ হইতে লাগিল, রাজপুরুষদিগের মনে তখন ভবিষ্যৎ ভাবনার উদয় হইল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা বন-ভাণ্ডার অক্ষয় ও অফুরন্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং কেহ কেহ বা বন-ভূমিকে কৃষি-বিস্তারের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এ দেশে একমাত্র কৃষির উন্নতি হইলেই দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বনের উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেন। এই হেতু বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের বহু বন-ভূমি চিরস্থায়িরূপে জমীদার ও অর্থশালী কৃষিব্যবসায়ীদিগকে হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক, বোম্বাই, মালাবার ও ব্রহ্মদেশের বন-ভূমি সকলের অবস্থা পরিদর্শন জন্য ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বনরক্ষক (Conservator of Forests) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও মনে যে সে সময়ে বনরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কার্য্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি পড়ে মিঃ কনোলী নামে মালাবারের এক কলেক্টরের। তাঁহার অধীনস্থ জিলার জঙ্গল মহল ক্রমে তরুশূন্য হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি স্বতন্ত্র স্থানে সেগুন গাছের আবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাঁহার সেই উদ্যোগের ফলে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের নীলাম্বর সেগুন-ক্ষেত্র সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এইরূপে রাজস্ব বিভাগের এক কর্ম্মচারীর চেষ্টায় একটি নূতন জঙ্গল-মহলের সৃষ্টি হইতে দেখিয়াও পুরাতন বন-ভূমির রক্ষকগণের কোনরূপ চৈতন্যোদয় হয় নাই, সুতরাং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশের অরণ্যানীসমূহ দিন-দিনই সেগুনগাছ বিরল হইতে থাকে, অন্য দিকে হিমালয় ও যুক্তপ্রদেশের বন দেবদারু ও শালবৃক্ষশূন্য হইয়া উঠে; আসাম প্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের জঙ্গলের অবস্থাও ঐরূপ শোচনীয় হয়। এই হেতু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার পর-বৎসর ডাক্তার ম্যাকলেলাণ্ড নামে জনৈক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্রহ্মের পেগু প্রদেশস্থ বন-ভূমির অবস্থা পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হয়েন। তিনি তথাকার ভিন্ন ভিন্ন বন-ভূমির পরিদর্শনানন্তর যে রিপোর্ট দিলেন, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মনে আতঙ্কের উদয় হইল। যে বন-ভূমি রাজকোষে বিপুল অর্থ আনয়ন করিতেছিল, এবং যাহার জন্য বৃটিশ রণপোত নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন, তাহা যে অফুরন্ত ভাণ্ডার নহে, এই রিপোর্ট পাঠে তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইল। এই সময়ে লর্ড ড্যালহৌসী ভারতের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, তাঁহার শাসনকালে অনেকগুলি উন্নতিকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ত্তবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন, রেলওয়ে স্থাপন ও টেলিগ্রাফ বিস্তারের ব্যবস্থা করেন; কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য তাঁহারই শাসনকালে খাল খননের সূত্রপাত হয়; ডাক বিভাগ সংগঠন ও ভারতের সর্ব্বত্র আধ আনা মাশুলে চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন, এবং সরকারী বন-ভূমি রক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত তাঁহারই উদ্যোগে হইয়াছিল। এই সকল শুভানুষ্ঠানের জন্য লর্ড ড্যালহৌসীর নাম এ দেশে যেমন চিরস্মরণীয় হইয়াছে, অন্য দিকে মারাঠা ও অন্যান্য এদেশীয় রাজ্য সকল বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া তিনি কলঙ্কভাগীও হইয়া গিয়াছেন।

লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বনরক্ষাকল্পে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নিবদ্ধ করেন এবং প্রথমেই ব্রহ্মদেশের ধ্বংস-প্রায় সেগুনবন রক্ষার জন্য ডাক্তার ব্রাণ্ডিস (Dr. Brandis) নামক এক জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিককে বন-তত্ত্বাবধায়কের পদে

(Suprintendent of Forests) নিযুক্ত করেন। অনতিকালমধ্যে ডাক্তার ব্রাণ্ডিস ভারতের বন-ভূমির পরিদর্শন ও পরিরক্ষণ বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহাতে বনতত্ত্বের গবেষণা সম্বন্ধে একটি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইল। ডাক্তার ব্রাণ্ডিস তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই বৃটিশ কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীদিগের অবাধ বৃক্ষচ্ছেদনের অধিকার লোপ করিলেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেক বিঘ্ন-বাধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ইংরাজ সরকারের আয় যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনই নবীন তরু সকল রক্ষার সুব্যবস্থা দ্বারা সরকারের ভবিষ্যৎ আয়ও সংরক্ষিত হইল। আর একটি উপকার হইল। এ দেশের কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র লোক চিরকাল বন-মধ্যে তাহাদিগের গো-মহিষাদি চরাইত এবং জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য অরণ্যজাত "আগাছা" শ্রেণীর বৃক্ষ সকল বিনা-মূল্যে পাইত। বৃটিশ কাষ্ঠব্যবসায়ীরা যে সময় হইতে পাট্টা করিয়া বন জমা হইতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে কৃষক ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদিগের সেই সনাতন অধিকারে বঞ্চিত হয়। ডাক্তার ব্রাণ্ডিসের ব্যবস্থায় তাহারা তাহাদিগের সেই পুরাতন অধিকার পুনরায় লাভ করিয়া দুই হাত তুলিয়া সরকারকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পূর্ত্তবিভাগ ও রেলওয়ে কোম্পানীর কার্য্যের জন্য কাষ্ঠের অপ্রতুলতার যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাও তিরোহিত হইল। তাৎকালিক ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ডাক্তার ব্রাণ্ডিসের এই কার্য্যদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে Inspector-General of Forests পদে নিযুক্ত করিয়া সমগ্র ভারতের বন-ভূমির তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর ডাক্তার ব্রাণ্ডিসের পরামর্শানুসারে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বন-রক্ষার জন্য প্রাদেশিক বন-বিভাগ সংস্থাপিত হইল এবং তদনুসারে যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের বন-রক্ষারও সুবন্দোবস্ত হইল। ডাক্তার ব্রাণ্ডিস যখন এইরূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বন-রক্ষা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, সেই সময়ে এ দেশের জঙ্গল-মহলের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জনৈক বিশেষজ্ঞ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন :—

Enormous areas of ruined and devastated forests existed in almost every province; also large areas of disafforested and unproductive land; springs and streams have dried up owing to the destruction of the forest in the Catchment Areas. In these regions land had gone out of cultivation, rivers had silted up as also harbours and small ports on the coasts. And throughout the country unrestricted grazing and firing of the forests were in force; and shifting cultivation was still practised on a large scale.

প্রায় সকল প্রদেশেরই বিশাল বন-ভূমি সকল ধ্বংস-প্রায় ও উচ্ছিন্ন হইয়াছে; সর্ব্বত্রই বন-ভূমি বৃক্ষশূন্য ও উৎপাদিকাশক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; নদীমাতৃক স্থান সমূহে বনোচ্ছেদ হেতু উৎস ও স্রোতোধারা সকল শুকাইয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থানের ভূমি আবাদশূন্য হইয়াছে ও নদী সকল মজিয়া গিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও গঞ্জ সকলেরও অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্রই বন-ভূমিমধ্যে অবাধ গোচারণ ও অগ্নি প্রদান চলিতেছে এবং খামখেয়ালীভাবে কৃষিকার্য্য চলিতেছে।

নূতন বন-রক্ষার ব্যবস্থায় এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের উপকারিতা, অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজপুরুষদিগেরও বুঝিতে বহু দিন লাগিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে যে সকল রাজপুরুষ তাঁহাদিগের এলাকার অন্তর্গত বন-ভূমির হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলেন, নূতন শ্রেণীর বন-রক্ষক কর্ম্মচারীর নিয়োগ তাঁহারা ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন এবং নানারূপে নূতন কর্ম্মচারীদিগের অনুসৃত নীতি ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যসাফল্যে বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু অনতিকাল পরে আর একটি ভীষণ ঘটনায় তাঁহাদিগের সমস্ত আশা-ভরসা চিরতরে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিপ্লব এ দেশে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, সুতরাং অন্য সকল কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুরুষরা তাহারই নিবারণে তাঁহাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন, সুতরাং বন-বিভাগের কার্য্যে এই কালে কোন উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। বিদ্রোহ

দমনের পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিভাগে ক্রমশঃ যে উন্নতি হইতে থাকে, বর্ত্তমানে তাহা হইতে আর্থিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ ২৪৯,৮৬৭ বর্গ-মাইল। ইহা ব্যতীত দেশীয় নৃপতিগণের রাজ্যে ১২৮,৩০০ বর্গমাইল বন-ভূমি আছে। দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভূত বন-ভূমির কার্য্যও বৃটিশ ভারতের অনুসৃত প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতের বনভূমিসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, Reserved, Protected ও Unclassed, ৩ হাজার ৭ শত ৪০ জন এবং ১১ হাজার ৫ শত জন বন-প্রহরী আছেন। ইঁহাদিগের বেতন, ভাতা ও অন্যবিধ ব্যয়ে বৎসরে কিঞ্চিন্ন্যূন এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ দেশীয়-দিগকে বনবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করিলে এবং তাহা-দিগকে এই বন-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ব্যয় অনেক কম হইতে পারিত। দেরাডুনে যে একটি বনবিদ্যালয় আছে, তাহাতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগের উপযোগী। এখনও পর্য্যন্ত এই বিভা-গের উচ্চপদ য়ুরোপীয়দিগেরই একচেটিয়া।

বন-ভূমিসমূহের মধ্যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ-সন্নিহিত অরণ্যানী
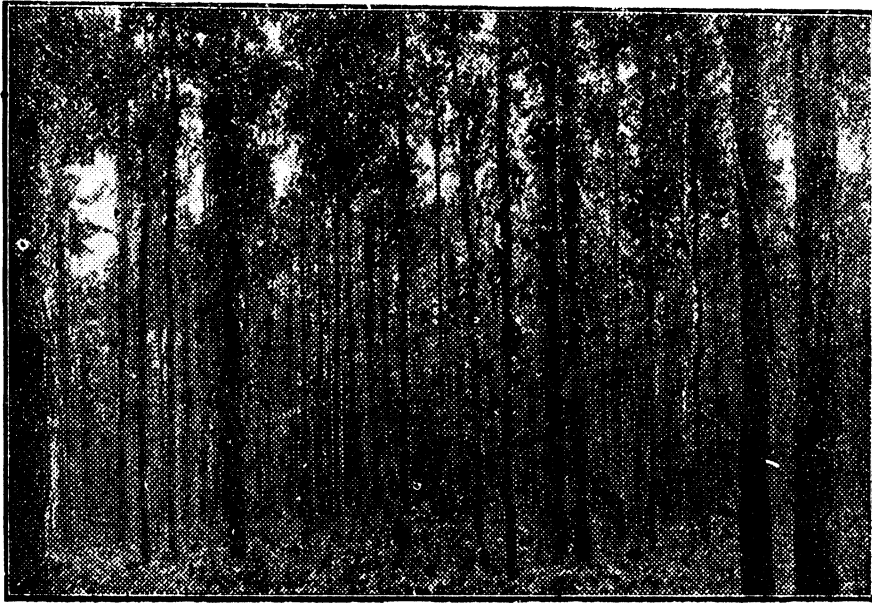
শালবন।

ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর বনভূমি আছে, যাহা Pasture lands বা চারণভূমি বলিয়া পরিচিত। এই বিভিন্ন শ্রেণীর বন-ভূমির বিশেষ পরিচয় দিবার পূর্ব্বে ইহা সংরক্ষণার্থ ও ইহার কার্য্য পরিচালনার্থ কি পরিমাণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। বনবিভাগের কার্য্যে ২ শত ৫৭ জন উচ্চতম কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত; তাহার পর প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ২ শত ৬০ জন কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদিগের সকলেই প্রায় য়ুরোপীয় এবং বৈজ্ঞানিক বনতত্ত্বে অভিজ্ঞ। নিম্নতন কর্ম্মচারী আছেন, প্রাকৃতিক কারণে বড়ই উপকারী। বর্ষায় বারিপাতে এবং জলপ্লাবন নিবারণে ইহার প্রভাব বড় অল্প নহে। এই কারণে ঐ সকল অরণ্যানী রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই হেতু এই শ্রেণীর অরণ্য সকল Reserved বা সংরক্ষিত বলিয়া অভিহিত। যে সকল অরণ্যে ব্যবসায়ের জন্য শাল, সেগুন প্রভৃতি বাহাদুরী কাঠ সংগৃহীত হয় অথবা দেবদারু-জাতীয় প্রয়োজনীয় বৃক্ষের সংখ্যা অধিক, সেই সকল বন Protected বলিয়া অভিহিত। আর যে সকল অরণ্য ক্ষুদ্রকায় তরু-গুল্ম-সমাকীর্ণ অথবা যথায় জ্বালানী কাষ্ঠের উপযোগী বৃক্ষই অধিক, সেই সকল বন Unclassed বলিয়া

পরিচিত। এই বিভিন্ন শ্রেণীর বনমধ্যে প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন জাতীয় তরু, গুল্ম, লতা আছে। বনতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল বৃক্ষ লতা-গুল্মাদির নামকরণ, জাতিনির্ণয় এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বনভূমি হইতে ১৯১৯।২০ খৃষ্টাব্দে ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ ঘন ফুট শাল, সেগুন প্রভৃতি বাহাদুরী কাঠ, ৮০ লক্ষ ঘন ফুট রেলওয়ে শ্লিপার এবং ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ঘন ফুট জ্বালানী কাঠ সরবরাহ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১৫ কোটি বাঁশ ও বেত বিক্রয় হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—গো-মহিষাদির ভোজ্য তৃণাদিও যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনূ্যন ৩৫৪০ লক্ষ টাকা বন-বিভাগের আয় হইয়াছে। ১৯১৯—২০ খৃষ্টাব্দে বন-বিভাগের সর্ব্বসমেত আয় হয়, ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়, ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বন-বিভাগ হইতে লাভ হইয়াছে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই লাভ দেখিয়াই বন-বিভাগের কার্য্যের বিচার করা সমীচীন নহে। বন-বিভাগ দেশের কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের কি সহায়তা করিয়াছে, তাহারও আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

তুর্ক-সন্ধি।

লয়েড জর্জ্জ—তাই ত—বিনাযুদ্ধে কামাল হৃত রাজ্য ফিরে পেল।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী। *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীক্ষাগুরু ও দীক্ষা।

আমাদের মধ্যে যেটুকু কর্ম্মপ্রবণতা জেগে উঠেছিল, তা এ দেশের পক্ষে এত অভিনব যে, তাকে ঠিক্ পথে চালাতে হ'লে, গন্তব্যটা যে কি, আমাদের সকলকে তার অল্প-বিস্তর ধারণা আগে কর্‌তে হ'ত। তার পর তাতে পৌছাবার পথটা ধোঁয়া, জ্যোছনা, বা আর কিছু তা স্থির কর্‌তে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'ত। তখন সেই নির্ব্বাচিত পথটাকে চলনসই কর্‌তে না জানি কত অসাধ্য-সাধন প্রয়োজন হ'ত! কিন্তু আমরা অলসতাকে শান্তি নামে অভিহিত ক'রে সেই শান্তির জন্য কাঁদুনী এমনই অভ্যাস ক'রে ফেলেছি যে, এত হাঙ্গামাতে না গিয়ে, ঐ প্রকার শ্রমসাধ্য কাযে এমন একটি লোক পেতে চেয়েছিলাম, যিনি আমাদের কর্ত্তব্য বাৎলে দিবেন, আর আমরা গীতার ভাবে, ফলাফল বিচার না ক'রে, চক্ষু বুজে আদেশ পালন ক'রে যাব। তাই ধর্ম্ম, সমাজ, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আমরা এই প্রকারের একটিকে ধ'রে নিয়ে তাকে গুরুগিরীতে বরণ করি।

অন্য সকল দেশেও ঐ সকল ব্যাপারে এক এক জন গুরু বা নেতা অবশ্য থাকেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের ঐ প্রকার ব্যক্তিকে নেতা বা যে কোন নামে অভিহিত করা হ'ক না কেন, তিনি আমাদের এই গুরু হ'তে প্রায়ই ভিন্ন প্রকৃতির। সে সকল দেশে তিনি যে বিষয়ের নেতা ব'লে গৃহীত হন, সেই বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাধ্যমত নিজে অভিজ্ঞ হ'তে চেষ্টা করেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথানুসরণকারীদের সে বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ কর্‌বার জন্য নানা রকমে চেষ্টা না ক'রে পারেন না।

আমাদের অ-বাবু নিজে পড়ে-শুনে জ্ঞান লাভ ক'রে তাঁর অনুগামীদিগকে জ্ঞান দিবার চেষ্টা কর্‌তেন। কিন্তু আমাদের মন অতটুকু জ্ঞানসঞ্চয় কর্‌বার খাটুনি খাট্‌তেও চাইত না। তাতে আবার তাঁর শিক্ষার প্রণালীটা মাষ্টারী ধরণের ছিল। তাই তাঁর গুরুগিরীতে আমাদের মন বুঝি উঠ্‌ল না। নতুন দীক্ষাগুরুর নামে আমাদের মন নেচে উঠল।

পরে পরে অনেক রকমের অনেক নেতার সহিত পাঠককে পরিচিত হ'তে হবে। তাই এখানে নেতার রকম নির্দ্দেশ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

আমাদের দেশে বিংশশতাব্দীতেও এমন সব গুরু জোটেন যে, আমরা যে বিষয়ের গুরু চাই, সে বিষয়ের জ্ঞান তাঁর আছে কি না, আমরা তা বড় একটা দেখতে চাই না। আমরা কেবল দেখতে চাই, তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি আছে কি না; অবতারের লক্ষণ তাঁতে প্রকটিত কি না; সর্ব্বোপরি তাঁর সাত্ত্বিকতার কায়দা দোরস্ত আছে কি না। যদি থাকে, কেবল তা হ'লেই তিনি যে কোন বিষয়ে, এমন কি, রাজনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারেও নেতা বা গুরু হওয়ার শ্রেষ্ঠতম অধিকারী ব'লে মনে করে নিই। কাযেই তিনি যে বিষয়ের পথিপ্রদর্শক হন, সে বিষয়ে ক্রমে অধিক অভিজ্ঞতালাভের প্রয়োজন অনুভব করেন না। তার ফলে তিনি সে বিষয় কোন কিছু বল্‌তে গিয়ে যখন প্রলাপ বক্‌তে থাকেন—তখন আমরা তার তরবেতর ব্যাখ্যা ক'রে ধোঁয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকি। আমাদের ক-বাবু তখন কিন্তু এই রকমের ধোঁয়ার গুরু ছিলেন না।

সমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই নেতা বা গুরু গঠিত হয়ে থাকেন। যাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠার বা লোকপূজা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য, লোকমতের আবদারকে খুব ফেনাতে পারেন অথবা সমাজের দুর্ব্বলতা সুবিধামত তোয়াজ কর্‌তে পারেন, তাঁরাই নেতা ব'লে সাধারণতঃ গৃহীত হন। এই প্রকার লীলাময় নেতারই এ দেশে বিশেষ পূজা, তারই বিশেষ আধিক্য। ক-বাবু তখন এ ধরণেরও নেতা ছিলেন না।

ভাবের নেতারা সমাজের দুরবস্থাজনিত দুঃখ অনুভূতির ফলে সেই দুঃখ দূর কর্‌বার উদ্দেশ্যে সুদূর ভবিষ্যতে বিপ্লব আন্‌বার জন্য সেই সমাজের চিন্তার ধারা বদলে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করেন।

---

* ভুল সংশোধন।—গত আশ্বিনের বসুমতীতে ৮২৭ পৃঃ ২৭ পঃ 'দুঃখ করবার' স্থানে 'দুঃখ দূর করবার' এবং ৮২৯ পৃঃ ৩৪ পঃ 'ইংরাজ শাসনের' এই শব্দ দু'টির মধ্যকার ছেদটা বাদ দিয়ে পড়বেন।

এই প্রকারে নবভাব প্রবর্ত্তনের ফলে অথবা অন্য কারণে দেশে যখন অদম্য কর্ম্ম-প্রবণতা জাগতে সুরু হয়, তখন ইহা প্রত্যক্ষ করবার ও ইহাকে সুপথে চালাবার প্রকৃত শক্তি যদি কারও থাকে, তবে তিনিই কর্ম্মের নেতা হন। এ দেশে এ রকম নেতার এখনও অভাব।

আর এক প্রকার নেতা দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, আত্ম-সম্মান, অথবা কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের আশা যখন কোন প্রবল শক্তির আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়, তখন তাঁদের কেহ বা বৈরাগ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন— আর কেহ বা প্রতিহিংসার তাড়নায় উক্ত আঘাতকারী শক্তির উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। আর ঠিক সেই সময় যদি এই আঘাতকারী শক্তির বিরুদ্ধে সমাজের বিদ্বেষ কোন কারণে স্ফুরণোন্মুখ হয়ে থাকে, তবে ত সোনায়-সোহাগা হয়ে যায়। তিনি নেতৃত্বের সিংহাসন দখল ক'রে বসেন। এই প্রকারের নেতারা জগতে অনেক অসাধ্য-সাধন করেছেন ও করছেন। যদিও এই নেতাদের স্বদেশ-হিতৈষণা প্রতিহিংসাজাত, তথাপি ইহার প্রভাব অতীব তীব্র ও নিরতিশয় ক্ষিপ্র। এমন কি, প্রতিহিংসার তাড়না সময় অসময়ের এবং সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষা করতে, অথবা তাহা সৃজনের তর সইতে দেয় না। কামড় দেওয়াটাই তার প্রথম ও প্রধান কায হয়ে পড়ে।

এই অহিংস যুগে বোধ হয় প্রতিহিংসা কথাটা অনেকের ভাল লাগবে না। তাঁদের জন্য লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ না কি নিষ্কাম ধর্ম্মে, নিজের বহু যত্নে দীক্ষিত প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়ে, বীর জয়দ্রথ ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে হত্যা করতে পেরেছিলেন বলেই কুরুক্ষেত্রের এইরূপে জিত যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নামে আজও পূজ্য। পুরাণের উপাখ্যান ছেড়ে দিলেও জগতের ইতিহাসে এই জাতীয় মহাবীরের কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ে আছে। তা ছাড়া এই অহিংসা কাণ্ডের মূলেই যে প্রতিহিংসার প্রেরণা নাই, এ কথা কি কেহ বলতে পারেন?

এখন ভেবে দেখ্‌ছি, আমাদের দীক্ষাদাতা ক-বাবু তখন এই প্রকারেরই নেতা ছিলেন। অ-বাবু তাঁকে বাল্যকাল হতে জানতেন। তাঁর কাছেই ক-বাবুর এই পরিচয় তখন পেয়েছিলাম যে, তিনি এক জন অসাধারণ বিদ্বান্ ও জ্ঞানী; পলিটিক্সে তিনি বিশেষজ্ঞ। এ থেকে আমরা নিশ্চয় ক'রে বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদের আর কোন বিষয়ে মাথা-ব্যথা করতে হবে না; খালি আদেশ পালন করলেই—বস্।

এক দিন বিকালে দেখলাম, অ বাবু তাঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন আমাদের স্বনামধন্য বারীণ-দা। গুরুর প্রতি ভক্তি ত আগে থেকেই পুরামাত্রায় গজিয়েছিল। অধিকন্তু আমার (মেদিনীপুরের) বাড়ীতে তাঁর অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিষ। তিনি বড় লোক না হ'লে আমার বাড়ীতে তাঁর আসা ব্যাপারটি যে বড় হয় না! আর এত লোক থাকতে, খুঁজে খুঁজে তিনি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, কেন না, তিনি আমাকে, দেশ উদ্ধারের এক জন যোগ্যপুরুষ ব'লে মনে করেছিলেন। এই রকম প্রাণমাতান চিন্তা আমার আত্মগরিমাকে এমনই উস্কে দিয়েছিল যে, যদিও ভক্তি ব'লে জিনিষটা আমার মধ্যে অল্পই ছিল, তবু তাঁর সম্বন্ধে তখন আর কিছু না জেনেই প্রথম দর্শনে আমার সমস্ত ভক্তি-টুকু তাঁর উপর নিংড়ে দিয়েছিলাম।

সত্যেন ও আরও দু' এক জন এসে জুটলে, আমরা আমাদের চাঁদমারী অর্থাৎ বন্দুক ছোড়া শিখ্‌বার স্থানে সকলে মিলে গেলাম। সম্বন্ধে, বারীণ সত্যেনের ভাগিনেয়। মাঠের মাঝে এক স্থানে কাঁকর খুঁড়ে লওয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ত্ত হয়েছিল। তার মধ্যে বন্দুক আওয়াজ করলে বাহির থেকে বড় একটা শোনা যেত না। আমরা সেখানে নেমে গিয়ে প্রত্যেকে এক একটি আওয়াজ করলাম। ক-বাবু ও বারীণ-দার বন্দুক ধরবার কায়দা ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল—তাঁদের সেই প্রথম হাতে খড়ি।

ক-বাবু বিশেষ ক'রে অ-বাবুর সহিতই কথা বলছিলেন। তার বিশেষ কিছু মনে নাই। কিন্তু অ-বাবুর মত তিনি কোন আজগুবী গল্প ঝেড়েছিলেন ব'লে মনে পড়ে না। দেশটা কেমন ক'রে তয়ের করতে হবে, তার একটা প্ল্যান বা মতলব তখন দিয়েছিলেন কি পরে দিয়েছিলেন, এখন তা ঠিক মনে হচ্ছে না। দু-এক কথায় বলতে গেলে মতলবটা এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গালা দেশকে ছয়টি কেন্দ্রে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে উপকেন্দ্র থাকবে। মেদিনীপুর ত একটি কেন্দ্র হবে। কলিকাতার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু তখনও খোলা হয়নি। তখন কলিকাতার নাকি অনেক হুমড়ো

চুমড়ো, ক-বাবুর সহিত জুটেছেন, আর কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা হচ্ছে।

দীক্ষার মন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হ'লে আবার এসে দীক্ষা দিবেন, এই আশা দিয়ে ক-বাবু পরদিন কলিকাতায় চ'লে গেলেন।

আবার মাস কতক পরে অর্থাৎ ১৯০২ সালের বোধ হয় শেষে ক-বাবু একা এসেছিলেন। দীক্ষা নেওয়ার জন্য আমরা অনেককে ভজিয়েছিলাম। ফলে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা জন চারেক মাত্র এসে জুটেছিলাম। দীক্ষা সম্বন্ধে অ-বাবুর সহিত আলাপ চল্‌তে লাগল। সংস্কৃতে রচিত মন্ত্র সকল দীক্ষার্থীর বোধগম্য হবে না, তাই বাঙ্গালাতে রচিত হওয়া উচিত ব'লে অ-বাবু আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তারপর অ-বাবু মন্ত্রটি বাঙ্গালা ক'রে আমাদের শুনিয়ে দিলেন। শুনে আমাদের মধ্যে এক জন 'এই আস্‌ছি' ব'লে সরে পড়েছিলেন।

এর পরেও যখন আমরা নিজেরা দীক্ষা দিতে গিয়েছি, তখন অনেকে প্রথমে খুব আগ্রহ দেখিয়ে শেষে দীক্ষার সময় গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেন তাঁরা স'রে পড়তেন, দীক্ষার পূর্ব্বে আমাদের মনের ভাব কেমন হ'ত, তা ভেবে দেখলে, আশা করি, পাঠক তার কারণ সম্যক বুঝতে পার্‌বেন।

দীক্ষা-গ্রহণের অনেক দিন আগে থেকে ইহার ভীষণ দায়িত্ব সম্বন্ধে ভালমন্দ অনেক রকম চিন্তা আপনা আপনি মনটা দখল ক'রে বস্‌ত। ভালর দিক্‌টার আভাস পূর্ব্বেই দিয়েছি, এখন মন্দের কথাই বলি। সোসাইটীর তরফ থেকে যখন যা আদেশ আস্‌বে, তা পালন কর্‌তেই হবে; নচেৎ মৃত্যু-দণ্ড। বিনা উত্তেজনায় জ্যান্ত মানুষ খুন কর্‌তে হবে; খুনা-খুনী ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে ডাকাতী কর্‌তে হবে। জাল, জুয়াচুরী, চুরী দরকার হলে কর্‌তে হবে; ধরা পড়লে ফাঁসি, দ্বীপান্তর অথবা সাধারণ অপরাধীর মত দীর্ঘ কারাবাস। দেশের কাযে সর্ব্বস্ব পণ কর্‌তে হবে, তার মানে সম্পত্তি টাকা-কড়িতে আর নিজের অধিকার থাক্‌বে না; প্রয়োজন হলে অকাতরে তা' দেশের কাযে দিতে হবে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রাণের বন্ধুকে এক দিন হয় ত বিদায় না নিয়ে, চিরকালের তরে হঠাৎ ত্যাগ কর্‌তে হবে, দরকার হলে আত্ম-সম্মানেও জলাঞ্জলি দিতে হবে। তার পর বিবেকের বিরুদ্ধে কায কর্‌তে হবে ভাবলে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠত, পরক্ষণে কিন্তু সুবোধ মন বুঝে ফেল্‌ত, দেশের মঙ্গলের জন্য কায কখনও বিবেক-বিরুদ্ধ হতে পারে না। যখন ভাবনা আস্‌ত, এই কীর্ত্তির কথা কেউ জান্‌বে না শুন্‌বে না, চির অজ্ঞাত থেকে যাবে, অথচ গ্রেপ্তারের ভয়ে (ইঙ্গিতেও) কাহাকে বলা চল্‌বে না, তখনই মনটা একবারে মুসড়ে যেত। নিষ্কাম কর্ম্মের বা নিঃস্বার্থপরতার দোহাই দিয়ে অবোধ মন সুবোধ হয়ে যেত। তার পর কোন্ স্নেহের পুত্তলিকে কোন্ দিন হঠাৎ ত্যাগ কর্‌তে হবে, এই চিন্তা যখন মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ত, তখন সবই অন্ধকার দেখ্‌তে হ'ত।

ইহা নিশ্চয় যে, সকলের এ রকম চিন্তা আস্‌ত না। আবার অনেকের এর চেয়ে আরও অধিক মর্ম্মান্তিক চিন্তা যে আস্‌ত না, এমন বলা যায় না। যাই হোক, এরূপ চিন্তার পর কাহারো স'রে পড়াটা নেহাৎ দোষের কিনা, তা বল্‌তে পারি না।

পরে কিন্তু নিজে দেখেছি এবং অনেকের নিকট জেনেছি, সিক্রেট সোসাইটীর কাযে আত্ম-সমর্পণ কর্‌বার আগে এই প্রকার চিন্তার পরিবর্ত্তে, এ কাযের সিদ্ধি হাতের কাছে ভেবে, কেবল ভাবী গৌরবের আশায় এ কাযে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক ছিল।

আবার মন্দ চিন্তা অনেকের মনে 'যাব কি যাব না' উভয় সঙ্কট এনেছিল। এ ক্ষেত্রে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁরা ভালমন্দ ভগবানে অর্পণ করে নাকি নিশ্চিন্তমনে দীক্ষা নিতে পেরেছিলেন, এমনও শুনেছি।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হ'ল। আমি তলওয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। সেই সংস্কৃত মন্ত্র অর্থাৎ "সত্যপাঠ" পড়বার হুকুম হ'ল। সংস্কৃতে লেখাটি না প'ড়ে, আমি যা বলেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তা হচ্ছে "ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব কর্‌ব।" ক-বাবু কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে যা বলেছিলাম, তাতে বুঝি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

দীক্ষার স্বার্থকতা সম্বন্ধে তখন কিন্তু আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। পরে যখন নিজে বিবেক-বিরুদ্ধ কায কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম, তখনই ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলাম। ঐ বিবেক-বিরুদ্ধ কাযের কথা যথাস্থানে পরে

বলব, এখন দীক্ষার সার্থকতার বিষয় কিছু না বলে দীক্ষার কথা শেষ করতে পারি না।

আমাদের পরিবর্ত্তনশীল মনে, আজ যা কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করি, ভীরুতা বা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অথবা জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি বশতঃ আমাদের কাছে পরে তা অকর্ত্তব্য হয়ে পড়ে; কিংবা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়ে তা সাধনের জন্য পূর্ব্ব কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করি। ইহাই বিচার-শক্তি-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ উদ্ধারের ব্যাপার—বিশেষতঃ আমাদের দেশের মত দেশের উদ্ধার-কার্য্য এমনই বিপদ-সঙ্কুল ও ভীষণ যে, এই সিক্রেট সোসাইটীর বীভৎস কাযগুলাকে একবার কর্ত্তব্য ব'লে স্থির ক'রে সঙ্কট এসে পড়লে তাকে বিবেকের দোহাই দিয়ে কথায় কথায় অকর্ত্তব্য ব'লে ত্যাগ করার সম্ভাবনা খুবই অধিক। তখন অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করা ও পূর্ব্ব কর্ত্তব্যের ক্রটি দেখিয়ে দেওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে পড়ে।

সঙ্কট-কালে কর্ত্তব্যত্যাগের এই পন্থাটি বঙ্কিমবাবু আমাদের জন্য প্রশস্ত ক'রে রেখে গেছেন। 'দেবী চৌধুরাণীতে' ভবানী পাঠক ইংরাজের হাতে ধরা পড়া নিশ্চয় জেনে "My mission is over" বল্‌তে বাধ্য হয়েছিল। দেবী (ওরফে) প্রফুল্ল, ধরা পড়েও কোন গতিকে রক্ষা পেয়ে, যখন দেখলে, এত সাধনার দেবীগিরির কর্ত্তব্যপালন আর চলবে না, তখন তা ত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণের ছুতায় স্বামিসেবা-ধর্ম্মপালনরূপ শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য ব্রজেশ্বরের ছুটি শাকের আঁটির উপর আর একটি বোঝা হ'তে গিয়েছিল। 'আনন্দ মঠের' সত্যানন্দও প্রায় ভবানী পাঠকের মতই করেছিল। আর জীবানন্দ এক আত্ম-প্রতারণার অবতারণার দ্বারা দীক্ষার সর্ত্ত লঙ্ঘন ক'রে ধর্ম্মসাধনার অছিলায় শান্তির আঁচল ধরারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যপালনের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য নভেলে এবং বাঙ্গালার অন্য লেখকদের উপন্যাসে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ চরিত্র যখনই প্রেমের টানে বা অন্য কোন মুস্কিলে পড়েছে, তখনই কর্ত্তব্য ত্যাগ করেছে। তার পর তাদের কেহ বা অছিলারূপে ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে আমাদের অনুকরণীয় চরিত্ররূপে বিরাজ করছে। বাঙ্গালা নভেলের এই সকল আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে, আমাদের চরিত্র গঠিত ব'লে বুঝি অতিবৃহৎ নেতা থেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকদের অধিকাংশ কর্ত্তব্যও অন্য কিছুর উভয় সঙ্কটে পড়লেই উল্‌টে-পাল্‌টে ধোঁয়া হয়ে যায়।

এই সকল কারণে জীবদ্দশায় যাতে শপথ-দ্বারা গৃহীত এই কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'রে অন্য কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠতর ও অবশ্য-পালনীয় জেনেও তা গ্রহণ করতে না পারে, এই জন্যই প্রত্যেক সভ্যকে সিক্রেট সোসাইটীর উদ্দেশ্যসাধনরূপ কর্ত্তব্যপালনে দীক্ষা দিয়ে এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হ'ত ও এই ব্রত-ত্যাগের পরিণাম ছিল মৃত্যু-দণ্ড। কার্য্যতঃ এই দণ্ডের ভয় দেখান হ'ত।

দীক্ষাদাতা গুরু নিজে যদি এই ব্রত লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর কি দণ্ডের ব্যবস্থা হবে বা কে ব্যবস্থা করবে, এ কথা দুর্ভাগ্য বশতঃ কখনও কারো মনে এসেছিল ব'লে কিন্তু শুনিনি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

তুর্কীর জয়।

জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে মিত্রশক্তিসমূহ যখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা জার্ম্মাণীকে পরাভব স্বীকার করাইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তখন মিত্রশক্তিপক্ষে যোগ দিয়া আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন যে ১৪টি সর্ত্ত দাখিল করিয়া সন্ধিতে সম্মত প্রকাশ করেন, অন্তর্বিপ্লবে দুর্ব্বল জার্ম্মাণীকে সেই সব সর্ত্ত স্বীকার করিয়া সন্ধির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সেই জন্যই এমিয়ে ও এলবাট নষ্ট করিয়াও ক্রীল ত্যাগকালে জার্ম্মাণরা সে নগর নষ্ট করে নাই।

AMIENS. — *La Cathédrale (côté Nord).*

এমিয়ের দৃশ্য।

কিন্তু জার্ম্মাণী পরাভূত হইবার পর আর সে সব সর্ত্ত বজায় থাকে নাই। তখন য়ুরোপীয় শক্তিসমূহ যে যাহার অধিকার বিস্তারের চেষ্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করিয়াছেন। মিশর তুর্কীকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই—আবার মিশরীরা স্বায়ত্ত-শাসন চাহিলে, তাহাদিগকে সে অধিকারও দেওয়া হইতেছে না। তাহাদের নেতা জগলুল আজ বন্দী। ইরাক ও তুর্কীর সাম্রাজ্যাংশ না রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজের প্রভাবাধীন রাখা হইয়াছে। ইরাকবাসীরা যে এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ—সে দিন ইংরাজের গড়া রাজা ফৈজুলের রাজ্যাভিষেকের বার্ষিক উৎসবে সার পার্সী কক্স যখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথে ইরাকবাসীরা তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে। জার্ম্মাণীর রাজ্যনাশ অধিক হয় নাই, কেবল ফ্রান্স আলসেস্ ও লোরেণ ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু তুর্কী, বোধ হয় প্রাচ্যশক্তি বলিয়াই, বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইবার সময় বৃটিশ মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—তুর্কীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হইবে না। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই।

যুদ্ধের সুযোগে গ্রীস তুর্কীর স্মার্ণা ও থ্রেস অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানরা

লীল।

তুর্কীকে স্মার্ণা ও থ্রেস ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন। কোন ফল হয় নাই। আবার স্মার্ণা ও থ্রেস পরহস্তগত থাকিলে কনষ্টাণ্টিনোপলও নিরাপদ রাখা যায় না। অথচ রাষ্ট্রপতি উইলসনের কথা রাখিলে, কোন অধিকারে গ্রীস স্মার্ণা ও থ্রেস দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। অধিকার কেবল—বিজেতার অধিকার।

এই অবস্থায় যখন ভারতে মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলনে চঞ্চল ও মিশর মুক্তির সংগ্রামে ব্যস্ত, সেই সময় তুর্কীর পক্ষে এক জন বীরের আবির্ভাব হয়। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশা। তিনি তুর্কীর সরকারের আবশ্যক সংস্কারসাধন করিয়া—তাহার নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

জজলুল পাশা।

কামাল বিজয়ী সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং গ্রীকরা তাঁহার কাছে পরাভূত হইতে লাগিল। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরাভূত গ্রীক সেনাদল স্মার্ণায় প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা নানা পথে পলায়ন করিতে লাগিল। ৯ই তুর্ক অশ্বারোহী সেনাদল মুক্ততরবারিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে স্মার্ণায় প্রবেশ করিল। ইংরাজ সেনাদলের কাপ্তেন থেসিগার তাহাদিগকে জানাইলেন, গ্রীকরা স্মার্ণা ত্যাগ

করিয়া গিয়াছে—তাহারা শান্তভাবে অগ্রসর হইলে লোক শঙ্কাশূন্য হইবে। বিজয়ী সেনাদল তাহাই করিল। পথে এক জন আর্ম্মেনিয়ান তাহাদের সেনাপতির অঙ্গে বোমা নিক্ষেপ করিলেও তিনি বিচলিত হইলেন না এবং তাঁহার সৈনিকরা সুশৃঙ্খলভাবে কায করিতে লাগিল।

২ দিন তুর্করা স্মার্ণায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিল। তাহার পর সহরে অগ্নি দেখা দিল। তখন লোকের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না—স্মার্ণার আর্ম্মেনিয়ান, ইহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকরা পলাইবার প্রাণপণ চেষ্টায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে সব দোষ তুর্কদিগের উপর অর্পণের চেষ্টা হইল। 'টাইমসের' সংবাদদাতা লিখিলেন—২ দিন পরে the town was given over to fire, pillage and

স্মার্ণায় তুর্ক সেনা।

massacre. এমন কথাও বলা হইল যে, অনুকূল বাতাস না থাকাতেই প্রথম ২ দিন তুর্করা সহরে আগুন লাগায় নাই—লুঠ করে নাই—হত্যায় বিরত ছিল। বাতাস অনুকূল হইলেই তাহারা সহর দগ্ধ করিতেছে।

এথেন্স হইতে সংবাদ আসিল, প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক নিহত হইয়াছে; মার্কিণ জাহাজে ১ হাজার ৮ শত গ্রীক ও আর্ম্মেনিয়ান পলাইয়া বাঁচিয়াছে। যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে,তাহার মূল্য না কি—২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। রয়টার যে কেবল সংবাদ সরবরাহ করিবেন, তাহা ভুলিয়া মত প্রকাশ করিলেন—বর্ব্বর তুর্করা তুর্ক ব্যতীত আর কাহাকেও শাসন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই—The Turk is unfit to govern any one but himself.

তাহার পর কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে, স্মার্ণায় অগ্নিদাহের দায়িত্ব—কামাল পাশার অধীন সেনাদলের নহে। গ্রীকরা পলাইবার পথে লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ করিয়াছিল এবং আর্ম্মেনিয়ানরা সহরে অগ্নি দিয়াছিল। এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে—গ্রীকরাই পলায়নের পথে অগ্নিযোগ করিয়াছিল—burning towns and villages in their retreat.

ইংরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্মার্ণায়-ব্যবসায়ে বিলাতের লোকের যে মূলধন খাটিতেছিল, তাহার পরিমাণ—১৫ কোটি টাকা। যে প্রণালীর উপর গেলিপলীতে যুদ্ধের সময় ইংরাজের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল, সেই প্রণালীতে সর্ব্বজাতির অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য সকল জাতির অভিভাবকের কায—ইংরাজের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য; নহিলে ভারতে এ দায়িত্বের কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না। ইংরাজ অন্যান্য জাতির মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই রণসজ্জা করিতে উদ্যত হইলেন। বৃটিশ ইস্তাহার প্রচারিত হইল—

Great Britain is prepared to do her part in maintaining the freedom of the Straits and the existence of the neutral zones.

এই জন্য ইংরাজ সেনাপতি হ্যারিংটনের সৈন্য বাড়াইবার ব্যবস্থা হইল—ভূমধ্যসাগরে নৌবহরের উপরও হুকুম জারি হইল। যে ভারতে যুদ্ধের পর জালিয়ানওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে, সেই ভারতকে বাদ দিয়া ইংরাজের আর সব রাজ্যাংশকে সমর-সজ্জা করিতে আহ্বান করা হইল।

ইহার কারণ, 'টাইমসের' সংবাদদাতার কথায় সপ্রকাশ—কামাল যখন বিজয়ী,তখন তিনি বোধ হয় নিশ্চয় সম্মিলিত

শক্তিসমূহকে দার্দ্দানালেস প্রণালী ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিবেন এবং মর্ম্মর-সাগরে কনষ্টাণ্টিনোপল রক্ষার জন্য আবশ্যক দুর্গ রাখিতে পাইলে তিনি প্রণালীপথে সেনার ঘাঁটী রাখিবেন না।

১৬ই সেপ্টেম্বর ইংরাজের ইস্তাহার প্রচারিত হইল। তাহার পরই ঘটনার প্রবাহ চঞ্চল, প্রবল, উচ্ছল, আবর্ত্তিত ও দ্রুত হইল। পরামর্শ না করিয়া এই ইস্তাহার প্রচারে ফ্রান্স বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং ফরাসীর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লর্ড কার্জ্জন প্যারিসে গমন করিলেন। তখন আবার পরামর্শ-পরিষদ গড়িবার কথা উঠিল। দেওয়া হইবে। লয়েড্ জর্জ্জ ও লর্ড কার্জ্জন সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া ইংরাজের কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ মনে করেন, লয়েড জর্জ্জের সোহাগেই গ্রীকরা তাহাদের দস্যুবৃত্তিতে সাহস পাইয়াছিল এবং এমন কথাও বলিয়াছিল যে, তাহারা কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইবে। লয়েড জর্জ্জের ও লর্ড কার্জ্জনের দুষ্কার্য্যের ফলে এসিয়া মাইনরের দুর্গতির সীমা নাই।

বিচার-বিবেচনার ফলে ফ্রান্স ও ইটালী গ্রীসের পক্ষ হইয়া তুর্কীর সহিত যুদ্ধে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন

সমুদ্রতীরে পলায়নপর গ্রীক্ প্রভৃতি।

না। তখন ইংরাজও আস্ফালন ত্যাগ করিয়া শান্তির পথ সন্ধান করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কামাল যে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহেন, তাহাও বুঝা গেল—তিনি সর্ব্বাধিকৃত দেশ অধিকারের প্রতিবাদে সম্মতি জানাইলেন। তবে অগ্রসর হইবার সময়—পথে—তাঁহার সৈনিকরা যে কোথাও সর্ব্বাধিকৃত অর্থাৎ সাধারণের দেশে প্রবেশ করে নাই, এমন নহে। তাই বিলাতের রাজনীতিক মিষ্টার আসকিথ বলিয়াছেন, লয়েড জর্জ্জের যেরূপ আদেশ ছিল, তাহাতে তথায় হ্যারিংটনের মত বিচক্ষণ ও স্থিরবুদ্ধি
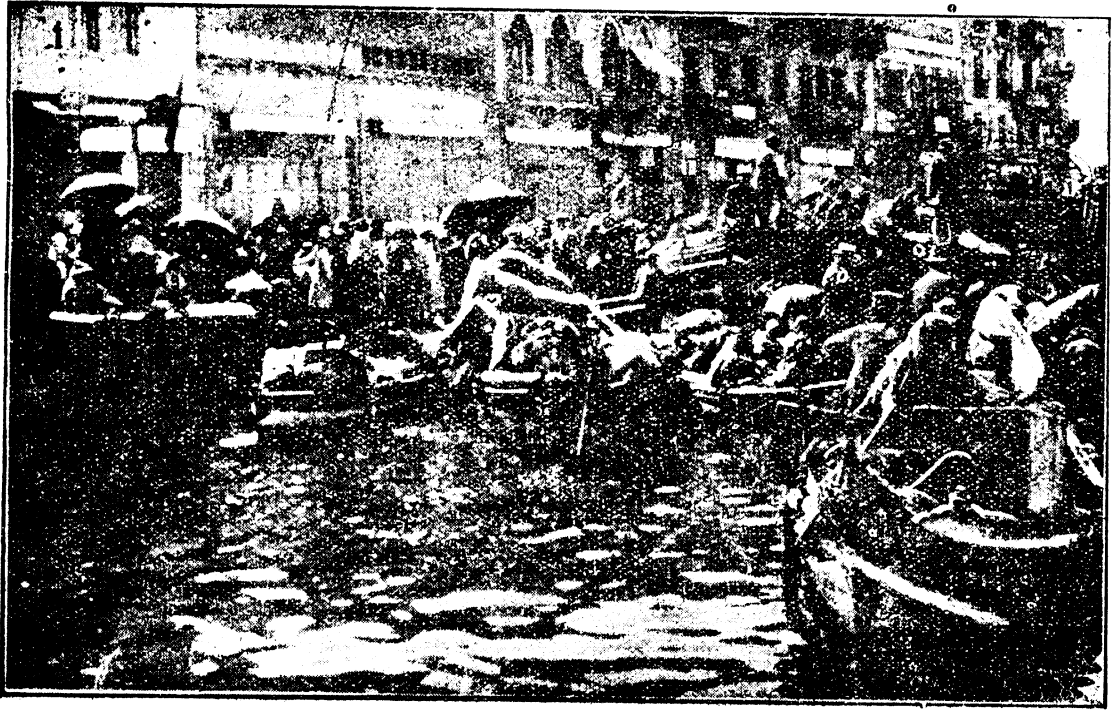
তুর্কীর সম্বন্ধে কত মিথ্যা অপবাদ যে কতবার প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যুরোপে তুর্কীর অবস্থানও যে খৃষ্টান শক্তিপুঞ্জের অভিপ্রেত নহে, তাহাও আমরা জানি। বোধ হয়, সেই সব কারণেই স্মার্ণাদাহের দায়িত্ব তুর্কীর স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

প্যারিসের পরিষদ চালাকীমাত্র। কামাল শান্তির পথেই হৃতরাজ্যাংশ পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বাধ্য না হইলে তিনি অস্ত্রধারণ করিতেন না। ইংরাজের প্রতিশ্রুতি ছিল, এসিয়া মাইনর, থ্রেস ও কনষ্টাণ্টিনোপল তুর্কীকে ফিরাইয়া

সেনানায়ক না থাকিলে আবার নরশোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত হইত। এখনও যে সে সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। কারণ, রুসিয়ার নবগঠিত সোভিয়েট সরকার বলিতেছেন—মিটমাট করিতে হইলে তাঁহাদিগেরও সম্মতি লইতে হইবে—কারণ, সে প্রদেশে তাঁহাদেরও স্বার্থ আছে; বিশেষ প্রণালীর স্বাধীনতা বলিলে এমন কিছুতেই বুঝায় না যে—ইংরাজের রণতরীই সে স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। তাঁহারা ইংরাজের অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আর এ দিকে লয়েড জর্জ্জের আস্ফালনও শরতের বর্ষণসম্ভাবনাবর্জ্জিত মেঘের অসার গর্জ্জন বলিয়া মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে প্যারিসে কৃত কার্য্যের জন্য লর্ড কার্জ্জনকে অভিনন্দিত করেন! যেন তিনি কেল্লা ফতে করিয়াছেন।

তখনই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়—কামালের দলকে কনষ্টান্টিনোপল, আড্রিয়ানোপল ও থ্রেস প্রদান করা হইবে।

২৫ সেপ্টেম্বরের সংবাদের প্রকাশ পায়—তুর্ক অশ্বারোহী সেনারা চাণকের কাছে সর্ব্বাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং জেনারল হ্যারিংটন তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—has requested their withdrawal. অর্থাৎ যে সময় ইচ্ছা করিলে জেনারল যুদ্ধ ঘোষণা
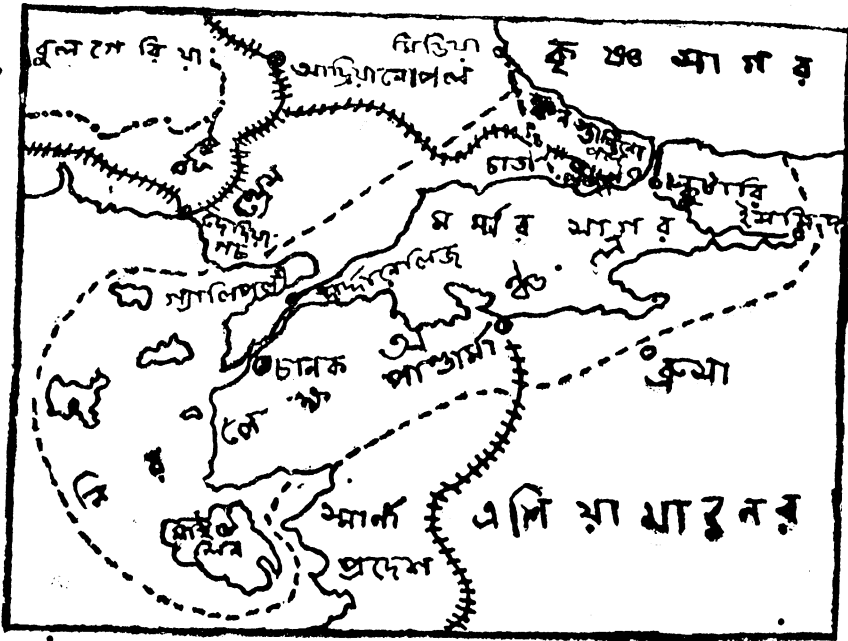
কামালের জয়ক্ষেত্র।

প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহা কেবল শূন্যকুম্ভে দমকা বাতাসের ঝাপটা। কারণ, বিলাতের শ্রমজীবীরা ও আরও অনেক সম্প্রদায় প্রাচীতে হাঙ্গামা বাধাইবার বিরোধী। জেনারল হ্যারিংটনও সেই ভাবে কায করিয়াছেন। তুর্করা চাণকের কাছে সর্ব্বাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ৩টি স্থান নষ্ট করে এবং তাহার পর জানায়, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আগ্রহ কামালের নাই। তখনও বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা দেখা যাইতেছিল—যুদ্ধ বা সন্ধি কামানের গর্জ্জন বা বর্জ্জনের উপর নির্ভর করিতেছিল। অথচ ইহার মধ্যেই লয়েড জর্জ্জ করিতে পারিতেন, সে সময় তিনি যুদ্ধ বর্জ্জন করিবার চেষ্টাই করেন। গ্রীকরা বলে, সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ কামালের করে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন "The Entente's capitulation to Kamal Pasha" কিন্তু জেনারল হ্যারিংটন স্থিরভাবে বলেন, যতক্ষণ তিনি না দেখিবেন—তুর্ক অশ্বারোহী সেনাদলের পশ্চাতে তাহাদের কামানও লইয়া যাওয়া হইতেছে, ততক্ষণ তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন না। তিনি কামালকে জানান, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বৃটিশ সৈনিকরা আক্রমণ করিবে না এবং তিনি কামালের সঙ্গে এ সব

বিষয়ের আলোচনা করিতে সম্মত। কামাল এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার সরকার পুনরধিকৃত রাজ্যাংশে সর্ব্ববিধ মগু বাজেয়াপ্ত করিয়া মদের দোকান বন্ধ করিয়া দেন।

এই সময় বিলাতের কোন কোন সমর-বিলাসী সংবাদপত্র বিলাতের লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে

অধিবেশন আরম্ভ হইবে, স্থির হয়। তুর্করাও সর্ব্বাধিকৃত প্রদেশে আর অগ্রসর হইতে বিরত হয়েন।

কামালের দল শান্তিবৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইতে সম্মত হইবার পূর্ব্বে থ্রেসের কি হইবে, তাহার আলোচনা হয়। তথায় গ্রীকদিগের থাকিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ প্রস্তাব করেন, তুর্করা শান্তি-বৈঠকের

কামাল পাশা।

থাকেন। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রে লিখিত হয়—Kamal desires to force humiliatian on Britain, disgracing us in the eyes of the world.

এইরূপে যখন যুদ্ধের সম্ভাবনা যেন বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন ফরাসী দূতের চেষ্টায় কামাল মুদেনিয়ায় পরামর্শ-পরিষদে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হয়েন। ৩রা অক্টোবর পরিষদের

নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে সর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিবেন না স্বীকার করিলেই গ্রীকদিগকে থ্রেস ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—তৎপূর্ব্বে তাঁহারাই থ্রেস অধিকার করিয়া থাকিবেন।

তখন দুই দিকে দুই শক্তি তুর্কীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছিল। এক দিকে বিলাতের 'ডেলী মেল' প্রভৃতি বলিতেছিলেন, তুর্করা অসম্ভব দাবি করিতেছেন আর এক দিকে

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ভেনিজেলস 'টাইমসে' পত্র লিখিয়া বলিতেছিলেন, যদি তুর্করা এখনই থ্রেস অধিকার করিতে পায়, তবে সে প্রদেশের খৃষ্টান অধিবাসীদিগকে নষ্ট করিবে। গ্রীস থ্রেস রক্ষার জন্য সৈন্যসজ্জা করিতেছে, এমন অসম্ভব কথাও প্রচারিত হইয়াছিল। বিলাতে আঙ্গোরা সরকারের প্রতিনিধি রেসাদ বে ভেনিজেলসের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেন এবং ওদিকে মুদেনিয়ায় স্থির হয়—তুর্কদিগকে থ্রেস প্রদান করা হইবে এবং কনষ্টান্টিনোপলের শাসন পদ্ধতিতে সম্মিলিত শক্তিসমূহের মত তুর্কীর জাতীয় দলেরও প্রভুত্ব থাকিবে—তুর্করা সর্ব্বাধিকৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। কিন্তু কামালের দল বলেন, রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারকেও শান্তি-বৈঠকে আহ্বান করিতে হইবে।

শেষে বহু আলোচনার পর ইংরাজ, ফরাসী ও ইটালীয়ান সকলের সম্মতিক্রমে স্থির হয়—

(১) গ্রীকরা থ্রেস ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ সেই প্রদেশ দখল করিবেন;

(২) তাহার এক মাস পরে তথায় তুর্কী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহার পর এই সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনা হইতে থাকে। সেই আলোচনাপ্রসঙ্গে জেনারল হ্যারিংটন কামালের প্রতিনিধি ইসমেট পাশাকে বলেন—তিনি যে সৈন্যসজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইতেছে; শান্তি সংস্থাপিত হইলেই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সৈন্যদল কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিয়া যাইবেন—তুর্করা দেশের শান্তি ও সম্পদ ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিনা রক্তপাতে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সব উপকরণ পাইলেন—

"Your goal is within your reach, and it will be entirely within your hands in 45 days, and your administration will be established satisfactorily."

সম্মিলিত শক্তিরা কেবল চাহেন—

(১) সন্ধি পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকৃত স্থান যেমন আছে, তেমনই থাকিবে;

(২) থ্রেসে তুর্ক সসজ্জ প্রহরীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ হইবে;

(৩) অতি অল্পকাল সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যরা থ্রেসে থাকিবে।

শেষে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহাতে বলিতেই হয়—কামাল জয়ী হইয়াছেন; কামালের বাহুবল ও বুদ্ধিবল আজ তুর্কীর হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধারসাধন করিতেছে—প্রাচীর পুনরুত্থানের অরুণ-কিরণে রাজনীতিক গগন আজ রঞ্জিত হইয়াছে। শেষ সন্ধিসর্ত্ত এইরূপ—

(১) গ্রীকরা পক্ষকালমধ্যে থ্রেস ত্যাগ করিয়া যাইবে ও ১ মাসের মধ্যে তথায় তুর্ক সরকারের প্রতিষ্ঠা হইবে;

(২) তুর্কীর সসজ্জ প্রহরীর সংখ্যা ৮ হাজারের অধিক হইবে না;

(৩) মারিজার পশ্চিম কূলে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সৈন্যদল (covering force) রক্ষিত হইবে;

(৪) সর্ব্বাধিকৃত স্থান নূতন করিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে, তাহার বিস্তার আর পূর্ব্ববৎ রহিবে না।

তুর্কী যে তাহার হৃত সাম্রাজ্যের কতকাংশও পাইল, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন মিষ্টার লয়েড জর্জ্জের কি হইবে? তিনি যে আবার একটা যুদ্ধ বাধাইয়া দিবেন—এক যুদ্ধের জোয়ারে যেমন প্রাধান্যের বন্দরে আসিয়াছিলেন, আর এক যুদ্ধের বন্যায় তেমনই সেই প্রাধান্য স্থায়ী করিয়া লইবেন—সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। বিলাতে আবার নূতন করিয়া পার্লামেণ্টে সদস্য-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবার লয়েড জর্জ্জের স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মিলিত মন্ত্রিসভা লোকমতের ফুৎকারে তাসের ঘরের মত পড়িয়া গিয়াছে।
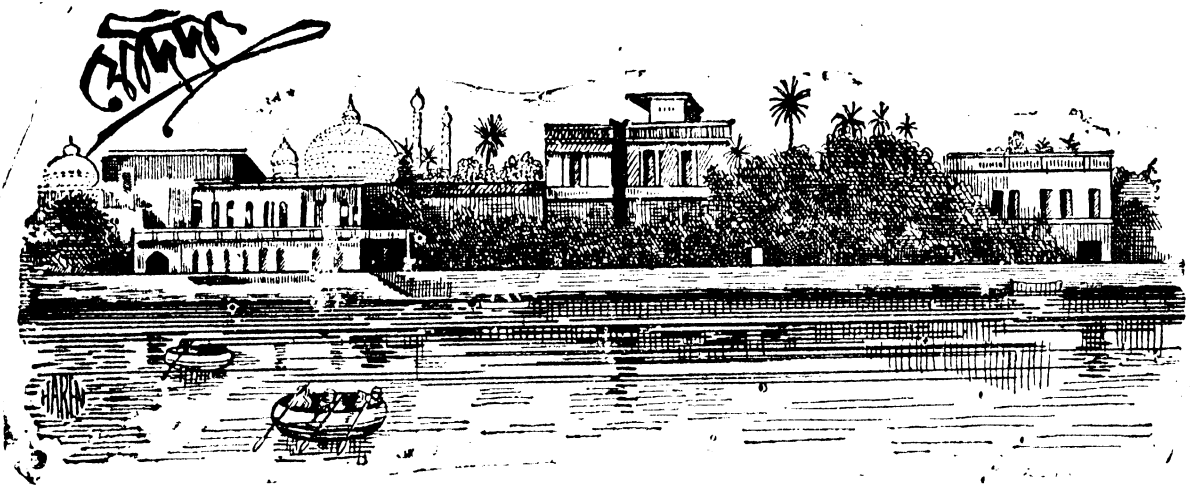
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকে টাইগ্রীসের বন্যাবারিবর্দ্ধিত প্রবাহ প্রবলবেগে বাগদাদের নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বাগদাদের পূর্ব্বে ওপারে নদীকূল ছাপাইয়া প্রান্তরে জল ছড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু বাগদাদ সহরে নদীর দুই কূলেই পোস্ত গাঁথা—পোস্তের মধ্যে মধ্যে সোপানশ্রেণী জলে নামিয়া আসিয়াছে—দেখিলে বারাণসীর কথা মনে পড়ে, কেবল বাগদাদে তেমন ঘাট নাই—ঐ সোপানপথে নদী হইতে জল আহরিত হয়, লোক গুফায় গতায়াত করে। কাযেই বাগদাদের নিম্নে নদীর স্রোত কিছু প্রখর। সারদাবের গবাক্ষ হইতে দায়ুদ সেই স্রোতে পড়িল। স্রোতের প্রখরতাহেতু সে তথায় স্থির থাকিতে পারিল না—ভাসিয়া চলিল, কিন্তু সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল—রুথের পতনশব্দ শুনিবে, তাহাকে লইয়া সন্তরণ করিয়া কূলে উপনীত হইবে। সে ভাসিয়া—সাঁতরাইয়া কেবল রুথের অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু নদীর জলে আর পতনশব্দ শুনিতে পাইল না। রুথ আসিতে পারিল না! ক্রমে দায়ুদ শ্রান্ত হইয়া—অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; এ দিকে তাহার ধৈর্য্যসীমাও অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। তখন সে কূলে উঠিল। পরিচ্ছদ সিক্ত—সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। সে সেই স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—তবে কি রুথ আসিল না?

এই চিন্তা তাহার বক্ষে—সৈনিকের বক্ষে শত্রুদলের সঞ্জীনবেধ-যাতনার মত অনুভূত হইল। রুথ ইচ্ছা করিয়া আসিল না! হইতে পারে না; তাহা হইলে সে কি কখন দায়ুদকে হারেমে লইয়া যাইত—আপনাকে ও তাহাকে বিপন্ন করিত? ছলনা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বিশেষ তাহাকে পাইয়া রুথের যে আনন্দ—মুক্তির আশায় যে উল্লাস—সে কি কখন অভিনয়মাত্র হইতে পারে? কখনই না। কুক্কুর যেমন গন্ধে দ্রব্যের স্বরূপ বুঝিতে পারে, প্রেমিকের হৃদয় তেমনই দেখিয়াই প্রেমিকার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারে। এত দিন রুথের হৃদয়ভাব অধ্যয়ন করিয়া—এত দিন তাহার প্রেম-সুখ-সম্ভোগ করিয়া—এত দিন তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া বেড়াইয়া সে আজ কেমন করিয়া মনে এ সন্দেহকে স্থান দিল? দায়ুদ আপনাকে আপনি ঘৃণা করিতে লাগিল। তবে—তবে যদি রুথ মনে করিয়া থাকে, সন্তরণে অপটু তাহাকে লইয়া পাছে দায়ুদ বিপন্ন হয় আর সেই জন্যই সে ইচ্ছা করিয়া আপনার মুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দায়ুদের মুক্তি-পথ সুগম করিয়া থাকে? রুথের পক্ষে সেরূপ আত্মত্যাগ বরং সম্ভব—স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এ কি হইল?

তাহার পর দায়ুদ আপনার ব্যাকুল চিন্তা সংযত করিয়া ব্যাপারটির বিচারে প্রবৃত্ত হইল। সে কেমন করিয়া সেই গবাক্ষ বিবরে উঠিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিল। তখন তাহার মনে হইল—তাহারই হিসাবে ভুল হইয়াছে; সে জাল ধরিয়া যে বলে গবাক্ষবিবরে উঠিতে পারিয়াছিল, সে বল রমণীর বাহুতে থাকিতে পারে না—বিশেষ জাল নাই, রুথ কি অবলম্বন করিয়া উঠিবে? ভুল তাহার—দোষ তাহার। সে আপনার মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিল যে, রুথের কথা ভাল করিয়া ভাবিয়াও দেখে নাই। রুথ তাহাকে কি হৃদয়হীন—স্বার্থপর পিশাচ মনে করিয়াছে? সেই অন্ধ কারাগৃহে নিষ্ঠুর অত্যাচারসহায় মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে তাহার

প্রেমিকের পিশাচমূর্ত্তি দেখিয়া কি ব্যথাই পাইতেছে! দায়ূদ উঠিয়া দাঁড়াইল—হাত বাড়াইয়া সেই গবাক্ষবিবরে উঠিবার চেষ্টার অভিনয় করিতে গেল—পড়িয়া গেল। তখন সে কেবল আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, বাল্যকালে সে একটি পাখী পুষিয়াছিল—যাঁহার অনুগ্রহে তাহার পিতার ব্যবসার পত্তন, তাঁহার পুত্র সেইটি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল; তাহার পিতাও তাহাকে সেটি দিতে চাহিয়াছিলেন; তাই দায়ূদ আপনার ভালবাসার সামগ্রী পরকে না দিয়া স্বহস্তে তাহার বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত কণ্ঠ চাপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। রুথকে আমীরের নির্য্যাতনের জন্য না রাখিয়া সে কেন তাহার প্রাণবধ করে নাই? মানুষের প্রাণ—বিশেষ রুথের মত কোমলস্বভাবসম্পন্না—তাহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলার প্রাণ লইতে কতক্ষণ লাগিত? সেও ত ভাল ছিল। দায়ূদ কান্দিতে চাহিল, কান্দিতে পারিল না—বেদনার আতিশয্য অশ্রুর উৎস রুদ্ধ করে।

রাত্রি কাটিয়া গেল—উষার অরুণচ্ছটা বাগদাদের শত মিনারের ও গম্বুজের উপর হইতে স্বচ্ছান্ধকার আস্তরণ সরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে রক্তাভায় রঞ্জিত করিল। ততক্ষণে দায়ূদের চিন্তার ব্যাকুলতাবেগ প্রশমিত হইয়াছে। ধৈর্য্য ইহুদী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে—এই ধৈর্য্য তাহার দুর্দ্দশাসঞ্জাত—ইহার জন্যই সে সব বাধা অতিক্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে। দায়ূদ বুঝিল, এমন করিয়া কেবল অধীর হইলে কিছু হইবে না—প্রতি মুহূর্ত্ত এখন কোহিনুরের মত মূল্যবান্—তাহাকে কায করিতে হইবে—রুথের উদ্ধারচেষ্টা করিতে হইবে। সে যে হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই হোটেলের দিকে চলিল।

তাহার মস্তকে টুপী নাই—কেশ বিশৃঙ্খল—বেশ কর্দ্দমমলিন—গতি অস্থির। বাগদাদের পথে পথে যে সব কুকুর দিবাভাগে কর্দ্দমে শয়ন করিয়া থাকে, আর রাত্রিকালে আবর্জ্জনাস্তূপে আহার সন্ধান করে, তাহারা দায়ূদকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সে হোটেলে প্রবেশ করিলে ভৃত্যবর্গ তাহার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। হোটেলের কালদীয় অংশী দ্বারে দাঁড়াইয়া জপমালা ফিরাইতে ফিরাইতে রাজপথে মৎস্য, ডিম্ব প্রভৃতির দর করিতেছিলেন, আর কমলালেবুর বা তুঁতফলের পশারিণী ইহুদী ও আরমানী রমণীদিগের সঙ্গে যে আলাপ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার বয়সোচিত বলা যায় না। তিনি দায়ূদকে দেখিয়া এক জন পশারিণীকে দেখাইলেন। উভয়েই হাসিল। রসপিপাসাপ্রাবল্যের এইরূপ পরিণতি বাগদাদ সহরে অসাধারণ ব্যাপার নহে। বাগদাদের অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে মধ্যে মধ্যে নিহত যুবকের শব গুপ্তপ্রেমের পরিণামসাক্ষ্য প্রদান করে। যে দেশে পুরুষ রমণীকে ভোগার্থমাত্র মনে করিয়া, আকাশে যত তারা, তত পত্নী গ্রহণ করিতে পারে—যে দেশে নারীর মর্য্যাদাবিষয়ে বিশ্বাসহীন পুরুষ নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রক্ষিরক্ষিত হারেমে বদ্ধ রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হয় না—সে দেশে অবিশ্বাসের পঙ্কে—সন্দেহের পূতিগন্ধে—পাপের উদ্ভব অনিবার্য্য।

দায়ূদ স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল—কিছু আহার করিয়া আপনার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইল। বাগদাদ তুর্কীর একটা প্রদেশের (বিলায়েতের) রাজধানী; এই বাগদাদে তুর্কীর কেল্লা আছে, বিচারালয় আছে; এই বাগদাদে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার ও সহরকোতয়ালের বাস। এই প্রাদেশিক রাজধানীতে অবশ্যই বিচার মিলিবে—অত্যাচারের প্রতীকারোপায় হইবে। ইহাই মনে করিয়া দায়ূদ বাহির হইল। প্রথমেই সে সহরকোতয়ালের কার্য্যালয়ে গেল। তখনও কার্য্যালয়ে কায আরম্ভ হয় নাই। দায়ূদ অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথাকালে কেরাণী প্রভৃতির দল আসিয়া কায আরম্ভ করিল; কিন্তু কোতয়ালের দেখা নাই! তুর্করা প্রতীচ্যদেশের প্রতিষ্ঠানের ও ব্যবস্থার অনুকরণ করিয়াছিল—কিন্তু মানুষ গড়িতে পারে নাই; তাই মানুষের ও ব্যবস্থার অভাবে তাহাদের শাসনপ্রণালী কীটদষ্ট ফলের মত অসার হইয়া কেবল শোভার্থ মাত্র বিদ্যমান ছিল; অনাচারের উর্ব্বরভূমিতে কেবল বিলাসের ও বিশ্বাসঘাতকতার ফসল ফলিত। মধ্যাহ্নে সহরকোতয়াল আসিলেন—দায়ূদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইল—কে সে যে খোদ সহরকোতয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহে? সে হইতে পারে না—তাহার প্রার্থনা সে কোন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে জানাইতে পারে; তিনি প্রয়োজন হইলে কোতয়ালকে জানাইবেন; খাস কোতয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার আশা তাহার পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা। যাঁহা

হউক, কিছু দিন রূপের পিতার বাসস্থানে বাস করিয়া এই সব স্থলে কি করিতে হয়, দায়ুদ তাহা বুঝিয়াছিল। সে এ রোগের ঔষধ বাহির করিল—লীরা ব্যতীত এ রোগের ঔষধ নাই। যে স্থানে অনাচারের প্রাবল্য, সে স্থানে অর্থে সব হয়—দায়ুদ অর্থব্যয় করিতে কাতর ছিল না। কাযেই লীরার প্রয়োগে কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাহার "অসঙ্গত" প্রার্থনা অচিরেই নিতান্ত "সঙ্গত" প্রতীয়মান হইল। দায়ুদ কোতয়ালের কাছে নীত হইল।

কোতয়াল তাঁহার কক্ষে একখানা প্রকাণ্ড কৌচে শয়ন করিয়া হাসিসের (গঞ্জিকার সার) নেশার শেষ খোঁয়ারী ভাঙ্গিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক জন কেরাণী পাশে দাঁড়াইয়া নথির সারাংশ বলিতেছিল—কোতয়াল "আচ্ছা" বলিলে হর্ম্ম্যতলে উপবিষ্ট ভৃত্য তাহাতে মোহরের ছাপ দিতেছিল। এইরূপে একটা প্রকাণ্ড সহরের পুলিসের কায নির্ব্বাহিত হইতেছিল। কায যাহা হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। দায়ুদ তথায় নীত হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কোতয়াল তাহার দিকে চাহিলেন। দায়ুদ দেখিল, তাঁহার নয়নে বিলাসব্যসনাসক্তির ভাব জড়তাব্যঞ্জক দৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু সেই জড়তার মধ্য হইতে ধূর্ত্তের তীক্ষ্ণতা ধূমমধ্য হইতে অগ্নিশিখার মত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দায়ুদকে তিনি তাহার প্রার্থনা জানাইতে বলিলে সে বলিল, তাহার কথা তিনি গোপনে শুনিলে সে বাধিত হইবে। কোতয়াল বলিলেন, সে পারস্যের শাহ বা রুসিয়ার মন্ত্রী নহে যে, তাহার কথা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে বলা যায় না। অগত্যা কর্ম্মচারীর ও ভৃত্যের সম্মুখেই দায়ুদ আপনার কথা বলিল। সে যখন সে কথা বলিতেছিল, কোতয়াল তখন শয়ন করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে কুণ্ডলীকৃত ধূমের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। দায়ুদের কথা শেষ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি আমার কাছে কি চাহ?"

দায়ুদ বলিল, "আমার স্ত্রীর উদ্ধার-সাধন।"

কোতয়াল হাসিলেন—"তোমার স্ত্রী! তোমার মত ইহুদীর কাছ হইতে যাইয়া আমীর আজীজের বেগম হইয়া সে কি অধিক সুখে নাই?"

দায়ুদের বোধ হইল যেন, সে তাহার গাত্রে অস্ত্রের স্পর্শ অনুভব করিল। এই বিচার!

কোতয়াল বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া এ সব কথা প্রমাণ করিবে?"

দায়ুদ বলিল, "প্রমাণের ভার আমার।"

"প্রমাণ করিলেই বা কে আমীর আজীজের হারেমে ইহুদার সন্ধান করিতে যাইবে? যাইলেও কি আর তাহাকে পাওয়া যাইবে? আমীরের পক্ষে তাহাকে জীবন্তাবস্থায় পুতিয়া ফেলিতে কতক্ষণ?"

"তবে উপায়?"

"তুমি কি পাগল যে, আমীর আজীজের অন্তঃপুর হইতে রমণী আনিবার সাহস কর? বাগদাদ সহরে ইহুদার অভাব নাই—আর একটা বিবাহ কর—এ পাগলামী ছাড়িয়া দাও।"

কোতয়ালের কথায় তুর্কের ইহুদীর প্রতি ঘৃণা ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুসলমান দেশে ইহুদীর অভাব না থাকিলেও মুসলমান কখন ইহুদীকে তাহার সমকক্ষ বিবেচনা করে না। আমি দেখিয়াছি, বাগদাদের বাজারে মুসলমান ক্রেতা ইহুদীর দোকানে কোন জিনিষ কিনিতে গেলে দশ বার বৎসরের বালক কুলী বলে—"ও ইহুদী, উহার কথায় বিশ্বাস করিও না।" পথে মুসলমান বালকও পরিণতবয়স্ক ইহুদী ভদ্রলোককে উপহাস করে—যেন সে রাজ্যে ইহুদীর বাস মুসলমানের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই ভাব তুর্কীর শাসনে যে কিরূপ অপ্রিয় করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোতয়ালের কথার অপমানে আহত দায়ুদ বলিল, "ইহাই কি অত্যাচারের প্রতীকারপ্রার্থীর প্রতি বাগদাদ সহরের সহর-কোতয়ালের একমাত্র উপদেশ?"

ইহুদী যুবকের এই ধৃষ্ট প্রশ্নে কোতয়াল বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এ উপদেশ কি তোমার মনে ধরিল না?"

দায়ুদ কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কোতয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে?"

দায়ুদ বলিল, "আপনি যাহা পারি, তাহাই করিব।"

সে চলিয়া গেলে কোতয়াল বলিলেন, "একটা কিছু না করিয়া বসে!"

কেরাণী হাসিয়া বলিল, "আমীর আজীজের প্রাসাদে? তথায় হাবসী প্রহরীদের ঠকান যায়; কিন্তু কুকুরের কি করিবে?"

কোতয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

"আমীরের ছয়টা প্রকাণ্ড কুকুর আছে। সমস্ত দিন সেগুলাকে অনাহারে আটকাইয়া রাখা হয়; রাত্রিকালে বাড়ীর স্থানে স্থানে এক একখানা মাংসের টুকরা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। কুকুরগুলা মাংসের কাছে দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়—ঘুমায় না; অপরিচিত কেহ আসিলে তাহার আর নিস্তার নাই।"

কোতয়াল "হাঃ! হাঃ!" করিয়া হাসিলেন। তবুও তিনি জড়তা পরিহার করিয়া আমীরকে একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন—বাগদাদ সহরে এক জন ইহুদী যুবক স্ত্রীহরণের জন্য তাঁহার শত্রুতা-সাধনে বদ্ধপরিকর; কোতয়াল তাহাকে আটক করিবেন; আমীরও সতর্ক থাকিলে ভাল হয়।

পত্র লিখিয়া তিনি তাহা আমীরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন এবং পত্রলিখন-শ্রমে এতই শ্রান্তি অনুভব করিলেন যে, সে দিন আর কোন কায করিলেন না।

কোতয়ালের দরবার হইতে বাহির হইয়া দায়ুদ ভাবিল, সে শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে—একবার ওয়ালীর (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার) কাছে যাইবে। ওয়ালীর কার্য্যালয়ে তাহার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় সহকারীর সাক্ষাৎ হইল—সে বিদেশী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তাহার পিতা ইহুদী—ব্যবসা-ব্যপদেশে ফ্রান্সে যাইয়া এক ফরাসী রমণীকে বিবাহ করেন; সে সেই বিবাহের সন্তান। সে-ও বোম্বাইয়ে শিক্ষিত ফরাসী ও ইংরাজী জানে বলিয়া চাকরী পাইয়াছে। সে সব শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দায়ুদের প্রার্থনায় কোন ফল হইবে না; কারণ, আমীর আজীজকে তুর্ক-সরকার অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। তুর্ক সরকার দুর্ব্বল—দুর্ব্বল সরকারের দুর্ব্বল বাহু কুনস্তান্তিনিয়া হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত পৌঁছে না—কাযেই যিনি ইচ্ছা করিলেই তুর্কীর পক্ষ ছাড়িয়া পারস্যের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, সেই আমীর আজীজকে অসন্তুষ্ট করা ওয়ালীর পক্ষে রাজনীতিকোচিত কার্য্য হইবে না। হয় ত ওয়ালীই দায়ুদের শত্রু হইয়া আমীরকে তুষ্ট করিবার জন্য কোন কৌশলে তাহাকে বিপন্ন করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া দায়ুদ বলিল, "ইহাই কি এ দেশের বিচার?"

কর্ম্মচারী যুবক বলিল, "ইহাই আত্মরক্ষায় অক্ষম—ষড়যন্ত্রজর্জ্জরিত—দুর্ব্বল রাজ্যের রাজনীতি।"

"তবে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশের আর কত বিলম্ব আছে?"

"যতদিন প্রবল রাজ্যগুলি ইহার বাটোয়ারাব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করিতে না পারে, ততদিন। তাহার পর আর এক মুহূর্ত্তও নহে।"

"সে দিন যত শীঘ্র আইসে, ততই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল।"

ব্যর্থ চেষ্টার হতাশা বেদনাভার বহন করিয়া দায়ুদ বাহির হইল—অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রথম সেতুর উপর উপনীত হইল—আমীরের প্রাসাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নয়নের দৃষ্টিতে যদি দাহিকাশক্তি থাকিত, তবে দায়ুদের দৃষ্টিতে আমীরের প্রাসাদ ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

সেই সময় ফরিদা তাহার সম্মুখে আসিয়া বোরকার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিল। সে তাহার সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। কোতয়ালের পত্র পাইয়া আমীর গুপ্ত ঘাতুকের দ্বারা দায়ুদকে নিহত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ফরিদা তাহা জানিতে পারিয়া দায়ুদকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছিল। দায়ুদের জীবনরক্ষায় তাহার স্বার্থ ছিল—দায়ুদ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় করিতে পারিবে। তাহার সাহসে, পলায়ন-কৌশলে, বুদ্ধিতে—ফরিদা মুগ্ধ হইয়াছিল; বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে আমীরের শত্রুতা-সাধন করিবেই করিবে। তাই সে দায়ুদকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছিল। অনেক অত্যাচারী নৃপতি শত্রুর আক্রমণের সকল পথ সাবধানে রুদ্ধ করিয়া শেষে আপনার হারেমে রমণীর আভরণমধ্যে রক্ষিত ছুরিকার আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে—আমীরের গৃহে ফরিদা তেমনই অস্ত্র। তাহার প্রতি আমীরের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সে তাঁহারই সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র তীক্ষ্ণ করিতেছিল।

ফরিদাকে সম্মুখে দেখিয়া দায়ুদ জিজ্ঞাসা করিল, "রুথ কোথায়?"

এই প্রশ্নে ফরিদা বিস্মিতা হইল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, দায়ুদই রুথের উদ্ধার-সাধন করিয়াছে। দায়ুদের প্রশ্নে সে বিশ্বাসের অবসান হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রতিহিংসাদীপ্ত হৃদয়ে নূতন ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব হইল। সে বলিল, "আমীর তাহাকে হত্যা করিয়াছেন।" ফরিদা

ভাবিল, এই সংবাদে দায়ুদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইবে; আর রুথ মৃতা জানিলে—পুরুষ দায়ুদ—কালে সে তাহার সাহায্য করিয়া তাহার মনে একটু স্থান পাইতে পারিলে হয় ত—কেন তাহারও রূপ আছে—বুদ্ধি আছে। যাহার শিক্ষা নাই—সংযম নাই—ধর্ম্ম নাই, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা থাকে না।

ফরিদার কথায় দায়ুদের মনে হইল,তাহার চরণতল হইতে সেতু সরিয়া যাইতেছে। সে সেতুর জীর্ণ কাষ্ঠবৃতি ধরিয়া দাঁড়াইল, নহিলে পড়িয়া যাইত।

ফরিদা বলিল, "রুথ আমার ভগিনীর মত ছিল; তাহার উদ্ধারের জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই।"

দায়ুদ সে কথা শুনিতেছিল কি না সন্দেহ।

ফরিদা বলিল, "তাহার পর, আপনার ও আমার জীবন বিপন্ন। আমি আমার জন্য ভাবি না; তাই সব বিপদ তুচ্ছ করিয়া আপনাকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছি। কোতয়াল আমীরকে আপনার কথা জানাইয়াছে।"

ফরিদার কথায় দায়ুদের বিশ্বাস হইল। সে বলিল, "তোমার এই উপকারকথা আমি কখন বিস্মৃত হইব না।"

তখন ফরিদা বলিল, "রুথের হত্যার প্রতিশোধ-বিষয়ে আমি আপনার সহায় হইব; যদি কখন কোন প্রয়োজন হয়, প্রাসাদে ফরিদাকে সংবাদ দিবেন। যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি আমীরের—নরপিশাচের শক্রতা-সাধন করিব।"

[ক্রমশঃ।

দিব্যোন্মেষ।

(শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের ইংরাজী কবিতা হইতে)

গিরিশৃঙ্গ হ'তে লম্ফে উতরি' ভূতলে,
কে যেন পবনোৎক্ষিপ্ত উন্মুক্ত কুন্তলে,
ছুটি' গেল অগ্রে মম;—কল্পনা উজ্জ্বলা
মম-নেত্র-পথে যেন, বিস্ময়-বিহ্বলা;
আরক্ত কপোল,—যেন সহসা কাননে,
গোলাপ খুলিল রূপ সত্রাস আননে;
নিঃশব্দ চরণক্ষেপ,—সমীরণ প্রায়;
পশ্চাতে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপি' পলায়।
চিহ্ন নাহি আর;—যেন মানসে ভাসিয়া,
না ধরিতে, ভাব দ্রুত পলা'ল হাসিয়া;
ঘন-যবনিকা ভেদি' সুরবালা কেহ,
প্রস্থিতা প্রকাশি' যেন জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

অভিমান

শিল্পী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ

মজুমদার

সার রাজেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের

ফিশক্যাল কমিশন।

ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং তাহার জনগণকে আহার্য্যের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাহাকে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেহধারণ করিতে হয়, তাহার পক্ষে বাণিজ্যের পথ পরিষ্কৃত রাখাই স্বার্থ। সেই জন্য—স্বার্থরক্ষাকল্পে ইংলণ্ড অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান হইবার পূর্ব্বে, তথায় এ নীতি ছিল না; পরন্তু ভারতীয় পণ্যের আমদানী আইন করিয়া বন্ধ করিয়াও ইংলণ্ড দেশে শিল্প সংস্থাপিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে ইংরাজের অধীনতা-হেতু বাধ্য হইয়া—অনিচ্ছায়—অবাধবাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ফলে দাঁড়াইয়াছে, ভারতবাসীরা বিদেশের কলের জন্য কাঁচামাল বা উপকরণ যোগাইয়া বিদেশী পণ্য খরিদ করিয়া দরিদ্র হইতেছে। ভারতবাসীরা স্বদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য রক্ষাশুল্ক সংস্থাপনের সমর্থক। এমন কি, মিষ্টার অষ্টেন চেম্বার্লেনও স্বীকার করিয়াছেন—ভারতবাসীরা যদি আইন করিবার অধিকার পাইত, তবে তাহারা বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক সংস্থাপন করিত। কিন্তু আইন করিবার অধিকার ভারতবাসীর ছিল না।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংরাজের পক্ষে আর অবাধবাণিজ্য-নীতিতে অবিচলিত থাকা সম্ভব রহে নাই। এমন কি, জার্ম্মাণীর রাসায়নিক রঞ্জকের অভাবে যখন ইংলণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসা বিপন্ন হইল, তখন ইংরাজ সরকার প্রভূত অর্থসাহায্য দিয়া দেশে রঞ্জকের কারখানা স্থাপিত করিলেন।

তাহার পর ইংরাজের নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ শিল্পের পুনর্গঠনের কথা উঠিল। তখন প্রস্তাব হইল—বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের পণ্য আমদানী-রপ্তানীতে কতকগুলা বিশেষ সুবিধা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং অন্য কয়টি বিষয়ের সঙ্গে তাহারও আলোচনার জন্য এ দেশে এক সমিতি গঠিত হইল। সংপ্রতি সেই ফিশক্যাল কমিশনের নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের সদস্যরা সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। পরন্তু পার্শী সদস্যদিগকে বাদ দিলে দেখা যায়, ভারতীয় সদস্য কয়জনই সোজাসুজি বলিয়াছেন—তাঁহারা এ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন।

কমিশনের মত—"ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা পরামর্শ দিতেছি যে, আমাদের বিবরণে বিবৃত ভাবে প্রয়োজন বুঝিয়া এ দেশে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা হউক।"

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে—সাধারণভাবে সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তন না করিয়া ক্ষেত্র বুঝিয়া তাহার প্রবর্ত্তনে উপকার হইবে। এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের শিল্পোন্নতি দেশের আকৃতি, সম্পদ বা জনসংখ্যার অনুপাতে আশানুরূপ হয় নাই এবং নানা বিষয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় ভারতের বিশেষ উপকার হইবে। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নতি-সাধন সম্ভব এবং সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত না হইলে তাহা হইবে না। ভারতের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও বলা যায়, সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইলে রাজস্ববৃদ্ধি হইবে। এক দিকে যেমন এই কথা—অপর দিকে তেমনই আবার বলিতে হয়, বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হইবে এবং ফলে দেশের লোককেই অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু সে ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ অধিক।

বোধ হয়, কমিশনের সদস্যরা মনে করিয়াছেন, বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক সংস্থাপিত করিলে পণ্যের যে মূল্যবৃদ্ধি হইবে, তাহা অস্থায়ী; কারণ, শুল্কের ফলে যখন দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন দেশের পণ্য দেশে অল্পমূল্যেই পাওয়া যাইবে এবং লাভের অংশ বিদেশে যাইবে না।

কমিশন বলেন, কোন্ কোন্ শিল্পে কিরূপভাবে রক্ষা-শুল্কের সুযোগ প্রদান করা সঙ্গত, তাহা স্থির করিবার জন্য এক সমিতি—টারিফ বোর্ড—গঠিত হইবে। কিন্তু সে বোর্ড কি ভাবে বিচার করিবেন, তাহার নিয়ম কমিশন বাঁধিয়া দিয়াছেন :—

(১) যে শিল্পের জন্য সংরক্ষণশুল্ক প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার উন্নতির স্বাভাবিক সুবিধা থাকা চাহি। অর্থাৎ

উপকরণ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যহেতু সে শিল্প যেন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(২) সংরক্ষণশুল্ক ব্যতীত সে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও উন্নতি দীর্ঘকালসাপেক্ষ।

(৩) প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে তাহা প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইবে না।

তবে কয়টি বিষয়ে এই সব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। জাতির বা দেশের রক্ষার্থ যে সব শিল্পের প্রয়োজন, সে সকল শিল্পের মধ্যে যে-গুলির উন্নতি-সাধনের সুবিধা এ দেশে বিদ্যমান, সে সব শিল্পকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্কের সাহায্য প্রদান করা হইবে। তদ্ব্যতীত পণ্যোৎপাদক কলকব্জা ও পণ্যের উপকরণ সাধারণতঃ বিনা শুল্কে আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। আর যে সব আংশিকরূপে প্রস্তুত করা পণ্য ভারতীয় পণ্যের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে সকলের উপর শুল্কের পরিমাণ কম করা হইবে।

যেরূপে নানারূপ সর্ত্তে এই সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সংরক্ষণনীতি ব্যর্থ করাই কমিশনের য়ুরোপীয় ও পার্শী সদস্যদিগের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এমন কথা বলেন নাই যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাহেতু তাহার পক্ষে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন ব্যতীত অন্য পথ নাই।

কমিশনের সভাপতি সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এবং ৪ জন ভারতীয় সদস্য—শ্রীযুক্ত শেষগিরি আয়ার, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস ও শ্রীযুক্ত নরোত্তম মুরারজী সে কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কমিশনের অন্যান্য সভ্য মূল প্রস্তাবটিকে এতগুলি সর্ত্তে আটকাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে প্রস্তাবের উপকারিতা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন,—সংরক্ষণ-নীতিই ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা

ভারতবর্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কত উপকার হইবে, তাহার উল্লেখ করিয়া শেষোক্ত সদস্যরা বলিয়াছেন, ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

অর্থাৎ ইংলণ্ডও যে নীতি অবলম্বন করিয়া স্বদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ও মার্কিণে যে নীতি প্রবর্ত্তিত আছে,

তাহাই প্রবর্ত্তিত করিয়া, ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়া—ভারতবাসীকে কৃষিসম্বল অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া—দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, এ দেশে অবাধবাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরাজ সরকার দেশের লোকের সম্পদ ও সন্তোষবিধানের চেষ্টাই করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তনে যদি প্রজাপুঞ্জের সম্পদ ও সন্তোষ-বিধান হয়, তবে কেবল ভারতবর্ষেই সে নীতি প্রবর্ত্তন না করিয়া ইংরাজ স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাজ্যাংশসমূহে—কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিলণ্ডে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই নীতির প্রবর্ত্তন করেন নাই কেন? সে সব দেশে অবাধবাণিজ্য-নীতির পরিবর্ত্তে সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কেন?

ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সমৃদ্ধি ও সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যেই কি অসম প্রতিযোগিতায় এ দেশের শিল্পসমূহ বিনষ্ট করিবার প্রয়াস করা হইয়াছিল? ভারতীয় সভ্যরা সে কথারও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে শিল্প কমিশনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—বিলাতের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্বার্থপরতাহেতু জিদ করিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশ হইতে বিলাতে পণ্যোৎপাদনের উপকরণ রপ্তানী করিতেই বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন। যদি তাহা না হইত, তবে অবস্থানুসারে ব্যবস্থাপরিবর্ত্তনক্ষম ভারতীয় শিল্পীরা কল-কব্জার প্রচলনে যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিত এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত। আজ যে ভারতবর্ষ শিল্পবিষয়ে অন্যান্য দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে জন্য ভারতবাসীর ক্ষমতাল্পতা দায়ী বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অন্যায়রূপে শুল্ক প্রবর্ত্তনের ফলে এ দেশের শিল্পীর স্বাভাবিক ক্ষমতার স্ফুরণপথ রুদ্ধ হইয়াছিল। এ কথা ইংরাজ গ্রন্থকাররাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই; পরন্তু তাঁহাদেরই কেহ কেহ স্পষ্ট বলিয়াছেন, ইংলণ্ড রাজ-নীতিক শক্তি অযথারূপে প্রযুক্ত করিয়া, ভারতের শিল্প নষ্ট করিয়াছিলেন।

আজ যে ভারতীয় সভ্য কয় জনের স্বতন্ত্র বিবরণে নিষ্ফল আক্রোশে কমিশনের অন্যতম যুরোপীয় সদস্য—কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সওদাগর সভার সভাপতি—মিষ্টার রোডস বলিতেছেন, তাঁহাদের এই নির্দ্ধারণ রাজনীতিক দলিল অর্থাৎ তাঁহারা অর্থনীতির দিক হইতে বিচার না করিয়া রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিয়াছেন, তাহার উত্তরে অবশ্যই বলা যায়, ইংরাজ এ দেশে শুল্ক সম্বন্ধে যখন যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই পশ্চাতে রাজনীতিক ব্যাপার ছিল। ভারতবর্ষে সংরক্ষণশুল্ক প্রবর্ত্তন ব্যতীত শিল্পপ্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি?

ইহার পর রাষ্ট্রগত বিশেষ ব্যবস্থার বা Imperial Preference এর কথা। ভারতবর্ষ এত দিন অর্থনীতিক ব্যবহারে খাস ইংলণ্ডের কাছে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই কিছু দিয়াছি। সে অবস্থায় ইংলণ্ডের ব্যবসার সুবিধার জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগে ভারতের আগ্রহ বা প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি? অবশ্য,ইংলণ্ড যদি আইন করিয়া ভারতবর্ষকে সেরূপ ব্যবস্থায় বাধ্য করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। ইংলণ্ডের সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, উপনিবেশসমূহ সম্বন্ধে সে কথা আরও বিশেষভাবে বলিতে পারা যায়। ভারতবাসীর প্রতি ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ-দিগের কুব্যবহারের কথা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন উপনিবেশে ভারতবাসীকে পদার্পণ করিতে দেওয়া হয় না—যেন তাহাদের স্পর্শে দেশ অপবিত্র হইয়া যাইবে; সর্ব্বত্রই ভারতবাসীরা ঘৃণিত। এ অবস্থায় ভারতবাসী কেন সেই সকল উপনিবেশকে ভারতে ব্যবসার সুবিধা করিয়া দিবে? বরং ক্ষমতা পাইলে ভারতবাসীর পক্ষে অপমানে অপমানের প্রতিশোধ লইবার স্পৃহাই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কমিশনের ভারতীয় সভ্যরা তাঁহাদের স্বতন্ত্র নির্দ্ধারণে বলিয়াছেন, ভারতবাসী যত দিন স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভ না করিবে এবং যত দিন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গে গঠিত ব্যবস্থা-পক সভা ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ না করিবে, তত দিন ভারতবাসী রাষ্ট্রগত বিশেষ ব্যবহারে সম্মত হইতে পারে না।

আমরা বলি,যত দিন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশে সেই সাম্রাজ্যের প্রজার পূর্ণ অধিকার সম্ভোগ করিতে না পারিবে অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসনে যত দিন তাহার ললাট হইতে লাঞ্ছনার চিহ্ন বিদূরিত না হইবে, তত দিন তাহার পক্ষে রাষ্ট্রগত বিশেষ ব্যবহারে সম্মতিদান সম্ভব হইবে না।

এই যে রাষ্ট্রগত বিশেষ ব্যবহারের প্রস্তাব, ইহাও নূতন নহে। বিলাতে পরলোকগত জোসেফ চেম্বার্লেন যখন শুল্ক-সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং মিষ্টার (এখন লর্ড) ব্যালফোর তাঁহার সমর্থক ছিলেন, তখন এ দেশে স্বদেশী আন্দোলনে শঙ্কিত হইয়া সার রোপার লেথব্রিজ ঐরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখনও ভারতবাসী সে প্রস্তাবের সমর্থন করে নাই, আজও তাহা করিবে না। কারণ, সমগ্র সাম্রাজ্য হইতে প্রাপ্য ব্যবহার না পাইয়াও তাহাদিগকে ব্যবসার সুবিধা করিয়া দেওয়া, হয় বাধ্য হইয়া করিতে হয়, নহে ত দাসবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা জগতের হাটে যে স্থানে সুবিধা পাইব, সেই স্থানেই মাল কিনাবেচা করিব এবং স্বদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশজ উপকরণে দেশেই পণ্যোৎপাদনের দিকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে।

কমিশনের কয় জন ভারতীয় সভ্য যে কতকগুলি স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেছি। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবে কি না—সে বিষয়ে এখন কোন কথা বলা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এ কথা আমরা অবশ্যই বলিব যে, শিল্প কমিশনে পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্যের মত তাঁহারা এই কমিশনে ভারতবাসীর প্রকৃত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিঃস্বার্থ পরোপকার !

জাতিসঙ্ঘ—আমরা মুখে বলি, পৃথিবীতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অভিপ্রেত ; মনে ছিল—জার্ম্মাণীর পালক নিয়ে পলাইতে পারিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

৪

জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের উপর সংসারের ভার দিয়া রঘুবীর এবং গদাধরকে লইয়া ক্ষুদিরাম শেষ বয়সে নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল কাটাইতেন। তাঁহার অভাবে পরিবারের সহসা কোনরূপ আর্থিক অভাব উপস্থিত হইল না। রামকুমার যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে কায়ক্লেশে দিন একরকম চলিয়া যাইতে লাগিল। কামারপুকুরে আসিবার ছয় বৎসর পরে ক্ষুদিরাম রামকুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপর পর পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। বড় বধূ এখন ঘরণী-গৃহিণী। তাঁহাকে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীর স্মৃতি, রঘুবীরের সেবা এবং কোলের দু'টি ছেলে-মেয়ে —গদাধর ও সর্ব্বমঙ্গলা—এখন চন্দ্রাদেবীর অনন্ত আশ্রয় হইল। পত্নীর পয়ে রামকুমারের জীবনে উন্নতির সূচনা। সুলক্ষণা বধূ সংসারের সকলের আদরিণী। কিন্তু দিনে দিনে বালিকার কলিকা-দেহ কুসুমিত হইয়া যতই তাহাকে মাতৃত্ব-গৌরবের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিল, সে রমণীয় যৌবন-শ্রীর অন্তরালে কালের উদীয়মান ছায়া দেখিয়া রামকুমার ততই শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। যে অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সন্তানের জননী হইলে পত্নীর মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহা দৈবকৃপালব্ধ। রামকুমার শক্তির উপাসক ছিলেন। দেবীর কৃপায় মৃত্যুর অবধারিত সময় তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিতেন। কোন সময় কলিকাতায় আসিয়া এক দিন গঙ্গাস্নান করিতে করিতে রামকুমার দেখিলেন, গঙ্গাগর্ভে একখানি শিবিকার ভিতর বসিয়া এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্নান করিতেছেন। স্নানকালে সম্ভ্রান্ত মহিলার সম্ভ্রম-রক্ষার এরূপ প্রথা পল্লীগ্রামে প্রচলিত নাই। এই অভিনব ব্যাপার দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ একবার বিজলী-ঝলকের মত স্নানার্থিনীর মুখ অনাবৃত হইয়া ব্রাহ্মণের বিস্মিত নেত্রপথে পতিত হইল। রামকুমার শিহরিয়া উঠিলেন এবং একান্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিয়া ফেলিলেন, 'আহা-হা! আজ যার আব্রু-রক্ষার জন্ত এত আয়োজন, কাল তাকে সকলের চোখের সামনে বিসর্জ্জন দিতে হবে!' ব্রাহ্মণ জানিতেন না, উক্ত মহিলার স্বামী নিকটেই স্নান করিতেছিলেন। এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মুখে এই অপ্রিয় সত্য শুনিবামাত্র বিস্ময়-কৌতূহল এবং ক্রোধ তাঁহাকে নিরতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সাগ্রহে এবং সবিনয়ে তিনি রামকুমারকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। অভিপ্রায়—বাক্য বিফল হইলে ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ! দৈবশক্তিরই জয়লাভ হইল। উৎকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামকুমার সসম্মানে গৃহে ফিরিলেন।

এই অলৌকিক শক্তিবলে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-কার্য্যে রামকুমারের প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যেখানে রোগ দুরারোগ্য এবং মৃত্যু অনিবার্য্য, সেখানে তিনি শান্তিকার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ব্যাধি যেখানে বৈদ্যের সাধ্যাতীত এবং প্রতিকূল দৈব শান্তি প্রতীক্ষা করিতেছে, লোকে দেখিত, রামকুমারের স্বস্ত্যয়ন সেখানে ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অমোঘ। ইহাতে তাঁহার উপার্জ্জনের পন্থা সুগম হইল। 'লক্ষ্মীজলা'র প্রচুর উর্ব্বরতায়, স্মৃতির বিধান এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নে যদৃচ্ছা-লব্ধ অর্থে শাকান্ন-সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবার নিরুদ্বেগচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে শ্রীমান্ গদাধরের উপনয়নকাল সমুপস্থিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন—গদাধরের দ্বিতীয় ভাব-সমাধি। কামারপুকুরের প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে আনুড় গ্রাম, তথাকার বিশালাক্ষী দেবী ও অঞ্চলে লোক-প্রসিদ্ধ। চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, সেই মাঠের মাঝখানে শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ষার অভিসার সমানে সহ্য করিয়া দিগন্ত-বিস্তৃত অম্বরতলে দেবী বরদায়িনীরূপে বিরাজ করেন। এখানকার রাখালবালকগণ দেবীর একান্ত অন্তরঙ্গ, তাহাদের সুখসঙ্গ না পাইলে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা নিরতিশয় নীরস বলিয়া মনে হয়। চারিদিকে গো-বৎসসকল স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে; আশে-পাশে রাখালবালকসব তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে; কেহ বনফুলে তাঁহাকে সাজাইতেছে, কেহ গান গাহিতেছে; সকলে মিলিয়া পথিকদিগের নিবেদিত মিষ্টান্ন কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছে, প্রণামীর পয়সা লুঠ করিতেছে; আর সর্ব্বোপরি

দেবী প্রসন্ন স্মিত হাস্য বর্ষণ করিতেছেন—দেবস্থলের এই প্রাণদ ছবি দর্শকের মনে ব্রজের ভাব উদ্দীপিত করে। কথিত আছে, কোন সময় এক লব্ধকাম ধনী দেবীর বাসের জন্য একটি দেউল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তখন হইতে প্রাত্যহিক দ্বৌকালীন পূজান্তে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইতে লাগিল এবং রাখালবালকদিগের সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া, কল-কোলাহলের পরিবর্ত্তে কাতর ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, 'মা, আমাদের ছেড়ে মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে রইলি! আমাদের আর কে আছে যে, রোজ রোজ লাড্ডু-মোয়া খেতে দেবে?' মায়ের পদ্মাসন টলিল এবং দেউলও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। পরদিন পুরোহিত সেই পতনোন্মুখ মন্দির হইতে দেবীকে শশব্যস্তে বাহিরে আনিয়া খোলা-মাঠে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। সে অবধি যে-কেহ সে মন্দির সংস্কার বা নূতন মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছে, মা তাহাকেই স্বপ্নে শাসাইয়াছেন—'সাবধান! তোর সপুরী একগাড় করব।'

সংক্ষেপতঃ ইহাই বিশালাক্ষীদেবীর বিস্ময়কর ইতিহাস। ধর্ম্মপ্রাণ কামারপুকুরের নর-নারীগণের সরল বিশ্বাসে দেবী জাগ্রতারূপে প্রতিষ্ঠিতা। রমণীগণ দলবদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার পূজা দিতে যান। তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য গদাধর একবার বিষম গোঁ ধরিয়া বসিল। গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা ভগিনী প্রসন্নময়ী এবার এ দলের নেত্রী। গদাই তাঁহার অতীব প্রিয়পাত্র, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া ত আহ্লাদের কথা। কিন্তু ভয় হয়, এক ক্রোশ পথ, মাঠে কাঠ-ফাটা রৌদ্র, আর বালকের আট বছরমাত্র বয়স। প্রসন্ন কিন্তু জানিতেন, আনুড়ের দেবী যদি কামারপুকুরে সশরীর উপস্থিত হইয়া নিবারণ করেন, গদাই তথাপি নিরস্ত হইবে না। অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইতে হইল। 'জয় বিশালাক্ষী' বলিয়া রমণীগণ যাত্রা করিলেন। বালকের সরস সঙ্গ, তাহার রঙ্গ-ভঙ্গ আর মাঝে মাঝে গ্রাম্য-কবি-রচিত দেবীর মহিমা-সূচক সঙ্গীত-তরঙ্গ পথ-শ্রম হরণ করিয়া রমণীগণের হৃদয়ে অপার আনন্দ সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রান্তর-পথে অকস্মাৎ এক অভাবনীয় বিঘ্ন আসিয়া রমণী-মণ্ডলীর গতিরোধ করিল। বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য গান করিতে করিতে গদাধরের তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ শুষ্ক, শরীর আড়ষ্ট হইয়া গেল এবং নিস্পন্দ নয়নপ্রান্ত হইতে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতে লাগিল। ভয়ে বিবর্ণ মুখে সঙ্গিনীগণ 'কি হ'ল, কি হ'ল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু গদাধরের অচেতন দেহ হইতে কোন সাড়া আসিল না। পল্লীর প্রাণধন গদাইকে অঙ্ক-শায়িত করিয়া রমণীগণের কেহ অঞ্চলে বীজন, কেহ চোখে মুখে জলসিঞ্চন, এবং কেহ বা তাহার অসাড় দেহের উপর অনিবার অশ্রুসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সকলের মনে হইল, দুরন্ত রৌদ্রে শিশুর সরদি-গরমি হইয়াছে। কিন্তু প্রসন্নময়ীর ভাবনা অন্যরূপ। তিনি সময় সময় গদাইকে বলিতেন, 'তুই মানুষ নোস্!' বালকের অবস্থা দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হয় ত দেব-শিশুর উপর দেবীর ভর হইয়াছে। প্রসন্ন সঙ্গিনীসমাজে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অকূলে কূল দেখিয়া রমণীগণের ভাঙ্গা বুকে বল আসিল। গদাধরের কর্ণকুহরে বার বার 'বিশালাক্ষী' নাম ধ্বনিত করিয়া সকলে ভক্তিভরে যুক্ত-করে মুক্ত-স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা, দয়া কর! মায়ের বাছা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দাও! মা, রক্ষা কর, রক্ষা কর!' অল্পক্ষণ পরেই বালক সংজ্ঞালাভ করিল এবং বিশালাক্ষী মায়ীর জয়-গানে মুক্ত প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রতিবাসিনীগণের মুখে ঘটনা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে কামারপুকুরের মাঠে যখন অনুরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছিল, তখন ক্ষুদিরাম জীবিত ছিলেন। আহা, পিতৃহীন বালক! এখন সকল দায়িত্ব তাঁহারই। কিন্তু যখন এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, গদাধরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের কোন বিপর্য্যয় দেখা গেল না, রামকুমার তখন মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া অনুজের উপনয়নের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন।

ইতোমধ্যে কখন্ যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা ধাত্রী ধনী কামারণী গদাধরকে মিষ্টান্ন-মোদক খাওয়াইয়া প্রসন্ন করিয়া, উপনয়নকালে তাহার নিকট প্রথম ভিক্ষা লইবার প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। অনুষ্ঠানের অনতিপূর্ব্বে ভ্রাতার বিসদৃশ প্রস্তাব শুনিয়া রামকুমার প্রথম ভাবিলেন, বালকের আব্দার, বুঝাইলেই বুঝিবে। এ বংশে কখন শূদ্রের দান গৃহীত হয় নাই বলিয়া সূচনা করিয়া তিনি যতই তর্ক-যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিলেন, গদাধর ততই বলিতে লাগিল, 'যে সত্যভঙ্গ করে, সে যজ্ঞসূত্র

ধারণের অযোগ্য!' নিঃসন্তান রামকুমার কনিষ্ঠকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার কাছে তাহার কোন আব্দারই উপেক্ষিত হইত না। কিন্তু এ যে বিষম ব্যাপার! রামকুমার প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে ভীত হইয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠকে তিনি ভাল রকমই চিনিতেন। সুমেরু নড়িবে, তবু তাহার সত্য টলিবে না। বুঝি, সকল কাণ্ডই পণ্ড হয়! ধনী কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ভিক্ষা-মাতা হইবার আয়োজন করিতে লাগিল—গদাই যে তাহাকে বাগ্‌দান করিয়াছে! ক্ষুদ্র পল্লী—গদাধরের নির্ব্বন্ধ রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস রামকুমারকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এরূপ অবস্থায় কুল-প্রথা লঙ্ঘন করিলে কলঙ্কভাজন হইতে হইবে না; কেন না, অনেক অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশে এরূপ ঘটিয়াছে। পিতৃ-বন্ধুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রামকুমার উপনয়নের দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ধনীকে ধন্য করিয়া গদাধর ধাত্রীর নিকট অঞ্জলি পাতিল—ভিক্ষাং দেহি!

যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবার পর গৃহ-দেবতা রঘুবীরের সেবাধিকার পাইয়া গদাধর অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাহার ধ্যান-প্রবণ মন ভাব-তন্ময়তায় সময় সময় সমাধির গভীর নীরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। জপ, ধ্যান, অর্চ্চনা, সন্ধ্যা-বন্দনা, লাহাবাবুদের বাটীতে সাধুগণের মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে আজন্ম শ্রুতিধর, মনস্বী বালকের মস্তিষ্কে অচিরে এক অপূর্ব্ব মেধার উদয় হইল। বয়সে বালক, স্বভাবে শিশু, জ্ঞানে প্রবীণ, এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ-বটুর অসাধারণ আচরণ সময় সময় বিস্ময়েরও বিস্ময় উৎপাদন করিত। যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে, ঐ সময় লাহাবাবুদের বাটীতে একটা ঘটার শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। তৎকালীন বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী সভাস্থ হইয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কূট প্রশ্ন উঠিয়া তাঁহাদের সকলকে জটিল তর্কজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং অপরিমিত সময় অতিবাহিত হইলেও তাহার সমীচীন মীমাংসা হইল না। সকলেই অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন, অথচ কেহ কাহারও কথা শুনিতেছেন না। এই সময় গদাধর কোন পরিচিত পণ্ডিতের কাছে একটি মীমাংসা উত্থাপিত করিল। দশমবর্ষীয় বালকের অপূর্ব্ব মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতবর্গ বিপুল বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন।

উপনীত হইবার পর গদাধরের জীবনে আর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাল্গুন মাস। শীতের সুষুপ্তি-অঙ্কে জাগরিত হইয়া প্রকৃতি অতি রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছেন। মেদিনী শ্যামাঞ্চলা, কুসুম-কুন্তলা, অধরে কুসুমিত-হাসি। জড়-চেতনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা সঞ্চারিত! ভৃঙ্গের গুঞ্জনে—বসন্তের বিজয়-গান, বিহঙ্গের কণ্ঠে—বীণার বিনোদ তান; কিন্তু কামারপুকুর পল্লী আজ নিরন্তর 'হর হর' রবে মুখরিত—শিব-রাত্রির ব্রত। এই পর্ব্বে পল্লীবাসিগণের রাত্রিজাগরণের সহায়স্বরূপ প্রতি-বৎসর পাইনবাবুদিগের বাটীতে যাত্রার আয়োজন হইয়া থাকে—স্মরহর মহাদেবের মহিমা গীত হয়। কিন্তু এবার বড় বিভ্রাট! যাহার উপর শিব সাজিবার ভার, সে সহসা শয্যা লইয়াছে। আজিকার মত অভিনয় ক্ষান্ত রাখিবার নিমিত্ত অধিকারী মিনতি করিতেছেন। সারা পল্লীর মনোভঙ্গ! তাহা ত কিছুতেই হইতে পারে না! উৎসবের পাণ্ডাগণ স্থির করিলেন, অভিনয়-পটু, সঙ্গীত-নিপুণ গদাই এ সঙ্কটে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। সারারাত্রি জপ-ধ্যান, শিব-পূজায় অতিবাহিত করিবার একটা মোহকর কল্পনা গদাধরকে তখন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বয়স্যগণ আসিয়া যখন শিব সাজিতে অনুরোধ করিল, গদাই প্রথমে বুঝিতেই পারিল না। অবশেষে তাহারা যখন বুঝাইয়া দিল যে, সে অমত করিলে উৎসবানন্দে বাধা পাইয়া সারা পল্লীর মনোভঙ্গ হইবে, গদাধর তৎক্ষণাৎ উঠিল এবং শিবকে সাজানো হইতেছে শুনিয়া অধিকারীও অবিলম্বে যাত্রা জুড়িয়া দিল। বাঘাম্বর, রুদ্রাক্ষহার, জটা, বিভূতি ভূষিত হইয়া গদাধর শিবধ্যানে নিমগ্ন হইল। গদাই শিব সাজিবে, পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছে। কিন্তু কোথায় গদাই? এ যে সাক্ষাৎ বাল-গঙ্গাধর! জাহ্নবীর ধবল ধারা যেন আজ দেবাদিদেবের নয়ন-প্রান্ত দিয়া অবিরল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া সে রুদ্ধশ্বাস বিপুল জনতা সহসা গগনভেদী রোলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের উলু ও শঙ্খ-রবে সমগ্র পল্লী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। গদাধর তখন ভাব-সমাধিতে সংজ্ঞাশূন্য। তাহার অচেতন দেহ বহন করিয়া বয়স্যবর্গ গৃহে পৌঁছাইয়া দিল। পুত্র কোলে করিয়া চন্দ্রাদেবী সারারাত অগাড় অঙ্গ অশ্রুধারে সিক্তিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে গদাধরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

এখন হইতে মাঝে মাঝে ধ্যানকালে বা ভাব-তন্ময়তায় বালকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কামারপুকুর ক্ষুদ্রপল্লী হইলেও শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া, এখানে বাস করিতেন। হরিবাসর, শিবের ও মনসাদেবীর গাজন প্রভৃতিতে হেথা সম-সমারোহে সার্ব্বজনীন উৎসব হইত। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানই গদাধরের অধিষ্ঠান ব্যতীত সম্পূর্ণ হইত না। আনন্দময় বালক সকল সমারোহেই সমান উৎসাহে যোগদান করে। ও-অঞ্চলে ভিখারিগণ গ্রাম্য-কবি-রচিত যোগাভ্যার পালা, তারকেশ্বরের প্রকট-মহিমা, মদনমোহন-উপাখ্যান প্রভৃতি গান করিয়া বেড়ায়। অসামান্য শ্রুতিধরত্বগুণে সে-সকল আয়ত্ত ও আবৃত্তি করিয়া গদাধর পল্লীর ঘরে ঘরে ভক্তির বন্যা বহাইয়া দেয়; কখন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করে এবং গান বা পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইলেই সমাধিগত হয়। তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন বৈলক্ষণ্য না হইলেও রামকুমার অনুমান করিলেন, ইহা বায়ুরোগ। পাঠাভ্যাস বা পাঠশালায় গমনের নিমিত্ত বালককে পীড়াপীড়ি বা তাড়না করিতে তিনি সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যমপুত্র রামেশ্বর এখন বাইশ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহের নিমিত্ত রামকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কিছুদিনে তাহা সুসম্পন্নও হইয়া গেল। কিন্তু হায়, তখন কে জানিত, বিবাহ-জনিত আনন্দ কোলাহল থামিতে না থামিতে এই দরিদ্র-সংসারে আবার শোক-হাহাকার উঠিবে!

যৌবন অতিক্রান্ত হইলে রামকুমার এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, পত্নী—বন্ধ্যা, তাঁহার আর সন্তানাদি হইবে না। কিন্তু ছত্রিশবর্ষ বয়সে তাঁহার গর্ভধারণের লক্ষণসকল দেখা দিল। রামকুমার শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, বিধিলিপি পূর্ণ হইবার দিন আসিয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার ভার্য্যার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বধূর স্বভাবতঃ শান্ত-স্বভাব ক্রমে উগ্রভাব ধারণ করিল। ক্ষুদিরাম নিয়ম করিয়াছিলেন, গৃহ-দেবতার পূজা না হইলে, আতুর ও অনুপনীত বালক ভিন্ন, পরিবারে কেহ জলগ্রহণ করিবে না। এতদিন পরে বধূকর্ত্তৃক এ নিয়ম প্রথম ভঙ্গ হইল। এ সম্বন্ধে স্বামী বা শ্বশ্রূর সকল অনুযোগেই তিনি ঔদাস্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্বশ্রূ মনকে সান্ত্বনা দিলেন, কখন কখন গুর্ব্বিণীর স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রামকুমার বুঝিলেন, ইহা মৃত্যুর অগ্রদূত। ক্রমে দশ মাসে দরিদ্রের কুটীর আলো করিয়া সন্তান জন্মিল—যেন রাজপুত্র! পুত্রমুখ দেখিতে দেখিতে বধূ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। সূতিকাঘর শ্মশান হইল। রামকুমারের বয়স তখন চুয়াল্লিশ বৎসর।

যার পর, তার সঙ্গে যায়। বধূর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের স্বচ্ছলতাও তিরোহিত হইল। পরিবারে লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু সে অনুপাতে অর্থাগম হয় না। রামেশ্বর কৃতবিদ্য হইলেও অর্থচিন্তায় উদাসীন। যা করেন রঘুবীর! রামকুমারের বয়স ক্রমশঃই ঢলিয়া পড়িতেছে, তার উপর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, মনোভঙ্গ। সকল সময় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-কার্য্যে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না, শরীর অপটু। অভাবে, বার্দ্ধক্যে, শোকে, রামকুমার চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। ঘরে বৃদ্ধা মাতা, দুগ্ধপোষ্য শিশু। দুগ্ধই উভয়ের জীবন। কিন্তু সে দুগ্ধ আসে কোথা হইতে? ঋণ—ঋণ! ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বন্ধুবর্গের পরামর্শে রামকুমার অবশেষে উপায় অবধারিত করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া টোল খুলিবেন।

সংসার এক প্রকার ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু চন্দ্রাদেবী ভাঙ্গা-বুক লইয়া আবার সেই ভাঙ্গা-তরীর হাল ধরিলেন। রঘুবীরের সেবার সঙ্গে শিশুর পালন, সংসারের রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম এখন তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। মধ্যমা বধূ নিতান্ত বালিকা, ইচ্ছা থাকিলেও সে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? গদাধর দেখিল, মাতার তিলার্দ্ধ বিশ্রামের অবসর নাই। তাঁহার শ্রমভার হরণ করিবার জন্য বালক যথাসাধ্য সহায়তা করিতে লাগিল। পল্লীর ঘরে ঘরে তাহাকে লইয়া যে আনন্দের হাট বসিত, তাহাতে এখন বাধা পড়িল। গদাধরের চিত্তহর নৃত্য, তাহার কিন্নরকণ্ঠে সঙ্গীত-তরঙ্গ, ভক্তি-প্রসঙ্গ, রস-রঙ্গ শুনিয়া প্রতিবাসিনীগণ ব্রজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। প্রিয়দর্শন বালকের প্রিয়সঙ্গ পাইবার নিমিত্ত পল্লী-রমণীসকলে চন্দ্রাদেবীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞ বালক যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

এই সকল প্রতিবাসিনীর মধ্যে কেহ কেহ গদাধরকে

অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রমণী-সাজে সাজাইয়া কোন দিন বৃন্দা, কোন দিন শ্রীরাধার অভিনয় দেখিতেন। রমণীসুলভ স্বর, হাব-ভাব-ভঙ্গীর অভিনয় করিতে গদাধরের অদ্বিতীয় নৈপুণ্য ছিল। নারীবেশে সজ্জিত হইলে মহিলাগণও তাহাকে বালক বলিয়া চিনিতে পারিতেন না। কুলাঙ্গনাগণ অসঙ্কোচে তাহার সহিত মিলিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রাণ বালকের সরল, পবিত্র চরিত্রে অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রতিবাসী গৃহস্থগণ এই নির্দ্দোষ আমোদ, প্রত্যয় ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। কেবল দুর্গাদাস পাইন নামক জনৈক প্রতিবাসী ইহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পরে কেন ঘরের কথা জানিবে? তার উপর—'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু!' গদাই যে বিশ্বাসভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবু অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত অত মাখামাখি ভাল নয়। গদাধর তাঁহার মুখের উপর একদিন মন্তব্য প্রকাশ করিল, 'অন্দরের দরজায় চাবি দিলেই স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা যায় না। সৎশিক্ষা দেবভক্তিই চরিত্র-গঠনের মূল। আমি ইচ্ছা করলে তোমার অন্তঃপুরের সকলকে দেখ্‌তেও পারি, তাদের সব কথা জান্‌তেও পারি।'

দুর্গাদাস বুঝিলেন, ইহা নিছক বালকত্বের দম্ভ। কিন্তু তথাপি গদাধরের স্পর্দ্ধিত আস্ফালন তাঁহাকে বিঁধিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, 'ইস্! কৈ জানো দেখি, কেমন জান্‌তে পার!' 'আচ্ছা, দেখা যাবে' বলিয়া গদাধর সে দিন চলিয়া গেল। দুর্গাদাস মনে মনে একটু হাসিয়া কথাটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। অনন্তর এক দিন অপরাহ্ণে দুর্গাদাস বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বন্ধুবর্গের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। সেই সময় একখানি মোটা মলিন কাপড়পরা একটি কিশোরী প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মেয়েটির হাতে পৈঁছা, কাঁকালে গোট, কাঁখে চুপ্‌ড়ি। অলঙ্কার সব রূপার। দুর্গাদাস বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কে তুমি?'

উত্তর হইল, 'আমি তাঁতির মেয়ে। হাটে সূতা বেচ্‌তে এসেছিনু। যারা এনেছিল, তারা চ'লে গেছে।'

"তা' এখানে কেন এসেছ?"

'আজকের রাতটুক যদি থাকতে দেন!'

দুর্গাদাস লোক মন্দ ছিলেন না। রমণীকে বিপন্ন বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, অন্দরে যাও।'

তাঁতির মেয়ে অন্দরে প্রবেশ করিলে সেখানে তার যত্ন-আদরের পরিসীমা রহিল না। বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং জলখাবারের জন্য মুড়ি-মুড়্‌কীও আসিল। মেয়েটি জলপান খাইতে খাইতে পাইনমহাশয়ের অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার আত্মীয়ারা আসিয়া অপরিচিতার সহিত নিজ নিজ সুখ-দুঃখের আলাপে নিমগ্ন হইলেন এবং কথায় কথায় রাত্রি এক প্রহর কাটিয়া গেল। এ দিকে দীর্ঘকাল গদাধরের অদর্শনে চন্দ্রাদেবী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং রামেশ্বরকে তাহার অন্বেষণে পাঠাইলেন। রামেশ্বর অনুজকে যেথা-সেথা খুঁজিয়া অবশেষে দুর্গাদাসবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'গদাই!' হঠাৎ অন্তঃপুর হইতে সাড়া আসিল, 'দাদা, যাচ্ছি গো!' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁতির মেয়ে দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। স্তম্ভিত, বিস্মিত দুর্গাদাস রোষ-কষায়িত নেত্রে গদাধরকে দেখিতে দেখিতে তাহার অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা ও নারীসুলভ ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অবশেষে হাসিয়া ফেলিলেন। গদাধর এখন কিশোরবয়স্ক।

অনুজের উচ্চ-প্রকৃতি, দেবভক্তি, ধর্ম্মানুরক্তি, কুলাঙ্গনাগণের সহিত অবাধ মিলন-শক্তি এবং পল্লীর পুরুষমাত্রেরই তাহার উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা—গদাধরের পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে রামেশ্বরকে সম্পূর্ণ সংশয়শূন্য করিয়াছিল। তিনি দেখেন, ইহার বাল্যখেলাও সাধারণ বালকের মত নহে। বালক ধ্যান-কল্পিত মূর্ত্তিসকল স্বহস্তে গঠন করিয়া বয়স্যবর্গের সহিত পূজা করে। পল্লীর প্রবীণ প্রতিমা-গঠনকারিগণ তাহার অশিক্ষিত পটুত্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে! তাহাদের গঠিত মূর্ত্তিসকলে তেমন ভাব-বিকাশ হয় না। চিত্রবিদ্যাতেও বালকের অসামান্য নৈপুণ্য। গদাধর একসময় সর্ব্বকনিষ্ঠা সহোদরা সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুরগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখে, ভগিনী প্রগাঢ় ভক্তিভরে স্বামীর পদসেবা করিতেছে। কিছুদিন পরে বালক একখানি অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিবারস্থ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

জপ, ধ্যান, পূজা, হরি-সঙ্কীর্ত্তন এবং পুরাণ-প্রসঙ্গের অনুশীলনে গদাধরের ধর্ম্মানুরাগ দিন দিন যতই প্রবল এবং প্রগাঢ় হইতে লাগিল, অর্থকরী বিদ্যার উপর ততই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাঠশালার সম্পর্ক সে একেবারে পরিত্যাগ করিল।

অবাধ অবসর লাভ করায় এই সময় তাহার বয়স্তগণ গদাধরের নেতৃত্বে একটি যাত্রার দল গঠন করিবার প্রস্তাব করে এবং গদাধরও তাহাতে সহজে সম্মত হয়। তাহারই পরামর্শে গ্রাম হইতে দূরে অবস্থিত মাণিকরাজার আমবাগান মহলা দিবার স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল।

রামকুমার বৎসরান্তে একবার করিয়া বাটী আসিতেন। গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে উপেক্ষা দেখিয়া তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বর সংসারের উন্নতি-সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন। ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা আসিয়া রামকুমারের উৎসাহ, উদ্যম হরণ করিয়া লইতেছে। সংসারের একমাত্র ভরসা—গদাধর। রামকুমার,রামেশ্বর ও চন্দ্রাদেবীর সহিত পরামর্শ করিয়া,সিদ্ধান্ত করিলেন,কনিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। প্রায় তিন বৎসর হইল, কলিকাতায় ঝামাপুকুর-পল্লীতে চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অধ্যাপনা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের আর গৃহকর্ম্মের অবসর থাকে না। স্থির হইল,গৃহকার্য্যপটু গদাধর তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবং রামকুমার স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা দিবেন। যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। গৃহ অন্ধকার, পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মন চুরি করিয়া, বয়স্তবর্গকে কাঁদাইয়া সপ্তদশবর্ষ বয়সে গদাধর নির্দ্ধারিত দিনে যাত্রা করিল। চন্দ্রাদেবী তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে বিদায় দিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

ভক্ত ভরাত।

এই ভারতের প্রাণের অর্ঘ্য ধৃত অঞ্জলিপুটে,
অই বিধাতার পাদপীঠতলে চিরদিন আছে উঠে।
উদঞ্জলিরে হিমগিরি কয় বিশ্বের লোক যত,
কুন্দকুটজগন্ধে তাহার নিখিল শ্রদ্ধানত।
ভক্তিতে তার চোখে ধারা বয় দেবতার শুভ নামে,
ব্রহ্মপুত্র রূপে দর্দর্ বয়ে' যায় ধরাধামে।
রেখেছেন প্রভু পাণি প্রসন্ন ভারতের শিরে স্নেহে,
পাঁচটি আঙুল জাগে মঞ্জুল পঞ্চনদের দেহে।
গঙ্গায় তাঁর করুণার ধারা শুভাশিস্ মঙ্গল,
ললাটে কণ্ঠে শতমুখী হ'য়ে ঝরিতেছে অবিরল;
বহিতেছে জ্ঞানপুণ্যে বিরচি' কূলে কূলে তপোবন,
বিতরি তীর্থে মঠ-মন্দিরে পারমার্থিক ধন;
ধরণীর সুখে তরণীর বুকে, বারিধি বক্ষ'তলে,
গ্রামে জনপদে পুরে প্রান্তরে পণ্যে শস্যে ফলে।
ইহজীবনের স্পৃহণীয় ধন জমিতেছে অবিরাম,
স্নানে পানে রত জীবলোক যত, গাহিছে হর্ষসাম।
এ যে অনারত আশিসের ধারা ভক্তের সংসারে,
এ হেন ভারতে বিশ্বে কেহ কি নিঃস্ব করিতে পারে?

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গে বন্যা।

এবার আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় অতিবর্ষণ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বাঙ্গালায় বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি উচ্চ স্থান বাদ দিলে আর সর্ব্বত্রই শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু জলনিকাশ না হওয়ায় বন্যায় রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জিলা তিনটিতে লোকের ধন-প্রাণনাশের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলিতে হয়—এ বৎসর বাঙ্গালীর পক্ষে দারুণ দুর্ব্বৎসর। অনেক গ্রামে গৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত ধৌত হইয়া গিয়াছে। কত লোক যে প্রাণ হারাইয়াছে এবং কত গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সান্তাহারের নিকটে আদমদীঘী রেল ষ্টেশনের নিকটে জল-প্লাবনের ফলে "হানা" হইয়া দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, আমরা তাহার ৩খানি চিত্র দিলাম। তাহা হইতে পাঠক প্রকৃত অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন। স্থানে স্থানে জলের বেগে রেলের পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বত্র গ্রামগুলি জলাশয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। সে সব স্থানে যে সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ক্ষেত্রে শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আদমদীঘীর হানা।

যখন এইরূপ অনিবার্য্য বিপদ উপস্থিত হয়, তখন দেশের লোক প্রথমেই সরকারের কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে। কারণ, লোকরক্ষাই সকল সভ্য সরকারের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। যে সকল সাম্রাজ্যমদগর্ব্বী ইংরাজ মনে করেন, বিজিত জাতিরা ইংরাজের সমকক্ষ নহে এবং তাঁহারাই সে সব জাতির অভিভাবক, তাঁহারাও এই কর্ত্তব্য স্বীকার করেন এবং এই কর্ত্তব্যকে The Whiteman's burden বলিয়া সেই ভার বহনের জন্য গর্ব্ব করেন। আর যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহারাও বলেন, প্রজাকে বিপদে রক্ষা করাই সভ্য সরকারের কর্ত্তব্য। রক্ষা করা বলিতে কেবল সম্ভব অসম্ভব বিদেশীয় আক্রমণের আশঙ্কায় বিপুল ব্যয়ে সৈন্যসজ্জা করাই বুঝায় না। এইরূপ ব্যাপারে ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের কষ্টস্বীকারের ও চেষ্টার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় ভারত সরকার এ বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিয়াছিলেন;—"We say that human life shall be saved at any cost and at any effort. * * 'Distress they must often suffer; we cannot save them from that. We wish we could do more, but we must be content with saving life and preventing extreme suffering.

অর্থাৎ যত ব্যয়ে ও চেষ্টায় হউক না কেন, মানুষের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। লোক কষ্ট পায়—আমরা তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। আমরা যদি আরও কিছু করিতে পারিতাম, ভাল হইত; কিন্তু অগত্যা মানুষের জীবন রক্ষা করিয়া ও অত্যন্ত কষ্ট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এবার সরকারের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হইয়াছে এবং সরকারী গভর্ণরের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা ক্ষতির পরিমাণ যেরূপ পরিমাপ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাতেই গভর্ণর এরূপ কায করিয়াছেন। নহিলে—এমন কথা মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, বর্ত্তমানে আমাদের ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় মানুষের দুঃখদুর্দ্দশায় বিচলিত হওয়া লজ্জাজনক দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

বন্যার পক্ষাধিক কাল পরে সরকার এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ :—

রেলরাস্তার অবস্থা।

সাহায্য যে ক্ষতির অনুরূপ হয় নাই, এমন মনে করিবার কারণও আছে। এই ব্যাপার ঘটিবার পরই যে বাঙ্গালার লাট দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া লোকের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই—এমন কি, কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের জন্ত অর্থ-সংগ্রহার্থ সভানুষ্ঠানও করেন নাই, সেজন্ত কেহ কেহ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া এরূপ অবস্থায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা—লর্ড নর্থব্রুক, সার রিচার্ড টেম্পল, লর্ড লিটন ও লর্ড কার্জ্জন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন।

যে অংশে বন্যায় অধিক ক্ষতি হইয়াছে, সে অংশের পরিমাণ,—

(১) বগুড়া জিলায় প্রায় ৪ শত বর্গমাইল।

(২) রাজসাহী জিলায় প্রায় ১২ শত বর্গমাইল—কোথাও ক্ষতি অধিক, কোথাও অল্প।

(৩) পাবনায় সামান্য স্থান।

অবশ্য, গৃহের ও শস্তের ক্ষতি অনেক হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, রাজসাহী জিলায় ধান্যের ফসলের ক্ষতি শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ; নওগাঁয়ে গাঁজার ফসল শতকরা

৯০ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বগুড়ার ধান্যের ক্ষতি শতকরা ২০ বা ২৫ ভাগের অধিক নহে। রাজসাহীতে শতকরা ৫০ বা ৬০ খানি ঘর নষ্ট হইয়াছে; বগুড়ায় শতকরা ১০ খানির অধিক নষ্ট হয় নাই। অনেক গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। রাজসাহীতে ৫ শত পশুনাশের কথা শুনা যাইতেছে। লোকের প্রাণনাশের যে সংবাদ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত। বগুড়ার কালেক্টার জানাইয়াছেন, তাঁহার এলাকায় ১৫ জন লোকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণীত হয় নাই। রাজসাহীর কালেক্টার বলেন, তাঁহার এলাকায় ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আর কোথাও কেহ মরে নাই।

ইহার পর কালেক্টারদিগের বিবরণে নির্ভর করিয়া বাঙ্গালা সরকার সাহায্যদানের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

(১) অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে সাধারণ হিসাবে দান বাবদে সরকার মোট ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা—৩ জিলার কালেক্টার বলিয়াছেন, ইহাতেই হইবে।

(২) ইহার পর বাড়ী গড়া ও কাপড় ইত্যাদির জন্য মোট ৫৪ হাজার টাকা প্রয়োজন। ঐ টাকা সরকার রাজস্ব হইতে দিতে পারেন না। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়ের ও মেদিনীপুরের বন্যার সময় যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল,—তাহার কতক টাকা সরকারের হাতে ছিল। তাহা হইতে সরকার এই টাকা দিয়াছেন।

প্লাবিত প্রদেশ।

(৩) ঔষধাদি ও পশুখাদ্য যোগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(৪) বন্যার জল সরিয়া গেলে জিলা বোর্ড কায করাইয়া শ্রমক্ষম ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) শেষে বীজ ও কৃষির জন্য আবশ্যক পশু ক্রয় করিতে কৃষকদিগকে ঋণ দিতে হইবে। সে জন্য রাজসাহীতে ও বগুড়ায় ৩ লক্ষ টাকা হিসাবে ৬ লক্ষ ও পাবনায় ১০ হাজার টাকা লাগিবে।

অর্থাৎ সরকারী হিসাবে প্রথম দফায় ২০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৫৪ হাজার টাকা ও পঞ্চম দফায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা—একুনে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা হইলে হইবে।

কিন্তু দেশের লোক সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে পুরোভাগে লইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্যদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছে, সেই ব্যবস্থার নেতৃগণের হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ক্ষতির পরিমাণ এইরূপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যার অনুপাতে সরকারী সাহায্য অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের কর্ম্মীরা কর্দ্দমদুর্গম ঘটনাস্থলসমূহে যাইয়া যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল বিবরণ হইতেই এই হিসাব করা হইয়াছে।

সরকারের মারফতে এককালীন দান প্রথম দফায় ২০

হাজার টাকা ও দ্বিতীয় দফায় ৫৪ হাজার টাকা; একুনে ৭৪ হাজার টাকা। দেশের লোকের এই সাহায্য সমিতি ইহার মধ্যেই তদপেক্ষা অনেক অধিক টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

প্লাবনপীড়িত স্থানের মানচিত্র।

কিন্তু সরকার ক্ষতির যে পরিমাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রের সংবাদদাতার পরিমাপেরও বিশেষ অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ‘ষ্টেটসম্যান’ লিখিয়াছেন :—

“বন্যার বিস্তার এত বহুদূরব্যাপী আর সম্পত্তি-নাশের পরিমাণ এত অধিক যে, অতিবৃষ্টির পক্ষকাল পরেও ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ পরিমাপ করা যাইতেছে না!—কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে, কত গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে, কি পরিমাণ শস্য ধ্বংস হইয়াছে, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। যাহাই হউক, লক্ষাধিক লোক যে এই বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

যে দিন ‘ষ্টেটসম্যানের’ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কথা

লিখিত হয়, সেই দিনই প্রকাশিত—স্থানীয় সংবাদদাতার বিবরণে দেখা যায়—

"শুনিতে পাওয়া যায়, ৩ বা ৪ শত লোক মারা গিয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৪০ জন স্বাভাবিক কারণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

অর্থাৎ প্রায় ২ শত লোক বন্যায় মারা গিয়াছে।

সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইলে 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সংবাদদাতা সে সম্বন্ধে লিখেন :—

"সম্পত্তির ক্ষতি সম্বন্ধে সরকারের হিসাব সর্ব্বতোভাবে কম করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়াই লোকের বিশ্বাস।"

এমন কি, এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার অব পাবলিক হেলথ স্থির করিয়াছেন, বগুড়া জিলাতেই ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকার উপর। তালসন গ্রামে ২ শত ঘর ছিল—তাহার মধ্যে ৭ খানি মাত্র বিদ্যমান। আর সরকারের হিসাবেই বগুড়ায় মাত্র ৪ শত বর্গমাইল স্থান প্লাবন-প্লাবিত—রাজসাহীতে ১২ শত।

'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

"নওগাঁ মহকুমার ৮ শত বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৫ হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে এবং ঐ মহকুমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা কোন মতেই ৬০ হাজারের কম হইবে না।"

এরূপ প্রবল বন্যায় জলনিকাশে বিলম্ব ঘটে কেন? গভর্ণর বাঙ্গালার লোককে আশা দিয়াছেন, সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বন্যার সম্ভাবনা কমাইবার উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মত গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে মনে হয়, কারণ সম্বন্ধে সরকারের এখনও সন্দেহ আছে।

রাজসাহী বিভাগের ভূমি পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে ঢালু, কাযেই জল পূর্ব্বদিকে যাইবে। কিন্তু রেলের রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ায় জলনিকাশে বিঘ্ন ঘটে এবং রেলের রাস্তার ও অন্যান্য রাস্তার বাঁধে বাধা পাইয়া জল সরিতে পারে না। এ সব রাস্তায় জলনিকাশ-ব্যবস্থা প্রয়োজনের অনুরূপ নহে। ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি বলিয়াছেন—কেবল অতিবর্ষণেই এই বিপদ ঘটে নাই। বৃষ্টির জল যদি স্বাভাবিক উপায়ে বহিয়া যাইতে পায়, তবে বিপদ ঘটে না; পরন্তু সামান্য কয় ইঞ্চ জল যদি জমীর উপর দিয়া বহাইবার ব্যবস্থা হয়, তবে শস্যের ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হইয়া উন্নতি হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ডাক্তার বেণ্টলীর মত অন্য কয় জন বিশেষজ্ঞও বলেন, বন্যা বন্ধ হওয়াতেই বাঙ্গালার ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইতেছে, ধান্যে পুষ্টিকরতার অভাব হইতেছে এবং বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে। দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশ-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া রাস্তা রচনা করাতেই যে দেশে ম্যালেরিয়া হইয়াছে, এ মত বহুদিন পূর্ব্বে রাজা দিগম্বর মিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বেণ্টলী বলেন, সব রাস্তায় অল্প দূরে দূরে জল-নিকাশপথ রাখা কর্ত্তব্য—তাহা হইলে জল জমিয়া আর এমন বিপদ ঘটিতে পারিবে না—জল বহিয়া গেলে শস্যের ও স্বাস্থ্যের উপকার হইবে, বর্ত্তমানে জলনিকাশ-ব্যবস্থার অল্পতা সম্বন্ধে ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত বলেন, সান্তাহার হইতে নশরৎপুর ৩ মাইল পথ—ইহাতে জল-নিকাশপথ কেবল ২০ গজ!. আবার সান্তাহার হইতে আদমদীঘী ৩ মাইলের মধ্যে ৩টি মাত্র সেতুপথে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে!

একদিনে সংগৃহীত চাউলের বস্তার উপর কর্ম্মীরা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে কোন মহিলাপ্রদত্ত কর্ণাভরণ।

কিন্তু এ বিপদে বাঙ্গালী তাহার সম্পদের সন্ধান পাইয়াছে। সে সম্পদ—বাঙ্গালীর হৃদয়—বাঙ্গালীর কর্ম্মোদ্যম—বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—বাঙ্গালীর স্বাবলম্বন। বাঙ্গালীর এই বিপদে বাঙ্গালী আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়াছে; তাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি দেশের লোককে সাহায্যদান করিতে আহ্বান করিলেই দেশের লোক সাগ্রহে আপনাদের শক্তি, উদ্যম ও অর্থ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের সে আহ্বান বাঙ্গালী কর্ত্তব্যের আহ্বান বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছে। ১০ বৎসরের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ সোৎসাহে এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। পুরাঙ্গনারা কেহ কেহ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট অলঙ্কার পাঠাইয়া দিয়াছেন—চাউল ও কাপড় সংগৃহীত হইতেছে। এমন কি, যাহারা সমাজের কৃপার পাত্র, দেহপণ্যবিনিময়ে অর্থার্জ্জন করে, সেই বারাঙ্গনারাও দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার পথে পথে ভিক্ষা করিয়া শত শত টাকা সংগ্রহ করিয়া সাহায্যভাণ্ডারে দিতেছে। দলে দলে কর্ম্মী দুর্গম ঘটনাস্থলে যাইয়া অর্থ, বস্ত্র ও আহার্য্য বিতরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহিলারাও আছেন। কেহই কর্ত্তব্যপালনে আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বাঙ্গালীর কর্ম্মোদ্যমে এবার বিপন্ন বাঙ্গালী বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেছে। বাঙ্গালী স্বাবলম্বনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—ত্যাগপুণ্যে ধন্য হইয়া—তাহার স্বরাজলাভের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। এবার বাঙ্গালী বুঝিয়াছে :—

"আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে;
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে;
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্যপ্রেমের বাতাসে।"

পথ কর্দ্দমাক্ত—সেই কর্দ্দমে গলিত পশুর শব মিশ্রিত হইয়াছে—দুর্গন্ধে তিষ্ঠান কষ্টকর—ছায়া নাই. সেই সব স্থানে

কলিকাতা সাহায্যদান-কেন্দ্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ।

কলিকাতায় রাজপথে নারীদলের ভিক্ষা।

যাইয়া বাঙ্গালার যুবকরা বাঙ্গালীকে আবশ্যক সাহায্য দিয়া আসিতেছেন। আর বাঙ্গালার নর-নারী, যে যে স্থানে আছেন, তাঁহাদের জন্য উপকরণ যোগাইতেছেন—তাঁহাদের মনে উদ্যমসঞ্চার করিতেছেন বাহুতে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন।

এবার এই বন্যায় বিপন্নের সাহায্যদান ব্যাপারে আবার বাঙ্গালীর পরীক্ষা হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী এ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিবে—সে প্রতিপন্ন করিতে পারিবে, সে বৃথা স্বাবলম্বন-সাধনা করে নাই।

এক হিসাবে ইহা বিপুল বলশালী বুরোক্রেশীর সহিত বাঙ্গালীর শক্তি-পরীক্ষা। বুরোক্রেশীর জনবল কমিশনার কালেক্টার হইতে কনষ্টেবল, চৌকীদার;—তাহাদের পশ্চাতে সরকারের রাজশক্তি। বাঙ্গালীর বল—মা'র কয় কোটি সন্তানের আন্তরিক আগ্রহ—সেবাধর্ম্মে নিষ্ঠা। বর্দ্ধমানের বন্যায় বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকদিগের এই সেবাধর্ম্ম দেখিয়া এক জন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন, দেখিয়া মনে হয়—নূতন জাতির উদ্ভব হইতেছে। এবার তাহাই ক্রমে পরিণতি লাভ করিতেছে দেখিয়া মনে আশা হয়, এ জাতির ভবিষ্যৎ কখন দুর্দ্দশার অন্ধকারাবৃত থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালার এই বিপদে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও সাহায্য আসিতেছে। এক প্রদেশের বিপদে এই যে অন্যান্য প্রদেশের ব্যাকুলতা — ইহা জাতীয় জীবনের সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। লোকমান্য তিলক মহাশয়ের বিরুদ্ধে সরকার প্রথম মোকর্দ্দমা দায়ের করিলে সে দিন বঙ্গদেশ তাঁহার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই এই নূতন জাতীয় জীবনের প্রথম সূচনা বুঝা গিয়াছিল। তাহার পর আজ ভারতে নবভারত রচিত হইয়াছে—এখন আমাদের জাতীয় ভাব ত্যাগের অবিচলিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ত্যাগের বল নানা প্রকারে পরীক্ষিতও হইয়া গিয়াছে।

একদিনে সংগৃহীত বস্ত্র।

এখনও লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ১ কোটি টাকা না হইলে লোককে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালীকে এ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—ভারতবাসীকে আজ বাঙ্গালার বিপদে সাহায্য লইয়া আসিতে হইবে। প্লাবনপীড়নে স্থানের ও লোকের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, আমরা তাহার কয়খানি চিত্র প্রদান করিলাম।

এক দিন যাঁহারা পরের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা-বোধ করিতেন, তাঁহাদেরও অনেকে সাহায্যের আশায় রিলিফকেন্দ্রে সমবেত হইয়াছেন।

বন্যা আসিয়া পড়ায় লোকে নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। জল সরিয়া যাওয়ায় এখন মূল্যবান জিনিষপত্র খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে।
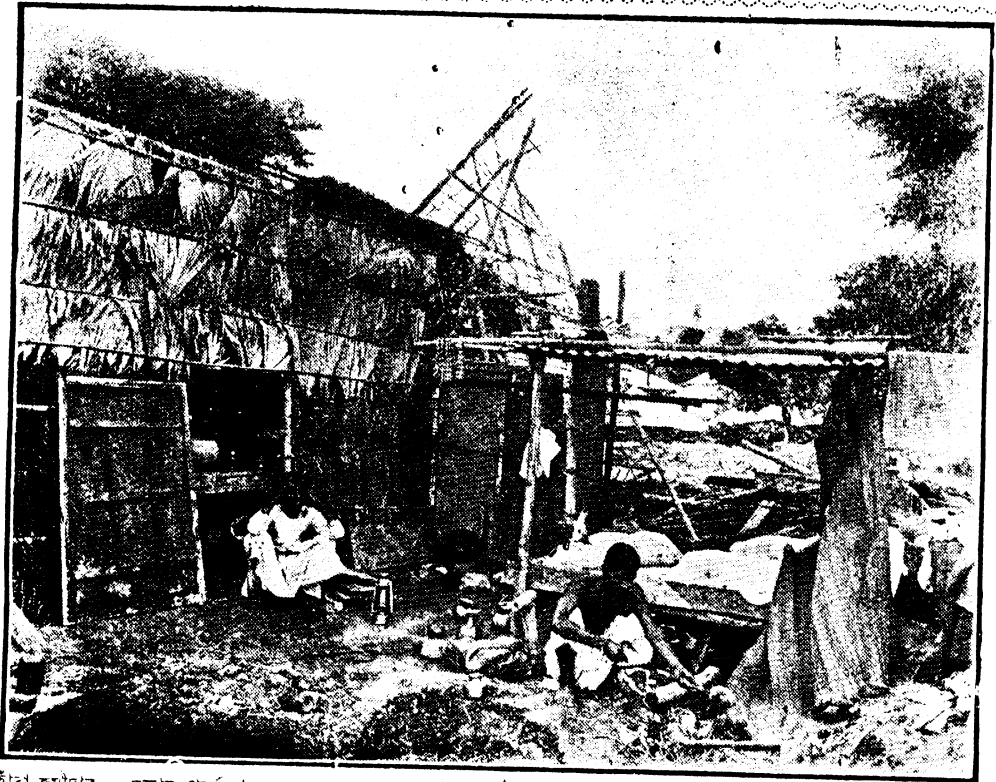
ইহাঁরা জমীদার; বন্যার পূর্ব্বে শত শত লোকের আশ্রয়দাতা ছিলেন, এখন নিজেরাই নিরাশ্রয়; পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন।
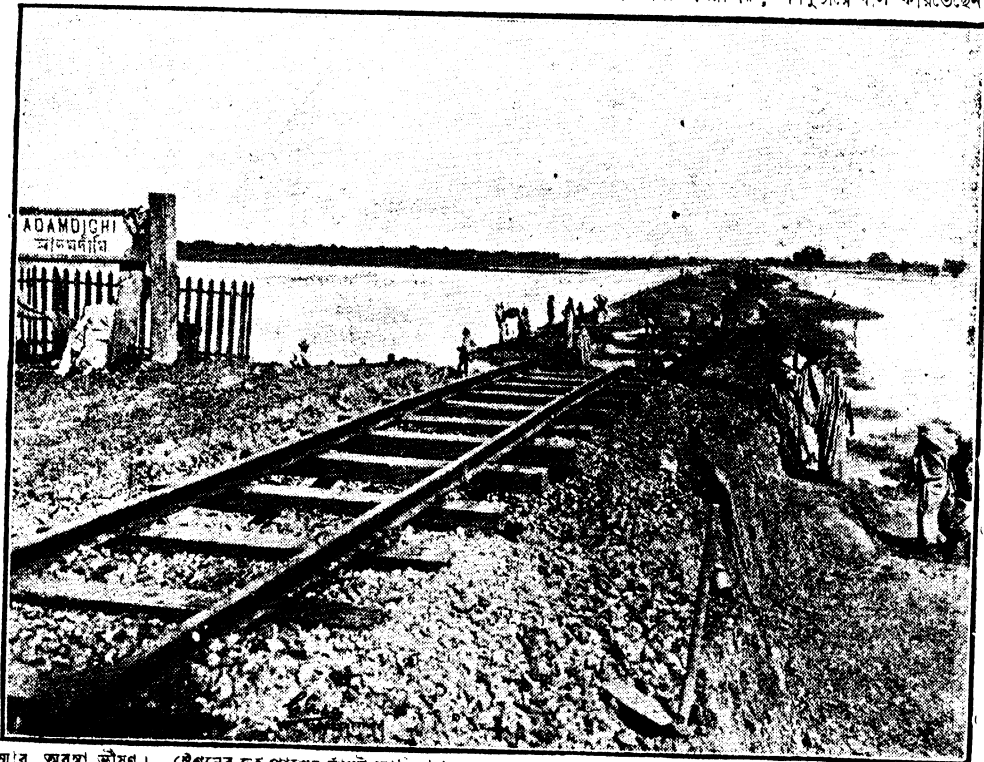
এইখানেই বন্যার অবস্থা ভীষণ। ষ্টেশনের দুই পাশের বাঁধই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রথম যখন বাঁধ ভাঙ্গে, তখনও যদি রেল কোম্পানী জল বাহির হইতে দিতেন, তাহা হইলে এ অঞ্চলের অবস্থা বোধ হয় এতটা খারাপ হইত না। কোম্পানী তাহা না করিয়া তাড়াতাড়ি ভাঙ্গনের জায়গা বাঁধিয়া ফেলেন পাঠক, উপরে রেল কোম্পানীর ব্যর্থ চেষ্টা দেখিতে পাইতেছেন। তখন রেলের এক দিকে জল অপর দিক অপেক্ষা তিন চার হাত উঁচু হইয়া ছিল।

গুরুবাগে সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহের সূচনা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে ভারতবর্ষে অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। পুঞ্জীভূত কারণের উপর ভারত সরকার রৌলট আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। খিলাফৎ-সমস্যা লইয়া য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ দিকে খাদ্যদ্রব্যের ভীষণ দুর্ম্মূল্যতার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা কোন প্রকারেই আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক লোক মনে করিয়াছিল যে, উহার দ্বারা দেশের কতকটা কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল যে, উহা অন্তঃসারশূন্য। কাযেই সমগ্র দেশবাসীর প্রতিবাদ ও নিবারণ উপেক্ষা করিয়া ভারত-সরকার যখন রৌলট আইন বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে ভারতবাসী সরকারের কার্য্যে বাধা প্রদানের এক অভিনব উপায় স্থির করিলেন। প্রত্যক্ষভাবে সরকারের কার্য্যে বাধা-প্রদান করিতে হইলে যে সামরিক পশুবলের প্রয়োজন, তাহা আমাদের পর্য্যাপ্ত না থাকায় এবং তাহার প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত না হওয়ায়, পরোক্ষভাবে সরকারের কার্য্যে বাধা প্রদান করাই স্থিরীকৃত হইল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গন্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা সংগ্রামে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ দেশেও ঐ অস্ত্র-দ্বারাই তিনি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতে পারিবেন। তাই ১লা মার্চ্চ তারিখে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে আইনগুলি অমান্য করা আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিব, সেগুলি মান্য করিব না—আমাদের এই সংগ্রামে আমরা একমাত্র সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া থাকিব—কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে বিরত থাকিব।" এই ভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র কমিটী গঠিত হইয়াছিল এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও উহাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ জানিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুলসীপেটায় সত্যাগ্রহ।

যাহা হউক, এই ভাবে ভারতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। তাহার ফল কি হইয়াছে, সে বিষয় আলোচনা করিবার সময় এখনও আইসে নাই। ভারতের নানা স্থানে জনগণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি স্থানে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিশেষরূপ কার্য্যকারী হইয়াছে, দেখা যায়। প্রথম মহারাষ্ট্র প্রদেশে টাটা কোম্পানী বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহের কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য দরিদ্র মবলাদিগকে উৎখাত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সকলে একযোগে সত্যাগ্রহ আশ্রয় করিয়া কি ভাবে টাটা-কোম্পানীর কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মবলারা দুইবার ঐ উপায়ে টাটা কোম্পানীকে পরাজিত করিয়াছে। এই সে দিন তৃতীয় দল শ্রীযুত বাপাতের নেতৃত্বে টাটা কোম্পানীর গৃহের জন্য খনিত ভিত্তিস্থান পাতর ফেলিয়া ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিন সহস্র মহারাষ্ট্রবাসী ঐ ভাবে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

গুরুবাগ কোথায়?

পঞ্জাবে দুইটি স্থানে দুইটি গুরুবাগ আছে। একটি অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির-সংলগ্ন। কিন্তু যে গুরুবাগে বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ সংগ্রাম হইতেছে, তাহা অমৃতসর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী; আজনালা তহশীলের অন্তর্গত। ঐ স্থানে ২টি গুরুদ্বার আছে। ১টি পঞ্চম শিখ-গুরু অর্জ্জুনদেবের নামে এবং অপরটি নবম শিখ-গুরু তেগ্ বাহাদুরের নামে উৎসৃষ্ট। সেখানকার বর্ত্তমান মোহান্তের নাম সুন্দরদাস। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল যে, বাগের জমী ও বসতবাটীটি মোহান্তের অধীনে থাকিবে এবং প্রবন্ধক কমিটী গুরুদ্বারগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন।

হাঙ্গামার কারণ।

এই ভাবে বর্ত্তমান হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। গত ১০ই আগষ্ট তারিখে গুরু-কা-লঙ্গরের কাঠ সংগ্রহ করিবার জন্ম প্রবন্ধক কমিটীর আদেশে ৫ জন আকালী সেবক গুরুবাগে কাঠ কাটিতে গমন করেন। এডিসনাল পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট মিষ্টার বেটীর আদেশে এক দল পুলিস ঐ ৫ জন আকালীকে গ্রেপ্তার করে। অমৃতসরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জেঙ্কিন্সের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে (গুরুদ্বারের জমী হইতে কাঠ চুরীর অভিযোগ) তাঁহাদের বিচার হয় এবং প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়।

তাহার পর ২২শে আগষ্ট অমাবস্যা মেলা উপলক্ষে আবার কয়েকজন আকালী মোহান্তের জমীতে কাঠ কাটিতে যায়। মোহান্ত পুলিসকে খবর দিলে মোহান্ত সুন্দরদাসের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্ম এক দল পুলিস-প্রহরী—গুরুবাগে পাহারা দিতে আইসে। ২৩শে ও ২৪শে তারিখেও আকালীরা ঐ ভাবে দলে দলে যাইয়া কাঠ কাটিতে থাকে। পুলিস ঐ ৩ দিনে ১ শত ১০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চুরী, হাঙ্গামা, অনধিকারপ্রবেশ প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেয়। এক দিকে যেমন গুরুবাগে শিখের দলকে কাঠ কাটাইতে পাঠান হইতে লাগিল, অপর দিকে অমনই সঙ্গে সঙ্গে অমৃতসরে আকাল তকতে সভা করিয়া সরকারের কার্য্যে বাধা দিবার জন্ম জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ সেই জন্ম প্রবন্ধক কমিটীর সদস্যগণকে শাস্তি প্রদান করা স্থির করিলেন। ২৬শে আগষ্ট শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার বাহাদুর মেহতাব সিং ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্যকে বে-আইনী সভা করার অভিযোগে পুলিস গ্রেপ্তার করিল। পুলিস গুরুবাগে পাহারা দিতে লাগিল—৩।৪ হাজার আকালীও তথায় যাইবার জন্ম অগ্রসর হইল। প্রথম প্রথম শিখের দল বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগকে শুধু ফিরাইয়া দিয়া পুলিস সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। অশ্বারোহী পুলিস ও সশস্ত্র পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আকালীগণের উপর যথেচ্ছভাবে প্রহার আরম্ভ হইল।

২৫শে আগষ্ট শিখরা গুরুবাগে একটি সভা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পুলিস সভা করিবার আদেশ দিল না; পরন্তু সভা করিবার জন্ম সমাগত জনগণকে প্রহার করিয়া গুরুদ্বারের বাগান হইতে তাড়াইয়া দিল।

ইহার পূর্ব্বেকার একটি কথাও এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের চাবি কাহার অধিকারে থাকিবে, সে বিষয় লইয়া পূর্ব্বে সরকারের সহিত শিখ-সম্প্রদায়ের অনেকদিন ধরিয়া বিবাদ চলে—অবশেষে সে বার সরকারকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় ও মন্দিরের চাবি শিখগণের দখলে আইসে। সেই সময় হইতেই শিখগণকে দমন করিবার জন্ম অপর পক্ষ সুবিধা ও উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন।

সামান্য কাঠ "চুরীর" ব্যাপারের সংবাদ পাইবামাত্র সরকারের কর্ম্মচারিবৃন্দ "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এক দিকে গুরুদ্বার সম্বন্ধীয় অধিকার বজায় রাখিবার জন্ম শিখ-সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর—অপর দিকে বে-আইনী কার্য্যে বাধা দিবার জন্ম সরকারী লোকসমূহ সর্ব্বদা যত্নবান্। এরূপ স্থলে ঘটনা সামান্যই হউক আর ভীষণই হউক, তাহাতে বেশী কিছু আইসে যায় না। সকলেই নিজ নিজ জিদ রক্ষা করিবার জন্ম উদ্‌গ্রীব। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কেহ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলে ভারতের লোক তাহা সহ্য করিয়া থাকেন না—তাই পুলিস ৫ জন আকালীকে গ্রেপ্তার করার পর পঞ্জাববাসী আকালী সম্প্রদায়ের সকলে সমবেত হইয়া পুলিসের ঐ কার্য্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বাধা দিবার জন্ম অগ্রসর হইয়াছেন। ব্যাপার কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহা বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। যদি আকালী ৫ জন সত্য সত্যই চুরী বা ডাকাইতী করিত, তাহা হইলে কি তাহাদের কার্য্য সমর্থন করিবার জন্ম এত লোক স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রহার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে আসিত? যাহা হউক, পুলিস "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করিবার জন্ম যাহা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছে—তাহাই করিতেছে। আকালীগণের সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-নীতিও পূর্ণভাবেই রক্ষিত হইতেছে। জগদ্বাসী এখন বিচার করুন—কে জয়লাভ করিল। প্রথম দিনের পর যে সকল আকালী শিখ নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্ম কাঠ কাটিতে গেল, পুলিস তাহাদিগকে নৃশংসভাবে প্রহার আরম্ভ করিল। অমৃতসর হইতে গুরুবাগ

যাইবার পথে রাজাসাঁসী ও রাণী-কা-পালে পুলিস বসান হইল—গুরুবাগেও বহুসংখ্যক পুলিস-প্রহরী ছিল। ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট তারিখে আহত আকালীগণকে চিকিৎসা করিবার জন্য যে সকল ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুলিস রাজাসাঁসী হইতে ফিরাইয়া দিল। ২৯শে তারিখে ২ জন ডাক্তার ও ৪ জন বয়স্কাউটকে যাইতে দেওয়া হইল। ইতোমধ্যে ঐ কয়দিনেই প্রায় ৬০ জন লোক সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হইলেন। অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিং (এম, এস, সি) ঐ পথ দিয়া পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তিনিও প্রহৃত হইলেন। মুসাম্মত আগাকৌর নামক এক জন আকালী মহিলা ও এক জন মুসলমান মহিলাও লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হইলেন। ৩০শে আগষ্ট তারিখে পুলিস শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর কার্য্যালয়ের বহুসংখ্যক ঘর তালাবন্ধ করিয়া দিয়া গেল; মফঃস্বল হইতে যে সকল আকালী কার্য্যালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ দিন হইতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। রাত্রিকালে ৬০ জন আকালী এক স্থানে পথের ধারে শুইয়া যখন নিদ্রা যাইতেছিল, তখন বহুসংখ্যক পুলিস (দুই জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী সমেত) তাহাদিগকে নিদ্রিতাবস্থায় এমন প্রহার করিল যে, ৩৫ জন অজ্ঞান হইয়া গেল; আহত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল না, পরন্তু গুরুদ্বার কমিটী যে ডাক্তার পাঠাইলেন, তাহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ঘটনাস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। অধ্যাপক রুচিরাম সাহানি ও রাণা ফিরোজ দীন গুরুবাগ অভিমুখে যাইবার সময় পথে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইলেন।

ঘটনাস্থলে পণ্ডিত মালব্য।

২রা সেপ্টেম্বর শনিবার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি যতবার অমৃতসরে গিয়াছেন, ততবারই পরলোকগত লালা গগরমলের ধর্ম্মশালায় বাস করিয়াছেন। এবার কিন্তু সেই ধর্ম্মশালায় যাইবামাত্র তাঁহাকে সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। ঐ ধর্ম্মশালার বর্ত্তমান অধিকারী লালা বিষণদাস মৃত গগরমলের পৌত্র। তিনি সম্প্রতি পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিষণদাসের ঐ গৌরবের পদপ্রাপ্তিই মালব্যজীকে তাড়াইবার কারণ কি না, কে বলিতে পারে?

তাহার পর পণ্ডিতজী জেলে সর্দ্দার বাহাদুর সর্দ্দার মেহতাব সিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। সর্দ্দার বাহাদুর পূর্ব্বে পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি কারারুদ্ধ হইয়া বিচারাধীন আসামীরূপে বাস করিতেছিলেন। পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎ করা হইল না, তিনি জেলের ফটক হইতেই বিতাড়িত হইলেন।

তাহার পর পণ্ডিতজী গুরুবাগে যাইবার জন্য ৩রা তারিখে বেলা ২টার সময় যাত্রা করিলেন। তাঁহার গাড়ী রাজাসাঁসীতে আটক করা হইল। তখন তিনি পদব্রজেই অগ্রসর হইলেন। পুলিস রাণী-কা-পালে তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি গ্রেপ্তার হইতে চাহিলেন; কিন্তু তাহাও করা হইল না। পণ্ডিতজীকে বিফলমনোরথ হইয়া অমৃতসরে ফিরিয়া আসিতে হইল। পথে এক জন পুলিস তাঁহার প্রতি লাঠি উঁচাইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে ছাড়িল না।

পরদিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ) ৪টার সময় পণ্ডিত মালব্য লালা দুনীচাঁদ, অধ্যাপক রুচিরাম ও মালিক লাল খাঁকে (পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি) সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী প্রথম ২ জন পুলিস-কর্ম্মচারীকে আইন বুঝাইয়া দিতে যায়েন—তাহাতে তাহারা বলে—"আপনি আমাকে আইন বুঝাইবার কে?" তাহার পর পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ২ জন সদস্যও ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অধ্যাপক রুচিরামকে ঘটনাস্থলে রাখিয়া অপর সকলে অমৃতসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্ডিতজী অধ্যাপক রুচিরাম ও দিল্লীর ডাক্তার গুরুবক্স সিংকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে গেলেন। ডেপুটী কমিশনারের আদেশ থাকায় পণ্ডিতজীকে গুরুবাগে যাইতে দেওয়া হইল—অপর ২ জন পথে বাধা প্রাপ্ত হইলেন। সেদিন পুলিস শুধু আকালীদিগকে প্রহার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—দর্শকরূপে যাহারা ঐ স্থানে গিয়াছিলেন—তাঁহারাও অনেকেই প্রহৃত হইলেন। তাহাতে অনেক মডারেট শিখও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—ব্যবস্থাপক সভার ২ জন শিখ সদস্যও এই অনাচারের প্রতীকারের জন্য

বদ্ধপরিকর হইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে অমৃতসর স্বর্ণ-মন্দিরে জিলা শিখ লীগের সম্পাদক সর্দ্দার ওমরাও সিংকে গ্রেপ্তার করা হইল। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং ঐ দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখেই নাকি পুলিস বহু লোকের নিকট হইতে টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইয়াছি।

প্রত্যহই শত শত আকালী দলবদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থল অভি-মুখে যাত্রা করিতে লাগিল। অনেককেই প্রহারে পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। ৬ই তারিখে পোষ্টা-ফিসের কর্ত্তৃপক্ষ গুরুদ্বার কমিটীকে জানাইলেন যে, তাঁহাদের চিঠিপত্র আর ডাকে আসিতে দেওয়া হইবে না। চিঠিগুলি সব পোষ্টাফিসে খুলিয়া দেখা হইত—কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছামত কয়েকখানি পত্র কমিটীর নিকট প্রেরিত হইত। 'ট্রিবিউন', 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট,' 'বন্দে মাতরম্', 'স্বরাজ', 'জ্ঞানী আকালী' ও 'পরদেশী'—এই কয়েকখানি সংবাদপত্রের প্রতি-নিধি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় ৭ শত লোক আহত হইয়াছে এবং আহতগণের জন্য অমৃতসর হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা হইলে পুলিস তাহা পথে কাড়িয়া লইতেছে। গুরুবাগে যাইয়া আত্মদান করিবার জন্য অমৃতসরে এত অধিক শিখ আসিয়া সমবেত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে বাসস্থান ও খাদ্য প্রদান করা শিরোমণি কমিটীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। ৭ই সেপ্টেম্বর বিখ্যাত শিখ নেতা ভাই তেজ সিং গ্রেপ্তার হইলেন।

ধারণপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী তাঁহাদিগকে গুরুবাগে যাইতে অনুমতি দিলেন না।

৭ই সেপ্টেম্বর আহত শিখগণের মধ্যে ২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভাই তারা সিং নামক এক জন কৃষক ও তাহার পিতা যখন মাঠে কায করিতেছিল, তখন পুলিস তথায় যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিয়া আইসে। প্রহারের ফলে বৃদ্ধ পিতা একটু পরেই মারা যায়। পুত্র তারা সিংকে হাঁস-পাতালে লইয়া যাওয়া হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। ঐ তারা সিং গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজের সামরিক বিভাগে বহুদিন কায করিয়াছিল এবং তাহার জন্য পেন্সনও ভোগ করিত।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে পঞ্জাব পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার জেনারল, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার জেনারল, কমিশনার ও ডেপুটী কমিশনার গুরুবাগ দেখিতে গেলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের সকলের সম্মুখেই পুলিস ১২ জন আকালীকে এমন প্রহার করিল যে, সকলেই অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। ১২ই তারিখে ব্যাপার জানিবার জন্য পঞ্জাবের গভর্ণর অমৃতসরে গেলেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টা-কালের জন্য তিনি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ দিন মহাপ্রাণ সি, এফ, এণ্ড্রুজও গুরুবাগে যাইয়া পুলিসের কীর্ত্তি দেখিয়া আসিলেন। পরদিন হইতে অমৃতসরের হাঁস-পাতালে আহতগণের সেবাকার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

আদালতে পণ্ডিত মালব্য।

ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিত মালব্য বহুদিন আদালতে ওকালতী করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ধৃত শিখগণের মধ্যে বাবা কাহের সিং নামক এক ব্যক্তি মোকর্দ্দমার সময় আত্মপক্ষ-সমর্থনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় পণ্ডিতজী তাঁহার পক্ষ অব-লম্বন করিয়া আবার আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। অমৃতসর ও লাহোরের গণ্যমান্য উকীলগণের মধ্যে অনেকেই তখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন।

গুরুবাগে আত্মদান কার্য্যে পুরুষগণের উৎসাহ দেখিয়া শিখমহিলাগণও তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য একটি দল গঠন করিলেন। তাঁহারা সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃপাণ

পণ্ডিতজীর লাঞ্ছনা।

অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার ডানেট পণ্ডিত মালব্যের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিলেন। এক স্থানে পুলিস যখন প্রহার করিতেছিল, তখন পণ্ডিতজী ডানেটের সহিত দেখা করিতে চাহেন। ডানেট নিজে দেখা করিলেন না—পরন্তু তাঁহার সহকারীকে আদেশ দিলেন, পণ্ডিত মালব্যকে এখনই এখান হইতে সরাইয়া দাও। এই সকল ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে ডানেটকে পণ্ডিতজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

এ দিকে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের

হোম-মেম্বার সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট গুরুবাগ সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, অমৃতসরের শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী তাহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। হোম-মেম্বার যে না জানিয়া সভায় বহু মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন—তাহা প্রতিপন্ন করাই কমিটীর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তাহার পর হোম-মেম্বার ঐ প্রতিবাদের আর কোন প্রতিবাদ প্রকাশ করেন নাই।

আকালীদিগকে ঐরূপ নির্ম্মমভাবে প্রহারের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেলে—মডারেট, এক্সট্রীমিষ্ট, সহযোগী, অসহযোগী, সরকারী, বে-সরকারী সকল সম্প্রদায়ের লোকই উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সেই জন্য ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে গভর্ণমেণ্ট কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৪ই তারিখে যে ১২ জন শিখ দলবদ্ধ হইয়া গুরুবাগে কাঠ কাটিতে গেল—পুলিস আর তাহাদিগকে প্রহার করিল না—সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া গেল। এই ভাবে অহিংসার নিকট বাহুবল পরাজয় স্বীকার করিল—প্রতিরোধের নিকট সত্যাগ্রহ জয়লাভ করিল।

কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই গুরুবাগে ১ হাজার ২ শত ১০ জন লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছিলেন। কয়েকজন ডাক্তার আহতগণের মধ্য হইতে যাঁহারা গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পৃথক্ একটি তালিকা প্রকাশ করিলেন। কাহার কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, তালিকায় তাহা দেওয়া হইল। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তালিকাটি প্রদান করিলাম। মূত্রাশয় যন্ত্রণা—৪২, অণ্ডকোষ—৩৬, মেরুদণ্ডের অস্থি—৩৪, মস্তক—১২০, অস্থিভঙ্গ—৪৯, থেঁতলান ঘা—৩১, দাঁতভাঙ্গা—১১, অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত—১২০, পৃষ্ঠব্রণ—৫২, দেহের সম্মুখভাগে আহত — ১৭৫, ঘোড়ার পদদলিত —৩। মোট ৬ শত ৭৩ জন।

১৫ই তারিখেও এক জন লোক আহত হইল। সর্দ্দার অমর সিং নিজের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া যখন সকালে মুখ ধুইতেছিলেন, তখন এক দল পুলিস যাইয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিয়া দিল। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, অমর সিংএর গলায় দড়ি বাঁধার দাগ ছিল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। ঐ দিন অমৃতসরের কমিশনার মিষ্টার এচ, পি, টলিণ্টন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরুবাগ লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল।

প্রহারে মৃত আকালী।

তাহার পর গ্রেপ্তারের পালা পড়িল—১৯শে সেপ্টেম্বর ২১ জন, ২০শে ২১ জন, ২১শে ২০ জন, ২২শে ২০ জন,

২৩শে ২০ জন, ২৪শে ৩০ জন, ২৫শে ৪০ জন আকালী গ্রেপ্তার হইলেন। এই ভাবে এ পর্য্যন্ত বহু আকালী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তারের সময়ও অনেক শিখকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। ঝরিয়া কয়লার খনির স্বামী বিশ্বানন্দ গুরুবাগ সম্পর্কে অমৃতসরে গিয়াছিলেন—২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে তথায় গ্রেপ্তার করা হয়।

গুরু কা বাগে আকালী।

তদন্ত-কমিটী।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অমৃতসরে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হয়। তাহাতে গুরুবাগ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত-কমিটী গঠিত হয়। মাদ্রাজের শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল) কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। মহামতি ছৈবৃপ, দিল্লীর শ্রীযুক্ত তকি, বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নাগপুরের শ্রীযুক্ত অভয়ঙ্কর ঐ কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ১লা অক্টোবর হইতে তদন্ত-কমিটী সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কার্পাস-কীট।

কার্পাস বৃক্ষে একপ্রকার কীট জন্মে,তাহাকে boll weevill বা কার্পাস-কীট বলা যায়। এই কীট আমেরিকার কার্পাস-ক্ষেত্রের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। ওয়াসিংটনের কৃষি-বিভাগ বিগত সেপ্টেম্বর মাসে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কার্পাস-কীটের উৎপাতে ৬২ লক্ষ ৭৭ হাজার গাঁইট তুলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২০খৃষ্টাব্দে যত তুলা নষ্ট হইয়াছিল, তাহার তুলনায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অবস্থা আরও শোচনীয়। বর্ত্তমান বর্ষে কীটের উৎপাত ক্রমেই বাড়িতেছে। বিগত আগষ্ট মাসেই ৮ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট তুলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি এই অনুপাতে কার্পাস-ক্ষেত্রে কীটের অত্যাচার চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা নষ্ট হইয়া যাইবে। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, তথায় মোট ৭৯ লক্ষ ৫৪ হাজার গাঁইট তুলা পাওয়া গিয়াছিল, আর কার্পাস-কীট ৬০ লক্ষ গাঁইটেরও অধিক ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে, উৎপন্ন তুলার অর্দ্ধেক কীটের দ্বারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অবিলম্বে কোনও বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন না করিলে এই ভীষণ কীটের আক্রমণ হইতে তুলা রক্ষা করা কঠিন হইবে।

কার্পাস কীট। বিভিন্ন অবস্থা।

এই boll weevil বা কার্পাস-কীট দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির চারি ভাগের এক ভাগ, এবং প্রস্থে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র; অর্থাৎ সাধারণ মক্ষিকার আকারবিশিষ্ট। ইহার জীবনীশক্তি অসাধারণ। যে কোনও ঋতুতে ইহারা আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত। শীতকালে ইহারা পূর্ণাবস্থায় থাকে। কঠোর শীত ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে না।

শীতকালে ইহারা বিনা খাদ্যে জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ। এই সময়ে কীটগুলি তুলার বীজের গুদাম, সঞ্চিত শস্যস্তূপ, ক্ষেত্রের বেড়ার বৃক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে। কার্পাসের চারাগুলি মাটীর উপর মাথা খাড়া না করা পর্য্যন্ত ইহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে। তাহার পরই দলে দলে খাদ্য সংগ্রহের জন্য গাছগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে।

কৃষি-বিভাগের বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, কার্পাস-কীটের অন্য কোনও খাদ্য নাই। কার্পাসের চারাই তাহাদের
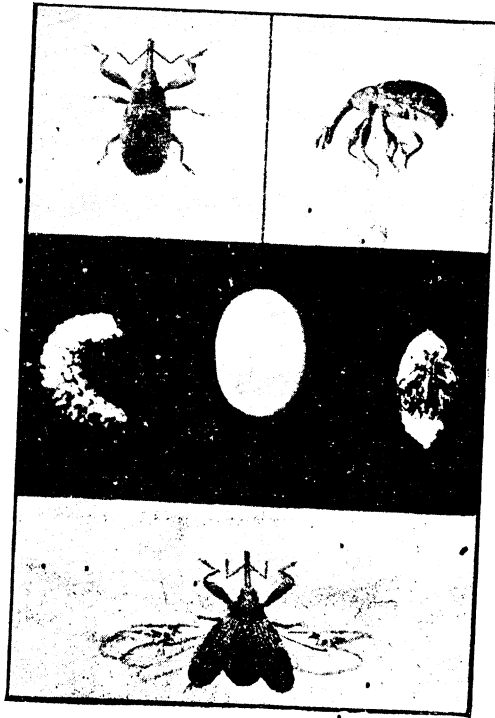
একমাত্র খাদ্য। ভোজন ও বংশবৃদ্ধি ছাড়া ইহাদের অন্য কোন কার্য্যও নাই। প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতে এক একটি কীট চারিবার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। কার্পাস-কীটের ছানাগুলির দ্বারাই অধিক অনিষ্ট সংঘটিত হয়। পূর্ণাবস্থায় কীটগুলি অপেক্ষা ইহাদের আকার কিছু বড়। উল্লিখিত চিত্র হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। কার্পাস-কুঁড়ির মধ্যে ইহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এক জোড়া কার্পাস-কীট হইতে এক ঋতুতে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ১ শত বংশধর উৎপন্ন হয়! একটি কীট কার্পাস-মুকুলে প্রবিষ্ট হইলেই তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য, এখন কল্পনা করিয়া দেখুন, এক জোড়া কীটের এতগুলি বংশধরের আবির্ভাবে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে!

কার্পাস-কীট কিরূপে তুলা ধ্বংস করিতেছে।

এই ভীষণ কীটের উপদ্রব হইতে কার্পাস রক্ষা করিবার উপায় কি, এ সম্বন্ধে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু কোনও প্রকৃষ্ট উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সে দিন দক্ষিণ কারোলিনার সেনেটের স্মিথ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এক বৎসর কার্পাসের আবাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলে, আহারাভাবে কীটগুলি মরিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ জন্য ১ শত কোটি ডলার ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করেন, তাহা হইলে যাঁহারা কার্পাসের চাষ করেন, তাঁহারা এক বৎসর উহার আবাদ করিবেন না। সেনেটর স্মিথের এ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইবে কি না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু কার্পাসকীটের উৎপাতে আমেরিকাবাসীরা যে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাপানী কাগজ।

জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিক সংপ্রতি একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা যেমন শক্ত, তেমনই দীর্ঘকালস্থায়ী। এই কাগজ ইচ্ছামত ভাঁজ করিয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না। কাগজে দাগ পড়িলে বা ময়লা হইলে উহা সাবান-জলে ধৌত করা যায়, তাহাতে কাগজের মসৃণতা নষ্ট হয় না। এই কাগজের দ্বারা ছাতা নির্ম্মাণ করা যায়। জলে ধৌত করিবার সময় বিশেষ কোনও প্রকার সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। বস্ত্রাদির ন্যায় সহজে উহা ধৌত করা

জাপানী কাগজ।

যায়। রৌদ্রে কাপড় ফেলিয়া দিলে যেমন তাহা শুকাইয়া যায় এই কাগজও তেমনই উপায়ে শুষ্ক করিতে হয়। এই কাগজ যে যে উপকরণে নির্ম্মিত, তাহার মূল্যও অধিক নহে। oiled paper বা তেল কাগজের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই।

আরোহিপূর্ণ নৌকাসহ সন্তরণ।

সংপ্রতি জনৈক ইংরাজ সন্তরণ-কারী 'ইংলিশ চ্যানেল' পার হইবার সঙ্কল্প করিতেছেন এই ব্যক্তি সন্তরণবিদ্যায় বিশেষ পটু এবং ইঁহার দেহের শক্তিও অসাধারণ। ইনি সংপ্রতি তাঁহার সন্তরণ বিদ্যা ও দৈহিক শক্তির বিস্ময়-জনক পরিচয় দিয়াছেন। এক খানি ছোট নৌকায় ৭ জন আরোহীকে চাপাইয়া তাহার সহিত একটি রজ্জু বাঁধিয়া, দেহসংলগ্ন বস্ত্র-নির্ম্মিত জিনের সহিত উহা আবদ্ধ করিয়া তিনি সমুদ্রে সাঁতার দিয়াছেন। প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত তিনি আরোহিপূর্ণ নৌকা সাঁতার দিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ সন্তরণকারী আরোহিপূর্ণ নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

দারু-নির্ম্মিত প্রহরী।

ওয়াইওমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কলেজের বিস্তৃত প্রাঙ্গ-ণের শ্যামল তৃণাস্তরণ রক্ষার জন্য দারু-নির্ম্মিত পুলিশ-প্রহরীর মূর্ত্তি গড়িয়া উহা ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই দারু-ময় মূর্ত্তিগুলি উর্দ্ধে ২৬ ইঞ্চ। প্রহরীগুলির হস্তে একটি করিয়া লৌহ-কণ্টক-মণ্ডিত দণ্ড, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"ঘাস মাড়াইও না।" পাছে কেহ ঘাসের উপর দিয়া চলা-ফেরা করে, এই জন্য ছাত্রগণ অভিনব প্রণালীতে এই দারুময় প্রহরিমূর্ত্তি তৃণক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে।

দারুময় পুলিশ প্রহরী।

প্রাগৈতিহাসিক মাংসাশী সরীসৃপ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সকল মাংসাশী সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীব-সম্প্রদায় পৃথিবীতে বিদ্য-মান ছিল, তাহাদের অস্থি, কঙ্কাল অথবা প্রস্তরীভূত দেহা-বশেষ দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, এসিয়ার উত্তরাংশেই ঐ সকল জীবের বাসভূমি ছিল। রয় চ্যাপমান্

মঙ্গোলিয়ার আবিষ্কৃত মাংসাশী গিরগিটি। 'টিরানোসেরস্' জাতীয় গিরগিটি একদল অষ্টচ জাতীয় গিরগিটির সম্মুখীন হইয়াছে।

এণ্ড্রুজ সংপ্রতি তৃতীয়বার আবিষ্ক্রিয়া-কল্পে সদলবলে উত্তর এসিয়াখণ্ডে গমন করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবজন্তুর আকার অতি দীর্ঘ ছিল। সে যুগের সরীসৃপাদি জীবগুলিও দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট পর্য্যন্ত হইত। মিঃ এণ্ড্রুজ মোঙ্গোলিয়া প্রদেশ অতিক্রমকালে কোনও স্থলে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটির প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ আবিষ্কার করেন। এরূপ বৃহদাকার সরীসৃপ এ পর্য্যন্ত আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

মানুষের শক্তি।

জর্ম্মণীর কোনও সার্কাসে এক ব্যক্তি দৈহিক শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিতেছেন। এই লোকটির শারীরিক বল অসাধারণ। সার্কাসের এই বীরপুরুষটি 'দোলা' উচ্চে তুলিয়া ধরিলে, আট জন পূর্ণবয়স্ক লোক অনায়াসে তাহাতে দোল খাইতে থাকেন। এই জার্ম্মাণ বীরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া সহস্র সহস্র দর্শক প্রত্যহ তাঁহার বল পরীক্ষার ক্রীড়া দেখিতে
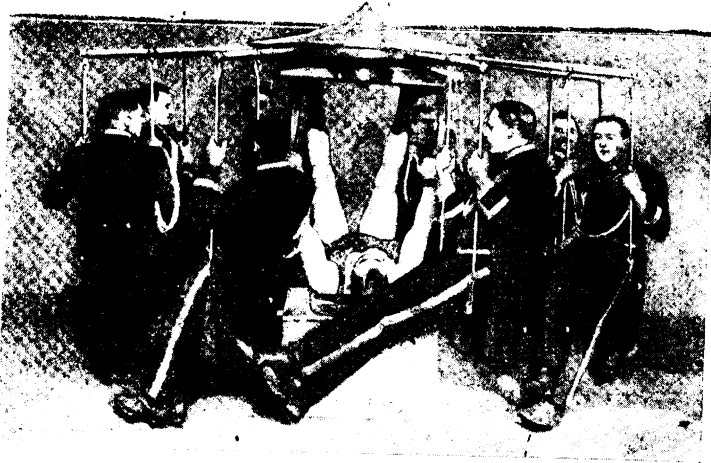
আটজন লোক দোল খাইতেছে।

ইনি একটি উচ্চ বেদীর উপর শয়ন করিয়া পায়ের দ্বারা একটা প্রকাণ্ড 'নাগরদোলা' ধরিয়া রাখেন। এই দোলায় আট জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দোল খাইবার ব্যবস্থা আছে। যাইয়া থাকেন। শক্তি চর্চ্চায় আমাদের দেশের যুবকগণ মনোনিবেশ করিতেছেন। তাঁহারা শক্তি চর্চ্চায় অবহিত হউন। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"
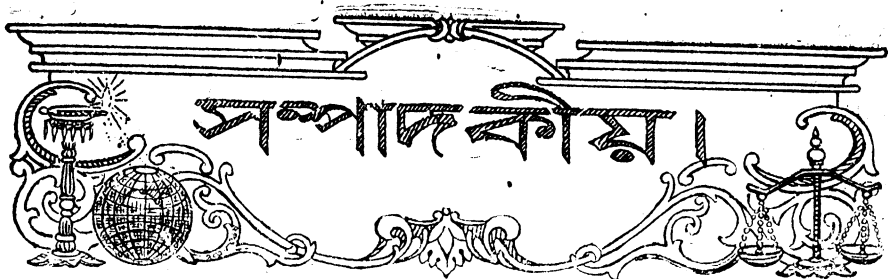
গুরু-কা-বাগে অহিংসা

গুরু-কা-বাগে শিখদিগের লাঞ্ছনার বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিখরা যে ভাবে অহিংসায় অবিচলিত রহিয়াছে এবং উত্তেজনার কারণ পাইয়াও যেরূপে শান্ত ভাব ত্যাগ করে নাই, তাহা দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য বলিয়াছেন, সেই সহিষ্ণুতা শিখগুরুদিগের দান, আর মহাত্মা গন্ধীর শিক্ষার ফল। শিখ-সম্প্রদায় ইংরাজের সেনাদলে বহু সৈনিক যোগাইয়াছে—জার্ম্মাণ যুদ্ধেও তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসায় ইংরাজের বিবরণ পূর্ণ। সেই শিখরা যে প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে, তবুও হস্তোত্তোলন করিতেছে না—ইহা সাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচায়ক নহে।

সংপ্রতি প্রয়াগের 'পাইওনীয়ার'ও স্বীকার করিয়াছেন—

"এই ব্যাপারে শিখদলের শান্ত শৃঙ্খলা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বটে। দুই চারি জন ব্যতীত আর সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বলপ্রয়োগে বিরত রহিয়াছে। তাহাদের সেই ভাব পরিহারের উপদেশ উক্ত হইতে না হইতে নিন্দিত হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, 'পাইওনীয়ার' যে দুই চারি জনের বলপ্রয়োগের কথা বলিয়াছেন, তাহারও প্রমাণাভাব। বলপ্রয়োগের কোন প্রমাণ আমরা কোন বিবরণে পাই নাই। তবে আজ 'পাইওনীয়ার' যে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এত দিন "চরমপন্থী" সংবাদপত্রে সেই কথা বলা হইলেই তাহা অসত্য বলিয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

আর একখানি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রও স্বীকার করিয়াছেন—

"এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিখরা যে প্রহার সহ্য করিয়াছে, স্থিরভাবে তাহা সহ্য করা সাধারণ মানসিক ও নৈতিক বলের পরিচায়ক নহে।"

মহাত্মা গন্ধী দেশবাসীকে অহিংসায় অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিয়া এই মানসিক ও নৈতিক বলের অনুশীলন করিতেই বলিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার উপদেশে সুফল ফলিয়াছে। যে মিশরবাসীরা আরবী পাশার সময় হইতে মুক্তির সংগ্রামে শারীরিক বলপ্রয়োগই করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নেতা জগলুল পাশাও আজ স্বীকার করিয়াছেন, মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগনীতিই মুক্তির সংগ্রামে সকল দুর্ব্বল জাতির অবলম্বনীয়। ইহার গতি কেহ প্রহত করিতে পারে না, শক্তি কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না।

এই ব্যাপারে শিখরা রাজনীতিক চক্রীদিগের প্রভাবে পতিত হইয়াছে—বলিয়া 'পাইওনীয়ার' যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ারই নিজস্ব থাকুক—ভারতবাসীর তাহা লাভ করিয়া কায নাই।

'পাইওনীয়ার' বলিয়াছেন, এ ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমান—কাহারও জয় বা পরাজয় হয় নাই—ইহা সামরিক ভাষায় drawn battle. এ কথা কি সত্য? ইহাকে যদি যুদ্ধ বল, তবে এ যুদ্ধ—সশস্ত্রে ও নিরস্ত্রে। কে জয়ী হইয়াছে? এ যুদ্ধ—বাহুবলে ও নৈতিক বলে। কাহার জয় হইয়াছে? এ যুদ্ধ—হিংসায় ও অহিংসায়। কাহার জয় ঘোষিত হইয়াছে? 'পাইওনীয়ার'কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, শিখরা প্রহৃত হইয়াও অহিংসায় অবিচলিত আছে। তবে আমরা কাহার জয় ঘোষণা করিব?—সশস্ত্র পুলিসের; না নিরস্ত্র শিখদিগের? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া যাহাই কেন বলুন না, আমরা জয়ের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি—মহাত্মা গন্ধী জয়ের যে নিদর্শন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে—সেই আদর্শে বিচার করিয়া ও সেই নিদর্শন লক্ষ্য

করিয়া—আমরা বলিব, জয়মাল্য শিখদিগের কণ্ঠেই শোভা পাইয়াছে।

আবার শিখরা পুলিসের বিরুদ্ধে দস্যুতার অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছে। আমরা আশা করি, কংগ্রেসের তদন্ত সমিতির বিবরণে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে।

ব্যবস্থাপক সভার অস্মমতা।

বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ শাসন-সংস্কারকে "পরীক্ষা"-মাত্র বলিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই এ দেশে বড় লাট ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর ঘটনাচক্রেই হউক, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে তাঁহাদের ক্ষমতার অসারত্ব যে ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে অসহযোগীরা যেমন আনন্দানুভব করিয়াছেন, সহযোগীরা তেমনই হতাশার বেদনা বোধ করিয়াছেন। ইংরাজ গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা বক্তৃতায় ও রচনায় লোককে স্বাধীনতা দিয়াছেন—লোক অনায়াসে আপনার মত ব্যক্ত করিতে পারে। এই স্বাধীনতা কিরূপ, তাহা এ দেশে আমরা বিশেষ বুঝিয়াছি। কত নেতা ও কত সংবাদপত্রসম্পাদক যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার "অপরাধে" কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। তবে এ বিষয়ে যে আইন ছিল, তাহার জন্য ইংরাজকে, বোধ হয়, অন্যান্য দেশে একটু লজ্জিত হইতে হইত এবং সেই জন্য সে আইন বাতিল করা যায় কি না, তাহার আলোচনা করিতে এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সে সমিতিতে ভারত সরকারের ব্যবস্থা-সচিব ডাক্তার সপরু ও স্বরাষ্ট্র-সচিব সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট সদস্য ছিলেন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য সার জন উডও ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয়, তাহাতে বৃটিশ-শাসিত ভারত হইতে দেশীয় রাজন্যবর্গকে ও তাঁহাদের সরকারকে আক্রমণ করিয়া প্রকাশিত পত্রাদির জন্য প্রকাশকদিগকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সার জন উড বর্ত্তমান দণ্ডবিধি আইনে সেইরূপ একটা ব্যবস্থা রাখিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিচার-বিবেচনার পর সমিতি তাহার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

অথচ তাহার পর সহসা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের শেষ সময়ে—দেশের লোককে এ বিষয়ে মতপ্রকাশের অবসর না দিয়া—সরকার এ বিষয়ে এক আইন পেশ করেন। ব্যবস্থাপক সভার নিম্নাংশ অর্থাৎ এসেম্ব্লী সে আইন পেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহা বর্জ্জন করেন।

তাহার পর ২৪ ঘণ্টা না কাটিতেই বড় লাট ছাড় দিয়া সে আইন ব্যবস্থাপক সভার উচ্চাংশে পেশ করান। সে ব্যবস্থা শাসন-সংস্কার আইনেই আছে। ব্যবস্থার মর্ম্ম এইরূপ—

বড় লাট যে রূপে কোন আইন পেশ করেন, যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন অংশ ঠিক সেই রূপে সে আইন বিধিবদ্ধ না করেন, তবে বৃটিশ-শাসিত ভারতের আপদনিবারণ, শান্তিসংরক্ষণ বা স্বার্থরক্ষার জন্য সে আইন প্রয়োজনীয় বলিয়া বড় লাট ছাড় দিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার অপরাংশ আইন বিধিবদ্ধ করিতে সম্মতি প্রদান করিলে বড় লাট সহি দিলেই তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে। আর যদি ব্যবস্থাপক সভার অপরাংশও আইন বিধিবদ্ধ করিতে অসম্মত হয়েন, তবুও বড় লাটের স্বাক্ষরমাত্রেই তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে। কেবল আইন পার্লামেণ্টে দাখিল করিতে হইবে এবং সম্রাটের মর্জ্জিতে তাহা নাকচ হইতে পারে।

এ দেশে কায়েম-মোকাম (Man on the spot) বড় লাট কোন আইনে সম্মতি দিলে পার্লামেণ্টে তাহার প্রতীকারের কোন আশা কিরূপ সুদূরপরাহত, তাহা আমরা বঙ্গ-ভঙ্গের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক কাযে অনেকবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি। সুতরাং সে আশায় আমরা প্রলুব্ধ হইতে পারি না।

তবে ব্যবস্থাপক সভার যে সদস্যরা প্রথমে আইন বর্জ্জন করিয়া পরে আবার বড় লাট তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে জিদ করিলে তাহার পুনরালোচনা করিবার অধিকার পাইবার জন্য বড় লাটের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন এবং তবুও সে অধিকার লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষ হইয়া শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী বলিয়াছেন, এবার বুঝা গেল—

(১) সরকার ব্যবস্থাপক সভার পরমর্শ গ্রহণ না করিয়াই, আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এবং পরে কারণ না দেখাইয়াই স্বেচ্ছায় সে আইন প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন।

(২) যাঁহারা শাসন-সংস্কার অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহারাও এখন বুঝিতেছেন, শাসন-সংস্কারের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অতিরঞ্জিত।

তাঁহাদের প্রথম কথা বলিবার কারণ, ব্যবস্থাপক সভার উচ্চাংশে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার সময় সরকারের পক্ষে কর্ম্মচারী মিষ্টার টমশন বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার রাজন্যবর্গের সহিত যে সব সন্ধিসর্ত্তে বদ্ধ, এ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে সে সব সর্ত্ত ভঙ্গ হইবে। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য, রাজন্যবর্গের পক্ষে সার জন উড কি সেরূপ কোন কথা তদন্ত-সমিতির সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে এ সব সর্ত্ত কি তদন্ত-সমিতির নির্দ্ধারণের পরে হয় নাই? কারণ, সে সব সর্ত্ত থাকিলে যে ডাক্তার সপরু ও সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট প্রচলিত আইন বাতিল করিতে উপদেশ দিতেন, এমন মনে হয় না।

শাসন-সংস্কারের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সহযোগী-দিগের ধারণা যে অতিরঞ্জিত, তাহা তাঁহারা এত দিন পরে বুঝিলেও লোক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেই জন্যই জাতীয় দল তাহা আশানুরূপ নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সহযোগীদিগের বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। কারণ; শাসন-সংস্কারের পরিমাণ ও প্রকৃতি আইনেই প্রকাশ। আবার সে আইনে আছে—বড় লাট যেরূপে আইন বিধিবদ্ধ করিতে চাহেন (in a form recommended by the Governor General) অবিকল সেই রূপেই ব্যবস্থাপক সভায় আইন বিধিবদ্ধ না হইলে বড় লাট নিজ ক্ষমতায় তাহা বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভার উচ্চাংশে অর্থাৎ কাউন্সিল অব ষ্টেটে মিষ্টার টমশন সে কথাটা সদর্পে সদস্যদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

বড়লাটের এই ব্যবহারে আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের ব্যবহারে আমরা বিস্মিত না হইলেও লজ্জিত হইয়াছি। কাউন্সিল অব ষ্টেটে সার বিনোদচন্দ্র মিত্র প্রমুখ যে সব সদস্য প্রথমে আইন স্থগিদ রাখিতে বলিয়াছিলেন, শেষে তাঁহারাও আর আইন বিধিবদ্ধ করিতে আপত্তি করেন নাই। আর ব্যবস্থাপক সভার নিম্নাংশে যে সব সদস্য প্রথমে আইন বর্জ্জন করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহারাই আইনের পুনরালোচনা করিবার অধিকার পাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন—যেন "ঘাট মানিতেও" প্রস্তুত ছিলেন! তাঁহারা বুঝিয়াছেন, শাসন-সংস্কারের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অতিরঞ্জিত। মিষ্টার টমশন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বড় লাট ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের মত পদদলিত করিতে পারেন এবং বড় লাটের ইচ্ছামত কায না করিলে টমশনের মত কর্ম্মচারীর কড়া কথা তাঁহাদের "উপরি পাওনা।" তবুও পদত্যাগ করা তাঁহারা কর্ত্তব্য বা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। পরন্তু পাছে বিলাতের লোক তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে ভুল করে, সেই জন্য তাঁহারা বিলাতে 'ডেপুটেশন' পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা এখনও সাগর-পার হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহা স্বদেশে নিবদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। আর তাঁহাদের আত্ম-সম্মান এমনই আঘাতসহ যে, কিছুতেই তাহা ক্ষুণ্ণ হয় না।

বড় লাটের হাতে যেমন ক্ষমতা ছিল এবং তিনি যেমন তাহা প্রযুক্ত করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের হাতেও তেমনই ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রয়োগ করিতে সাহসী হয়েন নাই। তাঁহারা যদি পদত্যাগ করিতেন, তবে আবার ব্যবস্থাপক সভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারকে সব কায বিশেষ অধিকারবলে সম্পন্ন করিতে হইত এবং তাহা হইলেই সমগ্র সভ্য-জগতে ভারত-শাসনের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িত; শাসন-সংস্কারে গণতন্ত্রের নামে ভারতবাসী কি অধিকার পাইয়াছে, জগতের লোক তাহা বুঝিতে পারিত। ভারতবাসীকে এখন স্বাবলম্বী হইতে হইবে—দানের আশায় থাকিলে জাতির উন্নতি হয় না।

ইরাক-সন্ধি

খালিফদিগের গৌরব-স্মৃতি-বিজড়িত বাগদাদ সহরে ইংরাজে ও ইংরাজের কৃত রাজা ফৈজুলে সন্ধি সহি হইয়া গিয়াছে। গত ১০ই অক্টোবর ইংরাজপক্ষে সার পার্সী কক্স সন্ধিতে সহি করিয়াছেন। ইরাক প্রাচীন দেশ এবং এই দেশেই টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিশ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে বাইবেলে বর্ণিত নন্দন-কানন অবস্থিত বলিয়া পরিচিত। ইরাকের বসরা বন্দর প্রাচীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর ইরাক বা মেসোপোটেমিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় তাহা ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

এই স্থলে ইরাকের রাজনীতিক ইতিহাসের একটি কথা

বশী প্রয়োজন। তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদকে বশীভূত করিয়া জার্ম্মাণ কৈশর তুর্কীতে প্রভাব বিস্তার করিয়া বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত রেল পাতিতেছিলেন। সে রেলপথ বসরা পর্য্যন্ত আনিবে—স্থির হয়। বসরা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প জার্ম্মাণীর ছিল এবং ইংরাজ বাগদাদ অধিকার করিবার পর তথায় আমরা জার্ম্মাণ সমর-বিভাগ হইতে প্রকাশিত যে মানচিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাতে জলপথে বসরা হইতে করাচী আক্রমণ করিবার পথ রেখায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু পরে জার্ম্মাণী জানিতে পারেন, বসরা হইতে পারস্যোপসাগরে যাইতে হইলে পথিমধ্যে সাতল-আরব নদীতে একটু উচ্চস্থান আছে; জোয়ারের সময় ব্যতীত বড় জাহাজ সেই Mud bar অতিক্রম করিতে পারে না। তাই প্রস্তাব হয়, রেললাইন পারস্যোপসাগরের কূলে কোইট পর্য্যন্ত লওয়া হইবে। তখন লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষের বড় লাট। তিনি জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি বুঝিয়া কোইটের শাসককে বশীভূত করেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া তথায় বৃটিশ রণতরী পাঠাইয়া দেন। কোইটের শাসক তুর্কী-সাম্রাজ্যে বসরা প্রদেশের গভর্ণরের (ওয়ালীর) অধীন নায়েব (কাইম-মোকাম) মাত্র। তিনি জার্ম্মাণীকে কোইট পর্য্যন্ত রেলপথ আনিতে দিবার আদেশ অমান্য করিলে তুর্কী তাঁহার ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইংরাজের জন্য পারিয়া উঠেন নাই।

রাজা ফৈজুল।

সার পার্শী কক্স।

তাহার পর জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় প্রধানতঃ ভারতীয় সেনাবলের সাহায্যে ইংরাজ ইরাক জয় করেন। তখন কথা ছিল, তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন করা হইবে না। তাহার পর সে কথা চাপা দিয়া নূতন কথা উঠে—আরবদিগকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হইবে। কার্য্যকালে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিয়া ইংরাজ ইরাকে রাজা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা যে ইরাকের সকল আরবের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তাহার প্রমাণ—সে দিন যখন ইংরাজপক্ষের হাই. কমিশনার সার পার্শী কক্স রাজ্যাভিষেকের বার্ষিক উৎসবে ফৈজুলকে অভিনন্দিত করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথে আরবরা তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল। সেই ঘটনায় বিলাতের কোন কোন পত্রও বলিয়াছেন, আরবরা ইংরাজকৃত এই ব্যবস্থা চাহে না।

এবার যে সন্ধি হইল, তাহাতে কেবল যে ২০ বৎসরের জন্য ইরাকে ইংরাজ-প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিবার ব্যবস্থা হইল, তাহাই নহে; পরন্তু ফৈজুলের প্রকৃত ক্ষমতাও সপ্রকাশ হইল। সন্ধির প্রধান সর্ত্ত:—

(১) ২০ বৎসরের জন্য সন্ধি বহাল থাকিবে;

(২) জাতীয়, অর্থবিষয়ক এবং বৃটেনের স্বার্থসম্পর্কিত সকল কাযে ইরাকের রাজা বৃটিশ হাই কমিশনারের পরামর্শমত কায করিবেন;

(৩) প্রয়োজন হইলে ইংরাজ অর্থ ও সৈন্য দিয়া ইরাকের রাজাকে সাহায্য করিবেন;

(৪) ইরাকে খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্যে কোনরূপ বাধা প্রদত্ত হইবে না। তাঁহারা যথেচ্ছা ধর্ম্মপ্রচার করিবেন।

কাযেই যখন ফৈজুলকে প্রতিযোগী ইবন সাদের শক্তি

প্রহৃত করিতে হইবে এবং তাঁহার আর্থিক সাহায্যেরও প্রয়োজন, তখন তিনি যে সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইরাকে তুর্কীর শাসনের নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছে। রাজধানী হইতে বহুদূরে তুর্কীর শাসন যে নির্দ্দোষ ছিল, এমন না-ও হইতে পারে। কিন্তু সে আদর্শে বিচার করিলে কয় জন অব্যাহতি লাভ করিতে পারে? মিষ্টার ফিলবী ভারতবর্ষ হইতে চাকরীতে ইরাকে গিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে ইরাকে যাইয়া আমারা নগরে আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। সংপ্রতি তিনি The Heart of Arabia নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"আরবদিগের ধাতু বুঝিতে এবং তাহাদিগকে শাসন করিতে তুর্কীর যেরূপ অসাফল্য দেখা গিয়াছে, তেমন আর কোথাও নহে। * * সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, লুণ্ঠন ও অনাচারের মধ্যে তুর্কীর পতাকা অনিশ্চিতভাবে উড্ডীন ছিল। যে স্থানে পূর্ব্বে কখন শান্তি ছিল না, আজ তথায় শান্তি বিরাজিত। তুর্করা যে গিয়াছে—তাহাদের শাসকসম্প্রদায়ের অর্থগৃধ্নুতাজনিত অনাচারের যে অবসান হইয়াছে, ইহাতে লোক আনন্দিত।"

কিন্তু আজ যখন রোয়ান্দুজ ও সুলেমানিয়ার নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধসংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে; যখন হিল্লার কাছে বিদ্রোহ এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দেও হাঙ্গামা হইয়াছে—তখনও কি বলা যায়—ইরাকে শান্তি বিরাজিত? আর সার পার্শী কক্সের অপমান কিসের পরিচায়ক? যখন বৃটিশ অস্ত্রের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করিতে হয়, যখন সংবাদপত্রসেবক প্রভৃতিকে কারাবদ্ধ করিয়া লোকমতপ্রকাশপথ রুদ্ধ করিতে হয়, যখন সিংহাসনলাভে প্রতিযোগীকে দেশান্তরিত করিয়া নিরাপদ হইতে হয়, যখন এক জন আরব শেখকে অর্থ দিয়া ("Indian silver rupee") বশীভূত করিতে হয় এবং যখন ইংরাজকৃত রাজার অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতে হয়, তখন—সে শান্তি কি প্রকৃত শান্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

তুর্কীর অধীনেই কি ইরাকে শান্তি ছিল না? সুলতান আবদুল হামিদ বা তুর্কীর জাতীয় সরকার ইরাকের ব্যাপারে সচরাচর হস্তক্ষেপ করিতেন না। তখনও খৃষ্টান বাগদাদ মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি হইতে পারিয়াছেন; তখনও ইহুদীরা নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবার মিষ্টার ফিলবীর কথার উত্তরে সার আর্ণল্ড উইলসনের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়—"সমধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য জাতির শাসনকার্য্যে তুর্কের দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত।"

ইরাকের এই সন্ধিতে কি ইংরাজের যুদ্ধকালদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইল?

—

নবাব সার সামশুল হুদা

নবাব সার সামশুল হুদার মৃত্যু হইয়াছে। হুদা সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম কৃতী সন্তান। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিবার পর বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি

নবাব সার সামশুল হুদা।

পদের সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রথম প্রথম এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সদস্য সফরে বাহির হইলে কমিশনাররা সদর হইতে সফরে চলিয়া যাইতেন। গল্প আছে, কোন বিভাগীয় কমিশনার এইরূপে গর-হাজির হইলে তিনি কাগজ-পত্র বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে আসিতে তলব দেন। কমিশনার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে—সাক্ষাৎলাভের জন্য কমিশনারকে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়—তাহার পর নবাব সাহেবের ফুরসৎ হয়। ঘরেও তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাগজ বুঝাইতে হয়। তাহার পর কমিশনার প্রভৃতিকে সতর্ক করিয়া এক সার্কুলার জারি করা হয়।

শাসন-পরিষদে কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড কার্মাইকেলের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে হাইকোর্টের জজ করা হয়।

তখনই তাঁহার শরীর অসুস্থ। শেষে তিনি সংস্কার আইনে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি অসুস্থ হইলে ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার স্থানে কার্য্য করেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অধিকদিন বিশ্রামসুখভোগ করিতে পারিলেন না।

—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়।

গ্রীসে বিপ্লব

এসিয়া মাইনরে কামাল-পাশার গ্রীকদিগের পরাভবের ফলে গ্রীসের বিপ্লবহেতু রাজা কনষ্টাণ্টাইনকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছে। গ্রীকরা স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণ; হতাশ হইলে তাহারা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া শত্রুমিত্র-বিচার-বিবেচনাশূন্য হয়। নহিলে — শান্তভাবে বিচার করিলে তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিত, এসিয়া মাইনরে রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টা কনষ্টাণ্টাইন কেবল গ্রীকদিগের অন্যায় আশা তৃপ্ত করিতেই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে জন্য দায়ী গ্রীকদিগের রাজ্যবিস্তার-লালসা; আর সে লালসা-বহ্নিতে ইন্ধন-যোগ করিয়াছেন—পরস্বলাভলোলুপ ভেনিজেলস। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় একবার তাঁহার রাজত্বকাল ফুরাইলে যখন তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসান হয়, তখন সোৎসাহে এসিয়া মাইনরে যুদ্ধ না চালাইলে কনষ্টাণ্টাইনের পক্ষে পুনরায় সিংহাসনত্যাগ ব্যতীত গতি ছিল না। পরস্বলাভ-লালসাচালিত হইয়াই গ্রীকরা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। আর সেই লালসার মত্ততায় তাহারা, বোধ হয়, আবার ভেনিজেলসকে ক্ষমতাচালন করিতে আহ্বান করিত। কিন্তু নিজকর্ম্মদোষে ভেনিজেলস গ্রীসে বহু শত্রু সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সরকারের

বিরুদ্ধ মতপ্রকাশ করায় প্রায় ২০ হাজার লোকের কারাদণ্ডে আমরা স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ। আর ভেনিজেলস যখন গ্রীসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া গ্রীসের ৬০ লক্ষ প্রজার মধ্যে ৮০ হাজার কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কাযেই গ্রীসে ভেনিজেলস কিরূপ অপ্রিয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সপরিবারে কনষ্টান্টাইন।

বর্ত্তমানে এসিয়া মাইনরে কামাল পাশার সাফল্যে এবং ফ্রান্সের ও ইটালীর ভাব দেখিয়া ইংলণ্ডেরও আর কামালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অপ্রবৃত্তিতে গ্রীকরা যেন স্তম্ভিত হইয়াছে; কি করিবে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই স্বভাবতঃ বিগ্রহপ্রিয় জাতি কত দিন ধীর ও স্থির হইয়া থাকিবে বলা যায় না।

মূল কথা, যত দিন গ্রীকদিগের পরস্বাপহরণলালসা নিবৃত্ত না হইবে, তত দিন তাহাদের যুদ্ধোদ্যম যাইবে না এবং তত দিন তাহাদের দুর্দ্দশারও অবসান হইবে না।

কনষ্টান্টাইন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি আর রাজা হইতে চাহেন না; কেন না, রাজা হইয়া মজা নাই—কেবল ঝঞ্চাট।

বিপ্লবে গ্রীক সৈন্যরা কনষ্টান্টাইনের উপরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু তিনি রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাঁহার পুত্রকেই রাজদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে—পুত্রও পিতার ত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। গ্রীকদিগের অন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইলে তিনিও যে সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন, এমন মনে হয় না। কারণ, গ্রীসে এখন অনেক দল—ভেনিজেলসের পক্ষ, ভেনিজেলসের বিপক্ষ, কনষ্টান্টাইনের পক্ষ, যুবরাজের পক্ষ, সোসালিষ্ট দল, কমিউনিষ্ট দল, অ্যানার্কিষ্ট দল। এই দলগুলির মধ্যে স্থির হইয়া রাজ্যশাসন সহজসাধ্য নহে।

গ্রীসের রাজা।

গ্রীকরা আপনাদের দুর্দ্দশার কারণ। আর যাঁহারা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া বা উৎসাহ দিয়া তুর্কীর রাজ্যাংশ হরণে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রীসের মিত্র নহেন—পরম শত্রু। অনেকে মনে করেন, মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ এই অপরাধে অপরাধী এবং সংপ্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে তিনি যে বক্তৃতায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার তুর্কবিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার ইংরাজ শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে বাহবা দিতে ত্রুটি করেন নাই। অথচ স্মার্ণার অগ্নিদাহের দায়িত্ব যে তুর্কদিগের নহে; পরন্তু কামাল তাঁহার সেনাদিগকে কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া কোনরূপ অনাচার হইতে বিরত করিবার জন্য ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রমাণ এখন পাওয়া গিয়াছে। সে কলঙ্কে তুর্করা কলঙ্কিত নহে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের সাহিত্যিক—রচনাশিল্পী—'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র গ্রন্থকার চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সংপ্রতি তাঁহার খাগড়ার (বহরমপুর) বাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইংরাজ কবি গ্রে যেমন তাঁহার একটি কবিতার জন্যই বিশ্ব-বিখ্যাত, চন্দ্রশেখরবাবু তেমনই তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন—তাঁহার সকল রচনাই তাঁহার নিজস্ব রচনারীতির গুণে মনোরম হইত। তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মত 'মসলা বাঁধা কাগজ' লিখিয়াছিলেন—তিনি 'সাহিত্যে' যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—তিনি 'বঙ্গবাসীতে' ও 'বসুমতীতে' প্রবন্ধ লিখিতেন—তিনি নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থ-সমালোচনা করিতেন—সে সবই তাঁহার রচনাবৈশিষ্ট্যে মনোরম। বঙ্কিমচন্দ্র রচনারীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন—'বঙ্গদর্শনে'র অনেক লেখকেরই রচনা তিনি সংশোধিত করিয়া দিতেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবুর রচনারীতিতে তিনি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচনায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতেন না।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখরবাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় বহরমপুরে। বহরমপুরে তখন বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী ছিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লালবিহারী দে তখন তথায় কলেজে অধ্যাপক, পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন নর্ম্মাল স্কুলে পণ্ডিত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন কলেজের শিক্ষক। আবার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তথায় উকীল, গঙ্গাচরণ সরকার বিচারক। 'ঐতিহাসিক রহস্যের' লেখক ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী বহরমপুরে। তাঁহারই বৈঠকখানায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কল্পনা পরিপুষ্ট হয়। চন্দ্রশেখরবাবু তখন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজের স্কুলে চাকরী লইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস বহরমপুর কলেজে চন্দ্রশেখরবাবুর সতীর্থ ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কয় মাস পরে তিনি 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রকাশ করেন। তাহাতে চন্দ্রশেখরবাবু ডিসরেলীর Curiosities of Literature অবলম্বন করিয়া 'বিদ্যাবিড়ম্বনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন। তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং তিনি লেখকের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন চন্দ্রশেখরবাবুকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লইয়া যাইলে আলাপের পর তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন—তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রকাশ করিবেন। চন্দ্রশেখরবাবু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তরুণ লেখকের পক্ষে তাঁহার এই কথা যে কত উৎসাহজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

আমরা তাঁহাকে তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচনার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

"তখন শোকাবেগে আপনার তৃপ্তির জন্য আপনি লিখিতাম। প্রথম প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায় ও আর কয়টি পুঁটিয়ায় লিখিত হয়। তখন আমি পুঁটিয়া স্কুলে মাষ্টারী করি। ছুটীর সময় বহরমপুরে আসিতে রাজসাহীর পথে আসিতে হইত। আসিবার সময় আমি শ্রীকৃষ্ণ দাসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতাম। সে বার সেই রচনার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবার জন্য খাতাখানি রাখিয়া দিলেন। আমি বহরমপুরে আসিলাম। ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ছাপাখানায় যোগ দেন। তিনি খাতা কলিকাতায় লইয়া যায়েন। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন ছাপাখানায় যাইয়া কোন রচনা তাঁহার কাছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়

শ্রীকৃষ্ণ আমার রচনার কথা বলেন। রচনাগুলি পাঠ করিয়া তিনি 'শ্মশানে' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ জন্য লইয়া গিয়াছেন। আমাকে না জানাইয়া প্রবন্ধ দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না, শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনিলে আমি, বোধ হয়, আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার কয় দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন, তিনি রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন—তবে পুস্তকখানি বড় স্বল্পায়তন হইবে, সুতরাং একটু বাড়াইলে ভাল হয়; আর আমি যদি বাড়াইতে চাহি, তবে যেন অতি শীঘ্র আর কিছু রচনা পাঠাই; কারণ, পুস্তক ছাপা আরব্ধ হইয়াছে। পত্র অপরাহ্নে পাইয়া রাত্রিতে 'শয়ন-মন্দিরে' লিখিতে বসি এবং পরদিন অপরাহ্নের মধ্যে উহা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

চন্দ্রশেখরবাবুর রচনায় ভাবের ও ভাষার সম্মিলন যেমন গঙ্গা-যমুনার সম্মিলনের মত লক্ষিত হইত, তেমনই বুঝা যাইত, তাহা অসাধারণ পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ছাড়া সংস্কৃতে ও ফরাসীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ফরাসী বিপ্লব বিষয়ক বিপুল সাহিত্য তিনি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এককালে আমরা আশা করিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার অধ্যয়নের ফলে বাঙ্গালীকে ফরাসী বিপ্লব-বিষয়ক একখানি মৌলিক পুস্তক দিবেন। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক আশাই আজ জাহ্নবীর কূলে চিতানলে শেষ হইয়া গেল। তিনি বাঙ্গালীকে যাহা দিতে পারিতেন—বাঙ্গালীর তাহা লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। সে দোষ কেবল তাঁহারই নহে। তাঁহার প্রতিভায় গৃহিণীপনা ছিল না—কিন্তু উকীল হইয়াও ওকালতী ত্যাগ করিয়া তিনি যে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সাহিত্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিলেও সাংসারিক হিসাবে আমরা যাহা পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করি, সাহিত্যের সেই পুরস্কার তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত হয় নাই—তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার মতও হয় নাই। হইলে, বোধ হয়, তিনি সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করিতে উৎসাহী হইতেন। তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সংগ্রামে তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বহরমপুরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব হইলে তিনি অভিমান করিতেন—"বুড়াকে ভুলিও না।" সাক্ষাতে কত আদর—আপ্যায়ন—কত কথা—কত গল্প, কত সাহিত্যালোচনা। আজ সে সব ফুরাইয়া গেল।

লজ্জার কথা—সাহিত্য-পরিষদ বা সাহিত্য-সম্মিলনও চন্দ্রশেখরবাবুকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বাণীমন্দিরেও যদি কাঞ্চনকৌলিন্যের আদর হয়, তবে সে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না।

চন্দ্রশেখরবাবু সাহিত্য-রসিক ছিলেন—তাঁহার রচনা রচনারীতির আদর্শ হইয়া থাকিবার উপযুক্ত। তিনি যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে সকল প্রবন্ধ ও তাঁহার আর সব প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া সংরক্ষিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ সঞ্চিত হইবে।

চন্দ্রশেখরবাবুর আর একটি গুণ অনেকে জানিতেন না। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক "টপ্পা" এখনও গায়িকাদের মুখে গীত হইয়া বাঙ্গালীর মনোরঞ্জন করে। সে সকলের মধ্যে এক একটি পদ যেন প্রবাদের মত হইয়া গিয়াছে—"বন পোড়ে সকলে দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না রে"—এ সব পদ পাকা হাতের রচনা।

সাময়িক সাহিত্যের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গে বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যিক প্রায় শেষ হইল—রহিলেন দুই যুগের সংযোগ-সেতু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চন্দ্রশেখরবাবুর সন্তান নাই—স্ত্রীও তাঁহার পূর্ব্বেই লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। শেষ-জীবনেও তিনি কেবল সাহিত্য-সাধনায় শান্তি সান্ত্বনা ও সুখ সন্ধান করিয়া আজ নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীকে যে সাহিত্য-সম্পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি; আর তাহাই

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গুরু-কা-বাগের ব্যাপারের সম্পর্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ড হইয়াছে। পুলিস তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩টি ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল :—

(১) ১১৭ ধারা (জনসাধারণের দ্বারা বা ১০ জনের অধিক লোকের দ্বারা কোন অপরাধ করণে সাহায্য দান)

(২) ১৪৩ ধারা (অবৈধ জনতাকরণ)

(৩) ১৪৭ ধারা (দাঙ্গা করা)

ম্যাজিষ্ট্রেট লালা বনওয়ারী লাল ১৪৭ ধারার দায়ে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া অপর ২ অভিযোগে তাঁহাকে যথাক্রমে ১ বৎসরের ও ৪ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম "অপরাধ" ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি আকাল তক্তে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় গুরু-কা-বাগে অবৈধ জনতা করা।

তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ—

তিনি প্রথমে বলেন, "এই যে ব্যাপার, ইহা কেবল শিখদিগেরই নহে; পরন্তু সকল সম্প্রদায়ের।"

তাহার পর আকালীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা তপ করিতেছ। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান তোমাদের সহিত একমত। ভগবান্ তোমাদিগকে এই তপের পুরস্কার দিবেন।"

তিনি বলেন—"শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতি আমাকে অনুমতি করিলে, আমার টেলিগ্রাম পাইলেই অনেক হিন্দু ও মুসলমান (তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে) আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা অহিংসায় অবিচলিত থাকিও। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।"

বিচারক প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন, আকালী শিখরা যে কায করিতেছে, তাহা অপরাধ। নচেৎ অপরাধে সাহায্য করার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অপরাধী বলা যায় না। বক্তৃতা করা স্বামীজী অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই বক্তৃতায় বিচারক অপরাধ পাইলেন কোথায়? যে পুলিস স্বামীজীকে চালান দিয়াছিল, সে পুলিস এই ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেও দাঙ্গা করার অপরাধে অভিযুক্ত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। অথচ 'পাইওনীয়ার' পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—শিখরা কোনরূপ বলপ্রকাশ করে নাই। তবে কে দাঙ্গা করিয়াছে, তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উক্তিতে যে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম লালা মুন্সী রাম। তিনিও ব্যবহারাজীব ছিলেন। কিন্তু সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া আর্য্যসমাজে যোগ দিয়া লোকসেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করেন এবং গুরুকুল সংস্থাপিত করিয়া তাহার কার্য্যে আত্মনিবেশ করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন সমগ্র ভারতে অসন্তোষ উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন তিনি কর্ত্তব্যবোধে গুরুকুল হইতে আসিয়া বিপদ্বহুল রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, দেশের এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন সন্ন্যাসীকেও রাজনীতিক্ষেত্রে আসিতে হয়। সেইরূপ সময়ে প্রয়োজন বুঝিয়াই তিনি—নির্ভীক সন্ন্যাসী—রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন। দিল্লীতে পুলিস যখন গুলী চালাইল, তখন চাঁদনীচকে ঘণ্টাঘরের কাছ হইতে উত্তেজিত জনতাকে স্বামীজী যখন শান্ত করিয়া আনিতেছিলেন, তখন সৈন্যদলের এক জন তাঁহাকে সঙ্গীনের খোঁচা মারিবে বলিয়া ভয় দেখায়। সন্ন্যাসী বক্ষের আবরণ সরাইয়া বুক পাতিয়া দিয়া বলেন "মার"। কিন্তু অহিংসার প্রভাবে পশুবলকে পরাভব মানিতে বাধ্য হইতে হয়—সৈনিক সঙ্গীনের খোঁচা মারিতে পারিল না। তাহার পর পঞ্জাবে যখন আগুন জ্বলিল, তখন তিনি নির্ভয়ে বিপদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই জন্য পঞ্জাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার শ্রদ্ধানত কৃতজ্ঞ দেশবাসী এই গৈরিকধারী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে বৃত করিয়াছিলেন।

আর এক দিনের কথা। সে দিন নবভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। সে দিন হিন্দু মুসলমানের মিলনে গঠিত নূতন জাতির গর্ব্বের দিন। দিল্লীতে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষিত হইয়া গিয়াছে—হিন্দু মুসলমানের রক্তে ভারতের পুণ্য ভূমি রঞ্জিত হইয়াছে। যে সকল মুসলমান দেশসেবায় পুরস্কারে মৃত্যুবরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য দিল্লীর জুম্মামস্‌জেদে—সাহজাহানের প্রতিষ্ঠিত ভারতের সর্ব্বপ্রধান

মস্‌জেদে প্রার্থনা হইতেছে। সে দিন সে মস্‌জেদে কেবল মুসলমানরা সমবেত। সেই সময় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ মস্‌জেদের দ্বারে উপস্থিত। মুসলমানরা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মস্‌জেদে লইলেন। তাহার পর যে দৃশ্য লক্ষিত হইল, তাহার তুলনা নাই। মস্‌জেদের কর্ত্তারা স্বামীজীকে প্রচারকের বেদীতে উঠিয়া বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন; ভারতের ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে, প্রথম অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানের মস্‌জেদের বেদীতে উঠিবার সম্মান লাভ করিলেন।

তাহার পর যখন তিনি মনে করিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, তখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্বকার্য্যে ফিরিয়া গেলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অহিংসনীতি কিরূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনেও পাইয়াছিলাম। "বয়কটে" ঘৃণার সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া তিনি মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত সর্ব্ববিধ বয়কটেও আপত্তি করিয়াছিলেন।

ইহাই যাঁহার পরিচয়—তিনি আজ লোককে অপরাধ করিতে সাহায্য করায় ও অবৈধ জনতা করায় "অপরাধী" স্থির হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ পাল

বর্ত্তমান বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পাল অনতিক্রান্ত যৌবনেই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি গত যুগের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের পুত্র। ধীরেন্দ্রনাথ উপন্যাস হইতে প্রত্নতত্ত্ব পর্য্যন্ত সাহিত্যের নানা বিভাগে কৃতিত্ব-পরিচয় দিয়াছিলেন। পুত্র যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক প্রতিভা পিতার নিকট উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি মাত্র ৮ বৎসর কাল সাহিত্যসেবার অবকাশ পাইয়াছিলেন এবং এই অল্পকালের মধ্যেই বহু উপন্যাস, নাটক, জীবনচরিত, শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে যতীন্দ্রনাথের বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নীকে ও শিশু দুইটিকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব?

যতীন্দ্রনাথ পাল।

কংগ্রেসের ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন

কংগ্রেস হইতে আইন অমান্য করিবার যোগ্যতা বিচার জন্য যে সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশিত হইল। এ দিকে কংগ্রেসের অধিবেশনকাল সমাগতপ্রায়। অধিবেশনের পূর্ব্বে সে রিপোর্ট প্রকাশিত না হইলে,

লোক কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কি না এবং প্রয়োজন হইলে তাহা কিরূপ হইবে—স্থির করিবার আবশ্যক সময় পাইত না। ইহার মধ্যেই এক দল ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের বিরোধী হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মত ও প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। অথচ রিপোর্টে প্রকাশ, যাঁহারা সমিতিতে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির এই অংশের পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। আমরা আগামী সংখ্যায় রিপোর্টের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিব।

বিলাতে নূতন মন্ত্রি-সভা

মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ যুদ্ধের সময় সমর সরঞ্জাম সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া বিলাতে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য সম্মিলিত মন্ত্রি-সভা গঠিত করিয়া এত দিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যেন তুর্কীর সঙ্গে আবার একটা যুদ্ধ বাধাইয়া আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পার্লামেণ্টে নূতন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

মিষ্টার বোনার ল।

হইবে। ইতোমধ্যে সম্রাটের আদেশে মিষ্টার বোনার ল প্রধান মন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত করিয়াছেন। মিষ্টার বোনার ল রক্ষণশীল। মন্ত্রি-সভায় কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, আমরা নিম্নে তাহা দেখাইয়া দিলাম :—

মন্ত্রিবর্গ

পুরাতন	নূতন
প্রধান মন্ত্রী—	
মিঃ লয়েড জর্জ্জ	মিঃ বোনার ল
কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট—	
মিঃ ব্যালফোর	লর্ড সলস্‌বেরী
লর্ড চ্যান্সেলার—	
ভাইকাউণ্ট বার্কেনহেড	ভাইকাউণ্ট কেভ
চ্যান্সেলার এক্সচেকার—	
সার রবর্ট হর্ণ	সার ষ্ট্যান্‌লী ব্যালড্‌ুইন
স্বরাষ্ট্র-সচিব—	
মিঃ এডোয়ার্ড শর্ট	মিঃ ব্রিজম্যান
পররাষ্ট্র-সচিব—	
লর্ড কার্জ্জন	লর্ড কার্জ্জন
ঔপনিবেশিক সচিব—	
মিঃ চার্চ্চিল	ডিউক অব ডেভনশায়ার
সমর-সচিব—	
সার ওয়ার্দিংটন ইভান্স	লর্ড ডার্বি
ভারত-সচিব—	
লর্ড পীল	লর্ড পীল
স্কটলণ্ডের মন্ত্রী—	
মিঃ মনরো	ভাইকাউণ্ট পোভার
নৌ-বিভাগের ফার্ষ্ট লর্ড—	
লর্ড লী	কর্ণেল এমারী
বাণিজ্য বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট—	
মিঃ ষ্ট্যানলী ব্যালড্‌ুইন	সার ফিলিপ লয়েড গ্রীন
স্বাস্থ্য সচিব—	
সার অ্যালফ্রেড মণ্ড	সার গ্রিফিথ বস্কোয়েন
কৃষি-সচিব—	
সার গ্রিফিথ বস্কোয়েন	সার রবার্ট স্যাণ্ডার্স
অ্যাটর্ণী জেনারেল—	
সার গর্ডন হিউয়ার্ট	মিঃ ডগলাস হগ

ইন্দিরা দেবী

গত দুর্গা পূজার নবমীর রাত্রিতে দশমী তিথিতে ৪২ বৎসর বয়সে বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিতা ইন্দিরা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। উপন্যাসপ্রিয় পাঠক-সমাজে ইন্দিরা দেবীর পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না—তাঁহার ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নাম সে সমাজে সুপরিচিত।

ইন্দিরা দেবী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র 'অনাথবন্ধু', 'সদালাপ' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম—সুরূপা; কিন্তু তিনি রাশি নাম "ইন্দিরা" তাঁহার সাহিত্যিক ছদ্মনামরূপে ব্যবহার করায় বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সেই নামেই পরিচিতা ছিলেন।

ইন্দিরা দেবী।

শৈশবে কোবিদ পিতামহের তত্ত্বাবধানে ইন্দিরা দেবীর শিক্ষা হয় এবং বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি পাঠকালে অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালা কবিতানুবাদ করেন। তাহার পর সংসারে গৃহিণীর ও জননীর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবসর-কালে তিনি সেই প্রতিভার অনুশীলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সব রচনা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সে সকল বাঙ্গালায় যে কোন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার সহিত তুলনায় আপনাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারে।

যাঁহারা তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভায় মুগ্ধ, তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনের কথা শুনিলেও মুগ্ধ হইবেন। হুগলীর উকীল শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহনের সহিত ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয়। তিনি গৃহে এমন গৃহিণী ছিলেন যে, তিনিই যে "লেখিকা ইন্দিরা দেবী", সে কথা তাঁহার বাড়ীর লোকও অনেক দিন পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। দেবরদিগকেও তিনি কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—সর্ব্বকনিষ্ঠ দেবর শৈশবে পিতৃহীন সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাতে গিয়াছেন। ইন্দিরা দেবী কিছু দিন হইতেই রোগভোগ করিতেছিলেন। বৌদিদির পীড়া শঙ্কাজনক হইয়াছে জানিয়া তিনি দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইন্দিরা দেবীর অনুরোধেই তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য-সংবাদের টেলিগ্রাম পাওয়া যায়। সংবাদ শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন—"এইটুকু জান্‌বার জন্যই বেঁচে ছিলাম।"

তিনি দীর্ঘকাল রোগ-যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহার চিত্তের প্রশান্ত ধৈর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রোগ, শোক, যাতনার মধ্যে তিনি তাহার হৃদয়ের ভাব মর্ম্মস্পর্শী কবিতায় লিখিয়াছিলেন:—

"বেদনা যদি প্রদান, প্রভু, ক্ষমতা দিও সহিবার;
আমারে তুমি যোগ্য কর তোমার বাণী বহিবার।

অনল দিয়ে পোড়ায়ে মাটী,
আমারে যদি কর গো খাঁটি,
তোমায় শুধু আমারে দিও, আপন জন কহিবার।

*　　*　　*　　*

সলিলে ধোয়া কয়লা কভু,
ময়লা তা'র ছাড়ে না প্রভু,—
স্বর্ণ সম কঠিন কর, অনলদাহে দহিবার।"

তিনি রোগের কণ্টকশয়নে শয়ন করিয়া তাঁহার শেষ উপন্যাস 'প্রত্যাবর্ত্তন' শেষ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক না হইলে কেহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে—মৃত্যুর ছায়া নিবিড় হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি করিয়া সেই অবস্থায় এমন ভাবে সাহিত্য-সাধনা করিতে পারে না।

তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রত্যাবর্ত্তন' বাদ দিলে 'স্পর্শমণি'ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে 'স্পর্শমণি'র সহিত একাসনে স্থান পাইবার মত পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। অকালে ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইন্দিরা দেবীর তিন পুত্র ও তিন কন্যা।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

পরিণত বয়সে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তিরোভাব হইয়াছে। প্রতাপবাবু হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং স্বদেশের মত বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। আমেরিকার সিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনীতে চিকিৎসক-সম্মিলনীতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহাকে এম, ডি, উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্বয়ং ডাক্তার ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার অন্যতম জামাতা ছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণকে তাঁহাদের এই শোকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

প্রবেশ নিষেধ

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে সপরিবারে কাশ্মীরভ্রমণে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা—পাটনা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ। কাশ্মীর দরবার চিত্তরঞ্জনকে নিঃসঙ্কোচে রাজ্যমধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন নাই এবং প্রফুল্লরঞ্জনও "এক যাত্রায় পৃথক ফল" উচিত নহে, মনে করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করেন নাই—ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়েন নাই; আমাদের বিশ্বাস, তিনি ইঙ্গিত করিলে ভারত সরকার আজই সাগ্রহে তাঁহাকে মিনিষ্টারী বা মেম্বারী দিয়া তাঁহাকে "হাত করিবার" চেষ্টা করিতে বিলম্ব করিবেন না। তাঁহার গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে গভর্ণরের সহিত তাঁহার অনেকবার সাক্ষাৎও হইয়াছে। অথচ কাশ্মীর দরবার ভয় পাইলেন—তিনি রাজ্যমধ্যে পদার্পণ করিলে তথায় জাফ্রাণের ক্ষেত্রে অসন্তোষের ফুল ফুটিয়া উঠিবে এবং সে ফুলে রাজদ্রোহের বিষফল ফলিবে। কাশ্মীর দরবার আপনার বুদ্ধিতে এই কায করিয়াছেন, কি অন্য কাহারও ইঙ্গিতে করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের এই কাযেই বুঝা যায়—কি জন্য বড় লাট ছাপাখানা আইন করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে আশ্রয়দানের জন্য অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাবের শাসনেই কি দেশে অসন্তোষের বীজ নষ্ট হইয়া সন্তোষের ফসল ফলিবে? আর এইরূপ যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করাও কি সংবাদপত্রের অপরাধ হইবে?
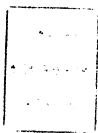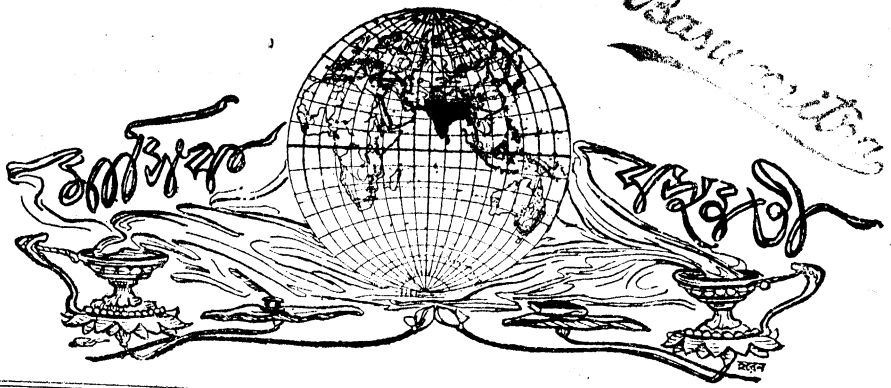
১ম বর্ষ } ২য় ✽ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ✽ খণ্ড { ২য় সংখ্যা

রসায়ন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে রসায়ন-শাস্ত্রই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে জাতির রাসায়নিক উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক আয়ত্ত, সেই জাতিই অবশেষে যুদ্ধজয়ী হইয়া থাকে। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী হইতে জার্ম্মাণ জাতি রসায়ন-শাস্ত্রে এবং ইহার ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য; এ বিষয়ে তাঁহারা অতীব বিস্ময়কর ফললাভ করিয়াছেন। নয়নমুগ্ধকর রঙ্-সমূহ তাঁহারা কয়লা হইতে উৎপন্ন আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রঙের ব্যবসায়েই তাঁহাদের কোটি কোটি টাকা লাভ হইতেছে। তদ্দেশীয় রাসায়নিকগণের কার্য্য-কুশলতা-প্রভাবেই তাঁহারা এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে; যুদ্ধ-ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যেই জার্ম্মাণীকে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শান্তি-ভিক্ষা করিতে হইত। নাইট্রিক্ এসিড যুদ্ধোপকর্ম্মের একটি প্রধান উপাদান। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দেশস্থ চিলি হইতে আনীত সোরার দ্বারা উহা প্রস্তুত করা হইত। যুদ্ধের সময় ইংরাজরা সোরার সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলে, জর্ম্মাণ রাসায়নিকরা নাইট্রিক এসিড তৈয়ার করিবার অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা বায়বীয় অক্সিজেন্ এবং নাইট্রোজেন্ হইতে প্রভূত পরিমাণ নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই আবিষ্কারের ফলেই তাঁহারা ৫ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পর্য্যন্তও যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রসায়ন-শাস্ত্র কেবল ধ্বংসই শিক্ষা দেয় না; মানুষেরও প্রভূত পরিমাণে উপকার করিয়া থাকে। ডিনামাইটের দ্বারা যেমন ধ্বংসসাধনও হয়, তেমনই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে এবং পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গাদি প্রস্তুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অস্ত্র-চিকিৎসায় ঈথার এবং ক্লোরোফর্ম্ম মানুষের চৈতন্য লোপ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলিসংবলিত ঔষধসমূহও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সত্য সত্যই রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত চিকিৎসা-শাস্ত্র চলিতে পারে না। এ কথা প্রাচীন ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। "রাসায়নঞ্চ তজ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরা-ব্যাধি-বিধ্বংসি ভেষজম্"—অর্থাৎ যে সমস্ত ঔষধ রোগ-নিবারক এবং যাহা জরামরণ-নিবারণ করিয়া যৌবন আনয়ন করে, তাহাই রসায়ন. এবং যে শাস্ত্রে এই সমস্ত ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করে, তাহাকে রাসায়ন-শাস্ত্র বা রসায়ন-বিদ্যা বলে। প্রাচীন তন্ত্র-সমূহে ('রসার্ণব' ও 'রসহৃদয়') লৌহ, পারদ এবং অন্যান্য ধাতুঘটিত ঔষধের নানাবিধ প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমূহে পারদ-ঘটিত ঔষধের দীর্ঘজীবন আনয়নের গুণ বিশেষরূপে কীর্ত্তিত আছে। খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

যুরোপ যখন কুসংস্কারান্ধকার ও অজ্ঞানতসমাচ্ছন্ন, এ দেশে তখন রসায়ন-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মৎ-প্রণীত "হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে" এই বিষয়ে প্রাচী ও প্রতীচীর তুলনা করিয়াছি। 'রসার্ণব' এবং অন্যান্য রাসায়নিক তন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত সময়ে ব্যবহারিক রসায়ন-শাস্ত্রে আমাদের দেশ যুরোপ অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তুঁতে (Copper sulphate, blue vitriol) এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ হইতে তাম্র এবং Calamine হইতে দস্তা বহির্গত হয়, ইহা এ দেশে উত্তমরূপ জানা ছিল। অগ্নি-শিখায় রঙ-দর্শনে খনিজ দ্রব্যের ধাতু-স্থিরীকরণ বিধাও উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত ধাতু-নিষ্কাশনপ্রণালী এমন সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, উহা কোনওরূপে পরিবর্ত্তিত না করিয়া আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এ দেশে ঔষধ প্রস্তুতকরণে আরও অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুই হাজার বৎসর অথবা আরও কিঞ্চিদধিক কালের জন্য চরক এবং সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ গ্রন্থরূপে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে। দেবমুখনিঃসৃত বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়ই হউক, বা হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত চরিত্রগুণে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হউক, এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বচনের আশঙ্কা নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, ডাক্তার হর্ণেলের সম্পাদিত বোয়ার-হস্তলিপিতে অধিকাংশ ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণের সহিত সুশ্রুত ও চরকের প্রস্তুত-প্রণালীর বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, কোন কোন স্থানে অবিকল নকল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যথা চ্যবনপ্রাশ। আমীর আলির "আরবরা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা ও নব্য ঔষধালয়ের স্থাপয়িতা,"—এ উক্তির সারবত্তা কিছুই নাই। কেবল যে আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণই রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; লৌহ, তাম্র প্রভৃতি "হীন" ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যযুগে যুরোপেও এই প্রকার transmutation of base metals into gold ব্যাপারে অনেকে মস্তিষ্কচালনা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাসায়নিক তন্ত্র হইতে এই বিষয়ে পাঠকবর্গের কৌতূহলোদ্দীপক কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বর্ণ বা সুবর্ণতন্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; * ইহার পাণ্ডুলিপি আমি কাশী ও ঢাকা রমনাকালীর মঠ হইতে সংগ্রহ করি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই—পরশুরাম কশ্যপ ঋষিকে ভূমিদান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অনাহারে মারা যাইতেছেন। এই জন্য তন্ত্রের স্রষ্টা মহাদেবকে কহিতেছেন,—

"ভূমিদানং ময়া দত্তং ঋষয়ে কশ্যপায়।"

* * *

ভক্ষণং দেহি মে দেব যদি পুত্রোঽস্মি শঙ্কর॥"

এই জন্য মহাদেব সুবর্ণের প্রক্রিয়া বলিয়া দিতেছেন,—পারদকে এমন অবস্থায় পরিণত করিবেন যে, তাহার সংস্পর্শে অষ্টধাতু সুবর্ণ হইয়া যাইবে।

"অষ্টধাতুষু তং সূতং দত্ত্বা কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ।"

শুধু তাহাই নহে, এই গুণবিশিষ্ট পারদ ভক্ষণ করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। আবার শুধু তাহাও নহে, যিনি এইরূপ অমরত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার মূত্র ও বিষ্ঠার সংস্পর্শে তাম্রও কাঞ্চন হইবে।

"তস্য মূত্রপুরীষেষু শুল্বং ভবতি কাঞ্চনম্।"

স্বর্ণতন্ত্র হইতে আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে, ইহা পাঠে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, প্রতিপাদ্য বিষয় কি প্রকার।

"শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি রহস্যাতিরহস্যকম্।
স্বর্ণ-তন্ত্রাভিধং তন্ত্রং কল্পরূপেণ কথ্যতে॥ ১০॥
তত্রাদ্যং স্বর্ণতন্ত্রস্য কল্পং শৃণু সুপুত্রক।
তৈলকন্দাভিধঃ কন্দঃ সিদ্ধকন্দঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১॥
কন্দঃ কমলবত্তস্য পত্রাণি বজ্রবচ্ছিশো।
তথৈব তু মহৎ পত্রং তৈলং স্রবতি সর্ব্বদা॥ ১২॥
জলমধ্যে সদা পুত্র স্বর্জ্জ এষ প্রতিষ্ঠতে।
বিষকন্দেতি বিখ্যাতো বিষাচ্চ কায়নাশনঃ॥ ১৩॥
তৈলস্রাবী মহাকন্দঃ পরিতস্তৈলবজ্জলম্।
দশহস্তমিতে দেশে সরতে তৈলবজ্জলম্॥ ১৪॥
মহাবিষধরঃ পুত্র তদধো বসতি ধ্রুবম্।
কন্দাধঃ কন্দচ্ছায়ায়াং নান্যত্র গচ্ছতি প্রিয়॥ ১৫॥
তৎপরীক্ষাবিধানার্থং কন্দে সূচীং প্রবেশয়েৎ।
সূচীস্রাবঃ ক্ষণাৎ পুত্র তৎ কন্দস্ত সমাহরেৎ॥ ১৬॥

তৎ কল্কং তু সমাদায় শুদ্ধসূতং খল্বে ত্রিধা।
মূষায়াং নিক্ষিপেৎ তস্য তৈত্তৈলং তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥
দীপ্তাগ্নিঃ তু মহারাম বংশাঙ্গারেণ দাপয়েৎ।
তৎক্ষণ মৃতিমায়াতি লক্ষ্যবেধী ভবেৎ সুত ॥ ১৮ ॥
ততঃ প্রভক্ষয়েদ্রাম ক্ষুন্নিদ্রাহারকো ধ্রুবম্।
তালং শুদ্ধং সমানীয় তৈত্তৈলেন খলেৎ সুত ॥ ১৯ ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

সর্ব্ববেধী ভবেদেব শতবিদ্ধো ভবেৎ সুত।
তৈত্তৈলং তু সমাদায় তাম্রদ্রাবে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২২ ॥
তৎক্ষণাত্তাম্রবেধঃ স্যাৎ দিব্যং ভবতি কাঞ্চনম্।
বঙ্গে কাংস্যে যদা দদ্যাৎ তদা রৌপ্যং ভবেৎ সুত ॥ ২৩ ॥
তাম্রে লৌহে তথা রীত্যাং তারে খর্পর সূতকে।
তৎক্ষণাৎ বেধমায়াতি দিব্যং ভবতি কাঞ্চনম্ ॥ ২৪ ॥

স্বর্ণীকরণ বিষয়ে বা পরশপাথর প্রস্তুতকরণে রুদ্রযামল তন্ত্রেও অনেক মজার কথা আছে। এ তন্ত্রখানি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ও প্রামাণিক। কিন্তু "ধাতুক্রিয়া" নামে ইহাতে একটি অধ্যায় আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে। ইহা তন্ত্রভুক্ত, অতএব ধরিয়া লইতে হইবে, মহাদেবমুখনিঃসৃত।

কিন্তু লেখক "ধরা" দিয়াছেন। ইহাতে ফিরঙ্গ ও রুমদেশের কথা রহিয়াছে। পর্ত্তুগীজরা প্রথম ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়া অঞ্চলে ছাউনি সংস্থাপন করেন এবং সেই অবধি ইঁহারা এবং ইঁহাদের বংশধরগণ ফিরঙ্গ নামে অভিহিত হইতেছেন। সুতরাং এই প্রক্ষিপ্ত অংশের সময় নির্ণয় করা সহজ। এই "ধাতুক্রিয়া" হইতে পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কৈলাস-শিখরে এক দিন পার্ব্বতী দয়াপরবশ হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে কহিতেছেন, "প্রভো, মর্ত্ত্যলোকে মানুষ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইয়া অনেক সময় বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করে। তাহাদের সুবিধার্থ এমন কিছু উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন, যাহাতে তাহারা স্বল্পমূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে পারে।" এই জন্য "হীন-হেম" করিবার ব্যবস্থা মহাদেব দিতেছেন,—

"ভুক্তিতে হীনহেমেন জায়তে ক্রয়বিক্রয়ঃ।
অনেনৈব প্রকারেণ জায়তে ধনসম্পদঃ ॥"

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই প্রক্রিয়া প্রচলনের উপদেশ দিলে, এখন পুলিসের শুভ-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইবে।

দুঃখের বিষয়, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে এ বিষয়ে অবনতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপের জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জ্ঞান-প্রদীপ নিবিয়া যায়। এখন আর অতীতের স্মৃতি লইয়া গৌরব করিলে চলিবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথায় য়ুরোপের উন্নতিশীল জাতিদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় মোটেই দাঁড়াইতে পারিব না; এমন কি, আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকার রসায়নাগারে অসংখ্য রসায়নবিৎ (রাসায়নিক) পণ্ডিত প্রাণপণে একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিতেছেন এবং প্রত্যহই কোন না কোন বিষয়ের নূতন আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ঐ দুই মহাদেশের তুলনায় আমাদের এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে সেরূপ আগ্রহশীল রাসায়নিকের সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে পাঁচ ছয় জনের অধিক হইবে না। অতএব আমাদিগকে বহু শতাব্দীর আলস্য ও জড়তা পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্ম-পথে ধাবিত হইতে হইবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পেশবার শিকারখানা।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ লিখিয়া গিয়াছেন, শিবাজীর অষ্টাদশ কারখানার মধ্যে একটির নাম শিকারখানা। কেবলমাত্র নাম হইতে ইহার স্বরূপ বুঝা যায় না। কিন্তু পেশব্যাঞ্চী বখরের গ্রন্থকার কৃষ্ণাজী বিনায়ক সোহনী পেশবার শিকারখানার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেকালের শিকারখানাটা ছিল কতকটা একালের চিড়িয়াখানা বা পশুশালার অনুরূপ। সোহনীর গ্রন্থে আছে যে, পেশবার শিকারখানায় ছিল—মানুষের কথার অনুকরণদক্ষ সাত আটটা বাঙ্গালা দেশের ময়না, গোটাকয়েক টিয়া, ঝুঁটিওয়ালা ভরত পক্ষী বা চণ্ডোল, গোটাকয়েক হাঁস, পানকৌড় আর পাঁচ দশ জোড়া ময়ূর। পাখীর তালিকা এইখানেই শেষ। কৃষ্ণসার ও হরিণী মিলিয়া মৃগ ছিল প্রায় দুই শত। কাল, হল্‌দে ও রঙ বেরঙের শশক ছিল পাঁচ সাত শত। পার্ব্বতীর পথের ধারে বাগানের মধ্যে একটি পুকুরের পাড়ে গৃহরচনা করিয়া শশকগুলি রাখা হইয়াছিল। শিকারী জন্তুরও সেখানে অসদ্ভাব ছিল না। দুই চারিটা চিতা, দশ বিশটা বাঘ পার্ব্বতীতে বড় বড় ঘরের মধ্যে মোটা লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ঘরগুলির চারিদিক খোলা। আর সেখানে ছিল ছোটখাটো একটা ঘোড়ার মত উঁচু, একেবারে হরিদ্রা একটা ভয়ানক বাঘ, তাহার নাম শম্ভু বাঘ। কালরঙ্গের চিহ্নও নাই, এমন বাঘ আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। সুতরাং পেশবার পশুশালার এই একটা জানোয়ার যে বাস্তবিকই দর্শনীয় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে গণ্ডার পাওয়া যায় না। ইংরাজ শিকারীর রাইফেলের গুলীতে হিন্দুস্থানের গণ্ডারের সংখ্যাও এখন কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু হিমালয়ের নিকটস্থ জঙ্গলে একসময় অনেক গণ্ডার ছিল। মহাদজী সিন্ধিয়া পেশবার শিকারখানার জন্য হিন্দুস্থান হইতে গোটা কয়েক গণ্ডার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কয়টা পাঠাইয়াছিলেন, সোহনী তাহা লেখেন নাই।

এতগুলি জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পক্ষী, হরিণ, শশক, ব্যাঘ্র ও গণ্ডারের পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত ছিল। মাঝে মাঝে পেশবার দিগ্বিজয়ী সেনানায়কগণ দেশে ফিরিবার সময় উপহার দিবার জন্য বিজিত দেশ হইতে নানাবিধ পশুপক্ষী লইয়া আসিতেন। এই ভাবে পার্ব্বতী শৈলের জীবনিবাসের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি হইত, পেশবার শিকারখানারও বাহার বাড়িত।

শিবাজীর শিকারখানায় কি কি জানোয়ার ছিল, শিকারখানার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এতদিন পরে জানিবার উপায় নাই, মারাঠী গ্রন্থে তাঁহার জীবনিবাসের সন্ধান পাওয়া যায় না, ইংরেজ লেখকগণও ইহার খবর অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পেশবার শিকারখানাটাও বোধ হয় ঐরকমই একটা কিছু ছিল। যাঁহারা আবুল ফজলের অমর গ্রন্থের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত, তাঁহারাই জানেন যে, দিল্লীশ্বর আকবর চিতা পুষিতেন, বাঘ পুষিতেন, শিকারী বাজ পুষিতেন, অনেক জানোয়ার তাঁহার জীবনিবাসে ছিল; হরিণ প্রভৃতি সুন্দর পশুর ত কথাই নাই। এই সকল জানোয়ারের জন্য বাদশাহের ভাণ্ডার হইতে অনেক টাকা খরচ হইত। আবার মিরশিকার পদবীধারী তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ছিল। বাদশা হাতীর লড়াই, হরিণের লড়াই দেখিতে ভালবাসিতেন, শিকারী বাজ, শিকারী চিতা লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন, সেই সকলের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতেন মিরশিকার। আগের ও পরের, বাদশার ও পেশবার পশুশালার প্রকৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, বাক্‌পটু ময়না ও টিয়া না থাকুক, মনোহর হরিণ ও হরিণী না থাকুক, শ্বেত, কৃষ্ণ পীত ও চিত্রবিচিত্র শত শত শশক না থাকুক, দক্ষিণাত্যে সুদুর্ল্লভ গণ্ডার না থাকুক, শিবাজীর বোধ হয় দুই একটা শিকারী বাজ ও শিকারী চিতা ছিল। অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে মৃগয়া করিবার অবসর তাঁহার হইত কি না, জানি না; বোধ হয়, হইত না। কিন্তু মুকুটধারী নরপতিদিগকে শুদ্ধ সম্ভ্রমের জন্য অনেক ঠাট বজায় রাখিতে হয়। সে কালের রাজা বাদশারা অবসরকালে শিকার করিতেন, জানোয়ারের লড়াই দেখিতেন। তাই শিবাজীও, বোধ হয়, মুঘল বাদশাহের অনুকরণে একটা শিকারখানা গড়িয়াছিলেন, দুই দশটা চিড়িয়া ও জানোয়ার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আর সেই হইতেই মহারাষ্ট্রে শিকারখানার ফ্যাসান পেশবা যুগের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।

সোহনীর গ্রন্থে পেশবার পশুশালার সকল জীবের নামের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও বাসগৃহের অবস্থা সম্বন্ধে সোহনী কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল পশুশালার গুটিকয়েক পশুপক্ষীর নাম করিয়াছেন, সংখ্যার বেলায় দশ বিশ, শ' দুই শ', পাঁচ সাত প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া কায সারিয়াছেন। ছিলেন পরশরাম ভাউ পটবর্দ্ধন, এবং পটবর্দ্ধনের সাহায্য করিতে ইংরাজপক্ষ হইতে কাপ্তেন লিটল ছোট একটা পল্টন লইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহারা পুনার পথে যায়েন নাই। তাই পেশবার রাজধানী দেখিবার সুযোগ ও অবসর তখন তাঁহাদের হয় নাই। ফিরিবার পথে তাঁহারা পুনায় আসিয়া কিছু দিন ইংরাজ দূত সার চার্লস ম্যালেটের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা পুনা নগরের যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া গিয়াছিলেন।
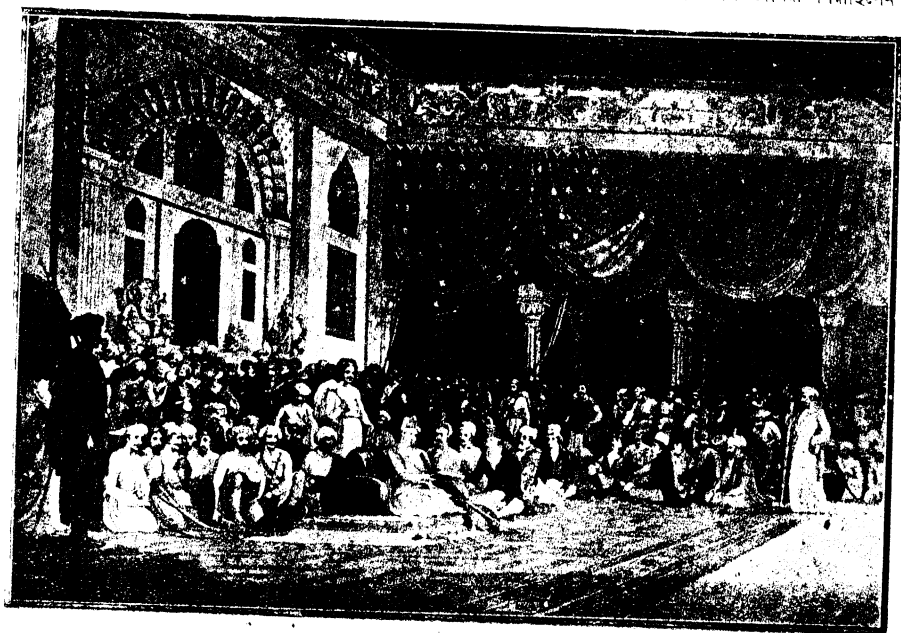
পেশবার দরবার।

জীবনিবাসের জন্য অনেকগুলি চাকর রাখবার কথার উল্লেখ করিয়াছেন, আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু কয়েক জন ইংরাজ লেখকের গ্রন্থে পেশবার শিকারখানার সংবাদ আরও একটু পাওয়া যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে মহীশূরের শার্দ্দূল টিপু সুলতানের সহিত যখন ইংরাজসরকারের যুদ্ধ হয়, তখন পেশবা ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে মারাঠাদিগের অন্যতম সেনাপতি পেশবার শিকারখানাও বাদ যায় নাই। কাপ্তেন লিটলের অভিযানের বিবরণ তাঁহারই এক জন সহকারী, লেপ্টেনাণ্ট মুর, লিখিয়া গিয়াছেন। মুরের গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং বহিখানা এখন বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে পেশবার শিকারখানার অতিক্ষুদ্র একটি বিবরণ আছে। মুর লিখিয়াছেন :—

"The Peshwa has a menagerie of wild animals, but it is not a large, nor a very select

collection. It consists of a rhinoceros, a lion, several royal tigers, leopards, panthers and other animals of the cat kind.—An extraordinary camel is by far the most curious creature in the collection; it is of that species called, we believe, the Bactrian camel and has two humps of such unweildy dimensions, that when lying down it cannot easily rise, from their enormous weight: It is quite white, with very long hair, a characteristic of its species,, about its head and neck. The animal is of course a lufus natura. It was as well as the rhinoceros, we learned, a present from Scindia. The lynx is a delicate animal, called in India and Persia, from its black ears seeahgosh. Sir Charles Matet has all these animals, with others, represented in clay by a Brahmin, who has great merit in his modellings the placid serenity of the camel and the ferocious confidence of the tiger he is happy in hitting."

লিঙ্কস্ জানোয়ারটা ক্ষীণকায়, ইহার কানের রং কাল বলিয়া ভারতবর্ষে ও পারস্যে ইহাকে সিয়াগোস (কালকান) বলে। সার চার্লস ম্যালেট এই সকল জানোয়ারের মাটীর মূর্ত্তি এক জন মূর্ত্তিনির্ম্মাণনিপুণ ব্রাহ্মণ শিল্পীর দ্বারা তৈয়ার করাইয়াছেন। উটের প্রশান্ত গম্ভীরভাব আর বাঘের হিংস্র আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটি বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

সোহনী সিংহের নাম করেন নাই, সেটা বোধ হয় তাঁহার গ্রন্থরচনার পরে আমদানী হইয়াছিল। আর সেই একছের
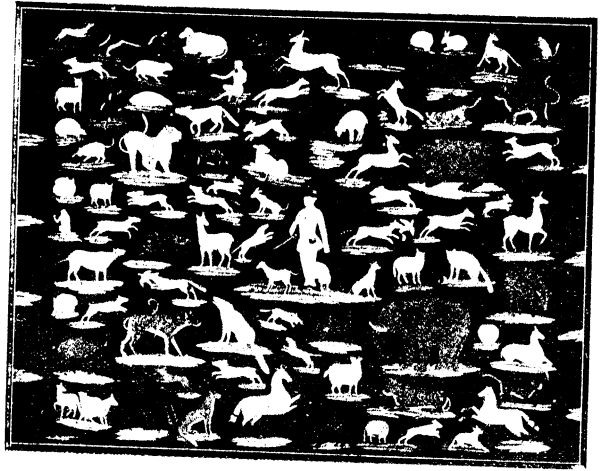
পেশবারে প্রাণিশালা।

পেশবার একটি পশুনিবাস আছে, কিন্তু তাহার জীবসংগ্রহ তেমন বড়ও নয়, ভালও নয়। এই পশুশালায় একটা গণ্ডার, একটা সিংহ, গোটাকয়েক বড় বাঘ (Royal Bengal Tiger), চিতা, গুলবাঘ ও বিড়ালবর্গের অন্যান্য জানোয়ার আছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জন্তু একটা উট। আমার বিশ্বাস, যাহাকে বক্ট্রীয় উট বলে, এইটি সেই জাতীয়; পিঠের উপর মস্ত বড় ও বেজায় ভারী দুইটা কুজ, শুইলে সেই কুজের ভারে উটটা আর সহজে দাঁড়াইতে পারে না। পশুটির গায়ের রং একেবারে শাদা, মাথার ও গলার ধারে লম্বা লম্বা লোম,—যেমন এই জাতীয় উটের থাকে। জন্তুটার বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য লুফাসনেটুরা। আমরা শুনিলাম যে, এই উট আর গণ্ডারটা সিন্ধিয়ার উপহার।

হলুদে বাঘটা লেপ্টেনাণ্ট মুর দেখিতে পায়েন নাই; দেখিলে অমন আশ্চর্য্য জানোয়ারের কথা নিশ্চয়ই লিখিয়া যাইতেন। সোহনী বলেন, সিন্ধিয়া পেশবার শিকারখানায় গোটাকয়েক গণ্ডার পাঠাইয়াছিলেন; মুর দেখিয়াছিলেন কেবল একটা গণ্ডার। বাকী গণ্ডারগুলি আর শম্ভু বাঘ, বোধ হয়, মুরের পুনায় আগমনের পূর্ব্বেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সার চার্লস ম্যালেটের নিকট পুনার সেই ব্রাহ্মণ শিল্পীর নির্ম্মিত বাঘ, সিংহ, হাতী, শশক, গণ্ডার প্রভৃতি ছোট বড় যে সকল জানোয়ারের মৃন্ময় মূর্ত্তি ছিল, সেইগুলিকে এক যায়গায় সাজাইয়া, মাঝখানে ম্যালেটকে দাঁড় করাইয়া এক জন ইংরাজ চিত্রকর, বোধ হয় ওয়েলস্, একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত

পারসনীস তাঁহার সদ্য প্রকাশিত Poona in Bygone Days বা অতীতকালের পুনা নামক গ্রন্থে এই চিত্রের একখানি সুন্দর প্রতিলিপি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

লেপ্টেনাণ্ট মুর পেশবার শিকারখানা দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সার চার্লস ম্যালেটের এই জীবনিবাসটি বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি কয়েকটি পশু ও পাখী এই চিড়িয়াখানায় উপহার দিয়াছিলেন। ম্যালেটের আর এক জন ইংরাজ অতিথি কিন্তু পেশবার শিকারখানার খুব তারিফ করিয়াছেন। তিনিও মুরের ন্যায় যুদ্ধব্যবসায়ী, তাঁহার নাম মেজর প্রাইস। তিনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে পুনায় গিয়াছিলেন। মেজর প্রাইসের মূল গ্রন্থ আমি দেখি নাই, রাও বাহাদুর পারসনীসের পুস্তক হইতে প্রাইসের মন্তব্যের সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"পার্ব্বতী শৈলমূলে অবস্থিত পেশবার পশুশালা কতিপয় বন্ধুর সহিত দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান দেখিয়া মনোভাব যেরূপ হইয়াছিল, পুনায় অবস্থিতিকালে আর কিছু দেখিয়া সেরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। এই পশুশালায় তখন গুটিকয়েক চমৎকার জানোয়ার ছিল, আমি উহা অপেক্ষা সুন্দর জানোয়ার দেখি নাই। একটা সিংহ ও একটা গণ্ডারের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্য বোধ হয় তাহাদের অরণ্যবাসেও ইহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারিত না। জঙ্গলের মালিক জানোয়ারের রাজার চেহারাটি তাহার পদমর্য্যাদার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাহার দেহটি মাংসল, শরীর সুপরিচ্ছন্ন, ললাট প্রশস্ত ও বৃহৎ, দেখিলেই মনে হয়— শক্তির ও মহিমার একটি জীবন্ত ছবি, সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে ইহার তুলনা নাই। সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ নহে, একটি খোলা চালার নীচে মৃত্তিকায় প্রোথিত দণ্ডের সহিত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। চারিদিকেই খোলা, তাই খাঁচার ভিতরে রাখিলে যেমন দুর্গন্ধ হয়, এখানে তাহা নাই। পশ্চাতের পদদ্বয়ে দেহভার ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট এই বিরাট পশু তাহার বিশাল বক্ষ ও সম্মুখের বাহু আমাদিগের দিকে প্রসারিত করিয়া এমন নিরুদ্বিগ্ন ঔদাসীন্যের সহিত তাহার এই অদৃষ্টপূর্ব্বপরিচ্ছদপরিহিত নবাগত শ্বেত দর্শকদিগকে দেখিতেছিল যে, আমাদের মনে সত্য সত্যই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল।

"সিংহের নিকটেই তাহারই মত খোলা ঘরে, তাহারই মত লোহার শিকলে বাঁধা একটা গণ্ডার। এমন চমৎকার গণ্ডার ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও আমি দেখি নাই। আলগা চামড়ার বিরাট ভাঁজে ভাঁজে ঢাকা কিম্ভূতকিমাকার যে সকল জানোয়ার সচরাচর দেখান হয়, এ গণ্ডারটা মোটেই সে রকম নয়। এই বিরাট পশুর সুপরিপুষ্ট দেহের চর্ম্মের মত বহিরাবরণ যেন ভিতরের মাংসের চাপে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। জানোয়ারটা মদের পীপার মত গোলগাল, কিন্তু ছোট একটা শূকরের ছানার মতই চঞ্চল। রক্ষকের লাঠির মৃদু স্পর্শের ইঙ্গিতে যখন গণ্ডার পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়া একেবারে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তখন ইহার তৎপরতা আমাকে বাস্তবিকই বিস্মিত করিয়াছিল। তখন সরু দিকের উপর খাড়া করা একটা মদের পিপার সহিত এই গণ্ডারের উপমা না দিয়া আমি থাকিতে পারি নাই। যাহাই হউক, এই বিশালকায় পশুর ক্ষিপ্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ইহার ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি যেন জীবনের প্রেরণায় পরিপূর্ণ। ঠোঁটের উপরের খড়্গ তখনও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু বক্রাগ্র দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ বিরাট দেহের সম্পূর্ণ বল দিয়া আঘাত করিলে তাহার ফল কি ভয়ানক হয়, তখন গণ্ডারের নিকট মহাবল হস্তীর পরাভবের যে কাহিনী শুনা যায়, তাহাতে আর অপ্রত্যয় হয় না। এই লাইনেই গোটাকয়েক বাঘ ও অন্যান্য জানোয়ার ছিল, কিন্তু ইহাদের তুলনায় তাহারা দর্শনের অযোগ্য, ইহাদের পার্শ্বে তাহাদিগকে নগণ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

প্রাইসের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, পেশবার পশুশালায় রক্ষিত সিংহ ও গণ্ডারটির স্বাস্থ্য অব্যাহত ছিল। জীবনিবাসের রক্ষকদিগের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কারণ, বন্দী শ্বাপদের স্বাস্থ্যহানি সামান্য অযত্নেই হইতে পারে। প্রাইসের বিবরণ হইতে আরও জানা যাইতেছে, জীবনিবাসের গৃহগুলি সুপরিচ্ছন্ন ছিল ; কারণ, সিংহের ঘরেও তিনি শুকারজনক দুর্গন্ধ পায়েন নাই। আর, বোধ হয়, পশুপালনকারী তাহাদের রক্ষিত জন্তুগুলিকে ভালবাসিত, আদর করিত ; তাহা না হইলে রক্ষকের লাঠির মৃদুস্পর্শে গণ্ডার ঠিক সার্কাসের গণ্ডারের মত দুই পা তুলিয়া দাঁড়াইবে কেন ?

সিংহ, বাঘ, চিতা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলি লোহার শিকলে

বাঁধা থাকিত, কিন্তু নিরীহ হরিণ-হরিণীদিগকে বাঁধিয়া রাখিবার বা লোহার তারের জালের বেড়ায় আটকাইয়া রাখিবার দরকার হইত না। তাহারা শিকারখানার আশেপাশে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত, আবার কখনও কখনও পেশবার মজলিসেও হাজির হইত। খ্যাতনামা ইংরাজ গ্রন্থকার জেম্‌স ফর্ব্বস তাঁহার 'Oriental Memoirs' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরাজ দূত সার চার্লস ম্যালেট কর্ত্তৃক বিবৃত পার্ব্বতী শৈলের নিকট রমনায় রক্ষিত পেশবার পোষা হরিণের দরবারে আসার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিবরণটি পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষক হইবে—

"অশ্বারোহীর দল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঠিত, প্রত্যেক সওয়ারের হাতে একটা লম্বা লাঠি। লাঠির আগায় একখানি লাল কাপড়। হরিণগুলি তাঁবুর নিকট আসিলে খুব জোরে বাজনা আরম্ভ হইল। তিনটা হরিণ তাঁবুতে প্রবেশ করিল। দুই ধারে দুইটা দোলনা ঝুলিতেছিল, তাহার উপর উঠিয়া দুইটি মৃগ অতি সুন্দরভাবে বসিল। তৃতীয় হরিণটিও ঠিক ঐরূপ ভঙ্গীতেই গালিচার উপর বসিল। বাদ্যধ্বনি থামিলে এক দল নর্ত্তকী তাঁবুতে প্রবেশ করিল। তাহারা মৃদু বাজনার তালে তালে হরিণের সামনে নাচিতে লাগিল, আর হরিণ তিনটাও নিতান্ত নিরুদ্বেগে বসিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল। চতুর্থ হরিণটা বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষা একটু

সেকালের পুনা।

"পুনা হইতে চারি মাইল দূরে, তাঁহার রমণায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিবার জন্য পেশবা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গীদের লইয়া বিকাল দুইটার সময় সেখানে গেলাম। আমরা দেখিলাম, সেখানে তাঁবু খাটানো হইয়াছে, তাঁবুর দরজায় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই পেশবা আসিলেন। আমরা সকলে গালিচার উপর বসিলে দেখিলাম, চারিটি সুন্দর কৃষ্ণসার এক দল অশ্বারোহীর আগে আগে আসিতেছে।

ভীতু, সেটা এতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, এই সময় সেটাও তাঁবুতে ঢুকিয়া গালিচায় বসিল। এক জন ভৃত্য হরিণের দোলনা আস্তে আস্তে দোলাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও হরিণদের কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। পেশবার ইচ্ছামত এই তামাসা খানিকক্ষণ চলিল, পরিশেষে পশুরক্ষক বড় হরিণটার শৃঙ্গে একগাছি ফুলের মালা পরাইয়া দিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চারিটা হরিণই একসঙ্গে চলিয়া গেল।

"পেশবা আমাকে বলিলেন যে, হরিণগুলিকে এইরূপে পোষ মানাইতে সাত মাস সময় লাগিয়াছে। এই হরিণ কয়টি রমণায় বড় বড় হরিণের পালের সহিত চরিয়া বেড়ায়, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা দেখান হয় নাই। রমণার চতুর্দ্দিক খোলা, কোন প্রকারের বেড়াই নাই। আমি শুনিলাম যে, তাহাদিগকে খাদ্যের লোভ দেখাইয়াও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। পেশবা বলিলেন যে, হরিণগুলি বাদ্য-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার দরবারে আইসে।"

রমণার হরিণ পেশবার তাবুতে বাজনা শুনিতে আসিত, আবার এই রমণার মাঠেই মাঝে মাঝে লোকজন লইয়া পেশবা হরিণ শিকারে যাইতেন। পেশবা জাতিতে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধের সময় নরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিতে তাঁহার হৃদয়ে বোধ হয় ব্যথার লেশ-সঞ্চারও হইত না, কিন্তু হরিণ তিনি মারিতেন না, শুধু ধরিতেন। কতক নিজের কাছে রাখিতেন, দুই একটি তাঁহার সামন্ত-দিগকে উপহার দিতেন আর বাকী সব আবার ছাড়িয়া দিতেন। এইরূপ একটি শিকারের কাহিনী বাসুদেব বামন শাস্ত্রী খরে সম্পাদিত ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহের নবম খণ্ডে মুদ্রিত একখানি পত্রে পাওয়া যায়। পত্রখানির লেখক সাঙ্গলীর সরদার চিন্তামণি রাও আপা। তিনি লিখিয়াছেন—

"গতকল্য শ্রীমন্ত রমণায় হরিণ বেড়িয়া ধরিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল, কল্য অরুণোদয়ে ভোজন করিয়া ফৌজ সহ আসিবে। আজ্ঞানুসারে অরুণোদয়ে ভোজন করিয়া তৈয়ার হইয়া পুলের নিকট নদী পার হইয়া গেলাম। তীর্থস্বরূপ রাজশ্রী দাদা, রামচন্দ্র পন্থ আপা, শ্রীপত রাও ভট্টি, চিরঞ্জীব রাজশ্রী বাপু ও নারায়ণ রাও আবা প্রভৃতিকে লইয়া আমরা যাইয়া দাঁড়াইলাম। কিছু পরেই শ্রীমন্ত আসিলেন। তাঁহার সহিত বিঠলবাড়ীর দেড় ক্রোশ ওধারে বড়গাঁও পর্য্যন্ত গেলাম। পাহাড়ের উপর ফৌজের লাইন ও নীচে পদাতিকের শ্রেণী খাড়া করা হইল, তাহার পর চীৎকার করিয়া হরিণ খেদাইতে আরম্ভ করিলাম। এক কি দুই শত হরিণ পলাইয়া গেল, শ' দুইশ' হরিণ আমাদের বেড়ের ভিতরে রহিল। এই ভাবে হরিণ তাড়াইতে তাড়াইতে গণেশ-খিণ্ডী পর্য্যন্ত আসিয়া শ্রীমন্তের অভিযান সেইখানে থামিল। রাজশ্রী মহাদজী সিন্ধিয়া সেখানে আসিলেন। আমাদের ফৌজের লাইন দিয়া একটা কৃষ্ণসার যাইতেছিল, আমাদের লোকরা সেটাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি পরে হরিণটা শ্রীমন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তখন আজ্ঞা হইল, সেটা তোমার লোকদের নিকটেই থাকুক। চতুর্দ্দিক হইতে হরিণ তাড়াইয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলা ফৌজ ও পদাতিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে লাগিল, যায়গায় যায়গায় তাহাদিগকে ধরা গেল। পঁচিশটা হরিণ ধরা পড়িয়াছিল। গোটা কয়েক বড় বড় কৃষ্ণসার লাফ দিয়া আমাদের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইয়া গেল। এই সময় বেলা প্রায় সওয়া দুই প্রহর হইয়াছিল। সিন্ধিয়া আজ্ঞা করিলেন যে, আমাকে একটা কৃষ্ণসার দিবার আজ্ঞা হউক। শ্রীমন্ত উত্তর করিলেন—তোমাকে দিব না, তুমি বধ করিবে। তখন সিন্ধিয়া বলিলেন যে, সাহেবের পায়ের

মহাদজী সিন্ধিয়া।

শপথ সেরূপ হইবে না। তাহার পর তাহাকে একটি কৃষ্ণসার দিলেন এবং সিন্ধিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত ফৌজ আনেন নাই। সঙ্গে শ' দুইশ' পাইক মাত্র ছিল। সিন্ধিয়া চলিয়া যাইবার অল্পকাল পরেই শ্রীমন্তের অভিযান ফিরিয়া চলিল। আমাদের নিকট একটা কৃষ্ণসার ছিল, আরও একটা হরিণ পাঠাইয়াছেন। তীর্থস্বরূপ রাজশ্রী রামচন্দ্র পন্থ আপাকে একটি হরিণ পাঠাইয়াছেন। সরকারে পাঁচটি হরিণী ও পাঁচটি কৃষ্ণসার আনিয়াছেন, বাকী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের কৃষ্ণসার ও রামচন্দ্র পন্থ আপার হরিণী মরিয়া গিয়াছে। আমাদের একটি হরিণী আছে। ভালই আছে। ঘাসদানা খায়। যত্ন করিতে আজ্ঞা হইয়াছে।"

দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের বাঘশিকারের বিবরণ এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের চিঠিতে আছে।

চিন্তামন রাওর লিখিত এই হরিণধরার বিবরণ মুঘল সম্রাট্‌দিগের কামারঘা শিকারের কাহিনী স্মরণ করায়। মুঘল বাদশাহরা বিরাট বাহিনী লইয়া বড় বড় জঙ্গল বেড়িয়া ফেলিতেন। তাহার পর সেই মানুষের জাল ক্রমে ক্রমে গুটাইয়া লইয়া, সর্ব্বপ্রকারের পশু খেদাইয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে লইয়া আসিতেন। বাঘ, ভালুক, সিংহ, হরিণ সকল রকমের ছোট বড় হিংস্র নিরীহ পশুই এই মানুষের জালে আটক হইত। সম্রাট নিজ হস্তে তাহাদের প্রাণসংহার করিতেন। সে একটা বিরাট ব্যাপার। সম্রাটের মৃগয়া-ক্ষেত্র বিশাল অরণ্য, সঙ্গে অগণিত সেনা, অগণিত পশু সম্রাটের গুলীতে, সায়কের অব্যর্থ সন্ধানে হত হইত। তাহার তুলনায় পেশবার এই শিকার অভিযান নিতান্তই নগণ্য ব্যাপার। তাঁহার মৃগয়ার স্থান রমণার ময়দান, মৃগয়ার প্রাণী হরিণ, তাহাও আবার তিনি মারিতেন না, ধরিয়া আনিতেন বা ছাড়িয়া দিতেন, সঙ্গে থাকিত সামান্য লোকজন। সিন্ধিয়ার মত সর্দ্দার তাঁহার সমস্ত ফৌজ লইয়া আসা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

কিন্তু তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পেশবার এই শিকারযাত্রা মুঘল সম্রাটের কামারঘা শিকারের অনুকরণ মাত্র। উভয় শিকারের প্রণালীই এক। উভয় শিকারেই মানুষের জালে আরণ্য পশু ঘিরিয়া ক্রমশঃ সেই জাল গুটাইয়া পশুপাল সঙ্কীর্ণ স্থানে জড় করিয়া ধরা অথবা মারা হইত। কেবল এই শিকার ব্যাপারে নহে, শেষকালে পেশবাগণ বহু ব্যাপারে অশনে ব্যসনে বসনে ভূষণে মুঘলদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ রাও বাহাদুর পারসনীসের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

১। কিনকেড Siva Chhatrapati.

২। কাশীনাথ নারায়ণ সানে সম্পাদিত পেশবাবখর।

৩। বাসুদেব বামন শাস্ত্রী খরে সম্পাদিত ঐতিহাসিক লেখসংগ্রহ।

৪। Edward Moor—A Narrative of the operations of Capt. Little's Detachment.

৫। Forbes—Oriental Memoirs.

৬। মৎপ্রণীত অপ্রকাশিত যন্ত্রস্থ গ্রন্থ -Administrative System of the Marathas.

জলপিপি।

ডাহুক ও কায়েমের মত জলপিপিও বাঙ্গালার খাল, বিল, ঝিলে বিচরণ করিয়া থাকে। ডাহুককে মাঝে মাঝে ভূমির উপর দৌড়িয়া যাইতে দেখা যায়। কিন্তু জলপিপি কখনও জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া এরূপভাবে ভূমির উপরে দৌড়াদৌড়ি করে না। প্রধানতঃ যে সকল জলাশয়ে কুমুদ, পদ্ম, কচুরিপানা থাকে, সেই সব স্থানেই জলপিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাসমান পত্র অথবা গুল্মের উপর দিয়া দ্রুতপদক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করা তাহার অভ্যাস। তাহার দীর্ঘ পদাঙ্গুলীবিন্যাসের জন্য প্রকৃতি দেবী যেন জলাশয়বক্ষে এই সকল বড় বড় পাতাগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বাস্তবিক সেগুলি না থাকিলে তাহার চলাফেরা করা দুরূহ হইত। এই জন্যই বোধ হয়, যে সকল জলাভূমিতে কুমুদকমলের একান্ত অভাব, সে সব স্থানে জলপিপির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। প্রচুর আহার্য্যের সম্ভাবনা থাকিলেও সে স্থান তাহার বাসোপযোগী বলিয়া সে গণ্য করে না।

জলপিপির বিচিত্র জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে বর্ষা ঋতুতে তাহার অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহাকে দেখিতে হইবে। নগরের বাহিরে রাজপথের দুই ধারে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ জলাকীর্ণ, স্থানে স্থানে কুমুদকমলপত্র, ঘন তৃণশীর্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, দূরাগত বিহঙ্গকলধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলে হয় ত জলমধ্যে অবতরণ করিয়া শব্দাভিমুখে ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হয়। কোথাও বা পথের ধারে অতি সন্নিকটে অথবা রেল-লাইনের পার্শ্বে নাতিগভীর খাতের মধ্যে সহসা তাহাকে দেখিতে পাই। বাঙ্গালার বাহিরে উড়িষ্যার পুরী হইতে কটকের রাস্তায় আঠারনালা পার হইয়া এবার বর্ষা প্রকৃতির স্নিগ্ধ-গম্ভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে উন্মুক্ত গগনতলে বহুদূর-প্রসারিত জলাকীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে জলপিপিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

আমাদের ডাহিনে অদূরবর্ত্তী রেল-লাইন পর্য্যন্ত নাতিবিস্তৃত খাত জলপূর্ণ ছিল; রাস্তার সহিত সমান্তররেখা হইয়া কিছু দূর গিয়া উচ্চ ভূখণ্ডে বাধা পাইয়া থামিয়া গিয়াছিল। জলাশয় তৃণাচ্ছাদিত, স্থানে স্থানে রক্তকুমুদ শোভা পাইতেছিল। এতক্ষণ পথে আসিতে আসিতে বিশেষ করিয়া কোন পাখী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, এই জলাশয়ে সর্ব্বপ্রথমে ঘাসের মধ্যে আমরা দুইটি জলপিপি দেখিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমরা নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের কোন প্রকার ভীতির লক্ষণ দেখা গেল না; নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহারা আহারান্বেষণে ব্যাপৃত রহিল। এমন কি, আমরা অনেকটা তাহাদের কাছে ঘেঁসিয়া ছায়াচিত্র লইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহারা সে স্থান একেবারে পরিত্যাগ করিল না। শব্দ করিতে করিতে মাঝে মাঝে পুংপক্ষীটা একটু উড়িয়া কিছু দূরে সরিয়া গিয়া পরক্ষণের মধ্যেই আবার স্ত্রীপক্ষীর নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা তাহাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলাম। উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিতে করিতে তাহারা কখনও বা ঘাসের অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছে; কখনও কুমুদপত্রের উপর দিয়া মন্থরগতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; আবার হয় ত খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া পড়িলে একটি যেন আহ্বানসূচক ধ্বনি করিল। অমনই অপরটি এক প্রকার অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বর্ণের তারতম্য নাই বলিলেই চলে; পুংপক্ষীটার কণ্ঠস্বর বেশী শুনা গেল। উভয়ের উড্ডীনভঙ্গী একইরূপ—গ্রীবা উত্তোলিত করিয়া কণ্ঠস্বরে সহসা দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে পক্ষভরে জলাশয়বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিল, পদদ্বয় ঋজুভাবে পশ্চাদ্ভাগে প্রলম্বিত। অর্দ্ধনিমজ্জিত ঘাসের উপর তাহারা নামিয়া তৃণভক্ষণে ব্যস্ত হইল। ঘাসের উপরেই তাহাদের পদাঙ্গুলি বিন্যস্ত; যদি কখনও খাদ্য খুঁজিতে খুঁজিতে তৃণপত্রহীন জলে আসিয়া পড়ে, তখনই সন্তরণে পুনরায় তৃণগুচ্ছের আশ্রয় লয়। সহসা পক্ষিমিথুন পরস্পর সঙ্গত হইল; কিন্তু প্রাঙ্‌মিথুন লীলাসূচক কোনও বিচিত্র হাব-ভাব-ভঙ্গী দেখিলাম না, কেবল পুংপক্ষীটার কণ্ঠ হইতে একটা চাপাস্বর বাহির হইতে লাগিল।

পরক্ষণে আবার পূর্ব্বের মত তাহারা তৃণভক্ষণে ব্যস্ততা প্রকাশ করিল।

এই জলাশয়ের মধ্যে কেবলমাত্র যে এই এক জোড়া জলপিপি ঘাসের উপর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা নহে। দূরে দূরে আরও দুই জোড়া পাখী ছিল। কিন্তু কোনও পক্ষি-যুগলের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অপর জলপিপির প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। জলাশয়ের উপর স্ব স্ব আবেষ্টনের মধ্যে জোড়া জোড়া জলপিপি এক প্রকার নিশ্চিন্তভাবে যেন চলা-ফেরা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ অপরের territory'র মধ্যে আসিয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি পায়, নিমিষের মধ্যে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়।

রাস্তার একদিকের খাতের কথা এতক্ষণ বলিলাম। অপর পার্শ্বে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র ভাদ্র মাসের পরিপূর্ণ বর্ষায় প্রায় নিমজ্জিত। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, সেই জলক্ষেত্রে, আন্দোলিত ধান্যশীর্ষের মধ্যে আর এক শ্রেণীর জলপিপি; ইহার কৃষ্ণবর্ণ অতিদীর্ঘ পুচ্ছ এবং কণ্ঠ ও শিরোদেশের শুভ্রতা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা ইংরাজ-বর্ণিত Pheasant-tailed Jacana। ভাল করিয়া ইহার কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই আমাদের অশ্বযানের ঘর্ঘর শব্দেই বোধ হয় সন্ত্রস্ত হইয়া দূরে উড়িয়া গেল। ইহারা ভীরুস্বভাব, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। ফিরিবার সময় পথের দুই ধারে জলাশয়বক্ষে স্থানে স্থানে অনেক Jacana দেখিলাম বটে, কিন্তু এই লম্বপুচ্ছ জলপিপি যে উড়িষ্যার এ অঞ্চলে এত সাধারণ বিহঙ্গ, তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রায় এমন কোনও জলাশয় দেখিলাম না, যেখানে এই পাখী একেবারে ছিল না; কোথাও কোথাও জলপিপির সঙ্গে ডাহুককে বিচরণ করিতে দেখা গেল।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পরদিন প্রাতে আমরা আবার ঐ পথে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব-বর্ণিত রেল-লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী খাত ও ধান্যক্ষেত্র পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, স্থানে স্থানে কুমুদ-কহ্লার-শোভিত জলাশয়,—এমন লাল ও নীলবর্ণ কুমুদ পুষ্পের বিচিত্র আস্তরণ আর কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কোথাও বা কচুরি-পানার ঘন আচ্ছাদনে জল অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, সেই কচুরিপানার মধ্যে এক গোছা ঘাস; তাহারই অন্তরালে সহসা একটা জলপিপি অন্তর্হিত হইল। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যেন কিসের উপর উপবেশন করিয়া চঞ্চু চালনা করিতেছে। মনে হইল, সে বুঝি তাহার স্বরচিত নীড়ের মধ্যে বসিয়াছে। তাহার সঙ্গীটি আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা ফটো লইবার চেষ্টা করিলাম। ঘাসের ভিতর হইতে প্রথমোক্ত পক্ষীটি বাহির হইয়া সরিয়া পড়িল; অপরটিও একটু দূরে গিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল না। দেখিয়া মনে হইল যে, সে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে; যখনই অপর কোনও জলপিপি ঐ সীমানার মধ্যে আসিতে চেষ্টা করিল, তখনই সেই আগন্তুককে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিল। এই বিরোধ তাহার স্বশ্রেণীর বিহঙ্গগণের সম্বন্ধে রূঢ়ভাবে প্রকটিত হইলেও হংস, বক প্রভৃতি অন্যান্য জলচর পক্ষীদিগের প্রতি তাহার আচরণ সম্পূর্ণ অন্তরূপ ছিল; তাহাদের সান্নিধ্য-সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন রহিল। এই পাহারা দেওয়া, এই আগ-ন্তুককে তিরস্কৃত করা, এত ব্যাকুলতা কিসের জন্য? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তথায় নীড় ত আছেই, খুব সম্ভব তন্মধ্যে ডিম্ব রক্ষিত হইতেছে। ফটো-চিত্র লইবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা পাখীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া একটু অপেক্ষা করিলাম। যে পাখীটা অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া নীড়ে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় আলোকচিত্র লইবার চেষ্টা করা গেল। অতঃপর ক্যামেরা বন্ধ করিয়া ঐ নীড় পরিদর্শন প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। কয়েকজন উড়িয়া ছোকরাকে সঙ্গে লইয়া জলে নামিলাম। প্রায় তিন ফুট গভীর জলের ভিতর দিয়া কচুরিপানা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া প্রকৃত নীড়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না; যে তৃণগুচ্ছের মধ্যে পাখীর বাসা আছে বলিয়া মনে করিয়া-ছিলাম, সেখানে কিছুই ছিল না; তাহার পার্শ্বে ভাসমান কচুরিপানার উপরে অনাবৃত অবস্থায় বিচিত্র-রেখা সমন্বিত অতি সুন্দর দুইটি ডিম্ব আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমার সহচর বন্ধু সুধীন্দ্রলাল সে দুটিকে হস্তগত করিলেন; ঠিক সেই সময়ে উক্ত পক্ষিদম্পতীর মধ্যে একটি পাখী আমাদের খুব নিকটে উড়িয়া আসিল; কিন্তু বাধা দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া আমাদের এই নিষ্ঠুর কার্য্যের

মূক সাক্ষী হইয়া রহিল। আমরা এক রাশি নীল কুমুদ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম যে, সেই পূর্ব্ববর্ণিত ধানের ক্ষেতে যেন আগেকার দিনের চেয়েও খুব বেশী জল জমিয়াছে, মধ্যাহ্নে সেই অচঞ্চল জলরাশির উপরে স্থানে স্থানে জলপিপি রহিয়াছে; এক জোড়া লম্বপুচ্ছ জলপিপি (Pheasant-tailed Jacana) পিঙ্গলপক্ষ জলপিপি (bronze-winged) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িতেছে, বসিতেছে; আবার উড়িয়া গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। দেখিতে এমন সুন্দর যে, সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বর্ষা ঋতুই ইহাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের প্রশস্ত কাল। এই সময়ে তাহাদের সুপুষ্ট দেহের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ খেলিয়া যায়। বর্ষাপগমে কিন্তু সে লাবণ্য আর থাকে না। গর্ভাধানকালে স্ত্রীপক্ষীর পুচ্ছ পুংপক্ষীর পুচ্ছ অপেক্ষা দুই তিন ইঞ্চি অধিক লম্বা থাকে; কিন্তু উহাদের বর্ণের পার্থক্য কিছু দেখা যায় না। আবার ঐ ঋতুতে উভয়ের ডানার পাশে কাঁটার মত একটা তীক্ষ্ণাগ্র পদার্থের উদ্ভব দেখিয়া মনে হয় যে, পক্ষসাপটে ভাবী আততায়ীকে তাড়াইবার জন্য এই অস্ত্র তাহারা প্রকৃতি দেবীর নিকট হইতে এই সময়ে লাভ করিয়াছে। শীতকালে সেই লম্বা পুচ্ছ আর থাকে না; বর্ণের সে কৃষ্ণতাও থাকে না। প্রায় ১২।১৩ ইঞ্চি লম্বা ঘন কৃষ্ণ বিপুল পুচ্ছের পরিবর্ত্তে একটা ছোট ল্যাজ থাকে, রংটা সাদা হইয়া যায়, আর সেই তীক্ষ্ণধার "খোঁচ" লুপ্ত হইয়া যায়। যে পিঙ্গল-পক্ষ (bronze-winged) জলপিপি আমরা সর্ব্বত্র অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাই, তাহাদের কিন্তু ঋতুবিশেষে এরূপ শারীরিক কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত হয় না। এই দুইটি বিহঙ্গ ব্যতীত আর কেহ জলপিপি-পরিবার ভুক্ত নহে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এত দিন পাশ্চাত্য বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ জলপিপিকে স্বতন্ত্র পরিবার বলিয়া গণ্য করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহারা ইহাকে 'অম্বুকুক্কুট' পর্য্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের বর্ণিত আখ্যানে জলপিপিকে ডাহুকের সঙ্গে পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একই জলাশয়ে কিছু দিন পূর্ব্বে অম্বুকুক্কুটবিশেষের (কায়েম) সহিত ইহাকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। অবশ্য, জলকুক্কুটের সহিত ইহার বাহ্যিক সাদৃশ্য এত বেশী যে; উভয়ের জ্ঞাতি সম্পর্ক মনে করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু জলকুক্কুটজাতীয় কোনও পক্ষী জলপিপির মত জলের উপর দিয়া চলা-ফেরা করে না। পদ ও নখরের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে, উভয়ে পার্থক্য কত অধিক।

পিঞ্জরে আবদ্ধ না করিয়া জলপিপিকে অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে রাখিয়া পালনের চেষ্টা অনেক স্থলে হইয়াছে। আলিপুরের কথা এইমাত্র বলিলাম। মিঃ ডড্‌স্ (Mr. Dods)এর ঐকান্তিক উদ্যমের ফলে অনেকগুলি জলপিপি চিড়িয়াখানায় আনীত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা টিকিল না। বোধ করি, এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে তাহাদিগকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে সকল শত্রুর কবল হইতে অম্বুকুক্কুটপরিবারস্থ বিহঙ্গগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল, জলপিপি তাহাদিগকে এড়াইতে পারিল না। দেশান্তরে উড়িয়া যাইবার সামর্থ্য তাহাদিগের ছিল না; কারণ, তাহাদিগকে চিড়িয়াখানার জলাশয়ে ছাড়িয়া দিবার সময় কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করা হইয়াছিল। খোলা জায়গায় পাখীকে অবাধে ছাড়িয়া দিয়া পালন করিবার চেষ্টায় প্রথমেই এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। মিঃ ফিন্ কলিকাতার যাদুঘরের মধ্যবর্ত্তী একটা জলাশয়ে লম্বপুচ্ছ জলপিপিকে ঐরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। তিনি বলেন—They resented each other's trespass on their chosen spot অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিত। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত পুরী অভিযানে একজোড়া সাধারণ পিঙ্গলপক্ষ জলপিপি আর এক জোড়া আগন্তুককে তাড়াইয়া দিতেছে দেখিয়াছিলাম। আরও দেখিয়াছিলাম যে, একটা bronze-winged jacana একজোড়া pheasant-tailed jacanaকে তাড়াইতেছিল। আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, সন্তানজননকালে ইহাদের প্রকৃতি বোধ করি উগ্র হয়; অন্য সময়ে হয় কি? মিঃ ফিনের অভিজ্ঞতা আমাদের সন্দেহ দূর করিল।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

বঙ্গ আমার, জননী আমার !

১

গার্ডের বাঁশী বাজিয়াছে, সবুজ নিশান উড়িয়াছে, এঞ্জিনের শেষ হুইশিল ধ্বনিত হইতেছে, এমন সময়ে দুই জন বাঙ্গালী যুবক একজন অবগুণ্ঠনবতী কিশোরীকে লইয়া তারক বাবুর রিজার্ভ কামরার দ্বার খুলিয়া ঢুকাইয়া দিল। তারক বাবু মালপত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন, "হাঁ হাঁ" করিয়া দ্বার আটক করিতে না করিতেই গাড়ী বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন ছাড়িয়া দিল। যুবক দুই জনের এক জন গাড়ীর সঙ্গে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলিতে লাগিল, "কিছু মনে কর্‌বেন না, টাইম নেই, তাই রিজার্ভ গাড়ীতে উঠিয়ে দিলুম তরুকে, আপনার মেয়েছেলেরা আছেন, বেশ যাবে'খন, ঐ মেঝেয় একটু যায়গা করে নেবে—হাওড়ায় আমাদের লোক নামিয়ে নেবে'খন—" গাড়ী প্লাটফরম ছাড়িয়া গেল, সুতরাং যুবকটি আর কি বলিল, তারক বাবু শুনিতে বা বুঝিতে পারিলেন না।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার তারক বাবুর সুদীর্ঘ ঘটনাময় জীবনে কখনও ঘটে নাই। মাত্র সপ্তাহ দুই ছুটীতে সপরিবারে প্রবাসবাসের পর তারক বাবু কাশীর মায়া কাটাইয়া সেই সুজলা সুফলা চিরশ্যামা বঙ্গমাতার পদ্মার তটে কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সবশুদ্ধ ৭।৮টি। তারক বাবু একখানি ইণ্টার ক্লাসের কামরা একেবারে কাশী হইতে হাবড়া রিজার্ভ করিয়াছেন। রিজার্ভ করিতে অন্যকে বেগ পাইতে হইলেও তাঁহাকে পাইতে হয় নাই, কেন না, তিনি পুলিসের লোক, পূর্ব্ববঙ্গের গোবিন্দপুরের ইন্‌স্পেক্টর। পুলিসের কাযে তাঁহাকে ভগবানের চিড়িয়াখানার হরেক রকম জীবের সহিত নিত্য পরিচয় করিতে হয়, নিত্য নূতন ঘটনাবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে হয়—কাযেই সহজে তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, এমন ঘটনা প্রায় ঘটে না।

কিন্তু আজ এ কি অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা! কোথাকার অজানা অচেনা বাঙ্গালীর ছেলে সম্পূর্ণ অপরিচিতা অবগুণ্ঠিতা লজ্জাভারনমিতা এক কিশোরীকে তাঁহার গাড়ীতে অম্লানবদনে চড়াইয়া দিয়া তাঁহারই আশ্রয় ও হেপাজতি ভিক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল—আর তিনি—তিনি কি করিতে পারেন? গাড়ী ছাড়িয়াছে, গাড়ী হইতে মেয়েটিকে ফেলিয়া দিতে পারেন না, এই সামান্য ঘটনা এলারম্ চেইন টানিয়া গার্ডকে জানাইতেও পারেন না, কাযেই পড়িয়া মার খাওয়ার মত তাঁহাকে অন্ততঃ রাজঘাট বা মোগলসরাই পর্য্যন্ত এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেই।

বিরক্ত হইয়া অর্দ্ধদগ্ধ বর্ম্মাচুরুট টানিতে টানিতে তারক বাবু বলিলেন,—"ভ্যালা বিপদ! নিজের সামলে উঠা যায় না, তার ওপর—"

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী নথনাড়া দিয়া বিরক্তির সুরে সায় দিলেন, "তা সত্যি বাবু, লোকের কি আক্কেল! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে গাড়ী রিজার্ভ কর, তা কি স্বস্তিতে যাবার যো আছে—"

কন্যা নীহার বাধা দিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "কেন মা, ও ত একটুখানি যায়গা নিয়েছে,তা, তোমাদের কি অসুবিধে হয়েছে? আহা! ছেলেমানুষ! আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে গেল!"

গৃহিণীর মনটা স্বভাবতঃই নরম; তবে কি না, পুলিস হুজুরের গিন্নী, এই যা। মেয়ের কথায় মা'র মনটা একটু ভিজিয়া আসিল, তিনি বলিলেন,—"না বাছা, গাড়ীতে থাক্‌তে মানা করিনি, তবে তোর জন্যেই রিজার্ভ করা, তুই একটু হাত-পা ছড়াবি তাই—"

"তা হোক মা! আমার ত রোগ সেরেছে। এস ত ভাই, এ দিকে উঠে বেঞ্চে বসবে এস ত।" নীহার শেষ কথাটা অবগুণ্ঠিতা কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল।

গাড়ী এই সময়ে রাজঘাটে পৌছিল। তারক বাবু প্লাটফরমে নামিয়া রেল পুলিসের আফিসের দিকে চলিলেন, একটা কনষ্টেবলকে ডাকও দিলেন, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া গাড়ীর কামরায় ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, এদের কোনও সন্ধান পেলে?"

তারক বাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "কাদের?"

গৃহিণী বলিলেন, "এই যে এই মেয়েটির সঙ্গের লোকেদের ?"

তারক বাবু বলিলেন, "না, আমি সে সন্ধানে যাই নি, আর কাঁহাতক গাড়ী গাড়ী চুঁড়ে বেড়াব—"

এই সময়ে নীহার বলিল, "থাক না বাবা, ও আর আমাদের কতটুকু যায়গা নেবে। দেখ না, তোমরা তাড়াতে ব্যস্ত ব'লে জড়সড় হ'য়ে এক কোণে মেঝেয় ব'সে রয়েছে। আহা! মানুষ ত!"

তারক বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা মেঝেয় কেন? যখন থাকবেই, তখন ভাল ক'রে উঠে বসতে বল না—ও হো! আমি রয়েছি যে! আচ্ছা, মোগলসরাই এলো ব'লে। আমি মোগলসরাইয়ে পাশের কামরায় যায়গা ক'রে নেব'খন, তোমরা ওঁকে বেঞ্চের ওপরে যায়গা ক'রে দিয়ো—রাতটা কাটান চাই ত!"

গৃহিণী সরিয়া আসিয়া পাশে বসিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "দেখ, আমি ভাল বুঝছি নি। সোমত্ত মেয়ে, সঙ্গে জিনিষপত্তর কিছু নেই, পুরুষমানুষও নেই, থাকলেও কোথায় রয়েছে কে জানে। নীহার কত সাধাসাধি করলে, হাতে ধ'রে তুলতে গেল, হাত ছিনিয়ে নিলে, কিছুতেই উঠে বসবে না। ঐ যে পিছন ফিরে দেড় হাত ঘোমটা টেনে ব'সে আছে, কিছুতেই খুলবে না, কেবল বলছে, 'আমায় মাফ করবেন, আমি বেশ ব'সে আছি।' কি বল দিকি ?"

তারক বাবু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ডু! কিছুই ত বুঝতে পারছি না। যাক্, মোগলসরাই এল, আমি নেমে যাচ্ছি, প্রতি ষ্টেশনে নেমে খবর নিয়ে যাব। তোমরা সাবধানে থেকো।"

কামরা হইতে নামিয়া পাশের কামরায় উঠিবার সময় তারক বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "আমি পুলিশের লোক, আমারও এতে তাক লাগছে! ব্যাপার কি ?"

২

পুঁটুলির মত কুণ্ডলী করিয়া কামরায় এক কোণে কিশোরী বসিয়া ছিল—দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত ছিল। তখন হাবড়া এক্সপ্রেস মোগলসরাই ছাড়াইয়া ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছিল, দ্বিপ্রহরের সূর্য্য-করে গাড়ীখানা তাতিয়া ঝলসিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছিল। নীহার ডাকিল, "এস না ভাই, বেঞ্চের উপর বসবে এস না, লজ্জা কি ?"

বাতাসের জোরে সে কথা ভাসিয়া উড়িয়া গেল, কিশোরী শুনিতে পাইল কি না পাইল বুঝিতে পারা গেল না, তবে সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বড় করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। তখন নীহার উঠিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে গেল এবং তাহার হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে সজোরে হাত ছিনাইয়া লইল।

নীহার বিস্মিত হইল; একটু ক্রুদ্ধও যে হইল না, তাহা নহে। কোথাকার কে অপরিচিতা—দয়া করিয়া তাহারা আশ্রয় দিয়াছে, অথচ তাহার এই ব্যবহার! নীহারের জননী বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আহা, থাক না বাছা ওর যেখানে ইচ্ছে! বলে পিরথিবীতে না কি দয়া-ধর্ম্মের কাল আছে!" নীহার আপনার আসনে ফিরিয়া গেল।

সমস্ত অপরাহ্ণটা এই ভাবেই গেল। কতকটা খোকাখুকীদের দুধ খাওয়াইয়া, কতকটা ঝিমাইয়া, কতকটা নাক ডাকাইয়া সময় কাটিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ইহার মধ্যে কয়েকটা ষ্টেশনে তারক বাবু আসিয়া সকল অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়া গিয়াছেন। এত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিশোরী যে ভাবে প্রথমে আসিয়া বসিয়াছিল, ঠিক সেই একভাবেই বসিয়া আছে—যেন পাষাণে গড়া পুতুলটি!

সন্ধ্যার পর তারক বাবু মেয়েদের গাড়ী হইতে এক দফা ফল মিষ্টান্নাদি লইয়া গেলেন। নীহারের মা খোকা খুকীদের খাওয়াইতে বলিলেন এবং নীহারকে কিছু খাইতে বলিয়া অবগুণ্ঠিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি গো বাছা, বড়মানুষের ঝি! বলি কথাই না কও, কিছু খাবে ত। না, চুপ ক'রে থাকলে হবে না। আমরা সবাই খাব, তুমি একলাটি উপোস যেতে পারবে না।"

নীহার কিছু খাবার লইয়া দুইটা পাত্রে রাখিয়া অবগুণ্ঠিতা কিশোরীর পাশে গিয়া বসিল, বলিল, "এস ভাই। তোমরা কি ? আমরা কায়স্থ।"

অবগুণ্ঠিতা নীহারের কথার জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোমটাটা আরও টানিয়া দিয়া নীহারের মা'র কাছে গেল। হঠাৎ সে সেখানে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার পা দু'খানি ধরিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল,

"মা! আমি আপনার সন্তান। বলুন, আমায় ক্ষমা করবেন।"

মোক্ষদা যতটা অপ্রস্তুত হইলেন, তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "আহা, কর কি, বাছা, বালাই ষাট! খ্যামা কোরবো? কেন, খ্যামা কিসের জন্তে, মা?"

কিশোরী তখনও অবগুণ্ঠনবতী। সে বলিল, "হাঁ মা, ক্ষমা। ভারি অপরাধ করেছি আমি—আমি ঠক, জুয়াচোর, জুয়াচুরি ক'রে আপনাদের কামরায় এসেছি, ইচ্ছা হ'লে আপনারা আমায় পুলিসে দিতে পারেন।"

মোক্ষদা ও নীহার বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে তাহার দিকে ফেল ফেল তাকাইয়া রহিলেন—কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিশোরী হঠাৎ মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "মা, আমায় যা ভাবছেন, আমি তা নই, তবু আমি আপনার সন্তান, আপনার জিতেনের মত—"

মা ও মেয়ে একসঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নীহার "ও মা গো" বলিয়া মায়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া মা'কে জড়াইয়া ধরিল এবং মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

কিশোরী—সে আর তখন কিশোরী নহে—বাধা দিয়া বলিল, "দোহাই আপনাদের, চেঁচাবেন না, যদি জিতেনদা'কে বাঁচাতে চান, তা হ'লে—"

মোক্ষদা পুলিসের এক বড় কর্ত্তার গৃহিণী, তাঁহার সাহস ও ধৈর্য্য অল্প ছিল না; তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন, "কে তুমি জিতেনের নাম নিচ্ছ?—বেটাছেলে মেয়েমানুষ সেজে আমাদের গাড়ীতে ঢুকেছো—এ দিকে দেখতে ত ভদ্রলোকের ছেলের মত—"

যুবক কাতরস্বরে বলিল, "সব পণ্ড হ'ল দেখছি। ভাগ্যে গাড়ী ঝড়ের বেগে দৌড়ুচ্ছে, না হ'লে যা চেঁচিয়েছিলেন! যাক, আমি, আমি, আমার পরিচয়? আপনি জিতেনদা'র শাশুড়ী ত—আর এই আমার বৌদি, জিতেনদা'র স্ত্রী, কেমন, না?"

মোক্ষদা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কে তুমি, শীগ্‌গির নেমে যাও, না হ'লে এখনই—"

কথা শেষ হইল না, নীহার চুপি চুপি তাঁহার কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিল। মোক্ষদা অমনই কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, জিতেনের কথা কি বলছিলে? জিতেন কোথায়? তুমি তাকে জানলে কি ক'রে?"

যুবক বলিল, "সে অনেক কথা। সোজা কথায় বলি, আমি জিতেনদার জন্যে এই বেশ ধরেছি, আপনাদের সঙ্গ নিয়েছি। যদি জিতেনদা'কে বাঁচাতে চান, তা হ'লে আমায় এইভাবেই আপনাদের আশ্রয়ে নিয়ে চলুন। গোবিন্দপুর থানায় আমার কায আছে, সে কায সফল না হ'লে বিধাতাও জিতেনদা'কে বাঁচাতে পারবে না। আপনি আমার মা, আর উনি আমার সহোদরা ভগিনী। কেমন, বুঝলেন ত? আর এতেও যদি না বোঝেন, তবে আর একটু কথা যোগ দেবার আছে, আমি অনুশীলন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক, মায়ের সন্তান।"

কথাটা বলিবার সময়ে যুবকের স্বভাবগৌর কমনীয় বদনমণ্ডল আনন্দ-গর্ব্বের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মোক্ষদা বলিলেন, "আমি অত-শত বুঝি না বাপু! আমি শুধু জানতে চাই, তুমি পরের ইষ্টিশনে নেমে যাবে কি না।"

যুবক বলিল, "না, যাব না।"

মোক্ষদা উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "তবে এঁদের ডাকতে হবে? ও মা, কেমন ভদ্দরলোক গা!"

যুবক দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না মা, ডাকতে হবে না। দেখছি, দিদিকে বুঝিয়ে বলতে হ'ল। দিদি! এটা লজ্জার সময় নয়। আপনার স্বামীর জীবন-মরণ এর উপর নির্ভর করছে।"

নীহার মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "এঁর সব কথাটা শুনলে ক্ষতি কি, মা?"

যুবক বলিল, "সব খুলে বলব ব'লেই এসেছি। আমার পিছনে পুলিসের গোয়েন্দা ফিরছে, তাই এই বেশে লুকিয়ে যাচ্ছি। শপথ ক'রে বলছি, রসুলপুরের রাজনীতিক ডাকাতীর সঙ্গে জিতেনদা'র কোন সম্পর্ক নেই, জিতেনদা' সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। গ্রামের জমীদারের ছেলে—যার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পেয়ে তারক বাবু দিদির সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে জিতেনদা'র সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন—সে-ই এই চক্রান্ত ক'রে পরোয়ানা বার করিয়েছে। আমি তার চক্রান্ত ভেঙ্গে দিয়ে জিতেনদা'র মুক্তির উপায় করতে যাচ্ছি। এ সাজে আপনাদের আশ্রয়ে গেলে গোয়েন্দার হাত এড়াতে পারবো

ব'লে এই কায করেছি। এখন আপনারা যা ভাল বিবেচনা করেন করুন।"

কামরার মধ্যে ক্ষণেককাল নীরবতা বিরাজ করিল। মোক্ষদা ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, তোমার নাম কি? তুমি আমার জিতেনের বন্ধু?"

যুবক বলিল, "হাঁ মা, আমি তাঁর ভক্ত অনুগত শিষ্য। তাঁর কাছে আমি আমার দেশ-মা'কে চিনতে শিখেছি। তিনি এত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, অথচ আমার মত হতভাগাকেও তিনি ভায়ের চোখে দেখেন, আমাকে মায়ের সেবার অধিকারী কর্‌বার যোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ঋণ শুধতে পার্‌বো না, তবু যদি তাঁর কিছু কাযে লাগি। আমাকে বীরেন ব'লে জান্‌বেন, মা।"

নীহার বলিল, "আপনি যদি ধরা পড়েন?"

বীরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাতেই বা ক্ষতি কি? জিতেনদা'র সন্ধান তা হ'লেও ত কেউ পাবে না।"

নীহার বলিল, "আপনার নিজের কি হবে?"

বীরেন এবারও হাসিয়া বলিল, "আমার জন্য ভাববেন না—আমার মত তুচ্ছ নগণ্য একটা প্রাণ ফাঁসি-কাঠে ঝুল্‌লে দেশের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু জিতেনদা'র কথা স্বতন্ত্র।"

মোক্ষদা বলিলেন, "কেন?"

বীরেন সোৎসাহে প্রফুল্লচিত্তে গর্ব্বভরে বলিল, "কেন? তিনি গেলে বাঙ্গালীর ছেলেকে মানুষ ক'রে গড়ে তুলবে কে? যাক্, আমার সব কথা খুলে বল্লুম, এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।"

মা ও মেয়ের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। নীহার বলিল, "তা হ'লে বাবার কাছে কি আপনি আত্মগোপন ক'রে থাকতে চান?"

বীরেন বলিল, "নিশ্চয়ই। তিনি পুলিসের কায করেন, তাঁকে এর মধ্যে জড়াতে চাইনি—অন্ততঃ গোবিন্দপুরে পৌঁছানো পর্য্যন্ত না। তার পর আমি আমার ব্যবস্থা করব।"

নীহার বলিল, "হাওড়ায় পৌঁছে আপনার লোকজন আপনার খোঁজ না নিতে এলে বাবাকে কি বলব?"

বীরেন ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "সে ভার আপনার উপর রইল—অন্ততঃ জিতেনদা'র সহধর্ম্মিণীর নিকট আমি এটুকু আশা করতে পারি। আজ চার বৎসর আপনি ছায়ার মত তাঁর সঙ্গিনী হয়ে ছিলেন।"

নীহার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

৩

গোবিন্দপুরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের গৃহের অন্তঃপুরের একটি কক্ষে নীহারবালা অত্যন্ত চঞ্চলভাবে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মুখে চোখে দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। জানালার ভিতর দিয়া অনন্তবিস্তার বিশালকায়া পদ্মার গুরুগম্ভীর তরঙ্গভঙ্গ দীপ্ত সূর্য্যকরে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু সে দিকে নীহারের আজ দৃষ্টি ছিল না।

হঠাৎ কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নীহারের জননী দেখা দিলেন। তাঁহার মুখে-চোখে একটা দারুণ নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। নীহার দ্রুতপাদবিক্ষেপে মায়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে উদ্বেগকাতর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল মা—কিছু করতে পার্‌লে?"

মোক্ষদা মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "না, মা, কিছুতেই তাঁর মন নরম করতে পারলুম না।"

নীহার কাতর স্বরে বলিল, "কিছুতেই না?"

মোক্ষদা বলিলেন, "না, কিছুতেই না। তাঁর এক কথা,—যে দেশের আইন মানে না, ধর্ম্ম মানে না, রাজা মানে না, দেশের লোকের বাড়ী ডাকাতী করে, সে যেই হোক না, দেশের শত্রু, তাঁরও শত্রু।"

নীহারের তখন লজ্জা ভয় কিছু ছিল না, সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "ছেলে বা জামাই হলেও সে শত্রু?"

মোক্ষদা জবাব দিলেন, "হাঁ, সে জামাই না, সে তাঁর শত্রু। তাকে তিনি নিজে ধরতে পার্‌লে আইনের হাতে দিতে পেছু পা হবেন না।"

নীহার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার পায়চারি করিতে লাগিল, ক্ষণপরে মায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, "তা হ'লে তাঁর মেয়েও তাঁর শত্রু?"

গৃহিণী জিব কাটিয়া বলিলেন, "বালাই! তিনি বলেন, তিনি বলেন,—"

নীহার কঠোরস্বরে বলিল, "কি মা? তিনি মনে করেন, তাঁর মেয়ে বিধবা হয়েছে, এই ত?"

মা মেয়ের মাথাটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বালাই, ষাট! ষাট! ও কথা কি বল্‌তে আছে? কত পাপ করেছিলুম মা—"

"কেন মা, বল্‌তে নেই কেন? বাপ যদি তা মনে কর্‌তে পারেন, তবে বল্লেই কি যত দোষ? যাক, তা হ'লে কোন উপায়ই তিনি কর্‌বেন না? তুমিও বীরেন-বাবুকে কোনও সাহায্য কর্‌বে না?"

মোক্ষদা সস্নেহে মেয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, রাগ করিস্ নে। জিতেন কি তাঁর কম আদরের বস্তু, কম স্নেহের ধন? কিন্তু কি কর্‌বেন, তিনি যে পুলিসের লোক, আইনের চাকর। তিনি বলেন, এ কাযে—এ কর্ত্তব্যপালনে আত্মীয়-স্বজনের মায়ার কথা ভাবতে গেলে চলে না—"

নীহার মায়ের কোল হইতে তীব্রবেগে মাথা তুলিয়া লইল, তাহার চোখে জল নাই, কিন্তু কি এক উজ্জ্বল আভায় তাহা ভরিয়া গিয়াছে। সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য কি, তা কি আমিও জানি নি? যখন হাসিমুখে তাঁকে দেশের কাযে বিদায় দিয়েছিলুম, তখন কি আমিও কর্ত্তব্যের কথা ভাবি নি? এই ক'মাস যখন তিনি গাঁয়ের গরীব চাষা-ভুষোদের বুকে তুলে নিয়ে তাঁর কর্ত্তব্য পালন কর্‌ছিলেন, তখন কি আমিও ত্যাগ স্বীকার করি নি—তাঁর দুঃখ কষ্ট, তাঁর কঠোর সাধনার কথা মনে ক'রে তাঁর বিদায়ের কষ্ট সহ্য করিনি? আমিও কর্ত্তব্য ভালবাসি, কিন্তু তা হ'তেও তিনি যে বড়!"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু, কিন্তু, তাঁর কর্ত্তব্য, তাঁর চাকুরী। জান না কি, ঐ কর্ত্তব্য তাঁর জীবনের কতটা অংশ জুড়ে রয়েছে?"

নীহার ভীষণ অসংযতস্বরে বলিল, "জানি। কিন্তু কি ছার্ এ কর্ত্তব্য প্রাণের টানের কাছে? যদি যথার্থ বাবার সে টান থাক্‌ত, তা হ'লে তিনি কি এমন কঠোর হ'তে পার্‌তেন? শ্বশুর কর্ত্তব্যের হাঁড়িকাঠে জামাইয়ের প্রাণ বলি দিতে পারেন, স্ত্রী তা পারে না। ছার কর্ত্তব্য ত দূরের কথা, স্বামীর প্রাণের জন্য স্ত্রী তার সর্ব্বস্ব বলি দিতে পারে। দেখি, এর উপায় কর্‌তে পারি কি না! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি ব'লে কি আমাদের কোন ক্ষমতা নেই, মা?"

নীহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, মোক্ষদা অবাক্ হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

৪

এই ঘটনার দুই চারি দিন পরে তারক বাবু অত্যন্ত ক্রোধভরে অন্দরে আসিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের এ সব কি বাড়াবাড়ি? রসুলপুর ডাকাতীর সম্পর্কে সব কাগজপত্র সিন্দুক থেকে চুরী গেল। আবার এ কি শুনি, তোমরা না কি একটা এনাকিষ্ট ছোঁড়াকে কুটুম্ব সাজিয়ে ঘরে পুরে রেখেছ? এ সব হ'ল কি? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বটে!"

গৃহিণীর মুখ শুকাইল, তিনি আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। তারক বাবু উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আগুন নিয়ে খেলা? মেয়েমানুষি বুদ্ধি কি সব যায়গায় চলে? কোথায় সে হতভাগা ছোঁড়া, এখনই এখানে পাঠিয়ে দাও, কতটা 'মিশচিফ' করেছে, আগে জান্‌তে চাই।"

গৃহিণী কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিলেন, "দেখ, অতটা কঠিন হোয়ো না। যা করেছি, জামাইয়ের মুখ চেয়েই করেছি। এ ছেলেটি বড় ভাল, আমায় মা বলেছে, আর নীহারকে দিদি বলে। জিতেনকে দেবতার মত দেখে ব'লে তার জন্যে প্রাণকেও তুচ্ছ ক'রে এ দেশে এসেছে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে লেক্‌চার দিতে হবে না। ছোঁড়াকে এখনই পাঠিয়ে দাও। দু'দিন সদরে গেছি, আর এই কাণ্ড! সাধ ক'রে বলে, মেয়েমানুষ!"

গৃহিণী কর্ত্তার সেই ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিলেন না, বাহিরে গিয়া ক্ষণপরে বীরেনকে তাহার গুপ্ত স্থান হইতে পাঠাইয়া দিলেন।

বীরেন কক্ষে প্রবেশ করিতেই তারক বাবু কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া পিস্তলটি সম্মুখে রাখিয়া গুরুগম্ভীরনাদে বলিলেন, "কি হে ছোকরা, খুব যে বুকের পাটা দেখতে পাই। মেয়েমানুষ সেজে হিন্দু গেরস্তর অন্দরে সেঁধিয়েছ, আবার ভোল্ বদলে কুটুম্ব সেজেছো, কোন্ সাহসে?"

বীরেনও গম্ভীরস্বরে বলিল, "যে সাহসে প্রাণকেও তুচ্ছ ক'রে নির্দ্দোষ বন্ধুর মুক্তি-সাধন কর্‌তে কাশী হ'তে এই পদ্মাতটে সিংহের বিবরে এসেছি, সেই সাহসে।"

"বহুৎ অাচ্ছা, খুব কথা শিখেছ দেখছি। তা' এই বহুরূপী সাজায় কি সাজা হয়, তা জানা আছে ?"

"আছে। থাকলেও তাতে ভয়ের কারণ নেই।"

"দেখ, ঘরের একটা কেলেঙ্কারী হবে, এই ভয়ে তোমায় এখনও গুলী ক'রে মারি নি, তা জান ? কিন্তু তোমাদের মত খুনে ডাকাত দেশের শত্রুগুলোকে কুকুরের মত গুলী ক'রে মারাই উচিত।"

"দেশের শত্রু আমরা ?—যাদের দেশ মা—"

"পাঁচ শ' বার। আইন মানে না, গুরুজন মানে না, ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাতী করে,—এরা আবার দেশোদ্ধার করতে আসে! যাক্, মিছে বাজে বোক্‌বো না। তুমি কি মনে করেছিলে, তোমার এই কারচুপি গোয়েন্দার চোখ এড়িয়েছে ? আমি সব জানি। এখন ভালয় ভালয় যে কাগজগুলো চুরী করেছ, ফিরিয়ে দাও, তোমার ফাঁসি নাও হ'তে পারে—অন্ততঃ আমি বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি।"

"ওঃ, এই জন্যে আপনি এখনও আমায় পুলিসে ধরিয়ে দেন নি বটে! তা কাগজপত্র ত আর পাবেন না। সে পেয়েই পুড়িয়ে ফেলেছি।"

তারক বাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! কি সর্ব্বনাশ! মিথ্যে কথা।"

বীরেন হাসিয়া বলিল, "বড় আশায় ছাই পড়েছে, না তারক বাবু? এত বড় সাজান মামলাটা বুঝি ফস্‌কে যায়!"

"শীঘ্র কাগজ বার ক'র—না হ'লে এখনই পুলিসে দেব।"

"দিন, এখনই দিন। আমার কায হয়ে গেছে। আপনার হাতের কাগজগুলো বাকি ছিল,তাও পুড়িয়ে ফেলেছি। আর জমীদারের ছেলের সাক্ষ্যসাবুদ—তাও সব ঠিক করেছি। এখন একটা কায বাকি, জিতেনদা'কে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া—"

"পাজী শয়তান! এই, কোন্ হ্যায় রে—"

"চেঁচাবেন না। আমি ত পুলিসের হেপাজাতেই রয়েছি, যখন ইচ্ছে আদালতে নিয়ে যেতে পারেন। অপরাধও আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু আমার এক অনুরোধ, জিতেনদা'কে ঘরে ফিরিয়ে আনুন, জিতেনদা' নির্দ্দোষ।"

"কখন না, সে খুনে ডাকাত।"

"ভুল, তারক বাবু, ভুল। যা প্রমাণ পেয়েছেন, সব ঐ জমীদার পুত্তুরের গড়াপেটা। বুঝছেন না, আক্রোশে সে এ কায করেছে ?"

"না, তা ছাড়াও প্রমাণ আছে।"

"তারও বাড়া বিরুদ্ধ প্রমাণ আমি দিতে পারি। যে দিন ডাকাতী হয়,সে দিন জিতেনদা কল্‌কেতায় অনুশীলন সমিতির এক গুপ্ত সভায় হাজির ছিল। বিশ্বাস হ'লনা? আচ্ছা, না হ'ক, আপনার মেয়ের কথাটাও একবার ভেবে দেখুন। আহা! তারও জন্মটা খেয়ে দিতে চান ?"

"তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? এতে তোমার স্বার্থ কি ? আমি এখনও বুঝতে পারছি না, জিতেনের জন্য তুমি কেন কাঁচা মাথা দিতে এলে? তোমার নবীন বয়স, ভদ্র আকৃতি, তুমি কি ভেবে এ কাযে নেমেছ ?"

বীরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিল, বলিল, "জিতেন আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু—"

"বন্ধু? হাঃ হাঃ! বন্ধুর জন্য কে এতটা করে ?"

"বিশ্বাস হ'ল না ? আচ্ছা, যদি বলি, আমাদের সম্প্রদায়ে দেশের কাযে মানুষ সব করতে পারে, তা হ'লে ?"—

"দেশের কায ? ও ত ফাঁকা কথা। দেশ কি ? দেশ কোথায় ? দেশের কাযটাই বা কি ?"

বীরেনের চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, সে কম্পিতকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বলিল, "দেশ কি? তারক বাবু, দেশ যে আমাদের মা! আমার মা, তোমার মা, আমাদের সকলের মা। যাঁর মাটীতে আমরা জন্মেছি, যাঁর পীযূষস্তন্যধারায় আমরা পুষ্টিলাভ করেছি, দেশ যে আমাদের সেই মা! সে মায়ের ঋণ কি তুচ্ছ জীবনদানেও শোধ করা যায় ?"

তারক বাবুর প্রাণের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। এ সব পাগলামির কথা তিনি অনেক স্বদেশী বক্তৃতায় শুনিয়াছেন। তিনি মনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া কঠোরস্বরে বলিলেন, "দেখ, ও সব লেক্‌চার আমরাও দিতে পারি। তোমাদের মুরদ যত সব জানা গিয়েছে। এক স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার, তাই পার্‌লে না, হাঃ হাঃ হাঃ! যাক্, তুমি জিতেনের বন্ধু, বিশেষতঃ আমার স্ত্রী ও কন্যা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে, এই জন্য দয়া ক'রে তোমায় এখনও ধরিয়ে দিই নি। কিন্তু আজ হ'তে তিন দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে মামলার কাগজপত্র যা নিয়েছ,

ফিরিয়ে দিয়ে যথা ইচ্ছা চ'লে যাও, কিছু বলব না। পুলিসের লোককেও ধরতে মানা ক'রে দেব। কেমন, রাজী আছ?"

বীরেন বলিল, "না।"

তারক বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না!"

বীরেন বলিল, "না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিতেনদা'র প্রতি আপনার মনের ভাব বদলিয়ে দিতে না পারবো, ততক্ষণ এখান থেকে এক পাও নড়ব না, মেরে তাড়িয়ে দিলে আবার ফিরে আসব।"

তারক বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে তোমায় মেরে তাড়াতে যাচ্ছে, আমি তোমায় পুলিসে ধরিয়ে দেব।"

বীরেন হাসিয়া বলিল, "ধরিয়ে দেবেন? বেশ, সে ত ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমায় জীয়ন্তে ধরিয়ে দিতে পারবেন না। ধরতে হ'লে আমার মৃত দেহটাকে ধরিয়ে দিতে হবে।"

তারক বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ইস্, বাঙ্গালীর ছেলের এত সাহস?"

বীরেন বলিল, "কেন, সে সাহসের পরিচয় কি এতদিন পান নি? তবে সরকার এত পয়সা খরচ ক'রে এত টিক্‌টিকি রেখেছে কেন? বাঙ্গালীর ছেলে হাসিমুখে জেলে যায় —ফাঁসিতেও ঝুলতে পারে।"

তারক বাবু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "বটে? তবে তাই হোক্। আজ থেকে তিন দিন সময় দিলুম, এর মধ্যে স'রে পড়। এখনও থানার বা গাঁয়ের লোক তোমার সন্ধান পায় নি। কিন্তু তিন দিন পরে যদি তোমায় এখানে দেখতে পাই, তা হ'লে স্বয়ং বিধাতা এলেও তোমার নিস্তার নেই। আমি তোমার জন্যে সদরে পরোয়ানা আন্‌তে চল্লুম।"

তারক বাবু এই কথা বলিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বীরেন কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করিয়া হাসিয়া ফেলিল তাহার পর বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

৮

আজ পদ্মাবতীর অতি ভীষণ রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি। সাঁঝের আঁধার নামিবার পূর্ব্বেই আকাশের ঈশান কোণে যে ছোট কাল মেঘখানি দেখা দিয়াছিল, তাহাই অল্পে অল্পে ঘটা করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামিয়াছে—সে বৃষ্টির পর রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, সে ঝড়ে পদ্মা ভীম রঙ্গে নাচিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পর যখন অল্প অল্প বৃষ্টি নামে, তখন মাঝি-মাল্লা যে যেখানে ছিল, সুবিধামত নৌকা লইয়া খালে-বিলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পদ্মা রণ-রঙ্গে মাতিয়া উঠিলে কে পদ্মাবক্ষে স্বেচ্ছায় থাকিতে চাহে?

সারা-রাত্রি উন্মত্ত বায়ু হা হা গর্জ্জিয়াছে, পদ্মার তরঙ্গরাশি সমস্ত রাত্রি ভীমরোলে হুহু গর্জ্জনে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়াছে, কূলপ্লাবী তরঙ্গ তরঙ্গের উপর চড়িয়া ভীষণ-শব্দে তটভঙ্গ করিয়াছে। শেষ রাত্রিতে ভীষণা পদ্মা ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে। এ ভীষণ দুর্য্যোগের সময়েও গোবিন্দপুরের নাতিদূরে পদ্মাবক্ষে একখানা ষ্টীমারের করুণ বাঁশীর সুর আকাশে ভাসিয়া আসিতেছিল—যেন সেই সুর কাতরভাবে গ্রামবাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিতেছিল। সেই ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু ও ঘনান্ধকারের মধ্যেও ষ্টীমারের ক্ষীণ আলোকরশ্মি গ্রাম হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে ষ্টীমারখানা লালমিঞার চড়ার গায়ে আছাড়িয়া পড়িতেছিল।

তারক বাবুর বাড়ীতে আজ কাহারও চোখে ঘুম নাই। এই জাহাজেই তারক বাবুর আজ বাড়ী ফিরিবার কথা, তবে তিনি ঠিক এই জাহাজেই আছেন কি না, কেহ জানে না। মা ও মেয়ে ঘরে আলোক জ্বালিয়া পদ্মার তাণ্ডবলীলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

ষ্টীমারের করুণ বাঁশী যখন স্পষ্ট বাজিয়া উঠিল, যখন জানালা দিয়া আর্ত্ত-উৎপীড়িত জাহাজের আলোকমালা স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, তখন নীহার আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডাকিল, "মা!"

যে সুরে "মা" কথাটি উচ্চারিত হইল, তাহাতে মোক্ষদা চমকিয়া উঠিলেন, তিনিও আকুলকণ্ঠে বলিলেন, "কি মা!"

"জাহাজখানা চড়ায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, বানচাল হ'ল ব'লে। ওতে যারা আছে—তাদের কি হবে, মা?"

"যা অদেষ্টে আছে, তাই হবে, ভেবে আর আমরা কি করব, মা?"

"তবু—তবু চোখের সামনে—"

জলতোলা

[শিল্পী—খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

কথাটা শেষ হইল না, নীহার অস্থির হইয়া উঠিল।

মোক্ষদা বলিলেন, "পোড়া জল-পুলিসের বোটখানাও মাঝি-মাল্লা নিয়ে কি ঠিক্ এই দিনেই তারপাসায় রওনা হ'ল!"

নীহার বাধা দিয়া বলিল,"হাঁ,মা, বাবা কি এই জাহাজেই —মা, ও মা, দেখ, দেখ, জাহাজখানা চড়ার গায়ে কাত হয়ে পড়েছে, ও মা! আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছে!"

মোক্ষদা হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কক্ষদ্বার খুলিয়া বারান্দায় মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন; বাহিরের উন্মত্ত বায়ু কোঁ কোঁ শব্দ করিয়া ঘরে ঢুকিল; সে ঝড়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে কাহার সাধ্য। নীহার খেয়াঘাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "মা, ও মা, ঐ দেখ, খেয়াঘাটায় কত লোক জড় হয়েছে, কত আলো জ্বলছে। চল না, মা, আমরাও যাই!"

"দূর পাগলী! আমাদের কি যেতে আছে?"

"কেন, মা, দোষ কি? আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি যত দোষ?"

"তা না ত কি মা? বিশেষ, এই দুর্য্যোগে এই রাত্তিরে সোমত্ত মেয়ে—"

"না, মা, আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছে। ওখানে গিয়ে চল দেখি, ওরা জাহাজের লোকদের বাঁচাবার কি করছে। ঐ দেখ, মা, পুবদিকে রাঙ্গা আভা দিচ্ছে, রাত বোধ হয় পুইয়ে এল।"

বস্তুতঃ রজনীর গাঢ় অন্ধকার তখন বিকাশোন্মুখ পুষ্প-কোরকের আবরণ-পটের মত ফাটিয়া পড়িতেছিল। খেয়া-ঘাটায় লোকজনের চেঁচামেচি সেই দুর্য্যোগের মধ্যেও বেশ শুনা যাইতেছিল। পাহারাওয়ালা রামখেলাওন তেওয়ারী ও আতাউল্লা শেখ লণ্ঠন ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, 'মায়ী-জীরা' খেয়াঘাটার দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে মোক্ষদা বলিলেন, "ছেলেটার কি ঘুম বাপু! গাঁ শুদ্ধ লোক উঠে পড়ল, বীরেন কিন্তু অসাড়ে ঘুমুচ্ছে।"

তেওয়ারী বলিল, "না মায়ীজী, ও বাবু ত আগে উঠিয়ে গেছে।"

* * * * *

সদর থানার ঘাট হইতে আজ অপরাহ্নে যখন তারক বাবু জাহাজে চাপেন, তখন ঘাটের কাছে এক স্বদেশী সভা হইতেছিল। কলিকাতা হইতে কয়েকজন দেশ-নায়ক সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বালক-গণ একটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া পথে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিল। গানটি এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরম পরি-চিত,—অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ।" বালকরা যখন নিশান-হস্তে মধুরকণ্ঠে গাহিতেছিল,—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ," তখন কি জানি কেন, তারক বাবুর সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হইতে-ছিল। এই গান যে তিনি আজ নূতন শুনিতেছিলেন, তাহা নহে, কত স্বদেশী সভায় এই গান তিনি শুনিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আজ যেন গানটি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার হৃদয়পটে উদিত হইল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলেও বরাবর ঐ গানটি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। আর—আর সেই সঙ্গে (দূর হউক দুর্ব্বলতা!)—সেই সঙ্গে আর একখানা কিশোর কমনীয় মুখের "আমার মা, তোমার মা, আমাদের সকলের মা" কথা কয়টি কি তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল?—কে জানে!

দূরের যাত্রীর মধ্যে তিনি স্বয়ং মাত্র। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি ও বাতাস উঠায় পর পর ষ্টেশনে যাত্রী নামিয়াই গেল, কেহ উঠিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যখন ঝড় উঠিল, তখন জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ ধরা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং পরে যখন পদ্মা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন জাহাজ বশে রাখাই দায় হইল। সারেঙ্গ ও খালাসীরা প্রাণপণে জাহাজখানাকে ঝড়ের মুখে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তটের সমীপবর্ত্তী হইবার যো নাই, তাহা হইলে জাহাজ তটে আছাড় খাইয়া খানচাল হইবে। আর ঘোর দুর্য্যোগ ও অন্ধকারে খাল-বিলের মোহানা নির্ণয় করা যায় না। জাহাজ এইভাবে ৩।৪ ঘণ্টা অনবরত ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গোবিন্দপুরের ঘাটের কাছে পৌঁছিল।

* * * * *

খেয়াঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মা ও মেয়ে দূর হইতে এক দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সেখানে বীরেন্দ্রনাথ জাহাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

এক দল লোককে কি বলিতেছে। দূর হইতে অনেকগুলি লণ্ঠনের আলোকে তাহার উজ্জ্বল আয়ত নয়ন তারকার মত জ্বলিতেছিল, মুখে এক অপার্থিব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অতিরিক্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় সে অতি দ্রুত কথা কহিয়া যাইতেছিল, শ্রোতারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিকটে গিয়া তাঁহারা শুনিলেন, বীরেন বলিতেছে, "ভাই সব, ঐ জাহাজে বাঁশী বাজছে, ওতে নিশ্চয় মানুষ রয়েছে। পাড় থেকে এই সামান্য ক' রশি তফাতে মানুষ হাত পা-বাঁধা কুকুরের মত ডুবে মরবে, আর আমরা এত কাছে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? কারও কি একখানা ডিঙ্গি নেই? যদি না থাকে, তবে আগে যা বলেছি, তাই কর, ঐ কাছি বাঁধ।"

এক জন জেলে বলিল, "ডিঙ্গি? তুমি ক্ষেপেছ, বাবু, এই দুরন্ত গাঙ্গে ডিঙ্গি ভাসাবে?"

বীরেন অস্থির হইয়া বলিল, "তবে, তবে?" এই সময়ে মা ও মেয়ের দিকে বীরেনের দৃষ্টি পড়িল। সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "এ কি, আপনারা এ দুর্য্যোগে বেরিয়েছেন? যান, যান, ঘরে ফিরে যান, যা করবার, আমরা করছি।"

কিন্তু নীহার কোন কথার জবাব না দিয়া পাষাণ-পুত্তলের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন বীরেন হাসি-মুখে বলিল, "দেখুন দিকি বোকামি! জাহাজখানা আর উল্টে পড়বার বিলম্ব নেই, তবু কেউ একখানা ডিঙ্গি দেবে না। যাক্, ভাই সব, সামান্য এই দু'চার রশি জল, এটা সাঁতরাতেও কষ্ট হবে না। দাও ঐ দড়িটা আমার কোমরে জড়িয়ে—কাছির গোড়াটা ঐ গাছের গুঁড়িতে কসে বাঁধ—"

পাঁচ সাত জন হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিল; নীহার একবার কি বলিতে গিয়া চুপ করিল। বীরেন আবার মধুর হাসিয়া কোমরে কাছি জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "তোমরা ভয় পাচ্ছ, ভয় কি? এ ত সামান্য দু'চার রশি, আমি সাঁতরে পদ্মা পার হ'তে পারি। এই দেখ না ১০ মিনিটে জাহাজে যাব"—বলিতে বলিতে তটপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া বীরেন্দ্রনাথ পদ্মাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিল—নীহার দৌড়িয়া বাধা দিতে গেল, কিন্তু কে যেন তাহার পা দুটা চাপিয়া ধরিল, মোক্ষদা অন্যান্য লোকের সহিত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এক জন পুলিসের লোক বীরেনের গলদেশে একটা লাইফ বেল্ট পরাইয়া দিয়াছিল।

* * * * *

আর আশা নাই, এই শেষ মুহূর্ত্ত! তারক বাবু যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন। চড়ায় জাহাজ ধাক্কা খাইবার সময় সারেঙ্গ জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। খালাসীরা একখানা লাইফ বোট ভাসাইয়াছে। তারক বাবু বোটে উঠিতে গিয়া ঝড়ের ধাক্কায় ডেকের উপর পড়িয়া গেলেন, খালাসীরা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া লাইফ বোট লইয়া বিপদ হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু এক বিপদ এড়াইতে না এড়াইতে আর এক বিপদ্ তাহাদিগকে গ্রাস করিল, প্রচণ্ড জলাবর্ত্তে পড়িয়া নৌকা মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল।

তারক বাবু তখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আসন্ন মৃত্যু, তবুও মানুষ সংসারের মায়া এড়াইতে পারে না। তাঁহার মনে হইতেছিল, একবার স্ত্রী-কন্যার সহিত শেষ দেখা হইল না! আর—আর—দূর হউক, সেই ছোঁড়াটা—সেই নবকিশলয়লাবণ্যমাখা হাসি হাসি মুখে "আমার মা, তোমার মা, আমাদের সকলের মা—"

সহসা জাহাজের গা বহিয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ডেকে চড়িতেছে! এ কি তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন? না, এ ত জীবন্ত মানুষ—এ কি, এ যে বীরেন্দ্রনাথ, সেই, সেই দুরন্ত লক্ষ্মী-ছাড়া ছোঁড়া! এ হাভাতে কোথা হইতে আসিল,—এ কি, এ কি,—সাঁতারিয়া আসিয়াছে?

"শীঘ্র আসুন, আপনার কোমরে জড়িয়ে দিই—আর কেউ আছে?" বীরেন নিজের কোমরের কাছি খুলিয়া তারক বাবুর কোমরে জড়াইল এবং তাঁহার গলদেশে লাইফ বেল্ট পরাইয়া দিল। তারক বাবু বিস্মিত, স্তম্ভিত! এমন ঘটনা ত তিনি তাঁহার পুলিসের ঘটনাময় জীবনে কখনও ঘটিতে দেখেন নাই! এ ছেলেটা কি ধাতুতে গড়া? মুখে বলিলেন, "তুমি বীরেন, তুমি—"

বীরেন বাধা দিয়া বলিল, "সময় নেই, দেখছেন না জাহাজ ডুবছে, শীঘ্র ঝাঁপ দিন, ডেঙ্গার লোক টেনে নেবে—"

"আর তুমি?"

বীরেনের সেই দুরন্ত মুখখানায় মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে হাসি তারক বাবু ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

বীরেন বলিল, "আমার জন্যে ভাববেন না, আমি সাঁতারও জানি। যান, যান।"

"না, না, তোমায় ফেলে যাব না, তুমি বালক,—তোমার এ ঋণ—এ্যাঁ, আমি তোমায় ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম!"

"ঋণ? ঋণ? তবে একটা অনুরোধ, আমি বাঁচি বা মরি, জিতেনদা'কে ঘরে নেবেন, আমার দিদির মুখে হাসি ফোটাবেন, জিতেনদা' নির্দ্দোষ—যান, যান, গেল, গেল, জাহাজ গেল, যান।"

এই বলিয়া বীরেন তারক বাবুকে পদ্মার তরঙ্গে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারক বাবু একবার ডুবিতে ও একবার ভাসিতে ভাসিতে দেখিলেন, বীরেন্দ্রনাথ হেলা জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রথম উষার অরুণরাগে তাহার মুখমণ্ডলে শান্তি তৃপ্তির এক অপার্থিব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর বীরেন্দ্রনাথ জলে ঝম্প প্রদান করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তারক বাবু আবার যখন ভাসিয়া উঠিয়া চড়ার দিকে চাহিলেন, তখন আর সেস্থানে জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না—সেস্থানটা জলে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর—আর দুরন্ত বীরেনের সেই হাসি হাসি মুখ কোথায় কোন্ দেশে অন্তর্হিত হইয়াছে!

*　　*　　*　　*

তীরের লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তারক বাবুকে টানিয়া তুলিল। তখন ভোর হইয়াছে, দুরন্ত পদ্মার আর সে ভীষণ মূর্ত্তি নাই, সব শান্ত, সব নীরব, যেন কিছু হয় নাই। তারক বাবু বহুক্ষণ পদ্মাতটে বসিয়া রহিলেন, চারিদিকে নৌকা পাঠাইলেন, কিন্তু হায়! সেই উষার মধুর আলোকে যে রত্নটি পদ্মার অতল গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবেন কি?

ঘরে ফিরিবার সময়, রোরুদ্যমানা পত্নী ও কন্যাকে সকল পরিচয় দিবার সময় তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের শত বৃশ্চিক-জ্বালা জলিয়া উঠিল। ঘরে ফিরিয়া তিনি চীৎকার করিয়া আপন মনে বলিলেন, "মূঢ় আমি, আমার এই সামান্য বিদ্যা লইয়া আমি মানুষ চিনিবার বড়াই করি! জন্মভূমি! তোমার সন্তানকে চিনিব কিরূপে?"

যতবার তারক বাবু সেই কোমল কিশোর বালকের মুখখানি ভুলিবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই তাঁহার মনে পড়িল সেই কথা, "আমার মা, তোমার মা, আমাদের মা!" আর মনে পড়িল সেই গান, "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সংসার-কুলায়।

১

ঘন শ্যামল পাতার কোলে মোর এ শীতল কুলায় ভালো,
হেথায় আমার গান জাগিল হেথায় আমার প্রাণ জুড়ালো।
নীলাকাশে চাই না তোমার,
নির্ম্মম ঐ মুক্তি উদার,
শরণহারা ধূ ধূ করা অসীম দেশের অসীম আলো।

২

বিশাল হ'লেও ঐ নীলাকাশ বিশাল খাঁচা আলোর খাঁচা,
পুড়বে পালা উড়বে পালক, শূন্য তাতে যায় কি বাঁচা?
চাইনে অসীমতার বেদন,
ভালো আমার সীমার বাঁধন,
নিজের রচা বাঁধন এ মোর মুক্তি-সুধার স্বাদ বিলালো।

৩

নিবিড় মিলনমাঝে আমি আছি তোমার কাছাকাছি,
স্নেহ প্রেমের সঙ্গী ফেলে একাকী না মুক্তি যাচি।
রোক্ ভরা এ কোলাহলে,
দুলুক্ ঝড়ে ভিজুক্ জলে,
হোক না আঁধার, বন-দেবতা, কুলায়-দ্বারে জোনাক জ্বালো।

শ্রীকালিদাস রায়।

দাগীর সন্ধানে।

সভ্যতাবৃদ্ধি, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সুসভ্য দেশসমূহে নানাপ্রকার অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। সভ্যতালোকপ্রদীপ্ত য়ুরোপে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নানাপ্রকার অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালীরও উদ্ভব হইয়াছে। অপরাধীও, আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য নব নব প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছে। অভিজ্ঞগণ, এ সম্বন্ধে বহু নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার কথা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশও করিয়াছেন। জীবন-সংগ্রামের এ সকল কাহিনীতত্ত্ব উপভোগ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "মানবশিকার"-সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের গোটাকয়েক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব; লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন ও ভিয়েনার গুপ্তচরগণ কিরূপে অভিনব প্রণালীতে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে, সংক্ষেপে সেই সকল কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বের বর্ণনা করিব। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া এই চারিটি দেশের প্রণালীর সম্বন্ধে আমরা নিম্নে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটিও কল্পনাপ্রসূত নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল।

লণ্ডনে বিচিত্র হত্যারহস্য।

লণ্ডন নগরের পূর্ব্বভাগে একটি ত্রিতল অট্টালিকায় স্নাইথারস্ নামে একটি লোক বাস করিত। বাড়ীটি এমনই সৌষ্ঠবহীন যে, সহসা কাহারও দৃষ্টি সে দিকে পড়ে না। স্নাইথারস্ প্রায় বিংশ বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার নূতন ও পুরাতন জিনিষের "বিকি-কিনি"র দ্বারা রীতিমত অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল। বেশ দাঁও মাফিক সে মূল্যবান্ জিনিষ কিনিত। এ বিষয়ে তাহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। সময়ে সময়ে এ জন্য লোকের অভিসম্পাতও সে অম্লান-বদনে কুড়াইয়া লইত। শুধু অভিসম্পাত নহে, কোন কোনও ব্যাপারে লোক তাহাকে প্রাণে মারিবার ভয়ও দেখাইত। অবশ্য, অভিসম্পাতকে সে গ্রাহ্য করিত না; কিন্তু যাহারা তাহাকে ভয় দেখাইয়া যাইত, তাহাদের কথাটা সে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিত না। ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তাটা তাহার ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। সে অবশ্য যথাসাধ্য দীন দুঃখীর ন্যায় জীবন যাপন করিত। সে যে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে, এ কথাটা সে কোনও দিন বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইতে দিত না। পাছে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে অথবা তাহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লয়, এই দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া সে উল্লিখিত আড়ম্বরহীন অট্টালিকাটি ক্রয় করে। অট্টালিকার দ্বার-জানালাগুলি অত্যন্ত দৃঢ় ও সৌষ্ঠবহীন; সহসা লুব্ধের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে না, এই ভাবিয়া সে বাড়ীটি কিনিয়াছিল। পরে প্রবেশপথগুলি লোহার গরাদের দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া সে বড় বড় তালা দিয়া সেগুলি বন্ধ করিয়া রাখিত। চোর, ডাকাইত নানা উপায়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাও সে ভালরূপে জানিত। সেজন্য সে বৈদ্যুতিক তার এমন ভাবে বাড়ীর চারিদিকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল যে, কোনও দরজার হাতল অথবা জানালার শার্সি বা কপাট স্পর্শমাত্রেই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আপনি বাজিয়া উঠিত। যদি ঘটনাক্রমে কেহ বৈদ্যুতিক তারের অবস্থান আবিষ্কার করিয়া কোনও উপায়ে তার কাটিয়া ফেলে, তাহার প্রতিবিধানও সে করিয়া রাখিয়াছিল। তারের সঙ্গে সে তারবিশিষ্ট সীসা এমনভাবে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিল যে, কর্ত্তিত তার তাহার ভারে নিম্নে পড়িয়া যাইবে, আর সেই সঙ্গে বন্দুকের বিস্ফোরক গুলী সশব্দে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ন্যায়ই গৃহস্বামীকে সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে। এইরূপে আবাস-ভবনকে সুরক্ষিত করিয়া স্নাইথারস্ একাকী সেই গৃহে অবস্থান করিত। সে কোনও দিন কোনও ব্যক্তিকে তাহার ভবনে প্রবেশ করিতে দিত না।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও এক দিন ব্যবসায়িগণ সবিস্ময়ে দেখিল যে, তাহার ভবনের বাহিরের সোপানের উপর তাহার অর্ডার দেওয়া দ্রব্যগুলি সকালবেলা হইতেই পড়িয়া আছে, কেহ সেগুলি ভিতরে লইয়া যাইতেছে না। এমন অভিনব ঘটনা দেখিয়া ক্রমে সকলের মনে সন্দেহ জন্মে। পুলিসে সংবাদ প্রেরিত হইল। তখন পুলিস আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল,

স্মাইথারস্‌কে কেহ হত্যা করিয়া, তাহার সুদৃঢ় লৌহ-সিন্দুক হইতে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। বৈদ্যুতিক তার ছিন্ন; বিস্ফোরক গুলীর উপর পুরু করিয়া কাপড় পাতা, কাজেই বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে গুলী ফাটিয়া যাইতে পারে নাই। যে বা যাহারা এই কার্য্য করিয়াছে, তাহারা যে বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও পাকা চোর, সে বিষয়ে পুলিসের সন্দেহ রহিল না। বাড়ীর কোনও দ্রব্যে একটি অঙ্গুলির ছাপ মাত্র পড়ে নাই। এমন কোনও নিদর্শনও তাহারা রাখিয়া যায় নাই—যাহার দ্বারা পুলিস কোনও অনুসন্ধান করিতে পারে। শুধু বালকের ক্রীড়ার উপযোগী একটা ছোট আঁধারে-লণ্ঠন সেখানে পড়িয়া ছিল। হাতে দস্তানা পরিয়াই যে চোরেরা এ কার্য্য করিয়া গিয়াছে, পুলিসের সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র রহিল না।

লণ্ডনের সুবিখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগ "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের" পুলিস এই অপূর্ব্ব হত্যা-রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোনও সূত্রই তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিল না। তাহাদের অনুসন্ধানের একটিমাত্র সূত্র ঐ ক্ষুদ্র আঁধারে-লণ্ঠনটি। যে সকল দোকানে ছেলেদের খেলানা বিক্রীত হয়, তথায় ঐ লণ্ঠনটি লইয়া গোয়েন্দাগণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কে কবে উহা ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু স্থির হইল যে, সহরতলীর পল্লী-রমণীরা তাহাদের সাত আট বৎসরের সন্তানদের জন্য এই প্রকার খেলার লণ্ঠন কিনিয়া থাকে।

গোয়েন্দাগণ মিলিত হইয়া পরে অনুসন্ধানের জন্য আর একটা উপায় অবলম্বন করিল। জনৈক গোয়েন্দার একটি সাত বৎসরের পুত্র ছিল। সেই গোয়েন্দার উপর ভার দেওয়া হইল যে, সে তাহার পুত্রকে ঐ লণ্ঠনটি লইয়া খেলা করিতে দিবে। নগরের প্রান্তভাগে, যে যে স্থলের লোক ঐ প্রকার খেলানা কিনিয়া থাকে, সেই সেই বিভাগে গোয়েন্দাটি তাহার পুত্রসহ বাস করিবে এবং পথে পথে বালকটি ঐ লণ্ঠন লইয়া আপন মনে খেলা করিয়া বেড়াইবে। পুত্রের পিতা (গোয়েন্দাটি) শুধু গোপনভাবে তাহার উপর সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে। কাযটি নিতান্তই কষ্টদায়ক। কিন্তু গোয়েন্দা অবহিতচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। এক সপ্তাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহাকে সে স্থল ছাড়িয়া সন্নিহিত অন্য আর এক বিভাগে ঐরূপ পরীক্ষার আদেশ দিলেন। সেখানেও ফল একই হইল। আবার অন্যত্র যাইয়া ঐরূপ পরীক্ষার জন্য গোয়েন্দার নিকট আদেশ আসিল। এইরূপে বহুবার বহুস্থানে ঐ প্রণালীতে পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ক্রমে গোয়েন্দা বিভাগ বুঝিলেন, এই হত্যা-রহস্যের আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড একেবারে হাল ছাড়িল না। পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াও কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন। ইংরাজ জাতির উহা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এক দিন উক্ত গোয়েন্দার পুত্রটি পূর্ব্ববৎ একটি রাস্তার ধারে লণ্ঠনটি লইয়া ঘুরিতেছে, এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক তাহার নিকট উপস্থিত হইল। লণ্ঠনটি দেখিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল, "এটা আমার লণ্ঠন, আমায় দাও।"

গোয়েন্দার পুত্রটি সরোষে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তোমার বৈকি! আমি দেব না।"

নবাগত বালক বলিল, "না, এ আমার লণ্ঠন, আমি চিনি!"

গোয়েন্দা অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। সে নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি ঠিক বলছ এটা তোমার? আমার ছেলে কয়েক সপ্তাহ আগে এটা কুড়িয়ে পেয়েছে।"

আগন্তুক বালক বলিল, "সত্যি এটা আমার লণ্ঠন। আমি প্রমাণ দিতে পারি। লণ্ঠনের পলতে পুড়ে গেলে আমি আমার বোনের ফ্লানেলের পোষাক থেকে খানিকটা কাপড় কেটে নিয়ে পলতে তৈরি করেছিলুম।"

গোয়েন্দা লণ্ঠনটি খুলিয়া পলিতাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, বাস্তবিকই বালকের কথা সত্য। তখন সে বলিল, "আচ্ছা, চল তোমার মা'র কাছে যাই। যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে লণ্ঠনটা তোমায় ফিরিয়ে দেব।"

তিন জন তখন বালকের মাতার নিকট গেল। স্ত্রীলোকটি বিধবা। তাহার বাড়ীর অন্যান্য অংশ সে ভাড়া দিত। রমণীটি পরিশ্রমী ও সাধু উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অনুসন্ধানে তাহাও প্রকাশ পাইল। বালকের মাতার কথায় প্রমাণিত হইল যে, বালক মিথ্যা বলে নাই। তখন গোয়েন্দা লণ্ঠনটি বালককে ফিরাইয়া দিল। রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে আরও জানিতে পারিল

যে, তাহার বাড়ীর দুই জন ভাড়াটিয়া বিল পরিশোধ না করিয়াই যে দিন হইতে উধাও হইয়াছে, সেই দিন হইতেই লণ্ঠনটি হারাইয়া গিয়াছিল। ভাড়াটিয়া-যুগলের এক জন রমণীকে বলিয়াছিল যে, সে তাড়িতের কায করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, অপরটি প্লম্বারের কায করে। তাহাদের কাছে ঐ সকল কার্য্যের উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রাদিও ছিল। রমণী স্বয়ং সে সকল যন্ত্র তাহাদের ঘরেই দেখিয়াছে।

তখন গোয়েন্দা-বিভাগের কায ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল। গোয়েন্দাগণ যাবতীয় প্লম্বার ও তড়িতের কায-জানা যুবকের সন্ধান লইতে লাগিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতাপত্রে যে সকল অপরাধীর তালিকা ছিল, তাহার সাহায্যে এবং অন্য প্রকার উপায়ে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। যে যে ভাড়াটিয়া বাড়ী নগর ও সহরতলীতে ছিল, সর্ব্বত্র চর ঘুরিতে লাগিল। নৃত্যাগার, হোটেল কোনও স্থলই বাদ পড়িল না। এমন ব্যাপারে ব্যষ্টির দ্বারা কায হয় না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সংহতি-শক্তি অতুলনীয়। রীতিমত অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর উল্লিখিত রমণীর বর্ণনার অনুযায়ী দুইটি যুবকের সন্ধান মিলিল। তাহাদের অজ্ঞাতসারে রমণী গোয়েন্দাদিগকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিল যে, উক্ত যুবক দুইটিই তাহার বাড়ীতে ভাড়াটিয়ারূপে অবস্থান করিয়াছিল।

তাহারা বাড়ীওয়ালীর বিলের টাকা পরিশোধ না করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া যুবকদিগের বিরুদ্ধে পুলিস তখনও অন্য কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কাযেই সংগোপনে তাহাদিগকে নজরবন্দী রাখা ছাড়া পুলিস তখন তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিল না। ক্রমে অনুসন্ধানে গোয়েন্দারা আবিষ্কার করিল যে, যুবকরা পল্লীগ্রামে গিয়া বৃক্ষের কাণ্ডে পিস্তল ছুড়িয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিয়া থাকে। বৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ গুলী বাহির করিয়া অভিজ্ঞগণ স্থির করিলেন যে, নিহত রূপণের মস্তকের মধ্য হইতে যে গুলী বাহির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত বৃক্ষকাণ্ড হইতে সংগৃহীত গুলীর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। উভয় গুলীই সাধারণ আকারের অপেক্ষা বড়।

তখন গোয়েন্দার দল সুকৌশলে যুবক দুইটির অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহে মন দিল। প্রত্যেকের সংগৃহীত বিবরণ হইতে বিশেষ কোনও কাযের কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেক গোয়েন্দার সংগৃহীত ইতিবৃত্ত একত্র সন্নিবিষ্ট হইবার পর যুবক দুইটিকে রূপণ স্মাইথারসের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা হইল। যে বেড়া জালে তাহারা ধরা পড়িল, তাহা হইতে উদ্ধারলাভের কোনও সম্ভাবনাই তাহাদের ছিল না।

বিচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপরাধীরা বুঝিতেই পারে নাই যে, পুলিসের এ নাগপাশ অচ্ছেদ্য। তখন অপরাধি-যুগলের মধ্যে যাহার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স, সে নৈরাশ্যজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল যে, যদি তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে সে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু রাজার তরফ হইতে উত্তর আসিল, তাহাকে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। তাহাদের বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাহার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নাই।

ফরাসী পুলিস।

অনুরূপ অবস্থায় ফরাসী পুলিস কিরূপ ভাবে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে, তাহার বিবরণ দিতেছি। প্যারী নগরীর এতোলী বিভাগে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনেকের গৃহ হইতে কয়েকটা অদ্ভুত চুরীর সংবাদ ফরাসী পুলিসের কর্ণগোচর হয়। সে চুরীর ব্যাপার সত্যই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রতিবারই কোন না কোন মূল্যবান্ কলাশিল্পবিষয়ক পদার্থ অভিজাত-সম্প্রদায়ের গৃহ হইতে যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে অন্তর্হিত হইতেছিল। পুলিস বুঝিল যে, এই চুরী কোনও ব্যক্তিবিশেষের কায। অপহৃত দ্রব্যগুলি মূল্যবান্ বটে; কিন্তু এমন বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট নহে যে, অন্যের নিকট তাহা সহজে বিক্রয় করা যায় না বা তাহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে প্যারীর পুলিস স্থির করিল যে, একই ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইতেছে। কিন্তু লোকটা এমনই আটঘাট বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ যে, পুলিস কোনও সূত্রেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। পুলিস নিঃসন্দেহ এই মীমাংসায় উপনীত হইল যে, লোকটা দস্তানা পরিয়াই চৌর্য্যে লিপ্ত, কারণ, তাহার অঙ্গুলির ছাপ কোনও ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নাই।

প্যারীর গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে যাহার নির্দ্দিষ্ট ধারণা অনুসারে সমাজে মিশিয়া চোরের সন্ধান লইতে

লাগিল। কিন্তু কোনও উপায়েই চোর ধরিবার কোনও সূত্র আবিষ্কৃত হইল না। ডবুনে নামক জনৈক গোয়েন্দাও নিজের ধারণা অনুসারে অদ্ভুত শক্তিশালী চোরের সন্ধানে ফিরিতেছিল। সে আপনাকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। কৌতূহলোদ্দীপক কলাশিল্প-সংক্রান্ত ভাল ভাল দ্রব্য-সংগ্রহের নেশাই তাহার জীবনের অবলম্বন—এ কথাটাও প্রচার করিতে সে বিস্মৃত হইল না। যাহাদের এ বিষয়ে রুচি আছে, এমন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে একটি শান্ত-প্রকৃতি অথচ উৎসাহী ব্যক্তির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। সে ক্রমে জানিতে পারিল যে, কোথায় গেলে কলাশিল্প-সংক্রান্ত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে পারে, এই ভদ্রলোকটি তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন। ডবুনে, লোকটির সহিত বিশেষ মাখামাখি ভাব দেখাইতে লাগিল; কিন্তু সে যতটা সৌহার্দ্দ দেখাইতেছিল, প্রতিদানে লোকটি তাহাকে ততটা দিতেছে না, এই ওজুহতে ডবুনে ক্রমে উক্ত অসামাজিক ব্যক্তিটির সংস্রব ত্যাগ করিল। সে ব্যক্তির নাম লারুস্।

ডবুনে তখনও লারুস্ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। যে চোর আইনের চক্ষুতে ধূলা দিয়া অবাধে চৌর্য্য-বৃত্তি চালাইতেছে, তাহার সহিত লারুসের কতটুকু যোগাযোগ আছে, সে সম্বন্ধেও ডবুনের ধারণা বিশেষ পরিপুষ্ট হয় নাই। কাজেই সহযোগী গোয়েন্দাগণকেও লারুসের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। ডবুনে যদিও লোকটির গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, তবুও লারুস্ এমনই চতুর যে, প্রায়ই সে তাহার দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইত।

ডবুনে তখন স্থির করিল যে, হয় লারুস্ দোষী, নয় ত সে নির্দ্দোষ। লারুস্ যে হোটেলে বাস করিতেছিল, একদা রাত্রিকালে তথায় তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে গোয়েন্দা দেখিতে পাইল যে, সান্ধ্য-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া লারুস্ বাহিরে যাইতেছে। অতি সংগোপনে ডবুনে লোকটির কক্ষের সম্মুখে আসিয়া চাবির সাহায্যে দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পর সে তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় জিনিষ পরীক্ষা করিতে লাগিল। তিনটি বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ;—একজোড়া বহু ব্যবহৃত দস্তানা, একটা কাচের কুঁজা, ও একটি কাচের গেলাস। লারুস্ তাহার শয্যার বামধারে একটা আধারের উপর ঐ তিনটি জিনিষ রাখিয়াছিল।

বামহস্তের দস্তানার যে অংশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকে, উহার সাহায্যে ডবুনে সেই স্থানটা ঘষিতে লাগিল। দস্তানাটা ছাগময়-চামড়া নির্ম্মিত। ঘষিতে ঘষিতে অবশেষে একটা অতি সূক্ষ্ম পরদামাত্র সেই স্থানে অবশিষ্ট রহিল। এমন নিপুণভাবে সে এই কার্য্য সম্পাদন করিল যে, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে এই পরিবর্ত্তন সহসা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। তাহার পর গোয়েন্দা গ্লাস ও কাচের কুঁজাটির বাহিরের দিক পরিপাটীরূপে ঘষিয়া পরিষ্কার করিল। গৃহত্যাগকালে সে কোনও জিনিষ সঙ্গে লইল না।

পরদিবস প্রাতঃকালে লারুস্ হোটেল হইতে নির্গত হইবামাত্র ডবুনে তাহার ঘরে পূর্ব্ববৎ প্রবেশ করিল এবং কুঁজা ও গ্লাস পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। একটি ক্ষুদ্র ব্রসের সাহায্যে সে কুঁজা ও গ্লাসের উপর রাসায়নিক চূর্ণ নিক্ষেপ করিল। লারুসের অঙ্গুলির ছাপ তাহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অনুরূপ গ্লাস ও কুঁজা সে সঙ্গে আনিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইটি জিনিসের স্থলে আনীত কুঁজা ও গ্লাস যথারীতি রাখিয়া দিয়া সে উল্লিখিত দ্রব্য দুইটি আপিসে লইয়া গেল।

উক্ত ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে পুলিসের নিকট পূর্ব্বোক্ত-প্রকার চুরীর অভিযোগ আসিল। এবারও চোর কোনও সূত্র রাখিয়া যায় নাই। তবে পুলিস এবার বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কয়েকটা অতি অস্পষ্ট চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল মাত্র। তাহাই পর্য্যাপ্ত। ডবুনের স্বাভাবিক বুদ্ধি এ ক্ষেত্রে জয় লাভ করিল। সে জানিত, দস্তানার সূক্ষ্মতম আবরণ ভেদ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ যেখানে পড়িবে, তথায় রেখা রাখিয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। সেই রেখার সহিত কুঁজা ও গ্লাসের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ মিলাইয়া অবশেষে লারুসকেই চোর বলিয়া সনাক্ত করিবার সুযোগ ঘটিল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রণালীর সহিত ফরাসী গোয়েন্দার অবলম্বিত প্রণালীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাহাদুরী সংহতিশক্তিতে, আর ফরাসী গোয়েন্দার ব্যাপারটি শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলস্বরূপ। ফরাসী পুলিস এ ক্ষেত্রে সহযোগীদিগের সাহায্যলাভে বঞ্চিত।

জর্ম্মাণ প্রণালী।

জর্ম্মণ গোয়েন্দা বিভাগ, ইংরাজের ন্যায় সংহতিশক্তির ভক্ত। কিন্তু তথাপি ইংরাজ ও জর্ম্মণ্‌-প্রণালীতে, বিশিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বার্লিন নগরে একটি রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড ঘটে। কোনও বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর মৃতদেহ সহরতলীর সন্নিহিত একটি গলির মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। সেই গলির অনতিদূরেই উক্ত রাজকর্ম্মচারীর বাসা ছিল। পরীক্ষায় পুলিস এইটুকু আবিষ্কার করিতে পারিল যে, পশ্চাদ্দিক হইতে উক্ত রাজকর্ম্মচারী আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং পিত্তলনির্ম্মিত একপ্রকার ফাঁস যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। তাহার পর তাঁহার মৃতদেহ গলির মধ্যে আততায়ী ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার যাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। মৃতদেহ, ঘটনার পরের দিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের সময় নিকটে কেহ কোথাও যে ছিল না, পুলিসের অনুসন্ধানে তাহাও প্রকাশ পাইল। বস্তুতঃ হত্যাকারী এমনই সাবধানতা সহকারে কার্য্য করিয়াছিল যে, পুলিসের পক্ষে অনুসন্ধানের কোনও সূত্রই ছিল না।

কিন্তু বার্লিনের পুলিস বিভাগে এমন একটি যন্ত্র আছে, যাহার সাহায্যে এরূপ রহস্যের সমাধান আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক জর্ম্মণীর অবলম্বিত প্রণালীটি অভ্রান্ত ও অমোঘ। সংহতিশক্তি অনুসারে কার্য্য হইলেও জর্ম্মণপ্রণালী অভিনব এবং তাহার অমোঘ কবল হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। জর্ম্মণীর প্রত্যেক ব্যক্তির—তা খাস জর্ম্মণই হউক অথবা বিদেশীই হউক না কেন—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, বিদেশী হইলে তাহার নগর-প্রবেশের তারিখ হইতে যাবতীয় ব্যাপারের ইতিহাস পুলিস-বিভাগের খাস আপিসে লেখা থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির নামে একখানি করিয়া কার্ড আছে। যদি কোনও পুলিসের কখনও কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, অমনই তিন মিনিটের মধ্যে প্রধান পুলিস আপিস হইতে সেই ব্যক্তির জন্ম-তারিখ, অবস্থা, শিক্ষা, সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মায় পিতামাতার নামধাম পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার পুলিস তখনই জানিতে পারে। যদি সে ব্যক্তি বিদেশীয় না হইয়া জর্ম্মণ হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন নগরের রিপোর্ট মিলাইয়া তাহার জীবনের সকল ঘটনাই অনুসন্ধানকারী পুলিসের হস্তগত হয়। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির ধর্ম্মমত, জীবনযাত্রা-প্রণালী, স্ত্রীপুত্রের নাম, বয়স, কবে কোথায় কত দিন কি ভাবে অবস্থান করিয়াছিল, আত্মীয়-স্বজনের কবে বা কোথায় মৃত্যু হইয়াছিল, এমন কি, তাহার ভৃত্যবর্গের ইতিহাস পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না।

এই Meldwesen বিভাগ যেমন বৃহৎ, তেমনই সুসম্পূর্ণ। বর্ত্তমানে বার্লিনের এই বিভাগে দুই কোটিরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তির নামের কার্ড সংগৃহীত আছে। প্রধান পুলিসকার্য্যালয়ে এ জন্য এক শত আটান্নটি ঘর আছে। দুই শত নব্বই জন কর্ম্মচারী এই কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত। প্রতিদিনই কার্ডের সংখ্যা, ইতিহাসের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। শুধু 'এইচ্‌' অক্ষরের কার্ডগুলি রাখিবার জন্য বর্ত্তমানে দশটি ঘর আছে, আর 'এম্‌' অক্ষরের জন্য সতেরটি ঘরের প্রয়োজন হইয়াছে।

নামের ইতিবৃত্ত ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি ত আছেই। যদি কোনও ব্যক্তি জর্ম্মণীতে গিয়া নিজের নামধাম প্রভৃতির কোনও পরিচয় না দেয়, তবে জর্ম্মণ পুলিস অন্য উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই প্রণালীকে Razzia বলা হয়। বার্লিন পুলিস দলবলসহ যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থলে বিনা ওয়ারেণ্টে যাহাকে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। সাধারণ পান্থনিবাস, হোটেল, থিয়েটার বলিয়া নহে; যে কোনও ব্যক্তির নিজের অথবা ভাড়াটিয়া বাড়ীতেও চড়াও হইবার অধিকার পুলিসের আছে। এইরূপ কোনও স্থলে পুলিস যাহাদিগকে ঘেরাও করে, তাহাদের সকলকেই স্ব স্ব জীবনের যাবতীয় ইতিহাস পুলিসের নিকট বিবৃত করিতে হয়। Meldwesen বিভাগের বর্ণনার সহিত Razzia প্রণালীর বর্ণনা মিলাইয়া দেখা হইলে, যদি কাহারও বিবরণে কোনও অসঙ্গতি থাকে, তবে প্রথমবারের অপরাধ বলিয়া শুধু তাহাকে জরিমানা দিতে হয়; যদি একবারের অধিক হয়, তবে তাহাকে জেলে যাইতে হয়।

আলোচ্য ঘটনায় বার্লিন পুলিস একটি প্রমোদ-ভবনে হানা দেয়। সেখানে যত লোক ছিল, তন্মধ্যে প্রায় তিন

শত ব্যক্তির বর্ণনায় পুলিসের পূর্ব্ব-সংগৃহীত বর্ণনার সহিত অসামঞ্জস্য ঘটে। তাহাদের সকলকেই পুলিস গ্রেপ্তার করে। তখন প্রত্যেকের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হইতে থাকে। অনুসন্ধানের ফলে উক্ত তিন শত ব্যক্তির মধ্যে ষাট জনের সম্বন্ধে এমন ঘটনা বাহির হইয়া পড়ে যে, ভিন্ন ভিন্ন নগরে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত। তত্রত্য পুলিস তাহাদিগের সন্ধানে ফিরিতেছে।

বার্লিন নগরের উক্ত নিহত রাজকর্ম্মচারীর হত্যারহস্য উদ্ঘাটনের জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিস সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় সাত আট জন লোক লইয়াই একটা অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে অধিকসংখ্যক কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তিন চারি জন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা পুলিস-কর্ম্মচারী, এক জন পুলিস ডাক্তার, এক জন ফটোগ্রাফার এবং এক জন বা কোন কোন স্থলে দুই জন বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা সমিতির মধ্যে থাকে। পুলিস বিভাগে এই প্রকার একত্রিশটি স্বতন্ত্র দল আছে। এক একটি দল এক এক বিষয়ে সুদক্ষ। তাহারা নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত কখনই বিষয়ান্তরে মন দেয় না।

আলোচ্য ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য রাহাজানি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই জন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আর এক জন গোয়েন্দা ছিলেন, তিনি গলায় ফাঁস আঁটিয়া রাহাজানি বিষয়ের অনুসন্ধানে বিশেষ পারদর্শী। এই সকল বিশেষজ্ঞ, রাজকর্ম্মচারীর হত্যা-রহস্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রমোদ-ভবনে যে সকল নর-নারী মৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি সুন্দরী যুবতীও ছিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, এই যুবতী কোন এক ব্যক্তির রক্ষিতা। সেই ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে অপর দুই নগরে তিনবার রাহাজানি করিয়াছিল। যাহারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের শ্বাস রোধ করিয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ সকল সংবাদ উক্ত দুই নগরের লিখিত বিবরণ হইতেই গোয়েন্দাগণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সূত্র ধরিয়া সেই ব্যক্তির অন্যান্য সহকারীর কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবশেষে গোয়েন্দারা হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলেন। সে ব্যক্তি বিচারকালে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, ঘটনার সময় সে অন্য নগরে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেই নগরের পুলিস-বিবরণী হইতে তাহার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে। তাহার পর জর্ম্মণ পুলিসের কাছে লোকটা আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, জর্ম্মণীর পুলিস বিভাগ একটি বিরাট যন্ত্রস্বরূপ। ইহা হইতে উদ্ধারলাভের আশা অপরাধীর পক্ষে বাতুলতামাত্র। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিস বিভাগকে মানব-বুদ্ধিসম্পন্ন একটি দল বলা যাইতে পারে। আর জর্ম্মণীর পুলিস বিভাগ ঠিক যন্ত্রস্বরূপ। ফরাসী পুলিসের সংহতিশক্তি নাই, উহার গোয়েন্দার ব্যক্তিত্বই উহার বৈশিষ্ট্য।

অষ্ট্রীয়ার মানব-শিকার-প্রণালী।

অষ্ট্রীয়ার প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভিয়েনার পুলিস বিভাগ, জর্ম্মণীর ন্যায় যন্ত্রবিশেষ নহে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সংহতি-শক্তিও তাহাতে নাই। ফরাসী গোয়েন্দার ন্যায় ব্যক্তিত্বের বিকাশও তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ "মানব-শিকার"-প্রণালীর তুলনায় ভিয়েনায় অবলম্বিত প্রণালী হীন ত নহেই, বরং উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়েই ভিয়েনার পুলিস, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে।

ওয়ায়েনার ওয়াড্ নামক স্থানে জনৈক কোটিপতি নির্জ্জনে বাস করিতেন। যে গৃহে তাঁহার শস্যাদি সঞ্চিত থাকিত, এক দিন তথায় তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। পরীক্ষায় প্রকাশ পায়, কোনও ভারী দ্রব্যের আঘাতে কেহ তাঁহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পুলিস সে যন্ত্রটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। অনুসন্ধানের অন্য কোনও সূত্রই ছিল না। শুধু সাধারণ শ্রমজীবীর ব্যবহারোপযোগী একটা টুপী একধারে পড়িয়াছিল।

অপরাধতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গ্রস্ তাঁহার রচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মাথার কেশ ও ধূলাই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার প্রধান সূত্র। তদনুসারে ভিয়েনার পুলিস উক্ত টুপী অতি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দুইগাছি কেশ আবিষ্কার করে। নিহত ব্যক্তির কেশের সহিত মিলাইয়া তাহারা বুঝিতে পারে যে, উহা তাঁহার নহে। কেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, যাহার কেশ পাওয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ, শরীরে শক্তি আছে, মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কেশের বর্ণ

পাংশুবর্ণ, তবে সবে পাক ধরিয়াছে। সে ব্যক্তি সংপ্রতি চুল ছাঁটিয়াছে।

তাহার পর একটা শক্ত কাগজের থলির মধ্যে টুপীটা রাখিয়া যষ্টির সাহায্যে আঘাত করিবার পর দেখা গেল যে, থলির নীচে কিছু ধূলা পড়িয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও রাসায়নিক ক্রিয়া-দ্বারা ধূলি-কণা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, শয়নগৃহের ধূলি বাদ দিলেও টুপীর মধ্যে কাঠের গুঁড়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সূত্রধরের কারখানায় যেরূপ কাঠের গুঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়, আলোচ্য ধূলি-কণার সহিত সেইরূপ গুঁড়ার সমাবেশ আছে। অতি সূক্ষ্মভাবে শিরীষের অস্তিত্বও তন্মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইল। পুলিস তখন স্থির করিল, যাহারা কাঠ জোড়া দেয়, এমন কোন ব্যক্তির মাথায় এই টুপী ছিল।

বর্ণনার অনুরূপ একটি লোক ঘটনাস্থলের অনতিদূরেই থাকিত। তাহার মাথার কেশের সহিত আবিষ্কৃত কেশ মিলিয়া গেল। লোকটা অত্যন্ত দরিদ্র ও মাতাল। তাহার গৃহে অনুসন্ধান করিয়া একটা লোহার হাতুড়ি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, নিহত ব্যক্তির মস্তকে যেরূপ আঘাতের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, হাতুড়ির আঘাতে তাহা হইতে পারে না। লোকটির গৃহ হইতে দুইটি ছেনিও পাওয়া গিয়াছিল। একটি লোহার, অপরটি পিত্তলের। পুলিস মিলাইয়া দেখিল যে, ছেনির আঘাত বেশ খাপ খায়। লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রটি মরিচাধরা; রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেল, জলের স্পর্শে মরিচা ধরিয়াছে। কিন্তু পিত্তলের ঔজ্জ্বল্য যন্ত্রটির উপরিভাগ সযত্নে চাঁচিয়া ফেলিবার পর, যন্ত্রের গায়ে দাগের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইল। রাসায়নিক পরীক্ষায় দাগগুলি যে রক্তের, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। নিহত ব্যক্তির রক্তে যে যে পদার্থ ছিল, যন্ত্রের গাত্রস্থ শুষ্ক রক্তের মধ্যেও তাহাই আবিষ্কৃত হইল। হত্যাকারী অবশেষে আত্মাপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিল।

ভিয়েনার পুলিসের বৈজ্ঞানিক আগারে অতি তুচ্ছ বিষয়ও উপেক্ষিত হয় না। পীতাবশেষ চুরুটে দাঁতের চিহ্ন অবলম্বন করিয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা ভিয়েনা পুলিসের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। পকেটের ছোট ছুরীর মধ্য হইতে ধূলা আবিষ্কার করিয়া অষ্ট্রীয় পুলিস হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া থাকে। অধ্যাপক উলেন্ হট্, মানুষের রক্তের সহিত পশুর রক্তের কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য—তাহাও তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আহার্য্য মহার্ঘ্য হওয়ায় সম্প্রতি অষ্ট্রীয়ায় পশু-হনন সম্বন্ধেও খুব কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও কোনও কৃষক নিষিদ্ধ পশু মারিয়া খাইয়াছে বলিয়া পুলিস কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের বস্ত্রে রক্তের দাগ পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক উলেন্ হট্ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতই তাহারা কোন জাতীয় পশু জবাই করিয়াছিল।

মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া যেমন অপরাধের সংখ্যা বাড়াইতেছে, আবার তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্যও তেমনই বৈজ্ঞানিক প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইতেছে। চুরী, ডাকাইতি, খুন প্রভৃতির সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের অপরাধ গোপন করিবার যেরূপ চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে হয় ত উত্তরকালে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিভাগের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। তখন হয় ত সকল জাতির মিলিত প্রতিভা, সমাজ-শত্রুগণকে দমন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শিল্প কৃষি বাণিজ্য
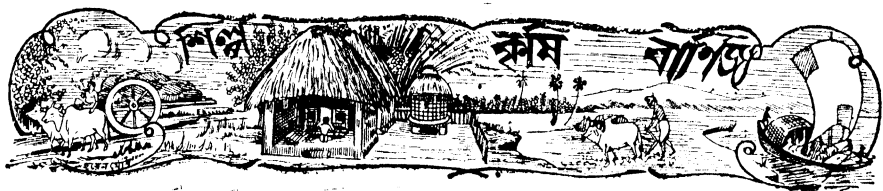
পেঁপে ও পেপেন।

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও প্রসার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। জল, বায়ু, পশু-পক্ষী ও মনুষ্য দ্বারা এক স্থানের উদ্ভিদ অন্য স্থানে নীত হইয়া কালক্রমে তথায় এত বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, উহা তদ্দেশের আদিম উদ্ভিদসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আজকাল ভারতের এমন প্রদেশ নাই, যেখানে পেঁপে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পেঁপে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ইহা প্রথমে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তন করে। যে কোন জল-হাওয়ায় ও মৃত্তিকায় জন্মিতে পারে বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পেঁপে শুদ্ধ ভারতে কেন, পৃথিবীর চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে, হাওয়াই, ফিলিপাইন, মণ্টসেরাট্ ও সিংহল দ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে প্রভূত পরিমাণে পেঁপের চাষ হইতেছে। শেষোক্ত দুইটি দেশে প্রধানতঃ পেপেন্ প্রস্তুতের জন্যই পেঁপে উৎপাদিত হয়।

কাঁচা ও পাকা পেঁপের যথাক্রমে সব্জী ও ফলরূপে ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। সুপক্ব পেঁপে মৃদু রেচক। কাঁচা পেঁপে কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শ প্রভৃতি রোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। পেঁপের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ উপাদান—পেপেন্। ইহা পেঁপের আঠাতে পাওয়া যায় এবং ইহার নাইট্রোজেন্-প্রধান দ্রব্যাদির উপর ক্রিয়া এত প্রবল যে, এক গুণ পেপেন্ উহার ২০০ গুণ পরিমিত মাংস হজম করিতে সমর্থ। পেপেনের রাসায়নিক গঠন-বর্ণনা এ স্থলে অনাবশ্যক, তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইহা Ferment অথবা উৎসেচক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শূকরের উদরের অংশবিশেষ হইতে প্রস্তুত পেপসিন্ (Pepsin) নামক ঔষধের ক্রিয়া পেপেনের সমতুল্য। প্রভেদ এই যে, বিনা অম্লসংযোগেও পেপেনের ক্রিয়া হয়, অধিকতর উত্তাপেও ইহার ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয় না এবং পেপসিন্ অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে পেপেন্ কার্য্য করে। পেপেনের জীর্ণকারক গুণের জন্য ডিপ্থিরিয়া রোগজনিত পর্দ্দা নষ্ট করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। পেট ফাঁপা, গলা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে, অর্শে, প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং ক্রিমি ও চর্ম্মরোগে পেপেন বিশেষ ফলপ্রদ। পেঁপের পাতায়ও কতক পরিমাণে পেপেন্ আছে। সেই জন্য কোন কোন স্থানে মাংস রান্নার ২।১ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে উহাকে পেঁপের পাতায় জড়াইয়া রাখা হয়। তাহাতে মাংস শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। করতলের চর্ম্ম উঠা ও মুখের ব্রণ ও ছুলি নিবারণে ও সাধারণ প্রসাধনের জন্য পেপেন্ দ্রাবণ অথবা পেপেন্ সাবান উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ইহা ব্যবহারে চর্ম্ম পরিষ্কার ও চক্চকে হয়। পেঁপেবীজেরও ক্রিমিনাশক গুণ আছে। সরিষার মত পেঁপেবীজে অল্পাধিক মাত্রায় ঝাঁজ আছে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে উহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। আজকাল পরিধেয় বস্ত্রাদির তন্তু নষ্ট না করিয়া দাগ তুলিবার জন্য পেপেন্ দ্রাবণ ব্যবহৃত হইতেছে।

পেঁপে অযত্নে অথবা সামান্য যত্নে জন্মিলেও উৎকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে, অথবা ব্যবসায়ের জন্য চাষ করিতে হইলে ইহার জন্য বিশেষ ক্ষেত্র রচনা প্রয়োজন। পেঁপেগাছ ৬।৭ হাত হইতে ১২।১৪ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। শাখা-প্রশাখা ক্বচিৎ বহির্গত হয়। কাণ্ড তন্তুময় ও ফাঁপরা বলিয়া কোন কাযেই লাগে না। পেঁপেফুলে সামান্য গন্ধ থাকিলেও হরিতাভ শ্বেতবর্ণের জন্য ইহা আদৌ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পেঁপের স্ত্রী, পুং ও উভলিঙ্গ গাছ আছে। শুধু ফল উৎপাদনের জন্য পুংবৃক্ষের কোন প্রয়োজন হয় না। পরাগসংযোগ ব্যতিরেকেও স্ত্রী বৃক্ষ সুস্বাদু ও সুবৃহৎ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমক্ষম বীজ উৎপাদন করিতে হইলে পুং-বৃক্ষ অত্যাবশ্যক। অনেক সময় যে পেঁপেবীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাহার কারণ এই যে, উহা কেবলমাত্র স্ত্রী-বৃক্ষের ফল হইতে সংগৃহীত। স্ত্রী ও পুং-বৃক্ষের মধ্যে কাণ্ড, পাতা প্রভৃতির কোন প্রভেদ না থাকায় ফুল হওয়ার পূর্ব্বে পেঁপের লিঙ্গনির্ণয় অসম্ভব। পুং-বৃক্ষেও ফল হইয়া থাকে, যদিও উহা

আকৃতিতে ছোট। সিংহলে পুং বৃক্ষের ফল হইতেই অনেক স্থলে পেপেন্ প্রস্তুত করা হয়। বীজ হইতে প্রস্তুত গাছের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জননীর গুণ প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য ক্রমশঃ কলমের প্রচলন হইতেছে।

পেঁপের পক্ষে দোআঁশ মাটীই ভাল। যে স্থলে জল জমে, তাহা পেঁপের পক্ষে অনুপযুক্ত। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ১২।১৫ হাত অন্তর ৪ ফুট গভীর ও ৪ ফুট ব্যাসযুক্ত গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রশস্ত। গর্ত্তের মাটী তুলিয়া তাহা পার্শ্বে ভাল করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া দরকার। পরে গর্ত্তের নীচে ৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত খোয়া দিয়া তৎপরে পুরাতন মিশ্র সার পূর্ব্বোক্ত মাটীর সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া মাটী গর্ত্তে দিয়া দিতে হয়। বর্ষার জল খাইয়া মাটী বসিয়া গেলে, তাহার পর পেঁপে-চারা বসাইতে পারা যায়। চারা হাপরে অথবা টবে তৈয়ারী করিয়া ৪।৫ ইঞ্চি পরিমিত বড় হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে বসাইতে হয়। চারা তুলিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া জল দেওয়া প্রয়োজন। পেঁপেবীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রায় ১৫ দিন লাগে।

পেঁপেগাছ অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ইহার চাষে সার ও জল যথেষ্ট পরিমাণে দরকার। ক্ষেত্র জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে হইলেই ভাল। চারা বসাইবার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কাণ্ড ও মূলের সন্ধিস্থলের উর্দ্ধভাগে মৃত্তিকা না পড়ে। পেঁপে গোল কিংবা লম্বা উভয়বিধ আকৃতিরই হইয়া থাকে। বড় ফল প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি ফল অপক্ব অবস্থায় তুলিয়া লওয়া দরকার। প্রায় সমস্ত বৎসরই পেঁপের ফল হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালেই অধিকতর মিষ্ট ফল হয়। ৯ মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই পেঁপেগাছ ফলে এবং ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফলনের মাত্রা প্রায় সমান থাকে। তৎপরে আরও ৩ বৎসর গাছ থাকিতে পারে, কিন্তু ফলন কমিয়া যায় ও নিকৃষ্ট ফল হয়। গড়ে প্রত্যেক গাছে ২০।২৫টি ফল হয়। ফলের অগ্রভাগ ঈষৎ পীতাভ ধূসরবর্ণ হইলেই বুঝিতে হইবে যে ফল পক্ব হইয়াছে। সেই সময় তুলিয়া সামান্য পরিমাণ বিচালীর মধ্যে রাখিলে ২।৪ দিনেই ফল পাকিয়া যায়। পেপেন্ প্রস্তুতের জন্য ঘন করিয়া বসাইলে বিঘায় ২৫০ এবং উত্তম ফলের জন্য বিরল করিয়া বসাইলে বিঘায় ১৫০টি পেঁপেগাছ হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীজ হইতে উৎপাদিত পেঁপেগাছ সব সময় সুফল প্রদান করে না। সেই জন্য কলমের গাছ বাঞ্ছনীয়। কলম করিতে হইলে পুরাতন স্ত্রী-গাছের মাথা ছাঁটিয়া দিতে হয়। তাহাতে পাশ হইতে শাখা বাহির হয়। শাখা ১ ফুট পরিমিত লম্বা হইলে, উহা কাটিয়া লইয়া প্রায় ২ মাসের চারার সহিত উহার যোড় লাগাইতে হয়। চারার উপরিভাগ কাটিয়া ফেলিয়া ইংরাজী বর্ণ V সদৃশ একটি গর্ত্ত করিতে হয়। তৎপরে মাথার নিম্নাংশ এরূপভাবে ছাঁটিয়া লইতে হয় যে, উক্ত গর্ত্তে যেন ঠিক বসিয়া যায়। বর্ষার প্রাক্কালেই এইরূপ যোড় কলম বাঁধিয়া নারিকেল-ছোবড়া অথবা কলার আঁশ দিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া রাখিলে অল্পদিনের মধ্যেই কলম প্রস্তুত হয়। বাকুবু দ্বীপ ও উটাকামণ্ডের বীজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতার সন্নিকটেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতীয় পেঁপে দেখিতে পাওয়া যায়।

পেপেন্ প্রস্তুতের জন্য বৃহদাকৃতির পেঁপে না হইলেও চলে, কিন্তু ফলগুলি সুমিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রায় ৩ মাসের ফল হইলেই তাহাতে আঠা পাওয়া যাইতে পারে আঠা বাহির করিবার জন্য ফলের ত্বক্ অগভীরভাবে ॥০ ইঞ্চি হইতে ৸০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চিরিয়া দিতে হয়। তীক্ষ্ণধার কাষ্ঠের ছুরিই এই কাযের পক্ষে প্রশস্ত। এইরূপ ছুরির দ্বারা অতি প্রত্যূষে ফলের গাত্র চিরিয়া দিয়া উহার নিম্নে একটি চীনে-মাটী অথবা এনামেলের পাত্র ঝুলাইয়া দিতে হয়। আঠা গড়াইয়া ঐ পাত্রে পড়ে। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই আঠা বাহির হইয়া যায়। তখন বিভিন্ন পাত্রের আঠা একত্র করিয়া শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয়। প্রায় ৬০টি ফল অথবা পাঁচটি গাছ হইতে ১ সের আঠা পাওয়া যায়। এক একটি ফলে ৩ দিন অন্তর এক একবার দাগ দেওয়া চলে। ১ সের আঠা শুষ্ক হইয়া প্রায় ৭ ছটাকে দাঁড়ায়।

আঠা শুষ্ক করিবার পূর্ব্বে সুরাসার দ্বারা (Rectified Spirit) দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক নহে। সামান্য মাত্রায় পেপেন প্রস্তুত করিতে হইলে আঠা কাঁচের শার্শির উপর শুকাইয়া লইলেই চলে। কিন্তু অধিক মাত্রায় হইলে একটি ঘরে ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট ভাটিতে আগুন দিয়া তাহার উপর একটি লোহার চাদর চাপা দিতে হয়। চাদরের ১ ফুট অথবা উপরি উপরি সজ্জিত কতকগুলি পাত্রে আঠা রাখিয়া ঐগুলি

উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ২।৩ ইঞ্চি চওড়া কাঠের বাতার চতুষ্কোণ ফ্রেমের নিম্নভাগে কোন প্রকার, মোটা কাপড় অথবা ক্যাম্বিস্ আঁটিয়া এক একটি পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত কাপড়ের উপর আঠা বিছাইয়া দেওয়া হয়। ঘরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেন-হিট থাকা দরকার। নীচের পাত্রগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপরে উঠাইয়া উপরের গুলি নীচে দিলে সমস্ত পাত্রে আঠা সমভাবে শুকাইয়া যায়। কাঁচা অবস্থায় আঠা অতি শুভ্র দধির ন্যায় থাকে, শুষ্ক হইলে বর্ণ একটু মলিন হইয়া যায়। কাঁচা আঠায় কখন অল্পাধিক ঝাঁজ থাকে। আঠা ধরিবার পাত্রে অতি সামান্য মাত্রায় ফরমালিন (Formalin) মাখাইয়া দিলে উক্ত ঝাঁজ নষ্ট হইয়া যায়। সম্পূর্ণ শুষ্ক আঠার রং প্রায় বিস্কুটের মত এবং উহা বিস্কুটের মতই সহজে হাতে গুঁড়াইয়া যায়। অতি অল্প পরিমাণেও চট্‌চটে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, আঠা ঠিক শুষ্ক হয় নাই। শুষ্ক আঠাকে কলের জাঁতায় বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া অবিলম্বে বোতল অথবা টিন যে কোন প্রকার বায়ুরুদ্ধ পাত্রে বন্ধ করা প্রয়োজন। পেপেনের আস্বাদ সামান্য লবণাক্ত ও তীব্র। ইহাতে দুধ কাটিয়া যায়। কতিপয় পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে,ইহার দ্বারা রবারের আঠাও জমাইতে পারা যায়। আপাততঃ এসেটিক্ অ্যাসিড (Acetic acid) এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পেপেন দ্বারা উক্ত কার্য্য সমাহিত হইলে, পেপেনের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে বৃদ্ধি পাইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বাজারে দুই প্রকারের পেপেন পাওয়া যায়—দানাদার ও চূর্ণ। দানাদার পেপেন ফিকে ধূসরবর্ণ; খোলা থাকিলে উহার রং ময়লা হইয়া যায়। চূর্ণ পেপেনের বর্ণ বিস্কুটের মত ও উহা পরিবর্ত্তিত হয় না। এতদ্ভিন্ন এক প্রকার অতি শুভ্র পেপেন পাওয়া যায়। উহা ঔষধার্থ ব্যবহার হয় না। কারণ, অত্যন্ত শুভ্র করিতে গেলে পেপেনের জীর্ণকারক গুণ নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেপেন্ সিংহল দ্বীপে প্রস্তুত হয়। অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় পেপেনেও ভেজালের অভাব নাই। সাধারণতঃ শ্বেতসার, আরারুট, শুষ্কীকৃত ও চূর্ণীকৃত গটাপার্চ্চা ও মনসাসিজ জাতীয় গাছের আঠা প্রভৃতি পেপেনের সহিত মিশাল করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিণ, জর্ম্মনী ও ইংলণ্ড পেপেনের প্রধান ক্রেতা। কিন্তু মার্কিণের নিউ-ইয়র্ক সহরই পেপেনের প্রসিদ্ধ বাজার। বৎসরে লক্ষাধিক টাকার পেপেন নানা স্থান হইতে মার্কিণে চালান যায়। বিগত কয়েক বৎসরে পেপেনের দরের অনেক উঠতি-বাড়তি হইয়াছে। যুদ্ধের সময় পাইকারী দর প্রতি পাউণ্ড প্রায় ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এখন গড়ে প্রায় ৫৲ টাকা পাউণ্ড (কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধসের) দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে পেঁপের স্থানীয় খরিদ্দার খুব কম এবং দূরের বাজারে লইয়া যাওয়াও ব্যয় ও কষ্টসাপেক্ষ। এরূপ স্থলে পেপেন প্রস্তুতই পেঁপেগাছের উৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার। এতদ্ভিন্ন বিস্তৃতভাবে পেঁপের চাষ করিলে ফল বিক্রয় করার লাভ ভিন্ন পেপেন প্রস্তুত একটা উপরি লাভে দাঁড়ায়। কারণ, পুং-গাছের ফলেও যথেষ্ট পরিমাণে পেপেন পাওয়া যায় অথচ ফল হিসাবে পুং ফল নিম্নশ্রেণীর। আজকাল ।০ আনার কমে ভাল পেঁপে পাওয়া যায় না। সুতরাং উদ্যান-ফসলের মধ্যে ইহাকে বিশেষ আয়কর ফসল বলিতে হইবে। উৎকৃষ্ট-জাতীয় পেঁপে চাষের প্রসার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

উদ্ভট-সাগর।

কৃপণের ধনসঞ্চয় করা যে কিরূপ বিড়ম্বনা, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে :—

আত্মানং পরিবঞ্চ্য যাচককুলং কুর্ব্বন্তি যে সঞ্চয়ং
তেষাং পাপজুষাং তদেব হি ধনং ভোগায় নো কল্পতে।
নিত্যং সঞ্চয়তে মধূনি সরঘা দত্ত্বাহনলং তন্মুখে
লোকা দেবগণং তথা পিতৃগণং সন্তোষয়ন্তি ধ্রুবম্॥

আপনারে বঞ্চি, বঞ্চি যাচক সকলে
যে জন সঞ্চয় করে ধন কুতূহলে,
নাহি ভোগ হয় তার সেই পাপ ধন,
মধু-মক্ষিকার কথা করুক স্মরণ।
সে রাখে কতই মধু সঞ্চয় করিয়া
কিন্তু তবু লোকে তার মুখে অগ্নি দিয়া
দেবলোক পিতৃলোক করয়ে উদ্ধার,
কৃপণের ধন নাহি ভোগে আসে তার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর।

নবম পরিচ্ছেদ।
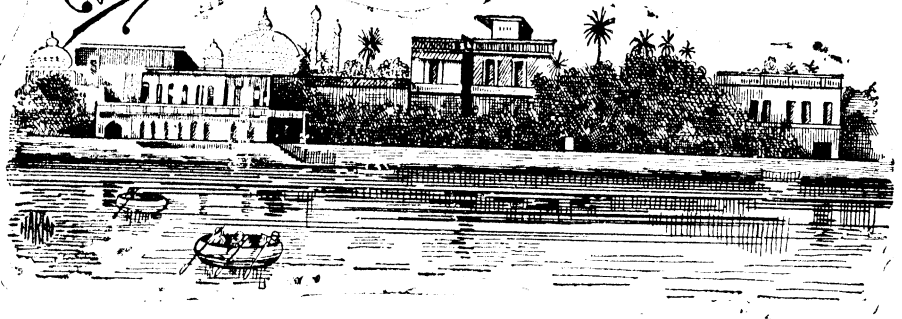
গুহায় অল্পক্ষণ পরেই রুথের শ্রম ও উৎকণ্ঠাজনিত অবসন্নতা দূর হইল। তখন সে আগন্তুকদ্বয়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। গুহায় দায়ুদ নাই—দুই জন মাত্র বলিষ্ঠ আরব; তাহাদের বেশ ও ব্যবহার, মুখভাব ও কথা তাহাদের হীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক। রুথের বোধ হইল, তাহারা শ্রমজীবী হইবে—সমাজের যে স্তরে মানুষ শারীরিক শ্রমমাত্র মূলধন লইয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নার্জ্জন করে—পশুরই মত শারীরিক অভাব পূরণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে এবং মানসিক ব্যাপারের সন্ধান রাখে না, সেই স্তর হইতে উদ্ভূত হইবে। কিন্তু রুথের বিশ্বাস—দায়ুদ তাহাদিগকে পাঠাইয়াছে—দায়ুদ তাহাদিগকে তাহার উদ্ধারসাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে। এ অবস্থায় কেহ অস্ত্রের দিকে মন দেয় না—যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার কথা মনে করে, যে কৌশলীর অস্ত্রে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে সেই কৌশলীরই প্রশংসা করে। তাই রুথ দায়ুদের কথাই ভাবিতে লাগিল, দায়ুদের বুদ্ধির—কৌশলের ও তাহার প্রতি দায়ুদের প্রেমের কথাই মনে করিতে লাগিল। দায়ুদের প্রশংসায় ও দায়ুদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রুথের হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল, গুহা চলিতে লাগিল। কিন্তু রুথের এক একবার মনে হইতে লাগিল, এই দুই জন লোককে সে কোথায় দেখিয়াছে। কিন্তু সে যে কখন্—কোথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না; যেন স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তির মত অস্পষ্ট—যেন বিস্মৃতির কুহেলিকাচ্ছন্ন মূর্ত্তির মত অর্দ্ধদৃষ্ট। বাস্তবিকই রুথ ইহাদিগকে দেখিয়াছিল—কিন্তু দেখিয়াও দেখে নাই; কারণ, তখন সে জাগ্রতস্বপ্নে বিভোর—তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

এই দুই জন আরব মিস্ত্রী সারদাবের গবাক্ষবিবর গাঁথিতে গিয়াছিল। তাহারা সারদাবে রুথকে দেখিয়াছিল, দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল। বিস্ময়ের কারণ এই যে, অতি দরিদ্র—উদরান্নের জন্য রাজপথে শ্রম করিতে বাধ্য না হইলে কোন মুসলমান রমণী দশ বৎসর বয়সের পর আত্মীয়ের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিতা থাকে না—বোরকা নামক ঘেরাটোপের মত কৃষ্ণ আবরণে আবৃত না হইয়া কোথাও যায় না। মুসলমান রাজ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোকের পক্ষে অনবগুণ্ঠিতা থাকা লজ্জার বিষয়; আর এই প্রথার জন্য মুসলমানও অনবগুণ্ঠিতার প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে চাহিতে শিখে নাই; এই দুই কারণে এ সব দেশে ইহুদী ও আরমাণী রমণীরাও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিয়া থাকেন; য়ুরোপীয়া রমণী ব্যতীত আর সকলেরই অবগুণ্ঠনব্যবহার পদ্ধতি। এ অবস্থায় আমীর আজীজের মত ধনীর অন্তঃপুরে এমন সুন্দরীকে শ্রমজীবীর সঙ্গে এক ঘরে থাকিতে দেখিয়া—বিশেষ তাহাকে অনবগুণ্ঠিতা দেখিয়া মূর্খ শ্রমজীবিদ্বয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তাহারা মনে করিয়াছিল, এ ব্যাপারে একটা গভীর রহস্য নিহিত আছে। তাহার পর তাহার সৌন্দর্য্যে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। অনবগুণ্ঠিতা রুথ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—সে চক্ষু দেখিলে মনে হয়, যেন গভীর নীল জলে ভরা নিস্তরঙ্গ হ্রদের উপর প্রভাতসূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়াছে। তাহার কৃষ্ণ-কুন্তল দুইটি কুঞ্চিত বেণীতে বদ্ধ হইয়া দুই স্কন্ধের উপর দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসে

আন্দোলিত পরিপূর্ণ বক্ষের উপর পড়িয়া বক্ষের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। উৎকণ্ঠাজনিত উত্তেজনায় তাহার গণ্ডের গোলাবী আভা গাঢ়তর হইয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, সুন্দরী বটে—আমীর আজীজের পসন্দের প্রশংসা করিতে হয়। আরব রমণীও সুন্দরী—কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যে আর ইহুদীর সৌন্দর্য্যে কত প্রভেদ! প্রথমার সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয়ার সৌন্দর্য্যের সুচারু—সূক্ষ্মভাব নাই। প্রথমা মানবী—দ্বিতীয়া হৌরী। প্রথমা অযত্নবর্দ্ধিত কাননকুসুম—দ্বিতীয়া পরিমিত বারি ও রবিকরপ্রসূত সযত্ন-রক্ষিত উদ্যান-পুষ্প। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের স্তরবিভাগ—শ্রেণীভাগ আছে; সেমিটিক সৌন্দর্য্য যখন ইহুদীর যৌবন-পুষ্পিত দেহে অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণতায় বিকসিত হয়, তখন তাহা মানবের চিত্তহারী হয় বটে—রুথে তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ শ্রমজীবী আরব কখন অভিজাতবংশীয় আরবের গৃহে হেনার প্রয়োগে কোমলকরচরণা—সুরমার সূক্ষ্মরেখায় সজ্জিতনয়না—কায়িকশ্রমে অনভ্যস্তা—কোমলা আরব কিশোরীর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই; তাহারা তাহাদেরই সামাজিক স্তরে রমণীদিগকে দেখিয়াছে—কঠোর শারীরিক শ্রমে তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অতি স্থূলভাবে বিকৃত হয়—তাহারা সেই শ্রমের ফলে যেমন দেখিতে দেখিতে যৌবনের পরিপূর্ণতায় মানসিক শক্তির দীপ্তিহীন প্রস্তরপ্রতিমার মত প্রাণহীন সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হয়, তেমনই আবার দেখিতে দেখিতে অতিক্রান্তযৌবন—জরাজীর্ণ হইয়া শ্রীহীন হয়। সুতরাং রুথকে দেখিয়া শ্রমজীবী আরবের মুগ্ধ হইবারই কথা। আর তাহাদের সে প্রশংসা শিক্ষিত ব্যক্তির অনাবিল প্রশংসা নহে—তাহা কামনাকলুষিত। বর্ব্বর আরবদিগের মধ্যে রমণী ভোগার্থমাত্র বলিয়া পরিগণিত। তাই সংস্কারক মহম্মদকেও তাঁহার ধর্ম্ম আরবদিগের উপযোগী করিবার জন্য বহুবিবাহের সমর্থন করিতে হইয়াছিল। উচ্চ নীতিক আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া—যুক্তির উপর যে ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কখন অজ্ঞজনগ্রাহ্য হইতে পারে না। তাই মহম্মদ পুরুষের চারিটি পত্নীগ্রহণের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—কিন্তু চারি জনকেই সমান ব্যবহার করিতে হইবে। এই "কিন্তু"তেই ভবিষ্যৎ সংস্কারের বীজ নিহিত ছিল; কিন্তু সে বীজ আরবের মরুভূমিরই মত আরবের উষর হৃদয়ে উপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থেও রমণীর হীনতাপরিচয় আছে—এক জন পুরুষের সাক্ষ্য দুই জন রমণীর সাক্ষ্যের সমান। এ অবস্থায় অশিক্ষিত আরবের সৌন্দর্য্যপ্রশংসার স্বরূপ কি আর বুঝাইতে হইবে?

তাহার পর চলিয়া যাইবার সময় শ্রমজীবীরা আমীরের কথা শুনিয়াছিল; শুনিয়া বুঝিয়াছিল, আমীর এই ইহুদীর প্রাণদণ্ডবিধান করিয়াছেন, আর সেই জন্যই তাহারা গবাক্ষবিবর বন্ধ করিয়াছে। তখন তাহারা ইহাকে উদ্ধার করিয়া আপনারা লইবার কল্পনা করিল। তাহাদের নয়নের নেশা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। তাহারা একাগ্রভাবে কার্য্যোদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। সংসারে যাহারা কেবল শারীরিক শ্রমের দ্বারা অন্নার্জ্জন করে—মানসিক চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয় না, তাহাদের মানসিক শক্তি ব্যয়িত না হওয়ায় সঞ্চিত থাকে; তাই সময় সময় তাহারা কোন কাযে যেরূপ একাগ্রতার পরিচয় দেয়, সামাজিক ও মানসিক নানা চিন্তায় ব্যয়িতশক্তি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সেরূপ একাগ্রতার পরিচয় দিতে দেখা যায় না। একাগ্রভাবে চিন্তা করিয়া তাহারা স্থির করিয়াছিল, তাহারা সারদাবের নূতন গাঁথা গবাক্ষবিবর ছিদ্র করিবে। পলায়নের সুযোগ পাইলে রুথ যে পলাইয়া আসিবে, সে বিষয়ে তাহাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না—কারণ, তাহাদের বিবেচনায় দুনিয়ায় জীবনের অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কিছুই নাই। আমীরের প্রাসাদের এক দিকে টাইগ্রীস প্রহরী—সে দিক হইতে ভয়ের কারণ নাই বুঝিয়া সে দিকে আমীর প্রহরীর ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা সেই দিকে যাইবে। আর যদি ধরাই পড়ে, তাহাতেই বা কি? সম্মুখসমরে যাহাই কেন হউক না—রাত্রিতে অন্ধকারে গোপনে কায করিবার সময় আরবের যেন প্রাণভয় থাকে না। সুরক্ষিত স্কন্ধাবার হইতে সে যেমন করিয়া চুরী করে, তাহাতে মনে হয়, চৌর্য্য-বৃত্তিতে পাঠান তাহার কাছে পাঠ লইতে পারে—প্রাণভয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা একটা বন্দুক চুরী করিবার জন্য বন্দুকের গুলীর ভয় করে না, তাহারা এমন ইহুদী সুন্দরীলাভের জন্য কি না করিতে পারে? তাই তাহারা নিশীথে গবাক্ষবিবরে ছিদ্র করিয়া রুথের উদ্ধারসাধন করিয়াছিল।

টাইগ্রীসের স্রোতে গুফা পূর্ব্বতীরে সহর ছাড়াইয়া গেল। তখন আগন্তুকদ্বয় গুফা তীরে লইল—রুথকে

নামিতে বলিল। তখনও আকাশ জ্যোৎস্নালোকে ভরা—বাতাস সুখদস্পর্শ—সহর সুপ্ত, তীরে দাঁড়াইয়া রুথ চারিদিকে চাহিল—দায়ুদকে দেখিতে পাইল না। সে বড় আশা করিয়াছিল, কূলে নামিয়াই দায়ুদকে পাইবে। সে আশায় সে হতাশ হইল। তৎক্ষণে গুফা কূলে টানিয়া তুলিয়া আরব দুই জন দুইখানি ক্ষেপণী লইয়া রুথকে বলিল, "চল।"

রুথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

এক জন আরব হাসিয়া বলিল, "আমাদের যাহার সঙ্গে ইচ্ছা।"

তাহার হাসি দেখিয়া রুথ ভয় পাইল; বলিল, "আমার দায়ুদ কোথায়?"

আরবদ্বয় অট্টহাসি হাসিল—সেই নিস্তব্ধ নিশায়—সেই নিঃশব্দ নদীকূলে সে হাস্য শ্মশানে প্রেতের হাসির মত ধ্বনিত হইল। এক জন বলিল, "কেন, আমিই দায়ুদ—চিনিতে পারিতেছ না?" আর এক জন বলিল, "কেন, আরব কি ইহুদীর অপেক্ষা মন্দ?"

এতক্ষণে রুথ তাহার বিপদ বুঝিতে পারিল। এ যে মৃত্যুর অপেক্ষা ভীষণ! সে চীৎকার করিতে চাহিল—যদি কেহ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ধূর্ত্ত আরবের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না; মুহূর্ত্তমধ্যে এক জন মস্তকের রুমাল দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—বলিল, "সাবধান, গোল করিয়াছ কি তোমার দুই চক্ষু উপাড়িয়া লইব।" তৎক্ষণে আরবের নয়নে ও অঙ্গভঙ্গীতে মরুদস্যুর নিহিত নিষ্ঠুরতা বিকসিত হইয়াছে—যে নিষ্ঠুরতাহেতু আরব পরাজিত শত্রুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া পৈশাচিক আনন্দলাভ করে, সেই নিষ্ঠুরতার নগ্ন-মূর্ত্তি দেখিয়া রুথ নির্ব্বাক্ হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিল।

তখন আরবদ্বয় রুথের দুই হাত ধরিয়া বলিল, "চল্।"

তাহারা রুথকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে সহরে প্রবেশ করিয়া তাহারা সহরের মধ্য দিয়া একটা দরিদ্রপল্লীতে প্রবেশ করিল। সে পল্লীতে দরিদ্র আরবদিগের বাস—জীর্ণ গৃহ—আবর্জ্জনাপূর্ণ পথ—পূতিগন্ধপূর্ণ বাতাস। এক জন আরব একটা গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। আর এক জন বলিল, "দেখিতেছিস্ না, চলিতে পারিতেছে না! আজ আমার বাড়ীতে লইয়া যাই।" আর এক জন বলিল, "ও সব চালাকী আমি বুঝি। সে হইবে না—আমার বাড়ী চল।" সে রুথকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "কি বল, ইহুদা সুন্দরী?"

যাহা হউক, রুথকে কে তাহার বাড়ী লইয়া যাইবে, তাহা লইয়া আরবদ্বয়ে মতান্তর হইল। এই জাতীয় লোকের মতান্তর দেখিতে দেখিতে মনান্তরে পরিণতি লাভ করিয়া রক্তপাতে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত করে। মতান্তর যখন কথান্তরে পরিণত হইল, তখন কেহই আর অনুচ্চ স্বরে কথা বলিতে পারিল না—তাহার পর দুই জনে হস্তস্থিত ক্ষেপণী লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। পাড়ার লোক দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া আসিল—কেহ একের পক্ষ, কেহ অপরের পক্ষ লইয়া মারামারিতে যোগ দিল—মানুষের চীৎকারে ও কুক্কুরের চীৎকারে সে স্থান হইতে বহুদূরে গৃহে সুপ্ত প্রহরীদিগেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। শেষে যখন কোতয়ালের সশস্ত্র সান্ত্রীরা আসিয়া উপনীত হইল, তখন পাঁচ সাতটা খুন ও দশ বারটা জখম হইয়াছে। তাহারা গুলী চালাইয়া আরও কতকগুলা লোককে হতাহত করিয়া দোষী নির্দ্দোষ যে ঘুস না দিল, তাহাকেই ধরিয়া মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল।

আরব দুই জন তাহাকে ছাড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিবামাত্র রুথ পথের পার্শ্বে একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল। বাগদাদ সহর গলির সহর। বারাণসীর মত তথায় গলির পর গলি—দুই দিকে উচ্চ প্রাচীর—তাহাতে লৌহবদ্ধ গৃহদ্বার; বাড়ীর মধ্য দিয়া—বারান্দার নিম্ন দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গলির পর গলি—পল্লী হইতে পল্লীতে গিয়াছে—একবার মোড় ফিরিতে পারিলে আর পলাতক পথিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। মুক্তি পাইয়া রুথ দৌড়িতে লাগিল। গলির পর গলি—অন্ধকার। বাগদাদ সহরে একটা বড় রাস্তা করিতে ওয়ালী নাজিম পাশার দশ বৎসর লাগিয়াছিল। সেই অন্ধকারে গৃহপ্রাচীরে আঘাত পাইয়া—ক্ষতচরণে রুথ দৌড়িতে লাগিল। যেন সে ভূতাবিষ্টা।

এইরূপে রুথ কত দূর গেল—কোথায় গেল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বোধ হইল, সে নগর ছাড়াইয়াছে। তবুও সে দৌড়িতে লাগিল। শেষে পথশ্রমে কাতর ও রক্তপাতে অবসন্ন হইয়া সে এক স্থানে যাইয়া পড়িয়া গেল—তাহার নয়নে আকাশে নক্ষত্রের আলোকও নিবিয়া গেল—সব অন্ধকার,—তাহার হৃদয়ের মত—জীবনের মত অন্ধকার।

[ক্রমশঃ।

কৈলাস-যাত্রা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলাম। আলমোড়ায় সুবিধামত ঘোড়া পাওয়া গেল না; সুতরাং পদব্রজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলীদের পৃষ্ঠে বোঝা দিয়া আসকোট অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কুলীরা আসকোট পর্য্যন্ত যাইবে, এইরূপ স্থির হইল। সমস্ত পথ আমাদের সহিত এ স্থানের কুলী যাহাতে থাকে, এরূপ চেষ্টা করা গেল; কিন্তু কেহ রাজি হইল না, সুতরাং আসকোট পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করা গেল। আসকোট আলমোড়া হইতে প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সে স্থানে এক জন রাজা অবস্থান করেন। তাঁহার নামে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা গিয়াছিল। সুতরাং তথায় কুলী সংগ্রহে অসুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়াছিলাম।

আলমোড়াকে আমি কৈলাসের দ্বার বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ তারের সহিত বিজড়িত। টেলিগ্রাফের তারেরও ইহা শেষ সীমা। এই স্থান হইতে যত দূরতর প্রদেশে গমন করিব, ততই আমরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মধ্যবর্ত্তী হইব; ততই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে দূরতর হইব। পাশ্চাত্য সভ্যতায় জর্জ্জরিত আমরা কিছুদিনের জন্য এই বিদেশী সভ্যতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, হিমালয়ের উপত্যকায়, সানুদেশে লুক্কায়িত আমাদের সুপ্রাচীন—প্রাণারাম—চিরমধুর প্রাচীন প্রথা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ধর্ম্মের তিন পদ বহুদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, আমাদের বিবেচনায় হিমালয়ের কন্দরে তাহা লুক্কায়িতভাবে আছে।

আলমোড়া হইতে আসকোট যাইতে হইলে কখন হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে আরোহণ, কখন বা নিম্নে অবরোহণ করিয়া যাইতে হয়। এই রাস্তায় মনোমুগ্ধকর নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, নানাপ্রকার বনস্পতি, নানাপ্রকার পক্ষীর সুললিত সঙ্গীত, বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য, হিন্দু রাজন্যবর্গের নানাপ্রকার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে দেখিতে আসকোটে উপস্থিত হই।

আলমোড়া ও আসকোটের মধ্যবর্ত্তী দোদুল্যমান সেতু।

প্রথম দিন আলমোড়া হইতে প্রায় আট মাইল দূরে বারছিনা নামক স্থানে মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। প্রায় ১০টার সময় বারছিনা গ্রামের একটি দোকানে উপস্থিত হইলাম। এক জন দৃঢ়কায় রজপুত যুবক আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। কথা-প্রসঙ্গে যখন সে শুনিল, আমি ব্রাহ্মণ, আর কৈলাস-যাত্রী, তখন তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। কেহ তুষারশীতল জল আনিয়া দিয়া তৃষ্ণা দূর

করিল; কেহ বা তৈল মাথাইয়া সেবা করিতে লাগিল। এক জন ব্রাহ্মণ যুবক খাদ্য-দ্রব্য পাক করিয়া রন্ধনক্লেশ দূর করিল। ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ৩টার সময় আবার চলিব'র উদ্যোগ করা গেল। গমনের পূর্ব্বে দোকানীর দাম চুকাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-যুবককে কিছু পারিশ্রমিক-স্বরূপ দিতে গেলে সে বিনয়ের সহিত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল। ইহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ধলছিনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আজ বিশেষ করিয়া চীর-বনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। সরকার বাহাদুর চীর বৃক্ষ হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরিপুষ্ট বৃক্ষের মূলদেশে ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়, ইহা হইতে নির্য্যাস বহির্গত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হইয়া থাকে। অনন্তর ইহা সংগৃহীত হইয়া ভাণ্ডারালীতে নীত হয়। তথায় আধুনিক প্রথায় পরিস্কৃত হইয়া তারপিন তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ কথিত হয় যে, পরিপুষ্ট বৃক্ষ হইতে নির্য্যাস বাহির করিলে তাহার কাষ্ঠের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অপর পক্ষে অপুষ্ট বৃক্ষ হইতে বাহির করিলে তাহার বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয়। পর্ব্বতবাসীদের গৃহ-নির্ম্মাণের ইহাই প্রধান উপাদান—সমতল প্রদেশেও ইহার টুকরা টুকরা কাষ্ঠ নদীর স্রোতে নীত হইয়া থাকে। চীর গাছ ৬।৭ হাজার ফিট উচ্চস্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। চীরের একটি বিশেষ শক্তি আছে। ইহা যে স্থানে বেশী পরিমাণে থাকে, সে স্থানে প্রায় অন্য গাছ হয় না। অনেক সময় পথিকরা ইহার কাঁচা ডাল জ্বালাইয়া মসালের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল থাকায় জ্বালিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না। কুলীর মুখে অবগত হইলাম, চীরের বীজ অনেকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই চীর-বনের ভিতর দিয়া কখন পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ, কখন নিম্নে অবরোহণ করিয়া নানাপ্রকার পক্ষীর কলরব শুনিতে শুনিতে সায়ংকালে প্রায় ৬টার সময় ধলছিনা নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল।

ধলছিনা আলমোড়া হইতে সাড়ে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সমস্ত দিনে সাড়ে ১৩ মাইল আসা গিয়াছে। সমতল ভূমিতে ২৫ মাইল গমন করিতে যে ক্লেশ হয়,—যে সময় অতীত হয়, এই সাড়ে ১৩ মাইলে তাহা অপেক্ষা বেশী ক্লেশ হইয়াছে, অধিক সময় গিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার ক্লেশ, পার্ব্বত্য বায়ু যদি দূর না করিত, তাহা হইলে ক্লেশের অবধি থাকিত না। অত্যন্ত ক্লেশের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে বোধ হয় যেন নূতন শরীর ফিরিয়া আসিয়াছে।

স্থানটি বেশ রমণীয়, সমুদ্র হইতে প্রায় ৬ হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ, সুতরাং বেশ মৃদু মৃদু শীত অনুভূত হইতে লাগিল। গ্রামের প্রবেশপথে অতি সুন্দর ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে, শীতল জলে পিপাসা দূর ও হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাত্রির অবস্থান জন্য আশ্রয়স্থান উদ্দেশে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করা গেল।

একখানি দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। ইহার সম্মুখভাগ গোলাবগাছে মণ্ডিত ও পুষ্পে সুশোভিত। এক জন সাধু ধুনি জ্বালাইয়া অগ্নির সেবা করিতেছেন। কুলীরা আসিয়া বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, আর পাহাড়ী ভাষায় আমাদের বিষয় তাহারা যাহা অবগত হইয়াছে, তাহা কহিতে লাগিল। দোকানী মহাশয় পরিচিতের ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি, বনবিভাগের ও এক জন পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাদের যাত্রার কথা শুনিয়া তাঁহারা আরও উৎসাহের সহিত আমাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সে সময় কাফল ভোজনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা গ্রহণের জন্য আমরাও আমন্ত্রিত হইলাম। পর্ব্বত আরোহণে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের এ আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হইল। যখন আমরা অম্লমধুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ফল গ্রহণ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিলাম, তখন বাঙ্গালার সুপরিচিত বৌ কথা কও পাখী দূরে "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" কহিয়া বাঙ্গালা ভাষার আবৃত্তি করিতেছিল। উপস্থিত জনগণের মধ্যে এক জন বলিলেন, "পণ্ডিতজী, শুনুন, ঐ পাখী বলিতেছে, 'কাফল পাকো', শীতের অবসান হইয়াছে, অতিথি অভ্যাগত আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে; অতএব 'কাফল পাকো' 'কাফল পাকো' বলিয়া পক্ষী ঘোষণা করিতেছে।" অতিথিপ্রিয় হিমালয়বাসীর সুন্দর কল্পনা বটে! জয়দেব, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের মধুর রসে প্লাবিত বঙ্গদেশ—"দেহি পদপল্লবমুদারং", "সখি, তুমি যে আমার সরবস ধন, তুমি যে আমার প্রাণ" ইত্যাদি কবিতারসে ডুবু ডুবু বাঙ্গালী পাখীর কাছে শুনিল

"বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও"। ইহা সে কালের বাঙ্গালীর কল্পনার অনুরূপ হইতে পারে। বীররসে অভিষিক্ত বর্ত্তমান বাঙ্গালী "জড়তা ছাড়ো" "প্রস্তুত হও" এইরূপ কিছু কল্পনা করিবে। কল্পনা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখন বাস্তব রাজ্যে আসা যাউক। আমাদের বাঙ্গালায় সূর্য্যাস্তের পরই অন্ধকার আসিয়া থাকে, এ স্থানে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টার সময়ও আলোক বর্ত্তমান ছিল। নানাপ্রকার চিন্তায় ও কথায় সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। সকল ভাবনার বড় ভাবনা ভোজন-ভাবনা উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিতে কিছু আলু দগ্ধ করিয়া আর সঙ্গের কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রাত্রি যাপন করিব। এই অভিপ্রায়ে আলুর কথা দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দোকানী ব্রাহ্মণ মহাশয় কহিলেন—অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ বিনয় ও ভদ্রতার সহিত তিনি কথাগুলি বলিলেন যে, তাহার মধুরতা হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ সুজনতা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একাধিক তরকারী, হালুয়াসহ সুন্দর সুস্বাদু রুটি ভোজন করা গেল। সুনিদ্রায় রজনী অতীত হইল। পুষ্পের সুমধুর গন্ধে এ স্থানের দেবভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

অতি প্রত্যূষে, হৃদয়ে এ স্থানের দেবভাব গ্রহণ ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া আবার গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাইবার পূর্ব্বে গৃহ-স্বামীর একটু পরিচয় না দিয়া গমন করিলে আমার ত্রুটি থাকিয়া যায়, সে জন্য একটু পরিচয় দিয়া অগ্রসর হইব। দোকানী মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ত বটেই, ইহার উপর পোষ্ট মাষ্টার, পুলিস কর্ম্মচারী, আর গর্ভমেণ্টের মুদী অর্থাৎ সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারীদের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য চাউল, ডাউল, আটা প্রভৃতি দোকানে রাখিতে হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য ইনি মাসিক বেতনও কিছু কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতগুলি গোলামের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সরকার বাহাদুরের সহিত এতগুলি কণ্ঠসূত্রে বিজড়িত হইলেও তিনি প্রাচীন আদর্শ পরিত্যাগ করেন নাই—যেন বিনয়ের খনি।

গতকল্য সমস্ত দিন চীর-বনের ভিতর দিয়া আগমন করিতে হইয়াছিল। দুরারোহ চড়াইও অনেক চড়িতে হইয়াছিল। আজ চড়াই বড় বেশী ছিল না। উত্‌রাই বেশী ছিল। এই উত্‌রাইএর সঙ্গে বৃক্ষাদিরও বেশ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। আজ বেল, আমলকী, হরীতকী, চিরতা প্রভৃতি বনস্পতির মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি দেখিতে দেখিতে ও নানাপ্রকার পক্ষীর কুলরব শুনিতে শুনিতে নানাপ্রকার মধুর গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নগরের মধ্যে নানাপ্রকার জন-প্রবাহ ও দোকানপাট দেখিয়া পথিক যেরূপ পথের ক্লেশ অনুভব করে না, সেইরূপ আমরা বৃক্ষের স্নিগ্ধছায়া, ঝরণার মধুর কলকল শব্দ, বহুবিধ প্রস্তর ও খনিজ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে সরযূর পবিত্র তটে উপস্থিত হইলাম।

সরযূ দেখিয়া কবি হৃদয় নানাপ্রকার কল্পনায় উচ্ছলিত হইতে পারে। আমরা কিন্তু কল্পনা-রাজ্যে গমন না করিয়া বাস্তব রাজ্যের কথাই কহিব। প্রায় ১০টার সময় সরযূর তটে উপস্থিত হইলাম। নিম্নভূমিতে বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। অবস্থানের জন্য সরযূর তটে একটি শিবালয়ে আশ্রয় লওয়া গেল। আমাদের আগমনের সহিত স্থানীয় মুদী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি আগমন করিলেন। সহরবাসী আমরা মনে করি, অর্থের বিনিময়ে সর্ব্বত্র সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুদীকে বলিলাম, এক জন লোক দাও, কিছু পয়সা দিব, আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মুদী যে জবাব দিলেন, তাহাতে আনন্দিত ও লজ্জিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "অর্থের বিনিময়ে এ স্থানে ভক্ত পাইবেন না। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের সেবা করিব।" রন্ধনের আয়োজন করিতে কহিয়া সরযূতে অবগাহন-স্নান করিতে গমন করিলাম। জল অতি বেগে প্রবাহিত হইতেছে, জলের উপরিভাগে ও মধ্যে নানাপ্রকারের প্রস্তর, সাবধানে স্নান সমাপন করিলাম। আসিয়া দেখি, মুদী নরসিংহ দেবের লোক দুইটা চুলা প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। অনতি-বিলম্বে রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। নরসিংহ উত্তম দধি ও আমের চাটনি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত হইল। পরিতোষের সহিত ভোজন করাতে নরসিংহের আহ্লাদের সীমা রহিল না বোধ হইল।

ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া প্রায় ৩টার সময় আবার গমন করিবার উদ্যোগ করা গেল। যাইবার পূর্ব্বে নরসিংহকে তাহার পয়সা চুকাইয়া লইবার জন্য আহ্বান করিলাম। সে আসিয়া প্রণামান্তে কোনরূপে পয়সা লইতে স্বীকৃত হইল না; অধিকন্তু অনুরোধ করিল, "আগের চটিতে

আমার পুরোহিতের দোকান আছে। তাঁহার কাছে আমার নাম করিলে থাকিবার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।” ‘নরসিংহের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আরও একটু আগে গিয়া গেনাই নামক স্থানে অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে উপস্থিত হইলাম। গেনাই আলমোড়া হইতে ৩০ মাইল। সুতরাং আজ প্রায় ১৬ মাইল হাঁটা হইয়াছে। এ স্থানে একখানিমাত্র দোকান, দোকানীর কাছে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মুদী মহাশয় কয়েকখানি ঘর দেখাইয়া দিয়া যে কোন গৃহ নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ঘরগুলি দুই তালার উপর, দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু উপরে ভাল হইলে হইবে কি? সকলগুলিই আবর্জ্জনাপূর্ণ হওয়াতে পিশু জন্মাইবার পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছে। আমার সঙ্গীটিকে পিশু ও ছারপোকাতে ক্ষতবিক্ষত করায় সে অনিদ্রায় কয়েক রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। দৈবক্রমে আমি উভয়ের আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছি। কৈলাস-যাত্রী আমাদের আগমনের সংবাদে গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে গ্রামের পাটওয়ারী মহাশয়ও আগমন করিলেন। থাকিবার অসুবিধা দেখিয়া তিনি একখানি নূতন গৃহে থাকিবার বন্দোবস্ত করেন। এই গৃহে প্রথম প্রবেশ আমরাই করিলাম। এ জন্য গৃহস্বামী বিশেষরূপে আনন্দ-প্রকাশ করেন। পাটওয়ারী জাতিতে রজপুত। তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কতকগুলি যুবক ও বৃদ্ধ আসিয়া ধর্ম্ম-কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদিগকে আমি স্বাস্থ্য, কৃষি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করি। শ্রোতাদের মধ্যে স্থানীয় ডাকবাংলার জমাদার প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমি মুসলমান, কখন রোজা বা নেমাজ করি নাই। ইহার কি দরকার আছে?” তাহাকে সরল কথায় বুঝাইয়া বলিলাম, “তুমি যদি ভোজন না কর, তাহা হইলে শরীর দুর্ব্বল, কৃশ বা নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই শরীর ছাড়া আর একটা জিনিষ ইহার ভিতর আছে। তাহার খোরাক উপাসনা, উপাসনার দ্বারা তাহা পরিপুষ্ট হয়, তাহার গ্লানি দূর হয়, এবং মানসিক বল বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক মানুষের উপাসনা করা উচিত।” সে বড়ই প্রসন্ন হইল, আর ডাকবাংলায় থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ডাকবাংলা সুন্দর স্থানে অবস্থিত হইলেও কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম না। স্বাস্থ্য ও আত্ম-নির্ভরতার উপর একটু বেশী করিয়া কহাতে এক জন বৃদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক কিছু কহিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্য এক জন যুবক তাহার কথায় বাধা দিয়া কহে, “ইহাই ত ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপালিত হইলে সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইবে।” কতকগুলি যুবক, বাঙ্গালার নব যুবকগণ কর্ত্তৃক নবযুগ আনয়নের উদ্যমের কথা আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের কথায় আমার বঙ্গ-মাতার অঞ্চলের নিধি যুবকগণের উপর তাহাদের যে পূজ্যবুদ্ধি আছে, তাহা বেশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আর আমিও যুবকগণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলাম।

গ্রামবাসীরা এ স্থানে ২।১ দিন থাকিতে অনুরোধ করে। দেড় ক্রোশ দূরে একটি সুন্দর হ্রদ আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষমণ্ডিত পর্ব্বত থাকায় ইহা বড়ই রমণীয় হইয়াছে। এই স্থানের প্রায় এক ক্রোশ দূরে কাতুর রাজাদের রাজধানী ছিল ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন জন্য আকাঙ্ক্ষা হইলেও কৈলাসের দিকে মনটা আকৃষ্ট হইল।

প্রত্যূষে ৫টার সময় গেনাই পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২টার সময় ১২ মাইল হাঁটিয়া বেরীনাগে বা বেনাগে উপস্থিত হওয়া গেল। কাশ্মীরে বেরীনাগ নামে একটি সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান আছে, সৌন্দর্য্যে তাহার সহিত ইহার তুলনা না হইলেও স্থানটি মন্দ নহে। ইহা এ অঞ্চলের সহর। এ স্থানে স্কুল, ডাক-ঘর, চা-বাগান আছে। কয়েক জন ইংরাজও অবস্থান করিয়া থাকেন। এ স্থানে দোকানের সংখ্যাও অনেক। স্কুলের বারান্দায় থাকিবার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা গেল। ভোজনের পর বিশ্রামকালে দেখিলাম, দলে দলে যুবক কেহ মণিঅর্ডার, কেহ বা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। এ অঞ্চলের বহুলোক ইংরাজের সম্মান, সাম্রাজ্য সুরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছে। তাহাদের প্রেরিত ৫।৭ শত টাকা প্রতিদিন পোষ্ট আফিসে আসিয়া থাকে। সকল সময় পোষ্ট আফিসে টাকা না থাকায় গৃহীতাদের বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সময় সময় ২০।২৫ দিনও অপেক্ষা করিতে হয়। সরকার

বাহাদুর টাকার পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে নোট চালাইবার' পক্ষপাতী, পাহাড়িরা টাকার পক্ষপাতী, এ জন্যও টাকা দিতে অনেক সময় বিলম্ব হইয়া থাকে।

বৃষ্টির জন্য যাত্রা করা হইল না। মনে করিলাম, ১ মাইল নীচে পুঙ্গেশ্বর নামক এক মহাদেবের প্রাচীন মন্দির আছে, একটু জল থামিলে দেখিতে যাইব। তাহাও হইল না। বারান্দায় বসিয়া যখন নানা বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম, তখন কতকগুলি যুবক আমার কাছে উপস্থিত হয়। এক জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না। তাহার এ ব্যবহারে বিস্মিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যখন অবগত হইল যে, আমি কৈলাস-যাত্রী, তখন সে লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিয়া পরিচয় প্রদান করিল। মনে করিয়াছিল, আমি সৈন্য-সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি! তাহারা গৃহে গমন করিবার উপক্রম করিতেছিল এজন্য মিঠাই প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছিল। তাহা হইতে কিছু কিছু আমাকে প্রদান করিতে লাগিল, আমি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঘটনা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রাচীন শিষ্টাচার ভুলিয়া যায় নাই দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। যে সমাজে মানুষের পরিবর্ত্তে দ্রব্যের দ্বারা সমৃদ্ধি পরিমিত হয়, সে সমাজ যে ধ্বংসোন্মুখ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রাধান্য লাভ করিলেও প্রাচীন আদর্শ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; আশা হয়, আবার স্রোতের পরিবর্ত্তন হইবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিয়া গেলে চা-বাগান দেখিতে গেলাম। চা বাগানের মালিকরা (অবশ্য ভারতবাসী নহেন) তিব্বতে চা'র ব্যবসা যাহাতে হস্তগত করিতে পারেন, সে জন্য এক সময় বড় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিব্বতীরা চীনের Brick teaর পক্ষপাতী। এ চা চীন হইতে লাসা হইয়া পশ্চিম-তিব্বতে প্রেরিত হইয়া থাকে। বেরিনাগের চা-ব্যবসায়ীরা চীনের ব্রিক টি প্রস্তুত করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। শুনিতে পাই, রূপে আর গুণে ইহারা চীনে চার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। দামেও খুব সস্তা, প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। তাহা হইলে হইবে কি? তিব্বতীরা ইংরাজী মাল পসন্দ করিল না, বেশী দামের চীনের চা তিব্বতীদের রসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

চা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি যে দেশে যাইতেছি, সে দেশবাসীর আনন্দের উৎস,—জীবনের সহচর চা। সেই জন্য মনে করি, ইহার সম্বন্ধে দুই এক কথা কহিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না। চা আমাদের খাস ভারতীয় সম্পত্তি। চীনবাসী ইহা ভারতবাসীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ডাঃ রয়েল নামক এক জন উদ্যোগী ব্যক্তি কামায়ুন পাহাড়ে ইহার আবাদ হইতে পারে, এই মর্ম্মে সেই সময়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অবগত করান। ব্যবসায়ী ইংরাজ এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে বীজ আনাইয়া আমাদের শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনে বপন করা হয়। সেই গাছ আসাম ও কামায়ূনে পাঠান হয়। আসাম চা'র জন্মভূমি—এখনও আসামের বনে জঙ্গলে বন্য চা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আসামী চা পৃথিবীর চা ব্যবসায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কামায়ুনে চা-বাগিচা বড় সুবিধা করিতে পারে নাই। আলমোড়া জিলাতে প্রায় ২০টা চার বাগিচা আছে; ২ হাজার একরের উপর জমীতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই সকল কথা শুনিয়া ও চা-বাগান দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অতি প্রত্যুষে বেরিনাগ পরিত্যাগ করিয়া থলে উপস্থিত হইলাম। ইহা আলমোড়া হইতে প্রায় ৫২ মাইল দূরে। আগমনকালে রাম-গঙ্গা পার হওয়া গেল। ইহার তটে প্রাচীন বালেশ্বরের মন্দির। দূর হইতে ইহার আমলক দেখিয়া বোধ হইল,যেন দক্ষিণ দেশের মন্দির এ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মেরামত না হওয়াতে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রদেশে পুঙ্গেশ্বর, কোটেশ্বর, বাগেশ্বর, ভুবনেশ্বর নামে যে পাঁচটি প্রাচীন শিব-লিঙ্গ আছে, বালেশ্বর তাহার অন্যতম। মন্দিরটি চন্দরাজ নির্ম্মিত। এ স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে ৮ দিন ধরিয়া একটি মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। থলের স্কুলে ভোজনাদি করিয়া বিশ্রাম করা গেল। স্কুল হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি বেশ নয়নরঞ্জন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তায় এক হাথিয়া দেউল দেখিলাম। রাস্তার স্থানে স্থানে লোকালয়, স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যও দেখা গেল। বনের ভিতর বৃক্ষসকল যে বিনা বাধায় নিরুদ্বেগে বর্দ্ধিত হইবে, তাহার যো নাই।

সর্ব্বত্রই সকলে শত্রু-পরিবেষ্টিত। মানুষ যেমন অন্য মানুষের অধীন হয়, ভারবাহী হয়, বৃক্ষের অবস্থা তাহা হইতে অন্যরূপ নহে। এক প্রকার লতা আছে, ইংরাজীতে ইহাকে হস্তী-লতা কহে, ইহার স্বভাব ২।৩ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া উন্নত পাদপকে কবন্ধের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করিয়া থাকে। এ রোগের একমাত্র ঔষধ মূলোচ্ছেদন। মূলোচ্ছিন্ন হইলে উভয়েই রক্ষা পাইয়া থাকে, অন্যথা উভয়ে পিষ্ট হইয়া বিধ্বস্ত হয়।

আজ সমস্ত দিনে প্রায় ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় ভিজিতে ভিজিতে দিদি-হাটের ডাক-বাংলার বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ডাক-বাংলা উচ্চ প্রদেশে নির্ম্মিত হওয়াতে বনভূমির এবং হিমালয়ের তুষার দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক-বাংলার রজপুত জমাদার কিছু মিছরি দিয়া প্রথম সৎকার করিয়া নূতন আলু ক্ষেত হইতে আনিয়া আর আটা দিয়া অতিথিসৎকার করেন। তিনি দূর গ্রামে অবস্থান করেন। সুতরাং আবাহনের সহিত বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন! সকাল বেলায় দেখা হইবে না বলিয়া কতই কাতরতা প্রকাশ করিলেন!

এ স্থানে এক অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করি। তাহার কারণ এখনও নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। ভোজনাদি করিয়া শয়নের পর, অকস্মাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। দেখিলাম, অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ পার্ব্বত্য প্রদেশকে আলোকিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। বহুসংখ্যক মশাল জ্বালাইয়া আসিলে, কিঞ্চিন্মাত্র আলোকিত হইতে পারে। তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সলোম্যান সেপ্টার বা সলোম্যানের দণ্ড, সে জ্যোতিঃ হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার কারণ কি?

প্রাতঃকালে দিদি-হাটের ডাক-বাংলা পরিত্যাগ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এক দিন এ স্থানে অবস্থান করিয়া এ স্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। বৃষ্টির সমাগমে ক্ষেত্রের কার্য্য করিবার জন্য কুলীরা কোনরূপে রাজী হইল না। সুতরাং আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময় বহুদিনের ঈপ্সিত আসকোটে উপস্থিত হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

বাঁশী।

জাগো জাগো, ব্রজবাসী, বাঁশী বাজে ওই,
এমন মধুর বাঁশী শুনি নে ত কই!
কে বাজায় কোথা হ'তে,
বুঝি নে ত কোন মতে,
শুধু গো শ্রবণ-পথে সুধা ঢালে, সই,
জাগো জাগো, ব্রজবাসী, বাঁশী বাজে ওই!

নীরব নিঝুম নিশি, নিশীথ গভীর,
জ্যোছনা ঢালিয়ে দেছে আলসে শরীর।
এমন মধুর রেতে,
ওই শোন কান পেতে,
বাজিছে চরণে কার মধুর মঞ্জীর,
সে ধ্বনি পবন বহে ধীর—অতি ধীর।

বাঁশী শুনে ফোটে বনে রাশি রাশি ফুল,
উচ্ছাসে যমুনা বয় উছলিয়া কূল।
কুহরিয়া ওঠে পিক,
শিহরিয়া ওঠে দিক্,
স্থাবর জঙ্গম ঠিক সমান আকুল,
কি জানি কি ভাবে প্রাণে কিসে আনে ভুল!

আমার হিয়ার মাঝে কেমনে কোথায়
কি কথা লুকানো ছিল, তা-ই বাঁশী গায়।
লুকানো তা ছিল কি যে,
জানি নে তা আমি নিজে,
কি মন্ত্রে কেমনে খুঁজে বাঁশী তা শুনায়!
কে বাঁশী বাজায়, ও গো, কে বাঁশী বাজায়!

সে কোন্ গহন বনে, ভুবন-মোহন,
বাজায় জানি নে, সখি, বাঁশরী এমন।
তমালের তলে খুঁজি,
সেথা বঁধু আছে বুঝি,
খুঁজি কালিন্দীর কূলে—নিষ্ফল যতন,
সে মোর পরাণ-বঁধু না জানি কেমন!

আমি ব'লে নই, ও গো, আমি ব'লে নই,
আপনা হারায় কে না বাঁশী শুনে ওই।
জড়ের অধিক হেন,
তোমরা ঘুমায়ে কেন,
ওঠ ওঠ, প্রাণসখা, ওঠ প্রাণ-সই—
জাগো জাগো, ব্রজবাসী, বাঁশী বাজে ওই!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

২০

প্রথমে আমি কিছুক্ষণের জন্য অবাক, নিষ্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের পানে চাহিয়া আছি। বৃদ্ধ যেন সমাধিতে লীন, চসমার ভিতরে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত, দেহে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এরূপ আকস্মিক মৃত্যু দেখা আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতেও এ পর্য্যন্ত একটি কথা বাহির হয় নাই। মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখি, পিতার মুখের পানে সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

"দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌বার ত সময় নয়, মা, বৃদ্ধ বাপের কাশী-প্রাপ্তি, কন্যার কর্ত্তব্য কর্‌বার সময়।"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, সেইরূপ নীরবেই কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে আরও কিছুক্ষণ কাঁদিবার অবসর দিয়া আমি বলিলাম—"মা, আমার কথা শুন্‌লে?"

এইবারে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"শুনেছি।"

"সংকারের একটা ব্যবস্থা ত কর্‌তে হবে!"

সিদ্ধেশ্বরী আবার চুপ করিল। উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ান আর ত আমার চলে না; আমি বলিলাম—"আমি এখন কি কর্‌ব, মা?"

"আপনি যান।"

"আমার অবস্থা ত তুমি সব জান।"

"আপনি আর দাঁড়াবেন না।"

"আর দাঁড়ানো অসম্ভব, কিন্তু এ রকম অবস্থায়—"

"আপনাকে ত আর থাকৃতে বল্‌তে পারি না।"

"এখানে তোমাদের কে কোথায় আছেন বল, আমি খবর দিয়ে যাই।—চুপ্ ক'রে থাক্‌বার যে আর সময় নেই, মা!—আমাকে বল্‌তেও কি তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে? আমাকে আত্মীয় জেনে বল।"

"এখন ত কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

"সে কি!"

"ওঁর ছেলে আছেন দেশে।"

"সে ত তোমার বাবার মুখেই শুনেছি।"

"এখানে ওঁর কোনও আত্মীয় নেই। আর থাক্‌লেও উনি রাখেন নি?"

"তোমার মাতামহ ত এখানে থাক্‌তেন।"

"আমার এক মামা আছেন। তিনিও এখানে নেই। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে তিনি কলকেতায় চ'লে গেছেন।"

মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তা হইলে এই কাশী সহরে, দেখছি, আমি ভিন্ন ত আর কেহ তার দ্বিতীয় আত্মীয় নাই!

বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে জালের মত চারিদিক হইতে চিন্তা আমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পীড়নে অস্থির হইয়া বেশ একটু উত্তেজিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেউ নেই?"

"আপনি আছেন।"

"আমার থাকার মূল্য কি?"

সিদ্ধেশ্বরী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ! আমাকে এ কি সমস্যায় ফেলিলে! মেয়েটার মুখের দিকে একবার চাহিলাম। বস্ত্রাঞ্চলে মুখখানাকে মুছিলেও এখনও মুখের

অনেক স্থানে রক্ত লাগিয়া আছে। রক্তচিহ্নের পার্শ্ব দিয়া এখনও অশ্রুর প্রবাহ। মুখের এক দিক, বিশেষতঃ কপালটা বেশ ফুলিয়াছে। ক্ষত হইতেও তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছিল। আঘাতের কারণ নির্ণয় করিতে মেঝের দিকে দৃষ্টি দিতেই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পড়িবার কালে বাপের একটা পূজাপাত্রে মাথা লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

অত যখন রক্ত, তখন আঘাত সামান্য না হইবারই সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি মৃত পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"এ ত যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন তুমি তোমার জীবনটা রক্ষা কর।"

"ভয় নেই, বাবা, আমি মরব না।"

"ও কথা ত আগেও শুনলুম, ও কথার কোনও মূল্য নেই—আঘাত নিতান্ত কম ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিল।

"চুপ্ ক'রে থেকে সময় কাটালে ত চল্‌বে না; বাপের দেহের যদি গতি করতে হয়, তা হ'লেও ত এ অবস্থায় তোমার থাকা চল্‌বে না।"

"আপনি যান।"

"যেতে পারলে, এতক্ষণ কি তোমার বল্‌বার অপেক্ষা রাখ্‌তুম, সিদ্ধেশ্বরী; তবে একবার আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে তাও যে করতে পারছি না, মা।"

ঠিক এমনই সময়ে মৃতদেহটা পড়িয়া গেল। সেখানে দুই তিনখানা পিতলের বাসন ছিল। দেহটা সেগুলার উপর পড়িয়া একটা শব্দ তুলিল। শব্দ বেশী না হইলেও, অবস্থার গুণে আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। দেহটা পড়িয়াই গড়াইল। পা-দু'টা সেইরূপই পরস্পরে বাঁধা।

সে বীভৎস দৃশ্য আমার দাঁড়াইয়া দেখা চলিল না। আমি সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়া উঠিলাম—"ঘর থেকে বেরিয়ে এস আপাততঃ।"

সিদ্ধেশ্বরীও বুঝি ভয় পাইয়াছে, সে বলিবার অপেক্ষা রাখিল না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। ঘরে শিকল দিতে দিতে বলিলাম—"এখন দোর বন্ধ থাক্, আমি একবার বাসা থেকে ফিরে আসি, এর মধ্যে তুমি গা, হাত, মুখ ধুয়ে ফেল। তোমার দিকেও চাইতে পারছি না, মা!"

কিন্তু ফিরিয়া দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতেছে। আমি তাহাকে ধরিতে না ধরিতে সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

আর তাহার বাধা মানিতে পারিলাম না, শতনিষেধ উপেক্ষা করিয়া আমি তাহার শুশ্রূষার সঙ্কল্প করিলাম।

২৪

মানুষ অনন্ত ভাবের অধিকারী। গুরু-কৃপায় সিদ্ধেশ্বরীকে বক্ষে ধরিয়াও আজ যে ভাব আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। এই বুঝি প্রকৃত বাৎসল্য! ইহার সমক্ষে স্নেহাস্পদ বুঝি কোনও কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না। মেনকার চোখে গিরিকুমারী বুঝি চিরদিনই অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী! আঘাতে, শোকে, ভয়ে, নিরাশায়— সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন সিদ্ধেশ্বরীকে যখন ধোওয়াইয়া, মুছাইয়া, ক্ষতস্থান কাপড়ে বাঁধিয়া বক্ষে ধরিয়া উপরে তুলিয়া তাহার ঘরে শয্যায় শয়ন করাইলাম, তখন সত্যসত্যই আমি গৌরী সেবার সুখই অনুভব করিলাম। এ সেবায় আমি গুরুদেবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। যখন তাঁহার কথা স্মরণে আসিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

এখনও পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে আমি ও সিদ্ধেশ্বরী, আর ঘরের ভিতরে আবদ্ধ তাহার পিতার মৃতদেহ।

"একটু দুধ খেতে হবে যে, মা!"

মুদিত চক্ষুতে হাত নাড়িয়া সে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

"না বল্‌লে চল্‌বে না, কিছু মুখে দিতেই হবে, নইলে যে, মা, জীবন থাক্‌বে না!"

সে সেইরূপই ইঙ্গিতে বুঝাইল, তাহার বাঁচিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার এত অধিক দুর্ব্বলতা আমাকে বিশেষ চিন্তিত করিল। তাহার ক্ষতের গভীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্ষতের অবস্থা ত আমি বুঝি নাই! বুঝিতে হইলে এক জন ডাক্তারকে দেখান প্রয়োজন।

কিন্তু একা আমি কি করিব? যোগিনীর আসিবার কথা ছিল, তিনিও ত এখনও পর্য্যন্ত আসিলেন না! ইহাকে এই অবস্থায় কাহার কাছেই বা রাখিয়া যাই! "হাঁ, মা, লছ্‌মী কখন্ আসিবে?"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না। একটু কিছু খাওয়াইয়া ইহাকে সবল করিতেই হইবে। আমি দুগ্ধের

অন্বেষণে পার্শ্বের রান্নাঘরে চলিয়া গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে দুগ্ধ পাইলাম।

কিন্তু আনিয়া তাহা সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কাছে ধরিতে সে পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। খাওয়াইবার জেদ করিলে চোখ মুদিয়াই সে হাতজোড় করিল।

"আমার অনুরোধ, মা, জীবন রক্ষা কর।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী এবারে কথা কহিল—"আমার বাঁচার কোনও মূল্য নেই, বাবা, মরাই আমার বাঁচা।"

এইবারে আমি গোটাকতক শাস্ত্রের বচন বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিলাম; বুঝাইলাম, জীবন রাখার মূল্য আছে, তাহাকে অবসন্ন করিতে নাই, মৃত্যুর কামনা করাও পাপ, সুখে দুঃখে তাহাকে বহন করাই ধর্ম্ম।

কথা বোধ হয় তাহার কানে প্রবেশ করিল না, অথবা সে তুলিল না, দুধ মুখে ধরিতে দেখিলাম, সে দাঁতে দাঁত দিয়া রহিয়াছে। তখন আমাকে ঈষৎ উষ্মার সহিতই বলিতে হইল—"অন্ততঃ আমার পরিশ্রমটা নিষ্ফল ক'রো না, মর্‌তে হয়, এর পরে ম'রো। আমি গুরুর সেবার জন্য মিষ্টান্ন নিতে এসে এই বিপদে পড়েছি।"

সিদ্ধেশ্বরী হাঁ করিল, আমিও তাহাকে দুগ্ধ পান করাইলাম।

পানের অল্পক্ষণ পরেই সত্যসত্যই তাহার দেহে বল আসিল। সে আমার নিষেধ সত্ত্বেও উঠিয়া বসিল; বলিল—"আপনি একবার বাসায় যান।"

"যেতে পার্‌লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখ্‌তুম না।"

"একবার গুরুবাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন।"

"তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে?"

"আমি সুস্থ হয়েছি, বাবা!" বলিয়াই সে বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল। আমি ব্যাকুলতার সহিত বাধা দিলাম। সে বাধা না মানিয়া শয্যা ছাড়িয়াই আমার দু'টা পায়ের উপর মাথা দিয়া পড়িল।

"হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি, মাথায় আবার আঘাত লাগবে, সিদ্ধেশ্বরী!"

কাকে বলি, কে শোনে! এ কি উষ্ণ অশ্রু!—দুই হাত দিয়া সন্তর্পণে তাহাকে শয্যায় বসাইয়া বলিলাম—"যোগিনী মা কই ত এলেন না!"

কপালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আমার অদৃষ্ট।"

"লছ্‌মী কখন্ আসে?"

"তার আস্‌তে এখনো বিলম্ব আছে।"

"তার বাসা?"

"এখান থেকে অনেকটা পথ। আমার পূর্ব্বের বাড়ীর কাছে।"

"সে বাড়ী কোথায় ছিল?"

"লছ্‌মী-কুণ্ডায়।"

অনেক দূরই ত বটে। সেখানে পৌঁছিতে যে সময় লাগিবে, সে সময়ের মধ্যে আমার বাসায় যাতায়াত করা যায়।

এই সময় একবার রাজাবাবুর নামটা আমার মনে উঠিল। ভাবিলাম, তার কথাটা একবার সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তুলি। সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-রহস্য অনেকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছি। যেন কেন, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতে প্রতিবাদ না পাইলে ঠিকই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, সেই চরিত্রহীন ধনী হইতে এ বালিকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। আমার গৌরী সেই অবৈধমিলনের ফল।

এতক্ষণই যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর একটু অপেক্ষা করিয়া সমস্ত মনের সন্দেহটা মিটাইয়া লই না কেন! ইহার পর আর কি এমন সুযোগ ঘটিবে!

কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও রাজাবাবুর নাম যখন মুখে আনিতে পারিলাম না, তখন বিদায়গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলাম—"মনে করছি, আমার বাসাতেই তোমাকে নিয়ে যাই।"

সেই দারুণ বিপদের মধ্যেও সিদ্ধেশ্বরীর মুখে হাসি দেখা দিল।

"হাস্‌লে কেন, মা?"

সমস্ত বিষাদরাশি মন্থন করিয়া হাসির বিজলী তাহার মুখের উপর স্থিরসৌন্দর্য্যে লীলা করিতে লাগিল।

"হাস্‌ছ কেন, সিদ্ধেশ্বরী? সেখানে গেলে তোমার সেবা হবে।"

"তা হবে।"

"তবে? তোমার বাপের দেহ-সংকারের কথা ভাবছ?"

"না।"

"তোমাকে বাসায় রেখে আমি সে সমস্ত ব্যবস্থা কর্ব!"

"আপনি ভিন্ন করবার আমার আর কে আছে?"

"তা হ'লে পাল্‌কী আনাই?"

সিদ্ধেশ্বরী আবার হাসিল।

"যাবে না?"

চক্ষু দু'টি আনত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বার কি উপায় রেখেছি!" বলিয়া সে একটি গভীর শ্বাসত্যাগ করিল।

"কেন উপায় নেই, মা! আমি ত তোমার উত্তরের অর্থ বুঝতে পার্‌লুম না।"

"আপনি আমাকে কি মনে ক'রেছেন?"

আমি বিস্মিতনেত্রে কেবল তাহার মুখের পানে চাহিলাম। বুঝিয়াও যেন আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"আমার মরণের অবস্থা, বাবার মৃত্যু—এ সব দেখেও কি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না?"

"তুমিই কি গৌরীর—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"তার নাম রেখেছেন গৌরী?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিষাদমাখা হাসিতে তাহার মুখখানি আচ্ছন্ন হইল যে, দেখিবামাত্র আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শূন্য, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী আমার মানসিক অবস্থা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিল—"এই সমস্ত জেনে, আপনি আমাকে ঘরে স্থান দিতে সাহস করেন? বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমি পতিতা?"

"তোমার যে পাঁচ ছ' দিন আগে বিবাহ হয়েছে বল্‌ছিলে!"

"বিবাহ? তিনি দয়া ক'রে বিবাহের নামে আমাকে আবার সমাজে স্থান দিয়ে গেছেন।"

"তোমার অবস্থা জেনেও?"

"জেনেই দিয়েছেন।"

"তোমার স্বামী এখন কোথায়?"

"তিনি দেশে চ'লে গেছেন।"

"আস্‌বেন কবে?"

"আর কি তিনি আস্‌বেন!"

"একেবারেই আস্‌বেন না?"

"আস্‌বেন?"

"কাশীতেও আর আস্‌বেন না?"

"তা বল্‌তে পারি না। তবে আমার মনে হয়, কাশীতে এলেও আমার কাছে তিনি আস্‌বেন না।"

"তাঁর বোধ হয়, দৃঢ় ধারণা, তুমি তাঁর এ মহত্ত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"পার্‌ব না?"

"সে আমি কেমন ক'রে বল্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী! এর উত্তর দিতে পার একমাত্র তুমি।"

সিদ্ধেশ্বরী মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি অনুমান করিলাম, সে মনে মনে পূর্ব্বজীবন বিস্মৃতির কোলে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। ভাল হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিতেছে। আমি তাহাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ দিলাম।

যখন দেখিলাম, তার চিন্তার শেষ নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বিদায়গ্রহণের আভাস দিতে হইল।

"এখন আমি কি কর্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী?"

সিদ্ধেশ্বরী এখনও পর্য্যন্ত চিন্তার সূত্র ধরিয়া ছিল। আমি কি বলিলাম, বোধ হয়, সে শুনিতে পাইল না। সে একটু গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল—"পার্‌ব না, বাবা?"

তাহার কথার সুরে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"মনকে যদি দৃঢ় কর্‌তে পার, তা হ'লে কর্‌তে না পার কি? আজ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় আছ, দু'দিন পরে সেই সমাজ তোমাকে আদর্শ ভাবিয়া আবার মাথায় তুলিতে পারে।"

"আপনি আসুন।"

"একবার আমার না গেলে আর চল্‌ছে না।"

"আপনি যান।"

"তুমিও চল।"

"আমি যাব না।"

"আমার কথায় কি ক্ষুণ্ণ হ'লে, মা?"

জিভ কাটিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"না দয়াময়, আপনাকে পেয়ে আমি বাবার জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বার অবকাশ পাইনি। বাপের অভাব আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবু আমি যাব না।"

"তোমারও যে আজ গুরুর প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

কপালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সে বলিল—"ভাগ্যে নেই।"

"তোমার গৌরীকে দেখ্‌বারও কি ইচ্ছা হচ্ছে না ?"

সেই ফোলা মুখ ভিতর হইতে রক্ত-প্রবাহ-পীড়নে যেন ফুলিয়া উঠিল—"আমার গৌরী! আমার বল্‌বার সম্পর্ক আমি তার সঙ্গে কি রেখেছি, বাবা!"

"যদি বাবাই আমি তোর, তা হ'লে আমি অনুরোধ কর্‌ছি, চল্ মা।"

"তার বেঁচে থাকার কথা শুনেই দেখ্‌বার জন্য আমি পাগলের মত হয়েছিলুম। তোমার গৌরী, তোমারই কাছে থাক্। তাকে দেখ্‌তে আর আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।"

বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শয়ন করিল। বুঝিলাম, অনেক কথা কহিয়া আবার তাহার ক্লান্তি আসিয়াছে। আর কোনও কথায় তাহাকে উত্যক্ত করিতে আমার সাহস হইল না। আমি কেবল বলিলাম—"একবার তা হ'লে আমি ঘুরে আসি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে চোখ না মেলিয়াই বলিয়া উঠিল—"তবে কি জানেন দয়াময়, আপনার গৌরীকে যদি গর্ভেই নষ্ট কর্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে আমার বুঝি এ দুর্দ্দশা হ'ত না; আপনাদের সমাজে আমি কুল-লক্ষ্মীরই আদর পেতুম; নারায়ণ পর্য্যন্ত আমার হাতের রান্না খেতে দ্বিধা কর্‌তেন না। আপনি যান, আমি কোথাও যাব না।"

সত্য কথা বলিবার যদি আমি অভিমান রাখি, তাহা হইলে এ কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়, ঋষিকুল-প্রতিষ্ঠিত সনাতনধর্ম্মের একাশ্রয় হিন্দু-সমাজ! তুমি কোন্ যুগের মধুরতা হইতে কোন্ যুগের তীব্রতা আশ্রয় করিয়াছ ?

ক্ষুণ্ণমনে সিদ্ধেশ্বরীকে সেই মরণের বাড়ীতে একা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

২৫

সঙ্কোচের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ী যেন জনশূন্য। উপরে, নীচে কোথাও যেন একটিও প্রাণীর অস্তিত্বের নিদর্শন পাইলাম না। বাহিরের দ্বার হাট করিয়া খোলা। একবার উপর নীচে চাহিলাম। তাহার পর ধীরে কবাট বন্ধ করিয়া ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

প্রথম ডাকে কোনও উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম, গুরুদেব গৃহে নাই। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। বেলা তখন অনুমান তিনটা। কৃপা করিয়া গুরু আজ সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে অতিথি হইলেন, আমি হতভাগ্য তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম না! অনাহারে আমার ঘর হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইল! ব্যাকুলভাবে একটু জোরগলায় এইবারে ডাকিলাম—"ভুবনের মা! —এ কি, আপনি ?" দেখি, যোগিনী চোখ মুছিতে মুছিতে রান্নাঘরের মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন।

"আপনি এখানে!"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বাবা, আপনার আসা জান্‌তে পারিনি। কখন্ আস্‌বেন, বুঝ্‌তে না পেরে দোর খুলে রেখেছিলুম। এই অবস্থায়, আমার মরণ, ঘুমিয়ে প'ড়েছি।"

"তা বেশ করেছেন, তাতে দোষ হয়েছে কি!"

"দোষ বিলক্ষণই হয়েছে, বাবা। যদি চোর ঢুকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যেতো, আমি ত কিছু জান্‌তে পার্‌তুম না!"

"বাড়ীতে কি আর কেউ নেই ?"

"কেউ নেই—গুরুদেব নেই, ভুবনের মা বুড়ী নেই, আপনার গৌরী পর্য্যন্ত।"

"গুরুদেব নিজের ইচ্ছায় আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এসে অনাহারে চ'লে গেলেন!"

"না, বাবা, আপনার সেই কৃপাসিন্ধু গুরু অনাহারে ফিরে আপনার কি অকল্যাণ কর্‌তে পারেন! আপনার ফেরার বিলম্ব দেখে, তিনি স্বহস্তে পাক ক'রে, আহার ক'রে, ভুবনের মা'কে প্রসাদ খাইয়ে, আপনার জন্য প্রসাদ রেখে চ'লে গেছেন। আমি আপনার প্রসাদ আগ্‌লে ব'সে আছি।"

"এঁরা কোথায় গেলেন ?"

"আগে প্রসাদ গ্রহণ করুন, তার পর শুনবেন।"

"আগে শুনতে কি দোষ আছে ?" আমি হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম।

সেইরূপই হাসির সঙ্গে যোগিনী উত্তর দিলেন—"একটু আছে বৈ কি!" তাঁহার মধুর হাসিতে উন্মুক্ত শুভ্র-মুক্তার মত দাঁতগুলি আমাকে যেন ঈষৎ রহস্য করিবার জন্য আমার চোখ দু'টাতে জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিল।

"শুন্‌লে আপনার হয় ত খাওয়া হবে না।"

আতঙ্কিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমন কথা যে, শুন্‌লে গুরুর প্রসাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব না?"

"তা পার্‌বেন না কেন, তবে পেটপোরা আহারে আপনার প্রবৃত্তি না হ'তে পারে। আপনার গুরুই আপনাকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে গেছেন।"

"কিন্তু শোন্‌বার জন্য আমার যে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে, যোগি-মা!"

"আপনার পক্ষে ওরূপ আগ্রহ ভাল নয়।"

"সেটা খুবই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তবু—"

"বাবাজি মহারাজের কাছে শুন্‌লুম, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেছেন।"

বলিয়াই মৃদুহাস্যের সঙ্গে মুখটি তুলিয়া বেশ একটু রহস্যেরই ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন—"সন্ন্যাসী মানুষের কৌতূহল কেন?"

"চলুন, বাবার প্রসাদ গ্রহণ করি।"

"হাত-পা ধুয়ে আসুন, আমি ঠাঁই করিগে।"

বলিয়াই তপস্বিনী মুখ ফিরাইলেন।

তিনি দু' পা যাইতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার?"

"আমার হবে এখন।"

"আপনি এখনো আহার করেন নি?"

মুখ ফিরাইয়া আবার শুভ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া যোগি-মা বলিলেন—"এক জনকেও কি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে নেই?"

মাথাটা ঝনঝনিয়া উঠিল। তাঁহার দৃষ্টি? এ কি সরলতার চাহনি? বলিতে পারিলাম না। কেমন কেমন-কি ঠেকিল? বলিতে পারিলাম না।

"তুমি আগে আহার কর, মা।"

"বেশ, এক সঙ্গেই খাবো, বাবা।"

* * * *

হাত, পা, মুখ ধুইতে ধুইতে মনে মনে বিশ্বনাথের নাম লইয়া সঙ্কল্প করিলাম। সন্ন্যাসাশ্রম আমাকে লইতেই হইবে। না পারি, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।

২৬

"কি গো ঠাকুর, বেলা যে বয়ে গেল।"

আমি নিজের ঘরে বসিয়া এতক্ষণ নিজের সঙ্গেই লড়াই করিতেছিলাম। চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলাম, মন যদি আমার উপর কথায় কথায় এইরূপ অত্যাচার করে, আমি কেমন করিয়া সন্ন্যাস লইব? লইয়া সে চরমাশ্রমের মর্য্যাদা যদি না রাখিতে পারি? যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমার পতন হয়, তা' হইলে ইহকাল পরকাল সব কি নষ্ট করিব? ভাবিতেছি, আর প্রাণপণ চেষ্টায় গুরুচরণ স্মরণ করিতেছি। এমন সময় তপস্বিনী ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া আমাকে উক্ত কথা শুনাইলেন। কথা তাঁহার কি মিষ্ট! আমি চোখ মেলিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তিনি আবার বলিলেন—"ঠাঁই ক'রে প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে যখন আপনার আসার কোনও লক্ষণ দেখ্‌লুম না, তখন অগত্যা আমাকে আস্‌তে হ'ল। কি কর্‌ছিলেন?"

"জপাদি আজ কিছুই হয়নি, মা, তাই সেগুলো সেরে নিচ্ছি।"

যোগি-মা খিল্ খিল্ হাসিয়া উঠিলেন।

এ কি বিদ্রূপাত্মক হাসি; বিদ্রূপ-স্বরূপ হইয়াও হৃদয়ে সে এমন তরঙ্গ তুলে কেন? নারীমুখের অনেক মধুরহাসি ত শুনিয়াছি, কিন্তু এমনটি ত আর কখন শুনি নাই।

"হাস্‌লে কেন গা?"

"উঠে আসুন—আর জপ কর্‌তে হবে না।"

"এ কথা বলার অর্থ?"

"সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, অর্থ আমাকে বল্‌তে হবে? যে উদ্দেশ্যে জপ, সেই অভীষ্টদেবকে দর্শন করেছেন—আজ আর আপনার জপ কি!"

"জপ করব না?"

"আপনি বুঝুন। কিন্তু আমি ত আর থাক্‌তে পারি না।"

"আপনি আহার করুন না।"

"কর্‌বার হ'লে আপনার অনুরোধের অপেক্ষা রাখ্‌তুম না।"

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"আমি ত' আর অপেক্ষা করতে পারি না, সেই মেয়েটি, বোধ হয়, আমার অপেক্ষায় এখনো অনাহারে ব'সে আছে। দৈব-দুর্বিবপাকে আমি এখানে আবদ্ধ হয়েছি। বাবাজি-মহারাজের প্রসাদ নিয়ে আমাকে তা'র কাছে যেতে হবে।"

আমি একবারে দাঁড়াইয়া বলিলাম—"চলুন।"

"আসুন, আবার যেন ডাকৃতে আস্‌তে না হয়" বলিয়া তপস্বিনী চলিয়া গেলেন।

আমাকেও উঠিতে হইল। কিন্তু উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বেদ—এতক্ষণ নিজের কাযেই আমি চোর হইয়াছি। সে চৌর্য্যের কথা ত আমি যোগি-মা'কে বলিতে পারিলাম না! জপের একটা মন্ত্রও এতক্ষণ মনেও উচ্চারণ করি নাই। কি করিতেছিলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিতে ত আমার সাহস হইল না। ভিতরের এই মিথ্যা লইয়া কি কেহ কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে? যদি হয়, সে সন্ন্যাসের মূল্য কি?

আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই আমি তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছি—বলিয়াছি, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে, এমন কথা আমি শুনাইব না। কলাকৌশলে সেরূপ ঘটনা তোমাদের মনোজ্ঞ হইতে পারে, আধ-গোপন আধ-প্রকাশের মাঝখান দিয়া তুলি ধরিয়া অতি কুৎসিতকেও সুন্দর করা সম্ভব, কিন্তু সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর চোখে তাহা চিরদিনই কুৎসিত। সমস্ত মধুরাবরণ ভেদ করিয়া সত্য তাহার দৃষ্টির সমক্ষে উগ্র-মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে। ধর্ম্মশাস্ত্র চিরদিনই তাহাকে নিন্দনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আমার যাহা ভাল লাগিবে, সব সময়েই তাহা ভাল নয়। যাহা ভাল নয়, তাহা পরিহার করিতেই শাস্ত্র কেবল উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

তখন আমি সন্ন্যাস-সঙ্কল্পী, বর্ত্তমান যুগের বয়সের হিসাবে বৃদ্ধ। আমার এই সমস্ত মনের কথা তোমাদের না শুনাইতেও পারিতাম। তবু শুনাইলাম। কেন? সত্যই তপস্যা, সত্যাশ্রয়ই সন্ন্যাস, তা তুমি ঘরেই থাক, কি গভীর অরণ্যেই আত্মগোপন কর। যদি শান্তি চাও, এই সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথা, স্থির জানিও, শান্তি নাই। তোমরা যাহাকে শান্তি বল, আমরা তাহাকে তোমাদের সুখ বলি। সে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাহার পশ্চাতে, তোমার অলক্ষ্যে, বিরাট দুঃখ তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বসিয়া আছে। শাস্ত্রকার অষ্টবিধ ক্লেশের মধ্যে সুখকেও এক ক্লেশের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই, সত্য কহিতে, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মনের কথা শুনাইলাম। শুনাইলাম বুঝাইতে, সন্ন্যাস লইতে কৃত-সঙ্কল্প বৃদ্ধের মনের যদি এই তাড়না, হে সংসারাগ্রহী যুবক, সে তোমাকে জানা না-জানার ভিতর দিয়া নিত্য কত তাড়না করিতেছে। মনের সেই মলিনতার ভিতর দিয়া দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে আমরা মন্দকে ভাল দেখি। আর যাহা ভাল—অমল-কুন্দবৎ শুভ্র, তাহা ওই দৃষ্টির দোষেই রঞ্জিত দেখিয়া থাকি।

আমারও তাহাই হইয়াছিল। দৃষ্টির দোষে এই অদ্ভুত চরিত্রা নারীকে দেখিতে আমি ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার সৌভাগ্য, সে অতি অল্প সময়ের জন্য। তাঁহার এক কথাতেই আমার চৈতন্য হইল। সত্যই ত, জপের উদ্দেশ্য ত আজ সিদ্ধ হইয়াছে! যাঁহাকে দশ বৎসরের সাধ্যসাধনাতেও গৃহে আনিতে পারি নাই, আনিবার অত্যধিক আগ্রহে অনেক সময় যিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অভীষ্টদেব স্বেচ্ছায় আজ এখানে অতিথি! তিনি আসেন নাই কেন, এত দিন পরে যেন বুঝিয়াছি। গৌরীর বন্ধন আমার কর্ম্মভোগের অবশিষ্ট ছিল। দিব্য দৃষ্টিবান্ তাহা বুঝিয়া এখানে আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন কেন, তাহাও যেন বুঝিতে পারিতেছি। আজ আমার অষ্টপাশ হইতে মুক্তি! তাই, এই কয়টা দিন ধরিয়া হৃদয়ের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

জ্ঞান-রূপিণী তাপসী-মূর্ত্তি মা! গুরুদেবের ইচ্ছায় তুমি বুঝি শেষ আঘাত দিতে আসিয়াছ! এ আঘাতের ভিতরে কোথায় তুই আমার গৌরী? জঞ্জালের ভিতর হইতে কুড়িয়ে আনা, এত দিন ব্যাকুল-স্নেহে বুকে ধরা, স্বর্গ হইতে ঝরা ফুলটির মত কোমল হইতেও কোমল, সুন্দর হইতেও সুন্দর ওরে আমার শিশু! কোথায় তুই? আর যে তোকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না মা! অন্ধের মত বাহুবিস্তার করিতেছি, তুই কোথায় লুকাইলি? আর যে তোকে আমি ধরিতে পারিতেছি না!

এরই নাম কি 'নেতি নেতি'? এই খুঁজিয়া না পাওয়াই আমার চৈতন্য?

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

পুরীদর্শন।

ইংরাজী ১৯০২ সালে আমি প্রথম পুরী গমন করি। ১৭ই মে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা পুরী পৌঁছিলাম। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া স্বনামখ্যাত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বর্গগত রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের "শশিনিকেতন" নামক সাগর তীরবর্ত্তী প্রাসাদে মালপত্রাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া সস্ত্রীক "ধূলা পায়ে" ঠাকুর দেখিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। দর্শনাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে বেলা প্রায় তিনটা হইল। সে দিন সমুদ্রে স্নান হইল না। বাড়ীতেই স্নান করিয়া সপরিবারে জগন্নাথের ভোগ তৃপ্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

পুরী—জগন্নাথ দেবের মন্দির।

৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর বহুদিন কটকের সরকারী উকীল ছিলেন। তিনি এক জন অতি বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার সততা, কার্য্যদক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য তিনি কি গবর্ণমেণ্ট, কি জনসাধারণ, সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অপেক্ষা তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকারিতা, সৎকার্য্যে দান, আতিথেয়তা এবং বন্ধু বৎসলতার জন্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার হিন্দু সমাজে চিরদিন পূজিত হইবে। তিনি অতিশয় মিতভাষী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি গুরু গম্ভীর হইলেও যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত, তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার সদালাপের পরিচয় পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একনিষ্ঠ সেবক ৺বলরাম বসু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু আমার প্রতিবাসী ছিলেন এবং হরিবল্লভ বাবু কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। হরিবল্লভ বাবুর সহিত আমার দূর-সম্পর্কও ছিল। আমার
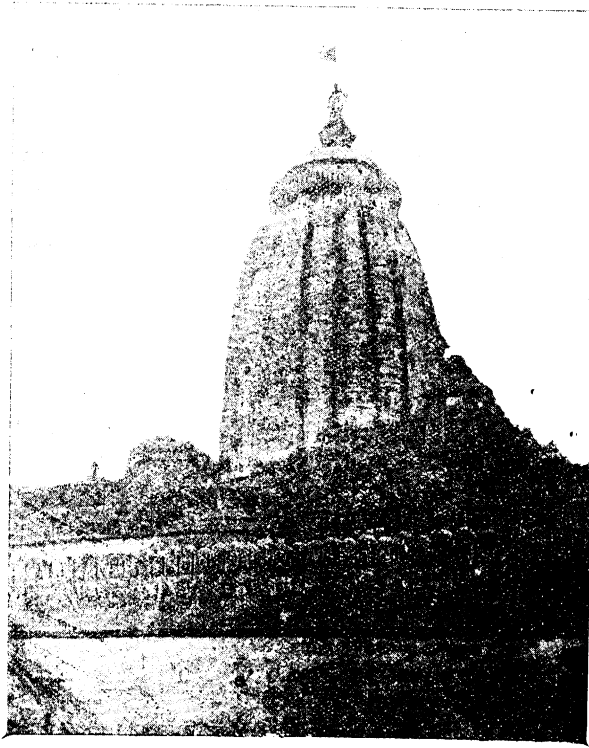
৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার শ্যালক-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে কেহ পুরী গমন করিত, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে প্রতিষ্ঠিত "শশিনিকেতনে" তাহাকে অবস্থান করিতেই হইত; কিছুতেই তিনি ইহার অন্যথা হইতে দিতেন না। আজ যদিও তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব-ব্যবস্থা এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার সহৃদয়তা ও আতিথেয়-তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং পরমহংস দেবের শিষ্যগণ পুরী যাইলে আজিও এই বাড়ীতে অবস্থান করিয়া থাকেন।

শশিনিকেতন।

শশিনিকেতন বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন দ্বিতল প্রাসাদ। প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু জমী দারবাটীর ন্যায় ইহার রন্ধনশালা, স্নানাগার, ভৃত্যদিগের আবাসগৃহ, কাছারী-বাড়ী প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং নানা ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষবাটি-কার দ্বারা এই উচ্চ সৌধ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। ঠিক বেলাভূমির উপর অবস্থিত না হইলেও সাগর এবং এই প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তখন কোন বাটী নির্ম্মিত হয় নাই। সুতরাং সাগরোর্ম্মি-চুম্বিত শীকরসিক্ত সুশীতল বায়ুপ্রবাহ এই অট্টালিকার সর্ব্বত্র অব্যাহতভাবে পরিবাহিত হইত। এই প্রাসাদের দ্বিতল অলিন্দ হইতে অনন্ত-বিস্তৃত মহোদধির তরঙ্গভঙ্গ দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। এই প্রাসাদ বহুকক্ষসমন্বিত। আমি যখন প্রথম পুরী গমন করিয়াছিলাম, তখন হরিবল্লভ বাবু ব্যতীত তাঁহার আত্মীয় কলিকাতার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবার তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এই বাটীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। আমিও কোন অসুবিধা ভোগ না করিয়া সপরিবারে এই বাটীতে এক মাসের অধিককাল সুখে বাস করিয়াছিলাম।

সমুদ্রের দৃশ্য।

পুরীর নিকট সমুদ্রের দৃশ্য মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করে। আমি বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া সমুদ্র দর্শন করিয়াছি, কিন্তু পুরীতটবর্ত্তী সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের যে গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা অন্য কোথাও করি নাই। বহুদূর হইতে গুরু-গম্ভীর মেঘমন্দ্রের ন্যায় সমুদ্রের অশ্রান্ত গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। নিকটে আসিলে বহুসংখ্যক রেল-গাড়ি একত্রে চলার শব্দের ন্যায় উহা প্রতীয়মান হয়। দিগন্ত-বিস্তৃত অতলস্পর্শ সুনীল জলরাশি এবং তদুত্থিত ফেন-মণ্ডিত শুভ্রশিরঃ অগণিত তরঙ্গরাজি মনকে মুহূর্ত্তমধ্যে সান্ত হইতে অনন্তের রাজ্যে লইয়া যায় এবং ইহার অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া মনে হয় যে, বিজ্ঞানবলে মানুষ যে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রাকৃতিক শক্তিকে বৃহৎপরিমাণে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা মানবের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া রজত-শুভ্র সৈকতভূমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক কত চিত্র-বিচিত্র শুক্তিসম্ভারে তাহার শীতল কোমল উন্নত বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে! আমরা নগ্ন পদে সৈকতভূমিতে ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সৈকতচুম্বী তরঙ্গরাজির শীতল সুখস্পর্শ আমাদের দেহ-মনকে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি প্রদান করিত। রাত্রিকালে বেলাভূমির উপর পরিত্যক্ত কত শুক্তিখণ্ড গগনবিহারী তারকারাজির ন্যায় নীলাভ মৃদু স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিত। সেগুলি দেখিতে ও আকারে বড় ঝিনুকের মত, উহার গহ্বরদেশ এক প্রকার শ্বেতবর্ণ কোমল পদার্থে আবৃত। এই শ্বেতাংশই অন্ধকারে আলোকময় প্রতীয়মান হইত। আমরা ইহা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতাম এবং অন্ধকার গৃহে রাখিয়া উহার স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা উপভোগ করিতাম। ক্রমে উহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইত এবং পরদিন রাত্রিতে উহা হইতে আর আলোকের স্ফুরণ হইত না। এই প্রাণী যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উহা উজ্জ্বল দেখায়।

অন্ধকার রাত্রিতে দূরস্থিত তরঙ্গরাজির শীর্ষদেশ আলোকময় প্রতীয়মান হইত। আলোকস্ফুরক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র সমুদ্রবিহারী কীটাণুর সমাবেশে তরঙ্গশীর্ষ এইরূপ দীপ্তিমান হইয়া উঠে। দীপ্তশীর্ষ অসংখ্য তরঙ্গরাজি দূর হইতে দর্শন করিয়া মনে হইত, যেন জলাধিপতি বরুণরাজের দীপা-লোক-সমন্বিত উৎসবগৃহ সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতেছে। কখন বা ভ্রম হইত, যেন অন্ধকার রাত্রিতে ভাগীরথীবক্ষ হইতে কলিকাতার আলোকময় রাজপথ ও প্রাসাদসমূহের চিত্র নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

আকাশের অবস্থানুসারে সমুদ্রের দৃশ্যের আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন হইত। প্রাতঃকালে অসীম নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া

সুহদায়তন লোহিতলোচন তরুণ অরুণের আবির্ভাব যে কি নয়নমনোরম, কি প্রীতিকর দৃশ্য, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! দ্বিপ্রহরের প্রখর-সূর্য্যকিরণ-সম্পৃক্ত সমুদ্রের ভাব অনুরূপ। আবার প্রদোষে স্বল্প-তারকা-সঙ্কুল ধূসরবর্ণ গগনের ছায়া সাগরবক্ষে প্রতিফলিত হইলে, এক শান্ত, গম্ভীর, সুন্দর ছবি নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইত। পূর্ণিমা-রজনীতে কৌমুদীপ্লাবিত রজতাস্তরণে মণ্ডিত সমুদ্রবক্ষ কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিত! পুনশ্চ আকাশমণ্ডল যখন নিবিড় নীল নবীন নীরদজালে আবৃত হইত, যখন প্রবল বায়ুপ্রবাহে গভীর সমুদ্রবক্ষ বিক্ষোভিত হইতে থাকিত, যখন প্রভঞ্জন-সাহচর্য্যে গগনস্পর্শী চঞ্চল উর্ম্মিমালা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া উদ্দাম তাণ্ডব-নৃত্য করিত, তখন সাগরের প্রলয়কালোচিত বিভীষণ সংহারমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া হৃদয় ভয়ে ও বিস্ময়ে অবসন্ন হইয়া পড়িত।

পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে সমুদ্র একটি। পুরীর শ্মশান, সমুদ্রতটবর্ত্তী "স্বর্গদ্বারের" নিকট। স্বর্গদ্বারের সান্নিধ্যে অবস্থিত সাগরাংশ "মহোদধি" তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যাত্রিগণ পাণ্ডার সাহায্যে যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকেন। তীর্থকার্য্য সম্পাদন ব্যতীত পুরীযাত্রিমাত্রেরই সমুদ্রস্নান একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নবাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, য়ুরোপীয়, বাঙ্গালী, সকলেই অন্ততঃ দুই এক দিনের জন্যও প্রাতঃকালে সমুদ্রস্নানের সুখ ও দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকেন। সাগরে অবগাহন-স্নান, জীবনে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে, সুতরাং আমোদ-প্রিয়তা এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে যেমন সুখ আছে, তেমনই দুঃখও আছে। অনেকেরই দুই এক দিন স্নানের পর কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া যায়; সমুদ্রতীরে যাইয়া কেবল দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন,—জলে নামিতে ভরষা করেন না। বাস্তবিক পুরীর সমুদ্রে স্নান করা যেন ঢেউয়ের সঙ্গে কুস্তি করা। অবিরাম তীরাভিমুখী তরঙ্গের মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ঢেউ খাওয়ার কৌশল না জানিলে বার বার আছাড়

পুরী-মন্দিরের অরুণস্তম্ভ।

থাইতে হয় এবং তাহাতে অনেক সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি হইবার সম্ভাবনা। কাপড় আঁট করিয়া পরিধান না করিলে স্নানের সময় উহা দেহ হইতে বিচ্যুত হইবারই কথা। তীর হইতে একটু দূরে যাইয়া স্নান করিলে ঢেউয়ের সঙ্গে বেশী যুদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু ঢেউ সরিয়া যাইবার সময়ে পদতলস্থ বালুকারাশির সহিত স্নানার্থীকে অনেক দূর সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এই জন্য অনেকে দূরে যাইয়া স্নান করিতে সাহস করেন না। অনেকে নুলিয়াগণের সাহায্যে সমুদ্রস্নান সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইহাদিগকে দুই চারিটি পয়সা দিলেই ইহারা হাত ধরিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসে। সমুদ্র-স্নান বিশেষ তৃপ্তিকর হইলেও গৃহে ফিরিয়া আর একবার স্নান করিতে হইত, তাহা না হইলে লোণাজল ও সূক্ষ্ম বালি দেহে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয় এবং গা বড় চুলকায়। সমুদ্রে স্নান করিবার সময় চোখ ও মুখ বন্ধ করিয়া রাখা উচিত, নচেৎ লবণাক্ত জল চোখ ও মুখে প্রবেশ করিলে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়।

এই ভীষণ তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্রে ধীবররা নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত ডোঙ্গায় চড়িয়া বহুদূরে মাছ ধরিতে গমন করে। এ অঞ্চলের ধীবরগণ "নুলিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা মান্দ্রাজের আদিম অনার্য্য অধিবাসী এবং তাহাদিগের ভাষা তেলেগু। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ ও অতিশয় শ্রমসহ। তাহাদের দেহের মাংসপেশীসমূহ অতীব দৃঢ় ও প্রকট। তাহারা কৌপীনধারী, অন্যথা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কেবল মাথায় কাণঢাকা টোপরের মত একটা পাতার টুপী পরে। সমুদ্রের তীরে বালুভূমির উপর তাহাদের পত্রাচ্ছাদিত প্রায় চতুর্দ্দিকে বদ্ধ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-সমন্বিত লম্বমান্ দোচালা ঘরগুলি সমান্তরাল ভাবে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধ কুটীরগুলির মধ্যস্থল চলিবার পথ। তাহাদের দেবতা সমুদ্র, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেবতার নিকট তাহারা ছাগ, মোরগ প্রভৃতি প্রাণী বলি দিয়া থাকে। তাহাদের নৌকা খোন্দলযুক্ত পৃথক তিন খণ্ড লম্বমান কাষ্ঠ দড়ি দ্বারা একত্রে বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সমুদ্রে ভাসে, জলপূর্ণ হইলেও কখন ডোবে না। অনেকস্থলে এইরূপ একখণ্ড কাষ্ঠই নৌকার কাজ করে। যে সকল নৌকা জাহাজে মাল বা যাত্রী তুলিয়া দেয়, সেগুলি বৃহদাকারের এবং একপ্রকার গাছের ছালে তৈয়ারী হয়। তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকা, অনেক সময়ে মনে হয় যেন সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহাকে আরোহি সহ তরঙ্গের শীর্ষদেশে ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। খুব বড় জাল লইয়া তিন চারি খানা নৌকা মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত একত্রে সমুদ্রে ভাসমান হয় এবং বহু দূরে যাইয়া জাল ফেলিয়া বিস্তর সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করে। যাঁহারা পুরী গমন করেন, আমিষভোজী হইলে সামুদ্রিক মৎস্যভক্ষণের লোভ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুরীর সমুদ্রে পায়রা-চাঁদা, পাবদা, ভেটকি, ইলিস, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ চাবুকের ন্যায় পুচ্ছ-যুক্ত শঙ্করমাছ, হাঙ্গর প্রভৃতি জালে ধরা পড়ে। সামুদ্রিক মৎস্য কিছু বেশী তৈলাক্ত; বিবেচনা পূর্ব্বক ভক্ষণ না করিলে উদরের পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ সাহস করিয়া ধীবরগণের সহিত তাহাদের নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে আমার নয় বৎসর বয়স্কা এক কন্যা ছিল। সমুদ্রে যাইতে আমার সাহসে কুলায় নাই, কিন্তু আমার কন্যা ধীবরদিগের সহিত তাহাদের ডোঙ্গায় বহুদূর সমুদ্র-বক্ষে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল।

আমি যখন প্রথম পুরী গিয়াছিলাম, তখন সমুদ্রের তীরে ভারতবাসীদিগের আবাসগৃহ অধিক ছিল না। যে উচ্চ পতাকা-স্তম্ভ (Flag Staff) সমুদ্রতীরে প্রোথিত আছে, তাহার এক দিকে কমিশনার, মাজিষ্ট্রেট, সিভিল্ সার্জ্জন্ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের অনেকগুলি বাংলা ও পাকা গৃহ অবস্থিত ছিল। সেখানে বেসরকারী কোন ভারত-বাসীকে গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইত না। স্তম্ভের অপরদিকে তখন দুই চারি খানি মাত্র ভারতবাসীদিগের পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সমুদ্রতীরে বিস্তর সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা ও স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অনেকেই এখন পুরী যাইয়া সমুদ্রতটস্থিত এই সকল প্রাসাদে সুখে অবস্থান করেন। য়ুরোপীয়দিগের বাসের সুবিধার জন্য সমুদ্রতটে কয়েকটি হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের অবস্থানের নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছি। সমুদ্রতীরে একটি আলোক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গের জন্য পুরীর তট-ভূমিতে জাহাজ লাগাইতে পারা যায় না। তট হইতে বহুদূরে জাহাজ অবস্থিতি করে এবং নৌকায় মাল বা যাত্রী বহন করিয়া জাহাজে উঠাইয়া দিতে হয়।

সমুদ্রের জল বিষম লবণাক্ত হইলেও বালুকাময় তটদেশে যে সকল কূপ খনন করা হয়, তাহাদিগের জল সুমিষ্ট ও সুপেয়। সহরের মধ্যে যে সকল কূপ আছে, তাহাদের জল মোটেই বিশুদ্ধ নহে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কূপের জল পানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে পুরীর ন্যায় যাত্রী-বহুল তীর্থস্থানে পানীয় জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীচুনীলাল বসু।

পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির।

পুরীধামস্থ জগন্নাথ দেবের মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। তাঁহাদিগের সেই কৌতূহল-নিবারণের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উপরিভাগে একখানি লৌহ-ফলক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্লোকটি এই :—

শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা॥

ব্যাখ্যা। রন্ধ্র = ছিদ্র = ৯; শুভ্রাংশু = চন্দ্র = ১; রূপ = একরূপ পরব্রহ্ম = ১; নক্ষত্রনায়ক = চন্দ্র = ১। অতএব ৯১১১ অঙ্ক হইল। কিন্তু "অঙ্কস্য বামা গতিঃ,— এই নিয়মানুসারে প্রকৃত-পক্ষে ১১১৯ অঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন সমস্ত শ্লোকটির অর্থ এইরূপ হইল;—বুদ্ধিমান্ (নৃপতি) অনঙ্গভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে (৬০৪ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং পুরীধামস্থ জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দিরের বয়ঃক্রম ৭২৫ বৎসর।

উক্ত শ্লোকটির মান-সমর্থক আর একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চারি পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে উৎকল-দেশীয় রাজগুরু বাসুদেব রথ মহাশয় একখানি সংস্কৃত চম্পূ-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম "গঙ্গবংশানুচরিতম্।" এই চম্পূকাব্যের নায়ক অনঙ্গসুন্দর। এই নায়ক, নায়িকাকে গ্রন্থারম্ভে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রিয়ে! বলিতে পার, কোন্ সময়ে সম্মুখে বর্ত্তমান এই জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল?" তদুত্তরে নায়িকা কহিতেছেন :—

অঙ্কক্ষৌণিশশাঙ্কেন্দুসম্মিতে শকবৎসরে!
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥

ব্যাখ্যা। অঙ্ক = ৯, ক্ষৌণি = পৃথিবী = ১; শশাঙ্ক = চন্দ্র = ১; ইন্দু = চন্দ্র = ১। অতএব ৯১১১ অঙ্ক পাওয়া গেল। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ",—এই নিয়মানুসারে প্রকৃত পক্ষে ১১১৯ অঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে সমস্ত কবিতাটির অর্থ এইরূপ দেখা যাইতেছে :—রাজা অনঙ্গভীম-দেব ১১১৯ শকাব্দে (৬০৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং পুরীধামস্থ জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দিরের বয়ঃক্রম ৭২৫ বৎসর। যখন উল্লিখিত দুইটি শ্লোকেরই মান একরূপ, তখন যে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির ১১১৯ শকাব্দে, ৬০৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (১)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

---

* আমি দুই তিনবার পুরী গমন করিয়াছিলাম। পথে যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা 'পুরী যাইবার পথে' নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পুরীতে উল্লেখযোগ্য যে সকল স্থান ও ঘটনা দেখিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।— লেখক

(১) জগন্নাথ দেব দর্শন ও উদ্ভট-কবিতা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিগত ১৩১৩ সালের ২৯শে পৌষ তারিখে পুরীধামে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে এক চতুষ্পাঠীতে একটি সংস্কৃত অধ্যাপকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একদিন বৈকালে স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট উদ্ভট-কবিতা প্রদান করেন; এবং বলেন, "উদ্ভট-সাগর মহাশয়! আপনাকে ২টি অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য কবিতা উপহার দিব।" ইহা বলিয়াই তিনি আমাকে উল্লিখিত প্রথম কবিতাটি দিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই একখানি পুঁথি আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। পুঁথিখানি সংস্কৃত-ভাষায় উড়িয়া অক্ষরে লিখিত; আমি ইহা স্বয়ং পড়িতে না পারায় তিনি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পুঁথিখানির নাম "গঙ্গবংশানুচরিতম্।" তখন তিনি পুঁথিখানির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বলিয়া আমাকে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকটি লিখিয়া লইতে বলিলেন। যখন দেখিলাম, ২টি শ্লোকেরই মান একরূপ, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক মহাশয়ের নামটি মনে না থাকায় এ স্থলে দিতে পারিলাম না।— লেখক।

ভূতের বোঝা।

১

তুলসীবেড়ের স্বরূপ বৈরাগীর মেয়ে বিলাসী বার বার তিন-বার কণ্ঠীবদল করিয়াও যখন মনের মত মানুষ পাইল না, তখন সে মনের মানুষের আশা ত্যাগ করিয়া, নিমক্হারাম পুরুষগুলার মুখে ঝাঁটা মারিবার অভিপ্রায়ে বিধবার বেশ ধারণপূর্ব্বক হরিনামে মনঃসংযোগ করিল।

প্রথম বারে বিবাহ হইয়াছিল, সাবলপুরের হরিদাস বৈরাগীর সহিত। হরিদাস যে লোক মন্দ ছিল, তাহা নহে, তবে দেখিতে সে সুপুরুষ ছিল না। তা নাই থাক্, বিলাসীকে সে প্রাণের তুল্যই ভালবাসিত, এবং বিলাসীর সুখের জন্য সে না করিতে পারে, এমন কাযই নাই, ইহা সে স্পষ্টভাবেই বিলাসীর নিকট স্বীকার করিত। তাহার সে স্বীকারোক্তিতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস না থাকিলেও বিলাসী কিন্তু তাহাকে ঠিক ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না, তাহার আদর, যত্ন, ভালবাসাকে বিলাসী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল। হরিদাস যখন বহু উপদেশেও বিলাসীকে বুঝাইয়া দিতে পারিল না যে, স্ত্রী হইয়া স্বামীর ভালবাসাকে এরূপ উপেক্ষা করা সম্পূর্ণ অন্যায়, তখন সে ক্ষুব্ধ চিত্তে বিলাসীর এই অস্বাভাবিক উপেক্ষার কঠোর প্রতিশোধ দিবার জন্য মাত্র সাত দিন জ্বরভোগ করিয়া, বিলাসীকে ছাড়িয়া এমন এক স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে গিয়া বিলাসীর আর স্বীকার করিবার উপায় রহিল না যে, এরূপ সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী লোকটিকে উপেক্ষা করিয়া বিলাসী বাস্তবিক খুব অন্যায়ই করিয়াছে।

কিন্তু এখন আর সে কথা বুঝাইবার উপায় যখন ছিল না, তখন বিলাসী অনুতপ্ত চিত্তে দিনকতক হরিদাসের উদ্দেশে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তাহার পর বিপত্নীক নিতাই দাস আসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন নিষ্ফল; সংসারে কেহ কাহারও নয়, সকলেই একা আসিয়াছে, এবং একাই যাইতে হইবে। সুতরাং এই ছায়াবাজীর সংসারে শোক দুঃখ পরিহার করিয়া, যাহাতে নিজের পথ পরিষ্কৃত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। সংসারটাই যখন মায়ার খেলা, তখন পরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজের পথ হারাইয়া কোন লাভ নাই।

নিতাই দাসের উপদেশে বিলাসী প্রকৃতিস্থ হইল, এবং শোক-দুঃখ পরিহার করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। পথ নিতাই দাসই দেখাইয়া দিল; কণ্ঠীবদল করিয়া সে বিলাসীকে নিজের শূন্য গৃহে লইয়া আসিল। বিলাসী এবার নিতাইকে ভালবাসিয়া, আদর-যত্ন করিয়া পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান্ হইল।

তাহার সেবা যত্নে, ভালবাসায় নিতাই মুগ্ধ হইল, এবং নিতাইও তাহাকে ভালবাসিয়া ও সোহাগ জানাইয়া তাহার প্রতিদান দিতে লাগিল। বছরখানেক বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ বিলাসীর সুখের আকাশে দুঃখের কালো মেঘ উঠিল,—কৃষ্ণগঞ্জের মহোৎসব দেখিতে গিয়া নিতাই এক বাগ্দীর মেয়েকে লইয়া ঘরে ফিরিল, এবং তাহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে দিন রাত উপদেশ দিতে লাগিল। বিলাসী ইহাতে অন্তরে আঘাত পাইল, এবং আপনার সুখের কণ্টককে দূর করিবার জন্য নবীনা বৈষ্ণবীর সহিত ঝগড়া করিতে থাকিল। কিন্তু বাগ্দীর মেয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় বৈষ্ণবের মেয়ে পারিয়া উঠিল না; ইহার উপর নিতাই যখন নবীনা বৈষ্ণবীর পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন বিলাসী মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই দাসের গৃহ পরিত্যাগ করিল। নিতাই নিষ্কণ্টকে নবীনা বৈষ্ণবীকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিল।

ইহার কিছু দিন পরে মধুর কীর্ত্তনগায়ক গোপাল দাস আসিয়া বিলাসীকে কীর্ত্তনের পদাবলী শুনাইতে লাগিল। তাহার মধুর কণ্ঠোচ্চারিত সুমধুর পদাবলী শুনিতে শুনিতে বিলাসী আত্মহারা হইয়া পড়িল; সে নিতাই দাসের অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ গোপাল দাসকে আপনার হৃদয়খানি দান করিয়া ফেলিল, এবং অচিরাৎ বৈষ্ণবপ্রথানুসারে কণ্ঠীবদল করিয়া রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা শ্রবণ করিতে করিতে গোপাল দাসের প্রেমতরঙ্গে সাঁতার দিতে লাগিল।

কিন্তু সংসারে দুঃখ যতটা দীর্ঘকালস্থায়ী, সুখ ততটা

নহে। সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই বিলাসীর সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত হইল,—গোপাল দাসের প্রেমতরঙ্গিণীর একটা উত্তাল তরঙ্গ হঠাৎ একদিন বিলাসীকে বালিচড়ার উপর আছড়াইয়া দিয়া বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া গেল। বিলাসী আর তাহার নাগাল ধরিতে পারিল না।

গোপাল দাস বিলাসীকে সঙ্গে লইয়া খড়দহের মহোৎসব দেখিতে গেল। কিন্তু মহোৎসব অন্তে যখন ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন বিলাসী আর গোপাল দাসকে খুঁজিয়া পাইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর সে জানিতে পারিল, মধুর কীর্ত্তনগায়ক গোপাল দাস এক চটুলনয়না বৈষ্ণবীকে কীর্ত্তনের সুমধুর পদাবলী শুনাইতে শুনাইতে নৌকাযোগে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষ বাহিয়া কোন্ অজানা প্রেমের দেশে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া বিলাসী কাঁদিতে লাগিল, এবং সেই দূরদেশ হইতে কিরূপে ঘরে ফিরিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িল। পরিশেষে বহু কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ছিদাম বৈরাগীর ছেলে বলরামের দেখা পাইয়া সে তাহার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ফিরিয়াই বিলাসী হাতের চুড়ী খুলিয়া ফেলিয়া, পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া থান কাপড় পরিল, মিশির কৌটা ফেলিয়া দিয়া ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল, এবং নিমক্হারাম পুরুষগুলার উদ্ধতম বায়ান্ন পুরুষের জন্য সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিতে করিতে হরিনামের মালা লইয়া নিয়মিত জপ আরম্ভ করিল। বলরাম এক দিন বেড়াইতে আসিয়া তাহার এই সন্ন্যাসিনীর বেশ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে গান ধরিল—

"এ কেমন তোর রঙ্গ দেখি, রাই।
কার বিরহে বিরহিণী, এমন সোনার অঙ্গে
মাখ্‌লি ছাই।"

বিলাসী গালি দিয়া বলরামকে তাড়াইয়া দিল।

২

"বিলাসি, ও বিলাসমণি, রাইধনি!"

ঘরের ভিতর হইতে বিলাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে পোড়ারমুখ?"

উত্তর আসিল, "পোড়ার মুখ নয়, চাঁদমুখ বলরাম। দরজাটা খোল দেখি।"

দরজা খুলিতে খুলিতে বিলাসী বলিল, "এত রাত্তিরে দরজা খুলে তোমার চাঁদমুখে নুড়ো জ্বাল্‌তে হবে নাকি?"

বলরাম বলিল, "তিন তিনটে লোকের মুখে নুড়ো জ্বেলেও কি সাধ মেটে নি, এখনো আমার মুখেও নুড়ো জ্বাল্‌বার সাধ? কিন্তু সে সাধ সহজে মিটবে না, রাইধনি।"

কপাট খুলিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া বিলাসী বলিল, "সহজে না মেটে, কষ্টে মিটবে। এখন এই রাত্তিরে মত্তে এসেছিস্ কেন বল্ দেখি?"

বলরাম দরজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিল, "এসেছি তোর সঙ্গে কণ্ঠীবদল কত্তে। এখন এই জিনিষটা ধর্ দেখি।"

বলিয়া সে কাপড়ের পুঁটুলীর মত কি একটা জিনিষ বিলাসীর দিকে বাড়াইয়া দিল। বিলাসী হাত বাড়াইয়া সেটাকে ধরিতে ধরিতে বলিল, "কি জিনিষ? ও মা, এ যে একটা কচি ছেলে। কার ছেলে নিয়ে এলি?"

বলরাম বলিল, "অপর কারো নয়, নিতাই দাসের ছেলে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া বিলাসী বলিল, "তার ছেলে তুই নিয়ে এলি কেন?"

মাথা নাড়িয়া বলরাম বলিল, "সাধে কি নিয়ে এসেছি! আমার গেরো, আমি এসেছিলাম নিতাই দাসের কাছে ধবোহাটীর মোচ্ছবের খবর নিতে। তা শুন্‌লাম, নিতে শালা তো মাসখানেক বাড়ী ছাড়া।"

বিলা। যমের বাড়ী গিয়েছে নাকি?

বল। সে যাক্ না যাক্, তার বোষ্টমী—

বিলা। বোষ্টমী না বাগ্‌দিনী।

বল। বাগ্‌দিনী হ'লেও এখন সে বোষ্টমী। তা মাগী তো বারকতক ভেদ বমি ক'রে সেই ঠিকানায় চ'লে গিয়েছে। গিয়ে দেখি, মাগী অকা পেয়ে প'ড়ে আছে, আর এই ছেলেটা পাশে প'ড়ে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় কচ্চে। কেউ কোথাও নাই, অন্ধকারে বাড়ীখানা যেন গিল্‌তে আস্‌ছে। কি করি, ছেলেটাকে তো তুলে নিয়ে পালিয়ে এলাম। রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লো।

মুখ বিকৃত করিয়া বিলাসী বলিল, "তা আমার কাছে নিয়ে এলি কেন? আমি একে নিয়ে কি কর্‌বো?"

বলরাম বলিল, "মানুষ কর্‌বি।"

বিলা। পরের ছেলে মানুষ করা আমার দ্বারায় হবে না।

বল। তবে তোর দ্বারায় কি হবে? মালা ঠক্‌ঠক্?

বিলা। মালার মর্ম্ম তুই কি বুঝবি? না, একরত্তি ছেলে, নাওয়ান, খাওয়ান, ঘর-দোর নোংরা—আমি এ সব পেরে উঠবো না।

তিরস্কারের স্বরে বলরাম বলিল, "তা পারবে কেন, হরিনাম কর্‌লেই চারটে হাত বেরুবে। মুখে আগুন তোর হরিনামের! একটা অনাথ ছেলেকে মানুষ কত্তে পারবে না, আর হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ক'রে স্বর্গে যাবে!"

রাগতভাবে বিলাসী বলিল, "আমি স্বর্গেই যাই, আর নরকেই যাই, তোর তাতে কি বল্ তো?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বলরাম বলিল, "কিছু নয়, কিছু নয়। এখন ছেলেটাকে অন্ততঃ দু' চার দিন রাখ্, তার পর ওর যা হয় ব্যবস্থা কর্‌বো।"

বিলাসী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। বলরাম বলিল, "আমি এখন চল্‌লাম; দেখি, বেজো দাসকে নিয়ে যদি মাগীর গতি কত্তে পারি।"

বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিলাসী অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা পেঁচা বিকট শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল, সে শব্দে ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে কাঁদিয়া উঠিল। বিলাসী বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া, ঘরে ঢুকিল, এবং ছেলেটাকে মেঝের উপর শোয়াইয়া আলো জ্বালিল। তাহার পর বাঁ হাতে আলো লইয়া সে ছেলেটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আহা, কিবা ছেলের ছিরি! যেমন রূপ, তেমনই গড়ন; চেহারা দেখিলে কান্না পায়। বাগ্‌দিনীর ছেলে, ইহার বেশী আর কি হইবে? ছেলেটার দিকে চাহিতে চাহিতে ঘৃণায়, বিরক্তিতে বিলাসীর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইতে লাগিল।

আলো দেখিয়া ছেলেটা একটু চুপ করিয়াছিল, আবার সে কাঁদিয়া উঠিল। বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বিলাসী আলো রাখিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইল। কোল পাইয়া ছেলে চুপ করিল, এবং একদৃষ্টিতে বিলাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এক বছরের ছেলে—মা'কে বেশ চিনিয়াছিল; সুতরাং বিলাসীর মুখে মায়ের মুখের ছবি দেখিতে না পাইয়া পুনরায় সে কাঁদিয়া উঠিল। বিলাসী "আয়-আয়" করিয়া তাহার মাথায় মৃদু করাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু সে করস্পর্শে স্নেহের কোন স্বাদ না পাইয়া ছেলে চুপ করিল না, বরং আরও জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল। বিলাসী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিরূপে এই হতভাগা ছেলেটাকে শান্ত করিবে, ভাবিয়া পাইল না। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর পদচারণা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছেলেটা ঘুমাইয়া পড়িল। মেঝের এক পাশে একখানা ছোট মাদুর পাতিয়া, তাহার উপর ছেলেটাকে শোয়াইয়া দিয়া বিলাসী নিজে শুইয়া পড়িল।

৩

বিলাসী শুইল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখে ঘুম আসিল না। ঘুম না হইলেই নানা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়; বিলাসীও পড়িয়া পড়িয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল। নিতাই যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিত, তবে আজ সেও এমনই একটি ছেলে কোলে পাইত। ঠিক এমনই নয়, তাহার গর্ভের ছেলে বাগ্‌দিনীর ছেলের মত এমন কুশ্রী কদাকার কখনই হইত না। আর সেই ছেলেকে এমন এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া সে নিজে কখন ভাল বিছানায় আসিয়া শুইতে পারিত না। আচ্ছা, সেও ছেলে, এটাও ছেলে; তবে তাহার উপর সে যে স্নেহ-মমতা করিত, ইহার উপর সেরূপ করিতে পারে না কেন? এইখানেই যত গোল! মানুষ তো সবাই, তবে নিজের মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজনের উপর যেরূপ হয়, অপরের উপর সেরূপ হয় না; সর্ব্বজীবে শ্রীহরি আছেন, ইহা জানিলেও আপনা হইতেই ভেদজ্ঞান আইসে। সংসারের যখন এইরূপই রীতি, তখন বিলাসীরই বা দোষ কি? সে কিরূপে এই স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া পরের ছেলেকে নিজের পেটের ছেলের মত ভালবাসিতে পারিবে? বিশেষ এই বাগ্‌দিনীর কালো কুৎসিত ছেলেটাকে তো সে কিছুতেই ভালবাসিতে পারিবে না; তাহার পেটে এমন ছেলে জন্মিলেও সে তাহাকে স্নেহযত্ন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। মা গো, ছেলে তো নয়, যেন স্যাওড়া গাছের ভূত। এখন বলা মুখপোড়া শীঘ্র শীঘ্র এ আপদ লইয়া গেলে বাঁচা যায়।

আচ্ছা, ছেলেটাকে কে মানুষ করিবে? বলার নিজের

ঘর আছে তো দোর নাই, নিজে কখন্ কোথায় থাকে, তাহার ঠিক নাই। সুতরাং সে তো নিজে পারিবে না, অপরেই বা কে এই পরের ছেলের ভার লইতে যাইবে? আচ্ছা, বলা যদি ইহাকে লইয়া না যায়, তাহার ঘাড়ে এই ভূতের বোঝা চাপাইয়া দিয়া যদি সরিয়া পড়ে? ওরে বাপ্ রে, এ ছেলেকে মানুষ করা বিলাসীর কর্ম্ম নয়। সংসারের আশা-ভরষা ছাড়িয়া দিয়া সে এখন পরকালের মঙ্গলের আশায় নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে; এই ভূতের বোঝা ঘাড়ে লইয়া সে পথে কি আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে? পরের এই কালো কুৎসিত ছেলেটার জন্য পরকালের পথে কাঁটা দিবে? বলা হতভাগা লইয়া না যায়, সে নিজেই এক দিন নিতাই দাসের ঘরের দরজায় ইহাকে ফেলিয়া দিয়া আসিবে। তাহাতে লোক যাহা বলিতে হয় বলুক, লোক-নিন্দার ভয়ে বাগ্দিনীর ছেলেটাকে গলায় জড়াইয়া বিলাসী নরকের কূপে ডুবিয়া মরিতে পারিবে না।

আঃ, কি আপদ! এত রাত হইল, তবু পোড়া চোখে ঘুম আসে না। ছেলেটা কি খায়, কে জানে; এক বছরের ছেলে—ভাত মুড়ি খাইতে পারে কি? ভাত মুড়ি খাইবে না ত কি খাইবে? নিতাই দাস উহাকে সের সের দুধ কিনিয়া খাওয়ায় কি না! এমন লোক সে নয়, পিপ্ড়ের পেট টিপিয়া গুড় বাহির করে। যদিই সে খাওয়াইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি আসে যায়? সে নিজের ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইয়াছে, পরের ছেলের জন্য বিলাসী দুধ কিনিতে যাইবে, ভারী মাথাব্যথা তাহার! ভাত খাইতে হয় খাইবে, না হয় বড় জোর এক পোয়া দুধ সে কিনিতে পারে। তাহাতে উহার পেট ভরে ভরুক, না ভরে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিবে। কাল সকালেই বিম্লী গোয়ালিনীকে এক পোয়া দুধের কথা বলিতে হইবে। বিম্লীর আবার যে দুধ, শুধু ঘোষ পুকুরের জল। দূর হউক, না হয় আধ সেরের কথাই বলা যাইবে। দুই চারি দিন বৈ তো নয়।

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে যেন তাহার চোখের পাতা মুড়িয়া আসিল। বিলাসী পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই ছেলেটার চীৎকারে বিলাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আঃ, এ কি আপদ্ আসিয়া জুটল! ঘুমাইবারও যো নাই। মরুক্ চেঁচাইয়া, বিলাসী উঠিতে পারিবে না। উঠিয়াই বা করিবে কি? পোড়া ছেলে কি সহজে থামিবে। তাহা অপেক্ষা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকুক, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজেই চুপ করিবে। বিলাসী চোখ দুইটাকে জোরে টিপিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল; ছেলেটার চীৎকারে ঘরখানা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিলাসী বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিতে পারিল না, অসহ্য হইলে বলরামকে গালি দিতে দিতে উঠিয়া আলো জ্বালিল এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলের কান্না কিন্তু সহজে থামিল না; তাহার থামিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই বিলাসী রাগে বলা হতভাগাকে, নিতে মুখপোড়াকে, বাগ্দিনী সর্ব্বনাশীকে সদ্যঃ যমালয়ে যাইবার জন্য আদেশ দিতে থাকিল।

৪

"কার ছেলে গো বোষ্টম দিদি, তোমার নাকি?"

"আমার নয় তো কি পরের?"

"না, পরের হ'তে যাবে কেন। তা তোমার ছেলে হ'লো কবে?"

ঈষৎ হাসিয়া বিলাসী বলিল, "অনে—এ—ক—দিন—তখন আমার বিয়ে হয় নি।"

হাসিতে হাসিতে বিমলা গোয়ালিনী বলিল, "তা হ'লে তুমি কুন্তী ঠাকৃরুণ হয়েছিলে বল।"

বিলাসী বলিল, "শুধু কুন্তী? অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী সব।"

বলিয়া বিলাসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিমলা হাসিয়া বলিল,"তা হ'লে বাকী এবার তারা মন্দোদরী বুঝি?"

বিলাসী বলিল, "তাও বাকী থাকবে না বোধ হয়।"

বিমলা বলিল, "তাই হোক দিদি, কৃষ্ণের কৃপায় যেন বাকী কিছু না থাকে।"

সহাস্যে বিলাসী বলিল, "বাকী থাক্‌বে শুধু দধি। তা গয়লা সই যখন রয়েছে, তখন সে ভাবনা নাই।"

বিমলা বলিল, "দধির ভাবনা থাক্। দধি দিয়ে যাব নাকি?"

বিলাসী বলিল, "দরকার হ'লে চেয়ে নেব। এখন দুধ আধ সেরটাক দিয়ে যা।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "দুধ কেন, সতীনপোর তরে না কি?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিলাসী বলিল, "মুখে আগুন, সতীন আবার কে না? সেই বাগ্‌দিনী। সাত খ্যাংরা মারি তার মুখে।"

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিমলা বলিল, "বাগ্‌দিনীর মুখে খ্যাংরা মার্‌লেও তার ছেলেকে তো দুধ কিনে খাওয়াতে হচ্ছে!"

ভারী মুখে বিলাসী বলিল, "কি করি বল, বলা মুখ-পোড়া যে এই ভূতের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেল।"

ঘাড় দোলাইয়া বিমলা বলিল, "তা এমন মন্দই কি করেছে বল, মা আর সৎমা একই জিনিষ। তোমারো তো কেউ নেই; বেটা ছেলে—মানুষ মুনুষ কর, পরে কায দেখ্‌বে।"

রাগত ভাবে বিলাসী বলিল, "হাঁ, কম কায দেখ্‌বে কি? আমার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী ক'রে দেবে! সেই আশাতেই তো দুধ খাওয়াচ্ছি।"

গম্ভীর মুখে উপদেশের স্বরে বিমলা বলিল, "তা ভাই, আশা নিয়েই সংসার। আর স্বর্গের সিঁড়ি কে তৈরী ক'রে দেয় বল, নিজের পেটের ছেলেই ভাত দেয় না। তবে বাঁচে তো ছেলেটা নেহাৎ সতীনপোর মত হবে না, এক বছরের ছেলে বৈ ত নয়, তোমাকেই মা ব'লে জান্‌বে।"

মুখ মচকাইয়া বিলাসী বলিল, "তা হলেই স্বর্গ থেকে পুষ্পরথ নেমে আস্‌বে। তুই যেমন পাগল, গয়লা সই, আমি বাগ্‌দিনীর ছেলেটাকে মানুষ কত্তে যাব। দু'চার দিন দেখি, তার পরে বলার দোরে ফেলে দিয়ে আসবো।"

ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বিমলা বলিল, "ফেলে দিয়ে আস্‌তে যাবে কেন? মানুষ করলে তোমার গতর ক্ষয়ে যাবে না কি? বলে, একটা ছেলের তরে লোক কত যাগ-যজ্ঞ করে। ঐ যে কেদার চৌধুরী কত পয়সা খরচ কচ্ছে, ছিষ্টির ওষুধ এনে বৌটার গলায় বেঁধে দিচ্ছে, যদি একটা মেয়েও হয়।"

বিলাসী বলিল, "আমার তো তার মত জমীদারী নাই যে, তা ভোগ কর্‌বার জন্যে অন্ততঃ পুষ্যিপুত্তুরও নিতে হবে। আমার সম্বলের মধ্যে এই ভাঙ্গা কুঁড়ে।"

ঘাড় দোলাইয়া বিমলা বলিল, "কেদার চৌধুরীর বৌ বলে, গাছতলায় গিয়ে থাকুলে যদি একটা ছেলে পাই, তা হ'লে তার বদলে এই ইমারত কোটা বালাখানা ছেড়ে দিতে পারি।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিলাসী বলিল, "যে পারে পারুক, আমি কিন্তু শুধু শুধু এই ভূতের বোঝা বইতে পার্‌বো না।"

"মুখে আগুন তোমার!" বলিয়া বিমলা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত দুধ দেব? আধ সের?"

"হ্যাঁ, যে ক'দিন থাকে, আধ সের ক'রেই দিয়ে যাস্।"

দুধ মাপিয়া দিয়া বিমলা চলিয়া গেল। দুধটা ঘরে তুলিয়া রাখিয়া বিলাসী স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিল। ছেলেটা হামা টানিতে টানিতে উঠানে খেলা করিতেছিল। কখন একমুঠা ধূলা লইয়া উপাদেয় খাদ্য বোধে তাহা মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে কোনরূপ উপাদেয় স্বাদ না পাইয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। কখন বা তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়া তুলসী গাছটাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু উচ্চতা প্রযুক্ত তাহাকে ধরিতে না পারিয়া 'আ মা, আ মা' করিতে করিতে মঞ্চের গায়ে হাত চাপড়াইতেছিল। উঠানের এক পাশে কয়েক ঝাড় বেল-ফুলের গাছ ছিল; গাছে ফুলও দুই চারিটা ফুটিয়াছিল। তুলসী গাছটাকে ধরিতে না পারিয়া ছেলেটা সেই বেল-গাছের ঝাড়ের দিকে ছুটিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া গাছের কতকগুলা পাতার সঙ্গে কয়েকটা ফুল ছিঁড়িয়া মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু অচিরোদ্গত দুই তিনটা দাঁতের সাহায্যে অর্দ্ধচর্ব্বিত হইয়া সেই ফুল ও পাতাগুলা যখন মুখটাকে বিস্বাদ করিয়া তুলিল, তখন বমনের উপক্রম করিয়া ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। বিমলার সহিত কথোপ-কথনে অন্যমনস্ক থাকায় এতক্ষণ সে দিকে বিলাসীর লক্ষ্য ছিল না, এক্ষণে কান্না শুনিয়া সেই দিকে নজর পড়িল। সে তাড়াতাড়ি ছেলেটার কাছে আসিয়া তাহার মুখমধ্যস্থ চর্ব্বিত পাতাগুলা অঙ্গুলিসাহায্যে বাহির করিয়া দিল, এবং পূজার ফুল নষ্ট হওয়ায় তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে তুলিয়া আনিয়া দাবার উপর বসাইল। তাহার পর ছেলেটাকে কাহার কাছে রাখিয়া স্নান করিতে যাইবে, সে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল, কোলে করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু ছিঃ, লোক দেখিলে কি বলিবে? ঘরে রাখিয়া গেলেও কি ফেলিবে, কি মুখে পুরিবে, তাহার ঠিক নাই। বিলাসী ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না।

এমন সময় "বেজা কি কচ্চে গো" বলিয়া বলরাম উপস্থিত হইল। বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বিলাসী বলিল, "আমার ছাদ্দ কচ্ছে। ওর নাম বেজা না কি?"

"হাঁ, ব্রজনাথ। খুব কাঁদছে না কি?"

"কাল সারা রাত আমাকে চোখের পাতা বন্ধ কত্তে দেয় নি। ভ্যালা আপদ্ জুটিয়েছ যা হোক্।"

ঈষৎ হাসিয়া বলরাম বলিল, "সংসারে শুধু সম্পদ্ নিয়ে থাক্‌লেই কি চলে রাইধনি, আপদ্ বিপদের বোঝাও এক আধটু বইতে হয়। মাইখেকো ছেলে, দিনকতক কাঁদাকাটা কর্‌বে বৈ কি। তার পর ভুলে যাবে, তোমাকেই মা ব'লে জান্‌বে।"

রাগতভাবে বিলাসী বলিল, "এত জানাজানির দরকার আমার নাই। এখন নিয়ে যাচ্চো কবে বল।"

সহাস্যে বলরাম বলিল, "একটা রাত না পোয়াতেই নিয়ে যাবার তরে এত তাড়া কেন?"

রাগে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বিলাসী বলিল, "কেন কি? এ ভূতের বোঝা আমি বইতে পার্‌বো না।"

বল। ছেলেটা কি ভূতের বোঝা হ'লো?

বিলা। তার চাইতেও বেশী।

বল। যদি পেটের ছেলে হ'তো?

ভ্রূকুটী করিয়া বিলাসী বলিল, "অত কথা আমি জানি না, শীগ্‌গির নিয়ে যেতে হবে। পাঁচ দিনের বেশী আমি রাখতে পারবো না।"

ঈষৎ হাসিয়া বলরাম বলিল, "রাগ কর কেন, রাইধনি, তাই না হয় নিয়ে যাব। আজ তো এখন যাই।"

মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির সহিত বিলাসী বলিল, "একটু ব'সো, আমি ডুবটা দিয়ে আসি।"

বলিয়াই গামছাখানা টানিয়া লইয়া বিলাসী চলিয়া গেল। বলরাম ছেলেটাকে কোলে বসাইয়া কোঁচার খুট দিয়া তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল।

৮

"মা— ম্মা—ম্মা, মা—ম্মা—ম্মা।"

কচি ঠোঁট দুইটিতে হাসির লহর তুলিয়া, ভাসা ভাসা চোখ দুইটি বিলাসীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া, তাহার হাঁটু চাপড়াইতে চাপড়াইতে অস্ফুটস্বরে বেজা ডাকিল, "মা—ম্মা—ম্মা, মা—ম্মা—ম্মা।"

বিলাসী মালা জপিতে জপিতে ফিরিয়া শিশুর মুখের দিকে চাহিল। প্রদীপের আলো আসিয়া বেজার হাস্য-প্রফুল্ল মুখের উপর পড়িয়াছিল, কুঁদফুলের মত কচি কচি দাঁত-কয়টি দিয়া শত চন্দ্রের রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছিল; কালো কালো চোখ দুইটিতে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উছলিয়া উঠিতেছিল। আ মরি মরি, কি সুন্দর মুখ, কি মন-প্রাণ-স্নিগ্ধকর হাসি, কি প্রাণমাতান ডাক, 'মা—ম্মা, মা—ম্মা!' এই কালো কুৎসিত ছেলেটার মুখে এত সৌন্দর্য্য, ইহার অস্ফুট মাতৃ-সম্বোধনে এত মধুরতা—এমন তৃপ্তি! বিলাসী আর মুখ ফিরাইতে পারিল না, স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শিশুর মাধুর্য্যভরা মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখনিঃসৃত মাতৃ-সম্বোধন শুনিতে লাগিল।

বেজা তাহার কোলে উঠিবার অভিপ্রায়ে হাঁটুতে ভর দিয়া, কচি হাত দুইখানি তুলিয়া, যেন সকরুণ প্রার্থনার স্বরে ডাকিল, "মা—ম্মা—ম্মা, মা—ম্মা—ম্মা!"

মালা সমেত হাতটা বাড়াইয়া বিলাসী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কোল পাইয়া শিশুর মুখে হাসি আর ধরে না; সে হাত দুইটা তুলিয়া বিলাসীর মুখখানা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হাত না পাওয়ায় তাহার মুখে যেন একটু নৈরাশ্যের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। বিলাসী থাকিতে পারিল না, শিশুর আগ্রহটুকু পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য সে মৃদু হাসিয়া মাথাটা একটু নীচু করিল। অমনই বেজা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উৎসাহ-প্রফুল্ল কণ্ঠে ডাকিল, "মা—ম্মা—ম্মা!" স্নেহের উচ্ছ্বাসে বিলাসীর বুকটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে আস্তে আস্তে মুখটা নীচু করিয়া শিশুর মুখের উপর স্থাপন করিতেই কি এক অব্যক্ত পুলকে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। বিলাসী জপ ভুলিল, নিতাই দাসের বিশ্বাসঘাতকতা ভুলিল, বাগ্‌দিনীকে ভুলিল, পরের ছেলের কালো কুৎসিত চেহারা বিস্মৃত হইয়া অজস্র চুম্বনে বেজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বেজা ক্ষুদ্র দশনরাজিতে হাসির জ্যোৎস্না খেলাইয়া বিলাসীকে যেন এক নূতন স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় বাহির হইতে বলরাম ডাকিল, "রাইধনি!"

বিলাসী তাড়াতাড়ি বেজাকে কোল হইতে নামাইয়া
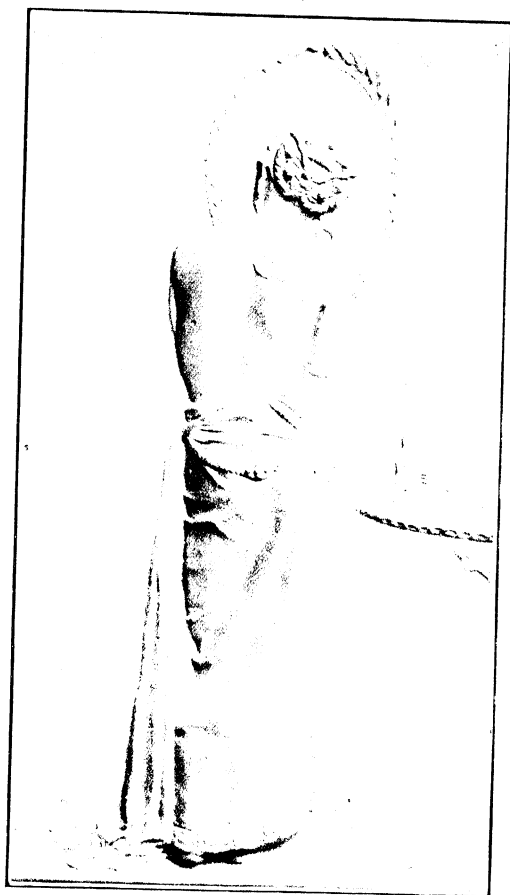
ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

প্রসাধন

দিয়া হাতের মালাছড়া ঠিক করিয়া ধরিল। বলরাম দাবার উপর উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জপ হচ্চে না কি ? বেজা কেমন আছে ?"

মুখটা একটু বাঁকাইয়া ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বিলাসী উত্তর দিল, "কেমন থাকবে আবার !"

বলিয়া সে বাঁ হাত দিয়া পিঁড়াটা ঠেলিয়া দিল। বলরাম পিঁড়ার উপর বসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদাকাটা একটু কমেছে ?"

মুখ মচ্‌কাইয়া বিলাসী বলিল, "হাঁ, কমেছে ! দিনে রাতে আমাকে অস্থির ক'রে তুলছে। ভূতের বোঝা নিয়ে আমার পুজো-আর্চ্চা, জপ তপ, সব মাটী হ'তে বসেছে।"

ঈষৎ হাসিয়া বলরাম বলিল, "বল কি, রাইধনি, একেবারে মাটী !"

বিলাসী মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া একটু রাগতভাবে বলিল, "এই বুঝি তোমার দু' পাঁচ দিন ?"

বলরাম বলিল, "না, দু' পাঁচ—দশ দিনের এখনও তিন দিন বাকী আছে। আজ সবে সাত দিন।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিলাসী বলিল, "ও সব স্তাকামী রেখে দাও, এখন নিয়ে যাচ্ছো কবে বল।"

বলরাম বলিল, "আজই।"

চমকিতভাবে বিলাসী বলিল, "এই রেতের বেলায় ?"

সহাস্যে বলরাম বলিল, "দোষ কি ? ওর এখন অন্ধ জাগো, কিবা রাত্রি কিবা দিন।"

বিলাসী কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে মালা ঘুরাইতে লাগিল। বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে থাকবে আজ ?"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে বিলাসী বলিল, "আর থেকে কায নাই, নিয়ে যাও।"

বলিয়া সে বেজাকে বলরামের দিকে একটু ঠেলিয়া দিল। বেজা ব্যাপার কিছু না বুঝিলেও সশঙ্ক দৃষ্টিতে একবার বলরামের—আরবার বিলাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বিলাসীর দিকে একটু সরিয়া বসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বলরাম বলিল, "ঐ দেখ, তুমি নিয়ে যেতে বলছো, কিন্তু ওর যেতে ইচ্ছা নাই, ও তোমার দিকে স'রে বসছে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিলাসী বলিল, "তবে আর কি, আমাকে কৃতার্থ ক'রে দিয়েছে। না না, এ সব ঝঞ্চাট আমি পোয়াতে পারবো না।"

স্নেহের স্বরে বলরাম বলিল, "তা পারবে কেন, দিনে সাতবার মালা ফিরুতে পারবে।"

রাগে মাথা নাড়িয়া বিলাসী বলিল, "না, মালা ফিরুবো কেন, পরের ছেলের নোংরা ঘাঁটলেই আমার পরকালের কায হবে।"

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, "এই চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সেই পরকালের ভাবনা যে রকম ভাবতে শিখেছ, রাইধনি, এর পর পঞ্চাশ বছর বয়সে কি যে করবে, তা তো ভেবেই পাই না।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিলাসী বলিল, "আমার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে।"

বলরাম বলিল, "এদ্দিন তাই তো দিচ্ছিলাম, মাঝে থেকে এই ছেলেটা এসে যে গোল বাধিয়ে দিলে। আচ্ছা, আজ থাক, কাল হবে না, পরশু এসে নিয়ে যাব।"

বিলাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় নিয়ে যাবে ?"

বল। যেখানে হয়।

বিলা। নিজেই রাখবে না কি ?

বল। আমাকেই কে রাখে, তার ঠিক নেই, আমি আবার পরের ছেলেকে নিয়ে রাখবো।

বিলা। তবে নিয়ে যেতে চাইছো যে ?

বল। কাযেই। তুমি যখন কিছুতেই রাখবে না, তখন কাযেই নিয়ে যেতে হবে।

ঈষৎ হাসিয়া বিলাসী বলিল, "তা হ'লে তোমার নিয়ে যাবার কথাটা ফাঁকি বাজি বল।"

হাসিতে হাসিতে বলরাম বলিল, "ঠিক ধরেছ, রাইধনি, নিয়ে গিয়ে রাখবার যায়গা থাকলে এ বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে যেতাম না।"

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিলাসী বলিল, "উঠলে যে ?"

বলরাম বলিল, "বসবো না কি ?"

বিলাসী বলিল, "বসো আর দাঁড়াও, পরশু নিয়ে যেতে হবে।"

বল। যদি না নিয়ে যাই ?

বিলা। আমি নিজে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এই বোঝা তোমার দরজায় ফেলে দিয়ে আসবো।

বল। পারবে ?

িলা। পারি কি না, দেখে নিও।

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলরাম বলিল, "তোমাকে এতটা কষ্ট কত্তে হবে না, রাইধনি, আমি নিজেই এসে নিয়ে যাব।"

বলরাম চলিয়া গেল। বিলাসী বিষ্ণু স্মরণ করিয়া পুনরায় মালা জপিতে আরম্ভ করিল। বেজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "মা—ম্মা—ম্মা, মা—ম্মা—ম্মা!"

বিলাসী তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে মালা ঘুরাইতে লাগিল। তাহার এই ঔদাসীন্য দর্শনে বেজা যেন দুঃখিত হইয়া মাটীর উপর শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

৬

যে দিন বলরামের আসিবার কথা ছিল, সে দিনটা বিলাসী খুব উৎকণ্ঠার সহিতই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বলরাম কিন্তু আসিল না। দিনে আসিল না, সন্ধ্যার পর হয় তো আসিতে পারে। বিলাসী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া বেজাকে শেষ দুধটুকু খাওয়াইয়া দিয়া মালা হাতে দাবায় আসিয়া বসিল। কৃষ্ণা চতুর্থী—প্রথম এক প্রহর অন্ধকার। অন্ধকারে খানিক খেলিয়া বেজা পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বিলাসী একা বসিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে মালা ঘুরাইতে লাগিল।

দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইতে লাগিল, সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল, গাছপালা, ঘর-দ্বার সব অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই স্তব্ধ অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জন বাড়ীখানার মধ্যে নীরবে বসিয়া মালা ঘুরাইতে বিলাসীর বড়ই একা বোধ হইতে লাগিল। ছেলেটাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জাগিয়া থাকিলেও ক্রন্দনের কলরবে নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাড়ীখানাকে অনেকটা সজাগ করিয়া রাখিত। বলা মুখপোড়া আসিবে বলিয়া গেল, কৈ, তাহারও দেখা নাই। দেখা দিবে কোথা হইতে? দেখা দিতে আসিলেই বেজাকে লইয়া যাইতে হইবে। পরের ছেলেকে সকলেই প্রতিপালন করে, ভূতের বোঝা সবাই ঘাড়ে লয়! না, আচ্ছা ভূতের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়াছে। এখন এ বোঝা কি উপায়ে নামানো যায়? পূজা-আর্চ্চা তো সব গেল, আহ্নিক করিতে বসিলে উহার কান্নার জ্বালায় সাতবার উঠিতে হয়। শুধু পূজা আহ্নিক কেন, খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আজ তো দুপুরবেলা নোংরা হাত দিয়া বাড়া ভাত নষ্ট করিয়া দিল। নিজের পেটের বালাই নাই, পরের বালাই লইয়া এ কি বিষম জ্বালায় পড়িতে হইয়াছে! হরি, মধুসূদন, বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তোমার চরণ সার করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাপাপিনী আমি, আবার এমন বিষম জ্বালায় পড়িয়াছি যে, দিনান্তে তোমাকে একবার ডাকিবারও অবসর পাই না। আমার এ জ্বালা দূর করিয়া দাও। —এই ভূতের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইয়া দাও, দয়াময়!

প্রাণের আকুল বেদনা শ্রীহরির চরণে নিবেদন করিতে করিতে বিলাসীর চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কাপড়ে চোখ মুছিয়া বিলাসী ধীরে ধীরে নাম জপ করিতে লাগিল।

মালা একবার দুইবার তিনবার ঘুরিয়া গেল। ঘরের পিছনে তেঁতুলগাছের ডালে বসিয়া পেঁচা ডাকিতে লাগিল; চাঁদের আলোয় পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিলাসী মালাছড়াকে কপালে ছোঁয়াইয়া গলায় ফেলিল। তাহার পর সে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"নাম ভজ নাম জপ নাম কর সার,
নাম বিনে এ সংসারে গতি নাহি আর।
রাম নাম জপ ভাই আর সব মিছে,
অনিত্য সংসার জেনো যম আছে পিছে।
হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু জগতের পতি,
তোমা বিনা অধমের আর নাহি গতি।
দারা-সুত মায়া-ফাঁস গলে জড়াইয়া,
ডুবিয়া মরিনু, নাথ, দেখহ চাহিয়া।"

বেজা ঘুমের ঘোরে "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই বিলাসী চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত চাপড়াইতে লাগিল। বেজা পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। বিলাসী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। নাঃ, রাগের মাথায় ছেলেটা আজ বড়ই মার খাইয়াছে। রাগেরই বা অপরাধ কি? তেমন উৎকণ্ঠার সময়—খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া কোথায় এক মুঠা পেটে দিতে গিয়াছি, না হতভাগা ছেলে ঝাঁপাইয়া আসিয়া তৈর

ভাতগুলাকে নষ্ট করিয়া দিল। ভাগ্যে হাঁড়ীতে এক মুঠা ভাত ছিল, নইলে তো উপবাসেই সারা দিনটা কাটাইতে হইত। না বাবু, খাবার জিনিষ নোংরা হইলে খাওয়া যায় না, তা নিজের ছেলেই হউক, আর পরের ছেলেই হউক। ছেলেমানুষ বলিয়াই কি উৎকণ্ঠার সময় এত সহ্য হয়? তবে মারটা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। পিঠের এইখানটা এখনও বুঝি একটু ফুলিয়া আছে। মার খাইয়া অবধি আজ সারাদিনটা ভয়ে মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। অন্য দিন জপে বসিলে কত উৎপাত করে,—কোলে উঠে, পিঠ চাপড়ায়, মালা ধরিয়া টানাটানি করে,—আজ আর সে সব কিছুই নাই, চুপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তা পড়ুক, তবু একবার স্থির হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে পারা যায়। ইহকাল তো গিয়াছে, এখন এই ভূতের বোঝা লইয়া পরকালটাও কি নষ্ট করিব?

বিমলী পোড়ারমুখী বলে, বেজা বড় হইলে আমাকে দেখিবে, খাওয়াইবে, পরাইবে। কায নাই আর দেখায়, যিনি সকল জীবকে দেখিয়া আসিতেছেন, তিনি দেখিলেই যথেষ্ট। বেজা বড় হইয়া আমাকে খাওয়াইবে! হায় রে কপাল! তাহা হইলে অমন সমর্থ বেটা থাকিতে বিনে বাগ্‌দীর মাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইত না। চুলোয় যাউক খাওয়ান পরান, এখন এ আপদ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।

মা, বলা মুখপোড়া আর আসিল না, আসিবেও না। তাহা হইলে—ইঃ, তাহার ঘরে গিয়া এ বোঝা ফেলিয়া দিয়া আসিব না! কালই তা দিয়া আসিতে পারি, তবে লোক পাছে কিছু বলে, এই যা ভয়। নয় তো বিলাসী বোষ্টমীর কাছে চালাকী করিয়া যাইতে হয় না।

বেজা পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল। বিলাসী এবার তাহাকে তুলিয়া কোলের উপরে শোয়াইল। বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া দাবার উপর পড়িয়াছিল। সেই আলোকে বিলাসী দেখিতে পাইল, ঘুমন্ত অবস্থাতেও বেজার ঠোঁট দুইটা যেন চাপা কান্নায় ফুলিয়া উঠিতেছে; বিলাসী বুঝিতে পারিল, ছেলেটা ঘুমাইয়াও মার খাইবার স্বপ্ন দেখিতেছে, এবং সেই জন্যই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। ছি ছি, এইটুকু ছেলেকে এত মারিয়া সে ভাল কায করে নাই। রাগ —মুখে আগুন তাহার রাগের। অজ্ঞান শিশু—তাহার কি শুচি অশুচি, ভাল মন্দ জ্ঞান আছে, না, মারিলেই সে জ্ঞান হইবে? আহা, বাস্তবিক আজ ছেলেটা ভয়ে যেন আধখানা শুকাইয়া গিয়াছে।

আপনার রাগকে ধিক্কার দিতে দিতে বেজাকে কোলে লইয়া বিলাসী ঘরে ঢুকিল।

এক দিন দুই দিন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল, বলরামের দেখা নাই। অনুসন্ধানে বিলাসী জানিল, সে নবদ্বীপে মেলা দেখিতে গিয়াছে। রাগে বিলাসী বলরামকে গালি দিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সে যখন বুঝিতে পারিল যে, ছেলেটার ভার সম্পূর্ণরূপে তাহার উপরেই পড়িয়াছে, বলরাম যে আর ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, সে আশা নাই, তখন বিলাসী ছেলেটার উপরেও না রাগিয়া থাকিতে পারিল না, এবং হতভাগা ছেলে যে তাহারই ঘাড় ভাঙ্গিবার জন্য, তাহার পরকালের পথে কাঁটা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে তাহাকে বিদায় করিবার উপায় আর নাই, ইহাই প্রতি কথায় ব্যক্ত করিয়া সামান্য রাগেও বেজার উপর বেশী করিয়া রাগ ঝাড়িতে লাগিল।

বিমলা দুধ দিতে আসিলে বিলাসী বলিল, "আর দুধে কায নাই, পরের ছেলেকে কে বারোমাস দুধ কিনে খাওয়াতে যাবে?"

বিমলা বলিল, "তা আজ এনেছি নাও, কাল থেকে আর নিও না।"

পরদিন বিমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি-গো, দুধ চাই না তো?"

বিরক্তি সহকারে বিলাসী বলিল, "দিয়ে যাও। নইলে খাবে কি? শেষে কি পেটের জালায় আমাকে খেয়ে ফেলবে?"

বিমলা হাসিতে হাসিতে দুধ মাপিয়া দিল।

৭

"হরে কৃষ্ণ! বিলাস কোথায় গো?"

বিলাসী স্নান করিয়া আসিয়া আহ্নিকের আগে বেজাকে খাওয়াইবার জন্য দুধ জাল দিতে বসিয়াছিল, সহসা যেন পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল, এবং চাহিয়াই তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া মাথায় তুলিয়া দিল। যে ডাকিতেছিল, সে নিতাই দাস। নিতাই সহাস্যমুখে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "হরে কৃষ্ণ, রান্না কচ্চো না কি? বেজা কোথায়?"

বেজা অদূরেই উঠানের এক পাশে কতকগুলা ধূলা ও এক মুটা ফুল লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল। বিলাসী সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "ঐ যে।"

নিতাই এক গাল হাসিয়া বলিল, "বেশ বেশ, ভাল আছে তো?"

বলিয়া সে দাবার উপর উঠিয়া বসিল। বিলাসী আসিয়া আসন একখানা পাতিয়া দিল। নিতাই আসন গ্রহণ করিয়া বলিল,"হরে কৃষ্ণ, আমি—বল্‌তে নাই, শ্রীধামে গিয়েছিলাম। কাল সেখান থেকে ফিরে কোটগঞ্জে এসেছিলাম। সেখানেই শুন্‌লাম, বৈষ্ণবী বৈকুণ্ঠলাভ করেছে। হরে কৃষ্ণ, শুনে ছেলেটার জন্য একটু ভাবনা হ'লো। সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি আসছি, রাস্তায় বলরামের সঙ্গে দেখা, সে বল্‌লে, বেজা তোমার কাছেই আছে—বেশ আদরেই। না থাক্‌বেই বা কেন, যতই হোক্, আপনার লোক তো!"

বলিয়া সে বিলাসীর মুখের দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বিলাসী হাঁ, না কিছুই বলিল না; সে গিয়া উনানের কাছে বসিয়া চুধে কাঠী দিতে লাগিল। নিতাই একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তা তুমি এমন অশাস্ত্রীয় আচরণ কেন করেছ বিলাস, বিধবার বেশ ধারণ করেছ কেন? আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে স্ত্রীলোকমাত্রেই শ্রীরাধার অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণই তাদের পতি। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে কোন স্ত্রীলোকেরই বৈধব্য নাই। তারা বিধবার বেশ ধারণ কর্‌লে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপমান করা হয়।"

মুখ ফিরাইয়া বিলাসী জিজ্ঞাসা করিল. "শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, আমরা মানুষ; দেবতা মানুষের পতি হবে কেমন ক'রে?"

মৃদু হাস্যের সহিত মস্তক সঞ্চালন করিয়া নিতাই বলিল, "হরে কৃষ্ণ, তাঁকে যে ভাবে যে ভাবনা করে, সেই ভাবেই পায়। ব্রজের গোপিনীরা তাঁকে পতিভাবেই সেবা কর্ত্তো। আর হরে কৃষ্ণ, যেমন স্ত্রীলোকমাত্রই শ্রীরাধার অংশ, তেমনি পুরুষমাত্রই তো শ্রীকৃষ্ণের অংশ।"

তাহার মুখের উপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বিলাসী মুখ ফিরাইয়া লইল। নিতাই বলিল, "হরে কৃষ্ণ, এ সকল অতি গুহ্য কথা, এক সময়ে তোমাকে বুঝিয়ে দেব। এখন একটু তেল দাও দেখি, রোদে মাথাটা ধ'রে গিয়েছে। রান্নার দেরী কত?"

মুখ না ফিরাইয়াই বিলাসী উত্তর দিল, "এইবার চাপবে।"

নিতাই বলিল, "আচ্ছা, সংক্ষেপেই সেরে নাও, কোন আড়ম্বরের দরকার নাই; এক মুটো খেয়েই আমাকে আবার কোটগঞ্জে যেতে হবে।"

বিলাসী তাহার সম্মুখে তেলের বাটি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটাকে নিয়ে যাবে তো?"

"তা নিয়ে যাব বৈকি" বলিয়া নিতাই তৈলমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইল। বিলাসী গিয়া উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া দিল।

আহারান্তে নিতাই বলিল, "তবে আসি বিলাস এখন। বেজা কোথায়?"

বিলাসী বেজাকে আনিয়া ধপ করিয়া তাহার সম্মুখে বসাইয়া দিল। নিতাই ছেলে কোলে পাইয়া হরে কৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিলাসী খুঁটী ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। উঠানের ছায়া সরিয়া সরিয়া অনেকটা দূরে চলিয়া গেল, রান্নাঘরে পাতরের উপর বাড়া ভাতগুলা শুকাইতে লাগিল,কিন্তু বিলাসী একটুও নড়িল না, সরিল না; যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

বলরাম আসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বেজা কোথায় বিলাসি?"

বিলাসী ধরা গলায় উত্তর দিল, "তার বাপ এসে তাকে নিয়ে গিয়েছে।"

বলরাম যেন হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "নিয়ে গিয়েছে! কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম বলিল,"তুমি ছেড়ে দিলে?"

বিলাসী বলিল, "বাপ ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি আটকে রাখতে যাব কেন? আমার কি এমন মাথাব্যথা?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলরাম বলিল, "বাপ যে তাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছে। এক শো দশ টাকা দর ঠিক হয়েছে। খবর পেয়েই আমি ছুটে আসছি।"

বিলাসী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বলরামের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরগম্ভীর

স্বরে বলিল, "বাপ ছেলেকে বেচবে, তাতে তোমার আমার কি ?"

বলরাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার তাতে দুঃখ নাই ?"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া জোর গলায় বিলাসী বলিল, "একটুও নাই। দুঃখ? বরং ভূতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমি বেঁচে গিয়েছি।"

"তবে বেঁচেই থাক" বলিয়া বলরাম দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বিলাসী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অাঁচল পাতিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, পড়ন্ত রোদটুকু গাছের মাথার উপর চিক্‌চিক্ করিতেছে। বিলাসী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সে যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না। সে ভূতের বোঝা যে নামিয়া গিয়াছে; তবে আর এত ব্যস্ততা কেন? বিলাসী উঠিয়া ব্যস্ততা সহকারে গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। পাতরের শুক্‌না ভাতগুলা জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল, এঁটো বাসনগুলা তখনও পড়িয়া ছিল, সেগুলা মাজিয়া ধুইয়া আনিল। তাহার পরে সে ঘরে দোরে ঝাঁট দিয়া সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া মালা লইয়া বসিল। আজ আর কোন গোলমাল নাই, নির্জ্জনে স্থিরচিত্তে ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিবে।

কিন্তু এ কি, জপে আজ মন বসে না কেন? বাড়ীটা যেন বড়ই ফাঁকা—ভয়ানক নির্জ্জন মনে হইতেছে। একটু কান্না নাই, হাসি নাই, কলরব নাই, যেন স্তব্ধ শ্মশান-ভূমি! এই নির্জ্জীব নিস্তব্ধ শ্মশান-ভূমে বসিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেও প্রাণ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! কেন এমন হইল? সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই বিলাসী,—নাই শুধু মাস দেড়েকের পরিচিত একটা একরত্তি ছেলে; তবে মনটা এমন করে কেন? সেই একরত্তি ছেলেটা কি তাহার সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ততা সব কাড়িয়া লইয়া গেল? বিলাসী মালা হাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া কে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

"হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি এখন
সে দিন আছে।
ব্রজেরি সে সুখসাধ ব্রজনাথের
সঙ্গে গেছে।"

বিলাসীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, গায়ক গাহিতে গাহিতে যাইতেছে—

"বৃক্ষেতে নাহি পল্লব,
গোষ্ঠেতে নাহি বল্লভ,
কোকিলেরি কুহু রব
সে রব নীরব হয়েছে।"

ওহো, নীরব—সত্যই ভয়ানক নীরব! কিছুই নাই, আর কিছুই নাই; যাহা কিছু ছিল, সব সেই হেজা হতভাগার—সেই ভূতের বোঝাটার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে! মালা-ছড়া আছড়াইয়া ফেলিয়া বিলাসী মাটীর উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং হাতের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গায়ক তখন গাহিতে গাহিতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। দূর হইতে তাহার গানের ক্ষীণ রেশটুকু বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—

"—সে রব নীরব হয়েছে,
হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি এখন সে দিন আছে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সত্যাগ্রহের জয়।

পঞ্জাবে গুরু-কা-বাগে আকালী হাঙ্গামার এক অঙ্কে যবনিকা-পাত হইয়াছে। ৫ হাজার ৬ শত ৩ জন আকালী শিখ গ্রেপ্তার হওয়ার পর গ্রেপ্তার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মোহান্ত নিজ সম্পত্তি রক্ষার অজুহতে পুলিস প্রহরী ডাকিয়াছিলেন বলিয়া পুলিস এত দিন গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখন এক নূতন ব্যবস্থা হইল। সার গঙ্গারাম নামক লাহোরের এক জন ভদ্রলোক মোহান্তের নিকট হইতে গুরু-কা-বাগ ইজারা

গুরু-কা-বাগে আকালীগণ ২৪শে অক্টোবর তারিখে গ্রেপ্তার হইতে যাইতেছেন। পশ্চাতে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ম্যাকফার্সনকে দেখা যাইতেছে।

করিয়া লইয়াছেন। গঙ্গারাম বলিয়াছেন—এখন হইতে শিখগণ গুরু-কা-লঙ্গরের জন্য কাঠ কাটিলে তিনি পুলিস ডাকিবেন না। কাযেই পুলিসকে বিদায় লইতে হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, গুরুবাগে এই সত্যাগ্রহের সমরে জয়ী হইল কে—সরকার না আকালী শিখের দল? পাছে কেহ পঞ্জাবের সরকারী কর্মচারীদিগের উপর পরাজয়ের অপবাদ দেয়, সেই জন্য তাঁহারা প্রথম হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। সরকারপক্ষ হইতে সার জন মেনার্ড পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় সার গঙ্গারামের গুরু-কা-বাগ ইজারা গ্রহণ সম্পর্কে বলিয়াছেন—The idea of this solution emanated from the gentleman himself but the Government has encouraged, and welcomed it—এই ভাবে হাঙ্গামা শেষ করিবার কথা ঐ ভদ্রলোকই প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন—অবশ্য, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। সার গঙ্গারাম তাঁহার এই কার্য্যের সহিত সরকারের সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছেন।

এ দিকে গ্রেপ্তার বন্ধ করিবার আদেশ জারি হওয়ার

পরই শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী জানাইয়াছেন—"গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, গভর্ণমেণ্ট শিখদিগের অভিযোগের প্রতীকার করিলেন। কমিটীর মতে মোহান্তের গুরু-কা-বাগ পত্তনী দিবার কোন অধিকার নাই।" কাযেই দেখা যাইতেছে যে, গুরু-কা-বাগে গ্রেপ্তার বন্ধ হইয়া যাইলেও মূল সংগ্রাম শেষ হয় নাই। আকালী শিখের দল যে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দলে দলে প্রহার ও কারাগার বরণ করিয়া লইয়াছে—তাহারা বহু আকালী শিখকে আজ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না—কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিত না।

গুরু-কা-বাগ যে মোহান্ত মহাশয়ের ইজারা দিবার অধিকার আছে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় গুরুদ্বার বিল পাশ করিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় ঐ আইন আলোচনার সময় শিখ ও হিন্দু সদস্যগণ সকলেই উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভায় এক জন মুসলমান মাত্র ঐ বিল সমর্থন করিয়াছেন। শাসন

গুরু-কা-বাগে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৪ জন আকালী দলবদ্ধ হইয়া মার্চ্চ করিয়া যাইতেছেন

তাহাদের সে অধিকার লাভ করে নাই। গভর্ণমেণ্ট, বোধ হয়, প্রহার ও গ্রেপ্তার করিতে করিতে হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই সার গঙ্গারামকে সম্মুখে আনিয়া সেই গ্রেপ্তারের দায় হইতে আপাততঃ কোন প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিলেন। সার জন মেনার্ড ব্যবস্থাপক সভায় যে ভাবে নিজেদের কাযের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের অবস্থা জনসাধারণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। হঠাৎ সার গঙ্গারামের এত দয়ার উদ্রেকেই সরকারের কারসাজি বুঝা গিয়াছে। এইরূপ সদ্‌বুদ্ধি আরও কিছু দিন পূর্ব্বে হইলে সংস্কার আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে—তাহাতে কোন আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইতে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সকল হিন্দু, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান সদস্য ও ৩ জন মুসলমান বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। সরকারী সদস্যগণের মধ্যে লালা হরকিষণলাল ও সর্দ্দার সুন্দর সিং মাজিথিয়া কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। তথাপি বিপক্ষ ভোটের সংখ্যা ৩১ ও পক্ষের ভোটসংখ্যা ৪০ হইয়াছিল। কাযেই গুরুদ্বার আইন বিধিবদ্ধ হইল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী একখানি ইস্তাহারে জানাইয়াছেন—"শিখগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গুরুদ্বার বিল গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিলের সহিত কমিটীর কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। এই বিল শিখ-সমাজের পক্ষে অপমানজনক। শিখগণ এখন হইতে আর গুরুদ্বার সংস্কার বিষয়ে সরকারের উপর নির্ভর করিবেন না—তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপর নির্ভর করিবেন।"

সংগ্রামে বাহুবল সত্যধর্ম্মকে পরাজিত করিতে পারে নাই। এত দিন যাঁহারা বলিতেন যে, অত্যাচারের সহিত সংগ্রামে অহিংসা জয়লাভ করিতে পারে না—তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন যে, আন্তরিক ও সমবেত সত্যাগ্রহ কখনও পরাজিত হইতে পারে না।

মহাত্মা গন্ধী একবার তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ পশুশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে জানে বটে, কিন্তু সত্যাগ্রহের সহিত সংগ্রামে তাহারা পারিয়া উঠিবে

আকালীদের দেহ পরীক্ষা করা হইবে—তাহার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন।

না। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের একটি নূতন উপায়—ইহার মর্ম্ম তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। মহাত্মার এই কথা শুনিয়া তখন লোক হাসিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাপ্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ইংরাজগণ বিব্রত হইয়া পড়িল, তখন তাহারা তাহাদের পরিচিত উপায়—বাহুবলের দ্বারা উহা দমন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ফলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—তাহাই আজ অহিংস অসহযোগ রূপ ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। গুরু-কা-বাগ আন্দোলনেও আমরা

কমিটীর এই ইস্তাহারটি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্ট কি জন্য ব্যবস্থাপক সভায় গুরুদ্বার বিল পাশ করাইয়া লইলেন। উহার দ্বারা আসল সমস্যার কোন প্রকার সমাধানই হইল না। আকালীগণ যে উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া সকল নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ একটুও সুগম হয় নাই। তবে আকালীগণ জগৎকে ত্যাগের ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন। সত্যাগ্রহের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া বাহুবল তাহার নিজের হীনতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ৪ মাস কাল ধরিয়া

ঠিক ঐরূপ ফলই দেখিতেছি। যদি আকালী আন্দোলনে হিংসা বা অসত্যের লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট, এত দিনে উহা নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু পঞ্জাবে আজ যে ভাবে সত্যাগ্রহের জয় ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারত নিজেকে যে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায় ?

ভয়প্রদর্শন করিয়া যে সত্যাগ্রহীদিগকে নিরস্ত করা যায় না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করিলাম। উহাতে আরও একটি মহত্ত্বের কথা প্রচারিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট মধ্যে হঠাৎ এক দিন ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা একটি নূতন জেল নির্ম্মাণ করিতেছেন—উহাতে আরও ১০ হাজার নূতন আকালী কয়েদীর স্থান হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীরা হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, এই সংবাদে আকালী শিখরা ভয় পাইবে এবং আর গুরু-কা-বাগে কাঠ কাটিতে আসিবে না। কিন্তু ফল ঠিক বিপরীত হইল। যে সকল আকালী শিখ এককালে সরকারের চাকরী করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুবাগে যাইয়া গ্রেপ্তার হইবেন।

গত ২২শে অক্টোবর রবিবার প্রথম সৈনিকের দল গুরুবাগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুবেদার অমরসিং ঐ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ৫৩ জন ননকমিশন্‌ড অফিসার, ৪৬ জন সিপাহী ও সওয়ার চলিল।

সে দিন অমৃতসরের রাজপথে যে দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ও উৎসাহিত করিবার জন্য প্রায় ১৫ হাজার লোক শুধু স্বর্ণমন্দিরের নিকট সমবেত হইয়াছিল। সমস্ত রাজপথেই সে দিন তিলধারণের স্থান ছিল না। ঐ ১ শত জনের মধ্যে ২২ জন পক্ককেশ—শ্বেতশ্মশ্রু—অবশিষ্ট সকলের বয়সও ৪০ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে।

হাবিলদার চরণ সিং নামক এক ব্যক্তি ঐ দলের মধ্যে ছিলেন—গত মহাযুদ্ধে তাঁহার একখানি পদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—কাঠের কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়া এখন তাঁহাকে চলাফেরা করিতে হয়। চতুর্দ্দিকের গৃহগুলি হইতে তাঁহাদের মাথায় এত পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর রাস্তাটি পুষ্পাস্তৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

যাহা হউক, এইবার তাঁহাদের যথার্থ সত্যাগ্রহের কথা বলিব। যখন তাঁহারা আদালতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন ডেপুটী কমিশনার ৩৪ জন য়ুরোপীয় পুলিস ও ২ শত বন্দুকধারী ভারতীয় সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটী কমিশনারের সহিত জাঠেদারের যে আলাপ হইল—নিম্নে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

ডেপুটী কমিশনার—গত ৭০ বৎসর ধরিয়া সরকারের সহিত শিখগণের বন্ধুত্ব ছিল—আপনারা সে বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ?

জাঠেদার—হাঁ, গত ৭০ বৎসর আমরা সরকারের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি—তাঁহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমরা কুটেল আমারায় ১০ দিন না খাইয়া কাটাইয়াছি—গত মহাযুদ্ধের সময় ঘোড়ার মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করিয়াছি। সরকারের জন্য আমরা ধর্ম্ম ও ইমান দিয়াছি। কিন্তু সরকার আমাদের ভাইদিগকে নৃশংসভাবে প্রহার করিয়া তাহার প্রতিদান দিতেছেন।

ডেপুটী কমিশনার—উহা ঠিক নহে। সরকার গুরু-কা-বাগে মোহান্তের জমী বে-আইনীভাবে শিখদিগকে দখল করিতে দিতে পারেন না। যদি আপনারা গুরুদ্বারে যাইতে চাহেন, তাহা হইলে সরকার সে কার্য্যে বাধা দিবেন। সরকার আপনাদিগকে পরের জমী অধিকার করিতে দিতে পারেন না, আপনাদের গুরু-কা-বাগে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?

জাঠেদার—আমরা পরের জমী অধিকার করিতে চাহি না—তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। ওয়াহে গুরু আমাদিগকে প্রয়োজনোপযোগী সকল দ্রব্যই দিয়াছেন। উহা গুরুর জমী এবং গুরুজীর দখলেই আছে। আমরা শুধু সেবা করিবার জন্য সেখানে যাইতেছি। আমরা গুরুর লঙ্গরের জন্য গুরুর জমী হইতে কাঠ কাটিতে চাহি।

ডেপুটী কমিশনার—যাহারা গোলমাল ও হাঙ্গামা করে—সরকার তাহাদের বিরোধী।

জাঠেদার—আমাদের সঙ্গে কোন অস্ত্র নাই। আমরা হাঙ্গামা করিতে পারিব না—শুধু আমাদের ভ্রাতৃগণের মত প্রহৃত হইতে যাইতেছি। আমরা কোন দিন আপনাদের উপাসনা মন্দিরে (Church) যাইয়া আপনাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করি নাই। আপনারা আমাদের সেবা-কার্য্যে বাধা দিবেন কেন ?

ডেপুটী কমিশনার—৩টি উপায়ে আমরা এই বিবাদ মিটাইতে পারি';—(১) আদালতে যাইয়া, (২) পঞ্চায়েৎ বা সালিশী দ্বারা (৩) গুরুদ্বার আইনের দ্বারা। কোন্‌টিতে আপনাদের মত আছে, বলুন।

জাঠেদার— আমরা ঐ সকল ব্যাপার বুঝিতে পারি না। আপনি শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর বা পন্থের প্রতিনিধির সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা সেবা করিতে আসিয়াছি এবং সেবা করিয়া চলিয়া যাইব।

'(না দিলে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড) আদেশ হইয়াছে। চরণ সিং নামক সিপাহীর একখানি পা' ছিল না বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বিচারকালে ঐ ১ শত শিখের পক্ষ হইয়া সুবেদার অমর সিং আদালতে যে একরার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আকালী শিখগণের মনের ভাব বেশ স্পষ্টভবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"সাধারণতঃ গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন ও বিশেষতঃ গুরু কা বাগ ব্যাপারে শিখগণ কি মনে করিয়া থাকেন, তাহা গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া

আকালীদের দেহ অনুসন্ধান করা হইতেছে এবং প্রত্যেকের নাম, ধাম প্রভৃতি লিখিয়া লওয়া হইতেছে।

ডেপুটী কমিশনার—আপনারা যদি আমার কথা না শুনেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিব।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, ঐ সৈনিক আকালীর দল গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ২৬ জনের বয়স খুব বেশী বলিয়া ৬ মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের (না দিলে আরও ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড) এবং অবশিষ্ট ৭৪ জনের প্রত্যেকের দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডের

দিবার এই সুযোগটি আমি ত্যাগ করিব না। এই দলের শিখগণ যে রাজভক্তির নিদর্শন যথেষ্টভাবে প্রমাণ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা আনন্দিত। আমরা টিরা, চিত্রল, আফগানিস্থান, ব্রহ্ম, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, মিশর, পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, পালেস্তাইন, গ্যালিপলি, রুষিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুসংখ্যক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিপন্ন করিয়াছি। সে সময়ে আমাদিগকে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। ফ্রান্সে হাজার হাজার

শিখসৈন্যকে বহু দিন ধরিয়া বরফের জলের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। আমরা যখন মেসোপোটেমিয়ার কুমাদিতে ছিলাম, তখন সে স্থানের উত্তাপ ১৩৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং এক দিনে ১৯০ জন লোক জলাভাবে তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করে। নভে চ্যাপেলে ও ইপে শিখসৈন্যগণ জার্ম্মাণ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া বেয়নেট যুদ্ধ না করিলে ইংরাজের আজ কি দশা ঘটিত, তাহা জগতের অবিদিত নাই। কুটেল আমারায় যখন সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্তি বন্ধ হইয়াছে, তখন আমরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বৃটিশকে রক্ষা করিয়াছি। তথায় বহু দিন ঘোড়ার ও অশ্বতরের মাংস ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য পাওয়া যায় নাই---আমাদের মধ্যে ২৪ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে--১ জনের একখানি পা' একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গ্যাসে তুই জনের চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে সকলেই কোন না কোন সার্টিফিকেট বা মেডেল পাইয়াছি। ২ জন আই, ও, এম্, এস্, ১ জন আই, ডি, এস্, এম্, এবং ১ জন এম্, এস, এম্ উপাধি পাইয়াছিলাম। আমরা প্রায় সকলেই বংশপরম্পরায় সিপাহী! আমরা যুদ্ধের সময় হইতে বৃটিশের সৈন্য-বিভাগে কায করিয়া আসিতেছি। আমরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া আজ এত আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি। গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আমাদের প্রতি সরকার যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। গুরু-বাগ ব্যাপারে সরকারের ব্যবহারের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, নানকানা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর সরকার দুঃস্থদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া সহানুভূতির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সাধু ও সজ্জনগণের সম্মান নষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই প্রকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হাইকোর্টে কি ভাবে চালান হইয়াছে, তাহাও আমাদের অবিদিত নাই। শিখগণের কৃপাণধারণ, কৃষ্ণ পাগড়ী পরিধান, স্বর্ণমন্দিরের চাবি রক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও সরকার কি ভাবে প্রজার ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সকল দেখিয়া আর অপরের সাধুতা ও

গুরু-কা-বাগে কাঁটা তারে ঘেরা অস্থায়ী জেলে ধৃত আকালীগণ।

সদিচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাহার পর গুরুবাগ ব্যাপারে ২ মাস ধরিয়া সরকারের লোক কি করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও আমাদের রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। পুলিসের নিষ্ঠুর ও অপবিত্র হস্ত আমাদের ধার্ম্মিক ভ্রাতৃগণের চুল ও দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। গুরুজীর নামে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হইয়াছে ও আইনের দোহাই দিয়া তাহারা সকল প্রকার বে-আইনী কার্য্য করিয়াছে। ইহার পর স্থির থাকা আর সম্ভব না হওয়ায় আমরা আজ গুরু ও পন্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আজ গুরুসেবায় যদি আমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনে করিব।"

সুবেদার অমর সিং যে সকল রাজভক্তির প্রমাণের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার প্রতিদান কি হইয়াছে? বিচারাধীন অবস্থায় হাজতের মধ্যে তাঁহাদিগকে এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, ১৯ ঘণ্টাকাল কেহ প্রস্রাব বা মলত্যাগ করিবার সুবিধা পায়েন নাই! কৃত কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার তাঁহারা পাইয়াছেন।

তাহার পর আর এক দল ভূতপূর্ব্ব-সৈনিক আকালী শিখ গুরুবাগে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে দলেও ১ শত ৪ জন লোক ছিলেন। আরও কিছু দিন গ্রেপ্তার চলিলে আরও কত পেন্সন প্রাপ্ত শিখ-সৈনিক দণ্ডিত হইতেন, তাহা কে বলিতে পারে?*

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

* চিত্রগুলি 'বসুমতী'র জন্য গৃহীত। গত বারের প্রবন্ধের চিত্র—'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে'র সৌজন্যে আমরা পাইয়াছিলাম—সম্পাদক।

গোপী।

নব-নবনীতে ঢালি' পদ্মমধু-ধারা,
স্বপনে গড়িল বিধি গোপীর হৃদয়,
অনুরাগে ব্রজবধূ তনু জ্ঞানহারা;
বঁধুর মধুর ছবি জাগে প্রাণময়।

যমুনার কল-গান,—বাঁশরীর সুর,
তমাল-পিয়াল-কুঞ্জে কোকিল-কূজন,
করে-সুন্দরের ধ্যানে রভস-বিধুর;
জাগায় মরমে নব প্রেমের স্বপন,—

ঘর তার পর সদা মন তার বনে,
প্রেম তারে সাধে সদা যেতে অভিসারে,
মিলন স্বপন সম আত্ম-বিস্মরণে;
বিরহে উছলে প্রেম—শত সুধাধারে;

শ্যাম নিত্য প্রেম-গান—গোপী তার সুর,
দোঁহার মিলনে বিশ্ব মধুর মধুর।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বাঙ্গালায় লোকক্ষয়।

এবার লোকগণনার হিসাব হইতে দেখা যায়, গত দশ বৎসরে বাঙ্গালার জনসংখ্যা মোট শতকরা ২ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা না বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২ শত ৩১ জন কমিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যা মোট ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮ শত ৯৬ জন বাড়িয়াছে। গত ভাদ্র মাসে এই কথার আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালার লোকক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপাধিক্য হেতুই বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা কমিলেও মুসলমানের সংখ্যা অল্প-বাড়িয়াছে। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য।

সংপ্রতি বাঙ্গালার ডিরেক্টার অব পাবলিক হেলথ ডাক্তার বেণ্টলী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গেও জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গালার সকল দিকেই অবস্থা শোচনীয়। ডাক্তার বেণ্টলী দেখাইয়াছেন, গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে—অর্থাৎ দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া—পশ্চিমবঙ্গের সকল জিলাতেই জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হওয়ায় লোকক্ষয় হইতেছে! সকল জিলায় সকল বৎসর লোকক্ষয়ের হার সমান না হইলেও মোটের উপর লোকসংখ্যা কমিতেছে—কোন কোন জিলায় এই ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরই জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক হয় নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের মৃত্যু হয়—তদবধি লোকক্ষয় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থা এরূপ ছিল না; কিন্তু গত ৪ বৎসর হইতে পূর্ব্ববঙ্গেও মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগে মৃত্যুর সহিত জন্মের তুলনায়—মৃত্যুই জয়ী হইয়াছে। কাযেই পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ব্ববঙ্গেও লোকক্ষয় আরব্ধ হইল।

বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালার লোকক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ। পরীক্ষার ফলে ডাক্তার বেণ্টলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে বৎসর বৃষ্টিপাত অধিক হয়, সে বৎসর ম্যালেরিয়া কম হয়, শস্যের ফলনও ভাল হয়।

কয় বৎসর নানারূপ অনুসন্ধানের ফলে ডাক্তার বেণ্টলী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—

(১) বৃষ্টিপাত অধিক হইলেই যে ম্যালেরিয়া হয়, এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক; পরন্তু দেখা যায়, অধিক বৃষ্টি হইলে সে বৎসর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(২) বাঙ্গালা দেশের নদীর সঙ্কোচ হওয়ায় ও ভূমিতলস্থ জল নামিয়া যাওয়ায় দেশের আর্দ্রতা কম হইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছে।

(৩) শাখানদীসমূহ যে সব স্থানে মূল নদী হইতে উদ্‌গত হইয়াছে, সেই সব স্থানে নদীগর্ভ পলিতে বুজিয়া যাওয়াই সে সব নদী শুকাইয়া উঠিবার একমাত্র কারণ নহে; সর্ব্ববিধ বাঁধে বর্ষার সময় বৃষ্টির জল আর পূর্ব্ববৎ খাল, বিল, জলায় যাইতে না পারাও অন্যতর কারণ। বর্ষার পর এই সব খাল বিল জলা হইতে নদীতে জল আসিত। এখন সে সব জলাভাবে শুকাইয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে ম্যালেরিয়া মশক (এনোফেলি) বংশবৃদ্ধির সুবিধা পাইতেছে।

(৪) দেশে ক্ষেত্রেও জলনিকাশের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বাঁধ রচনা করাই বিষম ভুল হইয়াছে।

স্বভাবতঃ বঙ্গদেশে বর্ষা অধিক হয় এবং বাঙ্গালা দিয়া ভারতবর্ষের অনেকাংশের জলনিকাশ হয়। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে; কাযেই যে সব ফসলের জন্য অধিক জলের প্রয়োজন, বাঙ্গালার কৃষককে সেই সব ফসলের চাষই করিতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালায় "শুষ্ক ফসলের" চাষ সম্ভব হইবে না। ধানের চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মাদ্রাজের ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ধানের চাষ থাকিলেও ম্যালেরিয়া নাই।

রাজা দিগম্বর মিত্র যে বলিয়াছিলেন, বাঁধের জন্যই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া হইয়াছে, তাহাই ঠিক। সেই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক। গত ৩০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার ও রেলপথের প্রভূত বিস্তার সাধিত হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় রেলপথ ছিল

না—রাস্তা ছিল ১ হাজার ৮ শত মাইল; আর আজ রেলপথের ও রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১৮ হাজার মাইল।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বাঙ্গালার জলসংস্থান কমিয়া গিয়াছে। খাল, বিল আর স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ব্বের মত ধৌত হইয়া যায় না। দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট তাপ ও আর্দ্রতা ব্যতীত ম্যালেরিয়া-মশক ম্যালেরিয়াবিষে বিষাক্ত হইতে পারে না। সেই জন্যই অক্টোবর মাসের পর হইতে এই মশক আর তেমন ম্যালেরিয়া বিস্তার করিতে পারে না। খাল বিল জলার মত যে সব স্থানে অধিক জল সঞ্চিত হয়, সে সব স্থানের মশক-বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। অথচ এখন সেইরূপ ছোট ছোট স্থানেই অধিক জল জমে। জলাধারের কূলেই মশকের বংশবৃদ্ধি হয়। সে হিসাবেও কয়টিমাত্র বৃহৎ জলাশয় অপেক্ষা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে অধিক মশক জন্মিবার সম্ভাবনা। আবার বৃহৎ জলাশয়ের জল শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয় না বলিয়া তাহা মশকবংশবৃদ্ধির অনুকূলও নহে।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া ডাক্তার বেণ্টলী বলেন—যতদূর সম্ভব বাঙ্গালায় জলপ্রবাহের স্বাভাবিক অবস্থার উদ্ধারসাধন করিতে হইবে এবং হাজা মজা নদীর সংস্কার করিতে হইবে। পলি পড়িয়া নদীর উৎপত্তিস্থান মজিয়া উঠা বাঙ্গালায় স্বাভাবিক ব্যাপার। কাযেই সেচের খালে তাহা হইলে যেমন (পলি কাটিয়া দিয়া) প্রবাহপথ পরিষ্কৃত করা হয়, নদীতেও তেমনই করিতে হইবে। এখন বাঁধে যে-সব বিল ও জলা হইতে জল নদীতে আসিতে পারে না সে সব বিলের ও জলার জল নদীতে পড়িবার পথ পরিষ্কার করিলে অনেক উপকার হইবে। তাহাতে জলা ধৌত হইয়া যাইবে, ও জলার জল নদী পুষ্ট রাখিবে।

জলের স্বাভাবিক প্রবাহপথ পুনরায় প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশের বিশেষ অপকার অনিবার্য্য। ডাক্তার বেণ্টলী বলেন, "I can see nothing but disaster in store" তাহা হইলে ক্রমেই অধিক লোকক্ষয় হইতে থাকিবে এবং ফলে কৃষিকার্য্য আরও কমিয়া যাইবে—বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ ক্ষুন্ন হইবে। বাঁধ দিয়া বাঙ্গালার জল-প্রবাহের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করায় যে ভুল হইয়াছে, তাহার সংশোধন না হইলে কিছুতেই লোকক্ষয় নিবারিত হইবে না; আর লোকক্ষয় হইলে তাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিও অনিবার্য্য হইবে—সরকারের রাজস্বও কমিয়া যাইবে।

বঙ্গদেশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ ছিল না—তাই যে বৎসর ইহা প্রথম সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, তখন চিন্তিত হইয়া সরকার ইহার কারণ সন্ধানের চেষ্টা করেন। সে জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, রাজা দিগম্বর মিত্র তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, দেশের স্বাভাবিক জল-নিকাশ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রাস্তা রচনা করাতেই দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বর্দ্ধমানে ইহার প্রবল প্রকোপহেতু তখন ইহাকে "বর্দ্ধমান ফিভার" নামে অভিহিত করা হয়। তাহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে রাস্তা রচনা সোৎসাহে আরব্ধ হইয়াছে। ভগবানগোলা পর্য্যন্ত রাস্তা রচনার পরই বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। তখন "ফেরী (খেয়া) ফাণ্ডের" আয় হইতে রাস্তা রচিত হইতেছে এবং জেলের কয়েদীদিগকে সেই কাযে খাটান হইতেছে। দেশের দুর্ভাগ্য, তখন দিগম্বর মিত্রের কথায় কেহ মনোযোগ দেন নাই। দেশে রাস্তার অভাব ছিল। সেই অভাব দূর হইতেছে দেখিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন—জলনিকাশ ব্যবস্থার দিকে কেহ মন দেন নাই। তাহার পর হইতে রাস্তাও বাড়িয়াছে—রেলপথও নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেলপথ নির্ম্মাণের কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাঁধে জল বদ্ধ হইলে ম্যালেরিয়া ব্যতীত দেশের আরও কি অপকার হয়, তাহার কথা বলিব। বাঁধে বাধিয়া জল আর পূর্ব্বের মত প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে না—বদ্ধ জলে ধান ভাল হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক বোটানিষ্ট মিষ্টার এলবার্ট হাউয়ার্ড এ কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেখা যায়—যে সব স্থানে বন্যা বন্ধ হওয়ায় পলিবাহী জলধারা বহিয়া যাইতে পারে না—অর্থাৎ বন্যা হয় না—সেই সব স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রবল হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলার বিষয় আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এ দেশে বর্ষার জল উচ্চ ভূমি হইতে মৃত্তিকা ধৌত করিয়া নিম্ন ভূমিতে প্রদান করে। ইহাতে বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য প্রদেশের নানাস্থানে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া এখন শিলাখণ্ডই অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, পলিতেই জমীর উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হয় এবং ধানের ফলন ভাল হয়। পুসার কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, এ ধারণা

ভ্রান্ত। যে সব জমীতে পলি পড়ে ও ধানের ফলন ভাল হয়, পলি পড়াই সে সব জমীতে ফলন ভাল হইবার কারণ নহে—বন্যার জল ক্রমে ক্রমে বহিয়া যাওয়ায় ক্ষেত্রে ধানগাছের মূলে উদজানপূর্ণ জল প্রবাহিত হওয়ায় সুফল ফলে (the aeration of the fields by the incessant slow passage of fresh oxygenated water past the roots of the crop) জল যদি বদ্ধ হইয়া যায়, তবে ঐ বায়ুর অভাবেই ধানের ক্ষতি হয়। বর্দ্ধমানে সে বার বন্যা হইলে ফসল খুব ভাল হইয়াছিল। বাঁধে জল বদ্ধ হইয়া যায় এবং ফলে ধানের ফলনও কমিয়া যায় এবং কদন্নে লোকের ম্যালেরিয়াপ্রতিষেধক ক্ষমতার হ্রাস হয়—কাযেই মোটের উপর লোকক্ষয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মিষ্টার হাউয়ার্ড বলিয়াছেন—"The interference (by the creation of artificial embankments) with the well-being of the rice plant in all probability placed the unfortunate ryot in a vicious circle, the result of which has been * * partial rural depopulation." গাছের মূলে আবশ্যক উদজান যাইবার উপায় করিতে পারিলে এ অবস্থার প্রতীকার হয়। শস্যের প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া দেশের জলনিকাশের স্বাভাবিক উপায় ক্ষুণ্ণ করা সঙ্গত নহে।

এ দিকে কেহ এখনও দৃষ্টি দিতেছেন না। কেবল এবার উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যার দায়িত্ব দেশের লোক রেলের বাঁধের উপর ন্যস্ত করায় সরকার এক জন এঞ্জিনিয়ারকে অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রেলপথে যে জলনিকাশের আবশ্যক ব্যবস্থা রাখা হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যবঙ্গ রেলপথের ধারে দমদম জংশন ও দমদম গোরাবাজার ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে অনেক গ্রাম রেল রাস্তায় জল বাধায় জলমগ্ন হইত—ক্ষেত্রে ধান্য নষ্ট হইয়া যাইত। এই অবস্থায় এক জন যুবক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল ইহার প্রতীকার প্রচেষ্টায় 'অমৃতবাজার' 'ষ্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রে ইহার আলোচনা করেন এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ কথা উপস্থিত করেন। কিন্তু কিছুতেই ঈপ্সিত ফললাভ হয় না। শেষে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে ললিতমোহন বিলাতে লর্ড ষ্ট্যানলী অব অলডারলীকে এ বিষয় অবগত করান। তিনি বিলাতে হাউস অব লর্ডসে ইহার আলোচনা করিলে রেলের কর্ত্তারা বাধ্য হইয়া এ দিকে দৃষ্টি দেন এবং ফলে জলনিকাশের জন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় লোক রক্ষা পায়।

সংপ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, উত্তরবঙ্গে আদমদীঘী ও নসরৎপুরের মধ্যে যে স্থানে এবার বন্যায় রেলরাস্তার প্রায় এক মাইল ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রজারা ১২ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কর্ত্তাদের কাছে দরখাস্ত করে—তথায় একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া জলনিকাশের উপায় করা হউক। রেলের কর্ত্তারা তথায় সেতু নির্ম্মাণের কোন উপযোগিতা উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু এবার তথায় রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রতিপন্ন হইল, তথায় সেতু-নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল এবং সেতুর অভাবে তথায় প্রজার শস্যহানি হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সংপ্রতি উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, অনেক স্থানে ছোট ছোট সেতুর কাছেই রেলরাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাহাতে বেশ বুঝা যায়, এই সব জলনিকাশপথ জলনিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রেলপথ বিস্তৃত (broad gauge) করিবার সময় জলনিকাশ পথ অধিক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (has been considerably curtailed)! এমনও জানা গিয়াছে, যখন ১টি মাত্র রাস্তা ছিল, তখন যে সব সেতু ছিল, ডবল লাইন করিবার সময় তাহার কতকগুলি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে! রেলের রাস্তায় বগুড়া জিলার জলনিকাশ-পথ রুদ্ধ হইয়া যেন এক বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলপথ রুদ্ধ করিয়া রেলরাস্তা রচনা করা হইয়াছে—(the railway line has dammed some minor water courses) বাস্তবিক বাঁধে জল না আটকাইলে বন্যার জল বহিয়া যাইতে পারিত। মিষ্টার বি, কে, ঘোষও বলিয়াছেন, উত্তরবঙ্গের রেলপথ যখন বিস্তৃত করা হয়, তখন পূর্ব্বস্থিত ছোট বড় সেতুর সংখ্যাও কমান হয়।

রেলের বাঁধে বন্যায় দেশের ক্ষতি হয় কি না, সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকার এঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর রলারামকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বহু দিন রেলের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি যে রেলের বাঁধের ব্যবস্থার প্রতিবাদ

করিবেন,এমন আশা করা যায় কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহের অবকাশ আছে। দেশের লোক এই অনুসন্ধানের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যে গঠিত এক সমিতি নিয়োগের প্রস্তাবই করিয়াছিল। কিন্তু সরকার তাহা করেন নাই এবং সেই জন্যই দেশের লোক সরকারের এই প্রস্তাবিত অনুসন্ধানের ফলাফল জানিবার জন্য কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে না।

বঙ্গদেশে লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা ম্যালেরিয়ায় কিরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয় সরকারী বিবরণেও যে নাই, এমন নহে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালা সরকার প্রেসিডেন্সি বিভাগের জলনিকাশব্যবস্থা ও তাহার সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ আলোচনা করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। সেই Drainage Committeeর বিবরণে দেখা যায়,বাঙ্গালার কোন কোন থানায় শতকরা ৮০ জনেরও অধিক অধিবাসীর প্লীহা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট ও লেফটেনাণ্ট প্রক্টর যশোহর জিলায়—যশোহর, চৌগাছা, মুক্তদহ, পাতিবিলা, ইচ্ছাপুর প্রভৃতি ২৫ খানি গ্রামে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ৬ শত ৪৪টি বালকের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই সব বালকের মধ্যে শতকরা ৬৬ জনের প্লীহা অস্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং শতকরা ৩৪ জনের রক্তে ম্যালেরিয়াজীবাণু বিদ্যমান! ডাক্তারদ্বয় স্বীকার করিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়ায় যে জন্মের সংখ্যা হ্রাস করায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ম্যালেরিয়ায় দুর্ব্বল জনক-জননীর প্রজনন-শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং গর্ভপাত হয় ও মৃত সন্তান প্রসূত হয়। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, ম্যালেরিয়ায় যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের অর্দ্ধাংশই ১০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক এবং ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনেক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপহ্রাস হইলে জন্মের হার বাড়িবার সম্ভাবনা।

ড্রেণেজ কমিটী সাধারণভাবে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান করিতে উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। বাঁধে যে জল বাধিয়া যায় এবং তাহার ফলে দেশের স্বাস্থ্যহানি হয়, সে কথা তাঁহারা ভাল করিয়া বলেন নাই; বোধ হয়, সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু তদবধি আরও যে অনুসন্ধান চলিয়াছে, তাহাতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা দিগম্বর মিত্রের মতই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এবার বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার বেণ্টলীও সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, রেলপথে ও রাস্তায় জলনিকাশের যথেষ্ট পথ রাখা একান্তই প্রয়োজন। সেইরূপ পথের অভাবেই দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বাস্তবিক পৃথিবীতে আর কোন দেশে যখন ৫০ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় বিস্তৃত ভূভাগে জনক্ষয় হয় নাই, তখন বাঙ্গালাতেই বা তাহা হয় কেন? ভুক্তভোগী দেশের লোক লক্ষ্য করিয়া বাঁধগুলিকেই ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এবার ডাক্তার বেণ্টলীর বহু অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের মতই সমর্থিত হইয়াছে।

সংপ্রতি অগ্রহায়ণ মাসেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ—ব্যবস্থাপক সভা বিশেষজ্ঞ—সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যে গঠিত এক সমিতি নিয়োগ করিয়া উত্তরবঙ্গে পুনঃ পুনঃ বন্যার কারণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করুন—সমিতি আরও সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বন্যাজনিত বিষম ক্ষতিতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপকথা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে বিষয় উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ, বন্যার অপেক্ষাও এ দেশে ম্যালেরিয়ায় অধিক ক্ষতি হয়। সে কথার আলোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে মাসিক বসুমতীতে করিয়াছি—এবারও সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কথা পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। এত দিন পর্য্যন্ত যাঁহারা দেশের লোককে কেবল কুইনাইন সেবনের উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহারা এবার বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে লোকক্ষয়ের প্রকৃত কারণ অনুভব করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় করিবেন কি? রেলপথের ও রাস্তার উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করে না—কিন্তু ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য যদি রেলপথের ও রাস্তার বাঁধে দেশের জলনিকাশের স্বাভাবিক উপায় নষ্ট হয় এবং তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে প্রবল বন্যায় ও প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় দেশে লোকক্ষয় হয়, তবে রেলপথের ও রাস্তার রচনা-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতেই হইবে। শ্মশানে সৌধ-নির্ম্মাণ ও রাজপথরচনা—উভয়ই তুল্যরূপে অর্থের অপব্যয়। যে ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস হইতেছে, সে ম্যালেরিয়ার কারণ দূর করাই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন।

খৃষ্টানদের জাগ্রত দেবতা।

গির্জ্জা।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পোর্টুগালের রাজকুমারী ক্যাথারিণের বিবাহের সময় ধীবর পল্লী বোম্বাই যৌতুক দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সেই গ্রাম প্রভূত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী হইবে জানিলে কি বোম্বাই এত সহজে ইংরাজের সম্পত্তি হইত? মালাবার হিলে দাঁড়াইয়া বোম্বাই দর্শন করিলে এই প্রশ্ন আপনা-আপনি মনে আইসে।
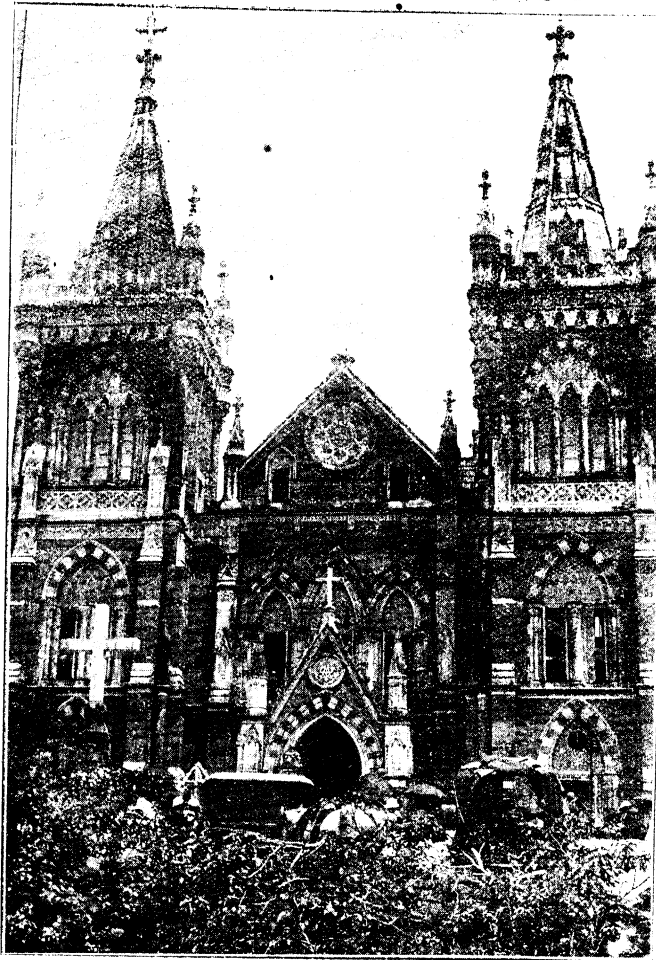
বোম্বাই হইতে দশ মাইল উত্তরে সালসেট দ্বীপের প্রথম নগর ব্যাণ্ডরা। বম্বে বরদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ধারে সহর; ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের বাস। এই ব্যাণ্ডরায় সমুদ্রের ধারে সেণ্ট মেরির গির্জ্জায় যীশুর মাতা মেরির প্রতিমূর্ত্তি আছে। বড় জাগ্রত দেবী। স কাহিনী শুনিবার যোগ্য।

এমন মনোরম স্থান সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাণ্ডরায় ছোট ছোট দুইটি পাহাড় আছে, ব্যাণ্ডরা আর পালী, একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে, যেখানে ব্যাণ্ডরা পাহাড় প্রায় শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ঠিক সমুদ্রের ধারে গির্জ্জা। রেলগাড়ীতে বসিয়া অনেক দূর হইতে দেখা যায়। দূর হইতে দেখিতে অনেকটা কলিকাতার জোড়া গির্জ্জার মত, সেই রকম দুইটা চূড়া আছে,

কিন্তু কাছে আসিলে আর সে সাদৃশ্য থাকে না। কারণ, সেণ্ট মেরির গির্জ্জার চূড়া ফাঁক ফাঁক, জোড়া গির্জ্জার মত অত ঘেঁষাঘেঁষি নয়, আর কলিকাতার গির্জ্জার অপেক্ষা ছোট হইলেও অত্যন্ত সুন্দর, দাঁড়াইয়া দু' দণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে। ব্যাণ্ডরার গির্জ্জা রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের, ইহাদের প্রার্থনা মন্দিরে আর প্রটেষ্টেণ্টদের প্রার্থনা মন্দিরে একটা প্রভেদ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়, কাথলিক মন্দিরের গঠন - প্রণালী প্রটেষ্টেণ্টদের অপেক্ষা প্রায় অধিক নয়নরঞ্জন হয়; আর শিল্প ও কারুকার্য্য অধিক।

মন্দিরের সম্মুখেই সমুদ্র, আরব্য সমুদ্রের অসীম বিস্তার। সে দৃশ্য দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতেই হয়, চক্ষু ফিরান যায় না। মন্দিরের নীচে গাড়ী, মোটর যাইবার পথ; তাহার

গির্জ্জার বেদী।

অতি অল্প দূরেই সমুদ্র, ব্যাণ্ডরার তিন দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মাদ্রাজে যেমন চমৎকার সৈকত, প্রশস্ত বালির তীর, তাহার মুক্ত সমুদ্রের ক্ষুব্ধ গাঢ় নীলিমা, বোম্বাই কিংবা বাণ্ডরার নিকটে সে রকম নয়। এখানে যাহাকে ইংরাজিতে back-water বলে, তাহাই, অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত জলের ভিতর বড় বড় প্রস্তর এবং নীচু পাহাড়ের মত আছে, তাহাতে সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ হইয়া যায়, জলেরও সেরূপ নীলবর্ণ থাকে না। তীরের কাছে জাহাজ কিংবা বড় নৌকা আসিতে পারে না, ষ্টীমার তিন চার ক্রোশ দূর দিয়া যায়। বর্ষাকালে সমুদ্রের রুদ্রমূর্ত্তি আর পর্ব্বতাকার তরঙ্গ আর ফেনের মালা ঠিক এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, বাহির সমুদ্রে গিয়া পড়িলে তবে
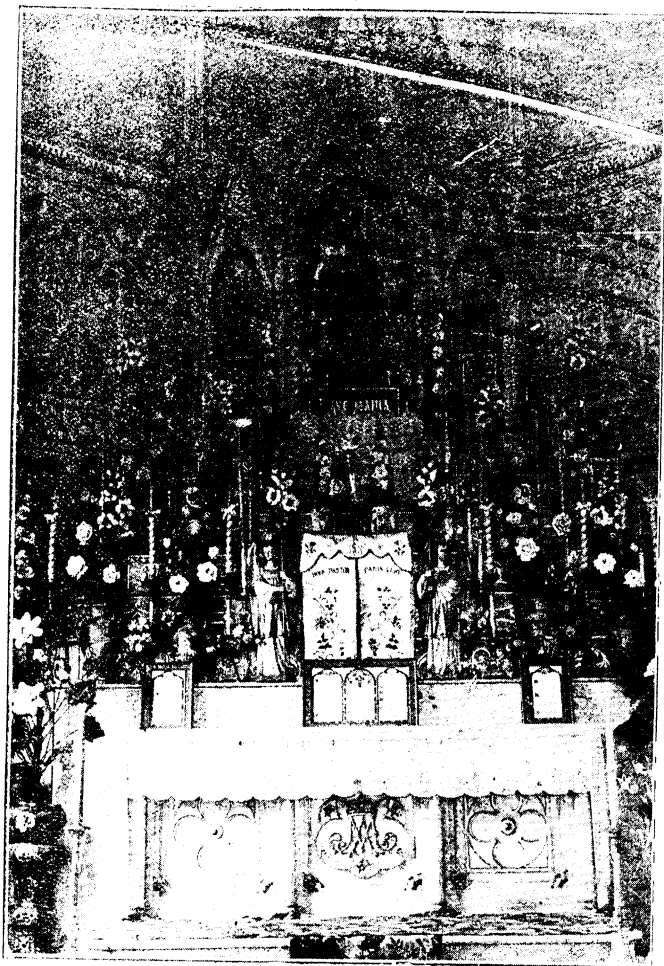
দেখা যায়। কিন্তু যেমন অবস্থাতেই হউক, সমুদ্রের মূর্ত্তির তুলনা কোথায়, আর সে মূর্ত্তি দেখিয়া কখন কি তৃপ্তি হয়? কখন সৌম্যরূপ, শান্ত, স্নিগ্ধ আকাশের মুকুরের মত, কখন আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া ভীমগর্জ্জন, লক্ষ লক্ষ তরঙ্গরূপ মস্তক তুলিয়া, ফেনশুভ্রকেশে যেন পৃথিবীকে গ্রাস করিতে আগমন!

এই খৃষ্টান মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া, সমুদ্রের বিশাল চঞ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। এই অগাধ অনন্ত সলিলরাশি, এই তরঙ্গের অবিশ্রান্ত আকুঞ্চন-প্রসারণ, এই নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ-গম্ভীর শব্দ কাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে? আর এই সমুদ্র-তীরে, এই শোভন পবিত্র মন্দিরে শত শত নরনারী মধুরকণ্ঠে কাহার যশোগান করিতেছে? একদিকে জড় প্রকৃতি আর তাহার পাশে চেতন-প্রকৃতি মানুষ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্ব-নিয়ন্তার বন্দনা করিতেছে।

পোর্টুগীজদের আমলে এই স্থানে রোমান কাথলিকদের একটি গির্জ্জায় মেরির মূর্ত্তি স্থাপনা হয়। সে সময় জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই মূর্ত্তির বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল না, কেবল খৃষ্টানরাই উপাসনার জন্য মন্দিরে যাইত। মুসলমানরা যেমন নিম্নজাতীয় হিন্দুদিগকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, পোর্টুগীজরাও সেইরূপ হিন্দুদের খৃষ্টান করিতেন। এখন পর্য্যন্ত বোম্বাইর আশে-পাশে চাষী, ধীবর প্রভৃতি নানা জাতি খৃষ্টান। তাহারা নামেই খৃষ্টান, কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার হিন্দুর মতই আছে, কালে-ভদ্রে কখন গির্জ্জায় যায়। যে সময় শিবাজী দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপন করেন, সেই সময় মারাঠা বর্গীরা এই প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। কিছুকাল পরে ব্যাণ্ড্রার এক জন ধীবর মাছ ধরিবার জন্য জাল ফেলিতে এই মূর্ত্তি জালে উঠে। নূতন মন্দির গঠন করিয়া মহাসমারোহের সহিত মেরির মূর্ত্তি আবার স্থাপন করা হয়। সেই সময় হইতে এই বিগ্রহের বিশেষ প্রতিষ্ঠা এবং জাগ্রত দেবী বলিয়া সকল জাতির অটল বিশ্বাস। সকল জাতির লোক এই দেবীর উদ্দেশে মানৎ করে, পূজা দেয়।

মেরির মূর্ত্তির মঞ্চ।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একটা মেলা হয়, নানা দেশ হইতে নানা জাতির লোক দেবী দর্শন করিতে আইসে। প্রকাণ্ড আম্রবাগানের ভিতর দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ। সেই পথে এক সপ্তাহ কাল মেলা বসে। কত দোকান-পসার সাজান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। প্রতিদিন লোকে লোকারণ্য, বোম্বাই হইতে ও অপর দিকে বীরার হইতে অনেক স্পেশেল ট্রেণ আইসে, লোকের ভিড়ে চলাচল কঠিন হয়। মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে মেলা আরম্ভ। বিপণির মধ্যে এক রকম দোকান সকলের নজরে

পড়ে। এই সকল দোকানে ছোট-বড়, সরু মোটা, বেঁটে-লম্বা নানা প্রকারের মোমবাতি বিক্রয় হয়। সেই সকল মোমবাতি ক্রয় করিয়া যাত্রীরা মন্দিরে দেবীকে অর্পণ করে। এই সকল দোকানে মোমের আরও কতকগুলা সামগ্রী রাখিবার কি উদ্দেশ্য, নূতন লোক হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারে না। ছাঁচে ঢালা মোমের শিশুর প্রতিমূর্ত্তি, মানুষের মাথা, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি এই সকল দোকানে সজ্জিত থাকে। ইহাই হইল মানৎ দিবার উপকরণ। কোন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, সন্তান কামনা করিয়া মানৎ

মাদ্রাজী খৃষ্টানদিগের শোভাযাত্রা।

রাখিয়াছে, মোমের শিশু ক্রয় করিয়া মন্দিরে উৎসর্গ করিবে। কাহারও বহুকাল ধরিয়া মাথাধরা রোগ, সে একটা মোমের মুণ্ড কিনিয়া দেবীকে অর্পণ করে। হয় ত কেহ হাতে কিংবা পায়ে বাত লইয়া ভুগিতেছে, মোমের হাত অথবা পা খরিদ করিয়া দেবীকে নিবেদন করে। স্ত্রীলোকরা ছেলে কোলে করিয়া ষষ্ঠীতলায় যেমন মাটীতে নগ্নদেহ শিশুকে রাখিয়া দেয়, দেবির মূর্ত্তির সম্মুখে সেইরূপ কোলের ছেলে-মেয়েকে পাতরের মেজের উপর শোয়াইয়া রাখে। অবিশ্রাম যাত্রীর স্রোত আসিতেছে, যাইতেছে, বিরাম নাই।

মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেখানে জাতি কিংবা ধর্ম্মের কোন বিচার নাই। জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই মানৎ রাখে; সকলেরই পথ অবারিত। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান সকলেই মানসিক করে, সকলেই দেবীকে কিছু না কিছু অর্পণ করে। কেহ যুক্তকরে নির্নিমেষ নয়নে দাঁড়াইয়া, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া জাগ্রত ক্ষেমঙ্করী দেবীর উপাসনা করিতেছে। এক দিকে বালক-বালিকারা দাঁড়াইয়া মধুর-কণ্ঠে স্তব-গান করিতেছে, আর এক দিকে কয়েক জন পাঠান ও পঞ্জাবী উৎফুল্ল নয়নে সুসজ্জিত মন্দির ও দেবীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। আর বাহিরে সমুদ্রের উদার বিশাল মহান্ প্রসার এবং দিগন্তব্যাপী আলস্য-শূন্য গম্ভীর ধ্রুপদ সঙ্গীত।

এমন স্থানে এমন সময়ে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয় যে, প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মে বিশ্বাস এক, দেবতা এক, বিশ্বব্যাপী বিরাট চৈতন্য এক, অখণ্ড, অপ্রমেয়, অব্যয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বন্যার কথা।

বন্যাপীড়িত স্থান সম্বন্ধে প্রথম বিবরণ প্রকাশের প্রায় ১ মাস পরে সরকার দ্বিতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে :—

কতকটা স্থানও প্লাবিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বত্র ক্ষতি একরূপ হয় নাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—বগুড়া জিলায় ২২ জন লোক ও রাজসাহীতে ১১ জন প্রাণ হারাইয়াছে—
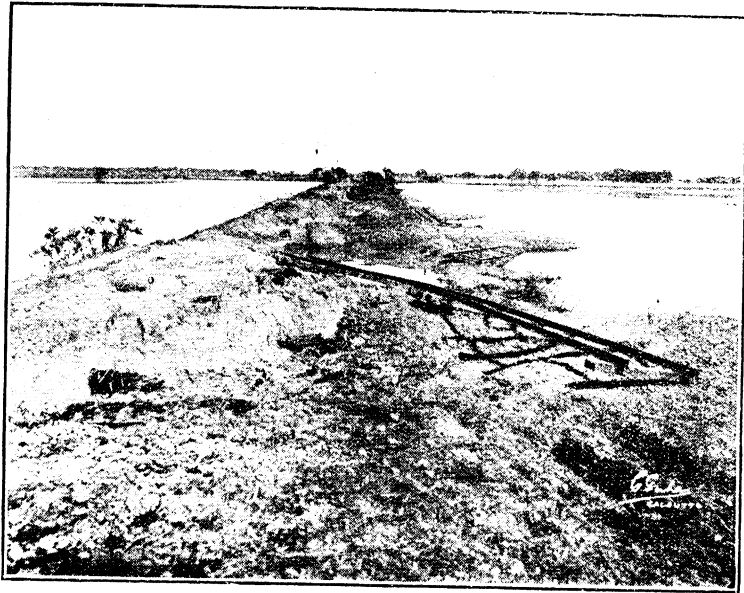
বন্যার জলস্রোতে শক্ত রেলের বাঁধের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাই উপরে দেখান হইল। জল লোহার রেলগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে।

যে সব স্থানে বন্যার প্রকোপ প্রবল, তাহা পরস্পরসংলগ্ন এবং রাজসাহী ও বগুড়া জিলাদ্বয়ে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। মোটামুটি দক্ষিণে নাটোর হইতে উত্তরে জয়পুরহাট পর্য্যন্ত বন্যায় পীড়িত হইয়াছে। বগুড়া জিলায় প্লাবিত স্থানের পরিমাণ ৪ শত ৭ বর্গমাইল এবং তথায় অধিবাসীর সংখ্যা—২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত ৬০। রাজসাহী জিলায় প্লাবিত স্থানের পরিমাণ ১২ শত বর্গমাইল এবং তথায় অধিবাসীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪ শত ৩৭। তদ্ব্যতীত পাবনায় প্রায় ৫০ বর্গমাইল স্থান এবং দিনাজপুর জিলায় বালুরঘাট মহকুমায় অন্য কোথাও মানুষের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বগুড়ায় সম্ভবতঃ ১০ হাজার গবাদি পশু ডুবিয়া মরিয়াছে এবং রাজসাহীর কালেক্টার প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার এলাকায় সম্ভবতঃ ১ হাজার ৪ শত গবাদি পশু মরিয়াছে। দিনাজপুরে বিনষ্ট গবাদি পশুর সংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৩৮ এবং পাবনায় বিনষ্ট পশুর সংখ্যা অতি অল্প। বগুড়ায় ও রাজসাহীতে বিনষ্ট গবাদি পশুর সংখ্যায় এই বৈষম্য অত্যন্ত অধিক এবং সে বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করা হইবে। তবে রাজসাহীর কালেক্টার বলিয়াছেন, তথায় যে সব স্থানে জমীর

উপর জল উঠে, সে সব স্থানে কৃষকরা বৃষ্টির আরম্ভেই গবাদি বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং তাহার পর আবার নূতন গবাদি ক্রয় করে। ধানের ফসলও নানাস্থানে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—ক্ষতি কোথাও শতকরা ৭৫ ভাগ, আবার কোথাও কম। গাঁজার ফসল প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক স্থানে লোক গৃহহীন হইয়াছে—যে সব ঘরের প্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত, সেই সব বাড়ীই অধিক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লোক গৃহহীন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সেবা সমিতি যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু এতগুলি লোকের গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহাদিগকে আসন্ন সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। আরও অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ প্রয়োজন, তাই করযোড়ে আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন, যাহার যাহা ইচ্ছা, এই সময় দান করিয়া নিরাশ্রয় গৃহহীনদের বাঁচাইবার উপায় করুন। পুরাতন কাপড়, চাউল, পয়সা যাহার যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন, সাদরে গৃহীত হইবে। এই

বন্যা-বিধ্বস্ত বাটীর আকার এই দৃশ্য। এই মহাশ্মশানে আবার কবে পল্লীর শ্যাম-শ্রী শোভা পাইবে, কে জানে?

এই বিবরণে দেখা যায়, প্লাবিত স্থানের লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। নিম্নে রাজসাহীর কালেক্টার ও স্থানীয় নেতৃগণের এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইল :—

রাজসাহী বন্যাপীড়িত সাহায্য-সমিতি।

সবিনয় নিবেদন ;—

আপনারা জানেন যে, রাজসাহী জিলার উত্তরাংশ ও বগুড়ার প্রায় এক তৃতীয়াংশ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। চারি কোটি টাকার উপর বিষয় নষ্ট হইয়াছে" ও ১০ লক্ষ

জন্য আমরা আজ আপনাদের দ্বারস্থ। আজ রিক্তহস্তে ফিরাইবেন না। দিয়াছেন বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন না। মনে রাখিবেন, একখানি পুরাতন কাপড় বা অর্দ্ধসের চাউলও আজ মহামূল্য। তাহা দিয়া একটি প্রাণীর একদিনের জন্যও প্রাণরক্ষা হইবে। দয়া করিয়া টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। রাজসাহী ১লা কার্ত্তিক। ১৩২৯ সাল।

আর, এন, রিভ ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট (সভাপতি) শ্রীকুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জ্জি, মৌলবী এমানুদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ

দাসগুপ্ত, শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীকেদারেশ্বর আচার্য্য, শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশী (সম্পাদক) (রাজসাহী)

যে স্থলে ১০ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে সরকারী সাহায্য এইরূপ:—

(১) অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বগুড়ায় ৭ হাজার এবং রাজসাহীতে ৮ হাজার লোককে প্রতিদিন সাহায্য দান করা হইয়াছে। এখন কেবল বিধবা, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতিকে তদ্রূপ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। স্থির হইয়াছে, বগুড়া ও রাজসাহী জিলাদ্বয়ে লোককে ৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিলেই চলিবে। পাবনায় ৩০ হাজার টাকা ও দিনাজপুরে ৫ হাজার টাকা যথেষ্ট হইবে। ভগ্ন গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্র ও গবাদি পশুর খাদ্য বাবদে বগুড়ার কালেক্টার ২৫ হাজার টাকা চাহিয়াছেন। সরকার ৪ হাজার টাকা দিয়াছেন—অবশিষ্ট তথায় সংগৃহীত হইতে পারিবে। রাজসাহীর কালেক্টার ৫৮ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা চাহিয়াছেন। দিনাজপুরের জন্য ৫ হাজার ও পাবনার জন্য ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

লোকের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নে মিসেস লীর একখানি পত্রের অনুবাদ প্রদান করিলাম। ইঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং ইনি সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্লাবনপীড়িত স্থান হইতে স্বামীকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন:—

সান্তাহার কেন্দ্র হইতে বগুড়ার পথে আদমদীঘির পরেই নসরৎপুর। এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামই বন্যার নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। নসরৎপুরের অধিবাসীরা স্থানীয় কেন্দ্রে সাহায্য লইতেছে। হুঁকা-হাতে ষ্টেশন-মাষ্টার বরদা বাবু; ইনি রিলিফ কমিটিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন।

"প্রভাতালোকবিকাশের পূর্ব্বেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল—তখনই বিপন্ন ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশার দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল—আমি আর ঘুমাইতে পারিলাম না। মনে পড়িল—নগ্ন নারীদের কথা। তাহাদের শয্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা ভাসিয়া গিয়াছে—Naked women their bedding destroyed or washed away, তাহাদের কুটীরে কোমর অবধি জল। তাহারা চাউল রাখিতে পারে নাই।—They

could not save their rice, স্থানে স্থানে তাহাদের রন্ধনের মৃৎপাত্রও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন অনেকে জ্বরে কাতর। কোথাও কোথাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুরুষরা স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে স্থানে চাউল বিতরিত হইতেছে, তাহারা অনেকে সেই সব স্থানে আসিয়াছে। আমার কেবল মনে হইতে লাগিল, শিশু ও বালকবালিকাদিগের জন্য আমাদের কাছে যদি এক বস্তা মোটা কাপড় ও গরম কুর্ত্তা থাকিত! আমার মনে হয়, আমি কখন এত শিশু দেখি নাই। আচ্ছাদনের অভাব হইলেও এখনও তাহাদের অনেককে সুস্থ দেখাইতেছে—কারণ, জননীরা সন্তানের শুশ্রূষায় কাতর নহে; তবে কেহ কেহ আর সন্তান পালন করিতে পারিতেছে না। আমার মনে হইতেছে, আমি আর কখন গৃহের আরাম ও বিলাস উপভোগ করিতে পারিব না—(তাহাতে রুচি হইবে না)। যখন এত লোক অনাহারে আছে, তখন আবশ্যকাতিরিক্ত দ্রব্য কিনিয়া অর্থ নষ্ট করা বা সাধারণ খাদ্যের অধিক কোন খাদ্যে অর্থ ব্যয় করা পাপ বলিয়া মনে হয়। এ জিলায় চাউল-ধোয়া জল বা খুঁড়াও কেহ ফেলিয়া দেয় না।"

সিংড়া হইতে তিনি আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন:—

"এক স্থানে সমগ্র গ্রাম সমভূম—গৃহশূন্য হইয়াছে, আর ৬টি পরিবারে প্রায় ৩৫ জন লোক আহার্য্য ও বস্ত্রশূন্য হইয়াছে। ভগ্নস্তূপ হইতে তাহাদের পুরাতন লেপ ও বস্ত্রাদি বাহির করিতে হইল। তাহাদের চাউল ভাসিয়া গিয়াছে। জ্বরে কাতর অবস্থায় তাহারা তাহাদের ভগ্নগৃহের আর্দ্র ভূমিতে পড়িয়া আছে। যেখানে যাই, সেখানেই কাতর ক্রন্দন—আসিয়া দেখ, আমাদের বাড়ী নাই—চাউল জলে পচিতেছে। গত ২ দিন আমরা মাইলের পর মাইল ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতেছি—যেন সমুদ্র, আমাদের তরণীতে তরঙ্গাঘাত হইতেছে। স্থানে স্থানে জল ১০ ফুট গভীর। কোন গৃহশূন্য নারী আমাকে বলিল, সে সারারাত্রি ৩টি ছেলে লইয়া একটি দীপ জ্বালাইয়া বসিয়া ছিল—পাছে সাপ আসে।"

যাঁহারা এক কালে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহারাও এই ভাবে কোন রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া লইয়াছেন। রেলের বাঁধে উঁচু জায়গায় এই কুঁড়েগুলি তৈয়ার করা হইয়াছে।

ইহার পর কি আর বলিবার কিছু থাকিতে পারে?

সান্তাহার হইতে শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন, মহাদেবপুর থানার এলাকায় ইন্দাই গ্রামে ১ জন লোক খাইতে না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"মৃত মুক নস্য দিন-মজুরী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। বন্যায় তাহার বাড়ী নষ্ট হইয়া যায় এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোন উপায় থাকে না। তাহার স্ত্রী ধান ভানিয়া খাইত, সে-ও অনাহার অবস্থায় পতিত হয়। মুক নস্যের পরিবারে ৬ জন লোক ছিল। খাদ্যাভাবে পরিবার-বর্গকে উপবাসী দেখিয়া হতাশ হইয়া সে নিজ জীবন শেষ করিবার ইচ্ছা করে ও ১৯শে অক্টোবর রাত্রিতে গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করে।"—অবস্থা কিরূপ হইলে লোক এরূপ কায করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এক জন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

"রাজসাহী জিলার গোবিন্দপাড়া গ্রামের রণাই প্রামাণিকের স্ত্রী অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে স্বামী ও ছেলে-মেয়ের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পিতা রণাইও ছেলে মেয়েকে ভরণ-পোষণ করিতে না পারায় তাহার একমাত্র ৬ বৎসর বয়স্কা মেয়েকে স্থানীয় আলী প্রামাণিকের হস্তে চিরতরে দান করিয়াছে।"

এইরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

যে স্থলে ১০ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সেই স্থলে সরকারী সাহায্য—দানে ও ঋণে সর্ব্বপ্রকারে যদি ১০ লক্ষ টাকা হয়, তবে দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের অংশে এক টাকার অধিক পড়ে না। যে সরকার বিবাহিত গৌরাঙ্গ সার্জ্জেণ্টদিগের বাসগৃহের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে পারেন এবং টাকার অভাবে আমোদ-প্রমোদের উপরও কর বসাইয়া দেশের লোকের জীবন আনন্দহীন করিতে বাধ্য হয়েন—সে সরকারের এই ব্যবস্থায় কি দেশের লোকের বলিবার কোন কথা নাই? এক দিকে ব্যবস্থাপক সভার জন্য বিলাত

শকুনির গো মহিষাদি ভক্ষণ।

হইতে সভাপতি আমদানী করা, আর এক দিকে বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত ১০ লক্ষ লোকের জন্য গড়ে বড় জোর ১ এক টাকা বরাদ্দ করা—এতদুভয়ের সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে সম্ভব হয় ?

বাঙ্গালার গভর্ণর এই বিপদের সময় যদি প্লাবন-পীড়িত স্থানে আসিয়া স্বয়ং প্রজার অবস্থা লক্ষ্য করিতেন, তবে বোধ হয়—তিনি এরূপ ব্যবস্থার সমর্থন করিতে পারিতেন না। কারণ, বিলাতে এক জন লোকও অনাহারে প্রাণ হারাইলে, তাহা সরকারের পক্ষে কলঙ্ক বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তিনি তখন প্লাবন-পীড়িত স্থানে গমন করেন নাই। তাঁহার শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ বলিয়াছেন—সে কাযের দায়িত্ব গভর্ণরের নহে—তাঁহার। কিন্তু তিনি কি করিয়াছেন ? তিনি একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি স্থানে গিয়াছিলেন মাত্র। প্রথমে তিনি বলিয়াছিলেন, সরকার অর্থের অভাবের দিনে মিনিষ্টার মেম্বারের মোটা মাহিয়ানা চালাইলেও খয়রাতি প্রতিষ্ঠান নহে,—not a charitable institution যে, অকাতরে অর্থ দান করিবেন। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, সরকার যতক্ষণে কালেক্টারদিগের সঙ্গে লিখালিখি করিতেছিলেন, ততক্ষণে দেশের লোক আপনাদের ভ্রাতা-ভগিনীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অগ্রণী করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সে অবস্থায় সরকার প্রতিযোগী অনুষ্ঠান করিলে কি এই গণতন্ত্রের যুগে নিন্দিত হইতেন না ? প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কথা বলিবার কারণ—কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সওদাগরসভা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সরকার টাকা লওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা চাঁদা দেন নাই। তবে দেশের লোক সাহায্য দিতেছেন বলিয়া সরকারের পক্ষে পাশ কাটান কিরূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরিচায়ক ? যে সরকার সর্ব্বদাই বলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া যে দায়িত্ব পাইয়াছেন, তাহা কিছুতেই ত্যাগ

একখানি বিধ্বস্ত গ্রামের শত শত করকেট-টিনের ঘর ভাসিয়া যাইতেছে।

করিবেন না, সে সরকারের পক্ষে প্রস্তারক্ষার সময় প্রতিযোগিতায় অনিচ্ছা বিস্ময়কর নহে কি?

মহারাজাধিরাজ গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা এ কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার অপেক্ষা বিদ্যায়, জ্ঞানে, বয়সে ও সম্ভ্রমে বড় শ্রমিক নেতা মিষ্টার কিয়ার হার্ডিকে শ্বেত সর্দ্দার কুলী বলিয়াছিলেন; মিষ্টার হার্ডির "অপরাধ" তিনি বলিয়াছিলেন—"—The time had come for the crown to be thrown into the melting pot" তিনি সরকারকে কড়া আইন করিয়া এ দেশে পাশ্চাত্যভাবের প্রবাহপথ রুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন—"If this socialism permeated among the masses of India and took a deep root there, no amount of loyal zamindars or loyalists would be able to do anything, for things would be too advanced, their own prestige would be gone by then."—ইত্যাদি। ইংরাজী বিশুদ্ধ না হইতে পারে; কিন্তু ভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

সরকার যখন পূর্ব্বোক্তরূপ সাহায্যই দিবেন, তখন দেশের লোককে সাহায্যদানে শিথিলপ্রযত্ন হইলে চলিবে না। কারণ, এখন শীত পড়িয়াছে—গৃহ নির্ম্মাণের ও আচ্ছাদন বস্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজন। আবার মাঘ মাস হইতে ধান্যের অভাবে বিষম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা। এবার বন্যায় দেশের লোক যেরূপে বিপন্ন স্বদেশবাসীর সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি। নানা সমিতি সাহায্যকার্য্যে—সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন ফ্লাড রিলীফ কমিটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্যাদির পরিমাণ এইরূপ:—

ভিক্ষাদান।

অর্থ	...	৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭ শত ৪৩ টাকা, ১৩ আনা, ২ পাই ;
চাউল	...	২ হাজার ৫ শত ৬৫ মণ,
নূতন কাপড়	...	১৩ হাজার ৩ শত ৮১ খানা ;
পুরাতন কাপড়	...	৪২ হাজার ৪ শত ৪৩ খানা ;
অন্যান্য অঙ্গাবরণ	...	৩৬ হাজার ৩ শত ৫৬টি।

ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছে :—

চাউল	...	২ হাজার ৩ শত ২০ মণ ;
নূতন কাপড়	...	৮ হাজার ৮ শত ৩ খানা ;
পুরাতন কাপড়	...	৩৭ হাজার ৫ শত খানা ;
অন্যান্য অঙ্গাবরন	...	২০ হাজার ৬ শত ৫০ খানা।

গবাদি পশুর জন্য ভূষী ও কৃষিকার্য্যের জন্য বীজও পাঠান হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম্মী কর্ম্মীরা যে কেন্দ্রে সাহায্য দিতে গিয়াছিলেন, সে কেন্দ্রে বর্ত্তমানে সাহায্যের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা এই কথা বলায় কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আর কোথাও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। মিশনের কর্ম্মীরা এমন কথা বলেন নাই যে, কোথাও আর সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পরন্তু তাঁহারা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাঘ মাসের পর—আশু ধান্য ফুরাইয়া গেলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। তাহা হইলে তখন আবার সাহায্যদান বিশেষ প্রয়োজন হইবে। সে জন্যও এখন হইতে প্রস্তুত থাকা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

মূল কথা, ১০ লক্ষ গৃহহীন লোকের গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিতে হইবে এবং আগামী ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব লোককে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এ কাযের জন্য কিরূপ অর্থের, কিরূপ আয়োজনের ও কিরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাযেই এখন হইতে সে জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে এবং আয়োজন বিষয়ে প্রযত্ন শিথিল করা হইবে না। সরকারের পক্ষে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ আপনাদের শৈথিল্য সমর্থনের জন্য দেশের লোকের যে কাযের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই দেশের লোকের শক্তির ও প্রকৃত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে সুপ্ত শক্তি, ইহাকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং এই যে প্রকৃতি, ইহারই অনুশীলন করিতে হইবে। তবেই জাতি প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়া জাতিসঙ্ঘে আপনার প্রকৃত স্থান লাভ করিবে। পরমুখাপেক্ষিতার পরিহার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে কেন্দ্রস্থ হইয়া স্বাবলম্বন করিতে হইবে। বাঙ্গালার এই বন্যায় বাঙ্গালী যদি তাহা বুঝিতে পারে, তবে তাহার এই দুঃখকষ্টভোগ ব্যর্থ হইবে না এবং তাহার দুর্দ্দশার পঙ্কেই তাহার সৌভাগ্যের শতদল মূল বিস্তার করিয়া ভবিষ্যতে অজস্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইবে। উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত বিধ্বস্ত গৃহ গ্রামের উপর কি ভবিষ্যতে সেই শুভ দিনের সূর্য্যালোক-বিকাশ-সূচনা—তরুণ-অরুণ-কিরণ-প্রকাশে দেখা যাইতেছে?

আর্য্যাবর্ত্ত।

নিম্নে অই মহাসিন্ধু সর্ব্বরত্নখনি,
কুবেরের কোষাগার, লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জ্বলে কোটিমণি।
ঊর্দ্ধে অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্যারন্ধধারা বার মাস
অই মন্দাকিনী—চিরধ্রুবের-জননী
মহাযোগধারা, এই ভস্ম-সঞ্জীবনী
স্বর্গে মর্ত্তে, অনিত্যে ও নিত্য সনাতনে,
শ্রেয়ে প্রেয়ে গৌরীহরে, লক্ষ্মীনারায়ণে,
শক্তিকর্ম্ম ভক্তিজ্ঞানে যোগ সম্মিলনী।
ইহপরত্রের মহামিলন-নিলয়
এই আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বদ্বন্দ্বসমন্বয়।
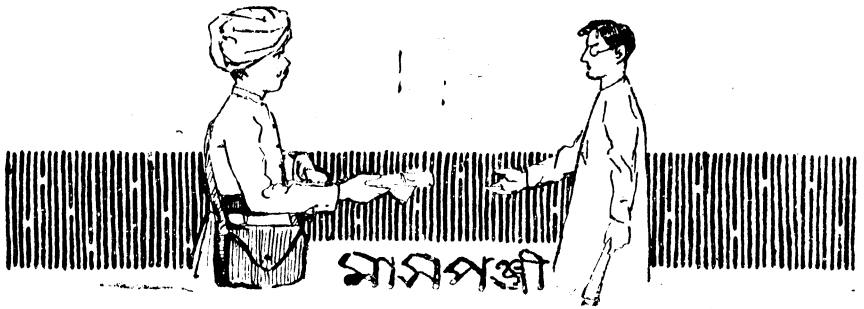
শ্রীকালিদাস রায়।

১লা ভাদ্র—

গভর্ণর-গমনে গন্ধী পুণ্যাহে পাবনায় বিনা পাশে শোভাযাত্রা বন্ধ, ১৪৪ ধারার সাহায্যে পিকেটিং, বক্তৃতা ও স্বেচ্ছাসেবকের কায বন্ধ। বোম্বায়ের জমিয়ৎ-উলেমা সভার সভাপতি মৌলানা সিদ্দিকির মীরাট জেলে প্রায়োপবেশন। কলিকাতায় খদ্দর প্রচার-সমিতির উদ্যোগে খদ্দর মেলা। হুগলী জেল সম্বন্ধে অভিযোগ—কারা-বিভাগের ডি-আই-জিকে রাজনীতিক কয়েদীরা সেলাম না করায় চার জনকে দাঁড়া-হাতকড়া; কয়েদীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিকূলতা; কর্তৃপক্ষের টানাটানিতে কয়েক জন জখম; এক জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁহাকে নাকি মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

২রা ভাদ্র—

বর্দ্ধমানে পিকেটিং বন্ধের জন্য ১৪৪ ধারা। আমেদাবাদ, নাদিয়াদের মিউনিসিপ্যালিটী সরকারের নিকট হইতে পূর্ব্বতন মিউনিসিপাল স্কুলগুলির ভার-গ্রহণে অসম্মত; নির্ব্বাচিত ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জনের পদত্যাগ। কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীট ও বৃন্দাবন বসাক লেনের মোড়ে দিনদুপুরে রাহাজানির চেষ্টা; কনষ্টেবলের সামান্য আঘাত ও আহত সরকারের হাঁসপাতালে মৃত্যু।

৩রা ভাদ্র—

সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষ হইতে কারামুক্ত দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে মির্জ্জাপুর পার্কে অভিনন্দন; পল্লী-মফঃস্বলেও দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন-অনুষ্ঠান। গবর্ণর-গমনে রাজসাহীতে হরতাল। দিনাজপুর কংগ্রেসের উদ্যোগে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে চরকায় সূতা কাটার প্রতিযোগিতা। আনাটোলিয়ায় ইসমিদ অঞ্চলে তুর্কী সেনার সংখ্যাবৃদ্ধি।

৪ঠা ভাদ্র—

অমৃতসহরে কাউন্সিল বয়কটের আন্দোলন। বাজাজ ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত দেড় লক্ষ টাকা হইতে উৎকল কংগ্রেস কর্ত্তৃক খদ্দর আন্দোলনে ২৯ হাজার টাকা অর্থসাহায্য। বিলাতে ব্ল্যাকপুল নামক স্থানে কাপড়ের কলের মজুরদের সভায় ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের জন্য চাঞ্চল্য; সভার মতে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্কে আইরিশ সিনফিনদের গচ্ছিত ২৩ লক্ষ ডলার আইরিশ সরকারের প্রার্থনায় ব্যাঙ্কেই আটক রাখিতে অনুমতি।

৫ই ভাদ্র—

দুঃখ প্রকাশ করায় রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে "বন্দে মাতরমে"র অব্যাহতি। লাহোর জেলার হুন্দিয়ারা গ্রামে সাজাই পুলিসের কর আদায়ে আকালী শিখ, কংগ্রেস সদস্য, রাজদ্রোহ সভা আইন অনুসারে দণ্ডিত ব্যক্তি প্রভৃতিদের উপর গুরু করভার। লাহোর পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রে কর্ত্তৃক স্থানীয় বন্দে মাতরম্ পত্রের বিরুদ্ধে সাত হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালিশ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দেশ-বন্ধু দাশ মহাশয়ের প্রস্তাব;—খাদী প্রস্তুত করা ব্যবসার জন্য নহে, আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য; কারখানা দুর্নীতির পরিচায়ক। পাবনা, চরখলিলপুরে প্রজার উপর পুলিসের গুলী; কয়েক ব্যক্তি আহত। গুরুবাগের স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া শিখদের ধর্ম্ম-সভা শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সহিত তীর্থের মোহান্তের বিবাদ; আগষ্ট মাসের প্রথমে গুরুবাগস্থিত পাঁচ জন আকালী কাঠের অভাবে বাগানের গাছ কাটিতে গিয়া মোহান্তের অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় শিখগণের সত্যাগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-বাগের বাগানে গাছ কাটা; মোহান্তের অভিযোগে গুরুবাগে পুলিস প্রেরণ ও দলে দলে শিখ সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার। ভূপ্রদক্ষিণকারী বৈমানিক দলের কাপ্তেন ম্যাকমিলান ও ম্যালিন্স আকিয়াব যাইবার পথে নোয়াখালী জেলার এক চরে এঞ্জিনের গোলযোগে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হন; তাঁহারা ২রা তারিখ কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, পথে কয়দিন নিরুদ্দেশ অবস্থায় ছিলেন; বৈমানিক দলের কর্ত্তা মেজর ব্লেক অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় হাঁসপাতালে। মান্দ্রাজে পেদ্দাপুর তালুকে এক দল বিদ্রোহীর আবির্ভাব; তাহারা পুলিস থানা হইতে অস্ত্র-শস্ত্র লুঠ করিতেছে। ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার দিবার বিষয়ে বৃটিশ কলম্বিয়ান গবর্ণমেণ্টের মনোভাবে শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মনোভঙ্গ। আইরিশ বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে সরকারী সৈন্যের সকল নগরের উদ্ধার; বিদ্রোহীদের গরিলা যুদ্ধ।

৬ই ভাদ্র—

বারদলৈয়ের ১১০ জন অসহযোগীর পানামা-গমনে সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাধা। গুরু-বাগ ব্যাপারে তিন জন শিখ নেতার কারাদণ্ড; তীর্থ-স্থান পুলিসের দখলে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ লয়েড জর্জ্জের সিভিলিয়ান বক্তৃতার আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

৭ই ভাদ্র—

পঞ্জাবের কারা-বিভাগের প্রধান কর্ত্তার নিকট মণ্টগোমারীর শিখ সভার রাজনীতিক বন্দীদিগকে ভাল খাদ্য দিবার প্রার্থনা; প্রজার করভার-বৃদ্ধির আশঙ্কায় উহা অগ্রাহ্য। সুরাটে সরকার মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ায় টেক্স বন্ধের আন্দোলন। তিন দিনে গুরু-বাগে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১০, গ্রেপ্তারের সময় প্রহার আরম্ভ। মোপলা সাহায্য-ভাণ্ডারে আফগান আমীরের হাজার টাকা দানের সংবাদ। বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোপীনাথ ঘোষের লোকান্তর। লক্ষ্ণৌয়ে চৌকীদার হত্যা মামলার আসামী ইটনের ফাঁসীর পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা।

৮ই ভাদ্র—

পীর বাদশা মিঞার মুক্তি উপলক্ষে ১৪৪ ধারায় সিরাজগঞ্জে শোভাযাত্রা বন্ধ। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তৃক আদেশ অমান্য। কলিকাতায় হ্যালিডে পার্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর পক্ষ হইতে পীর বাদশা মিঞা

ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৌলবী আবদুল করিমের—কারামুক্ত নেতা তিন জনের অভিনন্দন। পটুয়াখালীর জননায়ক নবীনচন্দ্র সেন গুপ্তের লোকান্তর। অমৃতসরে গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি, পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সর্দ্দার বাহাদুর মহাতব সিং ও কমিটীর আর সাত জন সদস্য, শিখদিগকে বে-আইনী জনতা ও অন্যান্য অপরাধ-জনক কায করিতে উত্তেজনা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার। বাখরগঞ্জের নাজিরপুর থানায় সেখ মাটিয়া গ্রামে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারি উপলক্ষে সশস্ত্র পুলিসের গমন; সশস্ত্র গ্রামবাসীদের সহিত সংঘর্ষ; পুলিসের গুলীতে দুই জন নিহত ও ৫ জন আহত; পুলিসের আঘাত অল্প। কটকে বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক শ্রীযুত ইউ এন্ চক্রবর্ত্তী বি এ, (লণ্ডন); ইনি য়ুরোপ মার্কিণ মুলুক প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছেন এবং ২৫ হাজার মাইল পথ হাঁটিয়াছেন; মাদ্রাজ ও সিংহল হইয়া এখন আফ্রিকা যাইতেছেন। বলশেভিক সাহিত্য প্রচারে মাদ্রাজে নীলকান্ত ব্রহ্মচারী গ্রেপ্তার। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালার জেলা বোর্ড সমূহকে দুই লক্ষ টাকা দান বা ঋণের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত। অষ্ট্রীয়ার আর্থিক দুরবস্থার জন্য জার্ম্মাণীর সহিত তাহার মিলনের কথা; একদিকে ফ্রান্সের ও অপর দিকে ইটালীর আপত্তি।

৯ই ভাদ্র—

মাদ্রাজ সরকার লঘু দণ্ডে দণ্ডিত ৮০০ মোপলাকে মুক্তি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মাদ্রাজে নূতন কালা-পাহাড়ের কারাদণ্ড; দেব-দেবীর শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য সে বহু মন্দির পুড়াইয়া দিয়াছে ও অনেক বিগ্রহও নষ্ট করিয়াছে। বি এন ডবলিউ রেলওয়ে য়ুনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মিলারের চার মাস কারাদণ্ড-ভোগের পর মুক্তি। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর কতক অংশ কর্ত্তৃক গো-হত্যা বন্ধের প্রস্তাব পরিত্যক্ত; আইনের বদলে মুসলমান সমাজের সহানুভূতির উপর নির্ভর। উত্তর-চীনের শাসনকর্ত্তা জেনারেল উ পেই-ফু দক্ষিণ চীনকে পরাভূত করিয়া বিরাট সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১০ই ভাদ্র—

দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত। সিরাজগঞ্জে পীর বাদশা মিঞার গমনে ঢাকার এক গায়কের প্রতি ১৪৪; শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় গান বন্ধ। পঞ্জাব সরকার গুরুদ্বারের মূল সমস্যার সমাধান জন্য আইন প্রস্তুত করিতেছেন। আনাটোলিয়ায় গ্রীসের বিরুদ্ধে কামাল পাশার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ; প্রথমে ইসমিদ আক্রমণ।

১১ই ভাদ্র—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বরিশাল জেলের বেত্রদণ্ড প্রসঙ্গ; সরকার পক্ষের উত্তর—জেলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে দিয়া বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা বন্ধ করা যায় না। লাহোরের ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক বন্দেমাতরম ওয়াল জমায়েৎ পত্রের নামে সাত হাজার টাকার দাবীতে মানহানির নালিশ। গৌহাটীর মৌলবী নুরুল হক খেলাফৎ আইন অমান্য তদন্ত সমিতির সদস্যদিগকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ায় পুলিস কর্ত্তৃক তাঁহার বাটী খানাতল্লাস হওয়ার সংবাদ। পুরীতে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের অভিযোগে তিন জন নামজাদা লোক গ্রেপ্তার; একজন ডাক্তার, এম বি। গুরু-বাগ যাইবার পথে নানা স্থানে পুলিস প্রহরী মোতায়েন; পাঞ্জাব কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অধ্যাপক রুচিরাম সাহানি ও আর এক প্রতিনিধির গুরু-বাগ-গমনে বাধা; গ্রেপ্তারী আসামীদের ধর্ম্ম-সঙ্গীত-গানে বাধা, মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল; খালসা কলেজের অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং ও তাঁহার ভ্রাতা গুরু-বাগ যাইবার পথে প্রহৃত হইয়াছেন। মাদ্রাজে যুবরাজ-গমনে ঘর-বাড়ী পুড়াইয়া দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ১৬ জন আসামীর প্রমাণাভাবে মুক্তি। তুর্কী বীর আনোয়ার পাশার মৃত্যুর জনরব নানা সূত্রে মিথ্যা সাব্যস্ত। ইরাকে আমীর ফয়জুলের রাজ্যাভিষেকের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মেসোপটেমিয়াস্থিত বৃটীশ হাই কমিশনার রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া তথায় একটি কক্ষে বৃটীশ বিদ্বেষসূচক বক্তৃতাদি শুনিতে পান; তাহার ফলে রাজার নিকট রাজ-কঞ্চুকীর পদ-চ্যুতির ও ক্ষমা-প্রার্থনার দাবী।

১২ই ভাদ্র—

কংগ্রেসের ও খেলাফতের আইন অমান্য তদন্ত কমিটীতে মডারেট প্রভৃতিদের সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া বিহারের সরকারী প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক এই সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুকূল মত সংগ্রহের জন্য স্থানীয় রাজ-নীতিকদের আহ্বানের সংবাদ। জেলখানায় অসহযোগী বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাগযুদ্ধ; সরকার পক্ষের সাফ জবাব—সপারিষদ গবর্ণরের অনুমতি লইয়াই বরিশালে বেত মারা হইয়াছিল। তুর্ক গ্রীক যুদ্ধে তুর্কীদের অফিউম-কারাহিসার দখল; ভীষণ সংগ্রাম। ইরাকে বৃটীশ বিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কে বাণিজ্য-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জাতীয় দলের ছয় জন নেতার গ্রেপ্তার ও বাগদাদ হইতে বহিষ্কারের আদেশ; বাগদাদের দুইখানি সংবাদপত্র বন্ধ ও তাহাদের সম্পাদক দুই জনকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা; জাতীয় দল ও ধীরপন্থী রাজনীতিকদিগকে দমনে রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান-গুলি বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ; ওদিকে হাই কমিশনারের দাবী অনু-সারে রাজার দুঃখ-প্রকাশ ও কঞ্চুকী পদচ্যুত; এই সকল ব্যাপারের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও পদত্যাগ।

১৩ই ভাদ্র—

চট্টগ্রামের কর্ম্মবীর শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি। অমৃতসরে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী ও আকালী দল অফিসে খানাতল্লাস; অফিস দুইটির কতকগুলি ঘর পুলিস কর্ত্তৃক তালাচাবী বন্ধ। পাবনায় চান্দাইকোণায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অভিযোগে ১২ জন আসামীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড; দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল। আসাম লাট স্যার উইলিয়ম ম্যারিসের যুক্তপ্রদেশের মসনদে স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা। মোপলা ট্রেণ বিভ্রাটের তদন্ত সমিতির রিপোর্টে ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত; কয়েদী চালানে মালগাড়ী ব্যবহার আপত্তিজনক না নির্ম্মম নয়; তবে কয়েদীদের রক্ষী সার্জেন এণ্ড্রুজের ত্রুটী হইয়াছিল; আদালতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে। তুর্কীদের ইসমিদ দখল।

১৪ই ভাদ্র—

গুরু-বাগের চতুর্দ্দিকে গ্রামগুলিতেও পুলিসের অনাচার; গুরু-বাগের পথে ৬০ জন নিদ্রিত আকালীর উপর লাঠী ও সঙ্গীনের খোঁচা, ডাক্তারদের সাহায্য করিতে যাওয়ায় বাধা; ওদিকে গুরু-বাগে সত্যাগ্রহীদের পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া প্রহার; মুখের মধ্যে ঘাস পুরিয়া দেওয়া, কাঁটা গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া, উপস্থের উপর প্রহার প্রভৃতি। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রীর সিভিলিয়ানী বক্তৃতার আলোচনায় আপত্তি। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি তস্পশাস্ত্রিং স্যার জন উডরফের অবসর গ্রহণ। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সমস্যার আংশিক সমাধান; ক্ষতিপূরণে ট্রেজারী-বণ্ড দিলেই এখন চলিবে। আনাটোলিয়ায় তুর্কীদের এস্কি-সহর অধিকার; গ্রীসের প্রহরী রণতরী কর্ত্তৃক বৃটীশ পতাকাবাহী সমরোপকরণপূর্ণ একখানা জাহাজ ধৃত। ২৫০ অবসর-প্রাপ্ত তুর্কী সৈন্য ও কতিপয় কুর্দ্দগণের বৃটীশ পল্টন আক্রমণ।

১৫ই ভাদ্র—

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে নিহত সওদাগরী জাহাজের বৃটীশ নাবিকদের জন্য জার্ম্মাণীর নিকট হইতে সাড়ে সাত কোটী টাকা আদায় করিয়া তাহা বৃটীশ নাবিকদের পরিবারবর্গকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছে; নিহত ভারতীয় নাবিকদের পোষ্যবর্গের জন্য কোনও ব্যবস্থা নাই। তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধে তুর্কীদের ৯০ হইতে ১০০ মাইল অগ্রসর হওয়ার সংবাদ; গ্রীক সামরিক কেন্দ্র সুদূর স্মার্ণা হইতেও সরান হইয়াছে।

১৬ই ভাদ্র—

গুরু-বাগ ব্যাপারে পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্যজীর অমৃতসর গমন ; লালা সাগরমলের ধর্ম্মশালায় তাঁহার প্রবেশে ও বাধা ; পণ্ডিতজী জেলে সর্দ্দার বাহাদুর মহাতাব সিংএর সহিতও সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পান নাই ; গুরুবাগের পথে মালব্যজীর গতিরোধ, পুলিস তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য তাঁহার মাথার নিকট লাঠী দুলাইয়াছিল। সবরমতী জেলে শ্রীযুত গণেশ সরকারের স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তাঁহার কারামুক্তি। মুলসীপেটায় টাটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে আবার সত্যাগ্রহ, পুনা হইতে কয় জন নেতার গমন ; ২৪ জন গ্রেপ্তার। পাবনার চর খলিলপুরে গুলীবর্ষণের সরকারী তদন্ত। আনাটোলিয়ায় গ্রীক সৈন্যশ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তের উশাকে প্রত্যাবর্ত্তন। ডাবলিনে আইরিশ বিদ্রোহীদের উপদ্রব। রয়টারের প্রধান সম্পাদক মিঃ এফ ডবলিউ ডিকিন্সের হঠাৎ মৃত্যু।

১৭ই ভাদ্র—

সিন্ধু প্রদেশের "হিন্দু"র অষ্টম সম্পাদক মানহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের শতকরা ৪০ জন সদস্য সরকারী গোয়েন্দা বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় হুলস্থূল ; আইন অমান্য-তদন্ত কমিটীতে প্রদত্ত বোম্বাই কংগ্রেসের সাক্ষ্য উহাদের মারফৎ সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হস্তগত হইয়াছে। পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লোবের নিকট অনাচারের মাত্রা কমাইবার জন্য মালব্যজীর অনুরোধে মিঃ লোবের উক্তি—"আপনি আইন দেখাইবার কে" ; মিঃ লোব শেষে স্বীকার করেন, অন্য দেশের লোক এ ভাবে নীরবে সহ্য করিতে পারে না ; অধ্যাপক রুচিরাম প্রহৃত। মহরমের তাজিয়া নিমজ্জন উপলক্ষে হুগলী, তেলিনীপাড়ায় পাটের কলের মুসলমান শ্রমিকদের ভীষণ হাঙ্গামা ; পুলিসের নির্দ্দেশে বিরক্ত হইয়া প্রথমে পুলিসকে প্রহার, তাহার পর হিন্দুদের উপর আক্রমণ ; হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ ; এক জনের মৃত্যু, ষাট সত্তর জন জখম, ইহা ছাড়া পুলিসের চৌদ্দ পনেরো জন আহত হইয়াছে ; আহতদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক ; মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক প্রায় এক শত দোকান ও পঞ্চাশ ষাটখানা বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে ; সশস্ত্র গুরখা পুলিস যাইয়া শান্তি-স্থাপন করে। মুলতানেও মহরমের তাজিয়া লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা ; বহু হতাহত, নানা স্থান লুণ্ঠিত, ঘর বাড়ী জখম ; বহু দোকানপাট, ধর্ম্মশালা ও হিন্দু দেব-মন্দির ভস্মীভূত। আনাটোলিয়ায় গ্রীক সৈন্যশ্রেণীর উত্তর প্রান্ত বিধ্বস্ত, তুর্কী সেনা কর্ত্তৃক ১৫০ কামান ও বিস্তর সমরোপকরণ ধৃত, আর একটি বড় জায়গা তুর্কী সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত ; স্মার্ণা বন্দরে বৃটীশ রণতরীর গমন। প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ঘোর বিরোধ ; ওদিকে বৃটীশ বিমান পলটনের লোক-জনের উপর কতকগুলি আরবের আক্রমণ।

১৮ই ভাদ্র—

হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পূর্ত্ত বিভাগের, ইঞ্জিনীয়ারের সহিত বর্দ্ধমানের মহারাজের স্থানীয় রাজাপুর খালের বন্যার অবস্থা পরিদর্শন। যোধপুরের মহারাজ সার প্রতাপ সিংএর পরলোক। গুরুদ্বার কমিটীর নেতাদের এক জনের পক্ষে আদালতে পণ্ডিত মালব্যজীর ওকালতী ; গুরু-বাগের পথে প্রহারের সঙ্গে লুণ্ঠনের অভিযোগ। পারস্যে বৃটীশ-বিরোধী কয়খানি সংবাদ-পত্র বন্ধ। স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় জগলুল পাশা জিব্রাণ্টারে স্থানান্তরিত, জগলুলের সহধর্ম্মিণী স্বামীর নিকট থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ডাক জাহাজ ইজিপ্ট ডুবীর তদন্তে কাপ্তেনের উপর দোষারোপ, কাপ্তেন ছয় মাসের জন্য সাসপেণ্ড ; ভারতীয় লস্করদের মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিবাদ।

১৯শে ভাদ্র—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার শারদীয় অধিবেশনের উদ্বোধনে মিঃ লয়েড জর্জ্জের সিভিল সার্ভিসী বক্তৃতায় বড়লাটের আশ্বাস, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয় নাই ; এই সম্পর্কে অসহযোগীদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ। খুলনা, কাটীপাড়ার সেবাশ্রম পরিদর্শনে কৃষি-সচিব নবাব নবাবালি চৌধুরি সাহেব কর্ত্তৃক কৃষক সম্প্রদায়কে অবসরসময়ে তাঁত, চরকা বা অন্য গৃহ-শিল্পে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ। অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, বাঙ্গালীর গৌরব, শ্রদ্ধাস্পদ জন-নায়ক মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের লোকান্তর। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এডভাইসারী বোর্ড ভারতীয় রেলপথে সরকারী পরিচালন অনুমোদন করিয়াছেন। গ্রীকদের স্মার্ণা রক্ষার শেষ ঘাঁটিস্বরূপ সুরক্ষিত স্থান উষাক সহর তুর্কী সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদ। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে গ্রীকে সেনাপতি-মণ্ডলে আগাগোড়া পরিবর্ত্তন। এদিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী গ্রীক সেনা কর্ত্তৃক নানা জন-পদ-পল্লীতে অগ্নি-প্রদানের সংবাদ। মেসোপটেমিয়ায় রুদ্র-নীতির ফলে জাতীয় দলের বহু নেতা মরুভূমির দিকে পলায়ন করিয়াছেন ; দুই জন পারসীক আন্দোলনকারী সরকারী ইঙ্গিতে পারস্যে চলিয়া গিয়াছেন।

২০শে ভাদ্র—

গুরুবাগে বহু আহত ও দুই জন মৃত্যুমুখে পতিত বলিয়া প্রকাশ ; কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে কুকুরের উপর বাৎসরিক পাঁচ টাকা টেক্স ধার্য্য ; টেক্স না দিলে হয় বিক্রয় করিয়া, না হয় মারিয়া ফেলিতে হইবে ; মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সরকারের নিকট আমোদ-প্রমোদের উপর গৃহীত টেক্সের অর্দ্ধেক অংশের দাবী। ও এথেন্সে প্রেরিত। হাবড়া, মাণিকপুরের ডেল্টা পাটকলের ম্যানেজার মিঃ উইলসন ও আর কয় জনের বিরুদ্ধে লুঠের অভিযোগ। বাঙ্গালার মিউনিসপ্যালিটীগুলি তাহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ; দার্জিলিঙ্গ, ঢাকা ও কলিকতার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থানে পরীক্ষায় প্রকাশ, চোকের দোষই অধিক। তেলিনীপাড়ার হাঙ্গামায় এ পর্য্যন্ত প্রায় এক শত জন মুসলমান গ্রেপ্তার। আফগান আমীর কর্ত্তৃক হিন্দু প্রীতি মূলক এক ঘোষণা জারী করার সংবাদ। তুর্কী সেনা কর্ত্তৃক আনাটোলিয়ায় ব্রুসা অধিকার, স্মার্ণার ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও ছয় জন খ্যাতনামা তুর্কী রাজপুরুষ কামাল পাশার সহিত যোগাযোগ রাখিবার অভিযোগে ধৃত

২১শে ভাদ্র—

শিখ মহিলা জাঠ দলের গুরু-বাগ যাইবার সঙ্কল্প। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ছয় জন সদস্য কর্ত্তৃক সভা করিয়া পুলিসের আচরণের নিন্দা, সরকারকে শিখদের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপে নিষেধের অনুরোধ ও শিখদের প্রতি সমবেদনা। গুরু-বাগে এ পর্য্যন্ত সাত শত আকালী আহত ; আহতদের রাখিবার জন্য অমৃতসরের কয় জন ধনীর কয়খানি ঘর ব্যবহার ও স্বর্ণ-মন্দিরের নিকট তাহার ব্যবস্থা ; ১৪ জন পুরুষ ডাক্তার ও এক জন লেডী ডাক্তারের এবং কয় জন কম্পাউণ্ডারের স্বেচ্ছায় সাহায্য। মিঃ লয়েড জর্জের সিভিল সার্ভিসী বক্তৃতার নিন্দামূলক প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় পরিষদে অগ্রাহ্য ; প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পরিষদ বৃটীশ জনগণের সহানুভূতি হারাইতেন বলিয়া সরকারের বিশ্বাস। ত্রিপুরা দরবার কর্ত্তৃক আখাউরা হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপনের সঙ্কল্প। মুলতান মহরম হাঙ্গামার সরকারী সংবাদে প্রকাশ—নিহতের সংখ্যা ৭০ আহতের ৭৪ ; হিন্দুদের ৯টি ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করা হইয়াছে। সার আলি ইমাম কর্ত্তৃক নিজাম সরকারের শাসন-পরিষদের সভাপতির পদত্যাগ করিয়া পাটনা-যাত্রা। ভূ-প্রদক্ষিণেচ্ছু বৈমানিক মেজর ব্লেকের কলিকাতা হইতে সাধারণ পথে ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন। মুলসীপেটায় সত্যাগ্রহে দুইটি বৃদ্ধা মাওলী রমণীর অর্থদণ্ড। আনাটোলিয়ার যুদ্ধে গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ট্রিকুপিস সদলবলে—অনেকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ সমেত তুর্কী হস্তে বন্দী ; সেনাপতি, যুদ্ধের পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, তুর্কীর দ্রুত আগমনের সংবাদ সময়ে পান নাই ; দার্দ্দানেলিজ তীর হইতে গ্রীক সেনার প্রত্যাবর্ত্তন ; তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধ স্থগিত সংক্রান্ত বৃটীশ প্রস্তাবে ফ্রান্স ও ইটালীর অসম্মতি ; ফ্রান্সের প্রস্তাব, তুর্ক-গ্রীক সেনাপতিরা নিজেরা কথাবার্ত্তা কহিলেই যুদ্ধ স্থগিত সম্ভব।

কৃষ্ণ-সাগরে বলশেভিকগণ কর্ত্তৃক বৃটীশ বাণিজ্য-পোতের উপর আক্রমণে ভূমধ্যসাগর বহরের নয়খানি বৃটীশ রণতরীর কৃষ্ণ সাগর গমন।

২২শে ভাদ্র—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্টের মুখে মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের নিন্দা। বেজওয়াদায় বারো জন অসহযোগীর কার্য্যবিধির ১১০ ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতির সংবাদ; ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়—রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা সমাজের পক্ষে যতই কেন বিপজ্জনক হউক না, তাহাদের বিরুদ্ধে শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনায় ১১০ ধারা প্রযোজ্য হইতে পারে না। শুধু আন্দোলনকারী বলিয়া এ অভিযোগ টিকিতে পারে না, প্রধান মন্ত্রীর সিবিলিয়ানী বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ভীত এবং উহাতে ১৯১৭ অব্দের প্রতিশ্রুতির গোলমাল হইতেছে, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উক্ত সভায় সরকার পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে গৃহীত। মুলতান সহরম হাঙ্গামায় ক্ষতির সরকারী হিসাব—এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মূল্যের বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে, বাড়ীগুলির জিনিষপত্রের হিসাব ইহার মধ্যে নাই। অগ্নিকাণ্ড ও লুঠপাটে বোধ হয়, তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; প্রকাশ, কতিপয় হিন্দু মহিলার উপর অত্যাচার হইয়াছিল। গ্রীক মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ; স্মার্ণার দক্ষিণে ইজিয়ান সাগর-তীরে তুর্কী সেনার উপস্থিতি; যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত তুর্কী সেনা গ্রীকদের ৭০০ কামান, ১১ খানি বিমান ও ২০০ কলের কামান হস্তগত করিয়াছে।

২৩শে ভাদ্র—

চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে শ্রীরামচন্দ্র রজকের কমিশনার পদ-প্রার্থনায় কতিপয় ভদ্র কমিশনারের আপত্তির সংবাদ। তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ; ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি প্রদান। মেদিনীপুর বন্যার সাহায্যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায় ও শ্রীযুত শাসমল প্রভৃতি নেতাদের পরামর্শ; স্বতন্ত্রভাবে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা। তুর্কী সেনা কর্ত্তৃক স্মার্ণা অধিকার; ২২শে ভাদ্র মধ্য-রাত্রে স্মার্ণায় গ্রীক শাসনের অবসান ও মিত্রশক্তির হস্তে সহরের ভারার্পণ; সহরে বৃটীশ, ফরাসী ও মার্কিণ সেনার শান্তিরক্ষা; ক্রুসা অঞ্চলের গ্রীকদের মর্ম্মর সাগরের পথে প্রত্যাবর্ত্তন; জাতীয় দল কর্ত্তৃক য়ুরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তুর্ক সীমানা ও দার্দ্দানেলিজ ফিরাইয়া পাইবার দাবী। আইরিশ পারলামেণ্টে সন্ধির বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সহিত আইরিশ সরকারের দ্বন্দ্ব, সভায় গোলমাল করিবার অভিযোগে প্রথমোক্ত দলের এক জন নেতার সভা হইতে বহিষ্কার।

২৪শে ভাদ্র—

অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনার স্থানীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা আর অমৃতসর হইতে গুরু-বাগ যাইবার পথে লোকজনকে বাধা দিবেন না; গুরুবাগে বক্তৃতা করার অপরাধে পাঞ্জাব নেতা সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গ্রেপ্তার। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তেলিনীপাড়ার হাঙ্গামার তদন্ত উদ্দেশ্যে কমিটী গঠন। আয়রলণ্ডের ডাকঘরগুলির কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কায বন্ধ করিয়াছে; ফলে আয়ারলণ্ড হইতে ইংলণ্ডে টেলিগ্রাম যাতায়াত বন্ধ।

২৫শে ভাদ্র—

গুরুবাগে পাঞ্জাব পুলিসের ইনস্পেক্টার জেনারেল, ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেল, অমৃতসরের পুলিস কমিশনার ও ডেপুটী কমিশনারের পরিদর্শন; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তথায় তাঁবু ফেলিয়া অবস্থান করিতেছেন। হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ী হইতে খানাতল্লাসীর ফলে ২১টি পুরাতন পিস্তল বাহির; পিস্তলগুলি মিউনিশান বোর্ডের বিক্রীত ৯৮০টি পিস্তলের সামিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের লোকান্তর। হাবড়া রেল ষ্টেশনে অনধিকারপ্রবেশ করিবার অভিযোগে অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, ভিক্ষুক প্রভৃতি ৯০ জনের এক টাকা জরিমানা, বিকল্পে তিন দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড, জরিমানা দিতে না পারায় সকলেই জেলে গিয়াছে। মাদ্রাজ রায়পুর মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ, উভয় পক্ষেই অনেকে আহত। আর্থিক অনাটনে গুজরাট জেলার মিউনিসিপ্যালিটীগুলির অবস্থা শোচনীয়; নানা স্থানে শিক্ষকরা মাহিনা পাইতেছেন না। মিশর, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহের আশঙ্কায় ও গ্রীসের সমর্থনে বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের রাজনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা, তাঁহার পদত্যাগ সঙ্কল্পের জনরব।

২৬শে ভাদ্র—

জেনোয়ার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনীতে ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নির্ব্বাচিত। ঝান্সীর ল্যান্স করপোর‍্যাল এস এ গ্র্যাণ্ডী তাহার পাচককে খুন করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। কনস্তান্তিনোপল ও গ্যালিপলী কামালের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের তথা মিত্রশক্তির নিকট বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনা।

২৭শে ভাদ্র—

গাণ্ডো মাঝী নামে এক নিরক্ষর সাঁওতাল হাজারীবাগ জেলা বোর্ডের সদস্য হইয়াছে। পঞ্জাব লাটের গুরুবাগ পরিদর্শন। কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে আর দুই ব্যক্তির নিকট (মিউনিশান বোর্ডের) আট শত পিস্তল বাহির; তিন জনেই অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত।

২৮শে ভাদ্র—

"মাদারল্যাণ্ড" সম্পাদক শ্রীযুত মজহরল হকের বিরুদ্ধে পাটনায়, আর একটি মানহানির মামলা আরম্ভ। গুরুবাগে প্রহারের বদলে গ্রেপ্তার আরম্ভ; মহাত্মার অহিংস মন্ত্রের জয়-জয়কার। পাঞ্জাব লাটের মুলতানের হাঙ্গামাস্থল পরিদর্শন। স্মার্ণায় গ্রীক ও আর্ম্মিনিয়ান পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড; তুর্কীদের প্রতিশোধ।

২৯শে ভাদ্র—

সহকারী ভারত-সচিব আর্ল উইণ্টারটনের ভারতে আগমন।

৩০শে ভাদ্র—

চন্দননগর হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত ২২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা; বাগবাজারের শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু ও আহিরীটোলার শ্রীমান্ আশুতোষ দত্ত ন্যূনাধিক সাড়ে চার ঘণ্টায় এই পথ অতিক্রম করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তুরস্কের প্রণালীপথ রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক উপনিবেশগুলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা; কনস্তান্তিনোপলে নূতন বৃটিশ-সৈন্য সমাবেশ। নিরপেক্ষ অঞ্চল রক্ষার জন্য রুমানিয়া ও যুগো-শ্লোভিয়ার নিকট বৃটিশের প্রার্থনা।

৩১শে ভাদ্র—

রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত পি জে মেটা কর্ত্তৃক গুজরাট জাতীয় বিদ্যালয়ে আড়াই লক্ষ টাকা দান। অমৃতসরে দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সভার অধিবেশন; সভায় গুরুবাগে পুলিসের ব্যবহারের নিন্দা ও সে সম্বন্ধে তদন্ত উদ্দেশ্যে কমিটী নিয়োগ। গুরুবাগের কাণ্ডে পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরকারী তদন্তও আরম্ভ হইয়াছে। শেষ গ্রীক সৈন্যদলের সাত হাজার সৈন্য তুর্কী হস্তে বন্দী। রুস-এঙ্গোরা সন্ধি অনুসারে দার্দ্দানেলিজ ও কনস্তান্তিনোপলের পুনরুদ্ধারে কামালের সাহায্য করিতে রুসিয়ার সঙ্কল্প।

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহারণ-শেষে কামানের ক্রমোন্নতি।

জেনারল উইলিয়ম্‌স আমেরিকার রণসম্ভার বিভাগের কর্ত্তা। উন্নততর প্রণালীর কামান, বন্দুক, গোলা-গুলী প্রভৃতির আবিষ্কার ও নির্ম্মাণকার্য্যে তিনি রত আছেন। য়ুরোপের ভীষণ রণক্ষেত্রে, মার্কিণ বাহিনীর রণসম্ভার-বিভাগের ভার লইয়া তিনি মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল পার্শিংএর অনুগমন করেন। প্রায় এক বৎসর-কাল পরে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমেরিকার রণসম্ভার-বিভাগের প্রধান কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। য়ুরোপের মহারণের অবসানের অব্যবহিত পরেই তিনি সহকারিবর্গের সহায়তায় জীবধ্বংসকারী নানা প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট এবং নানা প্রকার শক্তিবিশিষ্ট। জীবধ্বংসে, সৃষ্টিবিনাশে নবোদ্ভাবিত কামানগুলির শক্তি অসাধারণ। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় যে সকল অনলবর্ষী কামান শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাদের তুলনায় এই কামানগুলি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এই কামানগুলিকে রণক্ষেত্রে অতি সহজে বহন করিবার ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুবৃহৎ গোলাবর্ষণের উপযোগী হইলেও এই আগ্নেয়যন্ত্রগুলি ওজনে লঘুভার।

নবোদ্ভাবিত ১৫৫ এম্ এম্ (৬ ইঞ্চি) কামানবাহী মোটর গাড়ী।

জেনারল উইলিয়মস্ পত্রান্তরে তাঁহার উদ্ভাবিত এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কামানের উপকারিতা সম্বন্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ;—"রণক্ষেত্রে কামানই প্রধান সহায়। অনলবর্ষী কামানের ধূমজালের অন্তরালে পদাতিক সৈন্য অগ্রসর হইবার বিশেষ সুযোগ পায়, শত্রুপক্ষের কামানগুলিকেও অকর্ম্মণ্য করিবার সুবিধা হয়। ইহাতে পদাতিক সেনাদল স্বল্লায়াসে শত্রুপক্ষকে বিমর্দ্দিত করিতে পারে, স্বপক্ষের লোকক্ষয়ও কম হয়। যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিতে হইলে কামানের উৎকর্ষতা চাই। যে পক্ষে দূরবর্ষী কামান যত অধিক থাকিবে, গোলা-গুলী যথাযথ লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে নিক্ষিপ্ত করিবার
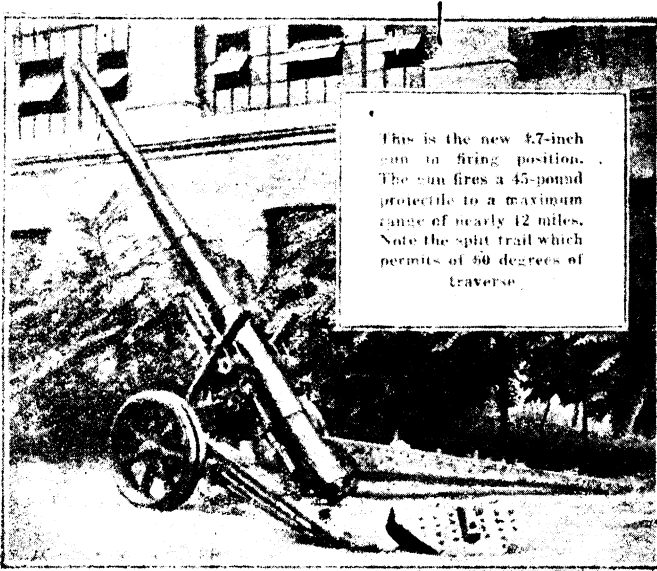
৪·৭ ইঞ্চি কামান ; অগ্নিবর্ষণের অবস্থায় স্থাপিত।

হয় ; দ্বিতীয়—গোলাবর্ষণের দ্রুততা ; তৃতীয়—ক্ষিপ্রতাসহকারে কামান বহন, অর্থাৎ অত্যল্পকালের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কামান লইয়া যাইবার ব্যবস্থা। এই তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি উন্নততর প্রণালীতে কামান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কামান যত লঘুভার ও দৃঢ় হইবে, ততই তাহা উৎকৃষ্ট।

এই কামান বহন করিবার জন্য ভার-সহ, দ্রুতগামী মোটর গাড়ী আছে। পথ বন্ধুর না হইলে এই মোটর কামান লইয়া ঘণ্টায় ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। ৯৫ পাউণ্ড (প্রায় ১ মণ ৬ সের) ওজনের গোলা এই কামান

সুবিধা হইবে—যাহার গোলার শক্তি অধিক—সে পক্ষে যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী।”

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া জেনারল উইলিয়মস্ আমেরিকার তরফ হইতে ভীষণ ধ্বংসাস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত কামানগুলি য়ুরোপের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ আগ্নেয়াস্ত্রকে পরাভূত করিয়াছে।

জেনারল উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন যে, কামানের তিনটি প্রধান গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম—গোলা যাহাতে অধিকতর দূরে নিক্ষিপ্ত
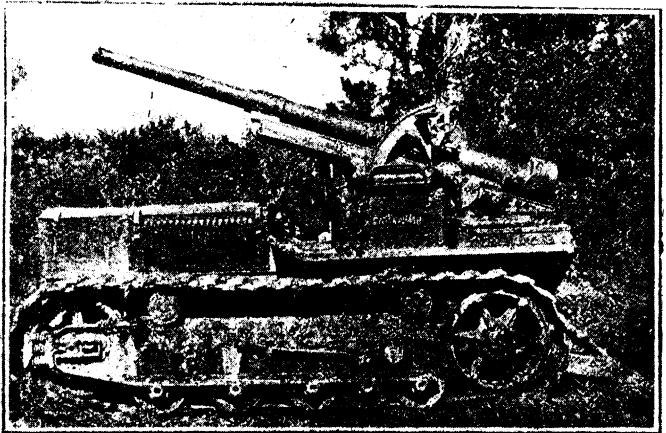
নবনির্ম্মিত ৭৫ এম্ এম্ (৩ ইঞ্চি) কামান।
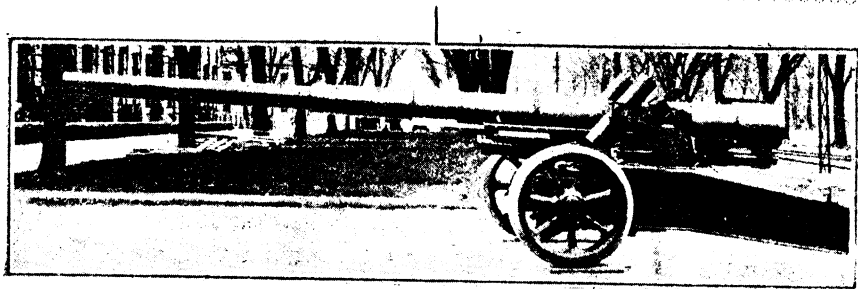
১৫৫ এম্ এম্ ৬ ইঞ্চি কামান।

হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় ১৫ মাইল দূরের বস্তু ধ্বংস করিতে সমর্থ। যুদ্ধের পূর্ব্বে বা সেই সময়ে য়ুরোপের রণক্ষেত্রে শক্তিপুঞ্জ এই শ্রেণীর যে সকল কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমেরিকার নবোদ্ভাবিত এই কামানের গোলা তদপেক্ষা ৪ মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

এই সকল কামান হইতে ৪৫ পাউণ্ড (প্রায় ২২ সের) ওজনের গোলা ১২ মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কামানের গোলা যত দূরে পৌছিত, এখন তদপেক্ষা কয়েক সহস্র গজ অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই কামান বহন করিবার স্বতন্ত্র মোটর গাড়ীও নির্ম্মিত হইয়াছে। অগ্নিবর্ষণকালে স্বতন্ত্র মোটর গাড়ীতে ইহাকে স্থাপিত করিতে হয়। এক গাড়ী হইতে অপর গাড়ীতে সংস্থাপন করিতে মাত্র কয়েক-মিনিট সময় লাগে। এ বিষয়েও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

৭৫ এম্ এম্ কামান অত্যন্ত লঘুভার। পূর্ব্বের ওজনের তুলনায় ইহার বর্ত্তমান ওজন ১ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১২ মণ ৮ সের) কম। এই কামানের গোলা ১৫ হাজার গজ (প্রায় ৯ মাইল) দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বের তুলনায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

১৫৫ এম্ এম্ কামানের গোলা ১৫ মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। কামানটি মোটর গাড়ীর উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। উহার সম্পূর্ণ আকৃতি এই চিত্র হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

সমুদ্রকূল রক্ষাকারী ১৬ ইঞ্চ সুবৃহৎ কামানের ওজন ২ শত টন (প্রায় ৫ হাজার ৪ শত ৬৮ মণ)। প্রায় সাড়ে ২৮ মণ ওজনের গোলা এই বিভীষণ কামান হইতে নির্গত হইয়া ৫০ হাজার গজ (প্রায় সাড়ে ২৮ মাইল) দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। মিনিটে একটি করিয়া গোলা বর্ষিত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক তারযোগে অগ্নিবর্ষণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সমুদ্রকূলে এই কামান রক্ষিত হইলে উহার সাহায্যে সমুদ্রপথ হইতে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়।

জেনারল উইলিয়মস্ আরও নানাবিধ কামানের উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত আছেন। মারণ-যন্ত্রের—সৃষ্টি ধ্বংসকারী আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবনে আমেরিকা সকলকেই ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রকূল রক্ষা করিবার ১৬ ইঞ্চি ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র।

মালয়ের সমুদ্রচারী বেদিয়া জাতি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ সমিতির অন্যতম সদস্য মিঃ ওয়াল্টার গ্রেন্জ হোয়াইট্ "The Sea Gypsies of Malaya" নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মার্গুই দ্বীপপুঞ্জের মকেন্ জাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, জীবন-যাত্রার প্রণালী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই মকেন্ জাতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম মালয়ের সমতলক্ষেত্রে শান্তশিষ্টভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। তাহারা স্বল্পেই সন্তুষ্ট ছিল। কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সে সময় তাহাদের ঘর বাড়ীর অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু শান্তভাবে থাকিলেও নিষ্কৃতি নাই। রণ-দুর্ম্মদ টিনো যোদ্ধবৃন্দের শ্যেনদৃষ্টি এই শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মকেন্ জাতির শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইল। হতভাগ্যগণ গৃহচ্যুত হইয়া মার্গুই দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু মকেন্গণ এখানে আসিয়াও আবার কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। প্রভূত পরিশ্রমের ফলে, নারিকেল, কদলী, আনারস প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। বাটুকের কাপ্তেন হুকুস্ প্রলুব্ধ হইয়া দক্ষিণদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ফলপুষ্পিত ক্ষেত্র লুণ্ঠিত হইল, বহু নরনারী দাসত্ব-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইল।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মকেন্গণ বুঝিল যে, তাহাদিগের অস্তিত্বলোপের আর বিলম্ব নাই। জাতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে গেলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তাহারা সমুদ্রগর্ভে আশ্রয়গ্রহণই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করিল। তাহারা পোত নির্ম্মাণে মন দিল। বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় লইতে পারিবে। এই নৌকার নাম 'কাবং।' বর্ষাকালে তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইত। কারণ, সে সময় শত্রুদল তাহাদিগকে বড় একটা আক্রমণ করিতে পারিত না। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির কাল অপগত হইলেই আবার চারিদিক হইতে দস্যুর দল তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

এইরূপে উপদ্রুত হইয়া তাহারা পরিশেষে স্থির করিল যে, বর্ষাঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে তাহারা নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রবক্ষেই অবস্থান করিবে। বিদেশীয়ের পোত দূর হইতে দেখিতে পাইলেই পলায়নের সুবিধা হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার পর হইতে তাহারা দ্বীপে স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণে অমনোযোগী হইতে লাগিল। নৌকাই তাহাদিগের স্থায়ী গৃহ। তাহারা ক্রমে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল যে, নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গায় গৃহ নির্ম্মাণের স্পৃহা অনেকেরই অন্তর্হিত হইয়া গেল। বর্ত্তমানে মকেন্গণ নৌকাতেই বসবাস করে। এখন তাহাদের নাম সমুদ্রচারী বেদিয়া। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও গৃহ নাই, স্থান নাই। সমুদ্রের উদার, প্রশস্ত, সীমাহীন বক্ষই তাহাদের আশ্রয়।

ভিক্টোরিয়া পয়েন্টস্থিত মকেন্দিগের আবাসগৃহ।

এই নৌকাগুলি তেমন দৃঢ় নহে। তালগাছের গুঁড়ি হইতে উহা প্রস্তুত। বাঁশ চিরিয়া নৌকার উপরে বিছাইয়া দেওয়া হয়। গাছের ছালের রজ্জুর দ্বারা বাঁশগুলি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। তালপত্রের পাইল, তৃণনির্ম্মিত রজ্জু নৌকার আভরণ। নৌকার একাংশের উপরিভাগে ঘাস ও তালপাতার ছাউনি। নৌকায় মাদুর পাতিয়া উহারা দিনের বেলা উপবেশন করে, রাত্রিতে উহাই শয্যার অভাব দূর করিয়া দেয়। নৌকাতেই রন্ধনের ব্যবস্থা আছে। নৌকার উপর

মৃত্তিকার প্রলেপ, উহাতে অগ্নিভয় থাকে না। তিনখানি বড় বড় পাত্র এমনভাবে স্থাপিত যে, তাহাতেই উনুনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাটীর হাঁড়ি অথবা সংগৃহীত লোহার পাত্রে সকাল ও সন্ধ্যায় পাককার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

নৌকাগুলি সাধারণতঃ ২৫ ফুটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাতে একটি দম্পতি পাঁচটি সন্তান সহ বসবাস করিতে পারে। আচ্ছাদনের নিম্নে সকলের স্থান সংকুলান না হইলে বালকবালিকারা অসমতল নৌকার পাটাতনের যেখানে সেখানে শয়ন করিয়া থাকে। ঝড় বৃষ্টির সময় সকলে আচ্ছাদনের নিম্নে আশ্রয় লয়। তখন আর নিদ্রার সুযোগ ঘটে না, হয় ত সকলে সারারাত্রি বসিয়া যাপন করে।

মকেন্‌গণ কোনওরূপ ডুবুরির পোষাক না পরিয়াই জলে ডুবিয়া থাকে। ইহাদের সন্তরণের প্রথাও বিচিত্র। অন্যান্য জাতীয় ডুবুরির ন্যায় ইহারা সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাইবার সময় মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া সন্তরণ করে না। উপরের দিকে মাথা রাখিয়া সোজা জলের মধ্যে অবতরণ করে। সে সময় ইহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে এবং কোনও প্রকার কৃত্রিম উপায়ের শরণাপন্ন হইতে ইহারা চাহে না। এ জন্য শুক্তি প্রভৃতি সংগ্রহ ব্যাপারে ইহাদের একচেটিয়া ব্যবসা ক্রমেই পরহস্তগত হইতেছে। কিন্তু সন্তরণ বিদ্যায় ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই।

সরকারের নিকট হইতে 'লাইসেন্স' লইয়া মকেন্‌গণ

মকেন্‌দিগের নৌকা। ভাসমান গৃহে সমুদ্রচারী বেদিয়াপরিবারের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের দৃশ্য।

মকেন্ নারীরা ডাঙ্গায় উঠিয়া পথ চলিবার সময় ছোট ছোট শিশু-সন্তানকে পৃষ্ঠে অথবা স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া লইয়া থাকে। সে সময় ইহাদের গমনভঙ্গী দেখিতে মন্দ নহে। মকেন্ জাতি সমুদ্রগর্ভ হইতে শুক্তি উত্তোলন করিয়া সাধারণতঃ জীবিকা অর্জ্জন করে। শুক্তির মধ্যে মুক্তা না থাকিলেও উহার মূল্য আছে। সামুদ্রিক শামুক সংগ্রহের জন্যও উহারা সর্ব্বদা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। এই শামুকের খোলা হইতেও সুন্দর বোতাম প্রস্তুত হয়।

অধুনা আহার্য্যের উপযোগী পাখীর বাসাও সংগ্রহ করিয়া থাকে। একজাতীয় 'সোয়ালো'পক্ষী আছে, যাহারা সাধারণতঃ সমুদ্র ও দ্বীপে উড়িয়া বেড়ায়। পাহাড়ের ধারে বা গুহার পার্শ্বে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মকেন্‌গণ অত্যন্ত লঘুগতি, ক্ষিপ্র। অসাধারণ দক্ষতার সহিত ইহারা পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে ও নামিতে পারে। যে সকল নীড়ে পাখী ডিম পাড়ে নাই, বাছিয়া বাছিয়া তাহারা সেইরূপ নীড় সংগ্রহ করে। মিঃ হোয়াইট্ এই প্রসঙ্গে বলেন,—"যাহারা এই

নীড়-সংক্রান্ত ব্যাপারের কোনও কিছুই অবগত নহেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, এই নীড়-রচনায় পাখীরা এক প্রকার সামুদ্রিক গুল্ম ব্যবহার করে। সামুদ্রিক 'সোয়ালো'র মুখের সংস্পর্শে আসিয়া সেই গুল্মগুলি অর্দ্ধপাচ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই সকল নীড় চীনদেশে, ব্রহ্ম মালয়ের চৈনিক উপনিবেশে ও ষ্টেট সেটেলমেণ্টে বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ নীড় হইতে এক প্রকার সুরুয়া প্রস্তুত হয়। মকেন্‌রা কিন্তু বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পায় না। মালয় ও চীন ব্যবসায়ীরা দ্বীপে গিয়া বসবাস করে এবং মকেন্‌দিগকে বলপূর্ব্বক কায করাইয়া লয়। মকেন্‌রা বলে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়িগণের আদেশ পালনে অবহেলা করিলে তাহারা তাহাদিগকে প্রাণে মারিবার ভয় দেখাইয়া থাকে। ব্যবসায়ীরা বিনিময়ে তাহাদিগকে অহিফেন প্রদান করিয়া থাকে। মকেন্‌রা অহিফেন সেবনের পক্ষপাতী নহে। তাহারা বলে যে, উহা সেবন করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, দারিদ্র্য ও মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে উক্ত বিষ লইতে হয়, নহিলে তাহাদের জীবনসংশয় হইবে।"

মালয়দ্বীপের সুস্থসবলদেহ মকেন্ পুরুষ।

গাছের কেয়ারী – গাছ বাঁকাইয়া ও ছাঁটিয়া ইহা প্রস্তুত।

মকেন্‌গণ এখন অহিফেন-সেবী হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা ব্যবসায়িগণের কাছে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে। অন্যের নিকট হইতে অহিফেন পাইবার সুবিধা তাহাদের নাই। সুযোগ বুঝিয়া ব্যবসায়ীরা চড়াদরে তাহাদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ সামান্য অহিফেনের বিনিময়ে উহাদের নিকট হইতে তাহারা অপর্য্যাপ্ত মূল্যের শুক্তি, শামুক ও নীড় গ্রহণ করিয়া থাকে।

মিঃ হোয়াইট্ গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এই সমুদ্রচর বেদিয়ারা আমাদিগকে, পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিকেই ভয় করিয়া চলে। সকলেরই হস্তে তাহারা নিগৃহীত হইয়াছে।" উহারা মিঃ হোয়াইটের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিয়াছে, তাঁহাকে মকেন্‌গণ বন্ধুর ন্যায় মনে করে। এ জন্য তিনি তাহাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রার প্রণালী, তাহাদের ভাষা, ঔষধ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

ধাত্রী কুকুর।

শিক্ষা দিলে কুকুরের দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদন করা যায়, কিন্তু সে যে নিপুণা ধাত্রীর ন্যায় শিশুকে বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করাইতে পারে, ইহাও বিস্ময়কর নহে কি? চিত্রের

কুকুরটি ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করাইতেছে, শিশুও নির্ব্বিকার-চিত্তে ধাত্রী অথবা মাতৃহস্ত-ধৃত বোতল হইতে অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতেছে। নিপুণা ধাত্রীর সহিত এ বিষয়ে এই কুকুরের পার্থক্য কতটুকু?

হাওড়ার নূতন সেতু।

বর্ত্তমান সেতুর পরিবর্ত্তে আর একটি নূতন সেতু কলিকাতা ও হাওড়াকে সংযুক্ত করিবে। ভাবী সেতুর আকার কিরূপ হইবে, তাহা এই চিত্র হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। এখন যেখানে পুলটি রহিয়াছে, তথা হইতে প্রায় ছয়শত ফুট উত্তরে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবার কথা। দৈর্ঘ্যে এই সেতু প্রায় ১৪ শত ফুট এবং প্রস্থে ১ শত ফুট হইবে। দুইখানি ট্রেণ যাহাতে পাশাপাশি যাইতে পারে, এরূপ রেলপথ এবং ছয়খানা গাড়ী অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, পুলের উপর সেরূপ ব্যবস্থাও হইবে। মানুষ চলিবার জন্য দুই পার্শ্বে ১২ ফুট চওড়া ফুটপাথও থাকিবে। এঞ্জিনীয়ারগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে ৩ কোটি টাকার উপর ব্যয় পড়িবে, সাড়ে তিন বৎসরের পূর্ব্বে উহার নির্ম্মাণ কার্য্যও সমাপ্ত হইবে না।
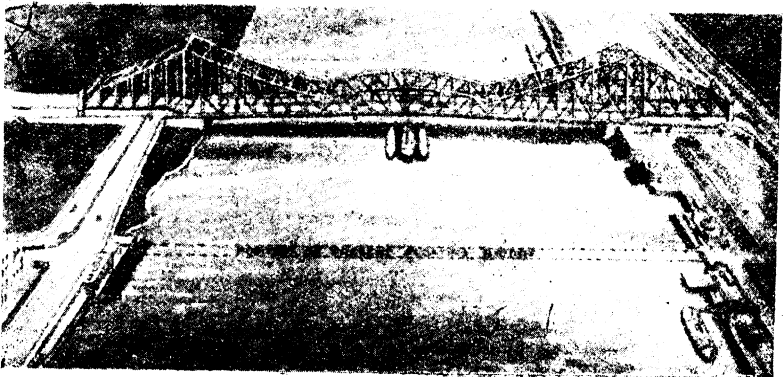
কলিকাতার নূতন সেতু।

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল।

কলিকাতা হইতে অদূরে শ্রীরামপুরে—গঙ্গার তটে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল নব্য-বঙ্গের অন্যতম গৌরবের সামগ্রী। এ দেশের কার্পাসশিল্প এককালে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল এবং ঢাকার কার্পাসবস্ত্র কেবল যে ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব আছে মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রতিভা কল-কারখানার পরিচালনেও সাফল্য লাভ করিতে পারে।
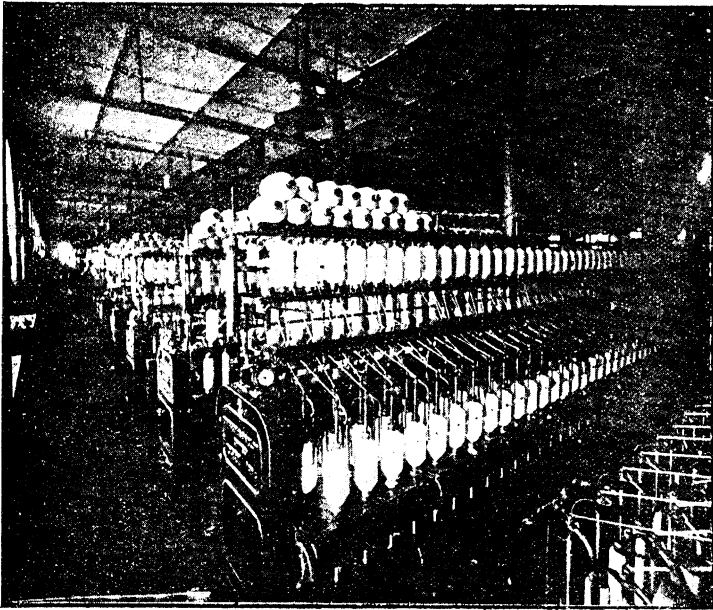
সূতা নাটাই করিবার যন্ত্র।

ভারতে মোগল বাদশাহদিগেরই আদর লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে ; পরন্তু রোমের সম্রাটগণের অঙ্গাবরণরূপেও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত নীতির ফলে সে শিল্প নষ্ট হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ বস্ত্রের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হয়।

কিন্তু তাহার পর ভারতবর্ষে বাঙ্গালা যে সময় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করিতেছিল, সেই সময় বোম্বাইয়ে কয়টি সূতার ও কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তদবধি বোম্বাইবাসী ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালীর

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মেসার্স ভিসরাম ইব্রাহিম এণ্ড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেণ্টস হইয়া ১৪ লক্ষ টাকা মূলধনে এই কল প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন চিফজাষ্টিস—সার কোমার পেথরাম ইহার উদ্বোধন করেন। তখন ইহার নাম ছিল—বেঙ্গল স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী (লিমিটেড)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহা হস্তান্তরিত হইয়া নোথকারবারে—শ্রীরামপুর কটন মিলস্ নামে অভিহিত হয়। তখন মেসার্স শা ওয়ালেস এণ্ড কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হয়েন

এবং মূলধন হয়—২০ লক্ষ টাকা। তখন মিলের ম্যানেজার য়ুরোপীয়।

তাহার পর বোম্বাইয়ের মেসার্স মূলরাজ গোবর্দ্ধন দাস এণ্ড কোম্পানী ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় কল ক্রয় করিয়া লক্ষ্মী তুলসী মিল্‌স নামে অভিহিত করেন। তখন ইহাতে ২১ হাজার টেকো ও ২ শত তাঁত ছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর স্বাবলম্বনপ্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময় বাঙ্গালায় একটি কাপড়ের কল স্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়

নূতন বয়ন গৃহ।

এবং কেবল কলটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ নামে যৌথকারবারে চালান হয়।

বঙ্গলক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বাঙ্গালীর মূলধনে স্থাপিত ও বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং কার্য্যাধ্যক্ষও বাঙ্গালী। বসন্তকুমার ব্যারিষ্টার—তিনি পঞ্জাবের লালা হরকিষণলালের মত ব্যবহারাজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আরম্ভাবধি মিলের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

মূলধন

১৯০৬ খৃঃ	...	...	১২ লক্ষ টাকা
১৯০৯ খৃঃ	...	...	১৮ " "
১৯১৪ খৃঃ (লোকশান)	...		৬ " "
১৯২২ খৃঃ	...	...	১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ২ শত টাকা

অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে মূলধন ১২ লক্ষ টাকা ছিল, তাহা ৩ বৎসর পরে ১৮ লক্ষ হইলেও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৬ লক্ষ টাকা লোকশানের পর আজ প্রায় ১৮ লক্ষ হইয়াছে।

জমী ইমারত ইত্যাদি

১৯০৬ খৃঃ	...	...	৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা
১৯২২ খৃঃ	...	...	৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা

কল-কব্জা প্রভৃতি

১৯০৬ খৃঃ ... ... ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা
১৯২২ খৃঃ ... ... ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা

গচ্ছিত তহবিল

১৯০৬ খৃঃ ... ... ৪ হাজার টাকা
১৯২২ খৃঃ ... ... ১৬ লক্ষ টাকা

মূল্যাপকর্ষ খাতেও প্রায় ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জমা হইয়াছে। আর মজুদ তহবিল ৪ হাজার টাকা হইতে ১৬ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

(ওয়েষ্টার্ণ), মধ্যপ্রদেশ (নিউলাইন) ও হায়দ্রাবাদ, যুক্ত-প্রদেশ হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়। এই কলের জন্য বৎসরে প্রায় ১০।১২ হাজার বেল তুলা আমদানী করা হয় এবং তাহা হইতে যে সূতা হয়, তাহাতে মিলের কাপড় বয়ন করিয়াও কিছু সূতা বাজারে বিক্রয় করা যায়। গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ষাণ্মাষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে আয়ের খাতে মাল-বিক্রয়ের মধ্যে সূতার মূল্য দেখা যায় ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৯ শত ৩০ টাকা। যে সূতা বাহিরে দেওয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালার অনেক হাতের তাঁতে কাষ চলিয়া থাকে।

মাড় দেওয়ার ঘর

বর্ত্তমানে মিলে ৪৫ হাজার টেকো ও ৭ শত তাঁত চলিতেছে।

এ পর্য্যন্ত মোট লাভ প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা।

বঙ্গদেশে তুলার চাষ অধিক হয় না; যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহাও সর্ব্বতোভাবে কলের কাপড়ের সূতার পক্ষে উপযোগী নহে। সেই জন্য বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের জন্য ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে—প্রধানতঃ গুর্জ্জর (নাওসারী), মান্দ্রাজ

বর্ত্তমানে কলে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ জোড়া কাপড় প্রস্তুত হয় এবং বাঙ্গালায় প্রস্তুত ও বিশেষ টেকসই বলিয়া বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র এই কাপড়ের বিশেষ আদর আছে। বাস্তবিক কলে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিক কাপড় সর-বরাহ করিতে পারিলেই বিক্রীত হইয়া যায়।

মিলের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে কর্ম্মচারীদিগের ও শ্রমজীবিগণের বাসগৃহ। শ্রমজীবিগণের বাসের গৃহগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে

অনুকূল এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বহুব্যয়ে সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। দিন দিন সেগুলির উন্নতি সাধন করাও হইতেছে। বর্ত্তমানে কলে শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার; কিন্তু ইহাদের মধ্যে ৩ শত জন মাত্র বাঙ্গালী! কলের কায করিবার উপযোগী দৈহিক শক্তির অভাবই যদি ইহার একমাত্র কারণ হয়, তবে—মাদ্রাজী, নাগপুরী ও জব্বলপুরী প্রভৃতি পশ্চিমাদিগের সহিত তুলনায় বাঙ্গালীর এই দৌর্ব্বল্য বিশেষ চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইয়া সাফল্যলাভ করা সম্ভব—মধ্যপথে বাধাবিঘ্ন দেখিয়া নিরাশ হইলে ঈপ্সিত ফললাভ হয় না। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের যে ইতিহাস আমরা দিয়াছি, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে, ইহার সাফল্যেও বাধা অল্প হয় নাই। একান্ত সুখের বিষয়, কলের ডিরেক্টারদিগের চেষ্টায় সে সব বাধা অতিক্রান্ত হইয়াছে। শেষে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সাফল্যের সময় অংশীদারদিগকে আশাতীত লভ্যাংশ দিয়া ও মজুদ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া ডিরেক্টাররা ভবিষ্যতে কলের পরিচালনব্যবস্থা কিরূপ হইলে

টানার কল।
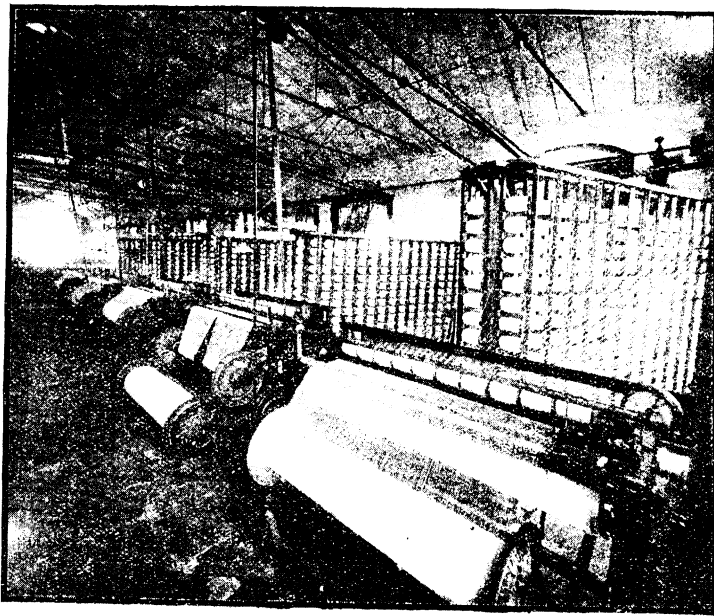
এই কলে তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করা, সূতায় রং করা, কাপড় বুনা—এ সকলই আধুনিক প্রথায় নিষ্পন্ন হয় এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত এই বৃহৎ কলের কায দেখিলে বাঙ্গালী গর্ব্বানুভব না করিয়া থাকিতে পারে না।

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল কেবল যে কল কারখানা চালান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচন করিয়াছে, তাহাই নহে; পরন্তু অনেক বাঙ্গালীর শিক্ষাক্ষেত্রও হইয়াছে। নানারূপ

ভাল হয়, সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সেই আলোচনার ফলে তাঁহারা এক জন ডিরেক্টারকে পরিচালন-ক্ষমতা প্রদান করিয়া, যাহাতে তিনি এই কাযেই আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা সমীচীন বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মিলের মজুদ তহবিলে যে টাকা জমা আছে, তাহাতে
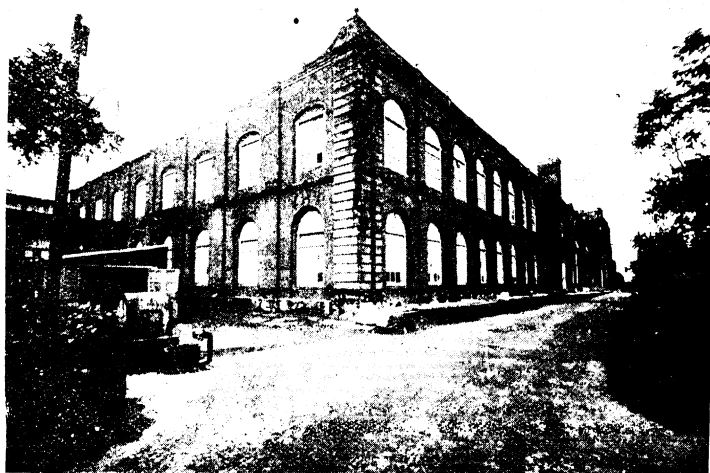
কলের বাড়ী।

কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ।
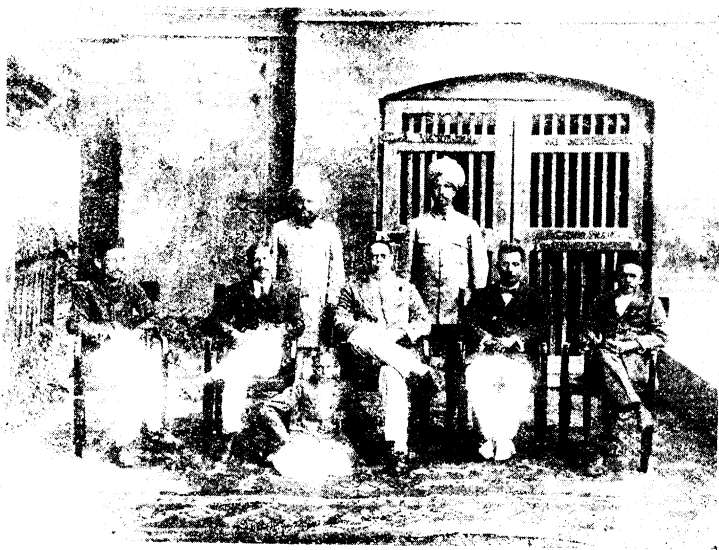
কল-কব্জার মূল্য হ্রাস হইলেই যে ইহার বিস্তৃতি সাধন করা হইবে, এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়।

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের উত্তরোত্তর উন্নতির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই আশা করি যে, ইহার দৃষ্টান্তে বাঙ্গালা দেশে আরও সূতার ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ফলে আচ্ছাদন বিষয়ে বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা দূর হইয়া যাইবে।

শ্রমিকদিগকে বাদ দিলে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। ইহার পরিচালক হইতে কেরাণী পর্য্যন্ত সকলেই বাঙ্গালী। এককালে এই কলেও ইংরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ রাখিতে হইয়াছিল এবং পরামর্শদানের জন্য বোম্বাইয়ের কোন ব্যবসায়ীকে মাসিক পারিশ্রমিক দিতে হইত। যত দিন বাঙ্গালীরা কাযটা শিখিয়া লইতে পারেন নাই, তত দিনই ইহার প্রয়োজন ছিল এবং সুখের বিষয়

তূলো পেঁজা যন্ত্র।

প্রয়োজন শেষ হইবার পর আর এক দিনও সেই সব অনাবশ্যক ব্যয় করা হয় নাই। এই কলে কায শিখিয়া শিক্ষিত যুবকরা যে ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কলের কায চালাইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। *

* চিত্রগুলি 'বসুমতী'র তত্ত্ব শিল্পী টি, পি, সেন কর্ত্তৃক গৃহীত।—সম্পাদক।

মিলন-রাত্রি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমার সন্তোষের বাম বাহুমূল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, পিস্তলের দ্বারা সে আহত হয় নাই। ক্ষতলক্ষণে কোনরূপ বিস্ফোটক দ্রব্যের আঘাতই প্রতীত হয়। ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ হাতটা কাটিয়া দিলে সে বাঁচিতেও পারিত — কিন্তু এখন সে ক্ষত যে ভাবে অবশ্যঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতে সে আশা অল্প ;—তথাপি বাহুচ্ছেদ ছাড়া তিনি অন্য কোন উপায় দেখিলেন না।

অপারেসনের পর প্রায় সপ্তাহকাল কাটিয়া গিয়াছে। রোগীর অবস্থা আজ অল্প ভাল, মাঝে মাঝে সে চেতনালাভ করিতেছে, কিন্তু মানুষ চিনিবার শক্তি এখনও ফিরে নাই,—কথাবার্ত্তাও খুব এলো-মেলো। একবার চক্ষু মেলিয়া অনাদির দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"গুরুদেব ?"

অনাদি এখানে আসিয়া অবধি তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে। হাঁসপাতালের দুই একজন কম্পাউণ্ডার সহকারী মাত্র, মাঝে মাঝে আসিয়া অনাদিকে অব্যাহতি প্রদান করে। ডাক্তারের আদেশে বাহিরের লোকের এখানে একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। সন্তোষের দলের লোক এ পর্য্যন্ত কেহ জানেও না যে সে পীড়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, — সকলেই জানে সন্তোষ রাজার কাছে কলিকাতায়।

অনাদি সন্তোষের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিল,—"কি সন্তোষ, ভাল আছ ত ?"

সে প্রশ্ন রোগীর মাথায় পৌছিল না - সে পূর্ব্বের ন্যায় বিজড়িত অস্পষ্ট স্বরে কহিল,—"দেশশত্রু শরৎকুমার — মেরেছি তাঁকে গুরুদেব।"

বলিতে বলিতে সে আবার চক্ষু বুজিল। কিছু পরে পুনরায় চোখ খুলিয়া সে বলিল, "আপনার আদেশ পালন করেছি —সে মরেছে।" উগ্র আহ্লাদে সে হাসিতে চেষ্টা করিল, — পারিল না— হাসির ভঙ্গীতে তাহার মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল।

অনাদি ব্রাণ্ডি-মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ তাহার মুখে প্রদান করিল, পান করিয়া সে নিঝুম হইয়া রহিল,—সে দিন আর কোন কথাই কহিল না।

শরৎকুমারকে মারিবার উদ্দেশ্যে বোমা প্রস্তুত করিতে গিয়া তাহার দ্বারাই যে সে নিজে ঘায়েল হইয়াছে, সন্তোষের কথা হইতে সকলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিলেন।

দ্বিতীয় দিন শরৎকুমার আসিয়া তাহাকে ঔষধাদি দিবার পর সহসা সে বিছানায় উঠিয়া বসিল,—তাহাকে দেখিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি—ওঃ ১৫ নম্বর ?"

শরৎকুমার মস্তকের ইঙ্গিতে মৌনে তাহার কথায় সায় দিয়া— ধীরে ধীরে তাহাকে পুনরায় বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। সে কহিল,—"বিজুমিঞা, জয় ভবানী,—জ্বালাও লণ্ঠন,—দোলাও নিশান,—"

শরৎকুমার বুঝিলেন,—লণ্ঠন অর্থে স্বাধীনতার আলোক, তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"জয় জয়—জ্বালো আলো—" এ কথায় তাহার মুখটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু ওষ্ঠাধরে অল্প একটু হাসির রেখাপাত হইতে না হইতে তাহার নয়ন মুদ্রিত হইয়া পড়িল। সহসা কিছু পরে জাগিয়া সে বলিয়া উঠিল—"সে কাগজখানা ?"

"কি কাগজ ?"

"বুঝতে পার না,—রাজার—রাজার—"

বলিয়া আবার নীরব হইয়া পড়িল। শরৎকুমার ও অনাদি উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—রাজার কি না জানি কাগজ সে আত্মসাৎ করিয়াছে।

কিন্তু সে দিন তাহার নিকট হইতে আর কোন কথাই পাওয়া গেল না।

তৃতীয় দিন সকালে ক্ষতস্থানে ঔষধাদি দেওয়ার পর

সে বেশ যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। ডাক্তারের দিকে পূর্ণকটাক্ষে চাহিয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ডাক্তার বুঝিলেন,—তাঁহাকে সে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং এই প্রয়াস-শ্রম তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে এখনই ক্লান্ত করিয়া তুলিবে, তিনি তাহার চক্ষুর আড়ালে গৃহের অন্যত্র সরিয়া গেলেন,—অনাদি সন্তোষের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। অনাদিকে সে বেশ সহজেই চিনিতে পারিল,—তাহার দিকে চাহিয়া আহ্লাদিতভাবে কহিল,—"ভাই অনাদি, তুমি কি সেবাধারী হয়েছ?"

"হয়েছি বই কি?"

"তবে একটা কথা বলি শোন।" বলিয়া সাবধানতা অবলম্বনে অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"সব অস্ত্র চুরী করেছি—ভুলক্রমের খুব সুবিধা।"

"ধনুকটাও চুরী করেছ?"

"না না, বড় ভারী! তুই কি নিবি? বন্দুক না তলোয়ার?"

ধনুক তাহা হইলে সে চুরী করিতে যায় নাই, সম্ভবতঃ অন্য কোন কারণে আলনা হইতে দেয়ালচ্যুত হইয়া তাহা নীচে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

অনাদি উত্তর করিল,—"পিস্তল চাই আমি।"

এই কথায় তাহার মনে পড়িল—আর এক কথা—সে কহিল,—"পিস্তল—হাঃ হাঃ ডাক্তারেরা বাক্সে—"

"কেন?"

"তাকে চোর ভাব্‌বে,—দেশশত্রু, সে দেশশত্রু—পার করেছি তা'কে।"

অনাদি বলিল,—"বেশ করেছ—কিন্তু তা'র অপরাধ?"

"রাজকুমারী যে তা'র বাধ্য—গুরুদেব?—গুরুদেব?"

বলিতে বলিতে সন্তোষের চোখ বুঝিয়া আসিল, শরৎকুমার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় বরফ-জল ও অনাদি মুখে পানীয় দিতে লাগিলেন। কিছু পরে সে চোখ মেলিল,—অনাদি জিজ্ঞাসা করিল, "কাগজখানা?"

সে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া উত্তর করিল,—"কাগজ—চেক, হুবহু সই করেছি বিজু মিঞা।"

কি সর্ব্বনাশ! রাজার চেক চুরি করিয়া জাল সই করিয়াছে নাকি!

অনাদি কহিল,—"কোথায় রেখেছ?"

"পকেটে।"

ঘরের আল্‌নায় টাঙ্গান সন্তোষের পিরাণটা শরৎকুমার হাৎড়াইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কিছুই পাইলেন না। কিছু পরে সন্তোষের চেতনা একটু ফিরিয়া আসিলে অনাদি তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"চেক কোথায়? পকেটে ত নেই—?" সে শূন্য দৃষ্টিতে অনাদির দিকে চাহিয়া বলিল, "গুরুদেব?"

"চেক কোথায়?"

"দেরাজে—দেরাজে।"

শরৎকুমার লাইব্রেরী ঘরে সন্তোষের পূর্ব্বাধিকৃত দেরাজ খুঁজিতে চলিয়া গেলেন।

সন্তোষের জ্বর বাড়িতে লাগিল,—বিঘোরে সে নিঝুম হইয়া রহিল। সহসা দ্বিপ্রহরের পর একবার চোখ মেলিয়া অনাদিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুদেব, এখনি কি যেতে হবে?"

"কোথায়?"

হাসির ভঙ্গীতে সন্তোষের ওষ্ঠাধরে সামান্য রেখাপাত হইল—সে কহিল,—"ভুলে গেলেন, ভুলক্রমে?"

অনাদি বুঝিল সে ডাকাতীর কথা বলিতেছে,—তাহার মাথায় বরফ-জল দিতে দিতে অনাদি কহিল,—"হাঁ, যেতে হবে বই কি। কোথায় বল ত?"

এ কথার উত্তর না করিয়া সে বলিল,—"যাচ্ছি চল। সর্দ্দার সুলতানজি, তোগলক মিঞা—বাজিমাৎ করেছ, গুড় গুড় গুড়ুম—"

এই সময় শরৎকুমার গৃহ প্রবেশ করিলেন, সে তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া হঠাৎ ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ও কে? ও কে? ডাক্তার? আমাদের আড্ডায়! সর্ব্বনাশ! সব প্রকাশ ক'রে দেবে—দেশশত্রু, ও দেশশত্রু! মার ওকে, মার—"

বলিতে বলিতে অতিরিক্ত উত্তেজনাবশে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং পিস্তল ছুঁড়িবার ভঙ্গীতে ডান হাতটা উঠাইয়া ধরিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া আবার শয্যায় টলিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ প্রাণবায়ুটুকু দেহ-বহির্গত হইয়া গেল।

* * *

শরৎকুমার নব কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত লাইব্রেরী ঘরের

আলমারি, ডেস্ক, দেরাজগুলি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কোন কাগজ-পত্র নব কার্য্যাধ্যক্ষ নষ্ট করে নাই। কাযের খাতাপত্র গুছাইয়া টেবিলে রাখিয়া বাজে কাগজপত্র তাড়া বাঁধিয়া থাকে তুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোন তাড়ার মধ্যে চেক পাওয়া গেল না, সন্তোষের সম্পত্তির মধ্যে একটা গুপ্ত দেরাজে—যাহার সন্ধান কার্য্যাধ্যক্ষ জানিত না—একখানা নোট-বই আর দেয়ালের গায়ে কাঠের থাকের উপর একটা বিস্কুটের ভাঙ্গা টিন দেখিতে পাইলেন। টিনের মধ্যস্থিত দুই একটি আরকের শিশি—তাঁহার অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিল। টিনটা ঝাড়ুদার পরদিনই তুলিয়া থাকে রাখিয়াছিল। শরৎকুমার টিনটা সরাইয়া তাহার জিনিষপত্র সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপ খোঁজাখুজির পর হাঁসপাতালে পৌছিতে তাঁহার অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়িল, পৌছিবার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পাঠক জানেন।

শরৎকুমার রাজাকে চেকের কথা জানাইতে সেইদিনই কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। দাওয়ানেরও যাইতে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু লাটের খাজনা সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিলেন না। সন্তোষ-সংক্রান্ত ঘটনা পুলিসকে জানান হইবে কি না—এ সম্বন্ধে রাজাদেশ কি, তাহা জানিয়া দেওয়ানকে লিখিবার ভার তিনি ডাক্তারকেই প্রদান করিলেন। অনাদিও শরৎকুমারের সহিত গেল না। সন্তোষের প্রলাপবাক্যে ডাকাতী সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল—তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, সন্ধানের জন্য সে প্রসাদপুরে রহিয়া গেল। যে খাতাখানা শরৎকুমার সন্তোষের দেরাজ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, শবদাহ করিয়া আসিয়া অনাদি সেইখানা পড়িতে বসিয়া গেল।

ডাক্তারের সঙ্গে এইরূপ বোঝাপড়া রহিল যে, অনাদি দুই এক দিনের মধ্যেই কলিকাতায় যাইবে; তবে যদি এখানে আরও কিছুদিন থাকা দরকার বোঝে ত পত্রে সে খবর ডাক্তার জানিতে পারিবেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় রাজার সমস্ত চেক মিলাইতে বলিলেন। চেকের মুড়ি শুদ্ধ চুরি গিয়াছে—সুতরাং কেবল নম্বর মিলাইয়া চুরি-চেক ধরা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। যাহা হউক, অনেক কষ্টে চুরি চেকের নম্বর যদি বা ধরা পড়িল—কিন্তু কোন্ নামে সে চেক কাটিয়াছে—টাকাই বা কত, তাহা ত বুঝা গেল না। তবে ব্যাঙ্কে গিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন যে, সে নম্বরের চেক কেহ ভাঙ্গাইয়া লয় নাই।

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ তাহাদের আদেশ দিয়া আসিলেন যে, সে নম্বরী চেক কেহ ভাঙ্গাইতে আসিলে টাকা না দিয়া চেক আটকাইয়া রাখিয়া যেন তাঁহাদের খবর পাঠান হয়। রাজার মাথার উপর দিয়া খুব একটা বিপদ কাটিয়া গেল। ইহাতে সকলেই বেশ একটু স্ফূর্ত্তি বোধ করিলেন।

অশ্ব চুরি সম্বন্ধে রাজাদেশে এ পর্য্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হয় নাই—চেকের কথাও রাজা অপ্রকাশ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। আসল কথা, প্রকাশ করিলেই ছেলেদের প্রতি পুলিস জুলুম আরম্ভ করিবে,—তখন তিনি ইচ্ছা করিলেও সে নির্য্যাতন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মাণিকতলার রাজপ্রাসাদে অপরাহ্ণ কালে রাজকুমারীর পাঠগৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয় কুন্দের সহিত গল্প করিতেছিলেন।

ভট্‌চায মহাশয়ের হাতে শিকলিবাঁধা তাঁহার ময়না পাখীটি তিনি কুন্দের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"লও কুন্দ, এটি আমার প্রাণপাখী, তোমার জন্যে এনেছি।"

পণ্ডিত মহাশয় অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে, ইংরাজের অনুকরণে আংটীদানে কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখা ব্রাহ্ম পদ্ধতি। কিন্তু কুন্দের সংস্পর্শে আসিয়াও টোলের প্রাক্তন সংস্কার হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই—চটি জুতা পরা পা দুখানা বিলাতি ষ্টিরাপের মধ্যে দিয়া ঘোড়ায় চড়ার কায়দাতে এখনও তিনি অনভ্যস্ত, অতএব নব্য সম্প্রদায়ের মত আংটীদানে engaged হইতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। মূল্যবান্ আংটী দিতে পারিলেও বা এ লজ্জাকুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন,—একটা সামান্য আংটী পরাইতে পরাইতে কি ভাষায় তিনি তাঁহার অসামান্য প্রেম প্রকাশ করিবেন? এই অকূল আকুল চিন্তা-তরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে তাঁহার মনোতরী সহসা কূল দেখিতে পাইল,—কুন্দকে উপহার দিবার জন্য তিনি তাঁহার আদরের ময়না পাখীটি লইয়া আসিলেন, ইহার মত মূল্যবান্ জিনিষ তাঁহার আর কি আছে!

কুন্দ কিন্তু ইহার মূল্য ঠিক বুঝিল না; সে রাগ করিয়া কহিল,—"আপনার পাখী আপনি রাখুন, আমি চাইনে। আমি জ্বলে মরছি এখন নিজের দুঃখে, এই সময় আবার আপনি এলেন জ্বালাতন করতে।"

কুন্দের নিকট এ রকম কথা শোনা পণ্ডিত মহাশয়ের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তিনি ইহাতে দমিলেন না—কেবল বাড়ান হাতটা টানিয়া যথাস্থানে রাখিয়া পাখীটার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; পাখী মধুরকণ্ঠে "কুন্দ কুন্দ" বলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—"কি হয়েছে, কুন্দ! কিসের দুঃখ?"

কুন্দ দুঃখের স্বরে কহিল, "বড় বিপদে পড়েছি, পণ্ডিত মশায়।"

সে স্বরে কৃত্রিমতা ছিল না; পণ্ডিত মহাশয় নিজেকেই বিপদ্‌গ্রস্ত বিবেচনা করিলেন—উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—"কি বিপদ্‌! বড় যে ভাবনা লাগিয়ে দিলে! তোমার কি ফের অসুখ করেছে? আবার বাড়ী যাবে না কি, তা হলেই ত সর্ব্বনাশ!"

কুন্দের বিষণ্ণ মুখেও কৌতুকরেখা ফুটিল। মৃদুহাসি হাসিয়া সে কহিল,—"না সে সব কিছু না—"

"তবে কি?"

"আমার দাদা ও সন্তোষদাকে রাজাবাহাদুর কর্ম্মচ্যুত করেছেন।"

"কেন? কি অপরাধে?"

"অস্ত্রশালা থেকে বন্দুক-টন্দুক কি সব নাকি চুরি গেছে।"

পণ্ডিত মহাশয় ভাবিতভাবে কহিলেন, "তোমার দাদার অমন মোটা মাইনের চাকরীটা গেল! ভাববারই ত কথা!"

"কিন্তু দাদা ত আর চুরি করেন নি। তবে তাঁর এ সম্বন্ধে কতকটা গাফেলি হয়েছে বটে। সন্তোষদা না কি—তার ছেলেছোকরা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে অস্ত্রশালায় আড্ডা করত। তা' দাদা কি ক'রে জানবেন যে, ভদ্রলোকের ছেলেরা চোর হবে।"

"তা ত ঠিক।"

"এই কথা যদি রাজাবাহাদুরকে কেউ বুঝিয়ে বলে!"

"তোমার দাদা কি তা বলেন নি?"

কুন্দ একটু চটা মেজাজে কহিল,—"তিনি কি বলেছেন না বলেছেন, আমি জানিনে—সম্ভবতঃ বলেছেন,—কিন্তু ফল কিছু হয়নি। এখন সুপারিসই একমাত্র শেষ উপায়!"

"তুমিই ত রাজাবাহাদুরকে বলতে পার।"

"সাহস হয় না,—পণ্ডিত মহাশয়; আপনি বলুন।"

সানুনয়কণ্ঠে কুন্দ এই অনুরোধ করিল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন;—"আমি রাজাবাহাদুরকে বলব! আমি যে কখনও মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইনি! বেশ মুরুব্বি ধরেছ, কুন্দ!"

"তবে রাজকন্যাকে বলুন। তা' ত পারবেন? তিনি যদি রাজাবাহাদুরকে বলেন—তবে দাদা নিশ্চয়ই মাপ পাবেন।"

"কেন রাজকন্যা ত তোমারই প্রিয়সখী, কুন্দ বলতে তিনি অজ্ঞান—তুমিই বল না।"

"না, আমার ভাইয়ের কথা বলতে আমার লজ্জা করে, বিশেষ তিনি যখন কতকটা দোষী।"

আসল কথা, কুন্দ মনে মনে সন্তোষকে সন্দেহ করিতেছিল, সেইজন্য রাজকন্যার নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ। আমিই তবে রাজকুমারীকে বলব,—এখন পাখীকে রাখবে ত? 'কুন্দ কুন্দ' ক'রে চেঁচিয়ে ওর গলা যে ভেঙ্গে গেল, একটু আদর কর ওকে।"

পণ্ডিত মহাশয় কথা কহিতে কহিতে দাড়ের পরিবর্ত্তে অনবরত এতক্ষণ পাখীটির মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন, সে কখন দাড় পাতিয়া নীরবে আরামটা উপভোগ করিতেছিল, কখন বা মাথা তুলিয়া নাচিতে নাচিতে 'কুন্দ কুন্দ' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, কুন্দের এতক্ষণ সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না; পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় হাসিয়া সে এইবার পাখীটিকে হস্তে গ্রহণ করিল, পাখীটা আদর-প্রত্যাশায় মাথাটা নীচু করিয়া দিল, কুন্দ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের বহুদিনপ্রত্যাশিত মনের আকাঙ্ক্ষা সহসা যেন পূর্ণ হইল, এই চিত্রের দিকে আনন্দ-নির্নিমেষ-নয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু মর্ত্ত্যের আনন্দ চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী; সহসা মোটরের ভেঁপুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।

কুন্দ ব্যগ্রভাবে বলিল,—"রাজকন্যা আসছেন; যান, পণ্ডিত মহাশয়, এই বেলা যান; তাঁকে এই বেলা ধ'রে পড়ুন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের তখন যাইতে মোটেই ইচ্ছা করিতেছিল না, এই শুভক্ষণে যখন প্রেমালাপের জন্য তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে—তখনই কি না সৈনিক প্রথায় বিদায়ের কড়া হুকুম!

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুণ্ণচিত্তে কহিলেন,—"যাচ্ছি কুন্দ,এত তাড়াতাড়ি কি, তিনি ঘরে বসুন,—আমি তাঁকে গিয়ে বলছি।"

কুন্দ উৎকণ্ঠিত আবেগে বলিল,—"তিনি ঘরে আসবেন কি হাসিকে নিয়ে বাগানে বসবেন, কে জানে? তখন আর সুবিধা পাবেন না—যান—পণ্ডিত মহাশয়, এখনি যান—আর দেরী করবেন না।"

পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাখীর উপর ঝুঁকিয়া অশ্রুপূর্ণ দাড়িটা তাহার ঘাড়ে আদরভরে ঘষিয়া দিলেন। এই অবসরে তাঁহার আলম্বিত শ্মশ্রুর অগ্রভাগ কুন্দের হস্ত স্পর্শ করিল, তন্মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ বাহিত হইয়াছিল কি না কে জানে! কিন্তু মুখ তুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহার কোন লক্ষণ দেখিলেন না; পাখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"চন্দ্রম—ময়না, তুমি নূতন বন্ধুর কাছে সুখে থাক আর তোমার পুরান বন্ধুর কথা মাঝে মাঝে তাঁ'কে স্মরণ করিয়ে দিও।"

পাখী—'কুন্দ কুন্দ' বলিয়া কুন্দের বক্ষে মাথা রাখিল, সে ঐ কথা ছাড়া আর কোন কথা শিখে নাই। পণ্ডিত মহাশয় সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—মনে মনে বলিলেন,—"কি দুঃসাহস!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বংশী-বট।

ছায়া ঘন বংশী-বট যমুনার তীরে,
ঝল মল করে রৌদ্র—নবভ পল্লবে,
শিখী নাচে, শুক গায়, মুহুঃ কুহুরবে
মগ্ন মৌন কি সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য বিতরে।

বনপথে মরকতমণির মূরতি,
কস্তুরীতিলক-শোভা—গলে বনমালা,
মন্মথ-মথন রূপ প্রেম-মধু ঢালা
মনোমদ মাধুরীতে মরছায় রতি;

আসি বংশীবটতলে,—উন্মদ মধুর
সুর সঞ্চারিয়া বাঁশী বাজায় কিশোর,
শিহরি রভস-রসে আনন্দে বিভোর,
গোপী ধায় রাঙ্গা পায় মুখর নূপুর।

কোথা যমুনার জল—কোথায় গাগরী,
প্রেমাবেশে নাগরীর প্রাণ গেছে ভরি।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

আইন অমান্য তদন্ত।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এক সমিতি গঠনের জন্য সভাপতিকে ভার দেন। কেন না, কোন প্রকারে আইনভঙ্গ বর্ত্তমানে এ দেশে অনুষ্ঠিত হইতে পারে কি না—সমিতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে যাইয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের মত জানাইবেন। এই প্রস্তাব অনুসারে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে এক সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা তাহার সদস্য ছিলেন :— পণ্ডিত মতিলাল নেহরু; শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারিয়া; ডাক্তার এম, এ, আনসারী; শ্রীযুক্ত ভি, জে, পেটেল; শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও শেঠ এম, এন, ছোটানী। শেঠ যমুনালাল খদ্দরপ্রচারে ব্যস্ত থাকিয়া সদস্যপদ গ্রহণ করিতে না পারায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সদস্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণ হওয়ায় পদগ্রহণে অসম্মতি জানাইলে শ্রীযুক্ত কস্তূরীরঙ্গ আয়াঙ্গার সদস্য মনোনীত হয়েন। শেঠ ছোটানী সমিতির কার্য্যে যোগ দিতে পারেন নাই।

এই সমিতির কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমিতির নির্দ্ধারণের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আইনভঙ্গ –

বর্ত্তমানে দেশ সাধারণভাবে আইন অমান্য করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু দেশের কোন কোন স্থানে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যে, কোন বিশেষ আইন ভঙ্গ করা বা কোন বিশেষ কর প্রদান না করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সেই জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিয়মানুসারে সীমাবদ্ধভাবে আইনভঙ্গে সম্মতি দিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক সমিতিসমূহকে দেওয়া হইবে।

(এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত।)

(২) ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন –

গয়ায় কংগ্রেস ও খিলাফৎ প্রকাশ করিবেন যে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে পঞ্জাবের ও খিলাফতের অনাচার প্রতীকারে ও স্বরাজলাভের পথে বাধা পড়িয়াছে এবং লোকের উপর নানারূপ অত্যাচার হইয়াছে—ইহার প্রতীকারকল্পে অহিংস অসহযোগের মূল নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অসহযোগীরা পঞ্জাবের কথা, খিলাফতের কথা ও স্বরাজের বিষয় লইয়া সমধিক সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইবার চেষ্টা করিবেন। নির্ব্বাচনে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য হইলে যদি তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে "কোরামের" অভাবে কায বন্ধ হয়, তবে তাঁহারা সদস্য হইয়া তাহার পর আর ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন না; কেবল যাহাতে তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কায করিবেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কায বন্ধ হওয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে তাঁহারা বাজেট ও সরকারের উপস্থাপিত প্রস্তাবাদির প্রতিবাদ করিবেন এবং পঞ্জাবের ও খিলাফতের অনাচার-প্রতীকারকল্পে ও অবিলম্বে স্বরাজলাভচেষ্টায় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইলে তাঁহারা অধিবেশনে যাইবেন না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে না বলিয়া এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে না হইয়া প্রথম ভাগে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও শ্রীযুক্ত পেটেল এই মত প্রকাশ করেন। আর ডাক্তার আনসারী, শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী ও শ্রীযুক্ত কস্তূরীরঙ্গ আয়াঙ্গার বলেন—ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদ্ধতি পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে।)

(৩) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান –

কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যের সুবিধার জন্য অসহযোগীদিগের মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম করা যায় না। তবে অসহযোগীরা স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কায করিবেন।

(এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত।)

(৪) সরকারী বিদ্যালয় বর্জ্জন—

বর্ত্তমানে বিদ্যার্থীদিগকে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিতে আহ্বান করার প্রয়োজন নাই। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই শিক্ষার্থীরা তথায় আসিবে।

(এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত।)

(৬) শ্রমিকসঙ্ঘ—

যাহাতে ভারতীয় শ্রমিকরা তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করিতে পারে এবং বিদেশী ভারতের উপকরণ ও শ্রমের সুযোগে অতিমাত্রায় লাভবান্ না হইতে পারে, সে জন্য শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করাইতে হইবে।

(এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত।)
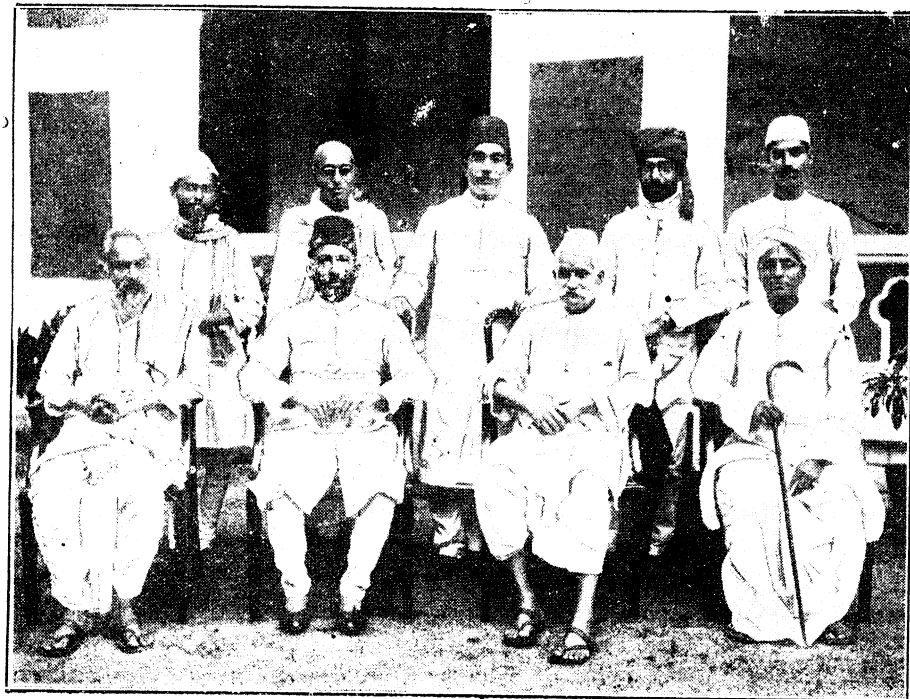
কংগ্রেস আইন অমান্য তদন্ত সমিতি।

দণ্ডায়মান—এম, এ, বসিত ; সি, রাজাগোপালাচারী ; এম, এ, আনসারী ; এইচ, এম, হায়াৎ ; লালজি মেহরত্রা।
উপবিষ্ট—ভি, জে, পেটেল ; হাকিম আজমল খাঁ ; পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ; এস, কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার।

(৫) আদালত বর্জ্জন—

পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চায়েতের দ্বারা মামলা নিষ্পত্তির জন্য লোকমত গঠিত করা কর্ত্তব্য। ব্যবহারাজীবদিগকে তাহাদের ব্যবসা ত্যাগ করাইবার প্রয়োজন নাই।

(এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত)

(৭) আত্মরক্ষার অধিকার—

কংগ্রেসের কার্য্যে ব্রতী থাকা ব্যতীত অন্য সময় সকলেই আইনসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন—তবে তাহাতে হাঙ্গামা না হয়। ধর্ম্মের অপমান, মহিলানিগ্রহ, লোকের উপর অবৈধ অত্যাচার, এ সকল ব্যাপারে আত্মরক্ষায় বলপ্রয়োগও নিষিদ্ধ নহে।

(এ বিষয়ে আর সকল সদস্য একমত হইলেও শ্রীযুক্ত পেটেল অতটা বাঁধা-বাঁধির পক্ষপাতী নহেন।)

(৮) বিলাতী পণ্য বর্জ্জন—

এ বিষয়ে মূলনীতি অবশ্য গ্রহণীয়। তবে অধিক ব্যক্তিদিগের দ্বারা গঠিত একটি সমিতি এ বিষয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে মত প্রকাশ করিবেন।

(এ বিষয়ে আর সকল সদস্য একমত। কেবল শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী বলেন, কংগ্রেস সমিতি মূলনীতি গ্রহণ করিলেও লোক ভুল বুঝিতে পারে এবং তাহাতে অহিংস অসহযোগের ক্ষতি হইবে।)

বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লইয়া কর্ম্মীদিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির দেশপ্রেমে ও আন্তরিকতায় কেহ সন্দেহ করে না। কিন্তু তাঁহারা কেন যে এ বিষয়ে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইলেন, দেশের লোক তাহাই বুঝিতে পারিতেছে না। সমিতির সদস্য ৬ জনের মধ্যে যে ৩ জন ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহারা লিখিয়াছেন, গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা যখন পাটনায় সমবেত হইয়াছিলেন, তখন ১ জন (শ্রীযুক্ত পেটেল) ব্যতীত আর সকলেই ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ৭ই অক্টোবর দিল্লীতে দেখা গেল, আরও ২ জন সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পাটনায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে, সাক্ষীদিগের অধিকাংশই বর্জ্জনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা দেশের কায করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন, যত দিন তাঁহারা মুক্তিলাভ না করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে বাধা সরকার দূর করিয়া না দিতেছেন, তত দিন সমিতি এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে এ বিষয়ের আলোচনা করা সমিতির মতে, জাতির আত্মসম্মানহানিকর ও অহিংস অসহযোগ অনুষ্ঠানের প্রতিকূল—"It would be against national self-respect and disloyalty to the cause and to those noble and self-sacrifising leaders and workers to entertain this question in their absence."

পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি বলিয়াছেন, ইহার পর তাঁহারা ৩ জন অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং বিবেচনা-ফলে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়। বোধ হয়, কাশ্মীর যাইবার পথে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশও সেই সময় অমৃতসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মতপরিবর্ত্তনের কারণ তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই।

যাঁহারা বর্জ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগের মূলনীতি পরিহার করা হইবে। এই বর্জ্জন ব্যাপারেই কংগ্রেস কর্ম্মীরা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং সার ভ্যালেনটাইন চীরলও স্বীকার করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন—একটি বড় গ্রামে কেহই ভোট দিতে উপস্থিত হয় নাই। কর্ণেল ওয়েজউড বলিয়াছেন—অপদার্থ স্বার্থপর লোকরা টাকা খরচ করিয়া সদস্য হইয়াছে—জাতীয় দল ব্যবস্থাপক সভা পরিহার করিয়াছেন—Incompetent self-seekers have bought their seats.

পঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তানম্ বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কমিটীতে ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশের প্রস্তাবের আলোচনাই করেন নাই—তাহাতে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষতি হইবে। যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কথাই আলোচিত হয়, তবে আর অসহযোগে প্রয়োজন থাকে না। যুক্তপ্রদেশের কমিটীর সম্পাদক পণ্ডিত হরকরণনাথ মিশ্র বলিয়াছিলেন, আজ যদি মহাত্মা গন্ধী লোককে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে বলেন, তাহা হইলেও লোক মনে করিবে, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে যে সর্ব্বতোভাবে অসহযোগ করা সম্ভব হইবে না, তাহা নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জের কথায় বেশ বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত কেলকার বলিয়াছেন, লোকহিতকর ব্যাপারে তাঁহারা সরকারকে সমর্থন করিবেন। এ অবস্থায় ৩ শত ২ জন সাক্ষী যে বলিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ, তাহাতে দেশের প্রকৃত জনমতই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

যাঁহারা দেশের কায করিয়া ৬ মাসের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না। এই আইনে মহাত্মা গন্ধী, লালা লজপৎ রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকৎ আলী,

বরদারাজালু, মৌলবী আবদুল, কালাম আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জনাব ইয়াকুব হাসান, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, পণ্ডিত সন্তানম্, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না। বিহারের জননায়ক বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সাক্ষ্যে স্পষ্ট বলিয়াছেন, এ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা কাপুরুষের কার্য্য— It would be cowardice to go. I use the word for want of a stronger term.

বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভা যে ভাবে গঠিত, তাহাতে অসহযোগীরা কিছুতেই বিশেষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারেন না। শাসন-সংস্কার আইনে বিধিবদ্ধ আছে—ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ৭০ ভাগ হইবে। কাজেই যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে হইলে নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জনকে স্বমতে পাইতে হইবে। ইহা কি সম্ভব? প্রদেশ হিসাবে নির্ব্বাচিত ও সরকারের মনোনীত সদস্যসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	নির্ব্বাচিত	মনোনীত
বাঙ্গলা	১৩৯	১১৩	২৬
মাদ্রাজ	১২৭	৯৮	২৯
যুক্তপ্রদেশ	১২৩	১০০	২৩
বোম্বাই	১১১	৮৬	২৫
বিহার ও উড়িষ্যা	১০৩	৭৬	২৭
পঞ্জাব	৯৩	৭১	২২
মধ্যপ্রদেশ	৬৮	৫৩	১৫
আসাম	৫৩	৩৯	১৪

এই যে সব নির্ব্বাচিত সদস্য, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত (Special representations) দলের প্রতিনিধিও আছেন। আমরা বাঙ্গালার কথারই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালায় এইরূপ সদস্যের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগদ্বয়ের য়ুরোপীয় প্রতিনিধি	৩
ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদ্বয়ের য়ুরোপীয় প্রতিনিধি	১
রাজসাহী বিভাগের য়ুরোপীয় প্রতিনিধি	১
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	২
বর্দ্ধমান বিভাগে জমীদারদিগের প্রতিনিধি	১
প্রেসিডেন্সী বিভাগে জমীদারদিগের প্রতিনিধি	১
ঢাকা বিভাগে জমীদারদিগের প্রতিনিধি	১
চট্টগ্রাম বিভাগে জমীদারদিগের প্রতিনিধি	১
রাজসাহী বিভাগে জমীদারদিগের প্রতিনিধি	১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি	১
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সওদাগর সভার প্রতিনিধি ...	৬
ইণ্ডিয়ান জুট মিল (পাটকল) সভার প্রতিনিধি	২
ইণ্ডিয়ান টি (চা) সভার প্রতিনিধি	১
ইণ্ডিয়ান মাইনিং (খনি সংক্রান্ত) সভার প্রতিনিধি	১
কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়েশন বা শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী সভার প্রতিনিধি ...	১
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি	২
মাড়োয়ারী সভার প্রতিনিধি	১
বঙ্গীয় মহাজন সভার প্রতিনিধি	১
মোট	২৮

এই ২৮ জনের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জন যে সরকারের সমর্থন করিবেন, এমন আশা অবশ্যই করা যায়। ইহা ছাড়া মনোনীত সদস্য ২৬ জন আছেন। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে বাদ দিলে ৮৫ জনের মধ্যে ৭০ জন অসহযোগী না হইলে অসহযোগীরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া মনোমত কায করিতে পারেন না। কিন্তু ৮৫ জনের মধ্যে ৭০ জন যদি অসহযোগী হইতেন, তবে ত তদন্ত সমিতি বলিতেন, দেশ আইনভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

যাহা দেখান হইল, তাহাতে বুঝা যায়, অসহযোগীরা ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারেন না যে, তাঁহারা সভায় না যাইলে কায বন্ধ হইবে। তাঁহারা যেরূপ সংখ্যায় যাইবেন, তাহাতে তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কোন অসুবিধাই হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের যদি সংখ্যাধিক্যও হইত, তাহাতেই বা কি? দিল্লীতে লেজিস্লেটিভ এসেম্বলী রাজত্বরক্ষণ আইন বর্জ্জন করিলে বড় লাট সরাসরি তাহা কাউন্সিল অব ষ্টেটকে দিয়া মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় লর্ড লিটন আসিয়াই স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভা যদি কয়টা খরচ নামঞ্জুর করেন, তবে তিনি তাঁহার বিশেষ অধিকারবলে তাহা মঞ্জুর করিবেন। সে

অধিকার লাটের হাতেই আছে। এ অবস্থায়—যখন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে কোন উল্লেখযোগ্য কায করিবার আশা নাই, তখন নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে বৃথা শক্তিক্ষয় করা কি কখন সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ?

যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে মহাত্মা গন্ধী প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের অনুগামী, তাঁহারা এমন কথাও বলিতেছেন—ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে তাহাতে অহিংস-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে না। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যে শক্তি নষ্ট হইবে, তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠন কার্য্যে আমরা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিব।

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। উভয় সমিতি প্রায় একই সময়ে নানা স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে কেবল এক জন—মিষ্টার জহুর আমেদ—ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর সকলেই ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, অসহযোগীরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন কি না, সে কথা এখন বিবেচনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এ পর্য্যন্ত দেশের লোক যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে সেই সকল ত্যাগী কর্ম্মী কারারুদ্ধ থাকিতে এ কথার আলোচনা করাও অপমানজনক। এখন দেশের লোককে স্বার্থত্যাগে ও কর্ম্মশক্তিতে উৎসাহিত করাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এখন লোকের দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কাযেই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কথার আলোচনা বর্ত্তমানে ইঙ্গিদ না করিলে অনিষ্ট অনিবার্য্য হইবে। যে স্থলে মুসলমান নেতৃগণের এই মত, সেই স্থলে—তাঁহাদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য।

খিলাফৎ আইন অমান্য তদন্ত সমিতি।
দণ্ডায়মান—আসফক আলি ; বসিত আলি ; মজহুর রেজ্জাক
উপবিষ্ট—মোয়াজ্জেম আলি ; টি, এ, কে, সেরওয়ানী ; ডক্টর আনসারি

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে সকল যুক্তি শুনিয়া মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছিলেন—তিনি অসহযোগীর পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কোন কারণ পাইলেন না। এখনও প্রবেশের পক্ষপাতীদিগের যুক্তির পরও অনেকে সেই কথাই বলিতেছেন এবং বলিবেন। যে ভাবে এবার নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে কর্ণেল ওয়েজউড বলিয়াছেন, এরূপ নির্ব্বাচন

না হইলেই ভাল হইত। অসহযোগীরা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিলেই বুঝা যাইবে—ইহাতে দেশের লোক সন্তুষ্ট নহেন। বিশেষ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও এক দিন বলিয়াছিলেন—স্বীকার করিয়াছিলেন, এখন ব্যবস্থাপক সভার বাহিরেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। সেই ক্ষেত্রে কায করিবার জন্যই তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন নাই। সে দিন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, আজও তাহাই বলিতে হইবে; কারণ, কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্য এখনও বহুপরিমাণে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

মহাত্মা গন্ধী তাঁহার কারাগার হইতে জানাইয়াছেন—বহু অসহযোগী মত পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলেও ক্ষতি নাই—প্রকৃত অসহযোগীর সংখ্যা অল্প হইলেও তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন—এবং তাঁহাদের দ্বারাই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

শ্যামহারা বৃন্দাবন।

কি আর শুনিবে, শ্যাম, বৃন্দাবনে তুমি বাম,
শ্যামহারা বৃন্দারণ্য অরণ্য কেবল;
নাহি হাস পরিহাস, নাহি গীত কলভাষ,
আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস, নয়নের জল।
নিশ্চল নক্ষত্র-ভাতি উজল করে না রাতি,
শোভে না সুধাংশু অংশু ব্রজের অম্বরে;
শ্যাম-চন্দ্র বিনা তা'র ঘুচিবে কি অন্ধকার
হৃদয়ে যে লভিয়াছে শ্যাম-শশধরে?
রবির কিরণ মাখি' আর নাহি গাহে পাখী;
কুসুমে শোভে না শাখী, রিক্ত তরুতল;
মলয় বহে না ধীরে; অলি না গুঞ্জরি ফিরে;
চঞ্চল যমুনা জলে নাহি কল কল।
কাননে না শুনি' বেণু শষ্প না পরশে ধেনু,
ব্রজের রাখালরাজে করে অন্বেষণ,—
শিখিপাখা শিরে ঝলে, বনমালা দোলে গলে,
অধরে মুরলী-খেলা ভুবন-মোহন।
নিরানন্দ ব্রজ-তলে কালিন্দী কাঁদিয়া চলে;
বিষণ্ণ বনানীবক্ষে উঠে দীর্ঘশ্বাস;
নদী কুলুকুলুস্বরে, তরুপত্র মরমরে
ভাসে শুধু ব্রজব্যাপী বেদনা-বিকাশ।
নন্দ আর যশোমতী বেদনব্যথিত অতি,
নয়নে নয়নধারা বহে অবিরল;
আঁখি অন্ধ হ'ল কাঁদি' স্নেহ দিয়ে অপরাধী!
ব্রজে কে প্রবোধ দিবে—সকলে বিকল?
নীলজলে যমুনার কামিনী-কুসুম আর
হাসে না—ভাসে না সুখে জললীলাছলে;
দিনশেষে যমুনায় ব্রজবালা নাহি যায়
শ্যামের বাঁশরী-স্বরে তমালের তলে;
করতালিতালে আর কঙ্কণ-শিঞ্জিতে তা'র
শিখী না নাচায় গোপী ভবন-অঙ্গনে;
লবঙ্গ মাধবীলতা ফুলভারে নহে নতা;
নাহি শোভা রক্তশোকে—পলাশে—রঙ্গণে;
যমুনা-প্রবাহ-প্রায় উছল যৌবন ভায়
লাবণ্য-আনন্দ ফুটে আননে—নয়নে
সে গোপী বিষণ্নমুখ বেদন ব্যথিত বুক,
নির্ব্বাপিত সুখদীপ আঁধার জীবনে;
পড়ে পত্র—নড়ে পাখী চমকিয়া চাহে আঁখি,
দূরাগত বাঁশীরব পশে কি শ্রবণে!
স্বপনে বাঁশরীস্বরে উঠি' বসে শয্যা'পরে
লুটায়ে কাঁদিতে শুধু বিরহ-শয়নে।
নাহি রসময় রাস, দোল—প্রীতিপরকাশ,
নিশীথে বাঁশরীস্বরে বনে অভিসার;
কুঞ্জে লভি' চিত্তচোরে বাঁধা প্রেম ফুলডোরে,
কাঁদায়ে কাঁদিয়া আঁখি মুছান আবার।
শ্যামসরসরোজিনী রাধা ব্রজসোহাগিনী
হিমম্লান কমলিনী বিরহ-ব্যথায়;
রাধা-নাথে ছাড়ি' আর কি রহিল রাধিকার?
শ্যামশিরোমণি তাই লুটায় ধূলায়;
বেদনা হৃদয় দহে কত আর ব্যথা সহে?
মূরছি পড়িছে রাধা কাঁদি' ধরাতলে;
আলুথালু কেশবাস, অধরে ফুটে না ভাষ,
বসন তিতিছে তাঁর নয়নের জলে।
শ্যাম বিনা রাধিকার জ্বালা কে জুড়াবে আর,
শ্যামের চরণ বিনা নাহি যা'র স্থান?
এ সংসার ব্রজবাসে ভক্তি শোভে মুক্তি-পাশে,
শ্যাম বিনা রাধিকার রহিবে না প্রাণ।

আগামী কংগ্রেস।

১

আগামী কংগ্রেস কি মূর্ত্তি ধারণ করবে, তা জানবার জন্য দেখছি আজকের দিনে অনেকেই উৎসুক। আমাদের পলিটিকাল নিকট ভবিষ্যৎ যে কংগ্রেসের মতিগতির উপর অনেকটা নির্ভর করবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলুক আর না-ই মিলুক, এ সত্য আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি নে, যে, দেশের বর্ত্তমান পলিটিকাল অবস্থায় কংগ্রেস হচ্ছে একমাত্র লৌকিক প্রতিষ্ঠান এবং কালক্রমে সে প্রতিষ্ঠান এতটা শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, আজকে কংগ্রেসকে দেশের রাজা-প্রজা কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না।

২

কংগ্রেসের কি করা উচিত, সে বিষয়ে নানা লোকের নানা মত আছে এবং সেই সব বিভিন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর-বিরোধী মত লোকে নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে এবং সেই সব মতের দ্বারা কংগ্রেস অবশ্য কতকটা চালিত হবে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত মতের প্রভাব কংগ্রেসের উপর যে খুব বেশী হবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। কেন না, কংগ্রেস পরের মতের দ্বারা ততটা চালিত হবে না, যতটা হবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দ্বারা। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করাই হচ্ছে পলিটিকসের ধর্ম্ম, আর কংগ্রেস হচ্ছে একটি পলিটিকাল সঙ্ঘ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা অনুমান করবার জন্য কংগ্রেসের অতীতের জ্ঞান আমাদের থাকা দরকার। এই বিশ্বাসে আমি সংক্ষেপে কংগ্রেসের ইতিহাস সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

৩

"ইলবার্ট বিল" নিয়ে দেশে যে আন্দোলন হয়েছিল,—তারি ফলে কংগ্রেস জন্মলাভ করে।—মিষ্টার হিউম জনকতক উচ্চপদস্থ উকিল ব্যারিষ্টার প্রভৃতিকে একত্র ক'রে বোম্বাই সহরে প্রথমে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, তার পরের বৎসর কলিকাতায় তার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, তার পর দু চার বৎসরের ভিতরই কংগ্রেস দেশের সর্ব্বপ্রধান পলিটিকাল সঙ্ঘ হয়ে ওঠে। ঐটি হ'ল দেশের একমাত্র পলিটিকাল মিলনক্ষেত্র; এবং এই হিসাবেই তা দেশের লোকের প্রীতি আকর্ষণ করলে। তার পর সেকালের গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের বিরোধী হওয়ায় সেটিকে বজায় রাখবার ও তার শ্রীবৃদ্ধি করবার জিদও বহুলোকের মনে জন্মলাভ করলে।

এই আদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, গভর্ণমেণ্টকে লোক-মত জানানো এবং গভর্ণমেণ্টের আইন কানুনের বিচার করা এবং এ কংগ্রেসের কর্ত্তাব্যক্তিরা ছিলেন সব উচ্চপদস্থ ও ধনী—আইনব্যবসায়ীর দল। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে,—কোনও বিশেষ আইন সম্বন্ধে আমরা আমাদের আপত্তি জানালে, সে আপত্তি গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করবেন, এবং কোনও বিষয়ে প্রজার দুঃখ জানালে, গভর্ণমেণ্ট সে দুঃখের প্রতীকার করবেন। সংক্ষেপে তাঁদের ধারণা ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে একটি হাইকোর্ট; অতএব কংগ্রেসের হওয়া কর্ত্তব্য একটি বার লাইব্রেরী। সুতরাং সে যুগে বক্তৃতা করাই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র কার্য্য। ফলে বড় বড় বক্তারা সব বড় বড় কংগ্রেসওয়ালা হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের সম্যক্ পরিচয় লাভ করবার পর গভর্ণমেণ্ট আর কংগ্রেসের প্রতিকূল থাকলেন না, এবং সত্যকথা বলতে গেলে তার প্রতি ঈষৎ অনুকূল হলেন। শেষটা দাঁড়াল এই যে, যাঁরা ওকালতিতে পয়সা করেছেন, তাঁরা এক দিন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হবার আশা মনে মনে পোষণ করতে লাগলেন, আর যাঁরা প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, তাঁরা হাইকোর্টের জজ হবার আশায় রইলেন, কেন না, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকে হাইকোর্টের জজ করা গভর্ণমেণ্টের একটা অ-লিখিত—আইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। শেষটা দেখা গেল যে, কংগ্রেসের দেহ আছে, কিন্তু তার প্রাণ নেই; আর তখন দেশের যুবকের দলের মনে কংগ্রেস সম্বন্ধে উৎসাহ কমে এল। এর পরও কংগ্রেস যে টিঁকে রইল, তার কারণ, কংগ্রেস ছাড়া দেশে আর কোনও সার্ব্বজনিক পলিটিকাল সঙ্ঘ নেই। তাই সকলেই কংগ্রেসকে ধ'রে থাকলেন ও বাঁচিয়ে রাখলেন। এই হ'ল কংগ্রেসের প্রথম পর্ব্ব।

তার পর যখন বুয়র যুদ্ধ হ'ল, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ, এই সূত্রে আমরা ইংলণ্ডের নব ইম্পিরিয়ালিজমের পরিচয় লাভ করলুম। যে বিশ্বাসের উপর পুরোনো কংগ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেশে এল প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ। এর ফলে দেশের লোকের চোখ পড়ল দেশের ইকনমিক অবস্থার দিকে। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে দরিদ্র দেশ, এ কথা আর চাপা রইল না। আর বিদেশী গভর্ণমেণ্টই যে দেশের দারিদ্র্যের কারণ, Digby, নাওরাজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই মত, এই নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। যখন দেশের লোকের এই ধারণা হ'ল যে, কংগ্রেস এত দিন তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে বকাবকি করেছেন,—যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে একমাত্র seperation of the executive and the judicial নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়াটা জাতির গোড়া কেটে তার আগায় জল দেওয়ারই সামিল। এই জ্ঞান হবামাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে একটা অস্পষ্ট ও বিরাট অসন্তোষ জন্ম লাভ করলে। লোকের মনের অবস্থা যখন এই, তখন বিলেতি ইম্পিরিয়ালিজমের অবতার Lord Curzon ভারতবর্ষের বড় লাট হয়ে এ দেশে এলেন। তাঁর প্রতি কথা, প্রতি কাজ এই অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে তুলতে লাগল। শেষটা বঙ্গভঙ্গের পর বাঙলাদেশে আগুন জ্বলে উঠল। দেখা গেল, লোকের মনে একটা নতুন ভাব জন্ম লাভ করেছে। দেশ উদ্ধার নিজ হাতে করতে হবে, এই বিশ্বাস লোকের মনে প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। এই সূত্রে কংগ্রেসে ফাট ধরলে। কংগ্রেসের প্রাচীন দল, প্রাচীন প্রোগ্রাম নিয়েই থাকতে চাইলেন। বাঙলার নূতন প্রোগ্রাম অর্থাৎ বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও সালিসি পঞ্চায়েৎ, কংগ্রেসের অবাঙ্গালী কর্তা ব্যক্তিরা প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। এ বিরোধ কলিকাতা কংগ্রেসে সুরু হয়, কিন্তু কলিকাতায় তা বহু কষ্টে চাপা দেওয়া হয়। সুরাটে ঐ দু'দলের মতবিরোধ আর চাপা থাকল না; ফলে কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল; মডারেট ও extremistয়ে বিচ্ছেদ ঘটল। কংগ্রেসে পলিটিকেল দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গের সৃষ্টি হ'ল। দক্ষিণমার্গীরা বামমার্গীদের কংগ্রেস হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে কংগ্রেসকে নিজেদের হস্তগত করলেন। এই সময়ে কংগ্রেস তার আইডিয়াল লিপিবদ্ধ করলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নাওরাজী বলেন,—"স্বরাজ" লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই স্বরাজ শব্দটির যে দুটি অর্থ হ'তে পারে, তা সে যুগের খবরের কাগজ পড়লেই দেখতে পাবেন। এক দল বল্লেন যে,স্বরাজ অর্থ autonomy with in the Empire, আর এক দল বল্লেন যে, ওর অর্থ autonomy without the Empire। যদিচ বাইরে থেকে দেখতে স্বদেশী প্রোগ্রাম নিয়েই দক্ষিণমার্গী ও বামমার্গীদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তবুও আসল কথা এই যে, সে বিচ্ছেদের মূল কারণ স্বরাজের এই বিভিন্ন আইডিয়াল। কাযেই মডারেটরা কংগ্রেসকে হস্তগত করেই কংগ্রেসের এই Creed তৈরী করলেন, যে Dominion self-government লাভই হচ্ছে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং যিনি ও Creed স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত নন, তিনি কংগ্রেসের সভ্য হ'তে পারবেন না। এই হ'ল কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্ব্ব।

৪

সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হবার পর; বাঙলা দেশে যুবকদের মধ্যে এক দল বিপ্লবপন্থী দেখা দিলে। তার পর গভর্ণমেণ্ট এই দলকে দমন করতে প্রবৃত্ত হলেন। কংগ্রেস টিঁকে থাকল বটে, কিন্তু দেশের সঙ্গে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমগ্র দেশ কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ল। তার পর বাইরে থেকে এল দেশের উপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা—গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের ধাক্কা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান হ'ল যে, এ যুদ্ধের ফলে সমগ্র মানবসমাজ একবার ভেঙ্গে পড়ে আবার নতুন ক'রে গড়ে উঠবে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে মানুষের যা কল্পনার অতীত ছিল, মানুষ তা চোখের সুমুখে ঘটতে দেখলে। রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণীর রাজপাট এক নিমিষে উড়ে গেল। পৃথিবীর সব চাইতে বড় ও প্রবল পরাক্রান্ত তিনটি সাম্রাজ্য একটির পর আর একটি ধূলিসাৎ হ'ল,—আর সে সব দেশে প্রজাই রাজা হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীর অপরাপর জাতের মত, ভারতবাসীরও মন একেবারে বদলে গেল। সকলের ধারণা হ'ল যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেরও একটা প্রকাণ্ড বদল হবে।

এই যুদ্ধ যখন চল্‌ছিল, তখন শ্রীমতী আনি বেসান্ত এক দিকে দেশে "হোমরুলের" দাবী তুললেন আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অনুবর্ত্তী হলেন। আর এক দিকে

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তার আইডিয়ালও ব্যক্ত করলেন। পার্লিয়ামেণ্ট থেকে বলা হ'ল যে, progresive realisation of self-goverment হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের আইডিয়াল। কংগ্রেসের মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার এল। দক্ষিণমার্গী ও বামমার্গী দু' দলই আবার কংগ্রেসে একত্র হলেন। তার পর এল reform। এই রিফরম নিয়ে দু' দলে আবার মতান্তর ঘটল। দক্ষিণমার্গীরা যা পেয়েছেন, তাই শিরোধার্য্য করলেন, আর বামমার্গীরা আরও বেশী দাবী করতে লাগলেন। এই নিয়ে এ দু' পক্ষের ভিতর আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সুরাটে মডারেটরা এর্কস্ট্রমিষ্টদের কংগ্রেস হ'তে বার ক'রে দিয়েছিলেন, এ ফেরা মডারেটরা নিজে হতেই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন। শেষটা অমৃতসর কংগ্রেসে ঠিক হ'ল যে, রিফরম সন্তোষজনকই হোক আর অসন্তোষজনকই হোক—কাউন্সিলে কংগ্রেসওয়ালাদের প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। এই হ'ল কংগ্রেসের তৃতীয় পর্ব্ব।

৫

তার পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে নন্-কো অপারেশনের প্রোগ্রাম গ্রাহ্য করতে বাধ্য করলেন। এ দলেরও আইডিয়াল হচ্ছে স্বরাজলাভ। কিন্তু এ মতে"স্বরাজের"অর্থ কি,তা প্রথমে বলা হ'ল না, শুধু এইমাত্র বলা হ'ল যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দেশের লোক স্বরাজ পাবে। কিন্তু দেশের লোকের দোষেই হোক্ আর যার দোষেই হোক্, গত ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ তারা পায়নি। সে তারিখে তারা পেয়েছে শুধু স্বরাজের definition। এ স্বরাজ মানে হচ্ছে Dominion self-goverment.

অতএব দাঁড়াল এই যে, কংগ্রেস অমৃতসরে যে অবস্থায় ছিল, আজ আবার সেইখানেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস আবার তার প্রোগ্রাম বদলাবে। যদি দেখা যায় যে,আসছে ডিসেম্বরে কংগ্রেস, কংগ্রেসওয়ালাদের কাউন্সিলে ঢোকবার অনুমতি দেন, তা হ'লে আর যিনিই হোন, আমি আশ্চর্য্য হব না।

৬

ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ আছে—এ সত্য উপেক্ষা করলে, কোন বিষয়েই কোনরূপ অনুমান করা যায় না। কংগ্রেসের পূর্ব্ব ইতিহাস থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, কংগ্রেসের মত সভা মধ্যপন্থী হ'তে বাধ্য। পৃথিবীর সকল দেশে চিরকালই সার্ব্বজনিক মত মাধ্যমিক মত। আর এই কারণেই বোলসিভিকরা তাদের প্রতিশ্রুত ন্যাশনাল assembly বসাতে দিচ্ছে না। কারণ, সকল সম্প্রদায়ের মত অনুসারে কায করতে গেলে নানা মতামতের যোগ-বিয়োগে একটা মাঝামাঝি মত দাঁড়িয়ে যায়, কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতের একাধিপত্য থাকে না। এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, কংগ্রেস ত নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করেছিল। তার উত্তর—বহু লোক ওটিকে একটি experiment হিসেবেই গ্রাহ্য করেছিল। তা ছাড়া উক্ত ব্যাপারে দু'টি পরস্পরবিরোধী মতের সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছিল। স্বদেশী যুগের বামমার্গীদের কাছ থেকে নন-কো-অপারেশনও সেই যুগের দক্ষিণমার্গীদের কাছ থেকে non-violence এই দুটি জুড়ে ঐ পুরো মতটি গড়া হয়েছিল। এ experiment সফল হ'ল না।

যে experiment ফেল করেছে, ফিরে ফিরতি সেই experiment করা যে বৃথা, বিশেষতঃ মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বের অভাবে, এ রকম বিশ্বাস কংগ্রেসের হওয়া অসম্ভব নয়। আর সে বিশ্বাস জন্মালে খুব সম্ভবত কংগ্রেস কাউন্সিল বয়কট করবার রায় উল্টে দেবেন।

তার জন্ম থেকে সুরু ক'রে অদ্যাবধি কংগ্রেসকে তিন তিন বার তিন দলের পলিটিসিয়ানরা হস্তগত করেছেন, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কোন দলই তা বেশী দিন নিজের দখলে রাখতে পারেন নি। এর কারণও স্পষ্ট। কোন বিশেষ পলিটিকাল সম্প্রদায় যদি দেশের লৌকিক পলিটিকসের উপর একাধিপত্য করতে চান ত তা করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কংগ্রেসকে ভাঙ্গা, তাকে হস্তগত করা নয়। যতদিন কংগ্রেস থাকবে, ততদিন তা একবার ডান দিকে ঝুঁকবে, একবার বাঁ দিকে ঝুঁকবে—কিন্তু অগ্রসর হবে মধ্যপথ ধরেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্বরাজ-সাধনা।

যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পূজ্য-পুরুষ স্বর্গীয় দাদাভাই নাওরোজী মহাশয় শেষ বারের জন্য সভাপতির আসনে অধিরূঢ় হইয়া "স্বরাজ" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখন হইতেই ঐ শব্দটি ভারতবাসীর রসনায় আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং বিবিধ মস্তিষ্ক কর্তৃক স্বরাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনুভূত হইয়া জনসমাজে উহা ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কেহ বলেন, স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর সংস্রববিরহিত ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা; কেহ বলেন, ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়া উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা; কেহ বা বলেন, বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া ঔপনিবেশিক প্রথা অনুসারে স্বদেশবাসীর দ্বারা ভারতের শাসন-যন্ত্র গঠন। এইরূপ যত প্রকার অর্থ ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বা হইতেছে, সব ই রাজনীতির দিক্ দিয়া।

এখন দেখা যাউক্, বাস্তবিকই রাজ-কার্য্যের সমস্ত অধিকার স্বদেশীয়ের হস্তে আসিলে-ই কি মানবের স্বরাজ-লাভ হয়? কাল যদি আমাদের মায়া কাটাইয়া এবং পরোপকারব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ইংরাজ এ দেশ হইতে চলিয়া যান আর আমরা ভারতবাসী স্বদেশীয়গণকে লইয়া নিজের পার্লামেণ্ট রচনা করি; কাল যদি নিযুক্ত হয় পার্শী প্রাইমমিনিষ্টার, গুজরাটী গভর্ণর, পঞ্জাবী কমাণ্ডার, ফারাক্কাবাদী ফরেন মিনিষ্টার, আলাহাবাদী লর্ড চান্সেলার, কানপুরী কণ্ট্রোলার, মাদ্রাজী ট্রেজারী লাট, পাটনেয়ে এটর্ণী জেনারেল, বাঙ্গালী গোলন্দাজ আর আসামী এডমিরাল, তাহা হইলেই কি আমরা সুখ-শান্তির চরম সীমায় উপনীত হইব,—বন্ধনীর বেদনার অনুভূতি হইতে মুক্তি পাইব?

যে স্বরাজের কথা বলিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহার অবতারণার পূর্ব্বে স্বরাজের আগে স্বায়ত্ত-শাসন নামে যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার জন্য আমরা লোলুপ হইয়াছিলাম, তাহার কতকটা করায়ত্ত করিয়া আমরা কিরূপ আরামে আছি, একবার বিচার করিয়া দেখিলে হয় না?

ধরুন, এই মিউনিসিপ্যালিটী ও—এই কলিকাতা কর্পোরেশনের গায়ে একটু আঁচড় দিয়া দেখিলেই ভারতবর্ষের ছোট বড় সকল মিউনিসিপ্যালিটীরই ধাত অনেকটা বুঝা যাইবে।

প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর হইল, মিউনিসিপ্যালিটীতে এই নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে অবধি তিন বৎসর অন্তর আমরা এক দিন স্বাধীন সিটিজন হইতেছি, মাথা হইতে ভোটের মোট নামাইয়া গা ঝাড়া দিতেছি। ভাগ্যক্রমে আমি এক জন ভোটার, তাই সেই ইলেক্‌শনের দিন কি ইলেসন! কি গরম মেজাজের, কি তারিফ তোয়াজের দিন! আমার মাৎসর্য্যের পূজার জন্য দন্তাবতার জমীদারপুত্র আমার ভাড়াটিয়া ভগ্ন কুঠুরীর দ্বারস্থ! কুসীদজীবী ধনকুবের আমার সম্মুখে যোড়হস্ত। মকেল-নাকাল-করা বড় বড় উকীল মনে মনে আমায় শালাজের ভর্ত্তা ও মুখে রক্ষাকর্ত্তা বল্‌ছেন আর সদ্যঃ ধোপ দেওয়া সাদা-প্রাণ রায় বাহাদুরের কি ঘনঘন "দাদা" সম্বোধন! আমি যাব এক জন, কিন্তু নে যাবার জন্যে দরজায় দাঁড়িয়ে একখানা মোটার, একখানা ল্যাণ্ডো, দু'খানা আফিস যান, তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস! জগন্নাথকে রথে তোল্‌বার সময় পাণ্ডারা তাঁকে ধ'রে খুব হেঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ী করে, অর্চ্চনার বেদনায় আমিও দারুব্রহ্মের ন্যায় আড়ষ্ট, 'ক্যাম্বিসওয়ালার' হেঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ী ক'রে একখানা রথের ভিতর আমায় ভরে দিলে, তার পর বাতাস—দুজনে দুদিক্ থেকে, একজন চাদর পাকিয়ে ঘুরিয়ে আর এক জন ভোটারলিষ্টের কাগজের বাড়ি—বাতাস! শেষ পোলিং অফিসে পৌঁছে-ই জলখাবার,—খেতেই হবে, আমি না খেলে ক্যানডিডেট কমিশনার বাহাদুর তিন দিন জলগ্রহণ করবেন না। আমার ইচ্ছা দু' রকম দু' গ্লাস সরবতে সেখানে চুমুক দিই, আর ডাবটা কচুরী দু'খান সিঙ্গাড়া দুটো নিমকীখানা সীতাভোগ মিহিদানা লেডিক্যানিং রাজভোগ রসগোল্লা গোলাপজলভরা বড় তালসাঁস আর 'আবার-

খাবা'টা মাটীর রেকাবি শুদ্ধ বাড়ী আনি, কিন্তু ভক্ত উপবাসী থাকিবেন এই আশঙ্কায় উদরস্থ উত্তম পুরুষকে সেই খানেই কিছু নিবেদন কর্‌তে হ'ল। এই যে এত অর্চ্চনা উপাসনা, খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি এ কেবলমাত্র আমাদের উপকারের জন্য; তাঁদের কোন-ই লাভ নাই; ইংরাজের সহবাসে থেকে থেকে তাঁদের ন্যায় এঁরাও পরোপকার মন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত হয়েছেন, এই যে আজ ষোড়শোপচারে ভোটার পূজা কল্লেন, এর শোধ নেবেন তিন বছর ধ'রে আগা-পান্তলা উপকার করে।

যেমন রিলিজন্ মানে ধর্ম্ম নয়,

আমার বিশ্বাস, সিভিলিজেসন্ মানেও সভ্যতা নয়; সে জন্য ও কথাটার আমি অনুবাদ করিব না। সিভিলাইজড-বাবুরা বলিবেন, 'স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়া আমাদের অনেক প্রকার মিউনিসিপ্যাল উন্নতি হইয়াছে; দেখ দেখি কি সব বড় বড় রাস্তা, কি গ্যাসের আলো, কি বিজলী বাতী, কি কলের জল ইত্যাদি ইত্যাদি'। অন্-সিভিলাইজ্‌ড আমরা বলি,—সত্যই তো, বড় বড় রাস্তা! কত শত শত ভদ্রাসন ভেঙ্গে চুরমার! কত সাত পুরুষের বাস্তভিটার অস্তিত্ব লোপ! যাক্ না লোকের ভিটা-মাটী, চুলোয় যাক্ লোকের বংশানুক্রমিক সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার স্মৃতিজড়িত ঘর-বাড়ী; দেখুক্ না গৃহশূন্য লোকে ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে টেলিফোনের থাম্বা ঠেস দিয়ে ট্রামের গেরাস্তারী চলাচল, মোটারের মুক্তিদাত্রী চক্রতল, লরী বোঝাই পাটের গাঁট, আর দুধারে দোকান বোঝাই বিলাতী বাণিজ্যের বেলোয়ারী হাট! বারো তেরো বৎসরের বালক-বালিকার নাসিকার উপর সিবিলাইজড চশমার কি বাহার, কি উন্নতি গ্যাস কেরোসিন বিজলী বাতির! এবং যে দেশে অন্-সিভিলাইজড জলসত্রের ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে পয়সা দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছি আর দু' গেলাস বেশী খাইলেই ওজন বুঝিয়া জরিমানা দিতেছি, এ সুখ বোধ হয় রামরাজ্যেও ছিল না! পঞ্জিকা খুলিলে দেখিতে পাই, ভগবান সূর্য্যদেব প্রায় প্রতিদিন-ই উদয়াস্তের সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু কলের জল ক্রণোমেটার ধরিয়া ঠিক দশটার সময় বন্ধ হইয়া যায়; আমি ত সহরের উত্তর প্রান্তে বাস করিয়া থাকি, এ ঝোপের মধ্যে তোপের আওয়াজ প্রায়ই পৌছায় না; সুতরাং কল বন্ধের সঙ্গে ঘড়ি মিলাইয়া লই। যখন প্রথম কলিকাতায় কলের জল হয়, তখন স্বায়ত্তশাসন মিউনিসিপাল আপিসে আসন প্রাপ্ত হয় নাই; তাই বোধ হয়, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল পূজা-পার্ব্বণের দিনেই দিবারাত্রি কলে জল পাওয়া যাইত; কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রথা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে; এবার দুর্গোৎসবের সময় দেখিলাম, বরুণদেব দিনে দশটায় যেমন মামুলী ছুটী লয়েন, তেমন-ই লইয়াছিলেন; তবে বোধ হয়, রাজার বাড়ী নাচ দেখিবার আশাতে-ই রাত্রিজাগরণটা করিয়াছিলেন। হয় ত হিন্দু কমিশনার বাহাদুররা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যখন সন্ধ্যার পরে-ই তাঁহারা গলগ্রহ ভাগিনেয়দিগকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রেরণ করেন, তখন পূজাবাড়ীতে রাত্রিতেই জলের প্রয়োজন; অবশ্য কর্পোরেশনে ব্রাহ্মণজাতীয় কমিশনারও আছেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় প্রতিমাও আনেন না, প্রসাদও বিতরণ করেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণবাড়ীতে সমস্ত দিনই যে জলের অত্যধিক প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের মিলও বলিয়া দেন নাই আর বার্ম্মিংহামের মিউনিসিপাল রিপোর্টেও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ দেখেন নাই।

মিউনিসিপালিটী আমাদের ভোগ পিপাসা

অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে পিপাসা মিটাই-বার খরচা দিবার শক্তি আমাদের আছে কি? একতালার চেয়ে দোতালায় শয়ন করিলে যে বেশী আরাম, তা পাগলেও জানে, হয় ত বা শরীরটা একটু বেশী ভালও থাকিতে পারে; তাহা বলিয়া যদি মিউনিসিপালিটী বাই-ল করেন যে, সকলকে দোতালা বাড়ী তৈয়ার করিতেই হইবে, না হইলে প্ল্যান মঞ্জুর করিব না; অথবা হেল্‌থ অফিসার হুকুম দেন যে, সকলকে প্রত্যহ একটা করিয়া পাঁঠার মুড়ি খাইতেই হইবে, বৈষ্ণব-দের পক্ষে আড়াই সের করিয়া দুগ্ধ, তাহা হইলে আমরা গরীবরা যাই কোথা? হয় ত কোন বিজ্ঞ ভাইস-চেয়ার-ম্যান বলিতে পারেন যে, তোমরা কলিকাতার ভিটা বেচিয়া উঠিয়া যাও; কিন্তু যাই কোথায়? কোনো চুলো কি রেখেছ? সিবিলিজেসন যে পল্লীগ্রামগুলির মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছেন, ম্যালেরিয়া ওলাউঠা যে সেখানে লুটো-পুটি করছে, তার ওপর এমনি সিবিলিজেসন বেড়েছে যে, শিক্ষার ধাক্কায় পুরাতন পুণ্যপিপাসাকে গলাধাক্কা দিয়া সঙ্গতিপন্ন দেশবাসীরা পুষ্করিণী খনন বন্ধ করিয়াছেন, সে টাকা

আর রোগ নিবারণের জন্য বিশুদ্ধ জলদানে ব্যয় না হইয়া রোগ হইবার পর মরিতে যাইবার জন্য হাসপাতাল প্রস্তুতে ও রায় বাহাদুরীয় বায়নায় দান করা হয়; অথবা কাকের বিশ্রাম আশ্রয়ের জন্য তাহাতে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়ন

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষত্ব-ই এই যে, প্রথমে দুষ্ট রসনার পরিতৃপ্তির জন্য অজীর্ণকর ভোজ্য আবিষ্কার, পরে প্রতীকারার্থ পরিপাকের ঔষধ প্রস্তুতকরণ। আবার মোরিয়া হইয়া যদিও কোথাও যাইতে চাই, সেখানে গিয়া খাইব কি? কেবলমাত্র মস্তিষ্কে বিদেশী বচনের বস্তা বোঝাই করিয়া আমরা যে একেবারে হস্ত-পদ চক্ষু আদির পক্ষাঘাত ঘটাইয়াছি; যাঁহারা পল্লীগ্রাম হইতে প্রত্যহ রেলে চড়িয়া লালদিঘীতে সেলাম ঠুকিতে আসেন, তাঁহারাও যে বৈকালে বাড়ী ফিরিবার সময় কলিকাতার বাজার হইতে বেগুণ মূলা সজিনাখাড়া কিনিয়া ঘরে ফিরিয়া যান; খিড়কিতে একটা মাচা বাঁধিয়া পুঁই গাছটা তুলিয়া দিবার শক্তিও CAT—Cat, DOG—Dogএর ঝাঁজে উঠিয়া গিয়াছে।

যে দেশে ঈশ্বরের নাম "দীননাথ" বলিয়া প্রচলিত, সেই দেশে "Survival of the fittest" বচনটি এখন ভগবদ্বাণী বলিয়া প্রচারিত হইতেছে; fittest বিনা richest সেই জন্য strongest; অর্থাৎ ধনবান্ শক্তিমান-ই জীবিত থাকার যোগ্য। মিউনিসিপ্যাল কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তর ও পূর্ব্বে খাল, দক্ষিণে আদিগঙ্গা (অনেক বাবু ইংরাজী কাগজ পড়িয়া যাঁহাকে এখন ভক্তিভরে টলির নালা বলেন) অথচ কলিকাতায় জলের কল, ছাঁকা আছাঁকা বারিবাহী নল আর তার বছর বছর বদল, এ বদলে বিশ পঁচিশ হইতে আশী নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা মিউনিসিপ্যাল মিটিংএ যেন খোলামকুচির মত কর্ত্তাদের মুখ থেকে ছড়াছড়ি হয়। কেন না, কলিকাতার সাহেবদের আর বাবুদের প্রাতর্বাক্যে বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত প্রয়োজন আর এই সারা বঙ্গদেশের ১ লক্ষ ৩০ হাজারের উপর পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতেই আষাঢ়ের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে, কোন গৃহস্থের মাথা ধরিলে সে এক গণ্ডূষ জলসেচনে মস্তিষ্ক শীতল করিতে ইতস্ততঃ করে। কেন না, তাহার গৃহিণী, কন্যা বা বধূ পদতল হইতে কেশস্তবক পর্য্যন্ত জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে দগ্ধ করিয়া ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তী কোন শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী হইতে দুই এক কলস মাত্র কর্দ্দমাক্ত পানীয় আনয়ন করিয়াছেন। গ্রামে দুঃখী লোকের বাস, তাহাদের তুচ্ছ unfit জীবনরক্ষার জন্য পুষ্করিণী খননে এমন কি-ই বা প্রয়োজন আর সেই খননকার্য্যের প্রণালী ধার্য্য করিতে বিলাতী বিশেষজ্ঞও আসিবে না এবং বড়জোর টাকা পঞ্চাশেকের বিলাতী কোদাল আবশ্যক হইবে, দু' পাঁচ লক্ষ টাকার পাইপ, বেণ্ড, ইয়ার্ডগলি, হাইড্রান্ট, কর্ক ইত্যাদি ইণ্ডেণ্টিত হইবে না।

মিউনিসিপ্যাল সুখের কতকটা ফর্দ্দ দেওয়া গেল। সম্ভ্রমও ততোহধিক, বাক্স খুলে টেক্স দিবার কি আরাম,—বেড়ে বেড়ে ত প্রায় কুড়ি পার্শেণ্ট দাঁড়িয়েছে, আবার সেই পার্শেণ্টেজ যে এসিসমেণ্টের উপর তা ছয় ছয় বৎসর অন্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে; আগে জানিতাম, মদ ও ঘৃত যতই পুরাতন হয়, ততই তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায়, কলিকাতা কর্পোরেশন বুঝাইয়া দিলেন, বাটী যত পুরাতন ও জীর্ণ হয়, ইটে যত নোণা ধরে, সুরকি চূণ যত রাবিশে পরিণত হয়, দরজা কড়ি যত উইএ খায়, ততই তাহার কিম্মৎ বৃদ্ধি পায়। এতে-ও খরচ কুলুচ্ছে না, স্বায়ত্ত-শাসন তাই জরিমানা করিবার জন্য মাইনে দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রাখিয়াছেন, এক জন ছিল, দুই জন হইয়াছে, এখনও বাড়িতে পারে, জামাইবাবু টামাইবাবু অবশ্য ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছে।

আসল কথা, স্বায়ত্ত-শাসনই বলি আর স্বরাজই বলি, রাজ অর্থে ত ইংরাজ ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না, বড় জোর সুইটজারল্যাণ্ড কি বুলগেরিয়া।

'সে দিন চলিয়া গিয়াছে—যখন খলিফারা ফকিরের ন্যায় জীবন-যাপন করিয়া ইসলামজগৎ শাসন-পালন করিতেন; সে দিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া আলমগীর নিজহস্তপ্রস্তুত টুপী বিক্রয় করিয়া আপনার কুটীর অর্থ সংগ্রহ করিতেন; সে দিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন রামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া ভরত অযোধ্যার সিংহাসনতলে বসিতেন; সে দিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন পথের অজ্ঞ লোক অসন্তুষ্ট শুনিয়া নিজের পতিহৃদয় ছিন্ন করিয়া রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীকে বনবাসে

পাঠাইয়াছিলেন; আর সে দিনও নাই—যখন উদয়পুরের রাণা আপনাকে একলিঙ্গের দেওয়ান ও জয়পুরাধিপতি গোবিন্দজীর কামদার বলিয়া পরিচয় দিয়া—রাজ্যাধিকারী ঈশ্বর. তাঁরা ভগবানের কর্ম্মচারী মাত্র জ্ঞানে প্রজা পালন করিতেন।

এখন রাজ্য মানে প্রথমে-ই আমরা বুঝি পার্লিয়ামেণ্ট; পার্লিয়ামেণ্টের নিষ্পত্তি, নির্ভর করে ভোটের উপর। **এই ভোট এক অদ্ভুত বস্তু।** বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, যশঃ. অভিজ্ঞতা, পদসম্পদ সবই ভোটমাহাত্ম্যে অঙ্কের সংখ্যার নিকট পরাস্ত। লয়েড জর্জ্জ, এস্কুইথ, ব্যালফোর, বোনার ল প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্তটা একটু ঘরের কাছে এসে দেখা যাক্। মনে করুন, যেন বছর কতক আগের কথা বল্‌ছি, গুরুদাসবাবু, রাসবিহারীবাবু এঁরা বেঁচে আছেন; ইউনিভার্সিটীর সেনেটে কোন এক নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণের জন্য গুরুদাসবাবু, রাসবিহারীবাবু, আশুতোষ মুখুয্যে মহাশয়, ষ্টিফেন্স সাহেব, হর্ণেল সাহেব, বাবু ব্রজেন্দ্র-শীল,দেবপ্রসাদবাবু,ডাঃ চুণিলাল এই রকম আরও জন-দশেক মিলে বল্লেন, এই প্রথাটা অবলম্বন কর্‌লেই কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হবে। অন্য দিকে কতকগুলি নবীন গ্রাজুয়েট আপনা-আপনি পরামর্শ ক'রে দল বেঁধে ঠিক কর্‌লেন যে, বুড়োদের আধিপত্য এবার নষ্ট কর্‌তেই হবে, ওদের এবার হারিয়ে দিতেই হবে। তার পর ভোট; একদিকে গুরুদাস প্রভৃতি সতের জন, অন্যদিকে যামিনী, কামিনী, অবলা এম, এ আঠার জন,——ব্যাস্. এক ভোট বেশী! হুও—সার গুরুদাস! হুও সার রাসবিহারী! হুও—সার আশুতোষ! হুও - ষ্টিফেন্স! হুও—হর্ণেল!

এই ভোটের 'শট্‌কে'র উপরই বিলাতী পার্লিয়ামেণ্ট চলিয়া আসিতেছে; উপরন্তু সেখানে আবার দলাদলিও আছে; হাফ আকড়ায়ের আসরে কনসারভেটিভেরা সখী-সংবাদ গাহিয়া গেলেন, পরে লিবারলরা আসর লইয়া তাহার উত্তর দিলেন; ইঁহারা ভোটের জোরে পোটের জোরে মিনিষ্টারাদি কর্ত্তা হয়েন, তাঁদের-ই ইচ্ছাতে শাসন-পালন, শোষন-পোষণ, দোহন-দাহন সব-ই হইয়া থাকে, ইংলণ্ডের লোক মনে করে, আমরা স্বাধীন; সেখানকার জনসাধারণ যথার্থ স্বাধীন হয় মাত্র বছর ৭।৮ অন্তর একটি দিন, যে দিন জেনারেল ইলেক্‌সন হয়। সে দিন আমাদের মিউনিসিপাল কচুরি-রসগোল্লার মত সেখানে ও পার্লামেণ্টারি বিয়র বিফ্‌ষ্টিক আছে। আমরা নিতান্ত কাঙ্গাল, তাই ভাবি, সেই স্বাধীনতা পেলে-ই স্বর্গ পাব; যেমন ক্যাঙ্গলা রাস্তা থেকে উচ্ছিষ্ট আখের ছুবড়ি কুড়িয়ে রস না পেলে ফেলে দিয়ে বলে, "শালা কি হ্যাঙ্গলা, একটু-ও রস রাখে নি, সব চুষে খেয়েছে!"

রাজনীতিক সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু কথা কই, সব ই ইংরাজের দেখিয়া, ইংরাজের কাছে শুনিয়া এবং ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া; মাতৃভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি সকল শব্দই ইংরাজীর অনুবাদ।

ইংরাজ বলিয়া থাকেন যে, **আমরা উপযুক্ত হইলেই রাজকার্য্যে** আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অধিকার প্রদান করিবেন। এই উপযুক্ত শব্দটির অর্থ বড়ই রহস্যপূর্ণ; পণ্ডিত তাঁহার পুত্রকে যে ভাবে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন,কৃষক তাহার পুত্রকে সে ভাবে উপযুক্ত করিতে চাহে না। কৃষক-পুত্র যদি ভূমির উর্ব্বরতার উপায়নির্দ্ধারণচিন্তা ত্যাগ করিয়া মেঘদূতের "কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা" কণ্ঠস্থ করিতে বসিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পিতা বলে, "ছেলেটা মাটী হয়ে গেল।" মুদী একরূপে ছেলেকে উপযুক্ত করে, ময়রা অন্য-রূপে করে; দর্জ্জি ও মুচির পুত্র ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পিতৃ-পেসার উপযুক্ত হয়; চোর ডাকাতের মনেও নিজ নিজ বংশধরদের উপযুক্ত করিবার ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে। জড়-বাদী ইংরাজ অত্যন্ত ভোগবিলাসী। বহু অর্থব্যয় ভিন্ন ভোগ-লালসা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না, সেই জন্য তাহার সমধিক অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন; অর্থ-ই তাহার ইষ্ট, অর্থ-ই তাহার অভীষ্ট, অর্থ ই তাহার উপাস্য; ইংরাজের পুরাণে সত্যযুগ নাই, স্বর্ণযুগ আছে। সত্যযুগে আর্য্যগণ নিত্য কাঞ্চনপাত্রে ভোজন করিয়া আবর্জ্জনা-জ্ঞানে তাহা পরিত্যাগ করিতেন, ইংরাজ কাঞ্চনের জন্য পাথারে প্রবেশ করেন, অগ্নিতে ঝাঁপ দেন, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া হিমানী-মণ্ডিত গিরিশিখরে, অগ্নি-সাগরতুল্য মরুভূমিতে উড়িয়া যাইতে চান।

ইংরাজ যখন দেখিলেন যে, আমরা বেশ বুঝিয়াছি, পেটে খাই না খাই, পথ চলিতে গ্যাস চাই, বৌএর জন্য দোতালায় কল চাই, অঞ্জলিপূর্ণ গিনির দৈনিক দক্ষিণা দিয়া বিলাত

হইতে বিশেষজ্ঞ না আনাইলে জল উর্দ্ধগামী কি নিম্নগামী হইবে, এ কথা কেহই ঠিক করিতে পারিবে না, এটা আমরা বেশ উপলব্ধি করিয়াছি এবং এই সব বিবিধ ব্যয়ের জন্য বিধবা মাসী পিসীকে হবিষ্য-দানে বঞ্চিত করিয়া টেক্স ও জরিমানা দ্বারা মিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার পরিপূর্ণ না করিলে আমরা অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত হইব, তখন বলিলেন, "বৎস, স্বাগতম্! আমাদের পার্শ্বে আসন লইয়া টেক্স বর্দ্ধন, জরিমানার উপায় নির্দ্ধারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট স্তবন, ভদ্রাসনভঞ্জন ও চৌরঙ্গীরঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তাবে ভোট দিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সুস্থশরীরে ও খোস-মেজাজে স্বায়ত্তশাসন ভোগ-দখল করিতে রহ।"

কখনও কখনও মফঃস্বলের কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ প্রতিবেশীদের অবস্থা বুঝিয়া টেক্স বৃদ্ধি করিতে ইতস্ততঃ করিয়া আপনাদের অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া বসেন, তখনই সরকার বাহাদুর তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া স্বায়ত্ত করায়ত্ত করেন।

আবার উদারহৃদয় পরোপকারী ইংরাজ রাজপুরুষগণ যখন দেখিলেন যে, আমরা স্বরাজ্য শব্দের সত্য অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি অর্থাৎ "স্ব" শব্দের সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনাই সভ্য মনুষ্যজন্মে সার ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তখন বলিলেন, "বৎস! স্বাগতঃ, দ্বিগুণ স্বাগতম্! এইবার তোমারা "রি-ফরম" কি না নব কলেবর ধারণ করিয়া কৌন্সিলে ব'স, মিনিষ্টার হও।—'সিবিলিয়ানদের মাইনে কমাও—মাইনে কমাও' বল্‌তে, এখন বুঝেছ ত বৎসরে চৌষট্টি হাজার টাকা পকেটস্থ না হইলে মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব কিছুই বজায় থাকে না।"

'উপযুক্ত' শব্দের আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রে প্রত্যহ দৃষ্টিপাত করিলেই সে কুয়াশা কাটিয়া যাইবে। দেখিবেন, সরকার প্রস্তাবিত সঙ্কল্পে 'তথাস্তু' বলিলেই দেশীয় মেম্বরগণের গুণগান ও বাহবাতে সেই সব সংবাদপত্র সমুজ্জ্বল। কেহ বলেন, "হায় হায়, এরা কোথায় ছিল এত দিন!" কেহ বলেন, "এমন রত্ন সব আগে আমরা চিন্‌তে পারিনি!" কেহ বলেন, "আর দেরি নাই, সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ ক'রে এরা দণ্ডচালনার উপযুক্ত হ'ল ব'লে!" কিন্তু যদি কেহ ঐরূপ কোন প্রস্তাবে ব'লে ফেলেন, 'নহি' 'নহি', অমনি রাগিণী বদলে গেল। তখন বুলি বেরুল "হায় হায়, এই বুদ্ধিতে এরা আবার স্বরাজ চায়! রাজনীতির চর্চ্চা করতে গেলে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন, তাও এদের নাই! ভাগ্যে ছিলেন চামড়াওয়ালা মহামান্য হাইড "সাহেব", নইলে ভারত আজ ভস্ম হ'ত; ইত্যাদি ইত্যাদি।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অভিশাপ।

(উইলমট)

যাহার পরাণ চরণে ঠেলিলে তাহার কি আর রাখিলে বাকী?
নিরাশা-অনলে দহি পলে পলে সে তার মরণ আনিবে ডাকি,
মেদিনীর স্নেহক্রোড়ের ছায়ায় ব্যথা তার শেষ হ'বে যবে,
সেদিন হইতে প্রণয়ের শাপ ধিকিধিকি তোমা দহিতে রবে।
তাহার পরাণ যেমন করিছে তোমারো তেমনি করিবে, জেন'
বিধাতা কি নাই? সতীর হৃদয় বিফলে বৃথায় ভাঙিবে কেন?

শ্রীকালিদাস রায়।

তুর্কীর কথা।

আঙ্গোরায় বড়োৎসব।

কামাল পাশার বিজয়বাহিনী স্মার্ণা অধিকার করিবার পর হইতেই তুর্কীর সম্বন্ধে ২টি বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—অন্যান্য জাতির সহিত তুর্কীর সম্বন্ধ স্থির করা, ও শাসন-সংস্কার করা। এই ২টি প্রধান ব্যাপারের তুলনায় আর সব কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যত দিন গিয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে, স্মার্ণার অগ্নিদাহের দায়িত্ব কামালের সৈনিকদিগের নহে। আঙ্গোরা সরকার বর্ব্বরোচিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। থ্রেস হইতে যে গ্রীক ও আর্ম্মাণীরা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহার কোন প্রকৃত কারণ ছিল না। কেবল তাহাই নহে, ইসমিদে ইংরাজ সেনাদলের অবস্থানে

পলায়নপর গ্রীক ও আর্ম্মাণীদল।

ইসমিদ।

তুর্কীরা কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। তুর্কীরা কেবল শান্তিতে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সম্ভোগ করিতেই চাহিয়াছে, আর কিছু নহে। চানক সম্বন্ধেও তুর্কীর কোন আপত্তি প্রকাশিত হয় নাই।

তবে স্মার্ণার পতনে যে তুর্কীর সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, স্মার্ণা ও থ্রেস পরহস্তগত হওয়ায় তুর্কদিগের বেদনার সীমা ছিল না। যে সুলতানকে পরে শাসন-ভারমুক্ত করা হইয়াছে, তিনিও বিজয়োৎসবে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মসজেদে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে জনগণ যে ভাবে কামালের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও অসাধারণ। সেরূপ শ্রদ্ধালাভ জাতির দুর্দ্দিনসহায়, রক্ষক ও ত্রাণকর্ত্তা ব্যতীত আর কেহ লাভ করিতে পারে না। কনষ্টাণ্টিনোপলে তাঁহার চিত্র বহন করিয়া শোভাযাত্রা হইয়াছিল। মসজেদের কাছে বিরাট জনসমাগম হয়।

কামালের সেনাদল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সর্ব্বত্র গমন করিয়াছে।

তুর্কীর শাসনপদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন তুর্কীরা পূর্ব্ব হইতেই

চানক।
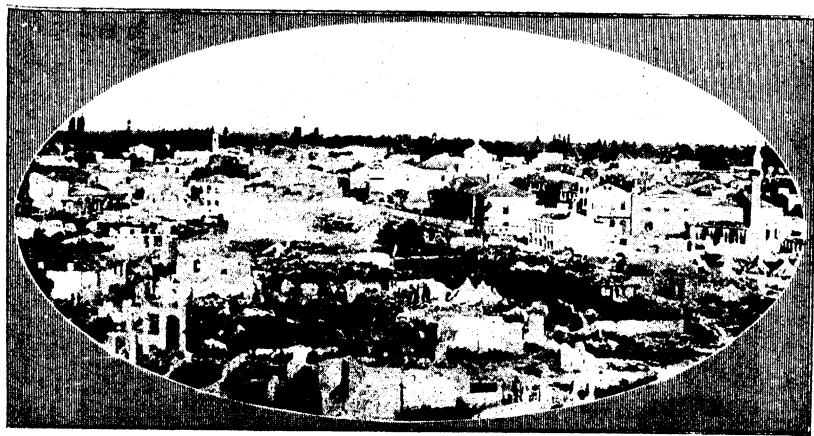
বিজয়োৎসব—সুলতান মসজেদে।

অনুভব করিতেছিলেন; সেই পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে না পারাতেই তরুণ তুর্করা এত দিন ঈপ্সিত সংস্কার সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। সুলতান সেই পদ্ধতির পরিচালক। সেই জন্য তুর্করা প্রথমে তাঁহাকে শাসনভার-মুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গুরু থাকিবেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ আপত্তি ছিল না। সুলতানের সহিত এই বিষয় আলোচনার ভার রেফেৎ পাশার উপর অর্পিত হয়। তিনি দীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল সুলতানের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং তখন সুলতান শাসনভার মুক্ত হইতে আপত্তি করেন না।

কামালের চিত্র লইয়া শোভাযাত্রা।

তদনুসারে তাঁহাকে কেবল ধর্ম্মগুরু খলিফা রাখাই স্থির হয়। ইহাও স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ওথমান-বংশ হইতেই উপযুক্ত লোক বাছিয়া খলিফা করা হইবে। তখন সুলতান তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে তিনি দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হয়েন এবং ইংরাজ তাঁহাকে যুদ্ধ-জাহাজে আশ্রয় দিয়া মালটায় পৌছাইয়া দেন। কেহ কেহ এমন কথা বলিয়াছেন যে, মুসলমানসমাজে বিরোধ বাধাইবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজরা এ কায করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের পক্ষে সে কথা অস্বীকার করিয়াছেন। রাজ্যচ্যুত সুলতান আশ্রয়

ইস্তাম্বুল মসজেদের বহির্ভাগে শোভাযাত্রা।

সম্রাট শাহজাহান
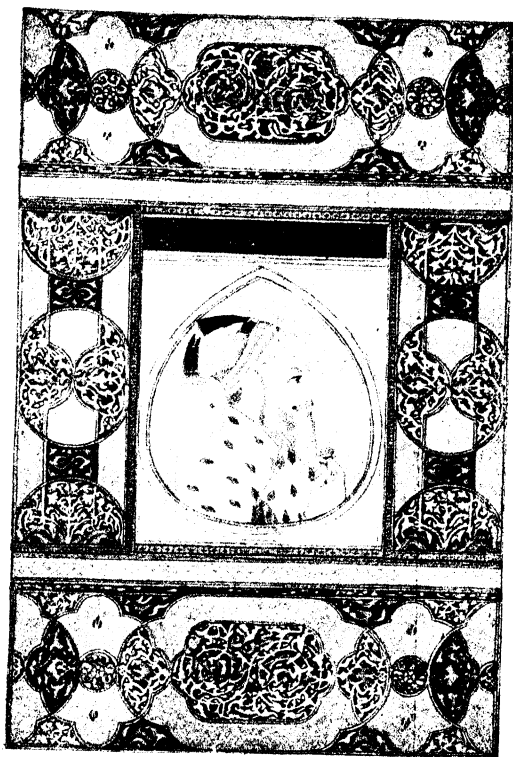
চাহিলে সে আশ্রয় প্রদান করা ইংরাজের পক্ষে দোষের বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন? ইহার পর তুর্করা নূতন সুলতান নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সুলতানের ও খলিফার নির্ব্বাচনে ইসলামের মূলনীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। ইসলামধর্ম্ম জগতে সর্ব্বপ্রধান গণতন্ত্রমূলক ধর্ম্ম; সুলতানের ও খলিফার নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইবে। ৬ষ্ঠ মহম্মদ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালে বহুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। জার্ম্মান-যুদ্ধের সময় তিনি কৈশরের অতিথি ছিলেন। তিনি তখন তুর্ক দলের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং স্বভাবতঃ কোন বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারিতেন না। প্রয়োজনীয়

রেফেৎ পাশা।

রাজচ্যুত সুলতান মহম্মদ।

কাযের সময় তিনি অন্তঃপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন!

এদিকে অন্যান্য জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য কামাল পাশা চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ফলে স্থির হয়, লসেনে পরামর্শ পরিষদ বসিবে। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায়—তুর্করা গ্রীকদিগের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছেন এবং কতকগুলি হস্তচ্যুত স্থান ফিরিয়া পাইতে চাহেন।

এই সময় লসেন-বৈঠকের অধিবেশনে বিলম্ব-সম্ভাবনা হওয়ায় তুর্কীর পক্ষে ইসমিত পাশা তাহাতে আপত্তি করেন; কারণ, আবশ্যক ব্যাপারের নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়া কোন পক্ষেরই সুবিধাজনক নহে। ইহার মধ্যে সময় সময় সংবাদ পাওয়া যাইত, তুর্কীর সহিত সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের বিরোধ বাধিবার উপক্রম হইতেছে; কিন্তু সুখের বিষয়, সেরূপ বিরোধ বাধে নাই।

লসেন-বৈঠকের উপর পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করিতেছে। যে তুর্কী জার্ম্মান-যুদ্ধে পরাভূত

হইয়া অনন্যোপায় হইয়া কতকগুলি সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বর্ত্তমান তুর্কী সে তুর্কী নহে। সেই জন্য তুর্কীর পক্ষে ইসমিত পাশা বলিতেছেন, তুর্কী সে সব সর্ত্তে সম্মত নহে। কিন্তু সম্মিলিত শক্তিরা সেই সব সর্ত্তই বাহাল রাখিবার জন্য ব্যাকুল। সে সব সর্ত্ত বাহাল থাকিলে যে তুর্কীর কেবল আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহাই নহে; পরন্তু তাহাতে তাহার আত্মসম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, সে সব সর্ত্ত থাকিলে তুর্কী কখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে না। সেই জন্য সে বিষয়ে ইসমিত পাশা বলিতেছেন—পুরাতন সর্ত্ত মুছিয়া নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন —Turkey is a new nation লসেনে যে সব ব্যাপার স্থির করিতে হইবে, তাহা অতীতের ব্যবস্থামত করিলে চলিবে না —to be based not on the events of the past but on the facts of the present. এ বিষয়ে মার্কিণ যে ভাব দেখাইতেছেন, তাহাতে তুর্কীর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যবস্থা হইতে পারে বটে; কিন্তু অন্যান্য দেশের ভাব সেরূপ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যেন বিজয়ী হইয়া বিজিতকে সন্ধির সর্ত্ত দিতেছেন। তুর্কীর সহিত ইটালীর ও ফ্রান্সের যেরূপ কথা ছিল, তাহাতে এই দুই দেশেরও তুর্কীর পক্ষাবলম্বন করা অর্থাৎ তুর্কীকে প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভোগের অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইতেছে না। বাস্তবিক য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তুর্কীর প্রতি কোন কালেই প্রসন্ন নহেন। কেবল ভাগবাটোয়ারাটা কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে সকলে একমত হইতে না পারাতেই তুর্কীর রাজ্য তাঁহারা আপন আপন রাজ্যের অংশীভূত করেন নাই। এবার কামালের জয়ে তাঁহাদের সে আশা অন্তর্হিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহারা যে সন্তুষ্ট, এমন মনে হয় না। তুর্কীকে তাঁহারা এসিয়ার রাজ্য বলিয়াই বিবেচনা করেন; তুর্কী যে য়ুরোপেও অবস্থিতি করিতেছে, সে যেন তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহে! অথচ এই তুর্কীর ভয়েই এক দিন য়ুরোপ কম্পিত হইত এবং জগতে ত্রাস

নূতন খলিফা।

ইসমত পাশা।

অগ্নিদাহের পর স্মার্ণা।

বিস্তারকার্য্যেও তুর্কী কম সাহায্য করে নাই। তুর্কীকে দুর্ব্বল বুঝিয়া এই সকল শক্তি যে যেখানে পারিয়াছেন—তুর্কীর রাজ্যাংশ অধিকার করিয়াছেন।

এবার যদি তুর্কী আপনার বহুকালসঞ্চিত দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া স্বাধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে, তবে এসিয়ার তাহাতে বিশেষ আনন্দের কারণ অবশ্যই আছে। জাপানের অভ্যুদয়ে প্রাচীর যে আনন্দের কারণ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে; কিন্তু জাপান উন্নতিলাভের পর আর এসিয়ার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না। তুর্কীর উন্নতিতে প্রাচীর উন্নতির সূচনা বলা যাইতে পারে। ইসলামের ধাতুতে যে গণতন্ত্রপ্রিয়তা আছে, আজ যেন তাহাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জয়যাত্রার পথে সকল বাধা সে অতিক্রম করিবে বলিয়াই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাই আজ দলাদলির মধ্য হইতে তরুণ তুর্কের আবির্ভাব—আর কামাল পাশায় তরুণ তুর্কের আন্তরিক কামনার মূর্ত্ত বিকাশ।

সব শেষের সংবাদ, ইসমিত পাশা কতকটা নূতন সর্ত্তে সন্ধিতে সম্মত হইয়াছেন,—সে সব সর্ত্তে যদি সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জ সম্মতি প্রদান করেন, তবে সহজেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে; নহিলে হয় ত আবার যুদ্ধের কালানলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবে—সভ্যতার উন্নতি প্রহত করিবে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব-সঙ্গীত।

[ষ্টার থিয়েটার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯]

আজি এ উৎসব-রাতি আনন্দে মাতিছে মন।
স্মৃতি-সাথী হোলো পথে কত কথা পুরাতন॥
অর্দ্ধ শত অব্দ হইল বিগত,
জাতীয়তা শব্দ নব কর্ণগত,
নবীন তরঙ্গ-ভঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ আন্দোলন॥
মহর্ষি-মন্দিরে এ মহানগরে,
কবি-মুখে স্ফুরে জাগ রে জাগ রে,
বন্দ্যো হেমচন্দ্র দুন্দুভি নিনাদে ঘোষে জাগরণ॥
নাশিতে তামস অলস নিশির,
যশোর-কেশরী আসিল শিশির,
লয়ে শিশুপাল সে নব-গোপাল করে মৈলা বিরচন॥
স্বধর্ম্মে আবার ফিরিল বিশ্বাস,
দেশ-দুঃখে সবে ফেলিল নিশ্বাস,
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ব্যায়াম অভ্যাস করে বহু যুবজন॥
সাহিত্য আকাশে নব সূর্য্যোদয়,
মধু, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, অক্ষয়,
সিংহ মহোদয়, প্যারী, রাম, নবীনাদি বিদ্যা নিকেতন।
নাটকের হাটে রামনারায়ণ,
দত্ত মিত্র বসুজ মনোমোহন,
ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ যতীন্দ্র উৎকৃষ্ট রচে নাট্য প্রহসন॥
নবীন লেখনী ধরিল তখনি,
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভার খনি,
খুঁজে হরলাল ক্ষত্র তরোয়াল নাটকে সৃজিল রণ॥
সেই ধন্য দিনে পুণ্যদ অঘ্রাণে,
অভিনয় কলা-কুসুম আঘ্রাণে,
কতিপয় যুবা-চিত অতিশয় হয় উচাটন॥
ধনীর ভবনে বিনা নিমন্ত্রণে,
যেতে নাহি পারে সাধারণ জনে,
অভিমান নিতে দান মানীগণে করে নিবারণ॥
জাতীয় ভাবেতে মাতি অতঃপর,
সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত খ্যাত বংশধর,
বাগবাজারেতে যুবা ক'টি ওঠে ফলাতে স্বপন॥

শ্রীকেশব গঙ্গো আদি নট বঙ্গে,
স্মরিয়া সম্ভ্রমে সঙ্গী রঙ্গী সঙ্গে,
রঙ্গালয়-অলঙ্কারে বঙ্গ-অঙ্গ সাজাতে যতন॥
বন্দ্যোজ নগেন্দ্র দলে কেন্দ্র-স্থল,
কর্ম্মপটু ধর্ম্মদাসে বসে বল,
মরতে ভরত ঋষি গিরীশ অর্দ্ধেন্দু দুইজন॥
নটেন্দ্র মহেন্দ্র মতি যদু শিবু,
গোপাল গোলক ক্ষেতু বেলবাবু,
অবিনাশ তিনকড়ি যোগী পূর্ণ কার্ত্তিক কিরণ॥
বালক বিহারী নন্তি দুলো শিশু,
শ্রীহরিমোহন সুকণ্ঠ সে আশু,
গবি মাধু গদাই গোপাল ধনী নিয়োগী ভুবন॥
আগু পাছু কিছু ইঁহারা উদ্যোগী,
স্বার্থত্যাগী যুবা সবে কর্ম্মযোগী,
সাথে সাথে নত-মাথে চলিয়াছে এই অভাজন॥
স্মৃতির ছলায় যদি অপরাধী
বাদ দিয়ে নাম, পদে ধরে সাধি,
সবাই আমার বড় আপনার সুখের স্মরণ॥
দীপ হ'তে দীপ জ্বলে যে প্রকার,
অচিরে গোচর বঙ্গরঙ্গাগার,
কবি মধুদত্তাদেশে রঙ্গস্থলে নটী আগমন॥
ছাতুবাবু বংশধর বিধিমতে,
শরৎ সারথী হইল সে রথে,
শ্রীবিহারী চট্টো কুমার উমেশ আদি নাট্যরথিগণ॥
আদ্যা নটী এলোকেশী সুকুমারী,
জগত্তারিণী শ্যামা নামে নারী,
অক্ষয় গিরীশ হরিদাস আদি জন-বিনোদন॥
পঞ্চাশ বছর পরেতে **নটেশ**!
নটকুল মান্য রাখে অপরেশ,
লুটায়ে প্রাচীন শির পরশি হে তোমার চরণ।
দর্শকেরে হর্ষ দাও নটকুলে শুভ বরিষণ॥

চিরাশ্রিত

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলিকাতা আবহ পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই Meteorologist পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই আবহ বিদ্যার বিশেষ উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ এ দেশের মত কৃষিপ্রধান দেশে তাহার উপযোগিতা আরও অধিক। যে দেশে লোক শস্যের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে এবং একবার পর্জ্জন্য বিমুখ হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষে হাহাকার উঠে, সে দেশে ঝড়বৃষ্টির সময় পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলে যে লোকের বিশেষ উপকার হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

দুঃখের বিষয়, এই বিভাগের ব্যয়ভার বহন করিলেও দেশের লোক ইহার দ্বারা বিশেষ কোন উপকারই লাভ করে না। তাহার কারণ, এই বিভাগের পর্য্যবেক্ষণ-ফল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় না এবং গ্রামে গ্রামে--এমন কি প্রধান প্রধান নগরে ও হাটে তাহার প্রচারের কোনই ব্যবস্থা নাই! যত দিন তাহা না হইতেছে—যত দিন দেশের কৃষকগণ আবহাওয়ার অবস্থা সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য সংবাদ না পাইতেছে, তত দিন এই বিভাগের দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। বোধ হয়, ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশেই এই বিভাগের পর্য্যবেক্ষণ-ফল বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয় না। বিদেশী সরকার যে সহসা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, এমন মনে হয় না। তবে বাঙ্গালায় এই বিভাগের ভার লইয়া শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র যদি এই বিস্ময়কর অনাচারের প্রতীকার করিতে পারেন, তবে তিনি কেবল যে আবহ বিদ্যার প্রতি—এই বিভাগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে পারিবেন, তাহাই নহে; পরন্তু দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া দেশের লোকেরও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

ভক্তিলতা ঘোষ

গত ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার 'ছেলেদের বঙ্কিম' রচয়িত্রী ভক্তিলতা ঘোষ মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি আগরতলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহিমচন্দ্র দত্তের কন্যা এবং শৈশবে মাতৃহীন হইয়া বিদুষী মাসীমাতার কাছে পালিতা। বাল্যকালেই ইঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায় এবং স্বামীর সাহায্যে তাহা পরিপুষ্ট হয়।

যে কোনও উপন্যাস অনায়াসে ছেলেদের হাতে দেওয়া যায় না; কিন্তু তাহাদের পাঠোপযোগী উপন্যাসও অধিক নাই দেখিয়া দেবর অমূল্যকৃষ্ণের অনুরোধে তিনি সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি সে

ভক্তিলতা ঘোষ।

বাঙ্গালার মন্ত্রী

শাসন সংস্কারের ফলে বাঙ্গালা দেশে ৩ জন মন্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ৩ জন উপরওয়ালার দ্বারাই প্রদেশের শাসনকার্য্য চলিতে পারে। সে স্থলে এখন শাসন-পরিষদের ৪ জন সদস্য ও ৩ জন মন্ত্রী হইয়াছেন। সংপ্রতি নবাব নবাবআলী চৌধুরীর পীড়া হওয়ায় তাঁহার কার্য্যভার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র লইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছে, ২ জন মন্ত্রীর দ্বারাই কায চলিতে পারে। এখন ভারত সরকারে ও বাঙ্গালা সরকারে ব্যয় সঙ্কোচের পথ স্থির করিবার জন্য ২টি সমিতির কায চলিতেছে। সেই ২ সমিতি কি এ বিষয়ে অবহিত হইবেন?

নবাব নবাবআলীর অসুস্থতার সময় আর একটা কথা জানা গিয়াছে, আইনে মন্ত্রীর ছুটীর কোন ব্যবস্থা নাই। আইনকর্ত্তারা বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, শরীর অসুস্থ হইলে অর্থাৎ কায করিবার ক্ষমতা না থাকিলে মন্ত্রীরা আর পদ আঁকড়াইয়া থাকিবেন না—বিদায় লইবেন।

কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন—কয়খানিমাত্র উপন্যাস ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও নাটকগুলির গল্প এইরূপে লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে যখন পরীক্ষার্থীদিগকে ফিরাইবার জন্য বহু যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রোধ করিয়া রাজপথে শয়ন করিয়া ছিল, তখন তাহা শুনিয়া তিনি অসুস্থ শরীরেও তাহাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এবার উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবনের সময় ভক্তিলতা নওগাঁয় ছিলেন। তখন তিনি শয্যাগত। বন্যার জল গৃহ প্লাবিত করিবে দেখিয়া সকলে ডাক বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার অসুস্থতা বাড়িয়া যায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শিক্ষা সচিব শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র।

সার সুরেন্দ্রনাথও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন—এখন সুস্থ হইতেছেন। তিনি অসুস্থাবস্থায় ছুটী লয়েন নাই।

শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীর প্রকৃত অধিকার লাভ কিছু হইয়াছে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও—তাহাতে যে ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না।

শাসন সংস্কারের মন্ত্রীরা গত ২ বৎসরে দেশের জন্য কি কি কায করিয়াছেন, তাহা দেশের লোককে জানাইয়া দিবেন কি? দেশের লোকের মতের উপর যাঁহাদের পদের স্থায়িত্ব ও বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতন নির্ভর করে না, তাঁহারা দেশের লোককে আপনাদের কার্য্য বিবরণ দেওয়া হয় ত একান্তই অনাবশ্যক মনে করিবেন।

নবাব নবাবআলি চৌধুরী।

রেলের চীফ কমিশনার

এ দেশে রেলের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সরকার এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সভাপতির নামানুসারে সে কমিটী একওয়ার্থ কমিটী নামে পরিচিত। কমিটী অনেকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে—রেলের জন্য এক জন চীফ কমিশনার নিযুক্ত করা হউক। বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসাবে সরকার সর্ব্বাগ্রে সেই মন্তব্য গ্রহণ করিয়া ভারতীয় প্রজায় ব্যয় বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্টের সভাপতি মিষ্টার হিণ্ডলে সেই পদ পাইলেন। তাঁহার রেলের অভিজ্ঞতা, তিনি ভারতে একটি মাত্র রেলের (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের) এজেন্টের পদে কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নিয়োগসম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই কেন হউক না, আজ তাহা প্রকাশ না করিয়া কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করিতে প্রলোভন হয়—কমিটীর আর সব নির্দ্ধারণের কি হইল?

কমিটী বলিয়াছেন, বহু ভারতীয় সাক্ষী বলিয়াছেন, ভারতে রেলের নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসীর কোন কথাই থাকে না। কমিটী এই অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া ইহার প্রতীকার করিতে বলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা প্রাসিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া এ দেশেও দুই শ্রেণীর পরামর্শ পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন—

(১) সেণ্ট্রাল

(২) লোক্যাল বা স্থানীয়

সেণ্ট্রাল পরিষদের গঠনসম্বন্ধে তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী সদস্যদিগের অর্দ্ধাংশ প্রধান প্রধান ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ব্যবসা-সভার দ্বারা মনোনীত

হইবেন। অপরার্দ্ধ দেশের নানা স্থানের পল্লীর স্বার্থের ও যাত্রীদিগের প্রতিনিধি হইবেন। সদস্য-সংখ্যা ২৫ হইলে চলিবে।

স্থানীয় পরিষদ দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া পরিষদ থাকিতে পারে অথবা প্রত্যেক রেলের জন্য একটি করিয়া পরিষদ থাকিতে পারে।

যখন কমিটী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—We think that no scheme of reform can attain its purpose of fitting the railways to the needs of the Indian public unless that public has an adequate voice in the matter—তখন সর্ব্বাগ্রে এই সব পরিষদ গঠন করাই সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। সরকার যে সেণ্ট্রাল পরিষদ গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবসা সভার সদস্য লওয়া হয় নাই; পরন্তু সরকার বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের মধ্য হইতে ইচ্ছামত জনকতককে সদস্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা হইতে সদস্য মনোনয়ন কিরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয়—বাঙ্গালার প্রতিনিধি, মিষ্টার আবুল কাশেম।

মিঃ হিণ্ডলে।

স্থানীয় পরিষদ গঠনের কোন আয়োজনই লক্ষিত হইতেছে না। কেবল পূর্ব্ববঙ্গ রেলে পূর্ব্বে একটি পরামর্শ পরিষদ থাকায় সেইটিরই কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইতেছে। অন্যান্য রেলপথে সেরূপ চেষ্টাও নাই।

আজ যিনি চীফ কমিশনার হইয়াছেন, তিনিও তাঁহার সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, রেলে যাত্রীর ভীড়েই বিশেষ অসুবিধা হয় এবং কেবল টাকার অভাবে সে অসুবিধা দূর করা যাইতেছে না—Overcrowding is the principal source of all difficulties and inconvenience to passengers. সে অসুবিধা দূর করিবারও পূর্ব্বে সরকার কেবল এক জন শ্বেতাঙ্গকে মোটা মাহিয়ানায় চীফ কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। অথচ বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ড যে তুলিয়া দেওয়া হইবে বা তাহার বহর কমান হইবে, এমনও বোধ হয় না। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, এই যে একটা নূতন পদের সৃষ্টি হইল, ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি।

এক দিকে যাত্রীর ভীড়ে দম আটকাইয়া যাত্রীর মৃত্যু অর্থাৎ ভারতীয় যাত্রীদের খেয়ার কড়ি দিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হওয়া, আর এক দিকে উচ্চ বেতনে এক জন শ্বেতাঙ্গ চীফ কমিশনার নিয়োগ—এরূপ ব্যবস্থা কেবল ভারতবর্ষেই শোভা পায়। কারণ, এ দেশের সরকার এ দেশের লোকের কাছে কোনরূপ কৈফিয়তের দায়ী নহেন।

—

ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি

বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভা যখন সংস্কার আইনের ফলে পুনর্গঠিত হইয়া প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিলাতের পার্লামেণ্টের আইনকানুন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানহীন বিলাত না দেখা এক জন উকীল সভাপতিকে দিয়াই কায চলিয়াছিল। অর্থাৎ যখন আইনকানুন বাঁধিয়া দিবার ও সদস্যদিগকে তাঁহাদের ব্যবহারের বিষয় সমঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, তখন নবাব সার সামসুল হুদাই কায চালাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে কায ভালই চালাইয়াছিলেন, সে কথাও স্বীকৃত হইয়াছে। অসুস্থতা হেতু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাঙ্গালী উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় সে কায চালাইয়াছিলেন। কায অচল হয় নাই। কিন্তু তাহার পর মোটা মাহিয়ানা বরাদ্দ করিয়া বিলাত হইতে শ্বেতাঙ্গ সভাপতি আনা হইল। মিষ্টার কটনের পার্লামেণ্ট-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাও যে বড় অধিক, এমন নহে; কেন না, তিনি অতি অল্পদিনের জন্য পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সার হেনরী কটন বাঙ্গালার সিভিলিয়ান ছিলেন এবং বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী হইয়া পরে আসামের চীফ কমিশনার

মিষ্টার কটন।

হইয়াছিলেন। বিলাতে ফিরিয়া যাইয়া তিনি একবার পার্লামেণ্টের সদস্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার "New India" পুস্তকখানি এ দেশে বিশেষ পরিচিত। পুত্র মিষ্টার কটন এ দেশে ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়াছিলেন। কয় বৎসর বার-লাইব্রেরীর সভা শোভন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কিছু কাল কংগ্রেসের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক ছিলেন। এই অভিজ্ঞতার পর যখন অর্থাভাব হেতু মধ্য প্রদেশে সার গঙ্গাধর চিটনবিশ বার্ষিক ১ হাজার টাকা লইয়াই সভাপতির কায করিতে সম্মত হইয়াছেন তখন বিলাত হইতে মোটা মাহিয়ানায় মিষ্টার কটনকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে বহাল করিয়া আনা হইল! স্বর্ণঘটিত না হইলে যেমন মকরধ্বজের উপকারিতা বাড়ে না, তেমনই শ্বেতাঙ্গ সভাপতি নহিলে কি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার জলুস খুলিত না?

বিলাতে বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার

শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ দে এঞ্জিনিয়ার হইয়া বিলাতে বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এঞ্জিনিয়ার হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারই বিলাতে থাকিয়া ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই; বোধ হয়, আর কেহই বিলাতে ব্যবসা করেন নাই। তিনি গ্লাসগো এণ্ড সাউথ ওয়েষ্টার্ণ রেলে এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের কাযও করিয়াছেন। তিনি এঞ্জিনিয়ারিং ও গ্যাস ওয়ার্কসেও বিবিধ কার্য্য করিয়াছেন এবং গঠন-বিষয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দিন দিন অধিক সাফল্য লাভ করিলে তাঁহার স্বদেশবাসী আরও আনন্দিত হইবে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে।

ভীম ভবানী

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ভীম ভবানীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মত বলবান লোক ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত নব্য বাঙ্গালায় দুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর ছিল এবং বাঙ্গালীকে

ভীম ভবানী।

অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হইত না। তখন বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে শারীরিক শক্তির চর্চ্চা হইত এবং বলবানের আদর ছিল। এখন সে দিন আর নাই। তাই ভীম ভবানী দুর্ব্বলদেহ নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার শারীরিক শক্তির নানারূপ পরিচয় দিয়া লোককে আনন্দিত ও বিস্মিত করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু দুঃখের বিষয়।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

আজকাল বাঙ্গালীর ছেলেরা দৈহিক শক্তির পরিচায়ক প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতেছে। সম্প্রতি ২২ মাইল পথ সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে।

সেই প্রতিযোগিতায় বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সদস্য শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি সন্তরণে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অসাধারণই বটে।

শ্রীমান বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

ফলিবে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে, আবার ৬০ হাজার টাকা খরচ করিয়া তাঁহাকে সফরে পাঠাইতে হইবে? ভারতবর্ষের টাকা খরচ করিবার মালিক বিদেশী শাসকসম্প্রদায়; কাযেই তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসী বেশ জানে, দুই-দশটা শ্রীনিবাসকে টাকা দিয়া ঘুরাইয়া আনিলে এবং তাঁহারা বিদেশে কথার তুবড়ী ফুটাইলে উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদিগের মতপরিবর্ত্তন সম্ভাবনা নাই। যত দিন ভারতবাসী অপমানের বদলে অপমান করিতে না পারিবে, তত দিন বিদেশে তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কোনরূপ প্রতীকারসম্ভাবনা নাই। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদিগকে সমঝাইয়া দিতে হইবে, কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীরাও অপমানে অপমান করিতে পারে। কিন্তু তাহা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন স্বায়ত্ত-শাসন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর প্রত্যাবর্ত্তন

ভারত সরকারের মারফতে ভারতবাসী প্রজার টাকায় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বৃটিশসাম্রাজ্যের উপনিবেশসমূহে সফর করিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। এই সফরে ভারতবাসীর নাকি প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। খরচটা নিশ্চিত; ফল--একেবারেই অনিশ্চিত। তিনি উপনিবেশে ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—উপনিবেশের লোক খুব শিষ্টাচারী। তবে তাহারা কেন যে ভারতবাসীদিগকে শৃগাল কুকুরের মত ব্যবহার করে, ভারতবাসী ট্রামে উঠিলে পদাঘাত করে, সেটা শাস্ত্রী মহাশয় বুঝাইয়া দেন নাই—বোধ হয়, আপনি বুঝিতেও পারেন নাই।

তবে তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন, ক্রমে সুফল

রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি স্বনামধন্য রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর অধিক অগ্রসর হয়েন

রায় রাধাচরণ পাল।

নাই; গৃহেই অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের কাযের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন এবং প্রায় ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যে অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় কলিকাতার বহু করদাতা নানারূপে উপকৃত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জীর শাসনকালে যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন আইন প্রস্তুত হয়, তখন যে ২৮ জন কমিশনার প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, রাধাচরণ বাবু তাঁহাদের এক জন। নূতন আইন হইবার পর মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য ভাল চলিতেছে না দেখিয়া পরামর্শ করিয়া নলিনবিহারী সরকার ও রাধাচরণ পাল দুই জনকে পুনরায় কমিশনার করা হয়। তদবধি তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কমিশনার ছিলেন।

মৃত্যুর দিনও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশনের পর মিউনিসিপ্যালিটীর সভায় যোগ দেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখনই অসুস্থ বোধ করিয়া ডাক্তারকে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী আইসেন। অসুস্থতা দূর হইয়া যায় এবং ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া তিনি রাত্রি প্রায় ১০টার সময় শয়ন করিতে গমন করেন। প্রত্যূষে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়েন এবং প্রভাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মত কর্ম্মনিষ্ঠ, শিষ্টাচারী, মিষ্টভাষী, সদালাপী লোক কলিকাতার সমাজে বিরল। তিনি বহু সভাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

তাঁহার সহিত আমাদের রাজনীতিক মতের ঐক্য না থাকিলেও তাহাতে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

১ম বর্ষ } ২য় * পৌষ, ১৩২৯ * খণ্ড { ৩য় সংখ্যা

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অবস্থা।
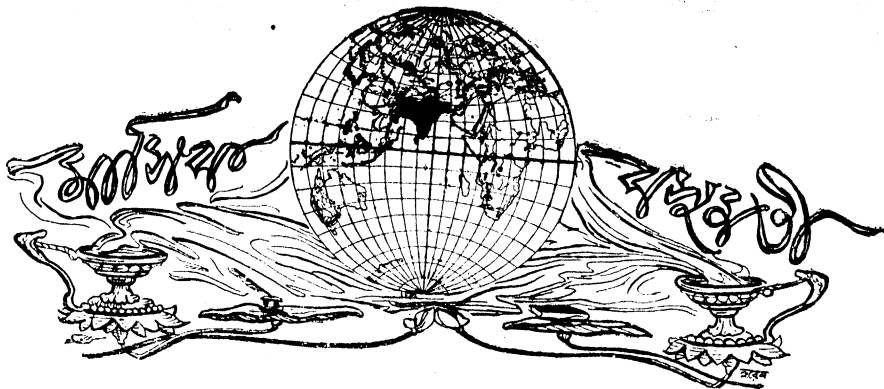
মহাযুদ্ধে যে জার্ম্মাণী একাকী প্রায় সমগ্র য়ুরোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল—পরাজয়ের পর তাহার অবস্থা জানিতে কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহলবশে জার্ম্মাণীতে গিয়াছিলাম।

জার্ম্মাণীর গ্রাম ও নগরের অবস্থা, বাজার দর, দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্বতঃই বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। প্রকৃত কথাও তাহাই—জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। Exchangeএ মার্ক মুদ্রার দাম অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু টাকার বাজার যাহাই হউক না কেন, আমি দেখিলাম, অন্যান্য বিষয়ে জার্ম্মাণীর অবস্থা খুবই ভাল। কোনও বিষয়েই জার্ম্মাণী পরমুখাপেক্ষী নহে। সমগ্র জার্ম্মাণজাতির প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাবলম্বনের এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন অন্যত্র দুর্লভ বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সকল প্রকার শাক-সব্জী, তরি-তরকারীও জার্ম্মাণ দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রতি বিঘায় যত শস্য জন্মে, জার্ম্মাণীতে তাহার চতুর্গুণ উৎপন্ন হয়। এমন কোনও জিনিষ আমি দেখিলাম না, যাহা জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত না হয়। আশ্চর্য্য এই উদ্ভাবনশীল, পরিশ্রমী জার্ম্মাণ জাতি!

বিভীষণ মহাযুদ্ধের অবসানে য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়-বাণিজ্যের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অধিকাংশ শ্রমজীবী বেকার বসিয়া আছে, এরূপ কথা সংবাদপত্রেও পাঠ করা যায়, প্রত্যক্ষও করিয়াছি। ইংলণ্ডে এরূপ বেকার লোকের সংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি এবং মার্ক মুদ্রার মূল্যের হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জার্ম্মাণীতে বেকার লোকের সংখ্যা মাত্র এগার হাজার! অনেকেই এমন অনুমান করিতে পারেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর ব্যবসায়-বাণিজ্য যেমন জোরে চলিয়াছিল, এখন তেমন নাই, কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী জার্ম্মাণজাতি নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই—এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যে কয়েক হাজার মাত্র বেকার লোকই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

জার্ম্মাণীতে কারখানার সংখ্যা অল্প নহে; প্রায় প্রত্যেক কারখানার কাজ পূর্ণ তেজে চলিতেছে; একটিও পরিচিত কারখানা বন্ধ হয় নাই। শ্রমজীবী কোথাও অলসভাবে বসিয়া নাই, প্রত্যেকেই কার্য্যলিপ্ত। নিয়মিত হারে প্রত্যেক শ্রমজীবীই পারিশ্রমিক পাইতেছে। শ্রমজীবিসংক্রান্ত সমস্যা জার্ম্মাণীতে নাই। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিবাসী-দিগের অবস্থাই শোচনীয়। চিকিৎসক, অধ্যাপক প্রভৃতি

শ্রমজীবীদিগের বসবাসের জন্য সুপরিষ্কৃত আবাসগৃহ সমূহ আছে। তাহাদের জন্য ভোজনাগার, হাঁসপাতাল, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়,ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ কিছুরই অভাব নাই। অবসরপ্রাপ্ত, বৃত্তিভোগী বৃদ্ধদের জন্য বাড়ী-ঘরও সেই স্থানের মধ্যে কারখানার মালিকগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকের জন্য তিনটি করিয়া ঘর—ঘরগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন।

ক্রূপের কারখানার অপেক্ষাও অনেক বড় বড় কারখানা জার্ম্মাণীতে আছে। প্রত্যেকটিতে এখনও তিন চারি শত বড় বড় এঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক কাম করিয়া থাকেন। লাইপ্‌জিক্, ড্রেস্‌ডেন, মিউনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট, কলোন প্রভৃতি। প্রত্যেক নগরই বিশাল,হর্ম্ম্যমালা-ভূষিত। প্রত্যেক নগরেই বড় বড় শিক্ষাগার, পুস্তকাগার, বাজার- নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর নাগরিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কোনওটিকে অপরের অপেক্ষা অল্প সমৃদ্ধশালী মনে হইবে না।

জার্ম্মাণরাজ্যে Institutions প্রতিষ্ঠান এত অধিক-সংখ্যক যে, গণনা করা যায় না। প্রত্যেক নগরেই অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, বহু সময় ব্যয় না করিলে এক একটা নগরের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া শেষ করা সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে বার্লিন নগরের Marine Museum ও
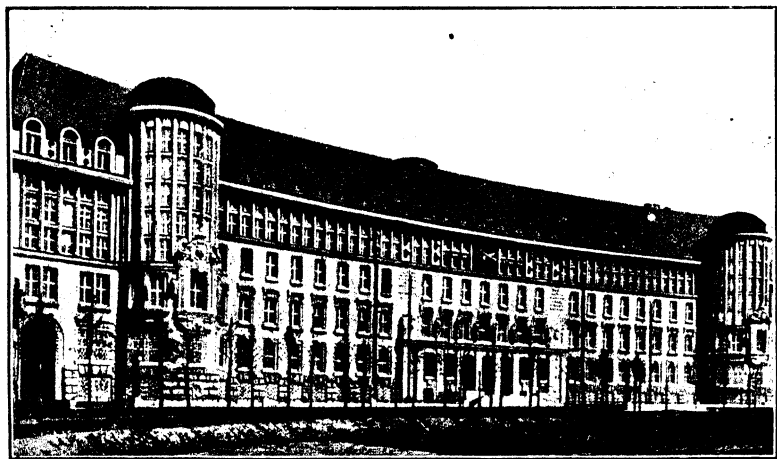
পুস্তকাগারের একাংশ।

জার্ম্মাণীতে অপচয় বলিয়া কোন কথা নাই। সকল বস্তুই জার্ম্মাণরা কাযে লাগাইয়া থাকেন। তরকারীর খোসা হইতে পাথর লোহ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। খড় হইতে পুষ্টিকর খাদ্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। সর্ব্বদেশের অব্যবহৃত, উপেক্ষিত টিন লইয়া জার্ম্মাণীর বড় বড় কারখানায় নানা প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সমগ্র জার্ম্মাণরাজ্যে একমাত্র বার্লিনই প্রধান নগর নহে। ফরাসীরাজ্যের প্যারী যেমন প্রধানা নগরী, জার্ম্মাণীর বার্লিন তাহা নহে। বার্লিনের মত বহু প্রধান নগর জার্ম্মাণীতে আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির নাম করিতেছি। যথা—

Geographical Museum বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Marine Museum এ নানাবিধ যুগের ক্ষুদ্রতম নৌকা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম যুদ্ধ-জাহাজ সমূহের Model (আদর্শ) আছে। কোনও দেশের নৌকা অথবা অর্ণবপোত অথবা যুদ্ধ-জাহাজের নমুনার অভাব এখানে নাই। তাড়িত শক্তির সাহায্যে তাহাদের গতির পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। যাবতীয় সমুদ্র-উপকূলভাগের মানচিত্র জার্ম্মাণগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রতট-বর্ত্তী পাহাড়, নদনদী, মালভূমি প্রভৃতির পরিচয় সেই Raised Maps বা উচ্চাবচ মানচিত্র হইতে অনায়াসে

বার্লিন য়ুনিভার্সিটি
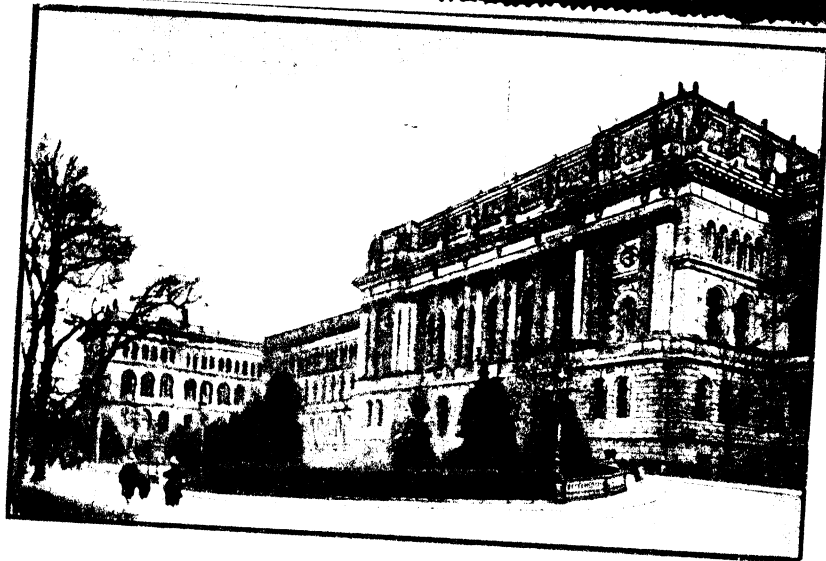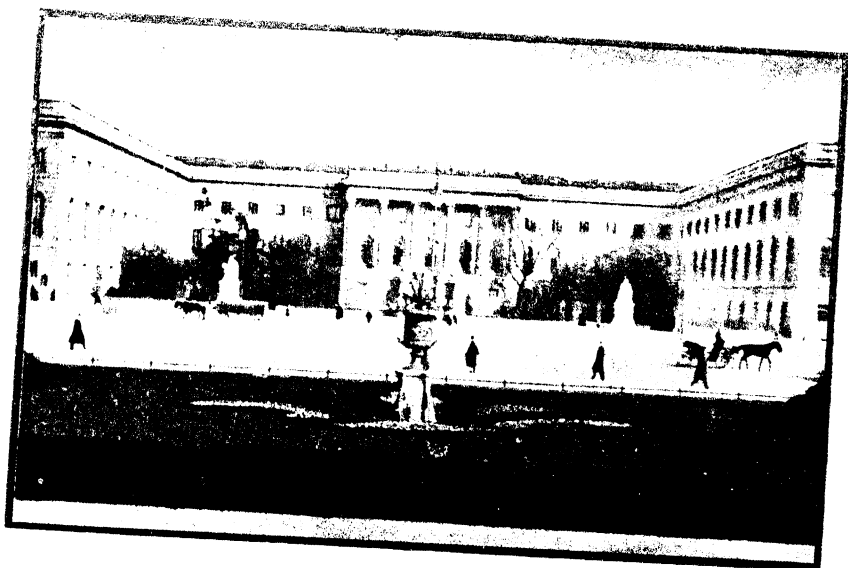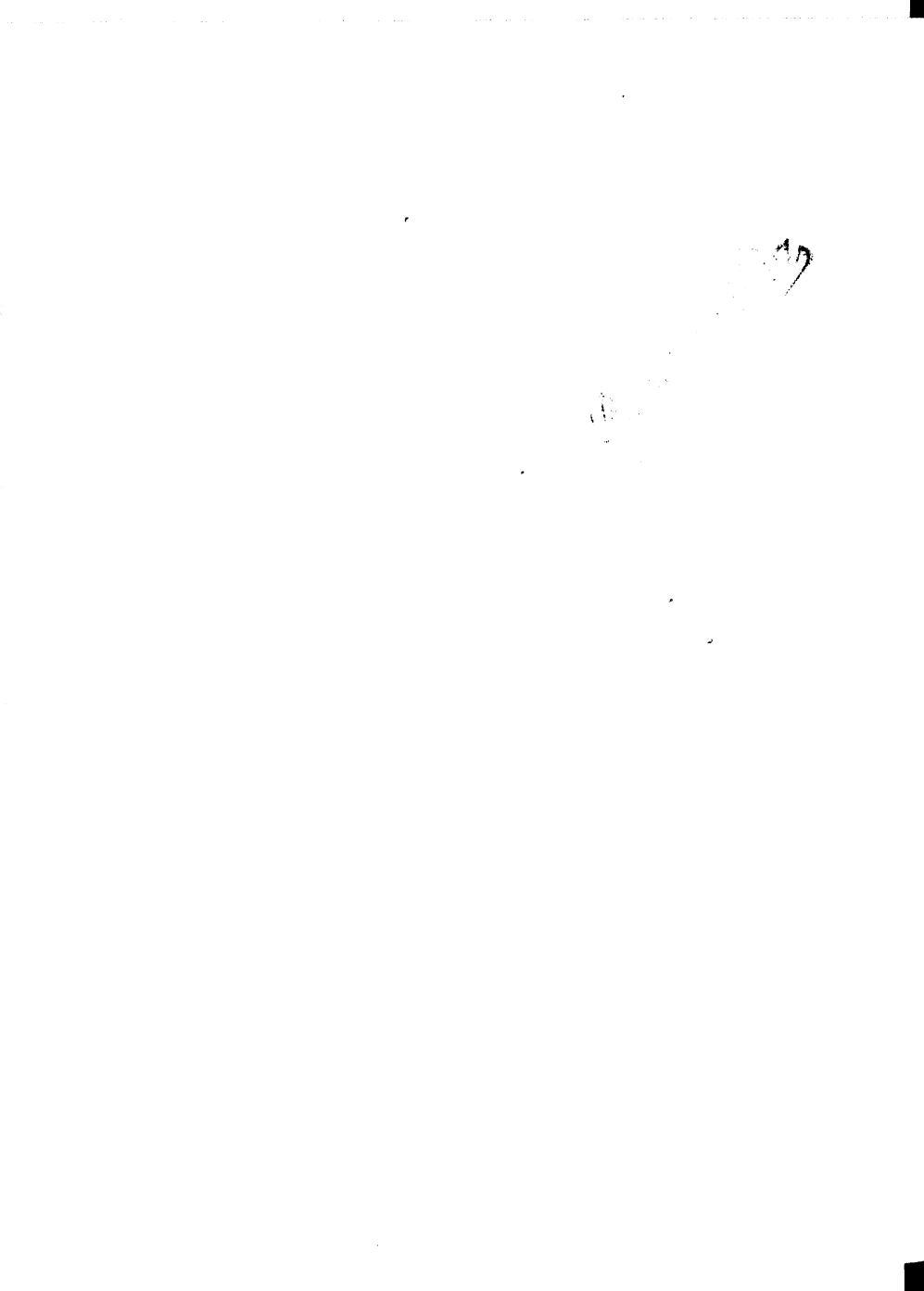
বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর কোন্ দেশে কি প্রকারের জাল ব্যবহৃত হয়, এই যাদুঘরে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। শুধু সংগ্রহ করিয়াই জার্ম্মাণগণ নিশ্চিন্ত নহেন। উহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে। আবার কোন্ দেশের কোন্ শ্রেণীর জাল ব্যবহারে সুবিধা অধিক, বক্তা তাহাও শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

Geographical Museum এ পৃথিবীর যাবতীয় রাজনীতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ আছে। এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠান কত বৃহৎ তাহা না দেখিলে শুধু কল্পনা করা যায় না। বিষয়গুলির জন্য বিভিন্ন তালিকা-পুস্তক আছে। সে তালিকা পুস্তকের (Catalogue) সংখ্যাও সামান্য নহে। এই মিউজিয়মে শিক্ষালাভ করিয়া যে কেহ ভূগোলে ডাক্তার উপাধি পাইতে পারেন।

পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ আছে। লাইপজিক্ নগরই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যদেশের গ্রন্থরাজি এখানে মুদ্রিত হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার গ্রন্থাদিও জার্ম্মাণগণ মুদ্রিত করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্র জার্ম্মাণীতে অত্যন্ত সুলভ। এত স্বল্পমূল্যে আর কোথাও উহা কিনিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীতে Orbispictus সংস্করণের গ্রন্থরাজি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প, ধর্ম্ম, বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থনিচয় এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। উহার কাগজ, ছবি ছাপা সবই অতি চমৎকার। বইগুলি বাঁধান। প্রতিখণ্ডের মূল্য ১২০ মার্ক, বর্ত্তমান হিসাবে এক পেনী বা আমাদের দেশের এক আনা মাত্র। এরূপ স্বল্প মূল্যে এমন সুদৃশ্য ও চমৎকার ভাবে মুদ্রিত গ্রন্থ ছাপাইয়া বিক্রয় করিয়াও প্রকাশকের লাভ থাকে। অন্যত্র এরূপ শ্রেণীর একখানি পুস্তকের মূল্য অন্যূন পাঁচ শিলিং বা প্রায় চারি টাকা।

ভূগোল যাদুঘরে তালিকা পুস্তকের দৃশ্য।

জার্ম্মাণীর শিক্ষা-বিস্তার ব্যবস্থা চমৎকার। তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে গেলে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। বারান্তরে তাহার চেষ্টা করা যাইবে। সমগ্র জার্ম্মাণীতে Gymnasium ও School এর শিক্ষাই উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা। মধ্যশিক্ষার (Secondary) নাম Continuation school system অর্থাৎ সম্প্রসারিত বিদ্যালয়জাত শিক্ষাপদ্ধতি। উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত নহে। Technical High School বিদ্যালয় সমূহে আমাদের দেশের এম্, এস্-সি (M. Sc.) পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ছাত্রগণ এই সকল বিদ্যালয়ে Differential Calculous, Differrential Equation প্রভৃতি উচ্চ গণিতের শিক্ষা পাইয়া

থাকেন। চারি বৎসরে পাঠ শেষ হয়। আমাদের দেশের ছাত্রগণ ২১ বৎসর বয়সে পাঠ শেষ করিতে পারিলেই আমরা বলিয়া থাকি, উহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে, এখন উহারা সংসারে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে;

বাজারের দৃশ্য।

কিন্তু কোনও জার্ম্মাণ-ছাত্র ২৬।২৭ বৎসরেও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তখনও সে শিক্ষার্থী ছাত্র মাত্র।

স্ত্রীশিক্ষাও জার্ম্মাণীতে বাধ্যতামূলক। তবে ১৫ বৎসর বয়সের পর কোনও ছাত্রী ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না-ও করিতে পারে। জার্ম্মাণীতে সাধারণতঃ বালিকারা ১৪ বৎসরেই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে সামান্য পরিমাণে জার্ম্মাণ, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালীর কায, সূক্ষ্মশিল্প, সেলাই, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার কলাশিল্পের শিক্ষাও প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৫ বৎসরের পর শিক্ষা আর বাধ্যতামূলক নহে। তখন ছাত্রীরা সাধারণ বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানপালন, ঔষধ ব্যবহার করা, শুশ্রূষার কায প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুধু নগরে নহে, প্রত্যেক গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মাণ-নারী শুধু কলাবিদ্যায় নহে, সুগৃহিণী হইবার উপযুক্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

লাবোয়াসিয়ে ও নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি।

আজকাল যেখানেই যাই, চরকা প্রচারের জন্য এত কথা বলি ও তজ্জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছি যে, লোক আমাকে "চরকাগ্রস্ত" বলে। কিন্তু চরকাগ্রস্ত হইলেও আমি যে তাহার চেয়ে বেশী রসায়নীবিদ্যাগ্রস্ত, এ কথা তোমরা নিশ্চিত জানিও। "যত দিন দেহে রহে প্রাণ" তত দিন রসায়নীবিদ্যা আমাকে ছাড়িবে না; আমিও তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। উপনিষদে আছে "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" 'আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন।' আমিও সেইরূপ প্রার্থনা করি, রসায়নীবিদ্যা দেবীকে আমি যেন নিরাস বা অস্বীকার না করি এবং রসায়নীবিদ্যা দেবীও যেন আমাকে পরিত্যাগ বা প্রত্যাখ্যান না করেন। তোমরা মনে কর, কোন গতিকে এম, এস-সি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গেল, আর শিখিবার বা সাধনার কিছু বাকি থাকিল না। তাহার পর চাকরী পাইলে, তখন সরস্বতী দেবীর নিকট চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ কর। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এম, এস-সি পরীক্ষা পাশ করিলে শিক্ষা বা জীবনব্যাপী সাধনার পথে প্রবেশ করা হয় মাত্র। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সাধনার সময় তখন উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক চক্রপাণি দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাহারও পূর্ব্বে অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আর এক জন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম নাগার্জ্জুন। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন :—

দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাক্লেশঃ কৃতো ময়া।
যদি তুষ্টাসি ময়ি দেবি জ্ঞানদে ভক্তবৎসলে।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্ব মে॥

"দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাক্লেশে কঠোর সাধনা করিয়াছি, হে জ্ঞানদে ভক্তবৎসলে দেবি, যদি তুষ্টা হইয়া থাকেন, তবে ত্রিলোক-দুর্লভ রসবন্ধ (রসায়নশাস্ত্রতত্ত্ব) আমাকে দান করুন।" আমি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এডিনবরাতে বিজ্ঞান অধ্যয়ন শেষ করিয়া তাহার পর ১২ বৎসরের তিন গুণ অর্থাৎ ৩৬ বৎসরকাল যাবৎ রসায়ন-শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি। এই বিদ্যা এত গভীর ও এত বিশাল যে, ক্ষুদ্র মানবজীবনে সমস্ত জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় ইহার অতি সামান্য অংশমাত্র পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তাই এতকাল পরে নিউটনের ভাষায় আমিও বলি, রসায়নজ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি। এক জন কোটিপতির কথা লোক কয় দিন মনে রাখে? রকফেলার, এণ্ড্রু কার্ণেগি প্রভৃতি দুই এক জন যাঁহাদের সঞ্চিত বা উপার্জ্জিত অর্থ দেশের সেবায় দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়া অধিকাংশ ধনীর কথা লোক দুই দিনে ভুলিয়া যায়। সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দুই এক জন ছাড়া অধিকাংশ কবিও যে ভাষায় তাঁহাদের কাব্য প্রকাশ করেন, সেই ভাষাভাষী লোকের নিকট ভিন্ন অন্যত্র আদৃত হয়েন না। কিন্তু এক জন বিজ্ঞানসেবী সমস্ত জগতের বরেণ্য হয়েন; তাহার কারণ, তাঁহার কঠোর সাধনালব্ধ আবিষ্কারগুলি জগতের সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তিনি সত্যের যে মূর্ত্তি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন, তাহা জগতের সকলের নিকট প্রচার করিয়া সমস্ত জগতের দুঃখ দূর ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

এইবার তোমাদিগকে নব্য রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমাদের দেশের ভাষায় একটি কথা আছে 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি'। জনৈক ফরাসীদেশীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির কথা বলেন, তাহার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। জগতের সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান এই মতে পাঁচটি। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম। বিশ্লেষণ বা ক্রমান্বয়ে যত ইচ্ছা তত ভাগ করিলেও যে পদার্থ হইতে সেই পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাকে মূল পদার্থ বা জগতের মূল উপাদান বা ভূত বলে। যখন অমর আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন, তখন যে মাটী, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম দিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে, সেইগুলি পুনরায় পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। ইহারই

নাম পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, দেহের কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হইল না। দেহের মাটী মাটীতে, জল জলে এইরূপে পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল—রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক জগতের কোন পদার্থের নাশ বা অস্তিত্বলোপ হয় না। এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তররূপে পরিবর্ত্তন হয় মাত্র এবং যে যে মূল পদার্থের পরমাণ (বা সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ) সমষ্টি লইয়া কোন পদার্থ গঠিত হয়, অন্য পদার্থে পরিণত হইলে তাহার একটি পরমাণুও নষ্ট হয় না। সমস্ত জগতের পরমাণু-সমষ্টি নিত্য, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই তত্ত্বের নাম পদার্থের অবিনশ্বরত্ব (indestructibility of matter)। এই তত্ত্বই সমস্ত রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ। নব্যরসায়নের সমস্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা এই তত্ত্বকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। পঞ্চত্বপ্রাপ্তি শব্দের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা বলিলাম। ইহার মধ্যে ভ্রমও কিছু আছে; তাহা পরে দেখাইব।

জগতে মধ্যে মধ্যে এক এক জন যুগাবতার জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত জগতের চিন্তাস্রোত এক নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া দেন। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি এক এক জন মহাপুরুষ আসিয়া সমস্ত পৃথিবীর চিন্তার ক্ষেত্রে এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত লাবোয়াসিয়ে সেইরূপ রাসায়নিক জগতে এক নূতন আলোক প্রদান করতঃ রসায়নশাস্ত্রকে এক নূতন পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগতে এই যুগান্তরসৃষ্টিকারক মহামনীষী লাবোয়াসিয়েকে আমরা নব্য রসায়নশাস্ত্রের জনক (father of modern chemistry) বলিতে পারি। তিনি রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

তোমরা দেখিয়াছ, ম্যাগ্‌নেসিয়মের তার (magnesium wire) পোড়াইলে কিরূপ সুন্দর রোস্‌নাই হয়। কিন্তু পুড়িবার পর কি অবশিষ্ট থাকে? একখানা পাকাঠী পোড়াইলে কয়লা হয় না, ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কাঠ ভালভাবে না পুড়িলে কয়লা হয়। ভালভাবে পুড়িলে ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এক মণ কয়লা পোড়াইলে অল্পমাত্র ছাই থাকে। বাকি জিনিষগুলি যায় কোথায়? মোমবাতি পোড়াইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পোড়াইলে মোমবাতিটি কি হইল? এইরূপ প্রশ্ন মনে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেন, কাষ্ঠাদি দহনশীল পদার্থে অলক্ষিতভাবে ফ্লজিষ্টন (phlogiston) নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। বিভিন্ন পদার্থে এই ফ্লজিষ্টন বিভিন্ন পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। দাহ্য বস্তুসমূহে পরস্পর যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল ফ্লজিষ্টনের পরিমাণের তারতম্য ও অন্যতর উপাদানের ধর্ম্মভেদে ঘটিয়া থাকে। দহনকালে যে বস্তু দগ্ধ হইতেছে, তাহা হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং তজ্জন্য আলোক বা অগ্নিশিখা দেখা যায়। ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া গেলে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ এই হিসাবে লঘু হইয়া যাইবার কথা। সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, কার্য্যতঃও তাহাই হয়। কাষ্ঠ ও মোমবাতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ভস্ম বলে, সেইরূপ

লাবোয়াসিয়ে।

ধাতু দগ্ধ হইলে ধাতুভস্ম অবশিষ্ট থাকে। এই ধাতুভস্ম অত্যন্ত লঘু। আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত লৌহভস্ম এত লঘু যে, ফুৎকারে উড়িয়া যায়; এমন কি, জলের উপর নিক্ষেপ করিলে ভাসিতে থাকে। দস্তা পোড়াইলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের ভস্ম পাওয়া যায়; উহাও এত লঘু যে, ফুৎকারে উড়িয়া যায়। য়ুরোপীয় প্রাচীন রাসায়নিকগণের মতে ধাতুভস্ম ও ফ্লজিষ্টন এই দুই পদার্থের সংযোগে ধাতু উৎপন্ন হয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতুভস্ম পড়িয়া থাকে, ফ্লজিষ্টন উড়িয়া যায়। হিন্দু দার্শনিকগণের মতে কাষ্ঠাদি পদার্থসমূহ পঞ্চভূতাত্মক; পোড়াইলে ক্ষিতির অংশ ছাড়া অন্য অংশ উড়িয়া যায়। ক্ষিতির অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভস্ম। সুতরাং যে পরিমাণ কাষ্ঠ বা ধাতু পোড়ান হয়, তাহার ভস্মাংশ তদপেক্ষা অনেক লঘু হয়।

তোমরা জান, কয়লাতে হাপর দিয়া বাতাস দিলে অগ্নি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে। এই জোরে জ্বলার কোন কারণ পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে পাওয়া যায় না। কোন ধাতুকে উত্তাপ দিলে ধাতুভস্ম হয় সত্য, কিন্তু বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্র দ্বারা কোন পাত্রের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে তন্মধ্যস্থ ধাতুকে বহুকাল উত্তাপ দিলেও গুঁড়া হয় না, অথবা তাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, অর্থাৎ উহা ভস্মে পরিণত হয় না,কেবল দ্রবীভূত হয় মাত্র। ইহারও কোনরূপ ব্যাখ্যা ফ্লজিষ্টন বা পঞ্চত্বপ্রাপ্তিবাদ হইতে পাওয়া যায় না। লাবোয়াসিয়ের পূর্ব্বে অনেকে পদার্থবিদ্যাঘটিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা পরীক্ষা না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই অনুমানের ও যুক্তিতর্কের উপর বিশেষ নির্ভর করিতেন।

লাবোয়াসিয়ে প্রথমতঃ নিক্তি (balance) লইয়া পরীক্ষা করেন। এই নিক্তি রাসায়নিকের অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য ব্যবহার্য্য যন্ত্র। ইহার সাহায্য ব্যতীত রসায়নশাস্ত্রে এক পদও অগ্রসর হওয়াও চলে না। ভাল নিক্তিতে (chemical balance) চুলের ওজন পর্য্যন্তও ধরা যায়। লাবোয়াসিয়ে ওজন করিয়া কতকটা রাং বা রঙ্গ (tin) লইলেন। তাহার পর উহা গলাইয়া লোহার শিক দিয়া নাড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর একরূপ শ্বেতবর্ণ ভস্ম পাওয়া গেল। তাহার পর উহা পুনরায় ওজন করিলেন; দেখা গেল, ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। ধাতুকে এইভাবে উত্তাপ দিয়া ভস্ম করিবার প্রথাকে এ দেশে মারণ বলিত। মারিত রঙ্গভস্মের ওজন রঙ্গ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে লাবোয়াসিয়ের ফ্লজিষ্টনবাদের উপর সন্দেহ হইল। এই সময় ইংলণ্ডে যোসেফ প্রিষ্টলি নামক এক ধর্ম্মযাজক ছিলেন; তিনি এক জন বড় রাসায়নিক পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বহুপ্রকার বায়ু বা গ্যাস আবিষ্কার করেন; এ জন্য তিনি বায়বীয় রসায়নের জনক (father of air or pneumatic chemistry) নামে অভিহিত হয়েন। তিনি এক দিন লোহিতবর্ণ পারদভস্ম (red ash of mercury) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। আতস কাচ (convex lens) দিয়া সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া এই পারদভস্মের উপর ফেলাতে এক রকম নূতন বায়বীয় পদার্থ বাহির হইল। এই বায়ুতে দাহ্য পদার্থ সকল অত্যন্ত দীপ্তিসহকারে জ্বলিতে লাগিল। তিনি সীসকভস্ম (তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নাগসিন্দূর) হইতেও উক্ত বায়ু বাহির করেন। অধিক পরিমাণে উক্ত বায়ু সংগ্রহ করিয়া গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কতকটা লোহিতবর্ণ পারদভস্ম একটি পাত্রে রাখেন এবং উক্ত পাত্রের মুখে একটি কাচের নল সংযুক্ত করিয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি মুখ-খোলা জলপূর্ণ পিপের জলমধ্যে একটি সচ্ছিদ্র কাঠের তক্তা রাখিয়া একটি জলপূর্ণ কাচের গেলাস উপুড় করিয়া কাঠের ঠিক ছিদ্রের উপর রাখেন এবং কাঠের ছিদ্রমধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত কাচের নলের মুখ জলপূর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। এই অবস্থায় পারদভস্মযুক্ত পাত্রে উত্তাপ দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত বায়ু বাহির হইয়া কাচের পাত্রের জলকে দূরীভূত করিয়া সে স্থান অধিকার করে। এইরূপে উক্ত পাত্র বায়ুপূর্ণ হইলে ঐ বায়ুর গুণ তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বায়ুতে দহনশীল বা দাহ্য পদার্থগুলি উজ্জ্বলতরভাবে জ্বলিতে থাকে। নির্ব্বাণোন্মুখ পাকাঠী উহার ভিতর দিলে পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। প্রিষ্টলি পরীক্ষার জন্য নেংটী ইন্দুর ধরিয়া খাঁচায় পূরিয়া রাখিতেন। এই নূতন বায়ুতে ঐ ইন্দুর ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দুর ইহার মধ্যে স্ফূর্ত্তিসহকারে লাফাইতেছে। তিনি নিজেও নিশ্বাসযোগে ঐ বায়ু টানিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইহাতে খুব স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। তিনি যে পাত্রে পারদভস্ম লইয়াছিলেন, তাহাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চকচকে পারদগোলক দেখিতে পাইলেন। প্রিষ্টলি ফ্লজিষ্টনবাদী ছিলেন, তিনি

এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন না। এখনকার মত তখন সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল না, তাই তাঁহার এই আবিষ্কারের সংবাদ সে সময় লাবোয়াসিয়ে জানিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে প্রিষ্টলি ফ্রান্সে বেড়াইতে যায়েন। যে কলাবিদ, সে নূতন স্থানে যাইয়া কলাবিদের সন্ধান লয়; যে গাঁজাখোর, সে গাঁজাখোরকে খুঁজিয়া বাহির করে। আমি নিজে বিলাত যাইয়া রসায়নীবিদ্যাগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। প্রিষ্টলি সেইরূপ খুঁজিয়া লাবোয়াসিয়েকে বাহির করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র ভোজন করিতে বসিয়া উক্ত নূতন বায়ুর আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্প করেন। লাবোয়াসিয়ের খুব মনোযোগের সহিত সে কথা শুনেন। প্রিষ্টলির প্রস্থানের পর তিনি তাঁহার কথিত সমস্ত পরীক্ষা পুনরায় নিজে করেন।

ইহার পর তিনি আর একটি পরীক্ষা করেন। একটি বক-যন্ত্রে কিছু পারদ রাখিয়া বক-যন্ত্রের প্রান্তভাগ অপর একটি পারদপাত্রে ডুবাইলেন; সেই প্রান্তভাগের উপর একটি কাচপাত্র উপুড় করিয়া রাখিয়া বক-যন্ত্রের অপর প্রান্তে পারদের নিয়ে তাপ দিতে লাগিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ক্রমাগত ১২ দিন ধরিয়া তাপ দিলেন এবং কি হয়, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, পারদের উপর এক প্রকার রক্তবর্ণ সর পড়িতেছে এবং পারদ ক্রমশঃ কাচপাত্রের উপরে উঠিতেছে। এইরূপে কাচপাত্রের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দূর পর্য্যন্ত পারদ উঠার পর উঠা বন্ধ হইয়া গেল। এই পরীক্ষার ফলও তাঁহার পূর্ব্বস্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের পরিপোষক
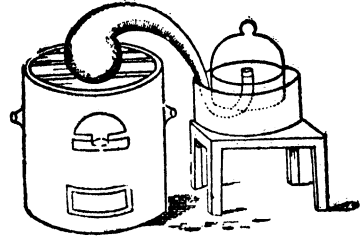
১নং বক-যন্ত্র।

২নং বক-যন্ত্র।

হইল। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, উত্তাপ দিলে পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত কোন এক উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ পারদভস্মে পরিণত হয়। তোমরা নল দিয়া খেজুররস পান করার পদ্ধতি অবশ্য জান। খেজুররসের মধ্যে নলের এক প্রান্ত রাখিয়া অন্য প্রান্তের বায়ু মুখ দিয়া টানিয়া লইলে খেজুররস বায়ুর চাপে শূন্য নলমধ্যে উঠিয়া পড়ে। এখানেও সেইরূপ বায়ুর একটি উপাদান পারদের সহিত মিলিত হইয়া যৌগিক পারদভস্মে পরিণত হওয়াতে পারদ বায়ুর চাপে শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য কাচপাত্রের উপরে উঠিয়াছে। যখন কাচপাত্রে পারদ উঠা বন্ধ হইয়া গেল, তখন বুঝা গেল যে, বায়ুর যে উপাদান পারদের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। এখন যে উপাদান অবশিষ্ট রহিল, তাহা পারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না। এই জন্য পারদ উঠা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং পারদভস্ম একটি যৌগিক পদার্থ। বায়ুস্থিত যে উপাদানের সহিত পারদ সংযুক্ত হইয়া পারদভস্মে পরিণত হইল, তাহার নাম দেওয়া হইল অম্লজান বা অক্সিজেন (oxygen)। তখনকার পরীক্ষিত সব কয়েকটি অম্লে (acid) এই বায়ু পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ভুলক্রমে ইহার নাম অম্লজনক বা অম্লজান (oxygen-acid producer) দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এখন আমরা জানি,—এরূপ অম্ল বা এসিড আছে—যাহাতে অম্লজান নাই। কিন্তু অম্লজান নামটি আজিও রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পারদভস্ম তীব্রতররূপে উত্তপ্ত হইলে পুনরায় বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন উহা হইতে যে বায়ু পাওয়া যায়, তাহা অম্লজান। প্রিষ্টলি পারদভস্ম অথবা সীসকভস্ম হইতে যে বায়ু পাইয়াছিলেন, লাবোয়াসিয়ের
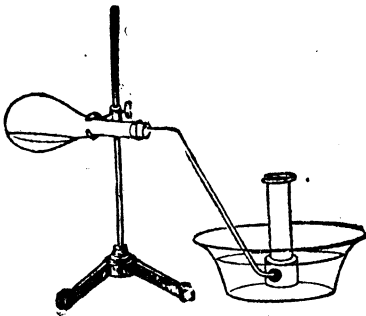
মতে দাঁড়াইল তাহা অম্লজান। ইহার দ্বারা আরও প্রমাণিত হইল যে, মরুৎ বা বায়ু একটি মূল পদার্থ নহে। উহাতে অন্ততঃ দুইটি বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে। উহার একটি অম্লজান বা অক্সিজেন—যাহার সাহায্যে দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়; অপরটির দ্বারা দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহার নাম নাইট্রোজেন (nitrogen) দেওয়া হয়। সাধারণ বায়ুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অম্লজান, বাকী চার-পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন। অবশ্য, পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাধারণ বায়ুতে জলীয় বাষ্প, অম্লাঙ্গারক বায়ু (carbon dioxide বা carbonic acid gas) এবং অতি সামান্য পরিমাণে আরগন (argun) নিয়ন (neon) প্রভৃতি কয়েক প্রকার বায়ু বিদ্যমান আছে। এইবার লাবোয়াসিয়ের প্রথম পরীক্ষাতে রঙ্গ হইতে মারিত রঙ্গের ওজন কেন বেশী হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। রঙ্গ বাতাস হইতে অম্লজান গ্রহণ করিয়া রঙ্গভস্মে পরিণত হয়। যেটুকু ওজন বাড়ে, তাহা বায়ু হইতে গৃহীত অম্লজানের ওজনের সমান। বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্র দ্বারা কোন পাত্রের বায়ু বাহির করিয়া লইলে অম্লজানের অভাবে পাত্রস্থ ধাতু উত্তাপ প্রয়োগ করিলেও ধাতুভস্মে পরিণত হইতে পারে না, ইহাও বুঝা গেল। হাপর দিয়া বাতাস দিলে অম্লজানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া আগুন জোরে জ্বলে।

এইবার সাধারণ দহন ক্রিয়ার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দহন অর্থ দাহ্য বস্তুর অম্লজানের সহিত সংযোগ। মোমবাতির কথা ধরা যাউক। মোমবাতি অঙ্গার (carbon) এবং উদ্‌জান বায়ু বা হাইড্রোজেন (hydrogen) নামক দুইটি মূল পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত। যখন বাতি পুড়িতে থাকে, তখন উদ্‌জান অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জলীয় বাষ্প এবং অঙ্গার অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অম্লাঙ্গারক বায়ুতে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্প এবং অম্লাঙ্গারক বায়ু অদৃশ্যভাবে বায়ুর সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। আমরা শুধু দেখি যে, বাতিটি পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। একটি বোতলের ভিতর বাতি রাখিয়া পোড়াইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বোতলের গায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু জমিয়া বোতলের স্বচ্ছতা (transparency) নষ্ট করিয়া দেয়। বাতির মধ্যস্থ উদ্‌জান ও বাহিরের বায়ুর অম্লজান সংযোগেই উক্ত জল উৎপন্ন হয়। বাতি পোড়াইলে যে অম্লাঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয়, তাহাও পরীক্ষার দ্বারা দেখান যায়। উক্ত বায়ু স্বচ্ছ চূণের জলের ভিতর (lime water) প্রবেশ করাইলে চূণের জলের স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া যায় এবং দুধের মত দেখায়; এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে জলের নীচে থিতাইয়া এক প্রকার গুঁড়া পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়, উহা খড়িমাটী (chalk)। সুতরাং এই মতে জলও একটি মৌলিক পদার্থ নহে। উদ্‌জান ও অম্লজান নামক দুইটি বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। বাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা গেল, কাষ্ঠ বা কয়লা সম্বন্ধেও সেই সব কথা খাটে। যখন দহনক্রিয়া-জাত পদার্থ উড়িয়া না যায়, তখন বায়ুস্থিত অম্লজান গ্রহণ করিয়া দাহ্য পদার্থটির ওজন বাড়িয়া যায়। আর যখন দহনক্রিয়াজাত পদার্থ অদৃশ্য বায়বীয় আকারে পরিণত হইয়া যায়, তখনও দাহ্য পদার্থটি অম্লজানের সহিত মিলিত হয় বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে পদার্থটির ওজন বাড়িয়া গেলেও আমরা যাহা দগ্ধ হয় না বা অম্লজানের সহিত মিলিত হয় না, তাহা মাত্র দেখি বলিয়া মনে করি যে, পুড়িবার পর জিনিসটি লঘু হইয়া গেল। সাধারণ বায়ুতে নাইট্রোজেন বায়ু (যাহা দহনক্রিয়ার সহায়তা করে না) মিশ্রিত আছে বলিয়া আগুন তত জোরে জ্বলে না। এই জন্য অম্লজান বায়ুর মধ্যে দহনশীল পদার্থগুলি এত দীপ্তি সহকারে জ্বলে। এই মতানুসারে সকল প্রকার ধাতুভস্ম ধাতুর সহিত অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। ধাতুভস্ম মৌলিক পদার্থ বা ক্ষিতির অংশ মাত্র নহে; পরন্তু ধাতু ও অম্লজান এই দুই মৌলিক পদার্থযোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। লাবোয়াসিয়ের এই ব্যাখ্যা পরবর্তী রাসায়নিকগণ দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে গৃহীত হইয়াছে।

দেখা গেল যে, প্রিষ্টলি যদিও অম্লজান বায়ু প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তবুও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ফ্লজিষ্টন-বাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এইরূপ অন্ধ সংস্কার বহু স্থানে সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শনে বাধা জন্মায়; এবং এই জন্যই যাঁহারা এই সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া সত্যের আলোক সাধারণ

মানবসমীপে উপস্থিত করেন, তাঁহারা মহাপুরুষ বা যুগাবতার বলিয়া খ্যাত হয়েন। তাই বলিতেছিলাম, লাবোয়াসিয়ে এক জন মহাপুরুষ। তিনি যে নূতন পথে চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত করান, তাহাতেই অচিরে রসায়নী বিদ্যা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। কবি যেমন বলিয়াছেন, 'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে' এস, আমরাও সেইরূপ প্রত্যেকে বলি, 'নমি আমি রসায়নগুরু তব পদাম্বুজে।' এইস্থানে একটি ছোট গল্প বলিয়া অদ্য তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলির পর এক দিন লাবোয়াসিয়ে ও তাঁহার স্ত্রী প্রাচীন মিশরদেশীয় পুরোহিত ও তৎপত্নী সাজিয়া তখনকার ফ্রজিষ্টনবাদদুষ্ট বহু গ্রন্থ অগ্নিপ্রদানে ভস্মীভূত করেন এবং বলেন যে, পুরাতনের এই ভস্ম হইতে রাসায়নিক বিদ্যা নূতন উজ্জ্বল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকসমাজে আদৃত হইবে। *

ইতি নব্য রসায়ন শাস্ত্রোৎপত্তির ইতিহাসে অম্লজান বায়ু ও তাহার গুণাবলি আবিষ্কার নামক প্রথম অধ্যায়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* দৌলৎপুর কলেজের ছাত্রগণের নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু বিবৃত।

বৈদিক প্রার্থনা।

১

সিদ্ধ হউক কামনা মোদের
বৃদ্ধি লভুক ধান্য-ধন,
শুদ্ধ সত্ত্ব-জ্ঞান গৌরবে
ঋদ্ধ হউক মোদের মন।

২

বুদ্ধি হউক কল্যাণময়ী
কর আমাদের হিংসাতীত,
হউক মোদের পুত্রপৌত্র
সুনীতি সুমতি সমন্বিত।

৩

ব্যাধিতে যেন গো বিতরি-ভেষজ
ক্ষুধিতে বিতরি অন্নপান,
দেশে দেশে চিরকল্যাণপ্রসূ
হয় যেন, প্রভু, মোদের দান।

৪

গো-চরণভূমি বাড়ুক মোদের
কর আমাদের আঢ্যগৃহী।
গোধন ঢালুক দুগ্ধ-সরিৎ
হই যেন মোরা বহুব্রীহি।

৫

শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বাড়ুক মোদের
অবগত হোক শত্রু যত,
পদধূলি দেন যেন গৃহদ্বারে
নিত্য অতিথি অভ্যাগত।

৬

এ গৃহে কখনো যাচকেরা যেন
নিরাশ হইয়া ফিরে না, প্রভু;
পরের দুয়ারে যাচ্ঞার লাগি
আমাদের যেতে না হয় কভু।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব্বে।

দীক্ষা নেওয়ার পর আমাদের উদ্যম ও চেষ্টা অনেক বেড়ে গেল। এই সময় আমি পূর্ব্বের কায ছেড়ে, নূতন একটি চাকরী নিয়েছিলাম। মেদিনীপুর জিলার কাঁথী, তমলুক ও সদরের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। তাতে মফঃস্বলে গুপ্ত-সমিতির কায কর্‌বার সুবিধা ঘট্‌ল, সহরের কায অ-বাবু ও সত্যেনের উপরেই ছিল। অল্পদিনের মধ্যে শরীরটি খুব শক্ত ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে গেল।

নিরক্ষর চাষা-ভুষা থেকে আরম্ভ ক'রে দারোগা সাহেব, এমন কি, ডেপুটী "সাহেব" পর্য্যন্ত, সকলকে কথাপ্রসঙ্গে, দেশের দুরবস্থার কথা পেড়ে, ইংরাজই যে সে দুরবস্থার একমাত্র কারণ, তা প্রমাণ কর্‌তে এবং সেই জন্য ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ জাগাতে লেগে গেলাম। তখন যে সকল যুক্তি দেখাতাম, এখন তা মনে হ'লে হাসি পায়। যখন ক্বচিৎ কখনও কোন ইংরাজ-ভক্ত ইংরাজের পক্ষ হয়ে আমাদের যুক্তির অসারতা দেখিয়ে দিত, তখন তাকে গালি দিতেও ত্রুটি কর্‌তাম না।

একবার এক জন ঝাণু ডেপুটীর সঙ্গে মামামহাশয়ের সাম্‌নে ঐ প্রকার তর্ক বেধে গেছল। প্রথমে কথা হচ্ছিল, অনেক বিষয়ে আমাদের দিন দিন কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। আমি ব'লে ফেলেছিলাম যে, ইংরাজই আমাদের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। ডেপুটী হুজুরের সম্মুখে আস্ত সিডিসন্! তিনি নিতান্ত উগ্রভাবে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ ক'রে ফেলেছিলেন যে, ইংরাজ আস্‌বার আগে দেশে দুরবস্থার একশেষ ছিল; ইংরাজ আসাতেই উন্নতি দেখা দিয়েছে। ইংরাজ না এলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌ত না ইত্যাদি। উন্নতির যে সকল নজির তিনি দেখিয়েছিলেন, সেগুলির একটিরও খণ্ডন দিতে না পেরে, আমি একেবারে বেকুব বনে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই জন্য রাগে গরগরিয়ে হাকিমদের কীর্ত্তির ব্যাখ্যান ক'রে তাঁকে দু'কথা শুনাতে যাচ্ছিলাম। এ হেন সময় মামামহাশয়, আমার দুরবস্থা দেখে ভাগ্যিস্ আমার সমর্থন ক'রে বলেছিলেন যে, ইংরাজ আস্‌বার আগে অনেক বিষয়ে এ দেশ অনুন্নত ছিল সত্য; কিন্তু পৃথিবীর অন্য সকল জাতি যেরূপে ক্রমে উন্নত হচ্ছে, আমরাও সেইরূপে ক্রমে উন্নত হ'তে পার্‌তাম; অধিকন্তু বিদেশীর অধীনতা-জনিত দোষগুলি আমাদের স্বভাবে পরিণত হ'তে পার্‌ত না। যাই হোক্, ইহা শুনে ডেপুটী আমায় তাঁর ধম্‌কানীর দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। মামামহাশয়ের এই যুক্তি ইহার পরে অনেক তর্কযুদ্ধে অব্যর্থ অস্ত্ররূপে প্রয়োগ কর্‌তে পেরেছিলাম।

সকল শ্রেণীর লোক ভজাতে গিয়ে দেখেছিলাম, স্বল্প-শিক্ষিত যুবকরা বেশীর ভাগ এ কাযে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাত। পরেও লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, আমাদের এই কাযে যত যুবক ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস্ কলিকাতা-বাসী কম ছিল। তাদের পনের আনাই কলিকাতার বাহিরের ছেলে। মহাকবি মাইকেল বোধ হয় এই জন্যই লিখেছিলেন,—

> "শিখাইব পল্লীবালদলে,
> পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি,"

নতুন ভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি (innovation) কলিকাতার মত বড় সহরের যুবকদের চাইতে পল্লীযুবকদের অনেক বেশী ব'লে আমার মনে হয়।

ঐ সব যুবকের মধ্যে যাদের উদ্যম অধিকমাত্রায় আমাদের চোখে ধরা দিত, তাদের নিয়ে শীকারে যেতাম, বাইক্ চড়তে, বন্দুক ছুড়তে আর নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করতে শেখাতাম। তাদের মধ্যে যাদের একটু সুবিধার ব'লে মনে হ'ত, তাদের গুপ্ত-সমিতির আভাস দিতাম। শুনে তাহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য খুব আগ্রহ দেখাত। কিন্তু পরে যখন দীক্ষা দিতে যেতাম, তখন তাদের প্রায় পাত্তা পাওয়া যেত না। ক্বচিৎ দু'এক জন যারা দীক্ষাও নিয়েছিল, তাদেরও পনের আনা কিছুই করেনি, আর যারা একটু আধটু কিছু করেছিল, তারা কাযের সময় "চাচা আপনা

বাঁচা", লৌকিক বেদের এই বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

একবার এক দারোগার ভাই, দিন কয়েক সাধ্যসাধনার পর খুব আগ্রহসহকারে দীক্ষা নিয়েছিল। তার পর তার দারোগাদাদার গোলামীর "পাপ অন্ন" আর খাবে না ব'লে বাড়ীতে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ জাগিয়ে অবশেষে এক দিন বাড়ী ও স্কুল ছেড়ে আমাদের প্রচারকার্য্যে খুব যত্নের সহিত লেগে গিয়েছিল। তার এই প্রকার ঐকান্তিক ভাব দেখে মনে হয়েছিল, না জানি সে কত অসাধ্যসাধনই না করবে। পরে যখন তা'কে ম্যাজিক্ ল্যান্টার্ণ দেখিয়ে ভাবপ্রচার ও টাকা রোজগার কর্‌বার ভার দেওয়া হয়েছিল, তখন প্রথমে বেশ আশানুরূপ কায করে, কিছু দিন পরে কিন্তু আর টাকাও পাঠালে না, আর কোথায় থাকে, তার খবরও দিলে না। অনেক দিন পরে যাই হোক্ জানা গেল, সে অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়েছে; আর দাদার সুবোধ ভাইটির মত বাড়ী গিয়ে, বে-থা ক'রে, বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়ছে।

এ কাযে সরকারী ছোট বড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে, এমন কি, পুলিসের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমীদারশ্রেণীর মধ্যে সব চেয়ে কম সাড়া পেয়েছি।

সহরে স্কুল-কলেজের মধ্যে সত্যেনই বেশীর ভাগ কায করত। অন্য লোকদের মধ্যে আমাদের গুরুজী অ-বাবু দীক্ষা এবং ভাবপ্রচারের কায বেশ চালাচ্ছিলেন ব'লে বল্‌তেন। কিন্তু কাযে-কর্ম্মে বিশেষ কিছু দেখ্‌তে পাই নি।

জমীদার, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি সকল প্রকার লোকের মধ্যেই, সহানুভূতি কর্‌বার লোক জুটেছিল। তাঁদের মধ্যে সকলেই যে গুপ্ত-সমিতির সমস্ত ব্যাপার আমূল জান্‌তেন,তা নয়। দীক্ষা নিতে বড় একটা কেউ চাইত না। আর আমাদের এই গুপ্ত-সমিতির আদর্শ প্রায় কারও মনে, যতটা দৃঢ় ও স্থায়িভাবে স্থান লাভ করলে, প্রকৃতরূপে কায হ'লেও হ'তে পারত, তত দৃঢ়ভাবে স্থান পায় নি।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাতে আমরা এমনই হতাশ হয়ে পড়তাম যে, আর এ সব কাযে প্রবৃত্তি হ'ত না। কিন্তু আমাদের গুরুজী অ-বাবু ও সত্যেনের দিক্ দিয়ে হতাশা ভুলেও যেত না। অধিকন্তু তাঁদের কাছে আমাদের হতাশার নামটিও কর্‌বার যো ছিল না।

এই অকৃতকার্য্যতার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে কর্‌তাম, অন্যকে অনুপ্রাণিত কর্‌বার শক্তি আমাদের নেই। এ শক্তি কি প্রকারে লাভ কর্‌তে পারি, এই চিন্তা ও চেষ্টা তখন প্রবল হয়ে পড়েছিল। আমাদের আদিগুরু অ-বাবুর সহিত এ বিষয় আলোচনা চল্‌ত। আমাদের এই আধ্যাত্মিক দেশে সম্ভব অসম্ভব যে কোন শক্তি যত ইচ্ছা যোগ-সাধনার দ্বারাই যে নিশ্চয় লাভ করা যায়, এই নিত্য প্রত্যক্ষ সনাতন পন্থাটি কিন্তু গুরুজীর মাথা থেকে বেরুল না। আমার মনে পড়ে, তিনি বাৎলে দিয়েছিলেন যে, খুব ক'রে এ সকল বিষয় পড়ে ও চিন্তা ক'রে অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌লে শক্তিলাভ হ'তে পারে।

আমি কিন্তু তখন দেখেছিলাম যে, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, তবুও তিনি খুব বেশী লোককে আশার অনুরূপ অনুপ্রাণিত কর্‌তে পারেন নি। তাঁর বাৎলে দেওয়া এই পন্থাটি তখন সেই জন্য আমার ঠিক ব'লে মনে লাগে নি। তবে সত্যেন অনেকগুলি ছেলেকে ভজিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও ৫।৬টি ছেলে ছাড়া কেহ শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে নি।

গুরুজী যখন তখন কলিকাতায় যেতেন। তিনি অত্যন্ত Optimist ছিলেন। গাছে কাঁঠাল আছে কি না, খোঁজ না নিয়ে গোঁপে তেল লাগাতে, তাঁর জুড়ীদার প্রায় দেখা যেত না। তিনি যখন কলিকাতা থেকে ফিরে এসে সেখানকার সমিতির কাযের হিসাব দিতেন, তখন তা শুনে আশাতীত কায হচ্ছিল ব'লেই মনে হ'ত। কিন্তু সমস্ত শুন্‌বার পর একটু চিন্তা ক'রে,থোক্-থাক্ কাযের দিকটা ভেবে দেখ্‌লে, দেখা যেত, সবটাই ফাঁকি।

একবার কলিকাতা থেকে এসে তিনি সেখানকার কাযের খুব লম্বা-চওড়া রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কাযের মধ্যে কিন্তু আমি পেয়েছিলাম, যুদ্ধশিক্ষার (?) একটি ঘোড়া, একখানি বাইক, আর একটি নামেমাত্র কুস্তির আখড়া। এক বৎসরে বাঙ্গালা দেশটাকে প্রস্তুত মানে, অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক্ শিক্ষিত সৈন্য, আর সেই বরাবর আফিসার ও যুদ্ধের সরঞ্জাম, এক বৎসরে না হ'ক, দু' বৎসরে তয়ের থাকা। অথচ আসল কেন্দ্র কলিকাতাতেই প্রায় দু' বৎসরে প্রস্তুত হয়েছিল (?) একটিমাত্র ঘোড়া, একখানি মাত্র বাইক, না হয় আরও ঐ রকম কিছু; আর জুটেছিলেন

আন্দাজ এক ডজন নেতা ও উপনেতা, খুব বেশী হয় ত, জোনা চার পাঁচ সর্ব্বস্বপণকারী ভাবী সেনাস্থানীয় চেলা এবং জন কয়েক মাত্র আধচেলা। গুপ্ত-সমিতির কায যে সেরেফ কিছুই হচ্ছিল না, তা বুঝতে একটুও বেগ পাই নি।

গুরুজীর কাছে কলিকাতা কেন্দ্রের কয়েক জন নেতার অনেক তারিফ শুনেছিলাম। তার মধ্যে এক জন ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু দেবব্রত বসু। তিনি না কি এ সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।

আমি দু' এক মাস অন্তর প্রায়ই কলিকাতায় যেতাম। সভাবাজারের উত্তরদিকে মামামহাশয়ের বাড়ীতে থাকতাম। খ-বাবুর সহিত সারকিউলার রোডের একটি বাড়ীতে দেখা করেছিলাম। সেইখানেই কালকাতার কেন্দ্র, তিনি সেখানে সপরিবারে থাকতেন, আর থাকতেন তাঁর একটি যুবতী আত্মীয়া। এঁর সম্বন্ধে পরে বলবার ইচ্ছা থাকল।

তিনি এবারও প্রথমবার সাক্ষাতের মত অনেক নতুন নতুন আজগুবি গল্প ঝেড়েছিলেন। যাই হোক্, তিনি আমায় দেবব্রতবাবুর বাড়ী নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবব্রতবাবুকে দেখে, বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে সত্যই বড় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কতকটা কাছে ছিল ব'লে কলিকাতায় গেলেই, দিন দু'বেলা তাঁর বাড়ীতে আড্ডা দিতাম।

দেবব্রতবাবুর কাছে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ কেন, সমস্ত দুনিয়ার গুপ্ত আর প্রকাশ্য সকল সমিতির খবর থাকত। খবরগুলা অত্যন্ত বাড়িয়ে, আর কখনও বা নিছক কল্পনা থেকে বলতেন। তিনি যে জেনে বুঝে এমন মিথ্যা বলতেন, তা মনে হয় না। এ তাঁর অভ্যাস। এটাকে pious বা honest fraud অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা প্রতারণা বলা যেতে পারে। এমন অনেক কল্পনা-প্রবণ লোক আছেন, যাঁরা কোন কিছু ঘটনা বা ভাব বাহির থেকে তাঁদের মাথায় ঢুকলে, নিজের প্রবৃত্তি (temperament) অনুযায়ী, তাতে জোড়া-তাড়া না দিয়ে পারেন না। এইরূপে নিজের ঝোঁকমত গ'ড়তে গ'ড়তে উক্ত ভাব বা ঘটনা বেমালুম এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, ইহার কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা, কিছুকাল পরে নিজেই আর তা স্থির ক'রে উঠতে পারেন না। তখন তাঁদের কল্পনা তাঁদের কাছে ঘটনাতে পরিণত হয়। সুতরাং তাঁরা মিথ্যা কথা বলার দ্বিধা অনুভব না ক'রে অবলীলাক্রমে তা সত্য ব'লে জাহির করেন।

তার পর অকাট্য প্রমাণ দিয়ে, যদি তাঁদের মিথ্যা বা ঘটনার কাল্পনিক অংশ কতটুকু, তা ধ'রে দেওয়া যায়, তবে তাঁরা বলেন "এরূপ ত হতেও পারত! বা ভবিষ্যতেও ত হ'তে পারে! তা না হ'লে আমাদের মনে এল কেমন ক'রে। এ এক রকমের সত্য, যাকে truth in anticipation বলা যেতে পারে।" দেবব্রত বাবুও ঠিক এই প্রকার বলতেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী, সকল সময় মৃদু হাসি, সুন্দর দাঁতগুলি, আর তাঁর অমায়িক ভাব ইত্যাদি মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেলত। তাঁর চেহারাখানি বেশ লম্বা-চওড়া ও ভারি সম্ভ্রমসূচক ছিল। চাহনী অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও হিপন্‌টাইজিং থাকত। চাহনীর দ্বারা উইল্ ফোর্স প্রয়োগ ক'রে মানুষকে বশ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইনি, ক-বাবু, ও সেই সময়ের অন্য তিন জন প্রধান নেতার সহকারী ছিলেন বটে, কিন্তু সকলের উপর প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতা বিস্তার করতে চেষ্টা করতেন এবং অনেকের উপর করেও ছিলেন। যথাস্থানে তা বলব।

উল্লিখিত তিন জন প্রধান নেতাই ক-বাবুর মত বিশেষরূপ শিক্ষিত ও বিলাত-ফেরত। তাঁদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার; ঐ সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে যখন বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই সিক্রেট সোসাইটীর খেয়াল তাঁর মাথায় ঢুকেছিল এবং ক-বাবুর অনেক পূর্ব্বে অনুশীলন-সমিতি বা এই রকম আর কিছু নাম দিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি চালিয়ে এসেছিলেন। তা' ছাড়া দেশের মঙ্গলকামনায় চালিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে ও প্রচেষ্টায় ইনি যোগ দিতেন। ইঁহার সঙ্গে অ-বাবু আমায় পরিচিত করিয়েছিলেন। ইঁহার সংস্পর্শে আর এক জন উদ্যমশীল ছেলেও নাকি কলিকাতাতে একটি দল গড়েছিল, তার নামও যেন আত্মোন্নতি সমিতি বা আর কিছু।

বাকী দু'জন নেতার এক জনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু অন্য জনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর নাম গ-বাবু ব'লে ধরে নিলাম। এঁর গুণে বড়ই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আরও কয়েক জন সহকারী নেতা ছিলেন। আমাদের বারীন তখন এঁদের ও খ-বাবু নীচু ধাপের কর্ম্মী ছিল। বারীন ও আরও দুই তিন জন ঘিয়ে ভাজা কর্ম্মী খ-বাবুর সঙ্গে ঐ কেন্দ্রেই থাকৃত।

জিলায় জিলায় শাখা-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে ইঁহাদের কাছে যে সকল খবর পেয়েছিলাম, তা বেশ প্রহেলিকাময় ছিল। অর্থাৎ কোথাও যে কিছুই ঠিকমত হয়নি, এ কথা ঠিক মত না ব'লে, এমনিটি ক'রে বলেছিলেন, আর এম্নি ভাব দেখিয়েছিলেন, যেন জিলা-কেন্দ্রগুলিতেই কাযের মত কায হচ্ছে। সে কথা ঘুণাক্ষরে কাকেও খুলে বলা গুপ্ত সমিতির কানুনবিরুদ্ধ বলেই যেন বল্‌তে পাচ্ছিলেন না।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে আমিও প্রথমে অনেক বাড়িয়ে বলেছিলাম, অর্থাৎ এখানে অনেকগুলি শাখা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, আর সবসমেত আন্দাজ ৪।৫ শত লোক সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হয়েছে ; ইত্যাদি প্রকার রিপোর্টই বেমালুম মুখ-থেকে বেরিয়ে গেছ্‌ল। কাযেই আমি ধ'রে নিয়েছিলাম যে, অন্য জিলার রিপোর্ট কতখানি সত্য আর কতখানি truth in anticipation.

যাই হোক্, গুপ্ত সমিতির কায সেখানে জোরের সহিত চল্‌ছিল ব'লে যে সকল স্থানের খুব নাম-ডাক তখন ছিল, সেই সকল স্থানে অনেক দিন পরে নিজে গিয়ে দেখেছিলাম ও শুনেছিলাম যে, তখন প্রায় তেমন কিছু ছিল না। ঢাকা সম্বন্ধে তখন কিছু না শুন্‌লেও পরে জেনেছিলাম, সেখানে নাকি অনুশীলন সমিতি নামে একটি দল উক্ত ব্যারিষ্টার নেতার অনুকরণে অথবা চেষ্টাতে গঠিত হয়েছিল। ইহার সহিত আমাদের ক-বাবুর সমিতির কোন সম্পর্ক ঘটেনি। তার পর বাঁকুড়াতে এক খ্যাতনামা ভদ্র লোকের একটা নাকি দল ছিল। তাঁরা নামে মাত্র আমাদের সমিতির সহিত পরে যোগ দিয়েছিলেন। আর আড়বেলের কোন স্কুল-মাষ্টার একটু আধটু দেশ উদ্ধারের ভাব প্রচার কর্‌তেন; তার ফলে কয়েকটি ছেলে কলিকাতার কেন্দ্রে এসে জুটেছিল।

এই সময় আর এক স্বনামধন্য অমায়িক ভদ্র লোক কলিকাতার সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিষয় পরে যথাস্থানে বল্‌ব। তাঁকে দত্ত বাবু নামে উল্লেখ কর্‌ব।

দেবব্রত বাবু আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে-ছিলেন কারণ, আমায় টাকাওয়ালা বড়লোক অর্থাৎ লক্কড় ব'লে প্রথমে বুঝে ফেলেছিলেন। যাই হোক, মেদিনী-পুর সমিতি থেকে কিছু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার আর শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর 'নিউ ইণ্ডিয়ার' মূল্যস্বরূপ নগদ ৫৲ টাকা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' এক সময়ে ব্রাহ্ম কাগজ ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় উহা রাজনীতিক ব্যাপারে সব চেয়ে গরম কাগজ ছিল। দেবব্রতবাবুও ব্রাহ্ম ছিলেন, আর তখন বেলুড়মঠের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দেবব্রতবাবুও, শুনেছিলাম, ঐ কাগজখানিতে লিখ্‌তেন।

অনেক চেষ্টা স্বত্তেও লোকের মনে গুপ্ত-সমিতির আদর্শ শিকড় গাড়তে পার্‌ছে না দেখে, দেবব্রত ও খ-বাবু এবং অন্য দু' এক জনের কাছে অনেক রকমে জান্‌তে চেয়েছিলাম যে,কি কর্‌লে লোক আমাদের আদর্শ আশানুরূপ গ্রহণ কর্‌বে। তাঁদের কথার ভাবে বুঝেছিলাম, তাঁরাও এই মুস্কিলটা হাড়ে হাড়ে অনুভব কচ্ছিলেন। তাই তখন তাঁরা লোককে হিপনটাইজ বা সম্মোহিত কর্‌বার জন্য অত মিথ্যা কথা বল্‌তেন।

আর বোধ হয়,এতেও বিশেষ ফল না পেয়ে, তাঁরা ভাব-প্রচারের সময়, ধর্ম্মের ফোড়ন আর ভগবান্, কালী, দুর্গাদির দোহাই দিতে সুরু করেছিলেন। এ বিষয়ের পথি-প্রদর্শক ছিল বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দ মঠ' আর বিপিন বাবুর 'শোভনা' নভেল এবং রাজনারায়ণ বাবুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।' শেষের দু'খানি বই কিন্তু খুব কম লোকই পড়েছিল।

ঐ পথ ধর্‌তে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের গুরুজী, এ সম্বন্ধের কথাপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তার এইটুকু আমার ঠিক মনে আছে যে, "ধর্ম্মটা আমাদের উন্নতির পথে draw back বা অন্তরায়।"

এই সময় স্থানীয় মিঞাবাজারে আবদুল কাদের সাহেবের বাড়ী ভাড়া নিয়ে কুস্তি প্রভৃতি শেখার একটি আখড়া খুল্‌বার চেষ্টা হচ্ছিল। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, আমাদের দেখাবার মত কায কিছুই ছিল না। অর্থাৎ ভাবী ভারত-উদ্ধার-যুদ্ধের আয়োজনাদির যে সকল আজগুবি গল্প ঝাড়তাম, তার প্রমাণস্বরূপ সুরুতে অন্ততঃ একটা আখড়া না দেখাতে পার্‌লে চলে না। তার উপর কলিকাতায় যখন একটা আখড়া খুলা হয়েছিল, তখন

আমাদেরও আখড়ার দরকারটা গজিয়ে উঠেছিল। আর একটা বিশেষ কারণ এই ছিল যে, যাঁরা সহানুভূতি দেখাতেন, তাঁদের কাছে টাকা খরচের যোগ্য একটা কিছু কায না দেখিয়ে টাকা চাওয়া যেত না।

তার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, বোধ হয় জুন মাসে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা অ-বাবুর চেষ্টায় মেদিনীপুরে এসেছিলেন। একসঙ্গে আলিপুর জেলে যখন ছিলাম, তখন দেবব্রতবাবু বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্ম্মপ্রচারে ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে এবং সেই সঙ্গে দেশের পূর্ণগৌরবের অনুভূতি জাগিয়ে কিরূপে লোকের মনকে অভিভূত করতে হয়, তা' আমাদের শেখাবার জন্য তিনিই নাকি ভগিনীকে এখানে পাঠিয়েছিলেন।

যাই হোক, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মেদিনীপুর ষ্টেশনে আমাদের সমিতির সভ্যগণ প্রায় সকলে ও অন্যান্য ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে থাম্‌লে তাঁকে দেখে অনেকে "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিল। এই না শুনে তিনি আঁৎকে উঠলেন এবং নিষেধসূচক হাত নেড়ে চুপ করতে ইঙ্গিত কর্‌লেন। আমরা নিশ্চয় অবাক্ হয়েছিলাম। তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" ইংরাজজাতির জাতীয় উচ্ছ্বাস-ধ্বনি, ভারতবাসীর উচ্ছ্বাস-ধ্বনি, ইহা হওয়া উচিত নহে। তখনও "বন্দে মাতরম্" ব্যবহৃত হয়নি। যখন বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম যে, আমাদের তেমন কিছুই নাই, তখন তিনি নিজে হাত তুলে উচ্চ স্বরে তিনবার বলেছিলেন,—"ওয়া গুরুজী কি ফতে, বোল্ বাবুজীকি খাল্‌সা।" আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ষ্টেশনের উপস্থিত অন্য লোক ব্যাপারটা অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। আমরা কিন্তু এই প্রকার বেকুব সেজে ধন্য হয়ে গেলাম। তার উপর এক জন এহেন ইংরাজ মহিলাকে, আমরা এই ইংরাজ তাড়াবার ব্যাপারে সহায় পেলাম মনে ক'রে, অন্ততঃ আমার মিইয়ে যাওয়া উদ্যম ও আগ্রহ আবার তাজা হয়ে উঠল।

সেই অসাধারণ করুণাময়ী ভগিনীর বিষয় এখানে কিছু না ব'লে পার্‌লাম না। জানি না, নিরপেক্ষভাবে দেখলে তাঁকে স্বদেশদ্রোহিণী বলা যেতে পারে কি না। স্বজাতীয়দের দোষ দেখে, সে দোষ থেকে তিনি নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে পার্‌তেন, চাই কি, সেই দোষ সংশোধনের অন্য উপায়ও অবলম্বন করতে পার্‌তেন। তা না ক'রে সে দোষের প্রতীকারের জন্য, অথবা আমাদের মত দুঃস্থের দুঃখ-মোচনরূপ কর্ত্তব্য বা দয়া-ধর্ম্ম পালন জন্য বহিঃশত্রু সৃষ্টি করা, অর্থাৎ আমরা শত্রুনামের অযোগ্য হলেও, আমাদিগকে নামে মাত্রও সাহায্য করাটা যেন একটুখানি কেমন ব'লে মনে হয়।

অথচ ঐ সময় এক দিন তাঁর সাম্‌নে ইংরাজজাতের নানাপ্রকার দোষের কীর্ত্তন করা হচ্ছিল; তাতে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, "ওরা আমার স্বজাতি; স্বজাতির কুৎসা শুনা এবং সহ্য করা বড় কষ্টদায়ক।"

যাই হোক্, তখন মেদিনীপুরে ভীষণ গ্রীষ্ম। যে ঘরটি তাঁকে থাক্‌তে দেওয়া হয়েছিল, বেলা একটার সময় তাতে ঢুকে সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিলেন। রলা (?) দেওয়া খাটের উপর থেকে পরিষ্কার গদিটি সরিয়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট মাদুর ও পাতলা কাঁথাখানি পাতলেন। অবাক্ হয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন,—সংযম অভ্যাস কর্‌ছেন। আর আমরা যে কাযের ব্রতী, তাতে ঐ রকম সংযম অভ্যাস করা অবশ্য উচিত।

তিনি এখানে পাঁচ দিন ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় অনেক লোক এসেছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে অনেকে স'রে পড়েছিলেন। সে জন্য স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁকে বলেছিলেন—"আপনার বক্তৃতার মধ্যে রাজনীতির তীব্রতা বেশী ছিল ব'লে অনেকে স'রে পড়েছিলেন। পরের বক্তৃতায় হয় ত লোক হবে না।" ইহার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনও প্রবাহিত। যাহারা ভয় পায়, আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নহে।" সত্য সত্যই পরের বক্তৃতায় ভাল লোক হয় নি। তিনি কিন্তু সমান আগ্রহে পাঁচ দিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁকে দিয়েই আমাদের আখড়ার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা হয়েছিল। তাতে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন, তা মনে হ'লে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রাণ উথলে উঠে।

ঐ পাঁচ দিনের এক দিন বৈকালে তাঁকে আমরা আখড়াতে নিয়ে গেলাম। আমাদের গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছাড়া আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ও অন্য লোক এই উদ্বোধন ব্যাপারের

গূঢ়রহস্য জান্‌তেন না। তাঁরা ভগিনীর ভাব দেখে নিশ্চয় অবাক্ হয়েছিলেন। এই পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেকে টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌তেন। যাঁরা সব চেয়ে অন্তরের সহিত বেশী সাহায্য কর্‌তেন, তাঁরা এখন পরলোকে।

ভগিনী তার পর নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠী ঘুরিয়ে ও অন্যান্য কসরত ক'রে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে দিয়েছিলেন। আর এক দিন তিনি স্থানীয় কয়েক জন ভদ্রমহিলাদের সম্মিলনে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দু' এক জন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুড়তেও শিখিয়েছিলেন।

ভগিনী আমাদের পড়বার জন্য কতকগুলি বইয়ের নাম করেছিলেন; আর কতকগুলি বই নিজে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ম্যাজিনির কয়েকখানি আর প্রিন্স ক্রোপট্‌কিনের একখানি বই ছিল।

ভগিনীর আগমন ব্যাপার আমাদের মরাগাঙ্গে আবার বান ডাকিয়ে দিল। কলিকাতা থেকে স-বাবুকে মাসে ১৫৲ টাকা মাহিনাতে ঘুসাঘুসীর বক্‌সিং মাষ্টার ক'রে আনা হ'ল। তিনি পরে এক অনুশীলন-সমিতির প্রধান কর্ম্মিরূপে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

বিশ্ববিদ্যালয়।
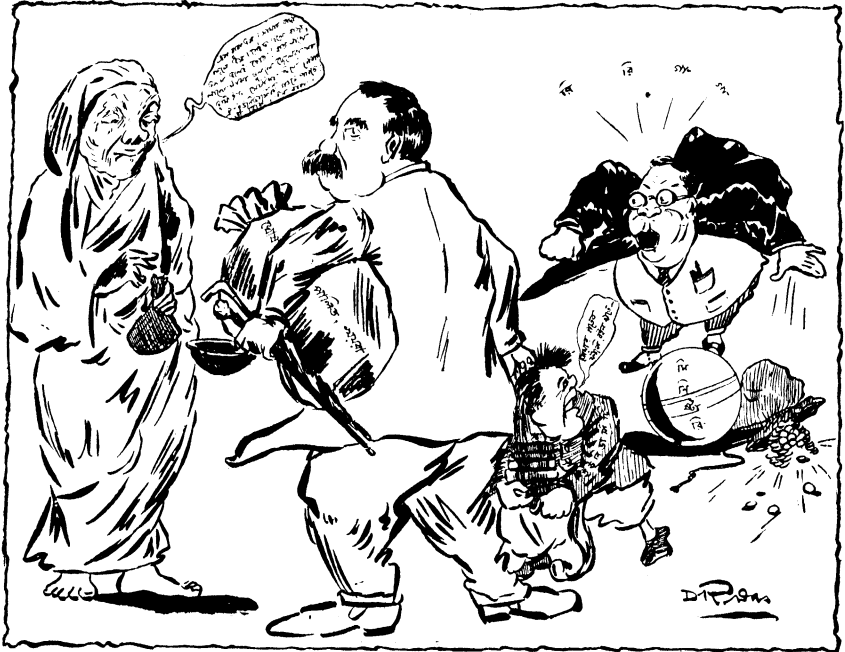
মিনিষ্টার।— পয়সা দিব, হিসাব লইব না? বাঃ!

ভাইস চ্যান্‌সেলার।—রইলো তোমার ওজন করা দান। আয় খোকা দেশে ভিক্ষে মেগে খাব, তবু—

দেশমাতা।— এস, বাবা, এস! সেই ত এলে বাছা, তখন এলেই হোত। কত লাখে লাখে টাকা উঠত। তা হোক্, এস বাবা।

তুর্কীর পুনরভ্যুদয় ও বর্ত্তমান সমস্যা।

প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া জগদ্ব্যাপী সংগ্রামের অবসানে সমস্ত পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়াছিল। যুদ্ধশ্রান্ত মানবজাতি নরহত্যার অবসানে আবার শান্তি-সুখ উপভোগের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিল। ক্লান্তি, অবসাদ ও শোকের সঙ্গে সঙ্গে বলদর্পে বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল। বিজ্ঞানমূলক জড়বাদের শিক্ষায় ঘৃণা আসিয়াছিল। স্থায়ী সন্ধি ও ভ্রাতৃভাবের পুনঃস্থাপনের জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এ আশা একেবারেই ফলবতী হয় নাই। বিজয়ী মিত্রপক্ষ ভার্সেই-এর (Versaillies) প্রাসাদে বসিয়া বিজয়দর্পে যে সন্ধি-সর্ত্ত বিজিত জাতিবৃন্দের উপর চাপাইয়াছিলেন, তাহা কাহারও মনোমত হয় নাই। জেতা বা বিজেতা, কোন পক্ষই সন্ধির সর্ত্তে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। জেতৃবর্গ অবশ্য শক্তিবলে পরাজিত শত্রুকে নিজ সর্ত্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অনন্যোপায় হইয়া সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন। এ সম্মতি বাধ্য হইয়া দিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুর্কী চারি দেশেরই সমান দশা হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার অস্তিত্ব একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। অষ্ট্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি জাতি হিসাবে স্বাধীন হইয়াছে। দক্ষিণাংশের শ্লাভ-প্রদেশগুলি সার্ব্বিয়ার সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমান জুগোশ্লাভিয়া এক বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশের বানাট্ প্রদেশ ও ট্রানশিল্ভেনিয়া রুমানিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। গ্যালিসিয়া পোলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আর অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বোহিমিয়া (চেকোশ্লাভিয়া) স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

বুলগেরিয়াকেও যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ গ্রীসকে প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরে কিয়দংশ রুমানিয়া ও পশ্চিমের এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ সার্ভিয়ার কবলে আসিয়াছে। জার্ম্মাণীরও ঐরূপ বহু প্রদেশ হস্তচ্যুত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তাই, বোধ হয়, ভয়ে ভয়ে নামমাত্র অন্য জাতীয় লোকের যে যে প্রদেশে বাস ছিল তাহাই সেই সেই রাজ্যের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের টাকাও ভয়ে ভয়ে আদায় করিবার চেষ্টা হইতেছে। মন্ত্রিবর লয়েড জর্জ্জ এ বিষয়ে আবার জার্ম্মাণীর পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার মিত্র তুর্কীর সহিত সন্ধিস্থাপনের সময়েই য়ুরোপীয় মস্তিষ্কের ও য়ুরোপীয় "শ্বেত" রাজনীতির প্রকৃষ্ট পরিচালনার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছিল। তুর্কী দয়ার পাত্র একেবারেই নহে। এসিয়াবাসী "বিবর্ণ" জাতি; ধর্ম্মে মুসলমান; তাহার উপর আবার তেজের সহিত যুদ্ধও করিয়াছিল। চারি বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর তুর্কীও যখন অবসন্ন হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইল, তখন তাহাকে সর্ত্ত স্বীকারের পূর্ব্বে কঠোরতর পণে আবদ্ধ করা হইল। যেমন দীক্ষার পূর্ব্বে সংযম ও অনুশোচনার প্রয়োজন, সেইরূপ সন্ধিলাভের পূর্ব্বে তুর্কীকে নবদীক্ষার উপযোগী সংযমব্রত অবলম্বন করিতে হইল। তুর্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল মিত্র-সৈন্যের হস্তে আসিল। যুদ্ধসামগ্রী, রণ-সরঞ্জাম, নৌবল সমস্তই মিত্রশক্তির হস্তে সমর্পিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র আশ্বাস দেওয়া হইল যে, তুর্কজাতির বাসভূমি প্রদেশ-সমূহ সমস্তই তুর্কীর হস্তে থাকিবে; রাজধানীও তুর্কদিগের থাকিবে এবং পবিত্র স্থান সমূহেরও সুব্যবস্থা করা হইবে।

অনন্যোপায় হইয়া তুর্কীর সুলতান ও মন্ত্রিবর্গ তাহাই স্বীকার করিলেন। নিরস্ত্র, অর্থহীন, মিত্রহীন, অনন্যগতি তুর্ক—তাহার সহায়-সম্বলের মধ্যে রহিল কেবল পৃথিবীর মুসলমানদিগের সহানুভূতি আর য়ুরোপীয় মিত্রশক্তিদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদজনিত স্বার্থমূলক সহৃদয়তা।

সেভ (Sevres) নগরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হইল। সর্ত্তানুসারে মেসোপোটেমিয়ায় আরবদিগকে বলপূর্ব্বক "স্বাধীনতা" দান করিয়া তাহাদিগকে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে রক্ষা করা হইল। সিরিয়ার মুসলমানদিগকেও ঐরূপ ফরাসীর অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা দেওয়া হইল। হাজাজের আরবদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল। আর্ম্মেনিয়া

স্বাধীনরাজ্য হইল। এমন কি, উহারও সীমা ছাড়াইয়া আজার বিজানে মুসলমানদিগকে স্বাধীন করা হইল। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে তুর্কীর অঙ্গচ্ছেদ ও বলক্ষয় করিয়াও মিত্রপক্ষ ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা বিভিন্ন জাতির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তুর্কীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সুন্দর বাণিজ্য-প্রধান স্মার্ণা প্রদেশ গ্রীসের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রীসের এ রাজ্যে কোন প্রকার দাবীই নাই বা ছিল না। গ্রীস যুদ্ধে মিত্রপক্ষের কোন সাহায্য করে নাই; বরং কৃতঘ্নতা, কপটতা ও স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করার বিশেষ অন্তরায় হইয়া উঠিল। সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়াবাসীরা অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা চাহিল না। ফরাসী ও ইংরাজ উভয়কেই বিশেষ বেগ পাইতে হইল। আর তুর্কীরাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও সেনানীবর্গ উক্ত সন্ধি নামঞ্জুর বলিয়া প্রচার করিয়া আনাটোলিয়ার দুর্গম-প্রদেশে তুর্করাষ্ট্রের শাসন পুনঃস্থাপিত করিলেন।

এই স্বাধীনতাপ্রয়াসী তুর্কদলেরই নেতা, আজ মুসলমান-জগতে ধন্য বীরবর মুস্তাফা কামাল পাশা। তিনি দেখিলেন যে, মুখের কথায় কিছু হইবে না। প্রতিবাদে ফল হইবে না। আবেদন কেহ শুনিবে না। সমবেদনায় কাহারও মন টলিবে না। তিনি তখন বীরের মত তুর্ক-জাতিকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় প্রাণ-বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

এ শিক্ষা তুর্কের আজ নূতন নহে। তুর্ক যে এত-কাল য়ুরোপে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহা তাহার নিজের শক্তিতে। অবশ্য য়ুরোপের নিকট সাময়িক সে সাহায্য পাইয়াছিল—স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সময়ে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসী সাহায্য করিয়াছিল। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্ক আত্মনির্ভরতা ভুলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছাচারতন্ত্র শাসননীতির ফলে তাহার শক্তির অপচয় হইয়াছিল। মতভেদ দলাদলির অভাবও ছিল না। নানা কারণে হীনবল হইলেও তুর্ক একেবারে অস্ত্র ধরিতে ভুলে নাই। তাহার সামরিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

তুর্কীর অতীত গৌরবের কথা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। মধ্য-এসিয়াবাসী অটোমান তুর্করা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমগ্র এসিয়ামাইনরে নিজ প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছিল, পরে গ্রীক সম্রাটেরই আহ্বানে উহার রক্ষার্থ য়ুরোপে অবতরণ করে। তখনও উহাদের রাজ্যলিপ্সা প্রবল হয় নাই। তাহারা আর্ত্তের সাহায্য করিয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া আইসে। গ্রীক রাজগণের দুর্ব্ব্যবহারে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তুর্ক বল্কান প্রদেশে স্বাধিকার স্থাপনে উদ্যোগী হয়। শেষ কোসোভা নাইকোমিড়িয়া ও ভার্ণার রণক্ষেত্রে সমাগত খৃষ্টান শক্তিকে বার বার পরাজিত করিয়া তুর্ক আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ক্রমে কনষ্টান্টিনোপল প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রদেশ উহাদের অধিকারে আইসে (১৪৫২ খৃঃ)। বিজয়ী তুর্ক তখন সামরিক শক্তিতে—শাসননীতির উদারতায় ও ন্যায়বিচারে য়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা উহা বার বার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উহাদের শাসননীতিতে অত্যাচার ছিল না। বিধর্ম্মীর প্রতি বিদ্বেষ বা বিচারে পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তুর্ক সুলতান খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করা দূরে থাকুক, নিজ ব্যয়ে উহাদের উপাসনাস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন; ধর্ম্ম-যাজকদিগকে যথাসাধ্য বেতন দিতেন ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সুলতান খৃষ্টান প্রজাদিগকে তাহাদের আইনানুযায়ী শাসন করিতেন। উত্তরাধিকার, দায় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবাদস্থলে স্থানীয় বিধি অনুসারে বিচার করা হইত। খৃষ্টান প্রজাকেও সুলতান দুর্ব্বৃত্ত জমীদারের (Faudal Lord) হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। ক্রীতদাসকল্প খৃষ্টান প্রজাদিগকে অভয় দান করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইতেন। তখন তুর্কীর সৈন্যবল অব্যাহত ছিল। অদম্য জানিসারি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পরাজিত হয় নাই। এই সকল কারণে তুর্কী সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, মিশর, হেজাজ, এসিয়ামাইনর, ট্রান্সককেসিয়া, সমগ্র বল্কান প্রদেশ—রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, আল-বেনিয়া ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। হাঙ্গেরীর বহু অংশ তুর্কীর করদ ছিল; এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্ত্তী রুষিয়ার দক্ষিণাংশও তুর্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

এই তুর্ক সমৃদ্ধি চিরকালই য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দ বিদ্বেষ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। চিরকালই তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া উহার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

লিপান্টোর (১৫৭২ খৃঃ) জলযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই উঁহারা সম্মিলিত হইয়া তুর্কদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উক্ত জলযুদ্ধে তুর্কগণ পরাজিত হয় ও তাহাদের নৌবল ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও তুরস্ক-সম্রাট বিচলিত হয়েন নাই। পরবৎসরেই পরাজিত ভিনীসিয়া সাধারণতন্ত্রের সন্ধিপ্রার্থী রাজদূত উপঢৌকন লইয়া আগত হইলে তুর্ক সুলতানের গর্ব্বিত মন্ত্রিবর উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"দূতপ্রবর, আমার প্রভুর পক্ষে একটি নৌবাহিনীক্ষয় শ্মশ্রু বপনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। উহা যেমন কামাইলে আরও ঘন হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের নৌবল আরও প্রবল হইয়াছে।"

উহারও দুই শত বৎসর পরে বিজয়ী তুর্ক সেনা অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরী অবরোধ করিয়াছিল। কেবল পোলণ্ডরাজ সোবাইস্কির বীরত্বেই উহারা পরাজিত হইয়া ভিয়েনা ত্যাগ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও রুষ সম্রাট পিটার তুর্কহস্তে পরাজিত হইয়া প্রচুর নিষ্ক্রয় দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে হীনবল হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তুর্ক-সৈন্য খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। তুরস্কেরও জয়শ্রী অচলা রহিল না। শাসনের বিশৃঙ্খলতা, আত্মকলহ, রাজকুলে বিবাদ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবর্গের স্বার্থপরতার ফলে ক্রমে সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটিল। খৃষ্টীয় জাতিবর্গ ক্রমে মাথা তুলিতে লাগিল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে তাহারা শক্তিমান হইয়া উঠিল। রুষিয়া প্রবল শত্রু হইয়া উঠিল। কনষ্টান্টিনোপল জয় ও ঐ নগরীতে রুষ সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করা পিটারের বংশধরদিগের জীবনের একটি মহদুদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। সুবিধা পাইলেই তুর্কদিগকে আক্রমণ করা ও শ্লাভ খৃষ্টানদিগকে সাহায্য করা তাঁহাদের ব্রত হইল।

রুষগণ অকারণ তুর্কদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রুষ সম্রাট চারিবার তুর্কদিগকে আক্রমণ করেন। তখন তুর্কীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা নানা কারণে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় প্রজাবর্গ গ্রীসে, সার্ভিয়ায় ও অন্যস্থানে বিদ্রোহী হয়। ঐ সঙ্গে মিশর ও এপিরাস্‌এর শাসনকর্ত্তৃদ্বয় আলিপাশা ও মহম্মদ আলি বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়াইয়া দিলেন। এই সময়েই আবার তুর্ক সুলতান মামুদ রণদুর্ম্মদ ও যথেচ্ছাচারী জানিসারিদিগের নিপাতসাধন করেন। এই সুযোগে রুষ-বাহিনী তুর্কসাম্রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করে, ও ফলে তুরস্ক-সম্রাটকে বিপন্ন করিয়া তুলে। ইংরাজ ও ফরাসী সুযোগমত নাভারিণোর নিকটে অতর্কিতে তুর্ক নৌবল বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে।

এই অভিনয় বার বার ঘটিতে থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেও রুষ-সম্রাট প্রথম নিকোলাস খৃষ্টীয় প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থ তুরস্ক আক্রমণ করেন। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীরা ক্রীমিয়ার যুদ্ধে তুর্কীর সহিত যোগ দেওয়ায় তুরস্ক রক্ষা পাইয়া যায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দেও ঐ ঘটনা ঘটে। সেবার বুলগেরিয়াবাসী খৃষ্টীয় বিদ্রোহীদিগের উপর তুর্ক-সেনা অত্যাচার করিয়াছে, এই ছলে রুষ-সম্রাট তুরস্ক-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। বীর ওসমান পাশার বীরত্বে রুষ-সেনা প্লেভনায় বার বার পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তুর্ক-সম্রাট সন্ধিপ্রার্থনায় বাধ্য হয়েন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে তিনটি খৃষ্টানরাজ্য স্বাধীন হয় এবং বুলগেরিয়া স্বতন্ত্র করদ রাজ্যে পরিণত হয়। সেবার ইংরাজের সাহায্যে তুর্কী-সাম্রাজ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পায় নাই।

উক্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কী-সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপিত হয়। মন্ত্রিবর মিধত (Midhat) পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হয়েন। সুলতান আবদুল হামিদ নিজে প্রজাদিগের মতানুসারে শাসন করিতে সম্মত হয়েন। যুদ্ধের গোলযোগে ও নানা কারণে উক্ত শাসন-প্রণালী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। আবদুল হামিদ যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য্য পুনঃস্থাপিত করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বিলাসী ও যথেচ্ছাচারী হইলেও তিনি কূটনীতিবিশারদ ছিলেন। তিনি কোনমতে শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুকে চালিত করিয়া শক্তিবর্গের মধ্যে ভেদ ঘটাইয়া রাজ্যরক্ষা করিয়া আইসেন। ফলে তুর্কী-সাম্রাজ্যের আর অঙ্গহানি হয় নাই।

সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালের শেষভাগে আবার সাম্রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীস য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের প্ররোচনায় তুরস্ক-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু পরাজিত হইয়া ক্ষতিপূরণ ও রাজ্যাংশদানে বাধ্য হয়। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধেরই কয়েক বৎসরের মধ্যে তুরস্ক

সাম্রাজ্যের কতিপয় শিক্ষিত ও উচ্চাভিলাষী স্বদেশ-প্রেমিক শাসন-পদ্ধতির সংস্কারকল্পে "নব্য তুর্ক-সম্প্রদায়" প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে উহাদের প্যারী নগরীতেই মিলন ও মন্ত্রণা-স্থান স্থাপিত হয়। ইঁহারা অর্থসংগ্রহ করিয়া শাসন-সংস্কার ও বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ ঘটাইয়া নূতন শাসন-প্রণালী স্থাপনের চেষ্টা করেন। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ ইঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কী-সাম্রাজ্যে আবার বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইঁহারা বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। ঐ বৎসর য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের গুপ্ত সাহায্যে ও মন্ত্রণায় বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পূর্ব্ব-রুমানিয়ার করপ্রদানে অস্বীকৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট সুলতানের "বন্ধুবর" জোসেফ বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশদ্বয় স্বরাজ্যভুক্ত করেন। এ বিষয়ে শক্তিপুঞ্জের কেহই বাধা দেন নাই। অতঃপর কিছু ক্ষতি-পূরণ লইয়াই তুর্ক-সম্রাটকে ক্ষান্ত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্‌বেনিয়া, মেসিডোনিয়াতে বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। তুর্ক-সৈন্য, আর্ম্মেনিয়া ও অন্যস্থানে বিদ্রোহী হয়। তরুণ তুর্কদলের অন্যতম নেতা নায়েজি বে, রেস্‌না সহরে বিদ্রোহী হয়েন। আত্মরক্ষার্থ আবদুল হামিদ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রজা-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। উদার-নীতিক-দলের নেতা কিয়ামিল প্রধান মন্ত্রী হয়েন। কিয়ামিলের ক্ষমতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই তাঁহাকে পদ-ত্যাগ করিতে হয়। তরুণ তুর্কদল প্রবল হইয়া উঠেন এবং আনোয়ার বের নেতৃত্বে এবং সেনাপতি মাম্‌দ সেভকেটের সহায়তায় দেশে রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হয় ও সুলতানকে পদচ্যুত করা হয়। আবদুল হামিদের স্থানে নূতন সম্রাট পঞ্চম মহম্মদ প্রজামতে রাজশাসন করিতে সম্মত হয়েন। ঐ সময়েই য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসন-সংস্কারের জন্য চারি জন বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। জার্ম্মাণ-সেনাপতি গোল্‌জ এবং তৎপরে আর এক জন তুর্ক-সেনার শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েন। ঐরূপ নৌ-সেনা শিক্ষার ভার পড়ে, ইংরাজ সেনাপতি এড্‌মিরাল গ্যাম্বল্‌এর হস্তে।

তরুণ তুর্কদল শাসন-সংস্কারের পর মনে করিয়াছিলেন যে, অতঃপর আর কোন গোলযোগ থাকিবে না; তুর্ক ও খৃষ্টান একমত হইয়া রাজ্যের উন্নতিকল্পে যোগ দিবে। কিন্তু তাঁহাদের এ আশা একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। খৃষ্টান প্রজাবর্গ প্রকাশ্যভাবে তুর্কদিগের বিপক্ষতা করিতে থাকে এবং উহাতে রুষিয়ার ও অষ্ট্রিয়ার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহারই দুই বৎসরের মধ্যে তুর্কী-সাম্রাজ্য আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিনা কারণে বিনা দোষে ইটালী তুর্কদিগের হস্ত হইতে ত্রিপোলী ছিনাইয়া লইল। য়ুরোপীয় রাজনীতিকবর্গ কেহ কোন কথা কহিলেন না। ঐ যুদ্ধ থামিতে না থামিতে আবার রুষ সম্রাটের গুপ্তসাহায্যে ও আমন্ত্রণায় এবং বেল-গ্রেডস্থিত রুষদূতের চক্রান্তে বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া ও গ্রীস একযোগে হঠাৎ তুর্কসৈন্য আক্রমণ করে। ফলে তুর্কসৈন্য একেবারে পরাজিত হয় এবং বুলগেরিয় সেনাপতি আদ্রিয়া-নোপল জয় করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের একেবারে দ্বারদেশে চ্যাটালজা দুর্গমালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন। য়ুরোপীয় রাজনীতি-করা এবারেও কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। পরাজিত হইয়া তুরস্ক কেবল কনষ্টাণ্টিনোপল বাদে সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া লণ্ডনে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর উহাদের মধ্যে আবার গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় আদ্রিয়ানোপল পুনরায় তুর্ক-হস্তে আইসে (১৯১৩—১৪)।

নানা কারণে উত্যক্ত হইয়া তুর্কী-সম্রাট মহাসমরে জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করেন। জার্ম্মাণী অবশ্য তখন তুর্কীর বিশেষ মিত্রতা করিতেছিলেন। আর ইংরাজ রাজ-নীতিকরাও বুদ্ধির দোষে তুর্কদিগের Capitulation ও extra-tarritoriality উচ্ছেদ করিতে অসম্মত হওয়ায়, বাধ্য হইয়া তুর্ককে ইংরাজাদির শত্রুর পক্ষে যোগ দিতে হয়। ইংরাজের সুবিধাই হইল। এই সুযোগে মিশর একেবারে ইংরাজের হস্তে আসিল।

যুদ্ধের পর সন্ধির সর্ত্তের কথা বলিয়াছি। সন্ধিতে তুর্কীর নিগ্রহ যৎপরোনাস্তিই হইল। বাধ্য হইয়া অনন্যো-পায় তুর্কী সুলতান বহুসর্ত্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াও উহাতে সম্মত হইলেন। প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। বন্দী তুর্কী সুলতান মিত্র সেনাপতিবর্গের ক্রীড়নক হইয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও চাপের উপর চাপ দিতে ছাড়িলেন না। সুলতানের আশার মধ্যে রহিল, যদি মিত্রশক্তিবর্গ দয়া করিয়া বা পরস্পর রেষা-রেষিতে রাজধানীটুকুমাত্র ছাড়িয়া দেন।

কামাল পাশা ও স্বদেশভক্ত বীরগণের এই আশ্বাস-মরীচিকায় কোন আস্থা হইল না। তাঁহারা মনে জানিলেন যে, শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকের দয়ার ভরষায় থাকিলে হইবে না; নিজের শক্তিতে স্বাধীনতালাভ বা মৃত্যু উভয়ই শ্রেয়ঃ। এই চিন্তায় তাঁহারা সৈন্যদল শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। সুবিধাও ঘটিল। বলশেভিকদল নিজ দলের পুষ্টিকল্পে তাঁহাদের সহায়তা করিলেন, সৈন্য-সাহায্যেও সম্মত হইলেন। আবার এ দিকে বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন গ্রীকদিগের উপর ফরাসী ও ইটালী বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টকে অর্থ ও যুদ্ধসামগ্রীর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। মুশো ফ্রাঙ্কলিন বুইলোর উদ্যোগে ফরাসীর সহিত তুর্কদিগের সন্ধি হইল। আয়োজন উদ্যোগ ঠিক হইলেই কামালের বাহিনী গ্রীকদিগকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত করিয়া এসিয়ামাইনর হইতে দূর করিয়া দিল।

বর্ত্তমানের ঘটনা কাহারও অবিদিত নাই। গ্রীকদিগের সাহায্যকল্পে লয়েড জর্জ্জ পুনরায় পৃথিবীব্যাপী মহাসমর ঘটাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইটালী ও ফরাসীর যুদ্ধে অনিচ্ছাবশতঃ ও বহু ইংরাজ নেতার আপত্তিবশতঃই ঐ যুদ্ধোদ্যম থামিয়া যায় এবং মুডানিয়ায় একটি অস্থায়ী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

তুর্করা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যাহাই করুক না কেন, তাহাতে অপরের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। তুর্ক সুলতানকে পদচ্যুত করা না করা তুর্কদিগের নিজের ব্যাপার। অবশ্য, এ বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদিগের বিশেষ স্বার্থ আছে। তুর্কী সম্রাটরা বহু দিন যাবৎ (প্রায় ৩৫০ বৎসর) ইসলামের খালিফা বা ধর্ম্মগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ পদ তুর্করাজবংশে একরূপ স্থায়িভাবেই অর্পিত হইয়াছিল। তবে উহা মুসলমান জনসাধারণের মতানুসারে বা কোরাণের বিধিমত হয় নাই। তুর্কী সম্রাটের শক্তিবলেই উহা ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমানে তুর্কগণ খালিফার পদ সুলতানের পদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। কথাটা এক হিসাবে মন্দ নহে। সুলতান উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, বাহিরের মুসলমানদিগের সাহায্য ও সহানুভূতিতে সুলতানের যথেচ্ছাচারস্পৃহা বলবতী হয়। উহাতে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পরিচালনে ব্যাঘাত ঘটে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থের মতেও উক্ত পদলাভে সুলতানের বিশেষ কোন অধিকার নাই। তবে ইদানীন্তন জগতে তুর্কী সুলতান একমাত্র স্বাধীন ও প্রবল মুসলমান রাজা হওয়ায় ইস্‌লামের মর্য্যাদারক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা ও শক্তি তাঁহারই ছিল।

এই জন্যই সুলতানের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ কাতর কণ্ঠে বার বার ইংরাজ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আশ্বাস সত্ত্বেও এই আবেদন অগ্রাহ্য করাতেই ভারতীয় মুসলমান প্রজার বিষম মনঃক্ষোভ ঘটে। আজিও সে ক্ষোভ তিরোহিত হয় নাই এবং যত দিন পর্য্যন্ত না ন্যায় ও ধর্ম্মানুযায়ী সন্ধি পুনঃ স্থাপিত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সেই আন্দোলন ও ক্ষোভ বর্ত্তমান থাকিবে।

বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের বিষয় কিছুই বলা যায় না। তবে এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে পুনঃ পুনঃ রণাভিনয় ও নরহত্যা চলিতেছে, তাহা য়ুরোপীয় রাজনীতিকদিগের পক্ষপাতিত্বে ও বুদ্ধির দোষে। তুর্কীর বিপক্ষতা করিবার সুযোগ পাইলে তাঁহারা কোন মতেই অবসর ছাড়েন না। তাঁহাদের মুখের কথা "জগতে শান্তি হউক, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পরের বিদ্বেষ দূর হউক" ইত্যাদি। কার্য্যের বেলা কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি চিরকাল স্বধর্ম্মাবলম্বীর দিকে। মুসলমানরা খৃষ্টানের উপর অত্যাচার করিলে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু বিপরীত ঘটনা হইলে অন্যরূপ ভাব হয়। চিরকালই শুনা যাইতেছে যে, তুর্ক জাতি ঘৃণ্য, উহাদিগকে য়ুরোপ হইতে তাড়াও, কিন্তু উঁহাদের পরম স্নেহাস্পদ খৃষ্টান গ্রীক, বুল্‌গেরিয়ান বা আর্ম্মানীদিগের কোন দোষই নাই। তুর্কী যখন বিদ্রোহদমনের সময় বিদ্রোহীর সাজা দেয়, তখন য়ুরোপবাসী ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জগৎ ব্যাপিয়া তুর্কীর কলঙ্ক প্রচার করেন। তাঁহারা তাহাতেও ক্ষান্ত থাকেন না। তুর্কীকে নানা উপদেশসূচক পত্র (note) দেওয়া হয়, নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করা হয়। প্রয়োজন হইলে আবার বলপ্রয়োগও হয়। কিন্তু তুর্কের উপর অত্যাচার হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহারা মজা দেখেন। রুষরাজ যখন ইহুদীর বংশ নির্ব্বংশ করেন, যখন পোলদিগকে সমূলে নাশ করার উদ্যোগ করা হয়, তখন ভয়ে কেহ কোন কথা বলেন নাই। প্রবল রুষের কথা দূরে

থাকুক, যখন বল্কানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরা যুরোপের সহানুভূতির জন্য নিজেই ছদ্মবেশী মুসলমানের দল সাজাইয়া নিজেদের গ্রাম জ্বালাইয়া তুর্কীর নামে দোষ রটনা করে, তখন প্রকৃত ঘটনা জানিয়াও কেহ কোন কথা কহেন না। বেশী দিনের কথা নহে—এই শতাব্দীর প্রথমেই যখন বুলগেরিয় কমিতাজির দল মাসিডোনিয়ায় মুসলমানদিগের নির্য্যাতন করিল, তখন কেহ কোন কথাটি কহিলেন না। আবার বিগত ১৯১৩—১৪র যুদ্ধে যখন গ্রীকরা মুসলমানদিগকে পশুর মত বধ করিল—মুসলমান কুল ললনাদিগকে গাছে ঝুলাইয়া উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিয়া সভ্যতার পরিচয় দিল, তখন কেহ ধর্ম্মের নামে কোন কথাটিও বলিলেন না। আর্ম্মাণীরা যখন রুষ বা অন্য জাতির সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহ করে,—মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ করে,—মুসলমানের রক্তে গ্রাম-নগর প্লাবিত করে—তখন যুরোপে কোন আন্দোলন হয় না। এই সে দিনের কথা—গ্রীকরা পরাজিত হইয়াও এনাটোলিয়ায় সমস্ত গ্রাম-নগর জ্বালাইল, তখন কেহই প্রকৃত তথ্য জানিবার চেষ্টা করিলেন না। গ্রীকসেনা পরাজিত হইয়া যখন স্মার্ণা নগরী জ্বালাইয়া দিল, তখন আবার উল্টা চাপ দিয়া তুর্কের ঘাড়ে ঐ দোষ চাপাইবার চেষ্টা হইল। প্রকৃত তথ্য অবশ্য বাহির হইয়া পড়িল। অপর দিকে আবার আর্ম্মাণীদিগের উপর অত্যাচারের অতিরঞ্জিত কাহিনী বাহির হইল। সব কয়টি রিপোর্ট পড়িলে মনে হয়, ৩০ লক্ষেরও উপর আর্ম্মাণী তুর্কদিগের হস্তে মারা পড়িয়াছে। মোটের উপর কিন্তু কাগজে কলমে ৩০ লক্ষের উপর আর্ম্মাণী জগতে ছিল না!

যুরোপ খৃষ্টান হীনবল জাতিদিগের রক্ষার (Protection of Christian minorities) জন্য সদাই সচেষ্ট। কিন্তু বল্‌কানের নূতন প্রদেশসমূহে যে সকল ইহুদী মুসলমান রহিল, তাহাদের কথা কেহ ভাবেন না। বস্‌নিয়া হার্জেগোভিনায় প্রায় শতকরা ৩৫ জন মুসলমান। আল্‌বেনিয়া ও এপিরাসেও অর্দ্ধেক মুসলমান। বুল্‌গেরিয়া ও প্রাচীন সার্ব্বিয়ায়ও প্রায় ১২।১৪ লক্ষ মুসলমানের বাস। মোটের উপর প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান রাজত্বের প্রজা। তাহাদের জন্য কাহারও প্রাণ কাঁদে না। তাহারাও যে বড় সুখে আছে, তাহা নহে। রুমানিয়ায় ইহুদীগণ সংখ্যায় প্রায় ৫ লক্ষ,তাহাদিগকে কিন্তু মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত করা হয় না!

আর এক কথা। তুর্কের উপর এত কঠোরতা কেন? তুর্করা ত সন্ধির সর্ত্ত চিরকালই যথাযথ পালনে চেষ্টা করে। অন্য জাতিরাই সন্ধির মর্য্যাদা রাখেন না। জার্ম্মাণী প্রতি পদে সন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিতেছে। তাহাদের উপর ত কোন জুলুম হয় নই; বরং লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতি মনস্বীর তাহাদের উপর বিশেষ সহানুভূতি।!

শেষ কথা এই যে, ন্যায়ের পথে না চলিলে কোন দিনই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। তুর্কদিগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুরোপীয়রা হস্তক্ষেপ না করিয়া, তাহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে সাহায্য করুন। তুর্কও আবার নিজের দোষ ত্যাগ করিয়া, নিজের উন্নতির দিকে মন দিবে। যুরোপীয় জাতিবৃন্দ অকারণ রাজ্যলপ্সা ত্যাগ কিরুন; তুর্কেরও রাজ্যলিপ্সা দূর হইবে। আন্তর্জাতিক সম্মিলনী (League of Nations) অপক্ষপাতে জগতের হিতের চেষ্টা করুন। জগতে শান্তি আসিবে; রণাভিনয় দূর হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্ম-নিবেদন।

কেন কর সাধ আর, সাধে নাহি অধিকার,
সাধ সদা না হয় পূরণ।
মানবে সঙ্কল্প করে, সিদ্ধি বিধাতার করে,
সাধ তবে কিসের কারণ?
জীবন ফুরায়ে আসে, তবু আছ সাধ আশে!
কত দিনে ফুটিবে নয়ন?
রক্ত-বীজ সম নাশি, বিষয়-বাসনা-রাশি,
হৃদে ধর গোবিন্দ-চরণ।

লাভালাভ সম জ্ঞান, কর কর্ম্ম সমাধান,
ফল হ'ক শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।
বাসুদেব হ'তে সব, অনুক্ষণ অনুভব,
"আমি করি" কর বিসর্জ্জন।
সাধ করিয়াছ কত! ফল হ'ল অন্য মত,
নিরাশায় হইলে মগন।
কর সার কৃষ্ণপদ, ফল যার কৃষ্ণপদ;
পরিণামে পাবে সে চরণ।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

কৈলাস-যাত্রা ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

আসকোট ।

আলমোড়া হইতে আসকোটের এক জন ভদ্রলোক, আমি এ প্রদেশ দিয়া কৈলাস যাইতেছি, তাহার সূচনা পত্র অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমি সাদরে অভ্যর্থিত হই। ডাক ঘরে আমি প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করি। পোষ্ট অফিসের যুবক কর্ম্মচারীটি যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনের পর আমি স্নানাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ পোষ্ট মাষ্টার, পথশ্রান্ত আমার ক্লান্তি-নিবৃত্তির জন্য রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রথম সুযোগে রাজওয়াড়া সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে আমার পরিচয়পত্র প্রেরণ করিলাম। অনতিবিলম্বে তাঁহার লোক আসিয়া সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন।

ভুটিয়া রমণী।

কুলীরা দেশে প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, কৃষি-কার্য্যের "জো" চলিয়া যাইবে। আমি আর বাধা দিলাম না। তাহাদিগকে ৭৵০ হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে কিছু খোরাকী ও বক্‌সীসও দিয়াছিলাম।

কুলীরা জাতিতে রজপুত। রাস্তায় নানা প্রকারে আমার সেবা করিয়াছিল; আর বিশ্বস্ততার সহিত সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছিল। তাহারা কোনরূপ অভদ্রতাও দেখায় নাই। আমাকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে পথের সহচর কুলীরা গৃহের দিকে রওনা হইয়া গেল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। রাস্তায় শুনিয়াছিলাম, আসকোটে খুব কলেরা হইতেছে। যখন গ্রামে প্রবেশ করি, শরীরটা যেন শিহরিয়া উঠিয়াছিল। ত্রাসপূর্ণ লোকদের মুখভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম। দুর্লক্ষণ সকল যেন চক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল।

টনকপুর হইতে একটি রাস্তা হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতাভিমুখে গমন করিয়াছে। যে রাস্তা দিয়া আমি আলমোড়া হইতে আগমন করিয়াছি, তাহা আসকোটের নিকট এই রাস্তায়

আসিয়া মিলিত হইয়াছে। টনকপুর হিমালয়ের পাদদেশে। ভুটিয়ারা এই স্থানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। দিন দিন এ স্থানের বেশ উন্নতি হইতেছে, শীতকালে ইহা বেশ গুলজার থাকে। গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়ারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। সে সময় টনকপুর পরিত্যক্ত জনপদ—বিগতশ্রী। জুন মাসের আগেই ভুটিয়া আর হুনিয়া (তিব্বতীরা হুনিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে) এ স্থান পরিত্যাগ করে। এই সকল ব্যবসায়ীর পণ্য-বোঝাই ছাগ ও মেষে সে সময় এ সকল রাস্তা পূর্ণ থাকে, আর ইহাদের গলার ঘণ্টারবে দিক্ সকল মুখর হইয়া উঠে। দুর হইতে এই ঘণ্টারব বেশ মধুর শুনায়।

কালী নদী।

ভোজনান্তে একটু বিশ্রামের পর কুমার সাহেবের লোক আমাকে লইয়া তাঁহার কাছারীর ঘরের একটি কক্ষ আমার অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এ স্থানের সম্মুখের দৃশ্য হৃদয়গ্রাহী; স্থানে স্থানে কিছু কিছু সমতলভূমি থাকায় এই শস্য-শ্যামলা ভূমি দর্শক-দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সম্মুখে নিম্নভাগ,পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভেদ করিয়া কালী বা সারদা নদী গর্জ্জন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে। নদীর অপর পারে হিন্দুর স্বাধীনরাজ্য নেপাল। দূর পর্ব্বতের মস্তকে উন্নতকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যেন শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। নেপালরাজ্যে ভাল রাস্তা-ঘাট না থাকায়, দুর্গম পর্ব্বতমালা যেন অধিকতর ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া, পথিক-হৃদয়ে অবসাদ আনয়ন করিতেছে।

কুমার নগেন্দ্রনাথ পাল, কুমার জগৎসিংহ পাল প্রভৃতি রাজকুমারগণ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানে আসিয়া নানা প্রকার আলাপ করিয়া এ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন। কুমার জগৎসিংজী এক সময় ইংরাজ সরকারের পোলিটিকেল পেস্কার ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে অনেকবার তিব্বতে গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার কাছে তিব্বত সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইলাম।

এক দিন রাজওয়াড়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহার উপর কৈলাস-যাত্রী, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইলাম। তাঁহার আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত ও প্রীত হইলাম। তিনি একবার কৈলাস-মানস-সরোবর গমন করিয়া-ছিলেন। তিনি, তাঁহার সেই যাত্রা সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া মানসের অপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা ঔৎসুক্য সহকারে কহিতে লাগিলেন। তিব্বতের দস্যুর কথা কহিয়া তিনি তথায় শরীররক্ষা-বিষয়ক সাব-ধানতা অবলম্বন জন্য দৃষ্টি রাখিতে কহিলেন।

রাজওয়াড়া সাহেবের কাছে যাইবার সময়, দরজার কাছে বাঘ মারিবার একটি যন্ত্র দেখিলাম। ইহা ইন্দুর মারিবার জাঁতি-কলের বিরাট সংস্করণ। জাঁতি বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে ছাগাদি পশু বাঁধিয়া রাখা হয়। লুব্ধ ব্যাঘ্র খাদ্যের উপর পতিত হইলে, যন্ত্রগত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সময় সময় এ প্রদেশে খুব বাঘের উৎপাত হইয়া থাকে। কখন কখন কালী-তট দিয়া তরাই হইতে ব্যাঘ্র আসিয়াও উৎপাত করিয়া থাকে।

রাজওয়াড়া সাহেবের পূর্ব্বপুরুষরা এক সময় এ প্রদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সে সময় তাঁহারা অনেক দেবমন্দির

প্রতিষ্ঠা ও অনেক ভূমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন নূতন নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইঁহারা পাল উপাধিতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পালবংশের সহিত আমাদের বাঙ্গালার পালরাজগণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। হিমালয়-প্রদেশে মণ্ডি, সুকেতের বর্ত্তমান সেনরাজবংশ, আমাদের বাঙ্গালার সেনরাজবংশের সন্ততি, এ কথা তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি তাহা হইতে পারে, তাহা হইলে কামাউনের পালরাজবংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে। আপনাদের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কোথায় কিরূপভাবে সিংহ-প্রকৃতির পুরুষগণ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যখন আলোচিত হইবে, তখন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইব।

আসকোটে অবস্থানকালে প্রাচীন পুঁথির বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, বিশেষ কিছু পাই নাই। কুমার সাহেব মানস খণ্ডের পুঁথি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিয়া তিব্বতে আমাদের হিন্দুর প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা বেশ অবগত হইলাম। তিব্বতে বর্ত্তমান যে সকল তীর্থস্থল, মঠ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময় সে সকল আমাদের হিন্দুদের ছিল। আমাদের গমনাগমনের বিরলতার সহিত সে সকল স্থান, বৌদ্ধরা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক। এ সকল কথা উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হইবে। মানস খণ্ডে হিমালয়ের উত্তর ও দক্ষিণের অনেক স্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আসকোটের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। সমতলভূমিতে লেবু, আম্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে; আপেল, ন্যাসপাতিও চেষ্টা করিলে যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে। রাজওয়াড়া সাহেবের বাগানে কতকগুলি গাছও দেখিলাম। সাধারণে এ বিষয়ে সাহায্য পাইলে প্রচুর ফললাভ করিতে পারেন। দেশের সর্ব্বত্র জড়তায় আচ্ছন্ন, এ প্রদেশও তাহা হইতে মুক্ত নহে।

নগাধিরাজ হিমালয় নানা প্রকার খনিজপদার্থে পরিপূর্ণ আছেন। এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে সুবর্ণের খনি আছে। খনি থাকিলে হইবে কি? চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ, হাত-পা থাকিতেও আমরা হস্ত-পদহীন। আবার সরকারের আইন-কানুনরূপ নাগপাশ হাত-পা আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমার ভূমির খনিজদ্রব্যে আমার অধিকার নাই। আসকোট দুই ভাগে বিভক্ত। গৌরী ও কালী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মাল্ল আসকোট। মাল্ল আসকোট গৌরীর দক্ষিণ কালীর মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বরভূমি। এ স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়; বাহিরেও কিছু কিছু রপ্তানী হইয়া থাকে।

এ অঞ্চলে কলেরা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। যে পাচক আমার রন্ধনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম, সে কয়েকবার ভেদবমির ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমার অভিপ্রায় কুমার সাহেবকে জ্ঞাপন করিলাম, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দিনকয়েক এ স্থানে অবস্থান করিয়া গমন করি। কিন্তু যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি অগত্যা আমার মতে মত দিলেন। কোনরূপে আর এক রাত্রি এ স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। অতি প্রত্যূষে এ স্থান পরিত্যাগ করিব, এইরূপ স্থির হইল। কুলীরাও ঠিক সময় আসিয়া বোঝা লইয়া যাইবে, বন্দোবস্ত হইল। রাজওয়াড়া সাহেব তাঁহার প্রজাদের উপর আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহাতে তাহারা সচেষ্ট হয়, এরূপ অনুজ্ঞা-পত্র দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এক নবীন বন্ধু তিব্বতে দস্যুভয়ের কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে কোন অস্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বলি, আমি তীর্থযাত্রী, সশস্ত্র হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। তদ্ভিন্ন আমি প্রত্যাগমনকালে এ রাস্তা দিয়া আসিব না; নেতিপাল দিয়া বদরীনাথ অঞ্চল দিয়া গমন করিব। সুতরাং অস্ত্র ফিরাইয়া দিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে। তিনি ডাকে পাঠাইবার কথা কহিলেও আমি তাহাতে রাজি হইলাম না। কুমার সাহেব তাঁহার এক ভুটিয়া প্রজার উপর একখানি পত্র দিয়াছিলেন, কালে তাহা বড় উপযোগী হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৩ই জুন বৃহস্পতিবারের রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। কুলীর দেখা নাই, উদ্বেগে সময় কাটাইতে লাগিলাম। বহু বিলম্বে রাজবাড়ীর পাইক কুলী ধরিয়া

আনিল। আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ভগবানের নাম লইয়া অগ্রসর হইলাম।

আসকোট পরিত্যাগের পর অল্প চড়াই চড়িতে হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় তুই মাইল উতরাই। দ্রুতবেগে উতরাই অবতরণ করিয়া গৌরীনদীর তটে উপস্থিত হইলাম। গৌরী হিমালয়ের তুষারগলিত শীতল-সলিল বহন করিয়া কালীর সহিত মিলিতা হইয়াছেন। জলাধিরাজ অনন্তকাল হইতে নগাধিরাজ হিমালয়কে পরিসিক্ত করিতেছেন। হিমালয়ও সেই বারির কণামাত্রও না রাখিয়া, অধিকন্তু নিজের শরীরের পরমাণু মিলিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে সেই জল প্রেরণ করিতেছেন। এই অদ্ভুত আদান-প্রদান অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

সুন্দর পুল দিয়া গৌরী পার হইলাম। গৌরীর তট দিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে কুলী কহিল,"আমি আর অগ্রসর হইব না। সম্মুখে গ্রামের প্রধানের বাড়ী; উনি লোক সংগ্রহ করিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সে প্রধানের বাড়ী বোঝা রাখিয়া চলিয়া গেল। আমার অর্থ ও ভয় দেখান সবই বৃথা হইয়া গেল। প্রধানকে ডাকাডাকি করিয়া আমার অবস্থার কথা কহিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে কহিলেন; আর কহিলেন, বোঝা যথাসময় আমার অদ্যকার গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। বৃষ্টির জন্য কৃষকরা ক্ষেতের কার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং লোক সংগ্রহে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

সেকালে গ্রামে কোন অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, তাঁহার বোঝা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ পর পর গ্রামবাসী কর্ত্তৃক সেই বোঝা পথিকের অভীষ্টস্থানে নীত হইত। ইহার মূলে কেমন শিষ্টাচার! কালে ইহা বিকৃত হইয়া "বেগারে" পরিণত হইয়াছে! যে পুরুষের সহিত কোনরূপ সরকারী সম্বন্ধ জড়িত আছে, সেই সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার গ্রামবাসী হউন, অথবা সুদূরসম্বন্ধী হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তিনি একটি অবতারবিশেষ, তাঁহার ভয়ে কুলীকুল বিভীষিকাগ্রস্ত হয়। ইহা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে এই সুন্দর প্রথার এক সময় বেশ প্রচলন ছিল। বিষ্ণুপুররাজ্যে যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে রাজ-অতিথি! গ্রামের মণ্ডল মহাশয় ভোজনাদি দিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। আর বোঝা থাকিলে লোক দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহা পাঠাইয়া দিতেন। এ কথা আমার নহে, কলিকাতা কুঠীতে হলওয়েল নামে এক জন কুঠীয়াল ছিলেন, তিনি তাঁহার "বাঙ্গালার কথা" নামক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যখন আমাদের "স্বরাজ" ছিল, তখনকার প্রথার একটু কণামাত্র উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত হইল। আমাদের বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাচীন প্রথা সকল এক্ষণে পীড়ার কারণস্বরূপ হইয়াছে।

কুলীর ভাবনা পরের উপর ন্যস্ত করিয়া আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গৌরীর সহিত কালীর সঙ্গমস্থলকে দক্ষিণে রাখিয়া এক্ষণে কালীর নিকট দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। বৃক্ষের উপর নানা জাতীয় পরগাছায় (orchid) নানা রঙ্গের পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। অতীত পথে স্থানে স্থানে জোঁক আর পিশু ছাড়া অন্য কোন প্রকার হিংস্র জন্তুর হাতে পড়ি নাই। একমাত্র "বিচ্ছু" গাছ ছাড়া অন্য কোন প্রকার কুটিল-প্রকৃতির বনস্পতির সংস্পর্শেও আসি নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বক্রাকারের এক প্রকার গাছের ফল আছে,তাহা এরূপ ভীষণ ও কুটিল যে, তাহার সংস্পর্শে আসিলে হরিণাদি কেন, সিংহাদিকেও প্রাণ হারাইতে হয়। এক সময় এক হরিণের পায়ে ইহা ফুটিয়া যায়, ইহার যন্ত্রণায় হরিণ অবশ হইয়া পড়িয়া থাকে। একটা সিংহ মৃতপ্রায় হরিণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। ভক্ষণকালে সিংহের মুখের ভিতর সেই ফলের কাঁটা লাগিয়া যায়। ইহার ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা প্রদাহ হইয়া সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Grapple Fruit of South Africa কহে আর বৈজ্ঞানিক নাম Harpagophytun। কলম্বিয়ায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহা হইতে ভয়ানক বিষ নির্গত হয়। আমাদের দেশের আলকুশী (সংস্কৃত নাম কপিকচ্ছু) এত উগ্র-প্রকৃতির নহে। আমার কুলী কহিল, সেকালে অর্দ্ধপক্ক আলকুশী ফলের সোঁ সংগ্রহ করিয়া বায়ুর গতি লক্ষ্য করিয়া শত্রুর দিকে পিচকারী সাহায্যে চালিত করা হইত। এই ক্ষুদ্র সোঁ শত্রুকুলকে আকুলিত করিয়া তুলিত।

শব্দ যেরূপ তরঙ্গের ন্যায় আগমন করিয়া কর্ণকুহরে

প্রবেশ করে, গন্ধও সেইরূপভাবে আগমন করিয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। আমি পুষ্পের গীত বা শব্দতরঙ্গ অনুভব করিতে করিতে পরম আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সকল সুখে একটু না একটু অসুখ আছে, আবার সকল অসুখের মধ্য হইতেও সময় সময় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নয়নরঞ্জন দৃশ্যের মধ্যেও উদ্বেগকর বিষয় উপস্থিত হইল। বৃক্ষাদির গলিতপত্র প্রথম বৃষ্টিতে পচিয়া অতি ক্ষুদ্রতম কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার এদেশী নাম আমি জানি না, ইংরাজীতে ইহাকে Sand-flies বলে। নামটা ঠিক দেওয়া হইয়াছে। পথিক যখন চলিতে থাকেন, সে সময় এই সকল কীট অগণিত সংখ্যায় অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে থাকে। শরীরের নিম্নভাগে অধিক পরিমাণে অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়াই রক্ষা। অন্যথা অত্যন্ত উত্যক্তকর হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময় সময় ইহা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, কৃষকরা ভূমিকর্ষণকালে খড়ের মশাল জ্বালিয়া ইহাদের অনুসরণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে।

আসকোট হইতে যে রাস্তা গারবাং অভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই রাস্তার উপর অনেকটা উচ্চ সমতলক্ষেত্রে বালবাকোট অবস্থিত। ১০।১৫ খানি গৃহসমষ্টিতে এই গ্রাম গঠিত হইয়াছে। যিনি গ্রামের প্রধান, তিনি গ্রামের পাটওয়ারী—জাতিতে রজপুত, রাজওয়াড় সাহেবের স্বজাতি ও তাঁহার এক জন প্রধান প্রজা। রাজওয়াড় সাহেবের পত্রের প্রভাবে, প্রধান মহাশয় যত্নের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নূতন নির্ম্মিত গৃহে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এ অঞ্চলে সকল গ্রামে দোকান নাই, সুতরাং পথিকের পূর্ব্বেই কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত। আমি রাজওয়াড় সাহেবের লোক বলিয়া আমাকে আহার্য্য-সংগ্রহে ক্লেশ পাইতে হইল না। প্রধান মহাশয় চাউল প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। এক জন অন্ধ্রদেশীয় সাধুর সহিত আসকোটে দেখা হয়। তিনিও কৈলাস-যাত্রী। পাকের সময় উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সহিত ভোজন করা গেল। বালবাকোটে প্রায় ১২টার সময় আসিয়াছিলাম, তখনও আমার বোঝা আইসে নাই। যত সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। যথাসর্ব্বস্ব সেই বোঝার ভিতর ছিল, যদি হারাইয়া যায় বা চুরী যায়, তাহা হইলে অসুবিধার সীমা থাকিবে না। এ কথা বার বার প্রধানকে কহিতে লাগিলাম। "কিছু নষ্ট হইবে না" বলিয়া প্রধান চিন্তা করিতে বারণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার মোট আনীত হইল। শুনিলাম, রাস্তায় ৩ বার কুলী বদল হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে কোন দ্রব্য হারাইয়া যায় নাই। মনে মনে কুলীদের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম; আর তাহাদের প্রাপ্য পয়সা দিয়া বিদায় দিলাম।

যে স্থানে আমি ছিলাম, সে স্থান হইতে নিম্নে গ্রামের শস্য-শ্যামল দৃশ্য প্রীতিপ্রদ। মনে করিতে লাগিলাম, এইরূপ সুন্দর সুন্দর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন অথবা উপনিবেশের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া যদি ছাত্রদের স্থায়ী স্বাস্থ্য ও চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে রুগ্ন, শীর্ণ জীবন-সংগ্রামে পরাজিত যুবকের পরিবর্ত্তে দৃঢ়কায়, কর্ম্মঠ, শ্রম-সহিষ্ণু এবং সকল প্রকার কার্য্যে উৎসাহী যুবকের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইবে।

এ দেশের রজপুতদিগের ভিতর জননীর হাতে রাঁধা ভাত খাওয়াও সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য। এ প্রথা কত দিন হইতে এ প্রদেশে প্রচলিত, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ কোন রজপুত নিজের বংশের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত হীনবংশের স্ত্রীর হাতের পাক করা অন্নভক্ষণ দূষণীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন; তাহার পর কালক্রমে এই প্রথা রজপুতদের মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে। আমি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহার এক পুত্র মিডিল ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি এ প্রদেশের মধ্যে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, তিনিও তাঁহার জননীর হস্তে সিদ্ধান্ন গ্রহণ করেন না। অনেক সময় তাঁহাকে রন্ধনশালার কার্য্যে সময় যাপন করিতে হয়, এ কথা তিনি দুঃখের সহিত নিবেদন করিলেন। এ সকল সংস্কার শিক্ষার বিস্তার না হইলে দূর হওয়া সম্ভবপর নহে। শিক্ষিত না হইলে মুক্তিলাভ আর সুশৃঙ্খলিত না হইলে কখন শক্তিশালী হইতে পারে না। ভারতে এই দুইটি প্রধান বিষয়েরই অভাব। সেকালে এই দুইটি প্রধান কার্য্য-ভার ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত ছিল। যে ব্রাহ্মণ ইহা হইতে

বিমুখ হইতেন, তিনি নিন্দিত হইতেন। জাতি যখন জীবিত থাকে, তখন সে জাতিতে পর্য্যটকের সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আরবরা ভ্রমণকারীকে "বিজেতা" বলিয়া পূজা করিতেন, তখন তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময় ছিল।

সায়ংকালে কতিপয় গ্রামবাসী আমার কাছে উপস্থিত হয়। তাহারা বেশ ভদ্র, বিনয়ী ও অতিথিপ্রিয়। এ প্রদেশ নানা প্রকার সুমধুর ফল, দ্রাক্ষা, ন্যাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষে বেশ উপযোগী বলিয়া বোধ হইল, আর আমাদের পেপে প্রভৃতিও হইতে পারে। এ সকল গাছের বীজ ও কলম রোপণের জন্য তাহাদিগকে কহিলাম। তাহারা ক্রীড়া-কৌতুক কি করিয়া থাকে, সে বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। যুবকদল আগ্রহের সহিত কহিল, "মহাশয়! ঐ যে সম্মুখে উন্নতশৃঙ্গ বনস্পতি-মণ্ডিত পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছেন, উহার উপর গিয়া আমরা ভল্লুক শীকার করিয়া থাকি। ইহা অনেক সময় বিপদ্‌পূর্ণ হইলেও ইহাতে আমরা বড় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। ভল্লুকের পিত্ত উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া বেশ দুই পয়সা পাওয়াও যায়। ইহার লোমপূর্ণ চর্ম্মও আমরা নিজেরা ব্যবহার ও বিক্রয় করিয়া থাকি।" এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পর বিদায় দিবার পূর্ব্বে আমার কুলীর বন্দোবস্তও করিয়া লইলাম।

প্রায় সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িয়াছিল। প্রাতঃকালেও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। সেই জন্য আমার যাত্রা করিবার পক্ষে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বৃষ্টি বন্ধ হইবার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। উন্নতভূমি হইতে নিম্নে নামিবার জন্য যে রাস্তা অবলম্বন করিলাম, তাহা বৃষ্টি আর গো-মহিষাদির গমনাগমন জন্য বেশ পিচ্ছিল হইয়াছিল। সেই রাস্তা অতিক্রমণকালে একাধিকবার পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহা কোনরূপে অতিক্রমণ করিয়া ঝরণার ধারা উত্তীর্ণ হইলাম। আবার কালীনদীর তট ধরিয়া যে রাস্তা উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বালবাকোট হইতে ধারচুলা প্রায় ১০ মাইল উত্তরে। যে সময় আমি এ প্রদেশ অতিক্রম করি, সে সময় রাস্তার ধারে মানববিহীন বহুসংখ্যক গৃহ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে কলেরা-প্রপীড়িত হুনিয়াদের (তিব্বতী) তাম্বু দেখিয়াছিলাম। মনে করিলাম, মহামারীর প্রকোপে কি এ প্রদেশ জনশূন্য হইয়াছে? গৃহপালিত গবাদি পশুও এ স্থানে দেখিতে পাইলাম না। কোন কোন স্থানে কৃষ্ণমুখ হনুমান্ দল বাঁধিয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘ দণ্ড ও ছত্রধারী আমার মত পথিক দেখিয়া হনুমানকুল চকিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাস্তায় কালিকা নামে একটি স্থান প্রাপ্ত হইলাম। একটি বহু শাখান্বিত বটবৃক্ষের তলে কালিকাদেবীর স্থান। তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া অগ্রসর হইলাম। অদ্যকার রাস্তা অধিকাংশ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়াছি; সুতরাং পর্ব্বতারোহণজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

৭টার সময় বালবাকোট পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২টার সময় ধারচুলা নামক স্থানে উপস্থিত হই। আসিবার সময় রাস্তার ধারে যে সকল সুন্দর সুন্দর গৃহ দেখিয়া আসিয়াছি, শীতের সমাগমের সহিত তাহা জনপরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই সকল জনপদবাসী দৃঢ়কায়, কর্ম্মঠ, উদ্যোগী ও বাণিজ্যপ্রিয়। বাণিজ্যের জন্য ইহারা শীতকালে দলে দলে টনকপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ কানপুর, কলিকাতা, দিল্লী, এমন কি, বোম্বাইয়েও গমন করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভের সহিত ইহারা গারবাং, কুটি প্রভৃতি স্থানে গমন করে। কতক কৃষি-কার্য্য করে, আর কতক বাণিজ্যব্যপদেশে তিব্বতে তাকলাকোট, গরতক, দরবীন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ভারতীয় দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় ও মেষের লোম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এ দেশ ভোট আর এ দেশবাসী ভোটিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহারা হিন্দু, কিন্তু তিব্বতীদের সঙ্গের প্রভাবে তিব্বতী ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহারা নিজেদের ভাষা ব্যতীত তিব্বতী, হিন্দী ও এ দেশের পার্ব্বতীয় ভাষা প্রায় সকলেই জানে। তিব্বত অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তারের জন্য ইঁহারা যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, যেরূপ অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। সর্ভে জেনারল আফিসের পণ্ডিত "A. K." রায় বাহাদুর পণ্ডিত কৃষণ সিং, আর পণ্ডিত "A" নান সিং, C. I. E. যদি পৃথিবীর অপর কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ

করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম প্রবাদবাক্যরূপে প্রত্যেক গৃহে উচ্চারিত হইত। শিক্ষাভিমানী আমরা কয় জন এরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষপ্রবরের কর্ম্মের সহিত পরিচিত আছি? এই ভুটিয়াদের সহিত আমাকে বহুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল, ইঁহাদের কথা সময়ান্তরে কিছু কিছু কহিব।

প্রায় ১২টার সময় ধারচুলাতে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানে সরকার বাহাদুরের একটি আফিস আছে। তিব্বতে যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়, আর তিব্বত হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ এ স্থানে লওয়া হইয়া থাকে। এ কার্য্যে যিনি নিযুক্ত আছেন, তিনি বড় মহাশয় ব্যক্তি। ইঁহার নাম আলমোড়াতেও শুনিয়াছিলাম। এখন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় পাইলাম। ইঁহার নাম পণ্ডিত লোকমণি। পরিচয়ে আমাকে বাঙ্গালী অবগত হইয়া তিনি তাঁহার, বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা-বিষয়ক অভিজ্ঞতা কহিতে লাগিলেন। বৈশ্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন একবার কলিকাতায় হইয়াছিল। তাহাতে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পর্য্যটক তাহাতে একটু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী সেই সকল পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। কোথায় কলিকাতা জোড়াসাঁকো মল্লিক মহাশয়দের প্রাসাদ, আর কোথায় হিমালয়ের অভ্যন্তরে ধারচুলা! এ স্থানে দেশের কথা শুনিব, ইহা স্বপ্নেরও অতীত হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হইয়াছিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর নিকটবর্ত্তী ঝরণায় স্নানাদি সমাপন করিলাম।

ভোজনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্থান পরিদর্শনের জন্য গমন করি। প্রথমে লাল সিং ভুটিয়ার দোকানে গমন করি। ইনি তিব্বতের এক জন বড় ব্যবসায়ী, ইঁহার নামে আমার পরিচয়-পত্র ছিল। ইঁহাকে আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা কহিলাম। তাহা শুনিয়া প্রীত হইয়া ইনি আমাকে সকল প্রকার সাহায্য করিবেন বলিলেন। লোকটি বড় ভদ্রপ্রকৃতির। কৈলাস-যাত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। ইঁহার মাতাও এবার কৈলাসে যাই-বেন। এ বৎসর কৈলাসের কুম্ভের বৎসর; বৌদ্ধ জগতের বহু দূর দূর দেশ হইতে যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে যেরূপ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক প্রভৃতি স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে, কৈলাস-মানসেও সেইরূপ কুম্ভ হয়। আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তিব্বতী-বৌদ্ধরা তাহা ভুলে নাই; তাহারা এখনও তাহা স্মরণ করিয়া তথায় সমবেত হইয়া থাকে। তিব্বতীরা ইহাকে ঘোটক-বৎসর কহিয়া থাকেন। লাল সিং কহিলেন, "এ বৎসর বহু যাত্রী তথায় গমন করিবেন। এই উপলক্ষে বহু ডাকাইতেরও আমদানী হইবে।" এ কথা শুনিয়া ভাবিলাম, দেখা যাউক, অদৃষ্টে কি আছে। আসকোটের কুমার সাহেব, লাল সিংএর নামে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, "সর্ব্ব প্রকারে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন।" সেই কথায় আর কথাবার্ত্তা ও দোকানের অবস্থা দেখিয়া সে প্রত্যয় আরও দৃঢ় হইল। সঙ্গে নগদ টাকা লওয়া বড় কষ্টকর ও বিপদপূর্ণ। পাহাড়ে রাস্তায় সব যায়গায় ভাঙ্গান টাকা পাওয়া যায় না, এই জন্য আলমোড়া হইতে কিছু নোট ভাঙ্গা-ইয়া লইয়াছিলাম। সেই টাকার বেশীর ভাগ লালসিংএর কাছে জমা রাখিলাম। কিছু দিন পরে তিনি তাকলাকোট বা পুরাংএ ব্যবসার জন্য যাইবেন। সেই স্থানে আমি তাহা লইব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আমি ভার ও চিন্তামুক্ত হইয়া হাল্কা হইলাম। এখন অনেকটা স্বেচ্ছচারীও হইলাম। লাল সিংএর কাছে বিদায় লইয়া কালীর উপর যে স্থানে দড়ির পুল আছে, সেই স্থানে কিছু-ক্ষণ বসিয়া কালীর রঙ্গভঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। আর দেখি-লাম, দড়ির পুল; দড়ি ধরিয়া এক জন লোক নেপাল হইতে ইংরাজরাজ্যে আগমন করিতেছে। এরূপ দৃশ্য বহু বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর ও বদরীনাথ অঞ্চলে গমনকালে দেখিয়াছি, সুতরাং ইহাতে কিছু নূতনত্ব দেখিলাম না। বহু দূরের মধ্যে নেপালে যাইবার ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। অপর পারে নেপাল সরকারের একটি ক্ষুদ্র নগর আছে; তাহাতে নেপালী কর্ম্মচারীরা অবস্থান করিয়া থাকেন, এ জন্য ইহা এ অঞ্চলে একটু প্রাধান্য লাভ করি-য়াছে। পূর্ব্বে এ স্থানে স্বর্ণ পাওয়া যাইত, এখনও লোক সময় সময় ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ স্থানে পাদরী মহাশয়দের একটা আড্ডা আছে। আমি যে সময় ধারচুলাতে উপস্থিত হই, সে সময় কেহ ছিলেন না। কোথায় য়ুরোপ বা আমেরিকা, আর কোথায় হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ধারচুলা! উদ্যোগী না হইলে লক্ষ্মীই বলুন বা সরস্বতীই বলুন, কেহই
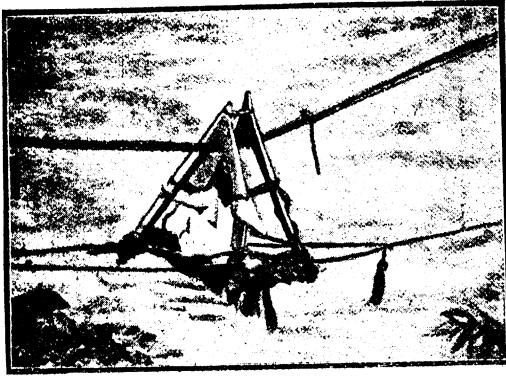
দো'দুল্যমান সেতুতে পার।

প্রসন্ন হয়েন না। এক সময় ভারতবাসী, এই শক্তিশালিনী দেবীদিগের প্রসন্নতালাভের জন্য তন্ময় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন! সে সময় ভারত ধনে ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সন্ধ্যাসমাগমে আমি আমার সায়ং-গৃহে উপস্থিত হইলাম।

ধারচুলা।

সায়ংগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পণ্ডিতজী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কয়েক জন রোগী তাঁহার কাছে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারী হইয়াও বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন; এ প্রদেশে বনৌষধি প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কথায় কথায় তিনি এক জন বাঙ্গালী সাধুর কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "এরূপ অপূর্ব্ব চরিত্রের সুদীর্ঘজীবী সাধু কখন আমি দেখি নাই। তিনি নানা প্রকার রোগের ঔষধের বিষয় অবগত আছেন। তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে রুষ, চীন প্রভৃতি দেশের জীবিত রাজামহারাজাদের চিঠিপত্র দেখিয়া য়ুরোপীয় পাদরী মহাশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতীবাবা নামে পরিচিত। বাঙ্গালী একাকী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রায় সকল বিভাগে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার দুরদৃষ্টবশতঃ মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি ইঁহাদিগের এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার উন্মেষ হইতেছে; ইহার পূর্ণতার সহিত ইহারাও জগতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে, আশা করা যায়।

প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, এ স্থান দিয়া যে সকল দ্রব্য তিব্বত হইতে আমদানী বা তথায় রপ্তানী হইয়া থাকে, পণ্ডিতজী তাহার হিসাব রাখিয়া থাকেন। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিব। তাহা পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই দুর্গম পথের বাণিজ্য কিরূপ ভাবে চলিতেছে।

তিব্বত হইতে আমদানী

সোহাগা	২২ হইতে ২৫	হাজার মণ।
পশম	৮	" "
লবণ	২০	" "
কস্তূরী	৫০	হাজার টাকার।
ভল্লুকের পিত্ত	৫০	" "

দোদুল্যমান সেতুতে দেশী লোক পার হইতেছে।

কম্বল	৩০ হইতে ৪০ হাজার খানা।
চামর পুচ্ছ	১০ হাজার টা।
ছাগ, মেষ	২৫ " "
চামড়া	১০ " "
ঔষধি	৪।৫ হাজার টাকার।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী।

গুড়, মেওয়া প্রভৃতি	১ লক্ষ টাকার।
বস্ত্র	১ " "
জহরাত	১ " "
গমাদি	১ " "

উপরের বাণিজ্য ভুটিয়াদেরই একচেটিয়া। তিব্বতী ব্যাপারীর সংখ্যা খুবই কম।

পাহাড় অঞ্চলে ধারচুলার কম্বলের বেশ সুখ্যাতি আছে। ভুটিয়া রমণীরা কম্বলবয়নে নিপুণা। এক সময় বিলাতের এক প্রদর্শনীতে ইহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল। সুন্দর সুন্দর কম্বল প্রস্তুত করিয়া ইহারা তথায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পুরুষরা ছড়ি প্রভৃতির উপর চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে মন্দ নহে।

অতি প্রত্যূষে ধারচুলা পরিত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম। কুলীর জন্য তাহা হইয়া উঠিল না। পণ্ডিতজী আমাকে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অগ্রসর হইতে অনুজ্ঞা দিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে কুলী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, বলিলেন। আমি তাঁহার সাদর বিদায়ে আপ্যায়িত হইয়া অগ্রসর হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

উদ্ভট-সাগর।

রামচন্দ্র সীতার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য হনুমান্‌কে লঙ্কায় পাঠাইয়া দেন। হনুমান্ রাবণের গৃহে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, শেষে অশোক-কাননে গিয়া তাঁহার দর্শন-লাভ করেন। হনুমান্ সীতাকে ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই। এক্ষণে সীতার দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই সীতা বলিয়া মনে করিলেন এবং "জয় রাম" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতা 'রাম' নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন হনুমান্ একটী চন্দ্রকান্ত-মণি-খচিত অঙ্গুরীয় সীতার হস্তে দিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র এই অভিজ্ঞান দিয়াছেন।" তখন পূর্ণিমা রাত্রি। সুতরাং চন্দ্রকিরণে অঙ্গুরীস্থ চন্দ্রকান্ত-মণি হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত-স্রাব হইতে লাগিল। অঙ্গুরীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সীতা কহিতেছেন :—

রামপ্রেরিতচন্দ্রকান্তঘটিতস্বর্ণাঙ্গুরীয়ং নিশি
শীতাংশোঃ করযোগতঃ স্রবদপঃ সংবীক্ষ্য সীতাঽব্রবীৎ।
কিং ত্বং রোদিষি রামচন্দ্রবিরহাৎ তস্যৈব পাণিগ্রহে
বিচ্ছেদং স্ফুট এব কিং ন বিদিতং মাং বীক্ষ্য সুস্থা ভব॥

রামের প্রেরিত চন্দ্রকান্ত-মণি-যুত
সুবর্ণ-অঙ্গুরী যবে হ'ল উপনীত,
তখন পড়িল তাহে চন্দ্রের কিরণ,
বিন্দু বিন্দু সুধা-রস হইল ক্ষরণ
সীতাদেবী চক্ষে ইহা বারেক দেখিয়া
অঙ্গুরীকে কহিলেন সান্ত্বনা করিয়া,—
"রামের বিরহে হায় তুমি কি এখন
ফেলিছ চক্ষের জল করিয়া ক্রন্দন?
শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে যে কেহ পড়িবে,
বিরহ-যন্ত্রণা তারে সহিতে হইবে।
আমার অবস্থা চক্ষে করিয়া দর্শন
সান্ত্বনা করহ তুমি আপনার মন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।
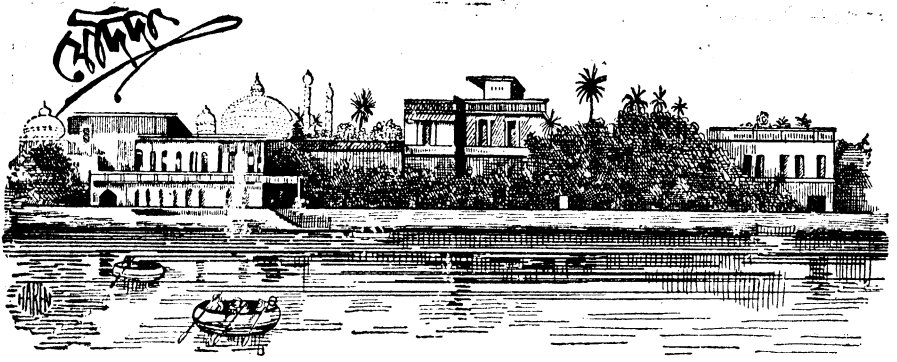
দশম পরিচ্ছেদ।

রুথ যে স্থানে পড়িয়া গেল, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িল। শ্রান্তির ও দৌর্ব্বল্যের আতিশয্য তাহাকে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া কয় দিন ও কয় রাত্রির পরে তাহাকে শান্তি দান করিল।

বর্ত্তমান সহরের শুষ্ক পরিখা অতিক্রম করিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ পথ যাইলে—নগরোপকণ্ঠে মুয়াজ্জম—ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় নদীতীরে কতকগুলি দরিদ্র আরবের দীন-গৃহ—আর বাগদাদের অন্যতম অলঙ্কার মস্‌জেদ। কিন্তু সে মস্‌জেদে এখন আর উপাসনার সময় তেমন জনতা হয় না। মস্‌জেদের বৃদ্ধ ইমাম প্রত্যূষে আপনার গৃহ হইতে মস্‌জেদে যাইবার সময় পথের পার্শ্বে নিদ্রিতা রুথকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার চরণ ক্ষতপূর্ণ—তাহাতে রক্ত জমিয়া আছে; দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্তিহেতু পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহাকে দেখিতেছেন, এমন সময় প্রভাতালোকপুলকিত বিহঙ্গের গীতে রুথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া ইমাম বলিলেন, "বৎসে, তুমি কি আশ্রয়হীনা?"

রুথ উঠিয়া বসিল; কিন্তু দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াই পদে বেদনা ও যাতনা অনুভব করিল। তাহার মুখভাবে ইমাম তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, একটা অবলম্বন ব্যতীত তুমি চলিতে পারিবে না—এই লাঠিখানি লও। একটু চলিলেই এ আড়ষ্টভাব কাটিয়া যাইবে—তখন, বোধ হয়, চলিতে পারিবে।" তিনি রুথকে আপনার যষ্টিখানি দিলেন—সেই যষ্টিতে ভর দিয়া রুথ তাঁহার অনুসরণ করিল।

মস্‌জেদের বাহিরে কয়খানি ঘর—প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইমাম রুথকে বলিলেন, "তুমি এই বাড়ীতে অপেক্ষা কর—জল আছে—মুখ হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে পারিবে।" বলিয়া তিনি মস্‌জেদে প্রবেশ করিলেন। রুথ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহ শূন্য; কিন্তু তথায় স্নানাদির সব ব্যবস্থা আছে।

নামাজ সারিয়া বৃদ্ধ ইমাম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন কর-চরণ ধৌত করিয়া আসিয়া রুথ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। দারুণ দৌর্ব্বল্যে সে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার দুশ্চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে। ইমাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহরে কি তোমার কোন আত্মীয় আছেন?"

রুথ বলিল, "হাঁ।"

"তুমি কি তাঁহাদের সন্ধানেই আসিয়াছ?"

"হাঁ।"

"কিন্তু সহর অনেকটা দূর। তুমি শ্রান্ত—আমার গৃহে চল; দরিদ্রগৃহে যাহা পাও, আহার করিয়া সহরে যাইবে।"

রুথ আবার ইমামের অনুসরণ করিল। সে দেখিল, তাঁহার কথাই সত্য—একটু চলিবার পর তাহার চলিতে আর পূর্ব্ববৎ যাতনা হইতেছে না। সে ইমামকে তাঁহার যষ্টি ফিরাইয়া দিল।

ইমামের গৃহ মস্‌জেদের নিকটেই—আরব পল্লীতে। সব গৃহই উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত—প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার।

সেই দ্বারপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইমাম ভৃত্যকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ একচক্ষু ভৃত্য আসিলে তিনি তাহাকে একখানি টুল আনিতে বলিলেন এবং সে টুল আনিলে রুথকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং ভিতরের মহলে প্রবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রুথ সেই পথে রমণীকণ্ঠে নানা প্রশ্ন শুনিতে পাইল—"কেন?" "কি জন্য?" "এত সকালে কে অতিথি?" "পথের ধারে অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল!" "এখানে আসিল কেমন করিয়া?"—ইত্যাদি। তাহার পরই ইমামের সঙ্গে প্রশ্নকারিণী বৃদ্ধা সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি ইমামের পত্নী।

রুথকে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "এ যে ইহুদী!"

ইমাম বলিলেন, "কেন, ইহুদী কি মানুষ নহে?"

"আরব ত নহে।"

"কিন্তু ইহুদীর দেহেও প্রাণ আছে। ইহুদীও বেদনা পাইলে ব্যথিত হয়। ইহুদীর প্রাণও মানুষের প্রাণ।"

ইমামের পত্নী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রুথকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে করুণার ভাব ছিল না। সে দৃষ্টি যেন রুথের দিকে অপমানের বাণক্ষেপ করিতে লাগিল।

ইমাম পত্নীকে বলিলেন, "মেয়েটি, বোধ হয়, গত কল্য অনাহারে কাটাইয়াছে—ইহাকে কিছু খাইতে দাও।"

পত্নী বলিলেন, "ওঃ—তাই! অপরিচিতা ইহুদী সুন্দরীকে পথ হইতে আনিয়াছ। ইহার প্রতি তোমার যে দয়া বড় অধিক দেখিতেছি!"

পত্নীর কথায় যে ইঙ্গিত ছিল, তাহাতে পতি লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কিন্তু তাঁহার সহগুণ অসাধারণই ছিল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ছিঃ—ছিঃ! এত বয়সেও তোমার বাক্যসংযমক্ষমতা জন্মিল না—মনকে একটু উদার করিতে পারিলে না?"

পত্নী বলিলেন, "বটে! এত সহগুণ আমার নাই। আমি এত সহ্য করিতে পারিব না। আমি ইহুদীর দাসীর কায করিতে পারিব না।"

"দাসীর কায! লোকের জীবনরক্ষা করা কি দাসীর কায? মানুষের সেবা করিবার সুযোগ যে প্রায়ই পাওয়া যায় না!"

"আমি ত আর মুয়াজ্জমের মসজেদের ইমাম নহি—আমার অত ধর্ম্মজ্ঞান হয় নাই।" তাঁহার ব্যবহারে রুথ উঠিয়া গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিল।

ইমাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি যাইও না। এক জন মানুষের জীবনরক্ষা করিবার অবসর পাইয়াও যদি আমি তাহার সদ্ব্যবহার না করি, তবে আল্লা তাঁহার এই দীন ভৃত্যের উপর রুষ্ট হইবেন; আমার বা আমার পরিবারে কাহারও মঙ্গল হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ইমাম আবার অন্তঃপুরের পথে চলিয়া গেলেন। অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনার কথায়, বোধ হয়, পত্নীর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল—তিনি আর কোন কথা না বলিয়া পতির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ইমাম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পত্নী ও ভৃত্য রুথের জন্য আহার্য্য লইয়া আসিলেন—ইরাকের ধনী-দরিদ্র সকলেরই সম্বল খর্জ্জুর, কমলালেবু, তুঁতফল, দুইখানি রুটী ও একটু দুগ্ধ। ইমাম রুথকে বলিলেন, "মা, দরিদ্রের গৃহে আহার্য্যেরও দৈন্য; কিন্তু আল্লার দীন সেবক দরিদ্র হইলেও তাহার মানুষকে সেবা করিবার প্রবৃত্তির দৈন্য হয় না। আজ সকালেই তিনি তোমাকে আমার পথে আনিয়া—তোমার সেবা করিবার অবসর দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন।"

ইমামের কথায় রুথ মুগ্ধ হইল। ধর্ম্মের সেবা মানুষকে এমনই উদারতাই দান করে। সে ক্ষুধিত—পূর্ব্বদিন দারুণ উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া—আজ নিদ্রার পর সে ক্ষুধার তাড়না তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইল—এ আহার্য্য ঈশ্বরই তাহাকে পাঠাইয়াছেন, ইমাম উপলক্ষ মাত্র।

সেই আহার্য্য আহার করিয়া রুথের অবসন্নদেহে যেন নূতন জীবনসঞ্চার হইল। তাহার মনে হইল, সে আবার পূর্ব্ববৎ উৎসাহে দায়ূদের সন্ধান করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে। এতক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল, শরীরের শক্তির অভাবে সে হৃদয়ের উৎসাহের উপযুক্ত কায করিতে পারিবে না; সেই চিন্তায় সে ব্যথিত হইতেছিল। এখন সে যেন শান্তি পাইল।

রুথের আহার শেষ হইলে ইমামের পত্নী একটি ক্ষুদ্র পারস্যদেশীয় জলাধার হইতে তাহাকে সুশীতল জল ঢালিয়া দিলেন। সেই জল পান করিয়া সে ইমামকে বলিল,

"ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন। আপনি আজ একটি অনাথা দুঃখিনীর জীবনরক্ষা করিলেন।" রুথের মনে হইতেছিল, ভগবান্‌ই তাহাকে আমীরের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তিনিই তাহাকে দুরন্ত আরব-দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন; আর আজ তাঁহারই বিধানে ইমাম তাহার বাঁচিবার উপায় করিয়া দিলেন। সে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

দ্বারের বাহির হইয়া রুথ শুনিতে পাইল, ইমামের পত্নী পতিকে বলিতেছেন, "আজ যাহা হয় হইল। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ইহার পর যদি তুমি কখন কোন ইহুদী যুবতীকে এমনই করিয়া কুড়াইয়া আন, আমি তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিব না।" বৃদ্ধবয়সেও স্বামীর প্রতি বৃদ্ধার সন্দেহে রুথের হাসি পাইল। সে শুনিল, ইমাম উত্তর করিলেন, "বরং আল্লার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন প্রতিদিন তোমাকে এমনই বিপন্ন ব্যক্তির উপকার করিবার অবসর দেন।" মনে মনে ইমামের প্রশংসা করিয়া রুথ সহরের দিকে চলিল।

তখন নিদাঘের রৌদ্র চারিদিক উজ্জ্বল করিয়াছে—দূরে বাগদাদের উজ্জ্বল মিনারের ও গম্বুজের উপর রৌদ্র যেন গলিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

রুথ দ্রুত চলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; কারণ, পথ চলিলেই তাহার চরণের ক্ষতমুখে আবার রক্ত ঝরিতে লাগিল—আবার সে পদে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে—যেন আপনার দেহ টানিয়া লইয়া—সে যখন সহরে উপনীত হইল, তখন রৌদ্র প্রখর। সহরে প্রবেশ করিয়া সে এক স্থানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিল, তাহার পর আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু সে কোথায় যাইবে? সে কথা সে মনেও করে নাই! সে মনে করিয়াছে, বাগদাদে আসিলেই তাহার সাধনা সিদ্ধ হইবে—কেন না, দায়ুদ বাগদাদে। কিন্তু এই বৃহৎ নগরে সে কেমন করিয়া, কোথায় দায়ুদের সন্ধান করিবে, তাহা সে ভাবে নাই। দায়ুদ এ সহরে নবাগত। কেহ যে তাহাকে চিনিবে—জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। দায়ুদ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় আত্মপরিচয় দিয়াছে কি ছদ্মনামে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাই বা কে বলিতে পারে? এখন সে এই সব কথা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই আপনার অবস্থার কথা ভাবিয়া নিরাশায় ও আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। মানসিক অবসাদে তাহার শারীরিক অবসাদ যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাগদাদের পথে পথে ঘুরিয়া সে অবসন্ন হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল—বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবনার ত অন্ত নাই।

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। তখন তাহার মনে হইল, তাহাকে রাত্রির জন্য আশ্রয় সন্ধান করিতে হইবে। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এই অপরিচিত নগরে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে? তখনই সে ভাবিল, যিনি আমীরের কারাগার হইতে তাহার মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন—আরব-দস্যুর হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন—ইমামের দয়ায় তাহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহাকে দয়া করিবেন। সেই বিশ্বাসে সে হৃদয়ে বল পাইল। সেই সময় এক জন বৃদ্ধা ইহুদী রমণী সেই পথে যাইতেছিল। রুথ তাহাকে ডাকিয়া আশ্রয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ রুথকে দেখিল, তাহার পর বলিল, সে রুথকে আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারে।

রুথ বৃদ্ধার সঙ্গে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে রুথ গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া বাগদাদের গলির গোলকধাঁধাঁয় পড়িয়া কোথায় চলিল, তাহা আর বুঝিতে পারিল না। শেষে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন গলিতে যাইয়া বৃদ্ধা একটি গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল। দ্বারের বাহিরে রাস্তার উপর এক বৃদ্ধা ইহুদী রমণী একখানি টুলে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। তাহার বেশ মলিন ও ছিন্ন, বিবর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন; তাহার বক্রাগ্র নাসিকা রক্তাভ—বয়সে ও রৌদ্রে হরিদ্রাভ মুখে সেই নাসিকায় তাহাকে বিকট দেখাইতেছিল; তাহার দৃষ্টি যেন জ্যোতিহীন—তন্দ্রাম্লান। আগন্তুক বৃদ্ধা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "নইমীদিদি আছে?" সে নারগিলার নল মুখ হইতে না নামাইয়া কেবল শিরঃসঞ্চালনে জানাইল—আছে।

তখন আগন্তুক রুথকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বারের সম্মুখে একটি বিবর্ণ বৃহৎ পর্দ্দা ঝুলান—সেই পথে

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; দক্ষিণে ও বামে দুইটি ক্ষুদ্রায়তন কক্ষ—কেমন অন্ধকার অন্ধকার। বামের কক্ষে কয় জন দরিদ্র রমণী বসিয়া ছিল। আগন্তুক রুথকে লইয়া দক্ষিণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "নইমীদিদি?" নইমী বাম কর তুলিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিল; তাহার পর আপনার কায করিতে লাগিল।

নইমী প্রৌঢ়া—কিন্তু লৌহ পুরাতন হইলেও যেমন মরিচাপড়া হইতে চাহে না, তেমনই যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক যৌবন অতিক্রান্ত হইলেও যুবতী থাকিতে চাহে—হাবভাব-বিলাস ত্যাগ করে না—সেই শ্রেণীর। তাহার মুখে রং মাখান, নয়ন-পল্লবে সুরমার রেখা আঁকা; তাহার বেশের বর্ণ উজ্জ্বল। সে একখানা গালিচার উপর বসিয়া এক জন রমণীর ভবিষ্যৎ গণনা করিতেছিল।

এই ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস সমাজের সর্ব্বস্তরেই লক্ষিত হয়। আমি জানি, বিষম বিষয়ী ব্যবহারাজীব বৎসরের আরম্ভেই বর্ষফল গণাইয়া আনিয়া থাকেন; ব্যাঙ্কের কেরাণী সপ্তাহে ছয় দিন বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হিসাব কষিয়া রবিবারে করকোষ্ঠী দেখাইয়া ফল জানিতে গিয়া থাকেন; সংবাদপত্রের সম্পাদক দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর কবে পুত্র হইবে, জানিবার জন্য জ্যোতিষীকে উদ্বাস্ত করেন। অধীর উপন্যাসপাঠক যেমন উপন্যাসের কতকাংশ পাঠের পরই শেষ অধ্যায় দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই গল্পটা জানিতে চাহে, মানুষ তেমনই জীবনের কতকাংশ কাটাইয়া শেষফল জানিতে ব্যগ্র হয়। এই যে গণনা, ইহা কি সত্য, না সর্ব্বৈব মিথ্যা? কে বলিবে? যদি সবটাই মিথ্যা হয়, তবে দশটার মধ্যে দুইটা কথাও খাটে কেন—খাটে কেমন করিয়া? এমনও দেখা গিয়াছে, গণৎকার মানুষের অবয়ব লক্ষ্য করিয়া বা হাতের রেখা দেখিয়া তাহার অতীত জীবনের নানা কথা বলিয়া দিয়াছে—যেন মানুষের মুখে বা হাতে তাহার জীবনের বিবরণ লিখিত আছে; সকলে পড়িতে জানে না; যে পড়িতে জানে, তাহার নিকট সে সবই সহজ-পাঠ্য। এই শাস্ত্র বিজ্ঞান বলা যায় কি না কে বলিবে? বহু শতাব্দী হইতে ইহা অবজ্ঞাত—ইহার তেমন চর্চ্চা হয় নাই—তাই আজ হয় ত ইহার উন্নতি সাধিত হইতেছে না। মানুষের জীবন কোন অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে এমন কথাও মনে করা যাইতে পারে যে, সেই শক্তি তাহার ভবিষ্যৎ যেরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, কেহ কেহ তাহা জানিবার উপায় অবগত হইতে পারে। কে বলিবে? সমাজের সর্ব্বস্তরেই আপনার ভবিষ্যৎ জানিবার বাসনা বিদ্যমান। কিন্তু নিম্নস্তরে সে বাসনা যত বলবতী, উচ্চস্তরে তত নহে। তাই সমাজের নিম্নস্তরের রমণীরাই নইমীর কাছে ভাগ্য গণাইতে আসিত। নইমী যে ব্যবসার মালেক, তাহাতে তাহাকে সারারাত্রিই জাগিতে হইত। তাহার পর সে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুমাইত—অপরাহ্নে লোকের ভাগ্যগণনা করিত।

নইমী তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা রমণীর হাত দেখিতেছিল, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন স্বপ্নাবিষ্টার মত ভবিষ্যতের কথা বলিতেছিল—যেন সে চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের চক্ষুতে ভবিষ্যতের লিপি পাঠ করিয়া বলিতেছিল। তাহার পার্শ্বে একটি বৃহদাকার মার্জ্জার উপবিষ্ট—তাহার বর্ণ ঘন কৃষ্ণ, চক্ষু দুইটি হরিদ্রাবর্ণ; দেখিলেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শঙ্কায় মানুষ শিহরিয়া উঠে। যে ভাগ্যগণনা করাইতে আইসে, সে কোন কঠিন প্রশ্ন করিলে নইমী হর্ম্ম্যতলে খড়ি দিয়া একটা ছক আঁকে, তাহার পর ডাকে—"রিক্তার!" সেই ডাকে বিড়ালটি আসিয়া ছকের উপর একখানি পা তুলিয়া দেয়—সে কোন্ রেখায় পা দিতেছে, তাহা দেখিয়া নইমী আবার চক্ষু মুদিয়া বলিয়া যায়। আগন্তুক বৃদ্ধাকে ও রুথকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া নইমী বলিতে লাগিল —"অন্ধকার! চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কিন্তু সে অন্ধকার কাটিয়া গেল—উজ্জ্বল আলোক দেখা দিল। কিন্তু—কিন্তু—ও কি? তাহার পরই ছুরি দেখিতেছি; আর ঐ তোমারই রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে!" যে ভাগ্যগণনা করাইতে আসিয়াছিল, এই কথায় তাহার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। নইমী চক্ষু মেলিয়া বলিতে লাগিল, "শুনিলে ত? এখন যে ক্লেশ পাইতেছ, তোমার সে ক্লেশের অবসান হইবে। কিন্তু এ কায করিলে কিছুদিন পরে তুমি নিহত হইবে।" রমণী কাতর ও কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,"হত্যা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি কোন উপায় নাই?" নইমী বলিল, "না। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। উহাই ভাগ্যলিপি। বুঝিয়া দেখিয়া যাহা হয় কর।" সে আর কোন কথা বলিল না দেখিয়া নইমী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?" সে হতাশভাবে বলিল, "না।"

তখন নইমী রুথের ও তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিল। তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিয়া রুথের মনে অজানা শঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। তাহার শুষ্কদেহ, রঞ্জিত মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—এ সব দেখিয়া রুথের কেবল মনে হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে শকুনির সাদৃশ্য যেন অত্যন্ত প্রবল।

রুথের সঙ্গিনী বলিল, "দিদি, এই মেয়েটিকে তোমার কাছে আনিয়াছি; আশ্রয় দিতে হইবে। যে আশ্রয়ে ছিল—সে আশ্রয়ে আর ইহার স্থান হইবে না। রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আমি কুড়াইয়া আনিয়াছি।"

নইমীর মুখ প্রসন্ন হইল, কিন্তু তাহার মুখের সেই মৃদু-হাসি রুথের কাছে, গোরস্থানে আলেয়ার আলোর মত বোধ হইল। সে হাসি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। আশ্রয়ের জন্য তাহাকে এই আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে! আপনার ভাগ্য চিন্তা করিয়া সে যেন আর চক্ষুতে অশ্রু ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। যাহার পিতার আশ্রয়ে কত লোক প্রতিপালিত হইত—যাহার পিতা দেশত্যাগ করিবার সময় কত লোক অন্নহীন হইল বলিয়া রোদন করিয়াছিল, এই কি তাহার কন্যার আশ্রয়! এই অন্ধকার সেঁতসেঁতে জীর্ণ গৃহ—গৃহ হইতে দুর্গন্ধ উঠিতেছে; আর গৃহস্বামিনী এই নইমী—যাহার দৃষ্টিতে অতীত জীবনের পঙ্কিল লালসার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই তাহার আশ্রয়! সে টাইগ্রীসের জলে ডুবিয়া মরিল না কেন?

যতক্ষণ রুথ এই কথা ভাবিতেছিল, ততক্ষণ নইমী বৃদ্ধাকে ঘরের এক পার্শ্বে লইয়া যাইয়া কি পরামর্শ করিতেছিল। পরামর্শের সময় নইমী ও বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে চাহিতেছিল। তাহার পর নইমী আসিয়া তাহার কাছে বসিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

রুথ নাম বলিবার পর নইমী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। যেন আসন্ন বিপদের সম্ভাবনাশঙ্কায় রুথ সত্য-গোপন করিল; কেবল বলিল, পারশী ইরাকে তাহাদের বাড়ী, সে যাহাদের সঙ্গে গৃহ হইতে আসিয়াছিল, তাহারা দস্যুহস্তে পতিত হওয়ায় সে নিরাশ্রয় হইয়া বাগদাদে আসিয়াছে।

নইমীর সে কথায় বিশ্বাস হইল না। সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই; আমার কাছে এ সব কথা খাটিবে না। দস্যুরা যদি তোমার সঙ্গীদের ধরিত, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিত না। তোমার যে এখনও রূপযৌবন আছে। আর দস্যুরা কি তোমার ঐ সব মূল্যবান অলঙ্কার না লইয়া চলিয়া যাইত?"

রুথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নইমী বলিল, "যাহার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে, তাহার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়াছ, তাই সে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে?"

শুনিয়া লজ্জায় রুথের মুখ রক্তাভা ধারণ করিল। নইমী মনে করিল, সে রোগের প্রকৃত নিদান নির্ণয় করিয়াছে। সে বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "পুরুষের মত নির্ব্বোধ আর একগুঁয়ে কেবল বাগদাদ সহরের ভারবাহী গর্দ্দভগুলা। তাহারা যাহাকে গৃহত্যাগ করায়, আশা করে, তাহারাই বিশ্বাস রাখিবে! বিশ্বাস কি অবিশ্বাসে ফলে?"

তাহার পর রুথকে সম্বোধন করিয়া নইমী বলিল, "তুমি বেশ করিয়াছ; যত দিন রূপ থাকে, যৌবন থাকে, তত দিনই স্ত্রীলোকের আদর; তাহার পর বাগদাদ সহরের কুকুরের মত আবর্জ্জনার স্তূপে মরণ—দিন থাকিতে তুমি চলিয়া আসিয়াছ—আমি তোমাকে আখেরের ভাবনা হইতে মুক্তির পথ করিয়া দিব। তুমি যদি নাচের মঞ্চে উঠ, তবে বুড়া ওয়ালীরও মাথা ঘুরিয়া যাইবে—কাইম-মোকাম ত কোন্ ছার।"

বৃদ্ধা বলিল, "তাহা হইলে, দিদি, আমি বাছিয়া তোমার জন্য আনিয়াছি!"

বৃদ্ধা পুরস্কারের কথা পাড়িলে, নইমী সুর ফিরাইয়া লইল,—"তোমার যে দেখি, গুফায় না উঠিতেই ভাড়ার কড়ি চাই! আগে দেখি, কেমন হয়।"

বৃদ্ধা বলিল, "সেও কি আবার দেখিতে হয়! আজ যে আমার ঘরে কিছু নাই। এমন জানিলে অন্য ঘরে লইয়া যাইতাম—সীরা বক্‌সিস পাইতাম।"

নইমী তখন কোমরে বাঁধা থলিয়া হইতে একটা মুদ্রা বাহির করিয়া দিল এবং বলিল, "কাল আসিও।"

বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেলে নইমী ঘরের বাহিরে গেল।

বামদিকের কক্ষে যে কয় জন স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, নইমী তাহাদিগকে বলিল, "আজ আমি আর কাহারও হাত দেখিতে পারিব না। আজ যে দেবতাকে ডাকিয়াছি, তাহাতে আজ আর কোন কায হইবে না।"

এক জন বলিল, "আমার কাযটা যে বড় জরুরী।"

নইমী বলিল, "তোমার জরুরী, আমার ত নহে। আমি আজ পারিব না।"

আগন্তুক কয় জন চলিয়া গেল।

সদর দরজা বন্ধ করিয়া নইমী পূর্ব্বের ঘরে ফিরিয়া আসিল। রুথ সেই গালিচাখানার উপর বসিয়া আপনার অদৃষ্টচিন্তা করিতেছিল। নইমী আসিয়া তাহার কাছে বসিল এবং জহুরী আবর্জ্জনার মধ্যে—রাস্তার কর্দ্দমে উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড কুড়াইয়া পাইলে যেমন তাহা গৃহে আনিয়া শতবার শত-রূপে পরীক্ষা করে—তেমনই ভাবে রুথকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে রুথের মুখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তাহার কেশ-রাশি নাড়িয়া, তাহার হাত তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সে যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার নয়ন আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রুথের মনে হইল, নইমীর নয়নের দৃষ্টিতে আর রিক্তারের নয়নের দৃষ্টিতে অসাধারণ সাদৃশ্য আছে। সে দৃষ্টিতে পশুর ক্ষুধা।

আমীরের অন্তঃপুরে যাইবার পূর্ব্বে হইলে রুথ এই ব্যাপারে কোনরূপ শঙ্কা করিত কি না, সন্দেহ। কারণ, তখন সে মানুষকে সন্দেহ করিতে শিখে নাই—মানব-চরিত্রের লালসাকলুষিত পাপদিকটা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু আমীরের অন্তঃপুরে থাকিয়া সে যাহা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, তাহাতে সে এই গৃহ ও গৃহস্বামি-নীকে কেমন সন্দেহ না করিয়া পারিতেছিল না।

নইমী স্থির করিয়া লইয়াছিল, রুথ গুপ্ত ও অবৈধ প্রেমের প্রলোভনে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। সে তাহারই আদর্শে লোককে বিচার করিয়াছিল। কাযেই সে স্থির করিয়া লইয়াছিল, রক্তের আস্বাদ পাইলে ব্যাঘ্র যেমন হিংস্র হইয়া উঠে, পাপের আস্বাদে মানুষও তেমনই উগ্র হইয়া উঠে—বিশেষ রুথ যখন একবার পাপের পিচ্ছিল পথে দাঁড়াইয়াছে, তখন সে অগ্রসর হইবেই। এই সময় তাহাকে দিয়া সে যথাসম্ভব স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবে। তাহাই তাহার ব্যবসা। বাগদাদ সহরে এই পাপ ব্যবসার অনেক কেন্দ্র আছে—নইমীর গৃহ তাহার একটি। আরবী, ইহুদী, আর্ম্মাণী, কালডীয়—নানা জাতীয়া নারী ছলে ও কৌশলে এই কেন্দ্রে নীতা হয়। তাহার পর—এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একে যৌবন ফুলেরই মত অল্পকালস্থায়ী, তাহার উপর পাপের অনলতাপে তাহা আরও শীঘ্র শুকাইয়া যায়। তখন শুষ্ক ফুলের মত, সেই বিকৃত রূপ যেন কৃত্রিম বর্ণে ও সুরমায়—ছলনার জন্য ব্যবহৃত বেশে আরও চিত্তবিকার সঞ্চার করে। সকল বড় সহরেই পাপপথের পথিক নারীর মুখে সেই চিত্র লক্ষিত হয়। নইমী স্বয়ং তাহার দৃষ্টান্ত। নইমী মনে করিয়াছিল, রুথ যখন পাপের আস্বাদ পাইয়াছে, তখন তাহাকে দিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য অধিক শ্রম করিতে হইবে না। এই রূপসীর দ্বারা তাহার কত সুবিধা হইবে, মনে করিয়া সে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিল এবং কৃত্রিম দয়া দেখাইয়া বলিল, "তাই ত, বাছা, তোমার মুখখানি যে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; বুঝি এখনও খাওয়া হয় নাই?"

রুথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ডাকিল, "নেজমা!"

এক বৃদ্ধা দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। রুথ বৃদ্ধার সহিত এই গৃহে প্রবেশকালে তাহাকেই গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।

নইমী বলিল, "আমার এই নূতন মেয়েটিকে স্নান করাইয়া আন।"

দাসী রুথকে বলিল, "তোমার কাপড় কোথায়?"

নইমী ধমক দিয়া বলিল, "কাপড় কি ও সঙ্গে আনিয়াছে—আমার দেরাজ হইতে লইয়া আইস।"

দাসী কাপড় লইয়া আসিল এবং রুথের অঙ্গে অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়া নইমীকে জিজ্ঞাসা করিল, "গাত্রে গহনা আছে; খুলিয়া রাখিলে হয় না?"

নইমী চড়াগলায় বলিল, "গহনা যে আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি; আমি আমার চক্ষু দুইটা আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদে রাখিয়া আসি নাই। সে জন্য তোমার ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

নইমী বুঝিয়াছিল, রুথ তাহার পক্ষে অমূল্য রত্ন; যাহাতে রুথের মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তাহার চেষ্টা করাই সঙ্গত। তাই সে প্রথমেই অলঙ্কারগুলা লইবার চেষ্টা করিল না।

দাসী আপন মনে বকিতে বকিতে—অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে রুথকে লইয়া কূপের কাছে গেল। রুথ বিস্ময়ে অভিভূত হইল—এই খোলা জায়গায় স্নান করিতে হইবে! তাহাকে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দাসী বিরক্তভাবে বলিল, "কি গো, দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে?"

রুথ অগত্যা তোয়ালেখানা টবের জলে ভিজাইয়া লইয়া হাত-পা-মুখ ধৌত করিল—পূর্ণস্নান করিল না। আর জল তুলিতে হইল না বলিয়া দাসী আর কোন কথা বলিল না। তাহার পর রুথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় কাপড় ছাড়িব?"

দাসী বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, এ যায়গাটা কি মন্দ?"

ততক্ষণে নইমীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "খাবার দিয়াছি।"

বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই রুথ দাসীর নির্দ্দিষ্ট ঘরে গেল।

নইমী নিজে একটা টুলে বসিয়া ছিল; পার্শ্বে একখানা টুল—আর তাহারই সম্মুখে আর একখানা টুলের উপর একটা প্লেটে খান দুই মোটা রুটী আর খানিকটা মাংস ও কুমড়া সিদ্ধ। রুথ সামান্য কিছু আহার করিয়া উঠিয়া পড়িল—সে খাদ্য তাহার মুখে রুচিল না। নইমী দরদ দেখাইয়া বলিল, "আহা, মোটে যে কিছু খাইতে পারিলে না!"

তাহার পর নইমী তাহাকে সঙ্গে লইয়া জীর্ণ সোপান-পথে দ্বিতলে উঠিল। সোপানের অবস্থা এমন যে, ভয় হয়—বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

উপরে উঠিয়া রুথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বহুক্ষণ পরে সে আলো ও বাতাস পাইল।

আবার নিম্নতলের সহিত দ্বিতলের কি প্রভেদ! ঘরগুলি সুসজ্জিত—প্রত্যেক ঘরে একখানা বড় খাট, তাহাতে পুরু পরিষ্কার বিছানা। হর্ম্ম্যতলে চাটাইয়ের উপর ছোট ছোট গালিচা পাতা। প্রায় প্রতি ঘরেই এক জন স্ত্রীলোক আয়নার সম্মুখে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া প্রসাধনে রত। কেহ মুখে রং মাখিতেছে, কেহ চক্ষুতে সুরমা দিতেছে, কেহ বা কেশ বেণীবদ্ধ করিতেছে। বারান্দা দিয়া নইমী ও রুথকে যাইতে দেখিয়া সকলেই একবার চাহিয়া দেখিল; তাহার পর, বোধ হয়, নইমীর তিরস্কারের ভয়ে, যে যাহার কাযে ব্যস্ত হইল।

রুথ ভাবিল—ইহারা কাহারা? এ যেন আমীরের অন্তঃপুরের দীন সংস্করণ—অনেক রমণী, সকলেই বিলাস-সজ্জা করিতেছে! কিন্তু ইহারা কাহারা, সে কথা নইমীকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।

তিনটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ কক্ষের দ্বারে আসিয়া নইমী বলিল, "আমিনা, তোমাকে ত আজ নৃত্যাগারে যাইতে হইবে। এই মেয়েটি নূতন আসিয়াছে। বড় শ্রান্ত—এখন তোমার ঘরে ঘুমাইয়া লউক; তুমি আসিবার আগেই আমি আর একটা ব্যবস্থা করিব।"

আমিনা—কালদীয়া যুবতী—নইমীর কথায় কোন আপত্তি করিল না নইমীর নির্দ্দেশানুসারে রুথ যাইয়া সেই ঘরে শয্যায় শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। সে তখনও বুঝিতে পারিল না, সে এক পাপপুরী হইতে মুক্তি পাইয়া আর এক পাপপুরীতে বন্দী হইল।

[ক্রমশঃ।

যমুনায়।

ঘুমঘোরে স্তব্ধ নিশি—মুগ্ধ মৌন ধরা,
তারাহার নীলিমার বিপুল অঞ্চল,
শুভ্র-রশ্মি রেখা তায় ঈষৎ চঞ্চল
তমাল বকুল বট সুপ্ত শান্তি ভরা,—

এখনো ডাকেনি পাখী,—স্তব্ধ গৃহশ্রেণী,
বকুলের মৃদু গন্ধ পবনে বিথার,
মরমর বংশীবট, অশ্বত্থের সার,
দুলিতেছে অন্ধকারে মাধবীর বেণী।

সহসা দেখিনু চাহি প্রসন্ন আকাশ,
কনক-কিরণ দোলে—পীতবাস সম,
ছায়ামায়া মাঝে এ কি দৃশ্য অনুপম
যমুনার বক্ষ জুড়ি রজত উদ্ভাস!

ধু ধু ধু বালুকাবক্ষে পীড়িত যমুনা,—
অপ্রেম উষরপ্রান্তে মূর্চ্ছিত করুণা।—

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি।

ভারতের উপকূল ত্যাগ করিয়া বিলাতের প্রত্যাশায় প্রথম যে দিন সমুদ্রে ভাসিয়াছিলাম, সে দিন হৃদয়ে কেমন যেন একটা কৌতুহলপূর্ণ উল্লাস অনুভব করিয়াছিলাম; ছয়টি মাসে পলে পলে সেটুকু ক্ষয় করিয়া শূন্য হৃদয়ে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। অন্যের কি হয়, বলিতে পারি না; আমার ত সখ মিটিয়াছে, কৌতূহলের নিবৃত্তি হইয়াছে; প্রতীচীর সভ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ তুলনা ভিন্ন পদার্থের সম্যক্ জ্ঞানলাভে মন সমর্থ হয় না। বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটি বস্তুকে পাশাপাশি বসাইলে, দর্শকের দৃষ্টিতে তাহাদের বৈষম্যের ভিতর দিয়াই তাহাদের স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। বেশ মনে আছে, আমার য়ুরোপভ্রমণকালে আমার নয়ন-পথে যতবার যত প্রকারের দৃশ্য পতিত হইয়াছে, ততবার তাহার পার্শ্বে আর একখানি করিয়া ছবি, দূর ভারতের কল্পনা-চিত্র, আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহের একটা পালটা জবাব যেন অন্তর হইতে বরাবরই পাইয়াছি। কতবার পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার সময় কল্পনা-প্রসূত দূর প্রাচ্য সৌন্দর্য্যের মনোহর দৃশ্যে বিভোর হইয়া পড়িয়াছি। প্রাচীকে জানা আছে, প্রাচীর ত সবই অবগত আছি, এই বিশ্বাসে, এই অহমিকায় অন্ধ হইয়া প্রতীচীর পরিচয় লইতে ছুটিয়াছিলাম; কিন্তু তেমন দূরদেশেও কোথা হইতে প্রাচী আসিয়া কেমন যেন একটা অপূর্ব্ব অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব শান্ত স্নিগ্ধ প্রভায় আমার মন প্রাণ কতবার হরণ করিয়া লইয়াছে। বাস্তবিক, ভারতকে চিনিতে হইলে একবার ভাল করিয়া য়ুরোপ দেখিয়া আসিতে হয়; য়ুরোপকে বুঝিতে হইলে ভারতের ভাবনায় তন্ময় হইতে হয়। তুলনা হইতেই পদার্থের অনুভূতি, বৈশিষ্ট্যের গর্ভেই জ্ঞানালোক সদা দীপ্তিমান।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র।

য়ুরোপ দেখিয়া মনে হইল, য়ুরোপ যেন জগতের "বুড়ো খোকা," যেন নাচঘরের কলের পুতুল। য়ুরোপ কি চাহে? পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য কোথায়? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এত ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্য, এমন শৃঙ্খলা, কার্য্যপরতা, এমন

অসারও হইতে পারে! বিগ্রহশূন্য সুদৃশ্য মন্দিরের মত য়ুরোপ এমন সুদৃশ্য হইয়াও অসার। অনিত্য জীবনের উপভোগের জন্য অবিশ্রান্ত কি ভয়ানক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিতেছে! দুরন্ত দুর্দ্দমনীয় প্রতিযোগিতায় মানুষ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাতে প্রত্যয় জন্মে না। কেহ ভক্ষ্য, কেহ ভক্ষক; কোথায়ও হাহাকার, কোথায়ও তাণ্ডবনৃত্যে অট্টহাস্য, ইহাতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণতি। সাম্য এবং পরার্থপরতা পাশ্চাত্য বাগ্মীর বক্তৃতার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। বাস্তব জগতে, পরস্পরের ব্যবহারে, সমাজের ব্যবস্থায় সে সাম্যের নিদর্শন কোথাও নাই। জাগতিক ঐশ্বর্য্যের অসারতা উপলব্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের উৎকর্ষসাধনে জীবনব্যাপী আন্তরিক আগ্রহ এই ভারতেই এক দিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সমাজের শীর্ষে বসিয়া নিম্নতমের সহিত প্রেমের প্রগাঢ় আলিঙ্গন এই দেশেই সম্ভব হইয়াছিল। অসামান্য প্রতিভার সহিত বালক-স্বভাবসুলভ সরলতা, বিশ্ববিজয়ী শৌর্য্যের সহিত বৈষ্ণবী দীনতা, অনন্ত ঐশ্বর্য্যে মহতী নির্লিপ্ততা, এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ এই দেশের, এই সমাজেরই বৈশিষ্ট্য ছিল; ভারত এ সম্পদের গর্ব্ব করিত। যে যুগে ইহা ছিল, সেই যুগই প্রাচীর উন্নতির উৎকর্ষের যুগ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আজ ত য়ুরোপ উন্নত, সমৃদ্ধ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে; য়ুরোপে এ সম্পদ নাই, প্রতীচী এ সম্পদের গর্ব্ব করে না, ইহা তাহার গর্ব্বের পদার্থও নহে; কারণ, প্রাচীর ও প্রতীচীর আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এক দিন ছিল—যখন ভারতে ও য়ুরোপে ব্যবধান সমুদ্রের ন্যায় উভয়ের আদর্শে ও ভাবেও ব্যবধানের বিশাল সমুদ্র ছিল। কিন্তু ভারতে এখন অবসাদের যুগ; ভারত পরাধীন; পরাধীনের পরানুবর্ত্তিতাই স্বভাব; তাই ভারত অন্ততঃ বাহ্যতঃও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া দুরন্ত মত্ততায় অন্ধ হইয়া প্রতীচীর অনুকরণে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আর ভারতের নাই। ভারতের, তথা বাঙ্গালার, মাঠে মাঠে বাটে "শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ," "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে", যাহা করুণ সুরে এখনও ধ্বনিত হয়, তাহা প্রাচীর তত্ত্বজ্ঞান-প্রসূত নহে, ভারতের উদার দর্শনের উচ্ছ্বাস নহে; তাহা অসামর্থ্যের হতাশ আক্ষেপ। এ ধ্বনি প্রাণময় ও সার্থক নহে, ইহাতে সে প্রাণের স্পন্দন নাই; আছে মুমূর্ষুর বৃথা আসক্তি মাত্র। বিলাত দেখিয়া মনে হইল, যদি বিলাত কখনও তেমন ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, যদি আগ্রহে প্রাণের সন্ধানে কোনও দিন অধীর হইয়া উঠে, তবেই সে সুদৃশ্য বিলাতী ফুলে প্রাচীন ভারতের ভাব-গন্ধ আসিয়া জুটিবে, প্রাচীর প্রাণের মধু তাহাতে সঞ্চারিত হইবে এবং সেই ফুলে বিশ্বমাতার পূজা আরব্ধ হইবে। আর এ কার্য্যের ভার য়ুরোপকেই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, য়ুরোপ জীবিত। এ কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি না হইলে বুঝিব, প্রকৃতই ইহা কলির শেষ এবং জগতের ধ্বংস অনিবার্য্য।

খাস বিলাতে অর্থাৎ ভারত-সম্রাটের দেশে প্রথমেই দুই মাস ছিলাম। ইংলণ্ডের কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণে, অনাবশ্যক বোধে, বিশেষ প্রবৃত্তি নাই; বৃত্তান্তের শেষভাগে অল্প কথায় তাহা সমাপ্ত করিব। বিলাতী দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যে দিন য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে পদার্পণ করিলাম, সেই দিন হইতেই প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণী যাত্রা করি। ইংলণ্ড হইতে জার্ম্মাণী যাইতে হইলে সাধারণতঃ বেলজিয়ামের সমুদ্র-তীরস্থ বন্দর অষ্টেণ্ড ও রাজধানী ব্রাসেলস্ নগরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অষ্টেণ্ড বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা আটলাণ্টিক মহাসাগরের যে অংশ উত্তরসাগর নামে খ্যাত, তাহার তীরে অবস্থিত। জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল। জাহাজ উপকূলে পৌঁছিলেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ইচ্ছামত গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়, ইহাই অনেকের ধারণা। একটু বেশী ঠেলাঠেলি করিতে পারিলেই এখানে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে। খেয়ার ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইতে হইলে ইহাই নিয়ম বটে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ ব্যাপার এত সহজ নহে। এক দেশের লোক অন্য দেশে প্রবেশ করিবে, কত প্রকার দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? কাযেই এখানে অবতরণ করিয়াই, গন্তব্য স্থানে যাত্রা করা ঘটিয়া উঠে না। দেখিলাম, ধীরে ধীরে সমস্ত যাত্রী ক্রমশঃ জাহাজ হইতে নামিয়া, দুই দলে বিভক্ত হইয়া, দুইটি বিভিন্ন ফটকের সম্মুখভাগে শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, একটি তোরণের উপরে "বেলজিয়ান ও ইংরাজের জন্য" লিখিত; অপরটি বিদেশীয়ের

জন্য। আমি ইংরাজের প্রজা; সুতরাং আইন অনুসারে প্রথম তোরণাভিমুখেই অগ্রসর হইয়াছিলাম। এ তোরণটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সুদৃশ্য। ইংরাজ বা ইংরাজের প্রজা এই কথা উচ্চারণ মাত্রেই এ স্থানে অব্যাহতিলাভ ঘটিয়া থাকে। বেলজিয়ামবাসিগণের ত কথাই নাই। কিন্তু অন্য যাত্রীর পক্ষে ব্যবস্থা অন্য প্রকার। বিষম কর্ম্মভোগ স্বীকার করিবার পর তবে এ স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দেখিলাম, এই শ্রেণীতে ফরাসী, ইতালীয়, জার্ম্মাণ, মার্কিণ, রুসিয়ান প্রভৃতি নানা দেশীয় লোকই আছে; এই ভাবেতেই আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। বেলজিয়ামবাসী সে উপকার ভুলে নাই।

অষ্টেণ্ড সহর তেমন বড় নহে। আকারে বৃহৎ না হইলেও পারিপাট্য আছে। সমুদ্রের উপকূলে পৌছিলেই জার্ম্মাণগণের কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড Light house (আলোকগৃহ) জার্ম্মাণীর তোপে খণ্ড খণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। আটলাণ্টিকের জলরাশি যেমন পূর্ব্বে অখণ্ড আলোক-গৃহ লইয়া ক্রীড়া করিত, এখন তাহার ভগ্ন অংশগুলি লইয়া

জার্ম্মাণ দুর্গ।

সকলেই শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। এক এক করিয়া প্রত্যেকের ছাড়পত্র ও মাল-পত্র ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতে লাগিল ও এক এক জন করিয়া মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। যাহা হউক, এ ব্যাপারে দেখিলাম, বেলজিয়ামে ইংরাজদিগেরই জয় জয়কার। সমগ্র বেলজিয়ামে ইংরাজের প্রভাব, খাতির-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। বোধ হয়, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াই বেলজিয়ামবাসী ইংরাজের কাছে এতটা কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের বোধ হয় মনে আছে, অনেক অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয়-হীন বেলজিয়ামবাসী নর-নারী-বালক-বালিকাকে ইংরাজ তেমনই উপেক্ষাত্র চারিদিকে নানা ভাবে নৃত্য করিতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধারম্ভের কিছুদিন পরেই বেলজিয়াম অধিকার করিয়া এই অষ্টেণ্ড সহরে সমুদ্রতীরে জার্ম্মাণগণ একটা সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণগণ অষ্টেণ্ড উপকূলে এই একটি মাত্র দুর্গ প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অষ্টেণ্ড হইতে জীবুর্জ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূলভূমির উপর জার্ম্মাণগণ এক দুর্ভেদ্য প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিরূপে এত শীঘ্র, এত বড় একটা কায করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময় উপস্থিত হয়। এই প্রাকারের উপরে বরাবর অল্প অল্প দূরে তোপ

সাজান থাকিত। তোপ নানা শ্রেণীর হইয়া থাকে। জার্ম্মাণগণ দূর সাগরবক্ষে শত্রুর রণতরী ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে এই তোপশ্রেণী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। তোপগুলি অত্যন্ত বৃহৎ আকারের এবং এই সব কামান হইতে বহুদূরে গোলা নিক্ষেপ করিতে পারা যায়। এক একটি তোপের পশ্চাদ্‌ভাগে ভূগর্ভে যেন গোলা-বারুদের এক একটা প্রকাণ্ড কারখানা। অনবরত এই স্থান হইতে তোপের ব্যবহারের জন্য গোলা সরবরাহ করা হইত। প্রত্যেক তোপের সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা, লোকজন, সামরিক কর্ম্মচারী যাহা কিছু সবই তোপের পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিত। এখন আর সে তোপ নাই। সে প্রাকার আছে, নানাস্থানে ভগ্ন তোপ বসাইবার স্থানগুলি দেখিলাম। সেগুলি যেন এক একটা পুকুর। তাহাতে এখন সমুদ্রের জল জমিয়া আছে। গভীর গর্ত্তের মধ্যস্থলে কলের উপর তোপের এক অংশ বসান থাকিত। এই কলের সাহায্যেই তোপের মুখ নানা দিকে ঘুরান-ফিরান যাইত। সে তোপ আর তেমন প্রলয়াগ্নি উদ্গিরণ করে না; নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির ন্যায় এখন তাহা ভগ্নস্তূপে পরিণত। কিন্তু সে দৃশ্য এখনও যেন বিভীষিকাময়। জার্ম্মাণ জাতি পর্য্যুদস্ত, ছিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু জার্ম্মাণীর সমর-সজ্জার একটা ভগ্নাংশও ভীতিব্যঞ্জক।

জার্ম্মাণ-পরিখা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অষ্টেণ্ড ক্ষুদ্র হইলেও অতি সুদৃশ্য। সমৃদ্ধ য়ুরোপে সুদৃশ্য নগরের অভাব নাই; কিন্তু অষ্টেণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চমৎকার; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে অষ্টেণ্ড-বাস অত্যন্ত আরামপ্রদ। এই জন্যই য়ুরোপের সকল স্থান হইতেই বিলাসী নর-নারী যুবক-যুবতী অষ্টেণ্ডে নিদাঘ-যাপন করিতে আইসেন। অষ্টেণ্ড গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে ঋতু-পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপের ভোগবিলাসী ধনী ব্যক্তিগণের আমোদ-প্রমোদের একটা কেন্দ্রস্বরূপ। সর্ব্বজাতীয় সকল দেশীয় যুবক-যুবতী, আর্থিক সামর্থ্য থাকিলে গ্রীষ্মে একবার অষ্টেণ্ডে পদার্পণ করিবেনই। জীবন-যৌবন উপভোগের এমন স্থান আর কোথায়? দিবাভাগে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই সময়টা সমুদ্রের জলে বালুকাময় তটে জনতা হইয়া থাকে। কি জন্য, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হইবে, স্নানেরই জন্য। তবে যাঁহারা শ্রীশ্রীপুরীধামে জগন্নাথ-দেবের স্নান-যাত্রা কিংবা কাশীধামে মণিকর্ণিকায় অর্দ্ধোদয় যোগে বা প্রয়াগের কুম্ভে তীর্থ-স্নানের জনতামাত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ স্নানযাত্রা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। ইহা বুড়া-বুড়ী দাদামহাশয়-দিদিমা'র গঙ্গাস্নান নহে। ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাববিবর্জ্জিত অপূর্ব্ব জলকেলি। স্নানে হরি, আল্লা, বুদ্ধ, যীশুর সম্পর্ক নাই।

স্বাস্থ্যের উন্নতি যদি ইহার অভিপ্রায় হয়, বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতে ইহা একটা অদ্ভুত "জোলো মাতন" বা জলকেলি। স্নানের ঘাটে স্থানে স্থানে এক প্রকার অশ্ব-শকট আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা চলে, এই জন্যই এই গাড়ীগুলি প্রয়োজনমত আগাইয়া বা পিছাইয়া লইতে হয়। গাড়ীগুলি এক একটি সুসজ্জিত কক্ষবিশেষ। ইহাতে স্নানার্থী প্রথমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া স্নানের পোষাক পরিধান করেন। স্ত্রী ও পুরুষদিগের জন্য স্বতন্ত্র সজ্জাগার প্রস্তুত থাকে। পোষাক পরিয়া যুবক-যুবতী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ সমস্ত রাত্রি চলিতে থাকে। নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বাদ্য, জুয়া হরদম চলে। মনে রাখিতে হইবে, এ স্থানে আমোদ করিতে হইলে পয়সার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। নানাদেশীয় নর-নারী, মা-লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ধনশালিনী যুবতীগণের সহিত পান-ভোজন এবং আনন্দ অনুভব করেন। স্ফূর্ত্তির বৈচিত্র্যের অভাবে যাঁহাদের জীবন নিতান্ত ভারস্বরূপ হইয়া উঠে, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া দিনকতকের জন্য প্রাণটা হালকা করিয়া লয়েন। টাকা লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা আমার জীবনে আমি এই প্রথম দেখিয়াছিলাম। মনে আছে, সে রাত্রিতে এই উজ্জ্বল

স্নানের ঘাট।

তাহার পর সন্তরণ আর অপূর্ব্ব জলকেলি। তেমন জলকেলি করিয়া আবার সমাজে স্থানলাভ এবং সভ্যতা ও সুশিক্ষার গর্ব্ব করা, বোধ হয়, এই প্রকার পাশ্চাত্য সমাজেই সম্ভব। কোনও যুবতী সন্তরণে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া শিক্ষা প্রার্থনা করিলেই, যুবকের দল অম্লানবদনে বুকে পিঠে নানা ভাবে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাই সভ্যতা!

ইহা ব্যতীত আবার ডুব-সাঁতার আছে!

দিনের আমোদের অবসানে রাত্রির আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ হয়। তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এ স্থানটির নাম "লে কারসাল।" এই সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে আলোকমালায় সজ্জিত গৃহে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের অন্তরালে আর একটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে দৃশ্য ভারতের তমসাবৃত ভগ্ন কুটীরবাসীর অন্নহীন, বস্ত্রহীন, রোগশোক-জর্জ্জরিত কঙ্কালসার দেহ, তাহার অবস্থা, তাহার ভবিষ্যৎ।

আর ভাল লাগিল না; তিন দিন অষ্টেণ্ডে বাস করিয়া বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ সহরে আসিলাম। পথে নানা স্থানে যুদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এখনও বেলজিয়ামের সুন্দর দেহ ক্ষতবিক্ষত; পল্লীগ্রামের অবস্থা এখনও শোচনীয়। তবে সহরগুলির সংস্কারকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প যাহা প্রায়

লে কারসাল প্রমোদ গৃহ।
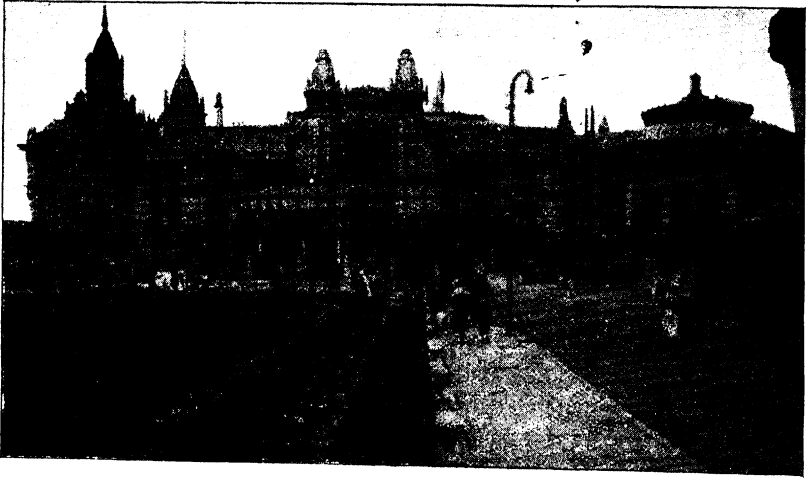
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ইহা বেলজিয়ামবাসীর অসাধারণ কৃতিত্ব ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন। ভার্সেলিজ সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী জার্ম্মাণী বেলজিয়ামকে ক্ষতি-পূরণস্বরূপ যে অর্থ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা দেন নাই; অথচ বেলজিয়াম স্বীয় শক্তিবলে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা হইতে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের অসামান্য রাজসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বেলজিয়ামের হোটেলগুলিতে অভ্যাগতের সেবার
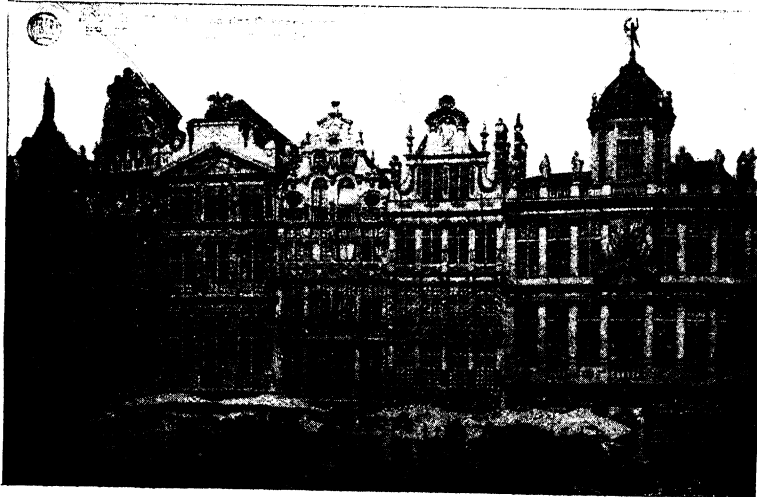
ব্রাসেলসের মিউনিসিপ্যাল গৃহ।
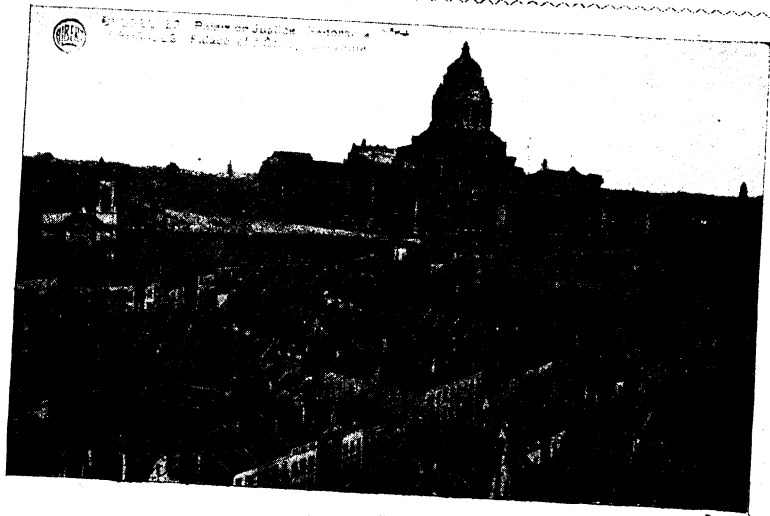
ব্রাসেলসের বিচারালয়।

কোনও প্রকার ত্রুটি হয় না। সর্ব্বপ্রকার খাদ্য পানীয় সরবরাহ হইয়া থাকে। হোটেলের স্বত্বাধিকারিগণ অভ্যাগতের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে তথাকার হোটেলে একপ্রকার অদ্ভূত নিয়ম দেখিলাম। যে ব্যক্তি যত টাকা মূল্যের আহার্য্য গ্রহণ করিবে, তাহাকে তত টাকার দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হয়। অর্থাৎ ৫৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলে ৬৲ টাকা দিতে হয়। এরূপ নিয়ম অন্য কোথাও দেখিলাম না।

বেলজিয়ামবাসী ইংরাজ জাতির প্রতি যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন, আচারে ব্যবহারে তাহারা ফরাসী জাতিরই অনুকরণ করিয়া থাকে। নগরের গঠনপ্রণালীতেও ফরাসী আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজধানী ব্রাসেলস্ নগর দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরীর একখানি ক্ষুদ্রায়তন প্রতিকৃতিমাত্র। নগরের রাজপথ, গৃহাদি সকলই প্রায় ফরাসী আদর্শে গঠিত।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

সংসার-সরাইয়ে।

(জালালুদ্দীন রুমী)

পশেনি তোমার কানে? ঘন ঘন বাজিছে দামামা।
উঠেছে উটের পিঠে রাহীদল বাঁধিয়া আমামা॥
উটের গর্দ্দানে বাজে কিনি কিনি কিঙ্কিণী ঘুঙুর।
ভিজাতেছ শুষ্ক তালু ওগো কারা নিঙাড়ি আঙুর॥
সরাবে মস্তানা হয়ে এখনো কে পড়েছ ঢুলিয়া—
অহিফেনে নিদ্রাহত যাত্রাপথ কে গেছ ভুলিয়া?

জ্বলেছে মশাল, বাজে তলোয়ার উঠে ঘোররোল।
এখনো বেহুঁস আছ? চারিদিকে এত সোরগোল॥
বালুকাসাগরগর্ভে তৃষাতুর, কণ্টকের বনে,
সহস্র লভিল মৃত্যু আত্ম সহ যুঝি প্রাণপণে॥
মহামিলনের কাবা, তবু সেই অমৃত-বৈভব।
পথের ক্ষণিক মোহে কে ভুলিবে মহামহোৎসব?

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীত।

আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে নিতান্তই informal ভাবে দু' চারটি কথা বল্‌তে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। এ সম্বন্ধে আমার এত বেশী বল্‌বার আছে যে, দু'চার কথায় আমার বক্তব্যটি নিবেদন করা সম্ভব নয়। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলার ইচ্ছা রইল। আপাততঃ এ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা মাত্র বলবার ইচ্ছা আছে, যা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একটু সংস্পর্শে এসে আমার একটু বেশী করেই মনে হয়েছে।

আমি অনেক লোকের মুখেই এ কথা শুনেছি, "ওদের সঙ্গীত শিখে আমাদের সঙ্গীতের কিই বা লাভ হওয়া সম্ভব?"

বাস্তবিক য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বিকাশ আমাদের সঙ্গীতের বিকাশ হ'তে এতই বিভিন্ন যে, ওদের সঙ্গীতের অল্প পরিচয়ে আমার নিজের মনেও এ সংশয়ের যে উদয় হয় নি, এমন নয়। কিন্তু পরে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে ও সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে দু'চার জন মহৎ-লোকের জীবনী প'ড়ে আমার মনে হয়েছে যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বিকাশের ধারাটার সঙ্গে আমাদের একটু নিকট পরিচয়ে আসা খুবই বাঞ্ছনীয়। কেন বলছি।

আমি বিশ্বাস করি যে, উচ্চতম সঙ্গীত করুণ-রসাত্মক। কবি যে বলেছেন our sweetest songs are those that tell of saddest thought এটা শুধু যে স্মৃতি-জগতের ক্ষেত্রেই খাটে, তা নয়, এ কথা উচ্চতম সঙ্গীত সম্বন্ধেও খাটে। আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই যে গম্ভীর বা করুণ মধুর রস, এটা আমার কাছে আমাদের সঙ্গীত-বিকাশের একটা মস্ত সম্পদ ব'লে মনে করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা ভাববার আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, শুধু সঙ্গীত ব'লে নয়, সমস্ত ললিতকলারই প্রাণ নির্ভর করে তার বৈচিত্র্যের উপর; এবং এই বৈচিত্র্য মানে হচ্ছে উচ্চতম স্তরের আর্টের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত একটু নিম্নতর স্তরের আর্টের একত্র সম্মিলন। আমাদের সঙ্গীতের technique এর সঙ্গে যাঁরা একটু পরিচিত আছেন, তাঁরা জানেন যে, গায়ক তাঁর সুন্দরতম আলাপকে সবচেয়ে বেশী মনোরঞ্জক কর্ত্তে হ'লে সর্ব্বদাই স্বরবিন্যাস সুমিষ্টতম করেন না বা কর্ত্তে পারেন না—অপেক্ষাকৃত কম মধুর স্বরবিন্যাসের পরে ও পাশাপাশি মধুরতর স্বরবিন্যাসের প্রয়োগ ক'রে থাকেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার এ বক্তব্যটি ভাল ক'রে স্ফুট ক'রে তোলার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আরও দু'চারটে কথা বল্‌ব, এই অভিপ্রায় নিয়ে কলম ধরা গেছে ব'লে তা কর্ত্তে পারলাম না। আমি আর একবার পুনরুক্তি ক'রে বলব যে, শুধু সঙ্গীতের মধুরতম ও উচ্চতম বিকাশকে নিয়ে ঘর করা চলে না—যেহেতু, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই এই উচ্চতম স্তরের সঙ্গীতমাধুর্য্য ফুটে উঠে থাকে। শ্রীপরমহংসদেব তাঁর মনোমত প্রাঞ্জলভাষায় বলতেন সা রে গা মা পা ধা নি, কিন্তু 'নি'তে বেশীক্ষণ থাকা যায় না, মাঝে মাঝেই নেমে আস্‌তে হয়। তাই আমাদের সঙ্গীতের উচ্চতম বিকাশকে—অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে আমরা বাধ্য হলেও আমরা যে রকম ভাবে এ যাবৎ শুধু করুণরসাত্মক (যেমন খেয়াল, গজল, ঠুংরি প্রভৃতি) বা শান্তরসাত্মক (যেমন ধ্রুপদ) সঙ্গীত নিয়েই ব্যস্ত আছি, সে রকম ভাবে শুধু এই দুই একটি মাত্র রসের বিকাশকে নিয়েই মাথা ঘামালে চলবে না। অর্থাৎ—আমাদের সঙ্গীতে উল্লাস ও হর্ষরসাত্মক সুরেরও আমদানী দরকার। আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, ভৈরবী, বেহাগ, খাম্বাজ, ভূপালী প্রভৃতি সুর বা টপ্পা ঠুংরী হর্ষরসাত্মক। এ সব সুর অনেক সময় দ্রুত ছন্দের সাহায্যে একটু আনন্দের ভাব প্রকাশ কর্‌লেও উল্লাসের ভাব প্রকাশে একান্ত অক্ষম। এই অক্ষমতাটা শুধু আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়ে ভাল ক'রে বোঝা যায় না—এটা বোঝা যায় যদি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে একটু সংস্পর্শে আসা যায়। সে সঙ্গীতের উল্লাস হর্ষরসাত্মক সুর তালগুলি এতই মনোমদ ও জমকাল যে, তার সঙ্গে একটু পরিচয় লাভ কর্‌লেই এ দিকে আমরা যে কত পেছিয়ে আছি, তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তাই আমার মনে হয় যে, আমাদের সঙ্গীতে হাস্যোল্লাসরসাত্মক রাগের সৃষ্টি কর্ত্তে হ'লে

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাছে যথেষ্ট শিক্ষা করবার আছে। এর একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে ছুই জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা হর্ষ ও অন্যান্য রসাত্মক বাঙ্গালা সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা দু'জনই য়ুরোপীয় সঙ্গীত-বেত্তা না হলেও তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা দু'জনে —অর্থাৎ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মদীয় পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়—যে বর্ত্তমান সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও নতুন রসের প্রেরণা আমাদের বহন ক'রে এনে দিয়েছেন, এ কথা নিতান্ত কাঁচা ওস্তাদী সঙ্গীতের ভক্ত ছাড়া আর কেহই অস্বীকার কর্ত্তে পার্‌বেন না। ওস্তাদী সঙ্গীতের দাম ও সৌন্দর্য্য অবশ্য এঁদের কথিত সঙ্গীতের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাই ব'লে এই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সঙ্গীতকে অভি-নন্দন না করার কোনই কারণ নেই। তাই আমার মনে হয় যে, যে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অল্প পরিচয়ে এঁরা দু'জন আমাদের বহুদিন যাবৎ স্রোতোহীন সঙ্গীতের মধ্যে একটা নতুন কিছুর মলয় হাওয়ার পরশ এনে দিতে পেরেছেন, সে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সঙ্গীতকলাবিদ্‌দের আরও ভাল ক'রে পরিচয় লাভ করা বাঞ্ছনীয়; এবং আমার খুবই বিশ্বাস হয় যে, এতে আমা-দের সঙ্গীতের একটা মস্ত লাভ হবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ হর্ষোল্লাসাদি প্রাণশক্তির সঞ্চারক সৃষ্টির দিক্ দিয়ে।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাছ থেকে আমাদের আর একটা জিনিষ শেখবার আছে, সেটা হচ্ছে traditionএর প্রতি শ্রদ্ধার বিনাশ। সামাজিক আসরে traditionএর কিছু দাম আছে, এ কথা মেনে নিলেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, সঙ্গীতাদি ললিতকলার আবহমানকাল বিধি-নিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে চলা তার বিকাশের একটা মস্ত পরিপন্থী। অবশ্য যথেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এক বস্তু নয়—সমাজেও নয়, আর্টেও নয়; কিন্তু যে কোন আর্ট নব নব উপায়ে মানুষকে আনন্দ দেয়, তা হাজার সনাতন নিয়মকানুন লঙ্ঘন করলেও গরীয়ান্ ব'লে গণ্য হবেই হবে। আর্টে এই সনাতন নিয়মকানুনকে পূজা করার বা একরোখাভাবে মেনে চল্‌বার প্রবৃত্তি নবসৃষ্টির পথে যে একটা মস্ত বাধা, এ কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। তার প্রমাণ এই গত কয়েক শতা-ব্দীর মধ্যে নতুন রচনা আমাদের মোটেই সৃষ্টি হয় নি, আর য়ুরোপে শত শত সঙ্গীতরচয়িতা নিত্যই নতুন স্বরবিন্যাসের উদ্ভাবন ক'রে মানুষকে নিত্য-নতুন আনন্দ দিচ্ছেন। দেখুন, harmony নামক অপূর্ব্ব ও বিচিত্র স্বরবিন্যাসের সৃষ্টি সঙ্গীতে এই স্বাধীন প্রেরণারই অনুসরণের ফল। মানুষের মন পুরাতনের বা অভ্যস্তের খোঁজেই চল্‌তে ভালবাসে ব'লে তাকে নতুনে সাড়া দেওয়াতে হয়—জোর ক'রে। তাই সঙ্গীতকার এই দরকারী অথচ অপ্রিয় কাযটার ভার নেন। তাঁর কাযকে লোক প্রথমটা সচরাচর অবিশ্বাসের চোখেই দেখে থাকে, বিশেষতঃ সঙ্গীতাভিমানী লোকরা। য়ুরোপের সঙ্গীত-সম্রাট বেতোভন্ নিয়ম-কানুনকে স্থাণুবৎ নিশ্চল মনে কর্ত্তেন না। তিনি প্রেরণা-নুসারে সঙ্গীতের নিয়মকানুনকে লঙ্ঘন কর্ত্তে কখনও দ্বিধা কর্ত্তেন না। তাঁর শিক্ষক Albrechtobezer তাই তাঁর উপর এতই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর আর এক ছাত্রকে বলেছিলেন,—"বেতোভনের সঙ্গে মিশো না। সে কিছুই শেখেনি এবং কখনও কোন রচনা সুনিয়মমাফিক কর্ত্তে পার্ব্বে না।" তাঁর অনেক নতুন জিনিষ তাঁর যুগে লোকের কাছে খারাপ ঠেকেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও—অথবা ঠিক সেই জন্যই—তিনি আজ য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কার।

এখানে আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। কোনও কলার নিয়মকানুন লঙ্ঘন কর্‌লেই যে, সে কলার এক জন মস্ত লোক হওয়া যায়, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য হতেই পারে না। আমি বলতে চাই শুধু এই, শুধু সঙ্গীতেই নয়, সব কলাতেই নতুনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখা ও সনা-তন নিয়মকে অপৌরুষেয় ব'লে মনে করাটা কলার বিকাশের একটা মহান্ অন্তরায়। কোনও কলায়ই license liberty নয়। তবে মানুষের যুগসঞ্চিত অভি-জ্ঞতা মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে কোনও কলার বিশেষ সন্নিবেশে কমবেশী আনন্দ পায়। তার জমাখরচের খাতায় আনন্দের এই কমবেশী হ'বে আর্টের একমাত্র কষ্টি পাথর। তাই কেউ যদি কোনও পুরাতন রাগরাগিণীর নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তা হ'লে তাঁর রচনার সমালোচনা করার সময় আমাদের কেবল এইটুকু মাত্র ভেবে দেখলেই চলবে যে, তাতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না এবং যদি যায়, তার পরিমাণ কতখানি ও তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু। সঙ্গীতের তারিফে এই আলোচনাই সর্ব্বেসর্ব্বা

হওয়া উচিত। তাই কোনও নতুন সুরের বিন্যাস বা নতুন সঙ্গীতের ধারায় আমরা যদি রস পাই, তবে তাতে যদি মাডাগস্কর বা হনোললুর সঙ্গীতের আমেজ থাকে ত থাক্ না কেন; তা'তে কি যায় আসে?

কথা উঠতে পারে, তা হ'লে আমাদের হিন্দু সঙ্গীতের ধারা লোপ পাবে। আমার মনে হয়, এ আশঙ্কা অমূলক। আমার মনে হয় যে, আমাদের উচ্চতম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে এতখানি সত্য সম্পদ আছে ও এতখানি সত্য রস আছে যে, শীঘ্র তার আনন্দসঞ্চারের ক্ষমতা নতুনের আগমনে লোপ পাবে না। পক্ষান্তরে, যদি নতুন কোন ঢেউয়ের বা তথ্যের আলোয় আমাদের এ সনাতন সঙ্গীতের অঙ্গহানি হয়, তবে সে অঙ্গহানিকেই আমি অভিনন্দন কর্ব্ব, কারণ, নতুন সত্যের আলোকে যে বর্ণ ম্লান হয়ে যায়, তার দামই বা কি আর গৌরবই বা কতটুকু? সেরূপ স্বল্পপ্রাণ রসকে নিয়ে কোলে ক'রে ব'সে থেকে লাভই বা কি? কিন্তু আমাদের মধ্যে সঙ্গীতরসিকমাত্রেই উচ্চতম সঙ্গীতে এতখানি রস পেয়ে থাকেন যে, এ সঙ্গীতের মধ্যে রসের বিদ্যমানতা ধ্রুব ব'লে মনে করার ঢের কারণ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতে কেন stagnancy এসেছে, উচ্চতম সঙ্গীতের রসের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তার আদর কেন সাধারণের কাছে কমে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে বিবিধ রসের বিকাশ কেন হয় নি, এ সব সমস্যার আলোচনা করার আপাততঃ সময়াভাব। তাই আমি শুধু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের নিকট সম্বন্ধটির বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে দু' চারটি কথা ব'লে এ প্রবন্ধটির শেষ কর্ব্ব।

আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে, সঙ্গীত একটা সখ মাত্র—যেমন দাবা খেলা বা ঘোড়দৌড় দেখা। সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের মনের বিকাশের যে কত গভীর সম্বন্ধ আছে, তার কোনও খবরই আমরা সচরাচর রাখি নে। আমাদের সঙ্গীত অশিক্ষিত লোকের হাতে প'ড়ে এত দিন রয়েছে বলেই আমাদের এ রকম একটা ধারণা জন্মেছে। ফলে আরও হয়েছে এই যে, আমাদের দেশে সঙ্গীতবিৎ লোক মোটের উপর যদি অবজ্ঞার পাত্র না হন, তা হ'লে ঔদাসীন্যের পাত্র ত নিশ্চয়ই। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের উচ্চতম বিকাশের যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তা য়ুরোপে Wagner, Beethoven প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণ কি রকম cultured লোক ছিলেন, তার একটু পরিচয় পেলে অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। Beethoven মানুষ হিসাবে অতি উচ্চ দরের মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সততা ছাড়া যে মানুষের অপর কোনও শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন থাক্তে পারে, তা আমি মানি না।" অপিচ, "আমরা যতটা পারি এস পরহিতে রত হই। এস স্বাধীনতাকে সব চেয়ে ভালবাসি ও এমন কি, সিংহাসনের জন্যও যেন সত্যকে না বর্জ্জন করি।" তাই তিনি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার হয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গীতে এত লোক উচ্চ আনন্দের সাড়া পায়। আমাদের দেশে কি কোনও ওস্তাদ এরূপ চিন্তা স্বপ্নেও পোষণ কর্ত্তে পারেন? পারেন না, তার কারণ, আমাদের দেশে উচ্চহৃদয় উচ্চশিক্ষিত লোক সঙ্গীতকে বর্জ্জন করেছেন। মহামতি রোঁম্যা রোলাঁ মহোদয়ের বেতোভনের জীবনী হতে একটি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে এ প্রবন্ধের শেষ করব। উনি লিখেছেন—"যেখানে চরিত্র মহৎ নয়, সেখানে মহান্ মানুষের জন্মান সম্ভব নয়, না ধর্ম্মের রাজ্যে, না কলির রাজ্যে।" *

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

* "য়ুরোপীয় সঙ্গীত থেকে আমাদের কি শেখবার আছে, সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা" এই নামে রামমোহন লাইব্রেরী হলে পঠিত।

জয়লক্ষ্মী।

(অনুবাদ)

তব—সতীহৃদয়ের মন্দির ত্যজি চলেছি বলিয়া হৃদয়রাণী।
সজল-নয়নে নিষ্ঠুর বলি পিছু হ'তে আজ রেখ না টানি॥
যেই প্রেয়সীরে বরিয়া আনিতে চলিয়াছি আজ শস্ত্র-করে।
আসিব না ফিরে, হয় ত এ শিরে দিতে হবে বলি তাহার তরে॥
তোমা হ'তে সে যে আরো বরণীয়, অভিমানভরে কেঁদ না প্রিয়ে।
তোমা ভালবাসি এ হৃদয় সঁপি তারে ভালবাসি পরাণ দিয়ে॥
সতীন যদিও তবু সে যে হবে তব বরণীয়, আঁখির আলো।
তারে ভালবাসি বলি' প্রিয়তমে তোমারে এতটা বেসেছি ভালো॥

শ্রীকালিদাস রায়।

সই।

১

ফাল্গুনের প্রাতঃকাল। রামচন্দ্রপুরের বালুদহের উত্তর পাড়ে কয়েকটি বালক রৌদ্র পোহাইতেছিল। পাল্কী আসিবার শব্দে তাহারা চাহিয়া দেখিল, বর-কনের পাল্কী নয়,দারোগা-জমাদারেরও নয়; সঙ্গে লাল পাগড়ীওয়ালা হিন্দুস্থানী আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পুলিসের চাপরাশ নাই। পাল্কীর সঙ্গে এক জন দেশী লোকও আসিতেছিল; সে বলিল, "মা, এই বালুদহ। এইখানেই রামচন্দ্রপুরের সীমানা আরম্ভ।"

বেহারারা পাল্কী নামাইল। একখানি পাল্কী হইতে এক জন বিধবা স্ত্রীলোক বাহির হইলেন। আর একখানি হইতে একটি কিশোর বালক নামিয়া আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। বিধবা ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া বালুদহের ঘাটে যাইয়া মুখ-হাত ধুইলেন।

ছেলেটি বলিল, "কি সুন্দর, মা! কেমন খোলা মাঠ! সবুজ ঘাস, তক্‌তকে পরিষ্কার জল!"

মাতা ম্লান মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র।

যে স্থানে পাল্কী রাখা হইয়াছিল, তাহার কাছেই একটা বহুকালের বটগাছ ছিল। তাহার তলায় একটি সিন্দূর-মাখান ছোট ইটের বেদী—মহাকালের। জেলেরা বালুদহে জাল দিবার আগে সেই স্থানে পূজা দিত। মা ও ছেলে বটতলায় আসিয়া মহাকালকে প্রণাম করিলেন। বেদীর নীচের ধুলা লইয়া মা ছেলের মাথায় দিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমরা এইখানে ব'সে থাক। গরুর গাড়ীখানা এসে পৌছুলে হরির সঙ্গে যাবে। আমি আগে চল্‌লুম।"

"তুমি একা যাবে?"

বিধবা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্রপুরে এসে তোর মা হারিয়ে যাবে না রে বাবা!"

বালুদহের পূর্ব্ব পাড়ের তেমাথাটায় আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। সে স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একটা বড় জামের গাছ ছিল; সেটা খুঁজিতেছিলেন। তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হরি খানসামা শশব্যস্তে আসিয়া বলিল, "এই সামনের রাস্তাটা।" রমণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তোকে কে আস্‌তে বল্‌লে?"

২

রামচন্দ্রপুরের মাঝের পাড়ার একটি ছোট বাটীর পশ্চাতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই বিধবাটি দাঁড়াইয়া ছিলেন। একটি সুকুমারী বালিকা বাম হস্তে এক গোছা "চুলের কেশী" ও অন্য হাতে এক বাটি নারিকেলতৈল লইয়া যাইতেছিল। সে কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি কে গা? আমি মনে করেছিলুম, বামুন পিসী।"

"বামুন পিসী কে গা?"

"কেন, আমাদের পুরুত ঠাকুরের বোন্।"

"তা হ'ক। এ বাড়ীটা কা'দের জান?"

"কেন, আমার মামীদের; তুমি জান না; বুঝি এ গাঁয়ের নও!"

"না বাছা। তোমার মামার নামটি কি, পুঁটু?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমার নাম পুঁটি নয়, ননী।"

"বেশ নামটি। তোমার মামার নাম কি?"

বালিকা ইতস্ততঃ করিল। সে কখনও অতবড় লোকটার নাম ধরে নাই। বলিল, "ওঁরা ঘোস। ওঁকে সকলে কর্ত্তামশায় বলে।"

"কেদার ঘোষ?"

"হাঁ, তুমি ত সব জান দেখছি। আমি মামীমা'র কাছে চুল বাঁধতে যাচ্ছি। তবে বামুনদের বিনীকেও ডেকে নিয়ে যেতে হবে। তুমি যদি একটু দাঁড়াও, এসে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা।"

৩

কেদার ঘোষের বয়স ষাট বৎসরের কম নহে। তাঁহার গৃহিণীও পাঁচের কোঠায়। ঘোষজা মহাশয় উঠানে বাঁধা

একটা কাল গবীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছিলেন। গৃহিণী খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া বলিলেন, "শরৎ ধাড়ার বউ, বোধ হয়, বাঁচবে না। মাথা চাল্‌ছে দেখে এলুম।"

"হাঁ। ব্যারামটা শক্ত।"

"বল্‌লে ডাক্তার এখনি আস্‌বে। তুমি একবার যাও। কটা টাকাও চাচ্ছিল।"

"যাচ্ছি। তুমি ছিলে না ব'লে দেরী হ'ল।"

"আমি ওদের বাড়ীই গেছলুম। ছোঁড়াটাকে দেখছি, দুটো অপগণ্ড শিশু নিয়ে ভাস্‌তে হবে।"

"ভগবানের ইচ্ছা" বলিয়া কেদার ঘোষ বাহির হইলেন।

"দাদা কোথায়, দিদি?" এই কথা মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"এই শরৎ ধাড়ার বাড়ী গেলেন। তুমি যে এত সকালে?"

"কাল রাত্রিতে শ্যামাচরণ এসে খবর দিলে, তারা আবার মত করেছে। আজ গায়ে হলুদ পাঠাবে। এই লগ্নেই হবে।"

"তোমার দাদার সঙ্গে কাল রাত্রিতে এই কথাই হচ্ছিল। তিনি বলেন, ওরা লোক ভাল নয়। কথার ঠিক নাই। কেবল দৌড়ে মুসে নেবার চেষ্টা।

"জানি, দিদি। কপাল! কি কর্‌ব বল?"

"অমন সুন্দরী মেয়ে! আর বিয়ের বয়সও কিছু পার হয়ে যায় নি। এই ত সবে ন'বছরে পড়েছে। তা তুমি যে বড় তাড়াতাড়ি কর্‌লে, ভাই!"

"জান ত, দিদি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। একটা আপনার বল্‌তে কেউ নাই যে, হঠাৎ কিছু হ'লে—"

"ও কি কথা, ভাই! অসুখ কি আর কারও হয় না!"

"সত্যি বল দেখি, দিদি, দাদা কি বলেন?"

ঘোষ-গিন্নী কথাটা ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "ছেলেটি কিন্তু ভাল; তবে বাপটা বড় বজ্জাৎ। জমীদারের নায়েব, আর তোমার ও শ্যামাচরণটিও বড় সোজা পাত্র নয়। শুন্‌লুম, এই বিয়েটা লাগিয়ে দিয়ে একটা গোমস্তাগিরি বাগাবার চেষ্টায় আছে।"

"সব জানি, দিদি। কিন্তু মেয়েটার একটা গতি হয়। আমার যে ব্যারাম, হঠাৎ মারা যেতে পারি।"

"বাড়ীর কথা শেষ কি মিটল?"

"দিন, লগ্ন ত সব স্থির হয়ে গিছল। ঐ কথা নিয়েই ত যত গোল। নায়েব আর শ্যামাচরণ পাকা দেখার পর আমাকে ফোস্‌লাচ্ছিল যে, বাড়ীটা লিখে দেওয়া হ'ক। দাদাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্‌লেন, কিছুতেই নয়। আমি কি ওঁর অমতে কায কর্‌তে পারি? তখন তারা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে গিছল। কাল রাত্রিতে আবার শ্যামাচরণ এসে বল্‌ছে, মত হয়েছে। এই লগ্নেই বিয়ে হবে। আজ সকালে গায়ে হলুদ পাঠাবে।"

"তাই হয়ে যাক। অমন সুলক্ষণা মেয়ে! ঈশ্বর ওর ভালই কর্‌বেন!"

"আশীর্ব্বাদ কর, দিদি! তুমি যেন আজ আর রাঁধাবাড়ার হাঙ্গাম ক'র না। ঠাকুরঘরের পাট সেরে দিয়েই ও বাড়ীতে যেও। সবই ত তোমায় কর্‌তে হবে। এয়োস্ত্রীর কায এ পোড়াকপালী হ'তে ত আর কিছু হবে না!"

"আচ্ছা। তিনি আসুন; আমি যাচ্ছি।"

"আমি এখন যাই, দিদি।"

"এস।"

৪

ঘোষ-গৃহিণী শ্রীধরমন্দিরের পাট সারিয়া ঘরে তালা লাগাইতেছিলেন। উঠানে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া এক অপরিচিতাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ গা?"

"চিন্‌তে পার্‌ছ না, বৌ? দাদা কোথায়?"

বৌ কিছুক্ষণ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাদের—"

বিধবা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এতই পর হয়ে গেছি, দিদি, যে নামটাও মুখে এল না!" ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি লইবার জন্য তিনি নত হইতেছিলেন। বৌ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুই জনের চক্ষু উথলিয়া জল ছুটিতেছিল।

ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। পল্লীবালা সুরমা সৌন্দর্য্য ও বংশমর্য্যাদার গৌরবে কলিকাতার কোন বিখ্যাত জমীদারবংশের বধূ হইয়া রামচন্দ্রপুর ত্যাগ করিয়াছিল। বিবাহের সর্ত্ত ছিল যে, সামান্য পল্লী-গৃহস্থের বাটীতে রাজার বধূ কখনও আসিবার নামও করিতে পারিবে না।

কিশোরী সুরমা যে দিন বিসর্জ্জিতা সীতার মত রামচন্দ্রপুর ত্যাগ করেন, তাঁহার দাদার সে দিনের আকুল দৃষ্টি, ভ্রাতৃবধূর করুণ ক্রন্দন, এখনও তেমনই তাহার মনে রহিয়াছে। মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন কেদার ঘোষ কিন্তু এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একবারও ভগিনী সুরমার বাটীতে পদার্পণ করেন নাই।

বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে সুরমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখন তিনিই কর্ত্রী। জন্মভূমির আকর্ষণ আজ তাঁহাকে সপুত্র রামচন্দ্রপুরে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন!

বালুদহের অর্দ্ধেকটা কচুরি পানায় ভরিয়া গিয়াছে। জানাদের জাজল্যমান সংসারের এখন একটিমাত্র 'বংশধর নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ সলিতাটির মত মিটি মিটি জ্বলিতেছে। মুখুয্যেদের কালীবাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই; চাটুয্যেদের ভিটের সাক্ষিস্বরূপ একটা মাটীর ঢিবি লতাগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

আসিবার সময় সুরমা তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষটির, প্রতি বাটীটির খোঁজ করিতে করিতে আসিয়াছেন। যে জামের গাছটি হইতে তাঁহার সইয়ের সঙ্গে ঘুমন্ত মধ্যাহ্নে জাম পাড়িতে যাইতেন, দহের যে ঘাটটিতে স্নানকালে দাপাদাপি করিয়া বর্ষীয়সীগণকে বিরক্ত করিতেন—বৌদিদির নিকট বকুনির সঙ্গে চড়টা-চাপড়টাও খাইতেন, যে জানাদের বাড়ী সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার, কৈলাস জানাকে গাই দুইতে ডাকিবার অছিলায়—বেড়াইয়া আসিতেন, আজ সেই সকল পরিচিত স্থানের খোঁজ লইয়া তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, এখন তাহার ছায়ামাত্র তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই।

৫

তাঁহাদের ত্রিশ বৎসরের জমা কথা ত শীঘ্র ফুরাইবার নহে।

"মামীমা" বলিয়া ডাকিয়াই ননী আবার বলিল, "এই যে গো, তুমি আপনিই এসেছ! আমি আবার তোমায় খুঁজে এলুম!"

"হাঁ, মা। তোমার দেরি দেখে আমি নিজেই এলুম। মেয়েটি কে বৌ?"

"মনে আছে তোমার, আমাদের সেই উর্ম্মিলাকে? তারই মেয়ে।"

"বেশ! সে যে আমার সই।"

"মামীমা, আমার চুলটা শীগগির বেঁধে দাও। আর মা তোমাকে দেরি কর্‌তে বারণ করেছে।"

"তোর নিজের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছিস্! বেশ ত!"

"যাও!"

সুরমা বলিলেন, "বিয়ে!"

"হাঁ, কাল ওর বিয়ে। আজ গায়ে হলুদ।"

ঘোষ-গৃহিণী ননীর চুল বাঁধিতে বসিলেন। বাহিরে পাল্কী ও লোকজনের শব্দ হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কারা আস্‌ছে!"

সুরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "জমীদারের ছেলে আস্‌ছেন।"

"কে?"

"তোমারই বাড়ী আস্‌ছে গো! জমীদারের ছেলে; বুঝতে পারছ না!"

আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘোষ-গৃহিণী বলিলেন, "বাছাকেও সঙ্গে এনেছ! এতক্ষণ বলনি!"

তের বছরের অমরকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন, "মামীমা; প্রণাম কর, বাবা।" অমর মামীর পদধূলি লইয়া ননীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এটি কে, মা?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আমার সইয়ের মেয়ে। দু' দিন আগে এলে বৌ ক'রে ফেল্‌তুম।"

অমর বলিল, "দূর!" কিন্তু তাহার দৃষ্টি লাবণ্যলতার মুখের উপর পড়িল। সে লজ্জায় মুখ নামাইল, কিন্তু তাহার অধরে হাসির রেখা।

সুরমা ভ্রাতৃজায়ার মুখে চাহিয়া বলিলেন, "সত্য বৌ। ছেলেবেলায় সইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম।"

৬

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই উর্ম্মিলা শুকাইয়া যাইতেছিলেন। হৃদ্‌রোগ তাঁহার জীবনী-শক্তিকে সাত বৎসর ধরিয়া শুষিয়া এখন নিঃশেষপ্রায় করিয়া আনিয়াছে। মেয়েটির বিবাহ দিয়া তিনি একেবারে ছুটী লইতে চাহেন।

আজ লাবণ্যাকে ঘোষগৃহিণীর কাছে পাঠাইয়া তিনি একবার শুইবার ঘরখানিতে ঢুকিয়াছিলেন, স্বামীর ছবির দিকে চাহিয়া কন্যার শুভকামনা করিতেছিলেন। হঠাৎ বুকের যন্ত্রণাটা এত বাড়িয়া উঠিল যে, আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ঘরের মেঝেয় শুইয়া পড়িলেন। কে যেন ডাকিল, "সই !"

স্বপ্ন ! না, মৃত্যুকালে পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে। কবে কোন্ বাল্যকালে উর্ম্মিলা কাহার "সই" ডাক শুনিতেন, আর আজ কত কাল পরে !

সুরমা তাঁহাকে ঠেলিয়া বলিলেন, "এ কি, সই ! মাটীতে প'ড়ে কেন ?"

স্বপ্নোত্থিতার মত উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার মুখের উপর বিহ্বল দৃষ্টি বিন্যস্ত করিল।

"চিন্‌তে পার্‌ছ না ? কি হয়ে গেছ, সই !"

"তুমি ! চিনেছি, সই।" তাঁহার কৃশ অঙ্গটি সইএর দেহে মিশাইয়া গেল।

কত কথা ! সে কথার শেষ নাই।

উর্ম্মিলা বলিলেন, "বড় ভাগ্যে এসেছ, সই। তুমি রাণী হয়েছিলে। তিনি মরণকালে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'লে গিছলেন, 'আমার নিজের বল্‌তে কেউ নাই। কিন্তু তোমার ভাবনাও নাই। বিপদে আপদে কেদার দাদার শরণ নিও। আর তোমার সই ত রাণী হয়েছেন, তবে তিনি পরাধীনা।' কেদার দাদার স্নেহের আশ্রয়ে আমি আমার স্বামীর ভিটেয় এতদিন নির্ভয়ে বাস ক'রে এসেছি। এখন ননীর বিয়ে দিয়েই আমার ছুটী। কিন্তু, সই, আজ যেন আর শরীর চলে না, সব ধোঁয়া দেখছি। হরি তোমাকে বড় সময়েই পাঠিয়েছেন ! তুমি আজ সব ভার নাও, সই !"

অতি স্নেহে উর্ম্মিলার গলাটি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরমা বলিলেন, "ননীর বিয়ের ভার, সব ভার, আমি নিলাম, সই। তুমি নিশ্চিন্ত হও।" তাঁহার মুখ দিয়া অস্পষ্ট স্বরে বাহির হইয়া গেল, "যদি দু' দিন আগে আসতাম !"

৭

বিবাহ সভায় কেদার ঘোষ কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। অন্দর-মহলের ভার সুরমা লইয়াছেন। উর্ম্মিলা রোয়াকের উপর দেওয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার শ্বাসকষ্টটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে; সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাহার উপর সমস্ত দিন উপবাস।

বর আসিয়াছে। কয়েক জন কন্যাযাত্রী কি যুক্তি আঁটিতেছিল। তাহারা বর-কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিল, "নায়েব মশাই, আপনার অজ্ঞাত নাই, আমাদের বারোয়ারিটা—"

"অবশ্য। কিন্তু এখানে কন্যাপক্ষই সমস্ত ভার নিয়েছেন।"

"বেশ ত। তাতে আর আমাদের আপত্তি কি ! পেলেই হ'ল। তা হ'লে—"

নায়েব বলিলেন, "শ্যামাচরণ, তা হ'লে এটা মিটিয়ে দিলেই ভাল হয় না ?"

"আজ্ঞে, আমি আর এখন কেউ নই, মশায়। কেদার ঘোষ হচ্ছেন কর্ত্তা। আর কে এক জন সই এসে অন্দর দখল ক'রে বসেছেন।"

"সে কি হে ? তুমি হ'লে ভাই—"

"না, মশায়, সে অসময়ে বটে। এখন কোথাকার কে জ্ঞাতি-ভাই তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু আপনি ত জানেন, এই শর্ম্মা কত কষ্টে এই যোগাযোগ করেছেন। যাই হ'ক, ঘোষজাকে ডেকে দিচ্ছি। মিটে যাবে।"

বারোয়ারির কথাটা কিন্তু সহজে মিটিল না। পাণ্ডারা ধরিয়া বসিল ১২৫৲ টাকা দিতে হইবে। এ গ্রামে ২৫৲ টাকার বেশী বারোয়ারি কেহ কখন দেয় নাই। আর যে স্থানেই কন্যাপক্ষের উপর ভার হইয়াছে, সেই স্থানেই কস্মিনকালে ৫৲ টাকার বেশী আদায় হয় নাই। ক্রমে বচসা বাধিয়া গেল।

প্রধান পাণ্ডা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ভয় দেখাইয়া বলিল, "সব কথা প্রকাশ ক'রে দেব। গ্রামের লোক বলেও বটে, অবীরা বিধবা বলেও বটে, এ কথা প্রকাশ করিনি। কিন্তু কেদার বাবু, বলুন দেখি, চারু মিত্র বিলেত গিয়েছিল কি না ?"

নায়েব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশের কথা ! শ্যামাচরণ, তুমি ত এ কথা জানাও নি !"

নানা প্রকার আস্ফালন ও তর্ক-বিতর্কের পর নায়েব বলিলেন, "লগ্ন ভষ্ম মহাপাপ। বিবাহ দেওয়াই উচিত।

তবে বারোয়ারির দাবি ১২৫৲ টাকা দেওয়া চাই। আর বেয়ানের বাড়ীখানি এখনই জামাইকে দানপত্র লিখে দিন।"

৮

"কি হবে, সই ?"

"আমি যখন ভার নিয়েছি, তোমার ভাবনা কি, সই! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

শ্যামাচরণ বাহিরে আসিয়া বলিল, "বারোয়ারির ৫৲ টাকার এক পয়সা বেশী দেবার মত নাই। আর বাড়ী একেবারেই লিখে দেওয়া হবে না।"

নায়েব বলিলেন, "কি ?"

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, "মেয়েমানুষের এত স্পর্দ্ধা! কার তেজে সে এত তেজ কর্‌ছে, একবার দেখে নেব! ওহে, তোমরা কেউ এখানে জলগ্রহণ করো না। আজ থেকে চারু মিত্রের বিধবাকে 'একঘরে' করা হ'ল।"

"আমিও বর উঠিয়ে নিয়ে চল্লুম।"

তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। প্রথম লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় লগ্নও ভস্ম হয় হয়। সেই জন্যই, বোধ হয়, নায়েব মুখে বলিলেও তখনই বর উঠাইয়া লইয়া গিয়া বিধবার জাতিপাত করিয়া পাপসঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে শ্যামাচরণের সহিত 'ফিস্ ফিস্' করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এক জন ঝি আসিয়া বলিল, "মাঠাকরুণ আপনাকে একবার গা তুল্‌তে বল্‌ছেন। বাড়ীর ভিতরে চলুন।"

"অবশ্য। বেয়ানের সঙ্গেই আমার কথাবার্ত্তা হওয়া ঠিক। শ্যামাচরণ, তুমি এস। আর চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনিও আসুন। অন্যে নিজেকে যত বড়ই মনে করুক, কে না জানে যে, আপনিই এ গ্রামের মাথা ?"

সশ্যামাচরণ ও সচক্রবর্ত্তী নায়েবের বিপুল উদরখানি উর্ম্মিলার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

ঘরের ভিতর হইতে সুরমা বলিলেন, "এ সময়ে আপনারা অনাথার প্রতি অবিচার কর্‌ছেন কেন ?"

"আমরা আর অবিচার কি কর্‌ছি ?"

"বারোয়ারিতে এ গাঁয়ে চিরকাল ৫৲ টাকা দেওয়া হয়—"

"আরে, চারু মিত্র যে বিলেত গিয়েছিল, সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে কেন ?"

"সে কথা ত আপনারা সকলেই জানেন, নায়েব মহাশয়ও ত জানেন।"

"আরে, নাও কথা! চারু মিত্র কবে ত্রিশ বছর আগে, আপকারদের জাহাজের ডাক্তার হয়ে তিন মাসের জন্য একবার মাত্র বিলেত গিয়েছিল, তা কি আমি খাতায় লিখে রেখেছি ?"

"কেন, পাকা দেখার পর শ্যামাচরণ আর আপনি এই স্থানেই স্থির কর্‌লেন যে, বিলেত-ফেরৎ দোষের জন্যে আরও ৫০০৲ টাকা ধ'রে দিতে হবে।"

"দেখ বাপু, ও সব মেয়েলি কথা চল্‌বে না। যদি সত্য বিয়ে দিতে চাও, তা হ'লে বারোয়ারির ১২৫৲ টাকা আর বাড়ীখানি—"

"যদি না দেওয়া হয় ?"

"তা হ'লে বিয়েও না দেওয়া হবে।"

"আচ্ছা, আপনারা একটু সময় দিন। একটু পরামর্শ ক'রে দেখি—"

"অবশ্য। কিন্তু রাত্রি অধিক হয়ে যাচ্ছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিল, "আর শাস্ত্রবাক্য, শুভস্য শীঘ্রং।"

বাহিরে যাইতে যাইতে নায়েব বলিলেন, "শ্যামাচরণ, কথা কচ্ছিল কে হে ?"

"উনিই সই, মশায়।"

"খেলোয়াড় বটে!"

চক্রবর্ত্তী বলিল, "কিন্তু কুঁদের মুখে বাঁক থাক্‌বে না।"

৯

"কি হবে, সই ?"

"কিচ্ছু হবে না। তোর মনে আছে, উর্ম্মি, ছেলেবেলায় আমরা বেয়ান বেয়ান খেল্‌তুম? সত্যিই আমার বেয়ান হবি ?"

উর্ম্মিলার বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি হাত দুইটা দিয়া সুরমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিলেন। সুরমা তাঁহার সবল হস্তে সইয়ের ক্ষীণ হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "করিস্ কি ? তুইই ত আমাকে রত্ন দিচ্ছিস।"

সুরমা ভাণ্ডারে যাইয়া বলিলেন, "বৌ, দাদা কোথায় ?"

"এই ঘরের কোণেই মাথায় হাত দিয়ে ঐ ব'সে আছেন।"

সুরমা দাদাকে বলিলেন, "একবার আমার সরকারকে ওবাড়ী থেকে ডেকে দিতে পার? আর অমরকেও নিয়ে এস।"

"তা' দিচ্ছি। কিন্তু কাল কি ক'রে মুখ দেখাব, বোন্! মান রক্ষা হ'ল না ত!"

"ভাবনা নাই, দাদা। আজ রাত্রেই ননীর বিয়ে দেব।"

"কি ক'রে দেবে, বোন্। অপাত্রে দিতে পারব না!"

"না, তুমি তাদের পাঠিয়ে দাও গে।"

১০

"অমর, এই মেয়েটিকে বিয়ে করবি, বাবা?"

অমর তখন খালি গায়ে মা'র পাশে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল। ঘুমের ঘোরে কথাটা না বুঝিয়া বলিল, "বিয়ে হয়ে গেছে, মা?"

তাহার মামী ভাণ্ডারের জানালায় দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কথা শুনিতেছিলেন; বলিয়া উঠিলেন, "বাছা যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে গা। একখানা লালপেড়ে কাপড় পাঠিয়ে দাও না।" কে এক জন শাঁক বাজাইল।

কেদার ঘোষ অনেকক্ষণ পরে অকূল-সমুদ্রের কূল দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সুরমা বলিলেন, "দাদা, তুমি বাইরে গিয়ে ব'স। ঘণ্টাখানেক পরে লোকগুলির পাত ক'রে দিও।" সরকারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "জমাদার যেন দরওয়ানদের নিয়ে দেউড়িতে হাজির থাকে। যেন না খেয়ে জনপ্রাণী বেরিয়ে যেতে না পারে।"

নায়েব সভায় আসিয়া আবার জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন; শাঁকের শব্দ শুনিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। চক্রবর্ত্তী বলিল, "আর কি? স্ত্রী-আচারের যোগাড় হচ্ছে। জানি, শিমুল গাছ তেল হয়ে যাবে।" শ্যামাচরণ বলিল, "কেদার ঘোষের বড় দেমাক। কিন্তু মধুসূদন দর্পহারী।"

আবার চুপ্‌চাপ্। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী উভয় পক্ষের নাড়ী জ্বলিতেছিল। ছেলেগুলি ঢুলিয়া ঢুলিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছিল। বাজ্‌করেরা বলাবলি করিতেছিল, "ভদ্রলোকের বিয়েতে ত এত ঘোঁট হয় না।" নায়েব প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতেছিলেন, এই বর উঠাইতে আইসে। চক্রবর্ত্তী বলিল, "এ লগ্নও ত প্রায় শেষ হয়ে এল। বোধ হয়, শেষ লগ্নেই হ'বে।"

সুরমা সভায় আসিয়া বলিলেন, "নায়েব মশায়, আপনাদের একটু জলযোগ --"

"কিন্তু বিয়ের কথা,—"

"সে ত আপনারাই ভেঙ্গে দিয়েছেন—"

"কি; আমার সঙ্গে রহস্য। ও সব—"

চক্রবর্ত্তী নায়েবের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছিল, "উনি যে সই, মশায়।" কিন্তু তাহাদের কথা শেষ হইবার আগেই কোমরে গামছা বাঁধা, হরিচরণ খানসামার মূর্ত্তি দেখিয়া নায়েব কেমন ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। জমীদারবাড়ীর খানসামা এখানে কেন? সরকার হাঁকিয়া বলিল, "বেয়াদব—"

অমর তখন বাসরে ঢুকিতেছিল; ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, গাঁটছড়া বাঁধা ছোট ফুট্‌ফুটে কনেটিকে তাহার পেছনে পেছনে ছুটিতে হইতেছে।

নায়েব ষাঁড়ের মত মোটাগলায় চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, "কি! আমি মহিষখণ্ডের নায়েব, আমার অপমান! এ গাঁ'কে দ' ক'রে ছাড়ব—"

সরকার বলিতেছিল, "আরে থাম্ থাম্। যেমন মানুষ তেম্‌নি—"

যেখানে সুরমাকে ঘেরিয়া ভিড়টা জমিয়া গিয়াছিল, সবল হস্তে পথ করিয়া অমর তাহার ভিতর মা'র পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঁটছড়ার টানের চোটে লাবণ্যকেও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। হরিচরণ তখন চেঁচাইয়া বলিল, "ঐ রাজা এয়েছেন। যদি বাঁচবি ত এখনও বৌরাণীর পায়ে মাথা ঠেকা—" করিম বক্স জমাদারের বিপুল দাড়িটাও সদর দরজা হইতে উঁকি মারিতেছিল।

১১

তাহার পর? সকাল হয় হয় হইয়াছে, নায়েব বেশ শান্ত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফূর্ত্তির সহিত হাঁক-ডাক করিয়া পরিবেশন করিতেছেন। হরি খানসামা কোমর বাঁধিয়া ধামা-ধামা লুচি আনিয়া

তাহার হাতে দিতেছে। কেদার ঘোষ এক পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। সুরমা, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ আর ঊর্ম্মিলা মাঝের দরজাটার আড়ালে দাঁড়াইয়া বাগ্মকর প্রভৃতির খাওয়া দেখিতেছিলেন।

উর্ম্মিলার বুকের ব্যথাটা এখন বুঝি আর নাই। তাঁহার মুখে তৃপ্তির হাসি। তিনি সুরমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "কিন্তু সই, ভদ্রলোকদের ত এখনও খাওয়া হ'ল না—"

"আরে,ভদ্রলোকদের মধ্যে ত নায়েব আমার কর্ম্মচারী। আর চক্রবর্ত্তী—ও আমার প্রজাও বটে, আর কন্যাযাত্রী হিসাবে, কর্ম্মকর্ত্তাও বটে। তুই ত বিলেত-ফেরতের স্ত্রী ব'লে 'একঘরে' হয়ে গেছিস্। ভদ্রসমাজ আর তোকে দয়া-মায়া করবে না। তারা যাদের ইতর বলে, যদি দয়ামায়া থাকে ত তাদের মধ্যেই আছে। তাদের ধরেই তোকে থাক্‌তে হবে।"

তখন সকলে নায়েবের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিল।

এই সময়ে শ্যামাচরণ আসিয়া ঊর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "দিদি, একেই বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

বামুনদের সুকুমার পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার।

হিমালয় অভিযানের কয়েকটি দৃশ্য।
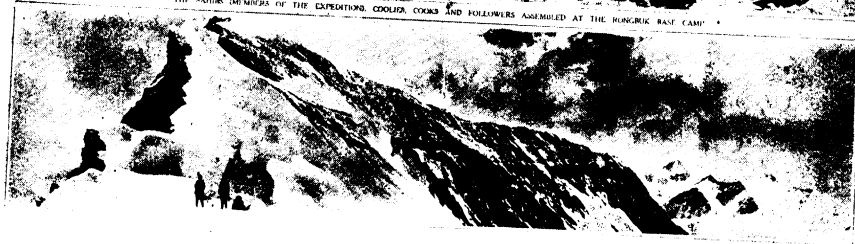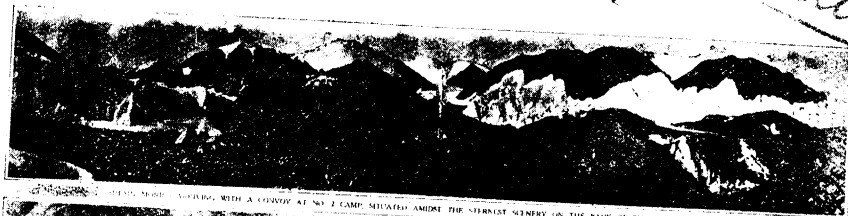
(১) পূর্ব্ব রংবক্ তুষার নদীর তীরের দৃশ্য।
(২) হিমালয় অভিযানকারী য়ুরোপীয় ও দেশীয় কুলী প্রভৃতির চিত্র।
(৩) এভারেষ্ট চূড়ায় পৌঁছিবার তুষার নদীর দৃশ্য। এই পথে অভিযানকারীরা আরোহণ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন।

১। কর্ম্মে ঔদাসীন্য অনুচিত।

অনেকের ধারণা যে, বেদান্ত আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন যে, জগৎ মিথ্যা। এটি ভুল ধারণা। যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জগৎ মিথ্যা, অপরের পক্ষে নহে। মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা নাই।

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বৎ এব ইদং প্রমাণং তু আ নিশ্চয়াৎ॥

দেহাত্মজ্ঞান ভ্রম হইলেও যেরূপ বৈদিক ব্যবহারের অঙ্গ, লৌকিক জ্ঞানও সেইরূপ আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সত্য বলিয়া গণ্য। আত্মার বিষয় পড়িলে বা শুনিলে আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় না। আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মজ্ঞ বলা যায়। অতএব জাগতিক ব্যবহারে শিথিল হওয়া উচিত নহে। পরন্তু ব্যবহারই জ্ঞানের হেতু বা সাধন। গুরু ও শাস্ত্ররূপ দ্বৈত ছাড়া অদ্বৈত জ্ঞান হয় না। আচার্য্যগণের মতে

"কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততঃ জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে"

জ্ঞান পাপক্ষয় হইলে হয়, কর্ম্ম দ্বারা "কষায়" কুসংস্কার "পক্ক" ক্ষীণ হয়। পাপক্ষয় কর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব সাধারণ পক্ষে কর্ম্মে ঔদাসীন্য না হইয়া কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। সাধারণ লোক কর্ম্ম করিবেই, ভগবানের মতে মুক্ত পুরুষেরও কর্ম্ম করা উচিত,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

মূর্খ যেরূপ ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করে, বিদ্বান্ সেইরূপ ভোগে অনাসক্ত হইয়া লোকরক্ষাচিকীর্ষু হইয়া কর্ম্ম করিবে।

২। জগদ্ধাত্রীর কর্ম্মে শক্তি নিয়োগ।

জীবের ভুক্তি-মুক্তির জন্য মহামায়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিতিকালে তিনি এই জগৎ পালন করিতেছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ আত্মসাক্ষাৎকারের পর জগদ্ধাত্রীর সেই পালনকার্য্যে নিজশক্তি অর্থাৎ স্বকীয় স্থূল-দেহের ও সূক্ষ্ম-দেহের শক্তি নিয়োজিত করেন। মহামায়া যেমন জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য সতত ব্যস্ত

সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা

জীবন্মুক্ত পুরুষও সেইরূপ নিজশক্তি অনুযায়ী ব্যস্ত হয়েন। জগজ্জননীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও কল্যাণ-কামনায় পূর্ণ হয়। মহামায়ার যেরূপ জীবের কল্যাণে নিজের স্বার্থ নাই, সেইরূপ তিনিও নিঃস্বার্থভাবে জীবের কল্যাণ কামনা করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজ দেহে অভিমান নাই, অতএব তাঁহার কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ভগবানের দর্শন হ'লে মায়া থাকে না, দয়া থাকে।" জীবন্মুক্ত পুরুষের হৃদয় বিশাল হইয়া যায়। তাহাতে অপার দয়া আইসে। তখন দুই একটি নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রিয়জনের প্রতি কেবল ভালবাসা থাকে না; সমগ্র দেশবাসীর উপর,—সমগ্র পৃথিবীর উপর—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উপর ভালবাসা পড়ে। সে ভালবাসায় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নাই। সে ভালবাসা দেশকাল ভেদ করিয়া যায়। সে ভালবাসা অতীত আত্মাগণের উপর পড়ে। কিসে জীবের কল্যাণ হইবে, এই জন্য তাঁহার হৃদয় ছট্‌ফট্ করে। জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজস্ব কিছুই থাকে না, দেহের শক্তি—মস্তিষ্কের শক্তি হৃদয়ের শক্তি তিনি জগদ্ধাত্রীর পালন-কার্য্যে নিবেদন করেন। তাঁহার বেশ বোধ হয়, জগৎ জগদ্ধাত্রীর, জীব তাঁহার সন্তান, তিনি নিজ সন্তানগণকে লালন করিতেছেন।

৩। জগদ্ধাত্রীর পূজা কি।

জগজ্জননীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়।

অমায়মনহঙ্কার অরাগমমদন্তথা
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষমক্ষোভন্তথা
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রোষশূন্যতা, মদহীনতা, দম্ভশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরাহিত্য, মাৎসর্য্যহীনতা,

নির্লোভতা,—এই দশটি পুষ্প মা'র শ্রীপাদপদ্মে দিতে হয়।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্॥

তাহার পর পরম পুষ্প অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান, এই পঞ্চপুষ্প নিবেদন করিতে হয়।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য উপহার দিতে হয়।

গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাৎ বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদেৎ পরমাত্মনে॥

গন্ধ পৃথ্বীতত্ত্ব, পুষ্প আকাশতত্ত্ব, ধূপ বায়ুতত্ত্ব, দীপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্য তোয়তত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিতে হয়। আর বিঘ্নকারক কাম-ক্রোধের বলি দিতে হয়।

"কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ॥"

কাম, ক্রোধ দুইটি সকল সৎকার্য্যের বিঘ্ন সম্পাদন করে, সেই জন্য এই দুইটিকে প্রথমে বলি দিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্।"

সাধনামার্গে এই মহাপাপকে বৈরী বলিয়া জানিবে।

পঞ্চোপচারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এইগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আরম্ভক। অর্থাৎ মহামায়ার পাদপদ্মে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ নিবেদন করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচং অদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নাতিমানিতা, এই-গুলি দৈবী সম্পদ্।

পূর্ব্বোক্ত দশটি পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এইগুলি দৈবী সম্পদ্। ভগবদ্গীতাতে দৈবী সম্পদ্ বিশেষ-রূপে বিবৃত আছে।

পাঁচটি পরম পুষ্পের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, এগুলি মোক্ষসাধক।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চতত্ত্বও উপহার দিতে হয়। পঞ্চতত্ত্বগুলি পঞ্চভূতের অনুকল্পমাত্র।

"আদ্যং তত্ত্বং বিদ্ধি তেজঃ দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
আপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবী শিবে।
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়ৎ বিদ্ধি বরাননে॥"

আদ্যতত্ত্ব অর্থাৎ তেজকে মদ্য বলিয়া জানিবে, দ্বিতীয়তত্ত্ব পবনকে মাংস বলিয়া জানিবে, তৃতীয়তত্ত্ব জলকে মৎস্য বলিয়া জানিবে, চতুর্থতত্ত্ব পৃথিবীকে মুদ্রা বলিয়া জানিবে, আর পঞ্চমতত্ত্ব আকাশকে মৈথুন বলিয়া জানিবে।

সিদ্ধপুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বা দৈবী সম্পদ্গুলি নিজের কোন প্রয়োজনে লাগে না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"আমি ভবের হাটে, দেহ বেচে দুর্গানাম এনেছি কিনে।"

তিনি এইগুলি মা'র শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন ও বলেন,"মা, এগুলি তোমার; এগুলি তোমার কাযে লাগিয়ে দাও। তুমি জীবের ভুক্তি-মুক্তির জন্য এই বিশ্ব রচনা করি-য়াছ, তোমার পালন কাযে এগুলি লাগিয়ে দাও।" তিনি নিজের ভোগ, মোক্ষও মা'র শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "মা, এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" অজ্ঞান অর্থাৎ ভোগ, জ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষ অর্থাৎ এই নাও তোমার ভোগ, এই নাও তোমার মোক্ষ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

৪। নির্ব্বাণমুক্তি তুচ্ছ হইয়া যায়।

তখন তিনি বিশ্ব এক নূতন দৃষ্টিতে দেখেন। সংসার অবস্থায় যে বিশ্ব অতি দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণাময় বোধ হইত, সেই বিশ্বে আর নিজের সুখ-দুঃখ খুঁজিয়া পায়েন না। তখন "সর্ব্বাঃ সুখময়াঃ দিশঃ" তাঁহার সকল দিক্ সুখময় হইয়া উঠে; এই বিশ্ব লীলাময়ের লীলাক্ষেত্র, কুমারীর ক্রীড়নক দেখেন। "কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়" তখন তিনি স্বেচ্ছায় মা'র চরণাশ্রিত দাস হইয়া যায়েন। শ্রীহনুমান্ যেমন শ্রীরাম-চন্দ্রের লীলার সহায়, সেইরূপ তিনি জগদ্ধাত্রীর দাসানুদাস হইয়া যায়েন। তখন তাঁহার নিজের নির্ব্বাণমুক্তি বা ভূমানন্দ

অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তিনি শিবলোক বা বিষ্ণু-লোকের সুখভোগ প্রার্থনা করেন না। সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সব ভাসিয়া যায়। মর্ত্ত্যে হউক, স্বর্গে হউক, আর রসাতলে হউক, যেখানে মা রাখেন, সেইস্থানে থাকিয়া জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য তিনি সাহায্য করেন।

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥"

দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বের ঈশ—বিশ্বের আত্মা প্রীত হয়েন, কারণ, বিশ্ব তাঁহার আশ্রিত।

৫। মুক্তপুরুষের কর্ম্ম।

সংসার ও মুমুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভোগ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। মুক্তাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কারণ, যাহা পাইবার, সে ত লাভ হইয়া গিয়াছে।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ কিছু ত হইতে পারে না। মুক্তাবস্থায় কর্ম্ম শুধু জীবের প্রতি করুণা-প্রণোদিত হইয়া করা। অনেকের ধারণা, মুক্তপুরুষ কেবল ঈশ্বরের নামে কাঁদিবে, নহে ত দিনরাত্রি ঘরে খিল দিয়া বা পাহাড়ে কি জঙ্গলে ধ্যান করিবে। ঈশ্বরের নামে কান্না ধ্যান, সে ত অনেক হইয়া গিয়াছে। ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতার বৃদ্ধিই মুক্তপুরুষের ঠিক ঠিক অবস্থা নহে। জগন্মাতার কার্য্যে দেহ মন বুদ্ধি প্রযুক্ত করা আরও উচ্চ আদর্শ। মনে করিলেই দেহ মন বুদ্ধি মা'র কাযে লাগাইয়া দেওয়া যায় না।

পবিত্র জিনিষ ছাড়া মা'র কাযে লাগে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,—"দাগী ফলে মা'র পূজা হয় না।" নিত্যপূজাতে দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণকেও আগে নানা পবিত্র দেব-দেবীকে নিজ অঙ্গে 'ন্যাস' করিয়া অর্থাৎ নিজেকে সাময়িক সেই সব দেব-দেবীর ন্যায় অতি পবিত্র ভাবিয়া তবে পূজাকর্ম্মের উপযোগী হইতে হয়। মুক্তপুরুষের দেহ পবিত্র, মন পবিত্র, বুদ্ধি পবিত্র।

অনেক সাধ্যসাধনা কষ্ট করিয়া এমন পবিত্র জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে। সেই জিনিষটাকে নির্ব্বাণ অর্থাৎ ক্ষয় করিয়া লাভ কি? সেই জিনিষটা যদি জীবের উপকারে লাগে, তদপেক্ষা মঙ্গল আর কি আছে? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,"যারা নির্ব্বাণ চায়, তারা হীনবুদ্ধি।" রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি।"

৬। কর্ম্ম কি?

যেটি ভোগ-মোক্ষের সাধক, সেটি কর্ম্ম। ভোগ-মোক্ষ স্বকীয় ও পরকীয়। স্বকীয় ভোগ-মোক্ষ ত হইয়া গিয়াছে, অতএব মুক্তপুরুষের ভোগ মোক্ষ মানে পরকীয় ভোগ-মোক্ষ। জীব নানা। জীবের বুদ্ধি নানা। অতএব জীবের ভোগবুদ্ধি নানা। আমার যেটিতে দরকার নাই, অপরের সেটিতে দরকার আছে, দেখি। আমার যেটি ভাল না লাগে, অপরের সেটি ভাল লাগে, দেখি। মুক্তপুরুষের নিজের দরকার বা ভাল লাগালাগি নাই। তাঁহার কর্ম্ম পরের জন্য, সে জন্য জগতে যাহা কিছু হইতেছে, কোনটাই তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। তাঁহার ব্রত জীবমাত্রকেই ভোগ-মোক্ষের দিকে সাহায্য করা। সে জন্য সংসারের যাবতীয় ব্যবহারে মুক্ত-পুরুষ সাহায্য করেন।

ব্যবহার নানাপ্রকার; সমাজ, পরিবার, অর্থ, রাজনীতি, শাসন, বিচার, স্বাস্থ্য, পূর্ত্ত, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি। এগুলি ভুক্তির জন্য প্রয়োজন। মুক্তপুরুষকে এ সমস্ত ব্যবহার বুঝিতে হয় ও সাহায্য করিতে হয়। সেইরূপ পারলৌকিক ভোগ ও মোক্ষ ব্যবহারেও সাহায্য করিতে হয়।

মন্বাদি মুক্তপুরুষগণের অনুশাসন-দৃষ্টে বুঝা যায়, তাঁহাদের প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখী। আচার্য্যগণের উপদেশ দেখিলেই বুঝা যায়,তাঁহাদের বুদ্ধি একদেশী নয়, সংসার, ঈশ্বর, সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, জীবের ভোগ-মোক্ষের উপর। শুধু ভোগ উপদেশ দেন নাই। শুধু মোক্ষ উপদেশও দেন নাই। এক জীবনে ভোগ মোক্ষ দুই-ই লাভ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু জীবের মেয়াদ ত আর ৫০ কি ৬০ কি ৭০ বৎসর নহে। জীব মোক্ষান্তস্থায়ী। জীব অনন্তকালস্থায়ী, জগৎও অনন্তকালস্থায়ী। মুক্তপুরুষের সম্মুখে অনন্তকালটা পড়িয়া রহিয়াছে। সে জন্য তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। তিনি পতিত দেখিলেই হস্তধারণ করেন ও তুলিতে সাহায্য করেন। এইরূপে তিনি

সর্ব্ববিষয়ে ব্যক্তিকে—জাতিকে—দেশকে—পৃথিবীকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করেন। কারণ, ইহাই তাঁহার ব্রত। ইহাই মহামায়ার আদেশ।

৭। পরহিত বড় কঠিন।

এইরূপ পতিত উদ্ধার করিতে তাঁহাকে নির্ভীক হইতে হয়। যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, সে নির্ভীক হইতে পারে না। পূর্ণ নির্ভীকতা মুক্তপুরুষ ছাড়া হইতে পারে না। সময় সময় নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েন না। কারণ, তিনি অশরীর, এ জ্ঞান তাঁহার কোনকালে লোপ হয় না। বিশেষতঃ,—

"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

মুক্তাবস্থায় গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না। আর "দুঃখসংযোগবিয়োগম্" দুঃখ সংস্পর্শমাত্রই সে দুঃখের বিয়োগ হয়। লোকনিন্দা বা লোকমান্য তাঁহার তেজ হ্রাস করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, লোকনিন্দা-সারমেয় চীৎকার। আর, তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্ম যথাযথ করিতে হয়। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইবার উপায় নাই। তিনি বুঝেন, মহামায়া তাঁহার কর্ম্মের পরিদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিতে আছে,—

"ভয়াৎ সূর্য্য"

সূর্য্য, বায়ু, বরুণ মহামায়ার চাবুকের ভয় করেন। সংসারী লোক ভাল কায করিলেও নিরহঙ্কার হইয়া করিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,—"এই মনে কর্‌ছে নিরহঙ্কার হয়ে কর্‌ছি, অমনি অহঙ্কার এসে পড়লো।" ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে তবে অহঙ্কার যায়, সে জন্য মুক্তপুরুষ নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করা জীবমুক্ত পুরুষ ছাড়া অপরের দ্বারা হইতে পারে না। অপরের সেরূপ কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই; কারণ, সে শক্তি কোথায়? মনে করিলেই শক্তি হয় না। কর্ম্ম জিনিষটা দেহ-মন-বুদ্ধি-সাপেক্ষ। মুক্তপুরুষের দেহ পবিত্র, তাঁহার হৃদয় বিশাল, তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম জিনিষ দেখিতে পায়। এ সব সাধারণে সুলভ নহে। অতএব মুক্তপুরুষের কর্ম্ম এক রকম আর সাধারণ পুরুষের কর্ম্ম অন্য রকম হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—"তিনপুরুষ পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এইটে ভেবে তবে একটা কায কর্‌তে হয়।"

৮। একঘেয়ে ভাব।

সাধক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাহায়, যার কর্ম্মের দিকে ঝোঁক, তাহার ভক্তি বা জ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকে না; সেবলিবে, জ্ঞান ও ভক্তি,ও কিছু নহে। যাহার ভক্তির দিকে ঝোঁক, সে কর্ম্মে শিথিল হয় ও জ্ঞানাভ্যাসে উদাসীন হয়। যাহার জ্ঞানের দিকে ঝোঁক, সে বলিবে, কর্ম্ম ভক্তি কিছু নহে, বিচারই আসল। সিদ্ধপুরুষে এই তিনটিই সমান ভাবে প্রবল হয়। যেমন তাঁহার ভক্তি, তেমনই তাঁহার জীবের কল্যাণ-কামনায় শক্তিপ্রয়োগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর একঘেয়ে ভাব দেখতে পার্‌তেন না।" সিদ্ধপুরুষে এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী না হইয়া বেশ মানাইয়া যায়। সিদ্ধপুরুষের ব্যবহারও কখন একঘেয়ে নহে। তাঁহার মাথা সব দিকে খেলে। কাকের একটি তারা উভয় চক্ষুতে যাতায়াত করে, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষের বুদ্ধি সর্ব্ব-বিষয়ে যাতায়াত করিতে পারে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ব্রহ্ম-ছাতের সিঁড়ি। সিদ্ধপুরুষের এই সব সিঁড়ি খুব সড়গড় হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলেই ছাতে উঠেন ও নীচে নামেন।

৯। উপদেশ ও জীবন।

পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন,—"ঠাকুরের উপদেশ শুন, আর বিবেকানের জীবন দেখ, তা' হ'লে কল্যাণ হবে।" পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীকে আদর করিয়া তিনি 'বিবেকান' বলিতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুকরণ সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, যাঁহার বিনা সাধনে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়, তাঁহাকে সাধারণে কি অনুকরণ করিবে? মা সরস্বতী যাঁহার জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দেন, সাধারণে তাঁহার কি অনুকরণ করিবে? কাঞ্চন যাঁহার অঙ্গে লাগিলে সেই অঙ্গটা বাঁকিয়া যাইত, সাধারণে তাঁহার কি অনুকরণ করিবে? কামিনীস্পর্শ হইলে শত বৃশ্চিকের জ্বালা যাঁহার অনুভব হয়, তাঁহার অনুকরণ কিরূপে করা যাইবে? ভগবানের নাম শুনিবামাত্র যাঁহার প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহার কি অনুকরণ করিবে? পূজ্যপাদ স্বামীজী প্রথম জীবনে সাধারণের মত প্রতিপালিত। স্কুল-কলেজে গিয়াছেন, পাঠাভ্যাস করিয়াছেন, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, শাস্ত্র অনেক পড়িয়াছেন। তাহার পর তিনি সঙ্গ ও সাধনা করিয়াছেন, তবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব

স্বামীজীর জীবন অনুকরণ সম্ভবপর না হইলেও স্বামীজীর জীবন হইতে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঠাকুরের উপদেশ স্বামীজীর জীবন-গঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। উপদেশ হাজার হাজার আছে, শ্রুতি স্মৃতি বস্তা বস্তা আছে, কিন্তু জীবন অতি অল্প। কারণ, উপদেশ যদি জীবনে ফলে, তবেই উপদেশ সার্থক হয়। ঠাকুর বলিতেন, "পাজিতে বিশ আড়া জল লিখা আছে, কিন্তু পাজি নিঙ্‌ড়ুলে এক ফোঁটাও পড়ে না।" সেইরূপ জীবনে না ফলাইলে উপদেশের মানেই হয় না। অনেকের ধারণা, জ্ঞানী হইলেই কেবল বিচার করিবে,—"জগৎ ত্রিকালমে নেই হায়" আর হিমালয়ের গহ্বরে পড়িয়া থাকিবে। ভক্ত হইলেই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। শ্রীঠাকুরের উপদেশের মর্ম্ম এরূপ ভক্তের হৃদয়োদ্যানে নানা কুসুম ফুটিয়া থাকে সত্য এবং তিনি সেই সৌগন্ধে বিভোর থাকেন বটে, কিন্তু ঐরূপ উদ্যান, আলোক প্রবেশ না করা হেতু অন্ধকারময়। আর ওরূপ জ্ঞানী চণ্ডভাস্করের দীপ্তিতে আলোকিত বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় মরুভূমি। শুধু জ্ঞানসাধন করিলে শুষ্ক তার্কিক হয়, আর শুধু ভক্তি সাধন করিলে বোকা হয়। ঠাকুর ঠাট্টা করিতেন,—

"প্রভু তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিলা।
ভক্তজন বলে প্রভুর এও এক লীলা।"

ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়, আর জ্ঞান-বিচার করিতে করিতে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুইটিরই ব্যায়াম দরকার। প্রভাতকিরণোজ্জ্বল সদ্যোবিকসিত কুসুমোদ্যানের মত জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ হওয়া চাই। তিনি উদাহরণ দিতেন,—"ঘিয়ে ভেজে রসে ফেল্‌তে হবে, তা হ'লে স্বাদ ভাল হয়।" স্বামীজীতে এইটি ফলিয়াছিল,সেই জন্য স্বামীজী সাধারণ জ্ঞানী বা ভক্ত নহেন, কিন্তু তিনি জ্ঞান ও ভক্তি দুইটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা দেখি, এরূপ জ্ঞানী বা ভক্ত একেবারে কাযের বার। এ জন্য ঠাকুর কর্ম্মের উপর খুব ঝোঁক দিতে বলিতেন। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে বেহুঁস বলিয়া গালাগালি দিতেন। লৌকিক জিনিষ লাভ করিতে হইলে লৌকিক উপায় অবলম্বনই প্রশস্ত। কর্ম্মশক্তির হ্রাস-হেতু লৌকিক উপায়ে আস্থাশূন্য হইয়া অলৌকিক উপায়ে বেশী আস্থাপর হয়। দুই এক ক্ষেত্রে কাকতালীয়বৎ কিছু লাভ হইলেও জানা উচিত, এটি সর্ব্বদা হয় না। সংসারের ইহা নিয়ম নহে। বাস্তবরাজ্য ছাড়িয়া কেবল ভাবরাজ্যে বা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়। বেহুঁস ভাবটা গৌরবের জিনিষ নহে। এটা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ। এটা রোগ। অনেকে এই বেহুঁস ভাবটার খুব বাহাদুরী করেন। ভক্তই হউন আর জ্ঞানীই হউন, সকলকেই এই জগতে বিচরণ করিতে হয়। অনেক সময় বেহুঁস ভাবটার দরুণ বা খেয়াল বশতঃ সময়োচিত বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া বা পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া বা নিজ সামর্থ্য না পর্য্যালোচনা করিয়া একটা কিছু করিয়া বসা ঠিক্ নহে। অতএব কর্ম্মশক্তির হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কর্ম্মশক্তি শুধু দেহের শক্তি নহে, মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের কর্ম্মশক্তি আছে। সে জন্য মস্তিষ্কের শুধু জ্ঞানশক্তি বা হৃদয়ের ভাব শক্তির উদ্বোধন করিলেই যথেষ্ট হইল না। দেহের, হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের কর্ম্মশক্তি উদ্বোধন করা উচিত। এইটি না করিলে মানুষ হয় ভাবপ্রধান, নহে ত জ্ঞানপ্রধান হয়। কিন্তু জ্ঞানের ও ভাবের শক্তি উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশক্তিরও উদ্বোধন করিলে মানুষ সম্পূর্ণ হয়; তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়। স্বামীজীতে মস্তিষ্কের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি ও কর্ম্মের শক্তি কয়টিই উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। সে জন্য তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধারণ মানুষের মত বেড়াইতে পারিতেন। ঠাকুর বলিতেন,—"ঈশ্বরদর্শন হ'লে আর দুটো হাত বেরোয় না, যে মানুষ, সেই মানুষই থাকে।" স্বামীজী কখন একটা বিশেষ খেয়াল ধরেন নাই। শাস্ত্রে আছে, সিদ্ধপুরুষ হয় ত জড়ের মত, কি উন্মত্তের মত থাকেন। আবার দেখাও যায়, সিদ্ধপুরুষ হয় ত নদীতীরে, কি শ্মশানে, কি জঙ্গলে ভগ্নাবস্থায় বসিয়া আছেন। কিন্তু ঠাকুরের উপদেশ অন্যবিধ। যখন স্বামীজী সিদ্ধিলাভ করিলেন, ঠাকুর বলিলেন,—"অমৃতের আস্বাদ পাইলে, এ তোলা রহিল; এখন মায়ের কায কর।" অর্থাৎ জগন্মাতার দাস হও। সিদ্ধ হইয়া নিজে একান্তে বসিয়া অমৃতাস্বাদ, উচ্চ আদর্শ নহে। তাহাও তুচ্ছ করিয়া জীবের কল্যাণ করা আরও উচ্চ আদর্শ। ঠাকুর বলিতেন,—"নিজের ঘর তৈয়ার হইয়া গেলে ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয়, অপরের কাযে লাগবে ব'লে।" স্বামীজী ইহার সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার শিষ্য-সেবকদের সাবধান করিতেন,—"ওরে, একটা আখ্‌ড়া কোরে ভিখিরী

হস্ নি।” বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সাধু-ভক্ত ভিক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের ডেরায় অলসভাবে দিনযাপন করেন। তিনি বলিতেন,—“তোরা রোজগার করবি না সত্য, কিন্তু গৃহস্থের একগুণ লইয়া তার লক্ষগুণ নানা রকমে দিবি। তোরা ধনী ও তোরা দাতা হ’।” পবিত্র দেহ-মন-বুদ্ধি অপেক্ষা ধন আর নাই। সেই ধন দান অপেক্ষা দান আর নাই। সংসারী লোকে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট কি চৈতন্যদেবকে আর কয়টা টাকার চাল-ডাল খাওয়াইয়াছিল? কিন্তু তাঁহারা যে জীবন দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোটি কোটি নর-নারী বহু শতাব্দী ধরিয়া খাইয়াও ফুরাইতে পারিতেছে না। অতএব এই সব মহাপুরুষ ভিখারী নহেন। তাঁহারা মহাধনী মহা-দাতা। সতীর চিন্ময় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা পীঠে দিয়াছিলেন, কেন না, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবের কল্যাণ হইবে।

১০। নিষ্কাম-কর্ম্ম, বিজ্ঞান, অহৈতুকী ভক্তি।

অনেকেই নিষ্কাম কর্ম্ম, বিজ্ঞান, অহৈতুকী ভক্তি শব্দ মুখে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এগুলি যে সিদ্ধপুরুষ ছাড়া অপরের সম্ভব নহে, এ ধারণা অতি অল্প লোকের আছে। জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরকে বলেন, “মশাই, আমাদের জনক রাজার মত।” তিনি বলিলেন,—“তোমরা কিছু কর, তবে ত জনক রাজা হইবে। জনক হেঁটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করেছিল কত দিন, তবে জনক রাজা হয়েছিল।”

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর তবে নিষ্কাম-কর্ম্ম করা চলে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥”

ভোগে আসক্তিশূন্য, জ্ঞানে যাঁহার চিত্ত অবস্থিত, এইরূপ মুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের দাস হয়েন, তিনিই পরমেশ্বরের পরিতোষের জন্য কর্ম্ম করেন। অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মের অধিকারী মুক্তপুরুষ ছাড়া অপরে হইতে পারে না।

বিজ্ঞানও মুক্তপুরুষ ছাড়া সম্ভব নহে। মুমুক্ষুর জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান; মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপরোক্ষ বা বিজ্ঞান। মুক্তপুরুষ সব জিনিষে ব্রহ্মদর্শন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—“ঠাকুর সকলকে আগে প্রণাম করিতেন। এমন কি, বেশ্যাদেরও প্রণাম করিতেন।” কারণ, তিনি সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করিতেন। ইহার নাম বিজ্ঞান। উপনিষদে আছে—

“ত্বং পুমান্ ত্বং স্ত্রী ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণেন দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোঽসি বিশ্বতোমুখঃ॥”

তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ লাঠীভরে চলিতেছ, তুমি নানারূপ হইয়াছ।

“ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মে মে কিতবাঃ উত।”

দাস ব্রহ্ম, ধীবর ব্রহ্ম, আর এই সব ছলকারী, ইহারাও ব্রহ্ম।

সাধারণে এগুলি পড়ে, বিজ্ঞানে এগুলি ঠিক ঠিক্ দেখা যায়।

অহৈতুকী ভক্তিও মুক্তপুরুষ ছাড়া হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে,—

“যং সর্ব্বে দেবাঃ নমন্তি মুমুক্ষবঃ ব্রহ্মবাদিনশ্চ।”

ভক্তগণ যাহাকে ভজনা করেন, মুমুক্ষুগণ যাহাকে ভজনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে মুক্তপুরুষগণ ভজনা করেন।

স্মৃতিতে আছে—

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে।
কুর্ব্বন্তি অহৈতুকীং ভক্তিম্॥”

আত্মারাম, গ্রন্থিহীন মুনিরাও ভগবানের উপর অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥”

যিনি “ব্রহ্ম” হইয়াছেন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষ সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত থাকেন,—শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সম। তিনিই আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম, বিজ্ঞান বা অহৈতুকী ভক্তি সাধারণে সুলভ নহে। ইহার অধিকারী ভীষ্ম, বশিষ্ঠাদি আধিকারিক পুরুষগণ; ইহার অধিকারী নারদ, শুকাদি পরম ঋষিগণ। অহৈতুকী ভক্তির নিদর্শন ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হি একান্তিনঃ মম।
বাঞ্ছন্তি অপি ময়া দত্তং কৈবল্যং অপুনর্ভবম্॥”

সাধু, ধীর, মন্নিষ্ঠ ভক্ত, তাহাকে মুক্তি দিলেও সে লয় না, অন্য কিছু বাঞ্ছা করিবে কেন? ঠাকুর গাহিতেন—"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।"

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

"নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্! প্রপন্নং অনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাৎ অনপায়িনী॥"

হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমার শরণাগত। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে অচলা অহৈতুকী ভক্তি হয়।

শাস্ত্রে আছে,—ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের উপর।

১১। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ধর্ম্মজীবনের সুরু।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন,—"নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তবে ধর্ম্মজীবনের সুরু হয়।" শাস্ত্রে বলে, "মুমুক্ষুই বেদান্তের অধিকারী আর তাঁহার প্রয়োজন মুক্তি।" আর এই ধর্ম্মের অধিকারী মুক্তপুরুষ; প্রয়োজন জগজ্জননীর দাসত্ব। মুক্তি অর্থাৎ ভূমানন্দ নিজে ভোগ করা। আর জগদ্ধাত্রীর দাসত্বে আত্মবলিদান দিয়া সকল জীবের কল্যাণ করা। এইরূপ মুক্তপুরুষ যে অবস্থায় থাকুন না কেন, একটি জিনিষে তাঁহার লক্ষ্য থাকে; সেটি—

"চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্।"

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁহার ধ্রুবতারা। সেই শ্রীচরণ পবিত্র ভূঃ ভুবঃ স্বর্ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, আর সনাতন।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

"অথাতঃ তে আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্।"

তোমার আনন্দপরিপূরক পদাম্বুজ হংসগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,
তত্ত্বমসির উপর আমার মহেশ-মহিষী।"

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"আগে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার পর ভগবদ্‌ভক্তি।"

"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ উপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥"

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ বিদ্যার দ্বারা সব 'ব্রহ্মাত্মক' এই যে দেখে, সেই নিঃসংশয় হয়, তখন তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার পর ভগবান্‌লাভ।

"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যং অনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥"

নশ্বর মানুষ-দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্যস্বরূপ—অমৃতস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, মনীষীদিগের মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য।

ধর্ম্মের এই অত্যুচ্চ আদর্শ ইদানীন্তন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ জীবনে দেখাইয়া দিয়াছেন, আর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সেই উচ্চ আদর্শ জীবের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম কোন নূতন পন্থিবিশেষের ধর্ম্ম নহে। ইহা বেদের উপর—পুরাণের উপর—তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য ইহা সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ নর-নারী জীবনে সার্থক করুক। নিজের কল্যাণ ত হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশের কল্যাণ হইবে—দশের কল্যাণ হইবে—জগতের কল্যাণ হইবে।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

গুহামধ্যে

২৭

উপর হইতে নামিতেই দেখি, যোগিনী বাহিরের দ্বারের কবাট ছুইটা আধাবন্ধ করিয়া অল্প ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়া সন্তর্পণে কি যেন,কাহাকে যেন দেখিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত, তাহার উপর একরাশ কোঁকড়ানো চুল, প্রান্তভাগ যেন হাজার ফণা তুলিয়া সাপের মত ঝুলিতেছে।

কৌতূহল জাগিল। তিনি কি করিতেছেন, আর কেন করিতেছেন, দেখিবার জন্য, মুখ ফিরাইলেই দেখিতে না পান, আমি এমন একটু অন্তরালে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে বুকটা অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে তপস্বিনী কবাটে খিল দিতেছেন!

অশুদ্ধমন, সন্ন্যাস লইবার বিরুদ্ধে যে বিষম শত্রু, তাঁহার এই বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, এত কথা এক মুহূর্ত্তে আমাকে শুনাইয়া দিল যে, আমি চিত্ত-চাঞ্চল্য কিছুতেই রোধ করিতে পারিলাম না। বাড়ীর মধ্যে পুরুষের মধ্যে আমি—সম্মুখে কত লুকানো অন্তরের কথা লইয়া ওই আর একটি অসামান্য সুন্দরী—যাহার আদি অন্ত কিছুই জানি না। কোথায় তাহার ঘর, কি তাহার অবস্থা, কেমন ভাবে তাহার জীবন-যাপন—সমস্তই আমার অজ্ঞাত। দেখা তাহার সঙ্গে সবে মাত্র আজ। নিঃসন্দেহ হইবার অনুকূলে, আছে মাত্র তাহার ওই গৈরিকের আবরণ। ওই একটিমাত্র সাক্ষী তাঁহার এই বিচিত্র আচরণের সদর্থ বুঝাইতে আমাকে সাহায্য করিল না। নানা ভাবের বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া আমি ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, এতক্ষণ আমি সিদ্ধেশ্বরীকে একবারেই ভুলিয়া আছি। শুধু তাহাই নয়, তাহার সঙ্গে, জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা ভুলিবার নয়, সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর সেই দুর্ঘটনা। রাজাবাবুর বাড়ীর কথা, সে ত স্মৃতির সমস্ত সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে!

চক্ষু মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে একবারে তিনটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। ভাসিল এক সঙ্গেও বটে, আবার সূক্ষ্ম হিসাব করিলে পরে পরেও বটে! সেই হিসাবেই বলি—পরে পরে পরে। প্রথমে ভাসিল রাণী, তাহার পর সিদ্ধেশ্বরী, সকলের পশ্চাতে তপস্বিনী। তিন জনেই আমার পানে চাহিল। রাণীর সেই ডাগর চোখ দু'টি সকল কোমলতার ভিতর দিয়া একটা অক্ষুণ্ণ গর্ব্বভরা দৃষ্টি আমার মুদ্রণোন্মুখ চোখ দু'টার উপর নিক্ষেপ করিল,বিলোল চাহনিতে স্নেহের লালসা পূরিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার সে দু'টাকে তুলিয়া ধরিল।

সকলের পশ্চাতে সেই রহস্যময়ী দৃষ্টি; তারা দু'টা যেন হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওগো ব্রহ্মচারী, আমরা কথা কহিতে জানি! তোমার মনটার দিকেই চাহিয়া দেখ না! সে মাঝে মাঝে কি কথা তোমাকে শুনাইতে ব্যাকুল হয়, তাহা না জানিয়া, না শুনিয়া, আমাদের মন দেখিতে এত ব্যস্ত হও কেন? দেখিতে আসিয়া, আমাদিগকে কেবল লজ্জা দাও। সন্ন্যাসী হইতে চহিয়াছ যখন, তখন আমাদের লজ্জাটা তুমিই গ্রহণ কর না কেন? তোমার মনটা মুখে ফুটিয়া উঠুক, আমাদের মুখ মনের ঘরে চলিয়া যাউক।"

সত্য সত্যই এইবারে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হইলাম। স্থির হইলাম, চোখ মেলিলাম। মেলিতেই দেখি, তপস্বিনী আবার কবাট উন্মুক্ত করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ জানিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। বিশেষ চেষ্টায় ইচ্ছার দমন করিলাম।

মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িলাম।

"আর বিলম্ব কর্‌বেন না, বাবা !"

"না, মা, আর বিলম্ব ক'রব না। বিলম্ব করা আর আমারই চ'লবে না, বেলা শেষ হ'তে চলেছে।"

"আমারও আর চলছে না।"

সিদ্ধেশ্বরীর কথাটা এই সময়ে আমার মনে পড়িয়া গেল। 'ফিরিয়া আসিতেছি' বলিয়া আমি যে তাহার কাছ হইতে চলিয়া আসিয়াছি! অনেক আগেই তাহার কাছে আমার উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল! সে যে বলিয়াছে, আমি ভিন্ন এ কাশীতে তাহার আর কেহই নাই!

খিল্, খিল্, খিল্!

"ও কি, মা, হঠাৎ হেসে উঠলে যে!"

"কিছু নয়, বাবা, একটা কথা মনে উদয় হ'ল।"

ছ'ই জনেই এবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছি। যোগিনী মা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। তিনি ভূমির দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার তাঁহার খিল্ খিল্ হাসি।

কি বিপদ, এ মেয়েটা এমন ক'রে হাসে কেন? কারণ জানিতে গিয়া, বিশেষ চেষ্টায়, নিবৃত্ত হইলাম।

২৮

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, যে সমস্ত সামগ্রী রাঁধিবার জন্য আমি সযত্নে বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বিভিন্নপ্রকারের ব্যঞ্জনের আকারে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দধি, দুগ্ধ, পায়স্ ও নানাবিধ মিষ্টান্ন।

দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল সামগ্রীর কতক আমি আনিয়াছি বটে, সব ত আনি নাই। আমার আয়োজন ছিল, পাঁচ ছয় জনের জন্য। এ ত দেখিতেছি, পোনেরো ষোল জনের উপযোগী সামগ্রী। এত আড়ম্বর কিসের জন্য ও খাইবে কে? আর, এত ব্যঞ্জন, এমন করিয়া রাঁধিল কে? গুরুদেব নিজেই কি এই সমস্ত পাক করিয়াছেন?

"হাঁ গো, মা!"

"কি, বাবা?"

"এত রান্না--"

"কে রেঁধেছেন জিজ্ঞাসা করছেন? কেন, বাবা, আগেই ত বলেছি।"

"গুরুদেব কি এই সমস্ত—"

"আমি রাঁধলে কি আপনি খেতেন?"

বুঝিলাম গুরুদেবই স্বহস্তে পাক করিয়াছেন, তপস্বিনীর পূর্ব্বের কথা, আমার মনস্তুষ্টির জন্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু ইঁহার কথার একটা উত্তর না দেওয়া অন্যায় হয়। আমি বলিলাম—"গুরুদেব কি করতেন?"

"তিনি আচণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করতে পারেন না! তাঁ'র এ কন্যার কুটীরে যখনই তিনি পদার্পণ ক'রেছেন, তখনই তাঁ'কে রেঁধে খাইয়েছি।" বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি বলিলেন—" আপনি যে ব্রহ্মচারী।"

"তাঁ'কে হাত পোড়াবার কষ্টটা না দিয়ে আপনি রেঁধেছেন জানলে, আমি সুখী হতুম।"

"আপনি ওই ঢাকা তুলে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

দেখিলাম, ঘরের এক স্থানে একখানি আসন পাতা, তাহার পার্শ্বে একটি জলপূর্ণ পান-পাত্র। দূরে শালপাতা-ঢাকা পাত্রে গুরুদেবের প্রসাদান্ন।

"এ আসন পেতেছ কি, মা, তুমি?"

তপস্বিনী উত্তর দিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র।

আমি সে আসনখানা হাতে তুলিয়া, আবার পাতিলাম। উপবিষ্ট হইয়াই বলিলাম—"মা! তুমি ওই প্রসাদ-পাত্র এনে দাও।"

মৃদু হাসিয়া তপস্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

"আমি যাচ্ছি, মা, তোমার দিতে আপত্তি কেন?"

তথাপি তপস্বিনী নড়িলেন না।

আমি জেদ ধরিলাম। ফল হইল না। লাভের মধ্যে, তাঁহার মাথাটি আনত হইল। মনে হইল, মুখ যেন সহসা মলিন হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে—না, না—সত্যই যে একবিন্দু জল!

আমি আসন ছাড়িয়া উঠিলাম। যেখানে গুরুর প্রসাদান্ন, সেখানে যাইয়াই পাত্রের উপর হইতে পাতা উঠাইলাম। তাঁহার ভুক্তাবশেষের সঙ্গে এক জনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য রাখিয়া গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন।

পাত্র হইতে গুরুর ভুক্তাবশেষের সামান্যমাত্র অংশ লইয়া মুখে দিলাম।

তপস্বিনী সেই ভাবেই নীরবে দাঁড়াইয়া।

আমি বলিলাম—"মা! একটা কথা আমার মনে প'ড়ে আমাকে হঠাৎ ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আমি একটা অবশ্য-কর্ত্তব্য কায অসম্পূর্ণ রেখে এসেছি। সেটা অসম্পূর্ণ রাখা আমার এখন এমন অন্যায় ব'লে বোধ হচ্ছে যে, এই প্রসাদান্নের কণামাত্র ছাড়া আর বেশী এখন গ্রহণ করতে পার্‌ছি না।"

"কোথাও কি আপনাকে যেতে হবে?"

"এখনি—আমি কালবিলম্ব করতে পার্‌ব না।"

"আমাকেও যে যেতে হবে এখনি।"

"আপনি ত সিদ্ধেশ্বরীর কাছে যাবেন?"

"আপনি তা'র নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে?"

"এ সমস্ত কথা ফিরে এসে যদি বলি?"

"ফিরে এলে আপনার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে?"

"আপনাকে থাক্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি।"

"আমিও যে অন্যায় করেছি, সে এখনো উপবাসী রইল কি না, বুঝ্‌তে যে পারলুম না।"

একবার মনে করিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর অবস্থার কথা বলি, কিন্তু বলিতে, কি জানি কেন, আমার সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"তা'র জন্য প্রসাদ আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে ওইটাই আপনি নিয়ে যান।"

"বেশ" বলিয়াই আমারই জন্য রক্ষিত সেই খাদ্যপাত্র উঠাইয়া লইলাম।

"ওই থেকে একটু কণা আমাকেও দিন।"

"কেন, মা, তোমার আহারে আপত্তি কি?"

"আপত্তি কিছু নেই, বাবা, সামগ্রীর ত অভাব নেই। প্রয়োজন বোধ করি, এর পরেই আহার করব।"

"তা' হ'লে ত আমার যাওয়া হয় না, মা!"

"আমি এখন খেতে চাইলুম না ব'লে?" তাঁহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"এক জনকে অনাহারে রেখে, আমি আর এক জনকে আহার করাতে যাব!"

"আমিই ত নিয়ে যেতে চাচ্ছিলুম। সেখানে আপনার যাবার কি প্রয়োজন, আমি ত জানি না।"

"এই যে বল্‌লুম, ফিরে না এলে বল্‌তে পার্‌ব না।"

"আপনার ফির্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে?"

"সেটা ত ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না!"

"একটা আন্দাজ?"

"অল্প সময়ও হ'তে পারে, অধিক সময়ও হ'তে পারে।"

"সারারাত্রিও হ'তে পারে?"

আমি তাঁহার মুখের দিকে ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই চাহিলাম। এটা কি তাঁহার রহস্য? কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কর্‌ব বল, মা!"

"এর উত্তর আমি কি দেবো, আপনার ইচ্ছা।"

"তুমি আহার কর্‌বে না?"

তপস্বিনী আবার নীরব। আবার তাঁহার মাথা অবনত হইল।

বুঝিলাম, তিনি আহার করিবেন না—অন্ততঃ আমি না করিলে। কিন্তু আর আমার ভোজনে বসা অসম্ভব। আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে বাইরের দোরটা—"

"বাবার প্রসাদের—"

আমার বলা তিনি যেমন শেষ করিতে দিলেন না, আমিও তেমনি তাঁহার বলা শেষ করিতে দিলাম না; পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনী তাহা মুখে পূরিলেন। তার পর করতল মস্তকে স্থাপন করিলেন। হাত নামাইয়া, চোখ মেলিয়াই বলিলেন—"চলুম, দরজার কবাট বন্ধ ক'রে আসি।"

২৯

বাহির দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই আমার মনে হইল, কিছু টাকা যে আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে!

"দাঁড়ালেন, কেন বাবা?"

তপস্বিনী ছিলেন আমার পশ্চাতে। আমি মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"একটা বড় ভুল যে হয়ে গেছে, আমাকে কিছু টাকা নিতে হবে যে!"

"আমারও ভুল হয়েছিল বল্‌তে আপনাকে, উপরটা একবার দেখে যান।"

"কেন, চুরির কি আশঙ্কা কর?"

"অনেকক্ষণ আমরা ওই ঘরে ছিলুম। উপরে কেউ ওঠা-নামা কর্‌লে ওখান থেকে ত দেখা যায় না!"

পাত্র হাতে করিয়াই আমি উপরে উঠিলাম। ঘরের দোরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই বুঝিলাম, চুরি হইয়াছে। বারান্দায় যে ঘটিটা রাখিয়াছিলাম, সেটা নাই। ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, যে ছোট বাক্সটির ভিতরে আমি হাত-খরচের টাকা রাখিতাম, সেটিও নাই।

আর মুহূর্ত্তমাত্রও না দাঁড়াইয়া আমি নীচে আসিলাম। কোনও কথা মুখ হইতে আমার বাহির না হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরই মধ্যে টাকা নেওয়া হয়ে গেল?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "হ'ল না।" প্রত্যাশা করিলাম তাঁহার একটা প্রশ্ন। প্রত্যাশায় দাঁড়াইলাম। কিন্তু সে প্রশ্নের পরিবর্ত্তে শুনিলাম—"আপনি কি কিছু বল্‌তে চান?"

আমার মুখের কি ভাব দেখিয়া তিনি এ প্রশ্ন করিলেন, বুঝিতে না পারিলেও আমাকে বলিতে হইল—"চাই।"

"বলুন।"

"কবাটে খিল দিয়ে আবার খুলে রাখ্‌লে কেন?"

"আপনি দেখেছেন?"

"উপর থেকে নামবার সময়ে।" তাঁহার আবার হাসি জড়ানো প্রশ্নে সব সত্যটা আমি বলিতে পারিলাম না।

"কিছু কি চুরি গেছে নাকি?"

"কিছু গেছে।"

"বলেন কি, এরই মধ্যে?"

"কিছু কেন, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট। একটা ঘটি গেছে, আর একটি হাতবাক্স, তাতে গোটা পঁচিশেক টাকা ছিল।"

"তা হ'লে খুব ক্ষতি ক'রেই গেছে। আমার মরণ, যে ভয় ক'রে কবাট বন্ধ কর্‌তে গেলুম, তাই হ'ল!"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন, মা?"

"আপনার রসুইঘরের দিকে গেলে এ দিক্‌টে কিছুই দেখা যায় না। সেটা প্রথম যাওয়াতেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। কাশীতে ত চোরের অভাব নেই। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় একবার রক্ষা হয়ে গেছে। এবারেও রান্নাঘরে আমাদের কত দেরী হবে বুঝ্‌তেও পারিনি, তাই কবাট বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলুম।"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন?"

মুখটি একটু তুলিয়া, শুভ্র দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া যোগিনী বলিলেন—"তাই ত ঠাকুর, আপনার ত খুব ক্ষতি ক'রে দিলুম!"

"আমার সঙ্গে আর রহস্য কর্‌ছ কেন, মা? বল না এটাও বিশ্বনাথের কৃপা।"

"তা বটে। যাচ্ছেন যখন সন্ন্যাস নিতে, তখন এগুলো ত ফেলে যেতেই হবে।"

"আমি কি সন্ন্যাস পাব, মা?"

"বা! আপনি ত সন্ন্যাসীই। লোকদেখানো একটা আশ্রম নেননি ব'লে?"

এত বড় একটা প্রশংসা—কিন্তু ভিতরে অহঙ্কার না আসিয়া প্রচণ্ড লজ্জা আসিল। কই, এখনো ত সাহস করিয়া ইঁহার কাছে মনের নীচতাটা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না!

"তা হ'লে কি হবে, বাবা?"

"কিসের কি হবে, মা!"

"টাকার?"

"অভাব হবে না, দরকার হয় পথেই পাব।"

"তবে আর বিলম্ব কর্‌বেন না।"

"কিন্তু আর একটা কথা জান্‌বার ইচ্ছা কিছুতেই যে দমন কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"দরজা কেন বন্ধ কর্‌লুম?—আপনিই একটা অনুমান ক'রে বলুন না।"

"অনুমানে আমি কত কি বলব, কিন্তু ঠিক যে বল্‌তে পার্‌ব, সেটা ত সাহস ক'রে বল্‌তে পার্‌ছি না। একটা মিথ্যা ব'লে তোমার কাছে অপরাধী হব?"

পূর্ণ সরল দেহ-যষ্টিখানি আমার মুগ্ধনেত্রের উপর যেন তুলিয়া তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে কি রকম দেখ্‌ছ, বাবা?"

"সাক্ষাৎ মা-সরস্বতীকে সম্মুখে দেখ্‌ছি।"

"সরস্বতী হই আর না হই, তবে আমি বৃদ্ধা ভুবনের মা নই।"

আমি অবাক্, শুধু সেই মৃদুহাস্যময়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

"বুঝ্‌তে পেরেছেন, বাবা?"

"এ কথাতেও যদি বুঝ্‌তে না পারি, তা হ'লে আমার সন্ন্যাসী হ'তে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

বাল্মীকির অভিশাপ।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ একমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥

[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।
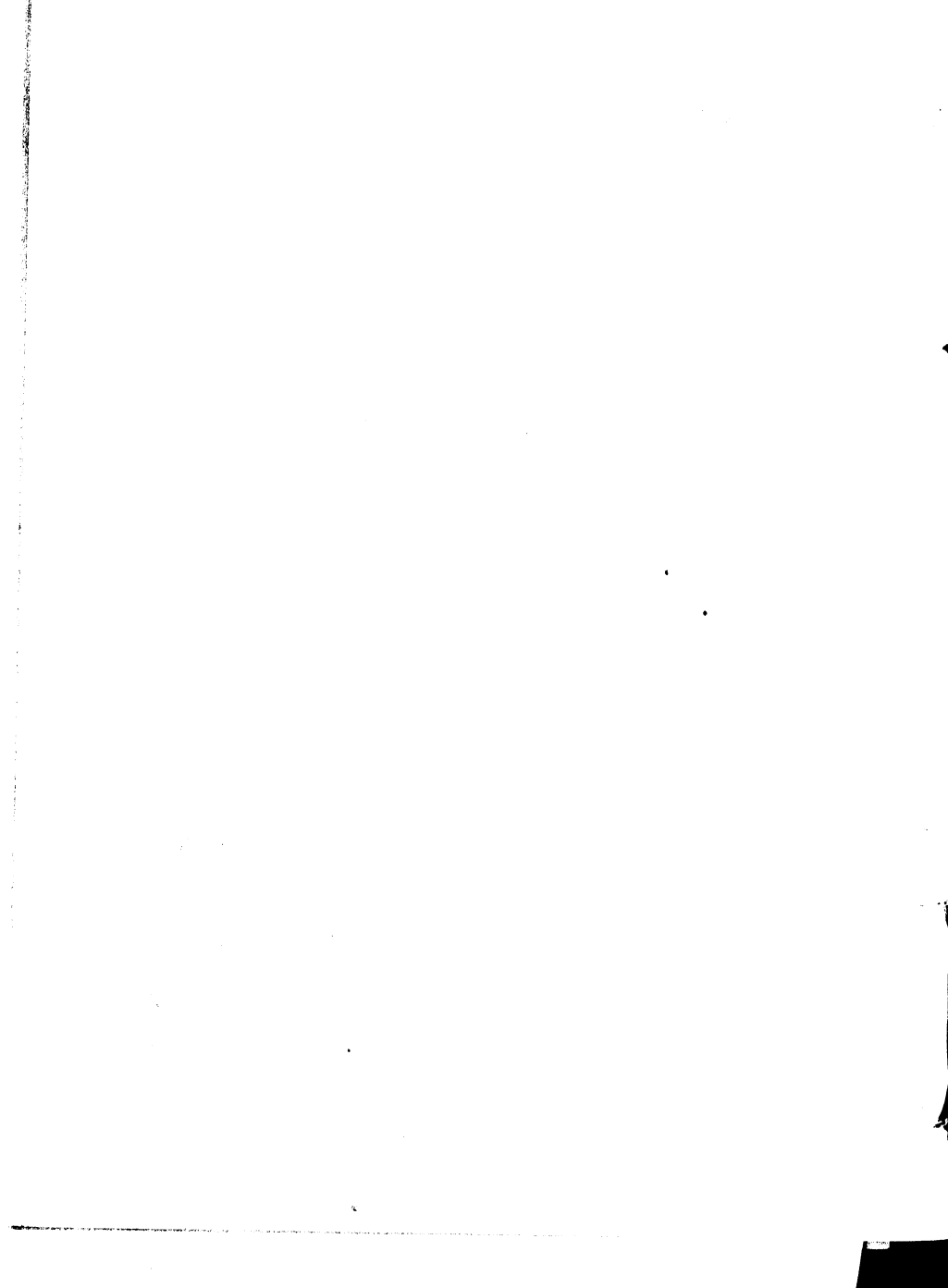
"এই বিশ্বনাথের পুরীতে এমন সব লোক আছে, যারা তাঁর মসৃণ পাষাণ-দেহের ভিতরেও ছিদ্র খুঁজে বার কর্‌বার চেষ্টা করে।"

"সেই চোর-নারায়ণকে দেখ্‌তে পেলে আমি প্রণাম কর্‌তুম। সে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল না কেন, তা হ'লে বুঝি আমার পূর্ণচৈতন্য হ'ত।"

"আর বিলম্ব কর্‌বেন না, সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

"তার পরিবর্ত্তে তোমাকে একটা প্রণাম কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কি কর্‌ব, হাতে গুরুর প্রসাদ।"

আমার কথা শেষ করিতে না করিতে তপস্বিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন।

আর একটা কৌতূহল—এই সময়েই মিটাইয়া লই। তপস্বিনী প্রণাম করিয়া যে-ই আবার দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম—"মা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।" বলিয়াই, তাঁহার কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই, জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি চল্‌তে চল্‌তে দু দু'বার ডুক্‌রে হেসে উঠ্‌লে কেন, আমাকে বল্‌তে হবে, বল্‌তেই হবে।"

"এতক্ষণ যে আপনার আহার শেষ হয়ে যেতো, বাবা!"

"দরজা বন্ধ কর।" বলিয়াই বাহির পথে পদনিক্ষেপ করিলাম।

বিশ্বনাথ! আমার সমস্ত ভিতরটাকে এইবারে গৈরিক বসনে ঢাকিয়া দাও।

[ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল স্কুলে চরকা শিক্ষা।
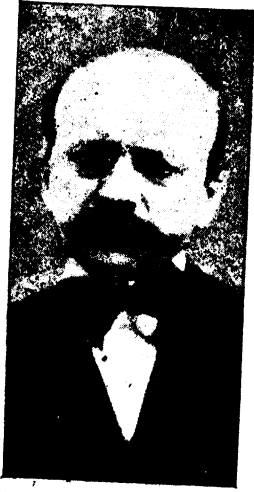
ডাঃ বিদো।

কৃত্রিম পেশী।

পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত রোগীর স্পন্দনশক্তি-বিরহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যে কৃত্রিম উপায়ে কর্ম্মোপযোগী করা যায়, তাহা এত দিন পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্যারী নগরের অভিজ্ঞ ডাক্তার গেব্রিয়েল বিদো অধুনা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে অব্যবহার্য্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীসমূহকে কার্য্যোপযোগী করা যায়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুধু প্রমাণ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তাঁহার উদ্ভাবিত কৃত্রিম পেশীর সাহায্যে পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত রোগী সংসারের নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার থুলিস্ সংপ্রতি নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'মেডিক্যাল্ রিভিউ অব্ রিভিউস' নামক সাময়িক পত্রে ডাক্তার বিদোর উদ্ভাবিত কৃত্রিম পেশী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। -- তিনি বলেন যে, প্যারীর হাঁসপাতালে বহু পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নর-নারী এই নবোদ্ভাবিত কৃত্রিম পেশীর সাহায্যে নানাবিধ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই কৃত্রিম পেশী সমূহ স্প্রিংযুক্ত। কৃত্রিম পেশীর সহিত স্প্রিং এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, স্পন্দনরহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর হইতে দেহের ভার অপসৃত হইলেই কৃত্রিম পেশীগুলি স্বাভাবিক পেশীর ন্যায় আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়।

বার্দ্ধক্য বশতঃ যে সকল রোগী চলাফিরা অথবা কোন কাযকর্ম্ম করিতে অসমর্থ, এই কৃত্রিম পেশী তাহাদিগকে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবে। ডাক্তার বিদো বলেন যে, প্রত্যেক রোগীর প্রতি অঙ্গের পেশীর সঞ্চালনগতি পর্য্যবেক্ষণের পর তদনুসারে কৃত্রিম পেশীবিন্যাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। একই প্রণালীর পেশী সকল ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না। সুতরাং ব্যবসা হিসাবে কৃত্রিম পেশী প্রস্তত করিলে আদৌ চলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কৃত্রিম পেশী প্রস্তত করিতে হইবে।

ডাক্তার থুলিস্ বলেন যে, শৈশবকালে যাহারা পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত হয়, ডাক্তার বিদোর কৃত্রিম পেশীগুলি তাহাদিগের পক্ষে অমোঘ ফলদায়ক। এক ব্যক্তির শৈশবে পক্ষাঘাত হইয়াছিল। তাহার শরীরের নিম্নার্দ্ধ অর্থাৎ কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত স্পন্দন রহিত হইয়া

বাম বাহুর জন্য স্প্রিংযুক্ত কৃত্রিম পেশীসমূহ।

গিয়াছিল। এই ব্যক্তি অধুনা ডাক্তার বিদোর হাঁসপাতালের ভার লইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সে হাঁটিতে পারে, চেয়ারে বসা এবং উঠা অবাধে করিয়া থাকে। একটা যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিবার সময় সে ভূমিতলে স্বয়ং বসিয়াছিল, উঠিবার সময় একটা চেয়ার অবলম্বন করিয়াছিল মাত্র।

লোকটি মোটর গাড়ীর তলদেশে একাই যাইতে পারে। আবার পক্ষাঘাতরোগ সত্ত্বেও স্বয়ং গাড়ীতে উঠিতে পারে।

ডাক্তার থুলিস্ বলেন,—"পূর্ব্বে কখনও এমন ব্যাপার সম্ভবপর ছিল না। এই লোকটি সমগ্র প্যারী নগরীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, পথিমধ্যে প্রয়োজন হইলে গাড়ীতেও স্বয়ং চড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তির কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত একেবারে স্পন্দনরহিত হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি এখন কর্ম্মক্ষম হইয়াছে, শুধু নিজেকে রক্ষা করা নহে, অপরকে সাহায্য করিতেও সমর্থ।"

সমুদায় নিম্নার্দ্ধ পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত। বিদোর নির্ম্মিত পেশীর সাহায্যে লোকটি দুই হস্তে লাঠি লইয়া পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। সিগারেট ধরাইবার সময় সে এক হাতের যষ্টি উদ্যত করিয়াছে।
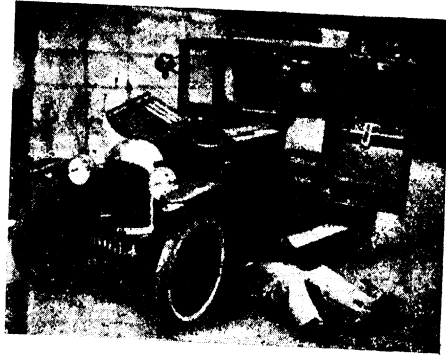
"পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত নরনারী প্রায়শই চলচ্ছক্তিহীন ও শয্যাশায়ী থাকে। ইহারা পরমুখাপেক্ষী ও পরানুগ্রহজীবী। কেহ সাহায্য না করিলে আত্মশক্তিতে ইহাদের নড়াচড়া করিবার সামর্থ্য থাকে না। এরূপ রোগী পরিজনবর্গেরও ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। ডাক্তার বিদো এই সকল নরনারীকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত, মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রত্যেক রোগীকে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া তাহার শরীরের মাংসপেশী সমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কৃত্রিম পেশী নির্ম্মাণ করিয়া দিলে সে রোগী নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে চলাফিরা ও কাযকর্ম্ম করিতে পারিবে।"

আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ, বিশেষজ্ঞগণ ডাক্তার বিদোর অনুসৃত প্রণালীমতে কার্য্যারম্ভ করিলে এ দেশের পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত অসংখ্য নরনারীর নবজীবন লাভ হইবে।

ব্যোম-রথে অবতরণ।

জুলস্ ভার্ণ কল্পনাবলে শত শত ক্রোশ জলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে 'সব্‌মেরিন্' সাহায্যে সে স্বপ্নও সার্থক হইয়াছে। এখন সমুদ্র-গর্ভের পথে ডুবা জাহাজ অনায়াসে দীর্ঘপথ চলাফেরা করিতেছে। জার্ম্মাণী ও রুসিয়া সম্মিলিতভাবে অধুনা ব্যোমপথে

পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তি নবজীবনলাভ করিয়া অপরের সাহায্যার্থে কাযকর্ম্ম করিতেছে।

যাত্রি-জাহাজ প্রেরণের জন্য যে প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহাও সার্থক হইতে চলিল। ভ্লাডিভোষ্টক হইতে মস্কো নগর পর্য্যন্ত ব্যোম-পথে জাহাজ চলিবে। এই দীর্ঘ পথ ৫ হাজার মাইল-ব্যাপী। রুসিয়ার অনুর্ব্বর বিশাল প্রান্তর ও সাইবেরিয়ার তুষারস্তব্ধ সীমাহীন ক্ষেত্র পার হইয়া আকাশপথে বায়ব জাহাজ যাত্রী বহন করিয়া যাতায়াত করিবে। সম্পূর্ণরূপে ধাতবপদার্থে নির্ম্মিত, দ্রুত গমনশীল ও ভার-বহ ব্যোমরথ সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে। এখনই ১ শত যাত্রিসহ বায়বপোত কোথাও না থামিয়া একযোগে সহস্র মাইল গমন করিতে পারে। অচিরে আরও শক্তিশালী বিমানপোত সমূহ নির্ম্মিত হইয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিবে।

এমন ব্যবস্থা হইতেছে যে, সুবৃহৎ বিমানপোত বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইবে। মধ্যপথে কোনও ষ্টেশনে কোনও যাত্রিদলের নামিয়া যাইবার কথা। সেই স্থানের সন্নিহিত হইবা-মাত্র পোতের গতি কিছু হ্রাস হইবে। পোতাধ্যক্ষের আদেশানুসারে নাবিকগণ বিরাট পোতসংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্রকায় বায়বপোত বন্ধনমুক্ত করিবে, তাহাতে অবতরণকামী যাত্রিগণ চড়িয়া বসিবেন। ক্ষুদ্র পোতখানি বন্ধনমুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে চালকের ইঙ্গিতানুসারে নিরাপদে অবতরণ করিতে থাকিবে। বিরাট যাত্রিজাহাজ আকাশপথে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া যাইবে।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণগণ মোটরবিহীন বিমান-পোত নির্ম্মাণে মন দিয়াছেন। মার্কিণগণ এবং অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকরাও এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বিগত জুন মাসে জনৈক যুবক মার্কিণ তাঁহার নিজের নক্সা অনুযায়ী নির্ম্মিত বিমানপোতের সাহায্যে আকাশপথে যাত্রা করিয়া একাধিক-বার কৃতকার্য্য হয়েন। মোটরবিহীন বিমান-পোতে চড়িয়া আকাশ-ভ্রমণ ইদানীং যুবক-গণের সখের কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে আর একটা সুফল এই হইয়াছে যে, এইরূপ বিমানযাত্রার ফলাফলের দ্বারা নূতন ও উৎকৃষ্টতর উপায়ে বিমানপোত সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে। বিগত গ্রীষ্মঋতুতে ফ্রান্সে সর্ব্বজাতীয় বিমান-পোতের একটা প্রতি-যোগিতা পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহাতে কাযটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—বিমানপথে যাত্রী লইয়া যাইবার ব্যবস্থার উৎকর্ষবিধান হইয়াছে। উল্লিখিত প্রতিযোগী পরীক্ষার কিয়দ্দিবস পরে জনৈক সামরিক জার্ম্মাণ বিমানচারী, মোটরবিহীন পোতে চড়িয়া অপূর্ব্ব সাফল্য দেখাইয়াছেন। একক্রমে দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া তিনি

ক্ষুদ্র মোটরহীন পোতে চড়িয়া অবতরণকামী যাত্রিগণ ষ্টেশনে নামিতে-ছেন। বিরাট বিমানপোত উড়িয়া যাইতেছে।

৩ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ডচ বিমান-চারী মোটরবিহীন পোতে এক জন আরোহী সহ ১৩ মিনিট কাল ব্যোমপথে ছিলেন এবং মোটরযুক্ত পোতের মত তাঁহার পোতকে ইচ্ছামত সঞ্চালিত করিয়াছিলেন।

এসিয়া মাইনর।

এসিয়া মাইনর এসিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহা ভূগোলপাঠক-মাত্রেই জানেন। য়ুরোপের সহিত এসিয়া মাইনরের সংযোগস্থলে লবণাম্বু-বাহী বসফরস্ ও দার্দ্দেনালিশ প্রণালী বিদ্যমান। এই সুবিশাল মালভূমি—এসিয়া মাইনর—আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। এত দিন য়ুরোপ এসিয়া মাইনরকে নগণ্য বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তুরস্কের অভ্যুত্থানে, স্মার্ণা ও মর্ম্মরসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহের আকস্মিক জাগরণে সকলেই আজ এই অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত দেশের অতীতকাহিনী, জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। সার উইলিয়ম্ রাম্‌সে নামক জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল এসিয়া মাইনরে অবস্থিতি করিয়া এতৎ-প্রদেশের যাবতীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। আমরা তাঁহার উক্তি হইতে এসিয়া মাইনর সংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

‘এসিয়া মাইনর’—এই সংজ্ঞা বা নাম মধ্যযুগের কল্পনা-প্রসূত। প্রাচীনযুগের লোকরা এই সুবিশাল মালভূমিকে একার্থবাচক একটি নামে অভিহিত করেন নাই। এসিয়া-মাইনর পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫ শত হইতে ৭ শত মাইল দীর্ঘ। মালভূমির আকৃতি দেখিতে অনেকটা দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠ-দেশের ন্যায়। মধ্যভাগের চারি পার্শ্ব শৈলমালা-পরিবেষ্টিত। মালভূমি হইতে ৫টি শৈলশ্রেণী পঞ্চ অঙ্গুলির ন্যায় প্রসৃত হইয়া ইজিয়ান্ সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

এসিয়া মাইনরে সাধারণ দোকান।

য়ুরোপ ও এসিয়া উভয় মহাদেশের সহিত যুক্ত হইলেও এই মালভূমি প্রধানতঃ কি ভৌগোলিক, কি ঐতিহাসিক, সকল বিষয়েই এসিয়া-চরিত্রবিশিষ্ট।

এ দেশে খাদ্য-দ্রব্য সুপ্রচুর নহে। অধিকাংশ ভূমি অনুর্ব্বর এবং শৈল-পূর্ণ। পূর্ত্তবিদ্যার সাহায্যে অনেক স্থলে শস্যোৎপাদন করা সম্ভবপর, কিন্তু ভূয়োদর্শনের অভাবে এখনও আশানুরূপ শস্য উৎপাদিত হইতেছে না। এ দেশের আকাশে বাতাসে যেন স্বাভাবিক স্বাধীনতা, সাহস ও নৌ-বিদ্যানুরাগের স্পৃহা তরঙ্গিত হইয়া বেড়াইতেছে।

এই বৃহৎ আনাটোলিয়া মালভূমি সর্ব্বত্র সমতল নহে—উচ্চাবচ। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে শীত অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘকালস্থায়ী। গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক সত্য; তবে গ্রীষ্মের অবস্থিতিকাল দীর্ঘ নহে। ভূমিতে উর্ব্বরাশক্তি বিদ্যমান; তবে বারিপাতের উপরেই শস্যোৎপাদন সম্পূর্ণরূপে

নির্ভর করে। বৃষ্টি কবে পড়িবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এ দেশবাসীরা বৃষ্টিদেবতার প্রভাব বিশ্বাস করিয়া থাকে।

প্রাচীন যুগে এসিয়া মাইনরের বিশাল মালভূমি, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

রোমানদিগের সময়ে মিশরের তুলনায় এই প্রদেশের ধনৈশ্বর্য্যের গৌরব ও খ্যাতি অত্যন্ত অধিক ছিল। তাহার প্রধান কারণ—মিশরের ধনরত্ন সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত, সে অর্থের দ্বারা প্রজাসাধারণের কোনও উপকার হয় নাই। কিন্তু এসিয়া মাইনরের প্রদেশের এই অভ্যুদয়কে ধ্বংস করিবার কোন চেষ্টা করে নাই। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগে রোমের প্রভাব বিস্তৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এসিয়া মাইনরের অধিবাসিগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমকগণ এসিয়া মাইনরে প্রবেশ করায়, কিছুদিনের জন্য এতৎপ্রদেশের নানাবিধ ক্ষতি হইয়াছিল। সামরিক বিধানের অন্তর্গত হওয়াতেই এসিয়া মাইনরের ক্রমোন্নতি কিছুকাল স্থগিত ছিল।

এসিয়াস্থিত রোমক শাসনকর্ত্তৃগণ সাধারণতঃ লোভী ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন। অন্যান্য সদ্গুণসত্ত্বেও তাঁহারা প্রায়ই অত্যন্ত নির্দ্দয়-প্রকৃতির পরিচয় দিতেন এবং পরস্বাপহরণের

এসিয়া মাইনরে আদানায় মহিলাদের চরকা কাটা।

পশ্চিমাংশস্থিত অধিবাসিবৃন্দের হস্তে সে প্রদেশের ধনসম্ভার থাকায় তদ্দ্বারা সে স্থানের বহু মঙ্গলজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ প্রদেশের অধিবাসীরা স্বাধীন নাগরিক ছিল। নিজেদের উন্নতিকল্পে তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। লাভ যাহা হইত, তাহা তাহাদিগের দেশেই থাকিত, অন্যত্র যাইত না।

রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াও এসিয়া মাইনর এই যে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, ইহার জন্য রোমের গৌরব করিবার কিছু ছিল না। কারণ, তাহা রোমের সৃষ্ট নহে; তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, রোম এ দ্বারা অপর্য্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করিতেন। এইরূপ যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তৃগণের পেষণ ও সামরিক শাসনের অন্তর্গত থাকিয়াও এক শতাব্দী পরে এসিয়া মাইনর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টজন্মের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়স্ সীজর এই প্রদেশ অধিকার করেন। অগষ্টসের শাসনকালে—খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১ হইতে খৃষ্টীয় ১৪ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে একরূপ নূতন প্রণালীতে শাসনকার্য্য চলিয়াছিল। প্রজার উপর সঙ্গতভাবে কর ধার্য্য হইল। প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের শাসনকার্য্য চলিতে লাগিল।

রোমক সম্রাটগণের শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থলপথে ও জলপথে দেশ-বিদেশের সহিত অনায়াসে সংবাদাদির আদান-প্রদানও হইত। এই সকল ব্যাপারে এসিয়া মাইনর সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভও করিয়াছিল। ঐতিহাসিক গীবনের মতে সে সময় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়াছিল, তেমন আর কখনও করে নাই। তন্মধ্যে এসিয়া মাইনর সুখসমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শীতের সময় সন্ধ্যার পরে লোক দিনে রৌদ্র-তপ্ত প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া শীত নিবারণ করিতেছে।

এসিয়া মাইনরের অধিকাংশ স্থান অনুর্ব্বর। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী করিয়া তুলিতে বহু শ্রম ও সময় প্রয়োজন। নিম্নভূমিগুলি প্রায়ই জলাকীর্ণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল এই সকল ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া থাকে। মালভূমির সুবিশাল মধ্যভাগ শুষ্ক।

পাহাড়তলীর ক্ষেত্রসমূহ এমন ঢালু যে, প্রবল বর্ষণ হইলেও সমুদায় জল গড়াইয়া নিম্নস্থ জলাভূমিতে গিয়া সঞ্চিত হয়। সুতরাং বাঁধ দিয়া উচ্চভূমিতে জল রক্ষা করিতে না পারিলে, তথায় শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উচ্চভূমিতে বাঁধ ও নিম্নভূমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করিলে এ প্রদেশে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইতে পারে।

এসিয়া মাইনরের অধিবাসীরা স্বভাবতঃই পরিশ্রমী। জীবন-সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হওয়ায়, বাধ্য হইয়াই তাহারা শ্রমসহিষ্ণু হইয়াছে। শ্রম কখনও ব্যর্থ হয় না। সুতরাং এ দেশের অধিবাসীরা বিনিময়ে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া থাকে।

এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। পথের ধারে অথবা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বত্রই বাজার। এক গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য অন্য গ্রামে বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে সম্প্রদায়গত বা গ্রামগত কোন প্রকার বাধা নাই; পরস্পরের মধ্যে বেশ প্রীতি ও সহানুভূতির পরিচয় ইহাতে প্রকাশ পায়। এই ব্যবস্থার ফলে নিম্নভূমির উৎপন্ন দ্রব্য, উচ্চভূমিতে চলিয়া যায়; আর উচ্চভূমির উৎপন্ন দ্রব্য নিম্নভূমির অধিবাসীদিগের কাছে বিক্রীত হয়। এইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় সুবিধা খুবই বেশী।

এসিয়া মাইনরের পশ্চিমভাগ ও ইজিয়ান্ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসীদিগের পূর্ব্বকাহিনী বাইবেলে বর্ণিত জেনেসিস্ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে

লিখা আছে যে, জাপেথের এক পুত্রের নাম জভন্। এই জভনের চারি পুত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে এসিয়া মাইনরে গমন করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ ক্রমশঃ এই বিরাট মালভূমির পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অতি পূর্ব্বকালে সাইলেসিয়ার টার্সস্ ও ম্যালস্ এই দুইটি নগর ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরস্পরের প্রতিযোগী ছিল। সমুদ্রকূলের যাবতীয় ভাল ভাল স্থানে ছোট বড় গ্রীক উপনিবেশসমূহ সংস্থাপিত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল গ্রীক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনও প্রয়াস করে নাই। তাহারা এসিয়া মাইনরের অধিবাসীদিগের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া—অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত গ্রীক উপনিবেশে গ্রীক ব্যতীত অন্যান্য জাতিও বাস করিত। তন্মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক ছিল; তবে প্রত্যেক উপনিবেশের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গ্রীকগণই উপভোগ করিত। এইরূপে বিনা বাদবিসংবাদে য়ুরোপের সহিত এসিয়ার পরিচয় আরব্ধ হইয়াছিল।

ক্রসায় রেশমের কারখানা।

কালে এই প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য জলদস্যুতাতেও পরিণত হইয়াছিল। হোমরের অমর কাব্যে—ট্রয় অবরোধ ব্যাপারে—তাহার আভাসও পাওয়া যায়। 'জভন' বংশধরগণের কার্য্যকলাপের ইতিহাস আবিষ্কার করা এখন অত্যন্ত দুরূহ। বর্ণপ্রলেপে জনশ্রুতি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না এবং বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ সে কিংবদন্তী বুঝিতেও অসমর্থ।

এসিয়াবাসী গ্রীকগণ য়ুরোপীয় গ্রীকদিগের সহিত অভিন্ন, এরূপ কল্পনা ভ্রমাত্মক। এসিয়া মাইনরের গ্রীকরা প্রধানতঃ য়ুরোপীয় গ্রীকদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। উভয় পক্ষে বিরোধ লাগিয়াই ছিল। এসিয়ার গ্রীকগণ য়ুরোপীয় গ্রীকদিগের সহিত প্রায় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

এসিয়া মাইনরে কতগুলি গ্রীক উপনিবেশ ছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন যুগে উপনিবেশের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছিল। শুধু সংখ্যাই বা কেন, শক্তিরও তারতম্য ঘটিয়াছিল। কোন কোন উপনিবেশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, আবার কোথাও বা নূতন করিয়া ধ্বংসাবশেষ উপনিবেশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সমগ্র দেশের সমৃদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন ও বিলোপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

এসিয়াবাসী গ্রীকদিগের জীবনযাত্রা একইরূপে আছে; প্রাচীনকালে যেমন ছিল, বর্ত্তমানযুগেও সেইরূপ। কৃষ্ণসাগর এবং সমগ্র এসিয়া মাইনরের চারি পার্শ্ব গ্রীকরা ঘিরিয়া রহিয়াছে।

গ্রীক সাহিত্য ও ললিতকলার পরিণতিব্যাপারে এসিয়াস্থিত গ্রীকগণের প্রভাব অসামান্য। কাব্য-সাহিত্যে হোমরের নাম অগ্রগণ্য। তিনি এসিয়াবাসী গ্রীক ছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একমত।

গ্রীক নাটকগুলিতে য়ুরোপের দাবী আছে সত্য ; কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রগুলিতে এসিয়ার প্রভাব বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এসিয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হেরোডোটস্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গ্রীক সঙ্গীতের অধিকাংশই এসিয়ার সম্পত্তি। চিত্রশিল্পেও প্রাচীন আইওনীয়গণ গ্রীসের গ্রীকগণকে পথিপ্রদর্শন করিয়াছিল। জভনপুত্রগণ বড় বড় সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থপতিশিল্পের আদর্শ য়ুরোপীয় গ্রীকগণকে শিক্ষা দিয়াছিল। কালক্রমে প্রাচীন আইওনীয় শিল্পের স্থলে এথেনীয় শিল্পাদর্শ সমগ্র গ্রীসদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মাইনরের গ্রীক নগরগুলি কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল। পৃথিবীর "সপ্ত আশ্চর্য্য" বিষয়গুলির অধিকাংশই এসিয়ায়। য়ুরোপীয় গ্রীসের তাহাতে দাবী-দাওয়া নাই।

জভনপুত্রগণের আশেপাশে যাহারা বাস করিত, পৃথিবীর লোক তাহাদের সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই অবগত আছেন। ইহাদিগের নাম হেট্টিট। এই হেট্টিট জাতি আইওনীয়দিগের প্রতিযোগী ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় বিরাট যুদ্ধ না বাধিলে এতদিনে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত হইত।

স্মার্ণার বালকবালিকা।

লিসিয়া ও ফ্রিজিয়ার স্মৃতি-সৌধও ক্যাপাডোসিয়ার শৈল-মন্দির অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর। এসিয়া মাইনরে একটি ধ্বংসাবশিষ্ট নগর আছে, মুসলমানগণ তাহাকে "একাধিক সহস্র গম্বুজবিশিষ্ট নগরী" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

এসিয়াস্থিত গ্রীক নগরসমূহে এত অধিকসংখ্যক স্থপতিশিল্পসমন্বিত মনোহারী স্মৃতি-সৌধ আছে যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এসিয়া

সুদূর অতীতে—ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে, এসিয়া মাইনরে একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তি বিদ্যমান ছিল। কৃষ্ণসাগর হইতে ১শত মাইল দূরে—দক্ষিণে বোগস্-কেউই নামক স্থানে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের অন্তর্গত অনেকগুলি বিশিষ্ট নগর ও রাজধানী ছিল। এই রাজ্য ও তাহার জনগণ সম্বন্ধে ইতিহাস রচনা করিবার সময় এখনও আইসে নাই। অনেক চেষ্টায় যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের একটা রেখামাত্র আঁকিতে পারা যায়।

হেটিট সাম্রাজ্য খৃষ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। লিডীয়ান্ সাম্রাজ্য হেটিট সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত। উহার রাজধানী সার্ডিস্। কথিত আছে, এই নগরী অত্যন্ত মনোহারিণী ছিল। কালক্রমে সার্ডিস্ ভূগর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছিল। কতিপয় উৎসাহী মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিক উক্ত নগরীর উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববৎসর পর্য্যন্ত (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁহারা চেষ্টা করিয়া ভূগর্ভ হইতে এই নগরীর কিয়দংশের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। ফ্রিজীয়-গণের আক্রমণের ফলে লিডীয় সাম্রাজ্য হেটিট সাম্রাজ্য হইতে বিভক্ত হইয়া যায়। ফ্রিজীয়গণ খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে য়ুরোপ হইতে দার্দ্দেনালিশ প্রণালী পার হইয়া এসিয়া মাইনরে আপতিত হইয়াছিল।

রোমকযুগে এসিয়া মাইনরের কিরূপ সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার জনসংখ্যাই বা কিরূপ ছিল, বিবরণ দ্বারা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। মালভূমির পশ্চিমাংশকে রোমকগণ 'এসিয়া' নামে অভিহিত করিত। এই প্রদেশ ধনৈশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্থানের অধি-বাসীরা সুপণ্ডিত ছিলেন। ২৩০টি বিভিন্ন নগরের নামে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকেই স্বস্বপ্রধান ছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন প্রত্যেক নগরে প্রচলিত ছিল।

উল্লিখিত নগরগুলির কোনটা বা খুব বড়, আর কোনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ছিল। কিন্তু প্রত্যেক নগরেই মিউনিসিপ্যালিটী ও স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া কাহারও গৌরব কম ছিল না।

কুম্ভকার পটী।

মর্য্যাদা হিসাবে প্রত্যেক নগরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। তন্মধ্যে তিনটি নগর "এসিয়ার প্রথম নগর" বলিয়া গৌরবের দাবী করিত। একটি নগরের নাম ছিল Seventh of Asia (এসিয়ার সপ্তম নগরী) সম্রাটের ধর্ম্মই প্রত্যেক নগরের ধর্ম্মাদর্শ ছিল। সমগ্র দেশের প্রতি প্রত্যেক নগরবাসীর ভক্তি ছিল—ইহার নাম দেশাত্মবোধ।

যে সকল প্রদেশ অনুন্নত ছিল—তথায় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রভাব তেমন দেখা যাইত না। আয়তন হিসাবে নগর বা

গ্রামের পর্য্যায়ভেদ হইত না। যে স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইত, তাহাই নগর বলিয়া খ্যাত ছিল। আয়তন বিশাল হইলেও স্বায়ত্ত-শাসন না থাকায় সে স্থান গ্রাম নামেই অভিহিত হইত।

লাইক্যাওনিয়া ও ক্যাপাডোনিয়া অঞ্চল এখন জনশূন্য। কিন্তু এককালে এতদঞ্চলে অসংখ্য বসতি ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সাধারণের চাঁদায় এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তম্ভগাত্রে যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতেই উহা অবগত হওয়া যায়। চাঁদার পরিমাণ ৬ হাজার হইতে ৫ শত দীনার। দীনারের মূল্য তখন কত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় এখন নাই।

খৃষ্টীয় তৃতীয় অব্দে রোমক প্রভাব এসিয়া মাইনর হইতে বিলুপ্ত হইতেছিল। সেই সময় মধ্য এসিয়া হইতে বহু অসভ্য জাতি একাধিকবার এসিয়া মাইনর আক্রমণ করে। এতদ্ব্যতীত মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণের সহিত এসিয়া মাইনরের ঘোর শত্রুতা চলিয়া আসিয়াছিল। উভয়পক্ষে এজন্য ভীষণ সংগ্রাম বহুবার ঘটিয়াছিল।

ইহার পর আরবগণের ভীষণ আক্রমণ ত ছিলই। মক্কা হইতে মহম্মদ পলায়ন করার পর হইতে মুসলমানবাহিনী কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারদেশে আবির্ভূত হইতে লাগিল। ৬৬০ হইতে ৯৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত দলে দলে আরব-দস্যু তরাস্ পার হইয়া এসিয়া মাইনরে প্রতি বৎসরেই অত্যাচার করিয়াছিল। আরব-দস্যুগণ প্রত্যেক নগরই এক একবার অবরুদ্ধ করিয়াছিল।

মধ্যে মধ্যে এসিয়া মাইনরে এক এক জন প্রতাপশালী সম্রাট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হেরাক্লিয়স্ অন্যতম। তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তিনি সাসানীয় শক্তিকে চূর্ণ করিয়া ফেলেন। তিনি সেনাবাহিনী সহ মেসোপোটেমিয়া, পারস্য ও আর্ম্মেনিয়ার মধ্য দিয়া গমন করিয়া সাসানীয় রাজশক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। তাঁহার বংশধরগণও কালক্রমে—৯৬৫ অব্দে আরবদিগকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয়েন।

উল্লিখিত দীর্ঘকালব্যাপী সমরাভিযানের ফলে দিগন্ত-প্রসারী রাজবর্ত্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। এই পথে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যসম্ভার প্রেরিত হইত। সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্য এই পথের সাহায্যেই চলিত। বাইজান্টাইন বাহিনী আরব-দস্যুগণের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এই পথ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। আরবগণ সে পথের সংস্কারের কোনও চেষ্টা করে নাই।

এখন ধারাবাহিক রাজপথের কোন নিদর্শনই আর পাওয়া যায় না। শুধু স্থানে স্থানে এখানে সেখানে রোমক যুগের পথের সামান্য রেখা মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে সেখানে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন (mile-stone) দেখিয়াই অনুমান করিতে হয় যে, রাজপথ সেই স্থানে ছিল।

কিন্তু রোমক যুগের সামাজিক ব্যবস্থা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আরব-দস্যুগণের আক্রমণ আকস্মিক ছিল। দেশবাসিগণের উপর তাহারা স্থায়িভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া পশ্চিম এসিয়ায় প্রাচীন যুগের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রভাবও ছিল। আক্রমণকারী বাৎসরিক শস্য নষ্ট করিতে পারে, দেশমধ্যে অভাব ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করিতে সমর্থ; কিন্তু বৃক্ষ, লতা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ধ্বংস করিতে পারিবে না।

শস্য সে বৎসরের কতক নষ্ট হইলেও পরবৎসরে আবার রোপণের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইত; কিন্তু বৃক্ষ একবার কাটিয়া ফেলিলে ফলধারণোপযোগী বৃক্ষ উৎপাদন করা বহুসময়সাপেক্ষ। য়ুরোপের মহাযুদ্ধে জ্ঞানী, সুসভ্য য়ুরোপীয়গণ শত্রুদেশের কত গ্রাম ও নগর যে বৃক্ষশূন্য করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শত্রুর সর্ব্বনাশের জন্য সুসভ্য বিবদমান শক্তিপুঞ্জ আক্রান্ত দেশকে বৃক্ষশূন্য করিবার যে পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, প্রাচীন যুগের আরব-দস্যুগণের যুদ্ধনীতির সহিত তাহার তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১০৭০ খৃষ্টাব্দে তুর্কজাতি এসিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এসিয়ার গৃহহীন বেদিয়া-জাতি—তুর্কমাণরা এসিয়া মাইনরকে পঙ্গপালের মত ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের আগমনের ফলে সামাজিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ক্রমে ক্রমে ভঙ্গ হইল। কৃষিকার্য্যের অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের ক্রমশঃ অভাব ঘটিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্যহেতু দেশের জনসংখ্যারও হ্রাস ঘটিতে লাগিল।

লোকসংখ্যার অল্পতাহেতু শ্রমিক-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল। বাঁধ দিয়া বৃষ্টির জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল। শ্রমশিল্পও ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। গ্রামের কৃষি, নগরের শিল্প ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইল।

সুলতানগণ যথাসাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেলজুক তুর্ক বা অটোমন্ তুর্করা ধর্ম্মোন্মাদ ছিলেন না। জেতার পক্ষে যতটা উদারতা প্রকাশ করা সম্ভবপর, বিজেতাদিগের প্রতি তাঁহারা ততটা উদার ছিলেন। প্রাচীন সামাজিক প্রথা সংরক্ষণের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তাঁহারা রোমকযুগের প্রথা, শিক্ষানুরাগ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

তাহা ছাড়া অধীন জাতিসমূহের অভ্যুত্থান রোধ করিবার জন্য অবাধ হত্যানীতির অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি এমন বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে দেশ ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। বিগত ৩০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নীতি এত অসঙ্কোচে অনুসৃত হইয়াছিল যে, তাহার বিভীষণ কাহিনী বর্ণনার অতীত।

এইরূপে উন্নতির মূলভিত্তি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ইহা ইচ্ছাকৃত, এমন কথা বলা যায় না। অবনতি যখন ঘটে, তখন এইরূপই হয়।

মার্কিণ মিশনের প্রতিষ্ঠিত স্কুলকলেজগুলি এই স্থানে অনেক কায করিয়াছে। প্রাচীন যুগে কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য পূর্ত্তবিভাগ যেরূপে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার উন্নততর প্রণালীতে জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিলে এ দেশের কৃষির উন্নতি সম্ভবপর।

এ দেশে বহু খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। তাম্র, সীসা, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এসিয়া মাইনরে হেট্টিট সম্রাটগণের সময়ে বিদ্যমান ছিল। লিডীয়া ও মাইসিয়ায় স্বর্ণখনি এক দিন দেশবিখ্যাত ছিল। এখনও এ সকল মূল্যবান্ ধাতু মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত আছে।

ধূতুরার দেবতা।

কনকচাঁপা ফুটেনিক' আমার আঙিনায়
পুরন্দরে পূজ্‌ব আমি কেমন ক'রে হায়!
আমার গৃহের আশে-পাশে রসাল মুকুল নাই
পঞ্চশরের উপাসনা হলো না মোর তাই।
নেই আঙিনায় রক্ত-জবা, রক্ত করবীর,
পূজা আমার হলো না তাই জগজ্জননীর।
নাই মালতী-মল্লী-জাতী-তুলসী-চন্দন
অর্চ্চিতে তাই পারিনি হায় অচ্যুত-চরণ।
সরোবরে ফুট্‌ল না মোর রক্ত শতদল
রাখেন কোথা পদ্মালয়া তাঁহার পদতল।
শেষ ভরষা কুন্দ-কুসুম ফুট্‌ল না আমার
রচ্‌ব কিসে বাগ্‌দেবতার অর্ঘ্য-উপচার?
আঁদার পাঁদার ভরে' আমার ধূতুরো ফুটে রয়
কোন্ দেবতার পূজা বলো তা' দিয়ে আর হয়?
এক ভোলানাথ, তোমার আচার বিচার বিধান নেই
সকাল বিকাল তুলে তোমার চরণ-তলে দেই।
অশরণের শরণ তুমি লও না কোন' দোষ
তুমি বিনা দেবতা আমার নেইক' আশুতোষ।

শ্রীকালিদাস রায়।

দ্বিত্ব নারিকেল

আফ্রিকার সন্নিহিত একটি দ্বীপ আছে, তাহার নাম সিচিলিস্। এই দ্বীপে একপ্রকার নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বিত্ব বা "ডবল কোকনট" বলা যায়। এই অপূর্ব্ব ফলের লাটিন নাম Coco-de mess Syn. Lodolcia Seychellarum। সিচিলিস্ দ্বীপ পূর্ব্বে সিংহ-শার্দ্দূল-সেবিত গহন অরণ্যে পূর্ণ ছিল। বন্য বর্ব্বরজাতি এখানে বাস করিত। ইংরাজ এখন এই দ্বীপের মালিক। বহু প্রচেষ্টার পর বনভূমি পরিষ্কৃত হইয়া এখানে নানাবিধ কৃষিকার্য্যের প্রসার হইয়াছে। ইক্ষু, চীনাবাদাম, নারিকেল, খর্জ্জুর, এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্বিত্ব নারিকেল একটি প্রধান ফসল।

দ্বিত্ব নারিকেল।

এই নারিকেলবৃক্ষ আমাদের দেশের তালগাছের অনুরূপ। ফলও অনেকটা নারিকেলের মত দেখিতে। তবে আকারে যথেষ্ট বৃহৎ এবং একটি ফলের মধ্যে দুই হইতে তিনটি নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ছোব্‌ড়া' বা বাকল (husk) সহ প্রত্যেক নারিকেলের ওজন এক মণ বা ততোধিক হয়। ইহাকে যমজ নারিকেলও বলা যাইতে পারে। কেন না, প্রত্যেক ফল পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ থাকে। সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ ইহাকে 'দরিয়ারী' নারিকেল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। পারস্য ভাষায় 'দরিয়া' অর্থে নদী বা সমুদ্রকে বুঝায়। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপে এই ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম দরিয়ারী নারিকেল হইয়া থাকিবে। এই নারিকেলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগের আকার নৌকার ন্যায় দেখিতে হয়, এ জন্য উহাকে কিস্তি নারিকেলও বলা যায়। ইহা নৌকাকৃতি করঙ্গ-বিশেষ। আফ্রিকা মহাদেশের উষ্ণ কোটিমণ্ডল ভিন্ন অন্যত্র এই ফল জন্মিতে দেখা যায় নাই। অধুনা এ দেশের দ্বীপসমূহেও ইহার চাষের চেষ্টা হইতেছে।

কঙ্করময় বালুকারাশি-সম্ভূত সমুদ্রগর্ভজ লবণাক্ত ভূমি এই নারিকেলের চাষের পক্ষে অনুকূল। ইহার মূল এত বড় যে, মৃত্তিকামধ্যে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। লবণাক্ত দ্বৈপ বায়ু ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়। প্রত্যেক চারা ৩০ হইতে ৪০ ফুট দূরে রোপণ করিতে হয়। সুপক্ব ফল সংগ্রহ করিয়া ৬ হইতে ৮ মাসকাল অন্ধকার গৃহে রাখিলে উহার অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুরগুলি ২।৩ ফুট উচ্চ হইলেই ভূমিতে রোপণ করা যায়। এক বৎসরের মধ্যেই উহা ২।৩ ফুট উচ্চ হয়। ফলের অঙ্কুর বাহির হইলে, উহাকে ছায়াশীতল স্থানে হাপোরে পুতিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর গাছ বর্দ্ধিত হইলে, অর্থাৎ ২।৩ ফুট উচ্চ হইলে যথাস্থানে রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাকালই রোপণের উপযুক্ত সময়।

মৃত্তিকাস্তে অন্ততঃ ৫ ফুট পরিসরবিশিষ্ট গর্ত্ত খনন করিয়া প্রত্যেক গর্ত্তে একটি করিয়া চারা রোপণ করিতে হইবে। তৎপরে লবণ-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। এই নারিকেলফলের পচা বল্কল ও লবণই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। ১০ হইতে ১২ বৎসরে এই গাছ পুষ্পিত ও ফল-ধারণের উপযোগী হয়। ফলের সংখ্যা অধিক হয় না। কোনও বৃক্ষে কদাচিৎ ১০ হইতে ১২টার অধিক ফল দেখা যায়।

এ দেশে সমুদ্রোপকূলে, দ্বীপে বা চরে এই নারিকেলের চাষ সম্ভবপর। সিংহলে সংপ্রতি ইহার চাষ হইতেছে। ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে, বঙ্গোপসাগরের উপকূল-ভূমিতে, সিঙ্গাপুর, পিনাং, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে ইহার বহুল চাষ হইতে পারে। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের ভূমিও এই নারিকেলের চাষের উপযোগী। পৃথিবীর যে যে স্থলে নারিকেল জন্মে, প্রায় তত্তৎস্থলেই ইহার আবাদ সম্ভবপর। মরিসস্ ও সিচিলিস্ দ্বীপের বন-বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই নারিকেলের চাষ বিপুল পরিমাণে হইতেছে।

এই অপূর্ব্বদর্শন নারিকেলের চাষে বিশেষ লাভ আছে। কাঁচা ফলের শস্য নারিকেলের ন্যায় সুখাদ্য। আমাদের দেশের তালফলের শস্য যেরূপ পুষ্ট ও নিরেট (solid), এই নারিকেলের শস্যও তদ্রূপ। পক্কফলের শস্য অতিশয় কঠিন ও দন্তের দ্বারা অচ্ছেদ্য। সুতরাং এই অবস্থায় উহার শস্য খাদ্যের অযোগ্য। ইহার শস্যাধার-চাড়া বা খোসা (shell) কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রস্তরবৎ কঠিন। কুঠার, করাত বা বাটালির দ্বারা উহা কর্ত্তন করিতে হয়।

এই নারিকেলের শস্য তৈলপূর্ণ। উক্ত তৈলের দ্বারা নানাবিধ কার্য্য হয়। প্রদীপ জ্বালান ও সাবান প্রস্তুত ব্যতীতও রন্ধনকার্য্যে এই তৈল ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা মূল্যের তৈল সিচিলিস্,মরিসস্ ও মাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার খৈল ও বল্কল বা ছোব্‌ড়া (husk) উৎকৃষ্ট সার। বল্কলের আঁশ (fibre) দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত হয়। নারিকেলের খৈল পশ্বাদির আহার্য্যস্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা ইহার চাড়া বা খোসা (shell) ভিক্ষাপাত্র বা করঙ্গস্বরূপ ব্যবহার করেন। এই চাড়া হইতে বোতামও প্রস্তুত হয়। একটি নারিকেল ফল হইতে ২।৩টি করঙ্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটির মূল্য আকারানুসারে ৩৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত। এই করঙ্গগুলি দীর্ঘকাল-স্থায়ী। নারিকেলের শস্য পাটায় ঘষিয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। এই দ্বিত্ব নারিকেল-বৃক্ষের সকল অংশই কাযে লাগে। ইহার পাতার দ্বারা সুন্দর পাখা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহ-নির্ম্মাণে এই পত্র ছাউনীস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তালকাষ্ঠের ন্যায় এই নারি-কেলের কাঠও দৃঢ় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহার দ্বারা ঘরের খুঁটি, কড়ি ও বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বল্কলহীন ফলের ওজন ২০ হইতে ২৫ সের।

মরিসস্ (মরিচ) দ্বীপ হইতে প্রবন্ধলেখক ছয়টি অঙ্কু-রিত ফল আনাইয়াছিলেন। উহাতে ১২০৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যানের অধ্যক্ষ মহা-শয়ের নামে ঐ ফল বোম্বাই বন্দরে আসিয়াছিল। তথা হইতে রেলযোগে ফলগুলি কলিকাতায় আনীত হয়। রেল-ওয়ে কুলীদিগের অসাবধানতায় ৪টি ফলের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট ২টি গাছ ১০।১২ ফুট উচ্চ হইয়া মরিয়া যায়। গণ্ডারকীটের উৎপাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই কীট নারিকেল গাছের ভীষণ শত্রু।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

কলির মহিমা।

(তুলসীদাস।)

সত্য বলিলে পৃষ্ঠের পরে যষ্টি পতন ভয়,—
মিথ্যা আজিকে দুনিয়ার রাজা—জগৎ করেছে জয়।
দুগ্ধ বিকায় অলিতে গলিতে পথে হাটে ঘুরে হায়,
দোকানেই থাকি সুরা গন্ধিকা নিঃশেষ হয়ে যায়।

দোষী নির্দ্দোষ নাহিক বিচার, মুক্তি লভিছে চোর,
সাধুরই ভাগ্যে লাঞ্ছনা আর অপমান অতি ঘোর।
নিরীহ বেচারা পথের পথিক তার গলে দাও ফাঁসি,
হায় কলিকাল তোর তামাসায় কভু কাঁদি কভু হাসি।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

মিলন-রাত্রি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হাসির সহিত রাজকুমারীর ভাবটা বেশ ভাল রকমই জমিয়া উঠিয়াছে। দেখা-শুনা এক দিনও তাঁহাদের বাদ পড়ে না। বিবাহপর্ব্ব শেষ হইবার পর নরেন সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন বন্ধু পাইয়া অণুভার বিরহে হাসির আর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না, অধিকন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক আবির্ভাবে হাসির মা-দিদিমাও নববধূর অভাব অনুভব করিবার বড় একটা অবসর পায়েন না। বাড়ীর সকলেই রাজকন্যার রূপে-গুণে মুগ্ধ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ বাড়ীর কর্ত্তা কৃষ্ণলাল। তিনি একদিন ওঁ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝ্‌লে, মা, বল ত?"

জ্যোতির্ম্ময়ী অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিলেন,—"জটিল অসম গ্রন্থির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাসাম্যে মিলিত হচ্ছে, ওঙ্কার শব্দ আমাদের অন্তরাত্মাকে এই প্রবুদ্ধি দান করে।"

কৃষ্ণলাল বালিকার এই ব্যাখ্যা অবাক্ হইয়া শুনিলেন,—কি সহজ ব্যাখ্যা! দিস্তা দিস্তা কাগজে লিখিয়া তিনি যাহা বুঝাইতে না পারিয়াছেন —বালিকা সংক্ষেপে দু' এক কথায় কি সুন্দররূপে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিলেন!

এ বাড়ীতে আসিয়া যখন জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহকর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়ান— কৃষ্ণলাল তাঁহার স্নিগ্ধবিদ্যুল্লতাসদৃশ মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া ভাবেন, কোন্ স্বর্গের দেবী ইনি? না জানি কি উদ্দেশ্যে মর্ত্ত্যে ইঁহার আবির্ভাব? আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কৃষ্ণলাল মনে মনে বালিকার প্রতি আনত হইয়া পড়েন।

হাসির মা-দিদিমা জ্যোতির্ম্ময়ীর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। কি অমায়িক সরলতা! রাজগৌরব, ধনগর্ব্ব এক ফোঁটা তাঁহাতে দেখা যায় না। দিদিমা'র কাছে পুরাতন দিনের গল্প কি আগ্রহেই জ্যোতির্ম্ময়ী শুনেন, আর রান্নাঘরের ধোঁয়া ও গরম অগ্রাহ্য করিয়া হাসির মাতার নিকট রান্না শিখিতেই বা তাঁহার কিরূপ উৎসাহ! কি যে ছাই-পাঁশ রান্না! কিন্তু রাজকন্যার মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না।

হাসি রাজকন্যাকে প্রেমিকার দৃষ্টিতে দেখে। অন্যের মুখে তাঁহার রূপ-গুণের কথা শুনিলে সে খুবই আনন্দলাভ করে—কিন্তু নিজের মনে তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা সে করে না— সমস্ত প্রাণে তাঁহাকে ভালবাসিয়া সে শুধু অন্তরে অন্তরে সুখ উপভোগ করে।

এই অনুকূল প্রীতিমধুর বায়ুর সংঘাতে জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের বালিকাসুলভ চাপা দরজাটি খুলিয়া গিয়াছে, হাসি-খেলার মধ্য দিয়া নবজ্ঞান অভিজ্ঞানে তাহার দিব্যদর্শন-শক্তিও বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনে হইত, এ যেন সত্য-যুগের পুণ্য ঋষিধাম, এখানে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা নাই, কুটিল-জটিল আলোচনা নাই, ওঙ্কাররূপ ইঁহাদের ধ্যান-ধারণার দেবতা, সরলতা শান্তি এ গৃহের বায়ুবেষ্টনী। জ্যোতির্ম্ময়ী তৃষাতুর প্রাণে এই পুণ্যধামের শান্তিসলিল পান করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেন— যদি সমগ্র বিশ্ব-জীবনের ধারা এইরূপ শান্তিময় হইত! বালিকা এই ভবনের নাম রাখিলেন 'আনন্দধাম'।

এখানে আসিয়া এক দিন সে দিদিমা'র বারান্দায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হাসির সহিত নীচেতলার একটি ঘরে আসিয়া দেখিল, এক জন সহিস ছোকরার তক্তাপোষের উপর জগদ্ধাত্রীর মত বসিয়া তিনি তাহার সেবা করিতেছেন। দিদিমা'কে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অবাক্ হইয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দিদিমা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমার মনে ভাই শুচিবাই অতটা নেই। এদের ত আপনার জন এখানে কেউ নেই, দিদি,—দেশ ফেলে পর-দেশকেই ওরা আপন করেছে—আমরা যদি রোগে শোকে ওদের না দেখি—তা হ'লে কে দেখ্‌বে বল? তবে হিন্দুর

ঘরে জন্মেছি—হিন্দুর আচার-বিচার ভুলতে পারিনে, গিয়ে কাপড় ছেড়ে স্নানাহ্নিক ক'রে ঘরে ঢুকব,—যদিও মনে বুঝি সেটা ভ্রান্তি।"

হায় রে! এমন দিন সমস্ত হিন্দুস্থান এইরূপ করিয়া ভাবিতে শিখিবে!

খেলা-ধূলার মধ্যে, হাসি-গল্পের মধ্যে বালিকা এক একবার সহসা গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। তাঁহার মনে পড়িয়া যায়—সেই কথা—সেই শবসাধন মন্ত্র—তিনি শিহরিয়া উঠেন—গল্প-গুজবের মধ্যেও অন্তঃসলিলাভাবে তাঁহার মনে ওঠে—কখনো না—কখনো না—এরূপ খাতুকের কার্য্যে মুক্তি নাই—নাই। নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি যখন চিন্তানিমগ্ন হইবার অবসরলাভ করেন—তখন এই কথাতেই তাঁহার মনঃপ্রাণ ভরপূর হইয়া ওঠে—তিনি নিবিষ্টচিত্তে ভাবেন, কখনো না—কখনো না, প্রতিহিংসা ভারতের মুক্তির পথ নহে, মিলন-মন্ত্রেই নষ্ট ভারত পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু কে শিখাইবে সে মন্ত্র, কোথায় পাইব তাহার সাধন-দীক্ষা! ভগবান, কবে তুমি আমাদের মহানিদ্রা ভঙ্গ করিবে!

* * * * *

এক দিন আহারান্তে দুই সখীতে পালঙ্কে বিশ্রামশয়নকালে, হাসি রাজকন্যার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "এস ভাই, আমরা সই পাতাই।" যেমন বিনা ফুলে সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না—সেইরূপ হাসির মনে হইতেছিল—একটা কিছু না পাতাইলে তাহাদের বন্ধুত্ব ঠিক পূর্ণশ্রী লাভ করিতেছে না।

রাজকন্যা আদর করিয়া ডাকিলেন—"সই, সই, ওগো সই"—তাহার পরই হাসিয়া বলিলেন—"না ভাই, এ ডাকটা বড় নভেলি রকম শোনাচ্ছে। তা ছাড়া সই হলেই ত মনের কথা বলতে হয়, কি বলব তোকে, ভাই? আমার মনে ত কোন লুকান কথা নেই।"

হাসি সখীর গাল টিপিয়া বলিল—"বটে! নেই বই কি! আমি বেশ জানি আছে, আমাকে শুধু ফাঁকি দেবার চেষ্টা।" বলিতে বলিতে হাসির 'শরদার' কথা মনে পড়িয়া গেল; বলিল—"শরদাকে ত তোমাদের ওখানে দেখতে পাইনে আজকাল, তাঁর খবর কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের ভাব গোপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; রাঙ্গা মুখ একেবারেই রাঙ্গা হইয়া উঠিল। হাসি হাসিয়া বলিল,—"এই মা বল্‌ছিলে, কোনো মনের কথা তোমার বলার নেই!"

জ্যোতির্ম্ময়ী সংযত হইয়া বলিলেন,—"তুই যে রকম কথা ভাবছিলি, তা মোটেই না—আমি দেশকে বরণ করেছি, আমার কি ও সব ভাবনা ভাববার অবসর আছে, ও সব বাজে কথা রাখ্।" রাজ-কন্যার এ ছলনার কথা নহে, তিনি নিজের মনের সহিত এইভাবে বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছিলেন।

"আচ্ছা দেখা যাবে,—দেখা যাবে!"

"বেশ, যখন দেখবি—তখন বলিস্। এখন আমার মনেও যে তোর মতন একটা সখ্ জেগেছে।"

"কি সখ?"

"পাতাবার সখ—পূর্ণ করবি সে সাধ! বল্ আগে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়—!"

"আমার ভাই তোর সঙ্গে মা পাতাতে সখ যায়।"

এবার হাসির মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল,—"কি যে বলিস, ভাই!"

"সত্যি বল্‌ছি! এবার থেকে তোকে আমি মা ব'লে ডাকব,—হতেই হবে তোকে আমার মা। অনেক দিন থেকে এই সাধ আমার মনে জেগেছে।—পূর্ণ কর, ভাই!"

"আমার মা ত ভাই তোমার সে সাধ পূর্ণ করছেন। তুমি আমার সখী—প্রাণের সখী।—"

"মা কি সখী হ'তে পারে না নাকি? আমি এমন মা চাই—যার একমাত্র মেয়ে হব আমি—আমি বড় স্বার্থপর। তাকে আর কেউ মা বলতে পারবে না,—বুঝলি, তুই?"

এই সময় দিদিমার আবির্ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বিছানায় টানিয়া বসাইয়া বলিলেন,—"দিদিমা, আপনি বলুন; আমি হাসির সঙ্গে মা পাতাতে চাই, পচা মামুলি সই পাতানোর চেয়ে এটা লক্ষ গুণে ভাল কি না?"

দিদিমা মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়ীর শুভ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া মুখে বলিলেন, "তাতে দোষ কি রূপসী নাতনী, তোর ত ভাগ্য ভাল, বিনা কষ্টে মেয়ে পাচ্ছিস,—আর অমন গুণের মেয়ে—ভাগ্যবতী তুই!"

কিন্তু হাসির মন প্রসন্ন হইল না, সে বলিল,—"না, ভাই, আমি তোমাকে কিছুতেই মেয়ে বল্‌তে পারব না।"

রাজকন্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"তুই মেয়ে না বলিস, আমি তোকে বলব মা।" বলিয়া তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়া,তাহার পায়ে হাত ঠেকাইলেন। হাসি হাসিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"করিস্ কি, ভাই, করিস্ কি?" রাজকন্যা তখন দুই হাতে হাসির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"মা আমার, প্রাণের মা, আমার প্রিয় সখী মা। অনেক দিন কাউকে মা ব'লে ডাকিনে। তোকে আজ মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ যেন ভরপূর হয়ে উঠলো।"

দিদিমা'র দুই চক্ষু আহ্লাদে জলে ভরিয়া আসিল। হাসি কিন্তু রাগ করিয়া বলিল, "কি যে করিস, ভাই, তুই! ফের যদি ও কথা বল্‌বি ত কথা বন্ধ—চিরজন্মের আড়ি!" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বৈকালে বাড়ী যাইবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিকে সঙ্গে লইলেন। মোটরে চড়িয়া হাসি বলিল, অণ্ডাদি গিয়ে পর্য্যন্ত হ্রদে আর বেড়ান হয়নি, আজ জলকে যাবি, ভাই?"

"বেশ ত, বাবাকে বা তোর শরদাকে সঙ্গে নেব। তিনি আজ প্রসাদপুর থেকে এসেছেন, আজ দেখা হবে এখন।"

হাসি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি আর কাউকে চাইনে, আমরা থাকব নৌকার উপর শুধু দু'জনে—তোমাতে ও আমাতে—"

জ্যোতির্ম্ময়ী সকৌতুকে বলিলেন, "আমি ত, ভাই, হাল ধরতে জানিনে, তোর নেয়ে হ'তে পারব না ত।"

"তরী না হয় অকূলেই ভাসবে; আমি তোকেই চাই। আমি না হয় হাল ধরব, তুই দাঁড় টানিস, তা ত পারবি?"

"আচ্ছা, বেশ! মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নেই, রাজি আছি,—"

হাসি মুখ ভারী করিয়া বলিল, "আবার ঐ কথা! তবে আমি নৌকায় চড়ব না—"

"সে ভাল কথা! আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে কাঁচা দাঁড়ির হাতে তরীখানা উল্টে গিয়ে তোর অমন সুন্দর কাপড়খানার রংটা কেরং ক'রে তোলে?" তাঁহাদের বাক্য-মীমাংসা শেষ হইতে না হইতে মোটরখানা গাড়ীবারান্দায় ঢুকিল, পণ্ডিত মহাশয় আগে হইতেই রাজকন্যার অপেক্ষায় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। নামিতে না নামিতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তিনি কহিলেন—"মা, একটা কথা আছে।"

রাজকন্যা হাস্যমুখে বলিলেন, "কালকের জন্য কথাটা রেখে দিলে চলে না, পণ্ডিত মশায়?"

"না, বড় জরুরি কথা, বেশী সময় নেব না। ঐ গাছতলা-টায় একবার এসে যদি দাঁড়াও, মা—"

রাজকুমারী হাসিকে কহিলেন, "হাসি, তা হ'লে, ভাই, তুমি উপরে গিয়ে ব'স—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের কথাটা শুনে নিই।"

হাসি বলিল, "তোমরা কথা ক'য়ে নেও না, আমি তত-ক্ষণ বাগানেই একটু বেড়াই।"

ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ, এই সময় রাজাবাহাদুর এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কন্যা অনুরোধবাক্যে কহিলেন—"বাবা, হাসি কিন্নর হ্রদে বেড়াতে চান, তুমি নিয়ে যাও না, বাবা! পণ্ডিত মশায়ের কি কথা আছে, শুনে আমিও এখনি আসছি।"

রাজা বলিলেন "বেশ ত! এস হাসি, তোমাকে নৌকায় বেড়িয়ে আনি।"

হাসি আর তখন কোন আপত্তির কথা খুঁজিয়া পাইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুখের তরঙ্গ উঠিতেছিল—হ্রদের জলে এবং রাজার মনে—সম্ভবতঃ হাসিরও মনে—কিন্তু ম্লান হাসির মধ্যে সে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

শীতকালের অপরাহ্ণ, সূর্য্যদেব অস্তপারে লুকাইয়া অপ্রকাশ্যভাবে দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার অঙ্গচ্ছটা বিকীর্ণ করি-তেছেন—আর প্রকাশ্য দিব্যরূপে গগন-অঙ্গন শোভিত করিয়া ষষ্ঠীর শশিকলা রবির কনক-কিরণে মধুরতর সান্ধ্য-মহিমা ঢালিয়া দিয়াছে।

দাঁড়ে আহত হ্রদ-বারির উচ্ছ্বাসগীতি তালে তালে উজ্জ্বল লহরীতে নাচিয়া নাচিয়া বাস্তব জগতে যে কুহক স্বপ্নভাব রচনা করিতেছিল, নীরসম্ভবা মোহিনীমূর্ত্তিরূপা হাসি

কর্ণধারবেশে তরীমূলে বসিয়া সেই স্বপ্নভাব বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল।

পৌষমাস— কিন্তু হাসির সাজসজ্জায় বাসন্তীর শোভা। তাহার রেশমী সাড়ী পীতবর্ণ, জ্যাকেট নীল এবং মাথায় পাতলা সালের ধানী রঙ্গের ক্ষুদ্র ওড়না। মোটরে চলিবার সময় বায়ুর দৌরাত্ম্য হইতে কপালের চুলগুলাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ওড়নাখানা মাথার উপর হইতে জিপসি ফ্যাসানে গলা বেড়িয়া পিঠের দিকে বাঁধা। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও বায়ুচুম্বিত চূর্ণকুন্তলরাশি ওড়না-স্খলিত হইয়া মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। হাসি এক হাতে হাল ধরিয়া রাখিয়া সচকিতভাবে মুখ তুলিয়া অন্য হাতে সেই বিদ্রোহী চুলগুলাকে পুনরায় ওড়না-বন্ধ করিতেছিল।

কি সুন্দর তাহার গ্রীবাভঙ্গী! এমনই শোভাতেই বুঝি বিশ্বের রূপকমল একদিন মৃণালবৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! রাজা কবি পুরুষ, মানসকমলের সেই চিত্রশোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মোহমুগ্ধ মনে প্রশ্ন উঠিল—না জানি কাহার অদৃষ্টপরিচালনায় নিয়োজিত এই অপরূপ-রূপা রূপরাণীর হস্তধৃত ভাগ্যদণ্ড? এ দণ্ডস্পর্শে তাঁহার ভাগ্যও যে এক দিন ঘুরিয়া যাইতে পারে এ কথা কিন্তু রাজার মনে উদিত হইল না।

রাজা দাঁড় টানিতে ভুলিয়া গেলেন, তাহার হাতের স্তব্ধ-মুগ্ধ অনাহত দাঁড়ের উপর দিয়া হ্রদের রজতধারা ছলকিয়া যাইতে লাগিল। অদূর হইতে সহসা সঙ্গীতধ্বনি উঠিল—

"আমি বাঁধলাম গান—হোলো না ত গান গাওয়া।"

হাসি এতক্ষণ হাল ধরিয়া নীরবে আকাশের উজ্জ্বল ছবিখানির দিকে চাহিয়াছিল, গান শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—"কে গান গাচ্ছে? বেশ ত গলা!"

রাজা সচকিতভাবে জলে দাঁড় ফেলিয়া বলিলেন,—"কেউ গাচ্ছে নাকি? আমি ত শুনতে পাচ্ছিনে।"

হাসি বলিল—"না, আমিও আর শুনতে পাচ্ছিনে, গান বন্ধ হয়ে গেছে।"

রাজা সজোরে দুই একবার দাঁড় ফেলিয়া বলিলেন, "হাসি, তুমি একটি গান গাও না—"

হাসি হালটা দোলাইয়া কহিল "কি যে আপনি বলেন? আপনি একটি গান্।"

রাজা একবার আকাশের চন্দ্রকলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় মর্ত্তচন্দ্রকলার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, মন্দ ত কিছু বলিনি। তুমি এক দিন এই হ্রদে নৌকা চালাতে চালাতে যে গানটি গেয়েছিলে, গাও না সেই গানটি হাসি—"

হাসি সাফ জবাব দিল—"মনে পড়ছে না—সে গান। আপনি একটি গান্।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,"তোমার আদেশ অবশ্যই পালনীয়,—কিন্তু আনন্দ-সঙ্গীত আমার ত কিছু মনে আসছে না।"

হাসি বলিল, "না-ই আসুক—যে গান আপনার মনে আসছে, তাই গান্।"

সূর্য্যের আলো সহসা স্তিমিত হইয়া পড়িল। শীতসন্ধ্যাকে বসন্ত আকুল করিয়া, আকাশের শশিকলা তাহার কোমল মধুর ছটা সকৌতুকে হাসির অঙ্গে ছিটাইয়া দিল। কি যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতি রাজার মনকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সহসা তিনি কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন—হাসির দিকে আর না চাহিয়াই আনমনে মৃদুস্বরে গান ধরিলেন—

"ভেসেছি স্রোতের টানে
কূলে কি অকূলে কে জানে?
তরঙ্গ-ছন্দে কুহক আনন্দে
মনোতরী চলে বেগে বাধা না মানে।"

সহসা তাঁহার হাতের দাঁড় হ্রদ-পার্শ্বের কূলভূমিতে লাগিয়া নৌকাখানাকে একটু সরাইয়া দিল। হাসি কিন্তু বেশ প্রকৃতিস্থ ভাবে হালটা টানিয়া রাখিল। রাজা অপ্রস্তুতভাবে দাঁড় ঠেলিয়া নৌকা ফিরাইয়া লইলেন—তাঁহার গান জমিতে না জমিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। হাসি একটু হাসিয়া লইয়া কহিল— "থামলেন কেন? গান্ না—বেশ চমৎকার গানটি।"

রাজা হাসিয়া হাসির অনুকরণে কহিলেন, "মনে পড়ছে না।"

হাসিও হাসিল, হাসিয়া কহিল—আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি—

"দাঁড়ে দাঁড়ে বাজে চঞ্চল সুর,
গতির নেশায় মতি ভরপুর;

কে জানিতে চায় চলেছি কোথায়।
পাতালতলে বা বিমানে---"

রাজা কুতূহলী হইয়া কহিলেন —"তার পর?"

"আর আমার মনে নেই, এবার আপনি---গান্ ..."

রাজা গাহিলেন —

"ঐ ডাকে নিশীথের বাঁশী!
আসি আসি আসি---এই আমি আসি!
চল চল নেয়ে, আরো বেগে ধেয়ে,
ঐ যে আলোক ঝলক হানে---
কোন্ আবছায়ায় কে জানে।"

রাজার উচ্ছ্বসিত গানের সুরে আকাশের চাঁদ নেশায় বিহ্বল হইয়া, হ্রদের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হাসি কিন্তু বেশ অটল স্থির সংযতভাবেই গানটা শুনিয়া শেষ হইলে, ধীরে ধীরে কহিল- "গানটি আমি রাজকুমারীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি; আপনারই রচনা না?"

রাজা বলিলেন- "কই, আমি ত রাণীর মুখে এ গান কোন দিন শুনিনি?"

তখন নৌকাখানা হ্রদের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল—হাসি হালের মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে কহিল—আচ্ছা, আপনি রাজকুমারীকে রাণী বলেন—কিন্তু—কিন্তু---"

রাজা উজানে দাঁড় পশ্চাতে টানিয়া তরীখানা ফিরাইয়া লইয়া সকৌতুকে কহিলেন—"কিন্তু কি? ব'লে ফেল, শোনাই যাক।"

অতুলেশ্বরের কথাবার্ত্তায় আজ গাম্ভীর্য্য ছিল না, হাস্যকৌতুকপূর্ণ প্রীতিভাবে তিনি হাসিরও মনে সখ্যভাব ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন। হাসি রমণীসুলভ প্রগল্‌ভভাবেই পুরুষের মনোমোহন বেশ একটু চপল হাস্য করিয়া কহিল—"কিন্তু আপনার রাণী যখন আস্‌বেন---"

রাজা সহসা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাববার কথা বটে! এ কথাটা আগে মনে হয় নি! কি বলা যাবে---তাই ত! তুমিই একটা নাম ঠিক কর না?"

হাসি বলিল, —"তাঁকে বউরাণী বলবেন।"

"বেশ! তোমার যদি ঐ নাম পসন্দ হয় ত তাই হবে।"

রাজার দৃষ্টিতে, রাজার সুরে সহসা হাসি এই কথার মধ্যে একটা যেন লুকান অর্থ দেখিতে পাইল। এতক্ষণ সে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া বেশ সহজ ভাবেই কথা কহিয়া যাইতেছিল---সহসা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে ভাব ঢাকিতে গিয়া পূর্ব্বের কথারই আবৃত্তি করিয়া কহিল,—"কি যে বলেন আপনি---"

"কিছু কি দোষের কথা বলেছি, হাসি?---"

"আপনি যে রাজা---"

"এই আমার অপরাধ? যদি ভিখারী হই ———"

দূরে গান উঠিল---

"ভিখারীর শূন্য ঝোলা,---রইল তোলা
হোলো না—পারে যাওয়া---"

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

রাজা বলিলেন---"গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

হাসি বলিল--"ঠিক যেন কোন অপরিচিত পাখীর পরিচিত সিস্।"

তীর হইতে রাজকুমারী ডাকিলেন---"বাবা!"

হাসি আনন্দের সুরে কহিল,---"রাজকুমারী এসেছেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগিল। রাজা বলিলেন—"আসবে, রাণী, নৌকায়? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।" কথাটি কি পূর্ণ সত্য!

শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া ছিলেন হাসির পাশে---তিনি বলিলেন---"রাজা বাহাদুর, অনাদি এসেছেন। প্রসাদপুর থেকে। মহারাণী আমাকে ডেকেছেন। আপনাকে একবার আসতে হবে, অনেক কথা আছে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

পুরী-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

আমাদিগের পাণ্ডা ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পুরুষোত্তম তীর্থের পৌরাণিক কাহিনী যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট দেবর্ষি নারদ প্রথমতঃ পুরীর স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া ভূপতি তাঁহার কুলপুরোহিতের সহোদর বিদ্যাপতিকে এই পবিত্র স্থান দর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি এই স্থানে বসু নামক এক শবরের সহিত মিলিত হয়েন এবং তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া "নীলাচল" নামক এক অনতি-উচ্চ শৈলখণ্ড দর্শন করেন। নীলাচলের উপর "নীলমাধব", "বিমলা", "নৃসিংহ" প্রভৃতি অনেকগুলি দেবদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ঐ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে এবং উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করেন। রাজা সৈন্য-সামন্ত পাত্রমিত্রাদি সমভিব্যাহারে পুরীতে আগমন পূর্ব্বক বর্ত্তমান ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের সন্নিকটে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া ঐ স্থানে এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া, নিজ নামে ঐ সরোবরের নামকরণ করিয়াছিলেন।

পুরীর পৌরাণিক কাহিনী।

বসু সবরের পুত্র দ্বৈতাপতি। তাহারই বংশধররা পুরুষানুক্রমে পাণ্ডারূপে জগন্নাথ দেবের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে এক তীর্থ। তীর্থ-যাত্রীর পক্ষে ইহা অবশ্য দর্শনীয়। মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সরোবরে স্নান করিতে হয়। এই পুষ্করিণীতে অনেক কচ্ছপ বাস করে। পাণ্ডার আহ্বানে তাহারা স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যাত্রীদিগের প্রদত্ত খাদ্য-সামগ্রী আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর জল মলিন ও সবুজ-বর্ণের। ইহার চতুর্দ্দিকের পাড় পাকা করিয়া বাঁধান।

পঞ্চতীর্থ।

"মার্কণ্ডেয়ো বটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থাবিধিঃ স্মৃতঃ॥"

ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্যতীত আর চারিটি তীর্থ পুরী-যাত্রীকে দর্শন করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে "মহোদধির" উল্লেখ করা হইয়াছে। "মার্কণ্ডের" পুষ্করিণীতে স্নান করিতে হয় এবং "রোহিণীকুণ্ডের" জল লইয়া মস্তকে ছিটা দিতে হয়। বটকৃষ্ণ পঞ্চম তীর্থ। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে পুরীতে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিয়া এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে হয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন যে, সকল দেবতাই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল "নীলমাধবই" অদৃশ্য হইয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহার অতিশয় নৈরাশ্য উপস্থিত হইল। রাত্রিতে স্বপ্ন দ্বারা তিনি "মাধবের" একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার এবং নীলাচলের উপর "মাধব" যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তথায় উহা স্থাপন করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। এই বিগ্রহের উপাদান ও নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। রাজার স্বপ্ন হইয়াছিল যে, কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড তিনি সমুদ্রে ভাসমান দেখিতে পাইবেন এবং উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া "মাধবের" বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বলেন যে, তিনি রাজাদেশে রুদ্ধগৃহে অন্যের অগোচরে সাত দিনের মধ্যে বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন কারণে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। রাজা এই নিয়মপালনে প্রতিশ্রুত হইলে বিশ্বকর্ম্মা নির্জ্জনে "মাধবের" প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অসম্পূর্ণ বিগ্রহ।

পঞ্চদিবস অতীত না হইতেই রাজা (কাহারও মতে তাঁহার মহিষী) কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ সত্ত্বেও দ্বার ভগ্ন করিয়া উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। তখনও বিগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেব-শিল্পী রাজার ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এই কারণে আজ পর্য্যন্ত জগন্নাথের মূর্ত্তি হস্তপদবিহীন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করেন। তথায় তিনি এত অধিককাল বাস করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার রাজ্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রজাবর্গ সকলই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে পুরীতে গালমাধব নামক এক জন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন "মাধবের" অসম্পূর্ণ দারুবিগ্রহ তখনও নীলাচলে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি গালমাধবের অনুমতি লইয়া শাস্ত্রবিহিত হোম, যাগ প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা মহাসমারোহে উক্ত বিগ্রহ নীলাচলের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহের উপরে বহুকাল পরে বর্ত্তমান পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই বিগ্রহই বর্ত্তমান "জগন্নাথ"। কিন্তু তাঁহার আদি দারুমূর্ত্তি এখন আর নাই। মন্দিরের নিয়মানুসারে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে জগন্নাথের "দেহ-পরিবর্ত্তন" হইয়া থাকে এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত নূতন মূর্ত্তিতে তাঁহার পুনরধিষ্ঠান হয়। মন্দির-সংলগ্ন "বৈকুণ্ঠ" নামক স্থানে প্রতি যুগান্তে তাঁহার নবকলেবর নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় সুবিখ্যাত নৃপতি যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে পুরীর মন্দিরের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাজপুর যযাতি কেশরীর রাজধানী ছিল। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথমে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কালে ঐ মন্দির জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য হইলে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেব নামক নৃপতি ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। নাটমন্দির প্রভৃতি অপর মন্দিরগুলি বহুকাল পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদিগের উচ্চতা আদি মন্দির হইতে অনেক কম।

পুরীর ইতিহাস।

উড়িষ্যায় মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-বিদ্বেষের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয়, হিন্দুর অন্য কোন তীর্থস্থানে সেরূপ দেখা যায় না। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবকে জয় করিয়া পাঠানগণ প্রথমতঃ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করেন। কালাপাহাড় ও অন্যান্য দেবদ্বেষী মুসলমানগণ উড়িষ্যার বহু দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরের ধ্বংসসাধন এবং অধিকাংশ মূর্ত্তি নাসিকা, হস্ত বা পদবিহীন করেন। ভুবনেশ্বর, পুরী এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে এই ধর্ম্মান্ধতার ও অনাচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকবরের রাজত্বসময়ে মানসিংহ পাঠানগণকে জয় করিয়া উড়িষ্যাকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন। তদবধি উড়িষ্যা বাঙ্গালার সুবেদারের শাসনাধীন থাকে। নবাব আলিবর্দ্দির শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। নবাব বহু চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালার প্রজাসমূহকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার ফলে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্ররাজ্যভুক্ত এবং সুবর্ণরেখা নদী বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গালা দেশে আর উৎপাত করিবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হওয়াতে নবাব তাঁহাদিগকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা "চৌথ"স্বরূপ প্রদান করিবেন, সন্ধিসূত্রে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন এবং এই অর্থ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া "চৌথ মারহাট্টা" নামক এক নূতন কর স্থাপন করিলেন।

ইংরাজরা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় অধিকার স্থাপন করেন। জগন্নাথের মন্দিরের ব্যয়ের জন্য মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তৃগণ রাজকোষ হইতে বৎসরে ৩০ হইতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিতেন। তাঁহারা যাত্রীদিগের উপর মাশুল বসাইয়া এই টাকা সংগ্রহ করিতেন। তখন রেলপথ হয় নাই, যাত্রিগণ হাঁটাপথে ১৮টি খিলান-বিশিষ্ট "আঠারনালা" নামক সেতু পার হইয়া পুরীতে গমন করিত। যাত্রীদিগের নিকট হইতে তাহাদের সামাজিক অবস্থা অনুসারে মাশুলের পরিমাণ নির্দ্ধারিত এবং সেতু পার হইবার সময়ে উহা আদায় করা হইত। এই সেতু পুরীর উত্তরাংশে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানেই প্রথমে শ্রীমন্দিরের চূড়া

দেব-সেবার ব্যবস্থা।

যাত্রিগণের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, এক একটি নরবলি দিয়া এই সেতুর একটি করিয়া খিলান প্রস্তুত হইয়াছিল। সেতুর নিকট "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটি পুষ্করিণী এবং একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণ পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুরীর রাস্তায় চলিবার সময়ে "মহাপ্রসাদ" মাড়াইবার জন্য যে পাপসঞ্চয় করিয়া থাকে, এই পুষ্করিণীতে পদপ্রক্ষালন করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। সাধু-সন্ন্যাসীর দল এবং মাশুল প্রদানে অসমর্থ, সামান্য অবস্থার যাত্রিগণকে পূর্ব্বে এই ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিতে হইত এবং সপ্তাহে এক দিন বিনা মাশুলে তাহারা পুরী প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইত।

১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ দেব-সেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। খুর্দা নামক স্থানে উড়িষ্যার প্রাচীন রাজবংশ তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান খুর্দা জংসন্ ষ্টেশন এই স্থানে অবস্থিত। উক্ত রাজা খুর্দা বা পুরীর রাজা নামে অভিহিত হইতেন এবং খুর্দা নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার হস্তে জগন্নাথের মন্দির-পরিচালনের ভার অর্পণ করেন এবং মন্দিরের খরচের জন্য তাঁহাকে বৎসরে ৬০০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ইংরাজরাজ যাত্রীর উপর তাহাদিগের অবস্থানুযায়ী একটি মাশুল নূতন করিয়া স্থাপন করেন। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক যাত্রীকে এই নূতন ব্যবস্থায় ছয় হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হইত। সামান্য অবস্থার যাত্রীদিগের নিকট হইতে ২৲ টাকা আদায় করা হইত। যাহারা উড়িষ্যার প্রকৃত অধিবাসী অথবা ব্যবসাদার, মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত জলবাহকগণ ও সাধু-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে এই মাশুল দিতে হইত না। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের সময়ে যাত্রিগণের নিকট যে পরিমাণ মাশুল আদায় করা হইত, বৃটিস গভর্ণমেণ্ট তাহার ১৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র আদায় করিতেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেবপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এইরূপ অর্থের ব্যবস্থা করাতে খৃষ্টীয় মিশনারিগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট যাত্রীর উপর মাশুল একেবারে উঠাইয়া দেন; মন্দিরের ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ৫৬০০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া দেব-সেবার সমস্ত কার্য্যের ভার খুর্দার রাজার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং মন্দিরের সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তদবধি খুর্দা বা পুরীর রাজাই জগন্নাথের প্রধান সেবক। তাঁহার রাজবাটী মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। আমরা যখন প্রথমে পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে, রাজার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যাত্রীর সংখ্যা অধিক হওয়ায়, বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরের আয় সবিশেষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলেও মন্দিরের কার্য্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছিল না। পাণ্ডাদিগের দ্বারা অর্থের বিস্তর অপব্যয় হইত যাত্রীদিগের প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দেবতার ব্যবহারে না আসিয়া পাণ্ডাদিগের গৃহে স্থানলাভ করিত। রাজা মন্দিরের কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাইস্ নামক এক জন পেন্সন্‌প্রাপ্ত ইংরাজ সিভিলিয়ানকে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায়, যাত্রীদিগের প্রদত্ত প্রণামী ও দক্ষিণা হইতেই দেব-সেবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত; এমন কি, দেবোত্তর-সম্পত্তির আয়ের উপর মোটেই হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। পাণ্ডাদিগের অসদুপার্জ্জনের পথে এইরূপ অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায় তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে কুপরামর্শ দিয়া মিষ্টার প্রাইস্‌কে কর্ম্মচ্যুত করায়। এইরূপে পাণ্ডাগণ পুনরায় যাত্রীদিগের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর ব্যবসা করিবার অবসর পাইল এবং পূর্ব্বে মন্দিরের কার্য্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ও অপব্যয় বিদ্যমান ছিল, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। বর্ত্তমান সময়ে রায় বাহাদুর সোখীচাঁদ নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারী মন্দিরের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেছেন। শুনিতে পাই যে, তাঁহার সুব্যবস্থায় মন্দিরের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। রায় বাহাদুর সোখীচাঁদ একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি; পুরীর দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আর্ত্ত-ব্যক্তিগণের উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পুরীতে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

দেব-সম্পত্তির অপব্যবহার।

হিন্দুর সকল তীর্থস্থানেই দেব-সম্পত্তির যথেষ্ট অসদ্ব্যবহার ও অপব্যয় হইয়া থাকে। পাছে ধর্ম্মকর্ম্মে হস্ত-ক্ষেপণ করা হয়, এই আশঙ্কায় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার সুব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট সাহসী হয়েন না। মান্দ্রাজবাসী

স্বর্গগত আনন্দ চার্লু মহাশয় এই অপব্যয় নিবারণের জন্য আইন প্রবর্ত্তনের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেবস্থানের অধিকারী অনেক মোহান্তের চরিত্র যেরূপ জঘন্য ও কলুষিত এবং দেবোত্তরের আয় আপনাদিগের ভোগলালসা-পরিতৃপ্তির জন্য যেরূপ অন্যায় ভাবে তাঁহারা অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই এই অপব্যয়ের প্রতিবাদ করা উচিত। দেব-সম্পত্তি সমাজের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের (Trustees) হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত এবং দেবসেবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই দেবস্থানাধিকারী মোহান্তের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সরল ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের বহু-ক্লেশোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে আমাদিগের তীর্থস্থান সমূহে প্রত্যহ যে কত অত্যাচার ও ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জানিয়া শুনিয়া যদি হিন্দু-সমাজ এই অত্যাচার নিবারণের যথোচিত ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে যাঁহারা তীর্থে গমন করিয়া দেবসেবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৌণভাবে মোহান্তগণের পাপ কার্য্যের সাহায্য করেন এবং তাহার ফল ভোগ করিতে অবশ্য বাধ্য। উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দির ব্যতীত বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মঠের ব্যয়ের জন্য বিস্তর দেবোত্তর-সম্পত্তি মঠের মোহান্তগণের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেবপূজা, জ্ঞানচর্চ্চা এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মপ্রাণ বিত্ত-সম্পন্ন অনেকানেক হিন্দু নরনারী কর্ত্তৃক এই বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি, পুরীর মঠ সকলের বাৎসরিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এখন দাতৃগণের সেই প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সমস্ত সম্পত্তি মঠের অধিকারীর হস্তগত হইয়া সম্পত্তির বিপুল আয় তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবাসিগণ এ বিষয়ে একবার আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা কমিটী গঠন করিয়া যে উপায়ে ইহার সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া প্রতীকারার্থ একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। যতদূর জানা আছে, কমিটীর মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এ বিষয়ের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া উপযুক্ত আইনের সাহায্যে যাহাতে এই দেবোদ্দিষ্ট অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচুণিলাল বসু।

পুষ্পিত 'কাল'।

ফুটিছে শতেক ময়ূখে উজল
　　'উষা,' কমলের শতদলে,
সন্ধ্যামণির শাখায় ফুটিয়া
　　পীত 'সায়াহ্ন' ঝলমলে।

কুপিত অরুণ জবায় প্রকাশে
　　'মধ্যদিবস' রাঙা হয়ে,
'সন্ধ্যা' ফুটিছে কুমুদ-শোভায়
　　কৌমুদীগলা সুধা লয়ে।

'গভীর নিশীথ' পুষ্পিত, নীল
　　অপরাজিতার সম্পুটে,
'শেষ রজনীর' কাতর বিদায়
　　সজল ইন্দীবরে ফুটে।

পুষ্পিত হয়ে উঠিতেছে 'কাল'
　　ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণে ক্ষণে,
দিবা রজনীর লীলা চলে কিবা
　　কুসুমের ঘুমে-জাগরণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অপরাধিনী
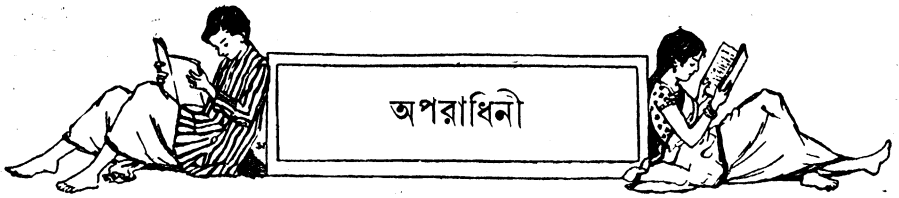
ঝম্—ঝম্—ঝম্———

সমগ্র রুষিয়ার অধিপতি প্রবলপ্রতাপান্বিত মহামান্য জারের বিরাগভাজন বন্দী ও বন্দিনীগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চির-তুষারাবৃত সুদূর সাইবিরিয়ার চির-নির্ব্বাসনে যাত্রা করিয়াছে ; হতভাগ্যদের শৃঙ্খলাবদ্ধ চরণ হইতে শব্দ উঠিতেছে, ঝম্—ঝম্—ঝম্।

ভীষণ শীত। যতদুর দৃষ্টি যায়, কেবল ধবল তুষারাবৃত প্রান্তর। মধ্যে সঙ্কীর্ণ গন্তব্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দিক্-চক্রবালে মিশিয়াছে। তুষার-ঝটিকা হতভাগ্যদের নত মস্তকের উপর দিয়া সগর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে ; বুঝি বা মানবের উপর মানবের নিষ্ঠুরতা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়াই আস্ফালন করিতেছে। শীতে অভিভূত হইয়া যদি কোন হতভাগ্য বন্দী মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতেছে, অমনই অশ্বারোহী কসাক প্রহরীর তীব্র কশাঘাত তাহার পৃষ্ঠে পড়িতেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হতভাগ্যরা ধীর চরণে আবার অগ্রসর হইতেছে। বুঝি বা এ পথেরও শেষ নাই।

সহসা শ্রেণীবদ্ধ বন্দীদিগের মধ্য হইতে এক জন শীতে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রহরীর শত কশাঘাতেও সে আর উঠিতে পারিল না ; শীতে ও পথশ্রান্তিতে হতভাগ্য তখন মুমূর্ষু ; তাহাকে পড়িতে দেখিয়া এক দল কসাক দানবের ন্যায় উচ্চহাস্য করিল, পরে তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া পদাঘাতে তাহাকে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। ইহা দেখিয়া বন্দীদিগের মধ্যে এক জনের কাতরকণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইল—"হা ভগবান্!" কিন্তু ইহাই মহামান্য জারের কঠোর আদেশ! এই ব্যবস্থার নিকট ভগবানের বিধানও বুঝি পরাভব মানে!

আবার শ্রেণীবদ্ধ বন্দীদল গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। ইহারা প্রায় সকলেই রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত। ভয়াবহ সাইবিরিয়ার নানা ধাতুর খনিতে ইহারা কায করিবে। কিন্তু যাহারা পারদ-খনিতে কর্ম্ম করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা জীবন্তে সমাধিদণ্ড লাভ করিয়াছে। কারণ, পারদবিষে পাচ সাত বৎসরের মধ্যেই তাহাদের হস্ত-পদ গলিত হইয়া যাইবে ; সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইবে। বন্দীদিগের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ও ছাত্র। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আবাহন করিতে যাইয়া ইহারা জারের বিরাগভাজন হইয়াছে ; তাহারই ফলে আজ তাহাদের সাইবিরিয়ায় চিরনির্ব্বাসন—পারদ-খনিতে জীয়ন্ত সমাধি!

ইহাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও আছেন ; কিন্তু জারের বিচারে এই অপরাধে স্ত্রীলোক ও পুরুষ বন্দীর কোন পার্থক্য নাই। সকলেরই গাত্রে হরিদ্রাবর্ণের দীর্ঘ ওভারকোট, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পাজামা, পদদ্বয় খাকি বর্ণের পটি ও জুতায় আবৃত। ভীষণ শীত, এই জন্যই এই ব্যবস্থা। পুরুষ বন্দীদিগের মুখে চোখে একটা অবসাদের ভাব। গতি উদ্যমহীন ও ধীর ; তাহারা যেন সংসারের সকল বন্ধন কাটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই অগ্রসর হইতেছে ; তাহাদের শেষ লক্ষ্য যেন মরণের কোলে বিরামলাভ। কিন্তু বন্দিনীদিগের মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ, পদক্ষেপ লঘু ও অস্থির। যেন তাহারা জারের অত্যাচারের শেষ সীমা দেখিবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। কসাক প্রহরীদিগের নেতা কাপ্তেন মেগানফ্ আদেশ প্রচার করিলেন, অদ্য এই স্থানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। পশ্চাতের ভারবাহী গর্দ্দভ-পৃষ্ঠ হইতে তাম্বু ও অন্যান্য সরঞ্জাম নামান হইল। কয়েকটি ক্ষুদ্র ও একটি বৃহৎ তাম্বু খাটাইয়া, ভিতরের তুষাররাশি পরিষ্কার করিয়া প্রত্যেক তাম্বুতে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল। প্রত্যেক বন্দীকে এক টুক্‌রা রুটি ও প্রতি দুই জন বন্দীকে মাংসের একটি টিনের কৌটা প্রদত্ত হইল। তাহার পর বন্দিগণ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে দশ জন করিয়া এক একটি তাম্বুতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইল। কাপ্তেনের আদেশমত রাইফেলধারী দুই জন করিয়া ভীমকায় কসাক প্রত্যেক তাম্বুর দ্বারে প্রহরী হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিল।

একটি তাম্বুর ভিতরে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া দুই জন বন্দী অগ্নিতে হস্ত-পদ যথাসম্ভব উত্তপ্ত করিতেছে। অপর সকলেই পথশ্রমে ও দারুণ শীতে অবসন্ন হইয়া কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আর প্রভাতের আলোক দেখিতে পাইবে না। দুর্দ্ধর্ষ শীতে অনেকের এই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইবে। প্রথম বন্দী মস্তকাবরণ উন্মোচন করিলে দেখা গেল, তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। উন্নত কপোল, আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু; চক্ষুর তারকা সুনীল, নম্র ও বিষাদ-ব্যঞ্জক; দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। আজানুবিলম্বিত বাহু সুদৃঢ় পেশীবদ্ধ। তিনি ধীরে ধীরে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দ্বিতীয় বন্দীর দিকে ফিরাইলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বন্দী নহেন, বন্দিনী। অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী। মস্তকাবরণ খুলিবামাত্র দীর্ঘ কেশপাশ বিলম্বিত হইল। তাঁহার বিশাল সুনীল চক্ষুর তারকা হইতে চটুলতা যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। মুখবিবর ক্ষুদ্র ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক; ললাট ভাবশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছিল। বৃদ্ধকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া দস্তানা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাম হস্তের অনামিকায় একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ক ছিল; তাহাতে একটি রক্ত প্রস্তর বসান ছিল। প্রস্তরখানির উপর একটি কাল ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত। বৃদ্ধ কৃষ্ণ ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি দেখিয়া ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। ধীর স্বরে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি, মজ্জমান ব্যক্তিও জীবন অপেক্ষা কিসের কামনা করে?" যুবতী দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, "স্বাধীনতার!"

বৃদ্ধ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বামহস্তের তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া ক্রুশচিহ্ন গঠন করিয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিলেন। যুবতীও সেইরূপ করিয়া অঙ্গুলীবদ্ধ ক্রুশচিহ্ন মস্তকে স্পর্শ করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার নাম বোরিস্ আলেকজাণ্ড্রোভিচ্। আপনার নাম?" যুবতী বীণানিন্দিত স্বরে উত্তর করিলেন, "আমার নাম মেরিয়ান্ পেট্রোভস্কি।" বোরিস্ কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন "আপনি কি কাউণ্ট পিয়েরী পেট্রোভস্কির কোন আত্মীয়া?" মেরিয়ান্ কহিলেন, "আমি তাঁহার কন্যা।"

বৃদ্ধকে বিস্মিত ও নীরব দেখিয়া মেরিয়ান কহিলেন, "আমি কাউণ্ট পেট্রোভস্কির কন্যা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন, কারণ, আপনি জানেন, আমার পিতা সম্রাটের ভৃত্য ও এক জন বিশিষ্ট রাজপক্ষীয় ব্যক্তি। তাঁহার কন্যা হইয়া আমি যে কেন সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলাম, তাহা শুনিতে বোধ হয় আপনি উৎসুক হইয়াছেন? আমার জীবনের সহিত আর এক ব্যক্তির জীবনকাহিনী বিজড়িত, তাঁহার নাম অলফ্ বার্গষ্টিন্। আপনি তাঁহার নাম শুনিয়াছেন কি?" বোরিস্ মস্তকসঞ্চালন করিয়া বিষাদক্লিষ্ট-স্বরে বলিলেন, "তাঁহার নাম মুক্তিকামীদিগের মধ্যে কে না শুনিয়াছে? তিনি বয়সে তরুণ হইলেও তাঁহার মুক্তিপ্রিয়তা রুষিয়ার গুপ্ত পুলিস ভালরূপই জানিত। সেই জন্যই অলফ্ তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতার দণ্ডও ভালরূপই পাইয়াছেন।"

যুবতীর সুনীল চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল। উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "হাঁ, অলফ্ বার্গষ্টিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; কিন্তু মহাশয়, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, অলফের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে? ব্যারণ মাকারফ আর ইহজগতে নাই?"

বৃদ্ধ বোরিস্ আলেকজাণ্ড্রোভিচ্ পুনরায় বিস্মিত হইলেন; দ্রুত-কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "বলেন কি, ভগিনি? ব্যারণ মাকারফ নিহত হইয়াছেন? গুপ্ত পুলিসের তিনিই ত সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন! তাঁহার মত দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী ত পুলিস বিভাগে আর ছিল না বলিলেই হয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার এই রহস্যময় কাহিনী আমায় বলিবেন কি?"

২

মেরিয়ান্ মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"মঁসিয়ে, আমি পিতার একমাত্র আদরিণী সন্তান; শৈশবে মাতৃহারা হইয়া পিতার স্নেহে কখনও মাতার অভাব বুঝিতে পারি নাই। আমাকে লালন-পালন ও শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পিতা শৈশব হইতেই এক জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মাদাম করডোভা। মাদাম আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতেন। রুষিয়ার রাজনীতিক অবস্থা চিরদিনই বিপ্লব-সঙ্কুল, কিন্তু আমি পিতার সন্তর্পণতায় কখনও দেশের অবস্থা নিরপেক্ষরূপে বিচার করিবার অবসর পাই নাই। সে

যাহা হউক, ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে আমার তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি রুষিয়ার বিপ্লববাদের স্বরূপ জানিতে পাইলাম।

"তখন ভোর হইয়াছে ; শীতকাল ; ঠিক এইরূপ প্রচণ্ড শীত। সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, মস্তকের দিকের জানালাটা খোলা ; একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দাসীকে ডাকিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহের নিম্নতলে একটা গোলযোগ শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পোষাক পরিয়া নীচে আসিতেই দেখিলাম, এক জন পুলিস কর্ম্মচারী বাবার সহিত উত্তেজিত স্বরে কি কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া কর্ম্মচারী সামরিক ধরণে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'বড়ই দুঃখিত হইতেছি, মাদাময়েল, কিন্তু কর্ত্তব্যের জন্য আমাকে এইরূপ রূঢ় কার্য্য করিতে হইতেছে।' আমি সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের কর্ত্তব্য ?' অফিসার কহিলেন, 'আমরা গত রাত্রি হইতে এক জন পলাতক বিপ্লববাদীর অনুসরণ করিতেছি। প্রত্যূষে সে আপনাদের বাটীর দিকে আসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে ; আমি একবার আপনাদের এই বাড়ীটি অনুসন্ধান করিতে চাহি।' বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, সে আমার বাড়ীতে আইসে নাই।' কর্ম্মচারী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, সে কি আপনাদের জানাইয়া আসিবে ? কোথাও লুকাইয়া আছে কি না দেখিতে হইবে।' তৎপরে এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, 'আইভ্যান, তুমি দুই জন লোক লইয়া আমার সহিত আইস ; আর পিটারকে বল, সে যেন অবশিষ্ট লোক লইয়া এই বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে। তাহাকে বলিয়া দাও, এখন যে কেহ বাড়ীর বাহির হইতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই যেন গ্রেপ্তার করা হয়।'

"বাড়ীর অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিয়া পুলিস কর্ম্মচারী আমাদের সহিত উপর-তলায় চলিলেন। উপরে পিতার, আমার ও মাদাম করডোভার শয়নকক্ষ। সহসা আমার উন্মুক্ত জানালার কথা মনে পড়িয়া গেল ; বুঝিলাম, এই পলাতকের সহিত এই বাতায়ন মুক্ত হওয়া রহস্যের কোন সংস্রব আছে। অন্যান্য কক্ষ অনুসন্ধান করিয়া কর্ম্মচারী আমার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিলেন। আমি তখন দ্বারে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিলাম, 'মহাশয় আপনি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবেন না। আমি পাঁচ মিনিট মাত্র হইল বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়াছি ; বিশ্বাস করুন, আমার কক্ষে কেহই আইসে নাই।' অফিসার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, সহসা তাঁহার চক্ষু খোলা জানালাটার উপর স্থাপিত হইল, আগ্রহপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু দেখুন ! ঐ জানালাটা কতক্ষণ খোলা রহিয়াছে ?' আমি বলিলাম, 'আমি উঠিয়া যাইবার সময় উহা খুলিয়া দিয়াছি।' এই মিথ্যা কথা বলিবার সময় বোধ হয়, আমার মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছিল ; মুখ তুলিয়া দেখিলাম, মাদাম করডোভা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

"পুলিস অফিসার ও অন্যান্য লোকগুলি চলিয়া গেলেন। বাবাও তাঁহাদের সহিত নীচে গেলেন। আমি ও মাদাম আমার কক্ষে রহিলাম। মাদাম কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেরিয়ান, তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন ?' আমার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হইল ; আমি নত মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মিথ্যা কথা, মাদাম ?'

'তুমি বেশ জান মেরিয়ান, যে জানালাটা তুমি খুল নাই ; কোন দিনই খুল না ; তুমি বিছানা হইতে উঠিয়া গেলে, মার্গারিটা আসিয়া খুলিয়া দেয়। তবে আজ তুমি উঠিবার পূর্ব্বে কে জানালা খুলিল ?'

'তাহা আমি জানি না, মাদাম।'

'তুমি খুল নাই ?'

'না।'

সহসা আমার কক্ষের আলমারীর পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, 'মহাশয়া, আজ আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।'

"চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, আলমারীর পশ্চাৎ হইতে এক যুবক বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিচ্ছদ স্থানে স্থানে ছিন্ন, মস্তকে টুপী নাই, কেশ বিস্রস্ত ও মুখমণ্ডল শুষ্ক। কিন্তু আমি এরূপ সুশ্রী মুখ পুরুষের আর দেখি নাই ; কৃষ্ণতার নয়নে উজ্জ্বল আভা, আর সেই নয়নের দৃষ্টি কি কোমল ! বোধ হয়, ক্ষণকালের জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, মাদাম করডোভার তীব্র প্রশ্নে

চমক ভাঙ্গিল। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কে তুমি? কি সাহসে এখানে প্রবেশ করিয়াছ?' যুবক-- ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'মাদাম, আমিই সেই পলাতক বিপ্লববাদী; পুলিসের হস্ত এড়াইবার জন্য এখানে আপনাদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়াছি। আমি এতক্ষণ গ্রেপ্তার হইতাম, কেবল অপনাদে দয়ায় বাঁচিয়া গিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' যুবক মিনতিপূর্ণ কৃতজ্ঞ নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কি জানি কেন, আমার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল; আবার আমার মুখ রক্তবর্ণ হইল, আমি চক্ষু নত করিলাম। মাদাম প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার নাম কি যুবক?' যুবক ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, আমার নাম অলফ্ বার্গষ্টিন, আমি মস্কৌ নগরের কলেজ ইম্পিরিয়েলের ছাত্র।' মাদাম বলিলেন, 'তুমি এই সঙ্কটপূর্ণ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছ কেন? সম্রাটের কর্ম্মচারীদিগকে বিনাশ করিয়া তোমরা কি স্বেচ্ছাচারের উচ্ছেদ্ন করিতে পারিবে? এই পথ ত্যাগ কর; ইহা বড়ই বিপদসঙ্কুল।' যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ, মাদাম, আপনারা যখন আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।' আমি সন্ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলাম, 'কি সর্ব্বনাশ! এখন আপনি বাহির হইলেই ধরা পড়িবেন। আপনি রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, অন্ধকার হইলে সুযোগ বুঝিয়া চলিয়া যাইবেন; আমি আপনাকে এখানে রাত্রি অবধি লুকাইয়া রাখিব।' বাধা দিয়া মাদাম বলিলেন, 'কি পাগলের মত কথা বলিতেছ, মেরিয়ান? আমি তোমার কক্ষে এই যুবককে সারাদিন লুকাইয়া থাকিতে কখনই অনুমতি দিব না। তাহা ছাড়া কাউণ্ট জানিতে পারিলে যুবককে তৎক্ষণাৎ পুলিসে দিবেন। সুতরাং ইঁহার এখনই এ গৃহ ত্যাগ করা উচিত।' মাদাম অলফ্‌কে দ্বার দেখাইয়া দিলেন।

"যুবক আমাদিগকে নমস্কার করিয়া বিবর্ণ কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তাঁহার কাতরতা ও সাহসপূর্ণ মুখ দেখিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছিল। আমি আদেশের স্বরে তাঁহাকে বলিলাম, 'মহাশয়, ফিরিয়া আসুন; এরূপ প্রকাশ্য দিবালোকে আপনার বাহিরে যাওয়া আত্মহত্যা মাত্র। আমি কখনই আপনাকে এখন যাইতে দিব না। আজ আপনি, বোধ হয়, অনাহারে আছেন?" অলফ্ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'ধন্যবাদ, আমি বাস্তবিকই অনাহারে আছি; আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি কিছুই খাই নাই। কিন্তু আমার অবস্থানে যদি আপনার বিপদ হয়, তবে আমি এখনই যাইতে প্রস্তুত।' আমি বলিলাম, 'না, আপনি এখন যাইবেন না; আপনার বিপদের তুলনায় আমার বিপদ কিছুই নহে।' মাদাম বলিলেন, 'কিন্তু, মেরিয়ান, কাযটা কি ভাল হইল?' আমি উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ হইল। অলফ সন্ত্রস্ত হইয়া একটি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইলেন। মার্গারিটা আমার প্রাতরাশ লইয়া প্রবেশ করিল ও একটি টেবলের উপর দ্রব্যগুলি রাখিয়া প্রস্থান করিল। আমি অলফ্‌কে ডাকিয়া সেইগুলি আহার করিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহার মুখে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল, চক্ষু দুইটিও বোধ হয় ঈষৎ জলভারাক্রান্ত হইল, আমার দিকে বারেক চাহিয়া তিনি নীরবে টেবলে বসিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহভরে আহার করিতে দেখিয়া মাদামও আর কিছু বলিলেন না। বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়ে করুণা-সঞ্চার হইয়াছিল।

৩

"রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ডুবিয়া গেলে অলফ বার্গষ্টিনকে আমরা বিদায় দিলাম। তাঁহাকে পুলিসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমার একটু গর্ব্ববোধ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় হৃদয়ে যেন একটা অজ্ঞাত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে আমার মনটা যেন ভার বোধ হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন একটা ভাবের বন্যায় আমি যেন ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। অতিকষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে আর অশ্রু বাধা মানিল না রুমালে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বাগানে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলাম; বুঝিলাম, আমি ভালবাসিয়াছি। সমস্ত রাত্রিই তাঁহার সেই অপূর্ব্ব চক্ষু দুইটির উজ্জল গভীর দৃষ্টি ধ্যান করিতে করিতে বিনিদ্র হইয়া অতিবাহিত করিলাম। আমি মনে মনে বুঝিলাম,

তাঁহার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। অলফ্ বিপ্লববাদী, হয় ত সাক্ষাৎভাবে কোন হত্যাকাণ্ড বা অপর কোন ভয়াবহ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। তদ্ভিন্ন জীবনে হয় ত আর কখনও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। এই কথা ভাবিতেই আবার আমার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। পুলিস তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তিনি ধরা পড়িলে কোন্ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। জারের বিচারে বিপ্লববাদীর পক্ষে হয় মৃত্যুদণ্ড, নহে ত সাইবিরিয়ায় চির-নির্ব্বাসন।

"পরদিন সংবাদপত্রে অলফের অপরাধের আভাস পাইলাম। সংবাদটি এইরূপ ছিল,—'সম্রাটের শীতপ্রাসাদ উড়াইয়া দেওয়া ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট বিপ্লববাদী অলফ্ বার্গষ্টিন্ পুনরায় পুলিসের হস্ত এড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাকে গতকল্য 'রুদে নিকোলাই' পল্লীতে কাউণ্ট পেট্রোভস্কির গৃহ পর্য্যন্ত গুপ্ত পুলিস অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই স্থান হইতেই সে রহস্যময় ভাবে অদৃশ্য হইয়াছে—পুলিস এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোন সন্ধান পায় নাই। আমাদের বিশ্বাস, সে এখনও সেণ্ট পিটারসবর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই।' সংবাদটি পড়িয়া আমার মনের ভাব কিরূপ হইল, অনুমান করিতে পারিয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট অতি কাতর হৃদয়ে করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন অলফ্ নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে পারেন। আমি যে পুনর্ব্বার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব, এ আশা আমার ছিল না। কিন্তু সাক্ষাৎ আবার হইল।

"এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে এক দিন সন্ধ্যার পর আমাদের বাটীর পশ্চাৎসংলগ্ন উদ্যানে একখানি বেঞ্চে আমি একাকী বসিয়া আছি। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে; আকাশে অযুত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, চতুর্দ্দিক শান্ত নীরব। আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বিশালতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছিলাম; আর তাহার সহিত অজ্ঞাতসারে তুলনা করিতেছিলাম, আমার এই তরুণ জীবনের ব্যর্থ প্রেমের কথার। ভাবিতেছিলাম, এই নিষ্ফল প্রেমময় জীবনকথা বাস্তবিক একটা বিয়োগান্ত কাহিনী মাত্র। অলফের চিন্তাতেই মন ডুবিয়া গিয়াছিল।

"সহসা নিকটে মনুষ্যের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ স্বর যে আমার বড় পরিচিত! বক্ষের ভিতর যেন আলোড়ন আরম্ভ হইল। শিরায় শিরায় রক্ত যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। পুনরায় সেই স্বর ডাকিল, 'মাদাময়েল!' এইবার অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দেখিলাম, এক জন লোক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিনিতে পারিলাম; কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অলফ্ বার্গষ্টিন্, আপনি পুনরায় এখানে আসিয়া কি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করেন নাই? কি সর্ব্বনাশ, পুলিস যে আপনাকে এখনই গ্রেপ্তার করিবে?' অলফ্ ধীর স্বরে কহিলেন, 'আমার জন্য আপনার এই উদ্বেগের নিমিত্ত আপনাকে ধন্যবাদ; আমি জানি, পুলিস আমাকে ধরিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; হয় ত এ পর্য্যন্তও আমার অনুসরণ করিয়াছে; কিন্তু—কিন্তু আমি আপনাকে পুনরায় আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না।' আমি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলাম। আমার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইল, 'শুধুই কৃতজ্ঞতা!' অলফ্ আবেগের স্বরে বলিলেন, 'না, মেরিয়ান, শুধু কৃতজ্ঞতা নহে, আমার হৃদয়ের পূজা, আমার হৃদয়ভরা ভালবাসা তোমার পায়ে দিতে আসিয়াছি। আমি আসিয়াছিলাম শুধু আর একবার তোমায় দেখিতে, অন্তরালে থাকিয়া আর একবার তোমার পূজা করিতে। আমি জীবনে কত বিপদ-সাগরে ভাসিয়াছি, কতবার এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে হইয়াছে, আবার আমায় বাঁচিতে হইবে। আবার আমার এই সঙ্কটরাশি অতিক্রম করিতে হইবে। বল, বল, মেরিয়ান, তোমার হৃদয়ের একবিন্দু প্রেম আমি পাইব কি না, আমি বাঁচিব কি না?' আমি কি বলিব? তাঁহার উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা শুনিয়া আমি সকলই ভুলিয়া গেলাম, অকপটে স্বীকার করিলাম, তাঁহাকে আমি ভালবাসি।

"অলফ্ নিকটে আসিয়া উভয় হস্তে আমার দুই হাত ধারণ করিলেন; অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে কম্পিতস্বরে বলিলেন, 'আমি জানি, মেরিয়ান, আমি তোমার প্রেমের যোগ্য নহি। আমার জীবন একটি সূত্র অবলম্বনে মাত্র ঝুলিতেছে। অনেকের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী। মাতৃভূমির দুঃখবিমোচনের জন্য আমি অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছি; সম্রাটের স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মচারীদিগকে সমুচিত দণ্ড দেওয়াই আমার জীবনের ব্রত,

এই জন্য কি তুমি আমায় ঘৃণা করিবে?' আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম,'না, তুমি যদি স্বহস্তে নরহত্যাও কর, তথাপি আমি তোমাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিব, ভালবাসিব; আমার একনিষ্ঠ প্রেম তোমারই জন্য উৎসৃষ্ট। আমি চিরকাল তোমারই থাকিব।' অলফ্ ধীরে ধীরে আমায় বক্ষে ধারণ করিয়া আমার অধর চুম্বন করিলেন। সে আবেগকম্পিত চুম্বনে আমি আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। একটা মোহময় ভাবের বন্যা আমায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমার তখন কোন ভয়, কোন দুঃখ রহিল না। অলফের বিপদকথা আমি ভুলিয়া গেলাম, নিজের গোপন অভিসারের কথা বিস্মৃত হইলাম; শুধু মনে রহিল, আমি ভালবাসি ও এই পৃথিবীতে আমি ও অলফ্ একা।"

মেরিয়ান স্বপ্নময় চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিভোরভাবে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কত ভাবরাশি, আনন্দ ও বিষাদের কত নিবিড় ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে খেলা করিতে লাগিল।

৪

বোরিস্ আলেক্জান্দ্রোভিচ্ তন্ময় হইয়া এই করুণ কাহিনী শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, পরিশেষে তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল, ভগিনি?"

মেরিয়ানের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "তাহার পর? তাহার পর আমি কতবার কত সন্ধ্যা অলফের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি। কত প্রেমের কথা, সুখ-দুঃখের কথা, তাঁহার কত বিপদের কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তাঁহার নিকটেই শুনিলাম যে, রুষীয় গুপ্ত পুলিসের অধ্যক্ষ ব্যারণ মাকারফ্ অলফ্কে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন; চারিদিকে অভেদ্য কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন ও দিবারাত্রি তাঁহার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সকল কথা শুনিয়া আমি মাকারফকে কি ঘৃণাই করিতাম! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি তাঁহার দ্বারা অলফের কিঞ্চিন্মাত্রও অনিষ্ট হয়, আমি স্বহস্তে তাহার প্রতিফল দিব। প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

"আমাদের এই প্রেমের কথা অপর সকলের নিকটেই গোপন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, শুধু এক জনের নিকট গোপন রাখিতে পারি নাই। তিনি মাদাম করডোভা। আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিলেন; আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক তিরস্কারও করিলেন; কিন্তু আমার প্রতি স্নেহবশতঃ পিতা কাউণ্টকে কিছু বলিয়া দিলেন না। এক দিন অলফের সাক্ষাৎ পাইয়া মাদাম তাহাকেও তিরস্কার করিলেন, এরূপ অযোগ্য মিলনে বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না—কর্ণপাত করার ক্ষমতাও আর আমাদের ছিল না। প্রবল বন্যায় নদীর মুখে সামান্য বাধা কি জলের গতিরোধ করিতে পারে? আমাদের প্রেমও যে সেইরূপ উচ্ছ্বসিত ছিল।

"এই সময় অলফ্ আমাকে তাঁহার গুপ্ত সমিতির অনেক গোপন কথা বলেন। তাঁহার নিকটে আমি উক্ত সমিতির গুপ্ত সঙ্কেত ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করি। আমার হস্তে যে অঙ্গুরীয়ক দেখিতেছেন, ইহা তাঁহারই প্রদত্ত স্মৃতি-চিহ্ন। ইহা তাঁহার প্রথম ও শেষ উপহার। এই অঙ্গুরীয়ক হস্তে থাকিলে ঐ সকল সমিতিতে প্রবেশ করা যায় ও সমিতির সকল সভ্যই এই অঙ্গুরীয়কধারীর সমস্ত অনুজ্ঞা মানিয়া চলিতে বাধ্য।

"কিন্তু আমাদের এই সুখস্বপ্ন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অলফ্ প্রায় এক সপ্তাহ আসিলেন না। দারুণ উদ্বেগে আমি অস্থির হইলাম। আমার অস্থিরতা দেখিয়া মাদাম করডোভা আতঙ্কিত হইলেন। পিতাও আমার এই ভাববৈলক্ষণ্য দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া চিকিৎসক আনাইলেন। কিন্তু, মহাশয়, যাহার অসুস্থতা মনের ভিতরে, শারীরিক চিকিৎসায় তাহার কি হইবে? সহসা একদিন বজ্রাঘাত হইল।

"সাত আট দিন পরে এক দিন প্রভাতে পিতা, আমি ও মাদাম ভোজনকক্ষে প্রাতরাশ করিতেছি, এমন সময় পিতা হস্তস্থিত সংবাদ-পত্রের একটি সংবাদ পাঠ করিয়া মাদামকে তাহা দেখাইলেন; দেখিলাম, মাদামের মুখ বিবর্ণ হইল। অতি কষ্টে মানসিক ভাব চাপিয়া রাখিয়া কোন মতে ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া গেলাম। যাইবার সময় সংবাদপত্রখানি চাহিয়া লইলাম। উপরে আমার কক্ষে

যাইবার সিঁড়ি অবধি পৌঁছাইয়া আর থাকিতে না পারিয়া সংবাদটি দেখিলাম। পড়িবামাত্র মস্তক ঘুরিয়া গেল; সম্মুখে যেন শত তারকা দেখিলাম। অস্ফুট চীৎকার করিয়া সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। সংবাদটি এইরূপ ছিল—'গত রাত্রিতে রুদে নিকোলাই নামক পল্লীর প্রবেশ-পথে প্রসিদ্ধ বিপ্লববাদী অলফ্ বার্গষ্টিন্ গ্রেপ্তার হইয়াছে। গুপ্ত পুলিসের অধ্যক্ষ ব্যারণ মাকারফ স্বহস্তে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে অলফের সন্ধান করিতেছিলেন; তাঁহারই বুদ্ধিবলে এই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার চতুরতা ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। শীঘ্রই সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অলফের বিচার হইবে। আপাততঃ তাহাকে বিশেষ সাবধানতা সহকারে দুর্গে রাখা হইয়াছে।'

"জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি আমার কক্ষে শয্যায়। পিতা,মাদাম ও ডাক্তার নিকটেই বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। আমি চক্ষুরুন্মিলন করিলে পিতা স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেরিয়ান, তোমার কি হইয়াছে?' আমি কষ্টে চক্ষুর জল গোপন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম যে, হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া যাওয়াতেই আমি মূর্চ্ছিত হই। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সুস্থ হইব। ডাক্তারও তাহাই ব্যবস্থা করিলেন। পিতা মাদামকে আমার নিকট একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া, আমায় একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে বলিয়া ডাক্তারের সহিত বাহিরে গেলেন। আমি নিমীলিতনয়নে শুইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে ললাটে কোমল করস্পর্শে চক্ষু চাহিয়া দেখি, মাদাম আমার ললাটে হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ ও সমবেদনা-পূর্ণ। আমি উঠিয়া বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেদিন বড় কান্নাই কাঁদিলাম। আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিবার পর একটু শান্ত হইলে মাদাম আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। আমি কিন্তু বেশ জানিতাম যে, অলফের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। আর, তাঁহাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। আর কেই-ই বা সে চেষ্টা করিবে? পিতাকে কিছু বলিতে সাহস হইল না, আর তাহাতে কোন ফলও হইত না। মাদাম মাত্র আমার সমবেদনায় কাতর। সহসা আমার হস্তস্থিত অলফের অঙ্গুরীয়কের কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার মনে করিলাম, এই অঙ্গুরীয়ক লইয়া সমিতিতে গিয়া সভ্যদের সাহায্য ভিক্ষা করি; তখনই মনে পড়িল যে, সমিতির ইহাই নিয়ম, সভ্যদের কেহ বিপদে পড়িলে, প্রাণপণে সকলে মিলিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং সেখানে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যদি অলফের মৃত্যুদণ্ড হয়, আমি ব্যারণ মাকারফের প্রাণসংহার করিব।

"যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। ইহার এক পক্ষ পরে এই সংবাদটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইল—'গতকল্য সামরিক আদালতে অলফ্ বার্গষ্টিনের বিচার হইয়া গিয়াছে। ব্যারণ মাকারফ ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নানা প্রমাণপ্রয়োগে অলফের অপরাধ প্রমাণিত করিয়াছেন। অলফ্ বিচারে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইয়া চরম দণ্ড লাভ করিয়াছে। পরশ্ব প্রত্যূষে বধ্য-ভূমিতে তাহাকে গুলী করিয়া মারা হইবে। দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিদ্রোহীর ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হয় নাই। সে গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরচিত্তে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছে। বিচারশেষে সে কেবল এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়াছে—'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয় হউক'। আমরা ব্যারণ মাকারফের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি; শুনা যাইতেছে যে, মহামান্য সম্রাট তাঁহাকে 'আয়রণ ক্রশ' পদকে ভূষিত করিবেন।'

"এই সংবাদে আমি যেন সহসা প্রস্তরীভূত হইলাম। আমার আর কোন সংজ্ঞা রহিল না। শুধু মনে রহিল, আগামী পরশ্ব প্রত্যূষে আমার অলফ্ প্রাণ হারাইবে। আমি নিজের স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম। কই, এখনও ত আমি মরিলাম না? এখনও যে আমি বাঁচিয়া আছি? মনে পড়িল, আছে, এখনও আমার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। এখনও আমার একটি কার্য্য অবশিষ্ট আছে। ইহা সম্পন্ন করিতে আমার নারী-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি, সমস্ত কৌশল, চাতুরী প্রযুক্ত করিতে হইবে; তাহার পর? যাউক, ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবিলেই হইবে। আমি হৃদয় দৃঢ় করিলাম।

"বিস্তৃত বর্ণনায় কি প্রয়োজন? দুই দিন পরেই সংবাদ

পাইলাম, অলফ্ চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। মাদাম করডোভা এই সংবাদ পড়িয়া শুনাইতে আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, কেন না, আমি উহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম না। আপনি কি কখনও প্রিয় পত্নীকে ঘাতুকের হস্তে নিহত হইতে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন? তাহা হইলে আপনি আমার তখনকার হৃদয়ভাব অনুমান করিতে পারিবেন। আমার বুকের ভিতর যে ঝটিকা বহিতেছিল, বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশিত হইতে দিলাম না; কারণ—আমরা রুষীয় নারী, আমরা যেমন হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দুটি দিয়া ভালবাসিতে পারি, তেমনই আমাদের প্রতিহিংসাবৃত্তিও ভীষণ; আমি সেই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানসিক অন্যান্য ভাব সবলে নিরোধ করিলাম। তখন হইতে আমার একমাত্র লক্ষ্য হইল, কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিব। সেই জন্য সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহাও শীঘ্র মিলিল।

৫

"আমাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য আমার স্নেহময় পিতা বল-নাচের প্রস্তাব করিলেন। আমার তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শুনিলাম, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অতিথি-বর্গের মধ্যে ব্যারণ মাকারফও যখন নিমন্ত্রিত হইবেন, তখন আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। নাচের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। সকলকে যথাযথ নিমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হইল। নাচের পর বিস্তৃত ভোজের ব্যবস্থা হইল; আমি একটু বিষাদের হাসি হাসিলাম। মাদাম করডোভা ভাবিয়াছিলেন, আমি অলফের কথা ভুলিতে পারিতেছি; আমার হাসি দেখিয়া তিনি তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

"আমি পিতার আদরিণী কন্যা। আমার সকল শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন; সেইজন্য অন্যান্য শিক্ষার সহিত তিনি আমাকে সঙ্গীত ও অস্ত্রচালনে পারদর্শিনী করিয়াছিলেন। আমার ব্যবহারের জন্য একটি উৎকৃষ্ট পিয়ানো ও একটি রৌপ্যমণ্ডিত রিভলভার তিনি কিনিয়া দিয়াছিলেন। মজলিসে আমার সঙ্গীত হইবে শুনিয়া সকলে সানন্দে সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অস্ত্রেও আমার প্রয়োজন ছিল।

"নাচের দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি আমার রিভলভারটি লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলাম। যে বেঞ্চে আমি ও অলফ্ কত দিন বসিয়া, কত প্রেমের স্বপ্ন দেখিয়াছি, কল্পনার রঙ্গীন বর্ণে কত সুখচিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই বেঞ্চে বসিলাম। অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহিল, মর্ম্মের গোপন ব্যথায় আকুল হইয়া সেই স্থানে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রিভলভারটি বেঞ্চের নিম্নে গুপ্তভাবে রাখিয়া দিয়া একবার চারিদিকে চাহিলাম। বুঝিলাম, এই উদ্যানে আমার এই শেষ ভ্রমণ; বোধ হয়, আমার জীবননাটকেরও এই শেষ অভিনয়-রজনী। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, অতিথিরা একে একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি নাচের পোষাক পরিয়া আসিয়া হাসিমুখে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলাম।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যারণ মাকারফ আসিলেন। তাঁহার পরিধানে মিলিটারী ইউনিফর্ম্ম; বক্ষে সম্রাটের অনুগ্রহ-চিহ্নস্বরূপ নবলব্ধ পদক; পদক্ষেপ গর্ব্ব ও কর্ত্তৃত্বপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিয়া আমার একটা উৎকট আনন্দ বোধ হইল। এই ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিলেই আজ আমার সকল আয়োজন — সকল আয়াসই সার্থক হইবে। এই চতুর রাজকর্ম্মচারীকে ভুলাইতে আজ আমার দেহের সমস্ত রূপ, নারীর সমস্ত চাতুরী ও সঙ্গীতকলার সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োজন। তজ্জন্য আমি কেশ-বিন্যাস ও পোষাকের যথেষ্ট পারিপাট্য করিয়াছিলাম। আমার মিষ্টালাপে ও হাবভাব দর্শনে ব্যারণ অল্পকালমধ্যেই আমার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের এক পার্শ্বে দূরে দাঁড়াইয়া মাদাম করডোভা আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি, বোধ হয়, মনে করিলেন, তরুণ হৃদয় কি লঘু, নিত্য নূতন হইলেই ভুলিয়া যায়! আমিও তাঁহার দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলাম।

"পিয়ানোর নিকট আমার ডাক পড়িল। আমি বাজাইতে বসিতেই ব্যারণ আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলেন। আমি গাহিতে লাগিলাম। সে কি সঙ্গীত! মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িবার পূর্ব্বে মিসররাণী ক্লিওপেট্রা বুঝি এইরূপ সঙ্গীতের লহর তুলিয়াছিলেন! আমি সঙ্গীতে আমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিলাম; লহরে লহরে, তালে তালে পিয়ানোর সুরের সহিত সঙ্গত রক্ষা করিয়া গানের সুর উঠিতে নামিতে লাগিল। আমি যেন পাগল হইলাম;

হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দুটি যেন নাচিতে লাগিল; আমার চক্ষুতে বিদ্যুৎ, হস্তে বিদ্যুতের গতি সঞ্চারিত হইল। অপূর্ব্ব ভাবাবেগে মগ্ন হইয়া সমস্ত ভুলিয়া মরণ-সঙ্গীত গাহিতে লাগিলাম 'ওগো আমার প্রিয়,আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত, কত কাল আর তোমার অপেক্ষা করিব? কত যুগ ধরিয়া তোমার একটি চুম্বনের আশায় বসিয়া আছি, তুমি ত আসিলে না! আজ আমি বিদায়-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মরিয়া তোমার প্রেমে অমর হইব। প্রভাতের ম্লান কুসুমের ন্যায় আজ আমি ঝরিয়া পড়িব। দূরান্তরে থাকিয়া কি তুমি আমার এই আহ্বান শুনিতে পাইবে না? আমার সমাধির উপর কি তুমি একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিবে না? উৎসবের আলোক-মালা একে একে নির্ব্বাপিত হইতেছে, আমার কণ্ঠের সঙ্গীত নীরব হইয়া আসিতেছে, চক্ষুও চিরকালের নিমিত্ত নিমীলিত হইতেছে। ঐ দেখ, অন্ধতমসে বিলীন হইবার নিমিত্ত মৃত্যুদূত তরী লইয়া অধীরভাবে আমাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আমাকে যে আজ যাইতেই হইবে। এস, আমার দয়িত, এস; তোমার শেষ বিদায়বাণী শুনিবার আশায় আমি যে অপেক্ষা করিতেছি; তুমি এস।' আমার কণ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিল। সঙ্গীতের রেশ যেন ক্লান্ত করুণ ক্রন্দনের মত কক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীরব হইল। শ্রোতৃবৃন্দ নির্ব্বাক; কাহারও চক্ষু অশ্রুসজল।

"মোহময় ভাবের তন্দ্রা কাটিয়া গেলে সকলে প্রশংসা-ধ্বনি করিলেন। আমার সঙ্গীত-দক্ষতায় প্রীত হইয়া মাকারফ, নৃত্যে আমাকে তাঁহার সঙ্গী হইবার প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনায় একটু গর্ব্বমিশ্রিত দাবীর ভাব ছিল। যাহা হউক, আমি তাঁহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলাম। যথাকালে নৃত্য আরম্ভ হইল। আমি শুনিয়াছি, আফ্রিকার কোন কোন বর্ব্বর জাতির মধ্যে প্রথা আছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা এইরূপ নৃত্যের আয়োজন করে। এই নৃত্যে তাহারা প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া উদ্দাম গতিতে নিজেদের হারাইয়া ফেলে। আমারও সেইরূপ হইল। আমি জানিতাম, পার্থিব জগতে আজ আমার এই শেষ আমোদ প্রমোদ। শুধু সঙ্কল্প রহিল, আজ আমি বিজয়িনী হইব। আজ আমার প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। যাহাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি, তাহাকেই লইয়া এই মরণ-নৃত্যের পর মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হইব। আমি উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। চতুর্দ্দিকে যে স্থানেই চাহিলাম, দেখিলাম—যেন অলফ্ হস্তসঙ্কেতে আমাকে আহ্বান করিতেছেন। আমি যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম।

"কিছুক্ষণ নৃত্যের পর মাকারফকে বলিলাম, 'দেখুন, এই কক্ষের বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছে, আমি শ্রান্ত হইয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বাহিরে উদ্যানে লইয়া চলুন।' মাকারফ আগ্রহভরে আমাকে লইয়া চলিলেন; হয় ত তিনি আমার নিঃসঙ্গ সঙ্গলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। আমরা অলক্ষিতে বাহির হইলাম। উত্তেজনায় আমার বক্ষের কম্পন দ্রুত হইল। এই বিয়োগান্ত প্রহসনে যবনিকা-পতনের আর বিলম্ব নাই।

৬

"ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আমি ও ব্যারণ সেই নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে আসিয়া বসিলাম। শীতল বায়ুপ্রবাহে আমার মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইল। ব্যারণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যারণ, আপনি এই পদকটি কি সূত্রে লাভ করিয়াছেন? সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে, শুনিয়াছি, ইহা লাভ করা যায় না।' মাকারফ বলিলেন 'দেখুন, আমি ইহা একজন দুর্দ্দান্ত বিপ্লব-বাদীকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত করিয়া লাভ করিয়াছি; এই ব্যক্তি সম্রাটের সিংহাসন কম্পিত করিয়াছিল। ইহার উচ্ছেদের জন্য সম্রাট আমাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'

'আপনি কি অলফ্ বার্গষ্টিনের কথা বলিতেছেন?'

'হাঁ। এই ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক ছিল। রুষিয়ার ছাত্র ও কৃষকবৃন্দ তাহাকে অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক বলিয়া জানিত। সেই জন্য তাহাকে সরান বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।'

'কিন্তু ব্যারণ, আপনারা যে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত করিয়াছিলেন, তাহা কি সত্য?'

'রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অনেক সময় মিথ্যারও আশ্রয় লইতে হয়; তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কথা কেবল আমিই আদালতে সপ্রমাণ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই সে চরমদণ্ড লাভ করিয়াছে।'

আমি কিঞ্চিৎ শ্লেষের ভাবে কহিলাম, 'আর এই জন্য আপনি নিশ্চয়ই যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন!'

আহতস্বরে মাকারফ বলিলেন, 'আপনি রাজ-পক্ষীয় হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? হতভাগ্য বার্গষ্টিন কি তাহার উপযুক্ত দণ্ডই প্রাপ্ত হয় নাই?'

"আমার বক্ষের শোণিত উত্তপ্ত হইল, দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'ব্যারণ, আপনি কি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, অলফের পক্ষীয় লোক এই জন্য আপনাকে বিপন্ন করিতে পারে?' মাকারফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'তাহার পক্ষীয় কোন লোক না হউক, তাহার প্রণয়িনীর নিকট হইতেই কিছু শঙ্কা আছে। রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম বটে, সে এই রুদে নিকোলাই পল্লীতে ইদানীং গতায়াত করিত। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট ভীত হইলে সম্রাট আমাকে পুলিসের অধ্যক্ষ করিতেন না। তদ্ভিন্ন আমি সর্ব্বদাই যথেষ্ট সতর্ক হইয়া থাকি।'

"আমি তড়িদ্গতিতে বেঞ্চের নিম্ন হইতে রিভলভার লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, কঠোর স্বরে বলিলাম, "ব্যারণ, আপনি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করুন; আমি আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর হত্যাকারীকে আজ উপযুক্ত প্রতিফল দিব; অলফের আত্মা প্রতিনিয়তই তাহার হত্যাকারীর শোণিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।' মাকারফ স্তম্ভিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! আমি রিপোর্টের কথায় বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু দেখিতেছি, তাহা সত্য। আপনি বার্গষ্টিনের বাগ্‌দত্তা? সত্যই কি আপনি আমায় খুন করিবেন?' আমি স্থির কণ্ঠে বলিলাম, 'আমি আমার স্বামীর হত্যাকারী ও বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত প্রতিফল দিব।' মাকারফ কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, সহসা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার হস্তস্থিত রিভলভার কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তদ্দণ্ডেই আমার উদ্যত পিস্তল ভীম গর্জ্জন করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিল। মস্তকে বিদ্ধ হইয়া মাকারফ পড়িয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে কোলাহল শুনিয়া পিস্তল নিজের মস্তকের দিকে লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সহসা পশ্চাৎ হইতে এক জন প্রহরী আমাকে ভীমবলে জড়াইয়া ধরিয়া পিস্তল দূরে নিক্ষেপ করিল; মূর্চ্ছিত হইয়া তাহারই ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িলাম।

"জ্ঞান হইলে দেখিলাম, অন্ধকারময় কারাকক্ষে শয়ন করিয়া আছি। উত্তেজনার অবসাদে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলাম। কষ্টে উঠিয়া দেখিলাম, নিকটে একটি পাত্রে জল রহিয়াছে; কিঞ্চিৎ পান করিয়া সুস্থ হইলাম। আমার তখনকার মানসিক ভাব বর্ণনা করা অসম্ভব।

"দুই দিন পরে কারাধ্যক্ষ আসিয়া সম্রাটের স্বাক্ষরিত মৃত্যুদণ্ড পাঠ করিয়া শুনাইয়া গেলেন। আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, এত দিনে আমি আকাঙ্ক্ষিতের সহিত মিলিত হইতে পারিব। যাঁহার প্রেমের জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, নারীর কোমলতা বিস্মৃত হইয়া, নর-হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, শীঘ্রই তাঁহার সহিত মিলিত হইব, কিন্তু সপ্তাহ পরে যখন অন্যান্য বন্দীর সহিত সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে প্রেরিত হইলাম, তখন রক্ষীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, মহিমান্বিত সম্রাট আমার পিতৃবন্ধুদিগের অনুরোধে অনুগ্রহপূর্ব্বক মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া আমায় চির-নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। আমি হত্যাকারিণী, নারীহৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট করিয়া আমি যে এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছি, তাহার কারণ প্রেম। আমি আজ ভয়াবহ চির-নির্ব্বাসনে যাত্রা করিয়াছি; জানি, সে স্থান হইতে জীবনে আর ফিরিব না; আর, এ জীবনেও আমার আর কোন কামনা, কোন বাসনা নাই, শুধু আমার একমাত্র ক্ষোভ এই যে, সত্বর অলফের সহিত মরণের পরপারে মিলিত হইতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি আমার প্রতীক্ষা করিবেন। হয় ত আমি ভ্রান্ত, কিন্তু শেষ বিচার দিবসে যখন সর্ব্বদর্শী ভগবান্ আমাদের অপরাধের বিচার করিবেন, তখন অলফের প্রতি আমার এই একনিষ্ঠ প্রেমের কথা ভাবিয়া কি তিনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন না?"

যুবতীর বিশাল নয়নদ্বয় হইতে মুক্তাফলসদৃশ দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার প্রস্ফুট গোলাপ তুল্য গণ্ড বহিয়া পতিত হইল। তাঁহার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠ নির্ব্বাক্ হইল, সজল-নয়নে তিনি নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোরিস্ আলেক্‌জান্দ্রোভিচ্ কোনও সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না; তাঁহারও চক্ষু অশ্রুসজল।

আবার প্রভাত হইল। আবার সারিবদ্ধ বন্দিগণ গন্তব্য পথের উদ্দেশ্যে ধীরচরণে যাত্রা করিল। আবার তাহাদের শৃঙ্খলিত চরণ হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল—ঝম্—ঝম্—ঝম্।

শ্রীজ্যোতীন্দ্রনাথ সান্যাল।

স্বরাজ-সাধনা।

২

প্রাচীন আর্য্য আদর্শ মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, পুরাণাদি-কথিত বিষয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা বলিয়া মনে করি অথবা স্থানবিশেষে নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া লই। মোগল-পাঠান রাজত্বকালে সেই আদর্শে কতকটা ভেজাল মিশিয়াছিল মাত্র, আর এখন ইংরাজী যুগে শৈশব হইতে গুরু-দক্ষিণার পরিবর্ত্তে ডুবালের গল্প পড়িতে আরম্ভ করিয়া যৌবনে French Revolution-এর ইতিহাস হইতে প্রজাতন্ত্র ও Adam Smith's Wealth of Nations হইতে অর্থনীতি শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য একেবারে আমাদিগের পেটে অপচ্য হইয়া পড়িয়াছে; আজ যদি **ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে রাজ্য-চালনার** সম্পূর্ণ অধিকার আসিয়া পড়ে, তবে পার্লামেণ্ট কাউন্সিল কমিটী ভোট গভর্ণর মিনিষ্টার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার পুলিস জজ প্রভৃতির যে সকল পাশ্চাত্য পুত্তলি আমাদিগের মস্তিষ্কে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিরই মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া ও অঙ্গে চাপকান আচকান্ বা পাঞ্জাবী পিরাণ পরাইয়া যথাযথ স্থানে বসাইয়া দিব, বড় জোর মাসিক বার হাজার টাকা বেতনের পদটার আট হাজারের হারে ধার্য্য করিব। সেই স্কুল সেই কলেজ সেই হাঁসপাতাল সবই থাকিবে, তবে না হয় Harry was a good boyএর স্থানে Hari or Harif was a good boy হইবে (হইবে কেন, হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে Primary পাঠ বিজ্ঞান-Readerও হইয়াছে) আর হাঁসপাতালে সকালে ইংরাজী ইন্‌জেকসন, মধ্যাহ্নে হাকিমী হালুয়া এবং সায়াহ্নে আয়ুর্ব্বেদীয় মকরধ্বজের ব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে।

তার পর ক্ষমতা;—ক্ষমতার বোতল যে আসবে পরিপূর্ণ থাকে, সে সুরা হুইস্কি হইতে উগ্রতর। যেমন সুরাপান করিলেই পা টলিবে, মাতাল হইতে হইবেই, তদ্রূপ হস্তে ক্ষমতা আসিলেই এই পঞ্চেন্দ্রিয়-শাসনাধীন মন নিশ্চয়ই মাতাল হইবে—আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিবে।

এই ক্ষমতা মনুষ্যের মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণতাপরতার উপরই নির্ভর করে, সেই জন্য বৈদিক যুগে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন; অন্যান্য দেশে ব্রাহ্মণের প্রতিরূপ ছিলেন খলিফা, র‍্যাবি, পোপ ইত্যাদি। উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়েরা আবার বাহুবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের শক্তি সংযোগ করিয়া সকল শাসনক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বা ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক হইয়া উঠিলেন, ক্ষত্রিয়ের প্রতিরূপও অন্যান্য দেশে দেখা দিয়াছিল যথা;—তাতার, মুর, রোমান, গ্রীক, স্পানিয়ার্ড, গল, স্যাকসন প্রভৃতি। ক্রমে বৈশ্যও বুঝিলেন, **কেবল দাঁড়ি-পাল্লা ধরিলেই চলিবে না।** বিদ্যার জোরেও জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে হইবে; সুতরাং বৈশ্যের বশ্যতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল, ব্রাহ্মণের উষ্ণীষ বিশপের মাইটার ক্ষত্রিয় মুরের তরবারিও বৈশ্যের সম্মুখে নত হইল; সভ্য জগতে এখনও বৈশ্য-সমাজে ইংরাজ মুখ্য কুলীন। এক্ষণে গুরু মশাই গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন, the schoolmaster is abroad, সুতরাং শূদ্রমস্তিষ্কেও এ, বি, সি'র ফশল ফলিয়াছে; তাহারা বলিতেছে, "কে হে তুমি মহাজন? আমাদের জন-মজুরের জোরেই ত তোমাদের সাজন-গোজন ভজন-পূজন অর্জ্জন-গর্জ্জন, আর হয়ে বেড়াচ্চ দশজনের এক জন।" এইরূপেই শূদ্রপ্রতাপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, বণিক ইংরাজ আজ শ্রমিক আমেরিকার দ্বারে ঋণী।

কথা আছে বটে বলং বলং বাহুবলং কিন্তু মনের ভিতর হইতে শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া না দিলে বাহুবীর অন্নগ্রাসটিও মুখে তুলিতে সমর্থ হয়েন না। আর সেই জড়বুদ্ধিযুক্ত বিষয়ী মন চালিত হয়েন মস্তিষ্কের পরামর্শে, বুদ্ধিতে ও আজ্ঞায়। মস্তিষ্কই বিদ্যা গ্রহণ করে, ধন উপার্জ্জন করে, শক্তি সংগ্রহ করে। সমাজ গঠনের আদি অবস্থায় মানব যখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাহুবলে দুর্ব্বলকে দলন ও তাহার ধনধান্য লুণ্ঠন করিত, তখন দলস্থ সর্ব্বাপেক্ষা

চতুর ও বুদ্ধিমানকে সর্দ্দার আখ্যা প্রদান করিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিত; সমাজ যখন একটু গুছাইয়া উঠিয়া সভ্য উপাধি পরিগ্রহ করিল, তখন **সর্দ্দারের অভিধান হইল রাজা** আর দস্যু হইল সৈন্য। সর্দ্দার একটা মাথায় চালাইত বড় জোর দুই শত চারি শত লোক; কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রজাপূর্ণ রাজ্য চালাইতে একটা মস্তিষ্কের শক্তিতে সকল সময় সঙ্কুলান হয় না বলিয়া রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্য হইতে প্রখর মস্তিষ্ক সংগ্রহ করিয়া মন্ত্র-গৃহ রচিত করিলেন। এইরূপে সাত আটটি মস্তিষ্ক রাজ্যের কোটি কোটি নরনারীকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই সচিবশক্তিচালিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রই অনূদিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট প্রাইম-মিনিষ্টার পার্লিয়ামেণ্ট কংগ্রেস কাউন্সিল সেনেট প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

ভারতবর্ষ একমাত্র ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলেও সেই প্রখরমস্তিষ্ক কতিপয়ের হস্তেই শাসন-পালনের সমস্ত শক্তিই ন্যস্ত হইবে।

সে দিন যে মানব স্বার্থ ভুলিবে, সে দিন সে 'আমি' ও 'আমার' বিস্মৃত হইয়া পরমার্থ-তত্ত্বে আত্মাকে নিয়োজিত করিবে, পৃথিবীর কোন প্রলোভনই আর তাহাকে বিষয়-বিষ পান করাইয়া রাজা মন্ত্রী কমাণ্ডার কাউন্সিলার করিতে পারিবে না; সুতরাং স্বার্থকে সঙ্গী না করিয়া কোন স্বদেশহিতৈষী শাসনসম্বন্ধীয় কার্য্যেই লিপ্ত হইবেন না। অগ্নি, ঋণ ও রোগের ন্যায় স্বার্থও প্রথম হইতে দমিত না হইলে দিন দিন আপনার আধিপত্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, **স্বার্থের উপাস্য দেবতা—ক্ষমতা,** আপনাকে অন্য অপেক্ষা অধিক বলবান করা। জড় জগতে বাহুবল বুদ্ধিবল ধনবল এই তিন বলই প্রধান ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু বুদ্ধিবল প্রকৃষ্ট না হইলে বাহুবল ও ধন-বলও বিশেষ কার্য্যকর হয় না, আবার বুদ্ধিবলের সঙ্গে ধনবল থাকিলে বাহুবল ক্রয় করা অতি সুলভ হয়।

শাসন-যন্ত্রের ইঞ্জিনিয়ারকে, বিদেশী-ই হউন বা স্বদেশী-ই হউন, নিজের বলের একাধিপত্য রাখিবার জন্য অন্যকে অপেক্ষাকৃত বলহীন করিতেই হইবে। ক্ষমতার নেশা এতই চিত্তাকর্ষক যে, সংসারীর কথা দূরে থাকুক, সাধক পিতা মাতা দারা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, সকল ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, অনশনে বা অর্দ্ধাশনে নগ্নগাত্রে তরুতলে বা গিরিগুহায় আসন গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে প্রকৃতির উপর কতকটা প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি-লেই সেই ক্ষমতা প্রকাশে আত্মতৃপ্তির লালসায় পরম পদে লীন হইয়া মুক্তি-লাভের আশাকেও পরিত্যাগ করতঃ অধি-কাংশ যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া যায়েন। ক্ষমতার চরণে মস্তক অবনত করিবার জন্য মানবের আগ্রহ এত অধিক যে, লোক কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনিলেই অগ্রে জিজ্ঞাসা করে, সে সাধুর আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি? তিনি কি জলকে দুধ করিতে পারেন? তামাকে সোনা করিতে পারেন? পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইতে পারেন? তিনি কি সাধ-নার পথ দেখাইতে পারেন বা ঈশ্বরজ্ঞান দিতে পারেন, এ কথা অল্প লোকই জিজ্ঞাসা করে।

এক দিকে রজোগুণদীপ্ত প্রবৃত্তি যেমন প্রভুত্ব লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে তমাচ্ছন্ন মন আবার তেমনই সেবকরূপে প্রভুপদে লুণ্ঠনের জন্য লালায়িত; একমাত্র তাড়নার পীড়ন-ই তাহাদের নিদ্রালু শক্তিকে কতকটা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারে।

এক এঞ্জিনিয়ার বাবু মফঃস্বলে পূর্ত্ত-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, কোন একটা ছুটীর সময়ে তাঁহার এক জন বন্ধু বেড়াইতে গিয়া কয়েক দিন তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিতে থাকেন; বন্ধুটি অবশ্য শিক্ষিত ও স্বাধীন-ভাবাপন্ন। তিনি দেখেন যে, প্রত্যহ প্রভাতে এঞ্জিনিয়ার বাবুর বাসার সম্মুখে হাজিরা লেখাইবার জন্য দুই শত আড়াই শত কুলী জমায়েৎ হয় এবং এঞ্জিনিয়ার বাবুর চাপ-রাশী এক এক জনকে রাস্তার কাযে ও এক এক ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে ঐ চাপরাশী একপাটী নাগরা লইয়া প্রত্যেক কুলীকে দশ ঘা করিয়া জুতা প্রহার করে, কুলীরা অম্লানবদনে পিঠ পাতিয়া ঐ প্রহার গ্রহণ করে, কাহারও কাহারও বা অধরপ্রান্তে একটু হাসিও দেখা দেয়; ছোলাগুড় খাইতে দিলে ঐ শ্রেণীর লোকের মুখে যে ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, জুতা-খাওয়া মুখের ভাবে তাহার বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না। বন্ধু বাবুটি খাস কলকাত্তাই, তার উপর গ্রাজুয়েট, সংবাদপত্র পাঠে প্রত্যহ প্রভাতবন্দনা করেন, কখনও কখন-ও বা Vox Papulj কি Pro Bono Publico গোছের নাম

স্বাক্ষর করিয়া কাগজে Correspondence লিখেন। সুতরাং এঞ্জিনিয়ার বাবুর চক্ষুর উপর এই অমানুষিক নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত কার্য্য নিত্য সম্পাদিত হইতে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং দিন চারেক পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় বন্ধুকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, চাকরীতে ঢুকে তোমার শিক্ষা সভ্যতা মনুষ্যত্ব সব-ই কি লোপ পেয়েছে? প্রথম দিন ভেবেছিলাম যে, পূর্ব্বে কোন দোষ করেছে, তাই বুঝি আজ তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাতেও জুতো মারাটা যে খুব অনুচিত, তা-ও অবিশ্যি মনে করেছিলুম; কিন্তু চার দিন ধরে দেখছি, কোন দোষ নেই, তুমি যখন ইন্‌সপেকসনে যাও, আমিও রোজ-ই সঙ্গে যাই, বেশ ত কায কর্ম্ম করে দেখতে পাই অথচ গরীব ব'লে তাদের খামকা খামকা এই অপমান—এই শাস্তি! এই জন্যেই ত কাগজে তোমাদের মতন অফিসারদের এত নিন্দা এত অখ্যাতি করা হয়।" এঞ্জিনিয়ার বাবু বল্লেন, "ওহে, ও সব theoretical ethics কলেজে করা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে তা চলে না। মার না খেলে ওরা কায কর্‌বে-ই না।" সহুরে বন্ধু বলিলেন, "এও কি একটা কথা! ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তোমাদের প্রাণে কড়া প'ড়ে গেছে, তাই বুঝতে পার না কি অন্যায় কায। ওটা তোমাদের serviceএর একটা supertion মাত্র।" এঞ্জিনিয়ার বাবু বলিলেন, "ভাল, তোমার কথাই থাক্, কাল থেকে মার বন্ধ ক'রে দেওয়া যাবে।" চাপরাশী বাসাতে-ই থাকে, সেইরূপ হুকুম-ই তাহাকে দেওয়া হইল। পরদিন সকালে কুলীরা সব রীতিমত জমায়েৎ হইল। হাজিরা লিখার পর চাপরাশী নম্বরওয়ারী এক এক গ্যাং ডাকিয়া কার্য্যস্থানের ঠিকানা বলিতে লাগিল, গ্যাংএর পর গ্যাং কুলীরা খাড়া হইয়া এটেন্‌সনে দাঁড়াইল, চাপরাশী আবার বলিল, "যাও সব কামমে যাও;" কিন্তু কুলীর দল নড়ে না, তাহাদের বুভুক্ষু নয়নের চাহনি যেন বলিতে লাগিল, "জুতা কৈ? জুতা কৈ?" অন্তর্যামী চাপরাশী মর্ম্মের কথা বুঝিয়া বলিল, "যাও যাও, আজ অউর কুছ নেহি হোগা, যাও মজাসে কাম করো।" তখন কুলীর দল একবার চাপরাশীর মুখের দিকে আর একবার এঞ্জিনিয়ার বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পরে আপনা-আপনি মুখ চাওয়া-চাওই করিয়া একটু ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া কোদাল গাঁতি দোলাইতে-দোলাইতে গা এলাইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের প্রস্থানের পর এঞ্জিনিয়ার বাবু বন্ধুর সঙ্গে একত্রে চা-পান করিয়া দুই জনে দুই ঘোড়ায় চড়িয়া উনি তদারকে ইনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন।

আধমাইলটাক পরে একটা কালভার্টের কাছে উপস্থিত হইয়া উভয়ে দেখিলেন, কুলীরা বসিয়া জটলা করিতেছে। কাহারও মুখে হুঁকা, কাহারও মুখে বিড়ি। কোদাল, গাঁতি, ঝুড়ি সব ছড়াছড়ি, গ্রাহ্যই নেই, এঞ্জিনিয়ারকে দেখিয়া না দাঁড়ান, না সেলাম। বাবু বলিলেন, "তোম লোক বৈঠ বৈঠকে কেয়া কর্‌তা?" এক জন উত্তর দিল, "এই আপোসমে দুটো চারঠো গল্পসল্প করতা হায়, আপনি যাও না।" বাবু বলিলেন, "কাম নেই করে গা?" আর এক জন বলিল, "হোগা হোগা, সব্‌ই হোগা, আপনি কষ্ট কর্‌তা ক্যানে, চলে যাইয়ে না, সরকারী কাম বন্দ নেহি হায়, আপনি বাসায় যাইয়ে, কাম হোয়ে গা।" আর কোন কথা না বলিয়া এঞ্জিনিয়ার বাবু বন্ধুসহ অগ্রসর হইলেন, দ্বিতীয় স্থানে পৌছিয়া দেখেন, সেই অবস্থা—সেই ব্যবহার। তৃতীয় স্থানেও সেই গদাইলস্করী আলস্য, সেই বে-আদবী উত্তর। এঞ্জিনিয়ার বাবু বুঝিলেন, যথেষ্ট তদারক হইয়াছে, আজ আর নয়; বন্ধুকে বলিলেন, "চল, বাসায় ফিরে যাওয়া যাক, আজ বড় কাযকর্ম্মের সুবিধা দেখছিনে।" পথে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোজ ত বেশ কাযকর্ম্ম করে, আজ ওরকম করছে কেন?" এঞ্জিনিয়ার বাবু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেটে পিঠে দুদিকের খোরাক না পেলে এ অঞ্চলের কুলীরা খাটতে পারে না।" বন্ধু দু চারখানা ইংরাজী বইয়ের নাম মনে মনে ক'রে নিলেন, কিন্তু কোন খানা থেকেই এঞ্জিনিয়ারের মন্তব্যের উত্তর দিতে সমর্থ হলেন না।

পরদিন প্রভাতে হেলিতে দুলিতে এলাতে এলাতে একটু বেশী বেলাতে একটু অনুগ্রহ করার-ই ভাবে যেন কুলীর দল হাজিরা দিতে আসিল, হাজিরা লিখার পর এঞ্জিনিয়ার বাবু সোলা হ্যাট মাথায় চড়াইয়া ডান হাতে হান্টিং হুইপ গাছটা ধরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সাহেবী সুরে সজোরে হিন্দীতে বলিলেন, "চাপরাশি, আজ শালা লোককো বিশ বিশ জুট লাগাও।" চব্বিশটি ঘণ্টা ধরিয়া চাপরাশী সাহেবের হাতটা উপবাসী, গেল রাত্রিতে এক রকম আধপেটাই খাইয়া রহিয়াছে, সে একেবারে পয়জার না বাহির করিয়া "রাম দো তিন" গুণিতে গুণিতে এক এক জনের পিঠে বিশ বিশ পটাস্

পটাস্! তখন কুলীরাও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সোৎসাহে কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল, "ওরে আপীসে আবার বাহাল হয়েছে, আবার বাহাল হয়েছে!" সে দিন তদারকে বাহির হইয়া বন্ধু দেখিলেন, কোদাল গাঁতি যেন কলে উঠিতেছে পড়িতেছে, ঝুড়ি সব উব্‌চো উব্‌চি বোঝাই, আর কি এটেন্‌সনে দাঁড়ান, কি স্যালিউটের ভাবে সেলাম!

বাসার ফিরিয়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, ব্যাপারখানা কি?" এঞ্জিনিয়ার ভায়া বলিলেন, "ব্যাপার আর কি, কাল জুতো না খেয়ে ঠিক করেছিল, আমার চাকরী গিয়েছে, আজকে ডবলবরাদ্দ পেয়ে ঠাওয়ালে যে, আপীল ক'রে আবার চাকরী পেয়েছি, হয় ত বা মাইনে-ও কিছু বেড়েছে।"

এই যে দাস্যভাব, ইহা কেবল কুলীজাতির প্রাণের মধ্যে আবদ্ধ নহে, অনেক হোমরা-চোমরা ধনকুবের, অনেক কেতাবী বাবু, অনেক খেতাবী বাহাদুর, অনেক গর্জ্জনশীল দেশহিতৈষীর প্রাণটাও **প্রভুপদে তৈলমর্দ্দন করিতে না পারিলে** যেন অস্থির হইয়া উঠে; যেমন কেনারী পাখীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিলেও সে স্বাধীনভাবে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, পিঞ্জরে বাস করাই যেন তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া বহুবংশপরম্পরাগত একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, সেইরূপ মানবজাতির মধ্যেও কতকগুলি লোক এমন একটা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে যে, কোষ্ঠীকারক তাহাদিগকে শূদ্রবর্ণ বলিয়া নির্ণয় করেন।

খাঁটি সোনায় গড়ন হয় না, স্যাকরার দোকান যত দিন থাকিবে, অল্প বেশী খাদ-পান-ও তত দিন থাকিবে। কেবলমাত্র সত্ত্বগুণী লোক লইয়া সংসার চলে না, সুতরাং এই বৈষয়িক সংসার যতদিন থাকিবে, ততদিন-ই একটু রজস্তমের ভেজাল দিয়াই সংসার গড়িতে হইবে। মাটীর মেদিনীতে মানবমন কিছু না কিছু প্রভুভাব বা সেবকভাব পোষণ করিবে-ই করিবে।

বর্ত্তমান সভ্যতায় যে সত্ত্ব একেবারে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে বাজারে যাহা দেখিতে পাই, তাহা হয় যশুরে আমসত্ত্ব, বেয়াড়া তেঁতুল-মিশানো; নয় মাদরাজী আমসত্ত্ব, বেজায় মিছরীর বুকনীতে ভরা; খাঁটি মালদয়ে আমসত্ত্ব যদি থাকে, তাহা কাহারও কাহারও ঘরে থাকিতে পারে, বাজারচলন সেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজা রজোগুণের রক্তবর্ণে রঞ্জিত। সুরার উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন খোঁয়ারীর অবসাদও অপরিহার্য্য, তমোর আবেশও তদ্রূপ রজোগুণের তেজে উদ্দীপ্ত পদ-বিক্ষেপে অনুসরণ করিয়া থাকে। বহুভাগ্যে **স্কচ ইংরাজ আইরিশের ঘরে অন্নের প্রাচুর্য্য নাই**, তাই আহার অন্বেষণে কাহাকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হয়, জঠরাগ্নি তাহাদিগের রজোভাবকে উত্তপ্ত রাখিয়াছে, তাই বেসাতীর পেশাতে ধনের পশরা ছাপাইয়া উঠায় তাঁহাদের ভোগবিলাস এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার নেশায় মাঝে মাঝে খোঁয়ারীর চোটে হিক্কা উঠিলেও এখনও অবসাদে লতাইয়া পড়েন নাই।

এ দেশে পক্ষি-চঞ্চু-ভ্রষ্ট নীবারও অঙ্কুরিত হয়, তপনদেবের করুণায় শীতনিবারণের জন্য মেষের চরণচতুষ্টয়ে মস্তক অবনত করিতে হয় না। এখানকার দস্যু চোর প্রবঞ্চক ব্যভিচারী প্রভৃতি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট লোকেরও মনে একটু ঈশ্বরের ছায়া, একটু বৈরাগ্যের হাওয়া স্পর্শ করে; সুতরাং মোগল আগমনের পূর্ব্বে ধনি-মনে এবং রাজরূপে ইংরাজ বিরাজ করিবার পূর্ব্বে জন-মনে বিলাসিতা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই জন্য নিত্য প্রয়োজনীয়ের অভাবের অভাবে উদ্যম-জনয়িতা রজঃ বঙ্গভূমি ছাড়িয়া এবং বিলাতী রেলের সুবিধা পাইয়া মাড়োয়ারের মরুভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর ব্রহ্মবিদ্যাস্থলে পুরোহিত-শাসন আসন পাতিয়া সত্ত্বভাবের ভিতর উপস্বত্ব লাভের লোভ জাগাইয়া দেওয়াতে বৈরাগ্যের ভাণে "যা করেন ভগবান" বলিয়া আমরা তমঃ ঠাকুরের মফিয়া-মাখান কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছি।

এই নিদ্রা বিশ্রামের নিদ্রা নহে, সুখের নিদ্রা নহে, শরীরে নবশক্তি সঞ্চারের নিদ্রা নহে, এ নিদ্রা একটি ব্যাধি, চিরনিদ্রার উপক্রমণিকাপ্রায়—(Sleeping sickness) এই ব্যাধি দূর করিবার জন্য, এই ঘুম তাড়াইবার জন্য অনন্তজ্ঞানময় পরমেশ্বর **ইংলণ্ডদ্বীপনিবাসী বুভুক্ষু শীতার্ত্ত শ্বেতাঙ্গদিগকে** এই তপন-তাপিত শ্যামা অটবী-শোভিত স্রোতস্বিনীহারাবলীপরিহিত রত্নগর্ভ ভারতে আনয়ন করিয়াছেন। ঘুমন্ত ছেলে নড়িলে চড়িলে মা যেমন তাহার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া ভাল করিয়া ঘুম পাড়ান, ইংরাজের হস্তাবর্ত্তনও তদ্রূপ আমরা প্রথম প্রথম জননীর স্নেহকোমল করস্পর্শ মনে করিয়া নিদ্রাটা আর একটু গাঢ়তর করিয়া লইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাও ধ্বনিত হইয়া

উঠিল। ঘুম—গেল ঘুম—ক্রমে করের কোমলতা দূর হইয়া চপেটাঘাতের কঠোরতা প্রাপ্ত হইল, চাপড়গুলা চামড়া ছাড়াইয়া হাড় পর্য্যন্ত পৌছিল, তখন একটু মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া দেখি মা কৈ—এ যে দাই-মা! দক্ষিণ হস্তে মুড়ী খাইতেছেন। তখন আমরা শিশুর সম্বল কান্না জুড়িয়া দিলাম; কণ্ঠের ট্যা ট্যা, চক্ষুর জল দাই-মা'র হৃদয় উদ্বেলিত করিল, তিনি চাপড়ের হাতটার বহর বাড়াইয়া দিলেন আর মুড়ী-খাওয়া হাতটি তেল-নুন-লঙ্কা-মাখান একটি আঙ্গুল আমাদের মুখে চুষিতে দিলেন। তাহার পর মাঝে মাঝে একটু একটু ঘুম আসে, এক একবার চটকা ভাঙ্গে। আজকাল মনে করিতেছি, আমরা জাগ্রত হইয়াছি; সত্যই কি জাগ্রত হইয়াছি? সুস্থ শিশু জাগিলে আর ত শয্যায় শুইয়া থাকে না, সে তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসে, যাহার হামার বয়স, সে হামা দেয়, যে চলিতে পারে, সে চলে, মাঝে মাঝে দৌড়িবার চেষ্টা করে, সে হুটোপুটি করে, দৌরাত্ম্য করে; আপনার দুধের বাটি গিয়া দখল করে, আপনার গেলাস খোঁজে, কাপড় খোঁজে; আমারা কি এর কোনটা করিতেছি?—না! এতেই বোঝা যায়, আমরা জাগি নাই, মাঝে মাঝে তেওড়াঙ্গি-ম্যাও-ড়াঙ্গি, গ্যাভাঙ্গি-গ্যাভাঙ্গি বটে, কিন্তু সেটা দুঃস্বপ্নের দৌরাত্ম্যে night mare ছাড়া কিছুই নয়।

এই তমোনিদ্রা জয় করিতে প্রথমে রজোগুণের আশ্রয় চাই। সত্ত্ব ও রজঃ দুই গুণই মানবকে কর্ম্ম করিতে বলে; সত্ত্বের সাধনায় কামনাবিহীন কর্ম্ম, রজের কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত। কামনাবিহীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কঠোর সাধনা চাই, সে সাধনার আদর্শ আর্য্যগণ পুরাণাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পরে তাহার কথা বলিব। কিন্তু সে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ লোককে রজোগুণের আশ্রয় লইয়া পরিতৃপ্তির দ্বারা ভোগ-লালসার নিবৃত্তি আনিতে হইবে; নিত্য-সিদ্ধ মহাপুরুষরাই প্রথম হইতেই সত্ত্বের পথের পথিক হইতে পারেন। **ইংরাজের আধার হইতে** এই রজোগুণের কিরণ ধীরে ধীরে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে; আমাদিগকে গ্রহণসক্ষম হইতে হইবে এবং গ্রহণজন্য যেমন উদ্যোগী হইতে হইবে, সতর্কও তেমনই হইতে হইবে, যেন তেজ ও দীপ্তির সঙ্গে দাহন ও শোষণ শক্তিও গ্রহণ করিয়া না ফেলি। উদ্যমের পৃষ্ঠে প্রতীচ্যের উদ্দাম কশাঘাত না করিয়া প্রাচ্যের সংযম রজ্জুর আকর্ষণে তাহাকে সংযত রাখিতে হইবে। মণির আধার হইলেও ফণী গ্রহণযোগ্য নহে, গৃহে আনিলে সবংশে সংহার; পবিত্রকারী গোময়তুষ্ট করিয়া মণি আনিবে, সেটি সাত রাজার ধন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ধনুক-শিক্ষা।

গয়ায় কংগ্রেস।

গয়া।
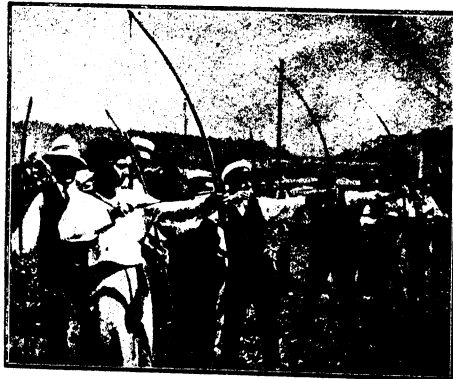
হিন্দুর পুণ্যতীর্থ ও গৌতমবুদ্ধের সাধনাক্ষেত্র গয়ায় এবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। গয়া বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত নহে। বাঙ্গালার শ্যাম প্রান্তর পার হইয়া ক্রমে পশ্চিমে গিরিসঙ্কুল স্থানে উপনীত হইতে হয়। পথের সৌন্দর্য্য মনোরম—মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালা প্রান্তর-দৃশ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। চারিদিকে গণ্ডশৈল গয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্ম-যোনি, নানা পর্ব্বতে গয়া পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের শিরোদেশে প্রায়ই মন্দির দৃষ্ট হয়।

গয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত। ইহাই পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোলাহলগিরি। পর্ব্বতের উচ্চতা ৪ শত ৫০ ফিটের অধিক নহে। পর্ব্বতোপরি শক্তিমন্দিরে শক্তির পঞ্চমুণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু দেবরাও ভাও সাহেবের ব্যয়ে পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরমধ্যস্থিত মূর্ত্তির বেদীতে উৎকীর্ণ শ্লোকে জানা যায়, বেদীটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তি তত প্রাচীন মনে হয় না। কথিত আছে, বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এই গিরিশিরে ১ শত ফিট উচ্চ একটি প্রস্তরস্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাং তাহার চিহ্নও দেখিতে পায়েন নাই।

গয়ার পথে

রামশিলা গয়ার উত্তরে অবস্থিত। এই গণ্ডশৈল ৩ শত ৭২ ফিট উচ্চ। ইহার চূড়ায় পাতালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের উপরার্দ্ধ পুরাতন বলিয়া মনে হয় না; নিম্নে ১০ ফিট পুরাতন—সম্ভবতঃ ১০১৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। সুগঠিত

সোপানশ্রেণী পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত; তাহাতে ৩ শত ১৯টি ধাপ। এই সোপানশ্রেণী ১২৯২ সালে "টিকারির শ্রীযুক্ত রাজা বন বাহাদুর সিংহ নির্ম্মিত।" রামশিলা হইতে প্রেতশিলা পর্য্যন্ত পথ আছে।

গয়ায় বাঙ্গালীরা ৪৫ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ লোক ফল্গুর বালুবক্ষে, বিষ্ণুপাদে ও অক্ষয়-বটমূলে পিণ্ড দিয়াই গয়ালীর নিকট "সুফল" লইয়া থাকেন।

গয়া ফল্গুর তীরে অবস্থিত। ফল্গু পার্ব্বত্য নদী, অন্তঃসলিলা।

হিন্দুর পক্ষে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান মন্দির বহু দিনের নহে; অহল্যাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, এই মহারাষ্ট্র দেশীয় মহিলা গয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ও ৭ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করেন। বিষ্ণুপাদমন্দির ধূসর প্রস্তরে গঠিত। মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান অংশ একটি মণ্ডপ মাত্র। গুচ্ছ গুচ্ছ স্তম্ভোপরি গম্বুজ—প্রতি গুচ্ছে চারিটি স্তম্ভ—স্তম্ভগুলি দুই স্তরে সজ্জিত। গর্ভগৃহ অষ্টকোণ—চূড়াকৃতি। গৃহমধ্যে প্রস্তরে পদচিহ্ন—ইহাই গয়াসুরের শিরোপরিস্থিত ধর্ম্মশিলায় বিষ্ণুর চরণচিহ্ন। মন্দিরের প্রবেশপথে একটি ঘণ্টা—ফ্রান্সিল গিল্যাণ্ডার্সের উপহার।

বিষ্ণুপাদের নিকটে গদাধরের মন্দির। মন্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তরপশ্চিম কোণে একটি শিরাভরণহীন স্তম্ভ। এই স্তম্ভ হইতে পঞ্চ ক্রোশ পরিক্রমণের পথের আরম্ভ। অদূরে সূর্য্যমন্দির। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বরথে আসীন। কিছু দূরে "অক্ষয়বট।"

রামশিলার মন্দির। [শিল্পী—টি, পি, সেন।

গয়া হিন্দুর যেমন পবিত্র তীর্থ, বৌদ্ধদিগের নিকটও সেইরূপ সমাদৃত। বৌদ্ধদিগের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষে ৪টি তীর্থ বিশেষ সমাদৃত—(১) গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু, (২) বুদ্ধের সন্ন্যাসভূমি—উরুবিল্ব, (৩) বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্র—বারাণসী, (৪) বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভস্থান—কুশী। এই ৪টি ক্ষেত্রের মধ্যে আবার উরুবিল্ব ও বারাণসী অধিক আদৃত। উরুবিল্ব বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া।

'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে লিখিত আছে—ব্যাধিত, জরাগ্রস্ত ও মৃত মানব দেখিয়া শাক্যসিংহ সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন এবং মানবকে এই সকল স্বাভাবিক বিকারমুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীর চিত্তে শান্তি বিরাজিত মনে করিয়া তিনি শান্তির সন্ধানে সন্ন্যাসী হয়েন। কোন শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রম হইতে তিনি পদ্মার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে রৈবতের ও রাজকের আশ্রম হইয়া বৈশালী নগরে কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সে

পিণ্ডদান ক্ষেত্র।
[শিল্পী—টি, পি, সেন।

শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি রাজগৃহে পাণ্ডব পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া সপ্তশত শিষ্যবেষ্টিত রুদ্রকের শিষ্য হয়েন। তাঁহার শিক্ষাতেও শাক্যসিংহের অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হয় না। তিনি তখন গয়ায় গমন করেন এবং উরুবিল্ব গ্রামে যড়-বার্ষিক ব্রত পালন করেন। ব্রত উদ্‌যাপনেও যখন তিনি শান্তি পাইলেন না, তখন গৌতম শব হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আহার্য্যের সন্ধানে লোকালয়ে গমন করিলেন। নিরঞ্জনার জলে স্নানে স্নিগ্ধ ও সুজাতাপ্রদত্ত আহার্য্যে পরি-তৃপ্ত হইয়া তিনি বোধিদ্রুমতলে প্রাণপণ করিয়া মুক্তিসাধ-নায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই স্থানেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জগৎকে জ্ঞানালোকে ভাস্বর করিবার উদ্দেশ্যে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্তর-কালে বৌদ্ধ নৃপতিরা ও ভক্তদল বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের অবস্থান স্মরণীয় করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া উরুবিল্বকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় মন্দিরে সেই প্রয়াস আজিও সৌন্দর্য্যে বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিতেছে।

বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মন্দির কত দিনের, তাহা লইয়া বিশে-যজ্ঞদিগের মধ্যে মতান্তর লক্ষিত হয়। চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন্থ সংএর বর্ণনাই বিস্তৃত—"বোধিদ্রুমের পূর্ব্বদিকে একটি বিহার বিদ্যমান। উহা ১৬০ হইতে ১৭০ ফিট উচ্চ; উহার তল-দেশ ২০ পাদ (৫০ ফিট) হইবে। এই বিহার নীলাভ ইষ্টকে গঠিত ও প্রলেপাবৃত। ইহার স্তরে স্তরে কুলঙ্গী আছে; প্রতি কুলঙ্গীতে বুদ্ধের স্বর্ণরঞ্জিত মূর্ত্তি স্থাপিত। চারিদিকে প্রাচীর সুন্দর স্থাপত্যকার্য্যে, মুক্তামাল্যে ও ঋষি-দিগের মূর্ত্তিতে শোভিত। চূড়ায় স্বর্ণরঞ্জিত তাম্রনির্ম্মিত আমলকফল। পরে ইহার পূর্ব্বদিকে (বা সম্মুখে) একটি দ্বিতল মণ্ডপ গঠিত হইয়াছিল। * * * বহির্দ্বারের দক্ষিণে ও বামে দুইটি বৃহৎ কুলঙ্গী—দক্ষিণে অবলোকিতে-শ্বরের ও বামে মৈত্রেয়র মূর্ত্তি। মূর্ত্তিদ্বয় রৌপ্যনির্ম্মিত ও প্রায় ১০ ফিট উচ্চ।"

এই বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান মন্দিরের সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে, বলিতে হয়—৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাং যে মন্দির দেখি-য়াছিলেন, এখনও বুদ্ধগয়ায় সেই মন্দিরই বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে বহুবার এই মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সংস্কার কার্য্যে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কানিংহাম

যথার্থই বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পে বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের তুলনা নাই।

বায়ু পুরাণান্তর্গত 'গয়ামাহাত্ম্যে' গয়ার উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে—

"বিষ্ণুর নাভিপদ্মসম্ভূত ব্রহ্মা বিষ্ণুর অনুমতি অনুসারে জীবসৃষ্টি করেন—সুরাসুর তাঁহারই সৃষ্ট। অসুরদিগের মধ্যে গয়া মহাবল ও পরাক্রমশালী ছিল। সে ১২৫ যোজন দীর্ঘ ও ৬০ যোজন বিস্তৃত ছিল; সেই বৈষ্ণব কোলাহল গিরিশিরে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া বহু সহস্র বৎসর সুদারুণ তপ করিয়াছিল। তাহার তপশ্চরণে ভীত দেবদল ব্রহ্মার নিকট অভয়প্রার্থী হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসশিখরাসীন মহেশ্বরের নিকট গমন করেন। মহেশ্বর উপায়নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া দেবগণসহ ক্ষীরাব্ধি শয়নে শয়ান বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করেন। বিষ্ণু স্বয়ং পশ্চাদ্‌গামী হইবেন বলিয়া অন্য দেবতাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তখন কেশব গরুড়-পৃষ্ঠে ও অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া গয়াসুরসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন আর তপশ্চরণ করিতেছ? আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি বর চাহ, বল; আমরা তাহাই দিব।"

বিষ্ণুপাদ মন্দির। [শিল্পী—টি, পি, সেন।
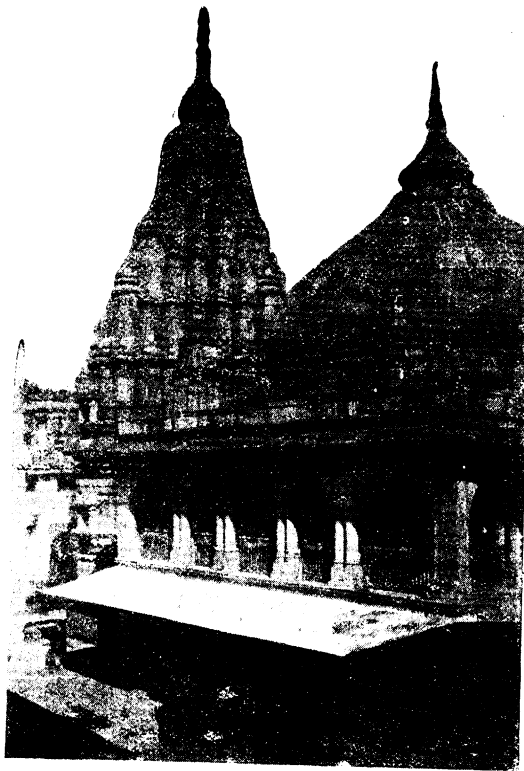
শুনিয়া গয়া বলিল, "যদি আমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করেন, তবে আমার দেহ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের দেহাপেক্ষা—দেব, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, তীর্থ হইতেও পবিত্র করুন।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলে জীবগণ গয়ার দেহ স্পর্শ বা দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিল; যমালয় শূন্য হইল। তখন পুরন্দর সহযাত্রী যম বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু গয়ার দেহোপরি যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দেবগণকে উপদেশ দিলেন। গয়া সমাগত দেবগণকে সম্মুখে দেখিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। তখন ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ তাহার দেহ প্রার্থনা করিলে গয়া সানন্দে নিজ দেহ প্রদান করিল। সে নৈর্ঋতে হেলিয়া কোলাহল গিরিতে পতিত হইল; তাহার মস্তক উত্তরদিকে রহিল ও পদ দক্ষিণে প্রসারিত হইল। তখন ব্রহ্মা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞশেষে দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, গয়াসুর যজ্ঞক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। তখন ব্রহ্মা যমকে বলিলেন, "তোমার গৃহ হইতে ধর্ম্মশিলা আনয়ন করিয়া উহার মস্তকোপরি সংস্থাপিত কর।" এই ধর্ম্মশিলা সমাগত ব্রহ্মার পূজার উদ্দেশ্যে স্বামীর পদসেবাবিরতা কোন ব্রাহ্মণীর

পাষাণদেহ। মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপিত হইলে ও দেবগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেও যখন গয়ার গতিরোধ হইল না, তখন ব্রহ্মা আবার বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু দেহোদ্ভূত মূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিলেন। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায় বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া গদাধররূপে গদাঘাতে গয়াসুরকে নিশ্চল করিয়া সকল দেবদেবীসহ ধর্ম্মশিলায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন গয়াসুর বলিল, "আমি নিষ্পাপ দেহ ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দিবার পর আমার প্রতি এ নির্য্যাতন কেন? আমি ত হরির আদেশেই নিশ্চল হইতাম। আমাকে কৃপা করুন।" দেবগণ গয়ার এই উক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে বলিল, "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করুন; পঞ্চ ক্রোশব্যাপী এই ক্ষেত্র গয়া-ক্ষেত্র নামে কীর্ত্তিত হউক—ইহার এক ক্রোশ আমার মস্তক অবস্থান করিবে। আর এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বলোক যেন পূর্ব্বপুরুষ সহ ব্রহ্মলোকে গমন করে।" গয়ার এই প্রার্থনা শুনিয়া বিষ্ণুসনাথ দেবগণ বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে ও পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধকারী স্বয়ং ও উর্দ্ধতন সাতপুরুষ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।"

বিষ্ণুপাদ মন্দিরাভ্যন্তর। [শিল্পী—টি, পি, সেন।

কে এই পরম বৈষ্ণব গয়াসুর—যাহার দেহ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের দেহাপেক্ষাও পবিত্র এবং যাহাকে নিশ্চল করিতে বিষ্ণুসনাথ সমগ্র দেবকুলের সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল? যিনি সব্যসাচিরূপে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে একদিকে প্রচলিত ভ্রান্ত মত বিনষ্ট করিয়া, অন্যদিকে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—এই গয়াসুর প্রচলিত প্রবলবল বৌদ্ধধর্ম্ম; আর গয়াসুরবিজয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বায়ুপুরাণের গ্রন্থকার জটিল দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। তিনি কিরূপে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে, গয়াসুরের বিরাট বপু স্থাপিত করিবার কল্পনা করিলেন? গয়াসুরের অপরাধ—সে মুক্তির পথ অত্যন্ত সুগম করিয়াছিল। সে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান পালন করিত না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মেরই লক্ষণ। বৌদ্ধগণ ধর্ম্মাত্মা, আত্মত্যাগী ছিলেন। গয়াসুর বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহার দেহ ৫৭৬ × ২৬৮ মাইল। কলিঙ্গ হইতে হিমালয়

ও মধ্যভারত হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত যে ভূভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ইহার কিছু অধিক। দেবগণের গয়াসুর-দমনচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বৌদ্ধধর্ম্মের দমনচেষ্টার রূপক। আর বিষ্ণুর গদাঘাত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-নির্যাতন। গয়ার মস্তকে শিলা-সংস্থাপন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানে আঘাতের পরিচায়ক। আবার দেবতার আশীর্ব্বাদেই বৌদ্ধ গয়া হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। বুদ্ধের পদচিহ্ন গয়ায় সম্পূজিত। ভারতে আর কোন তীর্থে পদচিহ্নপূজা প্রচলিত নাই। আবার 'গয়া-মাহাত্ম্যেই' বিষ্ণুকে বুদ্ধ আখ্যা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গয়া-মাহাত্ম্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—পুণ্যকামী বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুমমূলে পূজা করিবেন। এই পূজার বিশেষ মন্ত্রও আছে,—"আমি চলদ্দল, স্থিতিকারণ, যজ্ঞ, বোধিসত্ত্ব অশ্বত্থকে নমস্কার করি। হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, তুমি রুদ্রগণ-মধ্যে একাদশ, বসুগণমধ্যে পাবক, দেবগণমধ্যে নারায়ণ। নারায়ণ সর্ব্বদা তোমাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তুমি বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তুমি ধন্য ও দুঃস্বপ্নবিনাশন। আমি অশ্বত্থরূপী দেব—শঙ্খচক্রগদাধর, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃক্ষরূপক হরিকে নমস্কার করি।"
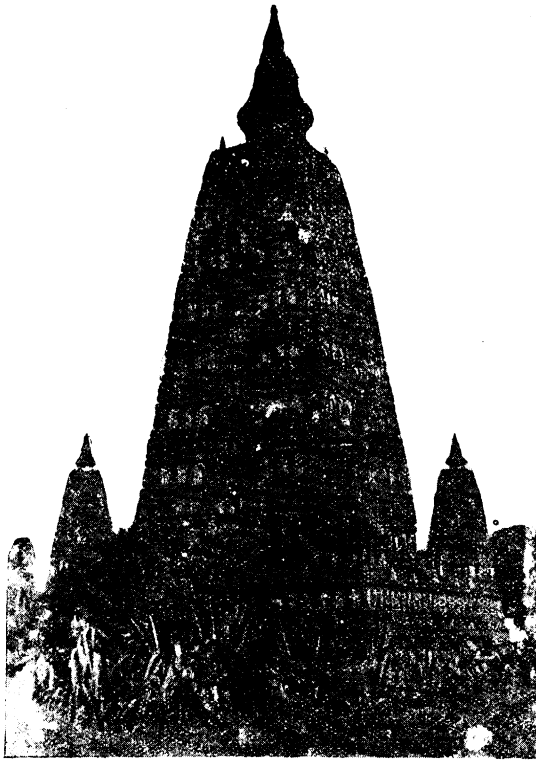
বুদ্ধগয়ার মন্দির। [শিল্পী— টি, পি, সেন।

কংগ্রেস

এই হিন্দুবৌদ্ধ-তীর্থ গয়াক্ষেত্রে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। এই জাতীয় যজ্ঞের সময় গয়ায় আরও কয়টি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে খিলাফৎ সভার অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই খিলাফৎ সভার সভাপতি ডাক্তার আন্সারী আর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ।

সহরের বাহিরে বিরাট মণ্ডপবেষ্টিত করিয়া প্রতিনিধি-দিগের বাসস্থানাদি রচিত হইয়াছিল। তাহাকে "স্বরাজ্যপুরী" বলা হইত।

কংগ্রেসের সময় ভারতে নানা স্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হইয়াছিল। এক দিকে উদাসীন সম্প্রদায়—আর এক দিকে আকালীরা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। আকালীরা যখন শোভাযাত্রা করিয়া গয়ার রাজপথ দিয়া যাইতেন, তখনকার সে দৃশ্য উপভোগ্য বটে। তাঁহারা এই স্থানেও লঙ্গর খুলিয়া অকাতরে আহার্য্য বিতরণ করিয়াছিলেন।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কেই সভাপতি করা স্থির হইয়াছিল—এমন সময় তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এবার তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে পাইয়া

পুনরায় সেই পদে বৃত করিয়াছিল। সভাপতিরূপে গয়ায় যাইবার পূর্ব্বে এবং আইন অমান্য তদন্ত সমিতির নির্দ্ধারণ প্রকাশের পরে দাশ মহাশয় ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা কলিকাতায় ও নাগপুরে গৃহীত এবং আমেদাবাদে পুনরুক্ত নির্দ্ধারণের বিরোধী। তিনি অসহযোগীদিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা আইন অমান্য তদন্ত সমিতিতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জনকতক নেতা বলেন, দেশে কর্ম্মশৈথিল্য ও অবসাদ আসিয়াছে, ব্যবস্থাপক সভা অধিকার করিবার চেষ্টায় যে উদ্যমসঞ্চার হইবে, তাহাতে সে শৈথিল্য ও অবসাদ দূর হইয়া যাইবে। আবার নির্ব্বাচনকার্য্যে পল্লীগ্রামে যাইতে হইবে, তাহাতে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যের সুবিধা হইবে। কিন্তু দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে উদ্যমের ও উৎসাহের অভাব নাই। পল্লীগ্রামে কায করিতে হইলে কর্ম্মীকে তথায় যাইয়া থাকিতে হইবে। কর্ম্মীরা এখনই পল্লীগ্রামে যাইয়া কায আরম্ভ না করিয়া কেন যে নির্ব্বাচনের সুযোগ সন্ধান করিতেছেন, তাহার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। নির্ব্বাচনের জন্য পল্লীগ্রামে যাইলে তখন ভোটসংগ্রহেই ব্যস্ত থাকিতে হইবে—গঠনকার্য্য হইবে না। কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের মধ্যে এই ব্যাপারে মনান্তর ঘটিতে পারে। ব্যবস্থাপক সভায় যাইলে কর্ম্মীদিগকে ব্যুরোক্রেশীর প্রভাবে পতিত হইতে হইবে। তাহারা গভর্ণারী হইতে নানা চাকরীর টোপ দিয়া দেশের লোককে পাকড়াইবার চেষ্টা করে—এমন কি, যাহাকে ধরিতে চাহে, তাহার আত্মীয়স্বজনকেও চাকরী দেয়। কাযেই তাহাদের সান্নিধ্য যথাসম্ভব পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌ.নারায়ণ সিংহ।

যদি আমরা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তবে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হইবে না—তাহার কোন প্রয়োজনই হইবে না। তখন সরকারকে নমিত করিবার জন্যও ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হইবে না। জনগণকে আমাদের সহযাত্রী করিতে হইবে বলিয়াই আমি বলি—গঠনকার্য্যেই আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের কংগ্রেস-কমিটীগুলিকে প্রকৃত জীয়ন্ত করিতে হইবে। স্বরাজ লাভের জন্য আমাদিগকে সেই কায করিতে হইবে। কাযেই আমরা এখন যেন আর ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন লইয়া সময়ক্ষেপ ও উৎসাহনাশ না করি। নহিলে, আমাদের অনিষ্ট হইবে—স্বরাজের আদর্শ আর আমাদিগের অখণ্ড মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। দাশ মহাশয় এ সব যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

তিনি আইনব্যবসায়ীর নিপুণতার সহিত "আইন ও শৃঙ্খলার" কথার আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু যতগুলি নজীর তুলিয়াছেন, সবই বিদেশের—তাহার পর তিনি ফরাসী-বিপ্লব হইতে রুসিয়ার বিপ্লব পর্য্যন্ত বিবিধ বিপ্লবের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীর সহিত প্রতীচীর যে ধাতুগত প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিয়া এবং স্বীকার করিয়াও বিদেশী দৃষ্টান্তে অভিভাষণ ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। এক "আইন ও শৃঙ্খলার"

বিচারে তিনি ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণের ৫ পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বিলাতের ইতিহাস হইতে নানা ঘটনার কথা তুলিয়া—হালাম, অ্যাডামসের কথা উদ্ধৃত করিয়া বিলাতের মুক্তির সংগ্রামের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন; কিন্তু মূল কথাটা ভুলেন নাই। বিলাতের লোক টিউডর বা ষ্টুয়ার্ট বা ক্রমোয়েল—যাহারই অধীন হউক না কেন—পরাভূত পরাধীন জাতি বলিয়া কখন পরিগণিত হয় নাই। সেই জন্যই কারাদণ্ড পর্য্যন্ত—গত কয় বৎসরের ঘটনায় যদি দেশের লোক সে বিষয় না বুঝিয়া থাকে, তবে সভাপতির এক অভিভাষণে তাহারা তাহা বুঝিবে না। দাশ মহাশয় অভিভাষণে এক স্থানে বলিয়াছেন, এ দেশের শ্রমিক ও কৃষকরাই স্বরাজলাভের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত। যে দেশে শ্রমিক ও কৃষকরা স্বরাজলাভের জন্য ব্যাকুল হয়, সে দেশেও কি জাতীয় মহাসমিতি হইতে এ দেশে "আইন

অকালী ঙ্গর। [শিল্পী—ভারত-হিতৈষী কোম্পানী—মথুরা।
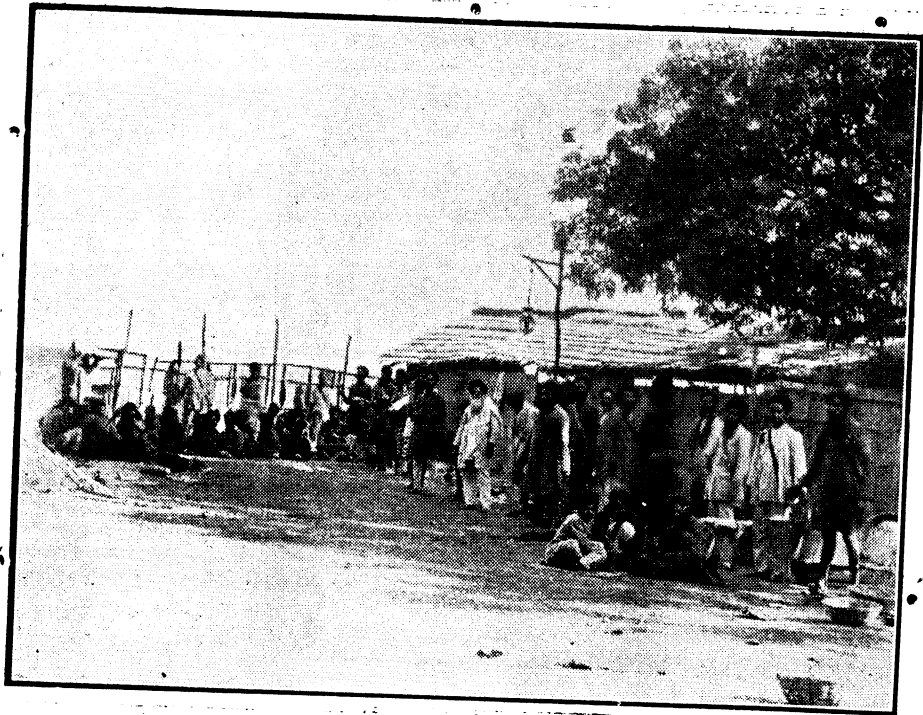
সে দেশে মুক্তির সংগ্রাম এদেশে মুক্তির সংগ্রাম হইতে অন্যরূপ হইয়াছে—তাহা হওয়াও অনিবার্য্যই হইয়াছিল। বিশেষ ইংরাজ মুক্তির সংগ্রামে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, ভারতবাসী সে পথ স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়াছে। তবে এ তুলনার সার্থকতা কিসে? এ দেশে "আইন ও শৃঙ্খলার" কথা এত করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার হইতে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের ও শৃঙ্খলার" অবস্থা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে? প্রজার অধিকার প্রজা বুঝিয়াছে—নহিলে সে স্বরাজলাভের জন্য ব্যাকুল হইত না! তবে কাহার জন্য দাশ মহাশয় সে অধিকারের কথার আলোচনা করিলেন? বিদেশী ব্যুরোক্রেশী যদি সে অধিকার স্বীকার করিতেই না চাহেন, তবে অসহযোগী কংগ্রেসের সভাপতি সে কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কি ফললাভের আশা করেন?

দাশ মহাশয় কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে;

(২) বিদেশেও মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগকে আমাদের জানাইবার জন্য প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৩) এসিয়ার নির্য্যাতিত জাতি সমূহের সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে, ভারতবর্ষ তাহাতে যোগ দিবে;

(৪) স্বরাজের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে;

(৫) শ্রমিক ও কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে;

(৬) সোৎসাহে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিতে হইবে;

(৭) অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে হইবে।

দাশ মহাশয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা ভারতীয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক—বিদেশী পার্লামেণ্ট এই অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। আমরা ইহা স্বরাজের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। হয় ব্যবস্থাপক সভা আমাদের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে, নহে ত এগুলা নষ্ট করিতে হইবে। আমরা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিয়া ইহার ইজ্জত নষ্ট করিয়াছি। এখন দেখিতে হইবে, আমাদের স্বরাজ যাত্রার অন্তরায় হইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলা যেন বিদ্যমান না থাকে। এগুলা বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর ছদ্মবেশ বা মুখোস। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে ইহা বর্জ্জন করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা অসহযোগের বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু তাঁহার এই কথায় এমন কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, যাহাতে অসহযোগীরা পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া আজ ব্যবস্থাপক সভায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন। তাহাতে যে কোন লাভ নাই, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি।

ব্রজকিশোর প্রসাদ।

দাশ মহাশয় বলিয়াছেন—আজ যখন ব্যবস্থাপক সভার দ্বার মুক্ত, তখন সেই পথেই আক্রমণ করা সঙ্গত। এ কথা দাশ মহাশয় কেমন করিয়া বলিলেন? যে দ্বার মহাত্মা গন্ধীর পক্ষে, মৌলানা মহম্মদ আলীর পক্ষে, লালা লজপৎ রায়ের পক্ষে রুদ্ধ—সে দ্বার কি কোন অসহযোগী মুক্ত বলিয়া

বিবেচনা করিতে পারে? সেরূপ বিবেচনা করিলে কি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে? যে দ্বার পুত্র জহরলালের পক্ষে রুদ্ধ—সে দ্বারপথে কি পিতা মতিলাল প্রবেশ করা আত্ম-সম্মান-সম্মত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন? "যে দিকেতে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা" ধরিয়া যে সব "বুদ্ধিমান লোক" "রক্ষা করে মাথা"—তাহারা রাজনীতিক হইতে পারে—বিশেষ প্রতীচ্য আদর্শের রাজনীতিক হইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে কি তদপেক্ষা বড় কিছু বলা যায়? যাহা হউক, কংগ্রেসের বহুমত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের প্রস্তাব পরিহার করিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, এই মতভেদ লইয়া দাশ মহাশয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং একটি নূতন দল গঠন করিয়াছেন। তবে এই দল কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে কায করিবে না; কংগ্রেসের মধ্যে থাকিবে। দাশ মহাশয় বলিয়াছেন, এই মতভেদের পর তাঁহাকে হয় রাজনীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হয়, নহে ত দেশের লোককে তাঁহার স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। তিনি শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি কংগ্রেসের বহুমত শিরোধার্য্য করিয়া গণতন্ত্রপ্রিয়তার পরিচয় দিলে লোক সুখী হইত। বিশেষ তিনি যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন, তাহাতে এমন আশঙ্কাও করা যাইতে পারে যে, তিনি হয় ত ক্রমে কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন। অবশ্য তাঁহার ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত প্রবীণ নেতাকে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বহুমত যে স্থলে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে না, সে স্থলে বহুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না। অবশ্য বহুমত যদি অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সে বহুমতের প্রাধান্য অধিক
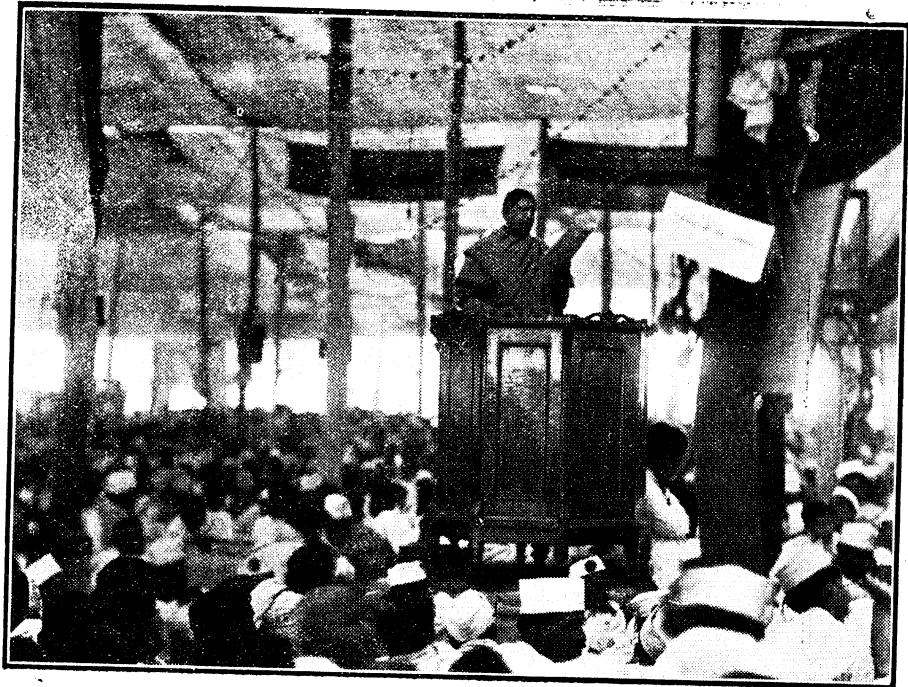
কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে সভাপতি [শিল্পী—ভারতহিতৈষী কোম্পানী—মথুরা]

দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না; কিন্তু যত দিন বহুমত—বহুমত, তত দিন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করাই গণতন্ত্রসেবকের কর্ত্তব্য।

গয়ায় কংগ্রেসের ফলে একটি নূতন দল গঠিত হইতেছে। এই দলে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই যে একমতাবলম্বী, এমনও নহে। তাঁহাদের মধ্যে কয়রূপ মতের লোক আছেন :—

(১) মহারাষ্ট্রের দল। ইঁহারা চাহেন responsive co-operation; ইঁহাদের দলের নেতা শ্রীযুক্ত কেলকার ও ডাক্তার মুঞ্জে প্রভৃতি বলিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহারা লোকের পক্ষে কল্যাণকর কার্য্যে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন। এমন কি, অসহযোগীরা যদি ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন, তাহাতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই।

(২ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের দল। ইঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সভার কায বন্ধ করিয়া দিয়া সভা ধ্বংস করিবেন। কাযেই ইঁহারা আর যাহাই চাহুন না কেন, কোনরূপ অসহযোগ—এমন কি, responsive co-operationও চাহেন না।

(৩) আর এক দল লোক আছেন, যাঁহারা আইরীশ সিনফিন-প্রথা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবেন—কিন্তু সভায় হাজির হইবেন না। ইঁহারা এইরূপ কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা যে কোনরূপে বিদেশী আমলাতন্ত্রকে জব্দ করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

(৪) মাদ্রাজের দল বলেন, "দেখ না কি হয়।"

এই সব দল লইয়া যদি একটা দল গড়া যায়, তবে কি ব্যবস্থাপক সভা লইয়া মতভেদ হওয়াতেই কংগ্রেসে থাকা যায় না?

এবার কংগ্রেসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বিলাতীবর্জ্জন প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যান। এই প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যানে কংগ্রেসে অহিংসার জয় ঘোষিত হইয়াছে।

গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্যের আলোচনা করিলে একটি কথা আর অস্বীকার করা যায় না—এবার কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আদৌ অগ্রসর হয় নাই। গত বৎসর কায যে স্থানে ছিল, আজও সেই স্থানেই রহিয়া গেল। মহাত্মা গন্ধী দেশকে একের পর আর একটি কার্য্য দিয়া—যেন সোপানপরম্পরায় স্বরাজের দিকে লইতেছিলেন, তাঁহার অভাবে কি সে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নেতা পাওয়া যাইবে না? বিশেষ গঠন-কার্য্যে আমরা যে আজও বিশেষ—এমন কি, আশানুরূপ সাফল্যও লাভ করিতে পারি নাই, তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না।

এখনও দুই দল একযোগে কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, এমন আশা কি করা যায় না?

পার্লামেণ্টে ভারতবাসী সদস্য

মিষ্টার সাকলাতওয়ালা।

বিলাতে ভারতীয় হাইকমিশনার
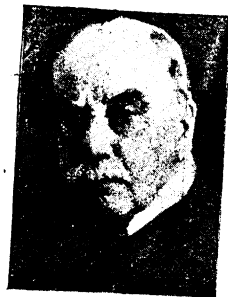
মিষ্টার ভোর।

অভিনয়।

মান-ভঞ্জন।

[সকল ভূমিকায় একক অভিনেতা—প্রফেসর শ্রীতারকনাথ বাগ্চী]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা ক্যাম্বিসের চেয়ারে অর্দ্ধশয়নে একমনে গহনার ক্যাটালগ দেখিতেছিলেন। সে কক্ষে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। ক্যাটালগের যে পাতে একটি ভাল নেকলেসের চিত্র আছে, সেই পাতটি দেখিতেছিলেন আর সম্প্রতি বিদেশগত স্বামীর প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইতেছিলেন। বিরক্তির কারণ, স্বামী গোকুলচন্দ্র তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, আমি শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্ব্বে বাটী আসিয়া তোমাকে এক ছড়া ভাল নেকলেস্ কিনিয়া দিব। কিন্তু হায়, দুর্গাপূজা গেল—কালীপূজা গেল—জগদ্ধাত্রীপূজাও গেল—বড় দিনের আমোদ-প্রমোদ আসে আসে। প্রত্যহই পত্র আসিতেছে, তাহাতে বাটী আসিবার নানা প্রতিবন্ধকের উল্লেখ। সুতরাং কাঞ্চনমালার দিন আর কাটে না—স্বামীর প্রতি বিরক্তি ক্রমে ক্রোধের আকার ধারণ করিল। এমন সময়ে হাতে ব্যাগ ও বগলে ছত্র, স্বামী গোকুলচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঞ্চন—কাঞ্চন, তুমি কেমন আছ?"

কাঞ্চন নিস্তব্ধ।

গোকুল। ওগো—ওগো—ও প্রাণেশ্বরি, কথা কচ্চো না যে—অসুখ করেচে না কি?

এবারও কাঞ্চনমালা নিস্তব্ধ।

তখন সহজে-সন্দিগ্ধচিত্ত গোকুলচন্দ্র ভয়ে কাঞ্চনমালার নিতান্ত সন্নিকট না হইয়াই বলিলেন—"কি গো—হঠাৎ কানে কালা হ'লে কিসে?"

কাঞ্চন ভাবিলেন, আর নিস্তব্ধ থাকা উচিত নয়—বলিলেন—"ও মা, কালা হ'তে যাব কেন?—কথার ছিরি দেখ—বিদেশ থেকে এসে একবার সম্ভাষণের ভঙ্গিমে দেখ—মরণ আর কি!"

গোকুলচন্দ্রের দেহে প্রাণ এলো—কেন না, তিনি ভাবিয়াছিলেন—দৈববিড়ম্বনার কথা বলা যায় না—হয় ত তাঁহার পত্নী সহসা বধির-ই বা হইয়া থাকিবেন। স্ত্রৈণ বিশেষণধারী গোকুল তখন একমুখ হাসিয়া আদরে সোহাগে বলিলেন—"ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি, প্রেয়সীর মনে মানের সঞ্চার হয়েছে।"

কাঞ্চন। হবে না—তোমার আচরণে মান তো মান—অভিমান—অনুমান—অপমান—হনুমান প্রভৃতি যে কটা মান আছে, তার সব কটাই আমার হওয়া উচিত। তোমার আক্কেল কি?—ব'লে গেলে দুর্গাপূজার আগে বাড়ী এসে আমাকে একছড়া নেকলেস্ কিনে দেবে—তা তোমার গ্রাহ্যই নেই। কথায় বলে 'রাধা করেন কালা কালা কালা বলেন এ কি জ্বালা।' আমারও তাই—

গোকুল মকর্দ্দমার ইস্যু জ্ঞাত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া নিকটে আসিয়া—গললগ্নীকৃতবাসে—সুর করিয়া কহিলেন—

"মান ত্যজ মানিনি লো—পরাণ যে যায়,
জ্বলিছে উদর মোর বিষম ক্ষুধায়।"

স্ত্রৈণ গোকুল সখের কবির দলে গান করিতেন, সুতরাং পুনরায় কীর্ত্তনের সুরে গাহিলেন—

"আমি তব ক্রীতদাস — প্রেয়সি, যা কর আশ,
পুরাইব তাহা আমি সদা প্রাণপণে।
পূরাতে তোমার সাধ, যাব সে মুরদাবাদ,
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যাব সে সুন্দরবনে॥"

কাঞ্চন তখন লঘু হাস্যমিশ্রিত রোষরক্তিম মুখে কহিলেন, "যাও—যাও, তোমার আর ঢং ক'রে কায নেই। তোমার সব-ই ছলনা।"

গো। না প্রেয়সি—আমি তিলতুলসী হাতে ক'রে তোমার পিতৃপুরুষের শপথ ক'রে বল্‌চি—আমি এই ধুলা-পায়েই এই দণ্ডেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবো। তুমি কিছু ভেবো না—আমি নেকলেস্ আন্‌তে চল্লুম। না আনি তো আমার বাপের নাম—গোকুলচন্দ্র—থুড়ি—আমার নাম গোকুলচন্দ্র চট্টো নয়। এই দেখ, আমি ব্যাগ খুল্‌চি।

গোকুলচন্দ্র ব্যাগ খুলিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া কহিলেন—"তোমার কি নেকলেস্ চাই?"

কাঞ্চন তখন হাসিয়া বলিলেন—"না, না, ও কি কথা। খাও দাও ঠাণ্ডা হও, তার পর যেয়ো এখন—এখন যেয়ো না, আমার মাথা খাও।"

"গোকুলচন্দ্র কহিলেন—"সর্ব্বনাশ! তা কি হয়? আগে নেক্‌লেস্ আনি, তবে তোমার মাথা খাব। এখন বল, কোথা হ'তে কিন্‌বো?"

কাঞ্চনমালা তখন গোকুলের হাতে ক্যাটালগখানি দিয়া বলিলেন,—"এই দেখ—পড়—"

গোকুল মনোনিবেশ সহকারে পড়িলেন—'মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড ব্যাঙ্কার্স। ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, কলিকাতা।' বলিলেন—"ব্যাস—এই তো আমি চল্লুম—তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ট্রামে চাপ্‌বো—আর চট্ কিনে নিয়ে আস্‌চি। হাঁ—হাঁ, আমি জানি—মণিলাল কোম্পানীর বিশ্বাসী ফারম—তারা বিনাপানে বেশ গহনা গড়ে।"

গোকুল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোকুলচন্দ্রের এইরূপ হঠকারিতায় কাঞ্চনমালা বেশ বুঝিলেন, তাঁহার স্বামীর তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ়। সুতরাং মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় ঘর-বা'র করিতে লাগিলেন। দশ—পনেরো—বিশ—ত্রিশ মিনিট—ক্রমে এক ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনো স্বামী ফিরিলেন না। তাঁর মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভয়—স্বামীর জন্য নহে, ভয়—ঐ নেকলেসের জন্য। কারণ, এই কলিকাতা সহরে পকেটমারা ও গুণ্ডার দলের দৌরাত্ম্য ভীষণ—পাছে কেহ নেক্‌লেসটি চুরি করিয়া বা ছিনাইয়া লয়। এমন সময়ে গোকুলচন্দ্র যুদ্ধবিজয়ী বীরের মত নেকলেস্ লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন—"এই দেখ—তোমার নেক্‌লেস্—কি জৌলুস্—যেন চাঁদের গুঁড়ো ঝক্‌মক্ করচে। বা—বা—কি বাহার—কি বাহার!"

কাঞ্চন দৌড়াইয়া আসিয়া কহিলেন—"দেখি—দেখি—"

গোকুল অমনি গান ধরিলেন—

"দেখ দেখ দেখি দেখি, কদমতলে সখি এ কি,
কার বাঁশী করে হাহাকার।
বলে বাঁশী রাধে রাধে, কালারে কি অপরাধে,
পায়ে ঠেলে কর লো প্রহার॥"

গোকুলচন্দ্র কাঞ্চনমালার কণ্ঠে নেক্‌লেস্ পরাইয়া দিয়া গাহিলেন—

"ওগো কেমন মানিয়েছে গো—
যেন রাধার গলে চাঁদের মালা,
যেন তোরঙ্গের গলায় তালা—
দেখ কেমন মানিয়েছে গো—"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইবার গোকুলচন্দ্রের মানের পালা। সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গোকুল বাটী আসিয়াছেন—পথ হাঁটা অভ্যাস নাই—বড় কষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আর কি বলিতে হইবে যে, দম্পতি পিনাল কোডের প্রণয়-ধারা অনুসারে মানের দাবী গোকুলচন্দ্রের ন্যায্য। গোকুল মান করিয়া চেয়ারে শয়ন করিলেন—কাঞ্চনমালা তখন মান ভাঙিবার জন্য গোকুলের পদসেবায় রত হইলেন। সে আরামে গোকুলের মান খরস্রোতস্বিনীতে তৃণবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল। গোকুল পুনরায় ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন—

"পার কি না পার চিনিতে, আমি গিয়েছিনু কিনিতে—
তোমার তরে হে প্রেয়সি ঐ নেকলেস্।
তুমি আমার চতুর্ব্বর্গ, তুমিই আমার হেথায় স্বর্গ,
তুমি আমার পাপ-পুণ্য, তুমিই দুঃখ-ক্লেশ।"

উত্তরে কাঞ্চনও নিতান্ত নাকি-সুরে গাহিলেন,—
"বেশ—বেশ—বেশ।"

সার আশুতোষ চৌধুরী

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মনীষী সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বিলাত হইতে জর্ম্মণীতে গিয়াছিলেন। শুধু ভ্রমণই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। জর্ম্মণ জাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ তাঁহার জর্ম্মণী-যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তত্রত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ও বহু মনীষী জর্ম্মণের সহিত তিনি আলোচনার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া জর্ম্মণীর বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার জর্জ্জ মার্গথ নামক জনৈক পণ্ডিত তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, "Neue Leipziger Zeitung" নামক পত্রে তিনি সার আশুতোষ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"সার আশুতোষের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই। নিমন্ত্রিত হইয়া আমি এষ্টোরিয়া হোটেলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। তাঁহার আকৃতিদর্শনে সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সার আশুতোষ বংশ-মর্য্যাদায় উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়; প্রতিভা ও পদগৌরবও তাঁহার যথেষ্ট আছে। ইংরাজ তাঁহাকে ব্যারনেট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। সার আশুতোষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সকলেই সুশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা আছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার পত্নী। এই উভয় বংশেই বহু কবি, শিল্পী ও শিক্ষিত ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্যবহারাজীব হিসাবে সার আশুতোষ ভারতবর্ষে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কলিকাতার হাইকোর্ট জর্ম্মণীর Reichsgerichtএর মত। বর্ত্তমানকালে কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার পরেই আরও দুই জন ভারতীয় বিচারপতি আছেন। তন্মধ্যে এক জন গণিতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বিজ্ঞানে প্রতিভার অবতার।"

"সার চৌধুরী অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও ললিত-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতির উন্নতিজনক ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তাঁহার সকল আগ্রহ অধুনা ভারতীয় জাতীয়তা বিকাশের প্রতি প্রযুক্ত। বহু উচ্চবংশের যুবকবৃন্দের ন্যায় তিনি রাজনীতিক ব্যাপারে কর্ম্মক্ষেত্রে কায করিতেছেন না, সে বয়স তাঁহার নাই। তাঁহার সহিত আলাপের ফলে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষ। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে গণ্ডিরেখা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই মধ্যে থাকিয়া তিনি ভারতীয়গণকে জাতীয়-জীবনে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের যুবক-বৃন্দ যাহাতে শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ হইয়া উঠে, এ বিষয়ে সার চৌধুরীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট। তিনি মুখে স্পষ্ট করিয়া সব কথা না বলিলেও তাঁহার কথার ভাবে এরূপ অনুমান অযথার্থ নহে।

"তিনি আমাকে বলিলেন যে, যুদ্ধের পরে জাপানী দ্রব্যের আমদানী ভারতবর্ষে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। জাপানকে হঠাইয়া মার্কিণও বাজার দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমশিল্পের অভ্যুদয় ঘটিবার

যাবতীয় দ্রব্যই ভারতে বিদ্যমান আছে। কয়লা, লৌহ ভারতে যথেষ্ট আছে। তিনি সদুঃখে প্রকাশ করিলেন যে, ভারতবর্ষের তুলা বিলাতে গিয়া তজ্জাত দ্রব্যাদি, ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা বহু সুলভে ভারতবর্ষেই বিক্রীত হইতেছে!

"সার চৌধুরীর সহিত তারপর ভারতীয় চিত্র, শিল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে নূতন জীবনস্পন্দন অনুভূত হইতেছে। ভারতীয় চিত্রে নিসর্গ-দৃশ্য এখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই। চৌধুরী আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা ভারতীয় সঙ্গীত উচ্চাঙ্গের। আমাদের শ্রবণশক্তির তুলনায় ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞের শ্রবণশক্তি শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্মতম প্রভেদও তাঁহারা ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ। ভারতবর্ষে সঙ্গীত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশই অবৈতনিক। সঙ্গীতের স্বরলিপির বিশেষ প্রচলন হয় নাই। সার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণীই নাকি সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রবর্ত্তিত করেন।

"বৃদ্ধবয়সেও জর্ম্মণীর culture সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার অবকাশ পাইয়া সার চৌধুরী বড় আনন্দিত দেখিলাম। ইংলণ্ড হইতে তিনি জর্ম্মণীতে আসিবার সময় সেখানকার লোক বলিয়াছিল যে, জর্ম্মণীতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বিপ্লব চলিয়াছে। এখানে আসিলে বন্দুকের গুলীতে তিনি প্রাণ হারাইতে পারেন। তথাপি তিনি এখানে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রসহ আসিয়াছেন। জর্ম্মণীর জীবন-যাত্রার প্রণালী ও জর্ম্মণীর জ্ঞান দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন বলিলেন। তিনি আবার এ দেশে আসিবার আশা দিয়াছেন।

"জর্ম্মণী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের এক জন প্রধান ব্যক্তির কি ধারণা, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া গেলে, সে-দেশের বহুসংখ্যক লোক তাঁহার নিকট জর্ম্মণীর কথা জানিতে চাহিবে। সার চৌধুরীর কথা অনুসারে তিনি ইংলণ্ড সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। সে বিষয়ে আমাদেরও সংশয় নাই। কিন্তু তিনি ভারতীয় অর্থনীতিক সমস্যা-সমাধানে সচেষ্ট। ইহাতে অন্য দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য—অর্থের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার জনৈক শিষ্য বলিয়াছেন,—'আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে, জর্ম্মণীর তাহাতে প্রয়োজন—সুতরাং এ উপায়ে অনেক কিছু ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।' আকস্মিক উত্তেজনামূলক কথা হইলেও এ কল্পনাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখায় ক্ষতি কি?"

অম্বিকাচরণ মজুমদার

ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় গত ১৪ই পৌষ পরলোকগত হইয়াছেন। মফঃস্বলে থাকিয়া রাজনীতিচর্চ্চায় যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অম্বিকাচরণ তাঁহাদিগের অন্যতম। কংগ্রেসের প্রথমাবস্থা হইতেই ইঁহারা তাঁহার সহিত সংযোগ রাখিয়াছিলেন।

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমায় পল্লীভবনে অম্বিকাচরণের জন্ম হয়। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষালাভের জন্য প্রথমে ফরিদপুরে ও পরে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছু দিন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কায করেন। পরে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরিদপুরে যাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। তথায় তিনি উকীলদিগের অগ্রণী ছিলেন। তিনি বহুদিন ফরিদপুর জিলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড কার্জ্জনের শাসনপদ্ধতির ও কৃত কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গে যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়, তাহাতে অন্যতম নেতার কাযও করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

মফঃস্বল মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তাহাতেই অম্বিকাচরণ বঙ্গদেশে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মডারেট মতেই অবিচলিত ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে

কংগ্রেসের এই অধিবেশন স্মরণীয় ঘটনা। সুরাটের বিচ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌতে দুই দলে মিলন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎনারায়ণের অভিভাষণে মিলনশঙ্খনাদ শ্রুত হইয়াছিল—সুরাটে বিচ্ছেদের পর এই মিলন; আমরা আজ প্রয়োজনের সময় মা'র আহ্বান শুনিয়া মা'র মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। সভাপতি বলেন, দশ বৎসর পরে দুই দলে মিলন হইয়াছে। তিনি বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি জাতীয়দলের নেতৃগণকে সাদরে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। অম্বিকা বাবুর অভিভাষণ সর্ব্বতোভাবে কালোপযোগী হইয়াছিল। তিনি বলেন, এ দেশে বৃটিশ শাসন আজও যথেচ্ছাচালিত—তাহাতে দেশের লোকের কোন অধিকার নাই। লোক এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে দেশে আর আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য থাকা সঙ্গত নহে। তিনি নানা বিভাগে সরকারের ত্রুটি প্রদর্শন করেন এবং ছাপাখানা আইনের অতি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি মিসেস্ বেশান্টের ও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করেন এবং দেশের লোককে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আজ আমরা স্বদেশে প্রবাসী—এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকারের এক মাত্র উপায় স্বাবলম্বন।"

অম্বিকাচরণ মজুমদার।

পাঠকদিগের অবশ্যই মনে আছে, এই সম্মিলিত কংগ্রেসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও মস্লেম লীগের শাসন-সংস্কার সমিতি কর্ত্তৃক একযোগে লিখিত শাসন সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অম্বিকাচরণ কিছু দিন হইতে পীড়িত ও একরূপ শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বদা দেশের রাজনীতিক ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিতেন। "মার্শ্মা ডিউক" ছদ্মনামে তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রবন্ধও লিখিতেন।

অম্বিকাচরণ বাবু এ দেশে কংগ্রেসের উৎপত্তি বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনাও করিয়াছেন। সে পুস্তক নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

অম্বিকাচরণের মৃত্যুতে কংগ্রেসের এক জন পুরাতন কর্ম্মীর—এক জন প্রবীণ দেশসেবক ও দেশপ্রেমিকের তিরোভাব হইল। তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতভেদ হইয়াছে, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গদেশে দেশাত্মবোধ-বিকাশে যাঁহারা কংগ্রেসের প্রথমযুগে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন—অম্বিকাচরণ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার উদ্যম, তাঁহার উৎসাহ তিনি দেশের কাযে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আজ অম্বিকাচরণের তিরোধানে বাঙ্গালা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইল। একে একে নিবিছে দেউটী।

রেলে তৃতীয় শ্রেণী

রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা এ দেশে যেরূপ অসুবিধা ভোগ করে, তেমন আর কোন দেশে নহে। অথচ রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ দেশের লোক এ বিষয়ে বহুবার আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা অরণ্যে রোদন হইয়াছে; কেন না, এ দেশে শাসক-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের অনুগ্রহপুষ্ট বিদেশী ব্যবসায়ীরা লোকমত অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

সংপ্রতি সরকার এ বিষয়ে এক নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, এ দেশে রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভীড় হয়, অর্থাৎ যে গাড়ীতে যত যাত্রী যাইবার কথা, সে গাড়ীতে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক যাত্রী বোঝাই করা হয়। তাহার কারণ:—

(১) প্রায় সব রেলপথেই গাড়ীর সংখ্যা কম। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ হাজার ৭ শত ১২খানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ছিল। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে কেবল ২ হাজার ৯৬খানা গাড়ী বাড়িয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা

৪১ কোটি হইতে ৪৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে গাড়ী বাড়াইতে বিলম্ব অনিবার্য্য ; কেন না, গাড়ীর অনেক উপকরণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

(২) যে সব স্থানে এক বই ডবল লাইন নাই, সে সব স্থানে গাড়ী বাড়াইলেও ট্রেণের সংখ্যা অধিক বাড়ান যায় না। আবার যে সব ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্ম ছোট, সে সব ষ্টেশনের জন্য ট্রেণ অধিক দীর্ঘ করা চলে না।

(৩) রেলের কারখানায় কায এত অধিক যে, তাড়াতাড়ি গাড়ী গড়িয়া তুলা অসম্ভব।

ইহাতে বুঝা যায়—

১লা মার্চ্চ হইতে যে সব জিনিষের খরিদ জন্য চুক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বিলাতে ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার এঞ্জিন ক্রয় করা হইবে, আর মার্কিণে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার ও সুইডেনে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার। গাড়ী প্রভৃতি বিলাতে ক্রীত হইতে ২২লক্ষ ৫ হাজার টাকার আর জর্ম্মণীতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ও বেলজিয়মে ৬০ হাজার ৫ শত টাকার। অন্যান্য জিনিষ বিলাতে ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার আর জর্ম্মণীতে ১ হাজার ৫ শত টাকার ও মার্কিণে ২৫ হাজার ৫ শত টাকার। এই যে হিসাব, ইহা কেবল সরকারী রেলের। ইহা ছাড়া
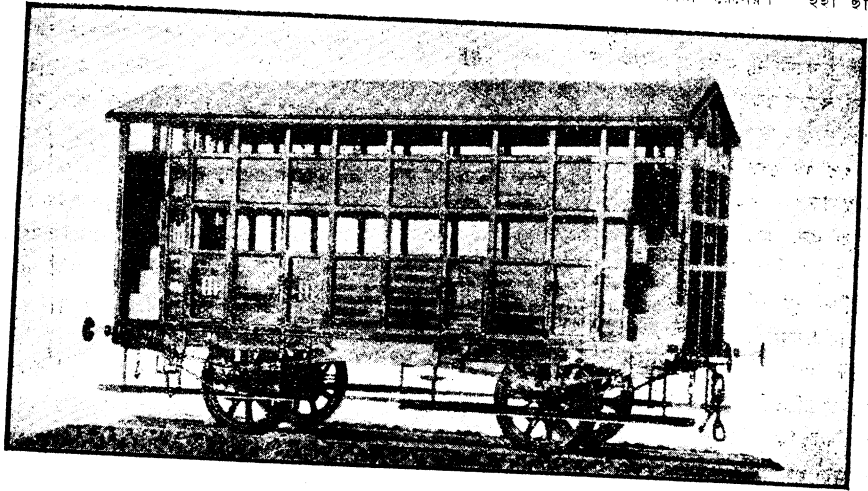
পুরাতন তৃতীয় শ্রেণীর রেলের গাড়ী।

(১) যাত্রীর সংখ্যা কিরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা, রেলের মোটা মাহিয়ানার চাকরীয়ারা তাহা বুঝিতেই পারেন না, এবং সেই জন্য গাড়ীর অল্পতাহেতু যাত্রীরা কষ্ট পায় বা খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতে বাধ্য হয়।

(২) এ দেশে সরকার রেলের বাবদে রাজস্ব হইতে কোটি কোটি টাকা খরচ করিলেও গাড়ীর উপকরণ এ দেশে গঠিত করিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিবার কোন উপায় করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দেশে রেলের উপকরণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাওয়া যাইলেও বিলাতেই অধিক উপকরণ ক্রীত হয়। গত

কোম্পানীর হাতে যে সব রেল আছে, সে সকলের হিসাব স্বতন্ত্র। এইরূপ ভাবে ভারতের টাকা বিলাতের ব্যবসায়ীদিগের লাভের জন্য ব্যয়িত হওয়া সঙ্গত কি না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(৩) কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ যাত্রী ও মাল হইবার সম্ভাবনা, কর্ত্তাদের তাহার কোন ধারণাই থাকে না এবং সেই জন্য তাঁহারা "আখের" ভাবিয়া কায না করায় শেষে পার্শ্বস্থ জমী অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। লিলুয়া প্রভৃতি স্থানে মাড়োয়ারী প্রভৃতি অনেকে জমী কিনিয়া আপনাদের মধ্যে হাত-ফেরতা করিয়া অধিক মূল্যের

কোবালা করিয়া রাখিয়াছে যে রেল কোম্পানীর কাছে অধিক মূল্য আদায় করিতে পারে।

আজকাল যে সব ষ্টেশন হইতেছে, সে সকলেও কেন যে বড় প্লাটফর্ম্ম করা হয় না—সে কথার সদুত্তর কে দিবে?

(৪) রেলের কারখানাগুলিকে, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বড় করা হয় নাই। বোধ হয় ভয়—পাছে বিলাত হইতে উপকরণ কম আনিলে বিলাতের ব্যবসায়ীদের লাভ কম হয়।

মোট কথা, সরকারের উত্তরে মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের অসুবিধা দূর হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অবশ্য য়ুরোপীয়েরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গতায়াত করেন না, করিলেও তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী থাকে, কাযেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের এই অসুবিধার কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা—এসেমব্লীতে শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যোশী মহাশয় বলেন, কর্ত্তারা অনেক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সব প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই—রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের অসুবিধা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ রেলে যাত্রীর ভাড়া হইতে যে আয় হয়, তাহার শতকরা ৮৩ ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা দেয়—মোট ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৯ কোটি টাকা ইহাদের কাছে আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দেয়, তাহাদের অসুবিধা করিয়া সরকার ক্ষতিকারী যাত্রীদিগের সুবিধা করিতে ব্যস্ত! কারণ, প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে কেবল লোকসান।

সরকার পক্ষ এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সরকার ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব অনুসারে কায করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং ইহাতে যে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে না।

—

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে অক্টোবর মাসে কৃষ্ণনগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে ক্যানিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বহস্তে নানারূপ গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন বলিয়া লোক তাঁহাকে "বেড়াবাধা ঠাকুর" বলিত। যোগেশচন্দ্র পিতার নিকট হইতে এই শ্রমশীলতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং দারিদ্র্যহেতু আর উচ্চশিক্ষালাভ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণনগরে এ, ভি, স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করেন। তাহার পর জেমো কাঁদীর স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকের কার্য্য করিয়া মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষক হয়েন। তথায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া "ক্যানিং লাইব্রেরীর" প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে বহু সুপাঠ্য পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। ক্যানিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু বিখ্যাত গ্রন্থকার তথায় তাঁহাদের পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে কবিবর হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় এবং "টেকচাঁদের" যে রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন রচনার পারিশ্রমিক দিবার জন্য ক্যানিং লাইব্রেরীতে পত্র দিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ে যোগেশচন্দ্র উদারমতাবলম্বী ছিলেন এবং পত্নীকেও শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই।

পরিণত বয়সে ব্যবসা বন্ধ করিয়া তিনি কৃষ্ণনগরে
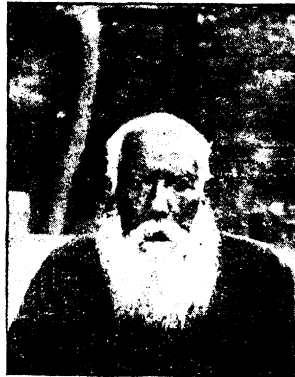
যাইয়া বাস করেন। সেই সময় তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের বিস্তৃত ইতিহাস, দুইখানি উপন্যাস ও 'প্রাচীনের পূর্ব্বকথা'-নামক প্রবন্ধগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগর কলেজের এই ইতিহাস পাঠ করিলে সেকালে এই প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রচারের বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ হইয়াছিল।

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী

গত ৫ই জানুয়ারী রাত্রিকালে প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুর গোস্বামিবংশের কুলপতি রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর কয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, আগামী মার্চ্চ মাসে বিলাতে যাইবেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে তিনি বিষয়-কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন এবং তথায় বিষয়-কার্য্য সমাধা করিয়া আহারের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টার সময় শয্যায় শয়ন করেন। তাহার পর সহসা তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী।

রাজা কিশোরীলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া উকীল হয়েন এবং প্রায় ১৫ বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতীও করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁহাকে বিষয়-সম্পত্তির কার্য্যের জন্য ওকালতী ত্যাগ করিতে হয়।

তিনি কিছু কাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

তিনি বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য ছিলেন।

তিনি শ্রীরামপুরে জনহিতকর নানা অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে এবং রাষ্ট্রীয় বিধিতে তাঁহার বিশেষ অধিকারও ছিল। জমীদাররূপে তিনি বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সভার এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বদেশীয় অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত রেল—বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের ডিরেক্টার ছিলেন এবং বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলেরও ডিরেক্টার ছিলেন।

তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অধিক লোকের নাই। বাঙ্গালার জমীদার দলের মধ্যে যাঁহারা বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত ও অর্থব্যয় করেন, কিশোরীলাল তাঁহাদের মত ছিলেন না। তিনি একদিকে—যেমন ইংরাজী সাহিত্যে, আইনে—বিশেষ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে ও রাষ্ট্রীয় বিধিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই আবার হিন্দুশাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেও জানিতেন।
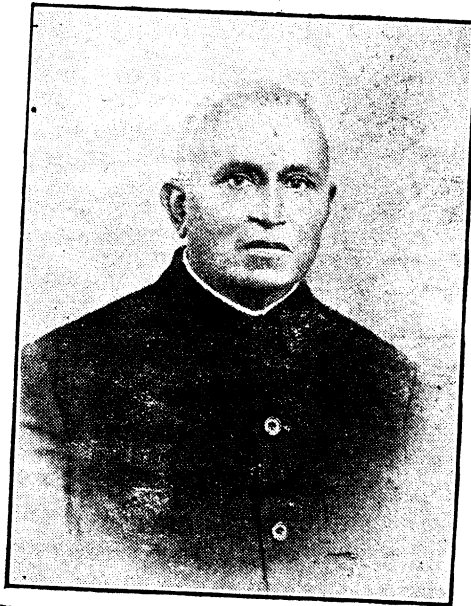
কুচবিহারের মহারাজা

মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ।

বঙ্গদেশে মিত্ররাজ্যের সংখ্যা অতি অল্প—কুচবিহার সে সকলের একটি। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। তৎকালে সেই বিবাহ লইয়া বঙ্গদেশে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল। যে বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া সঙ্গত বলিয়া কেশবচন্দ্র মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা সুনীতির তখনও সে বয়স হয় নাই। সেই জন্য এক দল ব্রাহ্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠিত করেন —তাহাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী ও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ব্যায়ামপ্রিয় ও উৎকৃষ্ট শীকারীও ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয়েন। অবিবাহিত অবস্থায় অল্পদিনমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং কয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা জিতেন্দ্রনারায়ণ রাজা হয়েন।

জিতেন্দ্রনারায়ণ বরোদার গায়কোবাড়ের দুহিতা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। এ বিবাহ যেন ঔপন্যাসিক ব্যাপার। পিতা কৃতদার এক জন প্রসিদ্ধ রাজার সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করেন; কন্যা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জিতেন্দ্রনারায়ণকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। পিতার তাহাতে আপত্তি ছিল। কিন্তু কন্যা পিতামাতার অমতেই জিতেন্দ্রনারায়ণকে বিবাহ করেন

মহারাণী ইন্দিরা দেবী।

এবং বঙ্গদেশই আপনার গৃহ করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে আসিয়া বাস করেন।

আজ অনতিক্রান্তযৌবনে অকালে জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু নিতান্তই মর্ম্মপীড়াদায়ক, সন্দেহ নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়দিনমাত্র অসুস্থ থাকিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের নায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যকালেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী বাঙ্গালায় জ্ঞানচর্চ্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। পুত্রগণ পিতার জ্ঞানপিপাসা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক এক জন দিক্‌পাল বলা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষালাভার্থ বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার এই সাফল্যে তাঁহার পরম বন্ধু কবিবর মাইকেল মধুসূদন যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কবির 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে একটি কবিতায় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অমর হইয়া আছে। সত্যেন্দ্রনাথের চাকরীর ক্ষেত্র—বোম্বাই প্রদেশ।

সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। চাকরীর সময় তিনি 'বোম্বাই চিত্র' নামক যে বৃহৎ ও সচিত্র পুস্তক প্রচার করেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব জিনিষ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি 'তত্ত্ববোধিনীর' তত্ত্বাবধান করিতেন এবং মেঘদূতাদি বহু কাব্য ও কবিতা সুললিত বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ চাকরী ছাড়িয়াই দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি চাকরী হইতে অবসর লইয়া আসিবার পর নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

কিন্তু সরকারী চাকরীতে থাকিয়াও তিনি কোন দিন দেশাত্মবোধ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। তরুণ-যৌবনে তিনি নবকুমার মিত্র প্রবর্ত্তিত হিন্দুমেলার আমলে যে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন— বাঙ্গালা ভাষায় তাহাই অন্যতম প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। সত্যেন্দ্রনাথ যদি কেবল সেই সঙ্গীত রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিতেন, তবুও বঙ্গদেশে তাঁহার যশ অক্ষয় হইয়া থাকিত।—

"মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি—রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়।
জয় ভারতের জয়;
গাও ভারতের জয়।
কি ভয়, কি ভয়?—গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত-ললনা ;
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা ;
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক ভারতের জয় —ইত্যাদি।
বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, মহামুনিগণ ;
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস ;
কবিকুল—ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়—ইত্যাদি।
কেন ডর ভীরু ? কর সাহস আশ্রয় ;
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল ;
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়—ইত্যাদি।"

এই রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন—"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

তুর্কীর ভবিষ্যৎ

লসেনে তুর্কীর প্রতিনিধিদিগের সহিত য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদিগের যে মীমাংসার আলোচনা চলিতেছে, এখনও তাহার কায শেষ হয় নাই। পরন্তু ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে সহজে মীমাংসার সম্ভাবনাও যেন সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছে।

এ দিকে জর্ম্মণীর কাছে ক্ষতিপূরণ লইয়া মিত্র-শক্তিসমূহের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত। ফ্রান্স যে কোন প্রকারে জর্ম্মণীর নিকট হইতে এখনই ক্ষতি-পূরণের টাকা আদায় করিতে উদ্যত হইয়া রণসজ্জা করিয়াছেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হইতে পারিতেছেন না। য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জ যদি এই ব্যাপারেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তবে যে তাঁহাদের আর তুর্কীকে শঙ্কিত করিবার বিশেষ উপায় থাকিবে না—তাহা বলাই বাহুল্য।

নিখিল ভারত সেবা-সমিতি

এবার ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র নিখিল ভারত সেবা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে যাইয়া ডাক্তার মৈত্রই নিখিল ভারত সেবা-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার ফলে পরবৎসর মহাত্মা গন্ধী সভাপতি হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মৈত্র মহাশয়ের চেষ্টায় গত ৮ বৎসরকাল বঙ্গীয় হিতসাধন

তুর্কীর নূতন খলিফা ও তাঁহার কন্যা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

মণ্ডলী বঙ্গদেশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে।

রায় অবিনাশচন্দ্র সেন বাহাদুর

যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে কায করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন, সি, আই, ই—এম, ডি, ও, তাঁহাদিগের অন্যতম। সংসার বাবু বাঙ্গালা হইতে যাইয়া সুদূর জয়পুরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, লোক বলিত, তিনিই জয়পুরে শাসনকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা—power behind the throne. জয়পুরের মহারাজ বাহাদুরও তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে "তাজিম-ই-সর্দ্দার" উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি যাঁহাকে প্রদত্ত হয়, অন্যান্য দেশীয় রাজাও তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন—ইহাই নিয়ম।

অবিনাশ বাবু পিতার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহকারী ও পরে প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজের সঙ্গে বিলাতে গিয়াছিলেন এবং মহারাজের কাছে রাজন্যসম্মিলনেও আসন পাইতেন

অল্প দিন কায করিয়াই অবিনাশ বাবু জয়পুর রাজ্যের পররাজ্য-সচিবের পদ লাভ করেন। এ দিকে তিনি "রায় বাহাদুর" ও "সি, আই, ই" উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

কয় বৎসর হইতে অবিনাশ বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল—কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জয়পুর রাজ্যের জন্য যথেষ্ট

শ্রম করিতে হইত। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর মাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখন জয়পুরের হিসাব বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ পাইয়াছেন।
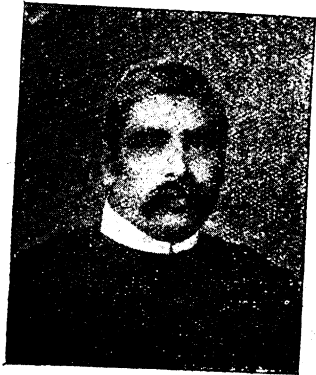
রায় অবিনাশচন্দ্র সেন বাহাদুর।

১লা আশ্বিন—

আলিপুরের সেণ্ট্রাল জেল হইতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কতিপয় দেশ-সেবকের—১৭ বি ধারার আসামীর মুক্তি; দণ্ড কাহারও এক বৎসরের কম ছিল না, তথাপি নয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই অব্যাহতি-প্রদান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে রাজপথের ভিখারী ও ফেরিওয়ালা রূপ আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য পুলিসের শরণ লইবার কথা। বৃটিশ রণতরী "আয়রণ ডিউক" হইতে নৌ-সৈন্যদের কনস্তান্তিনোপলে অবতরণ; আঙ্গোরা কর্ত্তৃক অপ্রতর্কিতভাবে রাজধানী আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত; তুর্ক আক্রমণ প্রতিরোধার্থ সেনাপতি নিযুক্ত; নৌ-সৈন্য ও মিত্র-শক্তির অন্যান্য সৈন্যদের পরিখা খনন। কেনিয়ায় ভারতীয়দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদ; শ্বেতাঙ্গদের সহিত সমান অধিকারের দাবী।

২রা আশ্বিন—

মাদারল্যাণ্ড পত্রের সম্পাদক দেশভূষণ মৌলবী মজহরল হকের কারাবাস কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি; জিনিষপত্র ক্রোক করিয়া জরিমানার টাকা আদায়। ময়মনসিংহে কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তেরো জন নেতার মুক্তি। আকালীদের শুশ্রূষা করিবার জন্য কলিকাতার মেডিক্যাল স্বেচ্ছাসেবক দলের অমৃতসরে উপস্থিতি। বাহির হইতে গুরুবাগে আহার্য্য-প্রেরণ বন্ধ করায় তথায় অবস্থিত আকালীদের কষ্ট। জামসেদপুরে টাটার কারখানায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের রাস্তার সংস্কারের জন্য স্থানীয় এক মার্কিণ কোম্পানীর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দানের সংবাদ। মুলতান হাঙ্গামায় লাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর সাহায্যার্থ অর্থ-সংগ্রহ; স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার পাণ্ডা। মুলতানে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাঙ্গামাস্থল পরিদর্শন। কলিকাতা টাউনহলে বিরাট সভায় আঙ্গোরার বিজয়-লাভে আনন্দ-প্রকাশ এবং বৃটিশ সরকারের গ্রীস-পক্ষপাতিতার প্রতিবাদ। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ কামালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সম্মত না থাকায় চানক হইতে দুই হাজার ফরাসী সেনার প্রত্যাহার; বৃটিশ বৈদেশিক সচিব প্যারিসে যাইয়াও ফ্রান্সের মত-পরিবর্ত্তনে অসমর্থ।

৩রা আশ্বিন—

"বোম্বাই ক্রনিকেল" সম্পাদক মিঃ মার্ম্মাডিউক পিকথল "মালিগাও আপীল" প্রবন্ধে আদালত অবমাননা করায় দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতায় স্নানার্থীদিগকে কলিকাতা, কালীঘাট, হাওড়া, সালখিয়া, শিবপুর প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে সাহায্য; অসহযোগী কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানগুলির যোগদান; প্রধান উদ্যোগী—উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস। সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ যাত্রীর সমাগম; লোকের ভিড়ে ষাট জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত। রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার প্রস্তাব সরকার পক্ষের আপত্তিতে প্রত্যাহৃত; সরকার পক্ষ বলেন, জেলের ব্যবহারে অতিরিক্ত কঠোরতা কোথাও করা হয় নাই। স্যার উইলিয়াম ম্যারিসের স্থানে বাঙ্গালা সরকারের সার জন হেনরী কার আসামের গবর্ণর নিযুক্ত। তুরস্ক-সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ২৫ জন সদস্যের বড় লাটের নিকট গমন ও শান্তির প্রার্থনা; বৃটিশ সরকারকে ভারতের মত জানাইবার সম্বন্ধে বড় লাটের আশ্বাস। গুরুবাগে শিখ মহিলাদের সমক্ষে কতিপয় পুলিস কনষ্টেবলের অশ্লীল গান গাওয়ার অভিযোগ। কারামুক্ত টাঙ্গাইল নেতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের উদ্যোগীদের প্রতি ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা ও শোভাযাত্রার নিষেধ। কামালের সাহায্যার্থ রুম্যানিয়া সীমান্তে বলসেভিকদের সৈন্য-সমাবেশ; প্রহরী রুম্যানিয় সেনার সহিত সংঘর্ষ। বিলাতে শ্রমিক দল যুদ্ধের বিরোধী; প্রধান মন্ত্রীকে বিপরীত মতাবলম্বী দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ, পার্লামেণ্টের নূতন নির্ব্বাচনের দাবী।

৪ঠা আশ্বিন—

জামশেদপুরে ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা ২০ হাজার; অনাচারের সংবাদে পুলিস ফৌজের উপস্থিতি। দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রতি কাশ্মীর সরকারের হুকুম—রাজনীতিতে যোগ না দিবার প্রতিশ্রুতি লিখিয়া না দিলে কাশ্মীরে থাকিতে দেওয়া হইবে না; দাশ মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি না দিয়া কাশ্মীর-ত্যাগ। জাতি-সঙ্ঘে ভারতে অহিফেন চাষ বন্ধের প্রস্তাবে নওয়ানগরের জাম সাহেবের প্রতিবাদ। ইসমিদ প্রভৃতি স্থান হইতে ফরাসী ও ইটালীয়ান পতাকা সরান হইয়াছে; সেখানে কেবল বৃটিশ সৈন্যরাই অবস্থান করিতেছে। থ্রেস অধিকারের জন্য আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; তাঁহারা সে উদ্দেশ্যে প্রণালী অবিলম্বে পার হইতে চাহিতেছেন।

৫ই আশ্বিন—

যাহারা মোপলা ট্রেণ বিভ্রাটের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী এবং যাহারা মোপলা স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের প্রতি অযথা রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের বিচারের প্রার্থনা; সরকার পক্ষের অসম্মতিতে অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য। কলিকাতায় রামবাগানে কোন বারবনিতার গৃহে চোরের সন্ধানে পুলিসের উপস্থিতি; আসামী ধরিতে গেলে তাহার বন্ধুর গুলীবর্ষণ; একজন পুলিস কর্ম্মচারী আহত। দার্দ্দানেলিজের এসিয়ার দিকের উপকূলে অবস্থিত এনজাইন সহর তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত। আঙ্গোরা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে থ্রেস প্রত্যর্পণের দাবী।

৬ই আশ্বিন—

আলিপুর জেল হইতে শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কারামুক্তি। শিয়ালকোট কনফারেন্সের নির্ব্বাচিত সভাপতি, স্থানীয় প্রাদেশিক খেলাফতের সম্পাদক, মানিকলাল খাঁ জামিন দিতে আদিষ্ট, আদেশ পালন না করায়

গ্রেপ্তার। সংবাদপত্রের আক্রমণ হইতে ভারতীয় রাজন্যদিগকে রক্ষা করিবার আইন স্থায়ী করিবার প্রস্তাব—নূতন পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য। রাষ্ট্রীয় পরিষদে পুলিস বিল গৃহীত; পুলিসের রাজভক্তিতে বাধা জন্মাইলে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা। জামসেদপুরের ধর্ম্মঘটের জন্য কলিকাতা হইতে সৈন্য প্রেরণ। তুর্ক সমস্যা সম্বন্ধে মিত্রশক্তির নিকট রুসিয়ার পত্র; দার্দ্দানেলিজ প্রণালীতে রণতরীর আগমনে এবং উহা বৃটিশের অধীনে থাকায় রুসিয়া সম্মত নহেন; কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ, তাহারাই দার্দ্দানেলিজের সমস্যার সমাধান করিবে; পত্রটির মর্ম্মপ্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। মিত্রশক্তি আঙ্গোরার ভাবগতি দেখিয়া তাহাকে আদ্রিয়ানোপল ফিরাইয়া দিতে, য়ুরোপের দিকে তুরস্কের সীমানা বাড়াইয়া দিতে এবং প্রণালী অঞ্চলে কতক পরিমাণে স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব করিতে দিতে সম্মত।

৭ই আশ্বিন—

করাচী জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক স্বামী কৃষ্ণানন্দ বক্তৃতায় রাজদ্রোহ ও জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিবার অভিযোগে জামীন-মুচলেকা দিতে আদিষ্ট। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট কর্ত্তৃক সিমলা শৈলে তাঁহার বিদায়ী অভিনন্দন সভায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের নিন্দা। কলিকাতায় তুমুল বৃষ্টি, রাজপথে জলস্রোত। কলিকাতায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডে নফর কুণ্ডু স্মৃতি-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে লোহার থাম প্রভৃতি দিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক হাজার টাকা মঞ্জুর। আঙ্গোরার অশ্বারোহী সৈন্যরা চানকের নিকটে নিরপেক্ষ সীমানা অতিক্রম করিয়াছে।

৮ই আশ্বিন—

কালীকটের উকীল এম খ্রি নারায়ণ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত। অমৃতসর আদালতে স্বামী বিশ্বানন্দ গ্রেপ্তার; স্বামীজী শিখ নেতাদের ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মামলা দেখিতে গিয়াছিলেন। শিখ নেতাদের মামলায় বাবা কাহন সিংএর পক্ষে পণ্ডিত মালব্যজীর ওকালতী। অতিবৃষ্টিতে ই বি রেলে সান্তাহারের ওধারে দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবার প্রধান পথে অনেক যায়গায় হানা; ডাউন দার্জ্জিলিং মেল পার্ব্বতীপুরে আটক। কাটীহার শাখাতেও ট্রেণ-চলাচলে বাধা। তুর্কী অশ্বারোহী সেনার চানকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে প্রবেশ। আঙ্গোরার সুবিধার জন্য কনস্তান্তিনোপল গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তুরস্কের রাজপরিবারের বহু ব্যক্তি সম্মিলিত পক্ষের সাহায্যে কনস্তান্তিনোপল হইতে মাণ্টায় পলাইয়া গিয়াছেন।

৯ই আশ্বিন—

গত কয় দিন হইতে বহরমপুর হইতে দলে দলে রাজনৈতিক বন্দীদের অব্যাহতি; কাহারও কারাভোগের কাল শেষ হয় নাই। রাজন্য আশ্রয় আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলেও বড় লাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে উহা আবার রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত, তথায় আলোচনা স্থগিতের প্রস্তাব অগ্রাহ্য; অবশেষে পাণ্ডুলিপিখানি গৃহীত; বড় লাটের ঐ বিশেষ ক্ষমতার পরিচালন সম্বন্ধে পূর্ব্বদিন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার প্রস্তাব সভাপতির হুমকীতে বন্ধ। ঢাকা ইসলামপুরে পিকেটিংয়ে স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। গুপ্তিপাড়ায় ইউনিয়ন বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকিটিংয়ের সংবাদ, লোকজনকে সস্তায় বিদেশী বস্ত্র কিনিতে অনুরোধ। পেদ্দাপুর তালুকে বিদ্রোহীদের অপ্রতর্কিত আক্রমণে মিঃ এল এন হেটার নামক এক জন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আর এক জন শ্বেতাঙ্গ গুলীর আঘাতে নিহত; তিন জন কনষ্টেবলও নিরুদ্দেশ। উত্তর বঙ্গের অতিবৃষ্টিতে ই বি রেলের সান্তাহারের এ ধারে ঈশ্বরদী আসিবার পথে এবং লালমণির হাট শাখাতেও হানা। আঙ্গোরা কর্ত্তৃপক্ষের কনস্তান্তিনোপল ও থ্রেস অধিকার।

১০ই আশ্বিন—

শিরোমণি কমিটীর অভিযোগ—গুরুবাগের পুলিস নিজেরাই বাগানে গাছ কাটিতেছে, তাহা আবার খুব বেশী পরিমাণে। লাহোরের জমীদার পত্রের সম্পাদক কেয়াসী মহম্মদ আদিল আদালতে অভিযুক্ত; উক্ত পত্রের আর এক সম্পাদককে রাজদ্রোহ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ; শেষ সম্পাদককে লইয়া জমীদারের মোট ছয় জন সম্পাদক অভিযুক্ত হইলেন। যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক লিবারেল কনফারেন্সে অসহযোগ আন্দোলনের স্বদেশী প্রচার ব্যবস্থার প্রশংসা। যুদ্ধে আঙ্গোরার সাহায্যার্থ ভারতে নানা স্থানে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ। গ্রীকরাজ কনষ্টাণ্টাইনের সিংহাসনত্যাগ; গ্রীক গবর্ণমেণ্টেরও পদত্যাগ; চতুর্দ্দিকে সৈনিক মহলের ও সামরিক দলের বিদ্রোহ; বিদ্রোহী দলের দাবী অনুসারে রাজা কনষ্টাণ্টাইন, রাণী ও দুই পুত্রের সহিত কোন যুদ্ধজাহাজে করিয়া এথেন্স ত্যাগ করিয়াছেন।

১১ই আশ্বিন—

কলিকাতায় উত্তর বঙ্গের বন্যার প্রথম সংবাদ; রেলের বাঁধের কূলে কূলে জল; পল্লী অঞ্চল প্লাবিত; জল নয় দশ ফিট; সান্তাহার-বগুড়া শাখায় বিষম হানা; সান্তাহার-পার্ব্বতীপুর অঞ্চলে রেলপথের পাঁচ মাইল স্থান জলমগ্ন। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ডাঃ মণিলালের বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত।

১২ই আশ্বিন—

গুরুবাগে পঞ্জাব পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টার-জেনারেল; গ্রেপ্তার কিন্তু সমভাবে চলিতেছে; শিখ ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গুরুবাগে পুলিস ধূমপান ও মোরগ আদি ভক্ষণ করিতেছে। এসিয়া মাইনরে গ্রীক সেনার পরাজয় প্রভৃতির জন্য গ্রীসের তিন জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গ্রেপ্তার।

১৩ই আশ্বিন—

এলাহাবাদের রামলীলা উৎসবে "আকালী চৌকী" বাহির করিতে নিষেধ করায় উদ্যোগীরা শোভাযাত্রায় কোন 'চৌকীই' বাহির করেন নাই। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, কারাগারে মহাত্মা গন্ধী ও শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে সংবাদপত্র পড়িতে এবং রাত্রে আলো ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। রেঙ্গুণে কাউন্সিল-বয়কট-বিরোধী সভায় পিকেটিংয়ের আশঙ্কায় রাজপথে বিনা পাশে পুঙ্গীদের দ্বারা পরিচালিত অথবা নির্দ্দিষ্ট শোভাযাত্রা ও সভা নিষিদ্ধ। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী খ্যাতনামা উপন্যাস-রচয়িত্রী অনুরূপা দেবীর লোকান্তর; ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবী নামে পরিচিতা ছিলেন। মোপলাদের অভিযোগের ফলে তথাকার বিদ্রোহ অঞ্চলের বহু কনষ্টেবলের বিভাগীয় শাস্তি; প্রহার করার অভিযোগে দুই জন কনষ্টেবল বরখাস্ত; ঘুস আদায়ের অপরাধে একজন হেড কনষ্টেবলেরও ঐ দশা; কয়েকটি অভিযোগের তদন্ত এখনও চলিতেছে। আফগানিস্থানে কাবুলের নিকট সর্ব্বপ্রথম রেলপথ পাতিবার সঙ্কল্প; আয়োজন প্রস্তুত; ইটালীয়ান ইঞ্জিনীয়ারও নিযুক্ত। কনস্তান্তিনোপলের জন্য ইংলণ্ড হইতে আরও সৈন্য প্রেরণ।

১৪ই আশ্বিন—

প্রেসিডেন্সী জেলে আবার কয়েদী হাঙ্গামা; কর্ত্তৃপক্ষের গুলী-বর্ষণ; দুই জন কয়েদী আহত। উত্তর-বঙ্গের বন্যার অবস্থা পরিদর্শন জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্তের সান্তাহার গমন; বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগেরও বন্যাস্থলে কতিপয় কর্ম্মী প্রেরণ; বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস হইতেও কর্ম্মী ও সাহায্য প্রেরণ। রেঙ্গুনের ডাঃ প্রাণজীবন দাশ মেটার প্রদত্ত আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া গুজরাট বিদ্যাপীঠের সাহায্যার্থ

মোট প্রায় আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বৃটীশ নৌ-বহর কর্তৃক দার্দ্দানেলিজ প্রণালীর অবরোধে রুষ সোভিয়েটের তীব্র প্রতিবাদ।

১৫ই আশ্বিন—

মহাত্মার জন্মদিন উপলক্ষে বোম্বায়ের সম্ভ্রান্ত বংশের প্রায় এক শত ভারতীয় মহিলার (তন্মধ্যে কয়েকজন পার্শী ও মুসলমান) যারবেদা জেলে মহাত্মার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পুণা যাত্রা। অমৃতসরে গুরুবাগ কাণ্ডের তদন্ত জন্য কংগ্রেসের তদন্ত কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ। রাজদ্রোহ ও অস্ত্র আইন মাদ্রাজে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। উত্তর-বঙ্গের বন্যায় সাহায্য জন্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রিলিফ কমিটী গঠিত।

১৬ই আশ্বিন—

"বরোদায় স্বেচ্ছাচার" শীর্ষক বোম্বে ক্রনিকেলের একটি সংবাদের তর্জ্জমা প্রকাশ করায় বরোদা সমাচার নামক স্থানীয় সাপ্তাহিক বন্ধ, অধিকন্তু তাহার চার শত টাকা জরিমানা। রাজসাহী, চরঘাটে বিদেশী লবণ ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীদের বয়কট করায় স্থানীয় আটাশ জন লোকের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটীশ। হাজারীবাগ জেলে হিন্দু-মুসলমান সকল রাজনৈতিক কয়েদীর একত্র ভগবৎ আরাধনার ইচ্ছায় বিপত্তি: দুই জনকে ঠাণ্ডা গারদ দিবার এবং অন্যান্যদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা কাড়িয়া লইবার অভিযোগ। অমরাবতীতে বিহার প্রাদেশিক মারবাড়ী অগ্রবাল-সভা; আফগানিস্থানে গো-বধ বন্ধ হওয়ায় আমীরকে অভিনন্দন। জামসেদপুরে কোন সধবা-বিধবা হিন্দু মহিলার কেরোসিনে আত্মত্যাগ। তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধ স্থগিতের জন্য সম্মিলিত পক্ষের ব্যবস্থায় মুদানিয়ায় বৈঠকের আরম্ভ।

১৭ই আশ্বিন—

উত্তর-বঙ্গের বন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে সাহায্য উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সভায় বেঙ্গল রিলীফ কমিটী গঠিত; আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, সাতকড়িপতি রায়, মিঃ ট্রটার, বেজনাথ পি দেওরা ও শ্রীমতী মায়া দেবী সম্পাদক। মহীশূরের তিনখানি সংবাদপত্র মুদ্রাযন্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিলেও সরকারী ব্যবস্থায় অব্যাহতি পাইয়াছেন। কাউণ্টেস্ ডাফরিণের ধন ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ ভারতীয় মহিলা ডাক্তারদের বিলাতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বৃত্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ডাঃ এইচ এস গৌরের ভাগিনেয়ী ক্যাম্বেল হাসপাতালের হাউস সার্জেন ডাঃ জানকী বাঙ্গয়ের সহিত হাকিম মসিহর রহমানের পুত্র ডাঃ এস জমানের শুভ পরিণয়। আইরিশ সন্ধি-পত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী, সম্প্রতি অন্যতম বিদ্রোহী নেতা মিঃ বার্টন ডাবলিনে গ্রেপ্তার।

১৮ই আশ্বিন—

মাদ্রাজের কোন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার অসহযোগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করায় তাঁহার পেন্সন বন্ধ হইয়াছিল, ক্ষমা প্রার্থনা করায় শেষোক্ত ঘটনার দিন হইতে পেন্সন দিবার আদেশ। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব বে-সরকারী সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও গৃহীত হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে উক্ত সদস্যদের একযোগে সভাস্থল ত্যাগের সংবাদ; দর্শকগণ আনন্দ প্রকাশ করায় সভাস্থলে পুলিস। মহীশূরে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বপ্রথম সরকারী চাকরী পাওয়ার ব্যবস্থা। বান্দার নিরপেক্ষ অঞ্চলে আঙ্গোরা সৈন্য।

১৯শে আশ্বিন—

বিজাপুরের কর্ণাটক বৈভবের সম্পাদকের রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড; সম্পাদক জরিমানা দেন নাই। জোড়হাটে এক স্বদেশী দোকানে ও জেলা কংগ্রেস আফিসে সরকারী হুকুমে তালা-চাবী; ইতিপূর্ব্বে ঐ বাড়ী দুইটির মালিকদের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী করা হইয়াছিল; কংগ্রেস আফিসের জন্য ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া ছিল; কংগ্রেস আফিস তালা চাবী বন্ধ হওয়ার এটি চতুর্থ বার। নেলোরে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী নরসম্মা ও অন্যান্য সাধারণের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটীশ। সহকারী ভারত-সচিবের সীমান্ত-পরিদর্শন। মাদ্রাজে এজেন্সী অঞ্চলে বিদ্রোহ-দমনে সরকারের সাহায্য না করায় একজন জমীদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত; অন্যান্যদিগকে ঐরূপ শাস্তির ভয় প্রদর্শন। উত্তর-বঙ্গের বন্যার সাহায্যে দারজিলিঙ্গে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চাঁদায় পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত। এক জন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বেঙ্গল রিলীফ কমিটীর সভাপতি আচার্য্যদেবের হস্তে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়া গিয়াছেন; ইঁহারা সপরিবারে খদ্দর পরিধান করেন; খদ্দর ঘরেই প্রস্তুত করেন, নিজেরা সূতা কাটেন ও নিজেরাই কাপড় বুনিয়া লয়েন। আকালী হাঙ্গামায় পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া লইবার জন্য গুরুবাগে সরকারী আড্ডা। বালীগঞ্জ কসবার শ্রীযুক্ত কোইচী তাকেদার নামে এক জাপানী যুবকের সহিত বাগনানের শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সমাদ্দার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিকুসুমের শুভ বিবাহ। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের লোকান্তর। মুদানিয়ার সভায় আঙ্গোরার কড়া মেজাজ, থ্রেস অধিকারের দাবী; লর্ড কর্জ্জনের প্যারিস যাত্রা। ইটালীতে ফ্যাসিষ্টিদের অভ্যুত্থান।

২০শে আশ্বিন—

আজমীরে শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গন্ধীর সভানেত্রীত্বে জেলা রাজনীতিক সভা। অমৃতসহরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড; বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামীজীকে বিশেষ শ্রেণীতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। খেলাফৎ ফতোয়া প্রকাশ করায় চট্টগ্রাম জেলা খেলাফৎ সম্পাদকের জরিমানা অভাবে কারাদণ্ড। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নবাব সৈয়দ সার সামসুল হুদা সাহেবের লোকান্তর। বালীগঞ্জ, লস্করপুরের একটি মাঠে জনস্রোত। ইংরেজ ফরাসীর পরামর্শে আঙ্গোরাকে থ্রেস প্রদান স্থির।

২১শে আশ্বিন—

জোড়হাট জেলে পণ্ডিত দেবশরণ উপাধ্যায়ের প্রায়োপবেশনের ফলে মৃত্যুর সংবাদ। লক্ষ্ণৌ জেলে শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও চিঠিপত্র লিখিতে নিষিদ্ধ। গিরিডিতে অসহযোগী নেতা শ্রীযুত বজরঙ্গ সহায়ের জামীন-মুচলেখা না দিয়া এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতির সহিত মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথের সান্তাহার আগমন; কয়েক ঘণ্টা পরিদর্শনের পর পুনরায় দারজিলিং যাত্রা; বন্যার পর বাঙ্গালা সরকারের কর্ত্তাদের প্রথম সাড়া। মাদ্রাজে একটি ১১ বৎসরের বালকের অদ্ভুত গণিত-বিদ্যার পরিচয়; বালক জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস মাদুরায়। আঙ্গোরার জন্য বৃটিশ রাজনীতির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সিংহাসন টলমল। পারস্যে সামরিক দল ও প্রজাতন্ত্র দলে রাজনীতিক বিরোধ; সমর-সচিবের পদত্যাগ।

২২শে আশ্বিন—

অমৃতসর বাজারে সিটি কংগ্রেস কমিটীর খদ্দর বিক্রয় ব্যবস্থায় পুলিসের আপত্তি। মীরাটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মুখ বন্ধের আদেশ জারী; জগদ্গুরু আদেশপালনে অস্বীকার। গুরুবাগ কাণ্ডে ধৃত আকালীর মোট সংখ্যা এ পর্য্যন্ত ১৩২৭। ত্রিপুরায় বন্যা। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা কর্তৃক কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজে বৈদ্যুতিক আলোক ও আসবাব জন্য লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি। তুর্কী সেনা নিরপেক্ষ অঞ্চলে আবার অগ্রসর; বৃটিশ

সেনাপতির সাবধান-বাণী ; ওদিকে এই নূতন সমস্যায় বৃটিশ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মত-অনৈক্য ; ফ্রান্স যুদ্ধের বিরোধী। গ্রীসের সহিত ইটালীর বিচ্ছেদ।

২৩শে আশ্বিন—

দিনাজপুরে চিরির বন্দর থানায় কয়েকটি হাটে পিকেটিং বন্ধের জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণের উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারী। বগুড়াতেও এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ। পাটনার আঞ্জুমানী ইসলামিয়া হলে জন-সভায় কারা-মুক্ত জন-নায়ক ডাঃ মামুদের অভ্যর্থনা। কংগ্রেসকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গুরুবাগ কাণ্ডের তদন্তে সরকার পক্ষ সাক্ষীদের জেরা করিতে অসম্মত। মাদ্রাজ এরোদের মিউনিসিপ্যালিটীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন স্থানীয় সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত ; মুসলমান বালিকাদের স্কুলে দিতে বাধ্য করা হইবে না। আগামী ২০ বৎসর কালের জন্য বৃটিশের সহিত ইরাকের সন্ধি।

২৪শে আশ্বিন—

যশোহর, দীঘলকান্দী নিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ সেনের লোকান্তর ; ইনি আমেরিকা হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন এবং ভারতে আসিয়া ছয় বৎসর আটক ছিলেন। লালগোলা ঘাটের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যা শ্রীমতী কমলকুমারী নন্দী পদ্মাস্রোতে লাফাইয়া পড়িয়া ছোট ভগ্নীর প্রাণ রক্ষা করায় রয়াল হিউমেন সোসাইটীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। আলিপুরে চেতলার বালিকা বধূ নিগ্রহের মামলা। মুদানিয়ায় যুদ্ধ স্থগিতের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত।

২৫শে আশ্বিন—

বোম্বায়ের ওয়াদিয়া ওয়াকফ হইতে উত্তর-বঙ্গের বন্যায় সাত হাজার টাকা সাহায্য। ভাওয়াল সন্ন্যাসী সম্পর্কে পুলিস ইনস্পেক্টার হত্যা মামলার শেষ আসামীরও হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি। তুর্কী সেনার আবার ইসমিদ অঞ্চল আক্রমণ। মার্কের মূল্য আরও অধিক হ্রাসের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থা। সমগ্র গ্রীসে সামরিক আইন জারী।

২৬শে আশ্বিন—

নেলোরে ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্যে সহযোগী-অসহযোগী সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সভা ; শোভাযাত্রা বন্ধের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত প্রকাশমের নেতৃত্বে স্থানীয় নেতা ও মহিলাদের রাস্তায় রাস্তায় খদ্দরের ফেরী। লোকমান্য তিলক মহারাজের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক দিবসে শোভাযাত্রা বাহির করায় "জ্যোতি"র ম্যানেজার ও একজন কংগ্রেস কর্ম্মীর কারাদণ্ড। মাদ্রাজে পুলিস ইউনিয়ন গঠনে সরকারের সম্মতি। প্রেসিডেন্সী জেলের দ্বিতীয় হাঙ্গামার সরকারী বিবৃতির অংশ।

২৭শে আশ্বিন—

কলিকাতা পাটোয়ার বাগান খেলাফৎ কমিটীর কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক রাত্রে পাহারা দিবার সময় পুলিসে গ্রেপ্তার ; খেলাফৎ কমিটী স্থানীয় লোকের অনুরোধে পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আঙ্গোরার ব্যাপারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের নিজ রাজনীতির সমর্থন করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারে বক্তৃতা। প্যারিসে পারস্যের শাহ।

২৮শে আশ্বিন—

মাদ্রাজে টিনেভেলিতে খেলাফৎ ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ কাপড়ের দোকানের কাছে যাইতে নিষিদ্ধ। কটকেও ১৪৪ ধারা জারী ; কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে সভা শোভাযাত্রা করিতে নিষেধ। মহাত্মার কারাদণ্ডে ব্যথিত হইয়া সালেমের ডাঃ বরদা রাজলু নাইডুর আয়কর প্রদানে অসম্মতি। আকালী আন্দোলনে শিখ সৈনাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সংবাদ। মিঃ লয়েড জর্জের ম্যাঞ্চেষ্টারী বক্তৃতায় ফ্রান্সের অসন্তোষ ; বিলাতেও চাঞ্চল্য। গ্রীকদের পূর্ব্ব থ্রেস পরিত্যাগ আরম্ভ। চানক সীমান্ত হইতে তুর্ক সেনার প্রস্থান।

২৯শে আশ্বিন—

পঞ্জাব খেলাফতের সম্পাদক ও পঞ্জাব কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত মালিক খাঁ জামীন দিতে অস্বীকার করায় এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গুরুবাগের কাণ্ডে দুই জন আকালীর মৃত্যুতে এক জন হেড কনষ্টেবল ও ছয় জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নে সরকারের অনুমতি। অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে ও প্রবন্ধক অফিসে সারদাপীঠের স্বামী শঙ্করাচার্য্যজীর পরিদর্শন। করাচীর স্বামী কৃষ্ণানন্দের জামীন-মুচলেখা না দিয়া এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড গ্রহণ। ব্লাডিভোষ্টক অঞ্চলে রুস সোভিয়েটের পুনঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। মিঃ লয়েড জর্জ্জের ম্যাঞ্চেষ্টারী বক্তৃতায় মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে বিলাতে শ্রীযুত আমীর আলির প্রতিবাদ।

৩০শে আশ্বিন—

স্বামী বিশ্বানন্দের নামে আবার রাজদ্রোহ ও জাতি-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ ; ধানবাদের বক্তৃতার জের। ভূপালের প্রজাগণের শিক্ষায় সাহায্য উদ্দেশ্যে স্থানীয় মহাপ্রাণ জেনারেল নবাবজাদা ওবাইদুল্লা খাঁ মহাশয়ের চার লাখ টাকা দানের সঙ্কল্প। খুলনা, মহেশ্বরপাশার ম্যালেরিয়া নিবারিণী সমিতির ব্যবস্থায় পল্লীসংস্কারের চেষ্টা।

১লা কার্ত্তিক—

দিল্লীতে সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর অধিবেশনে কামাল পাশার বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ ; কামালকে একখানি তরবারি ও আঙ্গোরা সরকারকে দুইখানি এরোপ্লেন দিবার সঙ্কল্প। কলিকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি। উত্তর-বঙ্গের বন্যা বিপন্নদের সাহায্যে কলিকাতা চিংড়ীহাটা রোডের তিনটি বালকের কালীপূজায় বাজী পোড়াইবার টাকা দান।

২রা কার্ত্তিক—

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর। বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ও তাঁহার খিচুড়ী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। বিলাতস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার সার উইলিয়াম মায়ারের লোকান্তর। বৃটিশ সৈন্যদলের জেনারেল জর্জ পেরিয়াস পিকিন হইতে যাত্রা করিয়া লাসায় আসিয়াছেন, তিনি পদব্রজে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য—বাঙ্গালার ইনস্পেক্টার-জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন খাঁ বাহাদুর আমীন উল ইসলাম ও বরিশালের চৌধুরী ইস্মাইল খাঁ উক্ত পরিষদে যাইবার পথে অম্বালায় দুই জন বৃটিশ সৈনিক কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নে সরকার পক্ষের উত্তর—এক জন আসামী সনাক্ত হইলেও মাননীয় সদস্যরা তাহাকে 'ক্ষমা' করিয়াছেন, কাজেই সরকারও কোন বড়াকড়ি করেন নাই।

৩রা কার্ত্তিক—

শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন ; এই সাহায্য দ্বারা মহিলা ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল তৈয়ারি করা হইবে। সিন্ধু নাউসেরার শক্তি মঠের তৃতীয় সম্পাদকের সশস্ত্রভাবে বে-আইনী জনতায় যোগদানের অপরাধে কারাদণ্ড। ভারতের অভিনন্দনে ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেসের সম্পাদক নেহেরুজীর নিকট আঙ্গোরার সন্তোষ প্রকাশ। ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হবার্টের (?) বিচারে সামান্য আঘাতের আসামী—কোন অসহযোগীর আপীলে অব্যাহতি ; ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতের বিচারের প্রতি কটাক্ষ ; রাজনৈতিক কারণে কিন্তু অনুরূপ অভিযোগে অতিরিক্ত শাস্তি অবিধেয়। গত কয় দিন হইতে আসামের বিভিন্ন কারাগার হইতে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের আসামী—নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে। জনৈক ভিক্ষুকের সমস্ত দিনের ভিক্ষালব্ধ

চাউল ও কোন 'ঝী'র একটি টাকা বেঙ্গল রিলীফ কমিটীকে দান। মিঃ বোনার ল নূতন বৃটিশ মন্ত্রি-সভা গঠনের ভার লইয়াছেন।

৪ঠা কার্ত্তিক—

১০৮ ধারায় অমৃতসরে স্বামী বিশ্বানন্দের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। লাহোর পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেকটর জেনারেলের মানহানির অভিযোগে জমীদার পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর উদ্দেশে পনেরো হাজার টাকার এক তরফা ডিক্রী; বিবাদীরা ইতিপূর্ব্বে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই। লাহোর জেল হাঙ্গামার ৯৯ জন আসামীর মধ্যে ৭৪ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পূর্ব্ব থে্সের তুর্ক কমিশনার কর্ত্তৃক তুর্ক নীতির ঘোষণা; আঙ্গোরা গণতন্ত্র অনুসারে শাসনকার্য্য চালাইবেন, খলিফাকে শাসন-ক্ষমতাচ্যুত করা হইবে।

৫ই কার্ত্তিক—

ঝান্সীর এক অস্থায়ী ষ্টেশনমাষ্টারের মৃত্যুতে তাঁহার যুবতী পত্নীর কেরোসিন সাহায্যে দেহত্যাগ। পারস্যে জনতা কর্ত্তৃক সরকারী অট্টালিকা আক্রমণ; গণতন্ত্রবাদীরা প্রধান মন্ত্রীর বিরোধী, তাহাদের বাধায় মুদ্রাযন্ত্র আইনও বিধিবদ্ধ হইতে পায় নাই।

৬ই কার্ত্তিক—

ভারত সরকারের আদেশে এঙ্গোরা সৈন্যদলে যোগদান নিষিদ্ধ। গুরুবাগে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২৯১২। তারণতারণের সভায় পুলিস রিপোর্টারদের বাধা দেওয়ার অপরাধে চার জন শিখ পুরুষ ও এক জন শিখ মহিলার ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। জামসেদপুরে ধর্ম্মঘটের অবসান। নর্থ ব্রিফ ষ্টেট হইতে "টাইমসে"র স্বত্ব ক্রয়।

৭ই কার্ত্তিক—

শিয়ালকোট জেলে লালা হংসরাজের স্বাস্থ্যহানি, শরীরের ওজন চল্লিশ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে পেটের দায়ে কন্যা-বিক্রয়ের সংবাদ, বিপন্নদের সাহায্যে চোরবাগান মল্লিক পরিবারের কুমার জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় ছয় মাস ধরিয়া প্রত্যহ চল্লিশ টাকা হিসাবে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দেহত্যাগ। কামালীদের দাবী-অনুসারে গ্যালিপলী হইতে গ্রীক সৈন্যদের প্রস্থান। জগলুল পাশা তাঁহার অবরোধের কারণ জানিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সুপ্রিম কোর্ট প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সিন্ধু, সাক্তিতির পঞ্চায়তী মুসাফিরখানায় পাঁচ জন অসহযোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাঁহারা মুসাফিরখানার বাহিরে বসিয়া থাকিবার সময়ে কার্য্যবিধির ১০৭ ধারায় গ্রেপ্তার। সুরাটের জনসাধারণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপালে টেক্স বন্ধের সঙ্কল্প।

৮ই কার্ত্তিক—

বঙ্গভঙ্গের সময়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে (পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া কারাদণ্ডে) দণ্ডিত শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মাদ্রাজ জেলে অবস্থান করিতেছেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও তিনি অব্যাহতি পান নাই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-শুল্ক বৃদ্ধির সঙ্কল্প। বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষা কমিটী স্থির করিয়াছেন, তথায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইবে। খড়্গপুরে কাপালিক কর্ত্তৃক নরবলির জন্য ছেলেধরার সংবাদ। মার্কিণে একটি বালিকার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ ও দর্শনের কায করার সংবাদ। গত এপ্রিল মাসে যুক্তপ্রদেশের বস্তী জেলায় অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সরকার পক্ষেয় ভয়প্রদর্শনে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় তদন্তের ব্যবস্থা; সরকার পক্ষের প্রতিবাদে অধিকাংশের ভোটে কমিটী গঠন স্থির! রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ই-আই রেলে দূরগামী কয়খানি ডাক ও এক্সপ্রেস ট্রেণ ছাড়া আর সব গাড়ীতে তৃতীয় ও মধ্যমশ্রেণীর কামরা য়ুরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য রিজার্ভ করা হইবে না বলিয়া আশ্বাস। রেঙ্গুনে শ্রমিক ধর্ম্মঘটে দাঙ্গা, ১৪ জন আহত; রিক্‌শা চালক, জাহাজঘাটার শ্রমিক, মিউনিসিপ্যালিটীর জলের কলের ও ড্রেণের শ্রমিক, মেথর, ট্রাম কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। বিলাতে পুরাতন পার্লামেণ্ট ভঙ্গ; নূতন মন্ত্রিগণের শপথগ্রহণ। এসিয়ামাইনরে গ্রীক পরাজয় সম্পর্কে রাজকুমার এণ্ডরুজ গ্রেপ্তার।

৯ই কার্ত্তিক—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় রাজনীতিক কয়েদীদের মুক্তি প্রস্তাবে সরকার পক্ষেয় আপত্তি; কয়েদীরা অনুতপ্ত নহেন বলিয়া তাঁহাদের মুক্তিতে আন্দোলন বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। নাড়াজোলের এক ডাকাতির সম্পর্কে একটি রমণী গ্রেপ্তার, সে নাকি ডাকাতদলের সর্দ্দারণী।

১০ই কার্ত্তিক—

পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলালের অস্ত্র রাখিবার পাশ রদ করায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন; সরকারকে না জানাইয়াই নাকি ঐ কার্য্য করা হইয়াছে; যেহেতু তাঁহারা সরকারকে উৎখাৎ করিতে সচেষ্ট। যতীন্দ্রনাথ ধারাকে পায়ে দলিয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া দিবার অপরাধে শ্যামপুকুর থানার এক জন কনেষ্টবলের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ঐ সম্পর্কে আর এক জনের ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড। এলাহাবাদে খৃষ্টান কনফারেন্সে খদ্দর গ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত।

১১ই কার্ত্তিক—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ, দায়রায় আসিবার পূর্ব্বে নিম্ন-আদালতেই সরকারপক্ষের ব্যবহারাজীব বাবদে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ। মালাবারে মোপলা-বিদ্রোহ মামলায় ছয় জনের প্রাণদণ্ড, তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অধ্যাপক রামমূর্ত্তি কর্ত্তৃক একটি ব্যায়াম শিক্ষাগার স্থাপনের সঙ্কল্প। ইটালীতে ফ্যাসিষ্টীদের বিদ্রোহ।

১২ই কার্ত্তিক—

থে্স হইতে শেষ গ্রীকদলের প্রস্থান।

১৩ই কার্ত্তিক—

শ্রীযুত জে, এম, সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম-কংগ্রেস-কমিটীর সভাপতির পদত্যাগের পত্র। আকালী মামলায় ৪০ জনকে বৃদ্ধ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে সরকারী রেলের হিসাবে প্রকাশ, আয় সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে চার কোটী ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। সঞ্জীবনীতে সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করায় সার্জেণ্টের নামে উকীলের চিঠি। হাসান-আবদাল রেল ষ্টেশনে আকালী কয়েদীদের স্পেশ্যাল ট্রেণের সম্মুখে শিখজনতা; ড্রাইভার গাড়ী না থামাইবার ফলে এগারো জন জখম। ইটালীতে ফ্যাসিষ্টী দল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-সভা সংগঠন। বিলাতে জেল-সংস্কারের সংবাদ। লসেনে সন্ধি-বৈঠক বসাইতে আঙ্গোরা গবমেণ্টের সম্মতি। বোম্বাই সরকার জানাইয়াছেন, য়ারবেদা জেলে মহাত্মা গন্ধীকে সাময়িক পত্র পড়িবার অনুমতি গত মার্চ্চ মাসেই দেওয়া হইয়াছিল, জেলের কর্ত্তা সে কথা না জানায় এত দিন মহাত্মাকে সে সুবিধা দিতে পারেন নাই।

১৪ই কার্ত্তিক—

শ্রীহট্ট জজ কোর্টের উকীল মৌলবী সিরাজুদ্দীন চৌধুরী পিউনিটিভ পুলিস ট্যাক্স না দেওয়ায় তাঁহার কতকগুলি জিনিষপত্র, শেষে আইন-বইগুলিও ক্রোক করা হয়; মৌলবী সাহেব পুলিসের এই ব্যবহারে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবার নোটীশ দেওয়ায় পুলিস কর্ত্তৃক ক্রোকের মাল ফেরৎ। গুরুবাগে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৩৮৪৬। বিদ্রোহী ফ্যাসিষ্টী-দলের রোম নগরে প্রবেশ। বিলাতে যুদ্ধের পর হইতে সিভিল সার্ভিসের চাকুরিয়াদের বেতনহ্রাসের ব্যবস্থায় গত সরকারী অর্দ্ধ বৎসরে ১০ কোটী লক্ষ বাঁচিয়া গিয়াছে; পরবর্ত্তী অর্দ্ধ বৎসরের জন্য আরও কাটছাঁট।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীবালগোপাল

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে। শিল্পী—শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

১ম বর্ষ } ২য় * মাঘ, ১৩২৯ * খণ্ড { ৪র্থ সংখ্যা

খদ্দর বলিতে আমি কি বুঝি ?

মহাত্মা গন্ধী-প্রচারিত খদ্দরের বাণী স্বরাজের আদর্শের সহিত একাঙ্গীভূতভাবে যুক্ত হইয়া দেশবাসীর নিকট যে কর্ত্তব্যের দাবী উপস্থিত করিয়াছিল, বৎসরাধিক কালের উত্তেজনার অন্তরালে পুঞ্জীভূত অবসাদের ভারে ভারাক্রান্ত মনকে আজ তাহার কতটুকু পালিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে। খদ্দরের শক্তিতে হীন-বিশ্বাস দেশবাসীর সমক্ষে আজ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি খদ্দরের প্রচারভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আরও অনেকেরই মত আমি খদ্দরের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার শিষ্য ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্রমাগত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিলাম, খদ্দর শুধু রাজনীতিক মুক্তিসাধনের অস্ত্র নহে,— খদ্দর মানব-জীবনের সহজ সরল গতির মূর্ত্ত প্রকাশ, ন্যায় ও সত্যের দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন আবরণ। খদ্দরকে আমাদের সাময়িক রাজনীতিক দ্বন্দ্বের প্রহরণরূপে ধরিব না। ইহাতেই আমাদের জাতীয়-জীবনের সমগ্র এবং পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। প্রথমতঃ—আমরা অনেকেই ভাবিয়াছিলাম, খদ্দরের আদর্শের অন্তরালে অতীতের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ আমাদের রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ—বিদেশী-পণ্য-বর্জ্জনেচ্ছাই খদ্দরের প্রচলন-চেষ্টার অন্যতম কারণ। এখনও অনেকে খদ্দরে কেবল জাতীয় অর্থনীতিক মুক্তিরই পথ দেখিতে পায়েন। কিন্তু জীবনের বাহুল্যবর্জ্জিত সামাজিক জীবনের দৃঢ়তা এবং ভারতীয় সভ্যতার সজীবতা, সেই বিস্মৃত বাণীই এই দেশে প্রচারের ভার খদ্দর গ্রহণ করিয়াছে।

অনেক কর্ম্মী বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হয় নাই বলিয়া আজ হতাশ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি মহাত্মার নির্দ্দেশমত খদ্দর বয়ন ও পরিধান করিতে পারিয়াছি? আমরা যদি খদ্দরকে শুধু রাজনীতিক মুক্তির অস্ত্রস্বরূপই দেখি, তবে কি ইহা আমরা পরিপূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিয়াছি?

যদি খদ্দরকে আমরা জাতীয় জীবনকে সুবিন্যস্ত করিবার উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, আজ উৎসাহ প্রশমিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া, জাতীয় জীবনের স্বচ্ছ অনাবিল গতি ফিরাইয়া আনিতে যদি আমরা প্রয়াসী হইয়া থাকি, যদি জীবন-যাত্রার শত অনাবশ্যক কোলাহলে ও বিরোধে অন্তঃসারশূন্য মনকে আবার অন্তর্মুখী করিয়া ভারতের জীবনধারায় সেই পুরাতন সরলতা ও সরসতা আনিতে আমরা প্রয়াসী হইয়া থাকি, তবে এক বৎসরের ব্যর্থ উদ্যমেই কি আমরা নিরুৎসাহ হইব?

আমি অর্থনীতিজ্ঞ নহি, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পল্লী-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি, একজোড়া হাতে তৈয়ারী খদ্দরের মূল্য মহাজনের উৎপীড়নত্রাসিত কৃষকের নিকট উপেক্ষার নহে। আঙ্গিনার গাছে উৎপন্ন তূলায় হাতে কাটা সূতায় তৈয়ারী খদ্দর কৃষক-পুত্রের এক মুষ্টি অধিক আহার্য্যের সংস্থান করে, পরিধেয় ক্রয় করিবার অর্থের জন্য তাহাকে শঙ্কিত চিত্তে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না। খদ্দর-বয়নে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার সময়ের সদ্ব্যবহারের মহামূল্য শিক্ষালাভ হয়। ফলে, দৈনিক জীবনের শত ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্য তাহাকে দোকানদারের শরণাপন্ন হইতে হয় না,—আত্মনির্ভরতা তাহাকে নিজের ছোটখাট অভাবগুলি মোচন করিতে প্ররোচিত করে।

দিনের অবকাশ-মুহূর্ত্তগুলির মূল্য কি? কোন্ কার-খানার মালিক ইহার জন্য মজুরী দিতে প্রস্তুত হইবে? কিন্তু বৎসরান্তে স্বাবলম্বনের ফলে যদি একখানি পরিধেয় বস্ত্রও হয়, তাহা হইলেও কম লাভ হইল না। আমরা শুনিয়া থাকি, সহরবাসীদের কঠোর জীবন-সংগ্রামে অবকাশের সময় নাই। ইহা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যে, হয় ত কাহারও কাহারও সময় অতি অল্প। কিন্তু অধিকাংশের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে নিরন্তর দারিদ্র্যে বস্ত্র-সমস্যায় কম ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। যদি তাঁহারা খদ্দর-বয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে কর্ম্ম-স্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে কি তাঁহাদের এই দুঃখ কিয়ৎপরিমাণেও লঘু হয় না? সহরবাসীদের কথা ধর্ত্তব্য নহে; দেশের শতকরা ৯৫ জন পল্লীবাসী। তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড। এই ৯৫ জনের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইহাদের সহায়তাতেই আমাদিগকে জাতীয় উন্নতির উপায় করিতে হইবে।

A bold peasantry their country's pride
When once destroyed, can never be supplied.

জাতিগঠনপ্রচেষ্টায় আমাদিগকে সভ্যতার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে হইবে। সম্মুখে ভবিষ্যৎ-আদর্শ যদি ধ্রুবতারার মত সমুজ্জ্বল না হয়, তবে কিরূপে আমরা সে কার্য্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব? জাতীয়-জীবন-দেবতার আহ্বান তূর্য্যনাদ যদি আমরা অন্তরে শুনিতে প্রয়াসী হই, তাহা হইলেই, পরস্পরবিরোধী বলিয়া বিবেচিত সকল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে; কাউন্সিল বর্জ্জন করিব, কি গ্রহণ করিব, সে বিচার মূল্যহীন অসার হইয়া উঠিবে। আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি, দৈনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যতটুকু রাজনীতি আমার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বিসমার্ক রাজনীতিকে Science of Opportunism বলিয়া অতি সত্য নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই সুবিধাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ব্যবহারিক রাজনীতি পরিচালনা করা হয় বলিয়া আজ আমাদিগকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছে। রাজনীতি কোন সীমা মানিয়া চলে না। রাজনীতিজ্ঞের মনোভাব অকপটে প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলে এ কথা সকলকেই বলিতে হইত। রাজনীতি কি সার্ব্বজনীন নীতি হইতে স্বতন্ত্র নীতি? যদি "অসহযোগ"কে আমরা নৈতিক ভিত্তির আশ্রয় হইতে নামাইয়া আনিয়া রাজনীতিক সুবিধা-তন্ত্রের আধার মাত্র বলিয়া গণ্য করি, তাহা হইলে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের এই বাণীর কি গ্লানি হইবে না? তেমনই ভবিষ্যবংশের শক্তির উৎস, নৈতিক দৃঢ়তা এবং অর্থনীতিক মুক্তির আদর্শ খদ্দরকে আমি রাজনীতিক অস্ত্র বলিয়া ভাবিতে পারি না। খদ্দর ব্যতীত যদি আমাদের স্বরাজলাভ হয়, তবে আমরা সে স্বরাজের যোগ্য কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। খদ্দর আমাদের কর্ম্ম-পটুতা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের বিশৃঙ্খল জাতীয় জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে। বিদ্বেষবিষশূন্য হইয়া তবেই আমরা সার্ব্বজনীন প্রীতি ও ঐক্য স্থাপনের অধিকারী হইব। যদি কখন অসহযোগ আন্দোলন অন্য কোন আকার গ্রহণ করে, তবুও খদ্দর আমাদের জাতির নিকট যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাতেই ইহার স্থান অটুট রহিবে। আমি জাপান, জার্ম্মাণী বা অন্য কোন দেশের ক্ষতি হইল, কি বোম্বাইয়ের লাভ হইল, তাহা বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করি না। কিন্তু খদ্দর বয়ন ও পরিধান করিতে যে আমার জন্মগত অধিকার আছে, তাহা কেন মনে করিব না? মহম্মদ কন্যাকে চরকা ও জাঁতা যৌতুক দিয়াছিলেন। পয়গম্বর বলিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূত্র-বয়নকারিণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিকা।

অনেকে মনে করেন, খদ্দর রুচি ও কলার আদর্শকে সঙ্কুচিত করিবে। যদি পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভিক্ষার উচ্ছিষ্ট

অন্ন লইতে প্রতিবাদ করা কলা ও রুচির বিরোধী হয়, তবে আমি রুচিহীন হইতে লজ্জা বোধ করি না। শিল্প-কলার অত্যুচ্চ আদর্শের নিদর্শন ঢাকার মসলিন কলে প্রস্তুত হইত না,—এমন কি, কারখানাতেও নহে। চরকা-কাটা সূতায় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আমি এখনও কিছু কিছু দেখিয়াছি।

প্রতি কলস্থাপয়িতা প্রায় দুই শত বা ততোধিক লোকের দারিদ্র্যের কারণ। মিলের কার্য্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। মনুষ্যকৃত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই মত ইহারও ত্রুটি আছে। দুর্নিবার প্রতিযোগিতার আবর্ত্তমোহ, বর্ত্তমান সুসভ্য জীবনের আনুষঙ্গিক বাহুল্য ও জটিলতাকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার সরলতা হারায়। ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ক্ষেত্র-অন্বেষণে প্রতীচ্যের সভ্যতার যে নগ্ন-মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, আমরা কি তাহারই অনুসরণ করিব ? মানবকে যন্ত্র হইতে পৃথক্ করিয়া না দেখার ফলে, এতদিন যাহারা অবনত-মস্তকে শত লাঞ্ছনার হীনতা নিজেদের প্রাপ্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল, আজ তাহারা মানবত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছে। পশ্চিম এই প্রশ্নের সমাধানে আজ ব্যতিব্যস্ত। আমরা কি আমাদের দেশে এই সমস্যারই সৃষ্টি করিব ? আমাদের দেশে, যতদিন পর্য্যন্ত মালিক শ্রমিকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, ততদিন প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্ক মধুর থাকায় কোন বিরোধ ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু বিপুল যৌথ-কারবার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ভোগ-বাসনায় মানুষ মানুষকে জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে ; তাহাতেই শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক শুষ্ক এবং প্রাণহীন হইয়া উঠিয়াছে। কুটীরশিল্পের পুনঃ-স্থাপনায় এই সম্বন্ধ আবার সরস হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহাতে শ্রমজীবীদিগের জীবনে মালিকের সহৃদয়তা নূতন মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিবে। শ্রমিক ও মালিকের একত্র জীবিকা অন্বেষণে সখ্য ও প্রীতি স্থাপিত হইবে। একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠতা সামাজিক জীবনের নূতন আদর্শ আনয়ন করিবে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করিয়া যে সাম্য ও মৈত্রীর সূচনা করিবে, তাহাতে পশ্চিমের সভ্যতার এই হলাহল অমৃত হইয়া দেশের জীবনীশক্তিকে নববলে বলীয়ান্ করিবে।

আজ মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত নবতন্ত্রে প্রভু ও ভৃত্যের একই বস্ত্র-বয়ন সম্ভব হইয়াছে। ভ্রান্ত সভ্যতার মরীচিকায় মানবের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের যে মহৎ আদর্শ আমরা হারাইয়াছি, ইহাতে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। আমি বহুবার প্রকৃত চরিত্রের উৎকর্ষে (Culture) এবং সভ্যতার পাশ্চাত্য বিকৃত মূর্ত্তিতে পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই বিভিন্নতা আমাদিগকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। জীবনের প্রকৃত মূল্য না বুঝাতে, বিজ্ঞান আজ বিড়ম্বিত ; সভ্যতার নামে বোঝা বহিয়া আমরা জীবন ভারাক্রান্ত করিতেছি। তাই বলিয়া, আমি বৃথা দার্শনিকতার পক্ষপাতী নহি। ব্যক্তি কিংবা জাতির আদর্শ-সন্ধানে সংগ্রাম অনিবার্য্য। সে সংগ্রাম আমরা করিব, কিন্তু পশ্চিমের অস্বাভাবিক কৃত্রিম উত্তেজনা বর্জ্জন করিব। উত্তেজনা মানবের কখন কল্যাণসাধন করে নাই। প্রকৃত কর্ম্ম-সংগ্রামই মানবজীবনকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায়। অতএব, কল্যাণপ্রদ কি না, বিচার করিয়া আমাদের কর্ম্মোদ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনায় অবসাদগ্রস্ত মনকে অধিকতর উত্তেজনার দ্বারা মুক্তি পাইবার আশায় আমরা যেন প্রযুক্ত না করি।

পল্লীগ্রামে কৃষকদিগকে বৎসরে ৪।৫ মাস সময় মাত্র ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অবশিষ্ট সময় তাহারা আলস্যে কাটায়। এই সময়ে খদ্দর-বয়ন প্রভৃতি অর্থকরী কায করিলে, দারিদ্র্যের কঠোরতার হ্রাস হইয়া ব্যক্তিগত, তথা জাতিগত, ইষ্ট সাধিত হইবে। উদরান্নের ও পরিধেয়ের সংস্থান না হইলে মানসিক উৎকর্ষসাধন করিবার অবসর কোথায় ?

খদ্দরে কি শুধু আমাদের বস্ত্র-সমস্যারই সমাধান হইবে ? ইহা কি গ্রামের সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতির কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে না ? পরস্পর এক কর্ম্মশৃঙ্খলে গ্রথিত পল্লীসমাজে, দালাল প্রভৃতির স্থান নাই। যদি আমাদের একজোড়া খদ্দরে বেশী অর্থ দিতেও হয়, তাহা হইলেও সেই অর্থ গ্রামেরই তন্তুবায়, কর্ম্মকার, শিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকিয়াই গেল ; এইরূপ শ্রেণীগত দারিদ্র্যের মোচনে এই খদ্দরই সহায়তা করিবে।

খদ্দর কৃষির সহিত যেরূপ এক সূত্রে গ্রথিত,

তাহাতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকে মনে করেন, কৃষিতে সমগ্র দেশের অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু কেবলমাত্র এক বাঙ্গালা দেশে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা চাষোপযোগী জমীর মধ্যে মাত্র ৬ কোটি ২৫ লক্ষ বিঘায় আবাদ হয়। তথাপি, আমাদের আহারের যথেষ্ট নাই। দুর্ভিক্ষ প্রতিবৎসরই আমাদের দ্বারে অতিথি। বিজ্ঞান রাষ্ট্র (State) এবং মালিকের (Capitalist) সেবায় আত্মদান করিয়া পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি প্রভৃতির উপায় আবিষ্ক্রিয়াতেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা সূর্য্যের অপর্য্যাপ্ত স্নেহরশ্মি লাভ করি। জীবন-সংগ্রামে ইহা আমাদের কম লাভের নহে। ইহাকে কার্য্যে লাগাইবার সহায়তা বিজ্ঞানকেই করিতে হইবে। কৃষির প্রসারেই উদরান্নের সংস্থান হইবে।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এডিনবরায় ছাত্র ছিলাম, তখন ধূমমলিন বারমিংহামের প্রতিনিধি মিঃ চেম্বারলিন বক্তৃতা দ্বারা দেশকে এই কৃত্রিমতার পথ ছাড়িয়া পুরাতন ইংলণ্ডের সহজ জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টিত ছিলেন। প্রত্যেক শ্রমজীবীর "৯ বিঘা জমী ও ১টি গাভীই" ইংলণ্ডের পুরাতন আদর্শ। বিগত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ইংলণ্ডের মনে আবার সেই পুরাতনের হারান সরল জীবনের শান্তির জন্য বেদনা জাগিয়াছে। আমরা আমাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিব। অন্ন এবং বস্ত্রের সংস্থান করিয়া আমরা জাতীয় জীবনকে জীবিত রাখিতে চেষ্টিত হইব; অনাবশ্যক বাহুল্যে জীবনকে দুর্ব্বহ করিব না। যন্ত্র-সভ্যতার ক্ষুধা যখন পশ্চিমের কয়লার খনি আর মিটাইতে পারিবে না, যখন জীবনের স্বেচ্ছাকৃত জটিলতায় সভ্যতা আপনি পথ হারাইয়া ফেলিবে, তখন প্রতীচ্যকে আবার এই প্রাচীর সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকাইয়া সভ্যতার নব-সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

উদ্ভট-সাগর।

ব্রাহ্মণ চিরকালই দরিদ্র। এ জন্য নারায়ণ ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মীকে ব্রাহ্মণের বাটী যাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন লক্ষ্মী না যাইবার কারণ দেখাইয়া কহিতেছেন :—

পীতোঽগস্ত্যেন তাতশ্চরণতলহতো বল্লভোঽন্যেন রোষা-
দা বাল্যাদ্বিপ্রবর্য্যৈঃ স্ববদনবিবরে ধারিতা বৈরিণী মে।
গেহং মে ছেদয়ন্তি প্রতিদিবসমুমাকান্তপূজানিমিত্তং
তস্মাৎ খিন্না সদাহং দ্বিজকুলভবনং নাথ নিত্যং ত্যজামি॥

সমুদ্র আমার পিতা, রত্নের আকর,
অগস্ত্য পূরিল তাঁরে পেটের ভিতর!
স্বামী তুমি নারায়ণ, জীবনের সাথী,
বুকের উপর তব ভৃগু মারে লাথি!
সরস্বতী আছে মোর প্রবল সতীন,
ব্রাহ্মণেরা তার গুণ গায় প্রতিদিন!
পূজিবারে তাহারাই দেব উমাপতি,
পদ্মবন ছিঁড়ি' মোর বাড়ায় দুর্গতি!
মনের দুঃখেতে তাই, ওহে নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের বাড়ী আমি না যাই কখন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী।

বিদ্যাপতির পদাবলী প্রথমে যখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন পদসংখ্যা দুই শতেরও কম। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলন ছাড়া বটতলাতেও পদাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে বিক্রয় হইত। আসল কথা, বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অন্য কথা লোক যেমন ভুলিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ পদেরও কোন হিসাব ছিল না। আমার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থে প্রায় এক সহস্র পদ আছে। তাহাতে মিথিলা হইতে আনীত তালপত্রের ও হস্তলিখিত অপর পুঁথির, নেপাল দরবারের পুঁথিখানা হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত তালপত্রের পুঁথির, পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বহুসংখ্যক পদ সংগৃহীত আছে। সঙ্কলনকালেই আমি জানিতাম, সমগ্র পদাবলী সংগৃহীত হয় নাই। কখনও যে হইবে, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না।

অবসরের অভাবে কয়েক বৎসর এ কাযে আর হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ কাব্যসমূহে বিদ্যাপতির অনেক পদ এখন পর্য্যন্ত অজ্ঞাতবাস করিতেছে। নূতন পদ খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ আয়াসসাধ্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ এইমাত্র বলিলেই হইবে যে, এক পদকল্পতরুতে তিন হাজার এক শত এক পদ আছে। এই কবিতা-অরণ্যের ভিতর হইতে প্রত্যেক পদ দেখিয়া বিদ্যাপতির রচনা বাছিয়া লওয়া অল্প পরিশ্রমের কায নহে। তাহা ছাড়া অন্য রকম অসুবিধাও বিস্তর আছে। সাধারণ ও সহজ ধারণা এই যে, যে পদে বিদ্যাপতির নামযুক্ত ভণিতা আছে, কেবল সেই পদগুলি তাঁহার রচিত। এই ধারণা আপাতদৃষ্টিতে প্রামাণ্য মনে হইলেও ভ্রান্ত। অনেক পদে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলেও ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা। বিদ্যাপতি বাঙ্গালা জানিতেন না, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে পারিতেন না। সুতরাং এই সকল পদ তাঁহার রচিত নহে, পদের শেষে তাঁহার নাম থাকিলেও সেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। নিজের রচিত পদেও সকল সময় বিদ্যাপতি নিজের নাম দিতেন না। তাঁহার কয়েকটি উপাধি ছিল, অনেক পদের ভণিতায় সেই সকল উপাধি আছে, কবির নাম নাই, যেমন নব জয়দেব, নব কবিশেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, কবিরত্ন, কবিকণ্ঠহার, দশ অবধান ইত্যাদি। আবার কতকগুলি পদে চম্পতি পতি, ভূপতি ও সিংহ ভূপতি আছে অর্থাৎ কবি নিজের নাম না দিয়া সঙ্কেতে শিবসিংহ অথবা অপর রাজার নাম দিতেন। এই সকল পদ বঙ্গদেশের বৈষ্ণব কবিতা-সংগ্রহে ও মিথিলায় প্রাপ্ত পুঁথিতেও পাওয়া যায়। ভণিতাশূন্য পদও অনেক আছে। শ্রেষ্ঠ কবির রচনার প্রধান প্রমাণ তাঁহার ভাষায় ও রচনার ভঙ্গীতে। এই বিশেষত্ব বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলীতে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তাঁহার পদাবলীর ভাষা ও রচনাকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে, তাঁহার রচিত পদে এবং তাঁহার অনুকরণে রচিত অপর কবির পদে প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাপতির পদ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেও পাঠবিকৃতি লইয়া বড় গোল বাধে। পদকল্পতরুর এবং অপর সঙ্কলন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠবিকৃতি সর্ব্বত্রই একরূপ। কারণ, যে ভাষায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করিতেন, সে ভাষা এ দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব পাঠ সংশোধন করিবারও উপায় নাই। একমাত্র উপায় মূল মিথিলা ভাষায় অভিজ্ঞতা ও সেই ভাষার সহায়তা।

আয়াসলব্ধ কয়েকটি পদ পাঠককে উপহার দিতেছি। একটি পদের অর্থশূন্য আরম্ভ এইরূপ-

অশনি কহতহি, তয়ানি পয়ে হাসি,
বিসরিদে বিষরাশয়া।

শেষের অর্দ্ধশ্লোক-

ইতি শাশ শুনি শুনি, কহত পুনি পুনি,
আকুল ভই বহু কালয়া।

এই পদের পাঠ সংশোধন করিয়া ও প্রাচীন বর্ণবিন্যাসের বিবৃতি রক্ষা করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি;—

(মাধবের প্রতি দূতী)

অইসনি কহতহিঁ তুঅ ন পএ হাসি
বিসরইত বিসোআসআ।
রঙন ভঙন সমান কানন
কঠিন করএ নিরাসআ ॥ ২।
অওধ আএল হঠ ন মানল
নয়ানে গরএ জলধারআ।
চাঁদে চঢ়ি জনি বেঢ়ি খঞ্জন
মুঞ্চ মোতিম মালআ ॥ ৪।
কুটিল কেসকলাপ খীন তনু
সখিনি জতনে নিবাধআ।
জনি উজোর হাটক ছাটি মনমথ
বান্ধি চামর চারআ ॥ ৬।
বহু দিন গেল বহু মাস ভেল
বহু বরিখ কতএ সমারআ।
নিজ নারি বিরহিণী জারি মাধব
সাধব কওন কাজআ ॥ ৮।
দূতি ভাস সুনি সুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কালআ।
নিজ নেহ গুনি গুনি গেহ জদুপতি
সিংহ ভূপতি ভানআ ॥ ১০।

১—২। (দূতী কহিতেছে) এমন করিয়া কহিতেছি, বিশ্বাস (দিয়া) বিস্মৃত হইতে তোর লজ্জা হয় না? রমণ-ভবন অরণ্যের সমান (হইল), নিরাশাতে কঠিন করিল (রাধার পক্ষে নিরাশা অসহ্য হইয়া উঠিল)। ৩—৪। (তোর ফিরিয়া যাইবার নির্দ্ধারিত সময়ের) সীমা আসিল। (তুই) হঠতাবশতঃ মানিতেছিস্ না (যাইতে স্বীকার করিতেছিস্ না)। (রাধার) নয়নে জলধারা ঝরিতেছে, খঞ্জন (নয়ন) যেন চন্দ্রে (মুখে) আরোহণ করিয়া, (মুখ) বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা (অশ্রুধারা) ত্যাগ করিতেছে। ৫—৬। রুক্ষ জটিল কেশকলাপ, ক্ষীণ তনু সখীগণ যত্নপূর্ব্বক সাজাইয়া (কেশ বেণীবদ্ধ ও অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া) রাখে, যেন মন্মথ উজ্জ্বল সুবর্ণের (দেহযষ্টির) কোড়া (কষা) বাঁধিয়া চমর (মৃগ) চরাইতেছে। ৭—৮। বহুদিন গেল, বহু মাস হইল, বহু বর্ষ কেমন করিয়া সম্বরণ করিবে? মাধব, নিজের বিরহিণী নারীকে দগ্ধ করিয়া কোন্ কার্য্য সাধন করিবি? ৯—১০। দূতীর কথা শুনিয়া শুনিয়া (মাধব) পুনঃ পুনঃ কহিল, বহু কাল (অতীত হইয়াছে আমি) আকুল হইয়াছি। সিংহ ভূপতি কহিতেছে, যদুপতি নিজের স্নেহ গণিয়া গণিয়া (স্মরণ করিয়া) গমন কর।

(দূতীর উক্তি)

নিজ করপল্লব দেহ ন পরসই
সঙ্কই পঙ্কজ ভানে।
মুকুর তলে নিজ মুখ হেরই সুন্দরী
সসি বোলি হরই গেয়ানে ॥ ২।
মাধব দারুন প্রেম তোহারি।
জে হম হেরল তেঁ অনুমানল
ভাগে জীবএ বরনারি ॥ ৪।
চন্দন সিতল অনল কনা সম
দেহ উঠল বিস্ফুকাই।
দীঘল নিসাসে পবন দরদাবই
জীবন কওন উপাই ॥ ৬।
কহ কবিশেখর ভল তুহুঁ নাগর
ভল তুয় পিয়ক আসে।
অপন মরম জনে এতেক নিঠুর পন
আনক কাজ কি ভাসে ॥ ৮।

১—২। নিজের করপল্লব দেহে স্পর্শ করে না, কমল অনুমানে শঙ্কিত হয়। মুকুরতলে সুন্দরী নিজের মুখ দেখিয়া চন্দ্র বলিয়া (মনে করিয়া) জ্ঞানহারায় (মূর্চ্ছিত হয়)। ৩—৪ মাধব, তোর প্রেম দারুণ, যাহা আমি দেখিলাম, তাহাতে অনুমান করিলাম যে, নারীশ্রেষ্ঠ ভাগ্যে বাঁচিয়া আছে। ৫—৬। শীতল চন্দন অগ্নিকণা তুল্য, দেহে ফোস্কা উঠিল, দীর্ঘ নিশ্বাসে পবন দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়, কোন্ উপায়ে (রাধা) বাঁচিবে? ৭—৮। কবিশেখর কহে, নাগর তুই ভাল (শ্লেষার্থে), তোর প্রিয়ার আশাও ভাল। আপনার মর্ম্মজনের প্রতি এত নিষ্ঠুরপণা, অপরের কথায় কায কি?

পদকল্পতরুতে রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহাবস্থা বর্ণনায় কবি বৈষ্ণব দাস এক স্থানে লিখিয়াছেন, "অথ চাতুর্ম্মাস্য বিদ্যাপতি ঠকুরস্য বর্ণনং।" সে বর্ণনা এই—

(রাধার উক্তি)

আঘন মাস　　রাস রস সায়র
নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিনিগন　　পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥ ২।
আওল পউখ　　তুসার সমীরল
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে　　ভোরি রহুঁ নাগর
করব কওন পরকার ॥ ৪।
মাঘ নিদাঘ　　কওন পতিআওব
আতপ মন্দ বিকাস।
দিনমনি তাপ　　নিসাপতি চোরাওল
কান্থ বিন্থ সঘন হুতাস ॥ ৬।
ফাগুনে গুনি গুনি　　গুনমনি গুন গন
ফাগুয়া খেলুন রঙ্গ।
বিরহ পয়োধি　　অবধি নহি পাইএ
দুরতর মদন তরঙ্গ ॥ ৮।

১—২। অগ্রহায়ণ মাস রাসরসের সাগর, নাগর মথুরায় গেল। পুররঙ্গিণীগণের মনোরথ পূর্ণ হইল; বৃন্দাবন অরণ্য হইল। (রাসলীলায় পুরস্ত্রীগণ অত্যন্ত কুপিত হইতেন। মাধবের বিহনে রাসের নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল, বৃন্দাবনে নিরানন্দ হইয়া তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল)। ৩—৪। পৌষ মাস আসিল, তুষারের ন্যায় শীতল সমীরণ, চন্দ্র হইতে অবিশ্রাম হিম-বর্ষণ হইতেছে। নাগরীর ক্রোড়ে নাগর ভুলিয়া রহিল, কি উপায় করিব? ৫—৬। মাঘ মাসে নিদাঘ কে প্রতীতি করিবে, সূর্য্যের বিকাশ মন্দীভূত। সূর্য্যের উত্তাপ চন্দ্র হরণ করিল, কানাই বিহনে হুতাশনের ন্যায় (দগ্ধ করিতেছে)। ৭—৮। ফাল্গুনে গুণমণি (মাধবের) গুণগ্রাম, ফাগ খেলিবার রঙ্গ গণিয়া গণিয়া (স্মরণ করিয়া) মদনতরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর বিরহ-জলধির সীমা (কূল) পাই না।

(দূতীর উক্তি)

মরমক বেদন　　দহন নিবারইত
জমুনা তীর জব গেলা।
কুঞ্জ কুটীর　　কদম্ব বন নিরখইত
দিগুন উতাপিত ভেলা ॥ ২।
হরি হরি কী কহব প্রেমক লাগি।
গুনি গুনি মুরুছি　　পড়লি ধনি তৈখন
উছলিত সত গুন আগি ॥ ৪।
সজল নয়নে　　বেঢ়ল সব সখীগন
ললিতা কয়লহি কোরে।
কমল পলাস　　সয়নে সখী বিজইতে
অঙ্গ তিতল দিঠি নোরে ॥ ৬।

১—২। মর্ম্মবেদন ও দহন নিবারণ করিতে (রাধা) যখন যমুনা-তীরে গমন করিলেন, কুঞ্জকুটীর ও কদম্ব-বন নিরীক্ষণ করিয়া দ্বিগুণ উত্তাপিত হইলেন। ৩—৪। হরি হরি, প্রেমের আঘাত (বেদনা) কি কহিব, ধনী তখন স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; (বিরহের) অগ্নি শত গুণ জ্বলিয়া উঠিল। ৫—৬। সখীগণ সজল নয়নে রাধাকে বেষ্টন করিল, ললিতা ক্রোড়ে লইল। সবুজ কমল-পত্রে শয়ন করাইয়া সখী বীজন করিতে চক্ষুর জলে অঙ্গ ভিজিয়া গেল।

(দূতীর উক্তি)

ঝর ঝর লোচনে নোর।
নাগর ভেল বিভোর ॥ ২।
ঘন ঘন তেজএ সাস।
আকুল ভেল পীতবাস ॥ ৪।
গদ গদ কহ আধ বাত।
ধূলি ধূসর ভেল গাত ॥ ৬।
ঐসন মুগুধ ভেল কান।
নব কবিশেখর ভান ॥ ৮।

১—২। লোচনে ঝর ঝর অশ্রু বহিতেছে, নাগর বিভোর হইল। ৩—৪। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, পীতবসন মাধব মুগ্ধ হইল। ৫—৬। গদগদ অর্দ্ধোক্তি করিতেছে, গাত্র ধূলিধূসরিত হইল। ৭—৮। নব কবি-শেখর কহিতেছে, কানাই এমনই মুগ্ধ হইল।

(দূতীর উক্তি)

জব রিতুপতি নব পরবেস।
তব তুহুঁ ছোড়লি দেস ॥ ২।

তাহে জত বিবিধ বিলাপ।
কহই হৃদয় মাহা তাপ ॥ ৪।
তবধরি বাউরি ভেল।
গিরিস সময় বহি গেল ॥ ৬।
তাহে জত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরএ বুক ॥ ৮।
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক জীবন লএ দন্দ ॥ ১০।
পুরুবক রাস বিলাস।
সুমরিতে ন বহ সাস ॥ ১২।
হিম সিসির বড় সীত।
দিন দিন উনমত চীত ॥ ১৪।
অব ভেল বহুত নিদান।
নব কবিশেখর ভান ॥ ১৬।

১—২। যখন ঋতুপতি বসন্তের নব প্রবেশ, তখন তুই দেশ ত্যাগ করিলি। ৩—৪। তাহাতে (রাধা) বিবিধ বিলাপ করিয়া হৃদয়ের মধ্যের যত তাপ কহিতেছে (প্রকাশ করিতেছে)। ৫—৬। সেই অবধি বাতুল হইল, গ্রীষ্ম বহিয়া গেল। ৭—৮। তাহাতে যত যত দুঃখ পাইল, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ৯—১০। শরতে নির্ম্মল চন্দ্র, তাহার জীবন লইয়া সংশয়। ১১—১২। পূর্ব্বের রাসবিলাস স্মরণ করিতে শ্বাস বহে না। ১৩—১৪। শীতকালে হিমে বড় শীত, দিন দিন চিত্ত উন্মত্ত হইতেছে। ১৫—১৬। নব কবিশেখর কহিতেছে, এখন অত্যন্ত শেষাবস্থা হইল।

রাসমণ্ডলে রাধার বীণাবাদন,—

(সখীর উক্তি)

নীরজনয়নী লেল বীন
সকল গুনক অতি প্রবীন
মধুর মধুর বাওয়ে তাল
বদন মদনমোহিনী।
ঝঙ্কত ঝঙ্কত ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ
অঙ্গভঙ্গি সোহিনী ॥ ২।
ললিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মন মোহনলাল
কহতহিঁ অতি ভলি ভাল
রাধা গুনশালিনী।
তরুনীগন এক ভেলি
সকল যন্ত্র করল মেলি
মুরলি খরলি দেওত কান
চমকি রাগমালিনী ॥ ৪।
মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর
অলিকুল তঁহি অতি সুস্বর
মুরলী ধুনি ঘন গরজনী
নাচত ময়ুর মাতিয়া।
বৃন্দাবন সুখদ ধাম
তঁহি বিহরই রাহি সাম
তরুনিগন বিমল বদন
গাওত কত ভাঁতিয়া ॥ ৬।
ফুলী অনিল বহই ধীর
ফুলি চলই জমুনা তীর
ফুলী কানন ফুলী মদন
ফুলী বয়নী সোহিনী।
ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাহি সাথ
অঙ্গ ভঙ্গ সরস রঙ্গ
কহত শেখর তুলহিনী ॥ ৮।

১—২। কমল-নয়নী মদনমোহন-বদনী সকল কলাগুণে অতি নিপুণ (রাধা) বীণা লইলেন। তাল মধুর মধুর বাজিতেছে। বীণা ঝঙ্কৃত হইতেছে, অঙ্গুলি চলিতেছে, অঙ্গ ঈষৎ দুলিতেছে, কুটিল নয়নে কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী শোভন। ৩—৪। ললিতা ললিত তাল ধরিতেছে, মোহনলাল কৃষ্ণের মন মোহিত হইতেছে; কহিতেছেন, ভাল ভাল, রাধা গুণশালিনী। তরুণীগণ এক হইয়া সকল যন্ত্র মিলাইল, কানাই মুরলীর স্বর দিতেছেন, রাগমালা চমকিত হইতেছে। ৫—৬। মত্ত কোকিল মধুর গান করিতেছে, অলিকুল সেখানে অতি সুস্বর দিতেছে, মুরলী ধ্বনির মেঘতুল্য গর্জ্জনে ময়ুর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বৃন্দাবন সুখদ ধাম, সেখানে রাধা-শ্যাম বিহার করিতেছেন, নির্ম্মলবদন তরুণীগণ অনেক ভাঁতিতে গান করিতেছে। ৭—৮। সুখকর বায়ু ধীরে বহিতেছে, যমুনাতীর উদ্বেলিত করিয়া চলিয়াছে, পুষ্পিত

কানন, মদন আনন্দিত, (রমণীদিগের) সুন্দর মুখ প্রফুল্ল। ললিতা মধুর কথা কহিতেছে, কানাই সরস অঙ্গভঙ্গে রঙ্গে রাধার সহিত নৃত্য করিতেছেন, শেখর (কবিশেখর বিদ্যাপতি) কহিতেছে (ইহার) তুলনা নাই।

(সখীর উক্তি)

অলসহিঁ নাগরি　　কুসুম সেজপরি
　সুতলি নাগর কোর।
কিয়ে রতিপতি তুন　　ভেল বানহ্‌ন
　কিয়ে হেরি রহল বিভোর ॥ ২ ।
　দেখ দুহুঁ নিন্দক রঙ্গ।
কনক লতাএঁ　　তমাল জনি বেঢ়ল
　চাঁদ সুরজ এক সঙ্গ ॥ ৪ ।
বয়নহিঁ বয়ন　　ভুজহি ভুজবন্ধন
　চরনহিঁ চরন বেআপি।
তড়িতহিঁ জড়িত　　জইসে নব জলধর
　সসিকর তিমিরহি ঝাঁপি ॥ ৬ ।
কনক মেরু জুগ　　নীল জলধি জলে
　ডুবল এহন অনুমানি।
ঐসন অপরুব　　কে করু অনুভব
　কহ কবিশেখর জানি ॥ ৮ ।

১—২। কুসুম-শয্যার উপর নাগরী আলস্যে নাগরের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইল। কিবা মদনের তূণ বাণশূন্য হইল, অথবা সে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। ৩—৪। দুই জনের নিদ্রার শোভা দেখ, যেন কনকলতা তমালকে বেষ্টন করিল, চন্দ্র সূর্য্য একত্র হইল। ৫—৬। মুখে মুখ, ভুজে ভুজ-বন্ধন, চরণে চরণ বেষ্টিত, যেন নব জলধর তড়িতে বেষ্টিত, তিমির শশিকিরণকে ঢাকিল। ৭—৮। এমন অনুমান হয়, স্বর্ণ মেরু-যুগল নীল সমুদ্র-জলে ডুবিল। কবিশেখর জানিয়া কহে, এমন অপূর্ব্ব কে অনুভব করিবে?

মিথিলা হইতে প্রাপ্ত অপর একখানি তালপত্রের পুঁথি হইতে আর একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এটি রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় নহে, বর্ষাকালে গৃহে পতির অবর্ত্তমানে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কোন স্বীয়া নায়িকা ননদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—

রতিআ ভেলি অধরতিয়া গে ননদী
　জলধর গরজএ ঘোর।
রসিয়া মোর পরদেসিআ গে ননদী
　দিন দোসে সুন ভেল কোর ॥ ২ ।
　করমহিনি হমেঁ ধনি রে ॥ ৩ ।
ছতিআ গড়লি পিরিতিআ গে ননদী
　পলাও ন বিসরএ মোহি।
ফিরি আওব কএ কিরিআ গে ননদী
　সরুপ কহঁও সখি তোহি ॥ ৫ ।
সপনা ভেল সুখ অপনা গে ননদী
　তহি তেজলিহু অবিচারি।
পনিআ বিহুঁনি নলিনিআ গে ননদী
　জৈসনি তৈসনি হমে নারি ॥ ৭ ।
হরবা বিনু সুন গরবা গে ননদী
　পহু বিনু সুনি বরনারি।
কুদিনা ফির ফির সুদিনা গে ননদী
　কহ বিদ্যাপতি অবধারি ॥ ৯ ।

১—২। হে ননদ, রাত্রি অর্দ্ধরাত্রি হইল, জলধর ঘোর গর্জ্জন করিতেছে। হে ননদ, আমার রসিক প্রবাসী, দিনের (কপালের) দোষে (আমার) অঙ্ক শূন্য হইল। ৩। আমি ভাগ্যহীনা রমণী। ৪—৫। হে ননদ, (আমার) হৃদয় প্রেমে গঠিত, আমি এক পলও বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। হে ননদ, ফিরিয়া আসিবার শপথ করিয়াছিলেন, সখি, তোকে সত্য কহিতেছি। ৬—৭। হে ননদ, আমার সুখ স্বপ্ন হইল, তিনি অবিচার করিয়া (আমাকে) ছাড়িয়া গেলেন। হে ননদ, সলিল বিহনে যেমন নলিনী, সেইরূপ আমি রমণী। ৮—৯। হে ননদ, হারশূন্য কণ্ঠ (যেরূপ, সেইরূপ) প্রভুশূন্য নারীশ্রেষ্ঠ। হে ননদ, কুদিন ফিরিয়া আবার সুদিন হইবে, বিদ্যাপতি অবধারিত কহিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কৈলাস-যাত্রা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভুটিয়াদের শীতনিবাস ধারচুলা প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার চড়াই চড়িতে আরম্ভ করা গেল। আজ আবার চড়াই বড় মন্দ ছিল না। বহু চড়াই ও উতরাই; এইরূপে ১০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া প্রায় ১২টার সময় খেলায় উপস্থিত হইলাম। এ স্থান প্রায় ৫ হাজার ফিট উচ্চ। এই স্থানে যাইয়া ডাকঘর অধিকার করিলাম। স্থান সুবিধার নহে; ক্ষুদ্র কুটীরের দোতালার উপর একটি অন্ধকারপূর্ণ ঘরে ডাক আফিস। মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সহিত পরিচয় ফলে বদ্ধাকাশ ও বদ্ধবায়ুপূর্ণ অন্ধকার গৃহ ভাল লাগিল না; যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ডাকঘর ছাড়িয়া একটু উপরে উঠিলাম। ক্ষুদ্র গ্রামের রাজপথে থাকিবার স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। P. W. D. কর্ম্মচারী পণ্ডিত ভোলানাথ যোশী মহাশয় রাস্তা-ঘাট দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত রাস্তায় দেখা হইল। থাকিবার স্থান অনুসন্ধান করাতে তিনি যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন, সেই স্থানে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রণ, দেশে বা বিদেশে সর্ব্বত্রই লোভনীয়। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের ধারাটা আজকাল বদলাইয়া গিয়াছে। এখন স্বার্থের দাস আমরা প্রতিবেশীকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর সেবায় তৎপরতা দেখাই। (অবশ্য এ কথাটা বনেদী বংশের পক্ষে নহে।) পণ্ডিতজীর আমন্ত্রণটা পরে ভোজন-নিমন্ত্রণে পরিণত হইল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল; আর ছিল নগর হইতে আনীত খাদ্য-দ্রব্য। সুতরাং ভোজনের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। ভোজনান্তে তিনি রাস্তা-ঘাটের কথা অনেক কহিলেন। আগের পথে একটা পুলের অবস্থা বড় খারাপ। তিনি আমাকে সাবধানে যাই-বার জন্য উপদেশ দিলেন। গারবাং এ থাকিবার জন্য সরকারী ঘরের কথা কহিলেন। তথায় আমার থাকিবার অসুবিধা হইবে না, ইত্যাদি বহু কথা কহিলাম।

হিমালয়ের তুষার দৃশ্য।

খেলা স্থানটি মন্দ নহে; পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত; নিম্নে ধবলী গঙ্গা। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষারদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে খেলার ঘৃতের, খুব ভাল বলিয়া সুখ্যাতি আছে।

১৭ই জুন প্রাতঃকালে খেলা পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১ হাজার ফিট নিম্নে নামিয়া ধবলী গঙ্গার তটে উপস্থিত হইলাম। ধৌলী গঙ্গাকে দরমা নদীও কহিয়া থাকে। ইহার তট দিয়া দরমা অভিমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। এ রাস্তা বড় দুর্গম; দুর্গম হইলেও দরমার ভুটিয়ারা এই রাস্তা দিয়া বাণিজ্যের জন্য গমনাগমন করিয়া থাকে। ধৌলী গঙ্গা, হিমালয়ের এ অঞ্চলের প্রচুর জলরাশি কালীর সহিত

মিলিত করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ধৌলীর পুল পার হইয়া এইবার প্রকৃত প্রস্তাবে ভুটিয়া দেশে প্রবেশ করিলাম। এখন হইতে কৈলাসের রাস্তার কঠোরতাও বুঝিতে পারা গেল। হাজার ফিট নামিয়াছি, এখন তাহা অপেক্ষাও বেশী খাড়াই উঠিতে হইবে। রাস্তাও ভাল নহে; বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে স্থানে স্থানে ধস ভাঙ্গিয়া ইহাকে অধিকতর ভয়াল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর আবার সময় সময় প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে পতিত হওয়াতে যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনাও সূচনা করিতেছে। যেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। সকলে একত্র মিলিত হইয়া নগাধিরাজকে আক্রমণ করা বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া আমরা পৃথক পৃথক হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রথম কুলীদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলাম। তাহাদের গতি ও বিধি দেখিয়া আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সঙ্কটপূর্ণ স্থান কুলীরা বেশ অতিক্রমণ করিল দেখিয়া, আমিও সাবধানতার সহিত দ্রুতবেগে নির্ভয়ে চলিতে লাগিলাম। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় একটি শিলাখণ্ড আমার পশ্চাৎ দিয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। পশ্চাতে না চাহিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শৈলরাজের লক্ষ্য ব্যর্থ হইলে তিনি আর প্রস্তর সন্ধান করিলেন না। আমরাও নিরাপদে তাঁহার মস্তকোপরি আরোহণ করিলাম। অপর পারে খেলার ঘরগুলি দেশালাইএর বাক্সের মত দেখাইতে লাগিল। ধৌলী গঙ্গা ক্ষুদ্র রেখার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

কালীর দৃশ্য।

দৃশ্যটি মন্দ নহে। পর্ব্বতের উপরিভাগে কতকটা সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অস্থকার অবস্থানস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল।

যে স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল, তাহার নাম সশা। ইহা চৌদাস পট্টির অন্তর্গত। প্রাচীনকালে এ সকল প্রদেশ চতুর্দংষ্ট্র গিরির অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইত। এই শব্দ হইতে চৌদাস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সশার ভুটিয়া পাটওয়ারী খুব ভদ্রতার সহিত আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্থানটি বেশ নির্জ্জন, ছোটখাট বাগানের মধ্যে। আকাশ নির্ম্মল থাকিলে এ স্থান হইতে সোর বা পিথোরা গড়ও দেখা যায়। তাহা এই স্থান হইতে সরল রেখায় ৪০।৫০ মাইলের কম হইবে না। কালী যে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই পর্ব্বতসমূহের মধ্যে একটা ফাঁকা যায়গা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ২।৩ ক্রোশের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে। এইরূপে দৃষ্টি বহুদিন হইতে আবদ্ধ ছিল। আজ অনেক দিন পরে বহুদূরদেশ নয়নগোচর হইল। দেশের সমতল ভূমি দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও পর্ব্বত সকল তাহার অন্তরায় হইতেছে।

সশা চৌদাস-বড় ভুটিয়া গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে ধ্বজ-যষ্টি শোভিত। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল স্থান অতিক্রমণ করিয়া আসিয়াছি, সে সকল স্থানের স্ত্রীলোকরা যেরূপ একটু বেশী সলজ্জ, এ স্থানে ভুটিয়া রমণীরা ততটা নহে। অত্যন্ত শীতের জন্য পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়।

তাহাদের পরিধানে কার্পাস-বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশমী কাপড়ের অধিক প্রচলন। এ স্থান ৮ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চে অবস্থিত; সুতরাং শীতও খুব বেশী। অন্য স্থানে এত শীত অনুভব করা যায় নাই। সন্ধ্যার সময় থার্ম্মমিটার দেখিলাম, ৬৫ ডিগ্রী নামিয়াছে। প্রাতঃকালে গমনকালে দেখিলাম, পারদ ৬০এ নামিয়াছে। এ স্থানে অন্ধ সাধুটির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি এ অঞ্চলে কিছু দিন থাকিয়া গরম কাপড় সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইবেন। এজন্য তিনি ভুটিয়া পল্লী হইতে কিছু কিছু অর্থ ও মৃগচর্ম্ম সংগ্রহ করিতে গমন করিয়াছিলেন। ভুটিয়ারা স্বভাবতঃ দয়ালু ও অতিথিপ্রিয়। কৈলাসযাত্রী সাধুসন্ন্যাসীরা ভুটিয়াদের উদারতা হইতে বঞ্চিত হয়েন না।

বিসূচিকাভীতি এ দেশবাসীদের মধ্যে বেশ ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছিল। তিব্বতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই রোগে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে এই ত্রাসের মাত্রাটা একটু বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। রাস্তার বহু স্থানে ইহাদের তাঁবু দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই রোগ যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অল্পই রোগ-মুক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে ভুটিয়ারা অনেক আগন্তুককে গ্রামে থাকিতে দেয় নাই; এখন কি, সময় সময় তাহাদের জলের ঝরণাও ব্যবহার করিতে দেয় নাই। সশা-চৌদাস হইতে প্রাতঃকালে পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। এই স্থানে আবার নূতন করিয়া কুলী সংগ্রহের জন্য একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কুলীকে কহিলাম, আজ সামখেলা পর্য্যন্ত গমন করিব। তাহাকে সেই স্থানের পাটওয়ারীর বাড়ীতে বোঝা লইয়া আসিতে কহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ সকল স্থানের লোকালয় সকল সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সঘন বলিয়া বোধ হইল। রাস্তার বহু নিম্নে ভুটিয়াদের বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর দেখিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে শস্যশ্যামল অনেক ক্ষেত্রও দেখিলাম। এ অঞ্চলে এ দেশের মসুর দাল প্রসিদ্ধ। আজ একটা উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইহার উতরাইএর শেষ সীমায় পার্ব্বত্য নদীর ধারে সামখেলা। রাস্তা হইতে একটু দূরে, এই রাস্তা বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। অচেনা লোকের পক্ষে ইহা বাহির করা একটু কষ্টকর। ভ্রমক্রমে সামখেলা অতিক্রমণ করিয়া নদী পার হইয়া ২ মাইল দূরে গালা বা গালাগড়ে গমন করিলাম। এই স্থানে ডাক পিয়নদের একটা আড্ডা আছে। সেই স্থানে আশ্রয় লওয়া গেল। ইহার নিকট এক ঘর দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিয়া থাকে। তাহার সাহায্যে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। মনে করিলাম, কুলীরা আমাকে সামখেলায় দেখিতে না পাইলে গালায় আসিয়া মিলিত হইবে।

যশোদা নাম্নী এক ভুটিয়া রমণী স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, কুলীরা আসিলে এই স্থানে রাত্রিবাস করা যাইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলীদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম, তাহাদের আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, দিবাও অবসানপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন আর এ স্থানে থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া, যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, সেই রাস্তা দিয়া নদী অতিক্রমণ করিয়া সামখেলায় উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্প অল্প অন্ধকারে কোনরূপে বহু কষ্টে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন সব সময়ই ক্লেশকর সন্দেহ নাই। এ যাত্রায় এরূপ ভাবে কখনও পিছু ফিরিতে হয় নাই। একটু ভ্রমের জন্য ক্লেশের সীমা রহিল না। নদীর উচ্চভূমিতে একটি কুটীরে আমার কুলীরা অবস্থান করিতেছিল। প্রধান মহাশয় আসিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন; ভোজনের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আজ প্রায় ১০ হাজার ফিটের পাহাড় উঠিতে হইয়াছিল। ৪ মাইল অনর্থক পথিভ্রমণ ইত্যাদি কারণে শরীরটা একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। রন্ধনের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া রাত্রিযাপন করিব, স্থির করিলাম।

রাস্তায় কুলীবিভ্রাট লাগিয়াই আছে। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল। এখন অভ্যাস হইয়াছে। এক জন কুলী বলিল, আমি আর অগ্রসর হইব না, আমার বোঝা বড় বেশী হইয়াছে। সে বোঝা বরাবর এক জন কুলীই আনিয়াছে। এখন তাহার জন্য আমি দুই জন কুলী করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং প্রধানকে এ সমস্যা দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি এক জন দৃঢ়কায় ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া আমাকে বাধিত করেন।

আবার প্রাতঃকাল হইল, আবার আমার গমনেরও আরম্ভ হইল। প্রধান মহাশয় ভোজন করিয়া যাইবার জন্য

অনুরোধ করিলেন; তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারাতে তিনি একটু দুঃখিত হইলেন। সামখেলা ৮।১০ খানি গৃহের সমষ্টি। গ্রামখানি একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার মত আগন্তুককে দেখিবার জন্য সুপ্তোত্থিত যুবক-যুবতীরা ঘরের বাহির হইতে লাগিল। তাহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহারা বেশ সুখস্বচ্ছন্দে আছে। গ্রামের আশ-পাশের শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে পথ অতিক্রমণ করিয়া আমার গন্তব্য রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। কয়েক মাইল গমনের পর নিরপানির প্রাচীন রাস্তা কুলীরা দেখাইয়া দিল। এ রাস্তা বড় দুর্গম, জল পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার নাম নিরপানি হইয়াছে। প্রত্যাগমনকালে আমাকে ইহার সঙ্কীর্ণ বিপদপূর্ণ রাস্তা দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সারদা বা কালীর অপর দৃশ্য।

কতিপয় মাইল উতরাইএর পর ভুটিয়া-নির্ম্মিত কালীর পুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহার এক পারে ইংরাজরাজ্য, অপর পারে নেপালরাজ্য। শীত-কালে ভুটিয়ারা ইহা প্রস্তুত করে; বর্ষাকালে যখন কালীর জল বাড়ে, তখন ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। পুল ভাঙ্গিয়া গেলে অগত্যা নিরপানির রাস্তা দিয়া আসিতে হয়। নেপালরাজ্যে প্রায় এক ঘণ্টা চলিতে হইয়াছিল। গমনকালে একটি জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। উচ্চ পাহাড়ের উপর জল পড়িতেছে। যে স্থানে জল পড়িতেছে, সে স্থানের প্রস্তর ক্ষয় হইয়া গহ্বরের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘণ্টা-খানেক পরে আবার ইংরাজরাজ্যে ফিরিয়া আসা গেল।
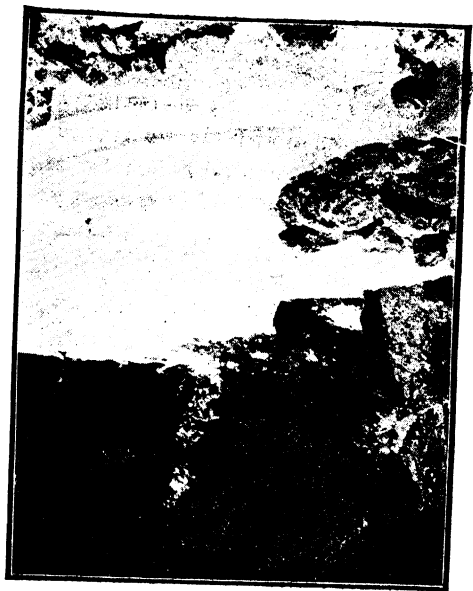
ভুটিয়া পুল।

কিয়ৎক্ষণ গমনের পর আর একটি জল-প্রপাত দেখা গেল। ইহা হইতে দেড় শত হাত নিম্নে প্রচুর ধারায় জল পড়িতেছে। কিয়ৎক্ষণ ইহার নিকটে বিশ্রাম করিয়া পুল পার হওয়া গেল। পুলটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে-পড়ে হইয়াছে। একে একে ভয়ে ভয়ে পুলটি পার হওয়া গেল। অদ্যকার রাস্তার শেষ ভাগটা বড়ই খারাপ, কোনরূপে ভগবৎকৃপায় তাহাও অতিক্রমণ করা গেল।

বহু কষ্টে, বহু চড়াই, উতরাই ও বহু পার্ব্বত্য নদ-নদী অতিক্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া মালপায় উপস্থিত হইলাম। ইহা প্রায় ৭ হাজার ফিট উচ্চে। এ স্থানে অধিক
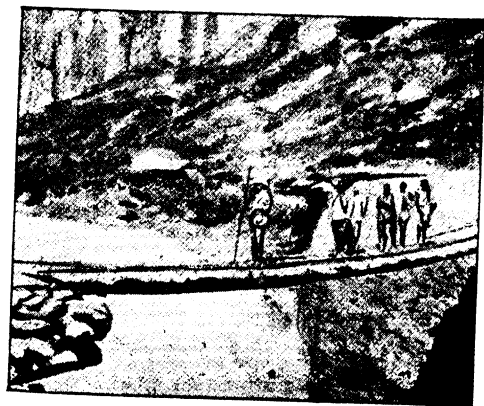
লোকালয় নাই। ইহা ডাক পিয়ন বদলাইবার একটা আড্ডা মাত্র। চতুর্দ্দিকে বন-জঙ্গল, নির্জ্জনতা যেন অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন।

পিয়নদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হওয়া গেল। তখন এক জন হরকরা আসিয়া তাহার ডাক অন্য হরকরাকে দিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আমরা কুলী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার জনতা বৃদ্ধি করিলাম। তাহার কুটীরে ২।১ জন লোক কোনরূপে থাকিতে পারে। কুটীরের কিয়দংশ রন্ধনশালা, অপরাংশ শয়ন ও ভাণ্ডার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কুটীরে থাকার সুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়া এই স্থানের স্বল্প নিম্নে নাতিবৃহৎ গুহার মধ্যে রাত্রিবাসের সঙ্কল্প করা গেল। এই গুহার এক পাশে একখানি পাতরের উপর আমি আমার শয্যা বিস্তার করিয়া তাহা অধিকার করিলাম। নির্জ্জনতা উপভোগের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী। সম্মুখে কালী যেন নৃত্য করিতে করিতে, কুলুকুলু শব্দে গান করিতে করিতে, কোন দিকে লক্ষেপ না করিয়া গমন করিতেছেন। কালী সারদা নামেও পরিচিতা। সারদার এই নৃত্য ও গীতের অভিনয় অনন্ত কাল ধরিয়া অভিনীত হইতেছে। এই গুহায় বসিয়া হয় ত কতশত যোগী ঋষি মহাত্মা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে এই অভিনয় দর্শন করিয়াছেন। আমার মত কতশত পথিকও যে কিয়ৎকালের জন্য স্বর্ণ ও সুন্দরীর ভাবনা ভুলিয়া গিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাস্তার ক্লেশের কথার একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু ইহার সুখের কথা একবারও কহি নাই। অত্যকার রাস্তায় নানা প্রকারের নয়নরঞ্জন পুষ্প ও তাহাদের নাসিকা-তৃপ্তিকর গন্ধের কথা উল্লেখ করি নাই। কতরূপ সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও পত্র যে দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। বর্ণের জন্য আমাদিগকে বিদেশীদের হাত তোলার উপর নির্ভর করিতে হয়। অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় যুবকগণের চেষ্টায় কত প্রকারের রং এই হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইতে পারিবে! আশা করা যায়, সমস্ত পৃথিবীও এক দিন তাহাতে রঞ্জিত হইতে পারিবে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর আবার যেন নূতন দেহ ফিরিয়া পাইলাম। পিয়নদের কাছে কিছু আলু পাওয়া গিয়াছিল, ভোজন বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। নক্ত ভোজন খেলার ঘৃতসিক্ত পরাটা আর আলুর তরকারী বড়ই উপাদেয় হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির যখন কৈলাসগমন করিয়াছিলেন, সে সময় ক্লেশসহনে অপটু ঔদরিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা কৈলাসযাত্রীর পক্ষে এখনও প্রযুক্ত হইতে পারে। সময় সময় আমাদের পক্ষে তাহার কিছু কিছু ব্যভিচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

ভিক্ষাভুজো নিবর্ত্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃড়্‌ধ্বশ্রমায়াস শীতার্ত্তি মসহিষ্ণবঃ॥
তে সর্ব্বে বিনিবর্ত্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্বান্নলেহপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥
তেঽপি সর্ব্বে নিবর্ত্তন্তাং যেঽপি সূদানুযায়িনঃ॥

"যাহারা ভিক্ষাভোজী, যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের ক্লেশ ও শীত সহিতে অপারগ, এরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্ত্তন করুন। যাঁহারা মিষ্টান্নভোজী, পক্বান্নপ্রিয়, লেহ্য পান ও নানা প্রকার মাংসভোজনে রত, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন। আর যাহারা পাচকের পশ্চাতে অনুগমন করেন, তাঁহারাও আসিবেন না।"

এই সকল দুঃখের সহিত সমর করিব বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। কেমন এক প্রকার তন্ময়তা আসিয়াছিল, তাহার ফলে এ সকল ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ হইত না। এইরূপ ক্লেশের ভিতর যদি ঈষৎ সুখের সঞ্চার হইত, তাহা হইলে তাহাতে আনন্দের সীমা থাকিত না। এই সামান্য আলু যে আনন্দ দিয়াছিল, বহু রাজার প্রাসাদের রাজ-ভোগ্য দ্রব্য সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িয়াছিল। মাথার কাছে ছাতিটি খুলিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া যেরূপ সুখে নিদ্রা হইয়াছিল, সেরূপ বুঝি আর কোথাও হয় নাই।

প্রাতঃকালের সঙ্গে আবার গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। মধ্য-হিমালয়ের যত মধ্যবর্ত্তী হইতেছি, ততই ইহার দুর্গমতা বুঝিতে পারিতেছি। যতই ইহার কঠোরতা উপলব্ধি করিতেছি, ততই যেন ইহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়মূল হইতেছে। পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বোচ্চ শিখরশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বক্ষে বহু বলের প্রয়োজন হয়। এই স্থান হইতে পর্ব্বতের গঠনপ্রণালীরও ব্যতিক্রম আরম্ভ

হইয়াছে। আজ ৯ হাজার ফিট উচ্চ বুধিতে অবস্থান করিতে হইবে। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। আমার মত পঙ্গুকেও তিনি শক্তি দিয়া হিমালয়বিজয়ে প্রবৃত্ত করিলেন। আলস্য আর ভয় মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। উদ্যমের ফলে আলস্য দূর হয়; আর একটু সফলতালাভের সহিত ভয়ও বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে অলসতা মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দীর্ঘ যষ্টির সাহায্যে শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলাম। রাস্তায় সময় সময় ভুটিয়া বা তিব্বতী ব্যবসায়ীরা বোঝাই মেষের দল লইয়া গমন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বলবান্ মেষের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে। সে দলের নায়ক হইয়া শৃঙ্খলার সহিত পর্ব্বতের চড়াই চড়িতেছে। স্থানে স্থানে ভারক্লান্ত মেষ বিবশ হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া ধুঁকিতে থাকে। সে দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ে বড় করুণা সঞ্চার হয়। কাতরতাব্যঞ্জক মেষের চক্ষুর্দ্বয় এখনও আমার মনে পড়িয়া থাকে। রাস্তার ধারে ব্যবসায়ীরা বোঝা সকল শ্রেণীবদ্ধ রাখিয়া রন্ধনাদি করিতে থাকে। সে সময় পরিশ্রান্ত মেষের দল কেমন আনন্দের সহিত সাগ্রহে তৃণাদি ভক্ষণ করে! সে সময় তাহাদের আনন্দ উপভোগ করিবার বিষয়। এইরূপ নানা বিষয় উপভোগ করিতে করিতে অন্ধকার চড়াইএর শেষ সীমায় উপস্থিত হওয়া গেল। চড়াইএর পর আবার নামিতে আরম্ভ করা গেল। মনে করিয়াছিলাম, আজই গারবাং যাইব। ক্লান্ত কুলীরা তাহাতে রাজী হইল না। আমিও বড় কম ক্লান্ত হই নাই। সুতরাং সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বুধির স্কুলগৃহে ডেরা ফেলা গেল।

বিসূচিকার ত্রাস এ অঞ্চলেও একটু একটু আসিয়াছে। কলেরার দেশ হইতে আমরা আসিতেছি, আমাদের সহিত মেলামিশি করা উচিত নহে, এ কথা লোক ভালরূপ বুঝিয়াছিল। কৈলাসযাত্রী আমরা, আমাদিগকে স্থান না দেওয়াও বড়ই দোষের, ইহাও তাহারা জ্ঞাত ছিল। উভয় দিক রক্ষা করিয়া গ্রামের উপরে স্কুলগৃহে থাকিবার পক্ষে তাহারা কোন আপত্তি করিল না।

আজ আর স্কুল বসিল না। আমাদের প্রতি সম্মান বা লোকের আত্মরক্ষার জন্য, কি কারণে স্কুল বন্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণ প্রবল হইয়া থাকিবে। স্কুলঘরটি মন্দ নহে বটে, কিন্তু পিশুতে পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাতা গেল। গ্রামের প্রধানকে ডাকিয়া পাঠান হইল। অনেক ডাকাডাকির পর প্রধানের পুত্র আসিয়া কহিল, প্রধান মহাশয় গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন। কোন বিষয়ে আমার অভাব ছিল না, সবই সঙ্গে ছিল। শাক-সব্জী ও কিছু দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য কহিলাম। বিশেষ কিছু পাইলাম না।

শ্রান্তি দূর করিবার পর স্নানের উদ্যোগ করিলাম। বহুদূরে—নিম্নে একটি ঝরণা আছে। গ্রামের পাশ দিয়া রাস্তা। গ্রামের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র একটা কুকুর আসিয়া আক্রমণ করিল। তিব্বতের কুকুর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এ কথা আগেই পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার রাস্তার সহচর—বন্ধু যষ্টি যদি সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে আমার কি দশা হইত, তাহা জানি না। একটা কুকুরের ডাক শুনিয়া গ্রামের আরও ২।৩টা কুকুর উপস্থিত হইল। কুকুরের সাহায্যের জন্য কুকুর আসিল, আমার সাহায্যের জন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দূরে ভুটিয়া রমণীরা জল আনিতেছিলেন, তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়া দ্রুতবেগে আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া একটু সাহস পাইলাম। তখন আমিও খুব দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলাম। রণে ভঙ্গ দিলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না, বরং সময় সময় আমি অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিয়াছিলাম। এই যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে রমণীরা আসিয়া সন্ধিস্থাপনে সহায়তা করিলেন। কুকুররা গ্রামের ভিতর গেল, আমিও স্নানের জন্য নিম্নে নামিয়া গেলাম। স্নানের পর সন্ধিভঙ্গভয়ে আর গ্রামের দিকে যাইলাম না, একটু ঘুরিয়া স্কুলগৃহে উপস্থিত হইলাম।

মধ্যাহ্নে আর নক্ত-ভোজনের কোন ত্রুটি হইল না। নিদ্রারও বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই। গৃহের মধ্যস্থলে অগ্নি প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রজ্বলিত ছিল। কুলীদের বস্ত্রের অভাব অগ্নির উত্তাপে দূর হইয়াছিল। প্রভাতের সহিত গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। শীতের প্রকোপটা খুব বেশী বোধ হইতে লাগিল। এত দিন যে বস্ত্রে শীত কাটিতেছিল, তাহা আর যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। সঞ্চিত সোয়েটারের, সদ্ব্যবহার করা গেল। বুধির নিকট বিদায়

লইয়া বড় রাস্তা ধরা গেল। আজ খুব খাড়া চড়াই চড়িতে হইবে। পর্ব্বতের শিরোদেশ যেন ঠিক মস্তকের উপর অবস্থান করিতেছে। আনন্দের সহিত উঠিতে লাগিলাম। আজ গারবাংএ উপস্থিত হইব; কৈলাস যাত্রার তৃতীয় পরিচ্ছেদ পূর্ণ হইবে। এই আনন্দলাভের জন্য পরিশ্রম বড় কম করিতে হয় নাই। বুধি হইতে গারবাং ৪ মাইল। এই ৪ মাইল যাইতে "কালঘাম" বাহির হইয়াছিল। পর্ব্বতের শিখরে উঠিবার সময় কপালে ঘর্ম্মানুভব হইয়াছিল। কিন্তু কপালে ঘামের কোন চিহ্ন রহিল না—ঘর্ম্মের পরিবর্ত্তে লবণ-কণিকা কপালে রহিয়া গেল। বহু কষ্টে যখন পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন আনন্দের সীমা রহিল না। উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বুধি যেন পদতলে এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। দূরের—বহু—বহু দূরের বনস্পতিমণ্ডিত পর্ব্বতশিখর সকল কেমন শোভা পাইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য বসিয়া উপভোগ করিবার জন্য প্রকৃতি সুন্দরী যেন শিলা সকল সুন্দররূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কুলীরা বিলম্বে উপস্থিত হইল। তাহাদের ক্লান্তি দূর হইলে আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল।

হিমালয়ের দেবদারু।

পর্ব্বতের উপর অনেকটা সমতল ভূমি ছিল। তাহাতে ভূমিসহ মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদে পীত, লোহিত, নীল বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, বহুমূল্যের গালিচা কোন বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনার জন্য পাতা হইয়াছে। মনুষ্য-নির্ম্মিত গালিচার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না! এই অতুলনীয় পুষ্পশয্যার তুলনা নাই। প্রকৃতি-সুন্দরী যেন নিজের মনের মত খেলা খেলিবার জন্য এই বিচিত্র কুসুমাস্তরণের রচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র শোভা উপভোগ করিতে করিতে পর্ব্বত-শিখরের অপর ভাগে উপস্থিত হইলাম। এ স্থান হইতে অদূরে অবস্থিত গারবাং আমাদের নয়নগোচর হইল।

পর্ব্বতের শিখর হইতে কিছু অবতরণ করিতে হইয়াছিল। একটি ঝরণা অতিক্রমণ করিয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এক সময় এ সকল প্রদেশ তিব্বতীয় প্রভাবের অন্তর্গত ছিল। এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। তিব্বতীয় কর্ম্মচারী যে স্থানে দুষ্টের প্রতি বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতেন, সেই শিলাখণ্ড এখনও পতিত রহিয়াছে। ভূত-যোনি হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য ইহার নিকট তিনটি শিলা রহিয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে "অপসর্পন্তু তে ভূতা" ভূতাপসারণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সমাজে দেখা যায়, কেহ সাহিত্যিক জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা রাজনীতিক জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কেহ বা আইন, চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে জীবন অর্পণ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বঙ্গীয় যুবকের ধর্ম্ম-জীবন প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে পূর্ব্ব হইতে নানা সম্প্রদায়ের বৈরাগী সন্ন্যাসী আছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় একটু ভিন্ন রকমের।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বৈরাগি-সন্ন্যাসি-জীবন সাধারণে বুঝে—"ভিক্ষা ক'রে খাওয়া," সামর্থ্যে কুলাইলে "ধ্যান ভজন করা" আর "পর্য্যটন করা।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ওরে, একটা লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়্লেই কি মস্ত হলো?" তাঁর অনুবর্ত্তিগণের প্রধান কর্ত্তব্য—শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে জীবরূপী শিবের সেবা। ঠিক ঠিক ত্যাগী না হইলে এ সব কায ঠিক ঠিক হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

যাহারা ভোগৈশ্বর্য্যে অভিনিবিষ্ট, আকৃষ্টচিত্ত, ঈশ্বরে তাহাদের বুদ্ধি যাইবেই না। সেই জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে প্রথমেই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। বাটী-ঘর, বাপ-মা, মান-সম্ভ্রম, পূর্ব্ব শিক্ষা-দীক্ষা, ইহকাল-পরকাল, "সর্ব্বং ভূঃ অপ্সু স্বাহা" বলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া প্রচার কার্য্যের অধিকারী হইতে হয়। ত্যাগী হইলে বুদ্ধি নির্ম্মল হইবেই। "আগ্‌লি পেছ্‌লি টান থাক্‌লেই বুদ্ধির ময়লা থাক্‌বেই।" সেই জন্য তিনি বলিতেন, "পূর্ব্ব

শিক্ষাদীক্ষা না থাক্‌লেও পবিত্র ত্যাগী হলেই ব্রেণ (মাথা) আপনা-আপনি খুলে যাবে।"

পূজ্যপাদ মহারাজ কেবল কথার উপদেশ ভালবাসিতেন না। তিনি উপদেশ খুব কমই দিতেন। "জীবন" তৈয়ারী তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। "জীবন" নাই, কেবল কথা, তিনি দেখিতে পারিতেন না। খুব লম্বা-চওড়া বোল, কিন্তু কোন কাযের নহে, এরূপ উপদেশের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অভিনব শিক্ষা-প্রণালী এই আক্ষরিক বেদ না শুনাইয়া, জীবনবেদ চক্ষুর সম্মুখে ধরা। লক্ষ পণ্ডিতে যাহা না পারিবে, একটি ত্যাগীর আদর্শ জীবনে তাহার চেয়ে বেশী কায হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন, প্রাচীনরা সর্ব্বক্ষেত্রে নানা শাখাগত উপনিষৎ সাধক-শিষ্যকে পড়িতে বলিতেন না। তাঁহারা "আধার বুঝে একটি আধটি মন্ত্র দিতেন—যেমন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' শিষ্য এই মন্ত্রমাত্র আজীবন সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ কর্‌বে।" তাঁহার শিক্ষার প্রণালী দেশের সম্মুখে, দশের সম্মুখে ত্যাগ জীবনের আদর্শ ধরা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ ছিল, "বনের বেদান্ত ঘরে আন্‌তে হবে।" ঘরে ঘরে ত্যাগের শক্তি, ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া দিতে হইবে, প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। সে জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইলে "লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়া" দরকার হইত না। নব যুগের এই নূতন সাধনা। নরই নারায়ণ। Humanity is Divinity.—নরের সেবাই নারায়ণের সেবা। উপনিষদে আছে,—

> "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ ত্বং কুমার উত বা কুমারী
> ত্বং জীর্ণেন দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোঽসি বিশ্বতোমুখঃ॥
> ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈমে কিতবা উত।"

তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী। আবার তুমি বৃদ্ধ হইয়া লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেছ। তুমি নানা রূপ হইয়াছ। দাস ব্রহ্ম, ধীবর ব্রহ্ম, আর এই সব ছলকারী দুষ্ট—এরাও ব্রহ্ম।

এইটি অভ্রান্ত সত্য বুঝিয়া ব্রহ্মদৃষ্টিতে জীবের সেবা করিতে হইবে। ত্যাগ, সত্য ও প্রেম এই সেবা-ব্রতের মন্ত্র। জীবসেবা অর্থে মাত্র কাঙ্গালীভোজন নহে বা রোগীর ঔষধ-পথ্যদান নহে; পরন্তু জীবের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, ধর্ম্মভাব উদ্দীপন, তেজ-বীর্য্য-ওজঃ প্রদান, শবরূপী জন-সঙ্ঘে চেতনাসঞ্চার। এই সব কাযে জীবের অধিকতর সেবা করা হয়। হীন পতিতকে উন্নত করা, তাহাকে মানুষ করিয়া গড়া, তাহার "হুঁস" আনিয়া দেওয়া, অতি উচ্চ অঙ্গের সেবা। সাংসারিক লোকের ন্যায় নিজ কায-কর্ম্ম হইতে ছুটী পাইলে পরোপকার-বুদ্ধিতে দেশের ও দশের কল্যাণ চিন্তা নহে। জীবে দয়া বলিলে তিনি চটিয়া যাইতেন; বলিতেন,—"জীবসেবা বল্।" ইহা একটি সাধনা।

এই সব কায সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার হইয়া করিতে হইবে। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমাকে অমুক Institution open (আশ্রমের প্রথম দ্বারোৎঘাটন) করতে বল্লে। আমি মনে মনে বল্লুম, ঠাকুর! তোমারই ভক্ত এসে থাক্‌বে? তোমারই পূজা কর্‌বে? আমার কি?" সব কায ঠাকুরের কায জানিয়া করিতে হইবে। নিজস্ব কিছুই নাই, নিজের লেনা-দেনা একটুও নাই।

আবার এই সব কায হাসিমুখে, স্ফূর্ত্তির সঙ্গে, আদরের সহিত করিতে হইবে; মহা গম্ভীর হইয়া, দাঁত-মুখ সিঁটকাইয়া, দম আট্‌কাইয়া, রক্ত মাথায় তুলিয়া করিলে চলিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ধর্ম্ম ত আর পেটকামড়ানি নয়।" বিশেষতঃ মা'র সন্তানদের শ্মশানও সুখবাসর; এই জ্ঞান সর্ব্বদা রহিবে। গাম্ভীর্য্য খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে প্রসন্নতা থাকিবে। তিনি নিজেও প্রসন্ন-গম্ভীর ছিলেন।

আবার সুচতুর কর্ম্মদক্ষ হইতে হইবে। এক একটি লোক আছে, যে কায দাও, কাযটি পণ্ড করিয়া বসিয়া আছে। এরূপ হইলে চলিবে না। ঠাকুর বলিতেন, "ভক্তই হবি; তা' ব'লে বোকা হবি কেন?"

সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ ভাব, পৃথক্ প্রকৃতি। বৈধর্ম্ম্যযুক্ত পরস্পর বিপরীত ভাবগুলির কেবল হৃদয় দ্বারা একত্র সমাবেশ করা যাইতে পারে, ভালবাসার দ্বারা—প্রেমের দ্বারা এক করা যাইতে পারে। ত্রিভুবন প্রেম দ্বারা বশ করা যায়। প্রেমের জয় সর্ব্বত্র। হৃদয়বান্ হওয়া একটি মহাশক্তি। ত্যাগীকে এই হৃদয়বত্তা বা প্রেমশক্তি বাড়াইতে হইবে।

আবার সেই ত্যাগীকে অসম্ভব বশ্যতা (Subordination)

অভ্যাস করিতে হইবে। প্রধান যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে হইবে। "তা মরতে বললে মরতে হবে।"

বোম্বাই বিভাগে একটি কলেজ আছে। তথায় ছাত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়; এবং ছাত্রগণ শিক্ষিত হইলে, সেই কলেজে সামান্য ভাতা লইয়া কয়েক বৎসর শিক্ষকের কার্য্য করিতে হয়। এই চুক্তিতে কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। এই কলেজের সহিত তিলক, গোখলে প্রভৃতি বহু বহু শক্তিমান্ পুরুষের নাম জড়িত। স্বামীর মঠেও কতকটা সেইরূপ ব্যবস্থা। কলেজের ছাত্রগণ যেরূপ উপযুক্ত হইলে ডিপ্লোমা বা উপাধি পায়, স্বামীর মঠে সেইরূপ সাধক উপযুক্ত হইলে "আনন্দ" উপাধি লাভ করিয়া মঠের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করে। নিজ মৎলবমত যাহা ইচ্ছা করিবার উপায় নাই। কারণ, সেই দিন হইতে তাঁহার গুরু দায়িত্ব হইল। মঠের ভবিষ্যৎ, মঠের উপকারিতা, জনসমাজে মঠের আদর, তাঁহার পবিত্র স্বার্থশূন্য জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাকে নিজের দীপ জ্বালিয়া, দ্বারে দ্বারে দীপ জ্বালাইবার জন্য বেড়াইতে হইবে। বলিতে হইবে, "হে গৃহবাসি! আমার প্রদীপ হইতে তোমার প্রদীপ জ্বালিয়া লও; তোমার গৃহের অন্ধকার দূর কর।" যে মঠ হইতে এই অবস্থা, উপাধি বা স্থান (Status) লাভ করিয়াছেন, সেই মঠের জন্য জীবন যদি তিনি না দেন, তাহা হইলে, তিনি অকৃতজ্ঞ। এইরূপ ধরাবাঁধা আইন।

এ দেশে মঠ, আখড়া, আশ্রম বহু আছে। মঠ একটি নূতন জিনিষ নহে। কিন্তু যে সকল মঠ আছে, উহাতে যাহাকে "ধর্ম্মজীবন" বলে, তাহা অতি অল্প। মঠধারী মোহান্ত গদীয়ান্ হইয়া বসিয়া আছেন। বিষয়ী লোকের ন্যায় কেবল জমীদারী রক্ষা করা তাঁহার পেসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ লাটের খাজনা, কাল পত্তনীর খাজনা, এ মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে, ও মহাল লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারের সহিত মামলা চলিতেছে, মামলা হাইকোর্টে হার হইয়াছে, বিলাত আপীল করিতে হইবে। কোন্ কৌন্সিলি ভাল? এই সব চিন্তাতেই দিন কাটিতেছে। কাযের মধ্যে কেবল কতকগুলি স্তুতিবাদকারী আশ্রিত সেবক প্রতিপালন। স্বামীর মঠ এ শ্রেণীর মঠ নহে। স্বামী জানিতেন, ২৪ ঘণ্টা ধ্যান-জপ করা চলে না। যাঁহারা উহার পক্ষপাতী, তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে মাত্র অলসতার প্রশ্রয় দিতেছেন। আলস্য মহাপাপের আকর। কুঁড়ে লোকের মাথা সয়তানের কারখানা। ইহা ধ্রুব সত্য। সে জন্য স্বামী সাধন-ভজনের সঙ্গে প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সাধকের নিজের কল্যাণ, সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও কল্যাণ। কর্ম্মই জীবনীশক্তি। যে স্থানে কর্ম্ম নাই, সে স্থানে জীবন নাই। যদি গতি না থাকে, বেগ না থাকে, সে নদী মরা। মরা নদীতে উপকার হয় না—অপকার হয়।

কেহ হয় ত বলিবেন, অর্থ না হইলে কোন্ ভাল কায করা চলে? কেহ ত রোজগার করিবে না, অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর, যাঁহারা ধর্ম্মসংস্থাপন করেন, তাঁহারা কারবারের প্রথা অনুযায়ী মজুত তহবীল আগে সঞ্চয় করিয়া আসরে নামেন না। তাঁহাদের দৈবী শক্তি। এই সব অনুষ্ঠানের পশ্চাতে "মহাশক্তি" "দৈবী শক্তি" আছেন। সেই শক্তিই মানুষকে ও অনুষ্ঠানকে চালান। সূত্রধারতনয় যীশুখৃষ্ট দ্বাদশ জন নগণ্য ধীবর শিষ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার প্রভুত্বকাল প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে চলিল; অর্থের ত কিছু অকুলান হইল না! স্বামী জানিতেন, এ ঠাকুরের কায। ঠাকুরের কাযে লোকের অভাব হইবে না বা অর্থের অনাটন হইবে না। কাহারও জন্য এ কায আটকাইবে না। তবে যে এই পুণ্যকাযে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার নিজেরই কল্যাণ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

অর্জ্জুন! ভাবনার কিছু নাই, এ সব আমি করিতেছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

রামকৃষ্ণ মিশনটি যাহাতে স্থায়ী হয়, পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি নিজেকে মিশনারী (প্রচারক) বলিয়া পরিচয় দিতেন। সাধু-তপস্বীর ভাব খুব থাকিলেও মিশনারী ভাবটা তাঁহার প্রবল ছিল। মুক্ত সাধু হইয়া, ভক্ত সেবক লইয়া আনন্দ করা, তাঁহার জীবনের গৌণকর্ম্ম ছিল। মিশনই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

লোকসমাজে যাইয়া, খুব জোরের সঙ্গে বল্ যে, আমার ভক্তের নাশ নাই।

নিজ উপদিষ্ট জ্ঞানপ্রচারের জন্য ভগবান্ যদুকুল সব নাশ করিয়া মাত্র উদ্ধবকে রাখিয়াছিলেন।

মদ্ বয়নং লোকং গ্রাহয়ন্ ইহ তিষ্ঠতু

আমার উপদিষ্ট জ্ঞান লোকসমাজে প্রচারের জন্য উদ্ধব এ স্থানে থাকুন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য, পদ্মপাদ প্রভৃতি চারি জন শিষ্যকে চারি ধামে বসাইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে" বলিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে একদিন বেড়াইয়াছিলেন। অর্জ্জুন, উদ্ধব, পদ্মপাদ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের মিশনারী। তাঁহারা অতি উদার ও অতি করুণ। তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জীবনে বুঝিয়াছিলেন, সেই সত্য সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক, তাহাতে জীবের কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র বাসনা। শ্রীউদ্ধবের ন্যায় পূজ্যপাদ মহারাজেরও একমাত্র প্রার্থনা ছিল,—

তাপত্রয়েণ অভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনি ঈশ।
পশ্যামি ন অন্যৎ শরণং তব
অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ অমৃতাভিবর্ষাৎ॥
দৃষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে
অস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়া অপবর্গ্যৈঃ
বচোভিঃ আসিঞ্চ মহানুভাব॥

হে ঈশ! ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপে তাপিত সন্তপ্ত জনের তোমার অমৃতবর্ষ পাদ-যুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য শরণ দেখিতেছি না। এই সংসার-কূপে মানুষ পতিত, কাল-অহি কর্ত্তৃক দষ্ট। সুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মানুষ উরুতৃষায় তৃষিত। হে মহানুভাব! কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর এবং অপবর্গবোধক বাক্যামৃত দ্বারা অভিষিক্ত কর।

তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মদ্গুরুঃ জগদ্গুরুঃ।"

তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের ভস্ম মাখিয়া ধুনী জ্বালিয়া নগ্ন অবস্থায় "শীতোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ" হইয়া কঠোর করিয়া মাত্র উত্তরাখণ্ডে প্রব্রজ্যার প্রয়োজন নাই। কারণ, তাঁহাদিগকে "আরণ্যক," "বনেচর" জীবন যাপন করিতে হইবে না। পরন্তু, তাঁহাদিগকে "সামাজিক" "গ্রামেচর" জীবন যাপন করিতে হইবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মাত্র নিজের আত্মার কল্যাণ নহে, পরন্তু, পূর্ব্বতন বৌদ্ধ ও খৃষ্টান মিশনারীর ন্যায় সমাজের, দেশের, দশের কল্যাণ-সাধন। বৌদ্ধ মিশনারীদের কীর্ত্তি এসিয়ার ইতিহাসে ক্ষোদিত। খৃষ্টান মিশনারীদের কীর্ত্তি বর্ত্তমান য়ুরোপের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত। এই সব ত্যাগী প্রথম প্রথম এতদ্দেশীয় সাধারণের দৃষ্টিতে নূতন ঠেকিবে। কালে ইঁহাদের উপকারিতা লোক উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই জন্য বলিয়াছি, পূজ্যপাদ মহারাজ বঙ্গীয় যুবকের অভিনব ধর্ম্ম-জীবন (Religious Career) খুলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।
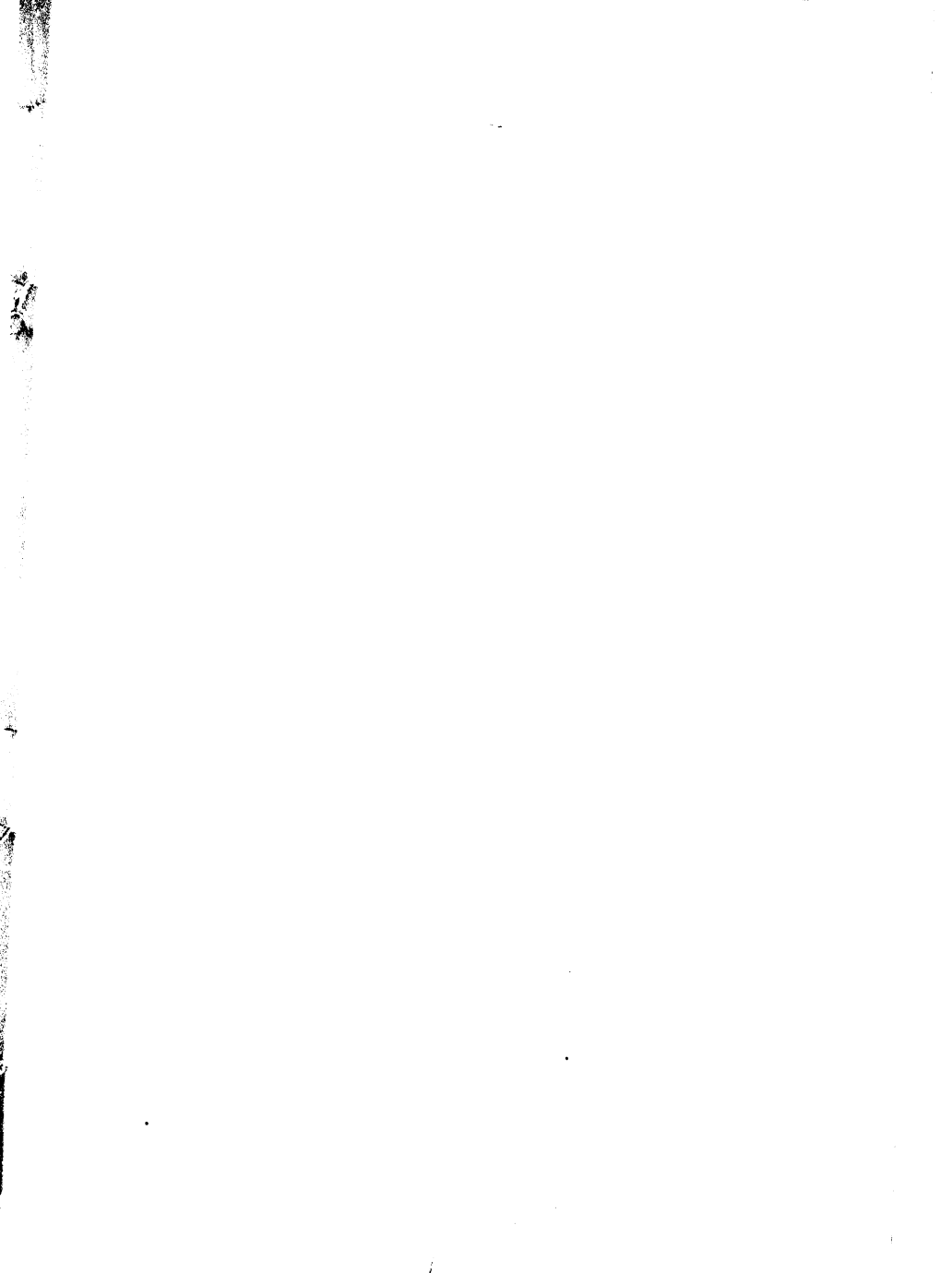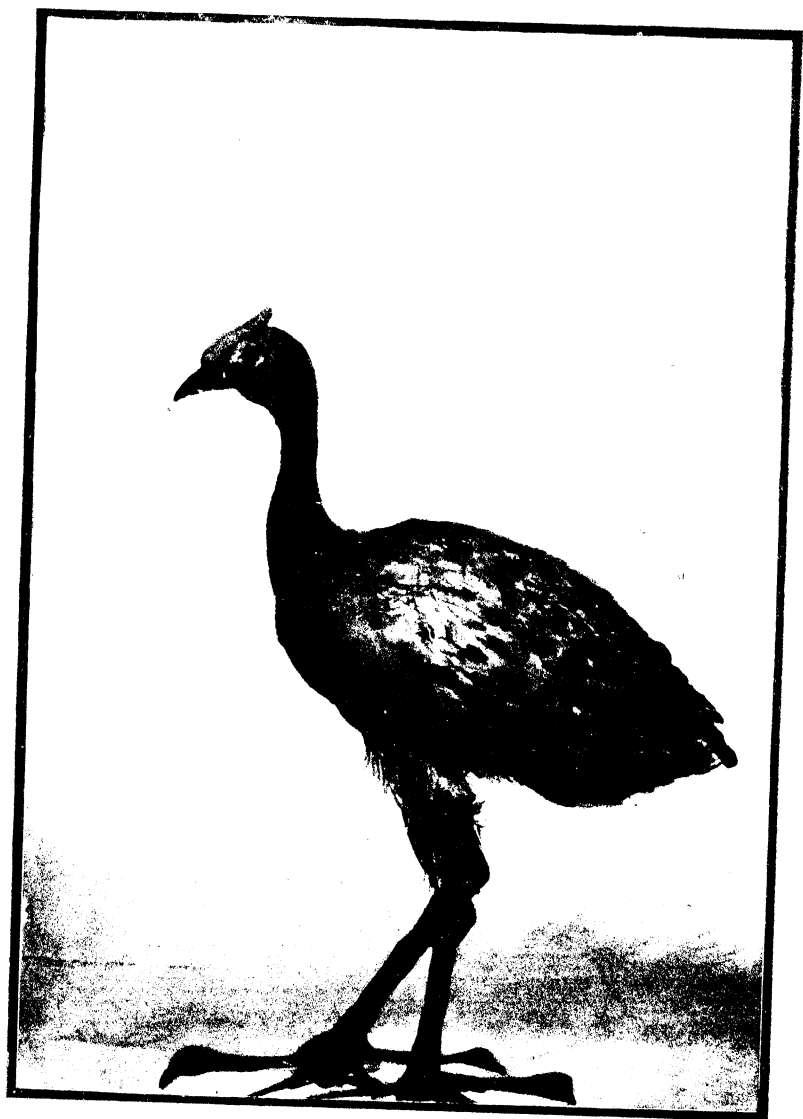
শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার 'ডাহুক' পাখী সম্বন্ধে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। সত্যচরণ বাবুর সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতে উৎসাহিত হইয়াছি। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে কোড়া পাখী সুপরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের, 'দাত্যূহ' ও 'কোযষ্টি' যে আমাদের চিরপরিচিত 'ডাহুক' এবং 'কোড়া', সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডাহুক ও কোড়া জলকুক্কুটপর্য্যায়-ভুক্ত বিহঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গের খাল বিল ও 'হাওর' * প্রভৃতি জলাশয়ে নানা জাতীয় জলকুক্কুট দেখিতে পাওয়া যায়। জলকুক্কুটদিগের মধ্যে ডাহুক ও কোড়াই শিকার ধরিবার জন্য পোষা হইয়া থাকে। ডাহুক ও কোড়া একপর্য্যায়-ভুক্ত জলকুক্কুট হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বিড়াল ও ব্যাঘ্র একপর্য্যায়ভুক্ত হইলেও উভয়ে যতটা প্রভেদ, ডাহুক ও কোড়ার প্রায় তদ্রূপই প্রভেদ। কোড়ার ন্যায় এমন দুরন্ত তেজস্বী পাখী অতি অল্পই আছে। কিন্তু এই সকল শিকারী পাখীর মধ্যে কোড়াই সর্ব্বপ্রধান। কোড়ার শিকার দেখিতে অতিশয় আমোদজনক। এই জন্য শিকারীদিগের নিকট কোড়ার মর্য্যাদাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ডাহুক পাখীকে অনেক সময়েই লোকালয়ের সন্নিহিত পুকুর কিংবা অন্য কোন জলাশয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু কোড়া কখনও এরূপ স্থানে আইসে না। কোড়া জলহীন নিভৃত স্থানে থাকিতেই অধিক ভালবাসে। জলজ উদ্ভিদের ঝোপের আড়ালে অথবা সবুজ ধান্যক্ষেত্রে অতি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া কোড়া আপন মনে বিচরণ করে। উহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। কোড়ার কণ্ঠনিঃসৃত গভীর ধ্বনি দ্বারা ঘনবিন্যস্ত তৃণলতাদির ঝোপের মধ্যে উহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। মাঝীরা যখন বিলের মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া যায়, যখন শিকারীরা বন্দুক স্কন্ধে করিয়া অতিশয় সন্তর্পণে বিলের তীরে বিচরণ করে অথবা ধীবররা মাছ ধরিতে জলে নামে, তখন সন্ত্রস্ত হাঁস, বক, পিপি, ডাহুক প্রভৃতি পাখী সশব্দে আকাশে উড়িয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া বসে; কিন্তু কোড়া ধীরপাদবিক্ষেপে জলজ গাছপালার ভিতর দিয়া নিকটবর্ত্তী ঝোপে নীরবে যাইয়া আশ্রয় লয়। বৃক্ষলতাদিশূন্য খোলা যায়গায় কোড়াকে দৈবাৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোড়ার অবয়ব কতকটা ডাহুকের মত। উভয়ের গ্রীবা এবং পদদ্বয় শরীরের তুলনায় দীর্ঘ। ডাহুকের পা বকের পায়ের ন্যায় অতিশয় সরু; কোড়ার পা তত সরু নহে। কোড়ার পা অধিকতর দৃঢ় এবং পেশীময়। এই সুদীর্ঘ পদযুগলই আপদ-বিপদে কোড়ার আক্রমণের ও আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। লম্বা পায়ের সাহায্যে কোড়া এত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিতে পারে যে, উহাকে ডাঙ্গায় দৌড়াইয়া ধরা মানুষের সাধ্যাতীত। জলজ তৃণলতা ও পানার উপর দিয়া কোড়া এত বড় শরীর লইয়া এরূপ দ্রুতগতিতে হাঁটিয়া যায় যে, সে দৃশ্য না দেখিলে অনুমান করা যায় না।

সাধারণতঃ কোড়া আয়তনে ডাহুক হইতে কিছু বড় হয়। ডাহুক অপেক্ষা কোড়া দেখিতেও সুন্দর। একটি পূর্ণবয়স্ক কোড়া প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। পশ্চাদ্দিক্ হইতে দেখিলে উহাকে ঠিক ময়ূরীর মত দেখায়। কোড়ার পায় ৪টি সুদীর্ঘ অঙ্গুলী। প্রত্যেক অঙ্গুলীর অগ্রভাগে বক্র এবং অতিশয় ধারাল নখ আছে। অঙ্গুলী ও

---

* 'হাওর' শব্দ সাগর বা সায়র শব্দের অপভ্রংশ। ময়মনসিংহ জিলায় বহুসংখ্যক বিস্তৃত হ্রদের ন্যায় জলাশয় আছে; ইহাদিগকে 'হাওর' বলে। 'হাওর' বৃহৎ বিলেরই নামান্তর। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের "বড় হাওরের" ব্যাস প্রায় ৭।৮ মাইল হইবে।

পায়ের গাঁটগুলি বেশ মজবুত। এই জন্য কোড়ার পায় এত জোর। ইহার লেজ হ্রস্ব, গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত কাল পালকে আবৃত; পিঠের ও লেজের পালকের মধ্য-ভাগ ঈষৎ কৃষ্ণ; কিন্তু দুই প্রান্ত হরিদ্রাভ; মাথার পালক ধূসরবর্ণ; চঞ্চুপুট প্রায় দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ; চঞ্চুর রং ঈষৎ কাল। চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র, কিন্তু উজ্জ্বল। পুং-কোড়ার একটি বিচিত্র শিরোভূষণ আছে, তাহা স্ত্রী-কোড়ার নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গে পুং-কোড়াকে শুধু কোড়া এবং স্ত্রী-কোড়াকে কোড়ী বলে।

কাকাতুয়া, ময়ূর, মোরগ ও বুলবুল প্রভৃতি পাখীর মাথায় কতকগুলি দীর্ঘ পালক আছে, উহাকে 'ঝুঁটি' বলে। কোড়ার শিরোভূষণকে এই অঞ্চলে 'চটি' বলে।

পূর্ব্বোক্ত পাখীদিগের ঝুঁটি ও কোড়ার চটিতে অনেক পার্থক্য আছে। ঝুঁটি পালকের সমষ্টিমাত্র; কিন্তু 'চটি' পালকের সমষ্টি নহে; উহা দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ ও সিকি ইঞ্চি চওড়া একটি স্ফীত মাংসখণ্ড। 'চটি' ঝুঁটির ন্যায় মাথায় গজায় না। ইহা কোড়ার চঞ্চুর গোড়া হইতে ঊর্দ্ধ-দিকে উঠে। মাথা ছাড়াইয়াও উহার অগ্রভাগ চুলের ন্যায় কিছু দূর উপরে লম্বিত থাকে; ঠিক যেন একটি চূড়া। আকারে ও বর্ণে ইহা ঠিক সুপক্ক লাল লঙ্কার ন্যায় দেখা যায়। এই আরক্তিম অপূর্ব্ব চটিটি কোড়ার চেহারার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

কোড়ার পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র শিরোভূষণ বৎসরের সকল সময় থাকে না। বৈশাখ মাসে চটি দেখা দেয় এবং শ্রাবণ-মাস পর্য্যন্ত থাকে। ইহার পর চটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন চটির স্থানটিতে কেবল হরিদ্রাবর্ণের ফিতার ন্যায় একটি চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান থাকে।

চৈত্র বৈশাখ মাস আসিলেই কোড়া তাহার বিলুপ্ত সম্পদ পুনঃ প্রাপ্ত হয় এবং তখন আবার সেই চটি ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার পূর্ব্বেই কোড়ার দেহে আবার নবীন কান্তি ফুটিয়া উঠে। তখন পুরাতন পালক পড়িয়া গিয়া আবার চাক্‌-চিক্যময় উজ্জ্বল নূতন পক্ষ উদ্‌গত হয়। বাস্তবিক তখন কোড়ার দেহে নবযৌবনশ্রী বিকাশ পায়; সর্ব্বাঙ্গে শক্তি ও সজীবতার সঞ্চার হয়; প্রবল আবেগ ও স্ফূর্ত্তিতে উহাদের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে; যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর উহারা বুকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, তাই প্রায় ৮ মাস কাল নীরবে থাকিয়া সহসা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে গম্ভীর ধ্বনিতে বন-ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। ভাদ্র হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত কোড়া একবারে নীরব থাকে। সেই সুদীর্ঘ সময় যে কোড়া নীরবে কোথায় অজ্ঞাত বন-বাসে দিনযাপন করে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কণ্ঠ-স্বরই উহার আগমনের বার্ত্তা প্রচার করে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষার সূচনা হয়। তখন পাহাড় হইতে বৃষ্টির জলরাশি নামিয়া আইসে; প্রায় খাল, বিল ও 'হাওর'গুলিতে নূতন জল দেখা দেয়। পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয়গুলিতে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করে; নানা জাতীয় জলচর পক্ষী সকল আসিয়া, কলধ্বনিতে কানন-কান্তার মুখরিত করিয়া তুলে। নবজলোচ্ছ্বাসের সহিত বিহঙ্গগণ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তখনই নানা বিহঙ্গের সুললিত কাকলীর মধ্যে সহসা গম্ভীর গুর্ র্ র্ র্ ডুপ্, ডুপ্, ডুপ্, ধ্বনি আকাশে উত্থিত হইয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বনে বনে সেই গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ব্যাঘ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইলে, প্রথমে গর্ গর্ শব্দ করে, পরে গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠে; কোড়ার ডাকও অনেকটা সেইরূপ। পোষা কোড়াগুলির সম্মুখে হাতে তুড়ী দিলেই উহারা রাগিয়া ঘন ঘন ডাকিতে থাকে। কোড়ার ডাকে মধুরতা নাই বটে, কিন্তু উহা কাকের ধ্বনির ন্যায় কর্কশ নহে। ইহাতে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব আছে। অনেকক্ষণ শুনিলেও বিরক্তি ধরে না। এই ধ্বনি অতিশয় দূরগামী। অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী পল্লী-গৃহ হইতে ইহা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কোড়া গ্রীবা বক্র করিয়া প্রথমে আস্তে আস্তে গুররর্‌র্ শব্দ করে, তাহার পর বহুবার ডুপ্, ডুপ্, ডুপ্, ধ্বনি করিতে থাকে। আবার থামিয়া গুররর্‌র্ শব্দ করে, তাহার পর পুনরায় ডুপ্, ডুপ্, ডুপ্ শব্দ করে। উহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উত্থিত হয়।

ডাহুক ও ডাহুকী উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। কিন্তু কেবল কোড়াই ডাকে, কোড়ীকে কখনও শব্দ করিতে শুনা যায় না। ডাহুকী যখন ডিম্ব প্রসব করিয়া উহাতে 'তা' দেয়, তখন দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত উচ্চৈঃস্বরে 'কোয়াক্' 'কোয়াক্' ধ্বনি করিতে থাকে; কিন্তু কোড়ী

নীরব থাকে। কোড়ী ডাকেও না, শিকারও ধরে না। এই জন্য কোড়ী কেহ পোষে না, কোড়া পুষিয়া থাকে।

বৈশাখ হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত কোড়ার যৌন-সম্মিলনের সময়। এই কালেই কোড়ী বাসা নির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ বিলের চারিদিকে রোপিত 'বাওয়া' ধানের ক্ষেতেই ইহারা বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ধানের গুচ্ছ-গুলি গুটাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করা সহজ বিধায়, কোড়ী ধানক্ষেতেই অধিক পছন্দ করে। কোড়ী এককালে ২টি হইতে ৭টি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি দেখিতে পায়রার ডিম্বের মত, কিন্তু বর্ণ সাদা হয় না; কতকটা ছাই-এর রঙ্গ। আর ডিম্বের গায় লাল বর্ণের ছিটাফোঁটা দাগ থাকে। ডিম্ব-প্রসবের ২০।২১ দিন পরে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

কোড়ার ছানা বাসা হইতে ধরিয়া আনা অতি দুষ্কর। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইবার পরই অন্য প্রাণীর শব্দ পাইলে অমনই বাসা হইতে লাফাইয়া জলে পড়ে, এবং জলজ উদ্ভিদ ও তৃণাদির মধ্যে এমন ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, কেহ উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আমি বহু অভিজ্ঞ শিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কোড়ার ছানা বাসা হইতে ধরিয়া আনা অতিশয় কঠিন কায। মোরগের ছানা ডিম হইতে ফুটিয়াই ছুটাছুটি করে এবং নিজ চেষ্টায় খাদ্য তুলিয়া আহার করে। কুম্ভীর, কচ্ছপ, সরীসৃপ প্রভৃতির ছানাও ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। একদিন একটি টিক্‌টিকির ডিম আমার ঘরের মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিবামাত্র একটি ছানা বাহির হইয়া দ্রুতগতিতে খাটের নিম্নে পলায়ন করিল।

কোড়া পাখীর ছানা ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইলে পর, কিছুদিন পর্য্যন্ত জননী উহাদিগকে আহার সংগ্রহ করিয়া দেয়; এবং জননীর সহিত উহারা বাসাতেই বাস করে। কিন্তু সহজে উহাদিগকে ধরা যায় না। জলে সামান্য শব্দ হইলে, অথবা কোড়ার বাসার নিকটবর্ত্তী তৃণাদি নড়িলে, অমনই ছানাগুলি জলে পড়িয়া ডুব দেয়।

কোড়া পাখীর গুরু-গম্ভীর ডাকে মুগ্ধ হইয়াই হউক, অথবা কোড়া পাখীর লড়াই দেখিবার জন্যই হউক, অথবা উহার সাহায্যে শিকার করিবার জন্যই হউক, যখন মানুষের মনে কোড়া পাখী পুষিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, তখন উহার ছানা ধরিবার জন্যও নানা প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। শেষে যখন দেখা গেল, কোড়া পাখীর ছানা ধরা সহজ নহে। তখন অন্য উপায় উদ্ভাবিত হইল। মানুষের বুদ্ধির নিকট পাখীর শক্তি পরাজিত হইল। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে বহু লোক সখ করিয়া কোড়া পুষিয়া থাকে। এই অঞ্চলে অনেক বিল ও 'হাওর' থাকায় কোড়ার অভাব হয় না। বর্ষার সমাগমে বহুসংখ্যক কোড়া আসিয়া বিলে-ঝিলে বিচরণ করিতে থাকে। যাহারা কোড়া পুষে, তাহারা এই সময়ে কোড়ার বাসার অনুসন্ধানে বাহির হয়। বাসা খুঁজিয়া পাইলে, উহাতে ডিম আছে কি না, দেখে। বৈশাখমাসে অতি অল্পসংখ্যক কোড়ী ডিম পাড়ে; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়মাসেই অধিকাংশ কোড়ী ডিম পাড়িয়া থাকে। বাসায় ডিম পাইলে কোড়াপালকগণ তাহা বাড়ীতে লইয়া আইসে।

একটি নারিকেলের মালার অর্দ্ধাংশে তুলা দিয়া ডিম-গুলিকে স্থাপন করা হয়। অতঃপর সেই নারিকেলের মালার অর্দ্ধাংশ এক জন লোকের নাভির উপর নেকড়া দিয়া এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখা হয় যে, ডিমগুলি সেই ব্যক্তির দেহ চর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা সংলগ্ন হইয়া থাকে। ডিমগুলি দেহের সহিত সংলগ্ন থাকায় শরীরের উত্তাপে ফুটিয়া উহার ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়।

কোড়ার ডিম ফুটিতে ২০।২১ দিন লাগে। এতদিন ডিমশুদ্ধ নারিকেলের মালা পেটে বাঁধিয়া রাখা যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আহারে-বিহারে, শয়নে সর্ব্বদা এই মালাটা পেটে বাঁধা থাকে। কায-কর্ম্মের অসুবিধা ত আছেই, তদ্ভিন্ন যন্ত্রণাই কি কম? ডিম ঠাণ্ডায় নষ্ট হইয়া যাইবে আশঙ্কায় স্নান প্রায় বন্ধ রাখিতে হয়। স্নানের কায কেহ কেহ মাথা ধুইয়া সারে। কেহ বা দুই মিনিটের জন্য নারিকেলের মালাটি খুলিয়া রাখিয়া ডুব দিয়া আইসে। দীর্ঘকাল এই কষ্ট সহ্য হয় না। অনেকেই আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য যাহারা ডিম দেখিয়া ভালরূপে চিনিতে পারে, তাহারা ফুটিবার ৬।৭ দিন পূর্ব্বে ডিম আনিয়া পেটে বাঁধে। এখন হয় ত, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কোড়া-পালকগণ ডিম ফুটাইবার জন্য কিরূপ অসাধারণ ক্লেশ

স্বীকার করিয়া থাকে। এই জন্য কোড়ার দাম এত অধিক হয়। ভাল কোড়ার মূল্য গুণানুসারে আজ কাল ২০।২৫ টাকা হয়। পূর্ব্বে কোড়ার আরও অধিক আদর ছিল। মুসলমান জমীদারগণ অনেকেই বহু মূল্যবান্ কোড়া পুষিতেন। ময়মনসিংহের ইটনার দেওয়ানবংশীয় এক জন জমীদার এক জন শিকারীকে একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া তাহার কোড়াটি হস্তগত করিয়াছিলেন। আর এক জন জমীদার একটি হাতীর বিনিময়ে একটি বিখ্যাত কোড়া ক্রয় করিয়াছিলেন।

কোড়ার ছানাগুলি দেখিতে মোরগের শাবকের ন্যায়; পা' দুইটি শরীরের তুলনায় অতিশয় দীর্ঘ; গায়ের রং ধূসর বর্ণ। শৈশবে জননীই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে; খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেয়। সন্তানপালনের সমস্ত দায়িত্ব কোড়ীর উপর। অধিকাংশ জাতির মধ্যেই দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান জন্মিলে ইহাদিগের আহার সংগ্রহ করিয়া আনে; যত দিন শাবক উড়িতে সমর্থ না হয় এবং নিজ চেষ্টায় আহারাদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তত দিন পিতামাতা উভয়েই সন্তান-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু যৌন-সম্মিলনের পর কোড়া ও কোড়ীর পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকে না। কোড়ী একাকী বাসা নির্ম্মাণ করে, ডিম্বে তা' দেয় এবং সন্তান পালন করে। কোড়া ধান, কুটি, পোকা শামুক ও ছোট ছোট মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে।

সাধারণতঃ শিকার ধরিবার জন্যই লোক কোড়া পুষিয়া থাকে। কোড়া অতিশয় হিংস্র বিহঙ্গ। উহার স্বজাতি-বিদ্বেষ বড়ই প্রবল। অন্য কোড়ার শব্দ কানে প্রবেশ করিলে সে ক্রোধে অধীর হইয়া যায়। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া ধাবিত হয় এবং অচিরে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এক বিলে এক-টির অধিক কোড়া বাস করিতে পারে না; এক রাজ্যে যেমন দুই রাজার স্থান হয় না, তেমনই এক বিলে দুইটি কোড়ার স্থান হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত কোড়ার কণ্ঠধ্বনি পৌঁছে, ততদূরের মধ্যে অন্য কোড়া আসিয়া ডাক দিলেই লড়াই অবশ্যম্ভাবী। এক কোড়ার রাজ্যে অন্য কোড়া আসিয়া নিনাদ করিলেই বুঝিতে হইবে, যুদ্ধের আহ্বান আসিয়াছে। আর নিশ্চেষ্ট থাকা কাপুরুষের কার্য্য।

কোড়ার লড়াই অতি ভীষণ। আগন্তুক আসিয়া শব্দ করিবামাত্র বিলের অধীশ্বর বিদ্যুদ্বেগে গিয়া উহাকে আক্রমণ করে। সুতীক্ষ্ণ নখ ও চঞ্চুর আঘাতে উভয়ে উভয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। ক্রোধোন্মত্ত যোদ্ধাদিগের শরীর হইতে রক্তের স্রোতঃ বহিয়া যায়, তবুও কেহ রণে ভঙ্গ দেয় না। একের পলায়ন কিংবা মৃত্যু ভিন্ন যুদ্ধের অবসান হয় না। অনেক সময়ই দুর্ব্বল কোড়াটি ইচ্ছা থাকিলেও পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রবলতর শত্রু এমন ভাবে সুদীর্ঘ অঙ্গুলী দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর পায় আঁকড়াইয়া ধরে যে, যে পর্য্যন্ত না সে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া প্রস্থান না করে, সেই পর্য্যন্ত দুর্ব্বলের আর ছুটিবার শক্তি থাকে না।

যদি কখন এক বিলে একাধিক কোড়া বিচরণ করিতে দেখা যায়, তবে যে কোড়াটি বল ও বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই-টিই কেবল উচ্চস্বরে নিনাদ করে, আর সব নীরব থাকে। দুর্ব্বলতর কোড়াগুলির কণ্ঠ হইতে ক্ষীণতম ধ্বনিও নিঃসৃত হয় না।

ডারউইনপ্রমুখ প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, যৌন-সম্মিলনকালে স্ত্রীবিহঙ্গদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্যই পুংবিহঙ্গদিগকে প্রকৃতি নানাবিধ বলে ও গুণে বিভূষিত করিয়াছেন। পুং-পক্ষীর যে সকল বিশেষ সম্পদ আছে, স্ত্রী-পক্ষীর তাহা নাই। কতকগুলি পুং-পক্ষীর পালক মনোহর নানা বর্ণে সুচিত্রিত; কিন্তু স্ত্রী-পক্ষীর পালকে তদ্রূপ বর্ণ-মাধুর্য্য নাই। কোন কোন পুং-জাতীয় বিহঙ্গের ইন্দ্রধনু-তুল্য বিচিত্র বর্ণ-শোভিত পুচ্ছ আছে; কিন্তু সেই জাতীয় স্ত্রী-বিহঙ্গের পুচ্ছ নাই। আবার কোন কোন জাতীয় পুং-পক্ষীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও সুদূরগামী; কিন্তু স্ত্রী-পক্ষীর কণ্ঠ-ধ্বনি অতিশয় ক্ষীণ ও অপরিস্ফুট। পক্ষীজাতির জীবনা-লোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, পুং-পক্ষীর বর্ণ-বৈচিত্র্য ও স্বরমাধুর্য্য স্ত্রী-বিহঙ্গদিগের চিত্তবিনোদন করিবার—উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। যৌন-সম্মিলনকালে পুং-জাতি নিজ নিজ দেহসম্পদ প্রদর্শন করিয়া স্ত্রীজাতিকে প্রেমমুগ্ধ করে। কোড়া পক্ষীর রহস্যময় জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত কোড়ার সঙ্গমকাল।

বৈশাখের শেষ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্তই কোড়ার ডিম পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়েই কোড়া নববল-সঞ্চারে সতেজ ও বলিষ্ঠ হয়, সুচারু নব পালক উদ্গত হইয়া উহার দেহকান্তি শ্রীসম্পন্ন হয়, তখনই কোড়ার আশ্চর্য্য শিরোভূষণ আরক্তিম ঝুঁটি দেখা দেয় এবং উহার সুগম্ভীর কণ্ঠনিনাদে বনভূমি ধ্বনিত হইয়া উঠে। শ্রাবণমাসে যৌন-সঙ্গমকাল অতীত হইয়া গেলেই কোড়ার পালক ঝরিয়া পড়ে, উহার দিগন্তপ্লাবী কণ্ঠস্বর নীরব হইয়া যায় এবং মনোহর শিরোভূষণ বিলুপ্ত হয়। বর্ষাকালে এক এক বিলে এক এক কোড়া বহু কোড়ী-পরিবৃত হইয়া বিরাজ করে। তখন কোন আগন্তুকের কণ্ঠধ্বনি কানে প্রবেশ করিলেই সেই কোড়া সন্দেহে উদ্বিগ্ন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কোড়া অতিশয় নির্ভীক থাকে, আষাঢ়ের পরই কোড়া যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন উহাদের পালকগুলি ঝরিয়া পড়ে বলিয়া উহাদের উড়িবার শক্তি থাকে না। তাই অন্য পাখী দেখিলেই উহারা ভয়ে অধীর হইয়া পড়ে। আবার পাখীগুলি খোলা যায়গায় আসিলে ভয়ে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। অনেকের ধারণা এই যে, বর্ষান্তে কোড়া এ দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। বাস্তবিক তাহা নহে। তখনও কোড়া বিলে অথবা তৎসন্নিহিত ঝোপ-জঙ্গলে নীরবে অতি সন্তর্পণে বাস করে। আমি শীতকালেও অনেক কোড়া বিলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। সেই সময়ে উহারা গাছপালায় এরূপ ভাবে সংগোপনে লুকাইয়া থাকে যে,আমরা দেখিয়াও উহাদিগকে লক্ষ্য করি না।

কোড়ার শিকার দেখিতে অতিশয় আমোদজনক বলিয়াছি। কিন্তু শিকারীর পক্ষে নহে। বন্য কোড়া ধরিবার জন্য শিকারী কি কষ্টই না সহ্য করে! শিকারের একটা মাদকতা আছে। এই মাদকতাবশেই মানুষ অম্লানবদনে অসীম ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। শিকারী যেই শুনিল, বিলে কোড়া ডাকিতেছে, অমনই সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল।

কোড়াকে ধরাও সহজ নহে। আমার এক দিনের কথা বলিতেছি। তখন আষাঢ় মাস, আমাদের গ্রামের চারিদিকের খাল বিল বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। রাস্তার ধারেই একটি সুন্দর বিল। বিলটির ব্যাস প্রায় এক মাইল হইবে, বিলের মধ্যভাগে পদ্ম, কুমুদ ও সুঁদি বন, আর চারিদিকে ধানের ক্ষেত। বিলে বহু হাঁস, পিপি, কোড়া, ডাহুক প্রভৃতি পাখী বিচরণ করে। সেই দিন আমরা কয়েকটি বন্ধু পূর্ব্বোক্ত রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, এক জন মুসলমান শিকারী কোড়া লইয়া শিকার ধরিবার জন্য বিলে নামিতেছে। কোড়া শিকার দেখিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইল; তাই রাস্তায় দাঁড়াইলাম। শিকারী কোড়ার খাঁচা লইয়া ধীরে ধীরে বিলের জলে নামিল এবং বুকজলে গিয়া দামের উপর পিঞ্জরটি স্থাপন করিয়া কোড়াটিকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর শিকারী আপন দেহ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন করিয়া দাম ও জলজ উদ্ভিদ দিয়া নিজ মস্তকটি উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিল। তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছিল না। শিকারকালে সর্ব্বদাই শিকারীরা এইরূপে লুকাইয়া পোষা-কোড়ার নিকটে থাকে। ইহার কারণ এই যে,পোষা-কোড়া অপেক্ষা বন্য-কোড়ার গায়ে অধিক বল; যখন দুই কোড়ায় লড়াই বাধে, তখন তাড়াতাড়ি বন্য-কোড়াটিকে ধরিয়া না ফেলিলে উহা পোষা-কোড়াকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া প্রস্থান করে।

খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পোষা পাখীটি যেই উচ্চকণ্ঠে কয়েকবার গুর্‌র্‌র্ ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্ শব্দ করিল, অমনই বিলের অপর ধার হইতে বন্য-কোড়াটি বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। বন্য-কোড়া যখন রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে গ্রীবা বক্র ও মস্তক আনত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তৎকালীন উহার ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা এখনও যেন আমার মনে পড়িতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তুমুল লড়াই বাধিয়া গেল। সুদীর্ঘ অঙ্গুলী দ্বারা এ উহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চুপুটে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। আর পাখী দুইটি এইরূপে আবদ্ধ হইয়া জলের উপর চরকার ন্যায় আবর্ত্তন করিতে লাগিল। উহাদের পাখার আঘাতে জলকণা চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নিমেষমধ্যে লুক্কায়িত শিকারী দামের নিম্ন হইতে বাহির হইয়া চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কোড়া দুইটিকে ধরিয়া ফেলিল। অতঃপর সে পাখী দুইটিকে ডাঙ্গায় আনিয়া বহু কষ্টে উহাদের মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলী ছাড়াইতে সমর্থ হইল। দেখিলাম, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উভয় কোড়াই অল্পাধিক জখম হইয়াছে।

শিকারার দেহও অক্ষত ছিল না। বিলের বড় বড় বহু-সংখ্যক জোঁক তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু শিকারীর সে দিকে লক্ষ্যই নাই। শিকারের সফলতায় সে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

শিকারীরা বন্য-কোড়া ধরিয়া উহার মাংস খায়, বন্য-কোড়া কিছুতেই পোষ মানে না। উহাদিগকে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। পরাধীন হইয়া শত্রুগৃহে উহারা জলবিন্দুও স্পর্শ করে না। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল।

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কোড়া পাখী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই প্রকার প্রত্যক্ষদর্শিতা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার নিদর্শন আমাদের সুধীসমাজে যত বেশী দেখিতে পাওয়া যাইবে, ততই আমাদের দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। দুই একটি কথা এ স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি।

কোড়া সম্বন্ধে লেখক মহাশয় আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে সকল লক্ষণের বর্ণনা করিয়াছেন, সমগ্র Rallidæ বিহঙ্গের পক্ষে তাহার অধিকাংশই প্রযোজ্য, ডাহুকে সেগুলি সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈশিষ্ট্যের দিকটা লেখক মহাশয় ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। শিকার ধরিবার জন্য ডাহুক পোষা হয় বলিয়া আমার জানা নাই। ডাহুকী ডাকে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। কোড়ী একাকিনী নীড় রচনা ও ডিম্ব রক্ষা করে কি না, সে তথ্য পক্ষিবিজ্ঞানজগতে-এখনও ভাল করিয়া আলোচিত হয় নাই ; ডিম্বের সংখ্যা সাতটি পর্য্যন্ত হয়, তাহাও এত দিন জানা ছিল না। লেখক মহাশয় কোড়ার নিশাচরত্বের কোন উল্লেখ করেন নাই। কোড়ার সাহায্যে কোড়া-ধরা ও মানুষের দেহের উত্তাপে ডিম ফুটাইবার যে সুন্দর বর্ণনা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কোনও অংশে পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা অপেক্ষা হীন নহে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

শিব-সঙ্কল্প।

(শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতে)

ওগো জাগ্রত মানস আমার, অমৃতের সন্ধানে
সব সীমা বাধা লঙ্ঘন করি ধাও অসীমের পানে।
দিব্যধামের অধিবাসী তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতি।
দেশ কালাতীত মম মন, হও কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী।

কর্ম্মের ধারা জলস্রোত সম চালিত করিছ তুমি
তোমার দ্বারাই চির-পিঙ্গল ঋষির যজ্ঞভূমি।
ব্রহ্ম-পিপাসুমণ্ডলী হয় তোমায় চেতনাবতী,
অন্তর তম গুহাস্থিত মন হও কল্যাণ ব্রতী।

তুমি প্রজ্ঞান দৈব চেতনা তুমি ধৃতি তুমি প্রাণ
চির আরাধ্য দৈবত তুমি ভাস্বর দ্যুতিমান্।
তুমি বিনা কোনো চিন্তার নাই সাধনায় পরিণতি,
সত্য প্রেরণা উৎস, হে মন, হও কল্যাণ ব্রতী।

হে অমৃত মন, তোমার অমৃতে প্রাণবান্ নন্দিত,
ভূত-ভবিষ্য বিশ্ব-ভুবন জাগ্রত নিয়মিত।
হোতা, হুতি, হোম তোমার সৃষ্টি, নাশ তুমি ক্ষয়ক্ষতি
বিরাট্ স্রষ্টা ত্রিকাল দ্রষ্টা, হও কল্যাণ ব্রতী।

রথনাভি হ'তে অরার মতন চারিদিকে প্রসারিত
ঋক্ যজু সাম স্মৃতি সংহিতা তোমা হ'তে নিঃসৃত।
তোমাতে নিহিত মানবাত্মার সব জ্ঞান সংহতি
বেদবেদান্ত প্রতিষ্ঠা-ভূমি, হও কল্যাণ ব্রতী।

নিত্য নবীন হে অজর মন, ধীর সারথির মত
বল্গিত করি বিশ্ব-মানবে রাখিয়াছ সংযত।
তুমি জবিষ্ঠ বিশ্ব-ভুবনে অবারিত তব গতি,
বেগবত্তম, হও মন মম কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ
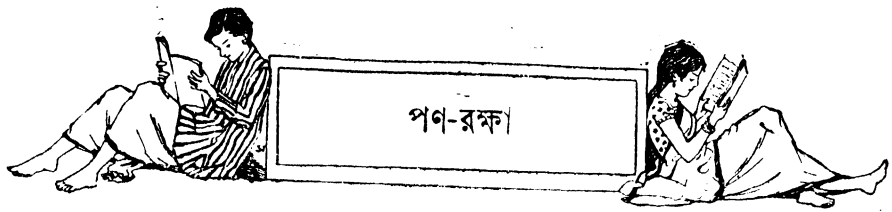
তখন প্রভাতের মধুর মলয় বৃক্ষ-পত্রের অঙ্গ শিহরিয়া বনভুমির উপর দিয়া বহিতেছিল। শাখা-প্রশাখা-বিস্তৃত এক সুবিশাল বৃক্ষোপরি আপন কুলায় ছাড়িয়া দুইটি পক্ষী বসিয়া যেন বিদায়ের পূর্ব্বে একবার পরস্পরকে শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছিল। দুইজনেই আহারান্বেষণে এখনই দুই দিকে উড়িয়া যাইবে। তার পর কে জানে, আর দেখা হইবে কি না। দূরে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনিয়া একটা পক্ষী সঙ্গীকে ছাড়িয়া অকস্মাৎ ত্রস্তপক্ষে উড়িয়া গেল; আর একটি স্থির হইয়া বসিয়া সেই অস্পষ্ট ধ্বনিটি সুস্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্যই বুঝি উৎসুক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দূরের শব্দ ক্রমশঃ নিকটে—আরও নিকটে, শেষে সেইস্থানে আসিয়া পৌঁছিল এবং সেই দ্রুত ধাবমান অশ্ব-পদধ্বনি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীভূত ও সেই শব্দসমূহের সৃজনকারী অশ্বারোহিসমেত অশ্ব সকল আসিয়া দর্শন দিল। দেখিয়া দ্বিতীয় পক্ষীটিও প্রাণভয়ে উড়িয়া পলায়ন করিল। বনভূমি তখন বহু কণ্ঠের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে, শিকারী কুকুরের তীব্র চীৎকারে, অশ্বপদধ্বনিতে ও ঘন ঘন তূর্য্যনাদে কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। সবিতৃদেব তখনও পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়েন নাই। বনভূমি তখনও যেন একটা কুজ্ঝটিকার আচ্ছাদনে আবৃত ছিল। পূর্ব্বসন্ধ্যায় পত্ররাজিতে শয্যা নির্ম্মিত করিয়া যে নিশ্চিন্তচিত্তা বন্যমৃগী শয়ন করিয়াছিল, সহসা তাহার নিদ্রিত কর্ণে সেই কোলাহল প্রবেশ করিল।

অকস্মাৎ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তেমনই করিয়া সেই বনসুন্দরী দ্রুত তাহার বন্যশয্যা হইতে তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। গত নিশায় শিশিরপাতে তাহার দেহ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ গা-ঝাড়া দিয়া সে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর একবার আকাশের পানে তাহার কৃষ্ণতার-সমুজ্জ্বল বিশাল নেত্রদুইটি তুলিয়া আবার নিম্ন পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। মুহূর্ত্তমাত্র সেই সে অস্পষ্ট চীৎকার শুনিল। তাহার পর যেমন শিকারীদলের সর্দ্দার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনই তাহার সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া সে তীরবেগে ছুটিয়া পলাইল। শিকারীর দলের সর্দ্দার এক জন অশ্বারোহী যুবক ও সেই লোভনীয় শিকারের পশ্চাতে তড়িদ্বেগে অশ্বমুখ ফিরাইয়া দিয়া তেমনই বিদ্যুদ্বৎ ক্ষিপ্রগতিতে অশ্বচালনা করিল। কিন্তু ততক্ষণে সে দূরেই চলিয়া গিয়াছিল। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে যুবক তাহার অপর সঙ্গীদের ছাড়াইয়া গেল। কখনও উচ্চ অধিত্যকায় উঠিয়া, কখন নিম্ন উপত্যকায় নামিয়া, কখনও জলার উপর দিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরধারাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া যুবক মৃগের অনুসরণ করিতেছিল। সহসা তাহার চোখে ধূলি দিয়া রামায়ণোল্লিখিত স্বর্ণমৃগের ন্যায় সেই মায়ামৃগী কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল! যুবক অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। এতক্ষণ সে শিকারীর স্বভাবজাত উদগ্র আগ্রহবশে এমন জ্ঞানশূন্যভাবে অশ্ব ছুটাইয়াছিল, কিন্তু যাহার জন্য এতখানি ক্লেশ স্বীকার, তাহাকে হারাইয়া এতক্ষণে যুবক আপনার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। তাহার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে ভিজিয়া গিয়াছিল। গুরু পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ধীরে ধীরে সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। অশ্বারোহীর যখন এমতাবস্থা, তখন অশ্বের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। অশ্বের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে ফেন বহির্গত হইতেছিল, অশ্ব প্রায় পতনোন্মুখ। যুবক একবার প্রত্যাশিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; সেই গিরি-প্রাচীর-বেষ্টিত নির্জ্জন কাননভূমে আশাপ্রদ কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন পর্ব্বত-গাত্রে খরতর রবিকিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল।

বেলা বোধ হয় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া থাকিবে। অবসন্ন দেহে যুবক সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। একবার উচ্চৈঃস্বরে বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিল, কিন্তু প্রতিধ্বনি ব্যতীত অপর কেহই সে ডাকের উত্তর দিল না। তাহারা অনেক দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া এ আহ্বান শুনিতে পাইবে? যুবক আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই দেখিল, নিকটেই একটা ঝরণা। তখন নূতন আশার বলে কথঞ্চিৎ বলীয়ান্ হইয়া সে আপাততঃ নিদারুণ তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য অশ্ববল্গা ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল—ঝরণার সুশীতল বারি আকণ্ঠ পান করিয়া, আপনার প্রিয় অশ্বটিকেও জলপান করাইয়া তাহার দেহে আবার যেন অনেকখানি বল আসিল। মনে আবার নবীন উৎসাহ দেখা দিল। তখন আবার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে মৃদুগুঞ্জনে গীত গায়িতে গায়িতে সে নির্ঝরিণীর তীরে তীরে উত্তরমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পরক্ষণেই প্রকৃতিজাত নয়ন-মনোমুগ্ধকর সুন্দর দৃশ্য সকল দেখিয়া তাহার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই বনে স্বচ্ছন্দবর্দ্ধিত আরণ্যক বৃক্ষ-লতাগণ যেন পরস্পর পরস্পরকে গভীর প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বন-পুষ্পখচিত ক্ষুদ্র তরু, কোথাও বিবিধ বর্ণের পুষ্পপ্রসবিনী বন-লতিকা একটি প্রকাণ্ড সহকার তরুকে বেষ্টন করিয়া যেন স্থানে স্থানে শ্রান্ত পথিকজনের জন্যই বিশ্রামসুখকর কুঞ্জ-কুটীর সকল নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ পুরাতন শাল, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝটিকা ও বারিপাতচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যেন সগর্ব্ব-উল্লাসে সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাহাদের জন্মকাল সে এক দূর অতীতের কথা, আজিকার নহে। তন্ময়চিত্তে সেই সকল মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যুবক আপন মনেই পথ অতিক্রম করিতেছিল। কোথায় যে চলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন সে তখনও কিছুমাত্র বোধ করে নাই।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। পশ্চিমের পর্ব্বতমালা সূর্য্যাস্তের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কে যেন চারিদিকে মুঠি মুঠি আবির ছড়াইয়া দিল। প্রত্যেক উচ্চাবচ গিরি-শৃঙ্গ, পর্ব্বতগাত্রস্থিত প্রতি প্রস্তরখণ্ডটি যেন জ্বলন্ত অনলের ধারায় সহর্ষে অবগাহন করিতে লাগিল। কিন্তু উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থিত নিম্নভূমিতে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের এই উদার শেষরশ্মির একটি কণাও প্রবেশপথ না পাইয়া তাহাদের অন্ধকার দূরীভূতকরণে সমর্থ হইল না। বহুক্ষণ এই সকল দেখিবার পর সহসা যুবকের মনে পড়িল যে, এ দৃশ্য যতই সুন্দর হউক না কেন, ইহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র! এইবার ইহার পরিবর্ত্তে যাহা আসিবে, তাহার অসুন্দর অকরুণ রূপ স্মরণে সাহসী যুবকও মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ বনভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ত এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা;—কিন্তু সকলই বৃথা। এই গিরিব্যূহে আগমনের পথ আছে, কিন্তু নির্গমের পথ অজ্ঞের পক্ষে নাই। হতাশ হইয়া তখন অশ্বের বল্গা একটা বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া সে সেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িল। আজি রাত্রি এই অজ্ঞাত রাজ্যেই যাপন অনিবার্য্য। আর হয় ত এই রাত্রিই তাহার জীবনের শেষ রাত্রি! এত বড় মহাবনে হিংস্র পশু নাই, ইহাও কি সম্ভব! তাহার তূণীর তূণহীন। এমন সময় সহসা সেই হতাশচিত্ত যুবার কর্ণকুহরে এক অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। আবার উদ্দাম বেগে তাহার হৃদয় সেই যন্ত্ররবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসীম আশানন্দে নাচিয়া উঠিল। তবে নিতান্তই তাহাকে হিংস্র জন্তুর আহার্য্য করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করেন নাই! এই ভৌতিক মায়াময় অরণ্য হইতে বহির্গত হইবার পথের সন্ধানও সে তাহা হইলে ঐ বীণাবাদকের নিকট হইতে পাইতে পারিবে।

সে উঠিয়া বীণাধ্বনির অনুসন্ধানে, শব্দানুসরণে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই তাললয়সমন্বিত বাদিত রব-শ্রবণে সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল, ইহা অশিক্ষিত হস্তনিঃসৃত নহে; পরন্তু কোন বিশেষজ্ঞেরই এই আলাপন। মনে মনে স্থির করিয়া লইল, নিশ্চয়ই এখানে কোন ভদ্রব্যক্তির সহিতই সাক্ষাৎ হইবে। অনার্য্য আদিম জাতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নূতন বিপদ্ ক্রয় করিতে হইবে না। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই যুবক দেখিল,—একখণ্ড পাষাণোপরি উপবেশন পূর্ব্বক এক রমণী একমনে বীণাবাদন করিতেছেন। নারীর পৃষ্ঠদেশ আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ কেশজালে

সমাচ্ছন্ন ; পশ্চাৎ হইতে কেবল ইহাই মাত্র দেখা গেল, মুখ দৃষ্ট হইল না। যুবক ধীরে ধীরে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া রমণীর অল্পমাত্র দূরে একটি বৃক্ষের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। একবার মনে ঈষৎ সঙ্কোচ আসিল, এই যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নারী উন্মুক্ত প্রকৃতির এই অতুল সৌন্দর্য্য-লেখা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহাকেই যেন যন্ত্রসহযোগে বাহিরে প্রচারচেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে বাধা দিব কি? ইহা কি উচিত? কিন্তু তখনই আবার মনে মনে এই যুক্তি স্থির হইল, অনুচিতই বা এমন কি? যে বিপন্ন, যাহাকে আজ ইঁহারই নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে উচিত বা অনুচিত বিবেচনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তথাপি যুবক কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীণা বাজিতে লাগিল। আগন্তুক নিস্পন্দশরীরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া সেই অজ্ঞাত বীণাবাদিনীর ভূমিচুম্বিত রাশি রাশি কৃষ্ণ কেশতরঙ্গের তালে তালে চঞ্চল নর্ত্তন, তাহার শুভ্র সুগোল স্কন্ধের এতটুকু আভাসমাত্র অতৃপ্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, আর মন্ত্র-মুগ্ধের মত একমনে শুনিতেছিল— কি যে শুনিতেছিল,—তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতেছিল না। সে অনেক গুণীর গন্ধালাপ শুনিয়াছে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব বীণাবাদন জীবনে সে আর কখনও শুনে নাই।

সহসা বীণা-ধ্বনি থামিয়া গেল। কিন্তু পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে বীণার সুর তখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রমণী বীণা থামাইল দেখিয়া, এইবার বিপন্ন যুবক তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার সশব্দ পাদক্ষেপে নারী তখন মুখ তুলিয়া সাশ্চর্য্যে তাহার দিকে চাহিল। যুবককে দেখিয়া তাহার—সেই প্রভাতের হরিণীটিরই মত সুবৃহৎ দুইটি কালো চক্ষে বিস্ময় যেন রেখায় রেখায় প্রস্ফুট হইয়া উঠিল।

যুবক অগ্রসর হইতে হইতে নম্র স্বরে বলিল, "আমি বিপন্ন,—পথহারা পথিক। এই দুর্গম বন-মধ্যে বীণা-ধ্বনি শুনিয়া এখানে আসিয়াছি।" যুবতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক সবিস্ময়ে দেখিল, নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলমধ্যে সে এক অতি অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ! এই অরণ্যবহুল পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্ব্বতরাজ-দুহিতা পার্ব্বতীর মতই ঐ মূর্ত্তি অপরূপ। এ মূর্ত্তি রাজধানীতেও দুর্লভ। এই গভীর বন-ভূমিতে এ রমণী-রত্ন দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার চিত্ত যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। যুবক নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই লোকবিমোহিনী নারী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তার পর বহুক্ষণ পরে বিস্ময়বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগিল, 'কে এ নারী? কেন এ বনবাসিনী?'

ইত্যবসরে সেই বিজনবাসিনী নারী স্মিতমধুর মৃদু হাস্যসংযুক্ত নম্র-স্বরে কহিল, "বিপন্ন আপনি? আমার সহিত আসুন।" এই বলিয়া অগ্রসর হইতে গেল। তখন যুবক বলিল, "তবে দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমার অশ্বটিকে লইয়া আসি, নতুবা হয় ত হিংস্র পশু-হস্তে সে নিহত হইতে পারে।"

ক্ষুদ্র অথচ পরিচ্ছন্ন একখানি কুটীর। ইহার একটি পার্শ্ব দিয়া ঝরণার জল ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়িয়া নদীর আকারে বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া হংস-কুল সন্তরণ দ্বারা তীরাভিমুখে ফিরিতেছিল। সাদা কালো জলে বিশালকায় পর্ব্বতসকল প্রতিফলিত হইয়া কৃষ্ণতর দেখাইতেছে। সূর্য্যের শেষ রক্তিমা কোথাও জলতলে আবির গুলিয়া দিতেছে, কোথাও কোথাও— যেখানে জল-স্রোত পর্ব্বতপ্রস্তরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কিছু দূর দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে একপ্রকার ক্ষুদ্র পুষ্প-খচিত গুল্ম জন্মিয়াছে, কোথাও জলমধ্যভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মের বিচিত্র শোভা। এমনই সৌন্দর্য্য-ভরা স্রোতস্বিনীতটে পুষ্পভূষিত লতাচ্ছাদিত কুটীর। যুবক পথপ্রদর্শিকা রমণীর সহিত সেই কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেই স্থানে এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল। তাহার ললাটে চিন্তার গাঢ় রেখা, মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, বিবর্ণ। উভয়ের পদশব্দে সহসা সে মুখ তুলিয়া চাহিল। যুবককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?" প্রশ্নকারী বৃদ্ধ। পক্ক কেশের প্রতি সম্মান দেখাইয়া যুবক সবিনয়ে উত্তর দিল, "বিপন্ন অতিথি।"

কুঞ্চিত ললাট অধিকতর কুঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর প্রশ্ন করিল, "অপরাধ লইবেন না। যদি বাধা না থাকে, আপনার নাম বলিবেন কি?"

যুবক ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "বাধা কিছু নাই। আমার নাম পুষ্পনাথ।"

"পুষ্পনাথ! ইহা কি মহাশয়ের নিজ নাম?"

এ প্রশ্নে যুবক ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমণী বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, যোধসিংহ?"

যোধসিংহ এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আবার প্রশ্ন করিল, "এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি মহাশয়?"

"শিকার।"

বৃদ্ধ যোধসিংহ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নীরব হইল। কিন্তু তাহার আনন হইতে অসন্তোষের গাঢ় ছায়া অপসৃত হইল না। রমণী কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "উহার কথা ধরিবেন না, আপনি আসুন।" যুবক সে অনুরোধ উপেক্ষা করিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে ত বহু দিনের কথা নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে তাহাদের বিপুল বিত্ত, অখণ্ড প্রতাপ, বিস্তৃতরাজ্য, সুখ-সৌভাগ্য সবই ত ছিল! কিন্তু অদৃষ্টের কি নিৰ্ম্মম পরিহাস! ছায়া-বাজীর দৃশ্যের ন্যায় একদিন অকস্মাৎ সবই যেন মন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা জয়সিংহ চন্দ্রাবতী নগরে রাজত্ব করিতেন। রাজনন্দিনী কমলকুমারী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। ফুলের মত নিষ্পাপ তাহার হৃদয়, শরতের মেঘের মত লঘু তাহার গতি। প্রজাপতির মত সে তাহার সাধের উপবনমধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত। সংসারের ধূলামাটীর সে যেন অতীত ছিল।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। তাই রাজ-কন্যা কমলকুমারীর দিন শুধু সুখের তরঙ্গে ভাসিয়াই কাটিয়া গেল না।

চন্দ্রাবতী নগরী বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার পদতলে অবস্থিত। চন্দ্রাবতী হইতে কিছু দূরে মালিয়া শৈলমালার অতি নিক-টেই বীরনগর নামে এক রাজ্যে সুজন সিংহ নামে এক জন রাজা ছিলেন। সুজন সিংহের সহিত জয়সিংহের কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে এবং পরে তাহা ভীষণ শত্রুতায় পরিবর্ত্তিত হয়। জয়সিংহ সুজনসিংহকে মনে মনে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তাঁহার উদার চিত্তে কখনও তাঁহার অনিষ্ট ইচ্ছা উদিত হয় নাই, কিন্তু সুজনসিংহ সর্ব্বদাই জয়সিংহের অনিষ্টসাধনচেষ্টায় ফিরিতেন।

এক দিন গভীর দুর্য্যোগময়ী নিশীথ রজনীতে সুজনসিংহ অতর্কিত ভাবে চন্দ্রগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

চন্দ্রগড় দুর্গবাসী তখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। সুপ্ত রাজা জয়সিংহ সহসা চমকিয়া জাগিলেন। প্রথমে দুঃস্বপ্ন বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন, নেত্র তাঁহাকে প্রতারণা করে নাই, সম্মুখে সুজনসিংহ উলঙ্গ তরবারি হস্তে যথার্থই দণ্ডায়মান!

ক্ষত্রবীর সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়াও ভীত হইলেন না, বরং ক্রোধকম্পিত উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুজন-সিংহ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ উত্তম! লুকাইয়া চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে আসি-য়াছ; রাজপুত বীরের এ উপযুক্ত কার্য্য! সুজনসিংহ! তোমার হৃদয়ে পররাজ্যলাভেচ্ছা প্রবল ইহা জানিতাম; কিন্তু এতদিন জানিতাম, তুমি বীর; তুমি যে এত বড় নীচ কাপুরুষ, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। জয়সিংহ মৃত্যুকে ভয় করে না, সে কাপুরুষ নহে। আমায় তরবারি আনিতে দাও।"

জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুজনসিংহ অসি উত্তো-লিত করিয়া জয়সিংহের পথ রোধ করিয়া বলিলেন।— "জয়সিংহ, আমি জানি, সম্মুখযুদ্ধে আমি তোমার সমকক্ষ নই, তাই এই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। তুমি জান না, এ চন্দ্রাবতীনগরী আমার কাম্য নয়; আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে এখনও তোমার জীবনরক্ষা হয়, প্রতিশ্রুত হও আমায় কন্যা দান করিবে?"

উত্তর হইল, "জীবন থাকিতে নয়। আমার মৃত্যুর পর যাহা হয় করিও।"

"জীবন যাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, জীবন যাইলে এ চন্দ্রাবতী আমার, তোমার কন্যা—চন্দ্রাবতী রাজকুমারী—"

জয়সিংহ সজোরে সুজনসিংহকে পদাঘাত করিয়া বলি-লেন, "নরাধম!" এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কাতরোক্তির সহিত নিজেও ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সুজনসিংহ জয়সিংহকে হত্যা করিয়া দুর্গ আক্রমণ-কারী সৈন্যদলের পরিদর্শনার্থ প্রস্থান করিল।

জয়সিংহের চীৎকারে রাণী ও রাজকুমারী জয়সিংহের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূলুণ্ঠিত নরপতির শোণিতাক্ত

মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন আততায়ী সে স্থানে উপস্থিত ছিল না। উৎপলকুমারী স্বামীর মৃতদেহের উপর আছাড়িয়া পড়িলেন। তখনও জয়সিংহের প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া বহির্গত হয় নাই। তিনি কোন মতে কেবল অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "প্রতিশোধ!"—কণ্ঠ তাঁহার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। মৃত্যু আসিয়া বীরের নির্ভীক জিহ্বাকে চির-নীরবতা প্রদান করিল।

জয়সিংহের হত্যার পরদিবস প্রাতে সকলে শুনিল, চন্দ্রগড় সুজনসিংহের অধিকারে।

সুজনসিংহ দুর্গ অধিকারের পর দাসী দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি জয়সিংহের বিধবা পত্নী ও কন্যার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। ইহা শ্রবণে বিধবা মহারাণী বলিয়া পাঠাইলেন, স্বামিহত্যাকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি অসমর্থ।

শুনিয়া সুজনসিংহ আত্মদমন করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে মনে মনে প্রস্তুত হইলেন।

সেই রাত্রেই রাণী, কন্যা ও বিশ্বস্ত ভৃত্য যোধসিংহের সহিত রাজপুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং সেই অবধি বিন্ধ্যগিরির উপত্যকামধ্যে নির্জ্জন গিরিকন্দরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কয়জনে বাস করিতেছেন।

রাজা সুজনসিংহ অত্যন্ত বিষয়লোভী, রাজ্যলোভী ছিলেন সত্য; কিন্তু জয়সিংহকে এরূপ ভাবে হত্যা করিয়া চন্দ্রগড় হস্তগত করা কেবল রাজ্যের লোভে নহে। এই উভয় লোভ অপেক্ষাও আর একটি প্রবল লিপ্সা তাঁহাকে এই মহাপাপে লিপ্ত করিয়াছিল।

রাণী উৎপলকুমারী একবার কমলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া কুক্ষণে ভবানী-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। রাজা সুজনসিংহও সেই দিন সেই মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ধ্যানপরায়ণা রাজ্ঞীর পার্শ্বে একাদশবর্ষীয়া বালিকা কমলকুমারীকে দেখিয়া, কমলকুমারীর পিতার সমবয়স্ক পিতৃস্থানীয় সুজনসিংহ সেই রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং দূতমুখে জয়সিংহকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকুমারীর পাণি-প্রার্থনা করেন।

রাজা জয়সিংহ প্রত্যুত্তরে জানাইয়া ছিলেন যে, উপযুক্ত পুত্রের সম্প্রতি মৃত্যু হইলেও সুজনসিংহের ভ্রাতা কুমার করুণসিংহের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ না করিয়া যে তিনি স্বয়ং বিবাহার্থী হইয়াছেন, ইহাতে জয়সিংহ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত। তিনি কুমার করুণসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন।

সুজনসিংহ পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন, যাহাকে তিনি পত্নী ভাবিয়াছেন, তাহাকে কেমন করিয়া ভ্রাতৃবধূ ভাবিবেন? অতএব তাঁহার হস্তেই কন্যাদান করা হউক। পুত্রার্থে তিনি পুনশ্চ নববধূ গৃহে আনয়ন করিতে মনস্থির করিয়াছেন।

জয়সিংহ দ্বিতীয়বার সে অসঙ্গত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি সুজনসিংহের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। করুণকে তাঁহার কন্যাদানে অসম্মতি নাই।

বার বার বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সুজনসিংহ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞানে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং কেমন করিয়া জয়সিংহকে সরাইয়া তাঁহার রাজ্য ও রাজকুমারী লাভ করিবেন, তাহাই তাঁহার দিবারাত্রির ধ্যান হইল।

১৩৪৬ সংবতে আলাউদ্দিন দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষীয় কিশোর কুমার করুণসিংহ ভ্রাতার প্রতিনিধিস্বরূপে পঞ্চসহস্র সৈন্য লইয়া এই যুদ্ধে গমন করেন। সুজনসিংহ যখন শুনিলেন, জয়সিংহও তাঁহার পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য চিতোর গড়ে পাঠাইয়াছেন এবং মাত্র অবশিষ্ট দুই সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি আপনিও শীঘ্র গমনোদ্যোগ করিতেছেন, তখন তিনি ভাবিলেন, এই উপযুক্ত অবসর। ভ্রাতা করুণসিংহ এক্ষণে চিতোর যাত্রা করিয়াছে; সেও বাধা দিতে নাই। চন্দ্রগড়েও এখন অধিক সৈন্য নাই। সেই রাত্রেই সুজনসিংহ জয়সিংহকে হত্যা করিলেন এবং চন্দ্রগড় অধিকার করিলেন; কিন্তু এত করিয়াও কমলকুমারীকে লাভ করিতে পারিলেন না। এই ঘটনায় তাঁহার লোভদুর্ব্বল চিত্তে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সে ব্যথা পাপীর চিত্তকে অনেকখানি অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অতঃপর পুত্রার্থ নব-বধূ গৃহে আনয়নের ইচ্ছাটা দূরীভূত হইয়া যায়।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই সকল ঘটনার চারি বৎসর পরে সুজনসিংহের ভ্রাতা রাজা করুণসিংহ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার এক বিজন প্রান্তে

শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই এক জন পথিভ্রষ্ট হইয়া গভীর অরণ্যমধ্যে কমলকুমারীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। সে পুষ্পনাথ, কিন্তু রাজকুমারী কমলকুমারীর প্রকৃত পরিচয় সে জানিতে পারিল না; তাহাকে সামান্যা ক্ষত্রিয়-কুমারী বাসন্তী বলিয়া জানিল।

সে রাত্রি সেই স্থানে আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরদিন পুষ্পনাথ বিদায় লইল। বাসন্তী পথ দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গমন করিল।

সঙ্কীর্ণ বন-পথ দিয়া দুই জনে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া পুষ্পনাথ বলিল,—"এইবার আমি পথ চিনিয়া লইতে পারিব। আর আপনার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল,—"আর কি কখন আমাদের দেখা হইবে?"

বাসন্তী নতমুখে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"যদি কখনও শিকারে আসেন, হয় ত দেখা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যোধসিংহ সেরূপ দেখা সাক্ষাৎ পছন্দ করিবে না। বৃদ্ধের মন বড় সন্দিগ্ধ দেখিলেন না। সে সকল লোককেই রাজার গুপ্তচর মনে করে। এক জন লোককে দুইবার দেখিলে আর রক্ষা আছে!" সে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু পুষ্পনাথ হাসিল না। অতি মৃদু অনিচ্ছুক গতিতে অশ্ব আরোহী লইয়া ক্রমশঃ নয়নান্তরালে প্রস্থান করিল।

পুষ্পনাথ যতক্ষণ বাসন্তীকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ বাসন্তী তাহার নয়ন ভূমিপানে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল; যেমনই পুষ্পনাথ তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া অশ্বের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন, বাসন্তী চোখ তুলিয়া পুষ্পনাথকে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর যখন শৈলশ্রেণী ও বৃক্ষরাজির মধ্যে অপরিচিত সুঠাম বীরমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাসন্তী কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেই দিন হইতে প্রায়ই পুষ্পনাথের সহিত বাসন্তীর সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। বিন্ধ্যগিরির সেই জনশূন্য অতি বিজন বনমধ্যে বাসন্তী ও পুষ্পনাথের পুনঃ পুনঃ মিলন অতর্কিত অথবা চেষ্টাসাধ্য কি না, সে কথাটি ঠিক করিয়া বলা যায় না। এক্ষণে কিন্তু উভয়ে উভয়ের বন্ধু। সেই কুটীরের পার্শ্বস্থিত উদ্যানে স্রোতস্বিনীতীরে দুইজনে কত সন্ধ্যায় কত প্রান্তে বসিয়া থাকে; পুষ্পনাথ কত কথা কহে, কত গল্প বলে, বাসন্তী নিবিষ্টচিত্তে সে সব শ্রবণ করে।

মহারাণী আপন দুঃখভারে অবসন্না, যদিও দরিদ্র সৈনিক পুষ্পনাথের নৃপতিদুর্লভ মূর্ত্তি ও বিনয়াবনত ব্যবহারে তাঁহার তাপদগ্ধ জ্বালাময় জীবন জুড়াইয়া যাইত, তাহার প্রতি পুত্রস্নেহ উথলিয়া উঠিতে চাহিত, তথাপি সংসারে কিছুই আর তাঁহাকে যেন আকর্ষণ করিতে বা আনন্দ দিতে পারিত না। কমল যতই হউক চঞ্চলা বালিকা মাত্র। দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে, ভস্ম করিতে পারে না।

সেদিন তখনও সূর্য্যদেব নিজের শাসনদণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্তগমন করেন নাই। সবে মাত্র পশ্চিমাকাশপ্রান্তে আপনার নৈশ শয্যাপ্রান্তে শ্রান্তশরীরে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। শরৎকালের আকাশ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। পর্ব্বতগাত্রনিঃসৃতা সেই মন্দ মন্দ বীচিবিক্ষেপকারিণী বিমলসলিলা স্রোতস্বিনীর বক্ষে সেই বর্ণচিত্রণ প্রতিফলিত হইয়া ঊর্দ্ধে, অধে, একই ইন্দ্রধনুবর্ণের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছিল।

ক্ষুদ্র এক শিলাখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক বনবালা বাসন্তী প্রকৃতির অতুলনীয় শোভাসম্পদ সন্দর্শন করিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা হইয়া পড়িয়া সঙ্কীর্ণ বনপথে নিজের দুইটি চকিত নেত্র ফিরাইতেছিল।

পুষ্পনাথ আজ আসিবে বলিয়া গিয়াছে, তাই এ অধীর প্রতীক্ষা। কিন্তু এ কি! অপরিচিত যুবার প্রতি কিশোরী বাসন্তীর মনের মধ্যে আকর্ষণ কেন? কেন? সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। শুধু দেখিয়া সুখ, প্রতীক্ষা করিয়া সুখ, ব্যর্থ প্রতীক্ষাশেষে কাঁদিয়া সুখ, তাই যাহাতে সুখ পায়, তাহাই করে। না করিয়া সে করেই বা কি? বালিকাবয়সে সংসার-বিতৃষ্ণা সন্ন্যাসিনী এবং জগতের প্রতি বীতস্পৃহ বৃদ্ধ—এই দুইটি মাত্র জীবিত প্রাণীই যে তাহার সঙ্গী, কাযে কাযেই এ ভিন্ন আর এক জন,—উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনার জীয়ন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর এক জনের সঙ্গ লাভ করিতে পাইয়াই কিশোরী বাসন্তীর কিশোর জীবনটি তাহারই প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; ইহাতে তাহার কি অপরাধ? কোন উপায় আছে কি?

সে দিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইল। পুষ্পনাথ আসিল না। তাহার পর এক পক্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল, পুষ্পনাথের

দেখা নাই। প্রতীক্ষা প্রত্যহই ব্যর্থ হইতে লাগিল। তবে বুঝি, পুষ্পনাথ বাসন্তীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? সম্ভব, তাহা না হইলে এত দিন না আসিয়া কি থাকিতে পারিতেন? তা ভুলিবেন নাই বা কেন? তাঁহার কাযকর্ম্ম আছে, আত্মীয়বন্ধু আছেন, বনবাসিনী বাসন্তীকে মনে রাখিবার তাঁহার ত কোন প্রয়োজন নাই। বাসন্তীরই কোন কর্ম্ম নাই, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি স্মরণ করা, আজকাল তাহাতেও যেন কেমন একটা নির্ব্বেদ আসিয়াছে; তাও আর তেমন করিয়া যেন ভাল লাগে না। তবে সে কেমন করিয়া পুষ্পনাথকে ভুলিবে? যে তরুণ মূর্ত্তি নিতান্ত অনবধানতাবশেই তাহার কৌমার-চিত্তে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা বুঝি আর মুছা গেল না। এই জনমানবসম্পর্কবিবর্জ্জিত শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে তরুণ কন্দর্পের ন্যায় রূপনাথ পুষ্পনাথকে বাসন্তী প্রথম যে দিন দেখিয়াছে, সেই দিন হইতেই কে জানে কেমন করিয়া সে তাহাকে ধ্যানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। বিস্মিতা ব্যথিতা বাসন্তী কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, কেমন করিয়া এমন হইল।

পুষ্পনাথের জন্য মন তাহার আকুল হইয়া উঠে, না আসিলে অভিমানে হৃদয় গুমরিয়া থাকে, কিন্তু আসিলে আর ভাল করিয়া মুখ ফুটে না, বলিবার যত কথা সবই মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। চোখে শুধু গভীর দুঃখবাষ্প দেখা দেয়।

তখনও প্রভাত হয় নাই। শেষ রাত্রির অন্ধকার তখনও দূরীভূত হইতে বিলম্ব আছে। প্রবল শীতঋতুর প্রকোপে সমস্ত বনভূমি যেন তুষারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কানন-প্রকৃতি সুপ্তির ক্রোড়ে শায়িতা থাকিয়া শীতে কম্পিত হইতেছে। হিমকণবর্ষী শীতকম্পন তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

এক জন যোদ্ধৃবেশী যুবক এই শৈত্যবিজড়িত প্রত্যুষকালে এই বনপথ দিয়া অশ্বারোহণে আগমন করিতেছিল। যুবক পুষ্পনাথ ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতেছিল। যেন বড় চিন্তান্বিত, দ্বিধাগ্রস্ত। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার অপসৃত হইল। পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়া মরীচিমালী গগনগর্ভে সমুদিত হইলেন। সবিতৃকিরণ পর্ব্বতসহ উপত্যকাভূমিকে স্বর্ণজলে বিধৌত করিয়া দিল এবং প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে আনন্দমর্ম্মর শ্রুত হইতে লাগিল। পুষ্পনাথ দেখিতেছিল, পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু সকল সূত্রভ্রষ্ট মৌক্তিকহারবৎ দোদুল্যমান রহিয়াছে। দেখিতেছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতির সে অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি তাহার চিত্তকে আজ সম্পূর্ণরূপ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাহার মন-প্রাণ তখন বিষয়ান্তরে নিমগ্ন ছিল। বাসন্তীর সুন্দর মুখখানি আজ কত দিন তাহার পিপাসী নেত্র দর্শন করে নাই।

বাসন্তী প্রভাতে সামান্য গৃহকর্ম্ম কয়টি সাঙ্গ করিয়া জননীর পূজাবকাশে বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক প্রকৃতির রূপরাশি দর্শন করিতেছিল, এবং মনে মনে গত জীবনের কথা ভাবিতেছিল। হৃদয় তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার আজ ব্যাকুল হইয়াছে।

গত রাত্রিতে যোধসিংহ অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছে; তদ্ভিন্ন পূর্ব্বকথা ভাবিলেই প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা চিত্তে যে স্বয়ংই জাগিয়া উঠে।

অকস্মাৎ সে দেখিল, অদূরে অশ্বারোহণে পুষ্পনাথ। বক্ষ তাহার আবেগে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুগভীর অভিমান জাগিয়া উঠিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "ছি ছি, তোর এতটুকু আত্মাভিমান নাই? একেবারেই কি ভুলিয়া গেলি যে, কাহার কন্যা তুই?"

পুষ্পনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বাসন্তীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তী শুধু একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ইঁহার শরীর ত কই রোগা—কৃশ নহে? ঠিক তেমনই সতেজ, তেমনি সুখ-পুষ্ট! মুখে শোকের ছায়ামাত্র নাই। সে তেমনই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। খেয়ালবশেই সে আসিয়া থাকে এবং তাহার না আসার কারণও আসার সহিত ঠিক সেই একই কারণপ্রসূত। পুষ্পনাথ তাহার মনের কথা বুঝিল, এতক্ষণ এই ভয়ই যে সে করিতেছিল। অদূরে অপর এক শিলাখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "রাগ করেছ, বাসন্তি?"

বাসন্তী বীরের মুখে সে স্বর শুনিয়া বিস্মিত হইলেও ক্রোধাভিমানের প্রভাবে নীরবে অপর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। না, কিছুতেই আজ নিজের মূল্য সে বিস্মৃত হইবে না।

পুষ্পনাথ আবার অতি কাতরস্বরে বলিল, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি বড় দুর্ব্বল, বারংবার নিজের চিত্তকে বশ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াও এবার দৃঢ়ভাবেই মনে করিয়াছিলাম যে,আর তোমার নিকটে আসিব না। তোমার মোহ আমায় জালের মত ঘিরিতেছে, ভাবিয়াছিলাম,আর এ মোহের সুবর্ণ-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না। দেখি, যদি তাহাতেই মুক্তি পাই। ভাবিয়াছিলাম, তোমার কাছে না আসিলেই বুঝি তোমায় ভুলিতে পারিব; এই এক পক্ষকাল আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি,অনেক কষ্ট পাইয়াছি,নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু তোমায় ভুলিতে পারি নাই। তোমার চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারি নাই। তোমায় ভুলিবার চেষ্টা করা আমার মহাভ্রান্তি! তোমায় এ জন্মে আর ভুলিতে পারিব না। শেষে ভাবিলাম, কেন আমি এমন করিয়া আত্মঘাতী হইতেছি? বাস্তবিক ত আমাদের মিলনে কোনই অন্তরায় নাই? তবে বল, বল বাসন্তি, কেন আমি তোমায় পাইব না?"

এ প্রস্তাবে সর্ব্বশরীর-মনে শিহরিয়া বাসন্তী প্রথমে লজ্জানম্র সুখ-বিহ্বল চিত্তে মুকুলিতনেত্রে রহিল। পরক্ষণেই পুষ্পনাথের পুনঃ প্রশ্নে সজাগ হইয়া উঠিয়া একবারেই আত্মসংযত শান্তস্বরে উত্তর করিল, "আমি যে কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছি, সে ব্রত পূর্ণ না হইলে ত বিবাহ করিব না —আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাসন্তী ইহারই পূর্ব্বরাত্রিতে এই সকল কথা লইয়াই তাহাদের পরম বন্ধু এবং একমাত্র অভিভাবক যোধসিংহের নিকট অত্যন্ত ভর্ৎসিত হইয়াছিল। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুকন্যাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না লইয়াই আপনার সুখে আত্ম-বিস্মৃত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই ভয় করিয়াই সে যে প্রথম দর্শনেই সুন্দর তরুণ পুরুষ পুষ্পনাথকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছে। বাসন্তী এবং রাণী,এমন কি, স্বয়ং মনকে বুঝাইতে চাহিলেও পুষ্পনাথ যে সুজনসিংহের গুপ্তচর ভিন্ন অপর কেহ,এ সন্দেহ বৃদ্ধের চিত্ত হইতে আজিও অন্তর্হিত হয় নাই। পূর্ব্বদিন যোধসিংহ সেই সব পুরাতন কথা তুলিয়া জয়সিংহের শেষ আদেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া বাসন্তীর মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। শুধু ইহাতেই সে সন্তুষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয়বার মৃত জয়সিংহের তরবারি স্পর্শ করাইয়া এই অসহায়া ক্ষুদ্রা নারীর দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে, সে পিতৃঘাতকের প্রতিশোধ না লইয়া নিজে বিবাহ-সুখসম্ভোগ করিবে না। সত্যই আজ আবার সেই সব অতীত চিত্রস্মরণে বাসন্তীরও হৃদয় প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যে স্মৃতি নিজের উদ্দাম যৌবনচাপল্য তাহাকে ভুলাইতে বসিয়াছিল, আবার তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে অনায়াসেই আজ উত্তর দান করিল,—"ব্রত পূর্ণ না হইলে বিবাহ হইবে না।"

"কিসের ব্রত? আমি শুনিতে পাই না কি, বাসন্তি! বলিতে বাধা আছে কি?"

বাসন্তীর উপরে যে কঠিন কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা বহিবার মত শক্তি সেই কুসুম-কোমলা বালিকাচিত্তে ছিল না। সে জন্মাবধি সুখ-লালিতা, সুকুমারী। বিশেষ নারী যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পূর্ণপ্রাণেই বিশ্বাস করে। বাসন্তী ভাবিল, পুষ্পনাথের নিকট কোন কথা গোপন না রাখিলেই বা ক্ষতি কি? এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইনি রাজকর্ম্মচারী, হয় ত এঁর কাছে কোন সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারে! এইরূপ ভাবিয়া সে উত্তর করিল,—"আমার ব্রত প্রতিশোধ!"

"প্রতিশোধ!" পুষ্পনাথ গভীর বিস্ময়ভরে নির্ব্বাক্ হইয়া প্রেম-পাত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। যাহাকে পুষ্প-কোমলা, প্রেম-প্রতিমা, আনন্দের ছবিখানি বলিয়াই এতদিন জানা ছিল, তার মুখে আজ এ কি অসঙ্গত, আশ্চর্য্য বাণী, এ যে প্রহেলিকা! সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, "তোমারও ঐ বিশুদ্ধ অন্তরে হীন ক্ষুদ্র প্রতিশোধ-স্পৃহা! সে কিসের প্রতিশোধ, বাসন্তি? সত্য কি তোমারও শত্রু এ জগতে থাকিতে পারে?"

"পিতৃহত্যার প্রতিশোধ।"

পুষ্পনাথ সহসা শিহরিয়া চমকিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া পরে ক্ষীণকণ্ঠে অতি ধীরে প্রশ্ন করিল, "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ! কে, কোন্ হতভাগ্য তোমার পিতৃহত্যাকারী?"

"সুজন সিংহ।"

স্তম্ভিত পুষ্পনাথের মুখ দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতই

বাহির হইয়া গেল,—"তুমি বাসন্তি—রাজা জয়সিংহের কন্যা কমলকুমারী তুমি ?"

বাসন্তী পুষ্পনাথের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "তোমার এ অনুমান যথার্থ। কিন্তু তোমার এ কি হইল ? অমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিলে কেন ? শরীর কি অসুস্থ হইতেছে ?"

"না না,—তবে"—কোন মতে শ্বাস টানিয়া ক্ষীণস্বরে যুবক আবার কহিল,—যেন কতকটা আত্মগতভাবেই কহিল, "তবে যে আমরা শুনিয়াছিলাম, রাণী উৎপলকুমারী এবং কমলকুমারী যমুনাজলে আত্মঘাতিনী হইয়াছেন।"

"তাহাদের মরণই বুঝি শ্রেয়ঃ ছিল, কিন্তু স্বামিহত্যাকারীর দণ্ড না দেখিয়া মহারাণী এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না লইয়া হতভাগী কমলকুমারী কেমন করিয়া মরিবে ? পামর সুজনসিংহের শোণিতে এখনও ত তাহার পিতৃতর্পণ সমাধা হয় নাই।"

পুষ্পনাথের পাণ্ডু-মুখ বিবর্ণতায় একেবারেই শোণিত-বিন্দুহীন শুভ্র হইয়া গেল।

এই ভীষণ আলোচনার পর কিছুক্ষণ কেহ আর কোন কথাই কহিল না। বহুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল। এ দিকে সূর্য্যদেব তাঁহার খরতর করজালে সমস্ত উপত্যকা-ভূমিকে প্রতপ্ত করিয়া তুলিলেন। বৃক্ষপত্রে শিশিরবিন্দু শুষ্ক হইল। বন্য পুষ্প স্থানে স্থানে ঝরিয়া পড়িল।

পুষ্পনাথ যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখে বিস্ময়, বিষাদ, ভয় কোন ভাবই আর প্রস্ফুট ছিল না। উঠিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই মুখের পানে স্থিরচক্ষে চাহিয়া পুষ্পনাথ গম্ভীর স্বরে কহিল, "রাজকন্যা কমল-কুমারি ! আমি তোমার ব্রতপালনের সহায় হইব। বল তুমি আমার হইবে ?"

বাসন্তীর বিশাল স্বচ্ছ নেত্রদৃষ্টিতে গভীর বিষাদের ঘন-ছায়া, দুঃখের মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তাহার পর কি আর আমি এ পৃথিবীতে জীবিত থাকিব ?"

"যদি থাক ?"

"ইহা অসম্ভব।"

"কোন অসম্ভবই কি জগতে সম্ভব হইবে না বাসন্তি ! বনবাসিনী ক্ষুদ্র বাসন্তী আমার এই যে মহামান্যা রাজকন্যা কমলকুমারীতে পরিবর্ত্তিতা হইয়া গেল, এও কি পুষ্পনাথের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল ? রাজকন্যার পক্ষে একজন সৈনিকের কণ্ঠে মাল্যদান-প্রতিজ্ঞা অবশ্য সম্মানের বা সুখের নহে, ইহাও জানি ; তথাপি তাঁহার চিত্ত যখন এই সৈনিকের অভিমুখী, তখন তাহাকেই গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করায় হয় ত তাঁহার আপত্তি নাও থাকিতে পারে, সেই ভরসায় এ অসঙ্গত প্রস্তাব করিতে পারিতেছি।"

বাধা দিয়া কমল কহিল, "যদিও পিতা কুমার করণ-সিংহকেই মনে মনে কন্যাদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর সে কথা স্মরণ করিলেও আমার মনে ক্লেশ বোধ হয়। যদি ব্রত পূর্ণ হয়, তবে জীবিত থাকিলে আমি—" কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

ঈষৎ হাসিয়া পুষ্পনাথ কহিল, "তুমি আমার হইবে ! আমিও এই অসিস্পর্শে শপথ করিতেছি, তোমার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ—"

সুগভীর বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া রাজকন্যা বাধা দিল, "বৃথা ও প্রতিজ্ঞা পুষ্পনাথ ! যে অভিশপ্ত জীবনে তুমি নিজেকে জড়িত করিতে চাহিতেছ, তাহার জীবন অত সরল নয়। যোধসিংহের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া যদি বাঁচিয়া থাকি ত বিবাহ করিব। তাহার বিশ্বাস, এ না হইলে আমার কর্ত্তব্যে বিষম বাধা পড়িবে। আর রাজকন্যার বিবাহের চিরন্তন রীতিও তাই। কোথাও লক্ষ্যভেদ, কোথাও অন্য কিছু। সাধারণ নারীর মত তাহারা এমন সহজে বিবাহ করিতে পারে কি ?" আবার সে তেমনই বুকফাটা হাসি হাসিল।

আবার পুষ্পনাথ ক্ষণকাল নীরব রহিল। পরে যেন সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া অতি সহজভাবেই কহিয়া গেল, "তবে তাহাই হউক বাসন্তি, ভাবিয়াছিলাম, ক্ষণিক স্বর্গসুখের পরিশেষে যমদণ্ড গ্রহণ করিব। নাই হউক, না হয় চিরদুঃখই আমার পরিণাম। বোধ করি, আমার এইরূপ হওয়াই উচিত।"

অর্থহীন এ প্রহেলিকা না বুঝিয়া বাসন্তী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাহারও চিত্ততলে গভীর বেদনা—ক্ষতের তীব্র জ্বালা। নারী সে, কেমন করিয়া তাহার প্রকৃতিদত্ত সমস্ত দানকে দর্পভরে ধূলিলাঞ্ছিত করিতে পারে ?

যোধসিংহ দূরে বসিয়া তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে

মনে জ্বলিতেছিল, এবং প্রভুহত্যার প্রতিশোধ লওয়া সম্বন্ধে একান্তই নিরাশ হইতেছিল।

পুষ্পনাথ তাহাকে সকল কথা বলিল। রাণীকেও সে প্রণাম করিয়া নিজের নিবেদন জ্ঞাপন করিল। কহিল, "যদি আপনার কার্য্যসাধনের পরক্ষণে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকি, তবে আমায় সেই সামান্যক্ষণের জন্যও বাসন্তী দান করিতে হইবে। আমিও যে বংশ-মর্য্যাদায় নিতান্তই হীন নহি, তাহাও আমি আপনার নিকট প্রমাণ করিব। দরিদ্র হইলেও রাজবংশে আমার জন্ম হইয়াছিল।"

সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল। পুষ্পনাথের অনুনয়ে যোধসিংহ রাণী ও রাজকন্যাকে কোনমতেই তাহার হাতে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল না। বৃদ্ধ সে, প্রায় চলচ্ছক্তি-হীন, তথাপি তাহার বাহু এখনও সম্পূর্ণ শক্তিহীন নহে। সে সঙ্গে যাইবে। প্রথমতঃ সুজনসিংহের চরের সহিত চন্দ্রগড় যাওয়াই তাহার অভিপ্রেত ছিল না। পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিল, "রাণীমা! পুষ্পনাথ নিশ্চয়ই সুজনসিংহের গুপ্তচর, তোমাদের এইরূপে চন্দ্রগড়ে লইয়া গিয়া বন্দী করিবে। চল মা, এখনও আমরা এ স্থান ছাড়িয়া পলাইয়া যাই।"

কিন্তু রাণী এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যে সেই উদার তরুণ ললাটে ও নির্ভীক সরল দৃষ্টিমধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

ক্ষুব্ধ যোধসিংহ নিয়তির জ্বলন্ত লিখন প্রত্যক্ষ করিয়া দংশিত অধরে নীরবেই রহিল।

যোধসিংহের অযুত বাধা না মানিয়া যথানির্দ্ধারিত দিনে চন্দ্রগড়ে যাত্রা করা হইল। অশ্বারোহী পুষ্পনাথের মুখমণ্ডল ধীর, গম্ভীর, আনন্দলেশশূন্য। হিমাদ্রির মতই তাহা অটল স্থির। যোধসিংহ মানস-চক্ষে দেখিতেছিল, রাণী ও রাজকুমারী বন্দী, পুষ্পনাথ প্রহরী এবং সিংহাসনোপবিষ্ট সুজনসিংহের ওষ্ঠে পৈশাচিক জয়ের হাসি। বাসন্তীর মনে সে দিন উত্তেজনার ঝড় বহিতেছিল।

অন্ধকারের ভিতর দিয়া কিছুক্ষণ যাইবার পর সহসা চন্দ্রগড় দুর্গের শত শত উজ্জ্বল উল্কা-আলোক নৈশাকাশে অসংখ্য তারকাদীপ্তির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। যোধসিংহ দুই হস্তে নয়নাবরণ করিল। রাণী সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পতনোন্মুখী হইলেন। পতঙ্গের ন্যায় বদ্ধদৃষ্টিতে কেবল কমলকুমারী সেই উল্কা-জ্বালার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, তাহারই চিতাশয্যা কে যেন ঐখানে, ঐ আলোকমণ্ডলার মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

বাসন্তীর মনেও পুষ্পনাথের প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ দেখা দিয়াছিল। সর্ব্বত্রই তাহার সম্মান, এমন কি, পুরদ্বার তাহার ইঙ্গিতমাত্র সেই গভীর নিশীথেও বিনা বাধায় মুক্ত হইয়া গেল। সে কে? কি তাহার উদ্দেশ্য? কিন্তু না, পুষ্পনাথ রাজার পার্শ্বচর, উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাহার এই সম্মান-প্রতিপত্তি এমন কিছুই বিস্ময়কর নহে! সে কি তাহার কাছে কখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে?

যোধসিংহ নীরবে অধর দংশন করিল,"হাঁ, চূড়ান্ত প্রতিশোধ বটে!"

গভীর বিষাদ ও নিরতিশয় বিস্ময়ের মধ্যে আজ চারি বৎসর পরে জয়সিংহের অনাথা কন্যা ও বিধবা পত্নী তাঁহাদের নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রকাণ্ড পুরী প্রায় জনহীনা। স্থানে স্থানে নির্ব্বাক রক্ষিবর্গ ব্যতীত অপর কেহ কোথাও নাই। সকলেই নতমস্তকে অসিস্পর্শে সম্মান জ্ঞাপন করিল। শোকে, হর্ষে ও বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত রাণী ও রাজকন্যাকে অবশেষে পুষ্পনাথ অন্তঃপুরসান্নিধ্যে—যে কক্ষে চারি বৎসর পূর্ব্বে জয়সিংহের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে লইয়া আসিল। কহিল, "মা! এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। কমলকুমারি, এইখানেই তোমার পিতৃতর্পণ সমাপ্ত করিতে পারিবে; অতি সামান্যমাত্র বিলম্ব সহ্য করিয়া থাক।"

পুষ্পনাথ চলিয়া গেল, এবং সামান্যক্ষণ পরে রাজ-পরিচ্ছদাবৃত এক তরুণ যুবা সেই দুঃখদাহভরা, ভীষণ স্মৃতি-পূর্ণ রাজকীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অভিবাদন জানাইল। পূর্ব্বকাণ্ডের এবং শত স্মৃতির এককালীন প্রত্যাবর্ত্তনবিপ্লবে যে শক্তি শরীর-মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরাবির্ভাবে ভয়ে ক্রোধে কম্পিতা হইয়া সক্রোধ-কণ্ঠে রাণী কহিলেন, "যোধসিংহের কথাই সত্য, নিজেকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিও। কমল, পুষ্পনাথ বিশ্বাসঘাতক। এ কি!—কে এ?"

কোষবিমুক্ত তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র অসি ঝন ঝন শব্দে স্খলিত হইয়া বাসন্তীর শিথিল মুষ্টি হইতে ভূমে পড়িয়া গেল। সে ক্ষণমাত্র স্তম্ভিত থাকিয়া প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "পুষ্পনাথ!"

পুষ্পনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল; শান্তকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, আমিই পুষ্পনাথ। রাজকন্তা! হউক পুষ্পনাথ, তাহাতে দ্বিধা করিবার প্রয়োজন নাই। এই পুষ্পনাথের জ্যেষ্ঠই তোমার পিতৃহন্তা। তিনি আজ পরলোকে, আমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, তাই তাঁহার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমিই এক্ষণে একমাত্র বাধ্য। এই লও তোমার তরবারি তুলিয়া দিতেছি, এই তোমার সাক্ষাতে মাথা পাতিয়া দিলাম, তোমার পিতৃতর্পণ সমাধা কর।"

"পরলোকগত পিতৃদেবকে পবিত্র কর" এই বলিয়া কমলকুমারীর হস্তচ্যুত অসি কুড়াইয়া দিয়া তাহার সম্মুখে নিজের বীরদেহ অবনত করিয়া দিয়া পুষ্পনাথ পুনশ্চ কহিল, "রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছি, রাত্রিশেষে সকলেই জানিবে, স্বর্গীয় জয়সিংহের বিধবা বহুদিন পরে নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাজকন্তার সিংহাসন আজ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক। প্রজাবৃন্দ সানন্দে তাহাদের প্রকৃত রাণীকে তাঁহার স্বীয় অধিকারে সংস্থাপন করিবে। সুখে থেকো বাসন্তী, চিরসুখী হয়ো,—এ বংশের পাপ যেন আমার রক্তেই ধৌত হইয়া যায়।—ভগবানের কাছে শুধু এই প্রার্থনা করি। তবে আর বিলম্ব কি?"

-- আবার বাসন্তীর অবাধ্য মুষ্টি-বিচ্যুত তরবারি ভূমি স্পর্শ করিল। রাণী পাষাণ-প্রতিমাবৎ অচলা হইয়া রহিলেন।

ধীরে—অতি ধীরে এক পঙ্গুপ্রায় বৃদ্ধ সেই শব্দশূন্য, ক্রিয়াশূন্য কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইল। কম্পিত শ্লথ-হস্তে কমলকুমারীর শীতল ঘর্ম্মপরিপ্লুত হস্ত ধরিয়া কোনমতে সে আবার পুষ্পনাথের দক্ষিণপাণি গ্রহণ করিল। বাষ্প-বেগে রুদ্ধপ্রায় গদগদ স্বরে সে কহিল, "করুণসিংহ! চোহানবীর! আমার প্রভুহন্তা আজ ভগবানের রাজ্যে। সেখানে তিনি তাহার ন্যায়বিচার নিশ্চয়ই এতদিন সমাধা করিয়াছেন। তোমার সঙ্গে আমাদের কোনই শত্রুতা নাই। এই আমার সোনার কমল আমি তোমায় দিলাম। মহারাণি! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

রাণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পুরাতন ভৃত্যের আজ্ঞা পালন করিলেন। তখন অশ্রুজলে ভিজিয়া বৃদ্ধ কহিল,—"মহারাজ করুণসিংহ! আমার রাজার—আমার প্রভুরও ইহা অভিপ্রেত ছিল। প্রভু! দেবতা আমার! তুমি এইবার প্রসন্ন হইয়াছ ত?"

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

তেত্রিশ কোটি।

মন্ত্রস্তব্ধ, জড়, কণ্ঠরুদ্ধ,
তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ!

পুণ্যস্মৃতি সেই আর্য্যাবর্ত্ত
গ্রাসে গহন ভীম কাল-আবর্ত্ত!
বেদঘোষ ওঙ্কার ধ্বনিতে
বীরহস্ত-টঙ্কার স্বনিতে
কর হে কর পুনঃ দশদিশি ক্ষুব্ধ।
তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ!

তেজোধাম সেই ভারতবর্ষ
নাশে মূঢ়তা, বৃথা সংঘর্ষ!
ক্ষত্রিয়ে-বৈশ্যে-ব্রাহ্মণে-শূদ্রে
ধনি-নির্ধনে মিলে, বৃহতে-ক্ষুদ্রে

মানবী-প্রেমে উজ্জ্বল উদ্ধ,
তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ!

কার্য্য ভূমি সেই হিন্দুস্থান
উপবাসে করে মৃত্যু-প্রয়াণ!
বহু মত শরণ, বিশাল ক্রোড়
হতমান, নিপতিত দাস্যে ঘোর।
মুক্ত করহ, ছাড় ভাই-ভাই-যুদ্ধ,
তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ!

শ্রীসরলা দেবী।

শিক্ষায় স্বাবলম্বন।

এখন বাঙ্গালায় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে সরকার হইতে একটা পৃথক জিনিষ বুঝায় না, কেন না, লর্ড কার্জ্জন যে আইন আঁটিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গে সরকারের ইস্পাতের বন্ধন আঁটিয়া বসিয়াছে—সে বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। তবে হয় ত সরকার নেকনজর করিয়া বা ছিটাফোঁটা দয়া দেখাইয়া সেই নাগপাশের বন্ধন কখনও কচিৎ একটু আধটু শিথিল করিয়া দেন, তাই সেই সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া লয়।

এমন একটু বন্ধন শিথিল হইয়াছিল বলিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথার উপর এক জন শক্তিশালী কর্ম্মী পুরুষ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দিনকতক বিশ্ববিদ্যালয়টা যেন আমাদের নিজস্ব বলিয়া কাহারও কাহারও অনুমান হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বাঙ্গালী, সিনেটে বাঙ্গালী, সিণ্ডিকেটে বাঙ্গালী, সর্ব্বত্র বাঙ্গালী, কেবল হেথা সেথা নৈবেদ্যের সন্দেশের মত দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ; কাযেই নিজস্ব বলিয়া মনে করা বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। কর্ণধার যেন একমেবাদ্বিতীয়ম্—যাহা করেন, তাহাই হয়। তিনি যেন "বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে," তাই দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহারও মনে হয় নাই যে, এক দিন এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিবে।

যখন অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বাঙ্গালীর ছেলেকে বুঝাইয়াছিলেন, "বাপু! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছ, এই ত তোমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তোমাদের দেশের লোকরাই সব, তাহাদেরই প্রাধান্য। তবে গোলামী শিক্ষার ভয়ে ইহার সঙ্গ ছাড়িতে চাও কেন?" সেই সময়ে তাঁহার মত মনীষী শক্তিশালী কর্ণধার দৃঢ়রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণ ধারণ করিয়া না দাঁড়াইলে আজ তাহার ভিত্তির চিহ্ন দেখা যাইত কি না, বলা যায় না।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গিতে অধিক দিন লাগিল না। দেশের ছেলেকে পুঁথিগত বিদ্যার উপরে কিছু শিখাইবার আশায়—কেবল কেরাণী উকীল গড়িবার উপরে, আরও কিছু গড়িবার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার অনেক টাকা ফেলিয়া নানা বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গে জুড়িয়া দেন। উহাতে ও অন্যান্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বহর বৃদ্ধি পাইল। শেষে অবস্থা এমন হইল যে, শিক্ষক বেতন পায় না, পরীক্ষক পারিশ্রমিক পায় না। তখন ইস্পাতের কাঠামোর আল্‌গা বাঁধন একটু কসিয়া বসিল। সরকার আইনের জোরে এমন বে-বন্দোবস্তের কৈফিয়ৎ চাহিলেন, পরন্তু ঋণ পরিশোধের আংশিক ভার গ্রহণ করিবার অভিলাষ জানাইয়া হিসাব চাহিলেন। গোলামখানার গোলামীর অস্থিপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িল।

বোধ হয়, অস্থিপঞ্জর বলাটা লেফাফাদোরস্ত হয় নাই, কেন না, বিশ্ববিদ্যালয় যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে হৃষ্টপুষ্ট হইলেও উহার গলদেশে বগলসের দাগ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম আমলে সদর্পে দেশের লোককে বলিয়াছিলেন,—"এই ত তোমাদের স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইহার অধিক কি চাও?" আর আজ? আজ তিনিও এই স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গলদেশে বগলসের দাগ কাটিয়া বসিতে দেখিয়া সখেদে বলিয়াছেন,—"এ দাসত্ব চাহি না, আমরা দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব, তবু দাসত্বের বিনিময়ে সরকারের খয়রাতি লইব না।"

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার মত মনীষী চিন্তাশীল পুরুষ বুঝিতে পারিবেন, এ দাগ মুছিবার নহে, এ বন্ধন ঘুচিবার নহে। শত বার দেশবাসীর দ্বারস্থ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়, যাহা তাহা থাকিবেই। যাহার জন্মে গোলামীর ছাপ দাগিয়া দেওয়া আছে, তাহার জন্ম ঘুচাইয়া পুনর্জ্জন্ম না দিলে ছাপ যাইবার নহে।

স্বাবলম্বন বড় ছোট কথা নহে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাবলম্বী হয়, ইহা কাহার ইচ্ছা নহে? তবে যে ইস্পাতের আইনে বিশ্ববিদ্যালয় বাঁধা, সে আইন থাকিতে স্বাবলম্বনের আশা দুরাশা। এই জন্যই দেশের লোক স্যর আশুতোষকে

দেশের কোলে ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিল। না হয় নাই হইত প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। আমাদের দেশে ত পূর্ব্বে গাছতলায় বিদ্যাদান আদর্শ ছিল। আমরা কোটা-বালাখানা চাই না, আমাদের খড়ের চণ্ডীমণ্ডপই ভাল। আর কোটা-বালাখানায় বিদ্যা হয়, চণ্ডীমণ্ডপে হয় না, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তাই বোলপুরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর সবরমতী আশ্রম বা গুর্জ্জর বিদ্যাপীঠ এই আদর্শেই গড়িয়া তুলা হইতেছে। 'সার্ভাণ্ট'-সম্পাদক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের চট্টগ্রাম সারস্বত আশ্রমের আদর্শ তাহাই। আবার ফরাসী মনীষী পল রিচার্ড সিন্ধু করাচীতে এই আদর্শে শিক্ষার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের গুরুকুল এবং মিসেস বেশাণ্ট ও অধ্যাপক এরান্‌ডেলের এডায়ার শিক্ষানুষ্ঠানও এই প্রকৃতির।

ধরিয়া লওয়া গেল, এই ভাবে এ দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা হইবে। সঙ্কল্প যদি এইরূপ হয়, তবে ছোটখাটোভাবে সার আশুতোষ কি এ দেশে জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না? তৈয়ারী জিনিষ ফলাও করিতে অধিক মেধা ও আয়াসের প্রয়োজন হয় না। সার আশুতোষের ন্যায় অসাধারণ মেধাবী গঠনদক্ষ শক্তিশালী পুরুষের কাছে দেশ কি ও কতটা আশা করিতে পারে? তিনি যদি এই নূতন জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, তবে উহা গড়িয়া উঠিতে কত বিলম্ব হয়?

দেশের লোক যে নবভাবে ভরপুর হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ শিক্ষা চাহে। যে শিক্ষায় মানুষ গড়িয়া উঠে, যাহার দ্বারা ছাত্রজীবনের প্রথম উষালোকের সঙ্গে স্বাবলম্বনবৃত্তি জাগিয়া উঠে, সেই শিক্ষাই এখন দেশের লোকের কাম্য হইয়াছে। এমন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ স্বাধীন দেশে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের নূতন লীলাক্ষেত্র মার্কিণ দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী। আমরা বলিতেছি না যে, বিজাতীয় বিদেশীয় আদর্শটিকে পূর্ণাঙ্গে আমাদের জাতীয় ছাত্রজীবনগঠনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তবে যাহা ভাল, যাহা মুক্তিকামী জাতির জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহার আদর্শ সকল দেশে সকল সমাজেই ভাল। আমাদের কথা, মার্কিণের সেই "ভাল"র আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমাদের সনাতন ভাবধারার সহিত উহার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া আমাদের ছাত্রজীবনের স্বাবলম্বন শিক্ষাকে এই অভিনব জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সার আশুতোষ যদি সেই ব্রত উদ্‌যাপনে প্রধান হোতারূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমাদের আশা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সুদূরপরাহত হইবে না।

মার্কিণের আদর্শ।

মার্কিণ দেশের স্বাবলম্বন-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একটু পরিচয় দিই। ইলিনয়, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের একটি অংশ—আমাদের দেশের জিলারই অনুরূপ। তথায় কার্লিনভিল নামক স্থানে ব্ল্যাকবার্ণ একটি অভিনব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইহার ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণরূপে self-starters and self-helpers অর্থাৎ প্রথম হইতেই নিজ-জীবনযাত্রা চালাইবার ও স্বাবলম্বনবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই শিক্ষানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য to place higher education within reach of those who cannot afford to get it elsewhere but are determined tc have it at any cost of effort, অর্থাৎ যাহারা মানুষের যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প অথচ অর্থাভাবে উহা অন্যত্র প্রাপ্ত হইবার সুবিধা ও সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কালেজের ছাত্র ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা কালেজ-সংক্রান্ত কোনও কাযের জন্য একটি পয়সা খরচ করা হয় না। বোলপুর বিশ্বভারতীতেও এই ভাবে ছাত্রগণকে কর্ম্মদক্ষ করা হয় বলিয়া শুনিয়াছি। ত্রিবেণীর নিকটে 'উত্তমাশ্রমে'ও দেখিয়াছি, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরাই আশ্রমের সকল কায নিজেরা করিয়া থাকেন। গোপালন, গোদোহন, ফলফুল ও শাকসব্জীর বাগানের পাট ও পুষ্টিসাধন, রন্ধন, রোগ-সেবা, আহার্য্যাহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য ব্রহ্মচারীদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সে বড় সুন্দর ব্যবস্থা। উহাতে কেহই কায়িক শ্রমকে ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না; সকলেই প্রফুল্লচিত্তে কার্য্য সম্পন্ন করে। ব্ল্যাকবার্ণেও ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রফুল্লচিত্তে

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করে। কালেজের পাঠাগার পর্য্যবেক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালেজের কামরা বারান্দা ইত্যাদি ঘষামাজা ধোওয়া পর্য্যন্ত সকল কাযই ছাত্র ও ছাত্রীরা করিয়া থাকে। আগাগোড়া সকল কাযেই ইহার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাবলম্বনবৃত্তিতে শিক্ষা দেওয়া ও অভ্যস্ত করা হয়।

আবার বিশেষ লক্ষ্য করিবার এইটুকু যে, ছাত্র-ছাত্রীরা যে কেবল কায করে, তাহাই নহে; তাহারা নিজেরাই কাযের ধারা ও পদ্ধতি বাঁধিয়া দেয়। কালেজে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ১ শত ৫০; কিন্তু ছেলেরা এমনই সুবন্দোবস্ত করিয়াছে যে, এই ১ শত ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারাই (১) ১৬০ একর (৩ বিঘায় ১ একর) জমীর চাষ, (২) দুগ্ধ-মাখন-পনীরাদির জন্য গবাদি পশু পালন ও দোহন এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহার অপেক্ষা মানুষ গড়িবার আর কি উৎকৃষ্ট উপায় হইতে পারে, জানি না। এই যে আত্মনির্ভরশীলতা, এই যে আপনার শক্তিতে বিশ্বাস, এই যে কাযে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি, ইহাতেই মুক্তিপ্রয়াসী জাতি গঠনের বীজ নিহিত থাকে।

কালেজের আইন-কানুন।

ব্ল্যাকবার্ণ কালেজে থাকিবার ও লিখাপড়া শিখিবার ১ বৎসরের খরচ ৫৭৫ ডলার মার্কিণ মুদ্রা। [এখন ৪·৪৬ ডলার ইংরাজী ১ পাউণ্ড মুদ্রার সমতুল। ইংরাজী ১ পাউণ্ড মুদ্রা আমাদের ১৫্ টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ ডলারের দাম আমাদের ৩৷৴০ আনা ছিল।] প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ কালেজের কাযের জন্য আড়াই ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়;

ছাত্রীরা পোষাক প্রস্তুত করিতেছে।

দুগ্ধজ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ, (৩) নিজেদের বস্ত্রাদি সীবন ও প্রস্তুতকরণ, (৪) বস্ত্র পরিস্কৃতকরণ, (৫) রুটী প্রস্তুতকরণ, (৬) রন্ধন, (৭) আহার্য্য পরিবেশন, (৮) রোগীর সেবা ও পরিচর্য্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়।

এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিবার ও করাইবার ভার আছে এক কমিটীর উপর; কমিটীর ৪ জন সদস্য—সকলেই ছাত্র, ২টি ছাত্র ও ২টি ছাত্রী। যাহারা এই কমিটীতে পালাক্রমে নির্ব্বাচিত হয়, তাহারা কিছুদিন কায করিবার পর নিজেরাই বলে,—"এই ভাবে কায করিয়া আমরা শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবার এবং কায করার কৌশল আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত উদার ঐ পরিশ্রমের বিনিময়ে ৫ শত ৭৫ ডলার হইতে ১ শত ৮ ডলার বাদ যায়। পরিশ্রম ছাড়া ছাত্রকে বৎসরে ১৬০ ডলার দিতে হয়। তাহা হইলে ছাত্রের বৎসরে দেয় হইল পরিশ্রমের দরুণ ১ শত ৮ ডলার আর নগদ ১ শত ৬০ ডলার একুনে ২ শত ৬৮ ডলার। ৫ শত ৭৫ ডলার হইতে এই ২ শত ৬৮ ডলার বাদ দিলে ৩ শত ৭ ডলার অবশিষ্ট থাকে। এ টাকাটা কোথা হইতে সরবরাহ হয়? ঐ টাকাটা কালেজের endowment fund অর্থাৎ দানবাবদ গচ্ছিত টাকার আয় হইতে এবং কালেজের চাষ আবাদ ও খেলা-ধুলার দর্শনীর আয় হইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু এমন ছাত্র-ছাত্রীও আছে, যাহারা বৎসরে শিক্ষা ও খাইখরচা বাবদে ঐ ১ শত ৬০ ডলার মুদ্রাও দিতে পারে

না। তাহাদের কি উপায় হয়? স্থান থাকিলে অতি আগ্রহান্বিত ছাত্র বা ছাত্রীকে কালেজে অতিরিক্ত কায দিয়া ঐ টাকা উসুল করিয়া লওয়া হয়। মজা এইটুকু, সেই অতিরিক্ত কাযের দরুণ ২॥০ ঘণ্টার নিয়মিত কায ছাড়া ছাত্র বা ছাত্রীর পাঠের বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়, এমন ভাবে কায দেওয়া হয়।

কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা।

যে সব ছাত্র ও ছাত্রী গোদোহন করে, তাহাদিগকে রাত্রি ৪টার সময় উঠিতে হয়। যাহারা গবাদি পশুকে আহার্য্য ও সেবা দান করে, তাহারা ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শয্যা ত্যাগ করে। ভোর ৫টার সময় প্রাতরাশের উদ্যোগকারীদিগকে উঠিতে হয়। ঠিক ৬॥০টার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাতরাশ সেবনে উপবেশন করে। প্রাতরাশের ব্যবস্থা,— দাইল, দুগ্ধ, টোষ্টরুটী, কোকো বা কাফি। তবে কচিৎ কখনও গরম বিস্কুট বা গরম কেক এই সঙ্গে দেওয়া হয়। ঠিক ৭॥০টার সময় ক্লাস বসে এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে।

ছাত্রেরা কায করিতেছে।

বেলা ১২টার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের 'বামুন-রাঁধুনী' ছাত্র-ছাত্রী বেলা ৯॥০টার সময়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করে। সান্ধ্য-ভোজনের রসুইয়ারা বেলা ৩॥০টার সময়ে রাঁধিতে আরম্ভ করে এবং ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় আহার্য্য পরিবেশন করে।

প্রত্যেক দিনের ভোজনে ছাত্র বা ছাত্রীর কত পড়ে? মার্কিণের মত দেশেও লোক প্রতি ইহাতে ১৩ সেণ্টের অধিক পড়ে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে ২ সেণ্ট ইংরাজী ১ পেনির তুল্য-মূল্য ছিল, এখন কিছু কম। ১ পেনি আমাদের এক আনার সমান। ইহাতে বহু মার্কিণ গৃহস্থের গৃহিণী ও অন্য কালেজের মেসের ম্যানেজাররা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ইহাতে কিছুই নাই, কেন না, ব্ল্যাকবার্ণের রন্ধনশালায় "ভাড়াটে" লোক নাই, বেতন হিসাবে কাহাকেও কিছু দিতে হয় না, পরন্তু "বাজার" করার "উপরিটাও" মারা যায় না। এই ভাবে বাল্যকাল হইতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগের "বুঝিয়া সুঝিয়া" সংসার করার প্রবৃত্তি অভ্যস্ত হয়। ব্ল্যাকবার্ণের দ্রৌপদী (হেড কুক) ১৭ বৎসরের বালিকা; তাহার অধীনে আরও ২টি বালিকা ও ১টি বালক রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করে, উহাদেরও বয়স ১৬।১৭ বৎসরের অধিক নহে। প্রতীচ্যে কয়জন জননী ১৬।১৭ বৎসরের পুত্রকন্যাকে পাকশালায় পশিতে দেন? এই অল্পবয়স হইতে ব্ল্যাকবার্ণের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে অভ্যস্ত হইয়া পরিণামে সংসার-সংগ্রামে ভয়ে দিশাহারা হয় না।

যাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীদের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে অথবা স্বাবলম্বনবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কায ব্ল্যাকবার্ণে কখনও করা হয় না। এই ভাবে শিক্ষিত হইয়া তাহাদের এমন স্বভাব হইয়া যায় যে, তাহারা পিতামাতার নিকট হইতেও শিক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যয় লইতে কুণ্ঠিত হয়, যতটা সম্ভব নিজের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের ব্যয়ভার বহন করিতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা প্রথমাবধি বুঝিতে শিখে যে, তাহারাও মানুষ, পুতুল নহে, তাহারাও দেশের কোনও না কোনও কায সম্পন্ন করিবার জন্য দায়ী। ইহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্ব, জাতীয়তাগর্ব্ব ও স্বদেশপ্রেমের বীজ।

আমাদের কথা।

এখন কথা হইতেছে, এই আদর্শে আমাদের সনাতন ভাবধারার মধ্য দিয়া যদি আমরা নূতন করিয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান গড়িয়া তুলি, তাহা হইলে সফলকাম

হইবে কি না। প্রথম পত্তনে অনেক বাধা-বিঘ্ন জুটিতে পারে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু একটা বড় কাযের প্রথম সূত্রপাতে এমন বাধা-বিঘ্ন ঘটিয়াই থাকে। তাহা বলিয়া বড় কায ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখাও উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না। দেশে সম্প্রতি অনুকূল বাতাস বহিয়াছে, সে বাতাসে কর্ম্মতরণীর পাইল তুলিয়া তরণী ভাসাইয়া দেওয়া অযুক্তি-সঙ্গত নহে। এক ভয়, উপযুক্ত কর্ণধারের। কিন্তু সে ভয়ও আমাদের নাই। মানুষের অভাব হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কাঁচিয়া গণ্ডুষ করিতে হইলে যে উপকরণের প্রয়োজন, তাহা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? কিন্তু যে দেশে তারকনাথ রাসবিহারীর মত জাতির উপকারক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে উপকরণের অভাব হইবে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দেশবাসীর দ্বারস্থ হইয়া কি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন?

ব্ল্যাকবার্ণ কালেজের "দানের গচ্ছিত অর্থ" Endowments কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল? উহাও ত এক দিনে সংগৃহীত হয় নাই। ব্ল্যাকবার্ণের জন্ম ও পুষ্টির ইতিহাস উপন্যাসের ঘটনাবলীর মত মনোরম।

এই কালেজের—এই মানব-হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টের নাম উইলিয়াম হাডসন। মার্কিণের পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চলের এক ছোট সহরে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। হাডসনের বিধবা জননীর অবস্থা বিশেষ অসচ্ছল ছিল না, অথচ কিশোর হাডসনের কালেজে পাঠের প্রবল পিপাসা নিবৃত্তির উপায় ছিল না। শেষে এক ধনী নিকটাত্মীয়ের কৃপায় তিনি কালেজের পাঠ শেষ করিয়া স্বয়ং প্রিন্সটন কালেজের প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার বড় আশা ছিল, যাহারা উচ্চ-শিক্ষাপিপাসু, অথচ সুবিধা অভাবে উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের জন্য প্রিন্সটন কালেজের দ্বার উন্মোচন করা। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইয়া ৫ বৎসর পরে প্রেসিডেণ্ট পদে ইস্তফা দিয়া তিনি তাঁহার পৈতৃক কৃষিক্ষেত্রে কায করিতে গেলেন। তিনি ভাবিলেন, এই স্থানেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হইল।

ব্ল্যাকবার্ণের অধ্যক্ষ মিষ্টার হাডসন।

কিন্তু তাঁহার ন্যায় উদার-হৃদয় কি সামান্য কৃষিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে? ডাক আসিল, তাঁহাকে ইলিনয় অঞ্চলের ব্ল্যাকবার্ণ কালেজের প্রেসিডেণ্ট পদে বসিতে হইবে। তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ডাকে কে যেন সাড়া দিল।

ব্ল্যাকবার্ণ কালেজের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন, উহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়—ছাত্রসংখ্যা অল্প, নিকটবর্ত্তী স্থানের জন কয়েক ছাত্রই উহার সম্বল; আবার কালেজের গৃহগুলিও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তবে নিরাশার মধ্যে এক আশা,—কালেজের সংলগ্ন অতি উর্ব্বর ৮০ একর চাষের জমী। ডাক্তার হাডসন গড়িবার মাটী পাইলেন, তাঁহার হাতে 'ঠাকুর' গড়িয়া উঠিতে কয় দিন লাগে?

কালেজের ট্রাষ্টীদিগকে ডাকিয়া ডাক্তার হাডসন

বলিলেন,—"আপনাদের এই ভাঙ্গা বাড়ী আছে; এক লক্ষ ডলার এনডাউমেণ্ট (গচ্ছিত টাকা) আছে, ৮০ একর কৃষি-ক্ষেত্র আছে; পরন্তু আপনাদিগকে সরকারী খাজনা দিতে হয় না, দানপত্রে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিষ্কর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আপনারা যদি আমার পরামর্শ অনুসারে শ্রমের বিনিময়ে শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী কালেজে লইয়া শিক্ষাদান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি ইহাকে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারি।" ট্রাষ্টীদের উপায়ান্তর ছিল না, কাযেই তাঁহারা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

প্রথমেই ডাক্তার হাডসন ২৫ হাজার ডলার খরচ করিয়া গৃহের জীর্ণসংস্কার করাইলেন ও কিছু নূতন অদল-বদল করাইলেন। তাহার পর তাঁহার সত্তানুসারে ছাত্র-ছাত্রীর আবেদনপত্র আহ্বান করিলেন। ডাক্তার হাডসন বলেন, প্রথম প্রথম তাঁহার আশঙ্কায় নিদ্রা হইত না,—হয় ত একখানিও আবেদন আসিবে না। যাহা হউক, প্রথম বৎসরে ৮০ জন ছাত্র হইল এবং দ্বিতীয় বৎসরে (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) কালেজের স্থান ভরিয়া গেল—শেষে এমন হইল যে, আবেদনের ভারে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

টাকার যোগাড়।

ইহার পর ডাক্তার হাডসন কালেজের উন্নতিবিধানের জন্য টাকার যোগাড়ে মনোযোগ দিলেন। এই স্থানে তাঁহার নিজের বর্ণনাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"প্রথমে আমি এক বন্ধুর কাছে গেলাম। আমার কালেজের কাযে বন্ধুটির বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিলেন,—আমি যদি অন্যত্র ২০ হাজার ডলার সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তিনি স্বয়ং ৫ হাজার ডলার দিবেন। তখন আমি আর এক বন্ধুর নিকট ১ হাজার ডলার ভিক্ষা চাহিলাম। ক্রমে ২৫ হাজার ডলার যোগাড় হইলে আমি সেই ধনী বন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি আবার বলিলেন,—আমি যদি আরও অতিরিক্ত ৪০ হাজার ডলার সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং ১০ হাজার ডলার দিবেন। আমি আঁধার দেখিলাম। ৪০ হাজার ডলার! অসম্ভব! যাহা হউক, হাল ছাড়িলাম না। আর এক বন্ধুর দ্বারে হাজির হইলাম, তিনি তখন বহুদূরে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন,—তিনি আমার কালেজে ৫০ হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত; তবে আমি যদি ৭৫ হাজার ডলার অন্যত্র তুলিতে পারি, তাহা হইলে তিনি ২৫ হাজার ডলার দিবেন, আর আমি যদি দেড় লক্ষ ডলার অন্যত্র সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি ৫০ হাজার ডলার দিবেন। আমার এখন বলিতে লজ্জা করে, তখন আমি এই কথা শুনিয়া কিরূপ হতাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি জিবসন সহরের এক দম্পতীর নিকট ৪০ হাজার ডলার মূল্যের ৮ শত ৪০ একর জমী পাইলাম। এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আমার দশ হাজার ডলার দান করিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী আমি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, দেড় লক্ষ ডলার অন্যত্র তুলিব। কায আরম্ভ করিবার পূর্ব্বদিনেই আমি ৫০ হাজার ডলার পাইলাম। আরম্ভের দিন প্রাতঃকালে আর এক বন্ধু আমায় পত্রযোগে ১৫ হাজার ডলার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। আবার ঐ রাত্রিতেই সিকাগো নগরস্থ আমার কালেজের এক দর্শক (visitor) কালেজ পরিদর্শনে আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ১০ হাজার ডলার দিলেন। ১লা জুলাই দেড় লক্ষ ডলার পূর্ণ করিবার শেষ দিন। সুতরাং জুন মাসটা উঠিয়া পড়িয়া কাযে লাগিলাম। কিন্তু যতই চেষ্টা করি, ১ লক্ষ ডলারের উপরে আর ১ ডলারও পাই না। ১লা জুলাই রাত্রি দশটার সময় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হে, টাকা উঠিল? আমি বলিলাম,—না এখনও সবটা উঠে নাই, তবে রাত্রি ১২টার মধ্যে তুলিব। ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে বহু দূরে দূরে টেলিফোঁযোগে বড় বড় বন্ধু লোকের কাছে ভিক্ষা করিতে লাগিলাম, বিধাতার কৃপায় ৫০ হাজার ডলার পূরিয়া গেল। বন্ধু কথামত পরে ৫০ হাজার ডলার দান করিলেন। এইরূপে আমাদের কালেজের তহবিলে দানের গচ্ছিত ধন একুনে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ডলারে উঠিল। ইহার পর আমরা সাধারণের নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিলাম।"

দানের প্রবৃত্তি কতকটা সংক্রামক ব্যাধির মত। একবার দান আরম্ভ হইলে বর্ষার বারিধারার মত অর্থ বর্ষণ আরম্ভ হয়। শুধু অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবার মানুষ চাই। বলিয়া দিতে হইবে না, সেই মানুষের আমাদের অভাব নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
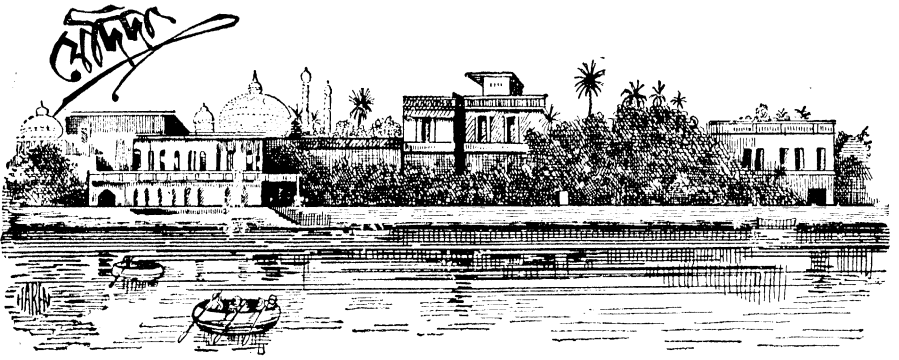
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাই—নাই—নাই।

জীবনে আর কোন আকর্ষণ নাই—হৃদয়ে আর কোন আশা নাই—বিষয়ে আর কোন স্পৃহা নাই। রুথ নাই; যে জীবনের আনন্দ, নয়নের আলো, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, সেই রুথ নাই—নিষ্ঠুর—পিশাচ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। সে যে ফুলের অপেক্ষাও কোমল; তবুও ফুলেরই মত সে মুক্তিলাভের আশা-বৃন্তে ভর করিয়া বাঁচিয়াছিল। সে আশাবৃন্তচ্যুত হইয়া সে আপনিই শুকাইয়া যাইত। কিন্তু নিষ্ঠুর আমীরের সেটুকু বিলম্বও সহে নাই; তাই সে রুথকে হত্যা করিয়াছে। এখন আমীর যদি তাহাকে হত্যা করে, তাহাতেই বা দুঃখ কি?

কিন্তু দায়ুদ এই কথা মনে করিলেই তাহার বুকের মধ্যে অতৃপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তি গর্জ্জিয়া উঠিল—না—না—না। তাহার মরা হইবে না। রুথের হত্যার প্রতিশোধ লইতে হইবে। যে রুথকে তাহার পাপ প্রবৃত্তির পরিচর্য্যার জন্য তাহার পিতার অঙ্ক হইতে—স্বামীর আলিঙ্গন হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাহার পর তাহাকে পাপপথের পথিক করিতে না পারিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহার পাপের প্রতিশোধ দিতে হইবে। মরুভূমির বাত্যা যেমন সম্মুখে যাহা পায়, উড়াইয়া লইয়া যায়—এই প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তি তেমনই দায়ুদের আর সব চিন্তা উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সে যখন মনে করিতে গেল—পাপীর শাস্তি ভগবান্ দিবেন, তখনই তাহার মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—ভগবান্ মানুষকে দিয়াই নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করান।

তখন রুথের অপহরণব্যাপার নূতন করিয়া দায়ুদের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, সে দিন রুথ যখন কাতরভাবে তাহাকে বলিয়াছিল, "দায়ুদ, আমাকে হত্যা কর"—তখন সে পিস্তল বাহির করিয়া আবার খাপে পুরিয়াছিল—বলিয়াছিল, "তুমি মরিলে ত সব শেষ। তুমি বাঁচিয়া থাক—বক্ষে এই কণ্টক লইয়া আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। তোমার উদ্ধারসাধন, আর এই পিশাচের নিপাত, আমার জীবনের ব্রত হইল। ভয় করিও না—এ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।" সে কি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল? রুথের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে সে ত তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইত—পিশাচ আমীর আজীজের নিধনসাধন হইত না। তাই কি তাহার এই শাস্তি? কিন্তু এ শাস্তি কি কঠোর! রুথ মরিয়াছে; কিন্তু আমীরের ত কিছুই হয় নাই। দায়ুদের সঙ্কল্প দৃঢ় হইল, সে মরিবে না—প্রতিশোধ লইবে।

যখন বাঁচিবার সঙ্কল্প স্থির হইল, তখন দায়ুদ নূতন করিয়া ভাবিতে বসিল। আমীর আজীজ তাহার অনিষ্টচেষ্টা করিতে পারে; কাজেই তাহাকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় আজই অন্য হোটেলে যাইতে হইবে—তাহার পর বাগদাদ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই নিরাপদ স্থানে যাওয়া যায় না—যে বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে পারস্যোপসাগরে যাইলে, তবে অন্যত্র—অন্য রাজার অধিকারে যাওয়া যায়—সে কোম্পানীর জাহাজ প্রতিদিন চলে না; সে

জাহাজের জন্য হয় ত দুই চারি দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। একমাত্র উপায়, আত্মগোপন করিয়া আরবদিগের সাধারণ নৌকা বাগলায় আবাদানে পৌছান। অ্যাংলো-পার্সিয়ান্ অয়েল কোম্পানী পারসী ইরাকে তৈলের খনি পাইয়াছেন; খনি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম আওয়াজ; তথা হইতে নলে অপরিষ্কৃত তৈল, সেতল-আরব নদীর কূলে এই আবাদানে আনিয়া তথায় পরিষ্কার করা হয়। আবাদানে য়ুরোপীয় উপনিবেশ আছে—তথায় ইংরাজের প্রাধান্য—দায়ুদ ইংরাজী ভালরূপই জানে। একবার আবাদানে পৌছিতে পারিলেই সে নিরাপদ হইবে এবং পরে তথা হইতে পারস্যোপসাগরের পথে বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

চিন্তার সূত্র যেন আর ছিন্ন হয় না- দায়ুদ ভাবিতে লাগিল। বোম্বাইয়ে পৌছিয়া সে রুথের পিতার কাছে রুথের মৃত্যুসংবাদ দিবে না; সে সংবাদ শুনিলে তিনি আর বাঁচিবেন না। আবার রুথের সন্ধানে যাইতেছে বলিয়া সে তুর্কীর রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইবে। সে তরুণ-তুর্কদলের কথা শুনিয়াছে—তাহারা তুর্কীর শাসন-পদ্ধতিতে সংস্কারের অগ্নি দিয়া পুঞ্জীভূত অনাচার নষ্ট করিতে উদ্যত। তাহারা সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিতেছে—তাহারা ইস্লামের ভিত্তি গণ-তন্ত্রের উপর নূতন শাসন-সৌধ রচনা করিবে—তুর্কীর লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবে। তাহাদিগের নিকট এই দারুণ অত্যাচারের কথা জানাইলে তাহারা অবশ্যই ইহার প্রতীকার করিবে। এই চিন্তায় দায়ুদ শেষে যেন অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইল—আশার অবকাশ পাইল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় দায়ুদ যে হোটেলে ছিল, সে হোটেল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। সে পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিল, হোটেল বদল করিবে। তাহার পর হোটেলে আসিয়া সে যখন শুনিল, কোতয়ালের লোক তাহারই মত এক জন ইহুদীর সন্ধানে হোটেলে হোটেলে ঘুরিতেছে, তখন সে আর কালবিলম্ব করা সঙ্গত বিবেচনা করিল না। সে হোটেলের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোত-য়ালের কর্ম্মচারীকে কি বলিয়াছেন?" হোটেলের অধি-কারী বলিলেন, "দেখুন, যে আশ্রয় লয়, তাহাকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম—সেই জন্য আমি ভাবিলাম, কি বলি? মিথ্যা কথা বলিলেও অধর্ম্ম হয়, তাই—আপনি আসিলেই আপ-নাকে যাইতে বলিব স্থির করিয়া বলিলাম, 'এক ইহুদী যুবক আমার হোটেলে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু চলিয়া গিয়াছে।' ধর্ম্মের মর্য্যাদা ত নষ্ট করিতে পারি না।" বলিয়া তিনি করধৃত স্ফটিকের মালা ফিরাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয়ে বড় দুঃখেও দায়ুদের হাসি আসিল।

দায়ুদ হিসাব করিয়া হোটেলের প্রাপ্য মিটাইয়া দিল এবং সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় আপনার ব্যাগটি লইয়া বাহির হইবার আয়োজন করিল। এই সময় হোটেলের অধিকারী তাহার ঘরে আসিলেন এবং সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন?"

দায়ুদ উত্তর করিল, "ইহুদী পল্লীতে যাই- কোথাও না কোথাও আশ্রয় মিলিবে।"

"না। পুলিশ তথায় সন্ধান লইয়া গিয়াছে; বোধ হয়, এখনও পাহারা দিতেছে।"

"কে বলিল?"

"আমার এক ইহুদী বন্ধু এই পথে যাইতেছিলেন—আমার সঙ্গে কথায় কথায় এই সংবাদ দিয়া গেলেন।"

এই কথা শুনিয়া দায়ুদ চিন্তিত হইল। সে বুঝিল, কোন ইহুদী আর তাহাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিবে না। নির্য্যাতনের আতিশয্যে তাহাদের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাহাদের সাহস নাই—ভরসা নাই। এ অব-স্থায় এই বিপদের মধ্যে সে কি করিবে, তাহা দায়ুদ যেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তখন হোটেলের চতুর অধিকারী বলিল, "আমি আপ-নাকে আমার একটা পোষাক দিতেছি; সেই ছদ্মবেশে আপনি অন্য কোন হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লউন। কিন্তু সঙ্গে ব্যাগটি লইলে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবেন না।"

দায়ুদ বুঝিল, চতুর কালদীয় তাহার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহাতে বাধা দিবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা সে কালদীয়ের প্রস্তাবেই সম্মত হইল এবং তাহার দত্ত ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া রাজপথে বাহির হইল। সঙ্গে কেবল অর্থ লইয়া গেল! যে দেশে শাসন-পদ্ধতি অনাচারদুষ্ট, সে দেশে অর্থই যে সর্ব্বত্র

অসাধ্যসাধন করে, তাহা সে বহুবার অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিল।

পথে বাহির হইয়াই সে ভাবিল সে কোথায় যাইবে? নানা স্থানে আশ্রয়লাভের সম্ভাবনার কথা বিচার করিয়া সে ভাবিল, একবার ইংরাজ দূতের কাছে যাইয়া আশ্রয়লাভের চেষ্টা করিলে হয়। তাহাই মনে করিয়া সে বৃটিশ দূতের কার্য্যালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। তখনও বাগদাদ সহরের বুক চিরিয়া নাজিম পাশা বড় রাস্তা রচনা করিতে পারেন নাই—গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া সে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইল। যে সময় ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ান জগজ্জয়ের দুরাশায় মত্ত হইয়া—একাতপত্র জগৎপ্রভুত্বলাভের জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন—সেই সময় প্রাচীতে তাঁহার প্রভুত্ববিস্তারচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ইংরাজ বাগদাদে এই আড্ডা করিয়াছিলেন। গৃহের প্রাচীরে প্রস্তরফলকে সে কথা লিখিত আছে; পাঠ করিলে অদৃষ্টচক্রের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আবর্ত্তন মনে করিয়া বিস্মিত হইতে হয়—মানুষের ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করা যায়।

দ্বারে প্রহরী দায়ুদকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দায়ুদ আপনাকে ইংরাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন প্রয়োজনে দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাহাকে দাঁড় করাইয়া প্রহরী ভিতরে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, আফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল দূতের টাইপিষ্ট লেখক জোসেফ এজরা একটা কি কায শেষ করিবার জন্য এখনও আফিসে আছেন; দায়ুদকে পরদিন বেলা ১০টার সময় আসিতে হইবে।

টাইপিষ্টের নাম শুনিয়া দায়ুদ একটু ভাবিল—সে ত ইহুদী বটে, স্বজাতি; তাহাকে একবার আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষতি কি? দুঃখভোগফলে ইহুদীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রবল হইয়াছে। সে প্রহরীকে বলিল, "আমি একবার মিষ্টার এজরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

"জিজ্ঞাসা করিয়া আসি"—বলিয়া প্রহরী চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া দায়ুদকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলের আফিসের একটা ঘরে লইয়া গেল।

দায়ুদ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, টাইপিষ্ট-যুবক একটা টেবলের সম্মুখে বসিয়া কি কাগজ ছাপিতেছে। দায়ুদের মনে হইল, সে যুবককে কোথাও দেখিয়াছে—মুখখানা যেন খুবই পরিচিত!

টাইপিষ্ট মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চাহেন?"

দায়ুদ বলিল, "আমি ইংরাজের প্রজা—তাই ইংরাজ দূতের কাছে আশ্রয় চাহি।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া টাইপিষ্ট উঠিয়া দাঁড়াইল—বারান্দায় একটা হারিকেন লণ্ঠন ছিল, সেইটা আনিয়া দায়ুদের মুখের কাছে ধরিল; তাহার পর বলিল, "তুমি—দায়ুদ!—ছদ্মবেশে!"

এই কথা বলিয়াই সে যাইয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সে জানিত, ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বাগদাদ সহরে একটু অসাবধান হইলেই বিপদ অনিবার্য্য। জোসেফের পিতা ভারতবর্ষে ব্যবসা করিতেন এবং তথায় বাসই করিয়াছিলেন। তথায় পঠদ্দশায় দায়ুদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় বাল্যকালের অনাবিল বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে। তাহার পর বহুদিন দুই জনে সাক্ষাৎ নাই। বাগদাদে ইংরাজ দূত পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে দপ্তরে যে আসিফে কর্ত্তা ছিলেন, জোসেফ তথায় টাইপিষ্টের কায করিত; তিনি বাগদাদে আসিবার সময় তাঁহারই কথায় অধিক বেতনের লোভে গৃহহীন ইহুদী যুবক জোসেফ মেসোপোটেমিয়ায় আসিয়াছে। কিন্তু দায়ুদ—সে আজ এই সময়, এমন ছদ্মবেশে ইংরাজের প্রজা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আশ্রয়-সন্ধানে আসিয়াছে কেন?

এই কেনর উত্তর ত অল্পক্ষণে দেওয়া সম্ভব নহে। সে যে সুদীর্ঘ কথা। তবুও দায়ুদ যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে সে কথা বন্ধুকে জানাইল। শুনিতে শুনিতে জোসেফ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, আর দায়ুদের অবিচলিত ভাব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতে লাগিল। বাস্তবিক কয় মাসের মধ্যে নানা কল্পনাতীত দুঃখ-দুর্দ্দশাভোগের ফলে দায়ুদ অসাধারণ ধৈর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিল।

সব কথা শুনিয়া জোসেফ বলিল, "আজ তোমার আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নহে; তুমি এই স্থানেই থাক। সময় সময় কাযের আতিশয্যে আমাকে আফিসেই রাত্রি কাটাইতে হয়—তাহার ব্যবস্থা আছে। আমার

বাসায় আমরা কয়জন ইহুদী কর্ম্মচারী থাকি—কি জানি, যদি সেখানেও কেহ সন্ধান লয়। এ গৃহে আমরা একেবারেই নিরাপদ। জান ত, অল্পদিন পূর্ব্বে এই বাড়ীর আঙ্গিনার উপর দিয়া বাগদাদের শাসক একটা রাস্তা লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজ দূত কেবল দুইজন সৈনিক দাঁড় করাইয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। এ দেশে ইংরাজের অসাধারণ প্রতাপ। কিন্তু—"

স্বর নিম্ন করিয়া জোসেফ বলিল, "কিন্তু আমরা এ সংবাদ পাইয়াছি, জার্ম্মাণী সেই প্রতাপ নষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রতাপপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। বার্লিন-বাগদাদ রেল-পথে সেই চেষ্টা সপ্রকাশ। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন জার্ম্মাণী সেতল-আরবের মুখে চড়া দেখিয়া বসরা হইতে কৈটে রেলের সীমাবিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষের বড় লাট লর্ড কার্জ্জন জার্ম্মাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারায় জার্ম্মাণীর সে চাল ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমরা দপ্তরের খবর হইতে বুঝিতেছি, আকাশে ঘনঘটা — ঝড় উঠিবে।"

দায়ুদ বলিল, "উঠুক। সেই ঝড়ে তুর্কীর সাম্রাজ্য মরুভূমির ধূলির মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হউক—পাপের অবসান হউক।"

জোসেফ বলিল, "দায়ুদ, তুমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ ও করিতেছ, তাহাতে তোমার মনে এইরূপ ভাব হওয়াই স্বাভাবিক বটে; কিন্তু প্রাচীর অধিবাসী আমরা এই প্রাচীন-সাম্রাজ্যের নাশ-কল্পনায় আমরা কি আনন্দানুভব করিতে পারি? তুর্কীর পূর্ব্বেতিহাস লইয়া প্রাচী যে গর্ব্ব করিতে পারে।"

"কিন্তু পাপের ভরা কি পূর্ণ হয় নাই?"

"হয় ত হইয়াছে; কিন্তু পাপ কাহার? তুর্কীর শাসন-পদ্ধতির এই অবস্থার জন্য দায়ী তুর্কীর অভিজাত-সম্প্রদায়। তাহাদের শিরায় নিরবচ্ছিন্ন তুর্করক্তই প্রবাহিত নহে—তুর্কীর অভিজাত-সম্প্রদায় বিলাসে জর্জ্জরিত; ইহারা ভোগার্থ গ্রীক, ফরাসী, কালদীয়, জীয়র্জ্জীয়, আর্ম্মাণী, ইহুদী—নানা জাতীয় স্ত্রীলোককে হারেমে লইয়া গিয়াছে—এই সব রমণীর অধিকাংশই হীন শ্রেণীর। এরূপ মিলনের ফলে কোন জাতীয় মানুষের উদ্ভব সম্ভব? তুর্কীর জনসাধারণ—কৃষকগণ অতিথিসৎকারের, সাহসের ও পারিবারিক আকর্ষণ-প্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ।"

"কিন্তু তুর্কীর শাসন-পদ্ধতি কি সংস্কৃত হইবে?"

"হইবে—যদি, রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজশক্তি জনগণের হস্তগত হয়; প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়; ইসলাম ধর্ম্ম যে গণতন্ত্রের পোষক, সেই গণতন্ত্র প্রবল হয়। নহিলে তরুণ তুর্কসম্প্রদায়কে লইয়া আমার বড় ভরসা নাই।"

দায়ুদ এই তরুণ তুর্কদিগের ভরসাই করিতেছিল; সে এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তরুণ তুর্করা এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নষ্ট করিতে পারে নাই; এক সুলতানের স্থানে অন্য সুলতান সিংহাসনে বসাইলেই শাসন প্রণালী অনাচারমুক্ত হয় না। তাহারা কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথ সারমেয়মুক্ত করিতে পারিয়াছে—প্রাসাদ ষড়যন্ত্রশূন্য করিতে পারে নাই।"

দায়ুদ এই কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইল। কিন্তু সে মনে করিল, সে শেষ অবধি দেখিবে—দেখিবে, তরুণ তুর্কদলের কাছে সে সুবিচার পায় কি না। সেই প্রবল সঙ্কল্প তখন ইরাকের মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকার মতই তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে বোম্বাই সহরে পৌঁছিয়াই য়ুরোপের পথে কনষ্টান্টিনোপলে যাইবে। সে যাইবে—সে যাইবে। কোনরূপে একবার বোম্বাইতে পৌঁছিতে পারিলেই হয়।

জোসেফ দ্বার মুক্ত করিয়া আরবী ভৃত্যকে ডাকিল, এবং সে আসিলে বলিল, "রহমন, আজ অনেক কায আছে, আমি বাড়ীতে যাইতে পারিব না। তুমি যাইয়া আমার খাবার আর বাজার হইতে কিছু খাবার আন।"

"ইন সা আল্লা" অর্থাৎ ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে হইবে—বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল।

আহারের পর দুইখানা ক্যাম্পখাট খাটাইয়া দুই বন্ধু শয়ন করিল এবং উভয়েই পরদিন দায়ুদের পলায়নোপায় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে জাগিয়া জোসেফ দায়ুদকে জাগাইয়া বলিল, "চল আমার বাসায়; স্নানাহার করিয়া প্রস্তুত হইবে। তোমাকে বেলা ১০টার পূর্ব্বেই রওনা করিয়া দিব।"

ইংরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য—তাহারা যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তেমনই তাহা ব্যয় করিতেও পারে। প্রাচীর অধিবাসীদের কাছে তাহাদের অর্থব্যয়ের ধারাটা যেমনই কেন মনে হউক না, তাহারা আপনার আরামের জন্য অকাতরে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। তাহাদের বেশে-বাসে-আহারে ব্যয় করিতে তাহারা কখন কুণ্ঠিত হয়

না—যে স্থানেই থাকে, আরামে থাকে। আবাদানে তৈলের কারখানার কর্ম্মচারীদের জন্য প্রতিদিন বাগদাদ হইতে ফল প্রভৃতি যাইত। যে নৌকায় সে সব যাইত, তাহার ছাড় ছিল—ইংরাজের নৌকা বলিয়া। সে কথা জোসেফের মনে পড়ায় সে স্থির করিয়াছিল, সেই নৌকায় আবাদানে কাহারও নামে একখানা পত্র দিয়া পত্রবাহকরূপে দায়ুদকে রওনা করিয়া দিবে।

জোসেফ তাহার সঙ্কল্পানুসারে কায করিল, আবাদানে একজন ইংরাজের নামে দূতাবাসের কাগজে একখানা পত্র দিবার ছলে দায়ুদকে সেই নৌকায় দিল—আরব মাঝিদের বলিয়া দিল—সে একখানা জরুরী সরকারী পত্র লইয়া যাইতেছে।

বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়া দায়ুদ সেই নৌকায় যাত্রা করিল। নৌকায় উঠিয়া সে বাগদাদের শত সৌধ-চূড়ার দিকে—আমীরের প্রাসাদের দিকে চাহিতে লাগিল, আর মনে মনে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিল।

বাগদাদ হইতে আবাদান ভাঁটাতে যাইতে হয়—টাইগ্রীসের প্রবাহও দ্রুত; কাযেই নৌকা শীঘ্রই বাগদাদ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। তখন দায়ুদ আবার আপনার কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতে লাগিল।

কয় দিন নানা সহর ছাড়াইয়া—যষ্টিমধুর ক্ষেত্রের পাশ দিয়া নৌকা যখন এজরার সমাধিস্থানে উপনীত হইল—তখনও দায়ুদ কেবল সেই সঙ্কল্পেই দৃঢ়—সে একবার তুর্কীর রাজধানীতে যাইয়া দেখিবে—প্রতীকারের উপায় করিতে পারে কি না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রুথ সেই যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গভীর রাত্রি—ঘর অন্ধকার। সাবধানে হাত বাড়াইয়া সে বুঝিল, শয্যায় সে একা। একটা বাতায়নের একখানি কপাট একটু ফাঁক করা ছিল,—তাহারই মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক কক্ষের অন্ধকার যেন একটু স্বচ্ছ করিতেছে। এ পার্শ্বে—ও পার্শ্বে ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—হাসি, গান, গল্প। গানের একটা কলি সে শুনিল—শুনিয়া সেই অন্ধকারে একাকিনী লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, গানটা এমনই অশ্লীল! এ গান কে গাহিতেছে? তখন সে শিহরিয়া উঠিল; সে আসিবার সময় ঘরে ঘরে রমণীদের যে সজ্জা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তবে তাহারা দেহ-পণ্য বিক্রয় করে।—তবে সে পাপের গৃহে নরকে আসিয়াছে। নইমী সেই পাপ-পুরীর অধিষ্ঠাত্রী; পাপের ব্যবসার মহাজন! ব্যবসা যেমন, মহাজন তাহার উপযুক্তই বটে।

রুথ ভাবিল, সে এই পাপপুরী হইতে পলাইতে পারিবে ত? বাহিরে চন্দ্রালোক, কক্ষে অন্ধকার; বাহিরে স্বাধীনতা, এ পুরীতে দাসত্ব। সে কেমন করিয়া মুক্তি পাইবে?

সে শুইয়া সেই কথা ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষদ্বার মুক্ত হইয়া গেল, একটা লণ্ঠন লইয়া নইমী আমিনার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। লণ্ঠনটার মধ্যে যে দীপশিখা জ্বলিতেছিল, তাহা হইতে আলোক ও ধূম প্রায় সমান পরিমাণেই উদ্গত হইতেছিল। লণ্ঠনের কাচের আবরণ এত মলিন হইয়াছিল যে, আলোক যেন বাহির হইতে পারিতেছিল না। রুথ যে জাগিয়াছিল, তাহা আগন্তুকদ্বয় বুঝিতে পারিল না। নইমী তাহাকে ডাকিতে যাইতেছিল; আমিনা বলিল, "আহা,—এখনও ঘুমাইতেছে; তুলিয়া কায নাই।"

নইমী বলিল, "এখনই যে ওয়ালীর ছেলে আসিবে।"

আমিনা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি জান, পিশুনাচের পর আমি শ্রান্ত হইয়া পড়ি; তবে কেন তাহাকে আসিতে বলিলে?"

"আমি কি আসিতে বলিয়াছি? সে দুইবার আসিয়াছিল, বলিয়া গিয়াছে, এক বন্ধুকে লইয়া আজ আসিবে, ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।"

"সে আসিলে তুমি তাহাকে ফিরাইয়া দিও।"

"বল কি? ওয়ালীর ছেলেকে ফিরাইয়া দিলে কি আর বাগদাদ সহরে বাস করা যাইবে?"

"না যায়, না যাইবে; মরিতেই বা ভয় কি? এও মরণ—সেও মরণ।"

তখন নইমী রাগের ভাবে বলিল, "আমার ঘাড়ে একটা বই দুইটা মাথা নাই—অত সাহস আমার আসিবে কোথা হইতে? পার, তুমি তাড়াইয়া দিও। তাহার পর যখন চুলে ধরিয়া লইয়া যাইবে, তখন?"

"সবই জানি ; যখন এ পথে পা দিয়াছি, তখন এই যন্ত্রণাই সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তবুও আমরাও মানুষ—মানুষ একটা উটের উপর—একটা গাধার উপর যে দয়া দেখায়, আমাদের উপর সে দয়াও দেখায় না। বুঝি আমরা সে দয়ারও যোগ্য নহি।"

"অত কথা আমি বুঝি না। তবে এটুকু জানিয়া রাখিও—ওয়ালীর ছেলের নেক-নজরে পড়া বাগদাদ সহরে অনেক মেয়েই ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে। আরও জানিও, নদীতে বন্যা যেমন প্রতিদিন আইসে না—জীবনে এ সুযোগও তেমনই প্রতিদিন আইসে না; যখন সুযোগ পাওয়া যায়, তখন তাহা হারান সুবুদ্ধির কায নয়।"

আমিনা আর কোন কথা বলিল না।

নইমী তখন রুথের গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া তাহাকে ডাকিল। রুথ উঠিয়া বসিল।

আমিনা যখন চলিয়া যায়, রুথ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—এখন দেখিল, আমিনা সুন্দরী। সে নৃত্যাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে—গাত্রে নানা অলঙ্কার, বেশ এমন ভাবে সজ্জিত যে, অঙ্গের ছাঁচটা বুঝা যাইতেছে। সে ঘরে একটা বাতি জ্বালিয়া একখানা কেদারায় বসিয়া অলঙ্কারগুলা খুলিতেছিল। নইমী বলিল, "সব খুলিও না।" তাহার পর বলিল, "না, খুলিয়াই ফেল—যাহাতে আর এক দফা অলঙ্কার আদায় করিতে পার, সেই চেষ্টা করিও। বুঝিব, তুমি কত বড় বুদ্ধিমতী।"

আমিনা সে কথার কোন উত্তর দিল না; আপনার মনে অলঙ্কার খুলিয়া পাশের একটা টেবলের উপর রাখিতে লাগিল। তাহার মুখভাব অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক।

নইমী রুথকে বলিল, "চল, আমরা অন্য ঘরে যাই।"—রুথ উঠিলে সে বিছানাটা ঝাড়িয়া দিল।

নইমী তখন রুথকে বলিল, "চল।" বলিয়া সে আলোটা একটু বাড়াইয়া দিল—ফলে লণ্ঠনে ধুমের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গেল।

রুথকে লইয়া নইমী পাশের ঘরে গেল। ঘরটা ছোট—তাহাতে একখানা ছোট খাট পাতা। ঘরে আর আসবাব বড় কিছু নাই; আছে কেবল একটা বড় সিন্দুক। সে আসিবার সময় আমিনার উন্মোচিত অলঙ্কারগুলা লইয়া আসিয়াছিল—সিন্দুক খুলিয়া সেগুলা তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। তাহার পর সে রুথকে বলিল, "তুমি এখন আমার এই বিছানাতেই শুইয়া থাক। আমার আসিতে বিলম্ব হইবে। ওয়ালীর ছেলে আসিবেন কি না! যাই—আর সব ঘরে সাবধান করিয়া দিয়া আসি, গোলমাল না হয়।" তাহার পর সে রুথকে বলিল, "দেখ, আমিনার এখনও রূপ-যৌবন আছে—সে ভাল নাচিতে ও গাহিতে পারে; তাই বাগদাদের ওয়ালীর ছেলেও আকৃষ্ট হইয়াছেন। রূপ তোমারও সামান্য নহে। তুমি যদি আমার কথামত চল, তবে দেখিবে, সহরে তোমার খ্যাতি আমিনার খ্যাতিকেও ছাপাইয়া যাইবে।"

নইমীর কথায় রুথের মনে হইল, কে যেন বিষধর সর্প আনিয়া তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিল। নইমী চলিয়া গেল—সে ভাবিতে লাগিল, অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা—তাহার কষ্টের কি শেষ হইবে না? পিতার পবিত্র গৃহোদ্যান হইতে সে আমীরের পাপপঙ্কিল হারেমে নীতা হইয়াছিল; তাহার পর—এ কি? এ যেন আরও বিষম অবস্থা। আমীরের গৃহে পাপের উপর যে একটু আবরণ ছিল, এ পাপপুরীতে তাহাও নাই—এ যেন কে তাহাকে বাগদাদ সহরের আবর্জ্জনার পথ-নালায় ফেলিয়া দিয়াছে—সেই পূতিগন্ধময় কৃমি-কীটপূর্ণ আবর্জ্জনারাশিতে তাহার মুখ চক্ষু পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহার অব্যাহতিলাভের কি কোন উপায় নাই! এত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার মৃত্যু হয় না? হায়—যে দিন আমীরের লোক তাহাকে হরণ করে, সেই দিনই দায়ুদ কেন তাহার কথা শুনে নাই—তাহাকে হত্যা করে নাই? দায়ুদের উপরও আজ তাহার মনে অভিমান উদ্ভূত হইতে লাগিল। সে কোথায় আসিয়াছে? যে গৃহে রূপজীবাদিগের বাস, সে সেই গৃহেই আশ্রয় লইয়াছে! সে শিহরিয়া উঠিল—শঙ্কায় তাহার বেদনাও যেন সে ভুলিয়া গেল। সে কি করিবে? যেমন করিয়াই হউক, সে মুক্ত হইবে—মরিয়াও মুক্তি লাভ করিবে। এত দিন সে মরে নাই—আশা ছিল, দায়ুদ তাহার উদ্ধারসাধন করিবে। দায়ুদ সে চেষ্টা করিয়াছিল—আপনাকে বিপন্ন করিয়া সে তাহাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়াছিল; কিন্তু হায়—তাহারই অদৃষ্টদোষে দায়ুদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দায়ুদ নদীর জলে পড়িয়াছিল—সে বাঁচিয়া আছে ত? হয় ত নাই।

এই চিন্তায় রুথ যেন অস্থির হইয়া উঠিল। যদি দায়ুদ তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রাণ হারাইয়া থাকে, তবুও কি সে জীবন রাখিবে? সে মনে করিল—না।

কিন্তু তাহার পরই পিতার কথা মনে পড়িল। দায়ুদ বলিয়াছিল, সে তাঁহাকে বোম্বাইয়ে রাখিয়া আসিয়াছে—তিনি তাহার পথ চাহিয়া—আশায় এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সে কি তবে একবার পিতাকে দেখিতে পাইবে না?

এই চিন্তায় রুথ আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীতে একটা যেন সন্ত্রস্তভাবের কথা শুনা গেল—নইমীর আদর-অভ্যর্থনায় রুথ বুঝিল—সেই ওয়ালীর ছেলে আসিয়াছেন। নইমী, বোধ হয়, সেই যুবককে আমিনার ঘরে লইয়া গেল; রুথ শুনিল—সে বলিল, "আমিনা, বাছা—আজ তোমার কি সৌভাগ্য; দেখ, গরীবের ঘরে কাহার আবির্ভাব।" রুথ আমিনার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল। যে আমিনা এই যুবক আসিবে শুনিয়া কত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, সে সেই মনোভাব গোপন করিয়া নইমীর সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, "তাহাই বটে।"—তাহার পর সে বলিল, "কিন্তু গরীবের সৌভাগ্য বিদ্যুতের বিকাশের মত—দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে মিলাইয়া যায়—স্থায়ী হয় না।" যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা হইল, সে কি উত্তর দিল, রুথ তাহা শুনিতে পাইল না। সে ভাবিল—এই জীবন কি দুঃখের—কি কষ্টের! মনের ভাব এমন ভাবে গোপন করিয়া দেবতার জিনিস দানবকে দিয়া তাহার মূল্যে জীবিকার্জ্জন করিতে হয়! বাস্তবিক কি এই জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করা যায় না?

তখন কত রাত্রি, তাহা রুথ ঠিক বুঝিতে পারিল না; কিন্তু আমিনা নৃত্যশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে—জ্যোৎস্নাও গভীর রাত্রি বুঝাইতেছে। সম্মুখের দ্বারপথে জ্যোৎস্নার আলো আসিতেছিল না—পশ্চাতে যে জানালা ছিল, রুথ তাহা খুলিয়া দিল—সাদা গোলাপের ঝরা পাপড়ীর মত এক রাশ জ্যোৎস্না ঘরে—শয্যার উপর পড়িল। যাহারা জ্যোৎস্নায় পবিত্রতার স্বরূপ দেখিতে পায়, তাহারা পাপপথের পথিক হয় কেন? রুথ ভাবিয়া পাইল না। পিতৃগৃহে থাকিতে সে যেমন পাপের পরিচয় পায় নাই, সে গৃহের বাহিরে আসিয়া তেমনই যেন পাপের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখিতেছে; তাহার অদৃষ্ট যেন তাহাকে পাপের পথের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

পাশের ঘরে হাসি-গল্প শুনা যাইতে লাগিল। নইমীর বিশ্রাম নাই; সে কেবলই বারান্দায় ঘুরিতেছে। বার দুই সে ঘরে আসিয়া রুথকে দেখিয়া গেল; রুথ জাগিয়া আছে দেখিয়া শেষবার বলিল, "আমিনার অদৃষ্ট আজ প্রসন্ন। সে যদি বুদ্ধি খেলাইতে পারে, তবে সে লীরার স্তূপে বসিতে পারিবে। তোমার যে রূপ, তাহাতে তুমিও আমিনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে। আমিনাকে আর নৃত্যশালায় যাইতে হইবে না—ওয়ালীর ছেলে আর বোধ হয় যাইতে দিবেন না। নৃত্যশালায় যাওয়া—ও ত কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য।"

রুথ কোন উত্তর দিল না। সে কি উত্তর দিবে? তাহার বুকের মধ্যে যে দারুণ ঘৃণা উথলিয়া উঠিতেছিল, সে অতি কষ্টে তাহা গোপন করিল। কারণ, সে বুঝিয়াছিল—এখন তাহাকে হয় ত চাতুরীই অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে। হয় মুক্তি—নহে ত মৃত্যু; এ পাপপুরীতে বাস সে করিতে পারিবে না। সে বুঝিয়াছিল, নইমী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলে তাহার মুক্তির পথ বিঘ্নবহুলই হইবে। মুক্তির পথে কত বিঘ্ন—কত অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ থাকিতে পারে, তাহা সে তাহার অতীত অভিজ্ঞতায় বিশেষরূপ বুঝিয়াছে। তাই সে সাবধান হইল। কেমন করিয়া সে এই গৃহের বাহির হইতে পারে, রুথ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল—সেই চিন্তায় সে যেন পাশের ঘরের গানের কথা ধরিবার কৌতূহলও ত্যাগ করিল।

পাশের ঘরে আমিনা মধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল—

"হে আমার মরু-নন্দনে প্রস্ফুটিত গোলাপ, আজ বহু ভাগ্যে তোমাকে পাইয়াছি; তোমাকে আমার মাথার কেশে রাখিব। তোমার সৌরভে আমি সুরভিত হইব।

"হে আমার কুড়াইয়া পাওয়া অমূল্য রত্ন, আমি তোমাকে আমার বুকে লুকাইয়া রাখিব; তুমি আর কখন আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

"হে আমার মরুভূমিতে প্রস্রবণ, আমি মৃত্যুতৃষ্ণায়

সমস্ত মরুভূমি ভ্রমণ করিয়া তোমার সন্ধান পাইয়াছি; আর তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না।

"হে আমার দয়িত, আমি তোমাকে পাইয়াছি, আর স্বর্গও চাহি না; তুমিই আমার স্বর্গ। আমি আমার প্রেমে তোমাকে আপনার করিয়া রাখিব—তুমি আমারই—তুমি আমারই।"

গান যে শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে দিকে রুথের মন ছিল না। বহুকণ্ঠের স্বরে যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। ওয়ালীর ছেলে বিদায় লইতেছেন। আমিনা কত আনুগত্য দেখাইতেছে; নইমী বলিতেছে, "দর্শনলাভের সৌভাগ্য আর কি আমাদের হইবে?"

তাহার পর সকলে নামিয়া গেল। উপর হইতে উৎকর্ণ রুথ দ্বার খুলিবার সময় সেই কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইল। আবার দ্বার রুদ্ধ হইল।

পাশের ঘরে নইমীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "কত দিয়ে গেল?"

আমিনা বলিল, "গণিয়া দেখি নাই।" সে কতকগুলা স্বর্ণমুদ্রা দিল। গণিয়া দেখিয়া নইমী বলিল, "পঁচিশ লীরা। অবশ্য সামান্য নহে; কিন্তু আমিনা, তাহাও বলি, তোমার মত বয়সে—এমন রূপ থাকিলে আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতাম না—দ্বিগুণ আদায় করিতাম। সে জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। তবে আজ আরম্ভ—ক্রমে পাওয়া যাইবে।"

রুথ আমিনার কোন কথা শুনিতে পাইল না।

তাহার পর নইমী রুথের ঘরে আসিয়া সিন্দুক খুলিয়া টাকা রাখিয়া সিন্দুক বন্ধ করিল।

নইমী রুথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "হাজার হউক, বড় মানুষের ছেলে—পঁচিশ লীরা দিয়া গেল। আমিনার বড় গর্ব্ব—সে বড় রূপসী। কিন্তু তোমার কাছে সে দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাকে দেখিলে অনেকে পাগল হইবে।"

রুথের বুকের রক্ত যেন জমিয়া যাইতেছিল।

রুথ কোন কথা কহিল না দেখিয়া নইমী মনে করিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—সে চুপ করিল।

বারান্দায় যাইয়া নইমী একবার আকাশের দিকে চাহিল,—তাহার পর "জ্যোৎস্না নিবিয়া আসিতেছে, প্রভাত হইবার আর বিলম্ব নাই"—বলিয়া আসিয়া শ্রান্তভাবে শয্যায় রুথের পার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

তাহার সান্নিধ্যে রুথ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া শুইল। শুইতে না শুইতে নইমীর নাসিকা-গর্জ্জনে রুথ বুঝিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণ সে চক্ষু মুদিয়া ছিল; এবার চাহিয়া দেখিল—জ্যোৎস্না নইমীর মুখে পড়িয়াছে। সে যতক্ষণ জাগিয়াছিল, ততক্ষণ কৃত্রিম উপায়ে যে শ্রীহীনতা গোপন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল,—এখন সেই শ্রীহীনতা যেন দ্বিগুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে মুখে পাপের ছায়া যেন অতি গাঢ়। শঙ্কায় রুথ শিহরিয়া উঠিল। আর সে দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইল না—সর্প সুপ্ত হইলেও মানুষ সহজাত-সংস্কারবশে তাহাকে ভয় ও ঘৃণা করে।

রুথ উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কোথাও কোন ঘরে কোন শব্দ শুনা যায় কি না। না। কোন ঘর হইতে কোন শব্দ শুনা যায় না—অবসন্ন হইয়া যে যাহার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল নিম্নতলে ইন্দুরের কিচ-কিচ শব্দ—আর কিছুই নহে।

অতি ধীরে—অতি সাবধানে রুথ শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। নইমীর নাসিকা-গর্জ্জন সমান চলিতে লাগিল। তাহার পর রুথ সাবধানে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল,—দ্বার মুক্তই ছিল। বারান্দায় আসিয়া তাহার মনে পড়িল,—সে গৃহের সিঁড়ি জীর্ণ, নিঃশব্দে সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাওয়াও যেমন অসম্ভব, নিঃশব্দে সে গৃহের দ্বার মুক্ত করাও তেমনই অসম্ভব। উপায়?

কিন্তু উপায় চিন্তা করিবার সময়ও যে আর নাই। যদি নইমী জাগিয়া উঠে—দেখে সে শয্যায় নাই? যদি আর কেহ জাগিয়া জানিতে পারে? তাহা হইলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হইবে।

অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে—সে যখন মুক্তির অন্য পথ দেখিতে পাইতেছে না, তখন সেই পথেই অগ্রসর হইবে।

রুথ সিঁড়িতে পা দিতেই সিঁড়িতে শব্দ হইল। সিঁড়ির ঠিক উপরের ঘর হইতে কে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে—নেজমা?"

সাহসে ভর করিয়া রুথ বলিল, "হাঁ।" তাহার পর সে আর না দাঁড়াইয়া নামিয়া গেল।

সোপান হইতে নামিয়া রুথ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল—উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল—কোন শব্দ পায় কি না। গৃহ নিস্তব্ধ। সহসা তাহার পদে সঞ্চরণশীল কোন জীবের কোমল দেহের স্পর্শ অনুভূত হইল। বোধ হয়, একটা ইন্দুর দৌড়িয়া গেল।

চন্দ্র তখন গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে—আকাশে জ্যোৎস্নার

আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে—সে আলোকে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণ আলোকিত হয় না। রুথ দ্বারের দিকে চাহিল। ততক্ষণে তাহার চক্ষু সেই স্বচ্ছান্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে দ্বার দেখিতে পাইল।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রুথ দ্বারের কাছে গেল—দৃষ্টির ও স্পর্শের সাহায্যে অর্গলের অবস্থান উপলব্ধি করিয়া সাবধানে অর্গল টানিয়া দিল। সে জানিত, দ্বার খুলিলেই শব্দ হইবে—মরিচাপড়া কব্জায় কপাট নাড়িবার সেই শব্দে হয় ত কেহ জাগিয়া উঠিবে—তাহার পূর্ব্বেই তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে। অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া যেন পলায়নের জন্য মনের ও দেহের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া রুথ সবলে দ্বার খুলিল। পলায়নের উত্তেজনায়—শব্দ হইল কি না, তাহাও সে শুনিতে পাইল না।

দ্বার খুলিয়াই রুথ বাহিরে রাজপথে আসিয়া পড়িল এবং লক্ষ্যহীন আগ্রহে যে দিকে চরণ চলিল, দ্রুতবেগে সেই দিকে দৌড়াইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চমী।

(১)

আজি, কে গায়িছে গান উদার মধুর স্বরিত-ললিত ছন্দে ?
নাচিছে রাগিণী স্ফুরিছে দামিনী সুরসপ্তক-দ্বন্দ্বে ?
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি,
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝিমি ঝিমি ঝিমি,
কণ কণ কণ কিণি কিণি কিণি, রণ রণ রণ রিণি রিণি রিণি,
বেপনা বেদনা বেধনা চেতনা মোহিনী বীণার তন্ত্রে !
সুধাভরা প্রাণ,— কে গায়িছে গান স্বরিত-ললিত ছন্দে ?

(২)

কিবা হরিচন্দন-সুন্দর-শোভা রসাল মৌলি মুকুলে।
সেজেছে ধরণী, সোনার বরণী কোমল পাটল দুকুলে।
কাননে কাননে কত কাম গীতা,—
বন-বল্লরী বিলোল-ললিতা,
হরিণ হরিণী মদে মাতোয়ারা, উদারা মুদারা তারা রাগ ধারা
নাদ মূর্চ্ছনা উদিতা মুদিতা, উদীরিতা বনবঞ্জুলে।
অশোক-আকুল দুলে অলিকুল ধরা রঞ্জিত বকুলে,
কিবা হরিচন্দন-নন্দন-শোভা আম্র-মৌলি-মুকুলে !

(৩)

ওই মন্দ মন্দ, মন্দ্র মন্দ্র—মানস-মোহন মন্দ্রণে,
ফুটিছে কমল চন্দ্র-ধবল সরসে মানসে নন্দনে।
পদ্মরাগের ছদ্ম কিরণে
কার হাসি রাশি গগনে গহনে ;
হেতা কুঙ্কুম হোথা কুসুম্ভ কার কাঁখে ওই কনক-কুম্ভ
কিরণ কিরণ কত শিহরণ
মাধবী-মোদিত মৃদু সমীরণ
কোকিল-বধুর, পঞ্চম সুর, বঁধুর হৃদয় রঞ্জনে ;—
পূরি দেববীথি, উঠে সামগীতি কে ওই রতন স্যন্দনে ?
রসতরঙ্গ শ্রীরাগরঙ্গ চরণ-কমল বন্দনে,
কিবা, মন্দ মন্দ মন্দ্র মন্দ্র মাধুরী মোহন-মন্ত্রণে !

(৪)

আজি এস ছন্দিনী, এস মন্দ্রিণী এস কবীন্দ্র শরণে
এস বর্ণিনী, এস নন্দিনী এস বিচিত্র বরণে !
এস মন্দার-মোদিতাঞ্চলে
বীণা-বিনোদন লীলা চঞ্চলে,
পুষ্পে পুষ্পে পর্ণে পর্ণে, রাগ রসময় বর্ণে বর্ণে,
কুসুমবন্ত নব-বসন্ত সুধা-সমুদ্র মন্থনে,
এস, রোহিণী মোহিনী, লীলাকলাপিনী, মণিমঞ্জীর চরণে,
এস মন্দ্রিণী, এস ছন্দিনী এস কবীন্দ্র শরণে !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জার্ম্মাণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা।

পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে জার্ম্মাণীর শিক্ষাব্যবস্থা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন মিলিয়া এ দেশে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (National Council of Education) গঠন করি। সেই সময় হইতে কিরূপে আমাদের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা পরিচালিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছি। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের পর দেখা গেল যে, বিদ্যালয়ের কোনও শ্রেণীতেই উপযুক্ত সংখ্যক ভাল ছাত্র পাওয়া যায় না। অন্য বিদ্যালয়ের উপেক্ষিত ছাত্রগণই আমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নাই দেখিয়া অধিকাংশ ছাত্র জাতীয় শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। উচ্চশ্রেণী—Arts classগুলি প্রায় ছাত্রশূন্য হইয়া রহিল। তাহার প্রধান কারণ, আইন-পরীক্ষার উপাধি (Law degree) প্রদান করিবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। কাযেই উচ্চশ্রেণীতে ছাত্র হইল না। পরিণামে Arts classগুলিকে ছাত্রাভাব বশতঃ বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

সাধারণ স্কুল বা কলেজ বিভাগের এরূপ দুর্দ্দশা হইলেও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিগরী শিক্ষাসংক্রান্ত শ্রেণীগুলির (Technical class) উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল ছাত্র সরকারী বিদ্যালয় বা কলেজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতিপয় ছাত্র আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবিষ্ট হইল।

মাণিকতলা, 'পঞ্চবটী ভিলায়' আমাদের যে কলেজ এখন বিদ্যমান, তথায় অতিকষ্টে ছয় সাত শত ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়। আমাদের কারখানা (workshop) ও পরীক্ষাগার (laboratory) বৃহৎ নহে! কিন্তু তথায় অধুনা এক সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে; তাহারা করিয়া খাইতেও শিখিতেছে। ইহা অবশ্যই বিশেষ আশার কথা। পরলোকগত দানবীর, মনীষী ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ উইলের দ্বারা জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা যাদবপুরের সন্নিহিত স্থানে মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে এক শত বিঘা জমী ইজারা করিয়া লইয়াছি। এই বিস্তীর্ণ ভূমির উপর কারিগরীশিক্ষাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগার (Physical laboratory), রসায়ন পরীক্ষাগার (Chemical laboratory) প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই সম্ভবতঃ উহা সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের বিশেষ আশা আছে যে, বর্ত্তমান ইংরাজী বর্ষের মধ্যেই মাণিকতলা হইতে আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে নবনির্ম্মিত মন্দিরে স্থানান্তরিত করিতে পারিব।

জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কিরূপে পরিপুষ্ট ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে পারিব, এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমি জার্ম্মাণীতে গিয়া তত্রত্য শ্রমশিল্প-বিভাগের কর্ত্তা (Director of Industries) ও শিক্ষা-সচিব (Minister of Education) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়েই বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে এ সম্বন্ধে আমার সহিত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, যাহাতে আমাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে কল্যাণপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারি, এজন্য তাঁহারা আমাকে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচয় করাইয়াও দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলোচনার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সকলেই একমত।

তাঁহাদের মতে, প্রথমতঃ আমাদের দেশে কৃষির উন্নতিই অত্যাবশ্যক। তাহার পর কারিগরী (technical) সংক্রান্ত শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে আহারের বন্দোবস্ত করা চাহি। তাহার পর অর্থ। অর্থের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে শ্রমশিল্পশিক্ষা উত্তমরূপে চলিতে পারিবে

না, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। জার্ম্মাণীতে শ্রমশিল্প-বিদ্যালয়ের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্ভূত শ্রমশিল্প (Scientific industries) সমূহের উন্নতি হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সে উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কারিগরী-বিদ্যালয়ের (Technical School) শিক্ষায় ভাল কারিগর (Workman) ও Foreman গঠিত হয়; কিন্তু বিশেষজ্ঞ (Expert) হইতে হইলে অন্য স্থানে অন্য উপায়ের দ্বারা সে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। আমাদের দেশের ছাত্রগণ যাহাতে বিশেষজ্ঞ (Expert) হইয়া উঠিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে প্রথম কারিগরী-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে ব্রেস্‌লো, এল্‌বারফিল্ড প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন জার্ম্মাণীর প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ কারিগরী-শিক্ষার (Technical) স্কুল আছে। বড় বড় নগরে ত আছেই, ছোট ছোট গ্রামেও অভাব নাই। ব্যয়সম্বন্ধেও জার্ম্মাণী বিশেষ সাবধান। অধিক বেতন দিয়া তাঁহারা লোক রাখেন না। অথচ সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ অবহিত। জার্ম্মাণীতে একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন অভিজ্ঞগণ অল্প বেতনে এরূপ কায করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সম্ভবতঃ দেশাত্মবোধই তাঁহাদিগকে এরূপ ত্যাগী করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে এই শ্রেণীর ছোট ছোট বিদ্যালয় আছে। স্থান সঙ্কীর্ণ, আয়োজন যে প্রচুর, তাহাও নহে; তথাপি প্রতি গ্রামেই কারিগরী-বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া শিক্ষা দিবার উপযুক্ত যাযাবর শিক্ষকও তথায় যথেষ্ট। এই সকল শিক্ষক কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্যও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। যে স্থানে যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, শিক্ষকরা তথায় গিয়া সেইরূপ কায শিক্ষা দিয়া থাকেন। কুম্ভকারকে মাটীর বাসন ভালরূপে গড়িবার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। যেখানে রজ্জু প্রস্তুত হয়, তত্রত্য শিক্ষার্থীদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রজ্জু-নির্ম্মাণের শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতের কাযে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদিগকে সেই বিষয়েই শিক্ষা দিবার অভিজ্ঞ শিক্ষকও আছেন। অর্থাৎ যে স্থানে যে কায হয়, উল্লিখিত শিক্ষকগণ সেই স্থানে যাইয়া সেই কাযের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সেই সেই বিষয়ে সহজে ও সুবিধাজনকভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপ শিক্ষা-প্রদানের জন্য জার্ম্মাণীর প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে স্যাক্সনীতে উল্লিখিত প্রকারের ৫ শতাধিক বিদ্যালয় ছিল। জার্ম্মাণীতে দেখিলাম, কোনও স্থানে কোনও কারিগরী-শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কর্তৃপক্ষ বিশেষরূপে সন্ধান লইয়া থাকেন, সেই স্থানের লোক কি কি প্রকার হাতের কায করিয়া থাকে; কিরূপ সংখ্যক ব্যক্তি সেই কায করিতে প্রস্তুত, তথায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা আছে কি না। এই সকল সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তবে তাঁহারা সেই স্থানে সেই প্রকার কারিগরী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকেন। উল্লিখিত প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য Trade Schools বা বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য-পরিচালন সমিতি হইতে বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চশ্রেণীর কারিগরী শ্রমশিল্প-শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহ সরকারই স্থাপন করিয়া থাকেন।

জার্ম্মাণীর গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত হিসাবে এ সকল ব্যাপারে সাহায্যও লইয়া থাকেন, অন্ততঃ লইবার চেষ্টা করেন। আমি যে কারিগরী-বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য-বিষয়ক বিদ্যালয়ও আছে। রাজনীতিবিষয়ে শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ও উহার অন্তর্গত। এই সকল বিদ্যালয়ে স্থপতি-শিল্প, পূর্ত্তবিদ্যা, যন্ত্রসংক্রান্ত ও বৈদ্যুতিক পূর্ত্তবিদ্যা (Mechanical and Electric Engineering), রাসায়নিক শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক-গঠনের জন্য গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে পশু-চিকিৎসা (Veterenary), খনি-বিদ্যা (Mining) প্রভৃতির জন্যও শিক্ষাগার আছে। বন-বিভাগের শিক্ষা-কার্য্যে পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্যও বিদ্যালয়ের অভাব নাই।

ড্রেস্‌ডেন্ একাডেমীতে যাঁহারা চিত্রবিদ্যা ও নক্সার কায

শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাস্কর্য্য, turning, লিথোগ্রাফী, পলস্তারার কায (stucco work), মুদ্রাকরের কার্য্য ও বইবাঁধা প্রভৃতি শিখিয়া থাকেন। উক্ত শিক্ষাগারে এই সমুদায় বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৃহৎ বিদ্যালয়ে সুবৃহৎ পুস্তকালয় ও পরীক্ষাগার আছে। নানা বিষয়ের আদর্শও (model) সংগৃহীত হইয়া এই সকল বিদ্যালয়ের শোভা ও সম্পদ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

এল্‌ব নদের তীরে নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিরাট বিদ্যালয় বিদ্যমান। বার্লিনের Marine Museum সুপ্রসিদ্ধ। এমন অপূর্ব্ব বিদ্যালয় আর কোথাও এমন সম্পূর্ণ নহে। পূর্ব্বে যে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তথায় শিক্ষানবীশ আছে। তাহারা তথায় কায শিখিয়া দেশের মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকে।

কতকগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহাতে হস্তলিপি, খাতা-পত্রে হিসাব রাখিবার প্রণালী, ব্যবসায়সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখা, টাইপরাইটিং, সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিবার শিক্ষা (shorthand) ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি যত্নের সহিত শিখান হইয়া থাকে।

সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে শিক্ষার খুব কড়াকড়ি, তন্মধ্যে স্যাক্সনী প্রদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা কঠোরতম। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর বালকবালিকারা ১৪ হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উন্নততর নৈশ-বিদ্যালয়ে (Advanced Night School) পড়িতে বাধ্য। কোনও স্তরের বালক-বালিকার অব্যাহতি নাই। এজন্য জার্ম্মাণগণ প্রভূত অর্থ-ব্যয় করিয়া থাকেন। শুধু স্যাক্সনী প্রদেশেই এইরূপ শিক্ষা-ব্যাপারে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। উহার অর্দ্ধাংশ স্বয়ং সরকার বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সরকার-পক্ষ হইতে এত টাকা ব্যয়িত হইলেও "Freedom of movement is studiously fostered" অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদের জিদ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন না। উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের কার্য্যপ্রণালী সরকারের তরফ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু সে পর্য্যবেক্ষণে দৌরাত্ম্যের কোনও আভাস পর্য্যন্ত থাকে না। স্থানীয় কার্য্যপরিচালক সমিতির উপরই পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত।

লাইপজিকস্থিত জার্ম্মাণ পুস্তকাগার—প্রবেশ-দ্বার।

জার্ম্মাণীর বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে যে কোনও বৈদেশিক ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল। অসঙ্কোচে তাঁহারা ভিন্ন দেশের ছাত্র-দিগকে বিদ্যালয়ে স্থান দিতেন। জার্ম্মাণ ছাত্রের ন্যায়ই তাহারা বিদ্যালয়ে সকল বিষয়ে সমান অধিকার পাইত। কিন্তু ক্রমশঃ কর্ত্তৃপক্ষ বৈদেশিক ছাত্রের স্কুল-কলেজের বেতনের হার বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ,

দেশের প্রয়োজন এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে, বাহির হইতে যত কম সংখ্যক ছাত্র আইসে, ততই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা। সেই নিমিত্ত জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বদেশের মঙ্গল তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য।

আমি যখন জার্ম্মাণীতে গিয়াছিলাম, সেই সময় অনেকগুলি বাঙ্গালী ছাত্র—আমার স্বজাতি যুবক তথায় ছিলেন। জার্ম্মাণীতে খরচ অল্প এবং তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট বিদ্যা থাকা প্রয়োজন, তাহা খুব উচ্চদরের নহে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমার হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই বিদ্যালয়ে special outside student বিশিষ্ট বাহিরের ছাত্র হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ ভাবে ভর্ত্তি হইয়া ভাল করেন নাই। বড় বড় কারখানায় অনেকে কারিগর হিসাবেও গৃহীত হইয়াছেন।

অনেকে আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধ্যয়নার্থ জার্ম্মাণীতে যাইবেন কি না। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা না করিয়া এবং উল্লিখিত ৩টি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত না হইয়া কখনই কাহারও জার্ম্মাণীতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।
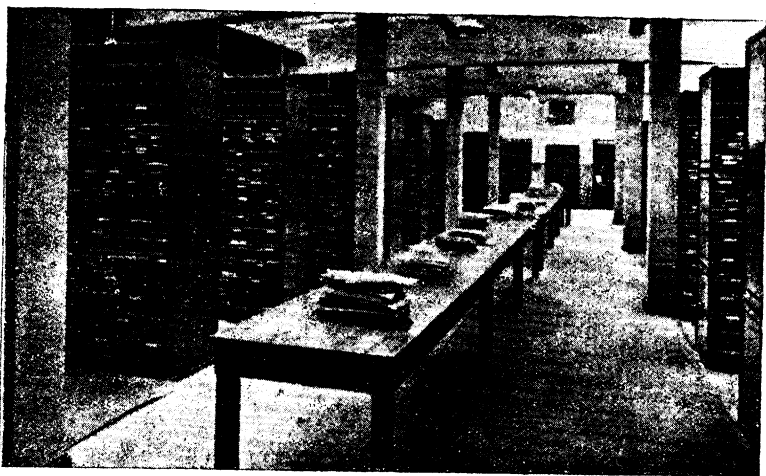
লাইপজিকস্থিত জার্ম্মাণ পুস্তকাগার—পুস্তকের তালিক-গৃহ।

স্বদেশীয় যুবকগণের অধিকাংশই জার্ম্মাণীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। অবশ্য বার্লিন অথবা জার্ম্মাণীর অন্যত্র এই ছাত্রসমূহ পরিত্যক্ত হয়েন নাই। জার্ম্মাণীর কারিগরী-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদের দেশের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র হইলেই চলে; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নসম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স সহ বি, এস্ সি পাঠ্যের সমতুল্য। উচ্চশ্রেণীর কারিগরী-বিদ্যালয়ে (Technical High School) শিক্ষার্থী ভারতীয় যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা তথায় প্রবেশের অনুপযুক্ত বিবেচিত

আমি যে কারিগরী-শিক্ষার কথা বিবৃত করিয়াছি, জার্ম্মাণীর প্রত্যেক বালক-বালিকা ১৪ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত উহা শিক্ষা করিয়া থাকে। অনেক স্থানে উহা অবশ্যশিক্ষণীয় (Compulsory)। জার্ম্মাণীর এই ঘোর দুর্দ্দিনেও এই সকল বিদ্যালয় সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, একটিও বন্ধ হয় নাই। শিক্ষকগণও অর্দ্ধাশনে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিয়াছেন। অদ্ভুত এই জার্ম্মাণ জাতি!

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।
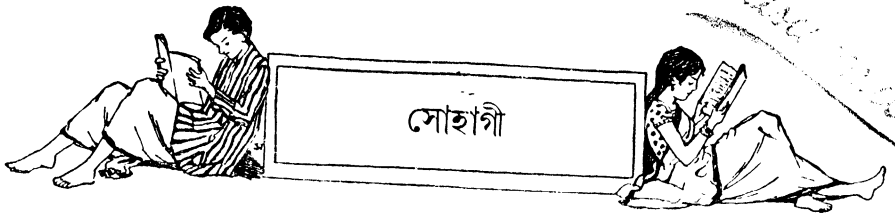
সোহাগী

১

ছেলে হ'বে না হ'বে না করিয়া বেশী বয়সে যখন একটি মেয়ে জন্মিল, তখন মা-বাপ সোহাগ করিয়া মেয়ের নাম রাখিল সোহাগী। তা গরীব বাগ্দীর ঘরে ফেনে-ভাতে মানুষ হইলেও সোহাগী মা-বাপের কাছে যে স্নেহ, যত্ন, আদর পাইল, অনেক বামুন-কায়েতের ছেলের ভাগ্যে বোধ হয় তেমন আদর-যত্ন জুটে না। সোহাগী যদি আকাশের চাঁদ চাহিত, বাপ কালাচাঁদ বোধ হয় তাহাও ধরিতে যাইতে পশ্চাৎপদ হইত না। সৌভাগ্যের বিষয়, সোহাগী সেরূপ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা কোন দিন প্রকাশ করে নাই; সুতরাং কালাচাঁদকেও তেমন দুঃসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইয়া নিষ্ফল-কাম হইতে হয় নাই; বড় জোর ডুরে কাপড়, কাচের রাঙা চুড়ি বা কাঁসার মল চারি গাছাতেই সোহাগীর আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ থাকিত, কালাচাঁদ ধার-কর্জ্জ করিয়াও মেয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া দিত, এবং মেয়ের মুখে আহ্লাদের হাসি দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ স্বর্গসুখ অনুভব করিত।

কিন্তু যতই আদর-যত্ন দেখান হউক, মেয়েছেলে—দুই দিন বাদে পরের ছেলের হাতে তুলিয়া দিলে পর হইয়া যাইবে, মা-বাপকে ছাড়িয়া, তাহাদের স্নেহ-যত্ন ভুলিয়া তাহাকে পরের ঘরে চলিয়া যাইতে হইবে, এই চিন্তাটা যখন মনে আসিত, তখন স্ত্রীপুরুষ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িত। সোহাগীকে ছাড়িয়া তাহারা কিরূপে থাকিবে, তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিত না। সোহাগী চলিয়া গেলে তাহাদের ঘর যে অন্ধকার হইয়া যাইবে, চক্ষু থাকিতেও দুই জনে কাণা হইয়া পড়িবে! কিন্তু উপায় কি? মেয়েছেলে—বিবাহ দিতেই হইবে, এবং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপর নিজেদের দাবীটুকু সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এই দাবীটুকু যাহাতে ছাড়িতে না হয়, পরের হাতে দিলেও মেয়ে যাহাতে একেবারে পর হইয়া না যায়, কালাচাঁদ তাহারই উপায়বিধানে সচেষ্ট হইল।

অনেক চেষ্টার পর একটি ছেলে পাওয়া গেল। গোপালনগরের রসিক মালিকের ছেলে মাণিকলাল মাতৃপিতৃহীন হইয়া মামার বাড়ীতে থাকিত এবং মজুরী খাটিয়া দুই বেলা দুই মুঠা পেটের ভাতের যোগাড় করিত। কালাচাঁদ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রলোভন দেখাইয়া ঘরজামাই হইয়া থাকিতে সম্মত করাইল, এবং যথাসময়ে তাহাকে ঘরে আনিয়া, তাহার হাতে সোহাগীকে সম্প্রদান করিয়া, মেয়ের উপর আপনাদের স্নেহের দাবী বজায় করিয়া রাখিল।

তা' কালাচাঁদের এমন কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল না, যাহাতে সে জামাতাকে বসাইয়া খাওয়াইতে পারে। একটা বিল জমা ছিল, দুই এক বিঘা চাষবাসও ছিল। শ্বশুরের সঙ্গে মাণিকলালকে বিল আগলাইতে, মাছ ধরিতে ও চাষে থাকিতে হইত। যেখানে জামাই গুরুঠাকুর অপেক্ষাও অধিকতর আদর-যত্নের ভাগী, সেখানে খাটিয়া খাইতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিত, তবে দিনকতক পরেই সে ভাবটা কাটিয়া গেল। ক্রমে সে শ্বশুরঘরটাকে ঠিক নিজের ঘরের মতই করিয়া লইয়া নিঃসঙ্কোচে থাকিয়া খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু বেশী দিন এই ভাবে চলিল না। সোহাগী যখন চৌদ্দ ছাড়িয়া পনরোয় পা দিল, স্বামীকে ভালবাসিবার—আদর-যত্ন দেখাইয়া স্বামীর ভালবাসা পাইবার প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঘরজামায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাদর ও বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার সে প্রবৃত্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতে লাগিল, তখন সোহাগী শুধু যে শ্বশুরের অন্নভোগী স্বামীর উপরেই ক্রুদ্ধ হইল, তাহা নহে, মা-বাপের উপরেও সে না রাগিয়া থাকিতে পারিল না, এবং তাহার এই রাগটুকুই মাণিকলালের স্বচ্ছন্দ দিনযাপনে সম্পূর্ণ অন্তরায় হইয়া উঠিল।

২

"মাণ্‌কে কোথায় গেল, সোহাগী ?"

বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া সোহাগী বলিল, "কোথায় যা'বে আবার ? ঘরে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে।"

অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিতভাবে মা বলিয়া উঠিল, "ও মা, এখনো ঘুমুচ্ছে ! বেলা যে এক পহর হ'তে যায় ! এখনো ঘুমুচ্ছে কেন ?"

মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া সোহাগী উত্তর করিল, "কেন, তা আমি কি ক'রে জান্‌বো ?"

গম্ভীর মুখে মা বলিল, "জানিস্ আর না ই জানিস, ডেকে দে। সে ব'লে গিয়েছে, মনসাতলার দেড় বিঘের বাকী ধানগুলো আজ যেন কাটা হয়।"

সোহাগী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় গিয়েছে ?"

ঈষৎ ঝঙ্কারের সুরে মা বলিল, "বাজারে গিয়েছে। নিজে বাজারে না গেলে তো চল্‌বে না ; বাবুকে পাঠালে ছ'টাকার মাল এক টাকায় বেচে আস্‌বে, তারো পাঁচগণ্ডা পয়সায় তাড়ী-মদ খেয়ে বাড়ী ঢুকবে। এমন কর্‌লে তো সংসার চলে না।"

রাগে যেন গর্ গর্ করিতে করিতে মাণ্‌কেকে ডাকিয়া দিবার জন্য পুনরায় আদেশ দিয়া মা বাহির হইয়া গেল। সোহাগী ঘরের খুঁটি ধরিয়া অনেকক্ষণ গম্ভীরমুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে যেন ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিয়া, নিদ্রিত স্বামীকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়া কঠোর অবজ্ঞার স্বরে ডাকিল, "ওঠো।"

সে স্বরে এবং সে ধাক্কায় মাণিকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে জড়াইয়াই উঠিয়া বসিল, এবং নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় সোহাগীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

সোহাগী মুখখানাকে আরও একটু ভারী করিয়া বলিল, "হয়েছে আমার মাথা ! বলি, আজ উঠ্‌তে হবে ?"

সোহাগীর কথায় মাণিকের বিস্ময়ভাবটা দূরীভূত হইল, সে দুই হাতে চোখ দুইটা রগড়াইতে রগড়াইতে "ওঃ, এই কথা !" বলিয়া পুনরায় শয়নের উদ্যোগ করিল। তদ্দর্শনে সোহাগী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিয়া উঠিল, "ও মা, আবার শুতে যাচ্ছো যে ?"

কাঁথাটাকে সরাইয়া কাঁধ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া চাপা দিতে দিতে মাণিক উত্তর করিল, "বড্ড শীত।"

বলিয়া সে পুনরায় শুইয়া পড়িল। সোহাগী রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "শীত ব'লে কি আজ উঠতে হবে না ?"

কানের উপর কাঁথাটা টানিয়া দিয়া মাণিক বলিল, "উঠবো বৈ কি ?"

ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে সোহাগী বলিল, "কখন্ উঠবে ? খাবার সময় ?"

তাহার এই রাগে মাণিক কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বেশ নির্ভীকভাবেই উত্তর করিল, "হুঁ।"

"কিন্তু খাওয়াটা আস্‌বে কোথা থেকে ?"

"শ্বশুরের পয়সা থেকে।"

"শ্বশুর বুঝি তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে ?"

"দু'দিন দশ দিন আর খাওয়াতে পারবে না ?"

"না।"

"আচ্ছা, না পারে, তখন দেখা যাবে।"

মাণিক পাশ ফিরিয়া সোহাগীর দিকে পিছন করিয়া শুইল। সোহাগী উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বিরক্তভাবে সরিয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। বাস্তবিক, শীতটা বড়ই বেশী পড়িয়াছে। এই শীতে মাঠের ঠাণ্ডা বাতাসে ধান কাটা সহজ কায কি ? বাতাসে ঘরের ভিতরেই বুক যেন গুর্ গুর্ করে। কিন্তু কায না করিলে কে বসাইয়া খাওয়াইবে ? বসাইয়া খাওয়াইতে পারিত সোহাগী,—বারোমাস না পারিলেও দশ দিনও পারিত, যদি বাগ্দীর মেয়েদের মত তাহার মাছ ধরিতে, গোবর কুড়াইতে যাইবার উপায় থাকিত। কিন্তু মা-বাপের আদরে মেয়ে সোহাগীর তাহা করিবার উপায় নাই, অভ্যাস না থাকায় সে করিতেও পারিবে না। সুতরাং স্বামীর দশদিন বসিয়া খাইবার আশা বৃথা। সে বসিয়া খাইতে গেলে সোহাগীকে খোঁটা খাইতে হইবে। সোহাগী এক দিন না খাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মা-বাপের কাছে খোঁটা খাইতে পারিবে না।

সোহাগী ধীরে ধীরে গিয়া পুনরায় বিছানার কাছে দাঁড়াইল, এবং নিতান্ত মিনতির সুরে বলিল, "এখনো শুয়ে রইলে ?"

মাণিক বলিল, "উঠে কি করবো?"

সোহাগী বলিল, "বাবা ব'লে গিয়েছে, মনসাতলার দেড় বিঘের ধানটা কাটতে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া মাণিক বলিল, "এই কন্‌কনে শীতে কাস্তে ধরতে গেলে হাত বেঁকে যায়।"

আবদারের সুরে সোহাগী বলিল, "তা যাক্‌, তুমি ওঠো।"

"তব উঠতে হবে?"

"হাঁ হবে, আমি গলায় কাপড় জড়িয়ে বলছি, ওঠো।"

মাণিক ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার এত জেদ কেন, সোহাগ?"

মাথা নাড়িয়া সোহাগী বলিল, "হাঁ, ওগো, ধানটা তোমাকে কেটে আসতেই হবে।"

"যদি ধান কাটতে না যাই?"

"তা হ'লে—না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওঠো।"

মাণিক দেখিল, সোহাগীর চোখ দুইটা জলে টপ্‌ টপ্‌ করিতেছে। মাণিক বলিল, "তুমি কাঁদচো, সোহাগ?"

"না গো না, তুমি ওঠো" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথাটা বলিয়াই সোহাগী ঝড়ের মত ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। ব্যাপার কিছু না বুঝিলেও মাণিক আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের বাহির হইল।

৩

কোঁচার খুঁটটা উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়া কাস্তে হাতে মাণিক ঘরের বাহির হইল বটে, কিন্তু উত্তুরে বাতাসের এক একটা ধাক্কা ঠিক বরফের ধাক্কার মত আসিয়া বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যখন কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল, তখন মাণিকের মনে হইল, দূর হউক, এত শীতে না গেলেই ভাল হইত, ধানগুলা আজ না কাটিলেও তো কোন ক্ষতি নাই। ক্ষতি না থাকিলেও সোহাগীর ব্যগ্রতাপূর্ণ অনুরোধ মনে পড়ায় মাণিক ফিরিতে পারিল না; হাত দুইটাকে জড় করিয়া বুকের কাছে রাখিয়া সে মাঠের দিকে অগ্রসর হইল।

পশ্চাৎ হইতে রসিক সরকার ডাকিল, "তামাক খেয়ে যাও হে, মাণিক।"

মাণিক বিছানা হইতে উঠিয়াই বাহির হইয়াছিল, তামাক পর্য্যন্ত খায় নাই। সুতরাং এই দুরন্ত ঠাণ্ডার সময় তামাক খাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। রসিক রোদে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, মাণিক গিয়া তাহার পাশে বসিল। রসিক তাহার হাতে হুঁকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে কোথায় চলেছ?"

মুখ মচ্‌কাইয়া মাণিক উত্তর করিল, "চুলোয়। মাঠে যাচ্ছি, আর যাব কোথা?"

"ধান কাটা হচ্ছে না কি?"

"হচ্ছে না, হবে। কর্ত্তা হুকুম ক'রে গিয়েছে, দেড় বিঘের ধান কাটতে হবে।"

"আমারো ধানগুলো কাটতে হয়েছে। তা বলি, থাক্‌ দু'দিন। যে শীত পড়েছে, অমনিই ঠাণ্ডায় হাত বেঁকে যায়। এত ঠাণ্ডায় কাস্তে ধরা যায় না।"

মাণিক একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ভাই, তোমার নিজের কাজ, পারি না বল্‌লে চলে। আমার ত সেটি বলা চল্‌বে না।"

রসিক বলিল, "চল্‌বে না তো ম'রে ম'রেও কাজ কত্তে হবে না কি?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুরের হুকুম না কি?"

বিরক্তিটুকু গোপন করিয়া মাণিক তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, "না না, হুকুম কেন, তবে ধানটা কাটতে হয়েছে।"

রসিক বলিল, "আমারো ধানগুলো কাটতে হয়েছে। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় কাস্তে ধরা যায় কি?"

সত্যই, এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় কাস্তে ধরিয়া ধান কাটা যায় না। না গেলেও মাণিক কেন যে এই দুঃসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া আপনাকে লজ্জিত করা সে সঙ্গত বোধ করিল না। সুতরাং সে রসিকের কথার কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিল।

রসিক একটা হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, সে দিন না তোমাদের শ্বশুর-জামায়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাণিক বলিল,—"না, ঝগড়া এমন

কিছু নয়। সে দিন হয়েছিল কি জান, দেড় টাকার মাছ বেচে তাড়ীখানায় ঢুকে বারো গণ্ডা পয়সা বরবাদে দিয়ে এসেছিলাম। তাই ওনারা বলাবলি করে। আমিও তাড়ীর ঝোঁকে—বুঝলে কি না, খুব বচসাই হয়ে গেল।"

রসিক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বটে! তা জামাই যদি বারো গণ্ডা পয়সা খরচ করেই আসে—"

বাধা দিয়া মাণিক তাড়াতাড়ি বলিল, "আহা, পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে তো ওনারা কিছু বলে না, তবে তাড়ীটা সে দিন বড্ড বেশী খাওয়া হয়েছিল, তাই তরেই বলাবলি কত্তে নেগেছিল।"

রসিকের হাতে হুঁকাটা ফিরাইয়া দিয়া মাণিক প্রস্থানের উপক্রম করিল। রসিক হুঁকায় একটা টান দিয়াই বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিল, "এঃ, কিচ্ছু নাই এটায়। ব'সো ব'সো, আর এক ছিলিম তামাক খাও।"

মাণিকের কিন্তু আর এক ছিলিম তামাক খাইবার ইচ্ছা ছিল না, প্রস্থানের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মাঠে যাইবার জন্য যে তাহার এই ব্যস্ততা, তাহা নহে; তাহাকে আর এক ছিলিম তামাক খাইতে গেলে কথায় কথায় সে দিনের ঝগড়ার সত্য বিবরণটা প্রকাশ হইয়া পড়ে! বাস্তবিক, বেশী তাড়ী খাওয়ার জন্য তো শ্বশুর সে দিন বকাবকি করে নাই, বারো গণ্ডা পয়সা নষ্ট করাতেই জামাইকে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' করিয়াছিল। এমন কি, সেই দিন হইতে মাণিকের মাছ ধরিতে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু শ্বশুরকৃত সে অপমানের কথাটা তো মাণিক প্রকাশ করিতে পারে না; কাজেই নিজের দোষ দেখাইয়া তাহাকে সত্য গোপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কথায় কথায় সে সত্যটা যদি বাহির হইয়া যায়। সুতরাং রসিকের তামাক খাইবার অনুরোধের উত্তরে সে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর তামাক খাব না, বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া হাসিয়া রসিক বলিল, "তা হোক্ না বেলা, এ তো আর পরের মজুরী খাটা নয়, নিজের কায। ব'সো ব'সো।"

অগত্যা মাণিককে বসিতে হইল। রসিক কিন্তু তামাক আনিয়া সেদিনের ঝগড়ার কথা আর উত্থাপন করিল না; অন্য বাজে গল্প ফাঁদিয়া বসিল। মাণিক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং এক ছিলিমের স্থলে তিন ছিলিম তামাক ধ্বংস করিয়া যখন দেখিল, জল খাবারের বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ বেলা আর মাঠে গিয়া কোন ফল নাই, তখন কাস্তে হাতে পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৪

কালাচাঁদ বাজার হইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ধান কতটা কাটা হ'লো মাণিক?"

খানিক ইতস্ততঃ করিয়া মাণিক উত্তর দিল, "হয়নি।"

একটু বিস্ময়ের সহিত কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, হয়নি, "তবে ধান কাট্‌তে আজ যাও নি?"

মাণিক বলিল, "গিয়েছিনু, কিন্তু যে শীত!"

রাগে মুখ ভারী করিয়া কালাচাঁদ বলিল, "কিন্তু এই শীতে বুড়ো মানুষ আমি, এক কোশ রাস্তা ভেঙ্গে বাজারে যেতে পারি।"

মুখটা যেন নিতান্ত ঘৃণার সহিত ফিরাইয়া লইয়া কালাচাঁদ গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিল। মাণিক মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে শ্বশুরের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

অদূরে বসিয়া সোহাগী মাছ বাছিতেছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কালাচাঁদ বলিল, "দেখলি, সোহাগী রকমখানা?"

সোহাগী মুখ না তুলিয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, হুঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা কালাচাঁদের যেন তেমন ভাল লাগিল না। সে মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "কিন্তু এ রকম করলে চল্‌বে কি ক'রে? বুড়ো মানুষ আমি, ক'দিক্ সাম্‌লাব?"

সোহাগী কোন উত্তর করিল না। সোহাগীর মা স্বামীর সম্মুখে আসিয়া ডান হাতটা নাড়িতে নাড়িতে রুক্ষ স্বরে বলিল, "তোমার সংসার, তুমি সাম্‌লাবে না তো কে সাম্‌লাবে শুনি।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক কালাচাঁদ বলিল, "আমার সংসার, আর ওদের কি নয়?"

গৃহ-শিল্প।

[শিল্পী—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়।

মুখ মচ্‌কাইয়া সোহাগীর মা বলিল, "ওদের কার,—জামায়ের? আ রে, বলে—'জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।' জামাই তোমার সংসার দেখবে, বুড়ো বয়সে বসিয়ে খাওয়াবে। কপাল আর কি!"

কালাচাঁদ বলিল, "কেন, জামাই আর ছেলে আলাদা না কি?"

সোহাগীর মা বলিল, "সে তোমার আমার কাছে নয়, বরং ছেলের ওপরে জামাই। কিন্তু ওদের কাছে তা নয়। জামাই তো পরের কথা, মেয়েই আপন হয় না!"

কালাচাঁদ ঈষৎ হাসিল, বলিল, "কেন, তোমার মেয়ে পর হয়ে গিয়েছে না কি?"

মুখ বাঁকাইয়া সোহাগীর মা বলিল, "তুমি যেমন ন্যাকা! মেয়ে ততদিন আপনার থাকে, যতদিন না বিয়ে হয়। বিয়ে হয়ে গেলে তখন বাপ-মা সব পর।"

ঘাড় নাড়িয়া কালাচাঁদ বলিল, "বটে!"

সোহাগীর মা বলিল, "বটে নয়, তুমি কি মনে কর, সোহাগী এখন তোমার দুখ-দরদ ভাবে? হায় হায়, সে দিন আর নাই, ও এখন দুখ-দরদ ভাবে জামায়ের। কৈ, জামাইকে একটা কথা বল দেখি, সোহাগী এখনি রাগে ফোঁস্ ক'রে উঠবে। তুমি সারা দিন-রাত বুক জুড়ে খেটে এস, কিন্তু জামাইকে এক বেলা একটু বেশী খাট্‌তে বল্লেই ওর মুখ ঘুরে যাবে।"

"হাঁ যাবে, তোমার এক কথা।" বলিয়া কালাচাঁদ স্নান করিতে চলিয়া গেল। সোহাগী ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে মাছ বাছিতে লাগিল।

৫

রাত্রিতে সোহাগী স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করেছ বল দেখি?"

মাণিক হাসিয়া উত্তর করিল, "মনে করেছি, তোমাকে এক জোড়া ঝুম্‌কো পাশা গড়িয়ে দেব।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া সোহাগী বলিল, "ইঃ, নিজের পেটের ভাতের যোগাড় নাই, আমাকে পাশা গড়িয়ে দেবে! কপাল তোমার!"

সহাস্যমুখে মাণিক বলিল, "আমার কপালটা মন্দ দেখলে কিসে বল তো? দিব্যি শ্বশুরের খাচ্ছি, আর প'ড়ে আছি।"

তীব্রস্বরে সোহাগী বলিল, "শুধু প'ড়ে আছ, প'ড়ে প'ড়ে কেমন লাথি-ঝাঁটা খাচ্চো। এমন ঝাঁটার ভাত খাওয়ার চাইতে উপোস দিয়ে মরাও ভাল।"

বলিয়া সোহাগী যেন তীব্র ঘৃণার সহিত মুখটা ফিরাইয়া লইল। মাণিক কিন্তু তাহার এই রাগটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই পরিহাসের স্বরে বলিল, "আমি উপোস দিয়ে ম'লে তোমার কি হবে, সোহাগ!"

রোষবিকৃতকণ্ঠে সোহাগী বলিল, "আমার ছরাদ হবে, দু'হাতে খাচ্চি, আর দু'টো হাত বেরুবে।"

ক্রোধের উচ্ছ্বাসে সোহাগীর স্বরটা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। তাহার এই অস্বাভাবিক রাগ দেখিয়া মাণিক একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল; বলিল, "আজ তুমি বড্ড রেগেছ, সোহাগ।"

তর্জ্জন সহকারে সোহাগী বলিল, "শুধু রেগেছি কি? আজ একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বো না।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের হেস্ত-নেস্ত করবে?"

সোহাগী বলিল, "তোমার এই ব'সে ব'সে খাওয়ার।"

মাণিক। আমি কি ব'সেই খাচ্চি? খাটি না?

সোহা। খাটো যদি, তবে আজ ধান কাট্‌তে গিয়ে ফিরে এলে কেন?

মাণি। বড্ড শীত।

সোহা। শীত ব'লে ফিরে এলে, কিন্তু যদি পরের মজুরী খাট্‌তে যেতে হ'তো?"

মুখ মচ্‌কাইয়া মাণিক বলিল, "সে আলাদা কথা।"

রোষগম্ভীর স্বরে সোহাগী বলিল, "আলাদা কথা বল্লে চল্‌বে না। শোন, কাল তোমাকে ঐ জমীর ধান সব কেটে ঘরে ঢুক্‌তে হবে।"

মাণি। যদি না পারি?

সোহা। না পার, নিজের পেটের ভাতের চেষ্টা ক'রে নেবে।

মাণি। তোমরা আমাকে খেতে দেবে না?

সোহা। না।

মাণি। খেতে দিবার মালিক তুমি নও।

সোহা। যারা মালিক, তাদের আমি মাথার কিরে দিয়ে বারণ ক'রে দেব।

মাণি। সত্যি দেবে?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া জোর গলায় সোহাগী বলিল, "হাঁ, দেব। না দিই তো আমি বাগ্দীর মেয়েই নই।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে" বলিয়া মাণিক পাশ ফিরিয়া শুইল। খানিক পরে মাণিক ডাকিল, "সোহাগ!"

সোহাগী চড়া গলায় উত্তর দিল, "কেন?"

মাণি। আমাকে উপোস রেখে তুমি খেতে পারবে?

সোহা। পারি কি না, কাল দেখে নিও।

মাণি। তা হ'লে আমার ওপর তোমার ভালবাসা নেই, বল?

রুক্ষকণ্ঠে সোহাগী উত্তর করিল, "না, নেই; তার কি হয়েছে বল।"

মাণিক ঈষৎ দুঃখিত স্বরে বলিল, "হয়নি কিছু। তা হ'লে আমি যদি ম'রে যাই?"

অন্ধকারেই মুখভঙ্গী করিয়া সোহাগী উত্তর দিল, "তবে তো আমার বড্ডই ক্ষেতি।"

মাণিক বলিল, "আর যদি এখান থেকে চলে যাই?"

সোহাগী যেন নিতান্ত ব্যগ্রস্বরে বলিল, "বেশ তো, যাও না। কবে যাবে? আজ রাতেই না কি?"

মাণিক একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তামাসা নয়, সোহাগ, তুমি যদি এমনতর কর, তা হ'লে সত্যিই আমি চ'লে যাব।"

পরুষকণ্ঠে সোহাগী বলিল, "আমিও তা হ'লে নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচি।"

মাণিক বলিল, "বোধ হয়, পছন্দ ক'রে একটা সাঙ্গা কর।"

সোহাগী বলিল, "সাঙ্গা করি, কি নিকে করি, একবার গিয়েই দেখ না।"

"আচ্ছা, তাই দেখবো!" বলিয়া মাণিক চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৬

পরদিন সকালে মাণিককে আর ডাকিতে হইল না; সে নিজেই খুব সকালে উঠিয়া কাস্তে হাতে বাহির হইয়া গেল। মা মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ যে এত সকালেই বাবুর ঘুম ভেঙে গেল, সোহাগী?"

সোহাগী বলিল, "তোমাদের কপাল ধরেছে আর কি।"

কিন্তু বেলা আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও মাণিক যখন মাঠ হইতে ফিরিল না, এবং সে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় সোহাগী বা সোহাগীর মা খাইতে পাইল না, তখন মা একটু উদ্বিগ্ন অথচ বিরক্তভাবে বলিল "বেলা শেষ হয়ে এলো, মাণ্‌কে এখনো ফিরলো না; গেল কোথায়?"

রুদ্ধভাবে সোহাগী বলিল, "চুলোয় গিয়েছে। তুমি এখন আমাকে খেতে দেবে কি না বল।"

মা বলিল, "তুই খা না, বাছা, তবে এতখানি বেলা, ছোঁড়া কিছু খায় নি!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সোহাগী বলিল, "খায় নি—তার কপাল। সে আজ মাঠের ধান রেখে আসবে না।"

মা যেন বিরক্তির সহিত বলিল, "কে জানে, বাছা, রাগ-ভাগ কিছু হয়েছে না কি? তা বাবুকে তো কায কত্তে বল্‌লেই রাগ! এমন রাগ-গোসা নিয়েই বা ক'দিন চলবে?"

সোহাগী মাতাকে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমাদের চলা-চলির কথা তোমরাই জান, আমি তোমাদের কাছে দু' বেলা দু'মুটো ভাতের ভিখিরী; আমাকে ভাত এক মুঠো দেবে কি না তাই বল।"

সোহাগীর এই আক্ষেপোক্তিটা মায়ের কাছে কঠোর শ্লেষোক্তি বলিয়া বোধ হইল। মা একটু রাগিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ও কি কথা লা, সোহাগী? তুই আমাদের কাছে ভাতের ভিখিরী? দেখছি, আজকাল তোর এই রকম কট্‌কটে কথা হয়েছে।"

সোহাগীও রাগে চোখ কপালে তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "হয়েছে তার করবে কি? সহ্য কত্তে না পার, দূর ক'রে দাও।"

সামান্য কথার উত্তরে মেয়েকে এত বড় চড়া কথা বলিতে দেখিয়া মায়ের ক্রোধের সীমা রহিল না। হায় রে, আদরের মেয়ে সোহাগী—যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে, এই ভয়ে মিন্‌সে বুড়ো বয়সে মাথায় মোট বহিয়া একটা পরের ছেলেকে ঘরে পুষিতে কাতর নয়, সেই সোহাগীর মুখে এত বড় স্নেহশূন্য কঠোর উক্তি! মা রাগে জ্ঞান-হারা হইয়া বলিল, "দূর ক'রে দিলে যাবি কোথায়?"

সদর্পে সোহাগী উত্তর করিল, "চুলোয়। কেন, তোমাদের ঘর ছাড়া আর কোথাও যাবার যায়গা নেই না কি?"

তোমাদের ঘর! হা ভগবান্, সোহাগী তবে এটাকে পরের ঘর বলিয়াই মনে করে? মা-বাপের ঘর আজ তাহার কাছে পরের ঘর। ইহাকেই বলে মেয়েছেলে! বেদনা-কাতর স্বরে মা বলিল, "তা বল্‌বি বৈ কি, সোহাগী, এখন তোর যাবার অনেক যায়গা হয়েছে, আমরা এখন তোর কাছে পর হয়ে দাঁড়িয়েছি।"

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সোহাগী বলিল, "সাধে কি এমন কথা বলি, তোমাদের ব্যাভারে বল্‌তে হয়। দোষ কর্‌বে এক জন, কিন্তু তার তরে লাঞ্ছনা খেতে হবে আমাকে। কেন বল তো, আমি তোমাদের কাছে কি এমন দোষ-ঘাট করেছি?"

সোহাগীর দুই চোখ দিয়া অভিমানের অশ্রুবিন্দু টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। সেই কয় ফোঁটা জলেই মায়ের রাগ, দুঃখ, আক্ষেপ সব মুছিয়া গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়া স্নেহ-কোমল স্বরে মা বলিল, "পাগল মেয়ে! নে, আয়, ভাত দিই গে চল্।"

সোহাগী মুখটাকে সবেগে ঘুরাইয়া লইয়া ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিল, "আর তোমার ভাত দিতে হবে না; দিলেও আমি কখনো খাব না।"

মা অনেক সাধ্যসাধনা করিল, সোহাগী কিন্তু ভাত খাইল না। সে এমন কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিল যে, মা হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিল না; কাযেই সে এই চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া প্রথমে এই-রূপ একগুঁয়ে মেয়েকে পেটে ধরার জন্য নিজের পোড়া কপালের উপর, তাহার পর ঘরজামাই করিয়া মেয়েকে ঘরে রাখিবার জন্য নির্ব্বোধ মিনসের বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিতে লাগিল।

তা মা যদি ভিতরের কথা জানিত, তাহা হইলে মেয়ের অবাধ্যতার জন্য এত দুঃখ প্রকাশ করিতে বসিত না। আসল কথা, সোহাগীর খাইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। রাত্রিতে সে স্বামীকে যে কড়া কড়া কথাগুলা শুনাইয়া দিয়াছিল, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কথাগুলা আপন মনে আলোচনা করিয়া মনে মনে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করিয়াছিল এবং স্বামীর নিকট নিজের এরূপ অহঙ্কার প্রকাশের জন্য আপ-নাকে ধিক্কার দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহার পর সকালে উঠিয়া মাণিক যখন কাস্তে লইয়া বাহির হইয়া গেল, তখনই একটা সম্ভাবিত দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাহার অন্তর শঙ্কিত হইয়া উঠিল। জলখাবারের বেলা অতীত হইয়া গেল, মাণিক জলপান খাইতে আসিল না; মধ্যাহ্নও অতীত হইল, মাঠের মজুররা একে একে ঘরে ফিরিতে লাগিল, মাণিক কিন্তু আসিল না। আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া সোহাগীর মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এক দণ্ড ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না, সেই মানুষ আজ রাগে বা দুঃখে এতখানি বেলা না খাইয়া কায করিতেছে! আর সে রাগ বা দুঃখ আর কাহারও উপর নয়, সোহাগীর উপরে। সোহাগীর ইচ্ছা হইল, সে মাঠে গিয়া তাহাকে বলে, ওগো কাযের লোক, আর তোমার কায করিয়া কায নাই, পেটে এক মুটা দিবে এস।

দণ্ডের পর দণ্ড যতই অতীত হইতে চলিল, সোহাগীর প্রাণটা ততই যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অথচ অন্তরের এই ব্যাকুলতা বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারায় উহা যেন আরও বেশী যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। কালাচাঁদ তখনও বাজার হইতে ফিরে নাই। ফিরিলেও সোহাগী কি স্বামীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বাপকে অনুরোধ করিতে পারে?

মনের এইরূপ অবস্থায় সোহাগীর মা মাণিকের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিল, আহারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোহাগী তখন ভাত খাইতে যাইয়া মায়ের কাছে স্বীয় নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করিতে গেল। সে সময়ে মা যদি কোন কথা না বলিয়া ভাত বাড়িয়া দিত, তাহা হইলে সোহাগী সেই ভাত লইয়া কি যে করিত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে কথায় কথা বাড়িয়া মা ও মেয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিল। সোহাগী যেন বাঁচিয়া গেল; অভিমানের অছিলায় মায়ের সস্নেহ সাধ্য-সাধনাকে উপেক্ষা করিবার চমৎকার সুযোগ পাইয়া গেল।

মায়ের অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলিলেও বাপের অনুরোধ উপেক্ষা করা সোহাগীর পক্ষে অসাধ্য হইল। কালাচাঁদ বাজার হইতে ফিরিয়া, হাত ধরিয়া মেয়েকে যখন ভাতের কাছে বসাইয়া দিল, তখন সোহাগীকে বাধ্য হইয়া ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে হইল। কিন্তু প্রথম গ্রাস গলাধঃ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস তুলিতেই রুদ্ধ অশ্রু যেন অভিমানের তাড়নায় এমনই উচ্ছ্বসিত হইল যে, একটা কাসি আসিয়া তাহার মুখের ভাতগুলাকে চারিদিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

সোহাগী হাত গুটাইয়া লইয়া বাঁ হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় মাণিক মাঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সোহাগীকে বলিল, "আজ দেড় বিঘের ধান সব কেটে এসেছি, সোহাগ!"

ভারী মুখে ঝঙ্কার দিয়া সোহাগী বলিল, তবে ত আমার সব ছুখ্যুই ঘুচে গিয়েছে।"

স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য মাণিক সারা দিন অনাহারে খাটিয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট প্রশংসার পরিবর্ত্তে এই অপ্রত্যাশিত বিরক্তিটুকু পাইয়া বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল; নিতান্ত হতাশ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লে তোমার ছুখ্যু ঘুচে, সোহাগ?"

তীব্রকণ্ঠে সোহাগী বলিল, "আমি ম'লে।"

বিরাগকুঞ্চিত মুখখানা সবেগে ঘুরাইয়া লইয়া সোহাগী স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। মাণিক ম্লানমুখে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

৭

মাণিক বলিল, "আমি এখানে থাকি, এটা কি তোমার ইচ্ছা নয়, সোহাগ?"

সোহাগী একটুও না ভাবিয়া উত্তর দিল, "মোটেই না।"

চিন্তাবিমলিন মুখে মাণিক বলিল, "বেশ, আমি এখানে থাক্‌বো না।"

সোহাগী বলিল, "কোথায় থাক্‌বে? তোমার তো ঘর-ভিটে কিছু নাই।"

মাণিক বলিল, "ঘর নাই, ভিটে আছে। সেখানে ঘর বেঁধে নেব।"

সোহা। ঘর বাঁধা তো দু'এক দিনে হবে না?

মাণি। তত দিন আমার এক জ্ঞাতি-খুড়ী আছে, তার ছেলেপিলে কিছু নাই। তার ঘরে থকেতে পারবো।

সোহা। বেশ, তাই থাক্‌বে।

মাণিক একটু থামিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে—"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া সোহাগী বলিল, "ছেড়ে যাবে কেন? সাথে নিয়ে চল না।"

বিষণ্ণ মুখে মাণিক বলিল, "তুমি কি মা-বাপকে ছেড়ে আমার সাথে যাবে?"

সোহাগী বলিল, "আমি যাই না যাই, তোমার খাওয়া-পরা যোগাবার ক্ষ্যামতা থাক্‌লে তো নিয়ে যাবে। তোমার তো সম্বলের মধ্যে চার আনা মজুরী, তা নিজেই খাবে না আমাকে খাওয়াবে?"

উৎসাহসূচক স্বরে মাণিক বলিল, "তুমি যদি যাও, সোহাগ, আমি নিজে উপোস দিয়ে তোমাকে খাওয়াব।"

সোহাগী বলিল, "ক'দিন উপোস দেবে? বারো মাস?"

মাথা নাড়িয়া, মাণিক উত্তর করিল, "হাঁ তো।"

সোহাগী ঈষৎ হাসিল; বলিল, "এক জনকে উপোস রেখে নিজের পেট ভরান—এমন খাওয়া আমি খেতে চাই না।"

মাণিক বলিল, "আমিও সেই তরে তোমায় নিয়ে যেতে চাই না।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে সোহাগী বলিল, "সেটা খুব বুদ্ধির কাযই করেছ।"

জামাই চলিয়া যাইবে শুনিয়া কালাচাঁদ চিন্তিত হইল। সোহাগীর মা কিন্তু একটুও ভয় পাইল না, সে কালাচাঁদকে অভয় দিয়া বলিল, "ভাবনা কিসের? এ তো বামুন-কায়েতের ঘর নয়; আমি মেয়ের আবার সাঙ্গা দেব।"

স্ত্রীর অভয়দান সত্ত্বেও কালাচাঁদ জামাইকে বুঝাইতে ত্রুটি করিল না। মাণিক কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না; বুঝিলেও সোহাগীর কড়া কড়া কথাগুলা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং একদিন সকালে সে কাপড়-চোপড় বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রাকালে শ্বশুরকে প্রণাম করিতে গেলে শ্বশুর ভারী মুখে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সুখের ভাত খেতে ঠোঁট পুড়ে গেল, দিন কতক দুঃখের ভাত খাওগে, বাছা।"

মাণিক নিরুত্তরে প্রস্থানোদ্যত হইল। এমন সময় সোহাগী আসিয়া মায়ের কাছে টিপ করিয়া গড় করিতেই মা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "ও মা, তুই আবার গড় কত্তে এলি কেন?"

সোহাগী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বাপের পায়ের

কাছে মাথা নীচু করিতে করিতে বলিল, "তবে চল্লুম, বাবা।"

বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "তুই কোথায় যাবি সোহাগী ?"

প্রস্থানোদ্যত মাণিকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সোহাগী উত্তর দিল, "ও যেখানে যাবে। ওকে তো একা ছেড়ে দিতে পারি না, বাবা।"

কালাচাঁদের বুকের উপর যেন হুম্ করিয়া মুগুরের ঘা পড়িল। হায় রে, হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ, সমুদায় ভালবাসা দিয়া যে সোহাগীকে তাহারা দুই জনে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে, সেই সোহাগী ঐ একটা কয় দিনের মাত্র পরিচিত লোককে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে অক্লেশেই ছাড়িয়া যাইতে পারে! স্নেহের—ভালবাসার এই প্রতিদান! হায় রে, অকৃতজ্ঞ মেয়ে! কালাচাঁদ মুখ তুলিল না, নতমুখেই ক্ষোভরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা!"

সোহাগী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মা কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুই আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবি, সোহাগী ?"

বলিয়া সে মেয়েকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেই কালাচাঁদ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর, থাক্।"

সোহাগী বিস্ময়-বিহ্বল স্বামীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। কালাচাঁদ রোরুদ্যমানা পত্নীর হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সোহাগীর মা ব্যাকুল-নেত্রে কন্যা-জামাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে সোহাগীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, কি করলে গো, সোহাগী যে চ'লে গেল।"

কালাচাঁদ মুখ ফিরাইয়া একবার রাস্তার দিকে চাহিল; তাহার পর আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সোহাগি, সোহাগি!"

সোহাগী তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। শুধু প্রতিধ্বনি উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া উত্তর দিল,—হি হি হি হি।

কালাচাঁদ মাথায় হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গাছের কেয়ারী।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে ভোলানাথ স্থানীয় পাঠশালায় বিশ্বনাথ আচার্য্য নামক গুরুমহাশয়ের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হয়েন। এই স্থানে ভোলানাথ বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং চাণক্য-শ্লোক কণ্ঠস্থ করেন। বিশ্বনাথ বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী বুল্‌টী গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পাঠশালার আয়ে এবং কোষ্ঠী ও পঞ্জিকাগণনার পারিশ্রমিক দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৩০টির অধিক ছিল না, মাসিক বেতন দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্র। শীতকালে গৃহমধ্যে এবং গ্রীষ্মকালে মাঠে উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে অধ্যাপনা হইত। প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া, পরে তালপাতা ও কলাপাতায় ছাত্রগণ হস্তাক্ষর লিখিত। পাঠ্য পুস্তকাদি কিছুই ছিল না। চাণক্য শ্লোক মুখে মুখে শিখান হইত। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার স্কুল বুক সোসাইটীর পক্ষ হইতে এই সময়ে পাঠশালাগুলির সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গোলদীঘীর দক্ষিণে বৈদ্যনাথ কামারের বাটীতে ডেভিড হেয়ার একবার পাঠশালার ছাত্রগণকে পরীক্ষা করেন। বিশ্বনাথ আচার্য্য তাঁহার ছাত্রগণকে তথায় লইয়া যায়েন। ছয় বর্ষ বয়স্ক ভোলানাথ শঙ্কিত হৃদয়ে এই প্রথম "সাহেবে"র নিকটে গমন করেন। পরীক্ষার ফলে ভোলানাথ ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের ব্যবহারের জন্য স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ক এ করাত" পুস্তক উপহার পায়েন।

ভোলানাথের মাতুলালয়ের অতি নিকটেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে—মিষ্টার ম্যাকে (Mr. Mackay) নামক এক জন স্কটল্যাণ্ডবাসী নিমতলা রোডে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে ভোলানাথ এই স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। মিষ্টার ম্যাকে স্বয়ং তাঁহাকে ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা দেন। প্রথম দিন ইংরাজী ভাষার প্রথম পাঁচটি বর্ণ ছয়বার উচ্চারণ করিয়া ম্যাকে ভোলানাথকে A B C D E উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ভোলানাথ তাঁহার মতন উচ্চারণ করিলে ম্যাকে প্রীত হইয়া তখনই তাঁহাকে বাড়ী যাইবার ছুটী দিলেন। মিষ্টার ম্যাকের এক বন্ধু মিষ্টার মিডলটন (যিনি পরে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন) মধ্যে মধ্যে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। তিনি প্রায়ই মদ্য পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায় আসিতেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলে বালক ভোলানাথ বড়ই ভীত হইতেন। ভোলানাথ ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করিবার অল্পদিন পরেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ম্যাকের স্কুল বিলুপ্ত হইয়া গেল; ভোলানাথ অতঃপর কিছুদিন জয়নারায়ণ মাষ্টারের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ দিবসে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত য়ুরোপীয় শিক্ষক হেনরী লুই ডিডিয়ান ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দু সমাজের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া হিন্দু আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে রক্ষণশীল হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ে উচ্চতম ইংরাজী শিক্ষার সহিত আদর্শ চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা করিয়া এই শঙ্কা দূর করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করেন। তিনি হার্ম্মান জিওফ্রি নামক এক দুঃস্থ ব্যারিষ্টারকে স্বল্পবেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্ম্মান জিওফ্রি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং য়ুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। অত্যধিক পানদোষ থাকায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ছাত্রগণকে তিনি অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এক জন ছাত্র তদীয় আত্মচরিতে

লিখিয়াছেন যে, এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হইত। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হাটখোলানিবাসী ভবানীচরণ দত্ত,'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তদগ্রজ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীনাথ ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ হার্ম্মান জিওফ্রির নিকটেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ভোলানাথ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দুই বৎসর ইংরাজী ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করেন। হিন্দু কলেজের ন্যায় গৌরমোহন আঢ্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রগণকেও মহাসমারোহে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বৈঠকখানার একটি দ্বিতল গৃহে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অভিনয় ও আবৃত্তি করেন, "আলেক্জাণ্ডার ও দস্যুর" অভিনয়ে ভোলানাথ আলেক্জাণ্ডারের এবং তদীয় সহপাঠী সূর্য্যকুমার বসাক মহাশয় দস্যুর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে বালক ভোলানাথ হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থলে বর্ণিত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস যে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা সত্য নহে। সেকালে গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা বিতরণের জন্য কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হুগলীতে ইংরাজের বাণিজ্যপোত আসিবার পর দালালরা এবং কুঠীর লোকরা প্রায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজাধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। পরে রামরাম মিশ্র প্রমুখ দুই চারি জন ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালী এবং ফিরিঙ্গী ও পাদরীরা স্থানে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দেশীয়গণকে যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আদেশ দেন যে, ভারত পরিচালনা সভা সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং দেশীয়গণের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন। কিন্তু যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকাকে হারাইয়াছিল, সেই প্রতীচ্য শিক্ষা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিতে ইংরাজগণ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিসংস্থাপনের পর উদারহৃদয় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন :—

"It is humane, it is generous to protect the feeble, it is meritorious to redress the injured; but it is a God-like bounty to bestow expansion of intellect, to infuse the Promathean spark into the statue and waken it into a man."

লর্ড হেষ্টিংসের এই প্রকাশ্য বক্তৃতা রাজকীয় ঘোষণাবাণীর ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হইল। বোম্বাই প্রদেশে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন দেশীয়গণের উচ্চশিক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কলিকাতায় মহাত্মা রামমোহন রায় ও প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের অর্থ কিন্তু প্রাচ্য সাহিত্যাদি-বিষয়ক পুস্তকের প্রচারে ও দেশীয় ভাষাশিক্ষার জন্যই প্রধানতঃ ব্যয়িত হইতে লাগিল।

উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি বিদ্যালয়

স্থাপনের জন্য ডেভিড হেয়ার তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিলেন। স্বর্গীয় বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই সার হাইড ঈষ্টের নিকট যাইতেন। সার হাইড বৈদ্যনাথকে দেশীয় নেতৃগণের মতামত জানিতে অনুরোধ করেন। ইঁহাদের অনুকূল অভিমতে উৎসাহিত হইয়া সার হাইড ঈষ্ট তদীয় ভবনে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে দিবসে সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রগণকে লইয়া একটি সভা করেন। এই সভায় একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা স্থির হয়। পরবর্ত্তী আর এক সভায় ৮ জন য়ুরোপীয় ও ২০ জন দেশীয় ব্যক্তি লইয়া এক সমিতি গঠিত হয় এবং মহাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ও তৎ প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের ভার এই সমিতির উপর প্রদত্ত হয়। এই সমিতির সদস্যগণের নাম এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

ডেভিড হেয়ার।

সার এড্ওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট,—সভাপতি। জে, এইচ্, হ্যারিংটন,—সহকারী সভাপতি। ডব্লিউ, সি, ব্ল্যাকোয়্যার। কাপ্তেন জে, ডব্লিউ, টেলর। এইচ্, এইচ্, উইলসন। এন, ওয়ালিচ। লেফটেনাণ্ট ডব্লিউ, প্রাইস্। ডি, হেমিং। কাপ্তেন টি, রোযাক্। লেফ্‌টেনাণ্ট ফ্রান্সিস আর্ভিন। চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন। সুব্রহ্ম মহেশ শাস্ত্রী। হরিমোহন ঠাকুর। গোপীমোহন দেব। জয়কৃষ্ণ সিংহ। রামতনু মল্লিক। অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামদুলাল দে। রাজা রামচাঁদ। রামগোপাল মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। চৈতন্যচরণ শেঠ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ। গোপীমোহন ঠাকুর। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাধাকান্ত দেব। রামরতন মল্লিক। কালীশঙ্কর ঘোষাল।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, উক্ত সমিতিতে রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ারের নাম নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজা রামমোহন রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃগণের এরূপ অশ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন থাকিলে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না এবং রাজা রামমোহনও তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ মহত্ত্ব সহকারে বলিয়াছিলেন যে, “আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।” ডেভিড হেয়ার চিরদিনই নীরবে এবং অপরের অলক্ষ্যে সৎকার্য্য করিতে ভালবাসিতেন।

সমিতির য়ুরোপীয় সদস্যগণ অনধিক কালের মধ্যেই একে একে অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রধানতঃ হিন্দু নেতৃগণের অর্থে ও উদ্যমে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী তারিখে গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হয়। কলেজের লক্ষাধিক টাকা যে, 'ব্যারেটো এণ্ড সন্স'-দিগের নিকট গচ্ছিত ছিল, উক্ত কোম্পানী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হিন্দু কলেজের অনেক টাকা নষ্ট হয়। এক লক্ষের মধ্যে তেইশ সহস্র টাকা মাত্র উদ্ধার হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, হরনাথ রায় এবং কালীশঙ্কর ঘোষাল এই সময়ে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ২০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা হিন্দুকলেজকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে কলেজটিকে সাধারণ শিক্ষা-সমিতির হস্তে দিয়া মাসিক তিন শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এইচ্, এইচ্, উইলসন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলেজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ডাক্তার উইলসনের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা প্রদান করেন এবং গোলদীঘীর (কলেজ স্কোয়ারের) উত্তরে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার-প্রদত্ত ভূমির উপর উক্ত বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিবসে কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে নবনির্ম্মিত গৃহে হিন্দুকলেজ স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার উইলসন এই কলেজে নব-জীবন সঞ্চারিত করেন। উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, কলেজের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুকলেজকে তিনি সাধারণের নিকট অতিশয় আদরণীয় করেন।

হেনরী লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন হিন্দু-কলেজ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রতিভার বর-পুত্র হেনরী লুই ডিভিয়ান ডিরোজিওর উপদেশে ও শিক্ষায় নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। এই সমাজ দেশের রাজনীতিক, সামাজিক, সাহিত্য বিষয়ক এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক সকল প্রকার সংস্কারের জন্য অসাধারণ উৎসাহ, প্রশংসনীয় স্বার্থত্যাগ, গভীর জ্ঞান এবং প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভোলানাথের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের নামোল্লেখ করিলে, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরবভাণ্ডার কতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের স্মৃতিপটে সমুদিত হইবে। ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া যে 'হিন্দু কবি' কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজেও

প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহযোগী স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সংবাদপত্র পরিচালনা শিক্ষা করেন, সেই কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহচর, এতদ্দেশীয় রাজনীতিক সভাদিস্থাপনে অগ্রণী তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' রচয়িতা 'রাজনীতিক পাদ্রী' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস্ রামগোপাল ঘোষ এবং সুধী ও সদ্বক্তা রসিককৃষ্ণ মল্লিক হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম পুরোহিত অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জ্জন্মদাতা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। "এক দিন যাঁর সাথে করিলে যাপন, সাত দিন থাকে ভাল উন্নিনীত মন" সেই সাধুচরিত্র রামতনু লাহিড়ী হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাধু শিবচন্দ্র দেব হিন্দু কলেজেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিক্‌দার ও কর্ম্ম-কুশল রাজা দিগম্বর মিত্র হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী গোবিন্দচন্দ্র বসাক—যাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন, ছোট আদালতের বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ—যাঁহার যত্নে ও উৎসাহে কৃষ্ণদাস পালের প্রতিভা বিকসিত হইয়াছিল, তাঁহারাও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। নবনারী, আরব্য উপন্যাস ও পারস্য ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া যিনি বঙ্গসাহিত্য অলঙ্কৃত করেন, সেই নীলমণি বসাকও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর যিনি সেকালে দেশের সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, এবং বাঙ্গালা গদ্যের যে প্রধান সংস্কারকের নিকট সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও ঋণী—সেই 'বাঙ্গালার ডিকেন্স' প্যারীচাঁদ মিত্রও এই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

ভোলানাথ যখন হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন উহার দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রসময় দত্ত এই কয়জন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যক্ষগণের সম্মুখে নাম, বয়ঃক্রম, পিতার নাম, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া ভোলানাথ বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন।

তখন গ্রীষ্মকালে দিবা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এবং শীতকালে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। বিদ্যালয়টি 'সিনিয়র' ও 'জুনিয়র' এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। জুনিয়র বিভাগে ৫টি শ্রেণী ছিল; তন্মধ্যে ১টি বালীর শ্রেণী ছিল। শেষোক্ত শ্রেণীতে বালকগণ প্রাচীনপ্রথামত বালুকার উপর অক্ষর লিখিতে শিখিত। জুনিয়র বিভাগে মলিস নামক এক জন য়ুরোপীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ভোলানাথ কিছু ইংরাজী ব্যাকরণ ও বানান শিক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে ডেভেনপোর্ট নামক এক য়ুরোপীয় শিক্ষকের অধীনে নবম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথ অঙ্কে কাঁচা ছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীর গণিতশাস্ত্রে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইত। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসর ভোলানাথ ৮ম

শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। এই শ্রেণীতে তারকনাথ নামক এক শিক্ষক অধ্যাপনা করিতেন। ডাক্তার উইলসনের স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ হেনরী টমাস কোলব্রুকের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সংস্কৃতজ্ঞ মিঃ জে, সি, সি, সাদার্ল্যাণ্ড নিযুক্ত হয়েন। ইনি বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী ব্যাকরণের অতি কঠিন প্রশ্ন করেন। ভোলানাথ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড বেণ্টিঙ্কের হস্ত হইতে ভোলানাথ সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রথম তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউস ও লর্ড বেণ্টিঙ্ককে দেখেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। সেকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আগমন করিতেন। সার আলেকজাণ্ডার চার্লসের সঙ্গে মুন্সী হইয়া যিনি কাবুলে গমন করিয়াছিলেন, সেই মোহনলাল একবার কলেজ পরিদর্শনে আইসেন। এই দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী, মস্‌লিন-পাগড়ীধারী মূর্ত্তিটি ভোলানাথের নিকট কিছু অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল। মোহনলাল পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়া একটি আইরিশ বালিকাকে বিবাহ করেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

পরবৎসর ভোলানাথ মিঃ মলিসের শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন এবং ইঁহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করেন। ইঁহার নিকট ভোলানাথ ইতিহাসে যে শিক্ষালাভ করেন, তাহাতে তাঁহাকে পরে কলিন, হিউম ও রবার্টসনের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ভোলানাথের সময়ে কলেজে ক্রীড়ার ব্যবস্থাও ছিল। ক্রিকেট, মার্ব্বেল, কপাটী, গুলিডাণ্ডা প্রভৃতি ক্রীড়াদ্বারা শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত হইত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভারতপরিত্যাগ উপলক্ষে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ হিন্দু কলেজে একটি প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। বালক ভোলানাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিককে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে শুনিয়াছিলেন।

বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির অনুমোদন করিয়া এতদ্দেশে পাশ্চাত্যসাহিত্য-বিজ্ঞানাদি প্রচারের এক অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন। পূর্ব্বে কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের আদেশানুসারে যে দশ সহস্র পাউণ্ড শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত, তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যপ্রচার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এতদ্দেশে শিক্ষাপরিষদ কিছু পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েকজন সদস্য সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষার প্রচারার্থী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ পাশ্চাত্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন। প্রাচ্যভাষা প্রচারার্থিগণই প্রথমে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মেকলে অপর পক্ষে যোগদান করিলেন, তখন পাশ্চাত্য ভাষাপ্রচারার্থীরাই জয়ী হইলেন। মেকলে তাঁহার ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৩৫) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যের উপসংহারে লিখিলেন, "যে কোন উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় পুস্তকালয়ের একটিমাত্র আলমারী সমগ্র সংস্কৃত ও আরব্য

সাহিত্যের সমতুল্য।” তিনি এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে আরও বলিলেন, “ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের বিধির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধনভাণ্ডার যে ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; যাহা জানা আবশ্যক, তাহারই শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক; দেশবাসিগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সমুৎসুক; ধর্ম্ম অথবা ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই; এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত করা সম্ভব; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।”

লর্ড উইলিয়ম ইহাতে এই অবধারণ প্রকাশিত করেন;—

১। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারল বাহাদুর শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী তারিখের পত্রদ্বয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন।

২। বড় লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচার করিলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে; এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার জন্য যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ইংরাজী শিক্ষায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ।

লর্ড মেকলে।

৩। কিন্তু সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুরের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, যত দিন দেশবাসিগণ দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমুৎসুক থাকিবে, তত দিনের মধ্যে দেশীয় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ তুলিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে, সে সকলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু শিক্ষাবস্থায় ছাত্রগণের সাহায্যার্থ যে বৃত্তি প্রদানের প্রথা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর সে প্রথার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে প্রথায় অধুনা শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্যবিধ অধিকতর আবশ্যক প্রথার দ্বারা অধিকারভ্রষ্ট হইবে এবং উচ্চ বৃত্তি প্রদানের একমাত্র ফল এই হইবে যে, সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যয়নে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অতএব তিনি আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর যে সকল ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা কোনও প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না, এবং যখন কোনও প্রাচ্য বিদ্যার অধ্যাপক তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, শিক্ষা-পরিষদ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিদ্যালয়ের অবস্থা ও ছাত্রসংখ্যার একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার স্থানে নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিচার করিবেন।
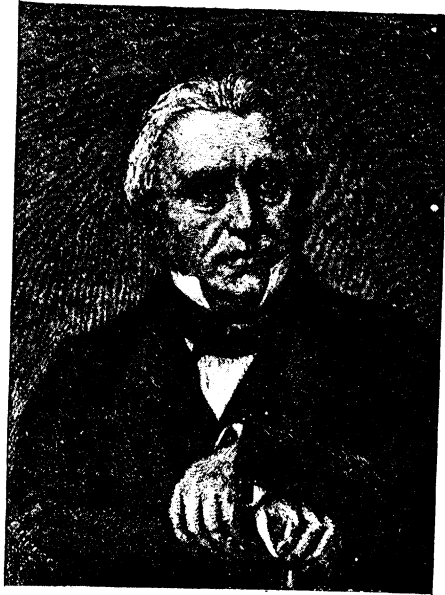
৪। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারলের গোচরে আসিয়াছে যে, শিক্ষা-পরিষদ প্রাচ্য সাহিত্যাদিবিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর উক্ত কার্য্যে আর অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

৫। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, এই সকল সংস্কার সাধিত হইলে, যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, শিক্ষা-পরিষদ সেই সমস্ত অর্থ অতঃপর দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড় লাট বাহাদুর পরিষদকে এতদর্থে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষাপদ্ধতিবিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

যখন এই অবধারণানুসারে কার্য্য আরব্ধ হইল, যখন প্রতীচ্য জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল, ঠিক সেই সময়ে অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও জ্ঞানস্পৃহা লইয়া ভোলানাথ হিন্দুকলেজের 'সিনিয়র' বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

ডি, এল, রিচার্ডসন।

কলেজের সিনিয়র বিভাগে ভোলানাথ জেম্‌স্ মিডল্‌টনের নিকট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ভোলানাথ যাঁহার নিকট ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন, সেই মিষ্টার ম্যাকের ইনি এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ভোলানাথ পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাকে জানিতেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কাপ্তেন বার্ট বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বালকগণকে ইংরাজী সাহিত্যের কয়েকটি অতি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ভোলানাথ সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পরীক্ষক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই ভোলানাথ মিঃ মূলার নামক একজন অধ্যাপকের নিকটে বায়রণের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি পাঠ করেন। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন, সেক্সপীয়রের পরেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কবি বায়রণ।

চতুর্থ শ্রেণীতে ভোলানাথ মিঃ হালফোর্ড এবং কাপ্তেন ফ্রান্সিস পামারের অধীনে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ফ্রান্সিস পামার সেকালের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার পামারের পুত্র। জন পামার দেউলিয়া হইলে ইঁহাদের অবস্থা অতিশয় হীন হয়। ফ্রান্সিস পামার ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। উক্ত বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন। ইনি পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে কাপ্তেন পামার তৎকালীন হীন অবস্থার জন্য অদৃশ্য থাকিতেন। একবার বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী ডাইস্ সম্বার হঠাৎ তাঁহার ক্লাসে আসিয়া পড়েন। ভোলানাথ ডাইস সম্বারকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তখন ইংলণ্ডে কোনও মহিলার পাণিগ্রহণার্থ গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ভোলানাথ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন এবং এই সময় হইতে বিখ্যাত ইংরাজী লেখক, সমালোচক, বক্তা এবং শিক্ষক কাপ্তেন ডি, এল্ রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। রিচার্ডসনের কাছে অধ্যয়ন করা তখন ছাত্রগণের নিকট অতিশয়

গৌরবজনক ছিল। সেকালে ছাত্রগণ প্রথম শ্রেণীতে ইচ্ছামত ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিতেন। ভোলানাথ প্রথম শ্রেণীতে প্রায় চারি বৎসর এবং রিচার্ডসনের নিকট সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ইংরাজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক-গণের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকগুলি পাঠ করেন এবং ইংরাজী রচনাশক্তি সঞ্চয় করেন। স্পেন্সার, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের অমর কাব্যগুলি রিচার্ডসনের ন্যায় সমালোচকের নিকটে পাঠ করিয়া ভোলানাথের সমালোচনশক্তিও যথেষ্ট বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অ্যাডিসন, সুইফট্, জনসন্, কোল্রিজ, ল্যাম্ব, হ্যাজলিট্ প্রভৃতির ইংরাজী প্রবন্ধাদি ভোলানাথ এই সময়েই পাঠ করেন। সাহিত্যের প্রতিই ভোলানাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গণিতশাস্ত্রে তিনি আদৌ মনোযোগ দিতেন না। রসায়ন শাস্ত্র এবং জরীপ কার্য্য ভোলানাথের মন্দ লাগিত না। প্রথমোক্ত শাস্ত্রে তিনি পুরস্কারও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেকালে হিন্দুকলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় সার এডওয়ার্ড রায়ান, সি, এইচ, ক্যামিরণ এবং ডাক্তার জে, গ্রাণ্ট প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী সাহিত্যে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় ভোলানাথের সতীর্থ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ প্রথম স্থান ও ভোলানাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল-প্রকাশের পূর্ব্বেই গোপালকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন এবং সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ভোলানাথই প্রাপ্ত হয়েন।

ভোলানাথ ইতিহাসেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গৃহীত বার্ষিক পরীক্ষায় ভোলানাথ ইতিহাসের কতিপয় প্রশ্নের এরূপ সদুত্তর দিয়াছিলেন যে, উত্তরগুলি তদানীন্তন শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি টাউনহলে হিন্দু কলেজের পুরস্কারবিতরণ সভায় সভাপতি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সম্মুখে ভোলানাথ উক্ত উত্তরগুলি পাঠ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য লর্ড অক্ল্যাণ্ডের হস্ত হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্রহণ করিয়া ভোলানাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কলেজ পরিত্যাগ করেন। ভোলানাথ গণিতে এত কাঁচা ছিলেন যে, আজিকালিকার পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে ভোলানাথ কখনও উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু সেকালে উচ্চতর আদর্শে শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং ছাত্রগণের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিকসিত করিবার চেষ্টা হইত। ভোলানাথের সতীর্থ ও পরমবন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"My friend Bholanath Chandra, the Hindu Traveller, wish a few others of his feather, used to skulk away from the Mathamatical Examination. But under a peremptory message from Sir Edward Ryan, the President of the Public Instruction Committee, they formally went through the ordeal, and returned almost blank papers, like Buncoo. Far from being affected by the consequences of failure, my friend Bholanath received the first prize of the College, then given to the best student in iiterature. What a contrast this to the reign of 'cram' to the present day."

হিন্দু কলেজে ভোলানাথ কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিদ্যালয়পরিত্যাগকালে তাঁহাকে প্রদত্ত অধ্যাপকগণের প্রশংসাপত্র দৃষ্টে প্রতীত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

গুহামধ্যে

(৩০)

বিশ্বেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাশীর গলি, অন্ধকার বেশ ঘন-ভাবেই সে স্থানটা আক্রমণ করিয়াছে।

আসিবার বিলম্ব, আসিবার সময় পথ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর পিতৃদেবের সৎকার করিতে হইবে।

দ্বারটা ঠিক লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি খানিক দূর চলিয়া গিয়াছি। হাতে আমার প্রসাদ-পাত্র। পাছে কারও গায়ে লাগে, অতি সাবধানে সেটিকে লইয়া চলিয়াছি।

মোড়ের মাথায় মাথায় তখন তেলের আলো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইতেই বুঝিলাম, আমি বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ফিরিতেছি, এমন সময়, একটু অন্ধকারের দিক হইতেই, কে এক জন বলিয়া উঠিল,—"বুড়োর পা সোজা কর্‌তে চারজনকে হিম্‌সিম্‌ খেতে হয়েছে।"

সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই আর এক জন বলিয়া উঠিল—"পা সোজা হ'ল ?"

"যতটা সোজা হবার, সেই অবস্থাতেই নিয়ে গেছে।"

"যাক্‌, বুড়োর এতকাল পরে কাশীপ্রাপ্তি হ'ল।"

বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেল। আরও দুই একটা কথা তাহাদের মুখ হইতে শুনিবার ইচ্ছা ছিল। সৎ-কারের সাহায্য করিল কে ? মৃত দেহের অন্তিম সংস্কারই বা কে করিল ? ইচ্ছার পূরণ হইল না। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ। ডাকিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী !" উত্তর পাইলাম না। দুইবার, তিনবার। কবাটে বার-দুই আঘাত করিলাম। বাড়ীর ভিতরটা সেইরূপই নিস্তব্ধ। ভিতর হইতে দ্বার বদ্ধ, তবুও এমন নিদর্শন পাই-লাম না, যাহাতে বুঝিব, ভিতরে মানুষ আছে।

একটু আশঙ্কা হইল। আঘাতের ফলে যদি মেয়েটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে ! বেশ উচ্চকণ্ঠে, কবাটে আঘাত দিতে দিতে বলিলাম— "বাড়ীতে কে আছ ? মা !"

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও কোন উত্তর না পাইয়া আমি ফিরিতেছিলাম। লোকজন, মেয়ে, পুরুষ—আমার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। কেহ কেহ আমার পানে চাহিতেছিল, একটি স্ত্রীলোক কিছু দূর গিয়া, আবার ফিরিল। আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইয়া থাকা আমার নিজেরই কাছে লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িল।

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম।

দুই চারি পা যাইতে না যাইতেই আমি কবাট খোলার শব্দ পাইলাম।

"কে ডাক্‌ছিলে গা ?"

দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক, বোধ হইল বর্ষীয়সী, মুখ দ্বার হইতে বাহির করিয়া সে পথের দিকে চাহিতে আমাকে দেখিল। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—"আমি, মা !"

"কোথা থেকে তুমি আস্‌ছ ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী উপরে আছে ?"

"তাকে তোমার কি দরকার ?"

"আছে কি না আছে, আগে বল, তার পর ত দরকারের কথা।"

"কি দরকার, আগে বল।"

আমাকেই বুড়ীর কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম—"তার জন্য তার গুরুদেবের প্রসাদ নিয়ে এসেছি।"

বুড়ীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। তাহার সাহায্যে সে আমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। লণ্ঠন নামাইতে নামাইতে সে বলিল—"প্রসাদ খাবে কে?"

বিশেষ ব্যাকুলভাবে আমি প্রশ্ন করিলাম—"বেঁচে আছে, না মারা গেছে?"

উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা আমার মুখের পানে বেশ একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই চাহিল। গ্রাহ্য না করিয়া আমি আবার বলিলাম—"বেঁচে আছে এখনও? মুখের দিকে কি দেখছ, বাছা? এই কথাটা বল্‌লেই, আমি তোমার কি সর্ব্বনাশ করব?"

"এখনও আছে।"

"তা হ'লে এক কায কর, এই থেকে একটু কলা নিয়ে তার মুখে দিয়ে এস।"

বলিয়া আমি তাহার বিস্ময়ে বিপুল-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে পাত্র উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম।

"ওতে কি আছে?"

"চেয়ে ছাখো—কৃপা ক'রে; আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে বুঝবে কেমন ক'রে?"

থালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বৃদ্ধা বলিল—"তুমি একটু দাঁড়াও।"

বলিয়াই বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় কবাটটি বন্ধ করিতে সে কিন্তু ভুলিল না। অগত্যা আমাকে আরও কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

আবার কবাটের খিল খোলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শিশুকণ্ঠের উল্লাস-ভরা অস্ফুট স্বর। এ কি গৌরী, গৌরী? আমার গৌরী কি এতদিন পরে তাহার মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়াছে? তাই কি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বৃদ্ধার এত সঙ্কোচ হইতেছিল?

অনুমানের নিশ্চয়তা তাহার স্পন্দন-প্রহারে আমার হাতটাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। হাত হইতে পাত্র পড়পড় হইল। বাস্তবিকই রক্ষার জন্য দুই হাতে সেটিকে ধরা ভিন্ন আমার গতি রহিল না।

কিন্তু দ্বার খুলিতেই—এ কি! ওরে দুষ্টু, তুমি?

একটা অহেতুক আতঙ্কের ভিতর দিয়া তাহার দুষ্টামিটা ডাগর চোখ দুইটিতে বেশ ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধার আহ্বান কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মুখের পানে চাহিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরী করুণাময়ীর আশ্রয় পাইয়াছে।

"ভিতরে আসুন।"

"আর আমি যাব না মা। তুমি নিয়ে যাও, কিংবা—"

"আপনিই নিয়ে আসুন।"

"তুমি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে নও?"

"দিদিমা, বাবাকে একটুখানি আসতে বল।" মিষ্টস্বর শুনিবামাত্র বুঝিলাম, ভিতর হইতে কথা কহিল কে।

"না রাণী মা, আমি ভিতরে যাব না। আমি দোরের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

কোনও উত্তর পাইলাম না। না পাইলেও দ্বারের কাছে তাঁহার আসারই প্রত্যাশা করিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধাকে রাণীর সম্বোধনের কথা শুনিয়াই বুঝিলাম,তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার একটা ভুল হইয়াছিল, গুরুদেবের প্রসাদ আমার কাছেই পবিত্র হইতে পারে, সিদ্ধেশ্বরীও তাহা পবিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ নিষ্ঠামাত্রসার ব্রাহ্মণ-বিধবার কাছে তাহা কি?—উচ্ছিষ্ট মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নিষ্ঠা-সম্ভাবনাও আমার মনে উঠিল। যদি তিনিও মনে করেন, উচ্ছিষ্ট?

অতি মৃদুস্বরে কবাটের অন্তরাল হইতে কথা উঠিল, কথা যেমন মৃদু, তেমনই মধুর—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"যাওয়াটা যে, মা, কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে করছি না।"

"আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

চিন্তার কারণ যে একটুও হয় নাই, এ কথা একবারে বলিতে পারি না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের নামেই প্রাতঃকালের সেই দুরবস্থার কথা মনে হইল। তথাপি, বারবারের অনুরোধে, ভিতরে প্রবেশ না করাটা অন্যায় মনে করিলাম। সিদ্ধেশ্বরী একা থাকিলে ত বাড়ীর ভিতরে

প্রবেশ করিতে আমার কুণ্ঠা হইত না! সে একা আছে জানিয়াই ত আমি আসিয়াছি।

তবু একবার বলিলাম—"তুমিও কি, মা, ইহাকে উচ্ছিষ্ট মনে করিতেছ?"

"তবে আমাকে দিন।"

"হাত বার কর্‌তে হবে না, মা, আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। ভিতরে যাইবার পথ দিতে গিয়া বুড়ী বলিল—"না, বাবা, উচ্ছিষ্ট মনে কর্‌ব কেন!"

বুঝিলাম, বুড়ী মিথ্যা বলিতেছে। নহিলে আমাকে, রাণীকে এই কষ্টটা দিবার তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

(৩১)

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশপথের পার্শ্বেই রাণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে একরূপ পশ্চাৎ করিয়া বালক-কোলে বৃদ্ধা। সঙ্কীর্ণ-পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার ত উপায় নাই! বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছায় আমাকে আরও একটু দূরে উঠানের দিকে যাইতে হইল।

ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখি, বৃদ্ধা কবাট আবার বন্ধ করিতেছে। আমি নিষেধ করিলাম, আমার নিষেধে রাণীও তাহাকে নিষেধ করিলেন—"কবাট দিতে হবে না, দিদিমা।"

বৃদ্ধা বেশ রাগের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"দোর দেবো না ত কি, শান্ত্রী পাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব না কি?"

আমার কথা, রাণীর কথা, বৃদ্ধা শুনিল না, কবাট বন্ধ করিল।

মরুক গে, তার যা খুশী, তাই করুক, রাণী তাঁহার ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোল হইতে লইয়া আমার নিকটে আসিতেই আমি তাঁহাকে প্রসাদপাত্র লইতে অনুরোধ করিলাম।

রাণী বলিলেন—"আপনিই উপরে নিয়ে চলুন, বাবা।"

উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে নিষ্ঠার আতিশয্যে বৃদ্ধা যে পাত্র হাতে করিতে চাহে নাই, এটা আমি ঠিক বুঝিয়াছি। রাণীর কথায় মনে হইল, তাঁহারও পাত্র হাতে করিতে আপত্তি আছে।

মনের সন্দেহটা মনে না রাখিবার জন্যই বলিলাম—"তোমারও কি, মা, পাত্র হাতে কর্‌তে আপত্তি আছে?"

একবারেই পাত্র হাতে ধরিয়া রাণী স্মিতমুখে বলিলেন—"তা হ'লে দুষ্টটাকে আপনি নিন্। ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠলে থালা সাম্‌লাতে পার্‌ব না। এই দেখুন, এখনি হাত বাড়াচ্ছে।"

বালক বলিয়া উঠিল—"আউ।"

"তবে র'স মা, ওকে একটু শিষ্ট হবার ওষুধ দিই।" এই বলিয়া বালককে কোলে না লইয়াই, পাত্র হইতে একটা মিষ্টান্ন লইয়া তাহার মুখে দিলাম। "ছেলের নাম রেখেছ কি, মা?"

"ললিতমাধব।"

"এই দেখ, ললিত বাবু, কেমন শিষ্ট হইয়াছে।"

"উপরে যাবেন না?"

"যে জন্য যাওয়া, তা তো হয়ে গেছে, আমি থাকলে তোমার চেয়ে বেশি আর কি করবো, মা?"

"গিয়েও এখন কোনও লাভ নেই।"

"সিদ্ধেশ্বরী কি ঘুমুচ্ছে?"

"মাথার যাতনায় অস্থির হয়েছিল ব'লে, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।"

"বাঁচবে ত?"

আপনিই বাঁচিয়ে গেছেন! ডাক্তার বলেছে, তাড়াতাড়ি বাঁধা না হ'লে, রক্ত ছুটে মারা যেতো। ঘণ্টায় মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল, আর একটুখানি বেশী ঢুক্‌লে তখনি মারা যেতো।"

"শুধু তা হ'লে ওকে নয়, মা; বিশ্বনাথ আমাকেও বাঁচিয়েছেন! ওটাও মলে আমাকে দু'জনের খুনের দায়ে পড়তে হ'ত।"

আপনার সেই গুরুর কৃপা। একটা লাঞ্ছনার পর আবার একটা লাঞ্ছনা—বিশ্বনাথ আর কর্‌তে পার্‌লেন না।

বলিতে বলিতে—"এ কি? ও মা, এ কি কর্‌ছ!" আমি তাঁহার হাতের পতনোন্মুখ থালা ধরিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণের বহু চেষ্টায় রুদ্ধ অশ্রু সহসা অবকাশ পাইয়া, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শুভ্র জাহ্নবী-ধারার মতই বুঝি ছুটিয়াছে।

"বিশ্বনাথের দোহাই, আমি কিছু মনে করিনি মা!" বলিয়াই দুইটি হাত তাঁহার পুত্রের মাথায় দিয়া, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"বিশ্বনাথের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার ললিতমাধব দীর্ঘজীবী হ'ক।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—"আজই দীর্ঘজীবী হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম ?"

পাগ্‌লী বারান্দা থেকে ছেলেটাকে নীচেয় ফেলে দিয়েছিল।

এ কথা শুনিয়া কোথায় কথা পাইব আমি ? স্থির-নেত্রে, পাগলিনীর মুখের পানে চাহিলাম।

রাণী বলিল—"ম'ল কই ? তুমি যে অভিসম্পাত দাও নি, বাবা। বিনাপরাধে সাধুর অপমান—এ বংশ লোপ পাওয়াই উচিত ছিল।"

এখনও আমি বক্ষের স্পন্দন নিবৃত্ত কর্‌তে পারি নাই,—এখনও আমার মুখে কথা ফুটে নাই।

বৃদ্ধা সহসা বলিয়া উঠিল—"হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়াটা তা হ'লে তোমাকেই মেরেছিল, বাবা ?"

"দেখ্ বুড়ী, ফের যদি তার দোষ দিবি, তা হ'লে আর তোর মুখ দেখব না। সে কে ? কুকুর বই ত নয়, মনিব যার দিকে লেলিয়ে দেবে, তাকেই গিয়ে কাম্‌ড়াবে।"

আর আমি কোন কথা বলিতে, কিংবা জানিতে সাহস করিলাম না। উপর হইতে সিদ্ধেশ্বরীর মৃদু আর্ত্তনাদ আমাকে বিদায়-গ্রহণের সাহায্য করিল। "সিদ্ধেশ্বরী বোধ হয় জেগেছে। উপরে যাও, মা, আমি এইবারে আসি।"

হাত হইতে থালা লইতে লইতে, যখন রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৌরী আমার কেমন আছে," আর প্রশ্ন করিতে না করিতে সেইরূপ ভাবেই কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন আমিও কোন ক্রমে চোখের জল আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

"যেখানে থাক্, যেমনই থাক্ না, মা, তোমার গৌরী তোমারই আছে।" বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলাম।

"দে, দিদিমা, আলো ধ'রে বাবাকে পথ দেখিয়ে দে।"

কিছুতেই বলিতে পারিলাম না,—সেই যে সকালে গৌরীকে দেখিয়া বাহির হইয়াছি, তাহার পর এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে দেখি নাই, আর বুঝি দেখিতে পাইবও না।

আর বুঝি দেখিতে পাইব না! গৌরী; আমার সেই আগুনে পোড়া দয়াময়ীর বাহুবন্ধন মুক্ত, সেই মধুর রূপেই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়া গৌরী। আর বুঝি তোকে দেখিতে পাইব না! দেখিতে চাহিলেও গুরু বুঝি—না না, গুরু যে আমাকে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন! যাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আমার বাসার কাছে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি দশটার কাছাকাছি। কাশীর সেই জন-বিরল গলিপথ নিস্তব্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে।

সারা পথটা চিন্তার পর চিন্তা, একটার পর আর একটা, আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তাকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভুবনের মা'র চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি, গৌরীর চিন্তায় হস্তের আবরণ দিয়া চোখের জল নিজের নিকট হইতেই লুকাইয়াছি। কিন্তু আমার রাণী-মা'র চিন্তা দুই করপত্রের মরণ চাপও অশ্রুর বাহিরে আসা রোধ করিতে পারে নাই।

চিন্তাশেষে গৌরীর জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তখন একবার রাণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে আজ না দেখিতে পাইলে বোধ হয় গৌরীর মোহ আমার কোনও কালে ঘুচিত না, আমার সন্ন্যাসী হওয়া হইত না।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—কেমন যেন একটা সভয় অবসাদে কেমন যেন নিজেকে লুকানো চৌরভাব—দ্বারে ধীরে আঘাত করিলাম। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। কবাট যেন ওই কোমল আঘাতও সহ্য করিতে পারিল।

"এ কি গো, মা, তুমি যে একবারে দোরের কাছেই ব'সে আছ!"

"তুমি কি মনে করেছিলে, বাবা ?"

"ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"তাই কি অত আস্তে দোরে ঘা দিচ্ছিলে ?"

"মনে কর্‌ছিলুম, যদি ঘুমোও, তোমাকে আর জাগাবো না।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় যেতে ?" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি আবার বলিলেন—"দোরটি আগলে ব'সে থাক্‌তে ?"

আমার মনের অবস্থা তখন একেবারেই ভাল ছিল না। তবে এরূপ ভাবের কথায় আমার মনে মনে বেশ রাগ হইল। হউক্ না কেন সে সন্ন্যাসিনী—অথবা তাহার সন্ন্যাসিনীর বেশ—কাশীতে অনেক সন্ন্যাসিনী আমি দেখিয়াছি। আজ প্রথম তাহার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার সঙ্গে ওরূপভাবে কথা কহিবার তাহার অধিকার কি ?

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন,দোর বন্ধ ক'রে ভিতরে আসুন। আমার হাত সকড়ি,আমি এ হাতে কবাট ছুঁতে পারব না।"

"তুমি কি বাসন মাজ্‌ছিলে?"

"সেই জন্যই ত কবাট খুলে রেখেছি। বর্ত্তনে হাত দিলে ত টপ ক'রে দোর খুল্‌তে পার্‌ব না।"

"সে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন?"

"বাবাজি মহারাজের প্রসাদ--সে কি প'ড়ে থাকবার বাবা—কাশীতে গ্রহণ করবার অনেক ভাগ্যবান্ আছে।"

আমি কবাট বন্ধ করিলাম। দেখিয়াই তিনি বলিলেন --"উপরে চ'লে যান, পা ধোবার জল ঠিক করা আছে।"

"তোমার দেওয়া জল আমি পায়ে দেব?"

"সে কি, বাবা, ওই এক বছরের গৌরী মেয়েটিই কি তোমার একমাত্র কন্যা?"

"বেশ, মা, তোমার যখন তাতে আনন্দ।" আমি উপরে চলিলাম।

"আর নানা ঝঞ্চাটে আপনার এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হইল না। আমি জলখাবার আপনার ঘরে সাজিয়ে রেখেছি।"

আমি উপরে উঠিয়াই দেখি, শুধু পা ধুইবার জল এ বেটী আমার সেবার জন্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। জল, গামছা, পরিধানের জন্য একখানি বস্ত্র, সমস্ত সযত্নে সে রাখিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে তেমনই করিয়াই সযত্নে রক্ষিত ফল, মূল, মিষ্টান্ন।

একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, দয়াময়ীর মুখখানা যেন জাগিয়া বায়ুতে আবার মিলাইয়া গেল!

এরা কি সকলেই দয়াময়ী? মাতৃত্ব ইহাদেরই নিজস্ব, দয়াও কি ইহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে মানুষের হৃদয় আশ্রয় করে? বহু কাল পরে, ত্যাগের মুখে এই এক, অভিনব দিনের অভিনব রাত্রিতে, গৌরীকে দেখিতে চারিদিক-চাওয়া দৃষ্টির উপরে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মত মুহূর্ত্তের জন্য সোনার সংসার যেন ভাসিয়া উঠিল।

জলযোগ করিতে করিতে, কি যেন কি চাহিতে-- হয় জল, নয়, দুই একটা ফল, নয় বহুকাল পরে নিঃস্ব সংসারীর সর্ব্বস্ব একটু আদরভরা মমতা--কি যেন কি চাহিতে যেমন ডাকিলাম "মা"! অমনই বাহির হইতে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনিলাম--"অম্বিকাচরণ!"

সঙ্গে সঙ্গে তপস্বিনীর কণ্ঠস্বর--"আপনাকে উঠতে হবে না, বাবা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।" [ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

পিঞ্জরের বিহঙ্গ।

[বদ্ধ-জীবের কথা]

১

পিঞ্জরমাঝে বন্দী বিহগ
ভাবে পিঞ্জর আপনার,
পিঞ্জর-স্বামী দিলে ফল জল
রচে তাহে নিজ অধিকার।

২

জনমের সনে যে ভাষা তাহার
কণ্ঠে করিল আগমন,
মা'র মুখ হ'তে কাড়ি যে কাকলি
কানন করিত সচেতন,
বন্য ভাবিয়া ত্যজিল তাহায়
গুরু-মুখে শিখি শেখা বুলি,
নাচিয়া নাচিয়া প্রভুর ভাষায়
প্রভু-গুণ-গানে রয় ভুলি।

৩

মুক্ত পক্ষে গগন-বক্ষে
অসীম শূন্যে সাঁতারিত,
উধাও হইয়া ছুটিত ঊর্দ্ধে
দশ দিশি করি মুখরিত,
ঝঙ্কার পিঠে ঝঙ্কার তুলি
দুলিত হরষে পুলকিয়া,
শৈল-শিখরে সিন্ধু-লহরে
বিহরিত বন বিমথিয়া।
নগ্ন তাহার চিক্কণ দেহে
কুসুম-পরাগ দিত ভূষা,
মধুর স্বপনে যাপিত যামিনী
জাগিয়া বরিত হেম-উষা।

৪

আজি সে স্বাধীন দিবসের স্মৃতি
লুপ্ত, নিশানা নাহি তার,
পাখাটি গুটায়ে পিঞ্জর-কোণে
সুপ্ত, নীরব হৃদি তার।
আলসে আসিছে মুদিয়া নয়ন,
তন্দ্রা-জড়িত জাগরণ,
শুধু থাকি থাকি জড়িত কণ্ঠে
প্রভু-গুণ-গানে নিমগন।

৫

বসন-আবৃত ক্ষুদ্র ভবনে
আধো আলো আধো ছায়া-মাঝে,
কনক-দণ্ডে নাচে বা কখন,
চরণে নূপুর কিবা বাজে!
বন্ধন-হীন স্বাধীনতা যার,
বন্দী সে আজি পিঞ্জরে,
সোনার শিকল কাটিতে চাহে না
মুক্তি-বিমুখ অন্তরে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া এক দিকে ভাইস-চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ে ও অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিষ্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্রে যে সব পত্র-ব্যবহার হইয়াছে ও সেই ব্যাপার লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যাপারটা ক্রমে দলাদলির বিষয় হইয়া পড়িতেছে এবং উত্তেজনার আবর্ত্তে পড়িয়া অনেকেই প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিতেছেন।

নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে টাকার অভাব হয় এবং তাহার চালকগণ অনুমান করেন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট প্রায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪ শত ৮০ টাকার অভাব হইবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারকে এই অভাবের কথা জানান। আশা ছিল, সরকার এই অভাব মোচন করিয়া দিবেন। এরূপ আশা করিবার কারণ ঃ—

(১) অভাবের অন্যতম কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে "ফী" বাবদে আদায় টাকার পরিমাণ এ বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টাকা কম। প্রধানতঃ অসহযোগ আন্দোলনের জন্যই এমন হইয়াছিল। তাহা নিবারণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

(২) আর এক কারণ, শিক্ষাদানের জন্য স্বীকৃত ব্যবস্থা। যে স্থলে জ্ঞানবিস্তারই লক্ষ্য, সে স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদানকেন্দ্র করিলে সে কার্য্যে ব্যয় অনিবার্য্য। বিশেষ, কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্দ্ধারিত সর্ত্তে লোকের কাছে দান গ্রহণ করিয়াছেন। সে সব কথাই সরকার অবগত ছিলেন এবং "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" হিসাবে তাহাতে সায়ও দিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয় জন সদস্য এমন একটা আন্দোলন গড়িয়া তুলেন, যাহাতে মনে হইতে পারে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা টাকা লইয়া গোলদীঘীতে ছিনি-মিনি খেলিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকের উপর অনাচারের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার তদন্তের জন্য প্রস্তাবও উপস্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই প্রতিষ্ঠান অর্থের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইলেও, তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় কতকটা স্বাধীনতা আছে। ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবে কেহ কেহ সেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা অনুমান করিলেন। ব্যাপারটা যেন ভবানীপুর বনাম ভবানীপুর হইয়া দাঁড়াইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে শিক্ষা-সচিব এমন মত ব্যক্ত করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিমৃষ্যকারিতার ও অমিতব্যয়িতার ফলেই ভারতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বেও তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, শিক্ষা সচিব বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আশানুরূপ সাহায্য করিবেন কি না সন্দেহ।

তাঁহাদের অনুমানই সত্য হয়। গত ১২ই জুলাই তারিখে শিক্ষা-সচিব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার কাছে মঞ্জুরী চাহেন। তিনি বোধ হয়, মনে করিয়াছিলেন—বিশ্ব-বিদ্যালয় পণ্ডিতদিগের কেন্দ্র—বিপদের সময় যখন "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—তখন এ অর্দ্ধেক টাকা দিলেই হইবে। তখন আমরা শুনিয়াছিলাম,—অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এবং আর ২টি বিশ্ব-বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, খতাইয়া তাহাই ২ লক্ষ ৫০ হাজার হয় বলিয়া এবং তহবিলে আর টাকা না থাকায় শিক্ষা-সচিব এই টাকাটা দিবার প্রস্তাব করেন।

কিন্তু শিক্ষা-সচিব তাঁহার বক্তৃতায় সদস্যদিগকে অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন দ্বিমত না হইয়া এই টাকাটা দিতে সম্মত হয়েন। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার যে অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। টাকা না পাইলে তাহা নষ্ট হইতে পারে (without funds

it is likely to collapse) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। সে অনুসন্ধানের ফল ও হিসাব পরীক্ষকের বিবরণ সরকারে দাখিল করা হইবে। যদি ব্যবস্থাপক সভা এই টাকা দিতে অস্বীকার করেন, তবে সভা গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন—পরবর্ত্তী লোক বলিবে, তাঁহারা বাঙ্গালায় উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে, সে যাহাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আজ ব্যবস্থাপক সভা এই সাহায্য দিতে অস্বীকার করিলে ফল বড় ভীষণ হইবে—(the consequences would be very serious.)

এই প্রস্তাব লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হয় এবং মিষ্টার ফজলুল হক বলেন, তিনি যে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন! আর কলিকাতা কর্পোরেশনের আজিকার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক আর এক জন সদস্যের বক্তৃতা স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া অসাধারণ শিষ্টাচারের পরিচয় দেন। সে যাহাই হউক, অবশেষে ঐ টাকাটা দেওয়াই স্থির হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের বক্তৃতায় কথার অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে এই ভাবটি দেখা যায় যে, শিক্ষা-সচিব কতকগুলা সর্ত্ত করিয়া তবে টাকাটা দিবেন এবং সে সব সর্ত্ত পালিত না হইলে (unless these conditions are satisfied) আর টাকা দেওয়া হইবে না।

ইহার পরই সরকারী হিসাব পরিদর্শকের রিপোর্ট সরকারের হস্তগত হয়। তাহাতে বলা হয়, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় ফীর টাকা কমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবের অন্যতম কারণ এবং ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষাদানব্যবস্থাই অন্যতম প্রধান কারণ। তাহাতে এমন কথাও বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল। প্রতীকার-প্রস্তাবের প্রথমেই বলা হয়—সর্ব্বাগ্রে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকার অভাব পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

শিক্ষা-সচিব সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দিলেন না। পরন্তু তিনি রিপোর্টে আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটির কথা ধরিয়া ২৩শে আগষ্ট (১৯২২) তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে পত্র লিখিলেন, তিনি হয় ত ব্যবস্থাপক সভার কাছে আরও টাকা দিবার প্রস্তাব করিবেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতন লইলেও ব্যবস্থাপক সভা বিনা সর্ত্তে টাকা দিতে পারেন না। ব্যবস্থাপক সভা টাকা দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ সর্ত্ত না দিলেও মন্ত্রীর সেরূপ সর্ত্ত দিবার অধিকার থাকিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যে সকল সর্ত্ত দিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়সাধ্য বিস্তার-সাধনে বিরত থাকিবেন।

(২) এ বৎসর সেনেট বাজেট গ্রহণ করিয়া ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে সরকারের কাছে পেশ করিবেন এবং ইহার পর প্রতি বৎসর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহা প্রস্তুত করিয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে। বাজেটে গত ৩ বৎসরের খাঁটি আয়ব্যয়, বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাব ও পরবৎসরের প্রস্তাবিত হিসাব দেখাইতে হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে হিসাব বোর্ডের সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার করিয়া মিলিত হয়েন—ইত্যাদি—

(৪) প্রতি বৎসর ৩০শে জুন আয়ব্যয় ধরিয়া একটা খাঁটি হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৫) নানা ভাণ্ডারের হিসাব একসঙ্গে ধরা হইবে না; পরন্তু মাসান্তে মাসের মধ্যে প্রকৃত আয় ও ব্যয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে হিসাব বোর্ডে, সেনেটে ও সরকারে দাখিল করিতে হইবে।

(৬) খাঁটি বার্ষিক হিসাব সেনেটে ও সরকারে দাখিল করিতে হইবে।

(৭) বাজেট ও খাঁটি হিসাব প্রকাশ করিয়া সাধারণের কাছে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রধান সংবাদপত্রে তাহা পাঠাইতে হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভায় দিতে হইবে।

(৮) ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সব বাকী বেতন ও পরীক্ষকদিগের বকেয়া প্রাপ্যের অন্যূন অর্দ্ধাংশ অবিলম্বে প্রদান করিতে হইবে।

এই সব সর্তের কতকগুলি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভ্রমের পক্ষে হানিজনক, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বিশেষ হিসাব-পরিদর্শকের রিপোর্ট সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য না শুনিয়াই আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করা ও বলা যে, সে রিপোর্ট reveals the fact that the financial adminstration of the University has hitherto been anything but satisfactory শিক্ষা-সচিবের মত দায়িত্বপূর্ণ পদের রাজকর্মচারীর পক্ষে শোভন কি না, সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ অবশ্যই আছে।

সরকারের এই সব সর্ত গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, তাহার বিচার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক সমিতি নিযুক্ত করেন। তাহার সদস্য—সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ক্রোহান, অধ্যাপক হাওয়েলস, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ, ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র।

এই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রিপোর্টে লিখিত কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) অর্থাভাবহেতু বিশ্ববিদ্যালয় যখন পরীক্ষার ফী বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তখন সে প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। বর্দ্ধিত আয় যে শিক্ষাদানকার্য্যে প্রযুক্ত হয়—তাহা যেন ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল না।

(২) ঢাকায় ও রেঙ্গুনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব্বে না জানাইয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হদ্দায় মাধ্যমিক স্কুল ও মাধ্যমিক কলেজের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার লোপ করা হয়।

(৩) দেশের লোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই। উচ্চশিক্ষার গবেষণার সাহায্যার্থ দেশের লোকের দানের উল্লেখ নিম্নে করা গেল

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ পালিতের দান
১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮ শত টাকা।

১৯১৩ " রাসবিহারী ঘোষের দান
১০ লক্ষ টাকা।

১৯১৯ " রাসবিহারী ঘোষের দান
১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।

১৯১৯ " জি, সি, ঘোষের দান
১ লক্ষ টাকা।

১৯২০ " গুরুপ্রসাদ সিংহের দান
৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

১৯২১ " রাসবিহারী ঘোষের দান
২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

এই ৪৫ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত টাকা ব্যতীত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। এই দানের অনুপাতে সরকার কোন অর্থ-সাহায্য প্রদান করেন নাই।

কমিটী সকল কথা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, শিক্ষা-সচিবের নির্দ্ধারিত সর্ত্তে স্বীকৃত হওয়া অনভিপ্রেত ও অসম্ভব—(not merely undesirable but also impracticable)

গত ২রা ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে রিপোর্ট আলোচিত ও গৃহীত হয়। তাহার পূর্ব্বে দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

(১) রিপোর্ট সেনেটে আলোচিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সেনেটের সভার পূর্ব্বেই কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রে তাহার বহু অংশ প্রকাশিত হয়। 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' এই আচরণ যতই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হউক না—সেনেটের যে সদস্য 'ষ্টেটস্‌ম্যান'কে সে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহার যে ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত হয় নাই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(২) বিলাতের 'টাইমস্'পত্রের শিক্ষাবিষয়ক ক্রোড়-পত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দাপূর্ণ এক সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারীর সহকারী সেই সন্দর্ভের নকল পাঠাইয়া 'বেঙ্গলীর' সম্পাদককে তাহা ঐ পত্রে প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। প্রচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী আবার শিক্ষা-সচিবের সেক্রেটারী; সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিভাগেই কায করেন। তাঁহার সহকারীর কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহার আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার এক জন সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থদান প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক যদি বলিতে পারেন—তিনি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা "ভূতাবিষ্ট" হইয়াছেন

তাঁহার বক্তৃতা in almost made to order by a demi-god, who has got entire possession of him, তবে লোক অবশ্যই মনে করিতে পারে, প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর এই সহকারীর পত্রও হয় ত বা শিক্ষা-সচিবের জ্ঞাতসারে বা উপদেশে লিখিত হইয়াছিল। পরে কৈফিয়তের হিসাবে বলা হইয়াছে, এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে বিলাতে পত্রাদিতে কোন মত প্রকাশিত হইলে সে বিষয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করা প্রচার-বিভাগের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে 'বেঙ্গলী' সম্পাদককে প্রচার-বিভাগের পত্র "প্রাইভেট" বলিয়া লিখিত হইয়াছিল কেন? আর এক কথা, তাহার পর 'টাইমস' পত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন করিয়া যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলের সম্বন্ধে প্রচার-বিভাগ নির্ব্বাক ছিলেন কেন?

শেষোক্ত প্রবন্ধের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটির লেখক—মাইকেল স্যাডলার। ইনি বিশেষজ্ঞ বলিয়াই সরকার ইঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, ভারত সরকার কার্পণ্যদোষে দুষ্ট এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষা বিষয়ক প্রবীনতার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অমিত উদ্যমে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি যে কার্য্যপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যদি ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তবে সে জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাঁহার সাহস ও উদ্যমের জন্য তাঁহার প্রশংসা করাই সঙ্গত—

Let us honour the Indian scholar and statesman for his courage and energy, not carp at him when his plans are caught in the meshes of debt.

'টাইমস' পত্রেই মিষ্টার জেমস্ এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার সাধিত হয়, তখন তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তখন বাঙ্গালা সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই—তাই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। এখন বাঙ্গালা সরকার সে বিষয়ে আপনাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না এবং বর্ত্তমান অবস্থায় আবশ্যক অর্থপ্রদান করাই সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ইতঃপূর্ব্বে সরকারের তরফ হইতে টাকা দিবার প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত সমিতির কথা বলিয়াছি। সেই সমিতির নির্দ্ধারণ গ্রহণ জন্য সেনেটে পেশ করেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই স্থানে নির্দ্ধারণগ্রহণ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলে, আশা করি, তাহা ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব বিবেচনা করিয়া তিনি ৫ বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষের কায করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কেহ আত্মসাৎ করিয়াছে বা তাহার অপব্যবহার হইয়াছে, এমন অভিযোগ সে রিপোর্টে নাই। পরন্তু সে রিপোর্ট পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের তুলনায় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে মোট খরচ ৮ লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা ৮ আনা ৬ পাই। ইহার মধ্যে সরকার দিয়াছেন কেবল ৬৮ হাজার ১ শত ৩৫ টাকা, বা শতকরা ৮ টাকার কিছু অধিক। ভারত সরকার যে সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিতে অস্বীকার করিতেছিলেন, সেই সময় দিল্লীরচনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন, রেলের বাবদে ১ শত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতেও পারিয়াছেন! বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে পারেন না, তখন বিবাহিত গোরা সার্জ্জেণ্টদিগের বিবিবিহারসৌধ নির্ম্মাণের জন্য ও হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীদিগের বাসগৃহের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অনায়াসে দিতে পারেন। ইহাই কি শাসন-সংস্কারের সুফল? বিজ্ঞান-কলেজের জন্য বাঙ্গালার লোক ৪৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ছাত্রদিগের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য বাবদেও ৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আর সরকার দিয়াছেন, বৎসরে ১২ হাজার টাকা! আজ অবস্থা যেরূপ তাহাতে বলা যায়, আমাদের জাতীয় বিপদ

উপস্থিত। তাহার প্রতীকারকল্পে তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেও প্রস্তুত।

ডাক্তার হাওয়েলস্ বলেন, বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে যখন প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা ফাজিল, তখন সে সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ লক্ষ টাকার অভাবে তিরস্কার করা শোভা পায় না।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই ২ জন 'সরকারী সর্ত্ত মানিয়া টাকা লইবার প্রস্তাব করেন।

সর্ব্বশেষে ভাইস্-চান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্টে অনেক ভুল আছে। তিনি সে সব ভুল দেখাইয়া বলেন, শিক্ষা-সচিব যে সব সর্ত্তে টাকা দিতে চাহিয়াছেন, সে সব সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অবিশ্বাস সপ্রকাশ। সে সব সর্ত্তে টাকা গ্রহণ করিতে তিনি স্বীকার করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও তাহাতে সম্মত হইবেন না। তিনি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া বাঙ্গালীকে তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবেন। তিনি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না—Freedom first, freedom second, freedom always—nothing else will satisfy me.

ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট শিক্ষা-সচিবের প্রস্তাবিত সর্ত্তে টাকা লইতে অস্বীকার করেন।

এ দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিবার কথায় কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এক দল বিনা সর্ত্তে টাকা দিবার প্রস্তাব করেন; আর এক দল বলেন, বিনা সর্ত্তে সিকি পয়সাও দেওয়া হইবে না। একান্ত দুঃখের বিষয়, এই সব প্রস্তাবের আলোচনা হইলেও ভোট গৃহীত হয় নাই; শিক্ষা-সচিবের অনুরোধে প্রস্তাবকারীরা প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ভোট গৃহীত হইলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যাইত।

শিক্ষা-সচিব বলিয়াছেন, ভাইস্-চান্সেলার তাঁহার কাছে আসিলে—অথবা বিশ্ববিদ্যালয়প্রীতি সত্ত্বেও তিনি আসিবার সময় করিতে না পারিলে—সেনেটের ২ জন সদস্যকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলে তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিবেন। তিনি তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য ৪ জনকে আহ্বান করিয়াছেন—সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার আশুতোষ চৌধুরী, সার নীলরতন সরকার, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শিক্ষা-সচিব মহাশয়ের প্রস্তাবের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহা "মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম" সপ্রকাশ। তিনি হাল আইনে মন্ত্রী হইয়াছেন; কাজেই ভাইস্-চান্সেলার তাঁহার কাছে যাইবেন, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অবশ্য তিনি মীমাংসার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবেন না; ভাইস্-চান্সেলার স্বয়ং যাইতে না চাহেন—আর কাহাকেও মন্ত্রীর কাছে পাঠাইবেন। নহিলে—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইলে, বোধ হয়, মন্ত্রীর বিরাট পদমর্য্যাদা নষ্ট হইবে। সে পদমর্য্যাদা কি এতই ক্ষণভঙ্গুর?

দ্বিতীয় কথা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রতিনিধি বাছিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে আহ্বান করিয়াছেন। কোন্ অধিকারে শিক্ষা-সচিব এমন কাষ করিলেন? যদি মীমাংসা করিবার জন্য একটা বৈঠক করা শিক্ষা-সচিবের অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের বলিতে পারিতেন—আপনারা ৪ জন প্রতিনিধি স্থির করুন; আমি তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিব। তাহা না করিয়া তিনি সরাসরি ৪ জন বাছিয়া লইলেন।

আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—যে ব্যাপারটার মীমাংসা আধ ঘণ্টায় হইতে পারে বলিয়া শিক্ষা-সচিবের ধারণা, সে ব্যাপারটার মীমাংসা করিতে এত দিন লাগিয়াছে কেন? অনেক দিন পূর্ব্বেই ত শিক্ষা-সচিব কোনরূপে আধ ঘণ্টা ফুরসৎ করিয়া লইতে পারিতেন।

ওদিকে শিক্ষা-সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নূতন আইন রচনা করিবেন। তাহার পাণ্ডুলিপি ভারত সরকারে পে[illegible] হইয়াছে। এখন অবশিষ্ট—ভারত সরকারের মঞ্জুরী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এই আইনে স্যাডলার কমিশনে[illegible] নির্দ্ধারণ পালনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়বিষয়[illegible] খানি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইয়াছে। তাহার ম[illegible] আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী চেয়ারম্যা[illegible] শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের প্রস্তাবিত আইনের ও শ্রী[illegible] যতীন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি[illegible] বারান্তরে এই সকলের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মিলন-রাত্রি

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হাসি ডাকিল, "শরদা—"

হাসি বাড়ী যাইবার সময় রাজকুমারীর আদেশে আজ শরৎকুমার তাহার সহযাত্রিরূপে মোটারের সম্মুখসিট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোটার চলিতেছিল নদীর ধার দিয়া—অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে। জলের উপর ছোট বড় জাহাজের এলো মেলো বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি, আর তীরদেশের সমসজ্জিত স্তম্ভাবলীর সুবিন্যস্ত আলোকগুচ্ছ নক্ষত্র-জ্যোতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া সগর্ব্বে বিজলীদীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল। কিন্তু হায় রে! কোন্ দর্প এমন ছিদ্রহীন, যাহার মধ্যে দর্পহারীর প্রবেশপথ রুদ্ধ? আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র যে আস্মানে মৃদুমন্দ হাসিয়া মেঘের মধ্যে টলিতে টলিতে সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকপুঞ্জ সেই ম্লানাভ আলোকে মুগ্ধ স্তম্ভিত; তাহাদের অণু পরমাণুতে আত্মলোপের বিনীত নম্রতা! জলে স্থলে কি অপূর্ব্ব শোভা! দর্শক শরৎকুমারের মনে জ্যোৎস্নামিলিত এই তাড়িদ্দীপাবলীর শোভা ভক্তিমণ্ডিত শক্তির মহিমা ব্যক্ত করিতেছিল। হাসির ডাকে তিনি জানালা হইতে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া হাসি কহিল, "শরদা—বড় আহ্লাদ হচ্ছে।" শরৎকুমারের ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন—"কেন?" কিন্তু তাঁহার মুখে আজ কোন কথা ফুটিতেছিল না, কিন্তু আবশ্যকও হইল না; তাঁহার নীরব কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া বিনাপ্রশ্নেই হাসি আপন বক্তব্যের অবতারণা করিয়া কহিল,—"শরদা, আমি ত প্রায় রোজই আপনাদের অঞ্চলে যাই, এতদিন পরে আপনার দেখা পেলুম। আপনি দেখছি, একেবারেই ভুলে গেছেন।"

রাজকুমারীর সহিত গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনা সহজ, কিন্তু হাসির হাসিমাখা সরলতাপূর্ণ মনটানা প্রশ্নে শরৎকুমার স্বভাবতই বালকের ন্যায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। আজ তিনি একেবারেই নির্ব্বাক্ হইয়া গেছেন। যাহাকে এক সময় পরিপূর্ণ প্রাণে ভালবাসিয়াছেন, যাহার প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়াছে—আজ বাস্তবিকই সে তাঁহার কে? তাহার বিস্মৃতিতেই ত তিনি নব জীবন লাভ করিয়াছেন,—ইহা যে সত্য কথা। তবু কেন সেই অতীত প্রেমকণার মদিরা তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া তুলিল! প্রাক্তন-সংস্কার-মোহে নব জীবনের প্রকৃত সহজ ভাব এমন ভার-গ্রস্ত, অপ্রকৃত, অবনত হইয়া পড়িল!

কিন্তু হাসির অনর্গল উচ্ছ্বসিত বাক্যে তাঁহার মনের এ ভারও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। সে আবার বলিল, "বল না শরদা?"

তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ভাবেই মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "কি বলব?"

"এতদিন ধ'রে একটিদিনও কি দেখা দিতে নেই?"

"তুমি যে দেখা করতে চাও, তা ত মনে হয়নি?"

"বটে! বেশ যা হ'ক! আপনি ভুলেছেন ব'লে কি সবাই ভুলবে নাকি? কিন্তু আমি ত চাইনে,—যে—"

হাসি থামিয়া গেল, শরৎকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন, "কি চাও না তুমি, হাসি?"

"আপনি যে আমাকে ভুলে যাবেন—এটা আমি মোটেই চাইনে, বুঝলেন ত? আমাকে বোন্ ব'লে—বাল্যসখী ব'লে চিরদিনই আপনার মনে রাখতে হবে।"

শরৎকুমারের হাসি ঠোঁটে মিলাইয়া গেল, একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "তা কি নেই মনে কর?"

হাসির সাফ্ জবাব—"করি বই কি,—খুবই করি।

বলুন, শরদা—কথা দিন—এই অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না?"

"আমি ত মনে করি, এ কথার উত্তর দেবার কোনো দরকার নেই।"

"আছে, আছে,—বলুন তবুও, শরদা, আমাকে আপনার সুখ-দুঃখের সব কথা মন খুলে বলবেন; কথা দিন,—বলুন।"

শরৎকুমার বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু গম্ভীর স্বরেই এ কথার উত্তরে কহিলেন, "আমার সুখ-দুঃখ কিছু নেই ত হাসি।"

হাসি এবার রাগ করিয়া কহিল,—"দু'জনেই সমান, কেউ কিছু বলতে চায় না, —আচ্ছা, বেশ নাই বল্লেন! আমি সব জানি—" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শরৎকুমার একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। হাসি যখন দেখিল—তাহার অভিমান নিষ্ফল; তখন আবার মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—"শরদা, লক্ষ্মীটি, বলুন না; আপনার মুখে শুনলে কতটা আহ্লাদ হবে, বলুন দেখি!"

শরতের ইচ্ছা হইল, তাহাকে তাঁহার নব-জীবনের কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলেন—হাসির অনুরোধ তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিল,—তথাপি তিনি তাহা পারিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন,—কিছুক্ষণ পরে কহিলেন,—"হাসি, ও কথা থাক্।"

হাসি মনে মনে একটা গুরু বেদনা উপলব্ধি করিয়া চুপ করিয়া রহিল, তবে কি সে ভুল বুঝিয়াছে? এখনও কি শরৎকুমার তাহাকে ভোলেন নাই! শরৎকুমার যদি বলিতেন,তিনি রাজকুমারীকে ভালবাসেন, তাহা হইলে হাসি কতটা না শান্তি লাভ করিত! ধীরে ধীরে সে চাপা-কণ্ঠে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—শরৎকুমার তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যে আমাকে ভাইয়ের অধিকার দান করলে—এতে সত্যই আমি বড় সুখী।"—

হাসি বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "শুনে আনন্দিত হলুম।"

শরৎকুমার হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু স্বরে ত আনন্দ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না।"

"আপনি যে আমার দান বেশ স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করেছেন, তারও ত প্রমাণ আমি পাচ্ছিনে। আচ্ছা, বলুন না, শরদা, আমি জানি, আপনি রাজকুমারীকে ভালবাসেন—কেন আমাকে সে কথা আপনি খুলে বলতে সঙ্কোচ করছেন? সত্যিই আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। বলুন, শরদা,বলুন।"

শরৎকুমার একটু দম লইয়া বলিলেন,—"না হাসি, রাজকুমারীকে আমি ভালবাসি,—এ কথা আমি বলতে পারিনে। তিনি ক্ষণজন্মা,—রূপে-গুণে তিনি মহীয়সী—তাঁর উচ্চ হৃদয়ভাবে কে না মুগ্ধ হয়? আমিও মুগ্ধ। আমি তাঁকে মনে মনে পূজা করি।—এ শুধু গুণের প্রতি, উচ্চ ভাবের প্রতি পূজা; কিন্তু, একে ভালবাসা বলা যায় না,—ভালবাসায় যে প্রত্যাশা থাকে, এতে তা নেই,—তারাকে, চাঁদকে কে না ভালবাসে,—কিন্তু তাতে কি কোন প্রত্যাশা থাকে? আমার এই প্রত্যাশাহীন পূজাকে ভালবাসা বলা যায় না।"

শরৎকুমারের মনের রুদ্ধ উৎস মুক্ত আবেগে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি থামিলে হাসি আনন্দে হাসিয়া বলিল,—"বড় আহ্লাদ—বড় আনন্দ হচ্ছে,শরদা। প্রত্যাশাহীন ভালবাসা বুঝি ভালবাসা নয়? এই হচ্ছে আসল প্রেম। নিরাশ হবারও কোন কারণ দেখিনে—প্রত্যাশাগুলোই বরঞ্চ প্রায়ই বিফল হয়—আর অপ্রত্যাশিত আশাই বেশীর ভাগ সফলতা লাভ করে,—এই ত সংসারের মজা! বুঝলেন ত? রাজকুমারী যে আপনাকে ভালবাসেন—সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই। ঘটকালীটার মাত্র অভাব। আচ্ছা, আমি এখন সে ভার নিচ্ছি; দিন স্থির ক'রে ফেলি! কি বলেন?"

শরৎকুমার হাসির এই কথায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; মর্ম্মান্তিক অনুরোধ সহকারে কহিলেন, "হাসি, আমার ইচ্ছা নয়—এ বিষয় নিয়ে তুমি কারও সঙ্গে আলোচনা করো। আমি তোমাকে এখন যা বল্লুম, এ আমার নিভৃত প্রাণের কথা। তুমি কথা দাও, হাসি—এ কথা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবে না?"

"বেশ, আচ্ছা, কথা দিলুম—আমি রাজকুমারীকে বলব না,—যে, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়েছে। কিন্তু আমি শুধু বিয়ের প্রস্তাবটি—"

"না, হাসি, না—তোমাকে এ সম্বন্ধে একেবারেই মৌন থাকতে হবে,—তুমি কিছু বলতে পাবে না—আমি বিয়ে করবই না।"

"যদি রাজকুমারী ইচ্ছা করেন?—তবুও না?"

"তবুও না, এ বিয়ে হতেই পারে না।"

অবশ্য হাসিকে নিরস্ত করিবার জন্য শরৎকুমার যেন-তেন-প্রকারে এ কথাটা উড়াইবার চেষ্টা করিলেন। হাসিকে নীরব করিবার তিনি অন্য উপায় দেখিলেন না। কিন্তু ফল তাঁহার মনের মত হইল না।

হাসি গম্ভীর হইয়া কহিল,—"বেশ, আপনি যদি বিয়ে না করেন—তবে আমিও করব না।"

হাসির স্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক! এ প্রতিজ্ঞা যে যথা-সময়ে শিথিল হইবে—তাহা শরৎকুমার জানিতেন, কিন্তু তবুও ত বলিতে পারিলেন না—

"আচ্ছা, বেশ, সেই ভাল—"

তিনি সস্নেহ ভর্ৎসনায় কহিলেন—"কি যে বল হাসি!"

"হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি—আপনি যদি না বিয়ে করেন, তবে আমিও করব না।"

তিনি একটু রহস্যের ভাবে কহিলেন,—"কেন, আমাকে জব্দ করার জন্য?"

"বেশ তাই—"

"আমাকে অসুখী ক'রে তুমি সুখী হবে?"

"আপনিও ত আমাকে অসুখী ক'রে সুখী হচ্ছেন?"

"বাজে তর্ক রাখ, হাসি, তুমি বেশ জান—তোমার সুখ আমার সাধনার একটি বিষয়।"

হাসি চুপ করিয়া গেল—সে ত প্রত্যুত্তরে বলিতে পারিল না—আপনার সুখও আমার জীবনের সাধনা। অন্ততঃ এ কথা ত সে অসঙ্কোচে বলিতে পারিত যে, "আপনার সুখেও আমি একান্ত সুখী"—কিন্তু শরৎকুমারের ঐ গুরু-গম্ভীর মজোর কথার পর তাহার মনের সমস্ত ভাবই কেমন লঘু বলিয়া মনে হইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া রহিল। শরৎকুমার বলিলেন, "আমি যদিও বেশ জানি যে, আমাকে ব্যথা দেবার জন্যই তুমি ও রকম কথা বলছ, কিন্তু কোনো ভাবেই না ক্ষণিকের জন্যও ও কথাটা তোমার মনে আনা ঠিক হয়নি।"

"ক্ষণিকের জন্য?"

"নিশ্চয়ই! রাজা বাহাদুর তোমাকে মনোনীত করেছেন, আর তুমিও মনে মনে যে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছ—না—"

হাসি লজ্জিত হইল, কিন্তু বেশ জোর করিয়াই বলিল, —"আপনি সবজান্তা। ভুল ভুল—সব ভুল—দেখে নেবেন।—"

"কি বলছ হাসি? তোমার এ কথা শুনলে রাজকুমারীর মনে কত দুঃখ হবে?"

"তা কি করব?"

"তুমি বেশ জান, তোমার বাপ মা এ বিবাহের জন্য কত উৎসুক,—তোমার মুখে এ কথা শুনলে তাঁরা কত ব্যথিত হবেন!"

"তা কি করব?"

"না, হাসি, অমন ক'রে বলো না তুমি। বুঝছ না কি এতে আমারও মনে কিরূপ কষ্ট দিচ্ছ? জানি, হাসি, এটা তোমার মনের ভাব নয়, মুখের কথা; তবুও বল, হাসি, বল, ওরূপ কথা কখনও আর মুখেও আনবে না?"

হাসি চুপ করিয়া রহিল—বিদ্রূপ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দুঃখম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা বলিতে পারিল না।

শরৎকুমার আবার বলিলেন,—"জান না, হাসি, যে দিন থেকে শুনেছি আমি, রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তোমার বিবাহ ঠিক হয়েছে, সেদিন থেকে আমার মনের কোণ থেকে খুব বড় একটা অন্ধকার কেটে গেছে। কতবার তখন থেকে মনে হয়েছে, ভাগ্যিস সেদিন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে! বিধাতাকে মনে মনে কত না ধন্যবাদ দিয়েছি। তুমি ভাগ্যবতী, হাসি, রাজা ক্ষণজন্মা পুরুষ, এমন স্বামী লাভ ক'রে তুমি ধন্য হও—ধন্য হও, হাসি।"

মোটার বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকিল, শরৎকুমার ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—"আর সময় নেই, হাসি, সময় নেই—এক দিন আমার আকুল প্রার্থনার উত্তরে 'না' বলে আমার জীবন আনন্দহীন করে দিয়েছিলে, আজ আমার অনুরোধ, প্রার্থনা সফল কর, হাসি,—বল—হ্যাঁ—রাজা বাহাদুরকেই তুমি—"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে বারান্দার ভিতর গাড়ী আসিয়া পড়িল—হাসি আস্তে আস্তে বলিল— "আপনি আগে আমাকে কথা দিন যে—"

আর বোঝাপড়া চলিল না, দুজনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল; শচীন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দরোজাটা খুলিয়া

ধরিয়া বলিল—"এই যে শরদা! আসবেন না একবার ভিতরে?"

"না ভাই—হাতে অনেক কায আছে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে সুজন রায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রাণীগঞ্জের সম্পত্তি হইতে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবেন, এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়াছিলেন,—কিন্তু চিরশত্রু অতুল রায় সে আশাতেও তাঁহাকে নিরাশ করিলেন।

এখন তাঁহাদের সুদশা লাভের একটিমাত্র উপায়। যদি বিজনকুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারেন,—তবেই তাঁহার সকল দিক বজায় থাকে; ধন-সম্পত্তি, মান-মর্য্যাদা সকলই রক্ষা পায়। কিন্তু ইহা ত একান্ত ভাবেই অতুলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বেই ত সুজন রায়ের এ প্রস্তাব অতুলেশ্বর অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর এখন এ কথা তুলিলে তিনি ত তাঁহাকে লাঠি দিয়া বিদায় করিবেন। তবুও সুজন রায় এ সঙ্কল্প মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না—ছলে বলে কৌশলে ইহা সিদ্ধ করিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন।

সুজন রায়ের ধর্ম্মে কোন দিনই মতি ছিল না—মঙ্গল-শক্তির আরাধনা তিনি কখনও ভুলিয়াও করেন নাই—কিন্তু সংঘাতিনী দৈবশক্তির প্রতি চিরদিনই তাঁহার অটল বিশ্বাস। বিপদে আপদে পড়িলেই করালী কালীর মাননা তিনি করিয়া থাকেন। আজও করিলেন, কালীঘাটে দেবীপদতলে শত পাঁটা বলি পড়িল,—গৃহস্থাপিত চামুণ্ডামূর্ত্তি মহিষ-বলিদানে পূজিত হইলেন। উপরন্তু ইতঃপূর্ব্বে কখনও যাহা করেন নাই—চামুণ্ডামূর্ত্তির পদতলে একদিন সন্ধ্যাপূজার সময় অনেকক্ষণ ধরিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। উঠিয়া দেখিলেন চামুণ্ডাকণ্ঠের প্রেতমুণ্ডগণের কাঁধের উপর দুইটা করিয়া হাত বাহির হইয়াছে। সেই হাতে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া জনে জনে তাঁহার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাসিতেছে।

সুজন রায়ের মনে দেবীর ইঙ্গিত ব্যক্ত হইল। রায় বংশের সৌভাগ্যসূচনা যে ধনুকের প্রসাদে সেই ধনুক লাভে যে তাঁহাদের ভাগ্যেও রাজ্য ও রাজকন্যালাভ ঘটিবে, তাঁহার সংস্কারান্ধ মন এই কথাই বারবার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল।

বিজনকুমার আজ প্রাতঃকালে কলিকাতাযাত্রার পূর্ব্বে যখন পিতৃপ্রণাম করিতে আসিল—তখন তিনি চামুণ্ডা দেবীর জপমালা হস্তে বৈঠকখানার বারান্দায় বিচরণ করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে রেলিঙ্গের উপর ঝুঁকিয়া নিড়নীধারী মালী দুই জনের চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি মিষ্ট ভাষা প্রয়োগে তাহাদিগের অন্তরাত্মাকে কৃতার্থ করিয়া তুলিতেছিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া পর্য্যন্ত সকাল বেলাটা তাঁহার জপের মালা হাতেই কাটে, তবে এজন্য সাংসারিক কোন কর্ম্মেই তাঁহার বাধা পড়ে না। মালা ফিরাইবার সময় যেমন উৎসাহে মাঝে মাঝে দশমহাবিদ্যার স্তুতিপাঠ চলে, ততোধিক উৎসাহে ভৃত্যগণ যথাসময়ে অভ্যর্থিত হয়। পুত্র প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার পর তিনি তাহার ইংরাজী বেশভূষাসম্পন্ন আপাদমস্তক বিরক্তকটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বারান্দার একখানা চৌকি দখল করিয়া লইয়া বলিলেন, "আজ আবার যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

পুত্র বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর করিল,—"আজ্ঞে কল্‌কাতায়।"

পিতা চামুণ্ডামূর্ত্তির স্তোত্র একবার আবৃত্তি করিয়া লইয়া জপমালা মস্তকে ঠেকাইবার পর তাহা গলদেশে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"এখন তখন কল্‌কাতা আর কল্‌কাতা। খরচ যোগায় কে?"

"কেন, আপনার আদেশেই ত যাচ্ছি,—মোকর্দ্দমা রুজু করাতে হবে না?"

সুজন রায় পূর্ব্বেই কৌন্সিলের মত লইয়া বুঝিয়াছিলেন, মোকদ্দমায় তাঁহার জয়লাভের সম্ভাবনা কম—তথাপি জেদের দোহাই অমান্য করিতে পারিতেছিলেন না—কিন্তু তহবিলের ঘাঁকতির দায়ে অবশেষে মনের পরাপ্রবৃত্তিটাকেও আপাততঃ কোণঠাসা করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"মোকদ্দমা করা অমনি সোজা কথা কি না? রেস্ত চাই। ব্যারিষ্টারদের মত জানতেই অনর্থক কত খরচ হোল। তুইও ত একটা অকালকুষ্মাণ্ড—পাশটাশ একটাও ত দিতে পার্‌লিনে। তোর উপরে যে এতটুকু আশা ভরসা বাঁধব—তারও ত উপায় রাখিস্ নি।"

বিজন রায় চুপ করিয়া রহিল। পিতা বলিতে লাগিলেন,

—"এখন একটিমাত্র উপায় আছে—এই বৈতরণী পার হবার একখানা ডিঙ্গি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—বাইতে পারিস্ যদি, তবেই কূলে উঠতে পার্‌বি,—পারবি কি না বল্—"

"আজ্ঞে বলুন, সে উপায়টা কি? তার পর বুঝব—পারব কি না।"

"অনেক বার ত বলেছি—যদি প্রসাদপুরের ধন্বকটা কোন রকমে দখল করতে পারিস্—তবে রায়-রাজ্য তোর হস্তগত হবে—নিশ্চয়ই; বুঝলি ত?"

এই ধন্বক সম্বন্ধে বিজনকুমার আবাল্য অনেক কথাই শুনিতেছে। এই ধন্বক-বাহ্নিকর মাথার উপর যে রায়-রাজ্যের স্থাপনা—ইহাকে ঘরে আনিতে পারিলে জজেরা যে তাহাদের ন্যায্য অধিকার গ্রাহ্য করিবেন—এই সংস্কার তাহারও মনে বিশ্বাসরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে।

পিতার কথার উত্তরে পুত্র কহিল,—"আজ্ঞে বুঝেছি।"

"বুঝেছি বল্লেই ত হবে না, পারবি কি না?"

"আজ্ঞে পারব—"

"আজ্ঞে পারব; অমন বাজে কথা আমি শুনতে চাইনে,—কি ক'রে পারবি, তাই বল্।"

"রাজ-দপ্তরে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, সে আমার জন্য সব কায করতে পারে।"

সুজন রায়ের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চামুণ্ডা-দেবীর বলিদানে শত মুদ্রা মানৎ করিয়াছিলেন—মনে মনে আরও একশত বাড়াইয়া দিয়া এতক্ষণ পরে প্রসন্নভাবে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তবে তাকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার কর।"

"কিন্তু খাওয়াতে হবে কিছু তাকে?"

সুজন রায় খনখনে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"অন্তরঙ্গ বন্ধুই বটে!"

"সে বন্ধু আমাকে খাতির করে, আমারও ত তার খাতির রাখা চাই, এক তরফা বন্ধুত্ব ত আর জগতে মেলে না।"

"বেশ, কি দিতে হবে বল্? এ সংসারে আগে থাকতে বিশ্বাস কাউকেই করতে নেই। অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল হাতে হাতে পেয়েছি। তবে যদি কাযটা হাসিল ক'রে দেয়, তখন তাকে তার আশ মিটিয়েই খাওয়াব, এইটে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি—বুঝলি ত?"

—"না, তেমন বেশী কিছু দিতে হবে না, তাদের একটা সভাসমিতি আছে, তাতে অল্পবিস্তর কিছু দিলেই চল্‌বে।"

"তবু আঁচটা কি তার?"

"এই শ পাঁচেক।"

"বাস্ রে" বলিয়া সুজন রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবুও ত ধন্বকের আশা ত্যাগ করা যায় না; পকেট হইতে দশ টাকার নোট ১০ খানা বাহির করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই নাও বাপু, চামুণ্ডার এ মানৎ অর্থ তোমাকেই দিলাম, এখন তাকে প্রসন্ন কর, বুঝলে ত? তার পর ধন্বকটা এনে যে দিন সে হাজির করবে, সেই দিন থেকে সভা-সমিতির জন্য তার আর কোন ভাবনাই থাকবে না।"

বিজনকুমার অতঃপর আর কোন কথাই না কহিয়া তাহাই পকেটে পুরিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সকালবেলা সেদিন আর তাহার কলিকাতাযাত্রা হইল না। এ কাযটা ত আগে করা চাই। কিন্তু আজ ত মাতৃ-মন্দিরে মিলনের দিন নহে, সন্তোষের সহিত দেখা হইবার উপায় কি? নিজে রাজবাড়ীতে যাইতে পারে না, চাকরের দ্বারা চিঠি পাঠানও ঠিক নহে, লোকের মনে তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে! আর যদি সন্তোষের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আরও দুই দিন অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ট্রেণটা ঠিক সময়ে ধরিতে পারিবে কি না সন্দেহ, অথচ আগামী দিনের জমকালো রেসটার জন্য অনেক দিন হইতে সে প্রতীক্ষায় আছে! "কি বিপদ!" এই বলিয়া সে ঘরে গিয়াই টাইম টেবল দেখিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে জুতার শব্দ পাইয়া সে দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিল। এ কি, এক জন সেবাদারীকে সঙ্গে লইয়া সন্তোষ যে স্বয়ং এখানে উপস্থিত!

বিজনকুমার 'হ্যাল্লো' নাদে সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরস্পরের আহ্লাদসূচক বাক্যবিনিময় চলিল, তাহার পর তিন জনই কেদারা গ্রহণ করিল। সন্তোষ বসিয়া একবার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল,—"আশপাশে কেউ নেই ত হে? তারণ, তুমি বরঞ্চ বারান্দায় গিয়ে বোসো,—চাকর-বাকর কেউ এদিকে আস্‌চে দেখলেই আমাদের সাবধান ক'রে দিও।" তারণ আদেশমাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে বারান্দার বেঞ্চে গিয়া বসিল। সন্তোষ তখন বলিল—"টাকার ত বিষম খাঁকতি, চাঁদার কিছু

যোগাড় না করলেই নয়। রাজা বাহাদুর যদিও আগে একবার হাজার টাকা দিয়েছেন, তবুও চল তাঁকে আর একবার ধরা যাক; মোটা টাকা তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথাও সহজে মিল্‌বে না। এবার তোমাকেও আমাদের সঙ্গে কিন্তু যেতে হবে—তাই বল্‌তে এসেছি হে।"

"ক্ষেপেছ! আমাদের মধ্যে কেমন সদ্ভাব, তা ত জান? তোমরা গেলে যদি হাজার টাকা মেলে—আমি গেলে হাজার পয়সা মিল্‌বে কি না সন্দেহ।—"

"কিন্তু রাজা বাহাদুর ত সে রকম ধরণের লোক নন; দেশ-হিতকর সভা-সমিতির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, শুনলে তিনি খুসীই হবেন।"

"না হে না, সে পাজি ডাক্তারটা থাক্‌তে আমি আর সে মুখো হচ্ছিনে। আগে তাকে—"

"সে আয়োজন হচ্ছে,—বেশী দিন আর তিনি রাজ-প্রসাদ ভোগের অবসর পাবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেবাধারীগুলোও যে অন্নাভাবে মারা যাবে। সভা-সমিতি—দেশোদ্ধার যা কিছু বল—সবার মূল হচ্ছেন এই যাদুর কাঠি—" বলিয়া সে আঙ্গুল বাজাইয়া টাকার রূপ সঙ্কেত করিল—সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"বুড়োর কাছেও কিছু আদায় কর, দাদা!"

উত্তর হইল,—"আমি কি নিশ্চেষ্ট ব'সে আছি না কি! কিছু পাওয়াও গেছে, আর একটা মস্ত দাঁওয়ের যোগাড় ফেঁদেছি।"

"সত্যি না কি? খুলে বল হে কথাটা, হাঁপ ফেলে বাঁচি।"

"তুমি ত রাজার হাতিয়ার-শালার কর্ত্তা, তুমি যদি সেখান থেকে কোন রকমে পুরাতন ধনুকটা সরিয়ে এনে বুড়োকে দিতে পার ত অনেক টাকা পাওয়া যায়। জান ত এই ধনুকটার প্রতি কর্ত্তার কিরূপ নেক্‌নজর।"

পাঠক! এখন বুঝিয়াছেন, অতুলেশ্বরের অনুমান ভিত্তি-শূন্য নহে।

সন্তোষ এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বেশ একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল,—"কিন্তু বড়ই বিশ্বাসঘাতকের কায হয় সেটা! জানিস ত, ভাই, রাজা বাহাদুর কিরূপ ভাল লোক ও ভাল মনিব।"

বিজনকুমার ব্যঙ্গ-ভরা হাসি হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"এ সব নীতির বুলি আওড়াতে শিখলি কবে থেকে তুই?"

সন্তোষ থতমত খাইয়া বলিল,—"তা ছাড়া, দাদার এতে সর্ব্বনাশ ঘট্‌তে পারে।"

"বিজনকুমার এবার গম্ভীর স্বরে বলিল,—"দেখ, আমরা যে কাযে ব্রতী হয়েছি, তার মধ্যে ও সব মামুলি ভাবনার স্থান নেই। মাতৃভূমিই আমাদের পিতা মাতা পুত্র কান্তা একাধারে সব,—আর গুরুর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনই এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। উপস্থিত এখন আমিই গুরুর প্রতিনিধি—"

সন্তোষ মনে মনে যেন কি কথা তোলাপাড়া করিয়া একটু পরে বলিল, "বল তবে তোমার হুকুম।"

"ধনুক চুরী ক'রে আন্‌তে হবে।" সন্তোষ সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল,—"দেখ, বিজু মিঞা, যদি ধনুকই চুরী করতে পারে, তবে অন্য হাতিয়ারই বা চুরী করতে দোষ কি?"

বিজন রায় আহ্লাদে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর চৌকী হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার কানের নিকট মুখ রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "কিচ্ছু না। পার্‌লে ত ভালই হয়। আমাদের অস্ত্র-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।"

সন্তোষও উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "দেখ ভাই বিজন-দা, আজ তবে মন খুলে বলি। রাজহাতিয়ার-শালার অস্ত্রগুলা যখনই দেখি, আমার মনে যে কি আপশোষ জেগে উঠে, কি বল্‌ব! এতগুলা অস্ত্র এখানে নিরর্থক মাটী হচ্ছে! আমরা হাতে পেলে কত ভাল কাযে লাগাতে পারতুম!"

"Bravo" বলিয়া বিজনকুমার তাহার পিঠ থাবড়াইয়া, ভগবদ্গীতার মামুলি শ্লোক দুই একটার আবৃত্তি দ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তুলিয়া কহিল,—"এই নে, ভাই, ৫০৲ টাকা বাবা দিয়েছেন। তার পর কার্য্যসিদ্ধি হ'লে খু[illegible] বড় রকম একটা দান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

বলা বাহুল্য, অপরার্দ্ধ রেসে ব্যয়ার্থ সে হাতে রাখিল। সন্তোষ নোট ক'খানা পকেটজাত করিয়া কহিল,—"খু[illegible] লাভ। কিন্তু দেখো, দাদা, বুড়ো যেন শেষে ফাঁকি না দেয়। এমন একটা মোটা দান তার কাছে চাই আমরা— যাতে আ[illegible] ভুলক্রমে যাবার দরকার না থাকে। সত্যি বল্‌ছি, বি[illegible]

শিক্ষা, পুলিস-খুন বা ইংরাজ-খুন করতে মনে বাধা পায় না; কিন্তু নিরীহ দেশের লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে বেশ একটু কষ্ট পেতে হয়।"

"কষ্টের কথা এখন রাখ। যে কায আমরা ধরেছি, তা'তে এ রকম কষ্ট জলের মত হজম করতে হবে। রাজা বাহাদুরের কাছে এখন না; গিয়ে মোটা রকম একটা চাঁদা আদায় ক'রে আন।"

এই কথাবার্ত্তার ফল কি হইল, পাঠক জানেন। হায় রে! মানুষের সঙ্কোচ! অধিক স্থলেই ইহা ম্যাক্‌বেথের দুর্ব্বলতা মাত্র!

বিজন রায়ের উপদেশ সবল শক্তিরূপে তাহার কর্ম্ম-যোগের মূলে অধিষ্ঠিত হইবামাত্র তাহার মনের সমস্ত বাধা-সঙ্কোচ দূর হইল। তখন রাজার চেকফর্ম্মে জাল সহি করিতে সে বরঞ্চ বেশ একটা আত্মপ্রসাদই অনুভব করিল।

*　　*　　*　　*

পরদিনই সন্তোষ জাল চেকখানা বিজনকে ভাঙ্গাইবার জন্য দিতে আসিয়া শুনিল, বিজন কলিকাতায় গিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াও সুজন-পণ সে চেক গ্রহণ করিল না। অর্থাৎ,—ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কোনো এক দিন যে এই চেক-রহস্যের তদন্তে সহর তোলপাড় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব চেক ভাঙ্গাইবার ভারও পড়িল সন্তোষের উপর। সন্তোষ সে ভার ঘাড় পাতিয়া লইয়া আপাততঃ লাইব্রেরী-ঘরের গুপ্ত দেরাজের মধ্যে চেকখানাকে আশ্রয় দান করিল। অতুলেশ্বর কলিকাতা যাইবার পর কোন ওজরে দাদার নিকট হইতে ছুটী আদায় করিয়া কলিকাতায় যাইয়া চেক ভাঙ্গাইয়া লইবে, এই রহিল তাহার মৎলব। কিন্তু রাজা চলিয়া যাইবার পরেই সে অস্ত্রচুরীর কাযে হাত দিয়া, সফলতার আনন্দে একরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন শনৈঃ শনৈঃ অস্ত্রাগার শূন্য হইতেছে, অথচ তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই—এই অপ্রতিহত বিজয়লাভের নেশায় পড়িয়া কলিকাতা-যাত্রার দিনটাকে সে ক্রমাগতই পরদিনের কোটায় ফেলিতে লাগিল।

কিন্তু নেশায় মাতিয়াও সে বন্ধুর উপদেশ ভুলে নাই। অন্য কোন অস্ত্রে হাত দিবার পূর্ব্বে প্রতিদিনই সে প্রথমে একবার ধনুকটা নাড়াচাড়া করিয়া দেখে, কিন্তু উঃ, কি ভারী! অন্য কাহারও সাহায্য না পাইলে ইহাকে নড়ান সরান যে একরূপ অসম্ভব,—কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া তাহা সে বেশ বুঝিল। অথচ বিজন এ কার্য্যে তাহার দোসর হইতে চাহে না; অন্য একটি মাত্র সেবাধারীকে সে জানে, যাহার সাহসের উপর একান্তভাবে সে নির্ভর করিতে পারে—কিন্তু সে এখন এখানে নাই, গুরুর আহ্বানে অন্যত্র সমিতিগঠনে গিয়াছে। তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় সুজন রায়ের আদিষ্ট স্বর্গ সিঁড়ি নির্ম্মাণে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া পড়িতে লাগিল। সবুরে মেওয়া ফলে—এই প্রবচন যে অনার্য্য-বিধান ভাষা ভাষ্যেই তাহার প্রমাণ। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রসম্মত "শুভস্য শীঘ্রং" এ ব্যবস্থার লঙ্ঘনে সন্তোষের অদৃষ্টে অনার্য্যের সেই মেওয়া ফলটি ফলিল না। হঠাৎ একদিন দলপতির আজ্ঞা-পত্র আসিল, "তোমার হাতের কায সত্বর শেষ করিয়া লইয়া অবিলম্বে এখানে আসিয়া হাজির হও।"

সে পত্র বিজনকুমারের মারফতই সন্তোষ পাইল। এখন অতুলেশ্বর এখানে নাই, রাত্রির অন্ধকারে সন্তোষের আড্ডায় আসিয়া পত্র দিতে বিজন কোন আপত্তির কারণ দেখিল না। গুরুর চিঠি পাইয়া খুব একটা নৈরাশ্যের ভাবে সন্তোষের মন ভরিয়া উঠিল, কিন্তু এ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত; সে শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "যে কাযটা শেষ করতে গুরুদেব ইঙ্গিত করেছেন, সেটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে—আজই রাতা-রাতি বাকীটুকু শেষ ক'রে ফেলে—কালই আমি এখান থেকে তা হ'লে চলে যাই।" বলিয়া আলমারির আড়ালে যে কোণে বসিয়া সে বোমা প্রস্তুত করিতেছিল, সেইখানে বন্ধুকে আনিয়া, অর্দ্ধ-প্রস্তুত বোমাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিল—"ঐ দেখ।"

বিজন বলিল—"রাতের মধ্যে কাযটা কি শেষ হবে?"

"হতেই হবে, গুরুর আজ্ঞা। এখন এস তোমাকে চেকখানা দিই।" বলিয়া দেরাজ খুলিয়া সে চেকটা বাহির করিল। বিজন আপত্তি করিয়া বলিল—"না না, চেক আমি নিতে পারব না—তুমি রাখ। তুমি ত কল-কাতা হয়েই যাবে, অমনি ভাঙ্গিয়ে নিও।"

"না, ভাই, ও সব কাযে বিলম্ব হ'তে পারে—গুরু শীঘ্র আমাকে যেতে বলেছেন। তুমি সেক্রেটারী—তোমার কাছেই এথা-ণ্ডথাকা উচিত। ভাঙ্গাতে পার ভাঙ্গিয়ে নিয়ো,

নইলে আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো। ইত্যবসরে গুরুদেব এ সম্বন্ধে কি বলেন—তাও জেনে রাখব।"

অগত্যা চেকখানা বিজন রায় গ্রহণ করিল। তাহা পকেটে পূরিয়া কহিল—"কিন্তু ধনুকের ত, ভাই, কিছু হোল না—বুড়ো ত' আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।"

সন্তোষ দেরাজটা বন্ধ করিয়া বলিল—"এখনি ত সে কাযটাও আমরা দুইজনে সেরে ফেল্‌তে পারি,—এস একবার চেষ্টা দেখা যাক্।"

লাইব্রেরী হইতে অস্ত্রাগারে যাইবার দ্বার বন্ধ ছিল, কিন্তু চাবিটা থাকিত সন্তোষেরই কাছে, দ্বার খুলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু সেই বৃহদাকার ধনুক দেখিয়া ত বিজনের চক্ষু স্থির! সে বলিল—"এ ধনুক নিয়ে আমরা পালাব কি ক'রে?"

"সে ভাবনা তোমার নেই এই দেখ ক্লোরোফর্ম! পাহারাওয়ালাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেই আমি কার্য্যোদ্ধার করি।"

প্রশংসা-বিস্ময়ে বিজন অবাক হইয়া রহিল।

সন্তোষ বলিল—"আমার রাজত্বে সুখে আছে সব চেয়ে রাজার পাহারাওয়ালার দল। তাদের আশীর্ব্বাদে স্বর্গদ্বার যে আমার জন্য প্রতিদিন একটু বেশী ক'রে খুলছে, তাতে সন্দেহ নেই। আজকাল প্রতি রাত্রিতে আমি লাইব্রেরী ঘরে এসে বসি। ১০টার সময় যে পাহারা বদল হয়, তারা বেশ সাধু-সজ্জন, তাদের প্রতি আমার হুকুম দেওয়া আছে যে, যতক্ষণ আমি এখানে থাকি, ততক্ষণ জেগে পাহারা দেবার তাদের দরকার নেই, ততক্ষণ তারা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করুক। আমি যাবার সময় তাদের ডেকে দিয়ে যাব।"

বিজন হাসিয়া বলিল—"পাহারাওয়ালা ভায়াদের বিধাতা দেখছি একইরূপ ধাতুতে নির্ম্মাণ করেছেন; আমি ভাবতুম, আমাদের দরোয়ানরাই বুঝি ঘুম-রাজ্যের উল্কাপিণ্ড—ছটকে বিষাদপুরে এসে পড়েছে।"

সন্তোষ বলিল—"শোন আগে, তারপর টীকা কোরো। এ বন্দোবস্তে আমার বিলক্ষণ সুবিধা হয়েছে। যখন তাদের নাসিকাধ্বনি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দরকার বুঝি যদি তা হ'লে সেখানে গিয়ে তাদের ঘুমের উপর মোহনিদ্রা রচনা ক'রে আসি। এক জায়গায় আমি কেবল কাবু—এই হরিরামের নিকট।"

"তা হ'লে—"

"কিন্তু সে আসে দুপরের সময়—তার আগেই আমার কায শেষ করতে হয়।"

বিজন ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"কিন্তু দুপরের ত বড় বেশী দেরী নেই।"

"এখনো আধঘণ্টার উপর দেরী আছে। এ সময়ের মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র কত পথ প্রদক্ষিণ করেন, বল ত হে? এস—আর বিলম্ব নয় লোকাভাবে এ কাযটা এতদিন ফেলে রাখাই হয়েছে।"

"আমার কিন্তু বুকটা কাঁপছে।"

"কিছু ভয় নেই; এস দেখি হাতাহাতি ক'রে ওটাকে আগে নামিয়ে ফেলি; নামানটাই হচ্ছে—আসল কায।"

"কিন্তু তার পর মড়ার মত ওটাকে দুজনে ঘাড়ে ক'রে পালাতে হবে ত? তখন নিশ্চয়ই ধরা পড়ব"

"না হে না; এস না, আগে নামিয়ে ফেলি—তার পর তোমার কিছু করতে হবে না—তুমি শুধু ওটাকে আমার কাঁধে তুলে দিয়েই সট্‌কে প'ড়ো,—তা হলেই আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারব।"

"যে কাণ্ড করছ, একদিন দেখছি আমাদের তুমি ফাঁসাবে।"

"আরে অত ভয় করলে কি চলে, দেখছ ত শীত-রাতে জানালাটা খোলা, ঐটি হচ্ছে—আমার মুক্তির পথ চুরীটা একদিন ত ধরা পড়বেই; তখন সহজেই প্রমা[ণ] ক'রে দেব যে, স্বদেশী দস্যুনন্দনরা ঐ পথে ঢুকে ঐ প[থে] চলে গিয়েছে।"

"আর এখন কি সত্যিই তুমি সদর রাস্তা দিয়ে ধনু[ক] ঘাড়ে করে বেরোবে না কি? কি dairing তুমি!"

"তা নয় ত কি—এস, আর কালবিলম্ব করা নয়—"

অতঃপর একটা ছোট টেবল দেওয়ালের নীচে আনি[য়া] ফেলিয়া, তাহার উপরে চড়িয়া উভয়ে ধনুক নামাইতে চে[ষ্টা] করিল। কিন্তু প্রসাদপুরের ধনুর্দ্দেবতা বিষাদপুরের হ[স্তে] আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে ব্যর্থমনো[রথ] করিয়া সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেলেন; ভয়কাতর বি[জন] রায় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া দ্রুতচরণে পলায়ন করিল।

সন্তোষের পলাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না— শব্দ পাইয়া হরিরাম যদি আসে ত দেখিবে, বন্দুকটা দেয়াল হইতে খসিয়া নীচে পড়িয়াছে; বাঁধন আল্‌গা হইলে এরূপ ঘটনা কিছুই অসম্ভব নহে। সন্তোষের আসল বিপদ ঘটিল — বোমা সরাইতে গিয়া।

বোমাটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলিবামাত্র তাহা ফাটিয়া গিয়া সন্তোষকে ধরাশায়ী করিল। এ খবর কিন্তু বিজন জানিল না। পরদিন তাহার দেখা না পাইয়া সে ভাবিল — সে গুরুদর্শনে যাত্রা করিয়াছে।

ইহাই অস্ত্র চুরীর আদি ইতিহাস। উপান্ত্য ভাগের সহিত ইহার কিরূপ যোগাযোগ আছে, পাঠক তাহা পরে বুঝিতে পারিবেন।

—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পুলেকে একশত টাকা ঘুস দিয়া পর্য্যন্ত সুজন রায় মাংসখণ্ডলুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় বন্দুকের প্রত্যাশায় আছেন। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল — মাসের পর মাস চলিয়া যায়— সে বন্দুক ত কই ঘরে আসে না। নৈরাশ্যদগ্ধ হইয়া দর্শনে অদর্শনে তিনি পুলেকে গালি পাড়েন— আর দুই সন্ধ্যা চামুণ্ডাচরণে অর্ঘ্য-দান করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করেন। আজ সকালে মন্দির হইতে গৃহে ফিরিয়া জপমালা ফিরাইতে ফিরাইতে দশ এগার বৎসর আগেকার একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার জমীদারীর ঠিক সীমানার পার্শ্বে অতুলেশ্বরের জমীর উপর একটি ক্ষুদ্র কালীমন্দির ছিল। এই ইষ্টকমন্দির রাতারাতি এক দিন তিনি ভাঙ্গিয়া দেন। পরে এই মন্দিরস্থান লইয়া বহুদিন উভয়পক্ষে মামলা-মোকদ্দমা চলে,— এবং বিচার-ভ্রান্তি-ফলে এই অংশ সুজন রায়ের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিজের অধিকারে পাইয়া পর্য্যন্ত তিনি এতদিন এ মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করেন নাই। সেই অপরাধেই যে দেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহা আজ সহসা তিনি সুস্পষ্ট বুঝিলেন। সেই দিনই আহারান্তে অশ্বযানে তিনি সেই মন্দিরের খোঁজে চলিলেন। মন্দির-স্থান অধিকার করিবার সময় যে সকল লাঠিয়াল নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদেরই একজন এখনও তাঁহার বরকন্দাজ — তাহাকে তিনি সঙ্গে লইলেন। নদীর তীরপথে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়া এক স্থানে বরকন্দাজ অশ্বযান থামাইয়া কোচমানের পার্শ্বদেশ হইতে নামিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে প্রভুকে দেখাইয়া বলিল— "ঐ যে জঙ্গল দেখা যায়, ওরি মধ্যে দেবীর ছিল অধিষ্ঠান।"

বহুক্রোশব্যাপী সেই ভীষণ জঙ্গলের দিকে চাহিয়া সুজন রায়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি নয়নে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহারই কর্ত্তৃক এইরূপে অবমানিত হইয়া দেবী এই তমসাবৃত জঙ্গলে পড়িয়া আছেন! কালিকার ক্রোধের কারণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তিনি ভয়কম্পিত কণ্ঠে জোড়হস্তে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কহিলেন "সন্তানের দোষ গ্রহণ করিও না দেবি, দয়া কর, রক্ষা কর— এ অধম সন্তানকে কৃপা-কটাক্ষ দান কর— এই জঙ্গল নাশ করিয়া তোমার করালী মূর্ত্তিকে আমি সপ্ত মন্দিরের ভিত্তিতে স্থাপন করিব।"

এ জঙ্গল পদব্রজে আজ ভেদ করা তিনি সম্ভব জ্ঞান করিলেন না; পরে হাতীর পিঠে চড়িয়া এখানে আসিবেন, এই সঙ্কল্পে গৃহে ফিরিলেন।

গাড়ী আসিয়াছিল তীরপথে; ফিরিল মাঠের পথ ধরিয়া। অপরাহ্নের রক্তিম ছটা ক্রমশঃ জঙ্গলের মাথা লাল করিয়া, নদীর জলে ঝিকিমিকি স্রোত তুলিয়া,— আকাশের বিশালতা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তুলিয়া তাহার নানা স্তরে নানাবর্ণ আঁকিয়া সন্ধ্যার রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দিকে দিকে পাখীর আগমনী সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুজন রায় গাড়ীর ভিতর হইতে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন, — সহসা তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া দুইটা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল,— কোচমানের দারুণ কশাঘাতে একবার নাড়া দিয়া গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিবার যোগাড় করিল— কিন্তু চলিল না। সুজন রায় সভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; তাঁহার কানে বন্দুকের আওয়াজ আসিয়া লাগিল। এ কি বননিভৃতে বন্দুকের শব্দ! মুহুর্ম্মুহু দুই চারিটা বন্দুক একের পর একে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, ঠিক যেন কাওয়াজের ধ্বনি। তিনি বিস্ময়ে কান পাতিয়া রহিলেন — কিন্তু অতঃপর আর কোনও শব্দ শুনিতে পাইলেন না; ঘোড়া দুইটাও এবার ভালমানুষী লক্ষণ প্রকাশ করিল;

কোচমান বলিল, "হুজুর, গাড়ীতে উঠুন।" তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে অশ্বদ্বয় বেশ সহজভাবেই গাড়ী বহন করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিল।

গাড়ীতে বসিয়াও এই বন্দুকের শব্দ সুজন রায়ের কানে বাজিতে লাগিল আর মাথার মধ্যে কত মৎলব ঘূরপাক খাইতে লাগিল। মাণিকতলার অ্যানার্কিষ্ট দল এখানেও একটা আড্ডা করিয়াছে না কি? তাঁহার মনে একটা মস্ত আশা জাগিয়া উঠিল,—বুঝিলেন, কালিকা দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি আর তখন উপরে উঠিলেন না—সন্ধ্যা আরতির সময় মন্দিরেও গেলেন না।

আজকাল বিজনকুমার তাঁহার পথ মাড়ায় না,—তাহাকে ডাকিলেই তিনি শোনেন—সে বাড়ী নাই। তাই তাহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া—নীচে সিঁড়ির ঘরে বসিয়াই মালা জপিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মৎলব সিদ্ধ হইল।

বিজন ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া সিঁড়ির ঘরে ঢুকিবামাত্র কর্ত্তা হাঁকিলেন—"হতভাগা—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?"

বিজন চমকিয়া উঠিল—পিতা যে ঘরের কোণে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, সে প্রথমে তাহা দেখে নাই। থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"দিন নেই, রাত নেই, বেড়াতেই যাওয়া হচ্ছে—কোন্ বাপের শ্রাদ্ধ করতে—সেইটে শুনি। জুয়াচোর লক্ষীছাড়া—দে—আমার টাকা ফিরিয়ে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে তুমি ঘাস খাবে ভেবেছ—সেটি হচ্ছে না।"

বিজনের মেজাজটা আজ আগে থাকিতেই খারাপ আছে, আজ মাতৃমন্দিরের মুক্তিতে একটা খুনের ভার তাহার উপরেই পড়িয়াছে। একদিন সে ভাবিয়াছিল, পরের জীবন লইয়াই এই স্বদেশী ব্রতের খেলা সে খেলিবে, নিজের জীবনও যে এ খেলার পণ্য স্বরূপ দিতে হইতেও পারে—এ কথা ইতঃপূর্ব্বে তাহার কোন দিন মনেই হয় নাই।

পিতার গালিগালাজ অন্য দিনের ন্যায় সে ধীর চিত্তে সহ্য করিল না, উত্তরে অসহিষ্ণুভাব প্রকাশ করিয়া কহিল,—"বেশ আপনি যখন চাচ্ছেন—আমি সে টাকা ফেরত এনে দেব, কিন্তু ধনুকের আশা তা হ'লে ত্যাগ করুন।"

সুজন রায় এরূপ উত্তর আশা করেন নাই, তিনি একটু নরম হইয়া বলিলেন,—"দেখ বেটা অকৃতজ্ঞ,—ধনসম্পদ আমি যে চাই—সে আমার জন্য—না তোর জন্য? প্রসাদপুর রাজত্ব পেলে গদিতে বসবে কে, তুই না আমি? সেইটে বল্ দেখি?"

"কিন্তু আপনার অবিশ্বাসেই ত আমার মন খারাপ হয়ে যায়, বন্ধুকে আমি রোজই তাড়া দিচ্ছি—সেও নিশ্চেষ্ট বসে নেই, যদি প্রমাণ চান—তাও দেখাতে পারি।"

"আচ্ছা তাই দেখা, চেষ্টা যে চল্‌ছে, এটা বুঝলেও ত নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

"আচ্ছা, আসুন তবে আমার ঘরে—"

আবেগভরে এ কথা বলিয়া ফেলিয়াই বিজন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একবার বাঁকা পথে পা ফেলিলে সহজে আর সোজা পথ মেলে না।

সুজন রায় কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন।

গৃহে আসিয়া সে আলমারী খুলিয়া একটা বন্দুক বাহির করিল, সবিস্ময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন,—"এ কি ব্যাপার!"

"প্রসাদপুরের অস্ত্রশালার বন্দুক!"

সুজন রায় ভীত-কণ্ঠে বলিলেন, "বন্দুক চুরী করতে বলেছে কে তাকে?—সর্ব্বনাশ! ধরা পড়লে যে আমাদের জেলে যেতে হবে।"

"আপনার তাড়া খেয়ে আমিই বলেছিলুম তাকে, চুরী বিদ্যাতে এমন করে হাত পাকাও যাতে করে ধনুকটা পরে সহজেই হাতাতে পার।"

সুজন রায় মালা মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন,—"দেখ্, আমার মনে হচ্ছে, তোর বন্ধুটিও মাণিকতলার লোক। ঠিক ক'রে বল্ দেখি, তুই এ দলে আছিস্ কি না? বড় যে ভয় ধরিয়ে দিলি!"

জোরের সহিত মিথ্যা বলা বিজনের খুব অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—এই কাযটি এ দলের লোকের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা; সে দৃঢ় স্বরে বলিল,—"কি যে বলেন, আপনি? আমার কি প্রাণের ভয় নেই না কি?"

তথাপি তাঁহার সন্দেহ মিটিল না,—তিনি বলিলেন, "লুকোস্‌নে আমার কাছে, ঠিক ক'রে বল্। যদি বা তাদের

পাক-চক্রে ফাঁদে পড়ে থাকিস্, আমি তোকে রাজ-সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করব, বল্, বিজন, বল্।"

বিজন অসঙ্কোচে বলিল,—"বৃথা ভয় পাচ্ছেন,—আপনার ছেলে হয়ে আমি রাজবিদ্রোহী হ'তে যাব, এ কখনো সম্ভবপর হয়?"

সুজনের মনের সন্দেহ তথাপি মিটিল না; তিনি কিছু না বলিয়া কহিয়া তাহার লেখার টেবলের নিকট আসিয়া দেরাজটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং কাগজপত্রগুলা টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বিজন হাসিতে লাগিল। গুপ্ত চিঠি-পত্র সে রাখিত না, পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিত, নোট বহিতেও সন্দেহজনক কোন কথাই তাহার লেখা থাকিত না। কিন্তু হঠাৎ যখন দেরাজের মধ্য হইতে পিতা অতুলেশ্বরের চেকখানা বাহির করিয়া ফেলিলেন—তখন সে অবাক্ হইয়া পড়িল। চেকখানা যে এই দেরাজে রাখিয়াছে, তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।—চেকখানা লইয়া সুজন রায় বাতির নিকট ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দশ হাজার টাকার Bearer চেক ভাঙ্গান হয় নাই; এবং তিন দিন পূর্ব্বে ইহার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এ কি ব্যাপার!"—

বিজন এইবার কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—"রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে আমার এক জন বন্ধু সভার জন্য চাঁদা এনেছিল।"

"কিন্তু, ভাঙ্গান হয়নি কেন?"

"আমাকে ভাঙ্গাবার জন্য দিয়ে, সে ঢাকায় চ'লে গেল; আমিও কথাটা একেবারেই ভুলে গেছি।"

"এত টাকা অতুল সমিতির জন্য দেবে—বিশ্বাস হয় না। হয় ত বা এ জাল চেক, তাই ভাঙ্গাতে সাহস করেনি।"

বলিয়া তিনি সেখানা পকেটে পূরিয়া পুত্রকে বলিলেন—"আমি কিন্তু কালই ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিদ্রোহীদলের খবর দিয়ে দেব। আর অতুলেশ্বর যে ঐ দলের নেতা, তাও বল্ব! এ চেকটা বা বন্দুকটা তাঁকে অবশ্য দেব না—তা'তে তোর উপর দোষ আস্তে পারে। এ গুলো এখন থাকে থাক, পরে সময় বুঝে কাযে লাগালে চল্বে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সন্ধানে তোরও আমাকে সাহায্য করতে হবে। যদি বা এদের সঙ্গে তোর কোন গুপ্তযোগ থাকে, তবে একমাত্র এই উপায়ে রক্ষা পাবি—বুঝলি!"

পরদিনই যে ম্যাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ লাভ করিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসাদপুরে আসিয়া অবধি অতুলেশ্বরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। তিনি "কল" করিতে আসিয়া যেরূপ স্বাধীনভাব দেখাইয়াছিলেন,—তাহা "সাহেবের" মনঃপূত হয় নাই; সুজন রায়ের অবনত সেলামই তাঁহার মনে নেটিব লোকের আদর্শ ভদ্রতা। উপরন্তু রাজকন্যা যে ক্লাউডেন সাহেবের বাড়ী যাতায়াত করিতেন, সে খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু নবাগতদিগকে কই তিনি ত সম্মান দান করিতে আসিলেন না? ইচ্ছাকৃত অবমাননা বলিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেব" ইহা ধরিয়া লইলেন। আসল কথা অবশ্য অন্যরূপ;—মিসেস্ ক্লাউডেনকে রাজকন্যা এতই ভালবাসিতেন যে, এত শীঘ্র সেই স্থানে গিয়া তাঁহারই স্থলভুক্ত মেমের সহিত হাস্যালাপ করিতে তাঁহার মন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, এই কষ্টকর ভদ্রতার কার্য্য আজ নয় কাল হইবে—বলিয়া স্থগিত রাখিতে রাখিতে কনফারেন্স আসিয়া পড়িল। তাহার পর হইতে উভয় পক্ষে মনোমালিন্য ঘটিল। "সাহেব" রাজার এই স্বদেশানুরাগ অতি ঘৃণ্য অপরাধ গণ্য করিলেন, আর রাজাও "সাহেবের" অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি একান্ত বিমুখ হইয়া পড়িলেন। কন্যাকে সেখানে পাঠান দূরে থাকুক,—নিজেই তাঁহাদের সহিত দেখাশুনা বন্ধ করিলেন।

এইরূপ ঘটনা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন পূর্ব্ব হইতেই রাজ-বিরুদ্ধে প্রস্তুত ছিল; এই কাঠ খড়ের উপর সুজন রায়ের বাক্যাগ্নি পড়িবামাত্র সহজেই তাহা জলিয়া উঠিল; অতুল যে বিদ্রোহীদলের একজন নেতা- ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন। সুজনের নির্দ্দেশে এবং সহযোগে পুলিসদল বন জঙ্গল ভেদ করিয়া বিদ্রোহীদিগের গুপ্ত আড্ডা আবিষ্কার করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ।

শিষ্য। গোটাকতক কথার মানে ব'লে দেবেন ?

গুরু। ফরাসী না ইতালীয়, কোন্ ভাষার ? জর্ম্মাণ ও রাসিয়ান আমি জানিনে।

শি। ইংরেজী ও বাঙলার।

গু। ও দুই ভাষা ত দিবারাত্র তোমার মুখে লেগে রয়েছে ?—ও দুই ত তুমি সমান জানো। আর দুটো একটা কথার মানে যদি না জানো ত অভিধানের ভিতরই তা পাবে।

শি। অভিধানে কথার শুধু পুরোণো মানে পাওয়া যায়।

গু। কথার তুমি মরা মানে চাও না, তাজা মানে চাও ? সে ত বেশ কথা। কিন্তু পুরোণো কথার নূতন মানে নিজে দিতে হয়। আর নয় ত যে দেয়, তারই কাছে তা শিখতে হয়।

শি। আপনার আশীর্ব্বাদে সেটুকু জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু দশে মিলে কোনও পুরোণো কথা যদি নতুন অর্থে ব্যবহার করে, আর সে দশ জনের প্রতি জন যদি তার আলাদা মানে করে, তা' হলে তার কোন্ অর্থটা ঠিক, তা বোঝবার উপায় কি ?

গু। এ রকম ঐক্যতানও হয় না কি ?

শি। সঙ্গীতে না হোক্, পলিটিক্সে হয়।

গু। পলিটিক্স ত তুমি আমার চাইতে ঢের ভাল বোঝ, আমি আর তোমাকে কি বোঝাব ?

শি। আমি পলিটিক্স্ খুব বুঝি, কিন্তু পলিটিক্সের ভাষা যে বুঝি, এমন কথা ত কখনো বলিনি।

গু। ওঃ ! তুমি জিনিষ বোঝো, কিন্তু জিনিষের মানে বোঝ না ? আচ্ছা—যা খুসি তাই জিজ্ঞেস করো, আমিও তার যা খুসি তাই জবাব দেবো।

শি। Congress মানে কি ?

গু। Progressএর উল্টো।

শি। ও অর্থ কোন্ অভিধানে পেলেন ?

গু। দর্শনের অভিধানে।

শি। তাতে কি লেখে ?

গু। এগিয়ে যাওয়ার নাম progress। Congress যখন No-change-ধর্ম্মী, তখন তা অবশ্য progress এর উল্টো।

শি। খিলাফতের মানে কি ?

গু। সংস্কৃতে যাকে বলে Nationalism, আরবিতে তাকে বলে খিলাফৎ।

শি। Nationalism একটা সংস্কৃত শব্দ ! আজ আপনি দেখছি, যা মুখে আসে তাই বল্‌ছেন।

গু। অনেক কথা যা বিলেতে বিলিতি, এ দেশে এসে তা সংস্কৃত হয়ে যায়। ওটাও তেমনি হয়েছে।

শি। ইংরাজির অপভ্রংশ যে সংস্কৃত—এ একটা নতুন আবিষ্কার বটে !

গু। দেবভাষার বিশেষত্ব কি ?—প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণে তার মানে বোঝে না, অথচ সর্ব্বসাধারণে তা ভক্তিভরে আওড়ায়। ন্যাসনালিজম্ শব্দটিতে এ দুটি গুণ স্পষ্ট।

শি। এর পর আপনার অতিবুদ্ধির তারিফ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সে যাই হোক, "স্বরাজ" মানে কি ?

গু। সেই বস্তু, যা কেউ জানে না কি, অথচ সবাই চায়। স্বরাজ্য স্বর্গরাজ্যেরই ছোট ভাই।

শি। তা হ'লে ও তিনটি শব্দ একত্র করলে কি হয় ?

গু। "কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ" এই সমাস হয়।

শি। সমাস হয় কেন ?

গু। ও তিনে সন্ধি হয় না ব'লে।

শি। কে বল্লে সন্ধি হয় না ?

গু। সন্ধি যদি হ'ত, তা হ'লে সন্ধি কর্‌বার এত প্রাণপণ চেষ্টা হ'ত না।

শি। সমাস হয় কি রকম ?

গু। যে যে-রকম ভাবে নেয়, সেই-রকম। খৃষ্টানরা হয় ত মনে করবে, ওট হচ্ছে দ্বন্দ্ব; মুসলমানরা তৃতীয়া-তৎপুরুষ; আর হিন্দুরা অব্যয়ীভাব।

শি। খৃষ্টানরা অবশ্য ওটকে "দ্বন্দ্ব" ভাবে, কেন না তারা তাই চায়। কিন্তু তৃতীয়া-তৎপুরুষ হয় কি ক'রে ?

গু। কংগ্রেস ও খিলাফতের ভিতর একটা "দ্বারা" বসিয়ে দেও, তা হলেই বুঝতে পারবে।

শি। হিন্দুরা যে ওটিকে "অব্যয়ীভাব" ভাববে, এ অনুমান করছেন কিসের থেকে? No-change থেকে?

গু। না। সূত্র থেকে। "নপুংসকমব্যয়ীভাবে"—এ সূত্র কি ভুলে গেছ?

শি। দেখুন মহাশয়, আপনার কাছে যা একটা সমাস, আমার কাছে তা একটা সমস্যা।

গু। সমাসমাত্রেই সমস্যা।

শি। কি রকম?

গু। একাধিক শব্দকে একত্র করলেই তারা মিলেজুলে এক হয় না। বহুকে এক করবার জন্য তাদের ভিতর বিভক্তি ঢুকিয়ে দিতে হয়; যাতে ক'রে তাদের পরস্পরের ভিতর সম্বন্ধটা স্পষ্ট হয়। আর সমাসে পাওয়া যায় কথার শুধু সম্পর্ক, সম্বন্ধ নয়।

শি। সম্পর্ক ও সম্বন্ধ আলাদা?

গু। অবশ্য। ইঁটের পাশে ইঁট বসালে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে আনলেও তাদের ভিতর কোন সম্বন্ধ জন্মায় না। স্পর্শন ও বন্ধন এক ক্রিয়া নয়।

শি। দু'খানি ইঁটের মধ্যে চূণসুরকি পূরে দিলেই ত তাদের ভিতর বন্ধন হয়?

গু। ঐ চূণ-সুরকির নামই ত বিভক্তি।

শি। আপনি বলতে চান যে, যাতে বিভাগ করে, তাতেই সংযোগ করে?

গু। সংসারের নিয়ম এই, ত আমি করব কি? আমি যদি বিধাতা হতুম ত এ বিশ্ব এক এক সময়ে এক এক নিয়মে চালাতুম। প্রথমে হুকুম দিতুম শুধু যোগ। তাতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাল পাকিয়ে যেত। আর তখন ঐ একটা প্রকাণ্ড নিরেট পঞ্চভূতের গোলা ছাড়া এ বিশ্বে আর কিছুই থাকত না। সেই গোলা নিয়ে কিছুদিন খেলা করতুম। তার পর যখন বিরক্ত ধরত, তখন বিয়োগের হুকুম দিতুম। আর অমনি পরমাণুতে পরমাণুতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত, আর তারা সব ঊর্দ্ধশ্বাসে পরস্পরের কাছ থেকে পালিয়ে যেত, আর এই বিশ্বটা একদম ধুলো হয়ে যেত; আর আমি তখন গোলাখেলা ছেড়ে ধুলো-খেলা করতুম। তার পর আবার—

শি। থামুন মশায়! আপনি বিধাতা হ'লে কি করতেন, তা শুনে আমার কোনও লাভ নেই, যেহেতু, আপনি বিধাতা নন। এখন যে কথা হচ্ছিল, তাতে ফিরে আসা যাক্।

গু। কথা হচ্ছিল এই যে, বিভক্তিহীন কথার পাশে পাশে বিভক্তিহীন কথা বসালে ঐ দুই প্রতিবাসীর ভিতর সম্বন্ধটা শত্রুতার কি মিত্রতার, তা বোঝা শক্ত। এক কথায়, সমাস মাত্রেই সমস্যা।

শি। একটা উদাহরণ দিন।

গু। একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ দিই। ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার তিনমুখো ও ছ'চোখো ছেলের মাথা তিনটে কেটে ফেললেন, তখন ত্বষ্টা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বৃত্রকে এই ব'লে আশীর্ব্বাদ করলেন যে,—'ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব'। বলা বাহুল্য যে,'ইন্দ্রশত্রু' সমাসটি তৎপুরুষও হ'তে পারে, বহুব্রীহিও হ'তে পারে। তৎপুরুষ হ'লে, ওর মানে হয় "ইন্দ্রের বধকারী হয়ে বর্দ্ধিত হও"; আর বহুব্রীহি হ'লে, ওর মানে হয় "ইন্দ্র যার বধকারী, সেই তুমি বর্দ্ধিত হও।" বাপ সমাসটা ব্যবহার করেছিলেন তৎপুরুষ হিসেবে, ছেলে বুঝলে তা বহুব্রীহি হিসেবে। ফল যা হ'ল, তা হেমবাবুর বৃত্রসংহারেই দেখতে পাবে।

শি। এ সব আপনি পান কোথায়?

গু। শাস্ত্রে।

শি। আপনি কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন কেন? আপনি কি চান যে, আমরা আবার কেঁচে শাস্ত্রশাসিত হই?

গু। মানুষ শাস্ত্রশাসিত না হ'লে, শস্ত্রশাসিত হয়। এ দুয়ের ভিতর কোন্ শাসন ভাল, তা তোমরাই বিচার করো।

শি। আপনি দেখছি মহা ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছেন, এ মতিভ্রম আপনার কেন হ'ল বলুন ত?

গু। মহা শূদ্র হওয়ার চাইতে মহা ব্রাহ্মণ হওয়া শ্রেয়ঃ ব'লে। আর দেখতে পাচ্ছি যে, দেশের লোক ঐ প্রথমোক্ত মহত্ত্বলাভের জন্য লালায়িত।

শি। আচ্ছা, আপনি গায়ত্রী জপুন। আমার সমস্যাটা কি, তা একবার শুনবেন?

গু। বল, শুনছি।

শি। আমি কংগ্রেস মানে বুঝি রাজনীতি, আর খিলাফৎ মানে বুঝি ধর্ম্মনীতি। অতএব এ দুয়ে মিলে যে স্বরাজ হবে, তার ভিতর থাকবে রাজধর্ম্ম, না ধর্ম্মরাজ?

গু। ও দুই ত এক। ও দুয়ের ভিতরেই রাজও আছে, ধর্ম্মও আছে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই। দুয়ের ভিতর যা তফাৎ, সে স্বধু ও দুই জিনিষের আগে পিছু বসাতে।

শি। কিন্তু কোন্‌টা আগে আসে, কোন্‌টা পিছুতে থাকে, তার উপরেই ত সব নির্ভর করে। ঘোড়া আগে, গাড়ী পিছুতে, আর গাড়ী আগে, ঘোড়া পিছুতে,—এ দুই বন্দোবস্তই সমান।

গু। অবশ্য নয়। কিন্তু আমি যাকে বলি ঘোড়া, তাকে তুমি যদি বল গাড়ী এবং vice versa, তা হ'লেই সমস্যার আর মীমাংসা হয় না।

শি। এখন আপনার মতে রাজ ও ধর্ম্ম, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত?

গু। তা লোকে নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে স্থির করবে। তবে আমাদের পলিটিকাল রাজ্যটা যে প্রধান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শি। কেন?

গু। সমগ্র হিন্দুস্থানের এক স্বরাজ্য হ'তে পারে, কিন্তু এক স্বধর্ম্ম হ'তে পারে না; এই জন্যে ধর্ম্মের বিয়োগের উপর রাজ্যের যোগ প্রতিষ্ঠা হবে।

শি। আপনি আমাদের পলিটিকাল সমস্যার যে মীমাংসা করলেন, তাকে ইংরেজিতে কি বলে জানেন?

গু। কি?

শি। Paradox.

গু। অর্থাৎ Orthodoxyর সঙ্গে heterodoxy মেলালে যা হয়?—আমি ত ওই মিলনই চাই।

বীরবল।

শোক-নৈবেদ্য।

১

হে অরূপ, মুক্ত আত্মা নমি যুক্তকরে,
স্তম্ভিত শোকাশ্রু, তব গুণকীর্ত্তি স্মরে।
অন্ধকার বঙ্গভূমি আলোকি উদিলে তুমি,
নিয়ন্তার-নিয়োজন সাধিবার তরে!

২

শুভ্র সৌম্য শান্তমূর্ত্তি? আহা কি সুন্দর।
বিধাতার মূর্ত্তিমান্ আশীর্ব্বাদ-বর?
এমন মহান্ মতি— সরল সত্যের জ্যোতি?
উদয়-শিখরে যেন দেব-দিবাকর!

৩

নিখিল প্রেমিক ছিলে দয়ার সাগর!
কারে না জানিতে শত্রু না মানিতে পর?
আসিত কাছে যে কেহ, তাহারেই দিতে স্নেহ
এক বিন্দু মলিনতা না ছিল ভিতর!

৪

জনমি দেবাত্মাগৃহে হে কুলপাবন,
কর্ম্মেতে করিলে ধন্য ধর্ম্মের ভবন।
সাহিত্য সুগীত গন্ধে সাজালে মোহনছন্দে,
মহোৎসব দৃশ্য, বিশ্ব আনন্দ-মগন।

৫

কিন্তু হায়! ব্যর্থ যে এ উৎসব জনতা।
এ মিলনে বাণী, গার্গী, লীলাবতী কোথা?
ভারতললনা হায় অন্ধকূপে মৃতপ্রায়!
জলিল হৃদয়ে তব দ্যায়ানল ব্যথা!

৬

বেদনামথিত মন্ত্র শুদ্ধ সত্যশ্লোক,
উচ্চারি জাগালে, দেব, মোহসুপ্ত লোক!
পুণ্যরণে হয়ে ব্রতী, একা তুমি মহারথী,
বাজালে বিজয়ভেরী, কল্যাণ-সাধক!

৭

মূর্খে করে আর্ত্তনাদ দৈব গায় জয়!
দলে দলে এল শিষ্য বীর সহৃদয়!
বন্দিনী হইল মুক্ত, হৃদয় আশ্বাসযুক্ত,
মরমে পরমশক্তি সত্যভক্তিময়!

৮

জীবনের কায তব হ'ল সমাপন,
সাধনে লভিলে সিদ্ধি, ব্রত-উদ্‌যাপন।
আজ মোরা কাঁদি ঘিরে, তুমি ত না চাও ফিরে,
আনন্দে চলেছ শূন্য পুরাবারে কোন্?

৯

যাও তবে পুণ্যলোকে যাও মহাপ্রাণ,
সুকৃতি তোমারে যেথা করিছে আহ্বান।
জন্মান্তরে যেন, ভাই, আবার তোমারে পাই,
এই ভিক্ষা সকাতরে যাচি, ভগবান্।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিবেকানন্দ।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতীচ্যখণ্ডে হিন্দুজাতি, হিন্দুধর্ম্ম উপকথার মত একটা আজগুবি ব্যাপার ছিল বলিয়া অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাসের আলোচনা করিতেন অথবা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে হিন্দুজাতির সংস্রবে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয় ত বা সামান্য কিছু সংবাদ রাখিতেন। মোটের উপর পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুর কোন আদর ছিল না, হিন্দুধর্ম্মের কোন গৌরবও ছিল না। সভ্যতা, স্বাধীনতা ও জ্ঞানলিপ্সার আদর্শভূমি আমেরিকাতেও সে সময়ে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম উপেক্ষিতই হইত। ভারতবর্ষে হিন্দু নামে এক জাতি আছে, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া একটা তথাকথিত ধর্ম্মও বিদ্যমান বটে; কিন্তু তাহার স্বরূপ অথবা গৌরব আছে কি না, তাহা জানিবার স্পৃহা কাহারও ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু পাশ্চাত্য দেশের কথা কেন, আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষের যে সকল জ্ঞানী মানী মনীষী য়ুরোপ অথবা আমেরিকায় যাইতেন, তাঁহাদের কয়জনই বা বিদেশে হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্ম্মের অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? প্রতীচ্যের দীপ্ত সভ্যতালোকে তাঁহাদেরও নয়ন-মন তখন অভিভূত, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কাযেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরববার্ত্তা সে দেশে তেমন করিয়া পৌঁছে নাই।

সে কার্য্য যাহার তাহার সাধ্যায়ত্তও ছিল না। এত বড় একটা বিরাট জাতির বৈশিষ্ট্য, এমন একটা মহান্ ধর্ম্মের বিশ্বজনীন বাণীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বিশ্বমাঝে স্থাপন করিবার মত শক্তিধর ভারতীয় তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রবল প্রবৃত্তিমার্গের পথিক যাহারা, তাহাদের কাছে নিবৃত্তিমূলক সনাতন ধর্ম্মের মহান্ সত্যকে প্রচার করিবার অধিকারী ত ভোগী নহেন। ত্যাগী, সংযতেন্দ্রিয়, অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যের দ্বারা সে কার্য্য সম্ভবপর নহে। তাই যেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীক্ষায় যুগযুগস্থায়ী সনাতন ধর্ম্ম তপস্যা করিতেছিল। বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর নরেন্দ্রনাথ, যুগাবতার পরমহংসদেবের প্রিয়তম শিষ্য, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, কর্ম্মযোগী, স্বামী বিবেকানন্দ বিরাট ধর্ম্মের মহান্ সত্যকে প্রচার করিবার জন্য যেদিন আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, সে দিন ভারতবর্ষের পক্ষে চিরস্মরণীয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সিকাগো মহাধর্ম্ম-সম্মিলনের কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। পৃথিবীর ১ শত ২০

কোটি মানবের ধর্ম্মগুরু, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা, মনীষী ধর্ম্মযাজকগণ সেই বিরাট ধর্ম্ম-সম্মিলন-ক্ষেত্রে সমবেত! ৬।৭ হাজার নরনারী—জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা-সমূহ ধর্ম্মালোচনার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ধর্ম্মব্যাখ্যার জন্য—হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপ ধর্ম্মের তত্ত্ব-কথা শুনাইবার জন্য বসিয়া আছেন! এ দৃশ্য কি ভুলিবার?

একদিনেই বিশ্ব-জয় হইয়া গেল। নবীন সন্ন্যাসীর একটি বক্তৃতাতেই সমগ্র আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু-জাতির গৌরব-প্রতিষ্ঠার বোধন হইয়া গেল। বিস্ময়-মুগ্ধ পাশ্চাত্য জাতি বুঝিল, হিন্দুধর্ম্ম উপেক্ষণীয় নহে—তাহার মধ্যে বিশ্ব-জনীন সত্য, মহান্ উদারতা, অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সিকাগো মহা-ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিবার পর হইতে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের—বিশ্বব্যাপী মানবধর্ম্মের তত্ত্ব-সমূহের প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারত-বর্ষের কোনও ধর্ম্মপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া এমন নির্ভীকভাবে, সরলচিত্তে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে পারেন নাই; কাযেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য তখন সিদ্ধ হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণে আমেরিকার নর-নারীরা ক্রমে এমনই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার প্রতিকৃতি সিকাগো নগরের বিবিধ স্থানে সংস্থাপিত হইল। সমগ্র সভ্যজগতে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া গেল।

এক বৎসর ধরিয়া স্বামীজী আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিবার ফলে অনেকগুলি নর-নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি আট-লান্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিসি-সিপী নদীর তীর-বর্ত্তী যাবতীয় প্রসিদ্ধ নগরে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক নগরে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। শুধু বক্তৃতায় বিশেষ কায হইবে না, একটা আশ্রমস্থাপনও প্রয়োজনীয়, এই চিন্তা এই সময় তাঁহার চিত্তে প্রথম সমুদিত হয়। তদনুসারে তিনি স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে একটা বাসা লইয়া শিষ্যগণকে ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য, সকল শিষ্যই এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহাদিগকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকেই ধ্যান-শিক্ষা দিতেন। অবশিষ্ট শিষ্যগণের নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন; বেদান্ত শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার

স্বামী সারদানন্দ।

আরব্ধ কার্য্য ভবিষ্যতে যাহাতে অব্যাহত থাকে, এই জন্যই স্বামীজীর এই প্রচেষ্টা।

স্বামীজী নিউ-ইয়র্কের এই শিক্ষা-শ্রেণীতে প্রধানতঃ রাজযোগ ও জ্ঞান-যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও অসাধারণত্বপূর্ণ। তাঁহার কোনও জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন যে, "এই শিক্ষাগারটি অনেক পরিমাণে একটি মঠের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল।"

স্বামী বিবেকানন্দের য়ুরোপীয় শিষ্যবর্গের মধ্যে ম্যাদাম মেরী লুই নাম্নী একজন ফরাসী রমণী, ডাক্তার ষ্ট্রীট ও হার লিওঁল্যান্সবর্গ নামক জনৈক রুসীয় ইহুদী বিশেষ প্রসিদ্ধ, স্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের পর ইঁহাদের নাম হইয়াছিল, স্বামী

মিস্ মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা)

অভয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ।

প্রচারকার্য্যের সহায় হইবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অন্যতম গুরু-ভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় যাইবার জন্য আহ্বান করেন। তিনিও স্বামীজীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রথমতঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে—স্বামী বিবেকানন্দ প্রাণপণ পরিশ্রম সহকারে আমেরিকায় বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া বহু সহস্র প্রতীচ্য নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

বেদান্ত প্রচারের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া স্বামীজী লণ্ডনে গমন করেন। যাইবার সময় তিনি মার্কিন শিষ্যগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া যায়েন যে,

ইংলণ্ডে যাইয়াই তিনি গুরু-ভ্রাতা সারদানন্দ স্বামীকে নিউইয়র্কে পাঠাইয়া দিবেন। সেই বৎসর জুন মাসে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় প্রচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডেও প্রচারকার্য্য বেগে চলিয়াছিল। এই স্থানেই মিস্ মার্গারেট নোবল (উত্তরকালে ইনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন) তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত, সেই সময় স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ প্রভৃতি আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক ব্যতীত বাফেলো ও ডেট্রয়েট নামক দুইটি স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছিল।

লণ্ডনে অবস্থানকালে তত্রত্য প্রচার-কার্য্যের জন্য বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে ডাকিয়া পাঠান। স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে স্বামী অভেদানন্দই লণ্ডনে প্রচার কার্য্য চালাইবেন। যথাসময়ে অভেদানন্দ স্বামী লণ্ডনে পৌঁছিলেন। বিবেকানন্দ গুরু-ভ্রাতাকে কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত উপদেশাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম, উপাদেয় সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্যানফ্রান্সিস্কোর শান্তি-আশ্রম।

স্বামীজী যখন লণ্ডনে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত, সেই সময় স্বামী সারদানন্দ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গীতা, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার নিপুণ ব্যাখ্যা ও প্রাণপণ চেষ্টায় শিষ্যের সংখ্যাও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শত শত নরনারী স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত হিন্দু-ধর্ম্মের পতাকা-তলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। গীতার মহিমা, বেদান্তের প্রভাব ক্রমে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিতে লাগিল।

এ দিকে লণ্ডনে প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় তিনি "বেদান্ত সোসাইটীর" ভিত্তি তথায় সংস্থাপন করেন। ৩৯নং ষ্ট্রীটে দুইটি বৃহৎ ঘর ভাড়া করিয়া উহাতেই তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র করিয়াছিলেন। উল্লিখিত দুইটি গৃহে দেড় শতেরও অধিক শিষ্য বসিতে পারিতেন। এখন হইতে সপ্তাহে ১৭টি ক্লাস হইত।

আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া, সারদানন্দ স্বামীর উপর তত্রত্য কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া স্বামী

বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লণ্ডনে পুনরায় গমন করেন। স্বামী অভেদানন্দ তখন প্রবল উদ্যমে লণ্ডন নগরে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছিলেন। বিবেকানন্দ দেখিলেন যে, তিনি যদি এ সময়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আমেরিকা ও লণ্ডন উভয় স্থলের প্রচার-কার্য্য সুচারুরূপেই চলিবে; স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উত্তমরূপেই সোসাইটীর কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।
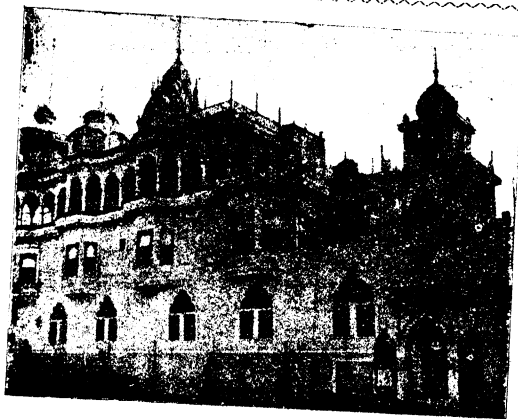
শান্তি-আশ্রমের প্রবেশ দ্বার।

উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎকাল পরে বিবেকানন্দ দেখিলেন যে, সারদানন্দ স্বামীকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া না আনিলে এখানকার কার্য্য কোন কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকিবে। তখন তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে আমেরিকায় যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী সারদানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট নিউইয়র্কে গিয়া Mott Memorial Hallএ ৭ মাসে ৯০টি বক্তৃতা করিয়া বেদান্ত সোসাইটীকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন ও ক্রমে উহাকে incorporate করাইয়া স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিলেন, সেই অবধি নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটী legally organised হইল।

এই সময় তিনি অনেক আমেরিকার নর-নারীকে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের হিন্দু নাম দিয়াছেন, যথা—গুরুদাস, রামদাস, শিবদাস, হরিদাস, শঙ্করী, শিবানী, মহাদেবী, সত্যপ্রিয়া ইত্যাদি। তন্মধ্যে গুরুদাস তাঁহার প্রথম শিষ্য। ইনি এক্ষণে বেলুড় মঠে অবস্থিতি করিতেছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর চিত্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রচার-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয়বার য়ুরোপঅভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লণ্ডনে কিছুদিন বাস করিবার পর স্বামীজী নিউইয়র্কে গমন করেন। সোসাইটীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বিবেকানন্দ শিষ্যবর্গকে নানাবিধ উপদেশাদি প্রদান করিতে থাকেন। অভেদানন্দ স্বামী তখন প্রচার-কার্য্যে নানা স্থলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর আগমন সংবাদ

স্বামী তুরীয়ানন্দ।

স্বামী ত্রিগুণাতীত।

পাইয়া তিনিও তাঁহার সহিত নিউইয়র্কে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

গুরু-ভ্রাতার নিকট বেদান্ত-প্রচার-কার্য্যের অসাধারণ সাফল্যের সংবাদ পাইয়া বিবেকানন্দ হৃষ্ট হইলেন। তিনি আরও জানিতে পারিলেন যে, নিউইয়র্কে "বেদান্ত-সমিতির" একটি স্থায়ী বাটীর ব্যবস্থা অচিরে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। স্বামী অভেদানন্দ যেরূপ প্রাণপণ করিয়া প্রচার-কার্য্য চালাইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া বিবেকানন্দ পরম পরিতোষ লাভ করেন।

অক্টোবর মাসে বেদান্ত-সমিতির নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হইল। পর সপ্তাহ হইতে রীতিমত বক্তৃতা ও উপদেশাদি দানের কার্য্য চলিতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্ত-সমিতির গুরুকার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত children's classএ বালক-বালিকাদিগকে হিতোপদেশ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার উদার ও সমুন্নত চরিত্রমাধুর্য্য স্বল্পকালের মধ্যেই জনসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট করিল। তাঁহার যোগশক্তি, এবং দর্শনশাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যাপ্রণালীর জন্য চারিদিক্ হইতে তিনি অজস্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া কালিফোর্ণিয়া গমনের জন্য তত্রত্য বন্ধু ও শিষ্যবর্গ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনিও সে অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। স্যানফ্রান্সিস্কো ও লস্ এঞ্জেলেস্ প্রভৃতি স্থানে স্বামীজী বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রশান্ত মহাসাগর-কূলে স্যানফ্রান্সিস্কো নগরে এই সময় প্রথম বেদান্ত-সভা স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ ভাড়াটীয়া বাটীতেই ক্লাস বসিত। সেইখানেই স্বামীজী শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে ১ শত মাইল দূরে মাউণ্ট হ্যামিল্টন্ নামক স্থানে মিস্ মিনী বুক্ নাম্নী স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্যা ১ শত ৬০ একর ভূমি স্বামীজীকে প্রদান করেন। এই

স্বামী পরমানন্দ।

বিস্তৃত ভূমিখণ্ড উপহার পাইয়া তদুপরি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা বিবেকানন্দের হৃদয়ে জাগ্রত হয়। তিনি এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিউইয়র্ক হইতে তুরীয়ানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া পাঠান। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরু-ভ্রাতার আহ্বানে সত্বর তথায় গমন করেন এবং দ্বাদশ জন শিক্ষার্থীর সাহায্যে ঐ উপহৃত ভূমির উপর "শান্তি আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করেন।

লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে—নির্জ্জন প্রদেশে, শিক্ষার্থীরা যাহাতে বেদোক্ত যোগ, জ্ঞান, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অভ্যাস করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের যোগচর্চ্চায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংসারের কোলাহলের মধ্যে মানুষ কখনই নিরুদ্বেগে ভগবানের আরাধনা করিতে পারে না। "শান্তি আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইল। শিক্ষার্থীরা এখানে পরমানন্দে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার অবকাশ পাইলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ।

"শান্তি আশ্রম" প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি মহাসমাধি লাভ করেন।

তাঁহার দেহাবসানের পরও তদীয় গুরু-ভ্রাতারা আমেরিকায় প্রচার-কার্য্য অখণ্ড উৎসাহ সহকারেই চালাইতে লাগিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদা মহারাজ) আমেরিকায় গমন করেন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে প্রচার-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। স্যানফ্রান্সিস্কো নগরে গমন করিয়া ত্রিগুণাতীত স্বামী গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। প্রতি রবিবারে তিনি শিক্ষার্থীদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষাও প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের প্রচারকার্য্য এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তিনি একা সমস্ত কার্য্য চালাইতে না পারায়, স্বামী নির্ম্মলানন্দকে (তুলসী মহারাজ) আহ্বান করিলেন। তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে পৌছিয়া তথাকার বেদান্ত-সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ Ved..nta Monthly Bulletin নামে বেদান্ত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বোষ্টন, ওয়াশিংটন, পিটাসবার্গ প্রভৃতি সহরে বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত স্থানে বেদান্ত-সমিতির কার্য্যের জন্য স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, স্বামী বোধানন্দকে আহ্বান

করিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল অভাবনীয় উদ্যমের সহিত আমেরিকায়, লণ্ডনে ও প্যারিসেও বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আরও কয়জন স্বামীকে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে আগমন করেন। সেইবার তিনি কলম্বো

বার্কশায়ারের বেদান্ত আশ্রম।

হইতে সিংহলের বড় বড় সহরে এবং ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ৭ মাস বক্তৃতাদি দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের যুবকশিষ্য স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করেন। নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের নিকট দুই বৎসর শিক্ষা করিয়া পরমানন্দ বোষ্টন সহরে বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন, স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক হইতে এক শত মাইল দূরে বার্কশায়ার পর্ব্বতের উপত্যকায়, দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল (৩২০ একর) পরিমিত স্থানে বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করিলেন। এই আশ্রমে, বৃক্ষতলে বসিয়া স্বামী অভেদানন্দ গীতা, বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে

বোষ্টনের বেদান্ত কেন্দ্র।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদ্যোগে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রচারকার্য্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত তখন একা এত বড় বৃহৎ কার্য্য চালাইতে পারিতেছিলেন না। স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিউইয়র্ক সহরে গমন করেন। উভয়ে মিলিয়া নবোৎসাহে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ও প্রকাশানন্দ স্বামীর সমবেত চেষ্টায় "Voice of Freedom" (স্বাধীনতার বাণী) নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়। এই মাসিকের সাহায্যে প্রচারকার্য্যও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীত দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর হইতে স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দুমন্দিরের সমুদায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী
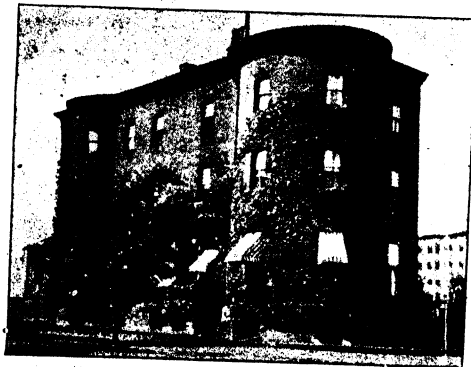
গীতা, উপনিষদ, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থিগণকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া থাকেন। শুধু অধ্যাপনা নহে, সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধেও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হয়। তথায় ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার বহু নর-নারী দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম ও পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রচারকার্য্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আরও কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসীর আমেরিকাগমন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী প্রকাশানন্দ সম্প্রতি এক জন সন্ন্যাসীকে কালিফর্ণিয়ায় লইয়া যাইবেন। নিউ-ইয়র্ক কেন্দ্রের জন্য অপর এক জন সন্ন্যাসীও প্রেরিত হইবেন।

প্রতি কেন্দ্রেই রীতিমত শিক্ষার্থী ২ শত হইতে ৩ শত। এতদ্ব্যতীত শত শত শিক্ষার্থী উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়া থাকেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র তিনটি।

(১) স্যানফ্রান্সিস্কো (কালিফর্ণিয়া)
(২) নিউইয়র্ক
(৩) বোষ্টন।

নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির ভার স্বামী বোধানন্দের উপর অর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ কানাডা, আলেস্কা এবং মেক্সিকো পর্য্যন্ত ভ্রমণ ও নানা স্থানে বেদান্তের বীজ বপন করিয়া, স্যানফ্রান্সিস্কো ও লস এঞ্জেলেস্‌এ নূতন বেদান্ত আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রচারকের অভাবে ঐ সমস্ত কেন্দ্র স্বামী অভেদানন্দ স্থায়ী করিতে পারেন নাই। সেই অভাব দূর করিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ পুনর্ব্বার ভারতে আসিয়াছেন এবং প্রচারক-সংগ্রহের জন্য কলিকাতা সহরে এক শিক্ষালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছেন। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষিত হইয়া প্রচারকগণ বেদান্তের পতাকা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবেন। যে ধর্ম্মেই ভারতবাসী হিন্দুর গৌরব—যে ধর্ম্মোপদেশের জন্য ভারতবর্ষ এক দিন সমগ্র জগতের শিক্ষাগুরুর ও দীক্ষাগুরুর আসন অধিকার করিতে পারিবে—যে ধর্ম্মের আলোকে জড়বাদোপাসক প্রাচীন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে এবং স্বার্থসর্ব্বস্ব সমাজে উদারতার ভিত্তির উপর প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে, সেই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কি ভারতবর্ষে লোকের অভাব হইবে? আশা করি, হিন্দুর এখনও তত অধঃপতন হয় নাই।

নিউইয়র্ক কেন্দ্রের ভার স্বামী বোধানন্দের উপর অর্পিত। বোষ্টন কেন্দ্রের ভার স্বামী পরমানন্দ লইয়াছেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ বলেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে, যখন আমেরিকার প্রত্যেক বড় নগরে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের প্রচারের ফলে আমেরিকার অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বহু মার্কিণ, ভারতবর্ষকে তীর্থক্ষেত্রের মত মনে করেন। তীর্থ-যাত্রায় ভক্তের হৃদয়ে যেমন বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভূত হয়, বহু মার্কিণ ভারতবর্ষে আগমনকে তেমনই পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আজ আমেরিকা-বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে। ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের সাধনা জয়-যুক্ত হইতে চলিয়াছে! ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরবের কথা, আনন্দের বার্ত্তা!

প্রিয়ার মান।

(কোলরীজ)

চক্ষে দেখিতে নহে সে শ্রীমতী গরবিণী রাজবালার মত
প্রেমভরে যবে চাহিল প্রথম বুঝিনু আহা সে রূপসী কত?
দেখিনু মরি সে কত মনোরমা দেবগেহে যেন গন্ধধূপ,
উজ্জ্বল তার আঁখি-তারা, তারা আলোর ফোয়ারা রসের কূপ।
আজি তার দিঠি কুণ্ঠাজড়িত উদাসীন প্রেম-করুণাহারা
চ'লে গেছে সে যে দূর,দূরতর,প্রেমের প্রলাপে দেয় না সাড়া।
তবু আমি দেখি তাহার আঁখিতে মাধুরীদীপ্তি তেমনি জাগে
রূপসীগণের হাসিরাশি চেয়ে তাহার ভ্রুকুটি মধুর লাগে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বাঙ্গালায় ব্যয়-সঙ্কোচ।

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনফলে বাঙ্গালার সরকারের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছিল। পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পায়, শাসন-সংস্কারের ফলে বাঙ্গালা সরকারে খরচ এইরূপ বাড়িয়াছে :—

শাসন-পরিষদের ১ জন সদস্য	৬৪ হাজার টাকা
৩ জন মন্ত্রী	১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি	৩৬ হাজার টাকা
ঐ সহকারী সভাপতি	৫ হাজার টাকা
কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী	৩৩ হাজার টাকা
চীফ-সেক্রেটারীর অফিসে ১ জন ডেপুটী সেক্রেটারী	২৬ হাজার ৪ শত টাকা
২ জন সহকারী সেক্রেটারী	১০ হাজার ৬ শত ২০ টাকা
আইন বিভাগে ডেপুটী সেক্রেটারী	১৮ হাজার টাকা
শাসন-পরিষদের ১ জন সদস্যের ও ৩ জন মন্ত্রীর সফরের খরচ	১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫ শত টাকা
ব্যবস্থাপক সভার ছাপা কাগজ প্রভৃতি	৫০ হাজার টাকা
অতিরিক্ত কেরাণী	৩৭ হাজার ২ শত ৪০ টাকা
মোট	৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা

বাঙ্গালা সরকারের আয়ে ব্যয় কুলান অসম্ভব হওয়ায় সরকারকে কর বাড়াইতে হইয়াছে এবং কর বাড়াইয়াও দেশের কল্যাণকর কার্য্যে আবশ্যক অর্থের অভাব ঘুচে নাই। সে দিনও বাঙ্গালার গবর্ণর বীরভূমে যাইয়া বলিয়াছেন, এবার উত্তর-বঙ্গে বন্যায় অর্থ-সাহায্য করিবার প্রয়োজন হওয়ায় বীরভূমে লোকহিতকর কার্য্যের জন্য ধার দিতে সরকারের তহবিলে লক্ষ টাকাও নাই।

বাধ্য হইয়া সরকার ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় নির্দ্ধারণকল্পে এক সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে সমিতির সদস্য—

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
সার ক্যাম্পবেল রোডস
রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
মিষ্টার এইচ, ই, স্প্রাই

এই সমিতির নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমিতি নিম্নলিখিত বিভাগে এইরূপ ব্যয়হ্রাসের প্রস্তাব করিয়াছেন—

আবগারী ও লবণ	৫০২২০০
বনবিভাগ	৮৭০০
রেজিষ্ট্রেশন	৭২৬৬০
গবর্ণরের কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের খরচ	১২০০০০
কাউন্সিলের সদস্য ও মন্ত্রিবর্গ	২১৬০০০
ব্যবস্থাপকসভা	২৭৫০০
সেক্রেটেরিয়েট	৪৫৫৯০০
রেভিনিউ বোর্ড	২৫০০০
বিভাগীয় কমিশনার	৫২০০০০
জেলা শাসন	৪১০০০০
দেওয়ানী ও দায়রা	১১৫০৭০০
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট	১৭০০০
ছোট আদালত	৪৮০০
লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার	১৫০০
বেঙ্গল পুলিস	২৬২৮৮০০
কলিকাতা পুলিস	৮১৩৫০০
শিক্ষা বিভাগ	৩৫৯৮৮০০
ডাক্তারী বিভাগ	২৯৫৫০০
স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাস্থ্য শাখা	২৭৬৬০০
ঐ ইঞ্জিনীয়ারিং	৭৫৬০০
সিভিল ভেটারনারী	৯৫৫৫০
কৃষি	২৯২৩০০
রেশম চাষ	১৯০০০
কোঃ অপারেটিভ সোসাইটী	২৬৬৬০০
শ্রমশিল্প বিভাগ	৩০৭৬০০
মৎস্য বিভাগ	৮২০০০
অন্যান্য খুচরা বিভাগ	৮০০০০
পূর্ত্ত বিভাগ	৮০০০০০
ষ্টেশনারী ও ছাপাই	২১০০০০
চাকুরীয়াদের বেতন	৯০০০০০
শৈল-বিহার, ছুটী ও কামাই	২১০০০০

রাহা খরচ ও অন্যান্য ভাতা	৭০০০০০
জলযান	২০০০০০
ভাড়াটে বাড়ী ও টেলিফোন	১২৬৫০০
ত' খরচা	১০০০০০০
মোট—	১৬৫০৯৭১০

আয়বৃদ্ধি

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ে এইরূপ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা ;—

সেটেলমেণ্টের ফলে	৯০০০০০
রেজিষ্ট্রেশন	২০০০০০০
সেচ বিভাগ	৩৫০০০০
দেওয়ানী ও দায়রায়	১৯০০০০
ডাক্তারী বিভাগ	৫০০০০
স্বাস্থ্য বিভাগ, ইঞ্জিনীয়ারিং	৭৫০০০
সিভিল ভেটারনারী	১৮০০০
রেশম চাষ	৫২০০০
শ্রমশিল্প	৭০০০
মোট	৩১৪২০০০ টাকা।

উল্লিখিত ভাবে ব্যয়সংক্ষেপ করিলে ও ঐরূপ আয়-বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালা সরকারের ১৯৬৫১৭১০ টাকা বাঁচিয়া যাইবার কথা। কিন্তু শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের ৬২৫৮০০ টাকা আয় কমিয়া যাইবে। তাই কমিটী মনে করেন, তাঁহাদের উপদেশমত কায করিলে মোট ১৯০২৫৯১০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

নির্দ্ধারণের মোট কথা উপহার দিতেছি—

(১) লবণ ও আবকারী বিভাগে বার্ষিক ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার উপর কমান যাইতে পারে। এই বিভাগে ২ জন ডেপুটী-কমিশনারের পদ লোপ করা সম্ভব।

(২) রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে খরচ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা কমান সম্ভব। এই বিভাগের ইনস্পেকটার জেনারলের পদ তুলিয়া দিয়া বিভাগের ভার আবকারীবিভাগের কমিশনারকে দেওয়া যায়।

(৩) সাধারণ বিভাগে ব্যয় কমান সম্ভব—

(ক) গভর্ণরের খাস কর্ম্মচারী বাবদে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। গভর্ণরের শরীররক্ষী তুলিয়া দিলে এই টাকাটা বাঁচিয়া যায়। লাট-প্রাসাদে পাহারার কায বাদ দিলে বৎসরে কেবল ২বার শোভার্থ শরীররক্ষী ব্যবহৃত হয়। এ ব্যয় নিবারণ করা সম্ভব।

(খ) শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীর বাহুল্য কমাইয়া বৎসরে ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস করা যায়, সমিতির রিপোর্টে বলা হইয়াছে।

অনেকেই বলেন, সরকারের কাযে ৪ জন সভ্য ও ৩ জন মন্ত্রীর প্রয়োজন নাই। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ১ জন গভর্ণর ও ৩ জন সভ্যেই কায চলিত। যদি স্বীকার করা যায়, শাসন-সংস্কারে নূতন ব্যবস্থায় ও বিস্তার-প্রাপ্ত ব্যবস্থাপক সভা-সংস্থাপনে কায বাড়িয়া গিয়াছে, তবুও এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শাসন-কার্য্যে ৪ জন প্রধান কর্ম্মচারী বৃদ্ধি সমর্থিত হইতে পারে না। কাযের তুলনায় এই সংখ্যা অত্যন্ত ও অপরিমিত অধিক। এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। কথা কেবল সংখ্যা-হ্রাসের পরিমাণ লইয়া। মোট ৪ জন হইলেই কায চলিতে পারে—২ জন মেম্বার (২ জনের ১ জন বে-সরকারী) আর ২ জন মন্ত্রী। তবে কমিটীর নির্দ্ধারণ বিচার জন্য এখন অতিরিক্ত ১ জন অভিজ্ঞ শাসনপরিষদ সভ্যের প্রয়োজন হইতে পারে। ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ৩ জন মেম্বার ও ২ জন মন্ত্রীর দ্বারাই কায করাইয়া পরে মোট ৪ জন রাখা চলিবে।

আমরা অবগত হইয়াছি,কমিটীর বাঙ্গালী সদস্যরা সকলেই মোট ৪ জন প্রধান কর্ম্মচারী রাখার পক্ষপাতী! কেবল মিষ্টার প্রাইয়ের সহিত রক্ষার হিসাবে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত আর ১ জন মেম্বার রাখার পক্ষে মত দিয়াছেন।

(গ) ব্যবস্থাপক সভার বার্ষিক ব্যয় ২৭ হাজার টাকা কমান যায়। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ইচ্ছা করিলে প্রশ্ন না-মঞ্জুর করিলে, ডেপুটী প্রেসিডেণ্টকে বিনা বেতনে কায করিতে হইবে স্থির হইলে, কেরাণীর সংখ্যা, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি কমাইলে এই টাকাটা বাঁচান যায়। ব্যবস্থাপক সভায় সময় সময় অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় বটে, কিন্তু সেই জন্য প্রশ্নের সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। সরকারী দপ্তরে কাগজপত্র যদি সুশৃঙ্খল থাকে এবং সরকার প্রশ্নের উত্তরে সরলভাবে যথার্থ কথা বলেন, তবে উত্তর

প্রস্তুত করিতে অধিক লোক প্রয়োজন হইবার কথা নহে।

(ঘ) দপ্তরখানায় মোট বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ কমান সম্ভব। পুলিস, মেডিক্যাল ও পাবলিক হেল্থ, শিক্ষা, আবকারী ও রেজিষ্ট্রেশন, জেল, পশুচিকিৎসা—এই সব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরা সরাসরি মেম্বার বা মিনিষ্টারের সঙ্গে পত্রব্যবহার করিলে মধ্যবর্ত্তী সেক্রেটারীগুলির আর প্রয়োজন হয় না। কৃষি, সমবায় ও শিল্প বিভাগে ১ জন মাত্র কর্ত্তা থাকিলেই চলিতে পারে। রাজস্ব দপ্তর এবং বোর্ড অব রেভিনিউ এক করিয়া ফেলাও সম্ভব। তাহা হইলে কেবল ৪ জন সেক্রেটারীর প্রয়োজন হইবে—

(অ) চীফ সেক্রেটারী—নিয়োগ ও রাজনীতিক বিভাগ

(আ) অর্থ সেক্রেটারী—অর্থ, বাণিজ্য ও সামরিক বিভাগ

(ই) বিচার বিভাগের সেক্রেটারী—বিচার বিভাগের ও লিগ্যাল রিম্যামব্রান্সার

(ঈ) স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সেক্রেটারী।

(ঙ) কমিশনার-পদ লোপ করিলে মোট ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ কমিবে।

(চ) মফঃস্বলে—জিলার শাসনপ্রণালীতে প্রায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ কমান যায়। ছোট ছোট জিলা এক করিয়া দেওয়া চলে। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসেও কর্ম্মচারীর স্থলে সাবর্ডিনেট সার্ভিসের লোক নিযুক্ত করিলে প্রায় ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা খরচ কমে—আর্দ্দালীর খরচও ৫ হাজার টাকা কমান যায়।

(৪) পূর্ত্ত বিভাগে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ২৫ হাজার টাকা আয় বাড়ান যায়।

(৫) বিচার-বিভাগে ১০ জন অতিরিক্ত জজের, ৫ জন সাব-জজের ও প্রায় ২২ জন মুন্সেফের পদ লোপ করা সম্ভব। সর্ব্বসমেত প্রায় ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত টাকা খরচ কমিতে পারে।

(৬) পুলিসের খরচ কমান সম্ভব—

(ক) বেঙ্গল পুলিসে—২৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত টাকা।

(খ) কলিকাতা পুলিসে—৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৫ শত টাকা।

পুলিসের সম্বন্ধে কমিটীর নির্দ্ধারণের আর একটু পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আমরা পুলিসের সফরাদি খরচের হিসাব পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি :—

(১) জিলা পুলিসে—

ষ্টীম লঞ্চে	১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা
রেলে "পাশে"	২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা
পথে ও রেলে গমনাগমন	১৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা
নৌকাভাড়ায়	১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা
নৌকা ক্রয়ে ও মাঝিমাল্লার বেতনে	১ লক্ষ টাকা
বাড়ী ভাড়ায়	২ লক্ষ টাকা

(২) প্রেসিডেন্সী পুলিসে—

রাজপথে গমনাগমনে	১ লক্ষ টাকা
বাড়ীভাড়ায়	৭১ হাজার টাকা
মোটর গাড়ীতে	৫ হাজার টাকা

এই স্থলে বলা প্রয়োজন—প্রেসিডেন্সী পুলিসের কার্য্যক্ষেত্র মাত্র ২০ বর্গমাইল; আর এই পুলিস বিনা ভাড়ায় ট্রামেও যাতায়াত করিবার অধিকার পাইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে থানার সংখ্যা ৪ শত ৫৩ ছিল; এখন হইয়াছে ৬ শত ৮৮। এই যে ২ শত ৩৫টি থানা বাড়ান হইয়াছে, তদন্ত সমিতি ইহা কমাইয়া দিবার পক্ষপাতী। সমিতির বিশ্বাস, ইহাতে শান্তিরক্ষার বা অপরাধী ধরিবার কোনই অসুবিধা হইবে না। সমিতি যে যে বাবদে খরচ কমাইতে চাহেন, সেই সকলের মধ্যে কয়টি :—

পুলিস ট্রেনিং স্কুলে	২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা
জল পুলিসে	২ লক্ষ টাকা
ক্রিমিন্যাল ইন্‌ভেষ্টিগেশন বিভাগে	৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা
জিলা পুলিসে	১১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত টাকা
সার্জ্জন ইনস্পেক্টার	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

কলিকাতা পুলিসে ডেপুটী কমিশনারের সংখ্যা কমাইয়া ৪২ হাজার ৪ শত টাকা ও সহকারী কমিশনারের সংখ্যা কমাইয়া ৮৯ হাজার ১ শত টাকা কমান সম্ভব। বাড়ীভাড়ার ৫৬ হাজার ৮ শত টাকা ও কাপড়চোপড়ে ৯৩ হাজার টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ করা সম্ভব।

(৭) শিক্ষাবিভাগের যে অংশ হস্তান্তরিত হওয়ায় নূতন ব্যবস্থায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় কমিবে, তাহা বাদ দিলেও মোট ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার

৮ শত টাকা খরচ কমিবে। তাহার মোটামুটি হিসাব :—

ট্রেনিং স্কুলে　　৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।
ইনস্পেক্সনে　　৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৯ শত টাকা।
প্রাথমিক স্কুলে　　২৪ হাজার ৬ শত টাকা।
মাধ্যমিক স্কুলে　　৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।
ট্রেনিং স্কুলে　　১ লক্ষ ৫০ হাজার ৫ শত টাকা।
ট্রেনিং কলেজে　　১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।
আর্টস কলেজে　　৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত টাকা।
মোক্তাবে　　৭ হাজার ৫ শত টাকা।
মাদ্রাসায়　　২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।
গৃহসংস্কারে　　১ লক্ষ টাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে　　১ লক্ষ টাকা।
মুসলমান শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টারে　　৩০ হাজার টাকা।

(৮) চিকিৎসা বিভাগে আয় ৫০ হাজার টাকা বাড়ান ও ব্যয় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত টাকা কমান যায়। যখন মেডিক্যাল কলেজে বহু ছাত্রই প্রবেশ করিতে চাহে, তখন কলেজের ছাত্রাবাসের ব্যয় সরকার বহন না করিয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে আদায় করিলেই এই ৫০ হাজার টাকা আয় বাড়িবে।

(৯) স্বাস্থ্য বিভাগে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩ শত টাকা খরচ কমান সম্ভব। উহারই এঞ্জিনিয়ারিং অংশে আরও ব্যয় কমান যায়।

(১০) কৃষি বিভাগে—পশুবিষয়ক অংশে ৯৫ হাজার ৩ শত ৫০ টাকা খরচ কমান ও ১৮ হাজার টাকা আয় বাড়ান সম্ভব। খাস কৃষি উপবিভাগে ব্যয় কমান যায়—১ লক্ষ ৮৩ হাজার ১ শত টাকা। রেশম উপবিভাগে ব্যয় ৩ হাজার টাকা কমান ও আয় ৫২ হাজার বাড়ান যায়।

(১১) সমবায় বিভাগের বহর দিন দিন বাড়িতেছে। ইহার ব্যয় বাড়িয়াছে :—

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে　　৯১ হাজার টাকা।
১৯১৮-১৯　　২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।
১৯২২-২৩　　৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

সমিতি বলেন, এই বিভাগে ১ জুন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রেজিষ্ট্রার থাকিবেন এবং তাঁহার ডেপুটীর পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে। সমগ্র বিভাগে বার্ষিক ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬ শত টাকা খরচ কমান যায়।

(১২) শিল্প বিভাগে মোট খরচ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা কমান যায়। ইহার মৎস্য উপবিভাগে কোনই উল্লেখ-যোগ্য প্রয়োজন সাধিত হয় না। এই উপবিভাগ তুলিয়া দিলে বৎসরে ৮২ হাজার টাকা খরচ কমিবে।

বাঙ্গালা সরকারের বাজেটে দেখা যায়, এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বেতন ২৭ হাজার ৫ শত টাকা আর তাঁহা-দের সফরের খরচ ২৮ হাজার টাকা।

(১৩) তাহার পর সিভিল ওয়ার্কস্ হিসাবে বৎসরে মোট ৮ লক্ষ টাকা এবং ষ্টেশনারী ও ছাপা হিসাবে মোট প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ কমান সম্ভব। ছুটী ও শৈলাবাস বাবদে ২ লক্ষ ১০ হাজার ও ডাকঘরের হিসাবে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ কমান যায়।

সমিতির বিশ্বাস, বর্ত্তমানে এ দেশে নিখিল-ভারত চাকরী ছাড়া আর যে সব চাকরী আছে, সে সকলে বেত-নের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা বেতনহ্রাসের নিম্নলিখিত হিসাব বহাল করিতে চাহেন :—

বেতনের পরিমাণ	শতকরা হ্রাস
২ শত ৫০ টাকা পর্য্যন্ত	০
২ শত ৫০ টাকার অধিক ৫ শত পর্য্যন্ত	৫
৫ শত টাকার অধিক ১ হাজার পর্য্যন্ত	১০
১ হাজার টাকার অধিক ১ হাজার ৫ শত পর্য্যন্ত	১৫
১ হাজার ৫ শত টাকার অধিক, ২ হাজার পর্য্যন্ত	২৫
২ হাজারের উপর	সাড়ে ৩৩

সমিতির নির্দ্ধারণে একই চাকরীতে দেশীয়ে ও য়ুরোপীয়ে বেতনে তারতম্যের প্রস্তাব আছে! সমিতি বর্ত্তমানে নিখিল ভারত চাকরীর জন্য বিদেশ হইতে লোক আমদানী করার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু যদি সে আমদানী বন্ধ করা না হয়, তবে ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন য়ুরোপীয়দিগের বেত-নের দুই-তৃতীয়াংশ করা হউক—ইহাই সমিতির নির্দ্ধারণ। কিন্তু সে ব্যবস্থা কি সঙ্গত হইবে? যদি বিশেষজ্ঞ বিদেশীকে আনিতে হয়, তাঁহাকে আবশ্যক বেতন দেওয়া হউক। কিন্তু সাধারণতঃ অধিক বেতন দিয়া বিদেশী লোক আমদানী করিবার কোন সঙ্গত কারণ সমিতি দেখাইতে পারেন কি?

সপ্ত-সমুদ্র প্রদক্ষিণ।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সমাজ নানাপ্রকার উদ্ভাবনে নিরত। ওয়াশিংটনে এক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার নাম—"Department of Terrestrial Maguetism of the Carnegie Institution." পৃথিবীর কোথায় কোথায় চুম্বকক্ষেত্র বিদ্যমান, তাহা আবিষ্কার এবং তদ্দ্বারা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ "কার্ণেজী" নামক একখানি সুদৃঢ় পোত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চুম্বকের প্রভাব যাহাতে এই সুদৃশ্য ও দৃঢ় জলযানের উপর না প্রসৃত হয়, এমনই বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পোত নির্ম্মিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে "কার্ণেজী" জাহাজে চড়িয়া আবিষ্কারকগণ ভূপ্রদক্ষিণ করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে, ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ "গ্যালি সি" নামক জলযানের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে "কার্ণেজী" জাহাজে চড়িয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমুদ্রপথে যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে, ১৯০৯ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জলযাত্রিগণ ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৫ শত ৯৫ মাইল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। এই দীর্ঘ জলপথ অতিবাহন করিতে "কার্ণেজী" তিন বার জলযাত্রা করিয়াছিল। "কার্ণেজীর" অধ্যক্ষ মিঃ জে, পি, অল্‌ট পত্রান্তরে এই সুদীর্ঘ জল-যাত্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কৌতূহলোদ্দীপক এবং জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া আমাদের জাহাজ নরওয়ের প্রথম বন্দর "হ্যামারফেষ্টে পৌছিল। ২৪ দিনে আমরা ৪ হাজার ১ শত ৫০ মাইল অতিক্রম করিয়াছিলাম। এই বন্দরটি সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী নগর। বন্দরপ্রবেশকালে সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গ-তাড়না ছিল না বলিলেই হয়; দূরে দূরে তুষারকিরীটী অদ্রিমালা দেখা যাইতেছিল। নিশীথে সূর্য্যোদয় আমাদের নেত্রে প্রতিফলিত হইল। শৈলমালার উপর দিয়া তপনদেব যেন ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছিলেন। সে দৃশ্য যেমন অভিনব, তেমনই চমৎকার। বন্দরে নানা প্রকারের অসংখ্য জাহাজ—সকলেই মৎস্য শীকারে রত। হ্যামারফেষ্ট বন্দরের প্রধান ব্যবসাই মৎস্য শীকার।

হ্যামারফেষ্ট বন্দরের দৃশ্য

"য়ুরোপের উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী এই নগরটি অত্যন্ত শী[illegible] প্রধান। শ[illegible] এখানে দী[illegible] কাল স্থায়ী। শাক-সব্জী, বৃ[illegible] লতা এখানে [illegible] একটা দেখি[illegible] পাওয়া [illegible] না। অতি ক[illegible] তাহাদিগ[illegible]

বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। বার্চ বৃক্ষ ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোন গাছ বড় একটা নেত্রগোচর হইল না। পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা কয়েক প্রকার ভায়লেট পুষ্প দেখিতে পাইলাম। অনেক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে ফুল ও সবজীর গাছ আছে। বৈচিত্র্যহীন শীতের দীর্ঘ দিবস ও রাত্রি অতিবাহিত করিবার পক্ষে এই গাছপালাগুলি অনেকটা সাহায্য করে—আনন্দ দেয়। নরওয়ে তুষারময় পর্ব্বত ও জল-প্রপাতের জন্য প্রসিদ্ধ।

নরওয়ের প্রসিদ্ধ সপ্তধারা জল-প্রপাত।

“আমরা হামারফেষ্ট ত্যাগ করিয়া ২৫শে জুলাই তারিখে আরও উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। য়ুরোপের ভীষণ যুদ্ধের কথা তখনও আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। ৩০শে জুলাই তারিখে আমরা দূরে “বিয়ার” দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। সমুদ্র সলিলে ভাসমান তুষার-শিলা-সমূহ নেত্র-গোচর হইল। স্পিটজবার্গেন অন্তরীপের দক্ষিণাংশে তুষার শিলার আধিক্য দেখিয়া আমরা জাহাজ আরও দশ মাইল দূরে সরাইয়া আনিলাম। স্পিটজবার্গেনের তীরে-তীরে জাহাজ চালাইলাম। এই স্থানে পাহাড়গুলি তুষারে সম্পূর্ণরূপ আবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তুষারধারা সমুদ্রের গর্ভে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। এই স্থানের বন্দর সমূহ তুষার-শিলায় আচ্ছন্নপ্রায়। বন্দরে প্রবেশ করিলে জাহাজ হয় ত এই সকল তুষার-শিলায় বেষ্টিত হইয়া অচল হইবে, এই চিন্তা করিয়া প্রাণপণ বেগে, সন্তর্পণে জাহাজ চালাইয়া আমরা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ‘কুইন্ মড তুষারনদী’ মাঝে মাঝে আমাদের নেত্র-গোচর হইতেছিল। আর্কটিক সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনাতীত।
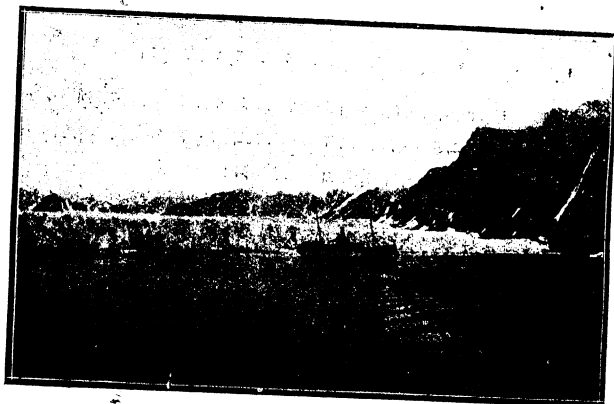
“আইসল্যাণ্ডের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম। রেক্জাভিক্ আইসল্যাণ্ডের রাজধানী। এই স্থানে আসিয়া আমরা য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্র রণের সংবাদ প্রথম জানিতে পারিলাম। রেক্জাভিক্

স্পিটজবার্গেনের সুপ্রসিদ্ধ তুষার নদী।

নগরের অধিবাসীরা মৎস্যজীবী। উহাই তাহাদের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়। এ স্থানে আলুর চাষ হয়; কিন্তু দেখিতে বাদামের মত ছোট। গৃহস্থগণ সকলেই তৃণ সঞ্চয় করিয়া থাকে। বালক-বালিকা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই হস্ত দ্বারা তৃণ উৎপাটন করিয়া জমা করে। আইস্‌ল্যাণ্ডকে সাগা জাতির দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়। য়ুরোপের প্রাচীনতম সাহিত্য-ক্ষেত্র বলিয়া আইস্‌ল্যাণ্ড প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমগ্র স্কানডিনেভীয় দেশে যে ভাষা প্রচলিত, এ স্থানেও তাহাই দেখিলাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আইস্‌ল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৩ শত ১০ মাইল এবং প্রস্থে ১ শত ৯০ মাইল বিস্তৃত। সমগ্র দেশের আট ভাগের এক ভাগ স্থান তুষার-স্তূপে পূর্ণ। প্রাচীন যুগে অগ্ন্যুৎপাত হওয়ায় অনুরূপ ভূমিখণ্ড গৈরিক নিস্রাবের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে। ছোট ছোট পল্লীতে আমরা দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়া সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলাম। এ স্থানে নরওয়ের মত ঘরের মধ্যে গাছ-পালা রক্ষা করা হয়। বাহিরে লতাপুষ্প বাঁচিয়া থাকে না।

"এ যাত্রা আমাদিগকে এই স্থান হইতেই নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

"১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে পুনর্ব্বার আমাদের জল-যাত্রা আরব্ধ হইল। 'কার্ণেগী' প্যানামা খাল উত্তীর্ণ হইল। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ চালাইবার সময় আমরা উড্ডীয়মান মৎস্যসমূহ দেখিতে পাইলাম। মৎস্যগুলি এক আকারের নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য দুই ফুটের অধিক দীর্ঘ হয় না।

"ডচ্ বন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমরা বোগোস্‌লফ্ দ্বীপপুঞ্জের সন্নিহিত হইলাম। এই দ্বীপগুলির আকার প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাত বশতঃ কোন কোন দ্বীপের শৃঙ্গ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

"দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ চালান অত্যন্ত সঙ্কট-সঙ্কুল ব্যাপার। সমুদ্রগর্ভে প্রবালদ্বীপসমূহ বিদ্যমান। ভাল নাবিক না হইলে প্রায়ই জলমগ্ন প্রবালদ্বীপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষ হয় এবং এইরূপে বহু অর্ণবপোত ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

"আটলান্টিক মহাসমুদ্রের প্রবেশদ্বারে লিটলটন্ বন্দর অবস্থিত। আমাদের জাহাজ এই বন্দরে আসিল। এই স্থানের অধিবাসীরা অতিথি-বৎসল। প্রত্যেক পরিবার হইতে একটি করিয়া সমগ্র যুবক ও কন্যা য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। গ্যালিপলির যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক পরিবারের সন্তান চির-নিদ্রিত হইয়াছে শুনিলাম।

অ্যালাস্কার বোগোস্‌লফ দ্বীপ হইতে অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্য।

"এই স্থানে আসিয়া আমরা এই যাত্রায় আণ্টার্টিক সমুদ্রের চারিদিকে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম আমাদের পূর্ব্বে এরূপ কার্য্যে আর কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। ভাসমান তুষারশিলা হইতে জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য জাহাজের সম্মুখভাগ খুব পুরু পিত্তলের পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। আণ্টার্টিক মহাসমুদ্রে সর্ব্বদা তুষারশিলার সহিত জাহাজের সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা।

"লিটল্‌টন হইতে যাত্রা করিয়া আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইলাম। ভাসমান তুষারশিলার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বুঝিলাম, এ স্থানে জাহাজ চালান সামান্য নৌবিদ্যার কার্য্য নহে। কুজ্ঝটিকার ধূম্র যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া উন্নতচূড় তুষারশৈলসমূহ আমাদের চারিদিকে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার জেমস্ রস যে সকল ভাসমান বিরাট তুষারশিলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই তুষারশিলাক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথম দিনেই ৩০টি তুষারশিলা আমাদের নেত্র-গোচর হইল। এ স্থানে আমাদের জাহাজের তাপমান যন্ত্রে ০ ডিগ্রিরও নীচে পারা দেখা গেল।

পেনগুইন পক্ষী।

"৮ দিন ধরিয়া আমরা পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। চারিদিকেই তুষারশৈল। ইহা ছাড়া তুষারঝটিকা, কুজ্ঝটিকা ত ছিলই। দক্ষিণ জর্জ্জিয়ার সন্নিহিত হইয়া আমরা একটা প্রকাণ্ড তুষারশৈল দেখিতে পাইলাম। প্রথমতঃ উহাকে একটি দ্বীপ বলিয়া আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল।

"হরন্ অন্তরীপের সমীপে আসিবার পর আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। এ স্থান হইতে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালার উচ্চশৃঙ্গ সমূহ স্পষ্ট নেত্রগোচর হইল। 'কিং এডওয়ার্ড কোভ'এ দুই দিন অবস্থান করিয়া আমরা আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আলু ও ভেড়ার মাংস এই স্থানে পাওয়া যায়। সার আর্ণেষ্ট স্যাকল্‌টন আণ্টার্টিক প্রদেশ আবিষ্কারে যাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দ্বীপে ৬টি কেন্দ্রে তিমি মৎস্যের তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় ১ সহস্র ব্যক্তি ২ লক্ষ ৪০ হাজার পিপা তিমি-তৈল বৎসরে এই স্থান হইতে চালান দিয়া থাকে। বিউনিসায়ারস্ হইতে মাসে একখানি জাহাজ এ স্থানে আসিয়া তৈল লইয়া যায়। বহির্জ্জগতের সহিত তত্রত্য অধিবাসীদিগের এইমাত্র সম্বন্ধ। এই দ্বীপে আবহবিদ্যায় একটি মানমন্দির আছে। অবজারভার সস্ত্রীক এ স্থানে বাস করেন। সমগ্র দ্বীপটিতে

তুষারশিলার অভ্যন্তরস্থ গুহা।

মাত্র দুইটি রমণী আছেন। এ স্থানের তীরভূমি তিমি মৎস্যের তৈল, মেদ, মজ্জায় এমন আর্দ্র যে, অষ্টপ্রহর যে মধুর গন্ধ সে স্থানটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাষায় কোনও কবি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। এই স্থানের অধিবাসীরা অতিথিবৎসল, সেবা-পরায়ণ। পেন্‌গুইন্ পক্ষীর ডিম্ব তাহারা ভারে ভারে আমাদিগকে উপঢৌকন দিল! এই পেন্‌গুইন্—অর্দ্ধেক মৎস্যাকৃতি, অর্দ্ধেকটা পক্ষীর মত।

দ্বীপের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমরা আবার দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ চালনা করিতে লাগিলাম। ক্রমেই তুষারশিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একটা শিলা উচ্চতায় ৪শত ফুট হইবে। একএকটা তুষারশিলা এত বৃহৎ যে, তন্মধ্যে গুহা পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এই গুহা এমন বৃহৎ যে, এক শত ফুট পর্য্যন্ত বিচরণ করা যায়।

লিন্‌ড্‌সে দ্বীপের উভয় ভাগ দিয়া আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। দূর হইতে এই জনহীন, বৃক্ষলতাশূন্য দ্বীপটি আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। চারিদিকে শুধু তুষারস্তূপ—যেন তুষার আঙ্গরাখায় ভূষিত হইয়া দ্বীপটি গভীর ধ্যানে মগ্ন। আশেপাশে, সমুদ্রসলিলে তুষারশিলাসমূহ যোগ-মগ্ন তাপসের ধ্যানভঙ্গ নিবারণকল্পে যেন দ্বীপটিকে পাহারা দিতেছে। দক্ষিণ জর্জ্জিয়া হইতে যাত্রা করিবার পর চারি মাসের মধ্যে আমরা একটি প্রাণীরও সাক্ষাৎ পাই নাই। শুধু একবার সমুদ্রবক্ষে একটি জলমগ্ন মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম।

"আমাদের এইবারের জলযাত্রায় অনেকবার ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিলাম সত্য; কিন্তু Great Australian Bightএর দক্ষিণভাগে আসিয়া যেরূপ ভীষণ ঝড় ভোগ করিলাম, এমন আর কোথাও হয় নাই। সমুদ্রমধ্যে ঝটিকা যে কিরূপ ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বোধের অতীত। এইবারের ঝটিকা এমনই প্রবল যে, প্রতিমুহূর্ত্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমরা অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া রহিলাম। কিন্তু আমাদের জাহাজখানা অত্যন্ত দৃঢ় এবং নাবিকগণ সুদক্ষ, তাই ভগবানের আশীর্ব্বাদে কোনওরূপে আমরা রক্ষা পাইলাম।

"১ শত ১৮ দিন পরে আমাদের জাহাজ পুনর্ব্বার লিটল্‌টনে ফিরিয়া আসিল। চক্রাকারে আমরা সমুদ্রপথ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। গণনা করিয়া দেখা গেল, এই দীর্ঘকালে আমরা ১৭ হাজার ৮৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। ১ শত ১৮ দিনের মধ্যে ৫২ দিন ঝটিকার সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে 'অরোরা' দীপ্তি ১৪ দিন আমাদের নেত্রগোচর হইয়াছিল;—কখনও প্রবল দীপ্তি, কখনও বা ক্ষীণ।

'কর্ণেগী' জাহাজের উপর আল্‌বাট্রস্ পক্ষী।

"দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রাকালে 'আলবাট্রস্' জাতীয় পক্ষী নিয়তই আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। অনেকগুলিকে আমরা নানা কৌশলে বন্দীও করিয়াছিলাম। একটি পক্ষী এত বড় যে, এক দিকের ডানা হইতে অপর প্রান্তের ডানা পর্য্যন্ত মাপিয়া দেখিয়াছিলাম, প্রায় ১৭ ফুট হইবে।

"অতঃপর পেগো পেগো দ্বীপে আমাদের জাহাজ ভিড়িল। এই দ্বীপটি মার্কিণদিগের অধিকারভুক্ত। বন্দরটি একটি পুরাতন আগ্নেয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিত। সহস্র

পেগো পেগো বন্দরের প্রবেশ দৃশ্য

বৎসর পূর্ব্বে একবার অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। এক্ষণে আর দুর্ব্বিপাকের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সেই স্থানে বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। চারি পার্শ্বে পর্ব্বতমালা—সানুদেশ তাল প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে সুশোভিত। প্রকৃতই এই দ্বীপটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। সমগ্র বিশ্বে এমন মনোরম ও নিরাপদ বন্দর আর নাই।

"সামোয়ানস্ জাতির এই স্থানে বাস। ইহারা মার্কিণের সংস্রব ও প্রভাবে আসিয়াও তাহাদের জাতীর রীতি-নীতি বজায় রাখিয়াছে। প্রাচীন যুগের প্রচলিত গৃহে তাহারা এখনও বাস করিতেছে। এমন সুস্থ, সবল জাতি পলিনেসীয়দিগের মধ্যে আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হয় নাই। এই দেশের সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের উপযোগী করিয়াই এ দেশের আইন প্রণীত ও প্রচলিত হইয়াছে। কারাগারের অধ্যক্ষ কারাগারস্থিত অপরাধীদিগকে লইয়া প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কারাগারে তালা বন্ধ করিয়া তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে যায়। আমরা কোনও সামোয়ান রাজনন্দিনীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইলাম। দেশীয় প্রথা অনুসারে কন্যার পিতা বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতগণকে মাদুর ও দেশজাত বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। উৎসব-ভোজের আয়োজনও প্রচুর হইয়াছিল। শূকরমাংস, মুরগীর কাবাব, নানাবিধ পক্ষিমাংস, ইক্ষু, নারিকেল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিমন্ত্রিতগণের সম্মুখে রক্ষিত হইল। আহূতগণের তুলনায় রবাহূতগণই তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিল, দেখিলাম।

"পেগো পেগো হইতে আমরা গুয়াম বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা গুয়াম যাইতেছি শুনিয়া জনৈক নিউজিলাণ্ডবাসী বন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, গুয়াম বলিয়া কোনও স্থান পৃথিবীতে নাই। আমরা যখন বুঝাইয়া দিলাম যে, গুয়াম কোনও কল্পিত মায়াপুরী নহে—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শাসনাধীন একটি প্রসিদ্ধ সামরিক পোতাশ্রয়, তখন সত্যই তিনি

সামোয়ান রাজনন্দিনীর সহচরী।

চলিতেছে। আমাদিগকে নানারূপ ক্রীড়া দেখাইয়া সে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিল। কান্দীতে প্রাচ্য ললিত-কলা ও সূক্ষ্ম শ্রম-শিল্পের কায দেখিলাম।

"সময় সংক্ষিপ্ত বলিয়া প্রাচীন অনুরাধাপুরে যাইতে পারিলাম না। শুনিলাম, এ স্থানে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি ও মন্দির বিদ্যমান। সিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গ্যালি নগর অবস্থিত। এ দেশীয় বহু ব্যক্তি চুণি, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান্ রত্ন কাটিয়া, ছাঁটিয়া সুদৃশ্য করিয়া থাকে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই ইহারা কায করিয়া থাকে। কচ্ছপের অস্থির দ্বারা ইহারা অতি চমৎকার দ্রব্যসমূহ নির্ম্মাণ করে।

সিংহলীরা হস্তীসমূহকে স্নান করাইতেছে।

"কালুতারায়—রাজপথে একটি বৌদ্ধ উৎসব দেখিলাম। রাত্রিকালে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ২ হাজার বৎসর ধরিয়া এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। উৎসবের উপকরণ, সাজ-সজ্জা অতি বিচিত্র সুন্দর। স্বর্ণখচিত রেশমী বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হস্তীর উপর ব্রোঞ্জনির্ম্মিত কুণ্ডলীকৃত সর্পরাজ, তদুপরি বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। সহস্র সহস্র নর-নারী সুসজ্জিত বেশে শোভাযাত্রার অনুসরণ করিতেছে। সে চমৎকার দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে ভাষায় ঠিক বুঝান যায় না।

"গ্যালিতে যে হোটেলে আমরা বাস করিতেছিলাম, তাহা সমুদ্রের উপকূলেই অবস্থিত। বালুকাপূর্ণ সৈকত-ভূমির উপর অবিশ্রান্ত তরঙ্গের গর্জ্জন, বর্ষার প্রবল ধারা আমাদিগের চিত্তে একটা অভিনব ভাবের সঞ্চার করিয়া ছিল। বাস্তবিক এই অবসরকাল আমরা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলাম। এখানকার অধিবাসীদিগের বেশ ভূষা অতি বিচিত্র। দীর্ঘ কেশজাল বেণীবদ্ধ হইয়া চূড়াকারে অবস্থিত। তাহার উপর একটি করিয়া কূর্ম্মাস্থি-নির্ম্মিত কঙ্কণিকা। বাস্তবিক পুরুষগুলিকে এ বেশে যেন স্ত্রী-জাতি বলিয়াই ধারণা জন্মে।

সিংহলে বুদ্ধোৎসব।

"সিংহল ত্যাগ করিয়া আমরা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করিলাম। স্বর্ণ লাভের আশা

কালগুর্লি স্বর্ণখনি, পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া।

রোপীয় উপনিবেশিকগণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন, কৃষিকার্য্য এ অঞ্চলে ১৯০৩ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হয়। এ দেশে অসংখ্য প্রকার মনোহর ফুল ফুটিয়া থাকে। এমন ফুল অন্যত্র দুর্লভ। অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরভাগ পাহাড়পর্ব্বত-বাঞ্জিত বলিলেই হয়। জলপ্রপাত তথায় আদৌ নাই। সুতরাং সেখানে অত্যন্ত জলকষ্ট। এ সমস্যার সমাধান না না হইলে তথায় কোনও প্রকার কৃষিকার্য্য সম্ভবপর হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—প্রসিদ্ধ কাল্‌গুর্লি স্বর্ণখনির অঞ্চলে দুইটি নগর আছে। দুইটি সহরে বহু সহস্র নর-নারী বাস করে। তত্রত্য অধিবাসীরা পার্থ নগর হইতে ব্যবহার্য্য জল পাইয়া থাকে। ইস্পাতের পাইপ পার্থ হইতে উক্ত দুইটি নগরে প্রস্তুত। সুবৃহৎ জলাধার হইতে জল পাম্প করিয়া তথায় প্রেরিত হয়। পার্থ হইতে এই দুইটি জনপদের ব্যবধান ও শত ৫০ মাইল।
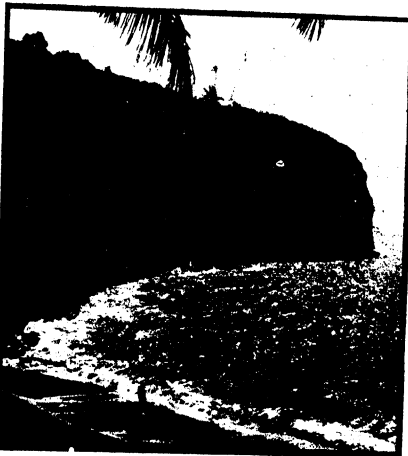
"অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করিয়া লিউলিন্ অন্তরীপের দিকে জাহাজ চলিল। এ স্থানটিতে সর্ব্বদাই ঝড়-বৃষ্টি হয়। কোনও রূপে ঝটিকাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া আমরা আবার উন্মুক্ত দক্ষিণ-সমুদ্রে পড়িলাম। ঝড় থামিয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্র-গর্ভে 'Royal Company' দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আমরা তাহাদের কোন নিদর্শন পাইলাম না। সম্ভবতঃ তাহারা বিলীন দ্বীপসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

"প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া আসিবার সময়—প্যাপেটি, টাহিটি ও সোসাইটি দ্বীপে কয়েকদিন অবস্থান করা গেল। এই সকল দ্বীপের অধিবাসীরা যেমন সরল, তেমনই অতিথিবৎসল। প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। আমাদের জাহাজের সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। এ জন্য আমরা সত্বর স্যান-ফ্রান্সিস্কো অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পেন্‌রিন্ দ্বীপের একাংশ।

"উত্তরাভিমুখে যাত্রা-কালে লেসানদ্বীপের পার্শ্ব দিয়া জাহাজ চলিল। ইহা একটা বালুকাময় দ্বীপ মাত্র। জনপ্রাণীর বাস এখানে নাই। পাহাড়ের উপর খালি বালির স্তূপ। দুই একটি বৃক্ষ ও কতিপয় মাত্র ঝোপ দেখা গেল।

"আমাদের জাহাজে ক্রমাগত জল উঠিতেছিল। ঝটিকামুখে

পড়িলে জাহাজটিকে রক্ষা করাই কঠিন হইবে, এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, অতিকষ্টে আমরা স্যান-ফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসিলাম। জীর্ণসংস্কার বোধ হইলে আমরা হাওয়াইয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে আবার যাত্রা করিলাম।

"পেন্‌রিন্ দ্বীপে আসিয়া দেখিলাম, অত্রত্য অধিবাসীরা তৃণকুটীরে বাস করে। নারিকেল ও তালকুঞ্জের নিম্নে এই সকল কুটীর নির্ম্মিত। এমন মনোরম, শান্তিপূর্ণ স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না, জানি না। এখানকার জল-বায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য সবই মধুর, পবিত্র। স্বপ্নেই শুধু মানুষ এমন দেশের কল্পনা করিতে পারে; এখানে আসিলে হৃদয়মধ্যে কাব্যস্রোতঃ আপনা হইতেই যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। হনলুলু হইতে সামোয়া যাইবার সময় কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা এই মনোরম দ্বীপে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এখানকার অধিবাসীরা বড় জাহাজ কখনও দেখে নাই বলিলেই হয়। শুধু একটা ছোট পোত মাঝে মাঝে এখানে দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়া থাকে। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল, প্রস্থে ৭ মাইল হইবে। অধিবাসীর সংখ্যা ৪ শত। এখানে ৮ জন শ্বেতাঙ্গ দেখিলাম। কেহ বা ব্যবসা উপলক্ষে, কেহ বা সরকারী কায উপলক্ষে বসবাস করিতেছেন।

"তীরে নামিয়া আসিয়া শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকদিগের অতিথি হইলাম। ভোজনশেষে আমরা গ্রাম দর্শনে বাহির হইলাম। ছোট একটি গির্জ্জা এখানে আছে। দ্বীপের অধিবাসীরা ধর্ম্মমন্দিরে প্রার্থনা শুনিতেছিল। সমাধিক্ষেত্রটিও দেখিলাম। তথায় একটি সাধারণ সমাধি নয়নগোচর হইল। শুনিলাম,একটি শ্বেতাঙ্গীর উদ্দেশে সে সমাধি। মহিলাটি ভদ্রবংশসম্ভূতা ও বিদুষী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাটি নিঃসহায় হইয়া পড়েন। জীবিকার্জ্জনেরও কোন উপায় ছিল না। সংসারে উঁহার কোনও আত্মীয়বন্ধুও ছিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি জনৈক দেশীয়কে বিবাহ করেন। এ জন্য তাঁহার জাতি গিয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যায়েন যে, তাঁহার সমাধিতে কোনও পরিচয় যেন না থাকে। নিউজিল্যাণ্ড সরকারের রেসিডেণ্ট এজেণ্ট এ স্থানে সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর বাস করিতেছেন।

এই দ্বীপে এক ব্যক্তির সহিত দেখা হইল, সে অর্দ্ধ-শ্বেতাঙ্গ। সংবাদ লইয়া জানিলাম যে, এই শ্বেতাঙ্গ লোকটি পামারষ্টোন দ্বীপের আবিষ্কারকের বংশধর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনটি পত্নীসহ আবিষ্কারক এই মনোহর দ্বীপে আসিয়াছিল। এখন তাহার বংশধর শতাধিক ব্যক্তি উপনিবেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তিন দিন পরে আমরা এই দ্বীপ হইতে ৪ শত মাইল দূরবর্ত্তী মনাহিকি দ্বীপে পৌছিলাম। এখানকার অধিবাসীরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এজেণ্ট মহোদয় আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য নৌকায় চড়িয়া আসিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা দ্বীপে চলিলাম। এ স্থানে তাজা মৎস্য ধরিবার বিশেষ বাসনা জন্মিল। দেশীয়গণ আমাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিল। এই দ্বীপেও ছয় মাস কোনও জাহাজ আইসে নাই। এজন্য এখানে তখন নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যের অনাটন হইয়াছিল। আমরা এজেণ্ট মহোদয়কে কয়েক কৌটা বিস্কুট ও কয়েক টিন মাংস উপহার দিলাম। দ্বীপবাসীরা বড়ই শিশুভক্ত দেখিলাম। অন্যের সন্তানকে পোষ্যপুত্র লয়। সুতরাং এই দ্বীপের যে কোনও ক্ষুদ্র শিশুর তিন চারিটি মাতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনাহিকি দ্বীপবাসীরা সুস্থ, সবল এবং সদাপ্রফুল্ল। পরিশ্রমেও ইহারা কাতর নহে। ইহারা টুপী, মাদুর, পাখা, এবং ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র স্ফীত হইয়া দ্বীপের গৃহগুলিকে গ্রাস করিয়াছিল। তখন অধিবাসীরা নৌকায় চড়িয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। আমরা যখন দ্বীপে আসিলাম, তখনও তাহাদের সকলের গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই।

দ্বীপবাসীরা আমাদিগকে তাহাদিগের নৃত্যকলার পরিচয় প্রদান করিল। নৃত্যমণ্ডলীতে ১০টি বালক ও ১০টি বালিকা দেখিলাম। এক দল বাদক একপ্রকার মাদল ও বাঁশী বাজাইয়া নৃত্যের সঙ্গতি রক্ষা করিল। নাচটি মন্দ লাগিল না। আমরা সকলকে পুরস্কৃত করিলাম। নারিকেল বৃক্ষে দ্বীপটি পরিপূর্ণ। পেঁপে ও কদলীর চাষ আছে।

তাহার পর আমরা পশ্চিম সামোয়া দ্বীপে গমন করিলাম। এই দ্বীপটি এখন নিউজিল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের অধীন।

কদলীজাতীয় বৃক্ষের খোলার উপর দেশীয় উলঙ্গ শিশু।

জাতীয় কদলী জন্মে, তাহা দেখিতে যেমন বৃহৎ, তেমনই সুস্বাদু।

"প্যানামা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্যানামা উপসাগরে সর্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এক দিনেই আমরা ১২টা সর্প দেখিয়াছিলাম। বর্ষাকালে শত শত সর্প জলে ভাসিয়া আইসে। নানাজাতীয় সর্প এ দেশে প্রচুর। প্যানামা খাল খনন করিবার পর এ দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের

মধ্যস্থতে একটি মানমন্দির আছে। এই স্থানে চুম্বক ও আবহ-সংক্রান্ত বিষয়ের বিবরণ সংগৃহীত হয়। এই জন্যই বিশেষ করিয়া আমরা এ স্থানে আসিয়াছিলাম। এখানকার শাসনকর্তার গৃহে আমরা নীত হইলাম; এই দ্বীপটিও পরম রমণীয়। অনেকগুলি ঝরণা এ স্থানে দেখিলাম। ঝরণার জল নির্ঝরিণীতে পরিণত হইয়াছে। দেশীয় বালিকাগণ কেমন অনায়াসে লম্ফ দিয়া নির্ঝরিণীর এক তীর হইতে অপর তীরে চলিয়া যাইতেছে! আমরাও তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় যোগ দিলাম। নদীতে অনেকে মাছ ধরিতে ব্যস্ত। পাহাড়ের ফাটলে যেখানে জল জমিয়া থাকে, অনেকগুলি দেশীয় রমণী তথায় কট্‌ল মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। এখানে এক

উন্নতি হইয়াছে। সমগ্র আমেরিকার মধ্যে প্যানামা নগর প্রাচীনতম। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়।"

ইহার পরই জলযাত্রাশেষে সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্যানামা বন্দরে নৌকার উপর হাটবাজার।

স্বাগত।

(ওগো !) উষার আলোকে হেসে,
কে তুমি আজি এ শিশির-প্রভাতে
দাঁড়ালে দুয়ারে এসে ?
তোমায় কখনো দেখিনি ত আগে,
তবুও ও মুখ বড় চেনা লাগে ;
কি যেন অসীম স্নেহ অনুরাগে
দেহ মন যায় ভেসে !
দুয়ারে আমার কে এলে গো আজ
এমন দীপ্ত বেশে ?

(ওগো !) তোমার চরণতলে,
আঙিনা আমার ভ'রে যে উঠিল
ফুলে, ফলে, শতদলে !
মরি মরি সখি, এ কি বিস্ময়,
নিমেষেই এসে ক'রে নিলে জয়
আমার এ কঠিন সুপ্ত হৃদয়
না জানি এ কোন্ ছলে ?
আঁধার মনের মন্দিরে আজ
তোমারই প্রদীপ জ্বলে !

(রাণি !) অবাক এ আগমন !
বিশ্বের এই নিঃস্বের দ্বারে
তোমার পদার্পণ !
হাসিতে যাহার সহাস্য দিক্
আঁখিতে উজল নবীন নিমিখ্
কোমলকণ্ঠে কুজে কোটী পিক
চঞ্চল ত্রিভুবন,
দীনের দুয়ারে দাঁড়ালো সে এসে
নিখিল পূজিত ধন !

(দেবি !) তোমার করুণা কণা,
যেন অযাচিত আশার অতীত,
আনন্দ মূর্চ্ছনা !
জ্বেলে দিল প্রাণে এ কি অপরূপ,
নব জীবনের সুগন্ধ ধূপ ;
অমৃত সরস প্রতি রোমকূপ,
যৌবন উন্মনা !
আমার চিত্তে নিত্য তোমার
আরতি ও উপাসনা !

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

শাসন-সংস্কার

শাসন-সংস্কার যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন দেশের অধিকাংশ লোকই বলিয়াছিলেন—তাহা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক তাহাই লইয়া কাষ করিতে প্রস্তুত হয়েন এবং তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশও করেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাব করেন যে, যদিও আইনে আছে, ১০ বৎসর এই প্রথা প্রচলিত থাকিবার পর পার্লামেণ্ট বিচার করিয়া দেখিবেন, অধিকারের মাত্রা কিছু বাড়ান যায় কি না, তবুও ভারতবর্ষ দায়িত্বপূর্ণ শাসনের পথে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সে ব্যবস্থার পুনর্বিচার করা হউক।

বিলাতে একটি বক্তৃতায় তৎকালীন ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগু এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যোগ্যতা দেখাইলে তবে বিস্তৃত অধিকারলাভ ঘটিতে পারিবে। যোগ্যতার প্রমাণ—

(১) রাজনীতিক হিসাবে শিক্ষিত ভোটদাতার দল গঠন;

(২) বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা;

(৩) যে সব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, সে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা;

(৪) শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ;

(৫) শৃঙ্খলা-রক্ষা।

যদি বর্ত্তমানে প্রদত্ত অধিকারের সম্যক্ সদ্ব্যবহার হয়, তবেই ভবিষ্যতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট দয়া করিয়া আরও অধিকার দিতে পারেন।

ইহাই ছিল মিষ্টার মণ্টেগুর সর্ত্ত। কিন্তু এ সব সর্ত্ত পালন করিবার সুযোগ কি তিনি ভারতবাসীকে দিয়াছেন?

(১) ভোটদাতার দল গঠন করিয়া তাহাদিগকে রাজনীতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা কোন ঔষধের দ্বারা হয় না; অধিকার দিলে তবে সে অধিকার ব্যবহারের শিক্ষা সম্ভব হয়।

(২) বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ভারতবাসীরা দেখাইতে পারে কি না, তাহা দেখাইবার কোন সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।

(৩) যে সব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অল্প, সে সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ভার সরকারই লইয়াছেন—ভারতবাসীর সে বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপের অধিকার আইনে নাই।

(৪) শাসনের সব দায়িত্ব বিদেশী ব্যুরোক্রেশী হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন। নহিলে কতকগুলা বিভাগকে সংরক্ষিত করিবার প্রয়োজন হইত না। তাহার উপর লাটের "ভিটো"; সে ত' আছেই।

(৫) শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার যে বিভাগের, সে বিভাগ সংরক্ষিত।

কাযেই দেখা যাইতেছে, মিষ্টার মণ্টেগুর মতে ভারতবাসীরা যে সব সর্ত্তে ১০ বৎসর পরে আর এক দফা সংস্কার পাইতে পারিবে, সে সব সর্ত্ত পালনের কোন সুবিধাই শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থায় দেওয়া হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড পীল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ১০ বৎসর না কাটিলে আর অধিকার দেওয়া হইবে না। তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল ফলিবে না। ব্যবস্থাপক সভা যে মনে করিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত ভারতবর্ষে আর রাজনীতিক উন্নতি সম্ভব হইবে না—তাহা একান্ত ভুল ব্যবস্থাপক সভা বা তাহার কোন সদস্য যত যোগ্যতাই কেন

দেখাইয়া থাকুন না, ভোটাররা প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে কি না, তাহা কালে বুঝিতে পারা যাইবে—এখনই তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর যতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারা না যাইবে, ততক্ষণ অধিকারের বিস্তারসাধন সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে উন্নতির গতি দ্রুত না হইয়া হয় ত প্রস্বতই হইবে। যে ব্যবস্থার প্রজননে ২ বৎসর কাল লাগিয়াছে, ৬ মাসের অভিজ্ঞতায় তাহার সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পার্লামেণ্ট হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বিবেচনা করেন। যখন নূতন প্রণালী পরীক্ষার আবশ্যক সময় অতিবাহিত হয় নাই, তখন তাহার রদ-বদলের কথা উঠিতেই পারে না।

অর্থাৎ এখনও ১০ বৎসর কাল যদি ভারতবাসী বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তবে ১০ বৎসর পরে তাহাকে বিস্তৃততর অধিকার দিবার বিষয় বিদেশের পার্লামেণ্টে আলোচিত হইবে এবং তখন সে পার্লামেণ্ট তাহার সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু এক দিকে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন—ভারতে সিভিল সার্ভিসের ইস্পাতের কাঠাম রাখিতেই হইবে, আর এক দিকে ভারতে জঙ্গী লাট বলিয়াছেন—ভারতের সেনাদলে ভারতীয় কর্ম্মচারী দিবার সময় এখনও হয় নাই। এই দুই কথা হইতেই ভারতবাসী সহজে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন—এমন ভাবে শাসন-সংস্কার চলিলে কত শতাব্দীতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

তুর্কীর কথা

তুর্কীর সহিত মিত্রশক্তিদিগের সন্ধির কথা শেষ পড়ে নাই। মিত্রশক্তিপুঞ্জ "অনেক চিন্তার পর" তুর্কীকে নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ত্ত দিয়াছিলেন,—

(১) তুর্কী মিশরে ও সুদানে কোনরূপ দাবীদাওয়া রাখিবেন না।

(২) ইজিয়ান হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সীমান্তের উভয় পার্শ্বে ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত জমী নিরস্ত্র করিতে হইবে।

(৩) তুর্কী যে সময় যুদ্ধে রত থাকিবে, সে সময় ব্যতীত আর সব সময় প্রণালী-পথে (সকল জাতির) ব্যবসার জাহাজ ও অসামরিক বিমান অবাধে গতায়াত করিতে পাইবে। তুর্কী যুদ্ধে রত হইলে, কেবল নিরপেক্ষ জাতির জাহাজ গতায়াত করিতে পাইবে—তবে তুর্কী সে সকল পোত খানাতল্লাস করিতে পারিবেন। শান্তির সময় যুদ্ধের জাহাজ ও বিমানও অবাধে যাইতে পারিবে—তবে তাহার একটা সীমা থাকিবে। কোন যুদ্ধে তুর্কী নিরপেক্ষ থাকিলে ঐরূপ ব্যবস্থাই বহাল থাকিবে।

(৪) দার্দ্দানালেসের উভয় তীরে ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত ভূমি, মর্ম্মরা সাগরে দ্বীপপুঞ্জ এবং সামোথ্রেস, লেমনস, ইমব্রস ও টেনিডোস নিরস্ত্র করা হইবে। তুর্কী প্রণালীর উপর বিমান চালাইতে পারিবেন এবং তাঁহার নিরস্ত্র স্থানে সশস্ত্র সৈন্যচালনার ক্ষমতাও থাকিবে। গ্রীস তাহার নিরস্ত্রীকৃত দ্বীপের কাছে জলপথে নৌ-বহর পাঠাইতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহা তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন-কেন্দ্রে পরিণত করিতে পারিবে না।

(৫) খাস কনষ্টাণ্টিনোপলে তুর্কী ১২ হাজার সৈনিক রাখিতে পারিবেন। গমনাগমনের নিয়মনির্দ্ধারণের জন্য এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তাহাতে বড় বড় দেশের প্রতিনিধিরা থাকিবেন এবং তুর্কীর, বুলগেরিয়ার, গ্রীসের, রুমানিয়ার, জুগো-শ্লাভিয়ার ও রুসিয়ার প্রতিনিধিও থাকিবেন। কমিশনের সভাপতি—তুর্ক হইবেন। কমিশন জাতিসঙ্ঘের অধীন থাকিবেন।

(৬) এই সব নির্দ্ধারণের ব্যতিক্রম হইলে সর্ত্তকারী জাতিরা—বিশেষ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী ও জাপান জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে একযোগে প্রতিবাদ করিবেন। তুর্কীকে তুর্কীতে বাসকারী সকলকেই নিরাপদে ধনপ্রাণ-সম্ভোগ করিবার অধিকার দিতে হইবে। গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীর বিনিময় হইবে—কেবল কনষ্টাণ্টিনোপলে ৩ লক্ষ গ্রীক থাকিতে পারিবেন।

(৭) যুদ্ধের পর সন্ধির সময় তুর্কীকে বাধ্য হইয়া যে সব সর্ত্তে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল—মূলতঃ সে সব বাতিল করা হইবে। কিন্তু বিচার, আর্থিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবসায় ও কাষ্টমস্ শুল্ক বিষয়ে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৮) তুর্কীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদে ১ কোটি ৫০ লক্ষ তুর্ক স্বুবর্ণ-মুদ্রা দিতে হইবে। তাহার সুদ বার্ষিক

শতকরা ৫ টাকা হিসাবে চলিবে। তদ্ব্যতীত শতকরা ১ টাকা হিসাবে মক্তুদণ্ড করিতে হইবে। অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে ৯ লক্ষ তুর্ক স্বর্ণমুদ্রা হিসাবে তুর্কীকে দিতে হইবে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রথম কিস্তি টাকা দিতে হইবে। গ্রীক ও তুর্ক উভয় পক্ষই ক্ষতিপূরণের দাবী ত্যাগ করিবেন।

(৯) বর্ত্তমান সন্ধিতে যে সব স্থান তুর্কীর অধিকার-বহির্ভূত হইবে বা যে সব দেশ অন্য কাহারও অধিকারভুক্ত হইবে—সে সব দেশের সম্বন্ধে খালিফের কোনরূপ রাজনীতিক, বিচারের বা শাসনের অধিকার থাকিবে না। তুর্কী মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখিবেন।

(১০) তুর্কীর ঋণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইবে যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ঋণ যাহা ছিল—তাহারই অংশমত ঋণ তুর্কীকে স্বীকার করিয়া পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্থির হয়, সর্ত্তের মধ্যে মসুলের কথা থাকিবে না। মসুল সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ যে নির্দ্ধারণ করেন, তাহাই তুর্কীকে মানিয়া লইতে হইবে।

রাজা প্যারীমোহন।

এই সন্ধিসর্ত্ত প্রদান করিবার সময় লর্ড কার্জ্জন বলেন, সাবধান—এটা প্রাচীর বাজারে গালিচা কেনাবেচা নহে, এটা জাতির ভাগ্যনির্ণয়! এ দিকে গ্রীকরা বলে, তুর্কী সন্ধিসর্ত্ত ভাঙ্গিয়াছে! আবার ফরাসী ইংরাজকে জানান, সন্ধির পথে বাধা পড়িলে ফরাসী তুর্কের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধির বন্দোবস্ত করিবেন।

ইহার পর তুর্কীর পক্ষে ইসমিত পাশা সর্ত্তের ৩০ দফায় বদল করিতে চাহেন এবং শুনা যায়, সম্মিলিত শক্তিরা কতক কতক পরিবর্ত্তনে সম্মতি দিবেন। সম্মিলিত শক্তিরা তুর্কীর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ তুর্ক স্বর্ণমুদ্রায় হ্রাস করিতে সম্মত হইলেও ইসমিত কিছুতেই তুর্কীতে বিদেশীর বিচার সম্বন্ধে তুর্কীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। সেই জন্য তুর্কীর পক্ষ হইতে সন্ধিসর্ত্তে সম্মতি দিয়া সহি করিতে বিলম্ব হইতেছে।

রাজা প্যারীমোহন

বিগত ২রা মাঘ অপরাহ্ণে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্যারীমোহন ভূমিষ্ঠ হয়েন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে প্যারীমোহন কিছুদিন ওকালতী করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে বেঙ্গল টেনান্সি (প্রজাস্বত্ব) বিল বিধিবদ্ধ হইবার সময় প্যারীমোহন জমিদারী ও রাজস্ব-বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একই দিনে তিনি রাজা ও সি, আই, ই উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন। রাজা প্যারীমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের উন্নতিকল্পে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক বৎসর তিনি এই সভার সম্পাদক

ও পরে এক বৎসর তিনি ইহার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রাজা প্যারীমোহন অনেক দেশ-হিতকর কার্য্যের সহিত সংস্পষ্ট ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি পিতার বিশাল জমিদারীর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে রাজা প্যারীমোহন একটি পুত্র ও বহু পৌত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী

গত ১১শে পৌষ মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে রাজসাহী জিলার প্রাচীন দুবলহাটী রাজবংশের কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি প্রজার কল্যাণকামী জমীদার ছিলেন এবং নানা স্থানে জলাশয় খনন ও সংস্কার করাইয়া দেন। তিনি স্বগ্রামে একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যু দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

গত ২২শে মাঘ রাজনীতিক অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 'সার্ভেণ্ট' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী দণ্ডের নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ হইবার কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে মুক্তি পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে সংবর্দ্ধনা করিতেছি।

বিচার-বৈষম্য

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার সমর্থ এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন—উদ্দেশ্য আদালতে বিচার-ব্যাপারে ভারতবাসীতে ও য়ুরোপীয়ে যে বৈষম্য আছে, তাহার নিবারণকল্পে কি করা যায়, তাহার বিচার জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করা হউক। নানা মতের ১৫ জন সদস্য লইয়া এক সমিতি গঠিত হয়। এত দিনে সে সমিতির নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেকাল হইতে এ দেশে বিচারবিষয়ে য়ুরোপীয়দিগের কতকগুলা বিশেষ অধিকার ছিল। কতকটা আপনাদের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং কতকটা ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জন্য বিজেতা ইংরাজরা আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যখনই সেই অন্যায় অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই ইংরাজ সমাজে প্রতিবাদের বন্যা বহিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ছিল—

ভারতীয় দায়রা জজরা ও কতকগুলি ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট য়ুরোপীয় বৃটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিচার করিতে পারিবেন।

ইহাতেই য়ুরোপীয় দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বড় লাট লর্ড রিপনকে অপমান করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই—রাজপ্রতিনিধির ভাগ্যে নানা লাঞ্ছনাভোগ হইয়াছিল। তখনকার কথা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা অবশ্যই মনে করিতে পারেন না—ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া এ দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিবেন। কিন্তু ইংরাজের আব্দার ইংরাজ সরকার অবজ্ঞা করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। একটা মাঝামাঝি আইন করা হইল; (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন) ফলে হইল, ভারতীয় বিচারকদিগকে নামে অধিকার দিয়া কাযে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল। তাঁহারা বিচার করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্ববিধ দায়রা মামলায়—এমন কি, ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেও জুরীর বিচার চাহিতে পারিবে এবং জুরীর অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ য়ুরোপীয় হইবেন। যে সব মামলায় ভারতীয় আসামী জুরীর বিচার চাহিতে পারে না, সে সব মামলাতেও য়ুরোপীয়রা সে অধিকার পাইতে পারিবেন।

এবার মিষ্টার সমর্থের প্রস্তাব। ইহাতেই কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সওদাগর সভার সভাপতি সার ওয়াটসন্ স্মাইথ খেঁকী কুকুরের মত তাঁহার জাতভাইদের দাঁত দেখাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখন—আজ আমরা তদন্ত সমিতির নির্দ্ধারণের মোট কথা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। তাঁহাদের প্রস্তাব:—

(১) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

(ক) ম্যাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডাদেশ দিলে, তাহার বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে।

(খ) অর্থদণ্ডের পরিমাণ যদি ৫০্ টাকার অধিক হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধেও আপীল করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতীয় হইলেও তাহার এই অধিকার থাকিবে।

(২) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

যে স্থলে হাইকোর্টে বা দায়রা আদালতে বিচার হয়, এবং জুরীর সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সে স্থলে আসামী মিশ্র জুরী পাইবার দাবী করিতে পারিবে—অর্থাৎ জুরারদিগের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ তাহার জাতভাই হইবেন। আর—

(ক) যদি জুরী একমত না হয়েন বা জুরী একমত হইলেও জজ জুরীর সহিত একমত হইতে না পারেন, তবে প্রমাণ বা আইনের তর্ক উভয় দফার জন্যই আপীল করা যাইবে।

(খ) স্পেশ্যাল জুরীর তালিকায় ভারতবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিতে পারিবে।

(গ) সাধারণতঃ জুরীতে ৫ জনের কম লোক থাকিবে না। আর খুনী মামলায় সম্ভব হইলে জুরীর সংখ্যা ৯ জন করা হইবে।

ভারতীয় অভিযুক্ত সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৩) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

মামলায় যদি জাতিগত বিষয় থাকে, তবে এসেসার সহ বিচার্য্য মামলায় দায়রা আদালতে আসামী জুরীর বিচার চাহিতে পারে।

অর্থাৎ জাতিগত বিদ্বেষাদির সম্ভাবনা আছে, এই ছল

ধরিয়া য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজা এসেসার সহ বিচার্য্য মামলাতেও জুরীর বিচার চাহিতে পারিবে।

ভারতীয় অভিযুক্ত সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৪) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

মামলায় যদি জাতিগত বিদ্বেষাদির কোন কথা না থাকে, তবে সাধারণতঃ এসেসরসহ বিচার্য্য মামলার বিচার এসেসর লইয়াই হইবে—তবে এসেসরের সংখ্যা ৩ জনের কম হইবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে, তবে ৩ জনই তাহার জাতভাই হইবে।

অতএব এরূপ ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় আসামীর বিচার কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে ভারতীয় আসামীর সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে।

(৫) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

যে মামলায় জাতিগত বিদ্বেষাদির কথা উঠিতে পারে, সে মামলা "ওয়ারেণ্ট কেশ" হইলে আসামী ও ফরিয়াদী উভয়েই মামলা জুরীর সাহায্যে দায়রা আদালতে হইবে, এমন দাবি করিতে পারিবে।

ভারতবাসী আসামী হইলেও এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৬) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

মামলা যদি "সামনস কেস" হয় এবং তাহাতে যদি জাতিগত বিদ্বেষাদির কথা উঠিতে পারে ও কারাদণ্ডাদেশ হইতে পারে, তবে আসামী বা ফরিয়াদী দাবি করিতে পারিবে—২ জন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার বিচার করিবেন—১ জন ভারতীয়, ১ জন য়ুরোপীয়। এই ২ জন ম্যাজিষ্ট্রেটে মতের অনৈক্য হইলে মামলা কোন দায়রা জজের কাছে যাইবে।

ভারতীয় আসামীর সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৭) য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজার সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

যে সব মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার্য্য, সে সব মামলা যদি ৫০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের মত হয়, তবে আসামী চাহিলে কেবল প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটই তাহার বিচারের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ভারতীয় আসামী এ সুবিধা পাইবে না।

(৮) প্রেসিডেন্সী সহরের বাহিরে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটরা আইনমত সব দণ্ডাদেশই দিতে পারিবেন—কেবল বেত মারার ও ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৩ ধারার মামলার দণ্ড দিতে পারিবেন না; কেন না, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রস্তাব হইয়াছে।

মোদ্দা কথা এই—

য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজারা ভারতে ইংরাজের আদালতে অভিযুক্ত হইলে যে সব বিশেষ অধিকার দাবি করিতে পারিত—তাহা বহাল রহিল; কেবল নামে ভারতীয় আসামীর অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে একটু বাড়াইয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ সরকার দুষ্ট ছেলেটাকে শাসন করিবার জন্য তাহার কাছে ঘেঁসা সম্ভব নহে দেখিয়া শিষ্টশান্ত ছেলেটাকেও শাসন সম্বন্ধে একটু আলগা দিবেন।

সমিতির নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের হোমমেম্বার এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় আইন পেশ করিয়াছেন। আইন পেশ করিবার সময় তিনিও স্বীকার করিয়াছেন—এই যে ব্যবস্থা হইল, ইহা একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা বা compromise. কিন্তু তিনি ব্যুরোক্রাটের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য সহকারেই বলিয়াছেন, এ দেশে য়ুরোপীয়রা যে সব অতিরিক্ত অধিকার সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সে মত অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য!—কেন? ইংরাজ জেতা, এ দেশের লোক বিজিত বলিয়া? যদি তাহাই হয়, তবে এমন কথা কেমন করিয়া বলা যায় যে, ইংরাজের আইনের চক্ষুতে সব মানুষই সমান?

অভাবে স্বভাব নষ্ট

লোক কথায় বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট; শাসন-সংস্কারে ব্যয় বাড়াইয়া বাঙ্গালা সরকার এখন যে অবস্থায় উপনীত, তাহাতে তাঁহারা হাঁসপাতালেও রোগীদিগের কাছ হইতে পয়সা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সরকার এক দিকে উচ্চকণ্ঠে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেই সরকারই আর এক দিকে হাঁসপাতালে রোগীদের কাছে স্থান ভাড়া ও ঔষধের দাম লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—এ দৃশ্য চমৎকার বটে! হাঁসপাতালগুলি যে কেবল সরকারের টাকাতেই চলে, এমনও নহে। দেশের অনেক বদান্য ব্যক্তি এই সব প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য

করিয়াছেন ; দরিদ্র দেশবাসী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ আজ সরকার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে—তাঁহাদের দানের সর্ত্ত পদদলিত করিতে অগ্রসর হইতেছেন! আর এই কার্য্যের দায়িত্ব—ভারতীয় মন্ত্রী—বাঙ্গালার রাজনীতিক "গুরুজী" সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একান্ত পরিতাপের বিষয়, দেশীয় মন্ত্রী—বিশেষ সার সুরেন্দ্রনাথ এই কার্য্য করিলেন অর্থাৎ দরিদ্র দেশবাসীকে চিকিৎসার উপায় হইতে বঞ্চিত করিলেন। কিন্তু ব্যুরোক্রাট কেবল শ্বেতাঙ্গ নহেন—কৃষ্ণাঙ্গও ব্যুরোক্রাট।

যোগেশচন্দ্র দত্ত

বিগত ২৫ শে পৌষ যোগেশচন্দ্র দত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুবাজারের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। যোগেশচন্দ্রের নাম কলিকাতার রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত। তাঁহার সহায়তায় পরলোকগত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত ইংরাজি পত্র 'রইস' ও 'রায়ত' প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পর যোগেশ বাবুই এ পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হয়েন। শিশির কুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান লীগের' সহিত তিনি বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। কলিকাতার সকল প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং সংবাদপত্রসেবক ছিলেন। মৃত্যুকালে যোগেশচন্দ্রের ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনিই বহুবাজারের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারের শেষ গৌরবদীপ। সে দীপ আজ নিবিল।

যোগেশচন্দ্র দত্ত

পুরী জগন্নাথের মন্দির

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় "পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বসু লিখিয়াছেন, প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে (সন ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসে) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় 'উৎকলে পঞ্চতীর্থ' নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে উড়িষ্যার পঞ্চতীর্থের বিবরণ ও তৎসহ কেশরী ও পাঠানবংশীয় রাজগণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়—

"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়মাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

অর্থাৎ ১১১৯ শকাব্দে ঐ মন্দির অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিররচনার এই সময় উড়িষ্যায় অনেকে অবগত আছেন।

১৫ই কার্ত্তিক —

আলি-ভাই দিবস উপলক্ষে বাঙ্গালোরে হরতাল; দার্জ্জিলিঙ্গে এঙ্গোরা-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের সময় গুরখা নেতা দল বাহাদুর গিরি ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় আকালী ও মোহান্তদের মধ্যে আপোষ ব্যবস্থার প্রস্তাবে কমিটী-গঠন। বরোদায় বালিকাদের উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য উদ্দেশ্যে মহারাণীর লক্ষ টাকা দান। রেঙ্গুনের চাল চুরীর মামলায় ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্মিথ ও পোর্ট ট্রাষ্টের কর্ম্মচারী মিঃ ষ্টিফেন্সের অন্যান্য আসামীদের সহিত সশ্রম কারাদণ্ড। মুলতান মিউনিসিপ্যালিটীতে হিন্দু সদস্যদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কাঁচা বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব স্থির হওয়ায় প্রতিবাদে হিন্দু দোকানদারদের হরতাল। কলিকাতা করপোরেশনে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব, অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাবের প্রতিকূল থাকায় উহা অগ্রাহ্য। ব্রহ্মে সরকারী চাকুরিয়াদের বিরুদ্ধে জোর করিয়া উৎকোচ আদায় প্রভৃতির অভিযোগে তাঁহাদের উপর সরকারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা; যশোহরের কর্ম্মবীর হীরালাল রায়ের লোকান্তর। মুলতান হাঙ্গামায় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটী এবং হিন্দু সভা কর্ত্তৃক পুলিস ও সরকারী তদন্তের দোষ দেওয়ায় পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় অভিযোগের তদন্ত প্রার্থনা; সরকার পক্ষের প্রতিবাদে প্রস্তাব অগ্রাহ্য। ডাবলিনে গোয়েন্দা-বিভাগের প্রধান আড্ডায় একসঙ্গে চারিটা বোমা নিক্ষেপ।

১৬ই কার্ত্তিক —

লাকসামে পিকেটিংয়ে ৩ বৎসরের শিশু গ্রেপ্তার। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে সরকার স্বীকার করিয়াছেন, গুরুবাগে ১৬৫০ জনের প্রতি বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে, আহতের সংখ্যা মোটামুটি পনেরো শত হইবে; সরকারের মতে গুরুবাগে পুলিসের কায আইন-সম্মত। আকালীদের তাড়াইবার সময় পুলিসের প্রহারে একটি স্ত্রীলোক অজ্ঞান হওয়ার সংবাদ। বাঙ্গালীগৌরব মহাবীর ভীমভবানীর লোকান্তর। পাবনা, ক্ষেতুপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায়ের এক ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা পিতাকে দায়গ্রস্ত বুঝিয়া নাইট্রিক এসিড পানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী সেখ মহিদ হোসেন জেলা বোর্ড বিল সম্পর্কে অতিরিক্ত কর গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। তুর্ক সুলতানের পদচ্যুতির ও তুরস্কে সাধারণতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের ঘোষণা।

১৭ই কার্ত্তিক —

শ্রীহট্টে পণ্ডিত দেওশরণের লোকান্তর উপলক্ষে স্থানীয় মাড়োয়ারীদের শোভাযাত্রার সঙ্কল্প; ডেপুটী কমিশনারের আপত্তি। ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর সভাপতি লর্ড ইঞ্চকেপের বোম্বায়ে আগমন। বাঙ্গালার কৃষি-সচিব নবাব নবাবালি চৌধুরী পীড়িত হওয়ায় তাঁহার বিশ্রাম-গ্রহণ; তাঁহার কার্য্যের ভার শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত পি, সি, মিত্রের উপর। হাসান আবদালের কয়েদী ট্রেণ বিভ্রাটের ফলে দুই জন মৃত্যুমুখে পতিত, কতিপয় আহত পুলিসে গ্রেপ্তার। বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক উত্তরবঙ্গের প্লাবনে নিজের, বাঙ্গালা সরকারের, তথা গবর্ণরের পক্ষসমর্থন; আচার্য্যদেবের প্রশংসা। পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ চব্বিশ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে লোকান্তরিত।

১৮ই কার্ত্তিক —

জামীন দিতে অস্বীকার করায় দল বাহাদুর গিরির এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বোম্বায়ে দিন দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে বিশ হাজার টাকা লুটের সংবাদ। ঝাড়গ্রামের সাব-জেলে কোন ডাকাতি মামলার সরকারী সাক্ষী আসামীদের হস্তে নিহত। আফগান আমীরের মহানুভবতার সংবাদ; তিনি রাজ-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে জন-সাধারণের অভিযোগ নিত্য নিয়মিত ভাবে শ্রবণ করেন ও তাহা সরকারী ইস্তাহারেও প্রকাশ করেন। তুর্ক হস্তে পূর্ব্ব-থ্রেসের চরলু জেলার শাসনভার প্রত্যর্পণ। আঙ্গোরা কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপলের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সন্ধি অগ্রাহ্য। আঙ্গোরার আদেশ অনুসারে কনস্তান্তিনোপলের মন্ত্রিগণের পদত্যাগ। ডাবলিনে মেরী ম্যাক্‌সুইনী গ্রেপ্তার।

১৯শে কার্ত্তিক —

কংগ্রেসের আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ; দেশ আইন অমান্যের পক্ষে প্রস্তুত নহে; কাউন্সিল-গমন সমস্যা। কলিকাতায় সম্পাদকসংঘের সভায় সার্ভেণ্ট ও সঞ্জীবনীর বিবাদের আপোষ। চট্টগ্রামের নেতা শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও উমেশচন্দ্র গুহের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর সার হার্কোর্ট বাটলারের স্মৃতিরক্ষার্থ কানপুরে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; এ জন্য পৌনে দুই লাক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের ডুর্ণ সহরে জর্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কৈশরের পুনরায় দারপরিগ্রহ।

২০শে কার্ত্তিক —

সিন্ধুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে শ্রীযুক্ত কস্তুরী বাঈ গন্ধী প্রভৃতির কাউন্সিল বয়কট প্রস্তাব গৃহীত। অমরাবতীতে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের কাউন্সিল-পক্ষপাতী মন্তব্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন সভাপতি মিঃ এইচ্ ই কটনের বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন। পঞ্জা ব্যবস্থাপক সভায় গুরুদ্বার পাণ্ডুলিপিতে শিখসদস্যদের আপত্তি; মিত্রশক্তিকে কনস্তান্তিনোপল ত্যাগের অনুরোধ। কনস্তান্তিনোপলের উপকণ্ঠে বৃটিশ ও তুর্কে সংঘর্ষ। সুলতান আঙ্গোরার ব্যবস্থা মানিয়া পদত্যাগ করিতে মন্ত্রীদিগকে সরাইতে অসম্মত; সুলতান কর্ত্তৃক বৃটিশের আশ্রয় প্রার্থনা। আঙ্গোরা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-সন্ধি-সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া কনস্তান্তিনোপলে কর আদায়। তুর্ক সিনেট সভার তিরোধান। আঙ্গোরার নূতন দাবী ;— তুরস্কের তথা ইরাকের সীমানা নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, গ্রীস ক্ষতিপূরণের টাকা দিবে, পূর্ব্ব সন্ধি-সর্ত্ত রহিত হইবে, তুরস্ককে পূ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

২১শে কার্ত্তিক—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় জেলা বোর্ডের পাণ্ডুলিপিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-প্রেরণের প্রস্তাব গ্রাহ্য না হওয়ায় দুই জন ব্যতীত আর সকল মুসলমান সদস্যের সভা-ত্যাগ। মালাবারের কাণ্ডে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত দুই জন আসামীর হাইকোর্টে আপীলে, এক জন পূর্ব্বে এটি নন্‌কোঅপারেটার থাকায় তাহার মুক্তি; অপর ব্যক্তির দণ্ডহ্রাস। শান্তিপুরের রাসে চার দিন ধরিয়া কলিকাতার সেণ্ট জন য়্যাম্বুলেন্সের সাহায্য।

২২শে কার্ত্তিক—

মাদ্রাজের নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কনষ্টেবল-হত্যা চেষ্টার অপরাধে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতায় ধূমকেতুর আফিসে ও এই সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানে খানাতল্লাস, মুদ্রাকর গ্রেপ্তার। খেলাফৎ কমিটীর সভাপতি মৌলানা মহম্মদ সুফীর গৃহেও খানাতল্লাস, জালিডে পাকের বক্তৃতার সম্পর্কে সম্পাদক রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। মৌলবী সেরাজুদ্দীনও রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। নোয়াখালীর জননায়ক হাজী আবদার রসিদের কারামুক্তি। বগুড়া পুলিসের বিরুদ্ধে বিচারাধীন আসামীকে মারপিটের মামলা। মাদ্রাজে তুমুল বৃষ্টি; আইন কলেজ জখম। তুর্ক সুলতানের বৃটিশ রণ-তরীতে আশ্রয়। বৃটিশ দূতাবাসে সেখ উল-ইসলাম। আঙ্গোরার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কনস্তান্তিনোপলে মিত্রশক্তির সৈন্য মোতায়েন।

২৩শে কার্ত্তিক—

গণ্টুরে অনেকেই পিউনিটিভ ট্যাক্স দিতেছেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর সহকারী সভাপতি জন-নায়ক মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁর প্রায় এক বৎসর দণ্ডভোগের পর কারামুক্তি, তাঁহার শরীরের ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। আটক জেলে আকালী কয়েদীদের ৪৮ ঘণ্টা প্রায়োপবেশন। গুরুদ্বার পাণ্ডুলিপি আলোচনার কমিটী সকল শিখ সদস্য কর্ত্তৃক বয়কট। বেঙ্গল রিলিফ কমিটীতে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ। বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা হ্রাসে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ বেণ্টলীর সিদ্ধান্ত—জল-প্রবাহের সংস্কার না করিলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ নিবারিত হইবে না। কালীঘাটে মোপলা ট্রেণ বিভ্রাটের আসামী সার্জ্জেন এণ্ড্রুজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ। ছেলেদের বঙ্কিম রচয়িত্রী ভক্তিলতা ঘোষের লোকান্তর। এসিয়ামাইনরে গ্রীসের পরাজয়ে ছয় জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও দুই জন সেনাপতির সামরিক বিচারের আদেশ। কনস্তান্তিনোপলে আঙ্গোরায় ও মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের বাগ-যুদ্ধ।

২৪শে কার্ত্তিক—

জোড়হাট জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গালার আবগারী বিভাগে পান-বর্জ্জন নীতির মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ। শ্রীহট্ট গবমেণ্ট স্কুলের এক শিক্ষককে স্কুলে যাইয়া বেত্রাঘাত করার অপরাধে স্থানীয় সব-ডেপুটীর ২০০ টাকা অর্থদণ্ড। ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দ্রমে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনা; কবিবরের তথায় রাজ-অতিথিরূপে অবস্থান। অমৃতসর জেলার এক রেল-ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার কোন যুবতী যাত্রীর অর্থে এবং তাহার পুত্র তাহার রূপে মুগ্ধ; ষ্টেশনমাষ্টারের নিযুক্ত গুণ্ডা কর্ত্তৃক যুবতী ভ্রমে উক্ত পুত্র নিহত, যুবতী তখন যুবকের জ্বালায় তাহার পূর্ব্বস্থান হইতে অন্যত্র গিয়াছিল। নিখিল ব্রহ্ম হোমরুল লীগের টাকা ভাঙ্গার অভিযোগে উহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাং-পু অভিযুক্ত। আমেদাবাদে ৪৩টি কলে ধর্ম্মঘট। লসেন বৈঠক অভিমুখে আঙ্গোরার প্রতিনিধিদের যাত্রা।

২৫শে কার্ত্তিক—

ধর্ম্মঘটে আমেদাবাদে হাঙ্গামা; দুইটি কল ক্ষতিগ্রস্ত, এক জন জখম। মালাবার অঞ্চলে মোপলাদের পীড়ন করায় দুই জন কনষ্টেবল পদচ্যুত; আর দুই জন সম্বন্ধে উৎকোচ আদায়ের অভিযোগ। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ কনস্তান্তিনোপল অবরোধে সম্মত না হওয়ায় ইংরেজে ফরাসীতে মনান্তর।

২৬শে কার্ত্তিক—

জমায়েৎ-উলেমার কার্য্যকরী সভায় কাউন্সিল গমন বা অন্য ভাবে সরকারের সাহায্য মুসলমানগণের পক্ষে অবিধেয় সাব্যস্ত; নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা রেলে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলে একখানি মিক্সড ট্রেণ পদচ্যুত; দুই জন ফায়ারম্যান ও চার জন যাত্রী নিহত, দুই জন যাত্রী আহত।

২৭শে কার্ত্তিক—

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আন্দামান ও মাদ্রাজ ঘুরাইয়া ঢাকা জেল হইতে মুক্তি। ঝালকাঠীতে মিউনিসিপ্যাল এলেকায় মদের দোকান রাখা হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি দেশবন্ধু কর্ত্তৃক কাউন্সিল সমস্যার আলোচনা। খেলাফৎ আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ, এক জন ভিন্ন আর সকলে কাউন্সিল বর্জ্জনের পক্ষপাতী; জন-গত আইন অমান্যের সময় এখনও আসে নাই; কমিটী স্কুল-কলেজ ও আদালত বয়কট সমর্থন করেন। কলিকাতার পুলিস আদালতে কেশিয়ার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী তহবিল তছরূপের অপরাধে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতায় ছাতাওয়ালা গলীতে গুপ্ত প্রেমের সন্দেহে একটি যুবক নিহত; হত্যাকারী প্রণয়িনীর স্বামী। আমেদাবাদে শ্রমিকসঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী অনুসূয়া বাঈয়ের পদত্যাগে ধর্ম্মঘট সঙ্গে সঙ্গে থামিতেছে।

২৮শে কার্ত্তিক—

দেশবন্ধু দাশ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে কাউন্সিল-বিরোধীদের কোন কথা বলিতে না দেওয়ায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র সভা ও কাউন্সিল গমনের বিপক্ষে ইস্তাহার। গুরুবাগ হইতে শিখ বন্দিগণকে লইয়া যাইবার সময় শিখ কনেষ্টবলের "সৎশ্রী আকাল" ধ্বনি ও তাহার গ্রেপ্তার। জলন্ধর জেল হইতে ডাঃ সত্যপালের কারামুক্তি। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতা আসিবার পথে গবর্ণর লর্ড লিটন কর্ত্তৃক বন্যাস্থল পরিদর্শন; বন্যার কাদা শুকাইবার পরে, অবসর-মত। ব্রহ্মে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে ভিক্ষু উত্তম কর্ত্তৃক ভোট-দাতাদিগকে ভোট দিতে ক্ষান্ত হওয়ার অনুরোধ। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত ভূরগ্রী ভারতে আসিয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিল কর্ত্তৃক ভারতীয় সরকারের কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপের অনুযোগ করিয়াছেন। শ্যামদেশের যুবরাজের সস্ত্রীক রেঙ্গুণে আসিয়া স্থানীয় ছোটলাটের আতিথ্যগ্রহণ। আঙ্গোরা ভাণ্ডারে ১৬ লক্ষ টাকা জমিয়া যাওয়ায় তাহা আঙ্গোরায় প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থসংগ্রহ বন্ধ। ব্রহ্মের ইরাবতী জেলার কোন গ্রামের অধিবাসীরা হোমরুল লীগে যোগদান করিতে অসম্মত হওয়ায় ফুঙ্গীরা তাহাদের যাজনকার্য্য বন্ধের ভয় প্রদর্শন করেন; সে জন্য গ্রামবাসীরা সকলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ওয়াশিংটনে করকের পরলোকগত লর্ড মেয়রের বিধবা মিসেস ম্যাকস্থইনী ও আর আট জন আইরিশ স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার।

২৯শে কার্ত্তিক—

পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় গতবৎসর বোম্বায়ে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা খুব কমিয়াছে। ব্রহ্মে রাজনৈতিক আন্দোলন উদ্দেশ্যে মহিলা-সভা গঠিত। বালেশ্বরে লোকে সেটেলমেণ্ট বয়কট করায় পিউনিটিভপুলিস নিয়োগ। শ্রীযুত কে সি চন্দ্র বাঙ্গালার সহকারী পাবলিসিটী আফিসার নিযুক্ত হইলেন। বীরভূম জেলার দুই জন মুসলমান ডাকাতদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হওয়ায় গোয়েন্দা বিভাগ হইতে তাহাদের পুরস্কার। বাঙ্গালার শ্রমশিল্প বিভাগ সন্দ্বীপ অঞ্চলে মেষের লোম কাটা ও কম্বল বয়ন শিখাইতেছেন। শ্রীহট্ট ক্লিভডন চা-বাগানে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ঘর জ্বালাইয়া দিবার অভিযোগে

গ্রেপ্তার। তুর্কী সুলতানের প্রাসাদের কতিপয় কর্ম্মচারীর মাল্টা যাত্রা। সন্ধি-সভার বিলম্বে তুর্কী প্রতিনিধি-মণ্ডলীর কর্ত্তা ইস্‌মেত পাশার প্যারিস যাত্রা।

৩০শে কার্ত্তিক—

ময়মনসিংহে কয় জন অসহযোগী সাড়ে তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও দশ মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতে তাঁহাদের মুক্তি। ব্রহ্মে কাউন্সিল বর্জ্জনের সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। সিন্ধ, হায়দ্রাবাদে ১০৮ ধারায় বহু মৌলবী গ্রেপ্তার; স্থানীয় "আল ওয়াহিদে"র সম্পাদক রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী বিলাতী টাইমসের একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালার সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে প্রচারের ব্যবস্থায় সরকারের প্রতি সন্দেহ-প্রকাশ। রেঙ্গুণে ভিক্ষুক-দমনের আইন বাহাল। সীমান্তে মাশুদদের সহিত যুদ্ধে অনেক সৈন্যের আহত হওয়ার সংবাদ। কাঁথী, কোটবাড় গ্রামের একটি স্ত্রীলোক দারিদ্র্যবশতঃ ৭ দিনের শিশু-কন্যাকে জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়ায় তাহার ৬ মাস কারাদণ্ডের সংবাদ। আমীরের মিতব্যয়িতার সংবাদ; নিজের ও রাজপরিবারের খরচ নিজস্ব তহবিল হইতেই চালাইয়া থাকেন। মাদ্রাজে তুমুল বৃষ্টিতে বাড়ী-ঘর জখম, ট্রেণ বন্ধ। মুলসীপেটায় সত্যাগ্রহ করায় ২৫ জনের সশ্রম ও আর কয়েক জনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ইহাদের মধ্যে ৬০ বৎসরের এক বৃদ্ধ আছেন, তিনি ওয়ার্দ্ধা হইতে গিয়াছিলেন। উপনিবেশে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে কড়া নিয়ম; সে সব দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি বয়কট। বাঙ্গালোরের তিপতুর গ্রামে কতিপয় মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুদের উপর আক্রমণ, বহু হিন্দু আহত। শ্রীযুক্ত সাকলাৎওয়ালা নামে এক জন ভারতীয় পার্শী নর্থ ব্যাটারসীর শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত।

১লা অগ্রহায়ণ—

লাহোরের সার গঙ্গারাম রায় বাহাদুর গুরুবাগের মোহান্তের নিকট হইতে বিবাদী জমী-জমা এক বৎসরের জন্য জমা লইয়াছেন, তিনি গুরুবাগে আকালীদিগকে যথেচ্ছ কাঠ কাটিতে দিবেন; ফলে, তথায় আকালীদের গ্রেপ্তার এইবার বন্ধ হইল; এই জমা লইতে দুই হাজার টাকা সেলামী ও এক বৎসরের খাজনা অগ্রিম দিতে হইয়াছে; এই নূতন ব্যবস্থায় গুরুবাগ হইতে অতিরিক্ত পুলিসও চলিয়া গিয়াছে। বলপ্রয়োগে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া অবধি গুরুবাগ সম্পর্কে সর্ব্বসমেত ৫৫৩১ জন গ্রেপ্তার। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় গুরুদ্বার পাণ্ডুলিপির আলোচনায় শিখ ও হিন্দু সদস্যদের সমবেত প্রতিবাদ। নোয়াখালীর কারামুক্ত নেতা হাজী আবদুর রসিদ সাহেবের কলিকাতায় সংবর্দ্ধনা। মাদ্রাজ সরকারের দয়ায় কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ৪৫০ জন মোপলা বন্দীর অব্যাহতি। নোয়াখালী জেলা-বোর্ড ১৪টি থানায় ১৪টি দাতব্য হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব সুলতান মালয় নামক বৃটিশ ব্যাটেলশিপে আশ্রয় লইয়াছেন এবং মাল্টা যাইতেছেন। মিশরে দুই জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আততায়ীর গুলীতে আহত। ব্রেজিলে পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেখানে বাঙ্গালার মত পাট জন্মান যাইতে পারে। কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে আমেরিকায় বৃটিশগায়নায় জমী দিবার প্রস্তাব, লণ্ডনের ইনস্ অব কোর্ট নয় জন নারীকে ব্যারিষ্টারী সনন্দ দিয়াছেন।

২রা অগ্রহায়ণ—

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। সিন্ধু কমিশনারের পঞ্চায়েতী মুসাফেরখানায় অসহযোগীর প্রবেশ নিষেধে এবং ঐ সম্পর্কে কয় জনের জেল হওয়ায় স্থানীয় অসহযোগীরা দলে দলে ঐ পঞ্চায়েতী নিয়ম ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ফলে পঞ্চায়েৎ বেগতিক বুঝিয়া আদেশটির প্রত্যাহার করিয়াছেন। হাজারীবাগ জেল হইতে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার কারামুক্তি; জেলের কঠোর পরিশ্রমে শরীরের ওজন প্রায় ১৪ সের কমিয়া গিয়াছে। সময়মন্তী জেলের রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পত্র-ব্যবহার আদি করিতে দেওয়ায় তথাকার ডেপুটী জেলার ও এক জন কেরাণী অভিযুক্ত; বহু রাজনৈতিক কয়েদী স্থানান্তরে প্রেরিত। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থায় তথায় কোন মুসলমান সংবাদপত্রকে বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করা হয়; টাকাগুলা কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন মোমদোত ষ্টেট হইতে দেওয়া হয়। উত্তর বঙ্গ বন্যায় মহাদেবপুর থানায় সুক সেখ নামক এক ব্যক্তির ২রা কার্ত্তিক তারিখে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সংবাদে সকল পক্ষের সমর্থন। নূতন বেঙ্গলী ব্যাটালিয়নে আবশ্যক (১০৯৬ জন) সৈন্য সংগৃহীত।

৩রা অগ্রহায়ণ—

কলিকাতায় সেণ্ট্রাল খেলাফতের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। তুর্ক জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক যুবরাজ আবদুল মজিদ খলিফা মনোনীত। বাগদাদের নকীবের পদত্যাগ; নূতন গবমেণ্ট গঠিত। ভ্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত বলশেভিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। হংকং যাইবার পথে একখানা বৃটিশ ষ্টীমারে বোম্বেটের আক্রমণ; অনেকে হতাহত, হাজার হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত। চীনের রাজস্ব-সচিব গ্রেপ্তার এবং মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ ইচ্ছা; রাজস্ব-সচিব অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ ঋণের বিরুদ্ধে গোপনে এক চুক্তি করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব সুলতানের কনস্তান্তিনোপল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বৃটিশের হস্তে তাঁহার পরিবারবর্গের ভার প্রদানের কথা।

৪ঠা অগ্রহায়ণ—

জেলে লালা লাজপৎ রায়ের স্বাস্থ্য-হানি হওয়ার সংবাদ। কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদের এলাকায় মদের দোকান রাখিতে অসম্মত, গাঁজার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। মাইজভোগের ছিন্ন কোরাণের সম্পর্কে শ্রীহট্টের জনশক্তির সম্পাদকের ও মুদ্রাকরের অর্থদণ্ড। নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটীতে অসহযোগী চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত। পঞ্জাব কংগ্রেস কমিটীর মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী রাজদ্রোহ ও জাতি-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে লালা লাজপৎ রায়ের বাটীতে গ্রেপ্তার। ঝাঙ্গ জেলে আকালী কয়েদীদের উপর শাস্তি দেওয়ার প্রতিবাদে প্রায়োপবেশন। ত্রিপুরায় লাকসাম ও গৌরীপুরে গ্রেপ্তার ও পিকেটিংয়ের ধূম। মিঃ সি এইচ ব্রাইদ নামে আর এক জন ভূ-পর্য্যটক সিঙ্গাপুর হইতে বাহির হইয়া ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কোকনদে বিষম ঝড়, বন্দরের একটি গুদাম জলসই, সমুদ্রের জলস্রোতে তীরস্থিত জেলেদের কুটীরগুলির সর্ব্বনাশ, একখানা লাঞ্চ জলমগ্ন। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায়, ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর সম্পর্কে সভার সাধারণ কার্য্য স্থগিতের প্রস্তাব ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত এম আর দীক্ষিত কর্ত্তৃক উত্থাপিত, অগ্রাহ্য হওয়ায় তাঁহার পদত্যাগ। লালা লাজপৎ রায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে কয় মাস হাজত ভোগ করিয়াছিলেন, পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার ঐ হাজত-বাসকে কারাদণ্ডের সময় হইতে বাদ দেওয়ার অনুরোধ ব্যর্থ; সরকারের সিদ্ধান্ত—সেরূপ ব্যবস্থা বে-আইনী। ভূতপূর্ব্ব সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে খলিফার পদ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য আঙ্গোরার আদেশ। তাঁহার মাল্টায় উপস্থিতি।

৫ই অগ্রহায়ণ—

করাচীর আল ওয়াহিদ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত দীন মহম্মদ রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আটক জেলের আকালী কয়েদীদের প্রায়োপবেশন। বরোদার দেওয়ান বাহাদুরের নিকট আপীলে বরোদা সমাচারের পুনঃ প্রকাশের আদেশ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা, বন্যার কারণ অনুসন্ধান জন্য কমিটী গঠন স্থির; বন্যা-বিপন্নদের জন্য সরকারের ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব; শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, এক সঙ্গে অত

টাকা খয়রাৎ না করিয়া একটি টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক। রেঙ্গুনে এক ভূতপূর্ব্ব কনষ্টেবল রেল ষ্টেশনে য়ুরোপীয় মহিলার উপর আক্রমণ করায় ৩০ ঘা বেত ও ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতা সালখিয়ায় বিবাহ-বিভ্রাট, বৃদ্ধ বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন পাত্রের সহিত বিবাহ। লসেনে তুর্কী সন্ধি বৈঠক আরম্ভ। লণ্ডনে বেকার হাঙ্গামা।

৬ই অগ্রহায়ণ—

মধ্যপ্রদেশ, সিওনীর মিউনিসিপ্যাটী কর্ত্তৃক রিসলী সারকুলার (শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কিত) অগ্রাহ্য। লণ্ডনে ইনস্-অব কোর্ট কর্ত্তৃক মহাত্মা ব্যাহারাজীবের অধিকার হইতে বঞ্চিত। কাছাড়ের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুত শ্যামাচরণ দেবের কারামুক্তি। ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্রুর পদত্যাগ মঞ্জুর। কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা পাটনা হাই-কোর্টে ওকালতী করিবার অনুমতি না পাওয়ায় প্রিভি কাউন্সিলে আপীল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে বে-কার সমস্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কমিটী-গঠন। রাজসাহী জেলায় গোবিন্দপাড়া গ্রামের বলাই পরামাণিক অর্থা-ভাবে তাহার এক কন্যাকে বিলাইয়া দিয়াছে। সম্মিলিত পক্ষের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শনে আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপলের কর্ত্তৃ-পক্ষ রাফেৎ পাশা পদচ্যুত।

৭ই অগ্রহায়ণ—

ধূমকেতু-সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম কুমিল্লায় গ্রেপ্তার। সিন্ধু, হায়দ্রাবাদে কতিপয় মৌলবীর ১০৮ ধারায় এক বৎসরের সশ্রম কারা-দণ্ড; মীরপুরের খেলাফতী আন্দোলনকারী মৌলবীর বহিষ্কার। শ্রীহট্টের শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য আমেরিকা যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনারের প্রতিকূল রিপোর্টে যাইতে পারেন নাই। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান রায় সাহেব লালা শিউচরণ লালের লোকান্তর।

৮ই অগ্রহায়ণ—

গুণ্ডা নেতা দল বাহাদুর কারাগারে টিপসহি দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার আরও তিন মাস কারাদণ্ড। কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রে-সের অধিবেশন; কার্য্যকারক মহলে পরিবর্ত্তন; দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের পদত্যাগ-পত্র। করাচীর বিখ্যাত বণিক পরলোকগত নাদির শা ইদালপি দীনশা নানাবিধ সৎকার্য্যে পাঁচ লাক টাকা দিয়া গিয়াছেন। ডাবলিনে বিদ্রোহী নেতা আসকিন চাইল্ডাসের প্রাণদণ্ড। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব পরলোকগত সার উইলিয়ম মায়ারের স্ত্রী-পুত্র না থাকায়, তিনি তাঁহার প্রায় সমুদয় সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে দিয়া গিয়া-ছেন; লণ্ডন ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তিন হাজার পাউণ্ড করিয়া পাইয়া-ছেন।

৯ই অগ্রহায়ণ—

গঞ্জামে লাটের গমনে হরতালের আশঙ্কায় ১৪৪ ধারার নোটীশে সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল প্রভৃতি নিষিদ্ধ। সেণ্ট্রাল খেলাফৎ পিকেটিং, আদালত বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট, দেশের সেবা, বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন, অত্যাচার বর্জ্জন, আইন অমান্য ও শ্রমিকসংঘ গঠন সম্বন্ধে খেলাফৎ তদন্ত কমিটীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সেনের কারামুক্তি; দণ্ড দুই বৎসরের জন্য হইয়াছিল, ১১ মাস পরেই মুক্তি; শরীরের ওজন ৭ সের বাড়িয়া গিয়াছে। আকালী পত্রের সম্পা-দক জ্ঞানী হীরা সিংয়ের রাজদ্রোহাপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। হ্যালিডে পার্কে কলিকাতা খেলাফৎ কনফারেন্সের অধিবেশন; প্রবেশ-পথে তিন জন অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক পুলিশের আদেশে স্থানত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় গ্রেপ্তার। কলিকাতায় গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার সময় দর্শকদের নিকট যে টাকাটা পাওয়া যায়, তাহা দাতব্য -ফণ্ডে খরচ করিবার ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব, প্রস্তাব টিকে নাই। বসরা হইতে বসুমতীর মারফতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের উত্তর-বঙ্গের ও দামোদরের বন্যায় বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে অর্থ-সাহায্য।

১০ই অগ্রহায়ণ—

আসামের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুত তরুণরাম ফুকনের কারামুক্তি। ধনামধন্য ডবলিউ সি বোনার্জীর কন্যা মিসেস কেল দেশের কার্য্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর উপনিবেশ ভ্রমণে ভারত সরকারের ব্যয়ের হিসাব—৬০ হাজার টাকা। আফগান আমীরের বক্তৃতায় সকল বিষয়ে আফগানি-স্থানের উন্নতির সংবাদ;—বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রতি সহরে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইউরোপে আফ-গান ছাত্রদের প্রেরণ করা হইতেছে (তাহার মধ্যে হিন্দু ছাত্রও আছে), য়ুরোপ হইতে সুযোগ্য অধ্যাপকদের আনাইয়া শিক্ষা-বিভাগের উন্নতি-বিধান করা হইতেছে, অনেক শুল্ক ও বাকী খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দাস-দাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্বদেশী বস্ত্র তৈয়ারীর ও সংবাদপত্র প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে; ইত্যাদি। আমীরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধেও সুসংবাদ;—আমীর আমানুল্লার একটিমাত্র বেগম, তিনি হারেম পদ্ধতি তুলিয়া দিয়াছেন, আমীর খুব পরিশ্রমী, বিলাসিতার প্রতি তাঁহার এরূপ বিরাগ যে, তিনি প্রাসাদের মূল্যবান্ গালিচা আদি বিক্রয় করিয়া সে টাকা লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন; আমীর বিদেশী দ্রব্যের উপর এমন বিতৃষ্ণ যে, এক দিন তিনি স্বহস্তে কাঁচি দিয়া রাজকর্ম্মচারী ও নিমন্ত্রিতদের বিদেশী পোষাক কাটিয়া দিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের প্রাণদণ্ডাদেশে অসম্মত হওয়ায় গ্রীক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

১১ই অগ্রহায়ণ—

দ্বারভাঙ্গার অসহযোগী উকীল, চম্পারণ হাঙ্গামার সময় মহাত্মার সহযোগী শ্রীযুত ব্রজকিশোরপ্রসাদ গয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত। জাঞ্জিবারের সংবাদ, সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে তথায় ৭০ হাজার টাকার খদ্দর রপ্তানী হইয়াছে। কচুরী পানা ধ্বংসের জন্য জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলিকে অনু-রোধ করিবার এক প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত। ময়মনসিং ঈশ্বরগঞ্জ থানায় সহনটী গ্রামে আসামী গ্রেপ্তারে পুলিসের সহিত আসামীর সংঘর্ষ, আসামীর স্ত্রীও পুলিসকে প্রহার করে। বিহার ব্যয়-সঙ্কোচ কমি-টীর তদন্ত শেষ; সকল স্থানেই খরচ কমাইবার প্রার্থনা। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পক সভায় সামান্য অপরাধের অসহযোগী বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা অগ্রাহ্য। শ্রীযুত অমূল্যধন আঢ্য খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানী শুল্কের হার বাড়াইয়া দিবার এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভী ও গো-বৎস হত্যা নিষেধের প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সন্নিহিত প্রাচীর সমস্যায় বৃটিশকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ অপেক্ষা এ বৎসর আরও সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া অনুমান। ভূতপূর্ব্ব সুলতানের জন্যও কিছু ব্যয় করিতে হইবে। কনস্তান্তিনোপলে বৃটিশ দূতাবাসে আবার ১৪০ জন আঙ্গোরা শত্রু আশ্রয় লইয়াছে।

১২ই অগ্রহায়ণ—

গুরুকাবাগের নিকট দুই জন আকালী হত্যার অভিযোগ হইতে আসামী কনষ্টেবল ছয় জনের অব্যাহতি। গঞ্জাম, বহরমপুরে গবর্ণর গমনে হরতাল। পাবনার ডাকাতি মামলার আসামী পাঁচু দায়রার বিচারে মুক্ত; পাঁচু ও আর এক ব্যক্তি (সে জেল হাস-পাতালে হৃদরোগে মারা গিয়াছে) পুলিসের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ করিয়াছিল; জজ সে জন্য পুলিসের সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, কলিকাতার শ্যামপুকুর থানায় বড়ীত্র থানার কাজে ইনস্পেক্টার সসপেণ্ড ও অভিযুক্ত হইয়াছে।

রেওয়া রাজ্যের কর্ম্মচারী শ্রীযুত এ ডি পটবর্দ্ধন য়ুরোপে বিমানবিদ্যা শিখিয়া রেওয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নে প্রকাশ, গন্ধী টুপী পরিধান সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ নহে। কলিকাতায় মিউনিসিপাল মামলার রায়, আসামী মিঃ মাইকেল ও মিঃ বিলিংহাষ্ট এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

১৩ই অগ্রহায়ণ—

সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যাহার; কলিকাতা হাইকোর্টে সার্জেণ্ট মানহানি মামলার আপীলের বিচার আরম্ভ। গুজরাটের আল ওয়াহিদ প্রেসের পরিচালক বক্তৃতা দেওয়ায় এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ঝান্সী জেলা কংগ্রেসের সহযোগী সম্পাদক মৌলানা জালালুদ্দীন আহম্মদের প্রতি ১২৪এ ও ১৫৩এ ধারায় ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। রায়পুর জেলে চার জন অসহযোগী তাঁহাদের অবস্থার প্রতীকার জন্য প্রায়োপবেশন করায় উল্টা ফল। খদ্দর প্রচার বিভাগের সংবাদ, বিস্তর জাপানী ও বিলাতী খদ্দরকে খাঁটী বলিয়া বাজারে চালান হইতেছে; সম্প্রতি আবার সাট সত্তর হাজার গাইট মার্কিণ খদ্দর বোম্বায়ে আমদানী হইয়াছে। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তর-বঙ্গের বন্যার কারণ নির্দ্দেশের সভা; রেলের বাঁধই কারণ, জলনিকাশের পথ হওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রামের এক বাবুর্চ্চী কোন শ্বেতাঙ্গকে প্রহার করায় ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দিল্লী রচনার ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমিটী বসিয়াছিল, ফতোয়া—রচনা চলিবে। কলিকাতা করপোরেশনের সভায় প্রকাশ, বিদ্যাধরী পলি ভরিয়া আসিতেছে, সহরের জলনিকাশে আশঙ্কা। গ্রীসের ছয় জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ডে বৃটিশ মন্ত্রীর এথেন্স ত্যাগ। মিশরে জগলুল পাশার দলের প্রাবল্যে মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ; রাজার সহানুভূতিও জগলুলীদের প্রতি।

১৪ই অগ্রহায়ণ—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, মহাত্মার পুত্র শ্রীযুত দেবীদাস গন্ধী লক্ষ্ণৌ জেলে নিয়মকানুন ভঙ্গ করায় তাঁহাকে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না। বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক যুগবাণী বাজেয়াপ্ত। শিয়ালকোটে নেতাদের মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে স্থানীয় ছয় জন পুলিসকে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা। অতি বৃষ্টিতে ত্রিচিনপল্লীতে রেলপথ জখম। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগকে সাহায্য করিবার জন্য সার মহম্মদ সফী ও শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস মনোনীত। বোম্বাই, থানা জেলায় বিরারে স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে কাউন্সিল পক্ষপাতী ও বিরোধী দলের বিরোধ, ১৫ জন আহত। নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লীনের বদলী উপলক্ষে ভোজাদিতে সাত শত টাকা ব্যয় করায় মিঃ লীনের ভৎসনা, টাকাটা বন্যা সাহায্যে দিলে শোভন হইত। ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে ঝড়ের ফলে কুমারিকা অন্তরীপের নিকট একখানা লবণের জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, ৭ জন নাবিক প্রাণ হারাইয়াছে। লসেন বৈঠকে তুর্কীর চৌদ্দ দফা সর্ত্ত—দার্দ্দানেলিজ ও বসফোরাস সম্পর্কে, কনস্তান্তিনোপলের অবস্থা, ক্যাপিচুলেশানের বিলোপ, গ্রীক ও তুর্কী প্রজার সংখ্যা অনুসারে অদল-বদল, কুর্দ্দি এলাকাভুক্ত এরাক, আরবের রাজ্যগুলির স্বাধীনতা, বাগদাদে রেল, ম্যাসিডোনিয়ায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সার্ভিয়ার স্বাধীন বন্দর, বুলগেরিয়াকে দেদিয়াগচ প্রদান ও পশ্চিম থ্রেসে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ডিমুটিকা, আনাটোলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলি, খেলাফৎ, তুর্কীর ঋণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত তুর্কীর জাহাজগুলির প্রত্যর্পণ। কনস্তান্তিনোপলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও শেখ-উল-ইসলামের মক্কা যাত্রা। গ্রীসে তিন জন সেনাপতি গ্রেপ্তার।

১৫ই অগ্রহায়ণ—

আমেদাবাদে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পূর্ণ তেজে পিকেটিং। বোম্বায়ে খদ্দর ফেরীর জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান। ফরিদপুরে সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য মেয়েদিগকে বাগানের কায শিখান; অভিভাবকদের আপত্তির সংবাদ। ত্রিবন্দ্রমে ভীষণ ঝড়, টেলিগ্রামের লাইন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ, সৈদাপেটো মিউনিসিপাল কাউন্সিলে দুই জন মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মার্কিণ নিউইয়র্কের মেয়র মিঃ জন হাইলানের মুখে ভারতের প্রশংসা ও বর্ত্তমান মুক্তি-সংগ্রামে সহানুভূতি।

১৬ই অগ্রহায়ণ—

মহাত্মার কারাদণ্ডে সালেমে ডাঃ পি বরদা রাজলু নাইডুর আয়কর প্রদানে অসম্মতি। সিংহল ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষের ব্যবহারে নব-নির্ব্বাচিত সদস্যদের শপথ লইতে অসম্মতি। মাদুরার বন্যায় সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন; রেল লাইন ধ্বসিয়া গিয়াছে। মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অর্থের অনাটনে বাৎসরিক ৩২ হাজার টাকা কম খরচের ব্যবস্থা। ব্যাভেরিয়ায় মিত্রশক্তির কর্ম্মচারীরা প্রহৃত হওয়ায় যুক্তপ্রদেশের দশলক্ষ মার্ক জরিমানা। ব্যাভেরিয়া জরিমানা আদায়ে অসম্মত। বিলাতে এটর্ণিগিরি পরীক্ষায় ৪ জন মহিলার সাফল্য। চৈনিক প্রেসিডেণ্টের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমান প্রতিনিধিদের লইয়া আঙ্গোরায় ধর্ম্মসংক্রান্ত মহা পরিষদ বসাইবার সঙ্কল্প।

১৭ই অগ্রহায়ণ—

কাছাড় জেলার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত মহাশয়ের কারামুক্তির সংবাদ; হোমের সুবিধা না পাওয়ায় ইনি জেলে বহুবার প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সদলবলে সান্তাহারে বন্যা অঞ্চল পরিদর্শন। বঙ্গীয় রিলীফ কমিটীর হিসাব—৩০ শে নবেম্বর পর্য্যন্ত নগদে ও জিনিষপত্রে ৫১১৯৮৫৮৴০ সংগৃহীত হইয়াছে। সামরিক বিচারে গ্রীক যুবরাজের পদগৌরব কমাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাকে এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, যুবরাজ বৃটিশ রণতরীতে এথেন্স ত্যাগ করিয়াছেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ—

বিহার লাটের পত্নী লেডী হুইলার ও সার আলেক্‌জাণ্ডার মুডিম্যান (রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি) স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট না থাকায়, প্রবেশপথে পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা পান, পরে ভিতরে খবর পাঠাইয়া তাঁহারা সে দায় হইতে অব্যাহতি পান। ডাক বিভাগীয় তদন্তের সময় ফেণী পোষ্ট অফিসের মেল পিয়ন দুই জনকে ভীষণ প্রহার করিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া দিবার অভিযোগে ডাক বিভাগীয় ইনস্পেক্টার, লাকসাম রেল পুলিশের দারোগা ও ফেণী থানার তিনজন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে মামলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার টানাটানিতে দেশবাসীর নিকট হইতে ভাইস চান্সেলারের সাহায্য প্রার্থনা; তিনি গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তে তাঁহাদের অর্থ লইতে অসম্মত। জেনারেল পেরিরা পিকিন হইতে স্থলপথে পদব্রজে হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন; অধিকাংশ স্থানেই তাঁহাকে পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইয়াছে; এই ভ্রমণে দুই বৎসর লাগিয়াছে। ঢাকা সোনারঙ্গের শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক কলিকাতা শোভাবাজারে শ্রীমতী আশালতা নামে একটি অন্ধবালিকার পাণিগ্রহণ। মস্কোউ সহরে কমিউনিষ্টদের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন; য়ুরোপ, ভারতবর্ষ, চীন, মেসোপোটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মিশরে বিদ্রোহ বাধাইবার আলোচনা। লুসেন বৈঠকে তুরস্কের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, বৃটিশের চক্রান্তের অভিযোগ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কৰ্দ্দমে কমল

১৯২৩ সনের বোম্বাই প্রদর্শনীতে মেডেল প্রাপ্ত

চিত্র শিল্পী — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

১ম বর্ষ } ২য় * ফাল্গুন, ১৩২৯ * খণ্ড { ৪র্থ সংখ্যা

অন্ন-সমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা।

মহামতি গোখলে এক দিন বাঙ্গালীর ললাটে গৌরব-টীকা দিয়া বলিয়াছিলেন,—"What Bengal thinks to-day, the whole of India will think to-morrow" ভারতবর্ষে বাঙ্গালীই নব নব চিন্তার প্রবর্ত্তক। বাস্তবিক এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালী কি ভাবে, বাঙ্গালী কি বলে, বাঙ্গালার চিন্তা কি নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছে, বাঙ্গালী জাতীয় উন্নতির কি নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছে, এই সব জানিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক বাঙ্গালার দিকে সাগ্রহে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু সে গৌরব বাঙ্গালী আজ হারাইতে বসিয়াছে। যে ছিল সকলের অগ্রগামী, সে আজ জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছে। ডিগ্রীপ্রিয়, চাকরীপ্রিয়, বাঙ্গালী বিলাসের আরামশয্যায়, আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল, আজ বড় দুঃখেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেছে। বুদ্ধির অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া সে জীবন-সংগ্রামে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে,—তাই আজ প্রকৃতির এই নির্ম্মম প্রতিশোধ।

প্রথম বয়সে, যৌবনের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর ছেলে যখন কলেজে প্রবেশ করে, তখন তাহার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মুখখানি দেখিয়াছি; কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করিয়া সে যখন জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে, তখন সেই আশার আলো বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যায় কেন? সে দিন যে হাসিয়াছিল, আজ সে কাঁদে কেন? বাঙ্গালীর অক্ষমতার বোঝা সরাইয়া দিয়া তাহার বিষাদের অশ্রুধারা কে আজ মুছাইয়া দিবে? নবীন আশার সঞ্জীবনী বাণী দিয়া কে আজ তাহার শৈবালাচ্ছন্ন জীবনস্রোতে নূতন প্রবাহ আনিয়া দিবে?

এই দুঃখ দূর করিবার ভার বাঙ্গালী যুবককে আপনিই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে, বাঙ্গালার সমাজদেহে কত দূর পর্য্যন্ত অক্ষমতা-ব্যাধি বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহা হইলেই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। তখন বাঙ্গালী যুবক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা আত্মচরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই এ সমস্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। আজ শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ শিক্ষকতা করিয়া আমি বাঙ্গালী ছাত্রের নাড়ীনক্ষত্র সবই বুঝিয়াছি এবং জীবনসংগ্রামে তাহার এই শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করিয়াছি। তাই আমি যখনই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলি, তখন সেই একই কথা বলি—তত্ত্বকথা নয়, কাব্যকথা নয়, সেই একই কথা—অন্ন-সমস্যা,

বস্ত্র-সমস্যা, জীবন-সমস্যা, কি উপায়ে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া সুস্থদেহে বাঙ্গালী যুবক উন্নততর জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিবে। এক জন নিরপেক্ষ ইংরাজ সে দিন দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী বিচার করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সভার সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে মান্দ্রাজবাসী আজ সকলের অগ্রণী, বোম্বাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছেন এবং বাঙ্গালী তৃতীয় ও সর্ব্বনিম্নে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে মহামতি গোখলের বাঙ্গালীর সম্বন্ধে উক্তি তুলনা করিয়া বাঙ্গালীর অবনতির বিষয় উপলব্ধি করুন। বাঙ্গালার সে গৌরবরবি আজ মেঘাচ্ছন্ন না চিরতরে অস্তমিত?

তাহার পর জীবনসংগ্রামের এক একটি প্রধান দিক লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উন্নতির সকল প্রকার পথ হইতে বিতাড়িত হইলে, অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ যদি খাইতে না পায়, পরিতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদ না করে, যুবকের মুখের হাসি না ফুটিতেই যদি মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করিতে পারিবে? তাই আজ বাঙ্গালার চারিদিকে হাহাকার। এই দেশব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদেও যদি বাঙ্গালী যুবকের মোহ না ঘুচে, এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যদি সে ডিগ্রী ও চাকরীর মায়ায় এবং উৎকট ভোগের অনাচারে মজিয়া থাকে, তবে তাহার সে দুর্ভাগ্য বর্ণনা অপেক্ষা নীরব অনুভূতির দ্বারা সমধিক বুঝিতে পারা যাইবে।

ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালী একরূপ সুখে ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, ঘরে ঘরে চরকা—বাঙ্গালীর অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ছিল না। তখন বাঙ্গালী ছিল বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—জীবন-সংগ্রামে কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাঙ্গালায় লাগে নাই। তাহার পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আপন জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। সেই যে পরাজয় আরম্ভ হইল, আজও সেই পরাজয়েরই পালা চলিতেছে। দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইল, বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হইল, বাঙ্গালী কৃষকের দেহের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন করা ফসলে বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিল, আর বাঙ্গালী অবাক্‌বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধি-লিপি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, মুখটি বুজিয়া, হাতটি গুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল! তাহার পর অন্নপূর্ণার দেশে হইল অন্নাভাব। আজ শুধু কলিকাতায় নহে, পল্লীগ্রামেও খাঁটি দুগ্ধের সের অনেক সময় আট আনা,—আর মাছ বলিয়া আমরা যাহা খাই, তাহাতে বস্তু ত কিছুই নাই, হোমিওপ্যাথিক মাপে খাওয়া, সে কেবল মনকে প্রবোধ দিবার জন্য। কোন রকমে ঘাসপাতা খাইয়া আজ আমরা জীবনধারন করিতেছি—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কোনমতে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছি না—আর আমাদের দুর্গতির সকল দোষ আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিতেছি—"ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশের ধনধান্য লুটিয়া লইয়া যাইতেছে।"

আজকাল রব উঠিয়াছে—বিহার বিহারীদের, আসাম আসামীদের, উড়িষ্যা উড়িয়াদের। কিন্তু বাঙ্গালা সকলের —সকলেরই জন্য বাঙ্গালী ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া দিব্য আরাম-শয্যায় পড়িয়া আছে, কেন না, বাঙ্গালী বড় পার-মার্থিক জাতি, বিশ্বকে আপন করিতে চাহে, তা সে জন্য যদি অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হয়, সেও স্বীকার। বাঙ্গা-লার দ্বার সব সময়েই খোলা। কলিকাতায় চৌরঙ্গী, এক্‌স্‌-চেঞ্জ যে স্থানেই যাইবেন, দেখিবেন, আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির মত কেমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের অস্থি পরো-পকারায় অকাতরে দান করিতেছি। রেলী, গ্রাহাম, গিলিনডারস্, টারনার মরিসন্ প্রভৃতি বিদেশী বণিকের উপকারার্থ আমরা অম্লানবদনে, সকল লজ্জার পারে যাইয়া কেরাণীগিরী করিতেছি। আবার আর একদিকে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা—ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্য অন্য ক্ষেত্র করতলগত করিতেছে—আমরা তাহাদের হিসাব লিখিয়া মাস মাহিয়ানা লইয়া আসিতে পরমানন্দে পান চিবাইয়া কলম পিষিতেছি—আর অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কারের ডাকে আকাশ ফাটাইয়া বলিতেছি,—"হুঁ, ওরা ছাতুখোর, খোট্টা, অসভ্য!"

ঠিক কথাই ত! যাহারা আপন পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অক্লান্তচেষ্টায় বিপুল ধনের অধীশ্বর হইতেছে—তাহারা ত অসভ্য বটেই; পরন্তু যাঁহারা ফিনফিনে পঞ্জাবী পরিয়া, পম্প সু পায়ে দিয়া, মাথায় টেরী বাগাইয়া তাহাদের ফারমে ২৫।৩০।৪০ টাকা মাহিয়ানায় চাকরী করিতেছেন, তাঁহারা সভ্য বটেনই—বাবু বটেনই! বড়বাজার ত মাড়োয়ারীর একচেটিয়া হইয়াছে—এ দিকে হ্যারিসন রোডের দুই পার্শ্বের বাঙ্গালীটোলা মাড়োয়ারীর হস্তগত হইয়াছে;—ক্রমশঃ কলিকাতার অন্যান্য স্থানও তাহাদের হস্তগত হইতেছে। বাবুকে বাবু হইয়া এবার যে বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ীর এক এক অংশে পায়রার খোপের মত ২।৩টি ছোট ছোট ঘরে সপরিবারে আশ্রয় লইতে হইবে, সে ভাবনা সভ্য বাবু ভাবিতেছেন কি?

কেরাণীর ত এই দশা। বাঙ্গালী শ্রমজীবীর দশাও কিছু ভাল নহে। প্রায় ৫০ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি, প্লামবার (Plumber) সব উড়িয়া; জল, ড্রেন, গ্যাসের কায ইহারাই করে। পাচক "ব্রাহ্মণ" হয় উড়িয়া, নহে ত হিন্দুস্থানী। পল্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি উড়িয়া "বামুন" ও হিন্দুস্থানী "বেয়ারা"। বাঙ্গালা দেশের ধনধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত, প্রত্যেক বাড়ীতেই কি মাটীতে লোহার সিন্দুক প্রোথিত, অন্নাভাবের কি এতই অভাব যে, বাঙ্গালী কাহারও মুটে, মজুর, বেহারা হইবার দরকার নাই?

৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, জুতা-ব্যবসায়ী চীনারা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট দখল করিয়াছে। এখন দেখিতেছি, লালবাজার, ফৌজদারী বালাখানা প্রভৃতি স্থানও তাহারা অধিকার করিয়াছে। জুতা-ব্যবসায়ী প্রায় সবই চীনা; এক আধ জন ভারতীয় অবাঙ্গালী। আবার কলিকাতায় ও মফঃস্বলের সহরে ছুতারের কায চীনারা একচেটিয়া করিয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী ছুতার একবারে "জাত-ব্যবসা" ত্যাগ করিতেছে। বাঙ্গালী ছুতার আজ প্রায় নিরন্ন। চীনে ছুতারের অনেক গুণ, তাহারা ফাঁকি দেয় না—তাহাদের উপর কাযের ভার দিয়া ভরসা পাওয়া যায়। দৃষ্টির আড়াল করিলে ইহারা হাত গুটাইয়া হুঁকা লইয়া গ্যাঁকির আসর জমায় না। চীনাদের মজুরী বেশী, কিন্তু সত্যর তিন অবস্থা দেখিয়া লোক বেশী মজুরী দিয়াও তাহাদিগকে কায দেয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় বড় বড় কায চীনা ছুতার কনট্রাক্ট লইতেছে। তাহারা সমবেত হইয়া কায করিয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি করিতেছে। বাঙ্গালী ঝগড়া করিতে জানে, সমবেত হইতে জানে না—কাযেই হটিয়া যাইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সব কাঠের গোলার মালিক ছিল বাঙ্গালী; এখন চাঁপাতলা অঞ্চলে যাইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, চীনা মিস্ত্রী কাঠের গোলার মালিক হইয়াছে, আর তাহাদেরই সাবেক মনিবগণ সেই সব গোলায় কেরাণীর কায করিতেছে। এই অশিক্ষিত চীনারা পিকিং, ন্যানকিন, ক্যাণ্টন হইতে বিনা মূলধনে এ দেশে আসিয়া আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করিতেছে, আর আমরা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছি! জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অন্য জাতি প্রবেশলাভ করিয়া সব অধিকার করিয়া লইতেছে, আর আমরা তিল তিল করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। চীনারা আমাদের ভাষা জানে না, কথা বুঝে না, অথচ বাঙ্গালার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া বড় বড় কাঠের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতেছে, আর আমরা একেবারে চুপ—যেন জড়ভরত।

রেল-ষ্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে কুলী, মজুর সবই হিন্দুস্থানী। রেল ষ্টেশন হইতে আধ ক্রোশের মধ্যেই বাঙ্গালীর গ্রাম আছে। ইচ্ছা করিলে ট্রেণের বাঁশী শুনিয়া ষ্টেশনে আসিয়া মাল উঠানামা করিয়া বাঙ্গালী চাষী অক্লেশে দৈনিক আট আনা উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা জমীর মালিক; তাহারা কি এই ঘৃণিত কুলীগিরী করিতে পারে? ইহাতে যে ইজ্জত নষ্ট হইবে! এদিকে দারিদ্র্যের ত শেষ নাই,—ঋণে ডুবু ডুবু;—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, মহামারী ত চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রেল-ষ্টেশনের ধারে ধারে হিন্দুস্থানীদের উপনিবেশ হইয়াছে। তাহারা 'গেটেখুটে' দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

এইরূপ আলস্য ও শ্রমবিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির কারণ। শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞান আমাদের আদৌ নাই বলিলেই চলে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমতার নিকটস্থ কোন গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। গন্তব্য স্থান রেল-ষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে। বৃষ্টি হইয়াছে, অনেক কষ্টে পাল্কী জুটিল ত বেহারা জুটিল না।

সে স্থানে গরীব চাষীর ত অভাব নাই; কিন্তু দিন গুজরাণ অসাধ্য হইলেও পাল্কীবহা! সে কি হয়?—সে যে অসাধ্য! মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও দেখিতে পাই, কোথাও কোথাও একটা ইলিশমাছ কিনিয়া মুটে খুঁজেন কিংবা সন্ধ্যার আঁধারে এদিক ওদিক করিয়া লুকাইয়া আনেন—যেন চুরী করিতেছেন। আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে এইরূপ বিষময় ধারণা আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

এদিকে বড় সাধের কেরাণীগিরীও যাইতে বসিয়াছে। মান্দ্রাজী আসিয়া বাঙ্গালীর স্থান দখল করিতেছেন। বাঙ্গালী যায় কোথায়? নিরামিষাশী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ ভাতের সঙ্গে একটু তেঁতুলজল পাইলেই খুসী—আর চাকরীতেও—বাঙ্গালীর তুলনায় কম মাহিয়ানায় কায করিতে পারেন—আর তাঁহাদের বাসা—চ্যাটাইঘেরা বারাণ্ডায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর হটিবার লক্ষণ সপ্রকাশ হইয়াছে।

আমাদের যুবকরা ডিগ্রী ও চাকরীর মোহ ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে এ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ব্যবসা ও শ্রমের মর্য্যাদা বুঝেন এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইতে শিখেন, তবে তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল গুণের আদর করিতে শিখিবে। তাঁহাদের বিলাসের বীজ আজ সমাজের নিম্নস্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—চাষী আজ রেলী ব্রাদার্সের মিহি কাপড় খুঁজে, মোটা কাপড় আর পরিতে পারে না, তাহার কারণ, সমাজের উচ্চস্তরের লোকরা সৌখীন ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। আমি শিক্ষক বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ী। ৭।৮টি ব্যবসায়-ব্যাপারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কৃতী সার রাজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিয়া তাঁহাদের এই মত জানিয়াছি যে, জাতীয় চরিত্রের দোষ, ত্রুটি সংশোধিত না হইলে আমাদের অন্ন-সমস্যা দূর হইবার কোন আশা নাই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও অতি সামান্য কার্য্য হইতে ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছেন। কার্ণেগী প্রথম ছিলেন Telegraph boy. ব্যবসায় হইতে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কারবার ক্রয় করিবার জন্য ৯ কোটি টাকা মূলধনের একটা syndicate বা সঙ্ঘ গড়িতে হইয়াছিল। Empire of Business (ব্যবসায় সাম্রাজ্য) নামক তাঁহার একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন,—"ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে আফিস ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।" শিক্ষাভিমানী, বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী যুবককে এ কথা বলিলে তাঁহার যে সৌখীন প্রাণটি—বিধাতা শুধু 'দখিণ হাওয়ায় দোদুল্ দোল্‌বার জন্য গড়েছেন'—সেই প্রাণটি আঘাতে শিহরিয়া উঠিবে। ক্রমাগত ব্যবসায়ের কথা প্রচার করায় অনেকে অভিযোগ করেন যে, আমি দেশের যুবকদের মাড়োয়ারী হইতে উপদেশ দিতেছি। আমি নিতান্ত গণ্ডমূর্খ নহি, এখনও সকালবেলা ৯টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমাকে বিজ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আমি "লেখাপড়া ছেড়ে দাও" এ কথা কদাচ বলি না। আমি বলি, শিক্ষিত হও—কিন্তু ডিগ্রী ও চাকরীর ব্যাধিমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকাসংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ কর।

Empire of Business নামক পুস্তকে বারংবার একটি কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—শিক্ষার্থীকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। হীনতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জনের প্রয়াস আমাদের যুবকগণের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের যুবকগণ এক মাস বা দেড় মাসে সকল দিকে একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, "সব শিখে নিয়েছি—এইবার টেবল, চেয়ার ও বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া দিয়ে আমাকে একটা বিভাগের কর্ত্তা ক'রে দিন, আমি হ্যাট, কোট, টাই এঁটে একবার কাযে লেগে যাই।" এইরূপ ধৈর্য্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকলেই কল্পনা করিতে পারেন।

ইংরাজীতে ফাষ্ট ক্লাস এম্, এ,—সেক্সপীয়র, মিল্টনের গৎ আওড়াইতে পটু—মাড়োয়ারীর দোকানে কেরাণী হইয়া তাহার নাগরীর তর্জ্জমা করিতেছেন। তাই বলি, ঘোড়া বেকুব না সওয়ার বেকুব? বুদ্ধিমান্ কে? যে চালায়, না যে চলে? রামযশ আগরওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হইলে কথাবার্ত্তা হইল হিন্দী ভাষায়। তিনি

প্রথমে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন, তাহার পর মুদীর দোকান করেন। এখন তিনি ক্রোরপতি—বড় বড় কয়লা-খনির স্বত্বাধিকারী। শীতলপ্রসাদ খড়্গপ্রসাদ বারাণসীর রাজা মোতিচাঁদের ফারম এত বড় ব্যাঙ্কার যে, এক টুকরা তুলট কাগজের কোণ ছিঁড়িয়া একটু লিখিয়া দিলেই সেই দেবনাগরী অক্ষরে অদ্ভুত লিখার জোরে চাহিবা মাত্রই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা মিলে। এত বড় অর্থপ্রতিষ্ঠান যাঁহারা চালাইয়া আসিতেছেন, বুদ্ধিমত্তা তাঁহাদের নয়, আর বুদ্ধি তাঁহাদের, যাঁহারা পাশ করিয়া উপবাস দিতেছেন!

আমরা দোকান করিয়া ফেল মারি। কেহ কাহারও অংশীদার হইয়া ব্যবসা করিতে জানি না; এরূপ ব্যবসা আরম্ভ করিলেই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করি। আর তিন মাস অসুখ হইলে বা অন্য কারণে চক্ষুর আড়ালে থাকিলে অংশীদারকে দিব্য ফাঁকি দিয়া ফেলি; ধর্ম্মবুদ্ধি—ন্যায়বুদ্ধি তখন রসাতলে অদৃশ্য হইয়া যায়। আর বাস্তবিক আমরা যে বুদ্ধির বড়াই করি, সে কেবল পাশকরা বুদ্ধি—তাহার মধ্যে প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস কিছুই নাই; সে কেমন একটা বিশ্রী ধার—যাহা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে, কিন্তু শক্ত করিয়া গড়িতে পারে না। আর আমরা যাহাদের প্রতি অনুকম্পাবশে নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া থাকি, সেই ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, নাখোদা প্রভৃতি ইংলণ্ড, জাপান, নিউইয়র্ক, উগাণ্ডা, কেনিয়া ও অন্যান্য স্থানে যৌথ-ভাবে ব্যবসায়কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ক্রোর ক্রোর টাকা উপার্জ্জন করিয়া ঘরে আনেন। ছাতুখোর, ইঁহারা আর আমরা সব মাথাওয়ালা! আমাদের মগজে ঘি আর ইঁহাদের মগজ গোবরভরা! হায় হায়, এ ভুল কবে কাটিবে?

প্রকৃত কথা, কেতাবী বুদ্ধির দৌড় কতটুকু, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। ভূগোল জানিতে হইবে না, ইতিহাসের প্রয়োজন নাই—অবাধে গ্রাজুয়েট হওয়া চলিবে। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা না জানিয়াই ফার্ষ্ট ক্লাস এম্, এ, হওয়া আটকাইবে না। এমনও দেখিয়াছি, নূতন নিয়মে I. C. S. পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন, কিন্তু Italian War of Independence (ইটালীর স্বাধীনতা সমর) অথবা American Civil-War (আমেরিকার অন্তর্বিগ্রহ) সম্বন্ধে একবারে অনভিজ্ঞ! একটু ভটি, একটু Paradise Lost ঠুকরিয়া আর মুক্তিনাথ, তারাকুমারের স্মরণ লইয়া যে বিদ্যা হয়, তাহার কাছে স্বয়ং মা সরস্বতীকেও বুঝি হারি মানিতে হয়! ভারতে যাঁহারা রাজ্যগঠন করিয়াছেন, সেই আকবর, শিবাজী, হায়দার আলি, রণজিৎ কেহই কেতাবী বিদ্যার ধার ধারিতেন না—প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিকথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। মন্ত্রীদের সাহায্যে আকবর সেনাবিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ প্রভৃতির কি অদ্ভুত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। আকবর নিজে বিহঙ্গতত্ত্বের অনুশীলনে আনন্দ অনুভব করিতেন। আমাদের দেশে অনেক মহিলার প্রতিভার কথা বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু ইঁহারাও পুঁথিগত বিদ্যায় বিদুষী ছিলেন না। বহি না পড়িয়াও যে আত্মোন্নতি করা সম্ভব, তাহা অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম প্রভৃতির জীবনকথা হইতে জানা যায়। ভূপাল রাজ্যে মহিলারা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হয়েন, এ কথা কোবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার Subjection of Women নামক গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা সহকারে রাজ্যশাসন করিয়াছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠ্যা-বস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশ গুণ শিখা উচিত। 'সিলেবাসে' (syllabusএ) নাই—পরীক্ষায় কাযে লাগিবে না: অতএব পড়িব না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জ্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। আর মুখস্থ, কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করিবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপক-ভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে পাশকরা বুদ্ধি প্রায়ই "অকেজো" হইয়া দাঁড়ায়। বাবু সুন্দরমল গিরিডি অঞ্চলে খুব বড় অভ্রখনির মালিক। ইঁহার অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এস-সি, পাশকরা ছেলেরা Chemist Babu (কেমিষ্ট বাবু) হইয়া নকরী করিতে যাইবেন। সুন্দরমল Chemistry (রসায়ন শাস্ত্র) বা Geologyর (ভূতত্ত্ব) ধার ধারেন না। কিন্তু ইঁহাদের

"কেযো" বুদ্ধি এমনই চমৎকার, বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি এতই সুপরিস্ফুট যে, কোথায় কিরূপ অভ্র পাওয়া যাইবে, সহজেই বুঝিতে পারেন এবং সেই সমস্ত স্থান মৌরসী লইয়া অভ্রের খনির কার্য্য আরম্ভ করেন। আমাদের পাশকরা ছেলেদের কখনও এই সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধি খুলে না। তাঁহারা চল্‌তি কারবারে চাকরী করিতেই জানেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা বি, এ, পড়েন, তাঁহাদের বৎসরে ৬ মাস ছুটী, আর যাঁহারা বি,এর পরে অন্য পড়া পড়িতেছেন, তাঁহাদের ছুটী ৭ মাস। এই ছুটীর মাসগুলি ছাত্ররা দেশে যাইয়া কি ভাবে কাটাইয়া দেয়, আমি সন্ধানী লোক রাখিয়া তাহার সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সব ছাত্রের দিন যাপন করিবার প্রধান অবলম্বন তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা আর ইচ্ছামত দিনের বেলা ঘুম; আড্ডার অতি সুবিস্তৃত আয়োজন। এক জন সবল সুস্থ যুবক যে কেমন করিয়া বহু মূল্য সময় এইরূপে নষ্ট করে, তাহা আমার বোধগম্য নহে। ৬০ বৎসর বয়সের আফিমখোর সম্বন্ধে এই দিবানিদ্রা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠদান এই দিবালোকে বলিষ্ঠ যুবক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করে, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! কত কায করিবার আছে; ঐ পল্লীগ্রামে, কত নিরক্ষর, কত অস্বাস্থ্য, কত অজ্ঞতা, উন্নতিশীল চলন্ত জাতিসমূহের কত পশ্চাতে কোন্ অন্ধকারে অবস্থান— তবুও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই হতভাগ্য জাতির সেবায় পরাঙ্মুখ; আপন দেশভাইকে ভাই বলিতে, ভালবাসিতে পারে না। প্রাসাদোপম হোষ্টেলের আড্ডা, থিয়েটার, বায়স্কোপ আর পাশের নেশা দেশের শিক্ষিত যুবকের মধ্যে কি যে বিষম বিষ ঢালিয়া দিতেছে, কে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করে? এই অভিশপ্ত জাতির উদ্ধার-চেষ্টায় পল্লীই যে আমাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, শিক্ষাভিমানী বিলাসী যুবক কবে সে কথা অকপটে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন?

ইংরাজ বালক মাতৃ-ক্রোড়েই কত কথা শিখে! তাহার পর স্কুলকলেজে তাহার জ্ঞানস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভ্রমণকাহিনী, বীরত্বকাহিনী প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার চিত্ত প্রসার লাভ করে। মাঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পর্য্যটকের আফ্রিকা-ভ্রমণের কথা, রবিন্‌সন ক্রুশোর অসমসাহসিকতার বিবরণ পাঠ করিয়া বাল্যকালেই তাহার চিত্তবৃত্তিসকল একটা গতি পায় এবং বিকসিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশে বালকের মনও যেন আনন্দহীনতায় অসাড় হইয়া পড়িতেছে। এই ত সে দিন হিমালয়ের দুরধিগম্য শৃঙ্গে আরোহণ করিবার কত চেষ্টা হইল; কিন্তু কয়জন যুবক তাহার রীতিমত সংবাদ রাখে? এই সেদিন কয়জন বিমানচারী কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কি দশা হইয়াছে, তাহার সংবাদ জানিতে কয়জন যুবক কৌতূহলী হইয়াছিলেন? আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। অজানাকে জানিবার, অদেখাকে দেখিবার বা অচেনাকে চিনিবার উল্লাস আমাদের কোথায়? শুধু আলস্যের আরাম-শয্যায় শয়ন করিয়া আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতেছি।

ফাঁকি দিয়া পাশ করিলে শুধু ফাঁকে পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? ডাক্তার জনসন্ কত বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিক্ষা পাঠাগারে—এক একটা লাইব্রেরীর সকল পুস্তক তিনি পাঠ করিয়া ফেলিতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, Lightning conductorএর প্রবর্ত্তক এবং আমেরিকায় স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ জীবনের প্রথম দশায় এক জন বালক মুদ্রাকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক এডিসন কয়েক মাস মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত আবিষ্কারক জগতে খুব কমই আছে। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া "নোট" মুখস্থ করিয়া পাশ করিলে বিদ্যার দৌড় আর কতটুকু হইবে?

আজ বাঙ্গালীর পরাজয় পদে পদে। বাঙ্গালী কেন পারে না? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর বাঙ্গালী অধ্যবসায়হীন—বাঙ্গালীর মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা নাই; "উড়ু উড়ু" মন—কোন কাযের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা সাধন করিবার জন্য বাঙ্গালী দৃঢ়ভাবে "লেগে পড়ে" থাকিতে পারে না। আজকাল কলেজের ছাত্রদের যদি জিজ্ঞাসা করি,—"ওহে ল (আইন) পড়ছ না কি?" অমনই কৈফিয়তের সুরে উত্তর হয়—"আজ্ঞে হাঁ,—

পড়ছি, কিন্তু ওকালতী করবো না।" "দু'মনা" হইয়া এই ভাবিয়া চলিবার অভ্যাসে প্রথম বয়সের চেষ্টা, উৎসাহ সবই শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু মাড়োয়ারী প্রথম বয়সের উৎসাহচেষ্টায় কৃতী হইয়া উঠে। সে অতিবুদ্ধি নহে, তাই তাহার পশ্চাতে দড়ি বাঁধা নাই। আবশ্যক হইলে তাহার ঝাড়ু দিতে বা আধ মণ মোট বহন করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর "প্রেষ্টিজ" জ্ঞানটা খুব টনটনে!

ইংরাজের অফিসের এক জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সে দিন আমাকে তাঁহার লজ্জার কথা বলিয়াছিলেন। অফিসঘর হইতে একটা জিনিস স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বেহারা নিকটে নাই, কাযেই তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এমন সময় "সাহেব" আসিয়া আস্তিন গুটাইয়া যখন কাযে লাগিলেন, প্রেষ্টিজের ধূম তখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। তিনি লজ্জায় পড়িলেন। বাস্তবিক ব্যবসা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নিজের হাতে পাল্লা ধরিতে হইবে। নহিলে বেহারা কর্ম্মচারী রাখিয়া নিজে সাক্ষিগোপালের মত বসিয়া থাকিলে ব্যর্থতা তাহার ফল দান করিবে। ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে, কার্য্যের খুঁটিনাটি সবই সর্ব্বাগ্রে রীতিমতভাবে জানা চাই। এক লম্ফে কেহ ব্যবসার পরিচালক হইয়াছেন, এমন কথা কখনও শুনা যায় নাই। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। জীবনে বিফলতা আইসেই। বাধা অতিক্রমের চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে। যে মাঝি ঝড়ের দিনে গাঙ পার হয় নাই, তাহার পরীক্ষা বাকি আছে। জীবনে যাহারা ভাঙ্গিতে পারে, তাহারাই গড়িতে পারে—সাহস করিয়া যাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, উদ্ধারের পথ তাহারাই পায়—জয়ী তাহারাই হয়—যাহারা অনিশ্চিতকে বরণ করিয়া লইতে পারে। আর যাহারা কেবল আগু-পিছু ভাবে আর প্রতি পদক্ষেপে নিক্তির ওজনে হিসাব করিয়া লাভ ক্ষতি খতায়, তাহারা অচল জড়পিণ্ড হইয়া যায়।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের Chemical Examiner ডাক্তার হানকিন প্রণীত Mental Limitations of the Experts নামক পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যাহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা টোলের পণ্ডিতের মত দুনিয়ার সব বিষয়ে অজ্ঞ। ঘটত্ব-পটত্ব আলোচনায় মগ্ন হইয়া বিশেষজ্ঞ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামেই চলিয়া গেলেন—খেয়াল নাই। কুটন্ত ডালে তৈল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা দেখিয়া স্ত্রীকে দেবী ভ্রমে স্তুতি করা পণ্ডিতেই সম্ভব। মধ্যযুগে য়ুরোপে Duns Scotus-এর শিষ্যগণ এইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের Dunce বলা হইত। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের জোরে কথাটার অর্থের কিছু গোলমাল হইয়া এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই তৃপ্তিকর হইবে না। কেতাবী বিদ্যাও অনেক সময় এই প্রকার অজ্ঞতার পরিচায়ক হইয়া পড়ে। ছেলেবেলা হইতে b-l a ব্লে মুখস্থ করিতে করিতে বৎসরের পর বৎসর পার হইয়া ছাত্র যখন পাশকরা হইয়া দাঁড়ায়, তখন দেখা যায়, তাহার কার্য্যকরী বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানটুকু ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

এ দেশে সব স্কুলকলেজে ছাত্র আকৃষ্ট করিবার জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—৯৩ জন স্কলারসিপ পাইয়াছে, ৫৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে—শিক্ষার বিপুল আয়োজন—"আয়—আয়—চ'লে আয়, খদ্দের!" তাহার পর বিদ্যার দৌড় ওই পাশ করা পর্য্যন্ত—পাশ করিলেই দীপনির্ব্বাণ—ব্যস্, বৃত্তি-পাওয়া ছেলের তাহার পর আর কোন খবর পাওয়া যায় না, তাহার নামও কেহ শুনে না। Senior Wranglerগণের দুই এক জন ছাড়া অন্য কাহারও নাম শুনা যায় না। এই সব কৃতী ছাত্রের শতকরা ৯৫ জন স্কুল কলেজে মাষ্টারী করিয়া চুপচাপ জীবন কাটাইয়া দেন—জীবনে গতি বা কর্ম্মের উৎসাহ থাকে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন তাঁহার পরীক্ষাগারে পাশকরা ছেলে লইতেন না। হারবার্ট স্পেনসর বলেন যে, উচ্চ অঙ্গের এন্‌জিনিয়ারিং কৌশলের যাঁহারা অধিকারী, দেখা যায়, তাঁহারা কেতাবী বিদ্যার ধার ধারেন না। সার বেঞ্জামিন বেকার Forth Bridge নির্ম্মাণ করেন। এই পুলটি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সার বেঞ্জামিন কোন কলেজে রীতিমত এন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। যাঁহাদের বিদ্যা পুঁথিগত, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই initiative (প্ররোচক শক্তির) অভাব—তাঁহারা নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া আপন বুদ্ধিবলে কোন কিছু নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন না। সিসিল রোডস বলেন,

যাঁহারা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের উচ্চ ডিগ্রীধারী, তাঁহারা "babies in financial matters" আর্থিক ব্যাপারে শিশুর মত অজ্ঞ।

এই কেতাবী বিদ্যার বোঝা বহন করিয়া আবহমান-কাল সকলকেই যে এক পথে চলিতে হইবে, এ কথার অর্থ কি? বাপ উকীল—অতএব ছেলেকে উকীল হইতে হইবে; কেন না বাঁধা ঘর আছে—তা সে ছেলের আইন বলি, "তোমাদের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে।" ইনকমট্যাক্স অফিসে মোটা মাহিয়ানার কয়েকটি চাকরী খালি হওয়ায় ৬।৭ হাজার দরখাস্ত পড়িয়াছিল। আবার এ দিকে Civil Serviceএর চার ফেলা হইয়াছে—সমস্ত ভারতবর্ষে ১০।১২টি চাকরী। বীজগণিতের Chance and Probability হিসাব করিয়া দেখিলে এই সব চাকরী পাইবার সম্ভাবনা এক এক জনের পক্ষে কতটুকু? সম্ভাবনা নাই বলিয়া

ফোর্থের সেতু।
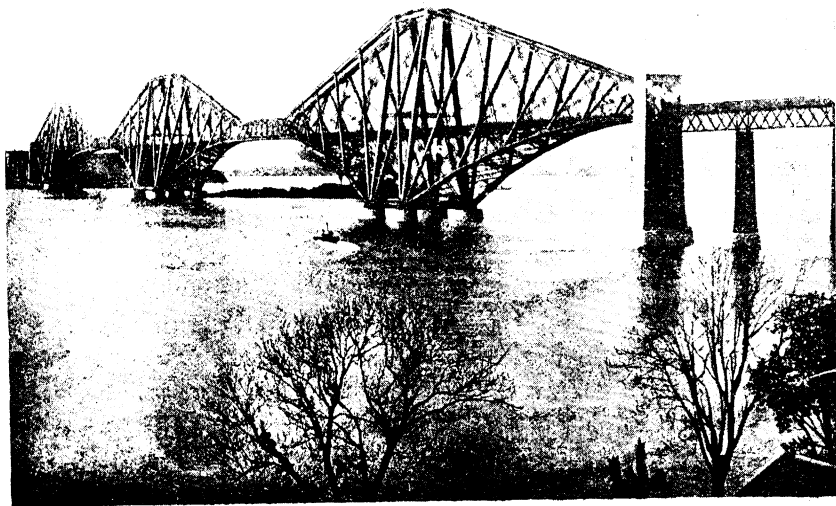
[এই সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণের জন্য ৫ হাজার লোক ৭ বৎসর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছিল। ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এই সেতু নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ২টি খাটাল ১ হাজার ৭ শত ১০ ফুট করিয়া লম্বা]

শিক্ষায় রুচি থাকুক আর নাই থাকুক! শিক্ষার মধ্যে এই সব জিদ আর ফরমাইস থাকায় ছাত্রের বৈশিষ্ট্য বা নৈপুণ্য বিকাশের অবসর পায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত অধিক কাল থাকা যায়, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে অকর্ম্মণ্যতা ততই বাড়ে। আমার কাছে কেহ পরামর্শ লইতে আসিলে আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করি, "গ্রাজুয়েট হয়েছ কি না?" যাঁহারা গ্রাজুয়েট, তাঁহাদিগকে

কোন কলেজে এই সব চাকরীতে মনোনয়ন করিবার অধিকার পাইলেও কর্ত্তৃপক্ষের আহ্লাদে আটখানা হইবার ত কারণ দেখি না।

বাঙ্গালা অবাঙ্গালীর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে মাড়োয়ারী পাট, তিসি, সরিষা, ধানের দাদন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর আমাদের পাশকরা যুবকগণ Civil Serviceএর সুখস্বপ্নে খুসী হইয়া আছেন। আবার

এই Civil Serviceএর ভিতরের কথা জানেন ত? একটা কথা এই স্থানে বলি, খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় Civil Serviceএর ফাইল দোরস্ত কাযের নমুনা বেশ পাওয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ তদন্তের হুকুম ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে নানা প্রভুর মধ্য দিয়া নিম্নতম পেয়াদায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর তথ্য সংগৃহীত হইয়া সরকারী খবর প্রকাশিত হইল—দুধ চাহিবামাত্রই পাইবে, আর মাছের কথা—সে ত যথেষ্ট আছে—ধরিয়া খাইলেই হয়। File ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটরা চলেন না—কার ফাইলের মহিমা ত এই! এ হেন Civil Serviceএর জবরদস্ত শিক্ষা ছাড়া না কি কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানী করা চলে না। অফিসিয়াল চশমা যাহার নাকের উপর উঠিয়াছে, তাঁহারই কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়—ধরাবাঁধা রাস্তায় চলিয়া বিদ্যা বুদ্ধি বাঁধা হইয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়।

কার্ণেগীর লৌহের ব্যবসা ক্রয় করিতে ৯০ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য যে সঙ্ঘ গঠিত হয়, মর্গান তাহার গঠনকর্ত্তা। বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে মরগ্যান বলেন, "আড়াই শত ডলার মাহিয়ানা দিয়া এক জন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে আড়াই লক্ষ ডলারের কায আদায় করিতে পারা যায়।" আমাদের দেশেও সুন্দরমল প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীরা আড়াই শত টাকা মাহিয়ানার বিশেষজ্ঞের দ্বারা কত লক্ষ টাকার

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যে কায করাইয়া থাকেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। বিশেষজ্ঞ চলেন, "কলুর চোখঢাকা বলদের মত"; ব্যবসায়ী কলু ইঁহাদের দ্বারাই তৈলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেন। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি বি, ই, পাশ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে মস্ত লোকসান হইত। আজ হয় ত তাঁহাকে একটা জিলার এঞ্জিনিয়ার হইয়া থাকিতে হইত; আর প্রমোশনের দরখাস্ত হাতে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে হাঁটা-হাঁটি করিতে হইত। মিষ্টার জে, সি, ব্যানার্জ্জি, রেলওয়ের শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। Associated Pressএর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় প্রথমে হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য কায করিতেন। আজ তাঁহার ক্ষমতা এত যে, মধ্যরাত্রিতে বড় লাটকে টেলিফোঁ করিয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই ইউনিভারসিটীর বিশেষজ্ঞ নহেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেকে অভিযোগ করেন, "তবে কি আপনি আমাদের মাড়োয়ারী হইতে বলিতেছেন?" আমি বলি, "না—তা নয়।" ভুল বুঝিবার বালাই অনেক। সার হিউ ব্রে, সার আলেক্‌জাণ্ডার মারে, সার এডওয়ার্ড আয়রণ

সাইড ইঁহারা অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজে পড়েন নাই বলিয়া কি অশিক্ষিত মাড়োয়ারীর সঙ্গে তুলনীয়? Fiscal Commissionএর সভাপতি হইলেন সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। ইনি ক্রোরপতি কলওয়ালা। কোন্ বাঙ্গালী Cobden Medalist এই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে আহূত হইয়াছিলেন? এ দেশে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর এম, এর ত অভাব নাই। তবুও ঐ কমিটীতে তাঁহাদের কেহ বসিতে পাইলেন না; কিন্তু আমার বন্ধু ঘনশ্যাম দাস বিরলা তাহার সভ্য হইলেন। বোম্বাইএর মিষ্টার দালাল Reverse Councilএর কুফল সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সকলই ফলিয়া গেল, কিন্তু অর্থনীতিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ কয়জন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? সার সাপুরজি ব্রোচা সেয়ার মার্কেটের হর্ত্তা-কর্ত্তা। সার জেমসেদজি তাতা নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া বাঙ্গালোরে Institute of Scienceএর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। Chemistry, Geology না জানিয়াও তাতা অত বড় লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাতার ম্যানেজার বড় লাটের বেতনেরও অনেক বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রধান পরামর্শদাতা পেরিন বৎসরে দুই তিন মাস এ দেশে থাকিয়া আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া যায়েন। যাঁহারা এত বড় বড় ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের শিক্ষার জন্য নিজেরই উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; স্কুল-কলেজের নোট বা ইউনিভারসিটীর ডিগ্রীর মুখ চাহিয়া থাকেন নাই।

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ।

ভিনিস নগরীর স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়াছিল তাহার বাণিজ্যজীবী সন্তানগণ। ডচ্ সাধারণতন্ত্রের (Dutch Republic) ইতিহাসের মূলে ঐ একই তত্ত্ব আছে। আসল কথা, যে স্থানে স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ বাণিজ্যোন্নতি, স্বাধীনতাও তথায় অবশ্যম্ভাবী। হল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক ভাগ সমুদ্র-তরঙ্গের নিম্নদেশে অবস্থিত। বাঁধ বাঁধিয়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সেই দেশের লোককে জীবন ধারণ করিতে হয়। বাণিজ্যজীবী ডাচরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম জানে; উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ফিলিপের মত নৃপতির সঙ্গে অবহেলে যুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। শত অভাবের আনন্দহীনতার মধ্যে বৃহৎ কল্পনা, বৃহৎ আশা জাতির চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। দেশের আশাস্থল যুবকগণকে গৃহের শত দৈন্যের চাপে ভারাক্রান্ত হইয়া অকালে উদ্যম-উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতে হয়—জাতির পক্ষে ইহা কত বড় অকল্যাণ, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। স্যাড্‌লার বলিয়াছেন,

তিনি বাঙ্গালী যুবককে হাসিতে দেখেন নাই। দারিদ্র্যের মধ্যে আনন্দের হাসি ফুটিবে কিরূপে? এ দিকে সামাজিক কু-প্রথা ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আমাদিগকে দিব্য বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমরা একটি ঘোর আধ্যাত্মিক জাতি। রাস্তায় কুষ্ঠরোগী দেখিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা তাহার রোগযন্ত্রণাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল বলিয়া চুপ করিয়া থাকি, আর জড়বাদী য়ুরোপীয় তাহাদের জন্য কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া অশরণের শরণস্থল হয়। তাহারাই আবার

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা।

সাঁওতাল পরগণার অরণ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাঁওতালদিগকে শিক্ষার আলোক দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, "আমাদের Spirituality অকর্ম্মণ্যতার [illegible] মাত্র।"

যাউক—নিরাশার কথায় আর কায নাই। আজ দেশে দিকে দিকে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা যথার্থই আশার কথা। এই প্রসঙ্গে যুবকদের নিকট স্বর্গীয় বরেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করি। ইনি যুবকমাত্র ছিলেন। পিতার বহুচেষ্টা ও তাড়নাসত্ত্বেও লিখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্পকালেই বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া কৃতী হইয়াছিলেন। যুবকগণের মধ্যে এইরূপ লোকের আবির্ভাব দেখিলে বাস্তবিকই আশায় বুক ভরিয়া উঠে। আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, নূতন আশায় নবীন কর্ম্মোৎসাহে বাঙ্গালীর জীবন ভরিয়া উঠুক, বাঙ্গালী আপন অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পাইয়া এবং প্রকৃত শিক্ষার বলে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আপন শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনীয়তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলুক। *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত

স্বরাজ-সাধনা।

৩

কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগকে সতেজে অগ্রসর হইতে হইবে, সেই জন্য শক্তির আরাধনা প্রয়োজন। শক্তিসঞ্চয় আমাদিগকে অবশ্য অবশ্য করিতে হইবে। প্রত্যেকের দেহের শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে কঠোর অভ্যাস দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া সেই ব্যষ্টিগত শক্তি জাতীয় সমষ্টিশক্তিতে পরিণত করতঃ দনুজদলনী মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবল স্মরণ রাখিলে হইবে না; দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে যে, সেই দনুজ আমাদিগের প্রত্যেকের ভিতরে আছে, আগে সংযম দ্বারা তাহাকে দমন না করিতে পারিলে দৈত্যবিজয়ের শক্তিলাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইব না।

Non-violent Non-co-operation কথাটা কি নূতন? প্রথম যে দিন দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন আজব-খানার প্রত্ন-প্রদর্শনীতে পরিণত হইয়া কলিকাতার গবর্ণর-জেনারেলের ষ্টেটচেয়ারে শাসনশক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইল, সেই দিনই ত ফোর্ট উইলিয়ামের মৃৎ-মঞ্চ হইতে লৌহবদন ব্যাদান করিয়া অগ্নিফুৎকারে কামান গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিল—Non-violent Non-co-operation! চোখ রাঙ্গাইও না—সহযোগী হইবার সাহস করিও না! সুবোধ বালকের মত 'তাড়য়েৎ পঞ্চ-বর্ষাণি' স্মরণে শাসন সহ্য করিবে, আর বিনয় বিস্তার ভূষণ জানিয়া অবিবাদে আজ্ঞা পালন করতঃ 'গুরুজনে মান্য কর' জ্ঞানবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

বৈশ্যকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণোত্তম মহাত্মা গন্ধীর চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ভাওলেণ্ট হইবার শক্তি কি আমাদের আছে যে, তিনি নন্-ভাওলেণ্ট হইতে বলিয়াছেন? কবে কোন্ কেরাণী কোন্ ডেপুটী কোন্ কাউন্সিলার কো-অপারেশন করিতে-ছিল বা কবে কো-অপারেশনের জন্য আলিঙ্গনের যুগল-বাহু আমাদিগের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল যে, তিনি কো-অপারেশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন?

বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মভূমি ভারতবর্ষ বহু দিন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জৈনগণের মধ্যেও অনেকে ছার-পোকাকে জীয়ন্ত মানবের রক্তপান করাইয়া অহিংসা-ধর্ম্মের মহিমা রক্ষা করেন; কিন্তু প্রহার খাইয়া হজম করিতে আমাদের ন্যায় প্রবুদ্ধ জাতি জগতে আছে কি না সন্দেহ:—

"কারো পৃষ্ঠে সত্য যুদ্ধ, মুষ্টি সহে হয়ে বুদ্ধ,
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ কিল খেয়ে স্মরে।"

শক্তিহীনকে কি কেহ কখন সম্মান করিতে পারে? শক্তিহীনের দ্বারা বিশ্ব-সংসারে কোথাও কখন কোনও কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বা হইতেছে কি? রণোন্মত্ত সেনানী যখন নিষ্কোষিত অসিকরে অগ্নি-জৃম্ভনকারী কামানের মুখে অগ্রসর হয়েন, তখন আমরা তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বাহবা দিতে থাকি; কিন্তু শুষ্কচর্ম্মাবৃত কঙ্কালসার তপোনিরত যোগীকে দেখিয়া কি একবার ভাবি যে, তাঁহার ঐ অস্থিপঞ্জরে প্রকৃতির উৎপাত উপেক্ষাকারী কি মহাশক্তি; মনের কি অলৌকিক দৃঢ়ভাবের প্রভাবে দুর্জ্জয় রিপুগণোত্তেজক বাহেন্দ্রিয় সকলকে তিনি কত সংযত রাখিয়াছেন!

কেবল বাহুবলই বল নহে, সংহারশক্তিই শক্তি নহে। পুরাণকাররা শিবের মধ্যেই সংহারশক্তির সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিব অর্থে কল্যাণ; কল্যাণের জন্যই সংহার শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। ঐশিকশক্তির যে প্রকাশ কৈলাসের বিলাস ছাড়িয়া শ্মশানবাসী; বাহন যাঁহার উক্ষ, গরল যাঁহার ভক্ষ্য, গলে যাঁহার হাড়মাল, কটীতে বাঘছাল সেই বিশ্বের চির-কল্যাণমাত্র-ধ্যান-পরায়ণ স্বার্থত্যাগী মহা যোগীই রুদ্রতেজ ধারণে সংহার-শক্তির প্রয়োগকরণে উপযোগী।

দুইপাতা ইংরাজী উল্টাইয়া অনেক অজ্ঞ বিজ্ঞের ন্যায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া থাকেন, চৈতন্যের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙ্গালী জাতিটাকে ভীরু ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

বটে! শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-কথা কি পড়া-শুনা আছে,—যথার্থ বৈষ্ণব কি চক্ষুতে দেখা আছে,—না সকালবেলা খঞ্জনী বাজাইয়া ঝুলি কাঁধে করিয়া মন্দিরাবাদনপটীয়সী সেবা-দাসী সঙ্গে যে বাবাজী মহাশয়ের দ্বারে দেখা দেয় এবং ফরমাস করিলে কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে রেলগাড়ীর গানও গাহিয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত মর্ম্ম অনুভব করা হইয়াছে? বেশী দিনের কথা নহে, সেই সে দিন স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক ইস্তাহার জারী করিলেন যে, সন্ধ্যা ছয়টা বাজিলে কেহ আর কোন সাধারণ স্থানে বক্তৃতা করিতে পারিবে না। অমনই বড় বড় ভারত-বিজয়ী বাক্য-বীর অভিধান তূণ হইতে খরশাণ বাণ বাহির করিতেছেন—আঘাতে লক্ষ লক্ষ অক্ষৌহিণী ধরাশায়ী করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে পকেট হইতে 'ওয়েষ্ট এণ্ড' খুলিতেছেন; আর কোথায় কোন্ কনেষ্টবল ছদ্মবেশে বসিয়া আছে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বক্তার peroration চলিতেছে,—"And I say this with courage undaunted twice tewenty times trampling down under the soles of my Monteith-made boots all threats of oppression, all fear of man-manufactured law, I say with all the emphasis I can command——ডাহিনের দোহার Prompt করিল "৬টা বেজে ১॥ মিনিট" অমনই emphasisএর পর ellipsis; বীরপদভরে বীর ত্বরিতে ট্রামে উঠিয়া সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বস্ত্র বয়কটের প্রতিজ্ঞা উদরের মধ্যে দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন।

আর ঠিক ঐরূপ অবস্থায় নবদ্বীপের বীর কৌপীনধারী গৌরাঙ্গের কার্য্যটা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। স্বদেশী হিংস্রক এখনও আছে, তখনও ছিল, তাঁহাদের প্ররোচনায় কাজী হুকুম জারি করিলেন, নগরে কেহ সংকীর্ত্তন করিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিবেন না। দুই এক জন ভক্ত এই সংবাদ মলিনমুখে গিয়া মহাপ্রভুকে জানাইল। তিনি বলিলেন,"তাহার কি করা যা'বে, সন্ধ্যার পর শ্রীবাসের অঙ্গনে যেমন সমবেত হওয়া যায় সেইরূপ সেখানে যেও, তার পর যা হয় দেখা যাবে,—আর দেখ, অন্ধকার রাত্রি, যাবার সময় এক এক গাছা লাঠি আর একটা ক'রে মশাল হাতে করে যেও।" সন্ধ্যার সময় শ্রীবাসের অঙ্গনে (যে ভক্তবীর শ্রীবাস এক দিন অন্তঃপুর হইতে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়াও পাছে মহাপ্রভুর উন্মাদনর্ত্তনে ভাবভঙ্গ হয়, এই ভয়ে পুত্রশোক অন্তঃকরণে রুদ্ধ করিয়া সমানে সকলের সঙ্গে "জয় জয়" করিয়া নাচিয়াছিলেন সেই শ্রীবাসের অঙ্গনে) দুই পাচ দশ জন করিয়া ক্রমে জন ত্রিশ বত্রিশ ভক্ত সমবেত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই এক হাতে লাঠি অন্য হাতে মশাল। গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তন জমিয়া উঠিল; কীর্ত্তন জমিয়া গেলে কি হয়, তাহা যে কীর্ত্তন করিয়াছে সে-ই জানে। তখন মন গৃহ ছাড়িয়া নগর ছাড়িয়া পৃথিবী ছাড়িয়া দেহ ছাড়িয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে, তখন আর কাজী নাই নবাব নাই বাদসা নাই, কে তখন ভাবে গারদের কথা বেত্রাঘাতের কথা শূলদণ্ডের কথা ফাঁসীকাষ্ঠের কথা! ভক্তমন তখন ভগবানের চরণে লীন; অঙ্গনদ্বারের অর্গল খুলিয়া প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গবীর ভাবাবেশে গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও বাহির হইলেন, পথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই জনতার বৃদ্ধি; যাহাদের লাঠি ছিল না তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লাঠি করিয়া লইল, গাছের ডালের আগায় নিজের উত্তরীয় জড়াইয়া মশাল জ্বালিল, মহাসাগর-তরঙ্গকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া হরিধ্বনির তরঙ্গপ্লাবনে নগর নিমগ্ন হইল, দ্বিসহস্র ভক্তচরণের নর্ত্তনতালে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। তাহার পর মহাপ্রভু কোথায় প্রবেশ করিলেন জান? কাজীর বাটীতে। (একেবারে লালবাজার!) কাজী শক্তিমান—বাদসাহের শক্তিতে, তিনি বাদসাহের নামে আইন প্রস্তুত করিয়া তাহার বলে প্রজাশাসন করেন; সেই কাজী দেখিলেন, যিনি বাদসাহের বাদসাহ, বিশ্বসংসারের একমাত্র ঈশ্বর, যাহার বিধিতে আলোক হয় অন্ধকার হয়, যাহার বিধি মানিয়া সপৃথিবী গ্রহনক্ষত্রগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিতে ফিরিতে ঘুরিতে থাকে, যাহার আজ্ঞায় সাগরে তরঙ্গ উত্থিত হয়, পর্ব্বত-গহ্বরস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, যাহার শক্তি সমস্ত জগৎকে সচেতন রাখিয়াছে, সেই চৈতন্যশক্তি সহস্র আকারে তাঁহার অঙ্গনে আবির্ভূত; এ শক্তির সম্মুখে তীরন্দাজের তীর সিপাহীর তরোয়াল গোলন্দাজের গোলা দূরে থাক, ইন্দ্রের বজ্রও নিষ্প্রভ।

প্রতি দীপশলাকার অগ্রভাগে যেমন অগ্নি-শক্তি রক্ষিত থাকে, প্রত্যেক মানবের অভ্যন্তরেও সেইরূপ চৈতন্যশক্তি অবস্থিত। অজ্ঞ শিশু যেমন যথাস্থানে ঘর্ষণ না করিয়া দেয়ালে কপাটে বেড়ার গায় ঘসিয়া ঘসিয়া দেয়াশালাই নষ্ট করে অথবা হঠাৎ জ্বালিয়া ফেলিয়া নিজের অঙ্গুলী দগ্ধ করে, দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানবও তদ্রূপ ঐশিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া আপনাকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে।

যে পাশ্চাত্য জাতিকে আমাদের অনেকেই এক্ষণে আদর্শজ্ঞানে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহারা কতক পরিমাণে আদর্শস্থানীয় হইলেও সম্পূর্ণ আদর্শ যে নহেন তাহা আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রতি প্রভাতে দৈনিক পত্রের তাড়িতসংবাদস্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, য়ুরোপে জাতিগণ পরস্পরের ভয়ে সতত শঙ্কিত। জার্ম্মাণী ভাবিতেছে, ফ্রান্সকে কিরূপে ফাঁকি দিব; ফ্রান্স বলিতেছে, সেবারে বড় নাকাল করিয়াছিলে, এবার তোমায় হাতে পাইয়াছি চর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছি এক্ষণে তোমার মর্ম্মভেদ করিব; বেলজিয়াম ইটালী পোলাণ্ড যে যাহার তাকে আছেন, কোন্ দিকে ছাতা ধরিলে আমার খাতায় কিছু জমা পড়িবে; রুসিয়া ত একেবারে রুষিয়া আগুন, মুখে বুলি রক্ত! রক্ত! রক্ত! এখন ত ধরাতল রক্তে প্লাবিত করি, তাহার পর বসুমতী আপনার গা ধুইয়া ফেলিতে পারে ধুইয়া ফেলিবে, না হয় রসাতলে যাইবে; ইংলণ্ড বলেন সকলেই বর্ব্বর, আমাদের সাধু উপদেশ ত কেহই শুনে না, পূর্ণঘট স্কন্ধে করিয়া দাড়াইয়া আছি, একবার আমাদের বসাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেই শান্তিজল ছিটাইয়া দি, কিন্তু ঘোর কলি, ব্রাহ্মণভক্তি কাহারও নাই। ব্রাহ্মণকে আশায় বঞ্চিত করিলে নরকস্থ হইতে হইবে, আর কি বলিব!

হা রে মানুষ! তুই আবার বলিস্, এক জন পরমেশ্বর আছেন! তুই আবার বলিস সেই পরমেশ্বর সমস্ত জগতের পিতা! সকল মনুষ্য তাঁহারই সন্তান! মনুষ্যরা পরস্পরে ভাই-ভাই! ভাইকে হত্যা করিতে, মানুষকে মারিতে গত আট বৎসরের মধ্যে য়ুরোপে যে সমস্ত যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিলে সয়তানও শিহরিয়া উঠিবে! অছিলা দেখান হয়, দানব প্রকৃতির শত্রুকে দূরে রাখিবার জন্যই এই সব সংঘাতিক আবিষ্কার; অর্থাৎ 'হের্' যখন দানব, তখন 'মঁসিয়ে'কেও দানব না হইলে চলিবে কেন? চমৎকার সিদ্ধান্ত! এই দেবদেব পরমেশ্বরের পৃথিবী দানব-পুরীতে পরিবর্ত্তিত করাই সভ্যতা!

কিন্তু মানব! এক শক্তি আছে, যে তোমায় রক্ষা করে, যে তোমায় বড় ভালবাসে, যাঁহার অংশে তোমার জন্ম, যিনি তোমার দেবত্বকে কখনই দানবত্বে পরিণত হইতে দিবেন না। মানবকে দানব হইতে দিবেন না বলিয়াই তিনি দেহ ধারণ করিয়া বারে বারে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েন; কখনও ধনুর্দ্ধারণে রাক্ষস নাশ করিয়া, কখনও বাঁশরী-রবে তোমার প্রাণ প্রেমে পুলকিত করিয়া, কখনও সন্ন্যাসীর ন্যায় তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া, কখনও তোমার জন্য নিজের বক্ষের রক্ত দিয়া, কখনও বা মাত্র সত্যের মহিমা ভক্তির মহিমা ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আবার তোমাকে তোমার দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় করিয়া যায়েন।

পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করা যায়। ইন্দ্রাদি দেবগণ যখনই জগতের কল্যাণ হইতে মন সরাইয়া লইয়া তমঃ-প্রভাবে ভোগ-বিলাসাদিতে মত্ত হইয়া রম্ভা-মেনকাদির লাস্যলীলা দর্শনে অমর জীবনকে আলস্যের আশ্রয়স্থল করিয়া তুলেন, তখনই দানবরা মার মার রবে আসিয়া অমরাবতী আক্রমণ করেন। দেব-শক্তি-হারা দেবগণ দানবশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া পাতালাদি দূর প্রদেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়েন। তখন সংযম আবার তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া আইসে। সংযম মনকে উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েন। বিষ্ণুর সান্নিধ্যই সৃষ্ট জীবকে শিষ্টতা প্রদান করে; করুণাধার গোলোকবিহারী বিষ্ণু শিষ্টের প্রতি সতত সদয়, তিনি কখন বা সুদর্শন চক্র চালনে, কখন বা নারায়ণী শক্তিপ্রভাবে সিংহবাহিনী দশভুজা রূপ ধারণ করিয়া, আবার কখন বা শিবভাবে বিভোর ত্রিশূল করে দানব দলন করিয়া ইন্দ্রকে সুরপতির আসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দেবাসুরের যুদ্ধ যে এই জীবপূর্ণ পৃথিবীতে অহোরাত্র চলিতেছে কেবল তাহাই নহে, প্রতি মনুষ্যের মধ্যেও এই সুরাসুরসমর চলিতেছে।

ডাক্তাররা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মনুষ্যদেহের মধ্যে malevolent ও benevolent bacteriaর যুদ্ধ অনবরত চলিয়া রোগের উৎপত্তি ও বিনাশসাধন করিতেছে। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে—বিশেষ এই এসিয়া মহাদেশে ভব-বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, মানবের মধ্যে দেব-দানবের যুদ্ধ অবিরত চলিতেছে; দানব যখন বিজয়ী, তখনই মানবের বন্ধন ও মহা দুঃখ, দেবতার জয়েই জীবের মুক্তি সুখ ও শান্তি।

সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে যে ব্যয় করে তাহার চিরদিনই অনাটন। যে দোকানদার বাজারের ধামা হাতে চাকরকে বসাইয়া রাখিয়া দোকান খুলেন এবং প্রথম বিক্রীর দুইটি টাকা কপালে ঠেকাইয়া বাক্সয় না রাখিয়া বেহারার হাতে দিয়া তাহাকে কপি ও গল্দা চিংড়ী কিনিয়া লইয়া বাসায় যাইতে বলেন, তাঁহার দোকানস্থিত গণেশটি উল্টাইয়া পড়িবার বেশী বিলম্ব থাকে না। দেওয়ালীর সময় যে বালক বাজির জন্য বারুদ প্রস্তুত করিতে করিতে কেমন হইল পরীক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজে রাখিয়া জ্বালাইতে থাকে, রাত্রিতে বাজী পোড়াইয়া আমোদ করিবার জন্য তুবড়ীর খোলে পূরিবার উপযুক্ত বারুদ প্রায় তাহার নিঃশেষ হইয়া যায়।

শক্তির প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে অগ্রে তাহা সঞ্চয় করা প্রয়োজন, অধিক করিয়া—ভাল করিয়া প্রয়োজন।

মহাত্মা গন্ধীর Non-violent Non-co-operation-এর (অহিংস অসহযোগ) অর্থ ও উদ্দেশ্য, বোধ হয়, এই শক্তি-সঞ্চয় করা। দেবভূমি ভারতবর্ষকে আবার অপরাজেয় দেবশক্তির কেন্দ্রস্থলে উন্নত করিতে হইলে কঠিন সংযম দ্বারা মহাশক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন; গুণ্ডাগিরি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গালাগালির শ্রাদ্ধ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা অনিষ্টকর জানিয়া তিনি ঐ সকল কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন, এই তাঁহার নন-ভাওলেন্স। আবার যাহাদিগকে নিজের ঘর-কন্না এক দিন নিজেই চালাইতে হইবে, আপনার মন্ত্রভবন আপনি রচনা করিয়া দেব-নীতিতে রাজনীতি পরিচালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহাদিগকে বলেন যে, বর্ত্তমান জগতে লোভপ্রবুদ্ধ দ্বেষোদ্দীপ্ত স্বার্থজড়িত রাজনীতি হিন্দুর শুদ্ধ শাস্ত্রমতে দানব-নীতি, সে কার্য্যের ব্যবহারিক প্রয়োগে সহযোগী হইয়া তোমাদের আভ্যন্তরিক শক্তির অপব্যবহার করিও না—এই তাঁহার নন-কো-অপারেশন। রাস্তার মারামারিতে দেখা যায়, যে পক্ষ তর্জ্জন-গর্জ্জন আস্ফালন করে সেই পক্ষই বেশী মার খায়, কলহপ্রিয়া নারীরা প্রায় শাপাভিশাপের পরই অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের বাহুতে কাপড়খানা সামলাইয়া পরিবার বলও থাকে না—তা থাবড়াটা আস্টা দিবেন কি!

সংযম ভিন্ন যে শক্তি সঞ্চয় হয় না পুরাণের প্রায় পত্রে পত্রে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যজ্ঞ ব্রত উপবাস দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানেই পূর্ব্বে হিন্দুকে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে হিন্দুকে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সংযম শিক্ষা ও বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়।

আর্য্যকবি একটি আদর্শ রাজচরিত্র সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্যে সেই চরিত্র স্থান অধিকার করিবার পর কত সহস্রবার পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, তথাপি আজিও লোক সেই সূর্য্যবংশপ্রদীপ-চরিত্র-চিত্র দেখিয়া বলে, এ রাজা সাধারণ রাজা নহে, রামচন্দ্র নারায়ণের অবতার! অবতারের ঐশ-আসনে অধিরোহণের পূর্ব্বে একটি সমগ্র জাতির দ্বারা তৎপদে বরণীয় হইবার জন্য রামচন্দ্রকে যেরূপে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল, সমগ্র ভারতে অতি পরিচিত বিষয় হইলেও তাহা একবার তলাইয়া দেখা যাউক।

প্রথমেই দেখা যায়, দশরথ কামজসন্তান উৎপত্তি করেন নাই, পবিত্রহৃদয়ে পুত্রলাভের ঐকান্তিক বাসনা ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়াই রাজা দশরথ ও তাঁহার মহিষীত্রয় চারিটি পুত্র লাভ করেন। এরূপ লোকোত্তর মানসিক অবস্থা বিশিষ্ট জনক-জননী হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে জাত-শুদ্ধ। লিখাপড়া শিক্ষা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দশরথ রামকে এক জন জটাধারীর সঙ্গে ভীষণা তাড়কা রাক্ষসী বধ করিতে প্রেরণ করিলেন; যাদব রায় কি মাধব বাহাদুর হইলে নগুকে বাড়ীর পাশে নিমন্ত্রণে পাঠাইতে রক্ষার্থ রতনসিং, গির্ধার পাঁড়ে দুই জন দরোয়ান আর দু'পায়ের দু'পাটী জুতা খুলিয়া লইবার জন্য গদা ও

গোপালেকে সঙ্গে দিতেন! তাহার পর বিবাহ—রীতিমত পরীক্ষা দিয়া রামচন্দ্রকে জানকী লাভ করিতে হইয়াছিল, চশমা নাকে দিয়া মিহি সুরে "আমি এখন থার্ড ইয়ারে পড়্‌ছি" বলা গোছ পরীক্ষা নহে; ইন্দ্রজিতের জন্মদাতা দশানন বিংশতি বাহু আস্ফালনে যে ধনুতে গুণ দিতে সমর্থ হয়েন নাই বালক রামচন্দ্র সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া অযোনি-সম্ভবা সীতাদেবীকে স্বীয় সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করেন। এইটুকু বাল্যশিক্ষা।

নিজের বার্দ্ধক্যের অছিলায় অপরিসীম অপত্যস্নেহের বশে দশরথ যখন যৌবনপ্রবেশসময়েই রামচন্দ্রকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত, তখন রামের শত্রুরূপী মহামিত্র মন্থরা আসিয়া কৈকেয়ীর কর্ণে কুমন্ত্রণা প্রদান করিল; পিতৃসত্যপালনার্থ মুকুটভূষিত রাম সিংহাসনের সোপান হইতে পা নামাইয়া জটা-বল্কল ধারণ করিয়া বনগমন করি-লেন। রামবাবু হইলে তৎক্ষণাৎ গণেশচন্দ্রের আফিসে গিয়া, বি, সি, মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রবর্ত্তী, সরকার প্রভৃতি সপ্তরথীকে নিযুক্ত করিতেন। সঙ্গে যাইলেন, কিশোরী বধূ সীতা আর কিশোর ভাই লক্ষ্মণ! মিসেস্ রাম হইলে এমন দুর্ব্বল আহাম্মক স্বামীর হাতে পড়িয়া-ছেন বলিয়া নিজের শিক্ষিত অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতেন এবং 'রাইটস্' সম্বন্ধে ঝড়ের বেগে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের ফটোগ্রাফ সমেত কোন মাসিক পত্রিকায় ছাপাইয়া দিতেন। আর ভ্রাতৃ-স্নেহের প্রাবল্যে লক্ষ্মণ বড় জোর বলিতেন, "ব্রাদার, পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম করো।" আর সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ ভরত এমন একটা একপার্টি ডিক্রী পাইয়াও রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে রামের বিষয়-আশয়ে একজিকিউটারী করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, রামের বনগমনসময়ে প্রজারা ধূলায় লুটাইয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, বীর বাহু দোলাইয়া তাঁহাকে টাউন হলে লইয়া গিয়া কেন "গারল্যাণ্ডেড" করে নাই।

"একটি কণ্টক যার ফোটেনিক পায়।
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত।"

যে নিজে জীবনে কখন দুঃখ পায় নাই, সে কখন কি দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিতে পারে? বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন :—"জগদীশ্বর যদি দয়াময়, তবে তিনি দুঃখময়ও বটে, দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? কিন্তু আবার তিনি নিত্যানন্দ; এ আনন্দ কোথা হইতে আসে? তিনি অহরহঃ দুঃখীর দুঃখনিবারণে নিযুক্ত তাহাতেই ঐশিক আনন্দের উৎপত্তি।" যাঁহাকে একদিন রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখী প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইতে হইবে এবং সেই দুঃখ মোচন করিয়া রাজ্যসুখের আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে, তিনি দুঃখের দরদ বুঝিবার জন্য ভিখারী হইয়া বনে গমন করিবেন বৈ কি? এইরূপে ভিখারী হইয়া, কাঠুরিয়া হইয়া, ব্যাধ হইয়া রাজ-পুত্র রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বনবাসে দুঃখের পাঠ-শালায় পড়ুয়া হইয়া রহিলেন। রামের মা'র রাম হইলে অগস্ত্য আশ্রমে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাবাজীর পায়ে ফুট্-শোর ও গায়ে জঙ্গল ফিবার হইত। রামচন্দ্রের পরীক্ষা এখানেও শেষ হয় নাই; আত্মরক্ষাসমর্থন ও অত্যাচারী-দমন-শিক্ষা প্রতি মানবের পক্ষেই অতি প্রয়োজনীয়, রাজ-পুত্রের ত কথা নাই; সেই জন্য যে জানকী শ্বশুর স্নেহময় অঙ্ক ও রাজান্তঃপুরের সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে বনগমন করিয়াছিলেন; সুবর্ণ-মৃগ দেখিয়া তাঁহারও মনে লোভের সঞ্চার হইল; যিনি কৈকেয়ীর কটু ব্যবহারেও কখনও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই, তিনি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণকারী লক্ষ্মণকে একটা কুৎসিত ভর্ৎসনা করিলেন এবং এই লোভ ও ক্রোধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, রাক্ষসের অশোকবনে চেড়ীর বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া। সীতার উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র অযোধ্যায় ভরতের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না, আপনার চেষ্টায় সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া কপি-সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কা-বিজয় করিলেন। এখনকার কয় জন ধনীর পুত্র গামছা কাঁধে বাহির হইয়া নিজের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারেন বলা যায় না। এই দুঃখের পাঠশালায় এম, এ, উপাধি লাভ করিয়াও রামচন্দ্রের পরীক্ষার শেষ হইল না; লোক-মত মান্য করা প্রধান রাজধর্ম্ম; সীতাকে বন-বাসে পাঠাইয়া আপনার হৃৎপিণ্ড আপন হস্তে অগ্নিতে দহন করিয়া রামচন্দ্র দেখাইলেন, রাজতন্ত্রে লোক-মতের প্রাধান্য কত অধিক।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

মুক্তি ও ভক্তি।

পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধত্রয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তানুসারে শক্তি ও শক্তিমান একই, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, জগৎসৃষ্টি সেই শক্তিমান পরমেশ্বরের—শক্তিরই অভিব্যক্তি, এই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবনিবহের সংসারভোগ ও অপবর্গ, জীবসমূহ সেই শক্তিমান পরম পুরুষের অংশ, অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিজ্ঞানময় সেই পরমাত্মা বা বাসুদেব হইতে প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবসমূহ আবির্ভূত বা পৃথক্‌কৃত হয়। জীবসমূহও পরমাত্মার ন্যায় সচ্চিদানন্দময় হইলে ও অনাদি সিদ্ধ অজ্ঞান, মায়া বা ভগবদ্‌বৈমুখ্যের বশে তাহারা সংসারী হয়; নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মোহবশতঃ দুঃখ অনুভব করে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের বশবর্ত্তী হয়। এই মোহনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, ভগবৎপ্রপত্তি বা আত্মকর্ত্তৃত্বের অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। সেই প্রপত্তি বা শরণাগতি অবিশুদ্ধ চিত্তে সম্ভবপর নহে, এই কারণে চিত্তবিশুদ্ধির আবশ্যকতা, চিত্তবিশুদ্ধির হেতু কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে যে ভাবে করিতে বলা হইয়াছে, সেই ভাবেই করিতে হইবে। ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

ভেদবাদী বা অভেদবাদী দার্শনিকগণের মতে যেমন মুক্তিই মানবের চরম বা পরম পুরুষার্থ, পঞ্চরাত্র মতেও ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মুক্তিই যে মানবের চরম লক্ষ্য, সেই বিষয়ে দার্শনিকগণের সহিত পাঞ্চরাত্রিকগণেরও কোনও মতভেদ নাই। সাংখ্য-পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বেদান্তী ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্ব্বাণমুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকগণ নির্ব্বাণকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সালোক্য, সারূপ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে কোন একটি হইলেই জীবের পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। যে নির্ব্বাণে আমার নিত্য সিদ্ধ অহন্তার বিলয় হয়, সেই নির্ব্বাণ কখনই কোন জীবের স্পৃহণীয় হইতে পারে না। পাঞ্চরাত্রিকগণের এই সিদ্ধান্ত আচার্য্য রামানুজ, মধ্বস্বামী, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের অভিমত। ইঁহাদের সকলেরই মতে কিন্তু ভক্তি মুক্তির সাধন; ভক্তিও জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণও ভক্তির সাধনতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—মুক্তির জন্য ভক্তি নহে। পরন্তু ভক্তির জন্যই মুক্তি, এই নবীন অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তই বাঙ্গালার সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের প্রচার দার্শনিকভাবে বাঙ্গালী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম করিয়াছেন; আর নবদ্বীপ এই সিদ্ধান্তের জন্মভূমি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই এই সিদ্ধান্তের প্রথম প্রচারক। এই সিদ্ধান্তটির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহারই আলোচনা করিবার জন্য এই মুক্তি ও ভক্তি শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। এইক্ষণে তাহারই বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ মানবের চরম বা পরমপুরুষার্থ নহে; প্রেমই মানবের পরমপুরুষার্থ। ভক্তির চরমাবস্থাকেই তাঁহারা প্রেম বলিয়া থাকেন, এই প্রেম বা প্রেমভক্তির স্বরূপ কি, তাহাই দেখা যাউক।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রধান পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভক্তির পরিচয়প্রসঙ্গে ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই—

> "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেনকৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সংক্ষেপতঃ এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ—এই, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি, কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের প্রীতির কামনায় যে অনুশীলন, তাহাই কৃষ্ণানুশীলন। অনুশীলন শব্দের অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশে যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় কিংবা কৃষ্ণসম্বন্ধে যে কোন ক্রিয়া করা যায়, তাহাই কৃষ্ণানুশীলন। ক্রিয়া বা অনুশীলন তিন প্রকার হইতে পারে;—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

ফলে দাঁড়াইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণামাদি দৈহিক ক্রিয়া কিংবা নামকীর্ত্তনাদি বাচনিক ক্রিয়া অথবা অনুরাগ চিন্তা ধ্যান উৎকণ্ঠা অভিলাষ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া বা মনোবৃত্তিনিচয় এই সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। এক্ষণে আর একটি শব্দের অর্থ বাকী আছে। কৃষ্ণ;—কৃষ্ণ কে? তাহাই অগ্রে দেখা যাউক। ভক্তি সম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

(ব্রহ্মসংহিতা)

ইহার তাৎপর্য্য এই, পরমেশ্বরই শ্রীকৃষ্ণ পদের অর্থ; তিনি বিগ্রহ বা শরীরসমন্বিত; সেই শরীর মায়িক বা ভৌতিক নহে; তাঁহার শরীর নিত্য এবং নিত্য শরীর চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার আদি বা উৎপত্তি নাই, অথচ তিনি সকলের আদি। তিনি সকল কারণেরও কারণ এবং তিনি গোবিন্দ অর্থাৎ আমাদের সকলের সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, অথচ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রকাশক।

এই কৃষ্ণের স্বরূপ কি, তাহা আরও বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র কি বলিতেছেন? শাস্ত্র বলিতেছেন:—

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—কৃষ ও ণ এই দুইটি শব্দের মিলনে কৃষ্ণ এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃষ এই অংশটি ভূ অর্থাৎ সত্তাকে বোধ করাইয়া থাকে। আর ণ এই শব্দটি নির্বৃতি অর্থাৎ শান্তিকে বোধ করায়। ফলে দাঁড়াইল এই যে, পারমার্থিক সত্তা ও পরম শান্তি যে স্থানে শাশ্বতভাবে বিরাজমান, সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

কৃষ্ণ শব্দের এই সর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্য্য সম্মত অর্থ যদি অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, এই কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোন সম্প্রদায়েরই আপত্তি থাকিতে পারে না। যিনি যে ভাবেই পরমাত্মার উপাসনা করুন না কেন, তিনি সর্ব্বথা কৃষ্ণানুশীলনই করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, উপাস্য দেবতার নাম বা আকারে সংস্কার বা রুচির বৈলক্ষণ্য অনুসারে বৈলক্ষণ্য আপাততঃ প্রতীত হইলেও সকল উপাসকের উপাস্য দেবতাই সকল প্রপঞ্চের একমাত্র কারণ আদ্যন্তহীন ও চিদানন্দময় এবং তিনিই পারমার্থিক সৎ ও শান্তির একমাত্র আশ্রয়। ইহা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই অত্যুদার ভক্তি-তত্ত্বে নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর সাকারব্রহ্মবাদিসহ বিবাদের কোন হেতু নাই। ইহার কোন অংশেই তথাকথিত গোঁড়ামীর কোন প্রকার গন্ধও উপলব্ধ হইতে পারে না। এই কৃষ্ণ-তত্ত্বে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদের কোন হেতুই উপলব্ধ হয় না, হইতেও পারে না। এই কৃষ্ণই শাক্তের চিদানন্দময়ী জগদম্বা; আর এই কৃষ্ণই বৈষ্ণবের প্রেম-যমুনাকূলে বিবেকনীপমূলে নিত্যবিরাজমান দ্বিভুজ মুরলীধর। যিনি যে স্থানে যে ভাবে বা যে নামে পরমাত্মার উপাসনা করুন না কেন, তিনি এই কৃষ্ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব—ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা উপাসনার শান্তিময় সর্ব্বসাধারণ নন্দন-কাননে বিদ্বেষময় কলহ-কণ্টক-তরু রোপণ করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণবও নহেন, শাক্তও নহেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারা উপাসনাতত্ত্বের কিছুই বুঝেন না। ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মুখ্য সিদ্ধান্ত।

সেই কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ পরমাত্মার উদ্দেশে কায়িক বাচিক বা মানসিক ক্রিয়া কিন্তু "আনুকূল্যেন" অর্থাৎ অনুকূল ভাবের সহিত হওয়া চাহি। নহিলে তাহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কেহ কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষপরচিত্তে তৎসম্বন্ধে কোন কায়িক বাচিক বা মানসিক ক্রিয়া করে, তবে সেই সকল ক্রিয়াকে ভক্তি বলা যাইবে না। কংস কৃষ্ণকে শত্রু ভাবিয়া তাহার বিনাশার্থ পূতনা রাক্ষসীকে গোকুলে পাঠাইয়াছিল। এই পূতনাপ্রেরণ বা পূতনাকে প্রেরণ করিবার সময়ে কংসের অন্তঃকরণে যে কৃষ্ণবিষয়িণী চিন্তা, তাহার কোনটিই ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা অনুকূল ভাবের সহিত হয় নাই, প্রত্যুত তাহা প্রাতিকূল্য বা বিদ্বেষ সহকারে হইয়াছিল।

এই আনুকূল্য বা অনুকূল ভাব বলিলে কি বুঝা যায়,

এখন তাহাই দেখা যাউক্। যাহাকে না দেখিলে বা মনে পড়িলে মন আপনা হইতেই আর্দ্র হইয়া উঠে, আবার দেখিবার জন্য, বার বার ভাবিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, তাহাকে দেখা বা তাহার চিন্তাতেই আনন্দ অনুভব করে, তাহার প্রতি মনের যে ঝোঁক বা প্রবণতা, তাহারই নাম আনুকূল্য। সুখের বা সুখসাধনের প্রতি অন্তঃকরণের যে উন্মুখতা বা অভিলাষময়ী তৎপরতা তাহাই আনুকূল্য, ইহাই ষট্সন্দর্ভে জীব গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রিয়জন দূরদেশে থাকিলে তাহার মুখখানি হঠাৎ মনে পড়িলে মনের মধ্যে যে আকুলভাবজড়িত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠাময় কোমলবৃত্তিবিশেষ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সময়ে নয়নের প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়, অবসাদমাখা প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বুকটা যেন কাঁপিয়া ছুর-ছুর করিয়া উঠে, সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে তাহাকেই আনুকূল্য বলা যাইতে পারে। এই আনুকূল্যের সহিত যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই উদ্ধৃত শ্লোকে সামান্যরূপে ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই সকল-প্রকার ভক্তির সাধারণ লক্ষণ। এই ভক্তি অধম, মধ্যম ও উত্তমভেদে তিনপ্রকার হইয়া থাকে। অধম ও মধ্যম ভক্তির বিশেষ পরিচয় এই শ্লোকে প্রদত্ত হয় নাই। উত্তম ভক্তির স্বরূপ কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকে তাহার দুইটি বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"অন্যাভিলাষিতাশূন্য" ও "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত।" এক্ষণে দেখা যাউক, এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য্য কি?

অন্যাভিলাষিতা শব্দের অর্থ ভগবৎপ্রীতি ছাড়া আর যাহা কিছু কামনার বিষয়, তাহা পাইবার জন্য যে অভিলাষ তাহা অর্থাৎ নিজের সুখসম্ভোগের কামনা এবং মোক্ষ-লাভের কামনা—এই দুই প্রকার কামনাই অন্যাভিলাষিতা। তাহা যে কৃষ্ণানুশীলনে বিদ্যমান থাকে, তাহা উত্তম ভক্তি হইতে পারে না। মোটের উপর দাঁড়াইতেছে—দরিদ্রের ধন পাইবার জন্য, দুর্ব্বলের ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য, কামুকের রূপবতী বনিতালাভের জন্য, উপেক্ষিতের সম্মান বা কীর্ত্তি-লাভের জন্য, বুভুক্ষিতের অন্নলাভের জন্য, যে কৃষ্ণভজন বা যে কোন ভগবদ্বিগ্রহের ভজন, তাহা উত্তম ভক্তি নহে। এমন কি, সংসারে বিরক্ত ব্যক্তির আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তি পাইবার জন্য যে ভগবদ্ভজন, তাহাও উত্তম ভক্তি নহে। সকল প্রকার কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল ভগবান প্রীত হউন, এই একমাত্র কামনা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে পোষণ করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার সেই ভজন বা কৃষ্ণানুশীলনই উত্তম ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভোগাভিলাষের ন্যায় মুমুক্ষা বা মুক্তিকামনাও যে ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল, এ কথা স্পষ্টভাবে অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির যে উজ্জ্বল ও অত্যুদার ভাব এই ভারতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়া-ছেন, তাহার সন্ধান অতি অল্প লোক রাখেন। বাঙ্গালার প্রবর্ত্তিত ভক্তিসিদ্ধান্তের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা।

ভক্তি যে সাধন নহে, কোন পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু ইহাই সকলপ্রকার পুরুষার্থের শিরোমণি বা পঞ্চম মুখ্যতম পুরুষার্থ, ইহা পুরাণ, স্মৃতি ও শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইলেও নির্ব্বাণ-বাসনা-কবলিতবুদ্ধি আগ্রহপরায়ণ নব্য দার্শনিকগণের শুষ্ক ও নীরস তর্কজালের ঘনান্ধকারে বৌদ্ধমতপ্রাবল্যের সময় হইতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তিশাস্ত্রের এই অতুলনীয় রহস্য যুগযুগান্তের পর বঙ্গদেশেই আবার প্রথমে উদ্বোধিত হয়। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেন এই অত্যাবশ্যক সিদ্ধান্তরত্নের নির্ব্বা-ণোন্মুখী প্রভাকে পুনরুজ্জ্বলিত করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন। ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জানিবার ও ভাবি-বার বিষয়।

ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী এক স্থানে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—

"ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র-কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভোগের স্পৃহা ও মোক্ষের স্পৃহারূপ দুই পিশাচী বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ভক্তিরূপ অনাবিল সুখের উদয় কি করিয়া হইতে পারে?

নির্ব্বাণরূপ চরম পুরুষার্থের সাধন নির্ণয় করিবার জন্য শুষ্ক তর্কজালে জড়াইয়া পরস্পরে বিবদমান দার্শনিকগণকে লক্ষ্য করিয়া আর কেহ এমন কঠোর বিদ্রূপোক্তির সহিত উপনিষদের সার সিদ্ধান্ত এমন সরলভাবে ও সাহসের সহিত

খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। আপনাকে দেহময় ভাবিয়া দেহসর্ব্বস্ব হইয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা সকল দেশের ও সকল কালের ধর্ম্মাচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ত্ব জ্ঞান যাহার হয়, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মজীবনে অধিকারী হইয়া থাকে। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে দেহের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ অবস্থাত্রয়ে—মালার পুষ্পসমূহে অনুগত সূত্রের ন্যায় আত্মার একরূপকতা অনুভব করিয়া অনুমান ও শাস্ত্রের সাহায্যে ক্রমে মনে দৃঢ়বিশ্বাস আসিবে যে, বাল্য-শরীরনাশের পর যৌবনশরীর লাভ করিবার সময় যেমন আমার বিনাশ হয় নাই, তেমনই এই মনুষ্যশরীর বিনষ্ট হইবার পরও আমার বিনাশ সম্ভবপর নহে; মনুষ্য-দেহপ্রাপ্তি যেমন আমার ইচ্ছানুসারে ঘটে নাই, এই মনুষ্যদেহনিপাতের পর সেইরূপ আমার সর্ব্বথা অজ্ঞাত কোন কারণের বশে হয় ত আবার কোন দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ হইতে পারে; যদি সেইরূপ দেহের সহিত সম্বন্ধ হয়, অথচ সেই দেহে আমাকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বড়ই অসহন ও বিড়ম্বনাকর হইবে, সুতরাং এই জন্মেই এমন কোন শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে ভবিষ্যতে দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইলে আর আমাকে দুঃখ ভোগ করিতে না হয় এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে সুখভোগ করিতে পারা যায়। এই প্রকার জ্ঞান ও বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় হইলে মানুষ পারলৌকিক সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই সকাম-কর্ম্মী বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐহিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন যে শক্তির বলে পরলোকে সুখ-ভোগ করিবার আশা মানুষের হইয়া থাকে, সেই শক্তিকেই শাস্ত্রকারগণ পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এই শক্তিসঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্ম-কার্য্যের প্রবৃত্তির নিদান যে ভোগেচ্ছা, তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামী উক্ত শ্লোকে পিশাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই ভোগেচ্ছা পিশাচীই বটে। কেন, তাহা বলি। পিশাচী কাহাকে বলে? একের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা অপরের পিশিত অর্থাৎ শোণিত পান করাই যাহার স্বভাব, তাহাকেই শাস্ত্র ও লোক পিশাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহাই যদি হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, আমি সুখ-ভোগ করিব, এইরূপ যে ইচ্ছা, তাহা কেন না পিশাচী হইবে? এই পিশাচীর অঙ্গুলি-হেলনেই শ্যামা বসুন্ধরার শ্যামল-অঙ্গ কত লক্ষ লক্ষ নর-শোণিত-স্রোতে রঞ্জিত ও প্লাবিত হইয়াছে। তাহার সাক্ষী সমগ্র সভ্য মানবের ইতিহাস,—রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, ভারতেতিহাসের পাণিপথ পলাশী, আর সেদিনের য়ুরোপের সেই লোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ। আর কত বলিব? সমগ্র মানবজাতির সকল শোণিত-কর্দ্দম-ময় ছোট বড় যুদ্ধ সবই ত ঐ ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি-বিশেষের হৃদয়গুহানিবাসিনী করাল পিশাচীর মনুষ্য-শোণিতপিপাসার পরিণতি। ইহা যিনি না বুঝেন, তাঁহার পক্ষে ইতিহাসপাঠ বিড়ম্বনা নহে কি?

এই লোকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধরূপ ভোগ্য বিষয়ের উপভোগ-স্পৃহা যেমন অপরের ভোগ্যবস্তুর প্রতি অধিকার স্থাপনের জন্য মানবকে প্রবর্ত্তিত করে বলিয়া তাহা স্বজাতীয় জনসমাজে অশান্তি ও উন্মত্ততাকর জন-বিপ্লবকর ভীষণ কলহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই লোকা-ন্তরেও ব্যক্তিবিশেষের ভোগাভিলাষ যে ঐরূপ করিবে, তাহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং কি ইহলোকে, কি পরলোকে ভোগাভিলাষই যে জনসমাজে সকল প্রকার অনর্থ ও তন্মূলক অশান্তির মূল নিদান হইয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র দার্শনিকপ্রবর আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন:—

"যুক্তং হি পরস্পদুৎকর্ষো হীন-
সম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতীতি।"

অর্থাৎ দেহাভিমানী প্রাণীদিগের মধ্যে একের অধিক ভোগসামগ্রী দেখিলে, তদপেক্ষা হীন সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তি যে দুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

এক্ষণে অনেকে হয় ত বলিবেন যে, ভোগস্পৃহা লোক

মধ্যে অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করে বলিয়া তাহাকে পিশাচীর ন্যায় বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু সংসার বিরক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি পাইবার জন্য যে স্পৃহা, তাহা কেন পিশাচী হইবে? প্রত্যুতঃ তাহা ত সকল মানবের পক্ষেই কল্যাণকরী হইয়া থাকে? ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী সেই মোক্ষ-স্পৃহাকে যে পিশাচী বলিয়া নিন্দা বা উপহাস করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বাতুলের প্রলাপের ন্যায় প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপসহনীয় হইবে না কেন? নির্ব্বাণপক্ষপাতী দার্শনিকগণের এইরূপ আশঙ্কার অসারতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, এইক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, পিশাচী যাহাকে পাইয়া বসে, সে যে কেবল পরের উপর উপদ্রব করিয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে। সময়বিশেষে সে যাহাকে পাইয়া বসে, তাহার মাথা চিবাইয়া খাইয়া তাহাকে আত্মবিনাশের দিকেও প্রবর্ত্তিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। শাস্ত্রে বলিয়া থাকে, পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তিগণ উদ্বন্ধন ও বিষভোজনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। তবে এই যে নির্ব্বাণপ্রিয় দার্শনিক ধুরন্ধরগণের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য যুক্তি ও প্রমাণ কল্পনার সাহায্যে সরল ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাণের জন্য উত্তেজিত করা, ইহা কি প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যার জন্য লোকদিগকে উৎসাহিত করার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে উপহসনীয় ও নিন্দনীয় নহে? নির্ব্বাণ জিনিষটা কি? ইহার উত্তরে, ভেদবাদী দার্শনিকপ্রবর নৈয়ায়িক বলিবেন, নির্ব্বাণ আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি, অর্থাৎ একেবারে অনন্তকালের জন্য সকল প্রকার দুঃখের হাত হইতে জীবের নিষ্কৃতিলাভই নির্ব্বাণ। কে এমন অনুন্মত্ত ব্যক্তি আছে যে, এইরূপ আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণকে না চাহিয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচিয় দিতে লজ্জিত না হয়? দার্শনিক ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এই নির্ব্বাণকে জীবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রই একবাক্যে এই নির্ব্বাণকেই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এ হেন নির্ব্বাণ-কামনাকে যিনি পিশাচী বলিয়া উপহাস করিতে সাহসী হয়েন, তিনি যে স্বয়ং পিশাচগ্রস্ত নহেন, তাহাতে প্রমাণ কি?

এই প্রকার নির্ব্বাণ-পক্ষপাতী ভেদবাদী দার্শনিকগণের মতও যে নিতান্ত নির্য্যুক্তিক, তাহা বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন, অগ্রে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

উদ্ভট-সাগর।

কোন্ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে মানুষ প্রকৃত কবি হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

> নৈব ব্যাকরণজ্ঞমেতি পিতরং ন ভ্রাতরং তার্কিকং
> দূরাৎ সঙ্কুচিতেব গচ্ছতি পুনশ্চাণ্ডালবচ্ছান্দসাং।
> মীমাংসানিপুণং নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা নিরস্তাদরা
> কাব্যালঙ্করণজ্ঞমেত্য কবিতাকান্তা বৃণীতে স্বয়ম্॥

> কবিতা-রমণী সতী এই ভূমণ্ডলে
> বর-মাল্য নাহি দেয় যার তার গলে।
> এ সংসারে হয় বৈয়াকরণ যে জন
> পিতা বলিয়াই তারে করে সম্বোধন!
> নৈয়ায়িক যেই জন,—তাহারেও হায়
> ভ্রাতা বলি' তার কাছে কিছুতে না যায়!
> যে জন বেদজ্ঞ,—তারে চণ্ডাল ভাবিয়া
> দূরে পলায়ন করে অবজ্ঞা করিয়া!
> মীমাংসক যেই জন,—হেরি' মাত্র তারে
> নপুংসক ভাবিয়াই অন্তর্দ্ধান করে!
> কিন্তু কাব্য-অলঙ্কারে যার বহু জ্ঞান,
> তারি গলে বর-মাল্য করিবে প্রদান।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট সাগর।

কৈলাস-যাত্রা।

অষ্টম অধ্যায়

গারবাং এই অঞ্চলের প্রধান সহর। ইহার বহু নিম্নে কালী প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন; বামদিকে বিশাল পর্ব্বত, পাদদেশে সমতলভূমির উপর গারবাং অবস্থিত। এই প্রধান সহরের গৃহ-সংখ্যা প্রায় ১ শত হইবে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি দ্বিতল। ধ্বজ-শোভিত গৃহশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গ্রামের সীমান্তে স্কুল-গৃহে উপস্থিত হইলাম। এ অঞ্চলে স্কুল-গৃহে ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, আর অতিথি-অভ্যাগত আশ্রয়স্থানও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার আসিবার কথা ধারচুলার পণ্ডিত লোকমনীজী অগ্রেই পাঠাইয়াছিলেন, আমি উপনীত হইলেই অনেকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কেহ কেহ কহিলেন, "আপনার অভ্যর্থনার জন্য গ্রামের প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলাম, দেখিতে না পাওয়াতে মনে করিলাম, এ বেলা বুঝি আসিতে পারিলেন না।" এইরূপ সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত হইলাম।

স্কুলের অধ্যাপক মহাশয় কামায়ুন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। যত দিন ভুটিয়ারা এ স্থানে অবস্থান করে, তত দিন এ স্থানের তিনি পোষ্ট-মাষ্টার ও স্কুল-মাষ্টার। শীতের সমাগমের সহিত তিনি দীর্ঘ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিদাঘের সহিত ভুটিয়ারা এ স্থানে আগমন করিলে মাষ্টার মহাশয়ও সেই সময় আসিয়া স্কুল ও পোষ্ট অফিস খুলিয়া থাকেন।

প্রাথমিক আলাপের পর অবস্থানের জন্য স্কুল-গৃহে স্থান দেখিতে লাগিলাম। মাষ্টার মহাশয়ও সে কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। গৃহের এক পার্শ্বে মঞ্চের উপর স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। আসবাবপত্র যখন রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম, সে সময় দিলীপ সিং নামক এক যুবক আসিয়া কহিলেন, "রুমাদেবী আপনাদের থাকিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করুন।" পরে অবগত হইয়াছিলাম, ধারচুলার পণ্ডিত লোকমনীজী রুমাকে আমাদের কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "সে স্থান অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন—সাধু-সন্ন্যাসী এ স্থানে আসিলে রুমা তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া সেবা করিয়া থাকেন।" এইরূপ কহিয়া মাষ্টার মহাশয় রুমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মনে করিলাম, ২।৩ দিন থাকিব, ইহাদের মধ্যে অবস্থান করিলে অল্পসময়ের মধ্যে ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেক অবগত হইতে সমর্থ হইব। এইরূপ মনে করিয়া দিলীপের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম।

স্কুলের অনতিদূরে রুমাদেবীর গৃহ। কুলীরা বোঝা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল—আমরাও সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম। আঙ্গিনায় কেদারায় আমি উপবেশন করিলাম; বহুসংখ্যক ভুটিয়া নর-নারী চতুর্দ্দিক্ হইতে সাগ্রহে দেখিতে লাগিল। কেহ বা ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে লাগিল; কেহ বা কোন্ দেশ হইতে আসিতেছি, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের কৌতূহল দূর করিয়া যে গৃহ অবস্থানের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, তথায় বস্ত্রপরিত্যাগের জন্য গমন করিলাম।

ঘরখানি দোতলার উপর। দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের মধ্যে গৃহের দ্বার এবং যাহাতে অধিক শীতল বায়ু আসিতে না পারে, সেই জন্য ছোট একটিমাত্র জানালা। গৃহের এক ভিত্তিগাত্রে গঙ্গাদেবীর চিত্র, অপর ভিত্তিগাত্রে—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

অঙ্কিত রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। মানুষের সঙ্গী, পুস্তক, ব্যবহারের জিনিষ দেখিয়া অনেক সময় তাহার চরিত্র অনুমান করা যায়। পণ্ডিত লোকমনীজীর কাছে এই সাধ্বী মহিলার অনেক সদ্গুণের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এখন তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।

হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নন্দাদেবী।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ভোজনাদির উদ্যোগ করা গেল।

রুমার আতিথ্যগ্রহণ জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হওয়া গেল। সেই সাধ্বী রমণী উত্তম চাউল প্রভৃতি উপকরণ প্রদান করিলেন। রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া স্নান করিতে গমন করিলাম। এ স্থানটি সমুদ্র হইতে ১০ হাজার ফিট হইতেও বেশী উচ্চ, সুতরাং এ স্থানে যে শীত খুব বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে হয়। স্থানটি খুব উচ্চ বলিয়া হাওয়া খুব হাল্কা ও শুষ্ক। ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্থান অতিক্রম করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ স্থানে অবস্থান করি নাই। এই জন্য খুব সাবধানতার সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিও মন দিয়াছিলাম। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও আমাদের শরীর এরূপ জলবায়ুতে অভ্যস্ত নহে বলিয়া এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।

স্কুলের নিকট রাস্তার নিম্নে জলের ঝরণা, মৃদুমন্দ ধারায় জল উদ্গত হইতেছে। গরম জলে স্নান করিবার জন্য কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন, আমি ঝরণার শীতল জলে স্নান করিবার পক্ষপাতী। ইহাতে সর্দ্দির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি প্রত্যহ গঙ্গার প্রাতঃস্নানে অভ্যস্ত হইলেও এ স্থানে ১০।১১টার সময় আমার প্রাতঃস্নান সম্পন্ন হইত। সম্ভবতঃ এই স্নানের অভ্যাসের ফলে শীতের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হই।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া স্কুলের দিকে গমন করিলাম। স্কুলে ৪০।৫০টি বিদ্যার্থী, ইহার মধ্যে ২।৪টি বালিকাও লিখাপড়া করিতেছে। পাঠ্যপুস্তক হিন্দী-ভাষায় লিখিত। এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে ভুটিয়া বালক বালিকার মধ্যে হিন্দীর প্রচলন দেখিয়া প্রীত হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ভদ্রপুরুষ। সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ইনি এ স্থানে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তির প্রতিনিধি। স্কুলের ভিত্তিতে যুদ্ধে ঋণ ও প্রাণ দিবার জন্য আমন্ত্রণপত্র আবদ্ধ। ব্যবসায়ী ভুটিয়াদের মধ্যে কেহ প্রাণ দিয়া সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হয় নাই, তাহা অবগত হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় আমার কৈলাসগমনের কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন। আর তিনি, "কত লোক এই স্থান দিয়া কৈলাস যাইতেছেন। আমার ভাগ্যে তাহা হইল না!"

নন্দাদেবীর অপর দৃশ্য।

বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তাঁহার কার্য্য করিবার কেহ নাই বলিয়া তিনি অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রসঙ্গের পর তিনি বলিলেন, "তিব্বতীরা যে পর্য্যন্ত না রাস্তা খুলিয়া দিতেছে, সে পর্য্যন্ত গারবাংএ অবস্থান করিতে হইবে। পাহাড়ে কলেরার প্রকোপের কথা অবগত হইয়া তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যেরূপে কোন স্থানে বেশী বিলম্ব না করিয়া আনন্দের সহিত গমন করিতেছি, সেইরূপ ভাবে গমন করিব। এ স্থানে যে এখন বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাতে পথক্লেশটা বাস্তবিকই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। "অসভ্য তিব্বত" যে স্বাধীন, সুতরাং সে ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে। চিরপরাধীন আমাদের মাথায় সে কথা প্রবেশ করিতে পারে না! ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য করেন, এইরূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল। পরে বুঝিলাম, আমাদের পক্ষে ইহা মঙ্গলময় হইয়াছে। ১৬।১৭ দিন গারবাংএ ছিলাম। এই অবস্থানের ফলে শরীর এ দেশের জলবায়ুতে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছিল। শুষ্ক হাল্কা বায়ু গ্রহণে ফুসফুসও অভ্যস্ত হইয়াছিল। তিব্বতে যে অঞ্চলে আমি ছিলাম, সে স্থানের সমতল ভূমির উচ্চতা সমুদ্র হইতে ১৪।১৫ হাজার ফিট। ইহা অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। শরীরকে যদি হাল্কা বায়ুর সহিত পরিচিত না করিয়া লইয়া যাইতাম, তাহা হইলে, বোধ হয়, রুগ্ন হইয়া পড়িতাম। যদি লিপুলেখ রাস্তা বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই এত দিন এ স্থানে অবস্থান করিতাম না। তাই মনে মনে ভাবিলাম, শাপ আমার পক্ষে ইহা বর হইয়াছে।
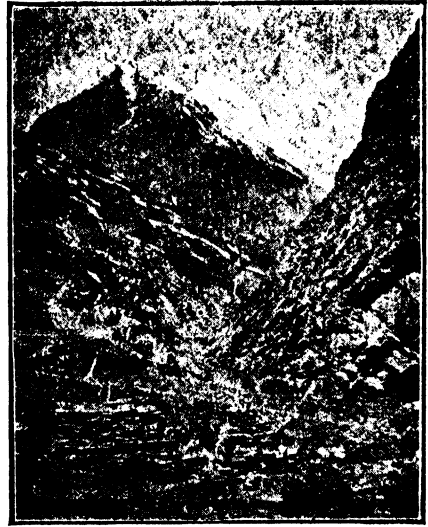
চকদেন, প্রস্তর স্তূপ ও পতাকা।

পতাকা ও স্তূপ।

গারবাং, দরর্ম্মা পরগণায়, Byans পট্টির অন্তর্গত। বিয়ানস্ ব্যাস শব্দের অপভ্রংশ। এই স্থানে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। তাঁহারই নামানুসারে এ প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। গারবাংএর অদূরে পর্ব্বতশিখরে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। এ দেশের লোক কহিয়া থাকেন, পর্ব্বত বড়ই দুর্গম। কস্তুরীলুব্ধ

শিকারীরা সময় সময় তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে অবগত হইলাম, উপরের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। এ স্থানে একটি নাতিবৃহৎ জলাশয় আছে; এজন্য এ স্থানটি বড়ই মনোহর হইয়াছে। মানসখণ্ডে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ ব্যাসদেব এই অপূর্ব্ব স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভুটিয়াদের বিশ্বাস, এখনও এ স্থানে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন পুরুষরা বাস করিয়া থাকেন। সময় সময় তাহার নিদর্শনও তাহারা পাইয়া থাকে। শিকারীরা বেশ ভক্তি সহকারে এ সকল কথা কহিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব পর্ব্বতে উঠিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে আমার এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই। এজন্য এখনও আমার আক্ষেপ আছে।

গারবাং গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূরে সরকারের কয়খানি গৃহ আছে। সরকারী কর্ম্মচারী আগমন করিলে, এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে পোলিটিকেল এজেন্টের এই স্থানে আফিস ছিল। তিব্বতী বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি আর বৃটিশপ্রভাব বদ্ধমূল করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। তিব্বতীরা কিছুদিন পূর্ব্বেও এ অঞ্চল দখল করিয়া ভুটিয়াদের নিকট হইতে শস্য, গুড়, কাপড় প্রভৃতি আদায় করিত। এখন তাহারা আর এ স্থানে থাকিয়া তাহা আদায় করে না, তাকলাকোটে আদায় করিয়া থাকে। ইংরাজ তাহাকে বাণিজ্যশুল্ক নাম দিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমের দুর্দ্দান্ত সীমান্তবাসীরা যেরূপ ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিব্বতীরাও আক্রমণ করিত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব জন্য তাহাদের এ ভাব স্থায়ী হয় নাই।

গ্রাম ও ডাকবাংলার মধ্যবর্ত্তী জমীতে বেশ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পলিমাটী অতীতযুগের জলপ্লাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জল থিতাইয়া যে পলি পড়িয়াছিল, তাহার স্তর বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভিতর হইতে সাগরের শামুক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কত শত যুগ অতীত হইল, প্লাবনের জল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পলিমাটী তাহা যেন সেদিনের ঘটনা বলিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সময় সময় আমি এই পলিমাটীর পাহাড় অতিক্রম করিয়া নিম্নে নির্জ্জন শ্মশানের নিকট কালীর তটে প্রস্তরের উপর বসিয়া চকিতহৃদয়ে মহাকালের ক্রীড়ার কথা চিন্তা করিয়া বিমোহিত হইয়াছি। সময় সময় অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। এক সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়; সূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া কালীর উভয়তটকে সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছে এইরূপ দুইটি উজ্জ্বল, নয়ন-রঞ্জন অদৃষ্টপূর্ব্ব রামধনুর আবির্ভাব হয়। কখন বা কুজ্ঝটিকার সময় দৃষ্টিবিভ্রমকারী দৃশ্য উৎপন্ন হইয়া বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল।

সময় সময় আমি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমরা সমতলবাসী পর্ব্বত আরোহণের আনন্দ কল্পনা করিতে সমর্থ নহি। ইহাতে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, ফুসফুস বলবান্ হয়। অভাবনীয় বিপদে মানুষ যাহাতে না বিমোহিত হয়, তাহার জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছে, য়ুরোপের মাউণ্ট ব্লাঙ্ক প্রভৃতি পর্ব্বত কঙ্করতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা অতিক্রমণ করিয়া য়ুরোপীয়রা "বাহোবাতে" দিক সকল মুখর করিয়া তুলেন। আমাদের দেশের মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। বদরীনাথ অঞ্চলে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে স্ত্রী-যাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখিয়াছি। আমি যে বৎসর কাশ্মীরের দুর্গম তীর্থ অমরনাথে গমন করি, সে বৎসরও আমাদের বাঙ্গালী মহিলাদের দেখিয়াছিলাম—তাঁহারা অকাতরে হিমালয়ের তুষারভূমি অতিক্রম করিতেছেন। আমার ধারণা, অগ্নিযোগে যাঁহাদের মুখ বিদগ্ধ (অর্থাৎ চা-চুরোট-বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতিতে যাঁহাদের মুখ পুড়িয়াছে—কণ্ঠনলী দূষিত হইয়াছে, ফুসফুস মলিন হইয়াছে—হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে, পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়াছে) এরূপ ব্যক্তি যেন হিমালয় আরোহণে না যায়েন। তাঁহারা এ অপূর্ব্ব আনন্দভোগের অধিকারী নহেন।

এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেও এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য অবসাদ উপস্থিত হইত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সিপাহীকে অর্দ্ধেক পথে লইয়া যাইয়া যদি তাহাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে রাখা যায়, যদি তাহার সামরিক উত্তেজনা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেনাপতি সে সৈন্যের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ফললাভে সমর্থ হয়েন না। আমার পক্ষে প্রায় সেইরূপ হইয়াছিল। এক এক বার মনের ভিতর

তরঙ্গ আসিত, এ স্থানে এরূপভাবে অলস হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা দেশে প্রত্যাগমন করা ভাল।

একবার মনে হইয়াছিল, নেপালরাজ্যে তিঙ্কর পাস দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করি। এ জন্য উদ্যোগও করিয়াছিলাম। ভুটিয়া বন্ধুরা বলিলেন, এ রাস্তা তত নিরাপদ নহে, একা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে সময় মনের ভাব এইরূপ হইয়াছিল, সেই সময় তিব্বত তাকলাকোট হইতে লিপুলেখ পাস অতিক্রম করিয়া এক সাধু আগমন করেন। বেচারা সাধু শীতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার বস্ত্রের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। আমার অতিরিক্ত একটা মোটা জামা ছিল; তাহা এক জন সাধুকে দিয়াছিলাম। দিবার মত বস্ত্র ছিল না—কিছু অর্থ দিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার কাছে অবগত হই, তিব্বতীরা পালাতে অবস্থান করিয়া ঘাঁটি আগলাইতেছে। ১৫ দিনের মধ্যে ঘাঁটি খুলিয়া দিবে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অনেকটা স্বস্তি আসিয়াছিল।

এই সময় ছংগরু হইতে একটা আহ্বান আসিল। ছংগরুর প্রধানের একমাত্র পুত্র কিছু দিন হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রধান মহাশয় শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন—সমস্ত সম্পত্তি তিনি লোকের কল্যাণকর কার্য্যে দান করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি আমার কিছু উপদেশ গ্রহণ জন্য উৎসুক হইয়াছেন। প্রথমে তথায় যাইতে আমি অমত প্রকাশ করিলাম। তাহার পর মনে করিলাম, যদি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দেওয়াইতে পারি, মিশন যদি লইতে সম্মত হইয়া এই স্থানে তাঁহাদের শাখা স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভুটিয়াদের মধ্যে পরমহংস দেবের নামের প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে, আর কালক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দেবতার অপূর্ব্ব বার্ত্তা তিব্বতীদেরও কর্ণগোচর হইবে। রুমাদেবী পথিপ্রদর্শক হইয়া এক দিন লইয়া চলিলেন। প্রায় ৩ মাইল পথ চলিয়া কালী অতিক্রম করিয়া ছংগরুতে উপস্থিত হইলাম। প্রধান মহাশয় যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমিও দানধর্ম্ম—শরীরের নশ্বরতা প্রভৃতি বিষয়ক নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার কিছু ফল দেখিলাম না। আমার মানস-সাধ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আসিবার সময় তিনি আমাকে তিব্বতী চিত্রকরের অঙ্কিত কৈলাসের একখানি চিত্র এবং আমাকে ও আমার সঙ্গীকে দীর্ঘলোম-যুক্ত ২খানি মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি ভক্তিপূর্ব্বক দিয়াছিলেন। তাকলাকোটে ইঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে সময় আমাকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ছংগরু গ্রামখানি মন্দ নহে—অনেক ব্যবসায়ী ভুটিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিঙ্কর নদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত। তিঙ্কর পাসের রাস্তাও এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে। নেপালরাজ্যের প্রজারা প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রধানের বাড়ীতেও অনেকগুলি বন্দুক রহিয়াছে, দেখিলাম। তিনি আমাকে যে মৃগচর্ম্ম দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মৃগয়ালব্ধ। নিরাশা পরমসুখদ—আমি নৈরাশ্যজনিত পরম সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে আবার গারবাংএ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম; আর ভাবিতে লাগিলাম, মানুষ একটু অনুকূল সুযোগ পাইলে কতরূপ সঙ্কল্প করে, জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তীর্থযাত্রী, এ সময়ও কুহকিনী আশা আমাকে বেশ ছলনা করিল।

নবম অধ্যায়

এক দিন আমি এই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিবার জন্য গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলাম। তখন আমার সঙ্গী একখানি গৃহ দেখাইয়া কহিলেন, "এই ঘরখানিতে 'রামবাং' হইয়া থাকে।" তিনি রামবাংএর অর্থ কহিতে সুরু করিয়া কহিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে কিশোর-কিশোরী এই স্থানে রাত্রিকালে মিলিত হইয়া পরস্পর প্রেমালাপ করিয়া থাকে। সায়ংকালে কিশোরীরা অগ্নি আনয়ন করিয়া গৃহের মধ্যস্থলে অগ্নি প্রজ্বালিত করে। তাহার দুই পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার গান গাহিয়া থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে পুরুষরা 'সখীর মানভঞ্জনের পালা' গান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকরা উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়া নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। ইহাতে উভয় দলের নৃত্যও বাদ পড়ে না। ভুটিয়া মদ, এই

অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া পান করিয়া থাকে। নৃত্য-গীত ও মদ্যপানে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলে তাহারা তথায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়।

স্ত্রীলোকরা অপর গ্রামের পুরুষদিগকে আহ্বান করিবার জন্য পর্ব্বতের উপর হইতে সাদা কাপড় নাড়িতে থাকে—এ দৃশ্য অনেক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষরা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে না, তাহারা সন্ধ্যাকালে আগমন করিয়া ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্গুলী দিয়া সীস দিয়া তাহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই প্রণয়-যজ্ঞে বালিকা অনুরাগ প্রকাশ করিলে, যুবক কিছু টাকা অনুরক্তার সখীর হাতে প্রদান করিয়া থাকে। এই অর্থ গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে, প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। ইহাই প্রথম পর্ব্ব।

এই অনুরাগের কথা বালক-বালিকার অভিভাবকরা অবগত হইয়া মত দিলে ইহাতে আর কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয় না। অন্যথা যুবকরা বলপূর্ব্বক কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পর্ব্বতের কোন নিভৃত স্থানে তাহাদের বন্ধুবরের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে।

অভিভাবক সম্মত থাকিলে কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বরের গৃহে লইয়া যায়। তথায় পানাহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করা থাকে। আগন্তুককে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়া থাকে। গ্রামের বৃদ্ধরা এই নব-দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া দেন। গ্রাম্য- দেবতার নিকট দম্পতীকে লইয়া যাইয়া নূতন ধ্বজারোহণ করাইয়া দেবতাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহের অধিককাল উভয় পক্ষ ভোজ দিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। সময় সময় বর-বধূর প্রণয় ছিন্ন হইয়াও যায়। সে সময় বধূ, বরের নিকট হইতে শ্বেত বস্ত্র প্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে, বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—আর তাহার চরিত্রে যে কোন দোষ নাই, ইহা সেই শ্বেত বস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বড়, ছোট সপত্নীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গৃহের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হিমালয়ের সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া আর প্রাচীন কালের আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ উভয় প্রকার বিবাহের মিলিত রামবাং প্রথার কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যে সময় গারবাংএ অবস্থান করিতেছিলাম, সে সময় তথায় এক অপূর্ব্ব উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার নাম ডুড়ং। ভুটিয়াদের ইহা শ্রাদ্ধ-উৎসব। এ সময় অনেক ভুটিয়ার বাড়ীতে ডুড়ং উৎসব হইয়াছিল। আমার ভুটিয়া সঙ্গী আমাকে কয়টি বাড়ীতে লইয়া যাইয়া এই উৎসব দেখাইয়াছিলেন। কয়বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, বহু ভুটিয়া নর-নারী উৎসব দেখিতে আসিয়াছেন। বিদেশী বলিয়া আমি সাদরে গৃহীত হইলাম। দেখিলাম, একটি ঘরে খুব ভিড়—সেই জনতা সরাইয়া দিয়া আমার ভাল করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা হইল। দেখিলাম, এক, দুই বা ততোঽধিক স্ত্রী বা পুরুষ কল্পনা করা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে যে কয় জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের ডুড়ং বা সপিণ্ডকরণ হয় নাই, তাঁহাদের শরীর কল্পনা করা হয়। পুরুষ বা স্ত্রী হইলে তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি দিয়া সজ্জিত করা হইয়া থাকে। সেই দণ্ডায়মান মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য সকল সাজাইয়া রাখা হয়। ঘটি, বাটি, বস্ত্র, আভরণ, পাদুকা, পুরুষ হইলে অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্বারোহী হইলে ঘোড়ার জিন প্রভৃতিও রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দেখিতে যেন কৌতুকাগার-প্রদর্শনী। ভুটিয়ারা নিত্যনৈমিত্তিক যাহা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্য এক স্থানে দেখিবার এই সুযোগ আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ সকল দ্রব্য ব্যতীত তথায় পুঞ্জীকৃত খৈও দেখিয়াছিলাম। পুরোহিত মহাশয় মৃত ব্যক্তির সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন—ভূতযোনি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা এই সপিণ্ডকরণ করিতে না পারিলে, চিহ্নবিশেষ ধারণ করিয়া থাকেন এবং সময় হইলে ডুড়ং সম্পন্ন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

যে সকল বাড়ীতে ডুড়ং দেখিতে গিয়াছিলাম, সকল বাড়ীর আঙ্গিনাতে মেষ বাঁধা দেখিয়াছিলাম। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা সেই মেষকে নানা প্রকার দ্রব্য ভোজনের জন্য

প্রদান করিতেছে। বহুভোজনে মেষের অগ্নিমান্দ্য হইলেও বলপূর্ব্বক তাহার মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য দূরপ্রদেশ হইতে ডাকে আনাইয়া মেষকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

এই উৎসবের কয়েক দিন পরে গ্রামবাসী পুরুষদের অসিনৃত্য—অদ্ভুত ব্যাপার। পুরুষরা সম্ভবতঃ মদ্যপান করিয়া এই তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে এই নৃত্যের অভিনয়টা একটু যেন অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে। অনেকে অসিচালনায় বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা যখন গমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন যুদ্ধবিজয়ী বীর-সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন, আর গ্রামবাসীরা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন।

যে মেষকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল, যাহাকে আত্মীয় বিবেচনায় কত সেবা-শুশ্রূষা করা হইয়া-ছিল, শেষে তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে সে পুনরায় গ্রামমধ্যে প্রবেশ না করে, সেই জন্য তাহাকে পাহাড়ের জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। মেষকে তাড়ানর পর তিব্বতীরা সেই ভেড়া ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিয়া থাকে।

এইরূপে দুই এক দিন বেশ কাটিয়া গেলে—দিন আর কাটে না। কখন স্কুলে যাইয়া ছেলেদের কিছু কিছু পড়াই; তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করি; কখন বা স্কুলের নিকট বৃত্তাকার চত্বরে—যখন গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে—সেই স্থানে অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের তুলনা—আমাদের দেশের প্রাচীন কালে কিরূপ অবস্থা ছিল ইত্যাদি তাহাদিগকে বলিয়া সময় যাপন করি।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতিদিন প্রথম রাত্রিতে এক জন লোক উচ্চৈঃস্বরে কিছু কহিতে কহিতে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিয়া থাকে। লোকটির স্বর বেশ গম্ভীর ও উচ্চ, সম্ভবতঃ এই গুণের জন্য লোকটি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, লোকটি কোন নূতন সংবাদ থাকিলে তাহা গ্রামবাসীর কর্ণগোচর করিয়া থাকে। রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে "গ্রামঘোষের" নাম আমরা অবগত হই। প্রাচীন কালের গ্রামঘোষের কার্য্য এই ব্যক্তি করিয়া থাকে। যে সময় সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল না, সে সময় গ্রামবাসীকে বাহিরের সংবাদের সহিত পরিচিত করাইবার পক্ষে ইহা মন্দ উপায় নহে। ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত থাকেন। আর সেই সংবাদের সদ্ব্যবহার করিবার পক্ষেও তাঁহারা সময় পাইয়া থাকেন। জ্ঞানই শক্তি, আর শক্তিশালীই সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র ধর্ষিত, প্রপীড়িত ও প্রতারিত হইয়া থাকে। আমরাই তাহার উত্তম উদাহরণ।

এ দেশের অধিবাসীর অনেককে বিদেশীদের মধ্যে সেভেজ লেণ্ডোর (Mr. A. Henry Savage Landor) মহাশয়ের নাম সম্ভ্রমের সহিত স্মরণ করিতে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজ সরকারের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার গমনপথে বহুবিধ বাধা প্রদান করিলেও, তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার অলীক কথা প্রচার করিলেও ভুটিয়ারা কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি ভুটিয়াদের সহিত মিলিত হইতেন, তাহাদের দুঃখের কথা অবগত হই-তেন, সময় সময় তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। অপর পক্ষে এরূপ উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর কথা আমরা অবগত হইয়াছি, যিনি তিব্বতীদের সহিত একরূপ ব্যবহার করিতেন, আর জগতে প্রচার করিতেন অন্যরূপ! ইহাই কি প্রতীচীর সুসভ্য ডিপ্লোমেসী?

যে সকল কুলী তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিল, তাহা-দিগের মধ্যে এক জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তাঁহার অধ্যবসায়,দৃঢ়তা,নির্ভীকতা ও সমদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল। সমদর্শিতার দ্বারা যেরূপ হৃদয় জয় করা যায়, সেরূপ আর কোন উপায়ে হয় না। হিমালয়ের এই নিভৃত প্রদেশে ইংরাজচরিত্রের মহিমা তিনি যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন, সেরূপ মহিমা অসির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না!

আমার আবাসস্থানের নিকট এক ঘর তিব্বতী বাস করিত। বহুদিন হইল সে তিব্বত পরিত্যাগ করিয়া এই দেশবাসী হইয়াছে। এক দিন দেখিলাম, সে চর্ম্মসংস্কার

করিতেছে—শক্ত চামড়াকে পিটিয়া পিটিয়া তাহার ভিতর এক প্রকার মাটী দিয়া পুঁটলির মত করিয়া পদদ্বারা দলিত করিতেছে। তাহার এই কার্য্য দেখিয়া আমার চর্ম্মখানি নরম করিবার জন্য তাহাকে প্রদান করিলাম। সে উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যে সেখানি বেশ নরম করিয়া দিল। ইহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ মোটে একটি সিকি প্রদান করিয়াছিলাম; সে তাহাতেই প্রীত হইয়াছিল। আমাদের দেশে চর্ম্মকারেরা কত রকম মসলা খরচ করিয়া চর্ম্ম কোমল করিয়া থাকে, আর এ স্থানে সামান্য মৃত্তিকা ও পরিশ্রমে কেমন সুন্দর ফল পাওয়া গেল!

হিমালয়ে কতরূপ যে বনৌষধি আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা সে সকলের গুণের সহিত পরিচিত নহি। তাপস যুবকের দল যখন এই সকল দ্রব্যের গুণ-গ্রাম অবগত হইবার জন্য একাগ্রতার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহারা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। এ অঞ্চলে এক প্রকার তৃণ জন্মায়, তাহা সাবানের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতে বস্ত্র বেশ পরিষ্কৃত করা যায়। কত প্রকার ফলের তৈলপূর্ণ বীজ অব্যবহারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই সকল বীজ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। হিমালয়ের সর্ব্বত্র জল হইতে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতার অভাবে এই অপূর্ব্ব শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেবাদিদেব মহাদেব হিমালয়ের অধীশ্বর। এই জন্যই বোধ হয় চক্ষুষ্মান্ ভক্ত বলিয়াছেন, "শিবই দারিদ্র্যদুঃখদহনে" সমর্থ। যিনি হিমালয়ের সহিত পরিচিত—যিনি এ স্থানের দ্রব্যের গুণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি কখনও দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত হইতে পারেন না।

এ অঞ্চলের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বড় কম নহে—শস্যও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভুটিয়ারা সেই শস্য ভূগর্ভে ভূর্জ্জবল্কলের আবরণ দিয়া রাখিয়া দেয়। ইহার মধ্যে শস্য বেশ ভাল থাকে। গ্রীষ্মসমাগমের সহিত সেই শস্য তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি বড় বেশী হয় না। 'মনসুন' অর্থাৎ বর্ষা এ প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার জল নিঃশেষ হইয়া যায়, উচ্চ পর্ব্বতমালা তাহার আগমনপথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং বেশী বৃষ্টি হয় না। যখন নিম্নভূমিতে বৃষ্টি বা বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তখন সেই দৃশ্য এই উচ্চ ভূমি হইতে দেখিতে মন্দ হয় না। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য—মেঘপুঞ্জে তড়িৎ প্রকাশ বহুবার দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

এ দেশে বৃষ্টি যে খুব কম হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য ভূমি শুষ্ক থাকে। এ দেশে যে শস্য উৎপন্ন হয়, ভুটিয়ারা তাহা তাহাদের শীতাবাসে লইয়া না যাইয়া এই স্থানে ভূগর্ভে রাখিয়া থাকে। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে ভূর্জ্জ বল্কলের আবরণ বিন্যস্ত করিয়া শস্য রাখিলে আর্দ্রতা ও মূষিকাদি হইতে রক্ষিত হয়। শীতকালে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলে চোরও ইহার সন্ধান বড় শীঘ্র জানিতে পারে না।

শীতকালে যখন ভুটিয়ারা চলিয়া যায়, তখন ২।৩ জন ভুটিয়া এই স্থানে থাকিয়া গ্রাম রক্ষা করিয়া থাকে। সে সময় এ প্রদেশ বরফে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়, গমনাগমনের রাস্তাও থাকে না। এরূপ দুর্গম অবস্থাতে একবার কয়েক জন চোর আসিয়া ভুটিয়াদের বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনার পর হইতে তাহারা সতর্ক হয়। চোরের আক্রমণ হইতে গারবাং রক্ষা করিবার জন্য কয় জন লোক এই স্থানে অবস্থান করে।

এক দিন এক জন তিব্বতী ৫০।৬০টা ভেড়া লইয়া গারবাংএ উপস্থিত হইল। এ স্থানের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন তাহারা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাছে মেষ রুগ্ন হয়, এই ভয়ে তিব্বতীরা গারবাংএর নিম্নে গমন করে না। তিব্বতী লোম বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে, এক একটা ভেড়াতে প্রায় ২ সের ২৷০ সের লোম পাওয়া যায়। কেশকর্ত্তনের পালা সুরু হইল; ৩।৪ জন লোক মেষের লোম কাটিতে আরম্ভ করিল, যাহাদের চুলকাটা হইল, সে ভেড়া যেন গ্রীষ্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

মেষের আগমনে আমিও যেন বিপুল ভার হইতে মুক্তি-লাভ করিলাম। তিব্বতীর আগমনে আমরা বুঝিলাম, লিপুলেখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; আমাদের গমনপথ অনর্গল হইয়াছে। যাইবার জন্য "সাজ" "সাজ" সাড়া পড়িয়া গেল। তিব্বতের জন্য আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়া গেল। এবার বোঝা আর কুলীর পৃষ্ঠে যাইবে না, এ জন্য

একটা ঝব্বু সংগ্রহ করা গেল। চামরী গাই আর বৃষের সহযোগে ঝব্বুর জন্ম। ইহা খুব ক্লেশ-সহিষ্ণু আর পর্ব্বত আরোহণে অভ্যস্ত; ইহার পদস্খলন প্রায় হয় না। মহা বৃষভবাহনের দেশে ঝব্বুর সাহায্য না পাইলে এই দুর্গম পথ অধিকতর দুর্গম হইত।

এ দেশে একটা চলতি কথা আছে যে, গয়াতে গমন করিতে হইলে টাকার দরকার, আর মানসে যাইতে হইলে ছাতুর প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রবাদ অনুসারে কিছু ছাতু আর গুড় সংগ্রহ করা গেল। মনে করিয়াছিলাম, বেশী করিয়া ছাতু লইয়া যাইব—সাধু, সন্ন্যাসী, লামাদিগকে দেওয়া যাইবে। ঝব্বুওয়ালা বেশী লইতে আপত্তি করিল; সুতরাং বেশী লওয়া হইল না।

ভারবাহী ঝব্বু।

বোঝার জন্য ঝব্বু আর আমার নিজের জন্য একটি ভুটিয়া ঘোড়া ভাড়া করা গেল। এবারের রাস্তা বিকট না হইলেও উন্নত প্রদেশ দিয়া গমন করিতে হইবে—বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ ও পাতলা, অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়, এ জন্য ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ৮ই জুলাই আমার সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ৯ই এ স্থান হইতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

বসন্তে।

এই গান-গন্ধ-বর্ণ বিশ্বভরা সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস,
তরুণ তরল শোভা, ঢল-ঢল আনন্দ-আলোক,
পুঞ্জ-পুষ্পে পুলকিত সহকার, চম্পক, অশোক,
এই হর্ষ, এই স্পর্শ, সমীরের এ মদ-বিলাস,

আধ-আধ স্বপ্ন সুখ স্মৃতিমাখা ভাব-উন্মাদনা
কোথা ছিল এত দিন? কোন্ গুপ্ত অমৃতভাণ্ডারে?
সৌন্দর্য্যের ভোগবতী বহিতেছে বেগে শতধারে
ফুটেছে জড়ের বুকে অপরূপ কি প্রেম চেতনা?

কত রূপ রসে পূর্ণ ধরিত্রীর পাষাণ-পঞ্জর
বসন্ত আসিছে ফিরে! নরচিত্ত কেন শূন্যময়
যৌবন-বসন্ত শেষে? ভ্রান্ত আমি, নর তুচ্ছ নয়—
বাহিরে সে ক্ষুদ্র ক্ষীণ,—অন্তরে সে অজেয় অমর,

আপনার মাঝে পশি' দেখ চেয়ে সৌন্দর্য্য-পিপাসী,
অনন্ত বসন্তমাঝে উছলিছে কি অমৃতরাশি।

শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পথি-প্রদর্শন

১

ভুবনেশ্বরীকে পতিহীন এবং মহাদেবকে পিতৃহীন করিয়া গোকুল চট্টোপাধ্যায় যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, মহাদেবের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। মহাদেবের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার খবর বাহির হইবার দুই দিন পরে গোকুল বাবুও ধরাধামে জীবনভার বহন করিতে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাহা বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, পুত্রের ফেলের সংবাদ তাঁহার মৃত্যুকে আগাইয়া আনিয়াছিল। মহাদেব যে ফেল হইবে, ইহা যাহারা তাহাকে জানিত, তাহাদের ভুল করিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহারা তাহাকে জানিত না, তাহারা আশ্চর্য্য হইল, কেমন করিয়া এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রিয়দর্শন বালকটি প্রবেশিকার মত পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারিল না। সে যাহা হউক, এ কথা সত্য যে, পুত্রের অকৃতকার্য্যতার সংবাদ পিতা যেরূপ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মাতা তেমন পারেন নাই। গোকুল বাবুর মৃত্যুর পর সদ্য পতিহীনা ভুবনেশ্বরী কাঁদিয়া পাড়া ফাটাইলেন না; যাঁহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন, নিন্দা মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাঁহাদিগকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন; নিকটতম আত্মীয়গণকে বুঝাইলেন, "খাবার পরবার সংস্থান ক'রে গেছেন, মাহুকে রেখে গেছেন—আমার ভাবনা কি?" যাহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা গা-টিপাটিপি করিয়া কথাটার গূঢ় ইঙ্গিত সম্বন্ধে পরস্পরকে সচেতন করিয়া দিলেন; যাহারা স্থূল-বুদ্ধি, তাঁহারা "মাগীর" অসীম ধৈর্য্যের কথা বলাবলি করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, ভুবনেশ্বরী পুত্রকে খুঁজিলেন। মহাদেব পাশের ঘরের এক কোণে বিমূঢ়ের মত বসিয়া ছিল, মাতার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র।

ভুবনেশ্বরী নিকটে যাইয়া পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। এতক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রু এইবার বাহির হইয়া পড়িল। মাতা ছিলেন মহাদেবের সব। তাঁহার কান্না দেখিয়া মহাদেবও কাঁদিয়া ভাসাইল। কিছুক্ষণ কাঁদিবার পর, ভুবনেশ্বরীর বুকের বোঝা, চোখের জলের ভিতর দিয়া অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া, তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া তিনি বলিলেন, "কাঁদছিস্ কেন, মাহু?"

মহাদেব সজল চক্ষু মাতার দিকে তুলিয়া বলিল, "তুমি কাঁদছ যে?"

ভুবনেশ্বরী চুপ করিয়াছিলেন। এই কথায় আবার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। তাঁহাতে একান্ত নির্ভরশীল পুত্রের কথা তিনি জানিতেন। কিন্তু সেই নির্ভরতা পিতৃশোককেও যে ছাপাইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন না।

সজোরে মহাদেবকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, তিনি বলিলেন, "উনি বল্‌তেন, 'মাহুকে তুমি শাসন কর না মোটে, ওটা ব'য়ে যাবে।' আমি ব'ল্‌তুম, 'জড়ভরতের মত বাড়ীতে ব'সে না থেকে যদি ব'য়ে যায়, ক্ষতি নেই। তা' ছাড়া, ও যে পথেই যাক্, আমাকে কখনও কষ্ট দিতে পারবে না।"

মহাদেব অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কি কখনও কষ্ট দিয়েছি, মা?"

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "না, বাবা, কখনও না। শুধু, সে দিন একটু বুকে বেজেছিল, যে দিন তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্‌লে, 'মা ফেল হয়েছি।' আমি চাই, সকলে দেখুক, তোমার শক্তি কোনও বিষয়ে, কারুর চেয়ে কম নয়। সকলে এসে আমায় বলে, 'তোমার ছেলেটি দুর্দ্দান্তের শিরোমণি!' আমি হেসে মনকে বুঝাই, 'শিরোমণি ত।' তুমি মোটে পড়াশুনা কর না—সকলেই ব'লত, আমিও দেখতুম। ভাবতুম, মাহু পরীক্ষার সময় সকলকে দেখাবে, সে না প'ড়ে অনেক পড়াশুনা-করা ছেলেকে কাবু করতে পারে। কই, তুমি ত' তা' পার্‌লে না? আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল যে।"

মহাদেব কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মনের সঙ্কল্প অন্তর্য্যামীর নিকট অগোচর রহিল না।

২

এক বৎসর পরের কথা। প্রবেশিকা পরীক্ষার খবর বাহির হইয়াছে। প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মুখে পর্য্যন্ত সেই একই কথা—কি করিয়া মহাদেব চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করিল? স্কুলের অতীত জীবনে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই; ভবিষ্যৎ জীবনেও যে ঘটিবে না, সে বিষয়ে সংশয় নাই। স্কুলটি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ ছয়টির অধিক ছাত্র হইত না। তাহাদের মধ্যে আবার একটি, বড় জোর দুইটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, স্কুলের সম্মান রক্ষা করিত। মহাদেব সারা বৎসর এক দিনও স্কুলে যায় নাই। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের তাহাতে আপত্তি ছিল না; মাসের মাহিয়ানা পাইলেই তাঁহারা খুসী। সেই মহাদেব কি করিয়া এই অভাবনীয় ব্যাপার সম্ভব করিয়া তুলিল? তাহার কার্য্যকলাপ কি সবই অদ্ভুত, সবই অনন্যসাধারণ?

যাহাকে লইয়া এত আন্দোলন, সে কিন্তু মুখ শুষ্ক করিয়া, বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিল। কি করিয়া মাতার নিকট এ মুখ সে দেখাইবে? মাতা যে তাহাকে 'শিরোমণি' দেখিতে চাহিয়াছিলেন? চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই। সমস্ত দিন পাড়া মাতাইয়া বেড়াইয়াছে; নিজের সঙ্কল্পের কথা ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করিবার সুযোগ কাহাকেও দেয় নাই। তাহার পর, গভীর রাত্রিতে মাতা ঘুমাইলে চোরের ন্যায় সন্তর্পণে অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ভোর হইবার পূর্ব্বে সে নিজের বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিত। তখন কিন্তু তাহার মন, এতক্ষণ যাহা পড়িয়া আসিল, তাহার পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত।

পুত্রের গোপন লীলা ভুবনেশ্বরীর নিকট অজ্ঞাত ছিল না। কিসের জন্য তাহার এই প্রচেষ্টা, সে কথা স্মরণে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। পুত্র যদি মাতাকে সুখী দেখিবার জন্য, সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিতে পারে, কোন্ লজ্জায় তিনি শয্যায় পড়িয়া থাকিবেন? মহাদেব পড়িতে বসিত; জানালার ফাঁক দিয়া তাহার পাঠনিরত মুখের প্রতি তিনি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। পড়িতে পড়িতে জাগরণে অনভ্যস্ত মহাদেবের চক্ষু দুইটি ঘুমে জড়াইয়া আসিত। অমনই ভুবনেশ্বরীর মাতৃহৃদয় ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে কোল দিতে চাহিত, প্রাণপণ বলে সে প্রলোভন তিনি সংবরণ করিতেন। নিজের উপর বিরক্ত হইয়া, মহাদেব ঘুম তাড়াইবার জন্য যখন ঘরময় পাদচারণা করিয়া বেড়াইত, ভুবনেশ্বরীর মনে হইত, কে যেন তাঁহার বুক দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া দিতেছে। তাহার পর ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে মহাদেব পাঠ বন্ধ করিত; ভুবনেশ্বরী লঘুপাদক্ষেপে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। শয্যায় বসিয়া, ভুবনেশ্বরীর চক্ষু জ্বালা করিয়া, জল আসিয়া পড়িত। পুত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার প্রলোভন জয় করিবার জন্য বিধবা ভগবানের নিকট করযোড়ে শক্তি ভিক্ষা করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, "মা হয়ে ছেলেকে আমি নষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না—তা'তে আমার বুক ভেঙ্গে যায় যাক্।"

* * * * *

ভুবনেশ্বরী কুটনা কুটিতেছিলেন। পাশের বাড়ীর হরির মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; হাসিমুখে বলিলেন, "এইবার তোমাকে এক দিন খাওয়াতে হবে, দিদি।"

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "বেশ ত, ভাই, সে ত আমার সৌভাগ্য।"

হরির মাতা কহিলেন, "অমন পাশ কাটিয়ে যাওয়া উত্তর দিলে চল্‌বে না। দিনক্ষণ সব ঠিক্ ক'রে ফেল। এমন ছেলে কার হয়? কার্ত্তিকের মত—যেমন রূপ—"

তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মাঝখানে ভুবনেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "দৈত্যদের মত—তেমনই গুণ।"

কৃত্রিম ক্রোধের সহিত হরির মাতা বলিলেন, "হোক্ সে দৈত্যদের মত। তোমার দৈত্যটি পাড়া তাক্ লাগিয়ে দিলে ত?' কারুর মুখে যে রা'টি নেই?".

বিপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভুবনেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "আবার কোথায় কি ক'রে এল?"

পূর্ব্বোমত স্বরেই হরির মাতা বলিলেন, "তা' নয় ত কি? হরি বলে, স্কুল হয়ে অবধি এ রকম কখনও হয় নি। হাজার হাজার ছেলে এক্‌জামিন্ দিলে, তার ভেতর মাহু মোটে ছ' জনের নীচে পাশ হয়েছে।"

ভুবনেশ্বরী কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এ কি বলিতেছে? তবে কি মহাদেবের পরীক্ষার খবর বাহির হইয়াছে? কই, মহাদেব ত সে কথা তাঁহাকে কিছু বলে নাই?

নিশ্চিত হইবার জন্য, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার হরি পাশ হয়েছে ত?"

হরির মাতা বলিলেন, "হ্যা দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ হয়েছে। ওদের স্কুল থেকে ঐ ওরা দু'জন পাশ হয়েছে; মাহু খুব ভাল হয়েছে, আর হরিও কোনও রকম ক'রে বেরিয়ে গেছে।"

হরির মাতা ইহার পর যাহা বলিলেন, একটা কথাও ভুবনেশ্বরীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। পরীক্ষার ফলাফল যে বাহির হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরী পুত্রকে চিনিতেন, সে যে পাশ হইয়াছে, তাহা সংশয়ের অতীত। সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার কথাটা জনরব হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নহে। তবে? সে কেন এমন করিয়া অপরাধীর কালিমা লইয়া লুকাইয়া ফিরিতেছে? মাতার মন নানাপ্রকার অসঙ্গত কল্পনা করিতে লাগিল; কোনটাই কিন্তু তাঁহার যুক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। এমন সময় হরির মাতা উঠিলেন, ভুবনেশ্বরীও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পুত্রকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভুবনেশ্বরী বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তখন দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছিল। মৃদু-পাদক্ষেপে ভুবনেশ্বরী তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মহাদেবের হুঁস নাই। কোমল করস্পর্শে চমকিয়া পাশের দিকে ফিরিতেই মহাদেব মাতাকে দেখিতে পাইল। তাঁহার দৃষ্টি তাহাকে বলিয়া দিল, তিনি সব কথাই শুনিয়াছেন। মহাদেব মাতার কোলের ভিতর মুখ লুকাইল। দুই জনেই নীরব; পুত্রের মুখ বন্ধ, মাতারও তাহাই। ভিতরে যে ঢেউ উঠিতেছিল, তাহার বেগ উভয়কেই সাম্‌লাইতে হইতেছিল—কথা কহিবে কে?

এইরূপভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, পুত্রের মুখের অতি সন্নিকটে মুখ লইয়া গিয়া ভুবনেশ্বরী ডাকিলেন, "মাহু!"

পুত্র উত্তর দিল না।

পুত্রের মাথাটা একটু নাড়িয়া দিয়া, মাতা সস্নেহে বলিলেন, "এত লজ্জা কেন, বাবা? পাশ হয়েছ, তা জানি। সপ্তম হওয়ার কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, সেটা শুধু জানতে চাই।"

গভীর লজ্জায় মহাদেবের মুখ হইতে বাক্য সরিতে চাহিল না। অতি কষ্টে, অব্যক্ত স্বরে সে বলিল, "হ্যাঁ, মা, সত্যি।"

ভীড়ের মধ্যে হারান বালক পরিচিতের মুখ দেখিতে পাইলে যেমন আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, প্রায় সেইরূপ অধীরতার সহিত ভুবনেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি? তবে তুমি এমন ক'রে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

মাতার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত মহাদেব চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইল যে, উত্তর শুনিবার জন্য তাঁহার চোখ দুইটি তখনও ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। সে কি ভাবিল; উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি খুসী হয়েছ, মা?"

মাতা বলিলেন, "এমন খবরে কে না খুসী হয়, বাবা?"

পুত্র বলিল, "কিন্তু, তুমি আমার 'শিরোমণি' দেখতে চেয়েছিলে যে।"

মাতা এতক্ষণে পুত্রের লজ্জার কারণ বুঝিলেন। নয়নাশ্রুতে ভাসিয়া বার বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"ভগবান্, এত সুখ অভাগিনীর অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে!"

নিবিড়ভাবে পুত্রকে বক্ষে সংলগ্ন করিয়া তিনি বলিলেন, "সেটা এর পরের পরীক্ষায় দেখব।"

পুত্র তখন ভাবিতেছিল,—ইহাতেই মা'র এত আনন্দ! যদি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, না জানি, কত আনন্দ হইবে! এমন মা কাহার হয়?

মহাদেব মাতার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিল। আই-এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, সে সকলকে জানাইয়া দিল যে, ইচ্ছা করিলে, অসম্ভবও তাহার নিকট সম্ভব হয়। ইহার পর সে কিন্তু আর পড়িতে চাহিল না। প্রতিবেশীদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "কি হবে প'ড়ে?" মাতার নিকট সে আব্‌দার করিয়া বলিল, "না, মা, আর

পড়্‌ব না। তুমি যা চেয়েছিলে, তা' ত করেছি—আর না, পড়া-শুনা আমার ভাল লাগে না মোটে।"

তাহার "না"কে "হাঁ" করান, ভুবনেশ্বরী ব্যতীত আর কাহারও সাধ্যের ভিতরে ছিল না। তিনিও সে চেষ্টা করিলেন না। অবশেষে, সত্য সত্যই মহাদেব পড়াশুনা ছাড়িল।

পাড়ায় অগ্নিযোগের ন্যায় খবরটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যে শুনিল, সে-ই একটু দাঁড়াইয়া ভাবিয়া লইল। এই পরমাশ্চর্য্য বস্তুটি ইহার পূর্ব্বে একটা ভারী ফলের ন্যায় উপরে ঝুলিতেছিল; সহসা সকলের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া নিজেও ফাটিয়া গেল এবং আশপাশের সকলকেও যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিল। সৃষ্টিছাড়া ছেলেটার জন্য আত্মীয়গণের দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না, পরিতাপেরও সীমা রহিল না। তাঁহারা বড় গলায় ঘোষণা করিলেন যে, বুদ্ধিহীনা নারীকে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতেই হইবে।

৩

সুখে, দুঃখে সকলের দিন কাটে। ভুবনেশ্বরীর সম্বন্ধে এ কথাটা এত সুন্দরভাবে খাটে যে, সত্য নির্দ্ধারণের জন্য দ্বিতীয় স্থানে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

ভুবনেশ্বরী চিরকালই একরোখা। তাঁহার পিতার চাকরী ছিল, দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে কন্যাটি থাকিত। পিতা নিজ মতানুযায়ী কন্যাকে শিক্ষা দিতেন এবং বুদ্ধিমতী বালিকাও বিভিন্ন জাতির চরিত্রগত পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া, বহু অজ্ঞাত তথ্য উদারমতাবলম্বী পিতার নিকট হইতে শিখিয়াছিল। ভুবনেশ্বরীর স্বামী ছিলেন নিরীহ ভালমানুষ। একমাত্র সন্তান মহাদেবকে কোন্ আদর্শানুসারে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, ইহা লইয়া স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইত। খোঁচার ভয়ে ভীত শামুক সঙ্কুচিত হইয়া নিজের খোলের ভিতর যেরূপ আশ্রয় লয়, ভুবনেশ্বরীর তর্কের ভয়ে গোকুল বাবুও সেইরূপ নিজের ঘরটির ভিতর আশ্রয় লইতেন! ভুবনেশ্বরী বলিতেন, "হ্যাঁ, তা বই কি? খালি পড়াশুনা, আর পড়াশুনা! ক্লাসে প্রথম হচ্ছে,' এদিকে বাড়ীতে বাপমা'র ছেলের অসুখে সেবা কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ বেরোচ্ছে; ঝাঁটা মার, অমন পড়াশুনার মাথায়। ছেলে একটু দুরন্ত হবে না, ছট্‌ফটে হবে না? যাদের প্রাণ আছে তারাই ছট্‌ফট্ করে। নিস্তেজ যা'রা, প্রাণহীন যা'রা, তা'রা থাকে চুপ ক'রে।" পুত্র কিশোর বয়স অতিক্রম করিলে, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, ইহার আলোচনায় উত্তেজিতা ভুবনেশ্বরী বলিতেন, "তখন, যা ইচ্ছে যায়, তাই কর্‌বে। পড়তে ভাল লাগে, পড়বে; না ভাল লাগে, ছেড়ে দেবে। আমরা ওই ক'রেই ত' ছেলেমেয়ের সর্ব্বনাশ করি। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, তাকে দিয়ে নিজেদের অভিরুচি মত কায করাতে চাই। ফলে দাঁড়ায় এই যে, তারা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফুলটা ফুট্‌ছে; তাকে নেড়ে চেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, দেখতে দেখতে বেচারীর প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ভিতর থেকে যে দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, মানুষকে সেই দিকে এগিয়ে যেতে দেব। তার প্রতিভা, যে দিক দিয়ে স্ফুরিত হ'তে চায়, হোক্; তা'তে বাধা দেব না। তার জীবনের সার্থকতা যদি দুষ্টামী-বকামীর ভেতর দিয়ে হয়, তাই হবে। বাবার মুখে কতবার শুনেছি, ভাল, মন্দ দুটো নিয়ে জাতের প্রাণ। অঙ্গহীন হয়ে কখনও জাত বাঁচে? তাই, আমাদের জাতও বাঁচছে না। বাবা দুঃখ ক'রে ব'লতেন, 'আমাদের দেশে ভালর যেমন অভাব, খারাপেরও তেমনই অভাব। ভাল-মন্দের মধ্যে যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তা আমরা কেউ ভেবে দেখি নে। এই ধর, একটা খুব ধূর্ত্ত চোর জন্মাল। অমনই তা'কে ধরবার জন্য, পাঁচটা মস্তিষ্ক অবিরত উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। তা'র ফলে, তাদের বুদ্ধিও যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে। বেশ ত', মরা জাতটার নবজীবন সঞ্চার কর্‌বার জন্যে যদি দরকার হয়, মানু তার মন্দ দিকটায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাতে আর দুঃখ কি? তা ছাড়া, চেষ্টা কর্‌লেই কি ছেলেকে খারাপ হওয়া থেকে বাঁচান যায়? এই যে এত ছেলে কুপথ ধরেছে, তাদের বাপমা কি সুপথে আন্‌বার চেষ্টার ত্রুটি করেছিল? তবু, কোনও ফল হয় নি কেন?"

* * * *

বৈকালবেলা সাজসজ্জা করিয়া, বড় আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মহাদেব চুল আঁচড়াইতেছিল। উন্মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি তাহার গৌরবর্ণ

মুখের উপর পড়িয়াছিল। ঘরের মেঝের মাতা ভুবনেশ্বরী বসিয়া। পুত্রগর্ব্বে গর্ব্বিতা মাতা সেই প্রসাধনক্রিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলেন, "এ ছেলের আবার বিচার! আমি যেন ক্রমশঃ কি হইয়া পড়িতেছি!"

মহাদেব আবার ফিরিল; মাতার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। মাতার চক্ষুতে তখনও সেই বিমুগ্ধ ভাব। একটু লজ্জা পাইয়া, সে ভুবনেশ্বরীর কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। পুত্রের লজ্জা ভুবনেশ্বরীর নিকট গোপন রহিল না। তিনি সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, বস্‌লি যে বড়? কোঁচান কাপড়খানা খারাপ হয়ে যাবে যে!"

মহাদেব বলিল, "যাক্ গে। খারাপ হ'য়ে গেলে, কেউ ত আমায় শূলে চড়াবে না।"

মাতা বলিলেন, "তা হ'লে, এত কষ্ট ক'রে কোঁচাবার দরকার কি?"

পুত্র বলিল, "সখ্। কেন, তুমি কি দেখনি যে, কত দিন আমি সাজগোজ্ না ক'রেই বেরিয়েছি?"

ভুবনেশ্বরী অন্য কথা পাড়িলেন; পুত্রের মস্তকের পিছনদিক্‌টায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "চুলটা খারাপ ক'রে দেব?"

মহাদেব উত্তর দিল না; মাতার বক্ষে মস্তক ঘষিতে উদ্যত হইল।

ভুবনেশ্বরী সশঙ্ক হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা পাগলকে নিয়ে পড়লুম ত! থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে।"

মহাদেব প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল—ভাবটা যেন, কেমন জব্দ!

এইরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া, প্রত্যহই মহাদেব বাহির হইয়া যায়; ফিরিতে কোনও দিন বা হয় রাত্রি একটা, কোনও দিন বা তিনটা, আবার কোনও দিন একেবারে পরদিন প্রাতঃকাল।

প্রতিদিনের মত আজও মহাদেব চলিয়া গেল। ভুবনেশ্বরীর উঠিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। হাতে কায নাই, পুত্রও কাছে নাই, হরির মাতারও এমন সময় আসিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এ কথা সে কথা ভাবিবার পর, অতর্কিতভাবে কখন্ যে তিনি পুত্রের কথা ভাবিতে সুরু করিলেন, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

এই ভাবনাটা ইদানীং তাঁহার জীবনের অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিছু ভাবিতে বসিলে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এই দিকেই তাঁহার মন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিত। তিনি ত কেবল মহাদেবের মাতা নহেন, তিনি যে তাহার গুরু, তাহার পথি-প্রদর্শক! দৃঢ়হস্তে লাগাম ধরিয়া, তিনি পুত্রকে দুরন্ত ঘোড়ার খেলা শিখাইয়াছিলেন। পুত্র সে খেলায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চালকের হস্ত কাঁপে কেন? অপরিমিত সাহস এবং অখণ্ড আত্মপ্রত্যয় ছিল বলিয়া, তিনি এই ভীষণ দায়িত্ব নারী হইয়াও নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু, প্রয়োজনের সময় সব সঙ্কল্প যে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে! মনকে সাহস দিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। মানসিক বল আহরণ করিবার নিমিত্ত তিনি রাজপুতরমণীগণের কথা ভাবিতেন, যাহারা সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, স্বীয় পতি-পুত্রকে অকাতরে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিত। তাহারা পারিত, তিনি পারিবেন না কেন?

যুক্তি সাময়িক উত্তেজকের মত তাঁহার দেহ মনকে সজীব ও সরস করিয়া তুলিত বটে, কিন্তু ধোপে টেঁকে কই? যুক্তির দ্বারা চোখ রাঙ্গাইয়া, আর যাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় হউক, মনকে বুঝান সম্ভব নহে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সে যে আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠে! তর্কের ঝোঁকে যে সত্যকে একদিন ভুবনেশ্বরী সাদরে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন, নিয়তি যে বাস্তব জীবনে তাঁহাকে সেই সত্যের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্র সম্প্রতি যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা কোনও মাতা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। তিনি সাশ্চর্য্যে ভাবিতেন, হইল কি? অভিজ্ঞতাপুষ্ট তাঁহার চিরকালের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সামান্য আঘাতে এমন করিয়া নড়িয়া উঠে কেন? তিনি যে স্বামীর সহিত এত তর্ক করিতেন, তাহার পিছনে কি সত্য ছিল না, সে কি কেবল কথার যুদ্ধ? মহাদেবকে মুখ ফুটিয়া তিনি কিছু বলিতে পারেন না, অথচ, তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়! পুত্র তাঁহার আদর্শের এক চুল এদিক ওদিক হয় নাই। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই পাইয়াছেন। তবু তাঁহার প্রাণ এমন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে কেন? পিতার নিকট

বহুবার তিনি শুনিয়াছিলেন যে, পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে, মাতাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক সহ্য করিতে হয়। সেই পিতাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে তিনি বলিতেন, "এতদিন সত্য ব'লে যে জিনিষ-টাকে বিশ্বাস ক'রে এসেছি, একটু কষ্ট পাচ্ছি ব'লে তাকে মিথ্যা ব'লে মনে করতে পারব না? ভাল ক'রে দেখব, তার পর, কর্ত্তব্য স্থির করব। মাদু যে পথে যাচ্ছে, যাক্।"

মহাদেব কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মাতিয়া গিয়াছিল। লুকাইয়া কিছু করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সঙ্কোচও তাহার নাই। শিশুকালে মাতার নিকট হইতে সে শিক্ষা পাইয়াছিল যে, আমরা যাহাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করি, তাহা পাপ হইতে পারে, কিন্তু সেই পাপ লুকাইবার যে প্রয়াস এবং তাহার জন্য যে সঙ্কোচ, তাহা মহাপাপ। মাতার প্রতি কথাটি মহাদেব বেদবাক্যের অধিক বলিয়া মনে করিত; এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মহাদেব জাহাজের ন্যায় চলিয়াছিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র তরীগুলিকে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার মত সাহস কাহারও ছিল না। সে যে অন্যায় করিতেছে, ইহা বুঝাইবার মত শক্তিও কাহারও ছিল না। তাহাকে ভালবাসিত অনেকে, কিন্তু ভয় করিত সকলেই। দুই চারি জন বন্ধু সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার সহিত তর্ক করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মহাদেব তাহাদিগকে দোষ কোন্ স্থানে বুঝাইতে গিয়া এমন সব অশ্রুত-পূর্ব্ব ও চমক-প্রদ কথার অবতারণা করিয়া ফেলিল যে, বিমুগ্ধ শ্রোতৃ-বর্গের মনে রহিল না যে, তাহারা তর্ক করিতে আসিয়াছে; —যখন মনে পড়িল, তখন তর্কের প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছে।

মহাদেব তাহাদের মুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়া চলিল,—"এ সব কথা, ভাল কথা নয়। তবু তোমাদের মনকে এমন আকৃষ্ট ক'রে রেখেছে কেন? আমি যে পথে গেছি, তাকে তোমরা আন্তরিক ঘৃণা কর, তবে সে কথা শোন্‌বার জন্যে তোমাদের এত আগ্রহ কেন? মনের অগোচর কিছু নেই। এখানে যদি এখন কেউ এসে সুনীতি কিংবা ধর্ম্মনীতিমূলক কিছু একটার সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তোমাদের হাই উঠে, এ পাশ ওপাশ চাও। আমি এমন কথা বল্‌ছি না যে, ও সব বিষয়ের বক্তৃতা কারুর ভাল লাগে না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা ও কথা শুন্‌তে শুন্‌তে পাগল হ'য়ে যান। আমার কথা হচ্ছে, যার যে দিক্‌টা ভাল লাগে, সে সেই দিক্‌টায় যাক্;—তা নিয়ে রাগারাগি কর্‌বারই বা দরকার কি? আর উপদেশেরই বা এত ছড়াছড়ি কেন? খারাপ, ভাল দুটোরই শক্তি আছে। দুর্ব্বলের কাছে মাথা নোয়ানর চেয়ে, শক্তিমানের কাছে ঘাড় হেঁট করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তবে 'ভাল' যাদের বেশী জোরে টানে, তারা ভালর দিকে যাক্। কারণ, তাদের কাছে ভালটাই বেশী শক্তিশালী।"

অকপটে কথা বলিতে যাহারা জানে, তাহাদের কথা ভাল হউক, মন্দ হউক্, শ্রোতার মনের উপর একটা দাগ রাখিয়া যায়। মহাদেব প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে জানিত, তাহার মধ্যে কপটতা থাকিত না; তাই এ সব ছেলে-ভুলান বাক্য তাহার বন্ধুবর্গকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল।

৪

এই প্রকারে এতদিন চলিতেছিল। সেদিনকার ঘটনার পর, স্রোত অন্য পথ ধরিল।

কি একটা কথা কাটাকাটির পর মহাদেব পুলিস ঠেঙ্গাইয়া, যথারীতি জরিমানা দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে, খবরটা কেমন করিয়া ইতঃমধ্যে পাড়ায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে এবং তাহার ফলে, ভুবনেশ্বরীর লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ নাই। উপরে ভুবনেশ্বরীকে ঘিরিয়া যে দলটি বসিয়াছিল, তাহাদের চীৎকার বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট মহাদেবের কর্ণে থাকিয়া থাকিয়া প্রবেশ করিতেছিল। এমনই একটা চীৎকারের ভিতর হইতে মহাদেব কুড়াইয়া পাইল যে, পুলিস মারার আদি ও অকৃত্রিম কারণ নাকি মাতালের কীর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নহে। তাহার মন এই অভিনব তথ্যের প্রতিবাদের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কিন্তু, শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটা সেই স্থান হইতে নড়িতে নারাজ হওয়াতে ব্যাপার অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রায় এক ঘণ্টা ভুবনেশ্বরীকে নানাপ্রকার সুপরামর্শদানের পর ভীড় ভাঙ্গিল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, মহাদেব পরিশ্রান্ত দেহটাকে কোনও মতে টানিয়া উপরে লইয়া গেল। ভুবনেশ্বরী সম্মুখের বরান্দায় বসিয়া ছিলেন। পুত্রের
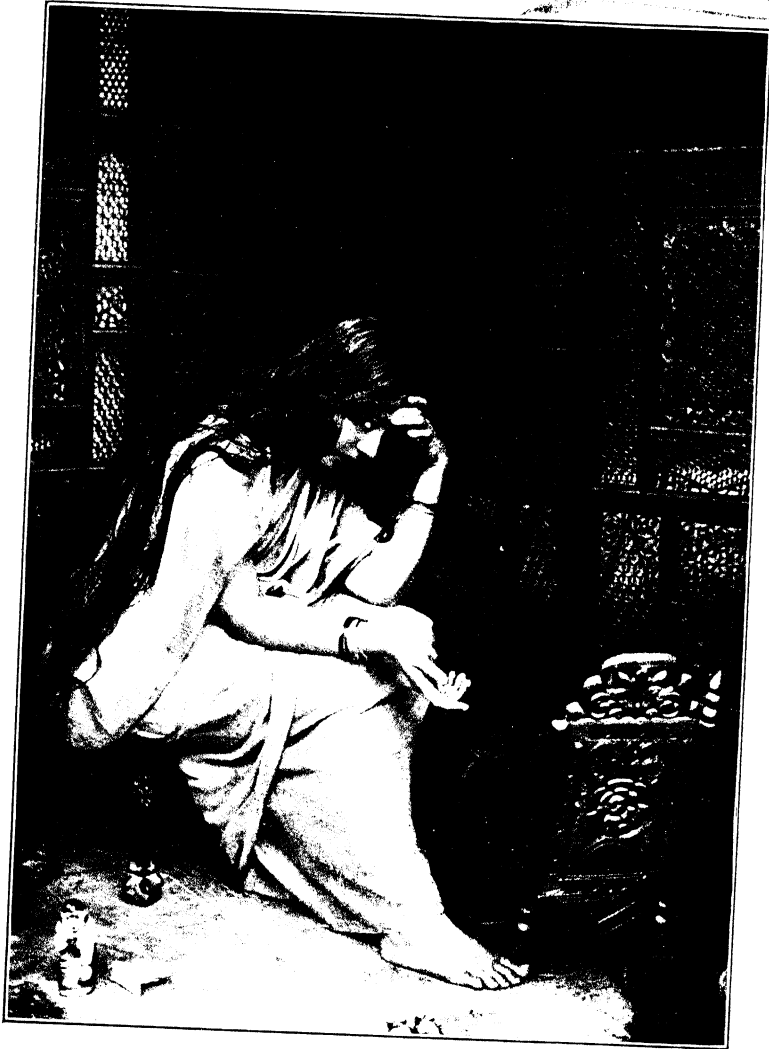
"অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে আয় মা ফিরে আয়!
দিনরাত কেঁদে কেঁদে ডাকি,
আয় মা ফিরে আয় মা ফিরে আয়!"

শিল্পী—শ্রী[illegible]কুমার চৌধুরী

আগমন দেখিতে পাইয়াও, তিনি তাহাকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। অভিমানী মহাদেব তাহা লক্ষ্যও করিল। বাহিরের ঘরে তাহার দেহটা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিলেও মনটা উপরের জল্পনা কল্পনা করিয়া, নানারূপ তিক্ত প্রতিশোধ-স্পৃহায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার উপর মাতার এই অবহেলার ভাব। মহাদেব সহিতে পারিল না, শ্লেষের সহিত বলিল,—"মা'র মন্ত্রীর দলটি বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে, দেখছি। মাইনে-টাইনে দিতে হচ্ছে কত ক'রে ?"

ভুবনেশ্বরী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পুত্রের নিকট হইতে এরূপ সম্ভাষণ তাঁহার জীবনে এই প্রথম। অসহ্য অন্তর্দাহে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ঘৃণায় মুখ হইতে কথা সরিতে চাহিল না। তিনি উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; বাহির হইতে দরজায় খিল লাগানর শব্দ শুনা গেল।

বাহিরে মহাদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র যে কথাটা তাহার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, তাহা তাহার নিজের কানেই অতিশয় বেসুরা ঠেকিয়াছিল। নিতান্ত ইতরের মত সম্ভাষণ, কি করিয়া এত সহজে সে মা'কে করিতে পারিল, তাহা ভাবিয়া সে নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই। বিস্ময় চরমে গিয়া উঠিল—যখন মাতা তিরস্কারমাত্র না করিয়া ভিতরে গিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এ অভাবনীয় ব্যাপার মহাদেবের অভিজ্ঞতায় একেবারে নূতন। অপরাধ তাহার যত বড়ই হউক, মাতা তিরস্কার ও উপদেশের দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া তাহা ছোট করিয়া ফেলিতেন। এবার সে প্রয়াস পর্য্যন্ত কেন করিলেন না ? শিশুকাল হইতেই সে দুষ্টামীতে অভ্যস্ত। তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক নানাপ্রকার অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া, সেই পথে তাহার দুষ্টামীর প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়া দিত। ভুবনেশ্বরী ব্যতীত আর কেহ দুষ্কৃতকারীকে ধরিতে পারিতেন না। ধরা পড়িয়া, জননীর নিকট হইতে শাসন ও আদর দুইটাই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া পাইয়া, মহাদেবের ধারণা হইয়া গিয়াছিল, অপরাধ করিতেই তাহার জন্ম এবং মাতা জন্মিয়াছেন তাহার অপরাধ লঘু করিয়া মার্জ্জনা করিবার জন্য। শিশুকালের সে ধারণা, পরিণত বয়সে পরিবর্ত্তন করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। তাহার বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নহে, ইহার প্রমাণও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এই সে দিনের কথা। পাড়ার লোক তাহার কার্য্যাবলীর কঠিন সমালোচনা করিয়া ছোট ছোট পদ্যে মনের বেদনা বাহির করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ একটা পদ্য বাড়ীর দরজায় আঁটা দেখিয়া, মহাদেব কৌতূহলী হইয়া পড়িল। তাৎপর্য্য অবগত হইয়া মহাদেবের সমস্ত অন্তর 'রী রী' করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এরূপ অপমান সহ্য করিয়া থাকিবার পাত্র সে নহে। জননীর অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক সে যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেই। ভুবনেশ্বরী অত্যন্ত শান্তভাবে ব্যাপারটার আদ্যন্ত শুনিলেন এবং পরিশেষে রায় দিলেন এই বলিয়া যে, তিনি যখন মা হইয়াও তাহাকে কোনও অপরাধে অপরাধী করিতেছেন না, তখন ব্যাঘ্রের ফেউ-এর ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠা একেবারে অকর্ত্তব্য, এমন কি, লজ্জার বিষয়। তবে ? মাতার আচরণ আজ এরূপ বিসদৃশ কেন ? হঠাৎ একটা আশঙ্কার কথা মহাদেবের মনে উদিত হইল। মা প্রতিবেশীদের কথা বিশ্বাস করেন নাই ত। তাহার ভাবনা এতক্ষণে কূল পাইল। সে মনে মনে বলিল, "ওঃ, তাই এত বিরাগ ? আমাকে ডেকে জিজ্ঞাস করাও হ'ল না,কি হয়েছিল। আমি নিজে সেধে গিয়ে ত কিছু বল্‌ব না।" অভিমানী মহাদেব উদ্‌গত অশ্রু দমন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে, নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর ভুবনেশ্বরীর লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাঁহার পুত্র মাতাল! মদ্য খাওয়া তিনি হয় ত সহ্য করিতে পারিতেন ; কিন্তু মাতাল হওয়া,—সে যে অসহনীয়। নেশা আমার অধীন—সে এক কথা। আমি নেশার অধীন—লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা। অবশেষে, তাঁহার পুত্র এমন করিয়া আদর্শ হইতে টলিয়া পড়িল! ছিঃ, ছিঃ! কেবল কি তাহাই ? মত্তাবস্থায় সে পথে বাহির হইয়াছে, নীচ, ইতর, হতভাগাদের মত মারামারি করিয়াছে,—তাহাতেও তৃপ্ত হয় নাই, গৃহে আসিয়া মাতাকে শ্লেষসূচক বাক্য বলিয়াছে। এ অবনতি দেখিতেও ভগবান্ তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আশার আকাশ-কুসুমের পরিসমাপ্তি শেষে পুত্র হইতেই হইল!

মনের ন্যায় পরমাশ্চার্য্য বস্তু পৃথিবীতে আর নাই।

কাযেই এই দুর্ব্বোধ্য সামগ্রীটার অধিকারীদিগের বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। যে ভুবনেশ্বরী প্রতিবেশীদিগকে কেউটএর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, যিনি তাহাদের সত্য কথাকে মিথ্যার সহিত একাসনে বসাইয়া, এক কান দিয়া শুনিয়া আর এক কান দিয়া বাহির করিয়া দিতেন,—তিনি তাহাদের মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিলেন কেন?

ভুবনেশ্বরী আদর্শের ভাঙ্গা ঘরখানিকে যুক্তি, চাড়ার ন্যায়, এতদিন কোনওমতে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল; আর পারিল না। সেখানি এবার ধরাশায়ী হইল। পুত্র বিপথে চলিয়াছিল,—তিনি আদর্শের জন্য তাহাতেও কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহাব মাতৃহৃদয় তাহাতে আর নাই। মনকে কেন্দ্র করিয়া, বিশ্বসংসারের আবর্ত্ত রচিত। মন যদি বাঁকিয়া দাঁড়ায়, সব নষ্ট হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ভুবনেশ্বরীর তেজ, সাহস, যুক্তি শেষ অবধি হার মানিল। নেশাখোরের বেশ ধরিয়া, পুত্রের যে মূর্ত্তি মাতার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া, সব ওলোট-পালোট করিয়া দিল, যাহার অস্তিত্ব এতদিন তাঁহার মনের ভিতরেই গোপনে অবস্থান করিতেছিল. একটা তুচ্ছ ধাক্কায় সে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিল। মহাদেব নেশার অধীন হইয়া পড়িতেছে,এই আশঙ্কা তাঁহার মনে অনেক দিন হইতেই জাগিয়াছিল। প্রতিবেশীদের ভাসা-ভাসা আলোচনা, সেই আশঙ্কায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু, যুক্তির সূক্ষ্ম আবরণ তাঁহাকে মনের সত্যকার অবস্থা বুঝিতে দেয় নাই। তাই, এ সম্বন্ধে তিনি এত নির্ব্বিকার থাকিতে পারিয়াছিলেন। আজ সে আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া সত্য আত্মপ্রকাশ করিল।

* * * * *

দিন যাইতে লাগিল। এ দিকে মাতা-পুত্রের ব্যবধান দূর হইতে দূরতর হইয়া উঠিল।

পুত্র ভাবে, মাতা না ডাকিলে যাইব কেন? তাহার পর, তাহার চক্ষুতে জল আইসে, সে আর ভাবিতে পারে না।—মাতা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, পুত্র যদি ক্ষমা চাহিয়া তাহার জীবনযাত্রা অন্যপথে চালাইতে সম্মত হয়, তাহা হইলে গোল মিটিবে, নচেৎ নহে। কি এক আবেগে, পুত্রপ্রাণা নারীর বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। অজানা ব্যথায়, বক্ষের ক্রন্দন চক্ষুর জলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহে। অজ্ঞাতে, তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়ে, "যাদু, বুকে ফিরে আয়!"

মহাদেবের পূর্ব্বের সে উৎসাহ আর নাই। তাহাকে পাইলে, সঙ্গীদের আমোদ জোয়ারের জলের মত বাড়িয়া উঠিত। এখন বাড়া দূরে থাকুক, ভাঁটার জলের ন্যায় কমিয়া আইসে। অভ্যাসমত এখনও সে বৈকালে বাহির হইয়া, গভীর রাত্রিতে গৃহে ফিরে, কিন্তু সুখ পায় কই? যখন আর পাঁচ জন সময়োপযোগী স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া, ভীষণ চীৎকারে ঘর ফাটায়, তখন সে এক কোণে উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। তাহার কানে সে বিকট ধ্বনি যে পৌঁছাইতেছে, এরূপ লক্ষণও কিছু পাওয়া যায় না। যোগদান করিবার জন্য, দুই এক জন মধ্যে মধ্যে যে তাহাকে ডাকে না, এমন নহে; কিন্তু, সে এরূপ বিতৃষ্ণা ও অনিচ্ছার সহিত তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে যে, পুনরায় অনুরোধ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। মহাদেব ভাবে, তাহার চিরকরুণাময়ী জননী তাহার প্রতি এরূপ অবিচার করিলেন কি করিয়া? দোষ করিয়া, সে লক্ষবার মার্জ্জনা পাইয়াছে, এবার দোষও নাই, মার্জ্জনাও বুঝি তাই নাই। দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার মাতার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িত। সেই মাতার সহিত একটা বাক্যালাপ করিতেও সে পায় না। সে যে কি শাস্তি, তাহা যিনি সব জানেন, তিনিই বুঝিতেছিলেন। তাহার জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কি করিবে? প্রতীকারের উপায় ত তাহার হাতে নাই!

ভুবনেশ্বরী প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে, এরূপভাবে দুই চারি দিন গত হইলেই পুত্র ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে এবং তিনি তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু, কই, তাহা ত হইল না? পুত্র যে অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহাও ত বুঝা যায় না। সে এখনও পূর্ব্বের মত সন্ধ্যাকালে বাহির হয় এবং বোধ হয়, আড্ডায় যাইয়া যোগদান করে। তাঁহার নিতান্ত দগ্ধ অদৃষ্ট, নতুবা এমন পুত্রের জন্য বুকভরা আশা লইয়া বসিয়া থাকিবেন কেন? এ চিন্তায় কিন্তু মন তাঁহার প্রবোধ মানে না। মাতা পুত্রের স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন; তাঁহার ঔদাসীন্য

তাহার বুকে যে খুবই বাজিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তথাপি, তাহার এরূপ আচরণ কেন? সে কি চায়? মাতার অভাব সে পূরণ করিবে? ভয়ে তিনি শিহরিয়া উঠেন। এইরূপেই ত কত শত জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে—দুঃখ ভুলিতে গিয়া তাহারা দুঃখের সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাঁহার চিন্তার সূত্র হারাইয়া যায়, আর তিনি ভাবিতে পারেন না, বক্ষ মথিত করিয়া জননীর প্রার্থনা অন্তর্যামীর পায়ে ছুটিয়া যায়—"আমার ভুলের সাজা আমায় দিও, ঠাকুর, তাকে নষ্ট করো না।"

৮

মহাদেবের যে কাণ্ডটা লইয়া রৈ-রৈ পড়িয়া গেল, সেটা এইবার বলিব।

যে বাড়ীটায় মহাদেবের আড্ডা ছিল, তাহার অনতিদূরে সেই পল্লীর একটি স্ত্রীলোক কয় দিন হইতে বিসূচিকা রোগে ভুগিতেছিল। এ সকল খবর মহাদেবের নিকট হাওয়ার আগে উড়িয়া আইসে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। তাহার কারণ, মহাদেবের মানসিক বিপ্লব। দেশ-কালপাত্র বিচার না করিয়া, পীড়িতের সেবা, দুঃস্থকে সাহায্যদান তাহার চিরকালের অভ্যাস। এ কথা সকলেই জানিত এবং তজ্জন্য তাহার ডাক পড়িত অনেক স্থানে। মহাদেব কখনও "না" বলিত না; কিংবা, তাহার শক্তিশালী দেহ ও উদার মন লইয়া রোগশয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইত না। জিদ করিয়া যে পল্লীতে ইদানীং সে আড্ডা করিয়াছিল, তথায় তাহার মত লোকের প্রয়োজন যে কত অধিক, তাহা না বলিলেও চলে। যত দিন দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, হতভাগীদের বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয় না; কিন্তু, রোগশয্যায় পড়িলে, "আহা" বলিবার মত কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—ভোজবাজীর মত সকলে অন্তর্হিত হয়। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও মহাদেব ঘরের কোণটিতে বসিয়া, মনটিকে মাতার পায়ের তলায় পাঠাইয়া, শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ কাহার সুতীক্ষ্ণ রোদনধ্বনি আসিয়া তাহার নির্জীব প্রাণকে কশাঘাত করিয়া জাগাইয়া দিল। সে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল; তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িল। ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কয় দিন অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর এইমাত্র হতভাগী মরিয়া জুড়াইয়াছে। বিলাপধ্বনি তাহার সহোদরার। মহাদেবকে দেখিয়া সে তাহার পায়ের নিকট আছাড়িয়া পড়িল। ভগিনীর মৃত্যুতে কাতর হইবার যথেষ্ট হেতু থাকিলেও, যে বস্তুটা তাহার শোককে দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল, সেটা শবদাহের ভাবনা। শনিবারের রাত্রি আমোদ-প্রমোদে না কাটাইয়া শ্মশানে গিয়া বসিয়া থাকা কাহারও মনোমত হইতেছিল না। তাহারা বলিতেছিল, "আজকের মতন থাক্ না প'ড়ে; বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে ঘর বন্ধ ক'রে দে, কাল সকালবেলা ওটার ব্যবস্থা করা যাবে।" ভগিনীর প্রাণ, সদ্গতির চিন্তায় এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। মহাদেব এক মুহূর্ত্তে অবস্থাটা বুঝিয়া লইল; ক্রন্দন-নিরতার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করিল; তাহার পর একখানি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া লইয়া, সেই ক্ষীণ শবটিকে দুই হস্তে সযত্নে তুলিয়া লইল; কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, কেবল মৃতার ভগিনীকে অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিল।

বিসূচিকা মহামারীরূপে কলিকাতায় তখন দেখা দিয়াছিল। নিমতলা দাহঘাটে মহাদেব অনেক পরিচিতকে দেখিতে পাইল। তাহারা চোখে, মুখে উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা মাখাইয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রথমে, মহাদেব উত্তর দিবে না ঠিক করিয়াছিল; অবশেষে কি ভাবিয়া বলিল, "একে যেখান থেকে এনেছি, সে জায়গাটা ভাল নয়।"

ধীরে ধীরে জনতা কমিয়া গেল। উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, বিস্ময় ও ঘৃণা লইয়া তাহারা ফিরিল। ছিঃ, ছিঃ! ব্রাহ্মণ-সন্তান একটা অস্পৃশ্যাকে দাহ করিতে লইয়া আসিয়াছে! হইতে পারে, মৃতা তাহার প্রণয়পাত্রী। কিন্তু, তাহাতে কি আইসে যায়? প্রেমের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া নূতন কথা নয়? এমন ত অনেক শুনা গিয়াছে যে, লক্ষপতি পথের ভিখারীতে পরিণত হইয়াছেন; কিন্তু, তাহাদের মধ্যে কি কেহ কখনও এরূপ বিপ্লবকারী কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছে? কালে কালে হইল কি? শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের শব স্পর্শ করিতে পারে না। সেই ব্রাহ্মণ-সন্তান এমন

করিয়া নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিল? কলিকাতা বলিয়া "পার" পাইয়া গেল। পল্লীগ্রাম হইলে দেখা যাইত; সমাজপতিরা একঘরে করিয়া তবে ছাড়িতেন। নিষ্ফল আক্রোশে সকলে ফুলিতে লাগিল।

* * * * *

প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাদেবের দাহকার্য্য এইমাত্র শেষ হইল। তাহার পরিচিত দলটির দাহকার্য্য রাত্রি তিন ঘটিকার সময় শেষ হইয়াছিল; তাহারা ভোর হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল; কারণ, রাত্রি থাকিতে গৃহে ফিরিতে নাই। কিছুক্ষণ হইল, তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। জাহ্নবীর বক্ষের উপর দিয়া যে বাতাস ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহার শীতল কোমল করস্পর্শ শ্রান্ত দেহটাতে বুলাইয়া লইবার জন্য মহাদেব দাহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে মনুষ্যচলাচল পথ হইতে একটু দূরে যাইয়া বসিয়াছিল। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহার খেয়াল নাই। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া সে চক্ষু ফিরাইল। যাহা দেখিল, তাহা তাহার বিস্মিত, স্তম্ভিত চেতনা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। ইহাও কি কখন সম্ভব হয়? বিমূঢ়ের মত নির্নিমেষনেত্রে, অভিভূতের ন্যায় ভুবনেশ্বরীর আগমন সে দেখিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিবার পথে নিরতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী দলটি মহাদেবের কীর্ত্তিকলাপ সবিস্তারে ভুবনেশ্বরীর কর্ণগোচর করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়াছিল; তীব্র সমালোচনাও যে কিছু কিছু করে নাই, এমন নহে। ভুবনেশ্বরী কান পাতিয়া সব শুনিয়াছিলেন, মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন নাই। তাহাদের মধ্যে হৃদয়বান্ একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া পাশের সঙ্গীটিকে বলিয়াছিল, "মাগীর বুকে বড্ড বেজেছে, কথা বল্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত নেই; আর না, থাক্।" ভুবনেশ্বরী শুনিতে পাইয়াছিলেন, বুকের মাঝখানটায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, বড্ড বেজেছে।"

তাহারা চলিয়া গেল, ভুবনেশ্বরী ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইলেন।

ভুবনেশ্বরী পুত্রের পাশে আসিয়া বসিলেন, তাহার মাথাটা নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, বড় কান্না কাঁদিলেন। মহাদেবও খুব কাঁদিল। কিছুক্ষণের পর পুত্রের মুখখানি সযত্নে সম্মুখের দিকে ফিরাইয়া, তাহার মুখের উপর হেঁট হইয়া, ভুবনেশ্বরী ডাকিলেন, "মাতু!"

পুত্র সেইরূপ ভাবে উত্তর দিল, "মা।"

মাতার বক্ষ উথলিয়া উঠিল; পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া মাতা পুনরায় ডাকিলেন, "মাতু!"

কণ্টকিত হইয়া, পুত্র পুনর্ব্বার উত্তর দিল, "মা!"

কাহারও কিছু বলিবার নাই; অথচ, বলিবারও এত আছে যে, তাহার অন্ত নাই। ভুবনেশ্বরী কেন যে পুত্রকে ডাকিলেন, তাহা তিনি জানেন না। পুত্র যে কেন মিছামিছি উত্তর দিল, সেও তাহা জানে না। এ যেন উভয়কে নামের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পুত্রের নাম এত মধুর, মাতা তাহা জানিতেন না; "মা" ডাক এত শান্তি দিতে পারে, তাহা পুত্রের স্বপ্নের অগোচর ছিল।

এইরূপ ভাবে আরও কিছুক্ষণ গেল। উভয়ে শান্ত হইলেন। ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কেন এসেছি, জানিস্?"

মহাদেব না ভাবিয়া উত্তর দিল,—"আমায় নিতে।" ভুবনেশ্বরী তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া, যেন নিশ্চিন্ত হইলেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহারই আছে; তাহার পর বলিলেন,—"হ্যাঁ, বাবা, নিতে। তোকে এবার এমন নেওয়া নেব মাতু, যে আমার সব ব্যথা, সব দুঃখ সার্থক হয়ে যাবে। আজ সেই কথাটাই বল্‌তে আমার এত দূরে ছুটে আসা। তা না হ'লে, বাড়ীতে বসেই ত তোর প্রতীক্ষা করতে পারতুম। ভাবলুম,—না, আমার কথা শ্মশানে গিয়েই বলা ভাল,—যেখানে পাপি-পুণ্যাত্মার প্রভেদ নেই, যে স্থান ভালমন্দের মিলনক্ষেত্র। এত কষ্টের পর যে পথটার সন্ধান পেয়েছি, সেটা তোকে আজ দেখিয়ে দিয়ে যাব। মাঝের দু'চার দিন তোর আমার মধ্যে যে পাঁচীলটা উঠেছিল, সেটা আমার ভুলে, তোর ভুলে নয়, মাতু। তুই যে ঠিক পথে চলেছিলি, তার প্রমাণ আমি পেলুম,—যখন শুনলুম, অস্পৃশ্যা ব'লে তুই স'রে দাঁড়াস্ নি, নিজের কাঁধ এগিয়ে দিয়েছিলি। যে সুপথে গিয়ে মনে নীচতা আসে, তার মত কুপথ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। তোর পথ তোকে নীচ ক'রে দেয়নি, হীন ক'রে তোলে নি, মনুষ্যত্ব ভোলায় নি—এর চেয়ে আর বড় পথ কোথায়? বিশিষ্টতা যে জগতের প্রাণ, সে কথা ত ভোলবার যো

নেই। কোনও ফুলের চমৎকার গন্ধ, গন্ধ বিলানই তার কায; কোনও ফুল দেখতে সুন্দর, সৌন্দর্য্যেই তার সার্থকতা; কোনও ফুল কুরূপ, এই রূপেই তার জয়। মানুষের পক্ষেও প্রকৃতির এই নিয়ম নিশ্চয় খাটে। সমাজ নিজের মনের মত ক'রে নিতে চায় ব'লেই এত বিভ্রাট, এত বিপত্তি, এত বিচার, এত বিরোধ! বেশী কিছু তোকে শোনাতে ইচ্ছে করছে না। আমরা মা ছেলে মিলে এক অপরূপ খেলা সুরু করেছিলুম। আমার হার হয়েছে। আমি আর তোর মা নয়, তুই আমার বাবা।"

অপরিসীম আনন্দে ও লজ্জায় মহাদেব মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। ভুবনেশ্বরী ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মস্তকে মুখ ঠেকাইলেন।

মহাদেবের মনে হইল, এত দিনে সে প্রকৃত পথ দেখিতে পাইল—সে পথে যাইলে মা'র মনে আনন্দ হইবে—লজ্জার বা দুঃখের কারণ ঘটিবে না।

শ্রীসন্তোষকুমার দে।

কুটীর পানে।

চল্ ফিরে চল্ কুটীর পানে,
সেথায় বাতাস গন্ধ-উদাস
　　সোহাগ জানায় কানে কানে।

আকাশ সেথা' সুনীল নিতি;
হর্ষে নদী গাইছে গীতি;
স্বর্গলোকের সুপ্ত স্মৃতি
　　উঠ্‌বে জাগি' তারার পানে।

দোয়েল-শ্যামা চালের পরে,
শিশ্ দিতেছে পুলকভরে;
খেলার ছলে স্বচ্ছ সরে
　　মরাল-দলে মৃণাল টানে।

হাজার রঙের বসন পরি'
ডাক্‌ছে সেথায় পুষ্প-পরী;
বনের মধু উজাড় করি
　　ডাক্‌ছে অলি আকুল তানে।

দুধ্-দোহনের মধুর স্বরে,
ঘুম ভাঙা'বে ঘরে ঘরে,
ক্ষীরের সাগর আকাশ-পরে,—
　　ভাস্‌ছে ধরা আলোর বানে।

কুঞ্জ-পথে অভয় বুকে,
হরিণ-ছানা খেল্‌ছে সুখে;
অঙ্গনেতে উর্দ্ধমুখে
　　নাচ্‌ছে শিখী পুলক-প্রাণে।

শূন্য কুটীর উজল ক'রে
অন্ন রেঁধে তোদের তরে,
ডাক্‌ছে যে মা আদরভরে,
　　হস্ত ভরা দুর্ব্বা ধানে।

চরকা করে মধুর হাসি',
বরণ করেন লক্ষ্মী আসি,
কহেন—"ভ্রান্ত ভারত-বাসি,
　　চল্ কুটীরের স্বর্গ পানে।"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
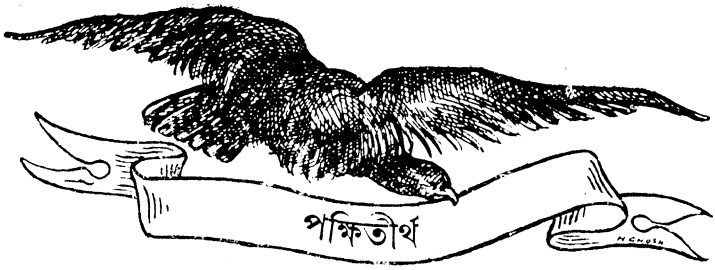
"পক্ষিতীর্থে যাই কৈল শিব দরশন"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্, মধ্যলীলা, ৯ম পরিঃ।

ঠিক্ যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা বিগত ১৯শে কার্ত্তিক পক্ষিতীর্থে উপনীত হইলাম, এ কথা বলিতে পারি না; তবে ইহা নিশ্চিত যে, মহাপ্রভু পক্ষিতীর্থে যাইয়া শিব দর্শন করিলেন, আর আমি অত্যন্ত নীরস ornithologistএর চশমার ভিতর দিয়া দর্শন করিলাম—দুইটি পাখী। শিব আছেন সত্য; শিবের মাহাত্ম্যে সমগ্র তিরুকালকুণ্ডম্ পরিপূরিত। কবে কোন্ আদিম যুগে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকটে বিষ্ণুশক্তি পরাভব স্বীকার করিয়াছিল; কোন্ মহাবিপ্লবের যুগে মহাদেব চতুর্ব্বেদ রক্ষা করিয়া অভ্রভেদী চারিটি গিরিশৃঙ্গে তাহাদের চিরন্তন সত্য প্রকট করিয়া বেদমাহাত্ম্য খণ্ডিত হইতে দেন নাই; আজ সেই তমসাচ্ছন্ন পৌরাণিক ইতিহাস রহস্যময় হইলেও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভাল করিয়া তাহার যবনিকা উত্তোলন করেন নাই। নহিলে হয় ত শৈব-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক তথ্যে আমার কৌতূহল কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইতে পারিত। এক দিন উত্তর-ভারতে কোনও এক বিপ্লবের যুগে বেদ প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু যিনি মীনরূপে সেই বেদের উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি শিব নহেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্য কিন্তু মহাদেবের লীলাকীর্ত্তনে মুখরিত; এমন কি, সুদূর রামেশ্বরম্ সেতুবন্ধে রাম-জানকী মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। যাক্ সে কথা। যে পক্ষিযুগল তিরুকালকুণ্ডকে একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ঐ তীর্থের নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিলাম।

প্রাতঃকাল; আমাদের রিজার্ভ-গাড়ীখানি ট্রেণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিঙ্গেলপট্ রেলষ্টেশনে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মোটর-বস্ আমাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল ও তাল-বীথিকার মধ্য দিয়া তীর্থাভিমুখে লইয়া চলিল। পথের দুই ধারে বৃষ্টিবিধৌত ধান্যক্ষেত্রে কৃষকগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে উন্নত গিরিশ্রেণী; সানুদেশে বিহঙ্গ-কলকূজিত মনোহর কানন; অনতিবিস্তৃত বন্ধুর পাষাণ-সোপানাবলী আরোহণ করিতে ক্লান্তি বোধ হইল। মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলাম। দরজা অতিক্রম করিয়া যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহা আয়তনে বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহা নিশাচর বাদুড়ের আশ্রয়স্থান বলিয়া বোধ হইল। ইহার অপর প্রান্তস্থ আর একটি দ্বারের ভিতর দিয়া এক অন্ধকার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া বেদগিরীশ্বরের দর্শনলাভের জন্য পীঠসমীপে উপস্থিত হইবার বাসনায় পীঠপরিক্রমা প্রয়োজন। একটি অনতিপরিসর দরজার মধ্য দিয়া গুহাভ্যন্তরস্থ দেবতার দর্শন লাভ করিলাম। বাহির হইতে গিরিশৃঙ্গস্থ যে মন্দিরকে সুদৃঢ় দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়, ভিতরে প্রবেশ করিলেও বিজয়-গর্ব্বিত চোলারাজের উৎকীর্ণ শিলালিপি-পাঠে সহজে সে ভ্রম অপমোদিত হয় না। কিন্তু ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্;—তাই অন্ধকার গুহামধ্যে দেবতা আসীন।

বাহিরে আসিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে করিতে আমাদের ডাহিনে একটি অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্মের উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১১টা; পূজারী "পক্ষিপাণ্ডরম্" আমাদিগকে আহ্বান করিলেন,—তীর্থস্থানে
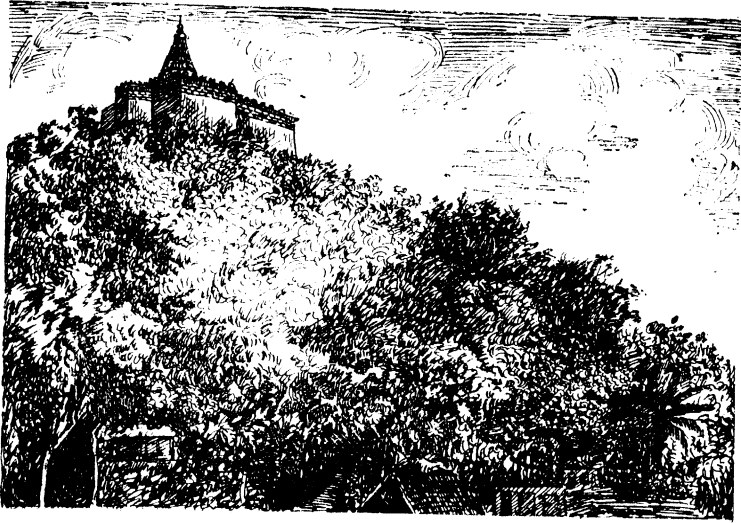
বেদগিরিশ্বরের মন্দির।

পক্ষী সমাগত। তিনি বলিলেন—আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই এত সহজে এমন সময়ে পাখীর দেখা মিলিতেছে। ত্বরিত পদক্ষেপে তাঁহার অনুসরণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিলাম। মন্দিরসংলগ্ন পাকশাল হইতে যে ভোগ 'পাণ্ডরম্' নিজ শিরে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যথা-স্থানে রক্ষিত হইতে না হইতে আকাশে একটি শ্বেতকায় গৃধ্রের আবির্ভাব হইল, দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক্। সকলেরই দৃষ্টি পাখীর উপরে নিবদ্ধ। ছায়া-চিত্র তুলিবার জন্য আমি নিমেষের মধ্যে

আয়োজন করিয়া লইলাম। আমাদের মাথার উপরে পাখী চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। পাণ্ডা বলিলেন—সকলে মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করুন। শিলাসনে সকলে বসিয়া পড়িল; আমি কিন্তু ক্যামেরাটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সম্মুখে উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়-মান হইয়া পাণ্ডরম্, বোধ করি, দেবতার অর্চ্চনা করিলেন। পলকের মধ্যে পাহাড়ের উপরে গৃধ্র আসিয়া বসিল; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী ছিল না। পাখীর দিকে পিঠ করিয়া

১নং চিত্র।

২নং চিত্র

চিত্র)। ভোজন ব্যাপার শেষ হইল।

দর্শকমণ্ডলী এতক্ষণ সমীপবর্ত্তী মণ্ডপমধ্যে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। 'পাণ্ডারম্' তাহাদের কাছে আসিয়া একটি বক্তৃতায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহারা সকলেই ধার্ম্মিক, তাই এত সহজে পক্ষিদ্বয়ের দর্শনলাভ ঘটিল। কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া সকলেই কিছু কিছু "প্রসাদ" লাভ করিলেন। আমরা গিরি হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

পাণ্ডা পূজায় বসিলেন; পার্শ্বে নৈবেদ্য-পাত্রগুলি বিন্যস্ত। গৃধ্রবর ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল (১নং চিত্রে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে)। পরক্ষণে একটি থালায় কিঞ্চিৎ অন্ন ও একটি ঘৃতপূর্ণ বাটি পাণ্ডা পাখীর সম্মুখে রাখিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন। পাখী অসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে আসিয়া (২নং চিত্র) আহারে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আর একটি গৃধ্র উহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন একটিকে তিনি স্বহস্তে ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং অপরটির সম্মুখে আর একটি ঘৃত-পাত্র রক্ষা করিলেন। একটি তাঁহার হাত হইতে খাইতে লাগিল; অপরটি ভাণ্ড হইতে (৩নং চিত্র) আহার করিতে লাগিল। ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া একটি পাখী উড়িয়া গেল; অপরটিকে পাণ্ডরম্ নিজ হস্তে ঘৃতস্নিগ্ধ অন্ন তখনও ভোজন করাইতেছেন (৪নং চিত্র)। সে পাখীটিও যখন পরিতৃপ্ত হইয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল, তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন (৫নং

সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর। আমরা যখন পাহাড়ে পক্ষিদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন অনেকগুলি ঠিক ঐ শ্রেণীর গৃধ্র বেদগিরির পাদমূলে অবস্থিত তিরুকালকুণ্ডম্ গ্রামের উপরে উড়িতেছিল। তখন আমার মনে হইতেছিল, না জানি, কোন্ পাখী পাণ্ডার আহ্বানে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; প্রসারিত খাদ্য-দ্রব্য কি মাংসাশী শবভুক্ শ্মশানচারী গৃধ্রের লোলুপদৃষ্টি

৩নং চিত্র।

আকর্ষণ করিতে পারিবে ? আর যদি করে, তবে দুইটি পাখীই আসিবে কেন ? আরগুলা অন্ততঃ কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে ত ? ইংরাজ পর্য্যটক পক্ষিতীর্থকে "Hill of the Sacred Kites" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—তবে কি চিল অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোনও পাখীর আবির্ভাব হইবে ? উহারাও ত মাংসাশী ; তবে কেন নিয়মিতরূপে প্রত্যহ এই নিরামিষ খাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া উহারা আসিবে ? কিন্তু তখন কোনও শ্বেতকায় চিলের দর্শন ত' পাইলাম না। আর একটা কথা। শর্করাযুক্ত স্নিগ্ধ অন্ন এবং স্বতন্ত্র পাত্রে তরল ঘৃত কেমন করিয়া গৃধ্র অথবা চিল-জাতীয় বিহঙ্গের এমন উপাদেয় ভোজ্য হইতে পারে যে, আমাদের চা অথবা অহিফেনের নেশার মত প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে তাহাদিগকে যথাস্থানে আকৃষ্ট করিয়া আনিবে ? অবশেষে গৃধ্র-যুগলের আগমনে আমাদের সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল। মানুষের আহ্বানে গৃধ্রের আগমন, অসঙ্কোচে তাহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করা,—ব্যাপারটা বহুদিন হইতে এতই বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইয়া আসিতেছে যে, অনেকে ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হইয়া নানা প্রকার কথাকাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। কবে কোন্ পৌরাণিক যুগে অভিশপ্ত ঋষিকুমারদ্বয় গলিত শবভুক্ গৃধ্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং বেদগিরিতীর্থে দেবতার প্রসাদলাভ করিয়া কলিযুগের অবসানে শাপমুক্তির বর পাইয়াছিল, জানি না ; কিন্তু জন-প্রবাদ এই যে, পক্ষিতীর্থের এই দুইটি গৃধ্র প্রাতঃকালে বারাণসী-তীর্থে স্নান করিয়া, মধ্যাহ্নে বেদগিরীশ্বরের প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়া, অপরাহ্নে রামেশ্বরম্ তীর্থে প্রয়াণ করে ! সুদূর য়ুরোপ হইতে সমাগত ওলন্দাজ বণিক্‌গণ, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গৃধ্রের এই রহস্যময় কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া মণ্ডপস্তম্ভগাত্রে নিজ নিজ নাম উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। *
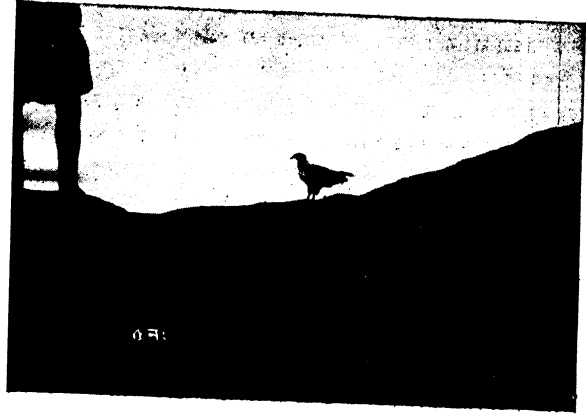
৩নং চিত্র।

৪নং চিত্র।

* হাভার্ট নামক ওলন্দাজ লেখক তাঁহার "Open Ondergang van Coromandel" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি সঙ্গীসহ ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী তিরুকালকুণ্ডমে ২টি পাখীকে দ্বিপ্রহরে ভোজন করিতে দেখিলেন

এই শ্বেতকায় গৃধ্র আমাদের বাঙ্গালা দেশে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ইহা বিরল নহে। সাধারণতঃ যে গৃধ্র আমাদের নয়ন-গোচর হয়, তাহা আয়তনে ইহাদের অপেক্ষা বৃহৎ, দেখিতে অতিশয় কুৎসিত ও তাহাদের খাদ্যপ্রবৃত্তি অত্যন্ত বীভৎস। তাই পক্ষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা এই শ্বেত গৃধ্রকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য করেন। ইহার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম Neophron gingianus। ইহার দেহায়তন খর্ব্ব, চঞ্চুও অপেক্ষাকৃত সরু; তজ্জন্যই বোধ হয়, সে কতকটা হীনবল ও ভীরুস্বভাব;—অপর শ্রেণীর বড় বড় শকুনির কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না। যদি ঘটনাক্রমে উহারা সকলে কোনও শবের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে এই শ্বেত গৃধ্র সাহস করিয়া কিছুতেই তাহার জ্ঞাতিগণের আক্রমণের ভয়ে তাহাদের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহার ঠোঁট ছোট বলিয়া মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে ইহার সামর্থ্যে কুলায় না। তাই নগর-জনপদে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্যে সে আহার্য্য সংগ্রহ করে। ইহাকে বায়সের সহচর হইয়া মানবাবাসের আশে-পাশে আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইংরাজ ইহার এই স্বভাব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 'White scavenger' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইহার খাদ্য সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা হইয়াছে। মার্কিণ দেশের জনৈক পক্ষিপালক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আবদ্ধাবস্থায় শকুনি গলিত শব-মাংস অপেক্ষা টাট্‌কা মাংস খাইতে পছন্দ করে। মিঃ ফিন্ অনুমান করেন যে, সে স্বাধীন অবস্থায় সাধারণতঃ প্রত্যহ টাট্‌কা মাংস খাইতে পায় না বলিয়া অগত্যা গলিত শব-মাংসে উদরপূর্ত্তি করে। আর এই যে তথাকথিত White scavenger, এই শ্বেত গৃধ্র, ইহাকে প্রায়ই শব ভক্ষণ করিতে দেখা যায় না; এবং আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে দেখা যায় বলিয়া এরূপ অনুমান করা ভুল হইবে যে, ইহা কেবল জঘন্য অখাদ্যে জীবনধারণ করে। ক্ষুধার তাড়নায় সে যাহা পছন্দ করে না, তাহাই খাইতে বাধ্য হয়। মিঃ ফিনের এই অনুমান অনেকটা সত্য। মিশরে ও মার্কিণে এমন অনেক গৃধ্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল খাইতে বড় ভালবাসে। তবেই বলা যাইতে পারে যে, আহার সম্বন্ধে কোনও কোনও শকুনির এমন কোনও বাঁধাবাধি নিয়ম নাই যে, তাহাদিগকে মাংস অথবা ফলভুক্ আখ্যায় বিশেষিত করা যাইতে পারে। সে মাংস খায়, আবর্জ্জনায় উদরপূর্ত্তি করে, ফলও খায়; কিন্তু তিরুকালকুণ্ডমের বাহিরে কুত্রাপি এমন করিয়া কেহ কোনও গৃধ্রকে দিনের পর দিন নিরূপিত সময়ে ঘৃতাক্ত শর্করান্বিত অন্ন সেবন করিতে দেখিয়াছেন কি? আর শকুনির যে পেটুক অপবাদ আছে, তাহার কোনই লক্ষণ এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? দুইটা শকুনি মিলিয়া এত অল্প পরিমাণ ভোজ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া যে স্বেচ্ছায় উড়িয়া যাইতে পারে, ইহা কোনও পক্ষিতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি? পক্ষিপালক অবশ্যই কোথাও কোথাও গৃধ্রকে বন্দী করিয়া তাহার আহার-বিহারের রীতি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, ইহার পেটুক অপবাদ অমূলক। মিঃ ফিন্ এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আবদ্ধাবস্থায় শকুনি নিয়মিত সময়ে আহার পাইলে কখনই অপরিমিত ভোজন করে না (In confinement, where vultures are fed regularly, they do not by any means eat immoderately)। আর সে টাট্‌কা খাবার পাইলে পচা মাংসে লোভ করে না।

মোটের উপর তাহা হইলে আমরা এইটুকু পাইলাম যে, গৃধ্রপরিবারভুক্ত কোনও কোনও শ্রেণীর বিহঙ্গ কেবল-মাত্র মাংসভুক্ নহে; অপর খাদ্যও আগ্রহের সহিত উদরসাৎ করে। আর তাহাদের অপরিমিত ভোজনের কথা—ওটা আমাদের কু-সংস্কার মাত্র। ইহার অধিক পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ অথবা পক্ষিপালক এখন পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই।

তিরুকালকুণ্ডমের এই শ্বেত গৃধ্রযুগল মাংসভুক্ কি না, সে তর্ক এখন উঠিতেছে না। আমরা দেখিতেছি যে, উহারা পোষা পাখীর মত মানুষের কাছে আসিয়া ঘৃত ও ঘৃতাক্ত অন্ন খাইয়া গেল;—ভোজনটা অপরিমিত হইল না; এবং বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া উহারা উড়িয়া গেল। প্রত্যহ সদ্যপ্রস্তুত নিরামিষ আহার পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া হয় ত বিস্ময়কর নহে; এবং এইরূপ খাদ্য পাইয়া থাকে বলিয়া হয় ত সে আবর্জ্জনারাশি

বা গলিত শব লোভনীয় মনে করে না। কিন্তু এ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলেও পক্ষিতীর্থের বিপুল রহস্যের কিছুমাত্র নিরাকরণ হইল না। যুগ-যুগান্তর এই ব্যাপার কেমন করিয়া চলিয়া আসিতেছে? খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দুইটি পাখী ওলন্দাজ বণিকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, কে বলিবে যে, ইহারা তাহারাই? যদি তাহারা না হয়, তবে তাহাদের বংশধরগণ অথবা নিকট-আত্মীয় আর কেহ কেহ এই পদ্ধতি কোন্ নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক নিয়মে রক্ষা করিয়া আসিতেছে? আবার যে পুরোহিত ওলন্দাজ দর্শকের সম্মুখে শকুনিকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া নিরামিষ আহারে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার এই অদ্ভুত শকুন্ত-বিদ্যা শিষ্যপরম্পরায় কার্য্যকরী হইয়া আসিতেছে? পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পাখীর আশ্রমে (Bird Sanctuary) পাখীর সঙ্গে মানুষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, মানুষের আহ্বানে পাখী সাড়া দেয় বটে, কিন্তু ঠিক নিয়মিত সময়ে একটি অথবা দুইটি তাহার কাছে আসিবে, আর কেহ আসিবে না, ইহা যেন বিহঙ্গ-প্রকৃতিবিরুদ্ধ;—যথেষ্ট আদর, প্রচুর খাদ্য ও অভয় পাইলে, সব কয়টা পাখীই হয় ত একসঙ্গে তাহার আতিথ্য লাভ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। প্রতিদিন আতিথ্যলুব্ধ এইরূপ পাখীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু তিরুকালকুণ্ডমে আমরা পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলাম যে, গ্রামের উপরে আরও অনেকগুলি শ্বেত গৃধ্র উড়িতেছিল। অথচ এই দুইটি ব্যতীত আর কেহ প্রলুব্ধ হইয়া দেবগিরি-শিখরে বসিল না! মনে রাখিতে হইবে যে, পঙ্‌ক্তিভোজন ইহাদের জাতিগত প্রথা। সেই প্রথার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইল।

এতক্ষণ যে পাখীকে শ্বেত বলিয়া বর্ণনা করা হইল, তাহা কিন্তু বাস্তবিক নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র নহে। সাধারণতঃ ইহাকে সাদা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু "শ্বেত" শব্দ হয় ত ঠিক প্রযোজ্য নহে। কারণ, এই Neophron gingianusএর ডানার প্রাথমিক পতত্রগুলি (primaries) কৃষ্ণাভ; তন্নিম্নস্তর (secondaries) পালকে ধূসরম্লানিমা বিদ্যমান; প্রচ্ছদ-পতত্র (wing-coverts) ঈষৎ ধূসর; এবং ঘাড়ের লোমাবলি যৎসামান্য লাল।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

চিত্রদর্শনে।

(Wordsworthএর ভাবানুসরণে)

ধন্য শিল্পিকরের তুলিটি চিররসনিঃস্যন্দী,
নশ্বরে তুমি অমর করেছ চপলে করেছ বন্দী।
অপরূপ রূপে ফুটায়ে তুলেছ গন্ধ রস ও শব্দ
বিলীয়মানের রুধিয়াছ লয়, ক্ষুব্ধে করেছ স্তব্ধ।

মন্ত্রমুগ্ধ থেমে গেছে অই মেঘখানি নভোগাত্রে,
চির-প্রভাতের রবিকরগুলি বিলীন হয় না রাত্রে।
উড়ে যাওয়া ভুলে থেমে গেছে অই বিহগ বিতত পক্ষে
তরীখানি স্থির প্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ নদীর বক্ষে।

ফুলগুলি কভু হয় নাক ম্লান আলো ক'রে আছে কুঞ্জ
পলাতে পারেনি দূরে দিগন্তে কুণ্ডলীধূমপুঞ্জ।
প্রভাত সন্ধ্যা যোগায় অর্ঘ্য তব উদ্দেশে নিত্য,
তব ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় সিন্ধুগিরির বিত্ত।

তুমি রুধিয়াছ রবির অশ্ব, রুধেছ কালের রথটি
স্বভাব-মাতার অঞ্চল ধরি আগুলেছ তার পথটি
নিমেষের প্রাণে বিতরেছ তুমি চিরন্তনের শান্তি,
ক্ষুদ্র পটের পরিসরে চির অসীমের ক্ষেমকান্তি।

শ্রীকালিদাস রায়।

সহজিয়া।

সহজসাধনার কথা লিখিবার উদ্যোগ করা দুঃসাহসের বিষয় বটে; যেহেতু, সাধনা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার একমাত্র সাধকেরই আছে, অপরের পক্ষে তাহা অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। ভারতের সমস্ত বিদ্যাই প্রায় গুরুমুখী, তাহাতে আবার সম্প্রদায়ের গুহ্যাতিগুহ্য সাধনপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে গোপনীয়; সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। যাহা লিখিতেছি, তাহা সংগ্রহ মাত্র—আমার নিজস্ব অতি অল্প, সুতরাং প্রবন্ধের মৌলিকতার দাবী করিতে পারি না।

সহজসাধনার কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ "সহজ" কথাটার অর্থ লইয়া একটু বিচার করিতে হয়। সহজ অর্থাৎ যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে—যাহার জন্য সাধনা বা শ্রমস্বীকার করিতে হয় না; সুতরাং সহজ কথাটার অর্থে মানবের প্রবৃত্তিই বুঝায়। সনাতনধর্ম্মের প্রধান তত্ত্ব—সংযম বা প্রবৃত্তির সংযম। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি বড় প্রবল, পশুরাও প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি কি মানব, কি পশু, কি কীট, কি পতঙ্গ সকলের মধ্যেই বিরাজমান। প্রবৃত্তি জীবের সহজাত, ইহার আকর্ষণ প্রতিরোধ করা অতি দুঃসাধ্য। দুরত্যয়া মহামায়া মানবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় ঘুরাইতেছে। মহামায়ার মোহফাঁদে পড়িয়া জীব 'চোখ-ঢাকা বলদের মত' ঘুরিয়া মরিতেছে। নানা প্রকারের প্রবৃত্তি নানা ভাবে আমাদিগকে নানা কষ্টে ফেলিতেছে। ধর্ম্মের উপদেশ—এই প্রবৃত্তি জয় কর। তুমি মানব, বহু সাধনা করিয়া লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণপূর্ব্বক এই মানবজন্ম লাভ করিয়াছ; এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিও না, জীবজগতের মধ্যে তোমারই এক প্রবৃত্তির উপর সংযমের অধিকার আছে,—সুতরাং এই নানা দুঃখের আকর আধিব্যাধিক্লেশের আগার প্রবৃত্তি-নিচয়ের রোধপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গের পথিক হও। প্রবৃত্তি মানবের সহজাত সংস্কার হইলেও বলিতে হয়—নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। বেদানুগ সাধনার প্রাণ সংযম;—যাহা সহজ, যাহা সংস্কার, যাহা মানবের প্রবৃত্তি, তাহার সঙ্কোচসাধনই বেদাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদে যে ভোগের উল্লেখ আছে, তাহাতে ইহলোকের ভোগ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কথিত, পরন্তু স্বর্গসুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বৈদিকসাধনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; কিন্তু উপনিষদাদির মধ্যে এই স্বর্গসুখও অতি তুচ্ছ ও হেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে ভূমার সুখই সুখ, অল্পে সুখ নাই—ইহারই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গীতায় বেদবাদের উপর যে জ্ঞানাত্মক মহাধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই সনাতনধর্ম্মের লক্ষ্য।

ধর্ম্ম কথাটির মধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যাহা ধরিয়া রাখে, বস্তুর বস্তুসত্তা বজায় রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। লবণকে যে গুণে লবণ করিয়া রাখিয়াছে—যাহা না থাকিলে লবণের লবণত্ব থাকে না, তাহাই লবণের ধর্ম্ম। মানুষকে যাহাতে মানুষ করে, অ-মানুষ হইতে মানুষকে বিশিষ্ট করিয়া রাখে, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের এই বৈশিষ্ট্য মানুষেই পাওয়া যায়, পশ্বাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাধীনতা, চিন্তার শক্তি ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা। এই ধীশক্তির সম্যক্ পরিচালনাপূর্ব্বক আত্মদমন করিবার ক্ষমতাই মানবের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অনুশীলনই মানবের প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম মানবকে যতই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করুক না কেন, মানবের পশুত্ব ঘুচিবার নহে। মানবের প্রবৃত্তি-নিচয়ের বা পশুধর্ম্মের যে একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ আছে, তাহার প্রভাব প্রতিরোধ করা বড়ই কঠিন। ধর্ম্মের ব্যবস্থা-প্রগ্রহ এই অসংযত ইন্দ্রিয়বর্গকে দমন করিয়া রাখিতে পারে না। মহামায়ার অষ্টপাশের বজ্রবন্ধন ছেদন করে, কাহার সাধ্য? বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম 'বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।'

প্রবৃত্তি নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। চক্ষু রূপের সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কর্ণ সুশব্দের আশায় সর্ব্বদা উৎকর্ণ, জিহ্বা সুরসের জন্য সর্ব্বদা সরস, নাসা সুগন্ধের আশায় বিস্ফারিত, ত্বক্ সুকোমল ও শীতল স্পর্শের জন্য সর্ব্বদা সম্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের রাজা মন ভোগায়তন দেহের মধ্যে বসিয়া প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ

বাস্তব ও কাল্পনিক কত প্রকার আশা ও আনন্দের স্বপ্নে উন্মত্ত, কত যে আকাশকুসুম রচনায় ব্যস্ত, কত প্রকার বাসনার জালবয়নে রত, তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যত প্রকার প্রবৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে কামপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। যতগুলি রিপু আছে, কামের ন্যায় দুর্দ্দম রিপু কোনটিই নহে। এই কামের প্রভাব কেবল মানবের উপর নহে, পরন্তু সামান্য কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি তির্য্যক্‌জীবেও বর্ত্তমান। কাম জীবজগতে প্রথম ও প্রধান প্রবৃত্তি। সৃষ্টির মূলই কাম,—কামস্তৎ সমবর্ত্ততাগ্রে, পূর্ব্বে কামই ছিলেন। কাম হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশ। যিনি এই সৃষ্টির মালিক, তাঁহার মনের মধ্যে কাম উৎপন্ন হইল—নিজের মহান্ রূপে তিনি আর তুষ্ট ও নিমগ্ন থাকিতে পারিলেন না। একক ভোগ সম্ভব নহে, এজন্য তিনি নিজেকে বহু করিতে ইচ্ছা করিলেন। (From uniformity came diversity)—"একোঽহং বহু স্যাম" এক আমি বহু হইব; সুতরাং যিনি এক, তিনি দুই হইলেন (আত্মানমকরোৎ দ্বিধা)। ক্রমশঃ দুই হইতে বহু হইল—তিনি গ্রহতারকায়, গগনে, ভূধরে, বৃক্ষ-পল্লবে, নদীতে, সাগরে, ফলে, পুষ্পে সর্ব্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—নদ-নদীসমূহ তাঁহার স্নায়ু, গিরিগণ তাঁহার পদরেণু, শশি-সূর্য্য তাঁহার নেত্র—সেই বিরাট্ পুরুষ এক হইয়া বহু এবং বহু হইয়াও এক। যাহা হউক, সৃষ্টির যে পরিকল্পনা, তাহার মূল কাম।

কামতত্ত্ব বড় কঠিন—কাম হইতেই জগতের উৎপত্তি, কামেই জীবের সৃষ্টি, কাম হইতেই মানব-সভ্যতার উৎপত্তি। কাম হইতে শিল্প ও কলার উদ্ভব, সাহিত্যাদির সৃষ্টি প্রভৃতিরও মূলে কাম। ঐ যে ফুল বায়ুভরে মন্দ মন্দ দুলিতেছে, নিজের বর্ণে টল্ টল্ করিতেছে, গন্ধে দিক্ মাতাইতেছে, উহার কি শুধু ফোটাতেই তৃপ্তি? না, কখনই নহে, ঐ যে প্রজাপতির দূত ভ্রমর আসিয়া গুন্ গুন্ করিতেছে, ফুলের জন্ম সার্থক হয়—যদি ফল তাহাতে ধরে। ফুল যতক্ষণ না ফলে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহার জীবন অসার্থক। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাহার জীবন সার্থক হয়, কারণ, ভবিষ্যতে সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে হাসিতে হাসিতে মরণের মধ্যে জীবন পায়। ফুল ঝরিল বটে, কিন্তু ফলের মধ্যে যে বীজ, তাহার মধ্যে তাহার অনন্ত জীবন রহিয়াছে—ফলের সম্পুষ্ট ফুলের জীবন অনন্ত। এই ফুলের মধ্য দিয়া যে ফলের উদ্ভব, তাহা কামতত্ত্বের একটা দিক্।

পশুজগতে দৃষ্টিপাত করুন—কত বড় একটা কামের শক্তি পশুজগৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পক্ষীর যে বিচিত্র বর্ণ, মনোহর স্বর, তাহার মূলে ঐ কাম। সিংহ তাহার কেশরগুচ্ছ লইয়া সিংহীর মনোরঞ্জন করিতেছে। পক্ষীর যে বর্ণ, তাহা পক্ষিণীর জন্য। বৃক্ষে বৃক্ষে যে বিহগ গান করে, সে বিহগীকে ভুলাইবার জন্য। স্বভাবের এই সুন্দর দৃশ্যের অন্তরালে মদনের মায়াই দৃষ্ট হয়। বসন্তের যে এত বর্ণনা লইয়া কবিরা ব্যস্ত, তাহার কারণ মধুমাসের রাজা মদন। মদনমহীপতির কনকদস্তরুচি কেবল যে কিংশুকজালের উপর, তাহা নহে, এমন কি, বিহগবৃন্দও তাহার গুণমুগ্ধ হইয়া গানে উন্মত্ত হয়। মৃগী তখন কৃষ্ণসারের গাত্রে শৃঙ্গ-ঘর্ষণ করে, নাগর-নাগরী মধুরমঙ্গল গাহিয়া মদনকে বরণ করিয়া লয়। প্রকৃতির সর্ব্বত্র একটা আনন্দের সাড়া পড়ে। বসন্ত এক প্রকার বায়োলজির rutting season—এ জন্য কবিরা বসন্তের স্তাবক, মূলে সেই কাম।

মানবের যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান, তাহারও উদ্ভব এই কাম হইতে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আদিস্তরে মানব পশু হইতে বড় পৃথক্ নহে। পশুদের যেমন কামড়া-কামড়ি আঁচড়া-আঁচড়ি করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হয়, মানবদিগের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ রীতি ছিল; তখন দৈহিক বলই প্রধান বল। কেবল আহারে নহে, যৌনসম্বন্ধেও ঐ নীতি চলিত; তাহার পরিচয় রাক্ষস-বিবাহে কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। বীরভোগ্যা ধরণী ও বীরভোগ্যা রমণী, শৌর্য্যবল না থাকিলে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকিত না; কঠোর জীবনসংগ্রামে সবলের নিকট দুর্ব্বলের পরাজয় ঘটিত—সুতরাং natural selection-এর মূল নীতি ছিল শৌর্য্য। যৌনসম্বন্ধবিচারে (sexual selection) শৌর্য্য প্রধান হইলেও মনোরঞ্জনার্থ নানা বিষয়ের প্রয়োজন হইত। কিসে নিজেকে ভাল দেখাইবে, কিসে পুরুষ স্ত্রীর এবং স্ত্রী পুরুষের মনোরঞ্জন করিবে, তাহার বহু চেষ্টা হইতে লাগিল। এই প্রেমের সাধনায় মানব সভ্য হইয়া উঠিল

—পরস্পরের মনোরঞ্জনার্থ তাহারা অঙ্গ রঞ্জিত করিতে লাগিল। শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার জন্য বস্ত্রের সৃষ্টি নহে—পরন্তু চিত্তরঞ্জনবৃত্তির অনুশীলনে তাহার উদ্ভব। এই জন্য দেখা যায় যে, অসভ্যজাতিদের মধ্যে বস্ত্রের প্রচার নাই, কিন্তু গাত্র রঞ্জিত করিবার প্রথা আছে। ক্রমশঃ বৃক্ষপত্রাদির দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য চলে; তাহার পর জীব-জন্তুর চর্ম্ম, পক্ষীর পালক প্রভৃতি হইতে বস্ত্রের উদ্ভব হয়। বেশ বিলাসকলার প্রধান উপকরণ; বেশ্যা কথার নিরুক্তিই তাহার প্রধান প্রমাণ।

কাব্যের আলোচনায় দেখা যায় যে, কবিতা ও গান প্রথমতঃ একপর্য্যায়ভুক্ত ছিল। Prosody কথার নিরুক্তি-গত অর্থ a song sung to music. গান যৌননির্ব্বাচনের একটি মন্ত্র। পাখীদের যে গান, তাহা তাহাদের কামের বহিরঙ্গবিকাশমাত্র, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মানুষের যে গান, তাহারও উদ্দেশ্য প্রথমতঃ ঐরূপ ছিল; য়ুরোপের wit combatএ, Trouvere ও Troubadorদের গানে যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন নাই, এ কথা কে বলিতে পারে?

মানবের এই যে প্রথম ও প্রধান প্রবৃত্তি কাম, ইহার দমনের জন্য সনাতন সমাজে বহু বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল। শিক্ষায়-দীক্ষায় বিধিব্যবস্থায় জীবনের সর্ব্ব অবস্থার মধ্যে সংযমপ্রবৃত্তির শিক্ষাদানই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে প্রবৃত্তির বলে ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনি তপোভ্রষ্ট, তাহার নিরোধের জন্য এরূপ কঠোর নিয়ম রচিত হইয়াছিল যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংহিতাকার মনু বলিতেছেন, এমন কি, মাতা ও ভগিনীর সহিত নির্জ্জনে উপবেশন করিবে না। কিন্তু ঋষিবৃন্দ এ কথাও জানিতেন যে, কোন প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপে নাশ করা যায় না। এ জন্য তাঁহারা এই কামকে ধর্ম্মার্থে নিয়োগ করিয়াছেন—ইহা হইতে আত্মেন্দ্রিয়সুখের কামনাকে নির্ব্বাসন দিয়াছেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে ধর্ম্মার্থে মাত্র ইহার সেবার সংযত নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এত কঠোর বিধানসত্ত্বেও দেখা যায় যে, এই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সম্প্রদায়বিশেষে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া উদ্দাম মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে নহে—গ্রীসে, রোমে, মিশরে, আরবদেশে, এমন কি, রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চে পর্য্যন্ত এই তীব্র প্রবৃত্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক দিন আমার এক সহযোগী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন,—"আমার এই চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কোন আস্থা নাই। দুই শত বৎসরে যে ধর্ম্মের এরূপ বিকৃতি ঘটে, সে ধর্ম্মের গৌরব কোথায়?" কথাটা হৃদয়ে লাগিয়াছিল। তখন উত্তর দিতে পারি নাই। এই প্রবন্ধে তাহার উত্তর আছে; কি কারণে নির্ম্মল হেমবৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম কলুষিত হইয়া লোকচক্ষুতে ঘৃণ্য ও হেয় হইয়াছে, তাহার সমাধানের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মই কলুষিত হয় নাই,—ভারতবর্ষের বহু স্থলে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকল ধর্ম্মে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে forced defloration of girls in the temples of Siva (Swan Bloch), বল্লভচারীদের গুরু কর্ত্তৃক কৌমার্য্যনাশ (গুরুপ্রসাদী), শৈবদের শক্তিগ্রহণ, শাক্তদের ভৈরবীচক্র, বৈষ্ণবদের কিশোরীসাধনা, পুরাতন গ্রীসে ভায়োনিসাস্কের উৎসব—এলেস্থনিয়ান মিষ্ট্রী প্রভৃতিতে এই ব্যভিচার-দোষ দৃষ্ট হয়। দোষ ধর্ম্মের নহে, পরন্তু মানবের সেই বীভৎস কদর্য্য instinct—মানুষের যাহা দৌর্ব্বল্য, ধর্ম্মের মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

যখন হইতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কথা জানিয়াছি, তখন হইতেই মনের মধ্যে একটা গণ্ডগোল রহিয়া গিয়াছে—কতবার ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ধর্ম্মের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি কেমনভাবে আসন গ্রহণ করিল। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি। এখনও তাহা বুঝি না, সুতরাং বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। তবে ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যক্রমে কিরূপে সহজসাধনা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে এই আচার আসিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিব।

বৈদিক যুগে আর্য্যদিগের যৌন-ব্যবস্থা (Sexual life) কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় আমি অবগত নহি; তবে তাঁহাদের চরিত্র যে সংযমগুণে উজ্জ্বল ছিল, এরূপ সুন্দর চিত্রই পাওয়া যায়। শিশুর ন্যায় তাঁহারা সরল ছিলেন; যাগযজ্ঞের দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধন তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ক্রমশঃ আর্থিক উন্নতির সহিত

তাহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল; নীতির বিধানও তৎসহ কঠোর হইতে লাগিল; আর্য্য বৈদিক যুগের পর মোটামুটি হিসাবে বৌদ্ধযুগ ধরা যায়, বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সংহিতা ও পৌরাণিক যুগ। কিন্তু বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক এই তিন যুগের মধ্যে একটা সাধনা বা সম্প্রদায় বা culture অন্তঃসলিলা নদীর মত ছুটিয়া চলিয়াছিল, তাহা তন্ত্র,—ইহাতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ছিল। বৈদিকযুগে এই culture-এর আভাস অথর্ব্ববেদে। বৌদ্ধযুগে ইহার বিকাশ নানা যানের তন্ত্রের মধ্যে এবং পৌরাণিক যুগে ইহার প্রতিধ্বনি নানা আগম-নিগমের মধ্যে পাওয়া যায়। এই তান্ত্রিক সাধনার (culture) কথা আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলিবার চেষ্টা পরে করিব। বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ পূজাপদ্ধতির (ritualism) প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। ফলশ্রুতির মোহ, স্বর্গসুখের লোভ সকাম যাগযজ্ঞাত্মক-ধর্ম্মের প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। যদিও উপনিষদে আত্মজ্ঞানসাধনার বহু প্ররোচক বচন আছে, তথাপি দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতি সে সাধনার সুমহান্ লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সুতরাং সনাতন সমাজ লক্ষ্য হারাইয়া তত্ত্ববস্তু ফেলিয়া ধর্ম্মের বহিরাবরণটা লইয়া ব্যস্ত ছিল; তাহার প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। ইহার জন্য প্রতিবাদের একটি ক্ষীণধারা সমাজের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা প্রবল হইয়া উঠিল—ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া গড়া হইল। যাহা কিছু ritualism, যত কিছু formalism, যাগযজ্ঞ, সাজ-সজ্জা, যত কিছু বাহ্য আড়ম্বর সমস্ত দূর হইয়া ত্যাগের মহিমা প্রচারিত হইল। সমস্তই দুঃখময়, জীবন দুঃখময়, জগৎ দুঃখময়, বিজ্ঞান দুঃখময়—দুঃখের এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় তুমি আমি সকলেই ভাসিয়া যাইতেছি। কেবল কি এই জীবনটা দুঃখের? জীবনের পরপারে কি এই দুঃখের অবসান? জীবনের পর জীবন, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এই দুঃখের ধারা—জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই দুঃখ! জন্ম, মৃত্যু, জরাব্যাধি জীবনের সঙ্গী—জীবনের পর কর্ম্মভোগই সেই নরক! এই দুঃখের চক্র মানব কেমন করিয়া এড়াইবে? দুঃখের প্রধান কারণ—দুঃখের জ্ঞান। এই দুঃখসংবিজ্ঞানের বিনাশসাধন করিতে হইবে। সমস্ত বিষয় হইতে এই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে এক মহাশূন্যতায় এই জ্ঞানবিজ্ঞান ডুবাইয়া দাও—সে-ই নির্ব্বাণ, সে-ই মুক্তি। সে কি সুখ? তাহা ত জানি না—নির্ব্বাণং পরমং সুখং কি না, বলিতে পারি না; তবে তাহা দুঃখের আত্যন্তিক নাশ।

বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহার মূল হইল—asceticism বা ত্যাগ। মঠে, বিহারে, রাস্তায়, ঘাটে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ যতি, ভিক্ষু, স্থবিরের বাহিনী দেখা দিল। দেশটা পীতবাস সন্ন্যাসীর সেনায় ভরিয়া গেল—সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়নিরোধ বা asceticism-এর বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। সমাজে যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, তাহা নীতিসমষ্টি (ethical code) মাত্র—নচেৎ ইহা পূর্ণমাত্রায় সন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগের নিকট নাস্তিকের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয় নাই। তাহার উপর বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরের উপর আস্থা না রাখিয়া তাহার ভিত্তি অতি দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। নবীনতার উত্তেজনা কাটিয়া গেলে, এই ধর্ম্ম অতিশয় ক্ষীণপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল। ইহার শেষ অবস্থায় নানা ভ্রষ্টাচার আসিয়া ধর্ম্মকায় দূষিত করিয়া ফেলিল—ক্রমশঃ প্রাণহীন হইয়া এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম। এই ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষ যখন সন্ন্যাসীর রাজত্ব হইয়া উঠিতেছিল, তখন কতিপয় স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। বুদ্ধদেব স্ত্রীলোককে কিছুতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘে আশ্রয় দিতে চাহেন নাই। কিন্তু প্রিয়শিষ্য আনন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসের অধিকার দিয়াছিলেন। ইহার জন্য কঠোর নিয়মাবলি প্রণীত হইল; কিছুতেই যাহাতে এই নবদীক্ষিত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মধ্যে অসংযম বা ভ্রষ্টাচার না আইসে, তজ্জন্য তাহাদের নির্জ্জনে আলাপ বা একত্র-বাস নিষিদ্ধ হইল। দেশে বৈরাগ্যের বন্যা বহিয়া গেল; মুণ্ডিতশীর্ষ পীতবসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী জরামরণব্যাধির জালবিমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল।

বুদ্ধদেব যখনই স্ত্রীলোককে তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন, তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মধ্যে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল! যৌন আকর্ষণের

তীব্রতা যে কি ভীষণ, তাহা যে ধর্ম্মের কতদূর বিরোধী, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কালক্রমে এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ব্যবহার তাঁহার ধর্ম্মের কলঙ্কে দাঁড়াইল। মধ্য-যুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে monk ও nun দিগের জীবন যেমন দুর্নীতিপূর্ণ ও বিলাস-লালসাদুষ্ট হইয়াছিল, বৌদ্ধ-দিগের মধ্যেও সেই কাণ্ড দাঁড়াইল। দুই ধর্ম্মের মূলে তীব্র asceticism—দুই ধর্ম্মেই প্রকৃতির ভীষণ প্রতিশোধ। সমস্ত প্রবৃত্তি রোধ করিতে গিয়া দুই সম্প্রদায়ই নষ্ট হইয়া-ছিল। যখন ধর্ম্মের বন্যা আসিল, উদ্দীপনা ও উত্তেজনায় দেশ একভাবে চলিল,—উত্তেজনার মোহ কাটিয়া গেলে, মানবের যে চিরন্তন অতি বলবতী প্রবৃত্তি, তাহা জাগিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য সে তরঙ্গ রোধ করে? প্রবৃত্তির মুখে সমস্ত বিধিবন্ধন ভাসিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের উপর কোন আস্থা ছিল না; সুতরাং যে বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া মানব ধর্ম্ম বা বিধান মানিবে, তাহার কেন্দ্র ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরকে ধর্ম্ম হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল। কাল-ক্রমে বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে সে আসনে বসাইয়া অভাব পূর্ণ করিয়া-ছিল। বুদ্ধ যেমন পূজার আসন পাইলেন, তেমনই বোধি-সত্ত্বগণ সঙ্গে সঙ্গে দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃতভাব ধারণ করিল—বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নানা বিকৃত ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। নানা মত হইতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। হীনযান, মহাযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত শক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বেদপন্থী ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম কখনই ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তবে বৌদ্ধ অভ্যুদয়ে হীনবল ছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহা মস্তক উত্তোলন করিল। ঘরের শত্রু ও বাহিরের শত্রুর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া ক্ষীণবল বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের কথা আমি অতি সংক্ষেপেই বলিয়াছি—তাহার ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের যখন শেষ অবস্থা, তখন ঐ ধর্ম্মের একটি সম্প্রা-দায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সহজযান। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ মহাযানে; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য কঠোর ক্রিয়াকলাপাদি করিতে হইত। পারমিতা জাঠধর্ম্মের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। কালে লোক এরূপ জড়, অলস ও বিলাসী হইয়া উঠিল যে, তাহারা আর ধর্ম্মের জন্য ক্লেশস্বীকার করিতে চাহিত না, সুতরাং বিশেষ বিশেষ পুস্তকের স্থানে কয়েকটি মন্ত্র বা ধারণীপাঠের ব্যবস্থা হইল। মন্ত্রই সর্ব্বস্ব হইল—এইরূপে মন্ত্রযানের প্রচার হয়। কিন্তু অবনতির সঙ্গে এই মন্ত্রযানের সহিত আর এক সম্প্রদায় উঠিল, তাহা—সহজযান।

এই বৌদ্ধ সহজযান হইতে বৈষ্ণব সহজপন্থার উদ্ভব, সুতরাং সহজযানের একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ভগবান্ বুদ্ধদেব ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কালে বৌদ্ধগণ তাঁহার নামে এক বিকৃত ধর্ম্ম চালাইয়াছিল। ইন্দ্রিয়ের ভোগ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইলেও এই সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়সেবার উপদেশ দান করিতে লাগিল। ধর্ম্মের পথ বন্ধুর ও কঠোর নহে; ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিয়া তাহার ধ্বংস-সাধন করিতে হইবে না, প্রবৃত্তিকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে না, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের সেবাদ্বারা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া অক্লেশে অবাধে সুখের সহিত সহজে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারা যায়। এ নির্ব্বাণ আর ভয়াবহ শূন্যতা নহে,—ইহা আনন্দের আকর। কিন্তু এই পথের পথিক হইতে হইলে গুরু চাই। গুরুই একমাত্র পথিপ্রদর্শক; তিনি দেখাইয়া দিবেন, পঞ্চকামের উপভোগপূর্ব্বক কেমন করিয়া নির্ব্বাণলাভ করা যায়। এই সম্প্রদায়ের মূল কথা গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুই সার, গুরু যাহা বলিবেন, তাহাই কর্ত্তব্য। গুরুর প্রীত্যর্থ সমস্তই কর্ত্তব্য। গুরুর প্রীত্যর্থ এই দেহ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগার্থ দেওয়া যায়। দানের মধ্যে মহাদান—আত্মদান; গুরু এই দেহেই বিহার করিয়া সাধনার পথ সুলভ করিয়া দিবেন। সহজযান মহাসুখবাদের বিকৃতি। সুখ জীবনের উদ্দেশ্য—সুখের দ্বার ইন্দ্রিয়, অনুভূতির করণ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সুখের বাহিরে বড় সুখ আর কি আছে? তন্মধ্যে চরমসুখ কামিনীবিলাস। তাহাই ইহাদের লক্ষ্য হইল—ধর্ম্মের মধ্যে কামাচার প্রবল হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঠে মঠে স্ত্রী-পুরুষে ভিক্ষু ভিক্ষুণী হইয়া বাস করিত। তাহারা পূর্ব্বেই অত্যন্ত ভ্রষ্টাচার হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে ধর্ম্মের প্রলোভনে নববলে বলীয়ান্ হইয়া এই দল পুষ্ট করিতে

লাগিল। তখন ভারতের দুর্নীতির যুগ—ভ্রষ্টাচার, বিলাসিতা-প্রাবল্যের যুগ। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ এই দলে প্রবেশ করিল। অতি জঘন্য, অতি কুৎসিত, অতি বীভৎস নগ্ন-মূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল। মন্দিরে-মন্দিরে অতি অশ্লীল মূর্ত্তি দক্ষ ভাস্কর দ্বারা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। পুরীর মন্দিরগাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তিগুলি সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে; কাশীর ললিতাঘাটে নেপালী-মন্দিরে এখনও সে প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে। রথের গাত্রে যে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত হয়, মদনমহোৎসবে (হোলি) যে বীভৎস কামায়ণের লীলা হয়, কে বলিতে পারে যে, তাহা এই শোচনীয় যুগের নিদর্শন নহে? এই সহজযানের দুইটি প্রধান লক্ষণ;—একটি গুরুবাদ ও দ্বিতীয় সহজানন্দ-সাধনা। ইন্দ্রিয়সেবায় লোক বদ্ধ হয়। কিন্তু সহজ পথে তাহা মুক্তির সোপান।

ইহাদের অত্যাচার কালে কালে এমনই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সহজসাধনার মূল শক্তি সাধনা, প্রত্যেক সাধকের এক বা ততোঽধিক শক্তি থাকা চাই। কখন বা বলপ্রয়োগ করিয়া, কখন ধর্ম্মের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, কখন বা ঐহিক সুখের বা মানসসিদ্ধির লোভ দেখাইয়া ছলে-বলে-কৌশলে বহু নর-নারীর সর্ব্বনাশসাধন করা হইত। কত যে জুগুপ্সিত জঘন্য ন্যক্কারজনক আচার ও পৈশাচিক অনুষ্ঠান এই ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ প্রকাশ করেন, তিনি মুদ্রাযন্ত্রের ধারায় পড়িবেন।

ধর্ম্মের নামে অনাচার কখন তিষ্ঠিতে পারে না—অধর্ম্মের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ক্রমশঃ এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠিল, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম নব গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া ভারত পুনরায় আলোকিত করিল। কুমারিল ভট্ট ও আচার্য্য শঙ্করের বিজয়দুন্দুভি কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ মুখরিত করিল। সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্তের ন্যায় বৌদ্ধ-নাস্তিক ও লোকায়তগণ বিলুপ্ত হইল। দেশীয় রাজন্যবর্গও বৌদ্ধগণের উপর অতি ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তখন নানাস্থানে পলাইয়া গেল এবং তাহারা নাম গোপন করিয়া পার্ব্বত্যভূমিতে ও বনে থাকিয়া দিনযাপন করিতে লাগিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের যে অন্তিম বিকৃত অবস্থা দেখা যায়, তাহার স্বরূপ হিন্দুধর্ম্মে তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বৌদ্ধ পদ্ধতি বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র ঈষৎ বিকৃত হইয়া এখনও তান্ত্রিকগণের মধ্যে চলিতেছে। তন্ত্রের সাধনা অতি পুরাতন, বৈদিক যুগেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্ত্তী কালে (Transition period) তন্ত্রসাধনাই প্রবল হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম একটা বৈদেশিক ধর্ম্ম নহে, তাহা ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সনাতনধর্ম্মের একটা পরিণতি; ক্রমশঃ বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানযুগে ঐ বিকৃত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি হিন্দুসাধনার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এখনও দেখা যায়, অনেক তান্ত্রিক মন্ত্রের সহিত বৌদ্ধ ধারণীর কোন পার্থক্য নাই। এই 'সহজে' বৌদ্ধগণই তান্ত্রিক হইয়া শক্তি উপাসনাপদ্ধতি চালাইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবী হইয়াছিলেন—আর তাঁহাদের নির্ব্বাসন দিবার উপায় নাই। তাঁহারা তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। প্রবৃত্তিমার্গ দিয়া নিবৃত্তিপথে যাওয়া সহজযানের রূপান্তর মাত্র; মন্ত্রের প্রভাব, গুরুর মহত্ত্ববাদ প্রভৃতি মন্ত্রযান ও বজ্রযানের প্রভাব হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম যে বৈদিকধর্ম্ম হইতে এতদূর সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। কালে লোক বৌদ্ধধর্ম্ম ভুলিয়া গেল—যাহা কিছু বৌদ্ধধর্ম্মের, তাহা নামান্তর ও রূপান্তর গ্রহণ করিয়া রহিল। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপকসঙ্ঘে পঠিত হয়।

পুরী-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩

যযাতিকেশরী যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং অনঙ্গ ভীমদেব যাহার পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন, তাহাই আদি বা মূল মন্দির। ইহাই "শ্রীমন্দির" নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে রত্ন-বেদী বা "মণি-কোটা" প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার দারুময় বিবিধবর্ণে রঞ্জিত সুবৃহৎ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। জগন্নাথের এক পার্শ্বে গদার আকারের সুদর্শন অবস্থিত রহিয়াছে।

জগন্নাথের মন্দির।

শ্রীমন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১২৫ হাত। উহা দৈর্ঘ্যে ১০০ এবং প্রস্থে প্রায় ৪৫ হাত। মন্দিরের চূড়ায় চক্র ও ধ্বজা শোভা পাইতেছে। বহুদূর হইতে, এমন কি, ৫।৬ মাইল ব্যবধানে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং দূর হইতে চূড়া দর্শন করিয়া যাত্রিগণ ভক্তি ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। অনেকানেক ভক্ত যাত্রী অর্থব্যয় করিয়া চূড়ায় ধ্বজা লাগাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন। পাঁচ সিকা বা পাঁচ টাকা দিলেই পাণ্ডাগণ ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারের পতাকা চূড়ায় লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ঠাকুর দেখিবার পরে যাত্রিগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

পুরীর মন্দির প্রায় ১৮ হাত উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটি প্রাকারে বেষ্টিত। বাহিরের প্রাচীরে সিংহদ্বার, হস্তিদ্বার, অশ্বদ্বার প্রভৃতি নামধেয় চারিটি দ্বার আছে; ইহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। পূর্ব্বমুখী দ্বারই প্রধান প্রবেশপথ, ইহা "সিংহদ্বার" নামে পরিচিত। ইহা "বড়দাণ্ডা" নামক পুরীর প্রধান প্রশস্ত রাজপথের উপর স্থাপিত। ইহার দুই পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ অদ্ভুতাকৃতি দুইটি সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বারটি চূড়াসমন্বিত।

সিংহদ্বার।

সিংহদ্বারের সম্মুখে রাজপথের উপর অষ্টকোণবিশিষ্ট "অরুণস্তম্ভ" নামক কৃষ্ণপ্রস্তরময় একটি উচ্চ স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্তম্ভের পাদপীঠও প্রস্তরনির্ম্মিত এবং উহার গাত্রে বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। অরুণস্তম্ভের উচ্চতা রত্ন-বেদীর সহিত সমান। এই স্তম্ভ দ্বারা বাহির হইতে জগন্নাথের সিংহাসনের উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উপরে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। পুরী হইতে কিছু দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত "কণারক" নামক স্থান হইতে এই প্রস্তরস্তম্ভ সংগৃহীত হইয়াছিল।

অরুণস্তম্ভ।

সিংহদ্বারের নিকট পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের ভিতরে চর্ম্মনির্ম্মিত কোন পদার্থ লইয়া যাইবার আদেশ নাই, এমন কি, চামড়ার মণিব্যাগ (Money-bag) পর্য্যন্ত বাহিরে রাখিয়া যাইতে হয়, নহিলে পাণ্ডাগণ বিষম গোলযোগ উপস্থিত করে এবং কিছু দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমি এক দিন ভ্রমক্রমে চামড়ার মণিব্যাগ ভিতরে লইয়া গিয়াছিলাম। দেবদর্শনের প্রণামী দিবার সময়ে উহা বাহির করাতে পাণ্ডারা সেদিনকার ভোগ নষ্ট হইয়াছে, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং ভোগের মূল্যস্বরূপ ৩০০ টাকা আমার নিকট দাবী করিল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর অষ্টগণ্ডা পয়সায় ক্ষতিপূরণ রফা হইল এবং আমার নিকট হইতে ঐ পরিমাণ দণ্ড আদায় করিয়া পাঁচ জনে বাঁটিয়া লইল।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দক্ষিণে "পতিতপাবন" মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। যাহাদিগের মন্দিরপ্রবেশ নিষেধ, তাহারা রাজপথ হইতে এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জগন্নাথ দর্শনের ফল লাভ করে। প্রবাদ এই যে, চৈতন্যদেব এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বামদিকে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার বাহন ষণ্ডের প্রস্তরময় মূর্ত্তি অবস্থিত।

সিংহদ্বার পার হইয়া ১৮টি সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতীয় প্রাচীরসংলগ্ন দ্বারের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই দ্বার পার হইয়া শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে হয়

সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে জগন্নাথদেবের প্রসাদ (নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য) বিক্রীত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ ইহা ক্রয় করিয়া দেশ-বিদেশে লইয়া যায়।

সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলে বামদিক্ দিয়া জগন্নাথের রান্নাবাড়ী যাইবার পথ। রান্নাবাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তবে আশ-পাশ হইতে ভিতরের ব্যাপার কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে উনানের সংখ্যা ও রন্ধনের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শত শত উনান জ্বলিতেছে,

রন্ধনশালা।

কণারক।

একটির উপর আর একটি করিয়া বহুসংখ্যক হাঁড়ি উপর্য্যুপরি চাপান হইয়াছে, কোনটিতে ভাত, কোনটিতে দাল, কোনটিতে তরকারী প্রস্তুত হইতেছে, উষ্ণ জলের ভাপরায় অধিকাংশ দ্রব্যাদি সিদ্ধ হইতেছে। পাচক ব্রাহ্মণের সংখ্যা দুই শতের কম নহে এবং তদুপযুক্তসংখ্যক "যোগাড়ে"রা কায করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না। কাঠের জালে জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এত লোক একত্র এক স্থানে কায করিলেও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরী সহরের অধিকাংশ অধিবাসী এবং যাত্রিগণ রন্ধনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, জগন্নাথের ভোগ খাইয়াই জীবনধারণ করে। সুতরাং জগন্নাথের মন্দিরে প্রত্যহ যে কত সহস্র লোকের অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সিঁড়ি উঠিয়া দক্ষিণদিকে "আনন্দবাজার"। এই স্থানে সমস্ত দিন জগন্নাথদেবের অন্নপ্রসাদ (রান্না ভাত, দাল ইত্যাদি) বিক্রয় করা হয়। বিস্তর লোক রন্ধনের লেঠা উঠাইয়া এই প্রসাদ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। ক্রয় করিবার সময়ে সকলেই ইহা মুখে দিয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছে, কিন্তু কেহ তাহাতে দোষ ধরে না। পুরীতে অন্যান্য হিন্দু-তীর্থের ন্যায় জাতি বা সকড়ির বিচার নাই; এ স্থানে যে কেহ অপরের স্পৃষ্ট বা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এই আচারটি বৌদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়।

আনন্দ-বাজার।

অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরের দরজা অতিক্রম করিয়া একটি

সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করা যায়। ইহারই মধ্যস্থলে শ্রীমন্দির অবস্থিত এবং চতুঃপার্শ্বে বিমলা, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, মহাবীর, ভুবনেশ্বরী, নীলসরস্বতী, নৃসিংহ, সত্যভামা, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। শ্রীমন্দিরের বাহিরের দিকের দেওয়ালে বিস্তর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

মূল মন্দিরটির সম্মুখে "জগমোহন", তৎপরে "নাটমন্দির" এবং সর্ব্বশেষে "ভোগমণ্ডপ।" এই চারিটি একত্রে জগন্নাথের মন্দির নামে পরিচিত।

উচ্চতায় ইহা রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের সিংহাসনের সহিত সমান। ইহার নিকটস্থ নাটমন্দিরের প্রস্তর-নির্ম্মিত দেওয়ালে তিনটি ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে, চৈতন্যদেব এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিতেন। একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষকাল তাঁহার অঙ্গুলির স্পর্শদ্বারা পাষাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এই তিনটি গহ্বর সৃজন করিয়াছে। নাটমন্দির ও জগমোহন এতদুভয়ের মধ্যস্থল এক খণ্ড সুবৃহৎ লম্বমান কাঠের খুঁটির দ্বারা আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ থাকে।
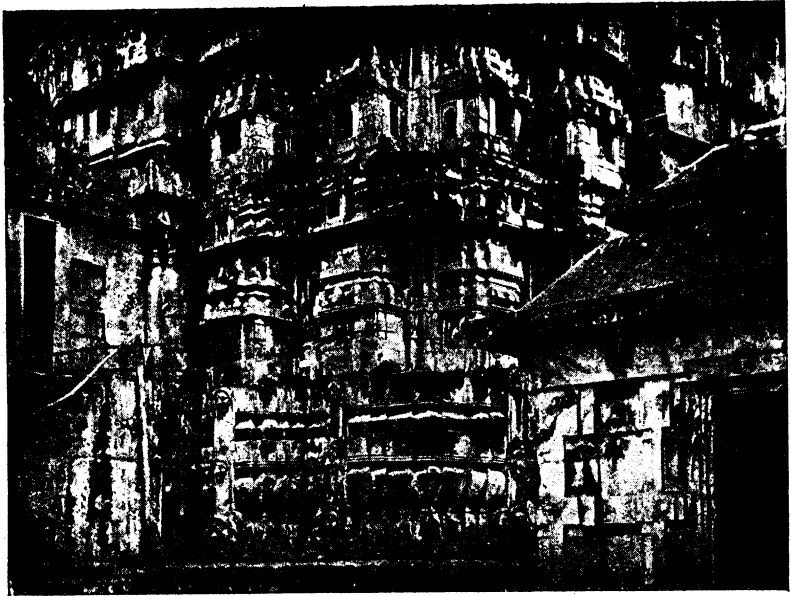
জগমোহন।

দ্বিতীয় দ্বারের সম্মুখে ভোগমণ্ডপের যে দরজা অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। সুতরাং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে দক্ষিণ বা বামদিক্ দিয়া ঘুরিয়া নাটমন্দিরের পার্শ্বস্থিত দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। নাটমন্দিরের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি স্তম্ভ "রত্ন-বেদী"কে সম্মুখ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার উপর গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই জন্ত ইহার নাম "গরুড়স্তম্ভ"।

যাত্রীর ভিড় হইলে এককালে যাহাতে অধিক লোক রত্নবেদীর নিকট যাইতে না পারে, তাহার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। অবরোধের পরেই একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার অবস্থিত। ইহা "জয়বিজয় দ্বার" নামে পরিচিত। এই দ্বার একবার বেলা দুইটার সময়ে এবং গভীর রাত্রিতে আর একবার রুদ্ধ করা হয়। অপরাহ্ণে ও প্রত্যুষে দ্বার উন্মোচিত হইলে লোক দেব-দর্শন করিতে পায়। জগন্নাথদে-

অধিক রাত্রিতে শয়ন করিলে জয়বিজয় দ্বার রুদ্ধ হয় এবং প্রধান পাণ্ডা মন্দিরের শীলমোহর দরজার উপর লাগাইয়া দেন। একটি পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দুই জন লোক প্রতিহারিরূপে সমস্ত রাত্রি তথায় অবস্থিতি করে। প্রত্যুষে ৫টার সময়ে প্রধান পাণ্ডা স্বয়ং আসিয়া শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং সেই সময়ে ঠাকুরের "মঙ্গল আরতি" আরম্ভ হয়। পাছে ঠাকুরের দেহস্থিত বহুমূল্য বসন-ভূষণাদি এবং তৈজসপত্র চুরী যায়, সেই জন্য দ্বার বদ্ধ করিবার এইরূপ কড়াকড়ি বন্দোবস্ত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে পাহারা দিবার জন্য এক দল পুলিস নিযুক্ত আছে, তাহারা টেম্পল্ পুলিস (Temple Police) নামে পরিচিত। রাত্রি ২টার পর মন্দিরের পুলিস ও প্রতিহারিদ্বয় ব্যতীত অপর কেহই মন্দিরের মধ্যে থাকিতে পারে না। এই সময়ে মন্দির-প্রবেশের চারিটি দ্বারই রুদ্ধ করা হয়। এই গভীর রাত্রিতে "দেবতারা" সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত বহুমূল্য বিচিত্র শয্যা-ভূষিত খট্টাঙ্গের উপর সুখে নিদ্রাগমন করেন।

রত্নবেদী ও ত্রিমূর্ত্তি।

শ্রীমন্দিরের যে অংশে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত, তাহা দিবা-ভাগেও গাঢ় অন্ধকারময়। তথায় দিবারাত্রি পুন্নাগ-তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোক উজ্জ্বল না হইলেও তাহারই সাহায্যে যাত্রিগণকে দেবদর্শন করিতে হয়। কতকগুলি প্রস্তরময় সোপান অবতরণ করিয়া রত্নবেদীতে পৌছিতে হয়। এই সিঁড়িগুলি অতিশয় পিচ্ছিল, নামিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ধূপ, ধুনা এবং সুরভি পুষ্পের সৌরভে ঐ স্থান সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। রত্নবেদীর উপর ত্রিমূর্ত্তি পুষ্পাভরণ, মণিময় মুকুট, বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুদর্শনের সহিত বিরাজ করিতেছেন। জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ, সুভদ্রা পীতবর্ণ এবং

ভোগমণ্ডপ

বলরামের দেহ শুভ্রবর্ণ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যদি কোন যাত্রী প্রথমে জগন্নাথের মুখ না দেখিয়া বলরামের মুখ দেখে, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। আমার স্বর্গগতা মাতাঠাকুরাণী পুরী হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে, কেন না মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বলরামের মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। সুভদ্রাদেবী মহাভারতে কৃষ্ণের ভগিনীরূপে পরিচিত থাকিলেও তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাবতীয় উৎসবে লক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এ স্থানে জগন্নাথের প্রতিনিধি যেমন "মদনমোহন", তদ্রূপ সুভদ্রার প্রতিনিধির কার্য্য "লক্ষ্মী"র দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

দেব-দর্শনের পর মন্ত্র পাঠ করিয়া রত্নবেদী সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

রত্নবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দের ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিলে নিতান্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তঃকরণও মুহূর্ত্তের জন্য সরস ও নন্দিত হইয়া উঠে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুই প্রাকারের অভ্যন্তরে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে নানা দেবদেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটি দেবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বিমলা" পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি, কিন্তু ইঁহার পদতলে শিব বা গলদেশে মুণ্ডমালা নাই। দক্ষযজ্ঞের অবসানে সতীদেহ ছিন্ন হইলে তাঁহার নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হয়, সুতরাং ইহা "বাহান্ন পীঠের" মধ্যে একটি পীঠস্থান। বিমলার মন্দিরও মূলমন্দিরের ন্যায় "জগমোহন" ও "নাটমন্দির"-সমন্বিত। অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া কয়েকটি দরজা অতিক্রম করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

বিমলা।

"মহালক্ষ্মীর" মন্দির বিস্তৃত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃশ্য প্রশস্ত একটি "নাটমন্দির" ইহার সম্মুখে অবস্থিত। ইহার ছাদ একটিমাত্র খিলানে গঠিত এবং কতকগুলি স্তম্ভের উপর-সংস্থাপিত। হিরণ্যকশিপুবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিবিধ চিত্র নাটমন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই স্থানটি অতি মনোরম, যাত্রিগণ অল্পাধিককাল এই স্থানে উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া থাকে।

মহালক্ষ্মী।

সত্যভামার মন্দির বিমলা ও মহালক্ষ্মীর মন্দিরেরই অনুরূপ। অনেকগুলি দরজা পার হইয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

সত্যভামা।

নিকটেই একটি ছোট মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নে "বটকৃষ্ণ" ঠাকুর অবস্থিতি করিতেছেন। এই বৃক্ষ "অক্ষয়বট" নামে প্রসিদ্ধ। কত বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পুত্রলাভমানসে এই বৃক্ষের তলদেশে আঁচল পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। একটিমাত্র ফল অঞ্চলে পতিত হইলে উহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ দূর হইবে।

অক্ষয়বট।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে "মুক্তিমণ্ডপ।" এখানে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ নিয়ত শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পুরীতে দান গ্রহণ করেন না, তাঁহারা এই স্থানে বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

মুক্তিমণ্ডপ।

পশ্চিম দ্বারের বামদিকে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি "মদনমোহনের" আবাসস্থান।

নিকটেই "রোহিণীকুণ্ড।" এই কুণ্ডের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একখানি চক্র, কাকের ন্যায় একটি পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি এবং দুইখানি পাদপদ্ম রক্ষিত হইয়াছে। পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি চতুর্হস্ত বিশিষ্ট। "ভুষণ্ডী" নামক এক কাক এই কুণ্ডে পতিত হইয়া চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রস্তরময় পক্ষিমূর্ত্তি ভুষণ্ডী কাকের। ইহা পুরীর পঞ্চ তীর্থের মধ্যে অন্যতম।

রোহিণীকুণ্ড।

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে কঙ্কালসার একাদশী ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুরীতে ইঁহার অদৃষ্টে বার মাস উপবাস। নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবাগণেরও পুরীতে একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস স্থানীয় আচার-বিরুদ্ধ।

একাদশী।

ইতঃপূর্ব্বে নাটমন্দিরের সম্মুখে ভোগমণ্ডপের উল্লেখ করা হইয়াছে। দিবসের বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের যে বিভিন্ন প্রকার ভোগ প্রস্তুত হয়, তাহা রন্ধনশালা হইতে নাকে মুখে বস্ত্রবদ্ধ বাহকগণ কর্তৃক গুপ্ত পথ দিয়া আনীত হইয়া এই স্থানে রক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে যথাবিধি ঠাকুরের সমীপে নিবেদিত হইয়া থাকে।

ভোগমণ্ডপ।

হস্তিদ্বারের নিকট "বৈকুণ্ঠধাম"। ইহা দ্বিতল। এখানে যুগান্তে ঠাকুরের "নব-কলেবর" মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এ স্থানে যাত্রিগণ টাকা জমা দিয়া "আটকিয়া" বাঁধিয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠ।

স্নানের বেদী উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, প্রশস্ত, এবং রেলিং দিয়া বেষ্টিত। ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আর একটি বেদী অবস্থিত রহিয়াছে। স্নান-যাত্রার সময়ে দেবতাদিগকে সশরীরে এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং মন্ত্রপূত বারি তাঁহাদের মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

স্নানবেদী।

এতদ্ব্যতীত আরও ছোট-খাট অনেকানেক দেব-দেবী ও দেব-মন্দির শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। বাহুল্যভয়ে তাহাদের উল্লেখ করা গেল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচুণিলাল বসু।

তাজ-শিল্পীর উক্তি।

সার্থক মোর এ দীন-জীবন, সার্থক আজি প্রাণ,
ধন্য তোমায়, হে আমার প্রিয়া, ধন্য তোমারি গান।
দীর্ঘ জীবন, শুধু অকারণ, যাপি নাই তব সনে,
প্রাণহীন বাণী, অলীক কাহিনী, হৃদয়ের গুঞ্জনে।

আজি শেষ মোর স্বপ্ন-রচনা পাষাণ-ছন্দে গাঁথা,
হেরিবে হর্ম্ম্যে আজিকে বিশ্ব বিয়োগ-অমর-ব্যথা।
অশ্রু-ভবনে রহিবে কি শুধু নৃপতির ব্যথাখানি,
থাকিবে না আর কারো আঁখিধার, আর কারো প্রেমবাণী?

এ জীবনে মোর তোমার পরশ ব্যর্থ হ'ল কি তবে,
হৃদয় মথিয়া রচিনু শিল্প, অশ্রু তাহে না র'বে?
নহে নহে তাহা, হে আমার প্রিয়া, আমি যে হৃদয় ছানি',
মৌন মহান্ শুভ্র পাষাণে রচিনু সৌধখানি!

কত যামিনীর আবেশ-মাধুরী তাহাতে রয়েছে লাগি',
কত বিরহের পুলক-বেদনা প্রাসাদের গায়ে জাগি'!
কত মিলনের মৌন-কাহিনী মর্ম্মর মাঝে গাথা,
আনত বদনে সরম-কাহিনী কত যে পরাণ-কথা;

ছন্দিত হয়ে, সঙ্গীত হয়ে পড়েছে পাষাণ বাঁধনে,
কম্পিত দেহে, শিহরিত প্রাণে, সঞ্চিত মম বেদনে!
মুকুতা-দীপ্ত প্রাচীর-গাত্রে ঝরিছে তোমারি হাস্য,
প্রবালের রাগে ঠিকরিছে তব ললিত-তরুণ লাস্য।

এ যে আলিপনা তব হৃদয়ের সারাটি পাষাণময়,
মূর্খ জগত গাহিছে তবুও আমারি অলীক জয়।
কুড়িটি বছর সাধনার ফলে আজিকে পূরিল আশা,
পাষাণে আজিকে ধ্বনিয়া উঠিল প্রেমের অমর ভাষা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ।

খুকুমণি।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

লেমোনিয়ে এখন গত-পত্নীক ; তাঁহার একটিমাত্র শিশু সন্তান। লেমোনিয়ে তাঁহার স্ত্রীকে মুগ্ধভাবে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসার মধ্যে একটু উচ্ছভাবও ছিল। তাঁহাদের সমস্ত বৈবাহিক জীবনের মধ্যে একবারও তাঁহার অবসাদের ভাব আইসে নাই। তাঁহার ভালবাসা কখনও পুরাতন হয় নাই। লোকটি খুব ভাল, খুব খাঁটি, সাদাসিধা, অকপট। তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না ; কাহারও উপর তাঁহার দ্বেষহিংসা ছিল না।

এক গরীব প্রতিবেশিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন ; শেষে বিবাহও করিলেন। তিনি কাপড়ের কারবার করিতেন। কারবারে মন্দ লাভ হইত না। তাই, কোনও তরুণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবে না বলিয়া তাঁহার মনে কখনও একটু সন্দেহ হয় নাই।

তাহা ছাড়া এই ললনা তাঁহাকে সত্যই সুখী করিয়াছিল। তিনি উহাকে ছাড়া আর কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না, আর কাহারও কথা ভাবিতেন না, তিনি অবিরাম উহাকে পদানত ভক্তের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আহারের সময়, ঐ সাধের প্রিয় মুখখানি হইতে একবারও চোখ ফিরাইতে পারিতেন না এবং এই জন্য নানা প্রকার আনাড়িপনা ও উল্টাপাল্টা করিয়া বসিতেন ; প্লেটের উপর সুরা ও লবণদানীর উপর জল ঢালিয়া ফেলিতেন। তাহার পর, শিশুর মত হাসিয়া উঠিতেন, আর বলিতেন ;—

—"দেখ, জান, আমার ভালবাসাটা একটু বেশী মাত্রায় উঠেছে ; তাই আমি এই সব বাঁদ্‌রামি করছি।"

তাঁহার স্ত্রী "জান্" শান্তভাবে, নত নম্রভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিত ; তাহার পর স্বামীর স্তুতিবাক্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া, অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া অন্য বাজে কথা পাড়িবার চেষ্টা করিত। কিন্তু লেমোনিয়ে, টেবলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিতেন এবং হাতখানি হাতে ধরিয়া রাখিয়া মৃদুস্বরে এইরূপ বলিতেন :—

—"আমার 'জানি'-টি, আমার মণিটি !"

তাহার পর তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে বলিয়া উঠিতেন ;—

—"নেও, নেও, একটু বুঝ্‌দার হও ; খাও, আমাকেও খেতে দেও।"

তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, তিনি রুটীর এক টুকরো ভাঙ্গিয়া, আস্তে আস্তে চর্ব্বণ করিতেন।

পাঁচ বৎসরের ভিতর, তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাহার পর হঠাৎ দেখা গেল, জান্ অন্তঃস্বত্বা হইয়াছে। স্বামী আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এই অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় তিনি স্ত্রীকে এক দণ্ডও ছাড়িয়া যাইতেন না। এত বাড়াবাড়ি করিতেন যে,যে বৃদ্ধা ধাত্রী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল,যাহার উচ্চ কণ্ঠস্বরে বাড়ী সর্ব্বদা মুখর হইয়া উঠিত, সে কখন কখন জোর করিয়া একটু হাওয়া খাওয়াইবার জন্য, তাঁহাকে গৃহ হইতে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত।

একটি যুবকের সহিত লেমোনিয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। যুবকটি লেমোনিয়ের স্ত্রীকে শৈশব হইতে জানিত। সহর-কোতোয়ালের কাছারীতে সে উপতত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিল। যুবকের নাম দির্‌তুর। দির্‌তুর সপ্তাহে তিনবার লেমোনিয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিত, গৃহিণীর জন্য ভাল ভাল ফুল আনিত ; কখন কখন থিয়েটারের টিকিট আনিয়া দিত এবং অনেক সময়, ভোজনের শেষভাগে সরলচিত্ত লেমোনিয়ে, প্রেমের আবেগে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া, বলিয়া উঠিতেন : —

—"তোমার মত সঙ্গিনী, আর ওঁর মত বন্ধু থাক্‌লে এই পৃথিবীতে সুখের পরাকাষ্ঠা হয়।"

সন্তানপ্রসবকালে স্ত্রীর মৃত্যু হইল। এই শোকে লেমোনিয়েও জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন। কেবল সন্তানের মুখচন্দ্রদর্শনে তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। একটি ছোট্ট জীব কুঁক্‌ড়ি-সুঁক্‌ড়ী হইয়া ট্যা-ট্যা করিয়া কাঁদিতেছিল।

এই শিশুটির উপর তাঁহার যার-পর-নাই ভালবাসা পড়িল। এই অপরিসীম ভালবাসা একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইল। এই ভালবাসার ভিতর মৃতপত্নীর শুধু স্মৃতি নিহিত ছিল না,ইহার ভিতর তাঁহার প্রিয়তমার কিছু দৈহিক অংশও উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। পত্নীর রক্ত-মাংস, তাহার জীবনের প্রবাহ-ধারা, তাহার সারাংশটি যেন উহার ভিতরে ছিল। পত্নীর জীবন যেন উহার ভিতর দেহান্তর লাভ করিয়াছিল। শিশুকে জীবনদান করিবার জন্যই যেন তাহার জননী অন্তর্হিত হইয়াছিল। শিশু-সন্তানটিকে পিতা আবেগভরে চুম্বন করিতেন। কিন্তু এই শিশুই তাঁহার পত্নীকে বধ করিয়াছিল, তাহার সাধের প্রাণটি অপহরণ করিয়াছিল, স্তন্যরূপে তাহার জীবনের কিয়দংশ যেন শুষিয়া পান করিয়াছিল। এখন লেমোনিয়ে শিশুটিকে দোল্না-শয্যায় শুয়াইয়া রাখিয়া, তাহার পাশে বসিয়া, একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কাটিয়া যাইত; তাহাকে দেখিতেন আর কত দুঃখের কথা, কত সুখের কথা তাঁহার মনে পড়িত। তাহার পর যখন শিশু ঘুমাইয়া পড়িত, তিনি তাহার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অজস্রধারে কাঁদিতেন এবং চোখের জলে তাহার কাপড় ভিজাইয়া দিতেন।

শিশুটি ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। পিতা এক দণ্ডও আর তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। তাহার চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতেন, পায়চারি করিতেন, তাহাকে নিজেই কাপড় পরাইয়া দিতেন, গা ধুয়াইয়া দিতেন, খাওয়াইয়া দিতেন। তাঁহার মনে হইত, বন্ধু দির্তুর—সে-ও যেন শিশুটিকে খুব ভালবাসে; সে শিশুটিকে খুব আবেগের সহিত চুম্বন করিত; পিতা-মাতা যেরূপ স্নেহের উচ্ছ্বাসে চুম্বন করে, ইহা সেইরূপ। সে শিশুটিকে ধরিয়া দোলাইত, ঘোড়ায় চাপিবার মত, নিজের পায়ের উপর তাহাকে বসাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচাইত; তাহার পর হঠাৎ তাহার হাঁটুর উপর তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া, তাহার খাটো কোর্ত্তাটি উঠাইয়া,তাহার স্থূল মাংসল কচি উরুদেশে তাহার ছোট্ট গোলগাল পায়ের ডিমের উপর চুম্বন করিত। তখন লেমোনিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মৃদুস্বরে বলিতেন;—"খুকুমণিটি, যাদুমণিটি আমার!"

যেন দির্তুর শিশুকে কোলে আরও জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার গোঁফের আগা দিয়া তাহার কাঁধের উপর সুড়্সুড়ি দিত।

কেবল ধাত্রী "সেলেস্ত" শিশুটির উপর তেমন মায়া-মমতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। শিশুটির ছেলেমী ব্যবহারে সে রাগিয়া উঠিত এবং এই দুই পুরুষমানুষের আদর-সোহাগ দেখিয়া মনে হইত, যেন সে হাড়ে-হাড়ে জ্বলিতেছে।

—"ঐ রকম ক'রে কি ছেলে মানুষ করা যায়! তোমরা ওকে দিব্যি একটি বাঁদর ক'রে তুল্‌বে।"

আরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। খোকা এখন ৯ বৎসরে পড়িয়াছে। সে এখনও ভাল করিয়া পড়িতে শিখে নাই। বেশী আদরে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। এখন সে আপনার খেয়ালমত চলে। ভয়ানক জেদী হইয়া পড়িয়াছে, ভয়ানক রাগী হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা বাহানা ধরে, বাপ তাহাই শুনেন, তাহার কথাই রাখেন। তাহার যাহা সাধের খেলানা, তাহা দির্তুর ক্রমাগত আনিয়া যোগায় এবং নানাপ্রকার মিঠাই ও মিষ্টান্ন আনিয়া তাহাকে খাওয়ায়।

তাহাতে সেলেস্ত তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া বলিয়া ওঠে,—"বড় লজ্জার কথা, বড় লজ্জার কথা, মশায়! তোমরা এই ছেলের সর্ব্বনাশ কর্‌চ—শুনছো, তোমরা এই ছেলের সর্ব্বনাশ কর্‌চ। এর একটা শেষ হওয়াই ভাল; হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছি, শেষ হবে, আমি কথা দিচ্ছি, এর শেষ হবেই; শেষ হ'তে আর বেশী দেরীও নেই।"

একটু হাসিতে হাসিতে লেমোনিয়ে উত্তর করিলেন,—"তুমি কি চাও, বল দেখি, বাছা? সত্যি আমি ছেলেটাকে একটু বেশী রকম ভালবাসি। আমি ওর কথা ঠেল্‌তে পারিনে। এখন তুমি যা ভাল বুঝ, তাই কর।"

খোকা একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, একটু রুগ্ন হইয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন,—বিশেষ কোন রোগ নহে, শুধু রক্তহীনতা। তিনি লৌহঘটিত ঔষধ, ভেড়ার মাংস ও ঘন সুরুয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু খোকা পিঠা ছাড়া আর কিছুই খাইতে ভালবাসিত না; অন্য খাদ্য খাইতে রাজি হইত না। খোকার বাপ হতাশ হইয়া, সরপুলি ও চকোলেটের মিষ্টান্ন তাহাকে খুব ঠাসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

একদিন সায়াহ্নে ধাত্রী সেলেস্ত একটু কর্ত্তৃত্বের ভাবে স্থির-বিশ্বাসের সহিত একটা বড় সুপ-পাত্র ভরিয়া সুপ লইয়া আসিল। সুপ-পাত্রের ঢাক্‌নাটা চট্ করিয়া খুলিয়া একটা বড় চামচ সুপের মধ্যে ডুবাইয়া বলিল,—"এই নেও সুরুয়া, এ রকম সুরুয়া তোমাদের জন্য আর কখনও করিনি। এইবার খোকা যদি এই সুরুয়াটুকু খায় ত ভাল হয়।"

লেমোনিয়ে ভীত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। তিনি দেখিলেন, গতিক বড় ভাল নহে।

ধাত্রী কর্ত্তার প্লেট লইয়া, নিজেই তাহাতে সুপ ভরিয়া দিল এবং প্লেটখানা কর্ত্তার সম্মুখে রাখিল।

লেমোনিয়ে একটু চাখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাস্তবিকই খুব ভাল; চমৎকার সুপ।"

তখন ধাত্রী খোকার প্লেটখানা লইয়া তাহাতে এক চামচ সুপ ঢালিয়া দিল; তাহার পর দুই পা পিছু হাটিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

খোকা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল, প্লেটটা ঠেলিয়া ফেলিল এবং ঘৃণার সহিত মুখে থুথু শব্দ করিতে লাগিল।

ধাত্রীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া চামচটা লইয়া, সুপ-সমেত চামচটা খোকার আধ-খোলা মুখের ভিতর জোর করিয়া পুরিয়া দিল।

খোকার দম আট্‌কাইয়া যাইবার মত হইল। খোকা কাঁপিতে লাগিল, থুথু ফেলিতে লাগিল; তাহার পর সে রাগিয়া তাহার জলের গেলাসটা দুই হাতে ধরিয়া ধাত্রীর উপর ছুড়িয়া ফেলিল। তখন ধাত্রীও রাগিয়া খোকার মাথাটা হাতের নীচে দাবাইয়া রাখিল এবং চামচ-চামচ সুপ তাহার গলার ভিতর দিয়া গিলাইয়া দিতে লাগিল। খোকা কতকটা বমি করিয়া ফেলিল, পা আছড়াইতে লাগিল, গা দোম্‌ড়াইতে লাগিল, হাত ছুড়িতে লাগিল—খোকার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—মনে হইল, যেন দম্ আট্‌কিয়া এখনি মারা যাইবে।

তাহার পিতা প্রথমে এরূপ বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার একেবারেই নড়ন-চড়ন ছিল না। পরে হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চাকরাণীর গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে দেয়ালের গায়ে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"দূর হ! দূর হ! পশু কোথাকার!"

কিন্তু ধাত্রী এক ঝাঁকানি দিয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিল; ধাত্রীর চুল এলো-মেলো, টুপীটা পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে। তাহার পর সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মশাই, তোমার হ'ল কি? ছেলেটাকে তোমরা মেঠাই খাইয়ে মার্‌তে যাচ্ছিলে, আর আমি তাকে সুপ খাইয়ে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, এই আমার অপরাধ! এর দরুণ তুমি আমাকে মার্‌তে যাচ্ছিলে?"

আপাদমস্তক কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আবার বলিলেন,—"বের হ, এখান থেকে! দূর হ!...দূর হ!...পশু কোথাকার!"

তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার সাম্‌নে আসিল এবং তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল,—"আ! তোমার বিশ্বাস...তুমি আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার কর্‌বে মনে করেছ?...আ! কিন্তু না,...আর, তা' কার জন্যে? কার জন্যে?...সেই ছেলেটার জন্যে, যে একেবারেই তোমার নয়...না.. একেবারেই তোমার নয়...তোমার নয়...তোমার নয় ...জগৎ শুদ্ধ লোক তা জানে,—হা আমার কপাল! কেবল তুমি ছাড়া...মুদীকে সুধাও, মাংসওয়ালাকে সুধাও, রুটিওয়ালাকে সুধাও—সবাইকে সুধাও, সবাইকে।..."

ক্রোধে স্বর বন্ধ হওয়ায় সে ছাড়া-ছাড়া ভাবে কথা বলিতে লাগিল; তাহার পর তাঁহার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

তাঁহার আর নড়ন-চড়ন নাই; মুখ সীসার মত নীলাভ; হাত দুইটা দোদুল্যমান। কয়েক মুহূর্ত্তের পর, বদ্ধ-স্বরে, কম্পিতস্বরে তিনি এই কথা বলিলেন,—"তুই বল্‌ছিস্?...তুই বল্‌ছিস্?...কি বল্‌ছিস্, তুই?"

তাঁহার মুখের ভাবে ভীত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। তিনি এক পা আরও আগাইয়া আসিয়া আবার বলিলেন,—"তুই বল্‌ছিস্?...কি বল্‌ছিস্ তুই?"

তখন সে শান্তস্বরে উত্তর করিল,—"যা বলেছি, তা আবার বল্‌ছি;—হা আমার কপাল! এ কথা ত জগৎ শুদ্ধ জানে।"

তিনি দুই হাত উঠাইয়া, ক্রোধান্ধ পশুর মত তাহা

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা হইয়াও ধাত্রী বলিষ্ঠা ছিল; তাহার বেশ একটু চটুলতাও ছিল। সে তাঁহার বাহুবন্ধন হইতে চট্ করিয়া ফস্‌কাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষার্থ টেবলের চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল; দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ আবার প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তীক্ষ্ণস্বরে সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"নির্ব্বোধ! নজর ক'রে দেখ, ভাল ক'রে নজর ক'রে দেখ, ছেলেটা একেবারে দিব্‌তুরের ছবিখানি কি না; ওর নাক দেখ, ওর চোখ দেখ, তোমার কি ঐ রকম চোখ, আর নাক, আর চুল? তোমার স্ত্রীও কি ঐ রকম ছিল? আমি আবার তোমাকে বল্‌ছি, এ কথা জগৎ শুদ্ধু লোক জানে, সবাই জানে, কেবল তুমি ছাড়া! এ কথাটা সহরের একটা হাসির জিনিস! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ..."

তাহার পর, সে দরজার সম্মুখে গিয়া দরজাটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

খোকা বেচারী ভীত হইয়া, তাহার সুপ-প্লেটের সাম্‌নে অচল হইয়া রহিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যথার অভিব্যক্তি।

কুট্মলে নিবদ্ধ ব্যথা লতা বিটপীর
ফলের জনম দেয়, কুসুমে ফুটায়।
অন্তর্গুহা গূঢ়ব্যথা নীরব গিরির
হর্ষকলগীতিময় নির্ঝরে ছুটায়।

বারিদের বজ্রব্যথা তাড়িত-তাড়না,
বসুন্ধরা সঞ্জীবন ঢালে শান্তিজল,
জীব-জরায়ুর ব্যথা—প্রসববেদনা
আনন্দনন্দনে অঙ্ক করে সমুজ্জ্বল।

তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বশিল্পিরাজ,
জ্বলিছে অনন্তজ্বালা তোমার অন্তরে,
অনাদি অনন্তকাল, তব সৃষ্টিকায,
চলিতেছে অহরহ এই বিশ্ব'পরে।

নিত্য নব দুঃখ তব নিত্য নব ব্যথা
হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট,
অপূর্ণ করিতে পূর্ণ তব ব্যাকুলতা,
মুছে মুছে আঁকিতেছে বিশ্বদৃশ্যপট।

ওগো শিল্পি, বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের নিদান,
শিক্ষা দাও পুত্রে তব পিতৃব্যবসায়।
এই বিশ্ব শিল্পাগারে দাও তারে স্থান
দীক্ষা দাও বেদনার শোণিত-টীকায়।

দাও ব্যথা, ক্ষতি নাই, নিত্য নব নব,
প্রকট করিব আমি শিল্পগরিমায়,
মন্দির গড়িয়া তায় উপাসক হব,
সৃজিতে সৃজিতে, স্রষ্টা, লভিব তোমায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

রামকৃষ্ণ।

৫

ঝামাপুকুরে স্মৃতির টোল খুলিয়া রামকুমার যে কেবল অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন, তাহা নহে। পল্লীর কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ঘরে তাঁহাকে যজন-কার্য্যও করিতে হইত। দেবতার মাথার উপর দু'টা ফুল ফেলিয়া, নৈবেদ্যটা একবার তাঁহাকে দেখাইয়া, মহাড়ম্বরে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি, তার পর চাল-কলা লইয়া চট্‌পট্‌ চম্পট! ধর্ম্মভীরু, দেশভক্ত রামকুমার তাহা পারিতেন না। সুতরাং যথাবিধি পূজা সম্পন্ন করিয়া অধ্যাপনার কার্য্য সারিতে দিগন্তের সূর্য্য মাথার উপর উঠে। তাহার পর রন্ধনে-ভোজনে বেলা প্রায় পড়িয়া যায়। এমনই দু'বেলা। ভগ্নশরীর আর কত সয়, কত বয়! তাঁহারও ত দিন ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে! গদাধর কলিকাতায় আসিয়া অধ্যাপনা ব্যতীত আর সব ভার লইয়া তাঁহাকে বিশ্রামের একটু অবসর দিল। কিন্তু কনিষ্ঠানুজকে যজন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রামকুমার প্রথম প্রথম একটু চিন্তিত হইয়া রহিলেন। একে সহর, তায় সম্ভ্রান্ত ঘর—যেখানে পাল্কীর ভিতর বসিয়া গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা—সে অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরের আদব-কায়দার বন্ধনে কি পল্লীর এই স্বচ্ছন্দচারী বালক অনায়াসে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে? কিন্তু রামকুমারের এই অমূলক ভয় অনতিকালেই দূর হইল। জ্যেষ্ঠ দেখিলেন, অশিক্ষিতা পল্লীবাসিনীদিগের ন্যায় সহরের সুসভ্য মহিলা-সমাজও তাঁহার সহোদরের বিচিত্র আকর্ষণে সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। গৃহিণীগণ দেখিতেন, এই প্রিয়-ভাষী, প্রিয়দর্শন, শিশুর মত সরলস্বভাব ব্রাহ্মণকুমার যখন পূজায় বসে, তখন বোধ হয়, দেবতা যেন ইহার পরমাত্মীয়, ইহার নিবেদিত দ্রব্য সকল পরমাদরে গ্রহণ করিতেছেন। কি মিষ্ট ইহার স্বর! মন্ত্রপাঠকালে মনে হয়, ঠাকুরঘর যেন দুলিতেছে, আর অচেতন শিলা সচেতন হইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছেন! যখন ধ্যান করিতে বসে, ইহার সুবঙ্কিম নয়ন-প্রান্ত দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরে আর বদনমণ্ডল কি এক দিব্য বিভায় ঝলমল করিতে থাকে! ইহাকে দেখিলে অন্তরে এক অপূর্ব্ব বৎসলভাবের সঞ্চার হয়! আহা আপনভোলা বালক! কখন কখন নৈবেদ্যগুলাও বাঁধিয়া লইতে ভুলিয়া যায়, স্মরণ করাইয়া দিলে কি কুণ্ঠিত-ভাবে গ্রহণ করে!

কিন্তু রামকুমার দেখিলেন, স্নেহে, ভালবাসায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর যজমানগৃহে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে উদ্দেশ্যে তাহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহা অণুমাত্রও অগ্রসর হইতেছে না। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহের অধ্যাপনায় সহোদরের শিক্ষা দ্রুতগতি উন্নতির পথ অবলম্বন করিবে। কিন্তু তাহার সুদূর-সম্ভাবনাও ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না! যে শিখিবে, সে দিকে তাহার আদৌ খেয়াল নাই, কেবল সেবায় পূজায় পরমানন্দে দিন কাটাইতেছে। সে আনন্দে বাধা দিতে রামকুমারের মন সরিতেছে না, অথচ না দিলেও উপায় নাই। গদাধরের বয়স দিন দিন বাড়িতেছে। কৈশোর অচিরে যৌবনে পরিণত হইবে এবং সংসারও আপনার দাবি হইতে অব্যাহতি দিবে না। সম্মুখে কঠোর জীবন-সংগ্রাম। ব্রাহ্মণের বিদ্যাই বল। গদাধরকে বলি বলি করিয়াও রামকুমার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আহা, সদানন্দময় বালক! মায়ের অঞ্চলের নিধি! ইহাকে কি তিরস্কার করা যায়! কিন্তু না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি। গদাধর সংসারের একমাত্র ভরসা। তিনি আর কয়দিন? শরীর বিশ্রাম চাহিতেছে। মন কহিতেছে, আর কেন, জাল গুটাইয়া আন, নহিলে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইবে। সময়মত এক দিন রামকুমার সহোদরকে সকল কথা বুঝাইলেন—অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত না করিলে ভবিষ্যতের উপায় কি? কথাগুলায় একটু তিরস্কারের আভাস ছিল। কিন্তু গদাধর পরিষ্কার উত্তর দিল, "ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার আবশ্যক নাই। যে বিদ্যায় অবিদ্যা দূর হয়, আমি তাই চাই।"

এ দিকে ভবিষ্যতের উপায় করিতেছিলেন,—শ্রীহস্তে শ্রীভগবান্। কলিকাতার দক্ষিণভাগে জানবাজার পল্লী। তথায় এক ঘর সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ বাস করেন। ইঁহার জাতিতে মাহিষ্য এবং ইঁহাদের উপাধি—মাড়। অক্ষয় কীর্ত্তিশালিনী রাণী রাসমণি এই বংশের বধূ। সাধকশ্রে

রামপ্রসাদের জন্মভূমি হালিসহরের পার্শ্ববর্ত্তী কোনাগ্রাম রাণীর জন্মধাম। সুন্দরী না হইলেও রাসমণি সুলক্ষণা ছিলেন। মাতা রামপ্রিয়া কন্যাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—রাণী। প্রীতিরামের দ্বিতীয় পুত্র রায় রাজচন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত যখন এই দরিদ্র-দুহিতার পরিণয় হয়, তখন কে ভাবিয়াছিল, এই কুলাঙ্গনার দয়া-দাক্ষিণ্য-কীর্ত্তি এক দিন ঐশ্বর্য্য-গৌরবের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর কিরণ বিতরণ করিবে? সম্পদের সুশীতল অঙ্কে রাসমণি দৈন্যের সকল দাহন ভুলিলেন, কেবল ভুলিলেন না—তিনি হারু ঘরামীর বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও লোক-হিতৈষণার কথা জন-রসনা এখনও আনন্দে ঘোষণা করিতেছে।

রাজচন্দ্র যখন পরলোকগমন করেন, রাণীর বয়ঃক্রম তখন অনুমান তেতাল্লিশ বর্ষ। নারী—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। তাঁহার বিপুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণভার প্রাপ্ত হইবার আশায় জনৈক ধনী অগ্রণী হইয়া আসিলেন। তিনি রাজচন্দ্রের কাছে দু' লক্ষ টাকা ঋণী। রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, "আপনি স্ত্রীলোক, বিষয়রক্ষার জন্য এক জন বিশ্বাসী লোক রাখা উচিত।"
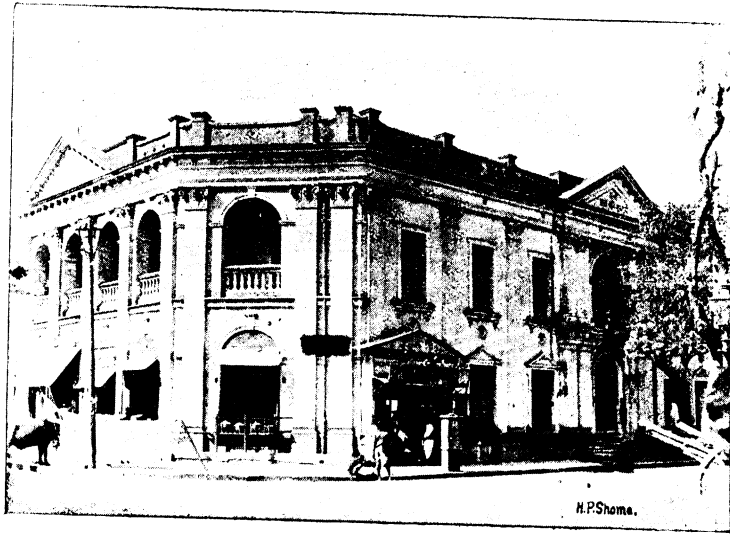
রাণী রাসমণির বাড়ী।

কন্যা—যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহা গচ্ছিত ধনমাত্র।

রাজচন্দ্রের সহিত রাণীর পরিণয়ে একটু রোমান্সের গন্ধ আছে। দুইবার বিপত্নীক হইয়া রাজচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন, আর বিবাহ করিবেন না। ত্রিবেণীর পথে কোনার ঘাটে সুলক্ষণা পল্লীবালাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার কুললক্ষ্মীকে বরণ করিয়া আনেন। বধূর পয়ে সংসারে সৌভাগ্যের বন্যা বহিল। ১২১১ সালে এই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাণীর বয়স তখন একাদশ বর্ষ। রাণীর

কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, রাণী পর্দ্দার পশ্চাতে থাকিতেন এবং তাঁহার জামাতা মথুরমোহন মধ্যবর্ত্তী হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। মথুর রাজচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যাকে প্রথম বিবাহ করিয়া বিপত্নীক হইলে, রাণী তাঁহাকে চতুর্থ কন্যা অর্পণ করেন। জামাতার মুখ দিয়া রাণী উত্তর দিলেন, "কথা সত্য! কিন্তু তেমন বিশ্বাসী লোক কোথায়?"

ধনী বলিলেন, "ইচ্ছা করেন ত আমিই সব দেখা-শুনা করতে পারি।"

রাণী উত্তর দিলেন, "এ ত ভাগ্যের কথা! কিন্তু একটু না ভেবে আমি কিছু স্থির করতে পার্‌ছি না। কিছুই জানা নাই, এমন কি, কার কাছে কি দে না-পা ও না আছে, তা ও জানিনি, আপনি যদি আমার সহায় হন, তা হ'লে ভাবনা কি? আমি যত শীঘ্র পারি, স্থির কর্‌ব। ইতি-মধ্যে আপনি যদি দেনা-পাও-নার একটা ফর্দ্দ ক'রে দেন, বড় উপকার হয়।"

মথুরমোহন বিশ্বাস।

ধনী স্বীকার করিলেন এবং যেখানে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, সেখানে নিজের ঋণ সর্ব্বাগ্রে তালিকাভুক্ত করিতে হইল। রাণী প্রশ্ন করিলেন, এ ঋণ সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে? ধনী ভাবী আশার বশবর্ত্তী হইয়া ছত্রিশ হাজার টাকা লাভের একটি সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর সম্পত্তি-রক্ষণাবেক্ষণের কথা পুনরুত্থাপন করিয়া ধনী উত্তর পাইলেন, "আমি বিধবা স্ত্রীলোক; যৎসামান্য আয়, আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মচারী রাখিবার যোগ্যতাও নাই, প্রস্তাব করাও ধৃষ্টতা।"

ধনী মথুরমোহনকে বলিয়া গেলেন, "বুঝ্‌লুম, রাণী সামান্যা স্ত্রীলোক নন।"

অন্যায়ের প্রতিবিধানে এই তেজস্বিনী রমণী নিজ সঙ্কল্প হইতে এক পদ বিচলিত হইতেন না। গঙ্গাতীরে বাবুঘাট ও তৎসংলগ্ন বাবুরোড রাজচন্দ্র বাবু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাণীর দুর্গোৎসবে প্রতি বৎসর নবপত্রিকাস্নান ও প্রতিমা নিরঞ্জন প্রভৃতি এই ঘাটে সমাধা হইত। বাবুরোডের পার্শ্বের অট্টালিকায় ঐ সময় এক উৎকট কড়া মেজাজের "সাহেব" থাকিতেন। এক বৎসর মহাষষ্ঠীর প্রত্যূষে বিরাট বাদ্যরোলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রক্তচক্ষু "সাহেব" আজ্ঞা দিলেন, "সয়তানী আওয়াজ থামাও!" কিন্তু ঢাক-ঢোল আরও জোরকাঠিতে বাজিয়া উঠিল। "সাহেব" আর কালবিলম্ব না করিয়া পুলিসে উপস্থিত। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। রাণী পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়া জানবাজার হইতে বাবুঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পাশে মোটা মোটা গরাণের বেড়া দিয়া বাবুরোড বন্ধ করিয়া দিলেন। কোম্পানী বাহাদুর ব্যতিব্যস্ত হইয়া কড়া হুকুম দিলেন, "বেড়া খুলিয়া দাও।" রাণী বলিলেন, "সরকার বাহাদুরের যদি প্রয়োজন হয়, উচিত মূল্য দিয়া রাস্তা কিনিয়া লউন।" কোম্পানী বাহাদুর জরিমানার টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিয়া রাস্তা খুলাইয়া লইলেন।

জনহিত-সাধন-সঙ্কল্পে রাণী ক্ষতি বা বিপদ্গ্রস্ত হইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। গঙ্গায় জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া অনেকগুলি জেলে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সরকার বাহাদুর তাহাদের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্য করিলে তাহারা রাণীর আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসমণি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ঘুস্থড়ির টেঁক হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত গঙ্গার জলকর জমা করিয়া লইলেন। রাণী যে অন্তরে অন্তরে দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছেন, মোটা টাকা পাইয়া সরকার বাহাদুরের দুরদৃষ্টি সে সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু সে চক্ষু অবিলম্বেই ফুটিল। বাঁশের বেড়া দিয়া রাণী তাঁহার অধিকারের উভয় সীমানা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাষ্পীয় পোত প্রভৃতির যাতায়াতপথ রুদ্ধ হইল। ব্যবসায়িগণ তুমুল গণ্ডগোল তুলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন। সাধারণের অসুবিধাজননের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া রুদ্ধপথ মুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ প্রচার করিলে রাসমণি উত্তর দিলেন, "আমার প্রজাদের হিতার্থে আমি জলপথ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। জাহাজ চলাচল করিলে মাছ পলায়, ডিম নষ্ট হয়। জালে যে অল্পসংখ্যক মাছ পড়ে, তাহাতে কোম্পানী বাহাদুরকে কর দিয়া জেলেরা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না।" রাণীকে প্রসন্ন করিবার জন্য কোম্পানী বিনা করে জেলেদের মাছ ধরিবার অনুমতি দিলেন। কৃতজ্ঞ প্রজাগণ গাইল—"ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি।"

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বুদ্ধিমতী রাণী তাঁহার দূরদর্শন-শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ্য টলটলায়মান দেখিয়া বিশিষ্ট ধনিগণ মাটীর দরে কোম্পানীর কাগজ বেচিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী বুঝিলেন, যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বণিকজাতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা কখন সমূলে বিনষ্ট হইবে না। তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সম্পত্তির আয় সম্যক্রূপে বৃদ্ধি হইল।

এই সময় কলিকাতায় ফ্রীস্কুল বাড়ীতে এক দল গোরা সৈন্য থাকিত। বিদ্রোহানল নিবিয়া গেলে তাহারা অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইহাদের কয়েক জন সশস্ত্র হইয়া এক দিন রাণীর বাটী আক্রমণ করে। সে উন্মত্ত প্রবাহের মুখে রাণীর দ্বাররক্ষকগণ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। সৈন্যদল অন্দরে প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র লুটপাট ও ভাঙ্গিয়াচূরিয়া তছনচ্ করিতে লাগিল। বিপন্ন পরিবারবর্গ প্রতিবেশী মান্নাবাবুদের বাটী আশ্রয় লইল। তেজস্বিনী রাণী কিন্তু নড়িলেন না। সংযত হইয়া একখানি তরবারিকরে গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর ঘরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার কর্ম্মঠ জামাতা মথুরমোহন তখন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গৃহে

বাবুঘাট।

ফিরিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং পুলিস ইন্স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উৎপাত শান্তি হইল। সৈন্যবিভাগ বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

উক্ত রঘুনাথজীউ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি ইতিহাস আছে। নিদাঘ মধ্যাহ্নে এক দিন রাজচন্দ্রবাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'ন। বড়লোকের ঘুম, ভাঙ্গাইতে কেহ সাহস করে না। কিন্তু তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর আদেশও অলঙ্ঘ্য। রাজচন্দ্রবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল এবং তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি ভিক্ষুক নই।" দীর্ঘকাল পরে রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে সন্ন্যাসী আর একবার দর্শন দেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া রাসমণি জানিতে পারিলেন, ইনি রঘুনাথজীউর পূর্ব্বসেবক! স্বামীর পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় রাণী সন্ন্যাসীকে কিছু দান করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে অনুনয় করিলেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা! এক লোটা, এক কম্বল হাম্‌কো দেনা।"

রঘুনাথজীকে দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী বিদায় গ্রহণ করিলেন। উত্তমপুরুষের বিগ্রহ মধ্যম পুরুষে গলগ্রহ হয় এবং অধম পুরুষে ক্রমে নিগ্রহ হইয়া
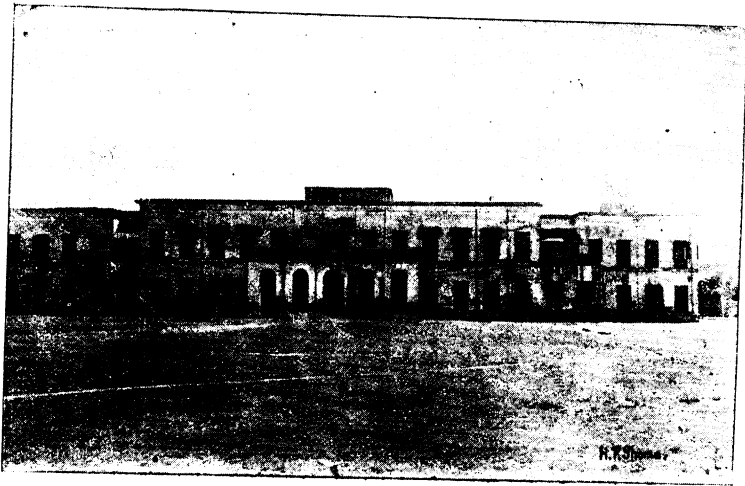
ফ্রী স্কুল।

সন্ন্যাসীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার কাছে রঘুনাথজী বিগ্রহ আছেন, আপনাকে দিতে চাই।"

"কেন?"

"আমি অতি দূরদেশে তীর্থপর্য্যটনে যাব। আর ফেরা হবে কি না সন্দেহ। আপনি বিগ্রহটির সেবা করুন, আপনার মঙ্গল হবে।"

বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজচন্দ্রবাবু সন্ন্যাসীর তীর্থপর্য্যটন-সাহায্যকল্পে কিছু অর্থ দিতে চাহিলে সন্ন্যাসী উঠে। কিন্তু এ বিগ্রহ সম্বন্ধে তত দূর গড়ায় নাই; তৎপূর্ব্বেই চুরী হইয়া যায়। সৎসাহস, তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা দেব-দ্বিজ-পরায়ণা এই রমণীর মুক্তহস্তের দান ও লোকহিত-কল্পে অজস্র অর্থব্যয় কীর্ত্তন করিতে জন-রসনা এখনও চঞ্চল হইয়া উঠে। বঙ্গভূমিতে বহু কীর্ত্তি এখনও রাসমণির অমর নাম উজ্জ্বল মণিখণ্ডের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তীর্থপর্য্যটন ভক্তিমতী হিন্দু-মহিলাগণের ঐকান্তিক কামনা। বৈধব্যদশায় সে লালসা দুর্দ্দমনীয় পিপাসায়

পরিণত হয়। বহুকাল হইতে রাণী অন্তরে অন্তরে পুণ্য-কাম হিন্দুর পরমধাম বারাণসী-দর্শন-বাসনা পোষণ করিতে-ছিলেন। তজ্জন্য বহু অর্থও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল অপরিহার্য্য বিষয়-কার্য্য তাঁহার কামনা-পূরণের পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু আর নয়! প্রতি নিশ্বাসে জীবনক্ষয় হইতেছে। মেদ-মাংস-ক্লেদভরা দেহে শমনের সমন-জারি হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের বিচারালয়ে হাজির হইবার দিন অদূরে। আর দেরি নয়! সময় থাকিতে প্রস্তত হইতে হইবে। জোর করিয়া না ছাড়িলে, বিষয় কি ছাড়ে? ভোগে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে। ভোগ নয়—দুরন্ত রোগ! ইহার আশু চিকিৎসা প্রয়োজন। ভব-রোগ-বৈদ্য বিশ্বনাথ ইহার একমাত্র চিকিৎসক। অচিরে তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। বারাণসীগমনে রাণী কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং অভিপ্রায় প্রকাশ মাত্র তাঁহার অনন্য-সহায় মথুর-মোহন অবিলম্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্ব-রাত্রিতে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন, নীলোৎপলবরণা এক অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী রমণী তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তুমি কাশী যেয়ো না। গঙ্গাতীরে মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে, আমার প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর। আমি তাতে আবির্ভূত হয়ে তোমার পূজা গ্রহণ করব।"

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য।

কিংবদন্তী কহে, দয়া-ধর্ম্ম দেব-ভক্তি-পরায়ণা রাসমণি শ্রীশ্রীদেবীর চিহ্নিত সেবিকাগণের অন্যতমা। জগদম্বার কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশলাভে তাঁহার মনঃস্রোত ভিন্নখাতে প্রবাহিত হইল।

গঙ্গাকূলে দক্ষিণেশ্বরপল্লী-অঞ্চলে মথুরমোহন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ষাট বিঘা জমী ক্রয় করিলেন। ঐ স্থান কূর্ম্ম-পৃষ্ঠাকৃতি এবং তাহাতে একটি পীরস্থান ও কবর-ভূমি ছিল। এইরূপ ভূমিই তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট শক্তি-সাধনার উপযুক্ত স্থান। শুভদিন নির্ণয় করিয়া রাণী ঈপ্সিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি সকল গঠন করিতে দিলেন এবং বিষয়চিন্তা পরিহার করিয়া দৃঢ় নিষ্ঠা-সহকারে কঠোর তপানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। দেব-দেবীর গঠন সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু যথেষ্ট তৎপরতার সহিত অনুসৃত হইয়াও শ্রীমন্দিরসংক্রান্ত সকল কার্য্য ১০ বৎসরেও সম্পূর্ণ হইল না। এ দিকে রাসমণি স্বপ্ন দেখিলেন, বাক্সের ভিতর বন্দিনী হইয়া দেবী নিরতিশয় ক্লিষ্টা হইয়াছেন এবং বলিতেছেন, "যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।" তখন বিষ্ণুপর্ব্ব কাল। শক্তি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু রাণী আর কালবিলম্ব করিতে সাহস করিলেন না।
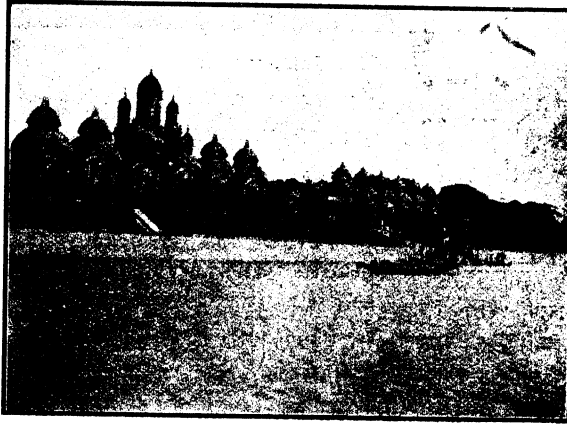
১২৬২ সাল—স্নান যাত্রার পুণ্য দিন। দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যানে আজ হরি, হর, অম্বিকার একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা হইবে। নিশা শেষ না হইতে হইতেই দেবালয়ের বিশাল প্রাঙ্গণ বিপুল জনতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে প্রাচীমুখ প্রস্ফুটিত হইল এবং পূর্ব্বাকাশে ঊষাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খরোল, ঢাক-ঢোল ও শত শত খোল গর্জ্জিয়া উঠিল। হরি-হরি-হর-হর, জয় জগদম্বে রবে প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। রক্ত পট্টবাসে আনন্দ-কলহাসে জাহ্নবী নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দ্বাদশ শিব-লিঙ্গ, শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ এবং শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ভক্তির অমল-ধারায় মন্দির-তল সুসিক্ত করিয়া রাণী ইষ্টদেবীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ভবতারিণীর

নবরত্ন দেউল দেখিয়া গদাধরের মনে হইল, রাণী রজত-গিরি তুলিয়া আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে বসাইয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীতে রামকুমারের পূজক নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত কারণ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, রাণী ইষ্টদেবীকে অন্নভোগদানে নিত্য-সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত হ'ন নাই। কেবল উদারপ্রকৃতি রামকুমার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, দেবালয় এবং দেব-সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিলে, প্রতিষ্ঠা-কার্য্য ও অন্ন-ভোগ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা উপস্থিত হইবে না। এই বিধানানুসারে রাসমণি দেবালয় ও দেব-সম্পত্তি তাঁহার গুরুবংশীয়গণকে দান করিয়া নিত্য-সেবার তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করেন। অতঃপর রাণীর সবিশেষ আগ্রহে রামকুমারকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করিতে হয়। অন্য মত এই, ইঁহার স্বদেশবাসী দুই এক ব্যক্তি রাণীর সংসারে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীও ছিলেন। তাঁহারাই রাণীর নিকট রামকুমারের সদাচার, নিষ্ঠা, দেবভক্তি প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দেবী-পূজায় ব্রতী করেন। যাহা হউক, ইহা দৈব-নিয়োগ। এই ঘটনা হইতেই দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের প্রতিষ্ঠা।
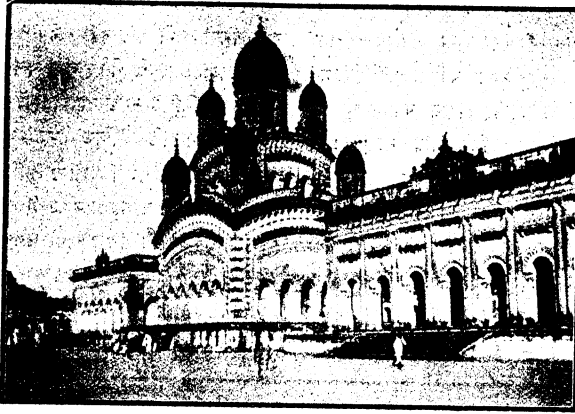
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য।

হরি-হর-শ্যামার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ হইলে দেবালয়-প্রাঙ্গণ অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে পরিণত হইল। কিন্তু জ্যেষ্ঠের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও গদাধর ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণে সম্মত হইল না। অগত্যা রামকুমার ভ্রাতাকে গঙ্গাকূলে গঙ্গাজলে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে বলিলেন। তাহাই হইল। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

* এই প্রবন্ধে প্রকাশিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিত্র সকল এবং এই সংখ্যার দুইখানি চিত্র 'উদ্বোধন' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গুরু গোবিন্দসিংহ।

হে গুরু গোবিন্দসিংহ! শেষ গুরু তুমি।
সর্ব্বশক্তি নিয়োগিয়া পতিতে উঠায়ে
স্থাপিলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি উপমা রহিত।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু একত্র করিয়া
ভাঙ্গিলে পাষাণ সম বিশাল প্রাসাদ;
লুপ্ত হ'য়ে গেল তাহা! ইন্দ্রজাল সম।
মৃত সঞ্জীবিত হ'ল তোমার পরশে;
ছুটিল চৌদিকে যেন উন্মত্ত হইয়া
সাধিল অদ্ভুত কার্য্য বিশ্ববিমোহন।
দেখালে মানবশক্তি অপূর্ব্ব অদ্ভুত।
হে গুরো! জগত-গুরো! দেখ একবার
ভারতের কিবা দশা হয়েছে এখন;
আর কি গো শোভা পায় সমাধি-শয়ন?
দেখ চাহি, আজি তব সমাধির পাশে
কি শক্তি নিষ্ক্রিয় তব আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
রয়েছে মলিন হ'য়ে; দেখ চক্ষু মেলি।

শ্রীমতী স—স—দাসী।
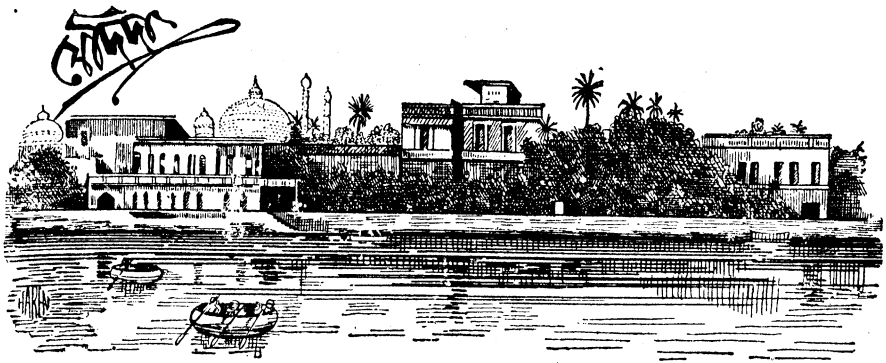
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৃহের বাহিরে আসিয়া রুথ যতক্ষণ পারিল দৌড়িয়া গেল—গলির পর গলি পথের পর পথ সে যেন পাগলের মত অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার পর শ্রান্তি হেতু যখন আর চলিতে পারিল না, তখন একটি গৃহের পার্শ্বে অন্ধকার স্থান বাছিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল। বসিয়াও সে শঙ্কাচঞ্চল হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল—উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। চারি দিকে অন্ধকার—জ্যোৎস্নালোক নির্ব্বাপিতপ্রায়—বিশেষ বাগদাদ সহরের সৌধারণ্যের মধ্য দিয়া রাস্তায় সে আলোক আর প্রবেশপথ পায় নাই। শব্দের মধ্যে কেবল কুকুরের চীৎকার; সে যখন পাগলের মত দৌড়াইয়া আসিয়াছে, তখন রাজপথে কুকুরগুলা চীৎকার করিয়াছে—এখনও তাহাদের কতকগুলার চীৎকার নিবৃত্ত হয় নাই।

রুথের মস্তিষ্ক যেন ঠিক ছিল না। অল্পক্ষণ সে কিছু ভাবিতেও পারিল না। তাহার পর তাহাকে ভাবিতে হইল। রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল—বাতাসের স্পর্শ, ঊষালোকবিকাশের পূর্ব্বে—বিহগের কূজন আরব্ধ না হইতেই—নিশাশেষসূচনা জানাইয়া দিল। দিবালোক বিকশিত হইলে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? এমন করিয়া এই স্থানে বসিয়া থাকা চলিবে না, আশ্রয় নাই, তবুও আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। সে কোথায় যাইবে?

একটা স্থানের কথা তাহার মনে হইল—আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদ। এই মসজেদের কথা কেবল ইরাকে, ইরাণে নহে, পরন্তু মুসলমানসমাজে সর্ব্বত্র পরিচিত। আরব, মিশর, চীন, ভারতবর্ষ সকল দেশ হইতে মুসলমানরা এই তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকেন। কাতিক্ষী কাদরিয়ায় নানা দেশের লোক আছে—সেই সেই দেশের পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী যাইলে "পাণ্ডা" বা প্রদর্শক হয়। ইরাকে—খলিফাদিগের স্মৃতিজড়িত—আরব্য উপন্যাসের লীলাক্ষেত্র বাগদাদ সহরে এই মসজেদে বাঙ্গালী "পাণ্ডা"ও আছে। রুথ এই মসজেদের নাম শুনিয়াছিল। আর এক কথা—কফীর পেয়ালা রাখিবার জন্য দায়ুদ আমারা হইতে যে রৌপ্য-থাল লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সাবিয়ান শিল্পীর দ্বারা এই মসজেদের চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিল। আমারার এই সাবিয়ান শিল্পীরা রৌপ্যের মধ্যে এন্টিমনি বসাইয়া যে কৌশলে চিত্র অঙ্কিত করে, তাহা বংশপরম্পরাক্রমে তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ; আর কেহ সে কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। নইমী যখন দাসীকে তিরস্কার করিতে করিতে এই মসজেদের উল্লেখ করিয়াছিল, তখনই সে কথা রুথের মনে হইয়াছিল। এখন সে ভাবিল, সে সেই মসজেদে যাইবে। মুয়াজ্জমের মসজেদের যাজকের কথা মনে করিয়া সে সাহস পাইল বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নীর ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে ভয় পাইল। কিন্তু ভয় পাইলেও উপায় নাই। কেন না, সেই মসজেদ ব্যতীত সে আর কোন স্থানের কথা জানিত না।

আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদ কোথায়, জানিতে রুথের বিলম্ব হইল না। বাগদাদ সহরের নানা স্থান হইতেই মসজেদের মসৃণ চিত্রিত টালী দিয়া আবৃত গম্বুজ দেখা যায়; আর যাহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না—সে

মসজেদ দেখাইয়া দিতে পারে। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া সহজেই তথায় যাওয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আকাশ বাগদাদের ধুধুর বর্ণ ধারণ করিল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শত মিনারচূড়ায় নব-দিবালোক প্রতিভাত হইল। রাজপথে দুই চারি জন লোক দেখা দিলেই সে মসজেদে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল।

মসজেদের রাস্তার পরপারে সেবাইতদিগের প্রাসাদোপম গৃহের দ্বারে তখন কয় জন সহিস কয়টি সজ্জিত গর্দ্দভ লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—গৃহের বালকরা গর্দ্দভারোহণে বেড়াইতে বাহির হইবে। রুথ যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তখন গৃহমধ্য হইতে সুবেশসজ্জিত সুদর্শন কয়টি বালক আসিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করিল। আর সেই সময় রাস্তার অপর পারে মসজেদের দ্বার হইতে বাহির হইয়া গৃহকর্ত্তা রাজপথে উপস্থিত হইলেন। রুথকে তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাহ?"

পক্বকেশ বৃদ্ধ ইমামের কথা যেন দয়ায় ও বাৎসল্যে স্নিগ্ধ। রুথ বলিল, "আমি নিরাশ্রয়—আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছি।"

বৃদ্ধ একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে রুথের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন, "যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তিনি তোমার কল্যাণ করুন—কেহ তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় না। চল, মা, আমার গৃহে চল।"

রুথ তাঁহার অনুসরণ করিল।

তিনি যখন বৃহৎ গৃহের বাহিরের অংশ অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন মুয়াজ্জমের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া সে বলিল, "আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন; আমি কিন্তু ইহুদা।"

রুথের কথায় বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা বলিলে কেন?"

রুথ উত্তর দিল, "কি জানি, যদি মুসলমান মহিলারা ইহুদা বলিয়া ঘৃণা করেন!"

"মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার মানুষের নাই। সকল মানুষই এক আল্লার সৃষ্ট। আমার ধর্ম্ম আমার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে সে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিব—কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিব কেন?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ রুথকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে এক যুবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা, এই কন্যা আশ্রয় সন্ধান করিতেছে; ইহাকে আশ্রয় দাও।"

যুবতী আসিয়া যেরূপ সাদরে রুথের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে লইয়া গেল, তাহাতে রুথ বুঝিল, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান এ গৃহে নিত্যকর্ম্ম।

যুবতী রুথের বেশ ও দেহের অবস্থা দর্শন করিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিলেন, "রাবেয়া!" যুবতী উত্তর দিল, "মা, বাবা এক জন ইহুদাকে আনিয়াছেন—তাহার স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

মা নামিয়া আসিলেন, রুথকে দেখিয়া বলিলেন, "আহা! বাছার এ কি অবস্থা!"

তিনি দাসীকে ডাকিয়া এক প্রস্থ বেশ আনিতে আদেশ করিলেন। রাবেয়া রুথকে স্নানাগারে লইয়া গেল। তথায় উষ্ণ ও শীতল জল, সাবান, তোয়ালে—সব ছিল। দাসী বেশ লইয়া আসিলে রাবেয়া রুথকে বলিল, "তুমি ভাল করিয়া স্নান কর; দাসী দ্বারে থাকিবে—যদি কিছু দরকার হয়, চাহিয়া লইও—লজ্জা করিও না।"

যুবতীর কথার সরলতা ও স্নিগ্ধতা রুথের হৃদয় স্পর্শ করিল—সে পিতৃবক্ষচ্যুত হইয়া এত দিন কেবল নরকের পূতিগন্ধ ভোগ করিয়াছে, তাহার কাছে এই সরলতা ও স্নিগ্ধতা কত মধুর মনে হইল!

স্নান করিয়া বেশপরিবর্ত্তনান্তে রুথ যখন ঘরের বাহির হইল, তখন দাসী তাহাকে দ্বিতলে লইয়া গেল। তথায় রাবেয়া ও তাহার জননী তাহার জন্য ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন—ঘরে আরও কয় জন মহিলা ছিলেন। সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রুথ আহার করিল। সে কোথা হইতে আসিতেছে—কি অবস্থায় বাগদাদ সহরে নিরাশ্রয় হইয়াছে—ইত্যাদি প্রশ্ন কিন্তু কেহই করিলেন না। পাছে সেরূপ প্রশ্নে সে অসুবিধায় পড়ে, বোধ হয় সেই জন্যই কেহ অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করিলেন না।

আহারের পর হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য রুথ যখন বারান্দায় গেল, তখন সে শুনিতে পাইল, ঘরের মধ্যে মহিলারা বলাবলি করিতেছেন, "যে রূপ, আর যেমন ব্যবহার, তাহাতে

মনে হয়, বড় ঘরের কন্যা বা বধূ। কে জানে,অদৃষ্টের কোন্ কোপে পড়িয়া পরের গৃহে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে।"

রাবেয়ার একটি ছেলে অসুস্থ—তাহাকে সেই অসুস্থ পুত্রের কাছে থাকিতে হইতেছিল; তবুও সে বার বার আসিয়া রুথের সংবাদ লইতেছিল। মধ্যাহ্নে আহারের পর সে একটি ঘরে রুথকে লইয়া যাইয়া বলিল, "তুমি এই ঘরে থাক। বোধ হয়, গত রাত্রিতে ঘুমাইতে পার নাই—একটু ঘুমাও।"

সে চলিয়া গেলে রুথ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিল—শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ইহার পর সে কি করিবে? সে কোথায় যাইতে পারে? এক স্থান—বোম্বাই; তথায় তাহার পিতা আছেন। কিন্তু সেই দূরস্থানে সে কেমন করিয়া নিরাপদে পৌঁছিতে পারিবে?—সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার পর শঙ্কা যেন তাহার নিত্য-সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে অধিক সময় চিন্তা করিতে পারিল না—ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে যখন রুথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন ঘরের বাহির হইয়া সে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিল—সন্ধান লইয়া জানিল, রাবেয়ার পুত্রের অসুখ করিয়াছে—চিকিৎসক আসিয়াছেন। শুনিয়া রুথ চমকিয়া উঠিল—তাহার যে ভাগ্য! তবে কি সে-ই সঙ্গে করিয়া অমঙ্গল আনিয়াছে? তাহার মনের মধ্যে যে কথাটার উদয়ে সে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিল, বাড়ীর সকলের ব্যবহারে হয় ত তাহা কেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ভাবিয়া সে দারুণ শঙ্কানুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু রুথ আর স্থির থাকিতে পারিল না—যে কক্ষ হইতে অসুস্থ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। চিকিৎসকের কাছে গৃহের মহিলারা বোরকায় আবৃত না হইয়া বাহির হইতেছেন না—শিশুও তাঁহাদিগকে না দেখিয়া চীৎকার করিতেছে। রুথ যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। শিশু তাহার দিকে চাহিয়া—চাহিয়া দেখিল, তাহার পর দুইখানি কোমল—মাংসল হাত বাড়াইয়া দিল। রুথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল; তাহার পর তাহার সেবানিপুণ হাত তাহার গাত্রে ও মস্তকে বুলাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই বিরত-ক্রন্দন শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। চিকিৎসকের চিন্তাগম্ভীর মুখ প্রসন্ন হইল।

রুথ সেই যে শিশুকে লইয়া বসিল, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সেই ভাবেই তাহাকে লইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর শিশু জাগিল—তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। চিকিৎসক রাত্রির মত বিদায় লইলেন। রাবেয়া আসিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া রুথকে বলিল, "এইবার তুমি যাইয়া একটু বিশ্রাম কর।" তাহার মাতা রুথকে লইয়া যাইয়া আহার্য্য দিলেন।

শিশু কিন্তু রুথকে সন্ধান করিতে লাগিল—কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রুথকে আবার শিশুর কাছে আসিতে হইল। রাবেয়া ও রুথ সেই একই শয্যায় শিশুকে লইয়া শয়ন করিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে শিশু সুস্থ হইল। রাবেয়ার মা রুথকে বলিলেন, "বাছা, তুমি কি শুভক্ষণেই আসিয়াছিলে। তুমি না থাকিলে কি ছেলেকে বাঁচাইতে পারিতাম? জামাতা বিদেশে—আমি কেবল আল্লাকে ডাকিয়াছি, দয়া কর।"

পুত্রের এই অসুস্থতার সময় রাবেয়ার সহিত রুথের যে ঘনিষ্ঠভাব জন্মিয়া পুষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে সকল সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। এক দিন রাত্রিকালে—যখন গৃহের আর সকলে সুপ্ত, তখন উভয়ে যখন এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল—সেই সময় রাবেয়া বলিল, "ভগিনী, বাবা মা সকলেই বলেন, কোথায় তোমার কে আছেন, জানিতে পারিলে তাঁহাদিগকে আনাইয়া তোমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তুমি কি রাগ করিয়া আসিয়াছ?"

রুথ অশ্রুবাষ্পজড়িত স্বরে বলিল,"আমার কে আছেন? আমি যে পথের ভিখারী।"

"তোমার ব্যবহার দেখিলেই বুঝা যায়—তুমি তাহা নহ। অবস্থার কোন্ বিপর্য্যয়ে তুমি আশ্রয়হীনা, তাহা বলিতে যদি কোন আপত্তি থাকে, বলিও না। তুমি আমার পিতার গৃহে তাঁহার কন্যার মতই থাক।"

সব সঙ্কোচের বাঁধ ভাসিয়া গেল। রুথ তাহার সব কথা—দুঃখের সুদীর্ঘ ইতিহাস রাবেয়ার কাছে বিবৃত করিল। বলিতে সে যত কাঁদিল, শুনিতে রাবেয়া তত কাঁদিল।

রাবেয়ার পিতা রাবেয়ার কাছে রুথের ইতিহাস

শুনিলেন! বলিলেন, "আহা, অদৃষ্টে কি এত কষ্টও ছিল! কিন্তু যিনি মরুভূমিতেও স্বচ্ছসলিলধারা প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই ইহার পর সুখ দিবেন।"

আমীরের কথায় তিনি বলিলেন, "এই সব কুক্কুর পবিত্র ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ। বহুবিবাহরত আরবদিগের কাছে বিমল ধর্ম্মমত প্রচারের সময় তাহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া পয়গম্বর বলিয়াছিলেন বটে, পুরুষ এককালে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু চারি জনকেই তুল্যরূপ ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া তিনি যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বহুবিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। আর এই সকল নর পিশাচ আজ আকাশে যত তারা—সমুদ্রসৈকতে যত বালুকণা, তত বিবাহ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না! কোন্ নরকে ইহাদের স্থান হইবে? আর তুর্কী—তুর্কীর অভিজাত সম্প্রদায় বিলাসে মত্ত—তাহারা ধর্ম্মের শাসন অবজ্ঞা করে, আল্লাকেও ভুলিয়াছে। কবে তুর্কীতে এমন নেতার আবির্ভাব হইবে, যিনি অসিকরে এই সব অনাচার দূর করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনরায় স্থাপিত করিবেন!"

তাহার পর রুথের ভবিষ্যৎ কার্য্যের কথা আলোচিত হইল। সে বোম্বাইয়ে যাইবে—পিতার বক্ষে আশ্রয় পাইবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "মা, তুমি যেরূপ বিপদ্ ভোগ করিয়াছ,—তাহাতে তোমাকে আমি একা যাইতে দিতে পারি না। বোম্বাই সহরে আমাদের অনেক শিষ্য আছেন। তাই আমাদের পরিবারে বালকরা আরবীর সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের ভাষাও শিক্ষা করে। আমাদের পরিবারের এক জনকে তথায় প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতে হয়। এক জন সংপ্রতি আসিয়াছেন—আমার এক ভ্রাতা প্রায় এক পক্ষকালের মধ্যেই তথায় যাইবেন—তুমি তাঁহার সঙ্গে যাইবে।"

তাহাই হইল।

কিন্তু যাইবার সব স্থির হইলে, এই এক পক্ষকাল, ইহা রুথের কাছে কত দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবে রাবেয়ার সঙ্গে থাকিয়া, তাহার শিশুকে কোলে লইয়া সে একরূপ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

নারীর মাতৃহৃদয়ে যে স্নেহ স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে, সে স্নেহ এই শিশুকে উপলক্ষ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাই যাইবার দিন—তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে রুথ অশ্রু বর্ষণ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দায়ূদকে বিদায় দিয়া ফরিদা আমীরের প্রাসাদে ফিরিয়া গেল—নানা ষড়যন্ত্র কল্পনা করিতে করিতে গেল—কেমন করিয়া প্রতিশোধ লইবে। সে প্রাসাদে ষড়যন্ত্রের আব্-হাওয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া বৰ্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে যে সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল, সে সব ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্র। এবার তাহাকে বিরাট ষড়যন্ত্র করিতে হইবে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, পাপ যেমন মানুষের দৌর্ব্বল্যকে আকৃষ্ট করে, মৃত্যু যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাহাকে তেমনই প্রবল বলে আকৃষ্ট করিতেছিল। আমীর কিরূপ কুচক্রী ও কূটবুদ্ধি, তাহা সে জানিত। সে তাঁহাকে তাঁহারই অস্ত্রে পরাভূত করিবে। সে দেখিয়াছে, যে সওয়ারের আত্মশক্তিকে প্রত্যয় যত অধিক, সে তত দুষ্ট ঘোড়া বাছিয়া লইয়া তাহাতে চড়ে, তাহাকে শায়েস্তা করিবে। সে তেমনই সঙ্কল্প করিল, সে আমীরের সর্ব্বনাশ করিবে। আমীরকে হত্যা করা? সে ত তুচ্ছ ব্যাপার। আমীর আজ তাহাকে অপমান করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রহৃত কুক্কুর যেমন আবার প্রভুর পদতলে পতিত হইলে প্রভু তাহাকে আদর করে, সে-ও তেমনই আবার আমীরের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে। তাহার পর সেই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সে আমীরকে হত্যা করিতে পারে। তাহাতে বিশেষ বুদ্ধিরও প্রয়োজন হয় না। সে তাহা করিবে না—সে দেখাইবে, এই ঘৃণিত—অপমানিত দাসীপুত্রী আমীরের অপেক্ষা কত বুদ্ধিমতী। শীকার করিতে যাইবার পূর্ব্বে শীকারী যেমন করিয়া অস্ত্র শাণিত করে, সে তেমনই যত্নে বুদ্ধিতে শাণ দিতে লাগিল।

সে ফিরিয়া আসিয়াছে জানিয়া প্রধানা বেগম তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সে গেল না। তখন তিনি স্বয়ং তাহার ঘরে আসিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—রাগ করিতে নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমীরকে বলিব, তিনি রাগিয়া বড় অন্যায় কায করিয়াছেন।"

সে রাত্রিতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া ফরিদা

ভাবিতে লাগিল—সে কি করিবে? দায়ুদ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছে—রুথকে আমীর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ লইতে আসিবে। তখন সে তাহার সাহায্য করিয়াও কি তাহার হৃদয় জয় করিতে পারিবে না? কেন—সেও ত সুন্দরী। সে শয্যা ত্যাগ করিল—দর্পণের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। দীপের আলোক তত উজ্জ্বল নহে, দর্পণে সে আপনার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল না। সে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। যদি সে দায়ুদের হৃদয় জয় করিতে পারে, তবে—তবে—। তাহার কল্পনা কত আকাশ-কুসুমই রচনা করিতে লাগিল! একবার মনে হইল, রুথ সত্য সত্যই মরিয়াছে ত? সে আপনাকে আপনি বুঝাইল—সেই ক্ষুদ্র বাতায়নবিবর হইতে খরস্রোত টাইগ্রীসের জলে পড়িয়া সে কি কখন বাঁচিতে পারে? বাঁচিলে দায়ুদই তাহার উদ্ধার-সাধন করিত। কিন্তু এ কি রহস্য? সে কেবলই ভাবিতে লাগিল।

প্রধানা বেগম আমীরকে কি বলিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। তবে পরদিন প্রভাতে এক জন দাসী আসিয়া ফরিদাকে জানাইল, আমীর তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন—অর্থাৎ যাইতে বলিয়াছেন। ফরিদার প্রথম মনে হইল, বলে—সে যাইবে না। কিন্তু সেরূপ উত্তর দিবার ফল সে জানিত; সে ফল ভোগ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। সে আমীরের কাছে গেল। আমীর কয়টা স্বর্ণমুদ্রা লীরা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"তুই লইয়া যা, একটা ভাল পোষাক কিনিস্।"

ফরিদা দেখিল, আমীর একখানা মানচিত্র খুলিয়া মনোযোগ সহকারে কি দেখিতেছেন—তিনি আর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন না—তিনি কি ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন।

সেই দিন হইতে ফরিদা লক্ষ্য করিতে লাগিল, রাজধানী হইতে সংবাদ লইবার জন্য আমীরের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল; ডাক আসিলে তিনি বহুক্ষণ কেবল পত্রাদি পাঠে ব্যস্ত থাকেন; মানচিত্র খুলিয়া ডাকের পত্রে লিখিত কি সব মিলান; আর কোন কাযে তাঁহার মন নাই; তাঁহার মুখে চিন্তার নিবিড় ছায়া। ফরিদা বুঝিল, একটা কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিতেছে। হয় বিপদ—নহে ত সম্পদ। বিপদই হউক আর সম্পদই হউক, তাহাতে তাহার কোন সুবিধা হইবে কি? একজাতীয় পক্ষী আছে—যাহারা ঝড়বৃষ্টি ভালবাসে—একজাতীয় জীব আছে—অন্ধকারেই যাহাদের আনন্দ। আজ ফরিদারও মনে হইতেছিল, একটা বিষম বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার সুযোগ আসিবে।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আমীরের উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তাহার পর এক দিন সে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (ওয়ালী) আমীরের কাছে আসিলেন। দুই জনে রুদ্ধদ্বারে বহুক্ষণ পরামর্শ হইল। তাহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে গতায়াত বড় ঘন ঘন হইতে লাগিল। ফরিদা দেখিত, ওয়ালীর লোক প্রায়ই পত্রাদি লইয়া আইসে। সে লক্ষ্য করিল, আমীর যখন তখন সে মানচিত্রখানা খুলিয়া দেখেন, সেখানা খোলাই থাকিতে লাগিল, আর তাহাতে রেখার পর রেখা টানা হইতে লাগিল।

প্রাসাদে প্রকৃত ব্যাপারের কোন সন্ধান না পাইয়া ফরিদা এক দিন বাজারে গেল। প্রাচীতে সংবাদ যেন হাওয়ায় বহিয়া যায়—প্রথমে বাজারে তাহার আলোচনা হয়। প্রতীচ্য দেশবাসীরা ইহাতে বিস্ময়ানুভব করিয়া প্রাচীর কথায় বলেন—the whispering galleries of the East. বাজারে যাইয়া ফরিদা নানারূপ জিনিষ কিনিবার অছিলায় ঘুরিতে লাগিল। সে বুঝিল, একটা অশান্তির আশঙ্কা যেন গুমটের মত সব দিকে ছাইয়া আছে। লোক অনুচ্চ স্বরে পরামর্শ করিতেছে—কোন কোন দোকানী বহুমূল্য দ্রব্যাদি সরাইয়া লইয়াছে। লোকের কথার মধ্যে ফরিদা একাধিক স্থানে জার্ম্মাণীর নামটা শুনিতে পাইল। কিন্তু সে কিছু বুঝিতে পারিল না। জার্ম্মাণী কে?

গৃহে ফিরিয়া সে এক জন কর্ম্মচারীর কাছে গেল। মুখ তুলিয়া কর্ম্মচারী দেখিল—ফরিদা। সে বলিল, "কি ভাগ্য! তুমি কি মনে করিয়া?"

ফরিদা বলিল, "কেন, আমায় কি আসিতে নাই?"

"তাই ত বোধ হয়, গরীবের ঘরে কি রাজরাণীর পদধূলি পড়ে?"

"রাজরাণীর অদৃষ্ট লইয়াই জন্মিয়াছি বটে"—বলিয়া ফরিদা মৃদু হাসিল—চক্ষুর যে ভঙ্গী করিল, তাহাতে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইল।

ফরিদা বসিয়া বলিল, "বল ত জার্ম্মাণী কে?"

কর্ম্মচারী বলিল, "একটা দেশ। ঐ যে বাগদাদে রেল হইয়াছে, ও সেই দেশের রাজা করিয়াছেন। কেন বল ত?"

"আমি বাজারে গিয়াছিলাম, তথায় লোকের মুখে ঐ কথাটা শুনিতে পাইলাম।"

"কয় দিন হইতে লোক যেন কি একটা গুপ্ত কথার আলোচনা করিতেছে—বোধ হয়, একটা ঝড় উঠিবে।"

ফরিদা অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "তাহাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি? ঝড়ে উচ্চ মিনার পড়িয়া যায়—দরিদ্রের গৃহ বাঁচিয়া যায়; ঝড়ে উঁচু গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে, যষ্টিমধুর গুল্মে ঝাপটা লাগে না।"

কর্ম্মচারী একটু রহস্য করিয়া বলিল, "কিন্তু যাহারা বড় গাছ নহিলে আশ্রয় করে না, বড় গাছ পড়িলে তাহাদিগকেও পড়িতে হয়; যে পাখী মিনার নহিলে বাসা বাঁধে না—ঝড়ে ত তাহারও ভয় থাকে।"

"আমার সে ভয় নাই—আমি নিশ্চিন্ত আছি।"

প্রকৃতপক্ষে ফরিদা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না; পরন্তু তাহার চিন্তার শেষ ছিল না। সে কেবলই ভাবিত—কি ঘটিতেছে?

এই সময় এক দিন রাজধানীর পত্র পাঠ করিয়া আমীর আদেশ দিলেন—বাহিরের মহলের তুইটি অংশ ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে, রাজধানী হইতে আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মন্ত্রী আসিতেছেন। ফরিদার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় কখন এমন হয় নাই। আমীর যখন বাগদাদে আসিতেন, মন্ত্রী সাহিদ তখন রাজধানী ত্যাগ করিতেন না; তথায় তাঁহার উপর কার্য্যভার দিয়া আমীর বাগদাদে বিলাসে মগ্ন থাকিতেন। বিশেষ তাঁহার পুত্রদ্বয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অবধি তাহাদের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিবার ভার সাহিদের উপর ছিল। আমীর পুত্রদ্বয়কেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—বিশ্বাস তাঁহার ধাতুতে ছিল না। পুত্রদ্বয়ও অবিশ্বাসের ফলে অবিশ্বাসেরই উপযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু পিতাকে তাহারা চাতুরীতেও পরাভূত করিতে পারিত না।

সাহিদ যেমন চতুর, তেমনই প্রভুভক্ত। তাঁহার মত কদাকার পুরুষ ফরিদা কখন দেখে নাই। গল্প আছে, কোন আরব হস্তী দেখিয়া বলিয়াছিল, আল্লা জীবের মধ্যে প্রথম হস্তী গড়িয়াছিলেন, তখনও তাঁহার গঠনকৌশল জন্মে নাই; তাই হস্তী অত কদাকার। তেমনই সাহিদকে দেখিয়া লোক বলিত, কুম্ভকার যখন প্রথম মূর্ত্তি গড়িতে শিখে, তখন তাহার গঠিত মূর্ত্তি যেমন হয়, সাহিদ তেমনই। সাহিদের মস্তক কেশলেশহীন—মসৃণ। তিনি একচক্ষু; শীর্ণকায়—যেন চর্ম্ম দিয়া অস্থি আবৃত। মুখের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—বক্রাগ্র দীর্ঘ নাসিকা; তাহা রক্তাভ। পৃষ্ঠে একটি বৃহৎ কুঁজ। তাঁহাকে দেখিলে শিশুরা আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠে। তাঁহার মস্তিষ্কে শয়তানের বুদ্ধি—হৃদয়ে শয়তানের প্রবৃত্তি। তাঁহার এই পাপপ্রবৃত্তি—রিরংসার দৌর্ব্বল্য বাদ দিলে, তাঁহার আর দৌর্ব্বল্য—অসাধারণ প্রভুভক্তি। সেই জন্য তিনি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। প্রভুর সাফল্য সাহিদের বুদ্ধির উপর কতটা নির্ভর করে, তাহা প্রভুর অজ্ঞাত ছিল না। তাই আমীর যখনই রাজধানী হইতে বাগদাদে আসিতেন, তখনই রাজধানীর সব কাযের ভার সাহিদের উপর দিয়া আসিতেন। সেই সাহিদ সহসা রাজধানী ত্যাগ করিয়া বাগদাদে আসিতেছেন! নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে। ফরিদা চারিদিক্ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ফরিদা সাহিদের দৌর্ব্বল্য জানিত। রমণীমাত্রেই তাঁহাকে যেমন ঘৃণা করে, তিনি যে তেমনই রমণীরূপে আকৃষ্ট হয়েন—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। সে সাবধানে তাঁহার সান্নিধ্য পরিহার করিত। এবার সে মনে করিল, যদি প্রয়োজন হয়, সে তাঁহার দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া দেখিবে—বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী সাহিদের বুদ্ধি দাসীপুত্রী ফরিদার বুদ্ধির কাছে পরাভূত হয় কি না।

এ দিকে সে প্রতিদিন বাজারে যাইতে লাগিল। তথায় সে আর একটা সংবাদ সংগ্রহ করিল—নাজীম পাশা বাগদাদ সহরের বুক চিরিয়া একটা বড় রাস্তা করিতেছেন; সহসা এ রাস্তা করিবার প্রয়োজন কি? লোক বলাবলি করিতে লাগিল—এ সব যুদ্ধের আয়োজন—প্রশস্ত রাজপথ না পাইলে কামান ও সেনাদল গতায়াত করিবে কিরূপে? আবার বাগদাদবাসীরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দেখিতে লাগিল, আকাশে মধ্যে মধ্যে সামরিক বিমান—এরোপ্লেন—দেখা দেয়। সে বিমানের কলের গুঞ্জনশব্দ শুনিলে রাস্তায় ভীড় জমে, লোক ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সেই পতঙ্গাকৃতি

বিমান দেখে, গৃহচূড়া হইতে নারীরা বোরকা ফেলিয়া দিয়া তাহা লক্ষ্য করেন। তুর্কীর অধীন দেশে—ইরাকে ইরাণে হারেমের বড় কড়া নিয়ম; বিমান হইতে অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদিগকে দেখা যায়; তবুও যে তুর্কী-সরকার বিমান ব্যবহার করিতেছেন, তাহার কোন বিশেষ গূঢ় কারণ অবশ্যই আছে বলিয়া লোক সেই কারণ কি হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করে।

নির্দ্ধারিত দিনের প্রায় নির্দ্ধারিত সময়ে ফরিদা প্রাসাদের উপর হইতে দেখিতে পাইল, কয়টি অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র টাইগ্রীস নদীর সেতু পার হইয়া আসিতেছে। নিকটে আসিলে ফরিদা চিনিতে পারিল—সর্ব্বাগ্রে উৎকৃষ্ট আরবী অশ্বে আমীরের পুত্র। অশ্বটির ধূসরবর্ণ দেহে শ্বেত ফেন—সে গর্দ্দভের সহিত মন্দগতিতে আসিতে হইতেছে বলিয়া যেন কেবলই ঘাড় বাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া অধীরতা জ্ঞাপন করিতেছে। আরোহী দৃঢ়করে বল্গা ধরিয়া আছে। তাহার দেহ সুগঠিত; কিন্তু মুখে যৌবনশ্রীর উপর যেন বিলাস-ব্যসনজাত অবসন্নভাবের আবরণ পড়িয়াছে। ফরিদার মনে হইল—দায়ুদের মুখে কেবলই যৌবনশ্রী—সে শ্রী কেমন উজ্জ্বল, কত মধুর! সেই অশ্বের প্রায় পার্শ্বেই একটি গর্দ্দভ—গর্দ্দভের পৃষ্ঠে সাহিদ। ফরিদা ভাল করিয়া দেখিল। যে অস্ত্র আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি, প্রয়োজনবোধে ব্যবহার-কালে তাহা আর তত ঘৃণ্য মনে হয় না। তাই আজ ফরিদার মনে হইতেছিল—সাহিদকে সকল রমণী যত ঘৃণা করে, বুঝি তিনি বাস্তবিক ততটা ঘৃণার মত নহেন। ফরিদা নামিয়া আসিল।

দারুণ গ্রীষ্মে—পথের শ্রমে আমীরের পুত্র ও সাহিদ শ্রান্ত হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই আমীর সারদাব হইতে বাহিরে আসিলেন। কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া তিন জনে কি পরামর্শ হইল।

তাহার পর আগন্তুকরা বিশ্রাম করিতে গেলেন, আর আমীরের এক পত্র লইয়া এক জন বার্ত্তাবহ পরপারে ওয়ালীর কাছে গেল।

সন্ধ্যার পর ওয়ালী আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে এক জন তুর্ক যুবক—যুবকের বেশ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর। আমীর এই দুই জনকে এবং পুত্রকে ও মন্ত্রীকে লইয়া বাহিরে দরবারঘরে গমন করিলেন, আদেশ দিয়া গেলেন—কেহ যেন প্রাসাদের সে ভাগে আসিতে না পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতিথিদিগের জন্য কফী আনিতে ফরিদাকে আদেশ করিয়া গেলেন। ফরিদা যে সুযোগ সন্ধান করিতেছিল, তাহা যেন আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

রৌপ্যের থালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ালায় বাসি রক্তের বর্ণ কফী লইয়া ফরিদা যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন আগন্তুক সামরিক কর্ম্মচারী মানচিত্রের উপর অঙ্গুলী স্থাপিত করিয়া আমীরকে বুঝাইতেছিলেন; সাহিদের এক চক্ষুর দৃষ্টি তাঁহার অঙ্গুলীর গতির অনুসরণ করিতেছিল। ফরিদাকে দেখিয়া কর্ম্মচারী চুপ করিলে আমীর বলিলেন, "উহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন—আর ও এ সব বুঝিতে পারিবে না।" সাহিদ কিন্তু তাহার দিকে যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহাকে অবিশ্বাস। ফরিদা মনে মনে বলিল, "দেখিব, তোমাকে জয় করিতে পারি কি না।"

কফী দিবার অছিলায় যতক্ষণ থাকিলে সন্দেহ ঘটিবার কারণ হইবে না, ততক্ষণ সে ঘরে থাকিয়া ফরিদা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে যতক্ষণ ঘরে ছিল, ততক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া ছিল। তাহার মধ্যে সে একাধিকবার শুনিয়াছিল—যুদ্ধ।

আগন্তুকরা বিদায় লইবার পর আমীর বহুক্ষণ পুত্র ও সাহিদকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। রাত্রি গভীর হইলে, যখন মন্ত্রণা শেষ হইল, তখনই আদেশ প্রচারিত হইল—সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন।

এ আদেশ যে শুনিল, সে-ই বিস্মিত হইল।

[ক্রমশঃ।
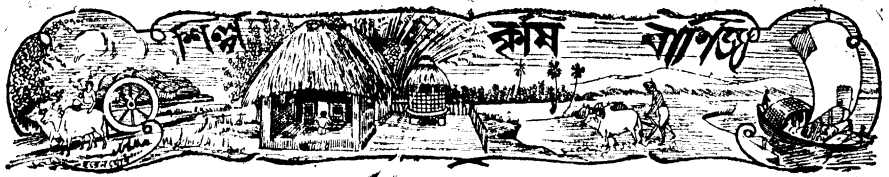
কাচের কথা

বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়ে' প্রথম কাচের কথা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে লিখা ছিল, ফিনিসীয় বণিকগণ মিশরের সমুদ্রকূলে বালুর উপর আপনাদের আহার্য্য রন্ধন করিবার জন্য কেলি-নামক এক প্রকার চারাগাছ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। পরে একটা কঠিন স্বচ্ছপদার্থ তাহারা উনানের তলায় দেখিতে পায়। ইহাই নাকি কাচের উৎপত্তির বিবরণ। সে যাহাই হউক, আধুনিক সভ্যতার উপাদানসমূহের মধ্যে কাচ যে অন্যতম, তাহা বোধ হয়, সকলেই মানিয়া লইবেন। শীতপ্রধান দেশে—যথায় শীতল বায়ু ঘরে প্রবেশ করান বাঞ্ছনীয় নহে, অথচ আলোক ও রৌদ্রের তাপ প্রয়োজনীয়, সে স্থানে সর্ব্বত্রই কাচের ব্যবহার দেখিতে পাই। সহজে ধুইয়া পরিষ্কার করা যায়, সহজে দাগ পড়ে না বা কলঙ্কিত হয় না, তাই কাচের আধার ও বাসন সভ্যসমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাচের আধার ভিন্ন বৈদ্যুতিক আলোক অসম্ভব হইত। কেরোসিন তৈলের বাতির আলোক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিতে গেলেও কাচের চিমনী দিয়া ঢাকা দিতে হয়। পূর্ব্বে যে স্থানে তৈলাধারে শৃঙ্খলপ্রদীপ ব্যবহৃত হইত, আজ সে স্থানে নানারঙ্গের কাচের ঝাড়লণ্ঠন শোভিত হইতেছে। নিজের প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য মানুষমাত্রেরই একটা স্বভাবসুলভ দৌর্ব্বল্য আছে। রমণীগণের প্রসাধনক্রিয়ায় মুকুরে প্রতিফলিত সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে কাচের দর্পণ আজকাল দীনদরিদ্রের গৃহেও স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানে মাটীর বা পাতরের ভাণ্ড ব্যবহৃত হইত, আজকাল কাচের শিশিবোতল সে স্থান অধিকার করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রারম্ভ হইতেই কাচ জিনিষটা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিত্যপ্রয়োজনীয় আধাররূপে স্থান পাইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সৌরজগতের চন্দ্রমণ্ডলের, এমন কি, কোটি কোটি যোজন দূরস্থিত নক্ষত্ররাজির অবস্থান ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এই কাচনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। য়ুরোপের সাধারণ নাট্যশালায় নাট্যামোদীমাত্রেই এক জোড়া অপেরাগ্লাস রঙ্গমঞ্চের নটনটীগণের হাবভাব আকৃতি-প্রকৃতি অবলোকন করিবার জন্য ব্যবহার করেন। এ দিকে জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌গণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম জীবাণুগণের আকার ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। বৃদ্ধবয়সে দৃষ্টিশক্তি জড়তাপ্রাপ্ত হইলে পঠনপাঠনে চশমা যেন নিত্যসহচর। আর আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফী বাঞ্ছিত, দয়িত, প্রিয়জনের মূর্ত্তি নিজের চক্ষুর সম্মুখে চিরস্থায়ী করিয়া রাখে। দূরদেশে প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তি, অচল পর্ব্বতশিরে শুভ্র তুষারকিরীট, সমুদ্রের সফেন উত্তাল তরঙ্গমালা, আলোকচিত্রসাহায্যে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ যে প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, সহস্র সহস্র লোক বায়োস্কোপে চলন্ত চিত্রাবলী দেখিবার জন্য ব্যগ্র, তাহাও এই কাচ আবিষ্কারের অন্যতম ফল। যে রঞ্জেন রশ্মি মনুষ্যদেহের চর্ম্ম-মাংসের নীচের অস্থি সাধারণ কঙ্কালের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাও এই কাচ আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। সমুদ্রতলগামী সবমেরিণ ও অর্ণবপোত যে পেরিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রবক্ষস্থিত পদার্থসমূহ যথাযোগ্য স্থানে অবলোকন করে, তাহাও কাচে নির্ম্মিত। বাস্তবিকপক্ষে যে সকল যন্ত্র বস্তুবিশেষকে দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রধান উপাদান কাচ। এই ত গেল মোটামুটি কাচের কয়েক প্রকার ব্যবহারের কথা। আধুনিক সভ্যতার মূলে, কাচের আবিষ্কার ও তাহার ব্যবহার কত বড় একটা স্থান অধিকার করিয়াছে, পাঠকমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তবে আজ আমি সাধারণ কাচ সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। আজ শুধু বীক্ষণযন্ত্রে (Optical Instruments) যে প্রকার কাচের ব্যবহার হয়, তাহার আবিষ্কার, নির্ম্মাণ ও গুণাবলী সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

এই বীক্ষণযন্ত্রের কাচের ইতিহাস মোটামুটি চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায় ;—

(১) প্রাথমিক চেষ্টা

(২) ১৭৮০—১৮৮৬ খৃঃ

(৩) ১৮৮৬—১৯১৪ খৃঃ

(৪) তৎপরবর্ত্তী কাল।

সাধারণ কাচে ও বীক্ষণযন্ত্রের কাচে প্রভেদ এই যে, বীক্ষণযন্ত্রের কাচ স্বচ্ছ ও এক খণ্ড কাচের সমস্ত স্থানই সমবিবর্ত্তনশক্তিযুক্ত (equal retractive index), বর্ণহীন, বায়ুবিন্দুশূন্য (free from air bubble) বিবর্ত্তন ও বিশ্লেষণ (dispersion) বুঝাইবার স্থান এ নহে। আশা করি, পাঠকবর্গ তাহার মলসূত্রগুলি জানেন।

১। প্রাথমিক চেষ্টা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বীক্ষণযন্ত্রের নির্ম্মাণাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। মহামতি গেলিলিও (Gallelio) পাডুয়া নগরে সুনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র চন্দ্রলোকদর্শনের জন্য প্রথম নির্ম্মাণ করেন। তদবধি নানা দেশের জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তবে সে সময় এই কার্য্যের জন্য অতি ক্ষুদ্র কাচখণ্ড পাওয়া যাইত। উপযুক্ত কাচের অভাবে দূরবীক্ষণের আয়তন ও প্রকাশিকা শক্তি বহু দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই এবং কাচের অভাবে হার্শেল প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ দুরবীক্ষণে ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহার করিতেন এবং যে কাচ পাওয়া যাইত, প্রজ্ঞাবান্ নিউটনও তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণবিষয়ে হতাশ হয়েন। ১৭৫৩ খৃঃ ডলণ্ড (Dollond) দূরবীক্ষণ ব্যবহারের উপযুক্ত কাচের অবয়ব ও বক্রতা অঙ্কপাত করিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তবে কাচের অভাব এই অঙ্ক কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। লণ্ডনে কলা-সমিতি (Society of Arts) ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাচনির্ম্মাণ-পদ্ধতির উন্নতিবিধানের জন্য এক পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ্-সমিতির (Royal Astronomical Society) কতিপয় সদস্য হার্শেল, ফারাডে ডলণ্ড ও রোজে (Rogete) বীক্ষণযন্ত্রের কাচনির্ম্মাণের বিশেষ অনুসন্ধান করেন। সে সময়ে সাধারণতঃ দুই জাতীয় কাচ এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। তাহাদের নাম ও গুণের কথা একটু বলা প্রয়োজন। প্রথমটি ফ্লিণ্ট কাচ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালীতে বালুর পরিবর্ত্তে স্ফটিকচূর্ণ (Quartz) ব্যবহার হইত। কাচ স্বচ্ছ, গুরুভার, অপেক্ষাকৃত অধিক বিবর্ত্তনশালী এবং অধিকতর বিশ্লেষণশক্তিসম্পন্ন হইত। দ্বিতীয়টি ক্রাউন গ্লাস্—৭৮ ফুট লম্বা একটা লৌহের নল নরম গলা কাচে ডুবাইয়া সাবধানে উঠাইয়া লওয়া হইত। যে কাচ এই সঙ্গে উঠিয়া আসিত, তাহা প্রথমে ফুঁ দিয়া একটা বড় বাতাসার মত করা হইত; তৎপরে একবার গরম করিয়া ও ফুঁ দিয়া ক্রমে একটা বড় ভাঁড়ের মত হইত। এই ভাঁড়ের মাথাটা গলাইয়া ফেলিয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিলে যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিত, তাহার আকার কতকটা সেকালের রাজাদের মুকুটের মত দেখিতে হইত। এই জন্য ইহার নাম ক্রাউনগ্লাস। পুনরায় গরম করিয়া দ্রুত ঘুরাইলে কাচের উপরিস্থ অংশ চ্যাপ্টা হইয়া সাধারণতঃ আধ ইঞ্চ পুরু একটা থালার মত দাঁড়াইত। যন্ত্রনির্ম্মাণকারিগণ কাচের কারখানা হইতে এই সব ক্রাউন কাচের থালা ক্রয় করিত। আর একটা প্রভেদ এই ছিল, ক্রাউন কাচনির্ম্মাণে চূণের পাথরের গুঁড়া ও ফ্লিণ্ট কাচনির্ম্মাণে মেটেসিন্দুর (Red lead) ব্যবহৃত হইত। তবে ইহা সহজেই বুঝা যায়, এইভাবে নির্ম্মিত থালার সব স্থান কখনই সমগুণসম্পন্ন হইতে পারে না। সেজন্য সে কালের যন্ত্রশিল্পিগণ, সাড়ে তিন ইঞ্চ ব্যাসের অধিক কাচের লেন্স (Lens) প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

২। ১৭৮০—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সুইট্জারলণ্ডে ক্ষুদ্র পল্লী ব্রেণেতে (Brenet) পল লুই গিনাণ্ড (Paul Louis Guinand) হঠাৎ ৯ ইঞ্চ ব্যাসের একখণ্ড সুন্দর নির্দ্দোষ কাচ তৈয়ারী করিয়া তৎকালীন-বৈজ্ঞানিকগণকে একটু বিস্মিত করেন। বেভেরিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাউন হোফার (Fruan Hofer) বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ পরিচিত। সূর্য্য-রশ্মির বিশ্লেষণে তিনি এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও বীক্ষণ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গিনাণ্ড ও ফ্রাউন হোফার মিউনিক্ সহরে এক কারখানা করেন ও সেই কারখানা হইতে জ্যোতির্ব্বিদগণকে অনেক কাচ দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর

ধরিয়া উভয়ে এই নির্ম্মাণপদ্ধতির রহস্য বেশ সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গিনাণ্ডের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে ইহার রহস্য তিনি শিখাইয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র হঁারি গিনাও (Henri Guinand) প্যারিসে তাঁহার ভগিনীপতির বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন ও প্যারিসের নিকটবর্ত্তী সোয়াজিলে-রোয়া (Choisoi-le-roi) পল্লীতে বোঁতাঁর (Bontemps) সহিত মিলিত হইয়া এক কারখানা করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই কারখানায়, এমন কি, ১৪ ইঞ্চ ব্যাসেরও কাচ প্রস্তুত হয়। পরে গিনাও এই কারখানা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ভগিনীপতি ফইয়ের (Feil) সহিত একযোগে নূতন কারখানা খুলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক আরাগোর (Arago) প্রবর্ত্তনায় প্যারিস একাডেমী (Academi de Paris) হইতে গিনাওকে কাচ নির্ম্মাণের জন্য লালণ্ডে (Lalende) স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। সেই বৎসরই জাতীয় শিল্প-প্রবর্ত্তনী সমিতি (Societe D' Encouragement Pour L' Industrie Nationale) হইতে ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার উৎকৃষ্ট ক্রাউন কাচের নির্ম্মাণকারীকে দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই দুই পুরস্কার গিনাও, ফই ও বোঁতাঁ তিন জনে পায়েন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বোঁতাঁ রাজনীতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া ফরাসীদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বারমিংহামে চান্স ব্রাদার্সের (Chance Brothers) সহিত যোগদান করেন। চান্স ব্রাদার্সের উন্নতি এই বোঁতাঁর যোগদানের ফল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের প্রদর্শনীতে চান্স ব্রাদার্স সাড়ে ৭ মণ ওজনের ও ২৯ ইঞ্চ ব্যাসের দুরবীক্ষণযন্ত্রের উপযোগী একখণ্ড ক্রাউন ও একখণ্ড ফ্লিট কাচ প্রদর্শন করেন। প্যারিস মান-মন্দিরের কর্ত্তারা এই ২ খানি কাচ ক্রয় করেন। আপাততঃ যদিও এই দুই খণ্ড কাচ অতি স্বচ্ছ ও নির্দ্দোষ ছিল, কিন্তু পরে নাকি কর্ত্তৃপক্ষরা তাহাতে বিশেষ সন্তোষজনক ফল পায়েন নাই।

মিঃ গিনাও।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভিনার (Vienna) প্রদর্শনীতে গিনাও ও ফই কোম্পানী ২০ ইঞ্চ ব্যাসের ৫ মণ ওজনের কাচখণ্ড প্রদর্শন করিয়া বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানসূচক পদক প্রাপ্ত হয়েন। প্যারিসের সন্নিকটে ক্লিষি নগরীতে মে এবং ক্লেমাড়ো (Maes et Clemendot) একটি ছোট কাচের কারখানা করিয়া কাচনির্ম্মাণে সোহাগার ব্যবহার প্রথম আরম্ভ করেন। ইঁহাদের কাচ অতিশয় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হওয়ায়, এই তথ্যের সন্ধান পাইয়া অনেকেই ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত ফই সোহাগা ব্যতীত ব্যারাইটিস্ (Barytes) ব্যবহার করেন, তাহাতে কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও বিবর্ত্তনী শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্যবহারাজীব মাঁতোয়া (Etiene-ch-Ed, Mantois) ফই (Feil) এর কারখানায় বখরাদার হিসাবে যোগদান করেন এবং রাসায়নিক ভেরনই (Vernouil)কে কাচ-নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা ও গবেষণার জন্য নিযুক্ত করেন। তাহার ফলে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাচ সৃষ্ট হয়। ঠিক এই সময়েই মাঁতোয়ার ভগিনীপতি "পারা" (M. Numa Parra) তাঁহার কার্য্যে যোগদান করেন। এই হইল সুবিখ্যাত "পারা মাঁতোয়ারা" নামক ফরাসী দেশের কাচের কারখানার সৃষ্টির কথা। ইঁহারা এতাবৎকাল সভ্যজগতের বহু মান-মন্দিরের দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের কাচনির্ম্মাণ কার্য্য অনেকটা একচেটিয়া করিয়া আসিতেছিলেন।

৩। ১৮৮৬—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাচনির্ম্মাণে বাস্তবিক একটা নূতন যুগ উপস্থিত হইল। অণুবীক্ষণ যন্ত্র-ব্যবহারীর নিকট অধ্যাপক আবের (Prof Abbe) নাম সুপরিচিত।

তিনিই যেনা (Jena) সহরে বিখ্যাত কার্ল সহিসের (Carl Zeirs)এর কারখানায় এই অণুবীক্ষণযন্ত্রের উন্নতিকল্পে ১০ বৎসরব্যাপী গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম করেন। তাহার ফলেই বর্ত্তমান অণুবীক্ষণযন্ত্রের উৎপত্তি। জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌গণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌গণের জন্য তিনি এক নূতন ধরণের অণুবীক্ষণযন্ত্রের অবজেক্‌টিভ (Objective) নির্ম্মাণের ব্যবহারের অঙ্কপাত করিতেছিলেন। ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল কয়েক রকম ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন কাচ। তিনি সেই জন্য জার্ম্মাণ দেশীয় ও অন্যান্য দেশীয় কাচনির্ম্মাতৃগণকে সেই প্রকার কাচ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন।

ঠিক সেই সময়ে জার্ম্মাণীর বেষ্টফালিয়া (Westphalie) প্রদেশের ভিটেন (Witten) নগরের ডাক্তার ষট (Schott) কাচ নির্ম্মাণ ও কাচের দোষ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তিনি নিজে যেনায় আসিয়া অধ্যাপক আবেকে স্ব-নির্ম্মিত কয়েক খণ্ড কাচ প্রদর্শন করেন। বহু আশা করিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাহার নির্ম্মিত নূতন বিবর্ত্তন ও বিশ্লেষণ পরীক্ষা-যন্ত্রের (Abbe Refractometer) দ্বারা তাহার গুণ পরীক্ষা করেন। ফলে কিন্তু প্রকাশ পায় যে, তিনি যে গুণসম্পন্ন কাচ চাহিতেছিলেন, সে কাচগুলি ঠিক তাহার বিপরীত গুণ-সম্পন্ন। হতাশ না হইয়া ডাক্তার ষট (Schott) এবং অধ্যাপক আবে দুই জনে সম্মিলিত হইয়া নূতন নূতন কাচনির্ম্মাণ-কল্পে ধারাবাহিক গবেষণার জন্য, একটা পরীক্ষাগার স্থাপন করেন (Glasstchnische, Laboratorium) এবং অল্পদিনের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রার্থিত ও অপ্রার্থিত গুণ-সম্পন্ন কাচনির্ম্মাণ করেন। সেই হইতে যেনার বিখ্যাত কাচনির্ম্মাণাগার স্থাপিত হয়। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের শীঘ্র শীঘ্র বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল, এবং প্রায় দ্বিশতাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাচ, ইঁহারা যন্ত্র নির্ম্মাণ-কারিগণের হস্তে দিলেন।

মিঃ আবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাচনির্ম্মাণের এই সামান্য ইতিহাস। তবে ধরিতে গেলে, গিনাণ্ডের (Guinand) সময়ে যে পদ্ধতি ছিল, আজিও তাহাই আছে। চুল্লীতে পূর্ব্বে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত, ক্রমে কয়লা তাহার স্থান অধিকার করিল। কয়লা হইতে গ্যাসের (Producer Gas) প্রচলন হইল। এখন আবার এই গ্যাসকে শোধিত করিয়া চুল্লীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তাহার পর তরল কাচকে আলোড়ন ও সঞ্চালন করিবার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহার চলন হইয়াছে।

৪। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ এবং তৎপরিবর্ত্তী কাল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যন্ত্র-শিল্পিগণ তাঁহাদের ব্যবহারের শতকরা ৬০ ভাগ কাচ জার্ম্মাণী ও ৩০ ভাগ ফরাসী দেশ হইতেই আমদানী করিতেন। যেমন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের ঘোষণা হইল, সেই সঙ্গে যুদ্ধোপকরণ নানা প্রকারের বীক্ষণ-যন্ত্রের, অভাব হইল। এ দিকে ফরাসী দেশ তাহাদের বাহিনীর জন্য ও রুষ বাহিনীর জন্য

কাচের যোগান দিতে লাগিল। তাহাতেও তাহারা যে সম্পূর্ণ পারগ হইয়াছিল, তাহাও নহে। ইংলণ্ডের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয় হইল। একা চান্স ব্রাদার্স (Chance Bros.) কত করিবে? ফ্রান্সে স্যাঁ গোবান কোম্পানীরা (St. Gobain Compagnie) বাইনো (Bagneaux) নামক প্যারিস হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে ফোঁতাব্লোর (Fontanibleau) নিকট একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিলেন। তাহাতে যাহাতে প্রত্যহ ৩০ মণ কাচ প্রস্তুত হয়, তাহার সরঞ্জাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইংলণ্ডে ডারবি সায়ারে (Derbyshire) ডারবি ক্রাউন গ্লাস কোং নামক নূতন কোম্পানী খুলা হইল, সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাচ নির্ম্মাণ-কল্পে নূতন বিভাগ খুলা হইল। ডার্বি কোম্পানীর তরফে ডাক্তার পেডল (Dr. C. J. Pe d dle) কাচ-তথ্য সম্বন্ধে প্রায় ৮ বৎসর ধরিয়া নানা গবেষণা করিতেছেন এবং শতাধিক ভিন্ন ধরণের কাচও ইঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কাচের কারখানা।

নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে গোটাকতক কথা।

১। প্রত্যেক কাচের একটা নির্দ্দিষ্ট বিবর্ত্তনশক্তি থাকিবে এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বিবর্ত্তনশক্তি অন্ততঃ চারিটি বর্ণের (লাল, কমলা, সবুজ ও নীল) নির্দ্দিষ্ট আলোক স্পন্দন রেখায় (wavelength C. D. F. G.) নির্ণীত হইবে।

২। কাচে কোন প্রকার বায়ুবিন্দু থাকিবে না।

৩। কাচের মধ্যে সূত্রাকার বা শিরাকার দাগ থাকিবে না।

৪। ২ ইঞ্চ স্থূল কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে কোন রকম রং দেখা যাইবে না এবং তাহা স্বচ্ছ হইবে।

৫। সাধারণ হাওয়ায় বা ভিজা বাতাসে, এমন কি, জলের ছিটায় কাচে কোন দাগ হইবে না।

৬। কাচ খুব কঠিন হইবে না। শীঘ্র অল্প পরিশ্রমে কাটা, ঘষা ও পালিশ করা যাইবে।

৭। কাচের উপাদানগুলি এমন হওয়া চাই যে, গলাইলে সহজে মিশ খাইয়া বেশ তরল হয়।

ফ্লিণ্ট কাচ তৈয়ারী করিতে হইলে উৎকৃষ্ট বালি, মেটেসিন্দুর, সোডা, পটাশ ও সোরা প্রথমে বেশ ভাল করিয়া মিশান হয়। ক্রাউন কাচে মেটেসিন্দুরের পরিবর্ত্তে চুণাপাতরের গুঁড়া দিতে হয়। বেরিয়ম্ ক্রাউন কাচে বেরিয়ম্ কারবনেট্, বোরো ক্রাউন কাচে সোহাগার গুঁড়া প্রয়োজনীয়। ভাগের কথা—মোটামুটি ৭০ ভাগ বালি, সোডা ও পটাশে মিশিয়া ২০ ভাগ, বাকিটা মেটেসিন্দুর বা অন্য কোন উপাদান। একটা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যেন লৌহজ কোন পদার্থের সংস্রবে না আইসে। লৌহজ পদার্থের সংস্পর্শে আসিলেই কাচে একটা সবুজ রং হইয়া যায়। সাধারণ বোতলের কাচ বা জানালার কাচ এই লৌহজ পদার্থ থাকার জন্য সবুজ রঙ্গের দেখা যায়।

যে মুচিতে এই সকল উপাদান গলান হয়, সেটা এমন জিনিষে গঠিত করান প্রয়োজন যে, তাপে ফাটিয়া না যায়; আর কাচের উপাদানগুলির সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণে সমস্ত কাচকে দূষিত না করে। এই মুচি প্রস্তুত
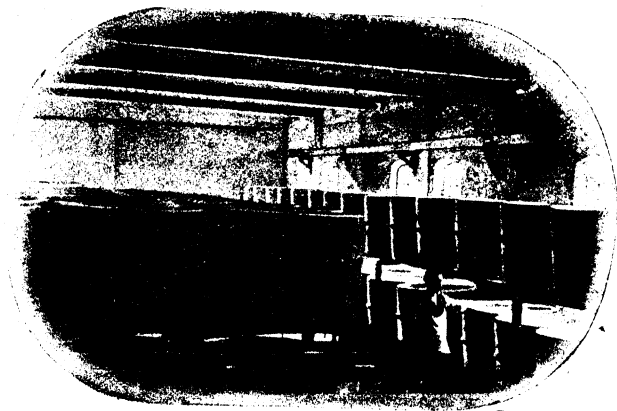
মুচি শুকান হইতেছে

হইতে বিন্দু বিন্দু গ্যাস বাহির হইতে থাকে। যখন জলের মত পাতলা হয়, তখন যে মসলাতে মুচি তৈয়ারী হয়, সেই মসলার হাতখানেক লম্বা একটা দণ্ড দিয়া কাচকে আলোড়ন করা হয়। আলোড়নের পূর্ব্বে উপরে যে সকল গাদ উঠে, তাহাও তুলিয়া ফেলিতে হয়। দণ্ড পাছে গলিয়া যায়, সেই জন্য তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জলের নল চালান থাকে এবং একটা বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঠিক দুগ্ধমন্থনের মত সেই তরল কাচকে মথিত করা হয়। ৬৷৭ ঘণ্টা অনবরত এইরূপ মন্থনের পর কাচ হইতে আর কোন প্রকার গ্যাসবিন্দু উঠে না। তখন মন্থনদণ্ড তুলিয়া লওয়া হয়।

করা, ইহার উপাদান ঠিক করা, কাচ-নির্ম্মাতৃগণের বহু অভিজ্ঞতার ফল। এই সকল মুচি দেখিতে অনেকটা বড় কৌটার মত হয়। ব্যাস প্রায় দুই ফুট, দলে প্রায় ২ ইঞ্চ পুরু হয়। এই সকল মুচি তৈয়ারীর পর প্রায় এক বৎসর ধরিয়া একটা সমশীতল ঘরে ধীরে ধীরে শুকাইবার জন্য রাখা হয়।

কাচ গলাইবার পূর্ব্বে, মুচিকে প্রায় ২৪ হইতে ২৬ ঘণ্টাকাল চুল্লীর মধ্যে রাখিয়া ধীরে ধীরে তাতান হয়। যখন তাতিয়া প্রায় সাদা হইয়া উঠে, তখন তাহাকে যত্নে টানিয়া আনিয়া আসল কাচ গলাইবার চুল্লীর মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে বড় কয়লা দেওয়া চামচের মত চামচে করিয়া কাচের উপাদানগুলি অল্পে অল্পে মুচিতে দেওয়া হয়।

উপাদানগুলি গলিয়া কাচ হইতে প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টা সময় লাগে। যেমন গলিতে থাকে, উহা

ঠাণ্ডা করা।

এইবার মুচিকে ঠাণ্ডা করা হয়। চুল্লীর তাপ প্রথমটা বেশ তাড়াতাড়ি কমাইয়া দেওয়া হয়। কাচের মুচির রাসায়নিক ক্রিয়া—যত বেশীক্ষণ কাচ তরল অবস্থায় থাকে,
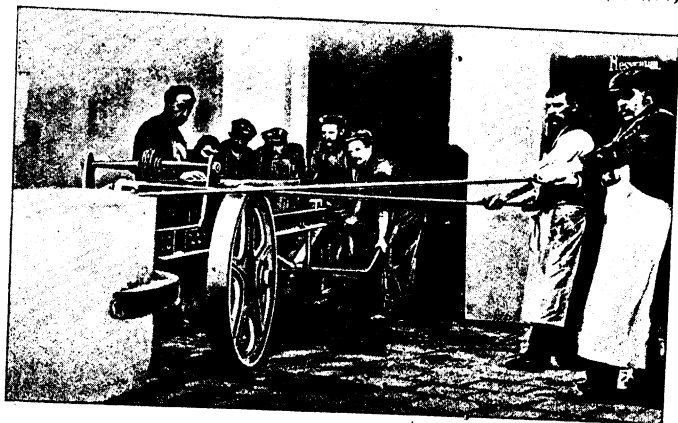
কাচ গলাইবার চুল্লির মধ্যে মুচি দিতেছে।

তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য প্রথমে শীঘ্র ঠাণ্ডা করিলে রাসায়নিক ক্রিয়াটাও বন্ধ হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিতে হয়। খুব ধীরে ধীরে করা চলে না। কেন না, অনেক সময় খুব ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে, কাচের কোন কোন উপাদান আসল কাচ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। আবার শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা করিলে কাচ ফাটিয়া ছোট ছোট টুকরা হইয়া যায় ও যন্ত্রনির্ম্মাণকার্য্যের অনুপযোগী হয়। তাই প্রত্যেক কাচের পক্ষে ঠাণ্ডার সময়টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হয়।

মুচিভাঙ্গা ও কাচের পরীক্ষা।

যখন মুচিটা বেশ ঠাণ্ডা হয়, তখন সেটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। দেখা যায় যে, কাচটা ফাটিয়া স্থানে স্থানে চৌচির হইয়া গিয়াছে।

এখন এক জন লোক একটা হাতুড়ি লইয়া কাচ ভাঙ্গিয়া ভালমন্দ বাছাই করে। ধারের কাচটা স্বভাবতই বাদ যায়। মধ্যের কাচের ছোট ছোট টুকরাও বাদ যায়। যে স্থানে বায়ু-বিন্দু থাকে বা ভাল মিশান না হয়, সেই সব অংশও বাদ দিতে হয়। এইরূপে এক শত ভাগ কাচের মধ্যে যদি চল্লিশ ভাগ ভাল কাচ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই চালানটা বেশ উতরাইয়াছে মনে করা হয়। কাযেই ষাট ভাগ বাতিল হইবে, ইহা কারিগরমাত্রেই ধরিয়া লয়।

ভাঙ্গা মুচি।

কাচের উপাদান মুচিতে দেওয়া হইতেছে।

কাচ ঢালাই।

এই টুকরা কাচ লইয়া সাধারণতঃ চৌকা চৌকা পাত্রে রাখা হয়। এ পাত্রগুলিও, মুচি যে মসলায় প্রস্তুত, সেই মসলায় গঠিত। কাচের টুকরাগুলি ওজন করিয়া যাহার যেমন ওজন, সেই রকম নানা মাপের পাত্রে রাখিতে হয়, যাহাতে কাচ নরম হইয়া এই ছাঁচের গর্ত্তটা সম্পূর্ণরূপে

কাচ ভাঙ্গা।

টান থাকিয়া যায়। এই টান থাকিলে কাচ অনেক সময় বিনা কারণে ফাটিয়া যায় এবং যে যায়গায় টান থাকে, তাহার বিবর্ত্তনী শক্তি অন্য যায়গা হইতে পৃথক্ হয়। সেজন্য সে কাচ বীক্ষণযন্ত্রে ব্যবহারের উপযোগী হয় না। তাই পুনরায় সেই কাচগুলিকে লইয়া সাধারণতঃ একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহে উত্তপ্ত চুল্লীতে সপ্তাহখানেক ধরিয়া ধীরে ধীরে গরম করিয়া এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া টান ছাড়ান হয়। যখন টান আর না থাকে, তখন ইহা যন্ত্র-নির্ম্মাতৃগণের উপযোগী হয়।

খুব সঙ্ক্ষেপে বীক্ষণ-যন্ত্রের উপযোগী কাচের নির্ম্মাণের ইতিহাসের আভাস মাত্র দিলাম। পাঠকমাত্রই বুঝিতে

ভরিতে পারে। এইবার ছাঁচগুলি লইয়া একটা বড় লম্বা চুল্লীর একদিকে দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে চুল্লীর ভিতর ঠেলিয়া দেওয়া হয়। চুল্লীর মধ্যভাগটা বেশ গরম থাকে। এই স্থানে যখন ছাঁচগুলি আইসে, তখন কাচ নরম হইয়া ছাঁচের মধ্যে ঠিক মোমের মতন বসিয়া পড়ে। তাহার পর কাচগুলি যেমন অপর দিকে আসিতে থাকে, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে থাকে।

দ্বিতীয় বারের পরীক্ষা।

ছাঁচ হইতে এই চৌকা কাচ বাহির করিয়া লইয়া তাহার দুই দিক্ ঘষিয়া পালিশ করিয়া স্বচ্ছ করা হয়। মোটামুটি প্রথমে কাচের ভিতর দিয়া দেখা হয়, তাহার পর পলারিজ্‌স্কোপ (Polarisoscope) যন্ত্রের সাহায্যে কাচের ভিতর টান (strain) আছে কি না, পরীক্ষা করা হয়।

উপরে উক্ত পরীক্ষা-ফলে কাচের অন্য দোষ না থাকিলে শীঘ্র ঠাণ্ডা করিবার জন্য কাচের ভিতর একটা

কাচের টুকরা পাত্রে রাখা হইতেছে।

কাচ পরীক্ষা।

পারিবেন, কাচ নির্ম্মাণ সোজা ব্যাপার নহে। আমাদের দেশে সাধারণ শিশি-বোতলের ও ল্যাম্পের চিমনী গঠিত করিবার কয়েকটি মাত্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহাতে দেশের অভাবের শতাংশও মোচন হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত একটি কারখানাও হয় নাই, যাহাতে জানালায় ব্যবহারের কাচপাত (Plane Glass) হয়। এ দিকে দেশের লোকের কাচের ব্যবহার প্রতিদিন বাড়িতেছে। কাচনির্ম্মাণের মসলা এ দেশে যে নাই, তাহা নহে, তবে হয় ত সেই সব মসলা ও কয়লা এবং বিক্রয়ের স্থান দুর্ভাগ্যক্রমে একস্থানে মিলে না। আমি য়ুরোপে যে কয়েকটি কারখানা দেখিয়াছি, তাহাদেরও সব উপাদান এক জায়গায় পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকের দৃষ্টি এ দিকে যে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে। তবে, জনসাধারণের জ্ঞান এত কম যে, হয় ত সব দিক্ না ভাবিয়া কারখানা করিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। ফলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হয়। অন্ততঃ দুই পাঁচটি কারখানা অর্থকরী না হইলে,দেশের লোক অর্থ দিয়া নূতন কারখানা করিতে কেনই বা ভরসা পাইবেন? য়ুরোপে এই সব কারখানায় সে দেশের বৈজ্ঞানিক এবং এঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় এবং কাচনির্ম্মাণকারিগণ তাহা প্রার্থনাও করেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে, আমাদের এ সব বিষয় চর্চ্চা করিবার অর্থ জুটে না।
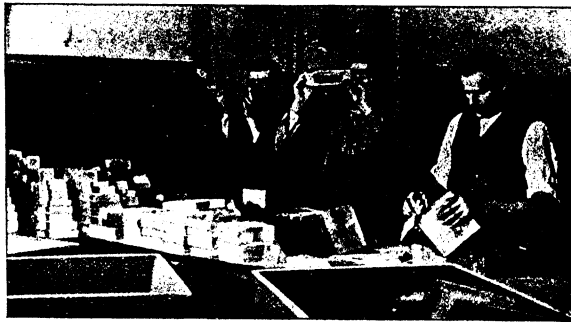
১০।১২ লক্ষ টাকার চশমার কাচ ও তৈয়ারী চশমা আমরা বৎসর বৎসর আমদানী করিয়া থাকি। শিশি-বোতলের ত কথাই নাই। জানালার কাচের উল্লেখ অনাবশ্যক। এ সকল অভাবমোচনের জন্য আমরা অন্যের দ্বারে ভিখারী,—ইহাই আমাদের অবস্থা। ইহা কি ভাবিবার কথা নহে?

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিলাতে নবনিযুক্ত হাই কমিশনার

শ্রীযুক্ত দালাল ও তাঁহার পত্নী।

৩২

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া উঠিব মনে করিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার সহিত আহার শেষ করিতে গিয়াও আবার শুনিলাম, "অম্বিকাচরণ!"

গুরুদেব একেবারেই আমার ঘরের দুয়ারে হাজির!

"উঠো না বাবা, আহার শেষ ক'রে নাও। মায়ের কাছে শুন্‌লুম, সমস্ত দিন তোমার পেটে অন্ন পড়েনি। খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা করছি।"

তাঁর আদেশসত্ত্বেও আর আমার পেটে কিছুই প্রবেশ করিতে চাহিল না।

দুই একটা মিষ্টান্ন নাকে-মুখে গুঁজিবার মত করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আরও যেন দুই চারিটা পায়ের শব্দ আমার কানে গেল। তবে বুঝি, আমার গৌরী-মাকে কোলে করিয়া ভুবনের মা ফিরিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি—কোথায় গৌরী? গুরুদেবের পশ্চাতে বারান্দার একটা থাম ধরিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়াইয়া যোগিনী-মা। কেমন যেন তাঁহার একটা পাগলের মত ভাব। মাথার সেই কেশরাশি অর্দ্ধেকের উপর যেন, তাঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছে।

আমি নির্ব্বাক্, গুরুদেবের মুখেও, কি জানি কেন, কথা নাই। তপস্বিনীর মুখে কোনও কালে যে কথা ছিল, দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বিষাদ এমন গভীরভাবে হঠাৎ আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে যে আমি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া গুরুকে প্রণাম করিব, তাহাও পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি।

যোগিনী-মাই প্রথমে কথা কহিলেন—"এইবারে আমাকে যেতে অনুমতি কর, বাবা!"

"কেন গো মা, ছেলে ডাগর হয়েছে ব'লে, তার ভার নিতে কি তোর বিরক্তি বোধ হচ্ছে?"

"তুমি ত সব জানো বাবা! ফিরে আসছি ব'লে, সেই সকালবেলায় সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে চ'লে এসেছি। এখনো ফির্‌তে পার্‌লুম না, তার যে ব্যাকুল হ'বার কথা!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়াই, বেশ একটু বিরক্তিভাবেই গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি মাকে রাজমোহনের স্ত্রীর কথা কিছুই বলনি অম্বিকাচরণ?"

অপরাধীর মত আমি মাথা হেঁট করিলাম।

"হাত ধুয়ে ফেল।"

একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই, যোগিনী ব্যস্ততার সহিত কমণ্ডলু ও একখানা গামছা লইয়া আমার সেবা করিতে আসিলেন।

হেঁটমুণ্ডেই আমি তাঁহাকে পাত্র রাখিতে অনুরোধ করিলাম।

"দোষ নেই বাবা, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।"

গুরুদেব পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—"সঙ্কোচ কেন, মা জল দিচ্ছেন, নাও না। তোমার এই অনর্থক সঙ্কোচের জন্য আমাকে কি দু' ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে?"

শিষ্ট বালকটির মত আমি যোগিনী-মা-দত্ত জলে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিলাম।

হাত-মুখ মুছিয়া, যেই গামছাখানি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি, অমনি আমার দুইটি পায়ে কমণ্ডলুর অবশিষ্ট জল ঢালিয়া, গামছার ভিতরে যেন কতকালের স্নেহ পূরিয়া—কি কোমল করপল্লব—অতি ধীরে, পাছে যেন আমার পায়ে লাগে, মুছাইতে লাগিলেন!

গুরু নিকটে, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াও, প্রতিবাদ করিতে

আমার সাহস হইল না। দয়াময়ীকে মনে পড়িল। কোনও দূরস্থান হইতে ঘরে ফিরিলে, সেও অতি আগ্রহে এইরূপই আমার সেবা করিত।

দয়াময়ীর কথা মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল! তাহার দুই এক ফোঁটা কি মায়ীজীর মাথায় পড়িল? যদিই পড়ে, তাহার কি এতই ভার যে, মায়ের মাথা আমার পায়ের নিকট পর্য্যন্ত নত হইয়া গেল?

কিছু হউক আর না হউক, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মাতৃমূর্ত্তি, আর সেই কত-কালের না-দেখা সেই স্নেহের প্রতিমা—দুইটিতে পরস্পরে বাহুপাশে জড়াইয়া আমার সরস-চোখের উপরই যেন এক হইয়া গেল। মিলিয়া যে কি হইল, দোহাই ভাই, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না।

"তোমারও যে পা মোছা শেষ হয় না গো!"

"কি করি বাবা, তোমার অম্বিকাচরণের পায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ না।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পা দুইটা আপনা হইতেই যেন পিছাইয়া আসিতে চাহিল। তাঁহার হাতে বুঝি টান পড়িল। মায়ীজী বেশ জোরেই আমার একটা পা ধরিয়া রাখিলেন। কি আপদ, তাঁহার মাথার কেশ যে, আমার পায়ের উপর লুটাইতেছে!

"কত বছরের ধূলো-কাদা যে তোমার বাবাজীর শ্রীচরণে জমে আছে!"

গুরু আর কোনও কথা ইহার উত্তরে কহিলেন না। মাও আপনার ইচ্ছামত সেবার পর, আমাকে নিস্তার দিলেন। গামছাটি কাঁধে লইয়া, কমণ্ডলু আবার তিনি হাতে করিতেই, আমি গুরুর সমীপে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনি গুরু মায়ীজীকে উদ্দেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার এ ছেলেটি কস্মিন্‌কালেও যে সাবালক হবে, এ আমার বোধ হচ্ছে না।"

বাস্তবিকই নাবালকের মত কিছু-না বুঝিয়া হাঁ-করা আমার মুখের পানে চাহিয়া গুরু আমাকে বলিলেন—"হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে দেখছ কি, মাকে প্রণাম কর।"

মায়ীজী কমণ্ডলু, গামছা যথাস্থানে রাখিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, না।"

তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে গেলে গুরুকে অতিক্রম করিতে হয়। আমি দূর হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকা-ইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"ও রকম নয়, আমার বেলা যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে—সত্যই যদি বিবেক-বৈরাগ্য চাও।"

"না বাবা, না।"

আর, 'বাবা না', আমি একেবারে মায়ের চরণ দুইটির উপর মাথা স্পর্শ করাইয়া দিলাম।

"'না' বল্‌লে চল্‌বে কেন মা, ওর কল্যাণ যাতে হয়, তা আমাকে ত দেখ্‌তে হবে! বামনাই অহঙ্কার থাক্‌লে ত আর বিবেক-বৈরাগ্য আস্‌বে না!

উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, গুরুদেব আমাকে বলিলেন—"ও মেয়েটা কি, জান কি অম্বিকাচরণ? – মুচির মেয়ে।"

রহস্যই হউক, কি যাহাই হউক, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনটা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জন্মগত সংস্কার—ত্যাগের শক্তি, ভগবানের পূর্ণ কৃপা না হইলে, কদাচ হইয়া থাকে। সত্যই কি আমি সমাজের একটা অস্পর্শীয়া নারীর পায়ে ব্রাহ্মণের চির-উন্নত মাথাটা অবনত করিলাম?

"দেখছ কি অম্বিকাচরণ, মাকে ধর।"

আমি ত এতক্ষণ দেখি নাই! সত্যই ত, এ কি দেখি-তেছি? গুরুদেবের সঙ্গেও ত অনেককাল কাটাইয়াছি, তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধন-রাত্রি ত অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কই, তাঁহারও ত অমন অদ্ভুত ভাবান্তর আমি কখন দেখি নাই!

চিত্রার্পিতার মত—সমস্ত প্রাণ-প্রবাহ কমনীয় দেহ-মন্দিরের কোন্ গোপন-প্রকোষ্ঠে যেন লুকাইয়াছে! পলক-যুগল নিরুদ্ধ হইতে গিয়া, বিশাল চক্ষু দুইটির কাছে পরাস্ত মানিয়াই যেন তারা দুইটিকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত করিয়া স্থির হইয়াছে! কাপড়খানা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। আঁচলখানা কাঁধের একাংশে শুধু সংলগ্ন।

"ধ'রে ফেল, অম্বিকাচরণ!"

অঙ্গ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে না করিতে একটি দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে মায়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

শশব্যস্তে সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে করিতে তিনি গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তাই ত বাবা, থাকে থাকে আমাকে কি ভূতে পায়?"

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন—"যেখানে এতক্ষণ ছিলে মা, সে স্থান থেকে তোমার এ ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওর চৈতন্য হয়।"

৬৩

চৈতন্য কি হইবে? এখনও—এই বিশ বৎসরের লোক-দেখান বৈরাগ্য—চৈতন্য কি এখনও আমার হইয়াছে?

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের দিন—দূর অতীতের স্মৃতি, যতটা আছে বলিতেছি—এই অপূর্ব্ব রমণীর নীরব আশীর্ব্বাদে এক মুহূর্ত্তেই আমার যেন চৈতন্য আসিল।

নিজের ভাঙ্গা-সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, ধার-করা মাল-মশলা দিয়া আবার যে একটা সংসার-রচনার চেষ্টা, নিজের কাছেও সযত্নে লুকাইয়া করিয়াছিলাম, সেটা দেখিতে দেখিতে যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! মানস-চক্ষুর সম্মুখ হইতে আমার এই গৃহবাসের আকাঙ্ক্ষা,আর তাহার ভিতরে শান্তি দিবার ছলদেখান সৌন্দর্য্য—আমার গৌরী—যেন দূর হইতে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে! এই শুভ-মুহূর্ত্ত বুঝি গুরুদেবের অবিদিত রহিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দয়াময়ীকে মনে প'ড়েছিল?"

বিশেষ একটু বিরক্তির দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

আমার দুর্ভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্ঠুরার মত সেই খিল্-খিল্ হাসি। হাসিতে-হাসিতেই গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কি হে অম্বিকাচরণ, আমার সঙ্গে তোমার কি যেতে ইচ্ছা আছে?"

"আছে প্রভু!"

মায়ীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাবে, বাবা?"

"যদি আজই যাই?"

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম—আজই যাই, মানে কি? যেমন দাঁড়াইয়া আছি, এই অবস্থাতেই আমাকে কি গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে?

"বুঝে দেখ।"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত চিন্তাকে প্রাণপণ শক্তিতে স্থির করিয়া উত্তর দিলাম—"আজই যাব।"

"প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আসছি।"

আর, আমার কি যোগিনী-মা'র—কাহারও মুখের পানে না চাহিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। মায়ীজীও নীরব। যে যাহার নিজের স্থানে আমরা নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া।

গুরুর গন্তব্যপথের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনিও বুঝি, সেই দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন।

চাহিতেই তাঁহার মুখে হাসি আসিল। আবার সেই মুক্তার মত দাঁতগুলি বাহির হইল। আমি কিন্তু গম্ভীর—মুখে হাসি আসিবে কি, ভিতরে পুঞ্জে পুঞ্জে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। বিন্দুগুলার মধ্যে কে আগে আসিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, পরস্পরে কলহ করিতেছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

"তাই ত গো, মিলন হ'তে না হ'তেই বিচ্ছেদ!"

"আর রহস্য ক'র না মা, তোমার এই রকম কথাতেই মনে মনে আগে থাকতে তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

"আমার কাছে?"

"তাই ত গা, তুমি এমন!"

"কি আমি? আমার ওই ভূতে পাওয়া দেখেই কি আমাকে কেমন-বোধ হ'ল? না গো, তোমার কোনও অপরাধ হয়নি! তুমি আমার সম্বন্ধে যা মনে করেছ, আমি তাই।"

কোনও উত্তর না দিয়া আমি কেবল তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

"আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারবে না।" আমি চোখ নামাইলাম।

খিল্-খিল্ হাসিয়া, এই অদ্ভুত-প্রকৃতি নারী বলিয়া

উঠিলেন—"হাঁ, ওই রকম ক'রে চোখ ছ'টি মুদে আমাকে দেখুন। তা হ'লেই বুঝতে পারবেন—আমি কি।"

এ সব কথা হেঁয়ালি, না গুরুদেবেরই ইচ্ছামত, আমার পরীক্ষা ?

"আমাকে দেখে কি, আবার আপনার সংসার পাততে ইচ্ছা হয়েছিল ?"

সত্য সত্যই তাঁহার কথাতে এইবার আমার বিরক্তি আসিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল মনের নানা প্রকার অবস্থা নিষ্ঠুরভাবে আমার ভিতরটাকে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছিল, এইরূপ সময়ে, যদিই তাঁহার রহস্য হয়, আমার ভাল লাগিল না।

"বল্‌তে দোষ কি, এখনি হয় ত বাবাজি মহারাজ এসে, আপনাকে নিয়ে যাবে, আর ত তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হবারই সম্ভাবনা। তখন, ব'লেই ফেলুন না! বা! বল্‌তে সরম কেন গো, ঠাকুর ?"

"প্রথম প্রথম তোমার কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগেনি।"

"তাই বলুন। মন, মুখ আলাদা ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া হয়। গেরুয়া প'রে অনন্তকাল ধ'রে পথ চল্‌লেও বস্তু লাভ হবে না।"

"বল্লুম ত মা, অপরাধ করেছি।"

"আমিও ত বল্লুম বাবা, তুমি কোনও অপরাধ করনি। গুরুর মুখে আমার কথা শুনে যা তোমার মনে হয়েছে, আমি তাই।"

"কতক্ষণ তোমার সঙ্গে এম্‌নি ক'রে কথা কাটাকাটি করব ?"

"চলুন ঘরে, আমি আপনার লোটা-কম্বল, পুঁটলি বেঁধে দিই।"

বলিয়াই, আমার সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, যোগিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৩৪

এক দিকে গুরুদেবের আকর্ষণ! তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। কোথায় আপাততঃ যাইতে হইবে, তাহার পর কোথায়, কত দিনের জন্য, আর কাশীতে ফিরিতে পাইব কি না—এ সমস্ত কিছুই আমি জানি না। যাইবার সামর্থ্য আমার কতটুকু, ইহারও পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাই নাই। গুরুদেবের আদেশ, অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়াই, আমি পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি। 'প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।' সে ফেরা যে কখন্ কিংবা কবে, তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই, ফেরা তাঁহার আজ রাত্রির মধ্যেও হইতে পারে ; অথবা হইতে পারে, কবে, কোন্ সময়ে, তাহার ঠিক কি! যখনই তিনি ফিরুন, আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এখন তিনি ফিরিলে কি আমি প্রস্তুত? শুধু একটা লোটা-কম্বল সংগ্রহ করাই কি আমার প্রস্তুত হইবার সীমা ? ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিলেও গৃহবাসের উপযোগী আরও ত কত জিনিষ রহিয়াছে! উদরান্ন-সংস্থান ; কিছু টাকা-কড়িও ত আমার আছে! আমি ত একেবারে নিঃস্ব নই! সেগুলারও ত যাহা হউক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে! যাইবার পূর্ব্বে দুই এক জন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গেও ত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন! মমতার বস্তু বলিয়া গৌরীকে দেখিবার অধিকার না পাই, কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুবনের মা'র সঙ্গে একটিবারের জন্য দেখা হইলেও কি তাহা আমার সন্ন্যাস গ্রহণের পথে অন্তরায় হইবে ?

একদিকে, সহসা একসঙ্গে জাগিয়া-ওঠা এই সকল চিন্তার রাশি ; অন্যদিকে, সংসার ত্যাগটা যেন কিছুই নয়, নিত্য-ঘটনশীল ব্যাপারের মধ্যে একটা, এইরূপ ভাবে, নিজের কানে গুরু-মুখ হইতে শুনিয়াও এ অদ্ভুত-প্রকৃতি নারীর আমাকে লইয়া রহস্য!

আমি যেন বুদ্ধিহীনের মত হইয়াছি। অথবা আমার মনের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, বুদ্ধি আমার কোনও কালে মস্তিষ্কের একটু ক্ষুদ্র পরমাণু আশ্রয় করিয়া ছিল কি না, ভুলিয়া গিয়াছি।

সেই অবস্থায়, যেখানে ছিলাম, সেখানে সেইরূপ ভাবেই আমি দাঁড়াইয়া। মায়ীজী আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ঘরে ঢুকিলেও, আমি তাঁহার কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ অথবা অনুসরণ করিলাম না।

"কি কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আমাকে দেখিয়ে দেবেন আসুন।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু মনের এ অবস্থা লইয়া

ঘরে ত প্রবেশ করিতে পারিব না। যে অদ্ভুত ভাব আমি তাঁহার দেখিয়াছি, গুরুদেবের মুখ হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে এই-মাত্র যে সব শ্রদ্ধার কথা শুনিয়াছি, তাহার পর যদি তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধার লাঘব হয়—তাই কেন,—সন্ন্যাস যদি আমার ভাগ্যেই থাকে, মন মুখ পৃথক্ করিলে চলিবে না। সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি, সেই দন্তপংক্তির বিকাশধারা তড়িতের খেলার মত হাসি, সেই বীণার সুর আলিঙ্গন-করা কণ্ঠ—নির্জ্জন গৃহে, তাঁহাকে মাত্র সম্মুখে রাখিয়া এই গভীর রাত্রিকালে কথোপকথন—এই তপস্যার আবরণে ঘেরা দেবী-মূর্ত্তিকে বিকারগ্রস্ত মনের প্রেরণায় যদি ভিন্নভাবে দেখিয়া ফেলি, নিজের কাছেই লুকান মন লইয়া কেমন করিয়া গুরুর অনুসরণ করিব ?

আমি সেই স্থান হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"গুরুদেব কখন্ ফির্‌বেন, তার ত স্থিরতা নাই, বাইরের দোর খোলা।"

"তা থাক্, তুমি একবার এসো—একবারটি।"

একবার 'আপনি', একবার 'তুমি!' আমার বুক কাঁপিবার মত হইয়াছে। আমি চলিলাম বটে, কিন্তু পা দুইটাকে অতি কষ্টে টানিয়া।

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি—নাঃ! এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, এ বেটী পাগল,—কাপড়, চাদর, বিছানা, বালিশ, কম্বল—ঘরের যেখানে যা ছিল, সব মেঝের এক স্থানে জড় করিয়া যেন পাহাড়ের মত করিয়াছেন, আর সেইগুলার পার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া, সেই তখনকার মত আপনার মনে হাসিতেছেন।

"কি বল্‌বে বল।"

"ভিতরেই আসুন।"

"আর ভিতরের মায়া কেন—ওইখান থেকেই বল।"

"ওইখান থেকেই বৈরাগ্য নিলেন নাকি ?"

আমি উত্তর দিলাম না।

"এগুলোর কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা আপনি সঙ্গে নেবেন, দেখিয়ে দিন! বাঃ! আমি কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর্‌ব ?"

"অপেক্ষা তোমাকে কর্‌তে কে বল্‌ছে। যা' নেবার, আমিই নেবো এখন।"

"তা হ'লে আমি যাই ?"

"কোথায় ?"

"যাব না ? সারা দিন-রাত কি আপনার ঘর আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব ?"

"সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ?"

"একবার না যাওয়া কি ভাল হয়, আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

এইবারে আমি ফাঁফরে পড়িলাম।

"সেখানে সকালে গেলে হবে না ?"

মায়ীজী চুপ করিয়া রহিলেন।

"রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা না হবারই সম্ভাবনা।"

"তা যা বলেছেন, তার যে রাগ। রাত্রিতে তার বাড়ী গেলে, হয় ত খড়ম নিয়ে মার্‌তে আস্‌বে।"

"কখনো এসেছিল নাকি ?"

"এসেছিল বইকি! বিশেষতঃ আমার গেরুয়ার ওপর সে হাড়ে চটা। বুড়ো বলে, চোখে অত বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, গেরুয়া কেন? নীল-বসন পর। তবে তার কোনও দোষ দেখিনি। সংসার তার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে।"

"এ জেনেও মা, এই রাত্তিরে তুমি সেখানে যেতে চাচ্ছিলে ?"

"কি করি বাবা, রাগী হ'ক আর যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ। মন মত্ত-করী, মাঝে মাঝে সিংহের আঘাত না খেলে সে ঠিক থাকে না। তার রাগের কথাগুলো আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর পিছাইতে গেলে আমাকে মায়ীজীর কাছে হেয় হইতে হয়, আজ না হউক, কাল সব ঘটনা সে জানিবেই। আমি বলিলাম—"বুড়ো আর নেই।"

"নেই!"

"মারা গেছে—আজ দুপুরবেলা।"

"তা, সে কথা আমার কাছে এতক্ষণ গোপন রেখে-ছিলে কেন বাবা ?"

মায়ীজী একবারে দ্বারের কাছে। ঘরের জিনিষপত্র সব তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"আমাকে যেতে একটু পথ দিন।"

অবশ্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমাকে অতি-ক্রম করিয়া এক পদ তিনি না চলিতেই, আমি বলিলাম—"আজ আর যাবেন না।"

"আর আমাকে নিষেধ কর্বেন না বাবা!"

"নিষেধই করছি। আরও আমার বল্বার আছে।"

মায়ীজী মুখ ফিরাইলেন।

"আরও একটা কথা আমি গোপন করেছি—একটা দুর্ঘটনার কথা।"

সমস্ত কথা এইবারে আমি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

মায়ীজী স্থির হইয়া শুনিলেন। শুনিবার পরও তিনি স্থির রহিলেন। এই সময়ে রাণীর কথাটাও উত্থাপন করিলাম। বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর রক্ষার ও সেবার লোক মিলিয়াছে।

"এখন গেলেও সিদ্ধেশ্বরীর দেখা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।"

"যাব না।"

"কথা গোপন ক'রে কি অন্যায় করেছি?"

"আপনি দোর দিয়ে আসুন।"

"সিদ্ধেশ্বরীর খবরটা আর একবার নিয়ে আসি না কেন?"

"বেশ।"

* * * *

সদর দ্বার পার হইব, এমন সময়, মায়ীজী বলিয়া উঠিলেন—"যদি আপনার গুরুজি এর মধ্যে এসে পড়েন?"

আমার গতি স্থগিত হইয়া গেল।

খিল্, খিল্, খিল্—পাখীর কলরবে মায়ীজী হাসিয়া উঠিলেন।

"তা হ'লে ত আমার যাওয়া হ'ল না।"

"যাও গো, তিনি আসেন, আমি হাতে পায়ে ধ'রে তাঁকে আট্‌কে রাখব।"

পথে নামিয়া অনেকটা চলিলাম; কিন্তু কই, কবাট বন্ধ করিবার শব্দ এখনও ত শুনিতে পাইলাম না।

৩৫

ঠিক যেন একটা নাটকীয় ঘটনা! এখন এই দূরাতীত কালে, নিৰ্জ্জন গিরি-উপত্যকার নির্জ্জন কুটীর হইতে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি। কিন্তু তখন? একটু একটু করিয়া সেই গলির পথে অগ্রসর হইতেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে বাড়ীর দ্বারবন্ধ শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে নিষেধ করিব? যদি আমার এই আসা-যাওয়া, আর তাঁহার পথের পানে অন্যায় 'চাওয়া' কেহ কোথা হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে? ফিরিয়া দেখিব? ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীর দোলা মনের উপর তাঁহার বিদ্রূপকরা খিল্ খিল্ হাসি যদি কেহ শুনে? যে সে লোক ত তাঁহার গৈরিক-বসন মর্য্যাদার চক্ষে দেখিবে না! না বাপু, আমি চলি, ফিরিয়া কায নাই।

যে গলি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে যাইতে হয়, আমি সেই মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে, জোরে কবাট বন্ধ করিলেও, আর আমার শুনিবার প্রত্যাশা রহিল না।

কিছু পথ এইবারে বেশ জোরেই চলিলাম। আরও খানিকটা পথ—গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। এখন ত মধ্যরাত্রি—আমি কোথায় যাইতেছি—যে বাড়ীতে কেবলমাত্র দুইটি স্ত্রীলোক আছে—দুইটি পরমা সুন্দরী যুবতী? একটির সম্বন্ধে যাহাই মনে করি না কেন, আর একটি এক জন মর্য্যাদাবান্ ভূ-স্বামীর স্ত্রী। আমার নিজের বাড়ীর দিকেই মুখ ফিরাইতে যখন আমার সাহস হইতেছে না, তখন কোন্ সাহসে সে বাড়ীর ভিতরে আমি মাথা গলাইতে চলিয়াছি?

গতি আমার এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিল।

এই চলা-ফেরায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। এই অল্পসময়ের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। শুধু বাহিরে ঘটিয়াই তাহা ক্ষান্ত হইল না। অন্তর-বাহিরে সমভাবে ঘটিয়া সে যেন আমার জীবনটাকে এক মুহূর্ত্তে ওলট-পালট করিয়া দিল।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার হাট করিয়া খোলা। বিস্ময়-অচলতায় একবারটি এদিক ওদিক চাহিয়া দাঁড়াইয়াছি, শুনিলাম—উপরে আমার ঘর হইতেই কে গান গাহিতেছে;—

শুনে যা শুনে যা মরণ, কাছে এসে শুনে যা রে;
কানে কানে বল্‌ব তোরে বলিস্‌নাকো যেন কারে।

যমুনা-কূলে

সঙ্গোপনের সরস হাওয়ায় বাদল-ঘন রাতে
তোর আসার আশায় বসে'ছিলাম দোদুল-মালা হাতে;
আঁধার ভেঙ্গে কেমন ক'রে কে এলো যে ঘরে,
তোরে মনে করে' মালা পরিয়ে দিলাম তারে।
শোন্‌রে মরণ সে এক স্বপন বাহু-পাশের বাঁধা,
অবশ আলস, হিয়ার পরশ মরণ-সুরে সাধা।
যা কিছু সব দেবার আমার আগেই দিছি তারে,
আগেই আমি মাতাল মরা বাচাল আঁখির ঠারে।

অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারের কবাট দুইটি বন্ধ করিয়া, সেইখানেই দাঁড়াইয়া সমস্ত গানখানি শুনিলাম।

এ গীত কখন্ বন্ধ হইল? সত্যই কি বন্ধ হইয়াছে? না না—আকাশের সর্ব্ব রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার শ্রবণ-লালসাকে উন্মত্ত করিবার জন্য ওই যে সে বাতাসের প্রতি পরমাণু ধরিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

উপরে উঠিলে আর কি গুরুর অনুসরণ করিতে পারিব?

৩৬

তবু আমি উঠিয়াছি। কখন্, কোন্ ফাঁকে, মনের কোন্ অছিলায়, এতকালের পর সেটা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

"প্রস্তুত থাক," মৃত্যুর স্থানকাল তুচ্ছ-করা ডাকের মত গুরুর সেই গম্ভীরস্বরের আহ্বান! উঠিবার সময়ে সেটা কি একটিবারের জন্যও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছি?

কে জানে! এখন ত আমি সন্ন্যাসী, বয়সে অশীতির উপরের বৃদ্ধ, দেহচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে, "প্রস্তুত থাক," আমার সকল ইন্দ্রিয়গুলার ভিতর দিয়া, গুরুবাক্যের প্রতিধ্বনির মত, আমার অন্তরাত্মা অবিরাম আমাকে শুনাইতেছে। এখনও কি আমি সে গুহামধ্যে প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলাম না?

"আসুন।"

গানটি তাঁহার সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। দেখি, নিজে-কেও লুকাইয়া, কত টিপি টিপিই না পা ফেলিয়া, আমি দ্বারটির পার্শ্বে চোরের মতই যেন দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু সেই নারী কেমন করিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন? কোনও দিক্ হইতে আমার আসার নিদর্শন আমি ত বুঝিতে পারিলাম না! সমস্ত জগৎটা যেন নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গিয়াছে! কেবল একটি শব্দ—আমার বুকে অবিরাম আঘাত-করা ঘন ঘন নৃত্যশীল একটি শব্দ-তরঙ্গ—দুপ্, দুপ্, দুপ্। এই শব্দ কি এ মায়াবিনীর কানে বাজিয়াছে?

"এসো না গো!"

যেন কি এক আত্মগোপনশীল শক্তির ইঙ্গিত তাঁহার এই আবাহন-কথার ভিতর দিয়া আমাকে তাঁহার ঘরের দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইল।

তাঁহারই ঘর বলিতেছি, এখন আর সে ঘর আমার বলিতে সাহস নাই। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখি, ঘর যেন এতদিন পরে তাহার অধীশ্বরীকে পাইয়াছে। পাইয়া, সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়া তাহাকে আপনার হৃদয়ের ভিতর বসাইয়া তৃপ্তির আঁখি নিমীলনে স্থির হইয়াছে। ঘরসাজান দ্রব্যগুলা বুঝি তাঁহাকে পাইয়া মত্ত হইয়া-ছিল! এখন মত্ততার অবসানে সেগুলাও যে যাহার স্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

"ওখানে কেন গো, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়াছি। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলিতে আমি অশক্ত। ইচ্ছা আমার তখন স্বাধীন ছিল কি না, বলিলে পাছে ভুল হয়, আমি বলিতে পারিব না।

আমি নির্ব্বাক্, শুধু তাঁহার কথা শুনিয়াছি। কথা কহি নাই, কহিতে পারি নাই। কহিতে শক্তি ছিল না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব! কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিব? যে বলিতেছে, সে কোথায়? আমি উত্তর দিলে সে কি শুনিতে পাইবে?

শুধু শুনিয়াছি—তোমরাও শুন। আর এই শোনার ভিতর হইতে আমার সে সময়ের প্রতিবিধির অবস্থা অনুমান করিয়া লও।

অনেকবার কৈফিয়ৎ দিয়াছি, আর একবার দিই না কেন? এ যে সন্ন্যাসীর কৈফিয়ৎ। তোমরা নিত্য যাহা শুনিয়া আসিতেছ, এ সে শোনা নয়। যাহা দেখিয়া আসি-তেছ, এ সে দেখা নয়। আমি ত আর মায়ার অনুরোধে তোমাদের মনজোগান কথা কহিতে পারিব না।

"দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে তুমি যেতে পার নি? তা আমি বুঝেছি। না গিয়ে ভালই

করেছ। তুমি যেতে ইচ্ছা করেছিলে, তাই আমি নিষেধ কর্‌লুম না।

"আমার চোখে জল দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ? হি হি হি,—আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অনেক কাল ধ'রে ত গানটা গেয়ে আস্‌ছি। কই, কখনো এক ফোঁটা জলও ত চোখের কোণে আসেনি!"

"আজ তবে হুহু ক'রে চোখে জল এলো কেন?"

"তুমি কি মনে কর্‌ছ, এ গানের আধ্যাত্মিক কোনও মানে আছে? কিছু না। অথবা থাকতে পারে, আমি জানি না। কে জানে, তাও বল্‌তে পারি না। তুমি মনে কর্‌ছ, আমি রচনা করেছি? হি হি হি, তখন আমি লিখতে পড়তেই জান্‌তুম না। কে রচেছে, তাও জানি না। সে কি ভুগে লিখেছে, না সখ্ ক'রে লিখেছে? কিন্তু এই গানই আমার এই দশা কর্‌লে!"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা! উঃ! তাহার কি অসহ্য আক্রমণ! ঠিক যেন মরণোন্মুখ, বিকারী রোগীকে ঘেরিয়া নিঃশব্দে তাহার মমতার বস্তুগুলি বসিয়া আছে। বসিয়া, তাহার শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস শব্দ দিয়াও এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু তাহার একটা নিঃশ্বাসের মৃদু আর্ত্তনাদকারী শব্দে আবার সমস্ত ঘরখানা বিষাদে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

"এই গানই আমার এই দশা কর্‌লে! কে বল্‌বে, সে ভুগে রচেছে, না ভাবে রচেছে। না, এ রচনা করা তার সখ্? কিন্তু সে ত জানে না, এ রকম শব্দভেদী বাণে কত হরিণীর বুক ভেদ হয়ে যায়!

"কাছে এসো—বসো। দয়াময়ীর কাছটিতে কেমন ক'রে বস্‌তে? বাঃ! সে কি তোমার স্ত্রীই ছিল? তার সেই অহেতুক সেবায় কখনও কি তোমার মা'কে মনে পড়ত না?

"হাঁ—বসো—এইখানে। একটিবারের জন্য মনে কর না আমি সে। ভুবনের মা'র মুখে তাহার অদ্ভুত-চরিত্রের কথা শুনে আমার একবার দয়াময়ী হ'তে ইচ্ছা হয়েছিল।

"আর যেমন মনে হওয়া—শুনতে ভয় পাচ্ছ? সে কি গো, তুমি যে ব্রহ্মচারী!" তখন ত বুঝি নাই, এখন কি বুঝিয়াছি? কিন্তু মিথ্যা কহিব কেন, তাঁহার শেষ কথায় আমার সমস্ত দেহটা—কাঁপিয়াছিল বলিতে পারি না—আমার নিদ্রিত স্মৃতির সহসা জাগরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। গুরুর আহ্বানবাণী এই সমস্যার মুহূর্ত্তে যদি আমাকে রক্ষা না করিত!

"অম্বিকাচরণ!"

আমার চৈতন্য ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিবার শক্তি আসিল।

"গুরুদেব ডাক্‌ছেন।"

"তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক্‌বেন কেন? উপরে আস্‌তে পারেন না?"

"তাঁহার আস্‌বার উপায় নেই।"

বিস্মিতবৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনি তাঁহার আস্‌বার পথ রোধ ক'রে এসেছেন?"

অপ্রতিভের মত আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

"হি হি হি, এগুলো নিয়ে যাও বাবা, তোমার অনন্ত-পথের সঙ্গী।"

আমি মুখ ফিরাইতেই মায়ীজী একত্র-করা লোটা-কম্বল কাপড়গুলা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

৩৭

দ্বার খুলিতে না খুলিতেই গুরু বলিয়া উঠিলেন—"বেশ ত তুমি! আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। তোমার প্রস্তুত থাকা মানে কি ঘুমিয়ে পড়া!"

গলির আলোটা আমার বাসার দ্বার হইতে খানিকটা দূরে। আর সেটা পূর্ব্বে বেশ উজ্জ্বল ছিল না। আলোটাকে পিছন করিয়া গুরুদেব দ্বার হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ ভালরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। না হইলেও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার পরিব্রাজকের বেশ।

আমি বলিলাম—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"আবার ভিতরে যাবার কি প্রয়োজন?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই যেন গুরু এবার বলিলেন—"তোমার কি যাবার ইচ্ছা নেই?—সঙ্কোচ কেন? যাঁ

বল্‌বার স্পষ্ট ক'রে বল। ইচ্ছা না থাকে, বল্‌তে লজ্জা কি! মর্কট-বৈরাগ্যের ত কোনও মূল্য নেই।"

"ইচ্ছা আছে, প্রভু!"

"তবে চ'লে এস! মেয়েলি পুরুষের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন?"

"কম্বল, কমণ্ডলু—এগুলো সব নিয়ে আসি।"

গা হইতে কম্বল খুলিয়া, নিজের কমণ্ডলু ও লাঠীগাছটি সব একসঙ্গে আমার গায়ে যেন নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন."এই নাও। আর কি তোমার চল্‌তে বাধা আছে?"

"একটু আছে বই কি বাবা! উনি ত এখনো তোমার মতন সমস্ত মায়া-মমতা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পাষাণ হ'তে পারেন নি।"

পিছন ফিরিয়া মায়ীজীর পানে চাহিতে আমার সাহস হইল না। শুধু তাঁহার কথা শুনিলাম। আমি উত্তর দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"কি আপদ, মা বাড়ীতে আছেন, আগে বলনি কেন?"

তাঁহার পদতলে মাথা নিক্ষেপ করিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য পড়িয়া রহিলাম।

করুণামাখা-স্বরে গুরু আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন। "সন্ন্যাস নেবার তোমার যোগ্যতা যদি এসে থাকে, তখন কোনও কারণে কারও কাছে তোমার লজ্জিত কি সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই।—মা, এইবারে আমাদের অনুমতি কর।"

"এগুলো?" বলিয়াই আমার জন্য রক্ষিত কমণ্ডলু প্রভৃতি মায়ীজী গুরুদেবকে দেখাইলেন।

গুরু বলিলেন—"ওগুলোর আর প্রয়োজন কি? এই ত অম্বিকাচরণের সে সব আগেই পাওয়া হয়ে গেছে।"

"সে ত গুরুর শিষ্যকে দেওয়া আশীর্ব্বাদের উপহার। শিষ্যেরও ত গুরু-প্রণামী ব'লে একটা জিনিষ আছে।"

"হাতে ক'রে নিয়ে দাও আমাকে অম্বিকানন্দ!"

সম্বোধনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই কি আমার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুদত্ত উপাধি? নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার বোধ হইল, যেন সমস্ত মমতার বস্তু আমার মানস-দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! একটি হৃদয়-ভার-লাঘবকারী নিঃশ্বাসের ভিতরে অতীতের সমস্ত অনুভূতি গলিয়া যাইতেছে! আমার সেই পরিত্যক্ত পল্লীর সংসার—সেই আমার শূন্যঘর-পূরণের তিন তিনবারের ফলহীন প্রচেষ্টা, দগ্ধ সংসারের সেই হীরকোজ্জ্বল উত্তপ্ত ভস্মাবশেষ দয়াময়ী ও তাহার বুকেধরা কন্যা—আর এ কাশীধামে আমার বানপ্রস্থকে বিব্রত করা—রাণী, নিদ্ধেশ্বরী, পরম কল্যাণময়ী ভুবনের মা, আর তাহার জগদম্বার স্নেহে বাঁচাইয়া তোলা গৌরী—আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

"সমস্ত মমতার শ্বাস এইবারে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও, সন্ন্যাসি!"

কে বলিল, কি জানি কেন, বুঝিতে না পারিয়া একটা বিপুল চমকে মুখ ফিরাইতেই দেখি, সেই প্রহেলিকাময়ী নারী ঘুমন্ত গৌরীকে কাঁধের উপর ধরিয়া ভাবাবিষ্টার মত কবাটে এক হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

"ও গো মা, আর দেখা ভাগ্যে ঘটে কি না ঘটে, প্রণাম ক'রে নে।"

অতি কষ্টে পা দুইটাকে দ্বারের বাহিরে আনিয়া নীরবে ভুবনের মা আমাকে প্রণাম করিল।

"হ'ল ত অম্বিকানন্দ? এইবারে চল।"

"দেখছ কি ঠাকুর,এ তোমার দয়াময়ীর দান। নমস্কার।"

গুরুর পিছন পিছন দুই চারি পদ চলিতে না চলিতে কবাট বন্ধ করার শব্দ আমার কানে গেল।

আর একটি দীর্ঘশ্বাস। কেন? গৃহ আমাকে চিরজীবনের জন্য বিতাড়িত করিল, না ক্ষুদ্র শিশু আমার নির্ম্মমতায় মুখ ফিরাইল?

সমাপ্ত।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব-সূচনা।

সেরাভিলো প্রিন্‌সেপের পিস্তলের গুলী হইতে য়ুরোপে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল। যখন বোসনিয়ার ক্ষুদ্র সারাজেভো সহরে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডের অঙ্গে বালক প্রিন্‌সেপের হস্তনিক্ষিপ্ত গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল, তখন কি কেহ জানিত, উহা হইতে য়ুরোপে কাল-সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে? আজ জেনারল ডেগুটে এবং ওয়েগাণ্ডের ৭০ হাজার ফরাসী সেনা জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চলে বিজয়দর্পে হানা দিয়াছে, নিরস্ত্র জার্ম্মাণী অস্ত্রমুখে তাহার জবাব দিতে পারিতেছে না, কিন্তু রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় জার্ম্মাণী যে তপ্তশ্বাস ফেলিতেছে, উহা হইতে যে আবার য়ুরোপে কুরুক্ষেত্রের উদ্ভব হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

ফরাসী ও জার্ম্মাণের শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূতন নহে। জাতি হিসাবে যখন জার্ম্মাণরা য়ুরোপে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয় নাই, তখন ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তখন ইংরাজ-ফরাসীর ১ শত বৎসরের যুদ্ধ, ৭ বৎসরের যুদ্ধ, নেপোলিয়ানের যুদ্ধ—কত যুদ্ধই না হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে হোহেনজোলারণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর হইতে, জার্ম্মাণ ফ্রেডারিক দি গ্রেটের শক্তি-প্রতিষ্ঠার পর হইতে, বিসমার্ক মোল্টকের অভ্যুদয়ের পর হইতে ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে যে প্রাধান্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ক্রমবিস্তার এখনও চলিতেছে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর আলশাস-লোরেণ প্রদেশ যখন জার্ম্মাণীর কবলগত হয়, তখন ফরাসীরা লজ্জায় অবনতশির হইয়াছিল—ফরাসীরা সে অপমানের তীব্র বেদনা কখনও ভুলে নাই। জার্ম্মাণ কৈশর উইল্‌হেল্‌ম্ তাঁহার একাদশ বৃহস্পতির দশার দিনে যখন জগৎপ্রসিদ্ধ ফরাসী নর্ত্তকীকে তাঁহার সমক্ষে নৃত্যকলার অভিনয় করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন নর্ত্তকী নির্ভীকহৃদয়ে সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিয়া, বুকে হাত দিয়া বলিয়াছিল,—"মহারাজ, আলশাস-লোরেণের ব্যথা বুকে বাজিতেছে, সে ব্যথা ভুলিতে পারি নাই।"

এইটুকু বুঝিতে পারিলেই রূঢ়ের রহস্য বুঝা কঠিন হইবে না। ফরাসী Chivalrous মহদন্তঃকরণ। স্বাধীনতাপ্রিয় স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া ফরাসীর খ্যাতি আছে। বস্তুতঃ ফরাসী বাহুবলে যে সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ব্যবহারেও বিজিত পরাধীন জাতিকে যে অধিকার প্রদান করে, জগতে অতি অল্প জাতিই তাহা দিয়া থাকে। গত জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় ফরাসীর পুঁদিচেরী ও চন্দননগরের দেশীয় প্রজা ভার্দ্দনের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তথায় ফরাসী সেনানী ও সেনার পদে বৃত হইয়া গোলন্দাজ বিভাগেও যুদ্ধ করিয়াছিল। ফরাসী রাজ্যের সকল প্রজারই সমান অধিকার আছে বলিয়া শুনা যায়। এহেন ফরাসীজাতি হঠাৎ অপর এক য়ুরোপীয় খৃষ্টানজাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হয় কেন? এ 'কেন'র উত্তর—ফরাসী-জার্ম্মাণে বহুদিনের শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিলাতের পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ জে, পি, টমাস সম্প্রতি হলাণ্ডের আমস্টার্ডাম সহরে আন্তর্জাতিক বণিক-সম্মিলনের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তথায় বহু জার্ম্মাণ প্রতিনিধির সহিত তাঁহার রূঢ় সম্পর্কে কথা হয়। জার্ম্মাণ শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলেন,—"রূঢ় অধিকারের দ্বারা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা ফরাসীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, রূঢ় অঞ্চলকে দ্বিতীয় আলশাস-লোরেণে পরিণত করাই ফরাসীর উদ্দেশ্য।" বস্তুতঃ জার্ম্মাণমাত্রেরই বিশ্বাস এইরূপ।

জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পর প্যারিস ও ভার্সেল সন্ধির সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণজাতিকে একরূপ নিরস্ত্র হইতে হয়। ফরাসী কিন্তু চিরদিনই বলিয়া আসিয়াছে, জার্ম্মাণী গোপনে সমরসাজে সাজিয়া আছে—জার্ম্মাণীর অস্ত্র-শস্ত্র অজ্ঞাতবাসের সময়ে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্র-শস্ত্রের মত লুক্কায়িত আছে, প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণ-অর্জ্জুন বলশেভিক-উত্তরের সহায়তায় উহা শমী-শাখা হইতে পাড়িয়া লইবে। ফরাসীর এই জার্ম্মাণ-বিদ্বেষের প্রচারকার্য্য সর্ব্বদা সজীব ছিল। মিত্রগণের সামরিক কর্ত্তৃত্ব-কমিশন যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর ঘোষণা করেন, জার্ম্মাণরা বস্তুতঃই অস্ত্রহীন হইয়াছে, তখনও ফরাসী প্রচার করিয়াছেন, কমিশন অবহেলা ও অকর্ম্মণ্যতার ফলে প্রকৃত তথ্য

অবগত হইতে পারেন নাই। অর্থাৎ ফরাসী জগতের লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন যে; জার্ম্মাণী মিথ্যার আবরণে সত্য ঘটনা লুকাইয়া রাখিয়াছে; তাহাকে যেভাবে জয় করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে; পরন্তু জার্ম্মাণী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে অসমর্থ, এ কথাও সত্য নহে, বেগ দিয়া তাহার নিকট অর্থ আদায় করিতে হইবে।

ইহার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। যদি ফরাসী সামরিক বিভাগের জেনারল ষ্টাফের কথামত বিশ্বাস করা যায় যে, জার্ম্মাণী যে কোন মুহূর্ত্তে ২১টি সম্পূর্ণ সুসজ্জিত আর্ম্মি-ডিভিসন রণক্ষেত্রে নামাইতে পারে, তাহা হইলে রূঢ় অঞ্চলে ফরাসীর হস্তে এত অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও আজ জার্ম্মাণী রণক্ষেত্রে আগুয়ান হইতেছে না কেন? স্বাধীন জার্ম্মাণীর সাহস ও বীরত্ব কি এতই অন্তর্হিত হইয়াছে যে, ২১টি সুসজ্জিত বাহিনী থাকিতেও প্রাণভয়ে সে শত্রুর অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিতেছে না? এমন সময় আইসে, যখন দলিত কীটও ফিরাইয়া দংশন করে। জার্ম্মাণীর কি সে ক্ষমতাও নাই?

মহাযুদ্ধের পর এ যাবৎ যে কোনও বিদেশী জার্ম্মাণীতে পর্য্যটন বা বাস করিয়াছেন, তিনিই জানেন, জার্ম্মাণীর নবীন সাধারণতন্ত্রের জন-নায়করা কিরূপ প্রাণপণে জনসাধারণকে পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-ফল বুঝাইয়া দিতেছিলেন:—"পরাজিত জার্ম্মাণীকে জেতা ফরাসীর অনুজ্ঞা মানিয়া চলিতে হইবে—আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনের অধিক অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। যদি আমরা জয়ী হইতাম, তাহা হইলে আমাদের সমরপ্রিয় কর্ত্তৃপক্ষ আজ ফ্রান্সে কি ব্যবস্থা করিতেন? এমন কি, আমরা যদি যুদ্ধজয় করিতাম, তাহা হইলে আমাদের দেশেও আমাদিগকে প্রত্যেক ডাক-বাক্সের নিকটেও সামরিক সেলাম দিতে হইত। এই সামরিক সাম্রাজ্য-গর্ব্বের অবসান হইয়াছে—আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। আইস, আমরা শান্তিতে থাকিয়া দেশ পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করি।" জার্ম্মাণী এই ভাবেই দেশ গড়িবার আয়োজন করিতেছিল।

এডুয়ার্ড বার্ণষ্টীন এখন জার্ম্মাণীর এক জন প্রধান নেতা। তিনি ফরাসীর রূঢ় আক্রমণে ব্যথিত হইয়া ইংলণ্ডের নিকট অভিমানভরে বলিয়াছেন,—"আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া তোমরা জার্ম্মাণীর বিপক্ষে যে কোনও সশস্ত্র সামরিক আক্রমণে বাধা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ।"

সুসজ্জিত ২১ দল সেনার মালিক জার্ম্মাণীর মুখে এ কথা কেমন মানায়? বিজিত, অধঃপতিত, দুর্ব্বল, পর-মুখাপেক্ষী জাতি যে ভাবে পরের মুখ চাহিয়া, পরের উপর নির্ভর করিয়া, পরের নিকট সুবিচারের প্রত্যাশা করে, আজ জার্ম্মাণী সেই ভাবেই কথা কহিতেছে। অথচ ফরাসী মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে উদ্যত কেন? ফরাসী বলে, "জার্ম্মাণকে যতই জোরে পদাঘাত কর, ততই সে তোমার নির্দ্দেশমত কায করিবে, অন্যথা নহে।" মহাযুদ্ধের পর যখন প্যারিসের শান্তি-বৈঠক বসে—অর্থাৎ আজ ৪ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী একবার জার্ম্মাণীকে এই ভাবে পদাঘাতে আজ্ঞাপালনে বাধ্য করিতে চাহিয়াছিল। তখন তাহাদের এইগুলি দাবী ছিল:—

(১) রাইন সীমানা;

(২) এসেন সহরের এবং ক্রুপের বড় বড় কারখানার উপর সামরিক কর্ত্তৃত্ব;

(৩) রাইন-তটস্থ ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশের কয়লা-খনিসমূহের উপর সামরিক কর্ত্তৃত্ব;

(৪) কয়লা খনি-সংশ্লিষ্ট ধাতু-দ্রব্যের ব্যবসায়ের উপর সামরিক কর্ত্তৃত্ব।

বস্তুতঃ ফরাসী তখন মিত্রসেনাগণের দ্বারা জার্ম্মাণীর ঘাট-বাট-মাঠ—সকল স্থলই ছাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল—বিজিত জার্ম্মাণগণকে জার্ম্মাণীর মধ্যে আবার পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল।

তখনও যাঁহারা এই চক্রান্তের মূল, এখনও তাঁহারাই ফরাসীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তখন পোঁয়াকারে ও ফশ জার্ম্মাণীকে যে ভাবে চাপিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে হতভাগ্য ১৪ পয়েণ্টের প্রেসিডেণ্ট উইলসন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি য়ুরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন মিত্রদের দাবীদাওয়ার কথা শুনিয়া মনে হয়, উহারা সকলে আরও যুদ্ধ চাহে—They all ask us to make more war!"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে পোঁয়াকারে ও ফশ মিত্রপক্ষের সমর-প্রিয় সাম্রাজ্য গর্ব্বীদিগকে নাচাইয়া প্রেসিডেণ্ট

পোঁয়াকারে।

জার্ম্মাণীর টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে তাহাকে হাঁফ ছাড়িবার অবসর না দিলে সে জাতি হিসাবে টিকিতে পারিবে না। ভার্সাইল সন্ধির ফলে আমরা তাহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছি; সে বাঁধন একটুকু আল্‌গা না দিলে সে সামলাইয়া উঠিতে পারিবে না, তাহার ব্যবসাবাণিজ্যও আর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, পরন্তু আমরা কোনও কালে জার্ম্মাণীর নিকট টাকা আদায় করিতে পারিব না। যে হংসীর নিকট ডিম্বের প্রত্যাশা করা যায়, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, খাইতে না দিয়া গলা টিপিয়া মারিলে লাভ কি? সবে জার্ম্মাণী Militarism সামরিক জাতিগর্ব্বের মোহ ত্যাগ করিয়া শান্তিপ্রিয় ভদ্র জাতি হইতে অভ্যস্ত হইতেছে, এ সময়ে তাহাকে পেটে মারিলে সে বলশেভিজম ও অরাজকতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—ফলে য়ুরোপের পুনর্গঠন অসম্ভব হইবে। অতএব জার্ম্মাণীকে ৪ বৎসর কাল মোরেটোরিয়াম দেওয়া হউক—অর্থাৎ জার্ম্মাণী নোটের টাকা চালাইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে থাকুক; পরে যখন সে এই ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মানুষের মত মানুষ হইবে তখন তাহার নিকট টাকা সহজেই আদায় হইবে।"

উইলসনকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, সেই ফশ ও পোঁয়াকারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেই পুরাতন দাবীই ঝালাইয়া তুলিতেছেন। তখন বহু কষ্টে যে যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে রুদ্ধ হইয়াছিল, আজ পোঁয়াকারে সেই যুদ্ধ বাধাইবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করিতেছেন। ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে প্রবল প্রতিবেশিরূপে বাঁচিতে দিতে পারে না, তাই আজ ক্ষতিপূরণ আদায়ের অজুহতে রূঢ় অঞ্চলে ফরাসী-বাহিনী হানা দিয়াছে। নিরস্ত্র জাতিকে আদেশপালনে বাধ্য করিতে যে উপায়ই অবলম্বিত হউক, বন্দুক-বেয়নেটের সাহায্যগ্রহণ কোনও শান্তিসন্ধির শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। কিন্তু রূঢ়ে ফরাসী তাহাই করিতেছেন।

লজানে যখন তুর্কী বৈঠক বসিয়াছিল, সেই সময়ে অথবা তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে প্যারিসে বিলাতের বৈদেশিক-সচিব লর্ড কার্জ্জন পোঁয়াকারের সহিত জার্ম্মাণ-ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের সম্পর্কে কথা কহিতে আসিয়াছিলেন। বহু বাদানুবাদের পরেও সে কথার মীমাংসা হয় নাই। যে কারণেই হউক, ইংরাজ বলেন,—"বর্ত্তমানে

এ কথা বলা বাহুল্য, ইংরাজের এ পরামর্শে ফরাসী আদৌ সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তবে বহুদিন

ফশ।

যাবৎ আঁতাত মানিয়া চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়, একেবারে বিগড়াইয়া যায়েন নাই। কিন্তু সাধের আঁতাত থাকা না থাকা সমান হইল—ফরাসী স্পষ্টই ইংরাজের কূটবুদ্ধির দোষ ধরিতে লাগিলেন। মার্কিণের কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল, ফরাসীর মনের কথা এই যে,—জার্ম্মাণযুদ্ধের ফলে ইংরাজ বেশ লাভবান্ হইয়াছেন, জার্ম্মাণীর যতগুলি উপনিবেশ আছে, সবগুলিই তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উপস্বত্ব তাঁহারা ভোগ করিতেছেন, পরন্তু তুর্কীর ইরাক প্রদেশে শাসনকর্ত্তৃত্বের অধিকার (mandate) পাইয়া তাঁহারা তৈলের খনির আয়ও হস্তগত করিয়াছেন, তাঁহাদের জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার তত প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইংরাজ জার্ম্মাণীকে ৪ বৎসর হাঁফ ছাড়িবার অবসর দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন; কিন্তু জার্ম্মাণী ঐ ৪ বৎসর প্রস্তুত হইবার অবসর পাইয়া আবার 'মানুষ' হইয়া উঠিলে প্রতিবেশী ফ্রান্সের, বেলজিয়ামের ও তথা ইটালীরই বিপদের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ ফ্রান্স ও বেলজিয়ামেরই জার্ম্মাণযুদ্ধে দেশ ধ্বংস হইয়াছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, উহারা ক্ষতিপূরণের টাকা না পাইলে দেশ সামলাইয়া লইবার অবসর হারাইবে, অতএব ফরাসী ঐ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারেন না।

কার্জ্জন।

এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইটালী স্বতন্ত্রভাবে কায করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ ইংরাজের সহিত ভিন্নমত হইয়া জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চলের কয়লাখনি সমূহের ও ওয়েষ্টফেলিয়ার কারখানাসমূহের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইংরাজ বলিলেন, তথাস্তু। মার্কিণ মিত্রসন্ধির মধ্যে ছিলেন না; পরন্তু মার্কিণ জাতিসঙ্ঘের মধ্যেও নাই, জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভাগ-বাঁটোয়ারাতেও ছিলেন না, ভার্সাইল সন্ধির পর ইংরাজ-ফরাসীতে যে স্বতন্ত্র সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতেও ছিলেন না। এই সকল কারণে মার্কিণ য়ুরোপের রাজনীতির সম্পর্কে থাকিতে চাহিলেন না, ফরাসীর সঙ্কল্পের ফলে অধিকৃত রাইন প্রদেশ হইতে নিজ সৈন্য অপসারণ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন ফরাসী বিনা বাধায় রূঢ় অঞ্চল দখল করিতে উদ্যোগ করিলেন।

প্রথমে ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে চাপ দিয়া বলিলেন, যদি জার্ম্মাণী ক্ষতিপূরণের টাকা সম্বন্ধে রফায় রাজী না হয়, তাহা হইলে রূঢ় অঞ্চলেও ফরাসীর অধিকার বিস্তৃত হইবে। এই অধিকারের কথায় সামরিক অধিকারের সম্পর্ক ছিল না, বে-সামরিক ভাবে কেবল টাকা আদায়ের জন্য অধিকার বিস্তৃত হইবে, এই কথাই ছিল। কিন্তু কার্য্যকালে ইহার বিপরীত হইল। যতই দিন যাইতে লাগিল এবং ফরাসীর 'অধিকারের' চাপ জার্ম্মাণীর অঙ্গে চাপিয়া বসিতে লাগিল, জার্ম্মাণীর প্রতিবাদ ততই উগ্রতর ভাব ধারণ করিতে লাগিল; অনন্যোপায় হইয়া জার্ম্মাণী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিল। যতই ফরাসীর বিপক্ষে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বাড়িতে লাগিল, ততই ফরাসীর বে-সামরিক অধিকার সামরিক অধিকারে পরিণত হইতে লাগিল। ফরাসী কেবল খনি ও কারখানা অধিকার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, জার্ম্মাণ শ্রমিক ও ধনীরা যখন ফরাসীর অধীনে কায করিতে অসম্মত হইল, তখন ফরাসী জর্ম্মাণ পুলিশের বদলে ফরাসী সেনার শাসন প্রচলিত করিলেন, পরন্তু কাষ্টম, ডাক, তার, রেল প্রভৃতি শাসনবিভাগগুলি হস্তগত করিয়া লইলেন। বেলজিয়াম ফরাসীর মতেই মত দিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু ইটালী একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সিনোর মুসোলিনি প্রথমে ফরাসীর দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি ফরাসীর কাযে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, ফরাসীর আসল মতলব কি? বস্তুতঃ ফরাসীর বিপক্ষে কথা কহিবার তখন কেহ নাই। মার্কিণ য়ুরোপের রাজনীতির ছায়া মাড়াইলেন না, ইংরাজ যে কারণেই হউক, ফরাসীকে

ঢালা নিরপেক্ষতা দিলেন, বেলজিয়াম ও ইটালী ফরাসীর সহায় হইলেন; একমাত্র মস্কো হইতে রুষিয়ান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ফরাসীর কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এখন ইটালী রুষিয়ার প্রতিবাদের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। মুসোলিনি ইংরাজ ও মার্কিণকে মধ্যস্থ হইয়া ফরাসীর অত্যাচার নিবারণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

মুসোলিনি।

ফরাসীর অত্যাচার তখন চরমে উঠিয়াছে। ফরাসী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণ ধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের মিল নাই, তাই রূঢ় অধিকারে তিনি জার্ম্মাণ শ্রমিকের সহানুভূতি পাইবেন। এই ধারণার এক কারণও ছিল। এ যাবৎ যুদ্ধের ফল জার্ম্মাণ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যতটা ভোগ করিতে হইয়াছে, ধনীকে ততটা করিতে হয় নাই। তাহারা তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বজায় রাখিয়াছে—এমন কি, আয়-করও অনেক ফাঁক দিয়াছে। এ দিকে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, মার্কের দর কমিয়া যাওয়াতে তাহার মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং ধনীরা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিলেও শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের কষ্টের সীমা ছিল না। রুষিয়ার বলশেভিকবাদের ফলে জার্ম্মাণ শ্রমিক ও মধ্যবিত্তেরা ধনীদের উপর এই হেতু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ফরাসীর ইহাই প্রধান ভরসা ছিল।

কিন্তু রূঢ় অধিকারের পর জার্ম্মাণ ধনী ও শ্রমিক এক হইয়া গেল। একটা জাতীয় দেশ-প্রীতির তরঙ্গ সমগ্র রূঢ় অঞ্চলের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল। এক জন জার্ম্মাণ খনি-ওয়ালা বা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করায় ধৃত বা দণ্ডিত হইলে সমস্ত খনির মজুর ও ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিতেছে। জার্ম্মাণ হোটেলে ফরাসী সরাপ ও খাদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, জার্ম্মাণ মহিলা ফরাসী সেনার সহিত কথা কহিলে তাহার কেশ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইতেছে, জার্ম্মাণ রেল-কর্ম্মচারী, ডাক-কর্ম্মচারী, পুলিস-কর্ম্মচারী প্রভৃতি ফরাসীর আদেশ মানিতেছে না—অম্লানবদনে দণ্ড গ্রহণ করিতেছে। অপ্রস্তুত, নিরস্ত্র ও দুর্ব্বল জাতির যাহা প্রধান অস্ত্র—সেই অসহযোগ মন্ত্র সমগ্র জার্ম্মাণজাতি গ্রহণ করিয়াছে। 'নিউইয়র্ক ট্রিবিয়ুন' বলিয়াছেন,—এই সময়ে এক জন জার্ম্মাণ গন্ধীর আবির্ভাব বড়ই প্রয়োজন। আজ নিরস্ত্র, দুর্ব্বল ভারতে যে অস্ত্র সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, দুই দিন পূর্ব্বে যে জার্ম্মাণী অজেয় বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছিল, সেই জার্ম্মাণী নানা অপমান-লাঞ্ছনার পরে সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে—অভাব সেই অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার এক জন উপযুক্ত নেতার।

কিন্তু নেতার অভাবেও জার্ম্মাণীর সাধারণ প্রজা যে অদ্ভুত একতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পতার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সমগ্র জগৎ বিস্মিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ লোক বলিতেছে, "ফরাসীরা জার্ম্মাণকে গুলী করিয়া মারিতে পারে, নির্ব্বাসিত করিতে পারে, জেলে আটক করিতে পারে; কিন্তু রূঢ়ের জনসাধারণের অদম্য তেজ দমন করিতে পারিবে না। অসহযোগ অস্ত্র ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে, উহার নিকট বন্দুক-বেয়নেট কিছু করিতে পারে না।"

বার্লিন হইতে এখনও ফরাসী বেলজিয়ানদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই—বার্লিন গভর্ণমেণ্ট এখনও সেই প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন নাই।" তবে তথাকার হোটেল হইতে ফরাসী বেলজিয়ান খরিদদার তাড়ান হইয়াছে। লক্ষ টাকা দিলেও ফরাসী বা বেলজিয়ান, বার্লিনের হোটেলে এক টুকরা রুটী পাইবে না। রঙ্গালয়ে ফরাসী নাটক অভিনীত হয় না; নাচ-ঘরে ফরাসী-নাচ কেহ নাচে না; পথে-ঘাটে কেহ ফরাসী ভাষায় কথা কহে না; ঘরে-বাহিরে কেহ ফরাসী মদ খায় না, ফরাসী কাপড় পরে

না; সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিটা যেন ফরাসী নামটা বর্জ্জন করিয়াছে। এসেনের বড় খনিওয়ালা মস্ত ধনী হার ফ্রিটজ থাইসেন যখন ফরাসীর আদেশ অমান্য করিয়া দণ্ডিত হয়েন, তখন রুঢ়ের জার্ম্মাণ জনসাধারণ প্রকাশ্যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিল; অথচ এই থাইসেনেই কিছু দিন পূর্ব্বে ধনী বলিয়া শ্রমিকদের অপ্রিয় ছিলেন! রুঢ়ে ফরাসীর সামরিক শাসনযন্ত্রে যে সমস্ত জার্ম্মাণ দলিত পিষ্ট হইতেছে, জার্ম্মাণ সংবাদপত্রে তাহাদের নাম-ধাম ইত্যাদি বড় বড় অক্ষরে Roll of honour of the Ruhr রূপে প্রকাশিত হইতেছে। রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু হইলে বা বীরপুরুষ আহত হইলে Roll of Honourএ নাম উঠে। ইহারই অনুকরণে আমাদের দেশে ধর্ষণনীতির ফলে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দেশকর্ম্মীর নাম জাতীয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে Roll of Honour পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল।

মিঃ বোনার ল।

এই যে একটা স্বাধীন জাতির প্রতি অত্যাচার—ইহার পরিণাম-ফল কি হইতে পারে? জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা ৬ কোটিরও অধিক—৬ কোটি লোককে বেয়নেট-বন্দুকে দমন করিয়া রাখা যায় না—অন্ততঃ যে জাতি এখনও স্বাধীনতা ও শক্তির আস্বাদ ভুলিবার অবসর পায় নাই—তাহাকে ত যায়ই না। দুই দিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর হুঙ্কারে ধরিত্রী কম্পিত হইয়াছিল—সপ্তরথিবেষ্টিত সে আজ নিরস্ত্র, দুর্ব্বল; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার জাত্যভিমান, তাহার তেজ, তাহার দর্প অন্তর্হিত হয় নাই। কেবল নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত বলিয়াই সে পড়িয়া মার খাইতেছে। কিন্তু এ অপমান সে কখনও ভুলিবে না—ভুলিতে পারে না। বার্লিনে এক জন প্রবাসী ইংরাজকে কোনও জার্ম্মাণ বন্ধু বলিয়াছেন:—"We shall not forget this for generations."

বোধ হয়, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ডে সুর বদলাইতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোনার ল ফরাসীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ফরাসীকে বাধাও দেন নাই। তাঁহার নীতির নাম দেওয়া হইয়াছে—Benevolent Neutrality. এ সব য়ুরোপীয়ান Diplomacyর রাজনীতিক চালবাজীর হেঁয়ালি কথার অর্থ বুঝা ভার। নিরপেক্ষতা আবার দয়ামূলক কি? নিরপেক্ষতা—নিরপেক্ষতা, ইহাতে দয়াও নাই, ঘৃণাও নাই। তবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ফরাসীর প্রতি নিরপেক্ষতাও দেখাইবেন, দয়াও দেখাইবেন, অর্থাৎ ফরাসী যদি রুঢ়ে জার্ম্মাণ তেজ দমন করে, তাহাতে বাধা দিবেন না, আবার ইংরাজ-অধিকৃত রাইনহেড অঞ্চল দিয়া যদি ফরাসী রুঢ়ের কয়লার গাড়ী পাঠায় বা ঐ অঞ্চলে দণ্ডিত জার্ম্মাণ অপরাধীকে ধরিতে আইসে, তাহা হইলেও বাধা দিবেন না। ইহাই হইল দয়া-সংবলিত নিরপেক্ষতা বা Benevolent neutrality. কলোন ইংরাজ অধিকৃত রাইনহেড অঞ্চলে অবস্থিত। ফরাসী সামরিক পুলিস (জেনডার্ম্মস) জার্ম্মাণ ল্যাণ্ডস ফাইনানজামতের প্রেসিডেণ্টকে কলোন সহরে গ্রেপ্তার করে, তিনি নাকি রাইনল্যাণ্ড কমিশনের এক আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক ইংরাজ সৈনিক ক্রুদ্ধ হয়। অনেক ইংরাজ বলে,—আমরা ফরাসীর রুঢ়ের নীতির অনুমোদন করি না, অথবা উহার জন্য দায়ীও নহি, অথচ আমাদের হুদ্দায় ফরাসীকে রুঢ়ের নীতি চালাইতে দিই, ইহা কেমন কথা?

এই হেতু ইংলণ্ডে দুইটি দল হইয়াছে। এক দল—বোনার ল'র দল, ফরাসীর সহিত কোনও মতে মনোমালিন্য ঘটাইতে চাহেন না। তাঁহাদের কথা, Entente at any cost. তাঁহাদের propaganda প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে, লর্ড রদারমোরের 'ডেলি মেল' প্রমুখ পত্র। লর্ড রদারমোর, প্রচার-কার্য্যে লর্ড নর্থক্লিফের প্রায় সমকক্ষ। এ সব কাগজে জার্ম্মাণদিগকে জার্ম্মাণ যুদ্ধকালের হুণ, বর্ব্বর, বস ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করিয়া ফরাসীর কার্য্যে বাহবা

দেওয়া হইতেছে এবং বলা হইতেছে, "দেখা যাউক না, ফরাসী ঠিক পথে চলিয়াছে, কি আমরা ৪ বৎসরের মোরেটরিয়মের কথা বলিয়া ঠিক পথে চলিয়াছি।" আপাততঃ এই দলেরই জয় হইয়াছে। পার্লামেণ্টে লেবর ও লিবারল দলরা এক হইয়া প্রধান মন্ত্রীর এই দয়ামূলক নিরপেক্ষতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জাতিসঙ্ঘের দরবারে আবেদন করিয়া বিশেষজ্ঞ কমিশন নিযুক্ত করিয়া জার্ম্মাণদের ক্ষতিপূরণ দিবার কত সামর্থ্য আছে, অবধারণ করা হউক এবং সে পর্য্যন্ত ফরাসীকে রূঢ় অধিকারে ক্ষান্ত দিতে বলা হউক। ভোটে কিন্তু লেবর ও লিবারলদেরই পরাজয় হইয়াছে। বিজেতৃপক্ষ বলিতেছেন, ফরাসী ভার্সাইল সন্ধি অনুসারে রূঢ় অঞ্চল অধিকার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

অপরপক্ষ ইঁহাদিগকে Diehard আখ্যা দিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ফরাসীদেশে যেমন Chauvinist, ইংলণ্ডেও তেমনই Diehard, দুই-ই সাম্রাজ্যবাদী, দুই-ই অসির উপাসক। ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা মিঃ ফিলিপ স্নোডেন বলিয়াছেন, "বৃটিশ সরকারের ফরাসীনীতি weak and contemptible দুর্ব্বল ও ঘৃণার্হ।" কেন, তাহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"ভার্সাইলের সন্ধি জার্ম্মাণী ভঙ্গ করে নাই, ফরাসী করিয়াছে। ভার্সাইল সন্ধির দোহাই দিয়া ফরাসী রূঢ়ে যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহা করিতে পারেন না; এই অত্যাচারের দ্বারা ফরাসী জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস করিতেছেন এবং রাজনীতিক সীমানাও হ্রাস করিয়া দিতেছেন। এই নীতি সমর্থন করিয়া বৃটিশ সরকার লোকচক্ষুতে দুর্ব্বল ও ঘৃণার্হ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।" মিষ্টার টমাস নামক পার্লামেণ্টের আর এক জন শ্রমিক সদস্যও বলিয়াছেন, "জার্ম্মাণ শ্রমিক নেতৃবর্গের বিশ্বাস, রূঢ় অধিকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা নহে, রূঢ় অঞ্চলকে দ্বিতীয় আলশাস-লোরেনে পরিণত করা।" বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধবাদীরা আরও এক কথা বলেন যে, —"জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট covenant (আইনে) ১১ নং ধারায় বলে, যেখানে কোনও জাতি আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গ করিবার মত কায করে, সেখানে জাতিসঙ্ঘ তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য হুকুম দিতে পারেন। তুর্কী মস্থল চাহিয়াছে বলিয়া ঐ ১১ ধারা প্রয়োগের কথা উঠিয়াছে। রূঢ়ের বেলা ফরাসীর বিপক্ষে ১১ ধারার কথা উঠে না কেন?"

কেবল ইহাই নহে, ইংরাজ-ফরাসীর বিপক্ষে ইঁহারা আরও একটা সাংঘাতিক কথা বলিতেছেন। ফরাসীর বিপক্ষে অভিযোগ এই যে, ফরাসী ইচ্ছাপূর্ব্বক জার্ম্মাণীর সহিত বিরোধ ঘটাইতেছেন। কেন, তাহার কারণও প্রদর্শন করা হইয়াছে। যুদ্ধের পর জার্ম্মাণদের ফরাসীবিদ্বেষ ছিল না বলিলেই হয়; যাহা কিছু ছিল, তাহা একটু সদ্ব্যবহার পাইলে দূর হইয়া যাইত। দুই শতাব্দী যাবৎ উভয় জাতির মধ্যে যে ঘোর সন্দেহ ও বিদ্বেষবিষ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কেন না, যে জার্ম্মাণ সামরিক সম্প্রদায় এতদিন ফরাসীর শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা যুদ্ধের পর শক্তিহীন হইয়াছিল, তাহার স্থানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধস্থগিতের সন্ধির (armistice) পর হইতে ফরাসীর সামরিক সম্প্রদায় কিছুতেই জার্ম্মাণীকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। এমন কি, ফরাসী পরোক্ষভাবে জার্ম্মাণীর রাজপক্ষীয় দলকে (monarchists) গোপনে সাহায্য করিয়াছে—ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বাভেরিয়ার রাজপক্ষীয় দলকে অর্থ দিয়া পোষণ করিয়াছে, এমন কথাও শুনা যায়।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অভিযোগ অন্যরূপ। বিরুদ্ধবাদীরা স্পষ্ট বলেন,—"Mr. Bonar Law gave him (M. Poincare) a free hand, perhaps in return for concessions in the Near East." ইহা বড় ভীষণ কথা,—"মিঃ বোনার ল সন্নিহিত প্রাচ্যে সুবিধার বদলে মুসিয়ে পোঁয়াকারেকে রূঢ় অঞ্চলে খোলা হাত-পায় কায করিতে দিয়াছেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজ সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা।

এই তীব্র সমালোচনাতেও বৃটিশ সরকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই, আর হইবে বলিয়াও মনে হয় না। তাহা হইলেই আবার য়ুরোপে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়া রহিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

মিলন-রাত্রি

বিংশ পরিচ্ছেদ
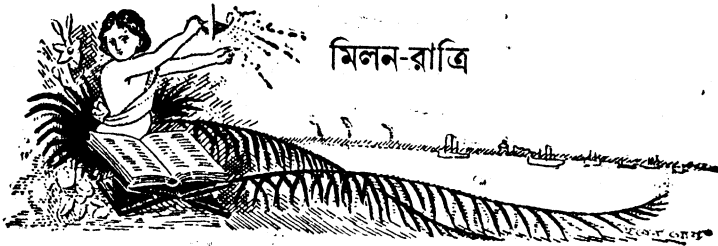
এবার যেন মহারাণী শরৎকুমারকে অতিরিক্ত সুনজরে দেখিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কলিকাতা আসিয়া নানা মাসিক পত্রিকা হইতে নানা পৌরাণিক ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ডাক্তার প্রসাদপুর যাইবার সময় তাঁহার হাতে সেই সকল ছবি ঠাকুরমাকে সে উপহার পাঠায়। শরৎকুমার চিকিৎসার অবসরে প্রায়ই প্রতিদিন একবার করিয়া মহারাণীর চরণদর্শনে আসিতেন, এবং সেই ছবিগুলির সম্বন্ধে অবতারিত প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যায় তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিতেন। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর মহারাণী পরিতৃপ্তচিত্তে ভাবিতেন, "মরি মরি! দেখতে যেমন সুশ্রী, পেটে তেমনি গুণ! চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে, বিদ্যাবুদ্ধি, বিনয়, সৌজন্য যেন ফেটে পড়ছে? মেয়েরও যে ছেলেকে মনে ধরেছে—তা ত বোঝাই গেছে! অমন ছেলে মনে ধর্‌বে না ত, ধর্‌বে কাকে? অতুলেরও ত এর প্রতি যথেষ্ট টান। তবুও যে বিয়েতে দেরী হচ্ছে কেন, সেইটেই আশ্চর্য্য। কে জানে বাবু, অতুলের মনের নাগাল যদি কিছুতে পাওয়া যায়!"

শ্যামাচরণের মধ্যবর্ত্তিতায় এ বিবাহ যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়েই মহারাণী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, শ্যামাচরণ বুঝাইয়া বলিলেই এ সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য সজাগ হইবে। মহারাণীর কথা ত তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন না; মায়ের মুখে এ কথা শুনিলেই রাজা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

শ্যামাচরণের হাতে জ্যোতির্ম্ময়ী ঠাকুরমাকে এইরূপ একখানি পত্র দিল :—

শ্রীচরণকমলেষু,

শত শত প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

ঠাকুর-মা, সুখবর জানিবেন। আমি নূতন মায়ের স্নেহে আমার হারা মাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। বাবারও মনোনীত হইয়াছে। ইহা আমার অনুমান মাত্র নহে, যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। এখন আপনি আসিয়া শুভদিন নির্দ্ধারণ করিবেন। সবিশেষ খবর শ্যামাচরণ-কাকার নিকট পাইবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

আপনার চিরস্নেহের— প্রণতা—রাণী।

চিঠিখানি পড়িয়া ঠাকুর-মার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা রাহুগ্রস্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি বিষণ্ণভাবে শ্যামাচরণকে কহিলেন—"খবর ত শুভ বটে, কিন্তু মেয়েটিও বড় হয়ে উঠেছে, তার একটা গতি না করেও ত এ কাযে মন দিতে পার্‌ছিনে। যখন অতুলকে বিয়ের জন্য জেদ করেছিলুম—তখন মেয়ে ছোট ছিল—এখন আগে ভাগে বাপের বিয়েই বা দিই কি ক'রে? কি বল তুমি বাবা?"

শ্যামাচরণ মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "যা বলেছেন, তা ঠিক বই কি? তবে দেরী হ'লে আবার এদিকে রাজার মতিগতি না ফিরে যায়।"

"দেরী কেন হবে? চার হাতে একই সময়ে বাঁধন পড়ুক না? এখানে ত বরকর্ত্তা তুমি,—তোমার ইচ্ছাতেই ত কর্ম্ম।"

শ্যামাচরণ কথার অর্থ বুঝিয়াও বোকা বনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। মহারাণী তখন একটু হাসিয়া অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন—"বর ত আমাদের সকলেরই মনে এক রকম ঠিকই হয়ে আছে—তবে সাত কথা না হ'লে বিয়ে হয় না—এই যা! তুমি এবার তোমাদের দিক থেকে প্রস্তাবটা পাকা ক'রে ফেলো, শ্যামাচরণ।"

শ্যামাচরণ মহারাণীর চরণে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"আপনি কি শরতের কথা বল্‌ছেন?"

"এতক্ষণে কি সেটা বুঝলে, বাবা! রাজারই অনুরূপ মন্ত্রীও বটে!"

তখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া সহাস্যভাবে শ্যামাচরণ কহিলেন,"মাপ করবেন মহারাণি,আমার দ্বারা ঘটকালী টট্‌কালী হবে না। আমি বরকর্ত্তা হ'তে চাইনে, আপনি, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা উভয় কর্ত্তাই হয়ে এ সম্বন্ধটা পাকা করে ফেলুন। জানেন ত আজকালকার ছেলেরা মা বাপ মানে না—তা আমি ত মামা। কিন্তু আপনাকে সে ঠিকই মান্‌বে।"

মহারাণী বলিলেন—"কথাটা কি জান শ্যামাচরণ, শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে আমার ঘরের বাইরে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। সব হারিয়ে একটি অতুলে ঠেকেছে আমার, দুবেলা দেবতার দোরে তাঁর মঙ্গল কামনা না কর্‌লে আমার দিন বৃথা যায়।"

"কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর কথা ভুল্লেও ত চল্‌বে না, মা!"

"না; তাই বা ভুল্‌তে পারি কই? যাব কলকাতায়, কিন্তু বেশী দিন যেন থাক্‌তে না হয় বাবা, সে ভার তোমার উপর। তুমি গিয়ে সব আয়োজন ক'রে ফেলো, আমি শেষ মুহূর্ত্তে সেখানে পৌঁছে, আমার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে ঘরে বৌ-জামাই একসঙ্গে যেন নিয়ে আস্‌তে পারি।—সেখানে পৌঁছেই এই চিঠিখানি রাণীর হাতে দিও।"

শুভাশীর্ব্বাদ দীর্ঘায়ু হস্ত,

রাণিজি, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিলাম। কিন্তু আমারও তোমাকে একটি সুসংবাদ দিবার আছে। আজ প্রাতঃকালে মন্দিরে যাইবার সময় দেখিলাম—তোমার নব-মল্লিকার গাছটিতে অসময়ে একটি কুঁড়ি ধরিয়াছে, আর একটি প্রজাপতি তাহার উপর বসিয়া আছে। আমি ইহার যে অর্থবোধ করিলাম, তাহাতে মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তোমার নিকট হইতেও ইহার অর্থব্যাখ্যা চাই।

রাণীর যখন জোর তলপ, তখন শ্যামসুন্দরকে ছাড়িয়াও শীঘ্র হুকুম তামিল করিব, এবং একেবারে জোড়মাণিক লইয়া ঘরে ফিরিব। ইহার ব্যবস্থা করিতে শ্যামাচরণকে বলিলাম—তুমিও প্রস্তুত থাকিও।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ঠাকুর মা।

রাণী চিঠিখানি পড়িয়া, হাসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "ঠাকুর-মার যেমন কথা।" তাহার পর আর একবার চিঠি পড়িতে গিয়া—উপরের কোণে ছোট অক্ষরে লেখা কথাগুলির দিকে নজর পড়িল—"মনে রেখো রাণিজি,—তুমি বিয়ে না কর্‌লে তোমার বাবা কখনই বিয়ে কর্‌বেন না।"

তখন রাত্রিকাল—দাসী আহারের খবর দিয়া গিয়াছে, বালিকা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি মুড়িয়া দেরাজের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গেল। আহারান্তে গৃহে ফিরিয়া চিঠিখানা আর একবার তাহার পড়িতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই সে শুইয়া পড়িল। তখন তাহাকে চিঠি পড়িতে দেখিলে কুন্দ কি ভাবিবে? যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা কুন্দ জিজ্ঞাসাই করে—তবে কি উত্তর দিবে সে?

পরদিন প্রভাতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর জ্যোতির্ম্ময়ী আর একবার চিঠিখানি পড়িয়া লইয়া তেতালার ছাতের উপর উঠিল। প্রায় প্রতিদিনই সে উদয়-শোভা দেখিতে এখানে আসে। আজ কিন্তু আধ ঘণ্টা দেরীতে আসিয়াও পূর্ব্বদিগন্তে কোথাও একটু উজ্জ্বল রাগ দেখিতে পাইল না। রাত্রিকালে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ভিজা গাছপালার মাথার উপর কুয়াসার কালো পাতে ঢাকা সূর্য্যের আলো প্রভাতে সন্ধ্যার ভাব ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে সজল চঞ্চল বাতাস উঠিয়া ঝাউ, দেবদারু, শাল, তাল প্রভৃতির শাখা দুলাইয়া দিয়া সেই কৃষ্ণ নিবিড় পটে যে ছিদ্র রচনা করিয়া দিতেছে, একটু অরুণ-জ্যোতির দর্শনব্যাকুল জ্যোতির্ম্ময়ী তন্মধ্যে নয়ন প্রবিষ্ট করিয়া দিতে না দিতে সেই ছিদ্রপথে—মুহূর্ত্তে মেঘ-জমাট হইয়া পড়িতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী আজ ক্ষুণ্ণচিত্তে অন্ধকার আকাশের দিকেই করযোড়ে চাহিয়া অন্তর্দ্দেবতার ধ্যান সমাপন করিল। অতঃপর নীচে যাইবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে ফিরিয়া, সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! পূর্ব্বদিকে এক বিন্দু রক্তিম রাগ নাই, আর পশ্চিম আকাশের স্তরে স্তরে উষার নানাবর্ণ আলিম্পন চিত্রিত! এখনই যেন সূর্য্যদেব ইহার মধ্য দিয়া পূর্ণ মহিমায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিবেন! রাজকুমারী বিস্ময়স্তিমিত দৃষ্টিতে এ চিত্র অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হে অন্তর্দ্দেবতা! এ কি ইঙ্গিত করিতেছ তুমি? তোমার উদ্দেশ্যপথে অসম্ভবও কি সম্ভবরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে? তবে তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছা দ্বারাই আমাকে ইচ্ছাযুক্ত কর হে প্রভু, অনন্তশক্তিধারী বিধাতৃপুরুষ!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত এবং অনাদি এই দুই জনে যে একবার বিদ্রোহী দলের সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন। বসন্ত এখন রাজ-কোতোয়ালির নায়ক। কনফারেন্সের সময় ইহার কার্য্যপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বাহাদুর ইহাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হইতে ইহারা উভয়ে কোতয়ালির বহির্দ্দিকের একটি ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সন্তোষের নোটবহিখানার অর্থভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। নামের সঙ্কেত, বাক্যের সঙ্কেত মোটামুটি তাহারা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছে, নম্বরের সঙ্কেতও অনেকটা বুঝিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছিল না কেবল নম্বরগুলার সহিত বাক্যশব্দগুলার ঠিক যোগাযোগ।—ইহা মিলাইতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন—একটা চন্দ্রবিন্দুর পর ২ × ৫ নম্বর ইহার পর একটা বাণফলক ও চতুষ্কোণ চিহ্নের নীচে লেখা পিংপং। পিংদিং অর্থাৎ প্রাণপণে শপথবদ্ধ লোক—ইহা তাহারা শব্দসঙ্কেত হইতে আগে বুঝিয়াছিল, অতএব মোটামুটি তাহারা এই বুঝিল, পিংপং দল কোন রেলগাড়ীকে ডিরেল করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চতুষ্কোণ গাড়ীর এবং বাণফলক ধ্বংসের চিহ্ন-সঙ্কেত বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিল। কিন্তু ১ × ৫ এই নম্বরের সহিত উক্ত সঙ্কেতের কি যোগ, তাহা ত বুঝা গেল না। অনাদি বলিল,—"খুব সম্ভব—এটা লোকসংখ্যা। দুজন থেকে ৫ জন লোক এ কাযে জোটার অর্ডার পেয়েছিল।"

বসন্ত বলিল,—না হে, তা নয়। ও নম্বর হচ্ছে সময়ের সঙ্কেত। দেখছ না, প্রথমেই চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ তিথির তারিখ তার পর এল মাস দিন।"

"তা যদি হয়—তা হ'লে কাযের কাল প'ড়ে যায় ভবিষ্যতে—আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে। সে দিন ভোরবেলা কোন হুমড়ো-চুমড়োর কলকাতায় আসার কথা আছে না কি হে?"

"কই, তা ত শুনিনি।"

"তা যখন শোননি, তখন তোমার ব্যাখ্যাটা নিরর্থক বলেই পেষ করা গেল; ও নম্বরগুলা কখনই Future tense নয়, Past। কিছুদিন আগেই একটা ট্রেন ডিরেল হয়েছিল—মনে নেই? খুব সম্ভব, এই কর্ত্তারাই তা করেছিলেন। যা হ'ক, এ সঙ্কেতটার সঙ্গে বোঝাপড়া এক রকম হয়ে গেল, এবার আর একটা ধর দাদা?" কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্কেতটাও ঐরূপ যবস্থবভাবে মীমাংসিত হইতে না হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া নোটবহির অক্ষরগুলাকে একেবারেই অস্পষ্ট করিয়া তুলিল। বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য—কে জানে, আমাদের নবীন সঙ্কেত-পাঠক বসন্ত, প্রত্নতাত্ত্বিকের উচ্চাসন-লাভ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তখন বইখানা মুড়িয়া ফেলিল এবং সিগারেটের উদ্দেশ্যে পকেটে হস্তপ্রদান করিয়া কহিল,—"বুঝে নিয়েছি সব, এইবার ইতি দেওয়া যাক্।"

অনাদি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে তাহার নয়নজ্যোতিতে অন্ধকার ঘরখানাও উজ্জ্বল করিয়া বসন্তকে কহিল,—"এরই মধ্যে ইতি কি হে? ঐ ত আমাদের জাতের দোষ! কিছুরি ভিতরে প্রবেশ করতে চাইনে। দাও দাও দেশলাইটা আমাকে, আগে তোমার তমোটা আমি নাশ করি, মুখাগ্নি পরে করো।" বলিতে বলিতে দেশলাইটা বসন্তের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া টেবলের কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া লইল, হেনকালে ভৃত্যবাবু গৃহপ্রবেশ করিয়া দীপ প্রজ্বলিত দেখিয়া হাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। বসন্ত অতঃপর চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিল,—"অত রাগতে হবে না হে, যা বুঝেছি, তাতেই কায চালিয়ে নিতে পার্‌ব।"

"বইখানার ছোঁয়াচে লাগলো না কি দাদা? হঠাৎ তুমিও যে দেখছি, সাঙ্কেতিক হয়ে উঠলে। কি কায চালাতে পার্‌বে?"

"অঙ্কগুলা উদ্ধার কর্‌তে পার্‌ব—এমন আশা হচ্ছে?"

"আশা—না বাসনা? সর্প—না রজ্জু?"

"না হে না, আশাই ঠিক, আমি ভুল বলিনি। দলপতির সঙ্গে দেখা করিয়ে-দেবার জন্য সন্তোষ যে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল—সেখানে ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে ওরা যে কায়েমি একটা বাসা বানিয়েছে—এই নোটবই থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—"

"তা ত যাচ্ছেই।"

"আর সে দিন সন্তোষ কি বলেছিল, মনে আছে ত? বাধাহীন মিলনের জন্যই অনেক খুঁড়ে আমাদের জন্য ঐ Loner's cornes সে আবিষ্কার করেছে।"

দুই জনে খানিকটা হাসিল, তার পর অনাদি বলিল—"হ্যাঁ, আর একটু হ'লেই তাদের প্রেমের ফাঁসটানে মহামিলনের পথেই আমরা গিয়ে পড়তুম! সে যাত্রা কি শঙ্কাই পেয়েছি আমরা।"

"সে মরে গিয়েও আমাদের বড় বাঁচান বাঁচিয়েছে। নইলে এতদিন যে, সে আরো কত কাণ্ড করত', তার ঠিক নাই।"

"তা ঠিক। এখন তোমার আশার কথা বল হে।"

"অস্ত্রগুলা যদি তারা এই আড্ডাতেই রেখে থাকে, তা হ'লে উদ্ধার করতে পারব ব'লে মনে করি।"

"চোরের উপর বাটপাড়ি? কি মজাই হয় তা হ'লে?"

"অত লাফাস্‌নে! তুই যে এখনি কায করতে চল্লি? কাযটা কিন্তু খুব সহজ নয়। ওদের আস্তানার মধ্যে ঢুকব কি ক'রে, সেখান থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরোব কি ক'রে, কখন্ সেখানে লোক জমে, কখন্ যাওয়া নিরাপদ, সে সব ত আগে সন্ধান নিতে হবে—জঙ্গলে প্রবেশের পথ ছাড়া আমরা আর ত কিছুই জানিনে।"

"তোমার হাতে ত চতুর লোক অনেক আছে।"

"আরে অপোগণ্ড! অনেক লোকে কায সিদ্ধ হয় না—নষ্টই হয়। আমার ভরসা একটি ছোট্ট মর্কটের উপর,—এ হেন লঙ্কাপুরী ত মর্কটদূতেই জালিয়ে দিয়েছিল।"

অনাদি কৌতূহলপরবশ হইয়া কহিল,—"কে তোমার সে মর্কটরূপী ভগবান্—বল দাদা—"

"দীনেশকে জানিস্? আমাদেরই ব্যায়াম-সমিতির সে একজন মেম্বর ছিল—সব চেয়ে ছোটখাট লোকটি, কিন্তু সব চেয়ে সে উৎসাহী ছিল। অথচ রাজকুমারীর ভাই-ফোঁটার দিন,—একটি কথা সে কইলে না, সমস্ত দিনই গোম্‌সা হয়ে রইলো,—মনে আছে ত?"

"না, মনে নেই, সম্ভবতঃ সেই বেঙ্কটেরামের দিকে আমার নজরই পড়েনি।"

"সে যে রাজকুমারীর সম্ভাষণে আহ্লাদ প্রকাশ করেনি—তার কারণ—সে তখন বিদ্রোহী দলে ঢুকেছিল।"

"তাকে তুমি হাতে পেয়েছ না কি? সে কি এখন তার ভুলটা বুঝেছে?"

"জানিনে তা। কিন্তু বুঝলেই বা কি ফল? সে ত আর গোয়েন্দাগিরি ক'রে দলের লোককে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছে না।"

"তবে?"

"বড় মজাই হয়েছে। কাল সোনারগাঁয়ের পথে তার সঙ্গে দেখা, সে ভেবে নিলে, আমি তাদেরই দলের একজন। জঙ্গলে প্রবেশের সময় বোধ হয়, সে আমাদের দেখেছিল।"

"তার পর?"

"আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠলো—'গুরু গুরু'। বুঝে নিলুম—ওটা হচ্ছে তাদের সাঙ্কেতিক সম্ভাষণবাক্য। তখন ত নোটবই পড়িনি, আমার বলা উচিত ছিল—চরণ শরণ—"

"এই যাঃ, কি বল্লে তুমি?"

"আমিও আস্তে আস্তে বল্লুম—গুরু গুরু।"

"ধরা প'ড়ে গেলে?"

"না ভাই, জান ত লোকটা তেমন চালাকচতুর নয়—একটু বরঞ্চ বোকাটে ধরণের,—সে হয় ত ভাবলে—আমি এখনও তাদের অন্তঃকুটীরে ঢুকিনি। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, মনে হোল যেন কিছু বলতে চায়—আমি দেখলুম বেগতিক, বেশী কথা কইলেই ধরা পড়ব—অথচ তার কাছে থেকে চোরাই মালের খবরটা যদি কোন গতিকে আদায় করতে পারি, এই ভেবে—তখন কথা কবার সময় নেই এই ওজরে আজ তাকে এখানে আস্‌তে বলেছি। ইতিমধ্যে আমরা রিহার্শেল দিতে পারব—এই ছিল আমার মৎলব। তার পর এখন ত নোটবইখানা প'ড়ে বড়ই সুবিধা হয়েছে। আমার পুরো বিশ্বাস যে, তাকে আমি হাত ক'রে কায সিদ্ধ করতে পারব। ঐ পায়ের শব্দ—তুই ও ঘরে গিয়ে বোস্। তোকে দেখলে লোকটার মনে যদি কোন রকম সন্দেহ জন্মে যায় ত সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

"সন্দেহ করার ত কোন কারণ নেই, তোকে যদি দলপতির কাছে দেখে থাকে ত আমাকেও দেখেছে, তোর কিছু ভাবনা নেই—আমি তার বিশ্বাসী হ'তে পারব।"

দীনেশ আসিয়া অনাদিকে দেখিয়া প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল—কিন্তু উভয়েই যখন গুরু গুরু মিঞাদীন বলিয়া অভ্যর্থনা করিল—তখন সে আশ্বস্ত হইয়া গুরু গুরু চরণ-শরণ সম্ভাষণে নিকটে আসিয়া প্রথমে

অনাদির সহিত কোলাকুলি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ভাই নাম ?"

অনাদি বলিল,—"২৫ নম্বর—" তাহারা নোটবুকে দেখিয়াছিল, ২৪ নম্বরের পর আর নামের নম্বর নাই।

দীনেশ বলিল—"এখও তা হ'লে তুমি প্রথম কুঠরীর লোক, দ্বিতীয় কুঠরীতে ঢোকা হচ্ছে কবে ?"

"গুরুর অনুজ্ঞা যখন হয়। পরীক্ষায় পাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

দীনেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কিরূপ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া দ্বিতীয় কুঠরীতে সে উঠিয়াছিল—বোধ হয়, সে কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। এইবার বসন্তের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নাম সেবাধারী ?"

"বন্ধুমিঞা মোক্ষানন্দ।" প্রথম কথাটা আপনার নাম হইতে বসন্ত বানাইয়া বলিল,—দ্বিতীয় শব্দ তাহারা নোটবুকে দেখিয়াছিল।

দীনেশ "নমো নমো" বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমিও এক দিন মনে ধ'রে রেখেছিলুম—কিন্তু—"

বসন্ত বলিল, "কিন্তু নিরাশার ত কোন কারণ নেই।"

"তুমি ভাইয়া কি তা হ'লে জান না—যে—"

"অনেক কথাই জানিনে আমি,—কিছুদিন থেকে মোক্ষলাভের আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, মন্দিরে যাবার সময় ক'রে উঠতে পারিনি ভাইয়া।"

অবনত মুখে দীনেশ বলিল—"আমি দাগী হয়েছি।"

"তুমি দাগী। বড়ই দুঃখের বিষয়,—এমন উৎসাহী সেবাধারী তুমি ? অপরাধ ?"

"পারিনি তা, পারিনি আমি। গুরুর আদেশ অমান্য করেছি।"

বসন্ত ও অনাদি দুই জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে,—নিজেরা নীরব থাকিয়া উহাকে কথা কহিতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাহারা বুদ্ধিমানের কাযই করিল, আপনা হইতেই অতঃপর সে বলিল,—"ডাক্তার এখন কোথায় ?"

অনাদি তখন সহাস্যে বলিল,—"আমাদেরই দলে !"

"আমাদেরই দলে ! তিনি তবে সেবাধারী হয়েছেন ! গুরু প্রসন্ন হউন। বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে এ হাতটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনিই আমার ভাঙ্গা হাত জোড়া দিয়েছেন, তা ত জান ?"

"জানি বই কি।"

"গুরুর আজ্ঞা পেয়েও এ হাত তাই তাঁর বিরুদ্ধে তুলতে পারি নি। বন্ধু মিঞা, আমি দাগী হয়েছি।"

অনাদি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমার প্রতি এরূপ আদেশ হ'লে আমিও অমান্য করতুম,—তুমি ঠিক কাযই করেছ ভাইয়া।"

দীনেশের ম্রিয়মাণ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত-কাল পরেই আবার ম্লানভাবে সে উত্তর করিল,—"কিন্তু আমি যে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করেছি,—ডাক্তার যে দেশ-শত্রু। তুমি কি বল বন্ধু মিঞা ?"

বসন্ত আশ্বাসবাক্যে বলিল,—"না মিঞাদীন, ডাক্তার দেশশত্রু নন্; দেশসেবক তিনি, গুরু ভুল বুঝেছিলেন।"

অনেক দিন পরে দীনেশের বুকের চাপা পাতরখানা কে যেন উঠাইয়া ধরিল, সে আরামে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"আঃ, আমি সুখে মরতে পারব তা হ'লে, আর আমার কোন কষ্ট নেই।"

উভয় শ্রোতার মনের মধ্যে একটা জ্বলন্ত সহানুভূতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; অনাদি তাহার অনুতাপ বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিয়া নীরব হইয়া পড়িল। বসন্ত সান্ত্বনা বাক্যে কহিল,—"মরবি কেন ভাইয়া ? দেশমাতা যে এখনও ভুখাঁ, তাঁর অন্নের যোগাড় করতে হবে যে আমাদের।"

"কিন্তু আমি যে দাগী, আমার কায ফুরিয়েছে বন্ধু মিঞা। ঠিক দিনটিতে আত্ম-সমর্পণ করার জন্য আমি কেবল অপেক্ষায় আছি।"

ইহাকে যে তাহারা মরিতে দিবে না এবং ক্রমশঃ বুঝাইয়া নিজেদের পক্ষে তাহাকে টানিয়া লইবে, এই সংকল্পে মনে মনে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় ? কোন্ দিন ?"

"কাল জেনে এসেছি, মন্দিরের শাল-জঙ্গলে, অমাবস্যার দিনে। সেদিন গুরুদেবেরও আগমন হবে।"

এই অকুণ্ঠিত ভক্তি-নিষ্ঠায় বসন্তের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। হায় রে! মঙ্গল-কার্য্যে ত এরূপ বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না। দেশ-মাতার এ কি দুর্ভাগ্য ! বসন্ত

সংযত হইয়া একটু পরে কহিল,—"ওঃ, সে ঢের দেরীর কথা। তার মধ্যে বিশ্ব উল্টে যেতে পারে। গুরুদেব ভুল বুদ্ধিতে তোমাকে দাগী করেছেন, সে ভুল তাঁর ভাঙ্গবেই, তখন নিশ্চয়ই তুমি তাঁর ক্ষমা পাবে।"

অনাদি এতক্ষণ পরে তাহার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল,—"কায কর মিঞাদীন, কায বন্ধ করলে চল্‌বে না। মঙ্গল কাযে মঙ্গল আছেই, গুরুর আদেশ ভ্রান্ত হ'তে পারে, কিন্তু এ সত্য অভ্রান্ত।"

বসন্ত অনাদির ন্যায় সরল-নৈতিক নহে। কোতোয়ালিতে কায করিয়া সে বুঝিয়াছে, কায লইতে হইলে সময়বিশেষে কূটনীতির শরণাপন্ন না হইলে চলে না। অনাদির কথা অন্য অর্থে ঘুরাইয়া লইয়া সে কহিল,—"কায দেখিয়ে গুরুকে প্রসন্ন কর মিঞাদীন।"

উদাসভাবে দীনেশ উত্তরে কহিল,—"কি কায করতে বল ?"

পুলিসের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে এইরূপ শুনছি। শীঘ্রই বন-জঙ্গলে তারা খানাতল্লাসী চালাবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হয়েছে, শীঘ্র আস্তানা থেকে হাতিয়ারগুলো সরান।"

অবশ্য পুলিসে এ খবর সত্যই উঠিয়াছে, বা উঠিবার সম্ভাবনা আছে—এ ভাবনা তখন তাহার মনে আদৌ ছিল না। ক্রমশঃ দীনেশকে এ কার্য্যে ভিড়াইবার অভিপ্রায়েই বসন্ত এইরূপ করিয়া বলিল। হিতে বিপরীত ঘটিল। দীনেশ ভীতভাবে বলিল,—"কাল ত সেখানে এ কথা কারো মুখে শুনিনি, এ খবরটা তা হ'লে কেউ এখনো জানে না; জানান ত উচিত।"

অনাদি এই কথায় প্রমাদ গণিল, কি জানি, যদি দীনেশ সেখানে গিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু বসন্ত অনাদি হইতে পাকা লোক; যখন হইতে বসন্ত শুনিয়াছে যে, দীনেশ দাগী, তখন হইতে সে আশ্বস্ত। দীনেশের উত্তরে সে কহিল,—"হ্যাঁ, জানাতে হবে বই কি! মিটিং কবে আবার ?"

পরশু। খবর জান না, ভাইয়া ?

"আমরা যে এখানে ছিলুম না।

"পরশু কাওয়াজ হ'য়ে আবার ৭ দিন সব বন্ধ থাক্‌বে,—এই ত কাল স্থির হয়েছে। পরশুই তোমরা গিয়ে এ খবরটা জানিয়ে এস। আমার দিনের আগে আমি ত আর সেখানে যেতে পারব না।"

পাঠক এখন বুঝিতেছেন, এই কাওয়াজের শব্দই সুজন রায় মন্দির পথে শুনিয়াছিলেন; অতএব ইহাদের অন্ধকার এই কথাবার্ত্তা তাহার পূর্ব্ব ঘটনা।

দীনেশের এই কথায় বসন্ত ও অনাদি উভয়েই অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। বসন্ত বলিল,—"বেশ আমিই সবাইকে খবর জানিয়ে আস্‌ব, আর অস্ত্র-উদ্ধার সম্বন্ধে যা পরামর্শ হয়—তাও তোমাকে এসে খবর দেব। তুমি এখন ভাইয়া তোমার দিনটা আসা পর্য্যন্ত এইখানেই থাক। ডাক্তারও এখানে শীঘ্র আসবেন, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। তিনি নিঃসন্দেহ তোমাকে মুক্তি পাইয়ে দেবেন।"

গুরুহারা, গৃহহারা মৃত্যুদণ্ড-সম্মুখীন হতভাগ্য দীনেশ ইহাদিগকে বন্ধু পাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

সেই রাত্রে অনাদি বাড়ী যাইবার সময় দুই বন্ধুতে একত্র মিলিত হইবামাত্র বসন্তকে সে কহিল,—"আমার কিন্তু ভাই মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"কেন হে ভায়া! মন ভাল হবারই ত কথা! এমন আশাতীত সহজ ভাবে হাতিয়ারগুলোর উদ্ধারের পথ খোলোসা হ'য়ে এল!"

"যা বল ভাই আমাদের মত ল্যাজধরা জাত বিধাতার সৃষ্টিতে আর কুত্রাপি মেলে না। বুদ্ধির মাথা একেবারেই খেয়ে ব'সে আমরা দেশোদ্ধারে মেতেছি। ইচ্ছা আমাদের একান্ত প্রবল যে, আমরা স্বর্গে চড়ি। য়ুরোপীয় কেউ হ'লে ইচ্ছামাত্র এঞ্জেলের পাখনা সৃষ্টির আয়োজনে উঠে পড়ে সে লাগতো। কিন্তু আমরা গাঁজায় দম কষে হনুমানের ল্যাজটাকেই সেই উদ্দেশ্যে সবে মিলে হাৎড়াচ্ছি।"

"আমরা যে বুদ্ধিমান জাত এতে ক'রে তারি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বোঝ না হে। কষ্ট নেই, শ্রম নেই, ল্যাজটা ধ'রেই উড়ে চল্‌বে, কতটা সুবিধা বল দেখি ?"

"তেত্রিশ কোটি হাতের টানে হনুমান মশায়ের ল্যাজটা অচিরে ছিঁড়ে যায় যদি ?"

"বল কি হে ? ত্রেতাযুগে হনুমানজি গন্ধমাদন ল্যাজে উঠিয়াছিলেন। আর এ যুগের ক্ষীণজীবী লোকগুলার ভারে গবর্ণমেণ্টের তর্জ্জনীটাও যে নোয় না। গুরু

গরুড় আর তাদের বইতে পারবেন না? না পারেন, মৃত্যুতেই আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি।"

"নিশ্চয়ই না। পতনে আমরা প্রেতত্বই লাভ করব। না ভাই রহস্য নয়।—আমরা দেশকে অধীনতা মুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধি, চিন্তা, ধর্ম্মজ্ঞান সমস্তই কি শোচনীয় ভাবে পরাধীন ক'রে ফেলছি! এমন কিছু পাপ নেই, নিষ্ঠুরতা নেই, দেশের নামে এবং গুরুর আদেশে, আমরা করতে কুণ্ঠিত! মনের এই দাসত্বের চেয়ে ইংরাজের দাসত্বও আমি ভাল মনে করি। দীনেশের কথা শুনে আমার মন থেকে আশার আলোক নিবে গেছে—"

"আরে গুরু চাই বই কি—সেনাপতি না হ'লে কি যুদ্ধ চলে? এ যে যুদ্ধের কাল; এ সময় ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেককে এক জনের অনুগত ক'রে না চললে ত হয় না।"

"স্বাধীন বুদ্ধি-চিন্তাকেই আমরা যদি মেরে ফেলি, তবে গুরু নির্ব্বাচনই বা করব কি ক'রে? ক্ষমতার লোভ বা বাহবার লোভ বা স্বার্থসিদ্ধির লোভ যাদের আছে, তাঁরা ত গুরু হ'তে পারেন না। এই ভণ্ডামীর আশ্রয়ে অপূর্ণবুদ্ধি নিঃস্বার্থ বালকরা প্রতিদিন পাপ মত্ততার মধ্যে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিচ্ছে! এ ভয়ানক কষ্ট!"

"হবে, হবে, ভাল গুরুর অভ্যুদয় হবে—এ শুধু আরম্ভের কাল। অত নিরাশ হবার কারণ নেই। আপাততঃ আমাদের সেনাপতিকে নিয়ে এস। পরশু পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। তুমি তাঁকে আনতে কালই যাও! এ দিকে দীনেশের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া ক'রে ফেলি।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, আমার মনে বড় অনুতাপ হচ্ছে।"

"কেন?"

"রাজকুমারীর সহিত দলপতিটার দেখা করিয়ে দিয়েছি।"

"গতস্য শোচনা নাস্তি।"

"আছে বই কি? ডাক্তারদাকে নিয়ে দেখ, ওরা কি রকম হ্যাস্তা নাবুদের চেষ্টায় আছে। হার মেনে শেষে যদি রাজ-কন্যার প্রতি শুভ দৃষ্টি দেয়? বড় ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে।"

কিছু ভাবনা নেই, এখন শীঘ্র ডাক্তারদাকে এনে ফেলো।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

তৈলক্ষেত্রে অভিযান।

পূর্ব্বযুগে মানব স্বর্ণের লোভে দেশদেশান্তরে যাইত, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে, সিংহশার্দ্দূলসেবিত গহন অরণ্যে, পর্ব্বতে, কান্তারে, স্বর্ণ আবিষ্কারের জন্য প্রাণপাত করিত। এক সময়ে স্বর্ণখনির লোভে স্পেনিশ-গণ দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, অধিকারবিচ্যুত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিল। এখন স্বর্ণ-সন্ধানীর পরিবর্ত্তে তৈল-সন্ধানীরা দক্ষিণ-আমেরিকার তৈলক্ষেত্রে অভিযান করিতেছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণক্ষেত্রে, অথবা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইউকোন স্বর্ণখনির সন্ধান পাইয়া তথায় অধিকারস্থাপনের জন্য যেমন সন্ধানীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, ইদানীং তৈল-সন্ধানী দলের মধ্যেও তেমনই ঠেলাঠেলি, চালবাজী চলিতেছে। তৈল-সন্ধানীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহাদের লুব্ধ শ্যেন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তৈললাভের আশায়, এমন দেশ নাই, যেখানে না তাহারা 'ডেরা-ডাণ্ডা' ফেলিয়াছে। অধিকার যাহাতে বজায় থাকে, স্বত্বস্বামিত্ব যাহাতে সর্ব্বাগ্রে লাভ করিয়া একাধিপত্য করা যায়, এ জন্য পরস্পর-বিরোধী তৈল-সন্ধানীর দল হুড়াহুড়ি করিতেছে, কিন্তু আইন বাঁচাইয়া। সন্ধানীরা এ জন্য কোথায় না গিয়াছে? পৃথিবীর মানচিত্রখানি খুলিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শুধু গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও স্পিটজবার্গেন ছাড়া এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে না তৈল-সন্ধানীর দল প্রবেশ করিয়াছে?

দেশবিদেশের সংবাদপত্র পড়িলেই জানা যায় যে, ইদানীং তৈলই রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশের রাজনীতিকগণ তৈলক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিবার জন্যই যেন রাজনীতিক চালবাজী দেখাইতেছেন। সংবাদপত্রসেবী ও রাজনীতিকগণের মন্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখিবার পক্ষে তৈলই এখন প্রধান বস্তু। কোনও প্রতীচ্য লেখক বলিয়াছেন, "তৈলনিষেকে ক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হইতে পারে; কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনীতির সমুদ্র ইহাতে আরও অশান্ত হইয়া উঠে।" আবার অপর পক্ষে, কোনও বিশিষ্ট তৈল-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিতেছেন, "ওগো, ভয় নাই। তৈল লইয়া পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ—ও সব বাজে কথা! হুজুগপ্রিয় লোকগুলা শুধু শুধু বাজে কথা রটাইতেছে!" কিন্তু এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তৈলের খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। মোটর, বিমানপোত, রণতরী প্রভৃতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; আর ইহাদের জন্য তৈলেরও বিশেষ প্রয়োজন। নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'ইভ্‌নিং নিউজ'পত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মূল কারণই তৈল। নিউজারসির 'ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী'র পরিচালক-সমিতির সভাপতি মিঃ বেড্‌ফোর্ড বলিয়াছেন,—"কেহই এ কথা জানে না, আগামী কল্য কোথায় কি পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং কেহই, পৃথিবীর কোথায় তৈল আছে, তাহার সন্ধানে অপরকে বাধা দিতেও পারে না। অথবা তৈলের সন্ধান মিলিলেও উহার স্রোতোধারাকে কমাইয়া বা বাড়াইয়া লইতেও সমর্থ নহে।"

টুল্‌সা (ওক্‌লাহোমা) হইতে প্রকাশিত 'অয়েল এণ্ড গ্যাস্ জর্ণাল' নামক পত্রে সংপ্রতি এইরূপ একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে:—"এখন তৈলই রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণ তৈলসমস্যা সমাধানের জন্যই মাথা ঘামাইতেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রীতি ও শান্তি সকলেরই মূলে ঐ একই ব্যাপার। যুরোপের রাজনীতি বলিতে এখন পেট্রলিয়ম্ নীতিই বুঝাইবে। জাতির অদৃষ্ট লইয়া মন্ত্রণাকুশলী মন্ত্রিগণ যে রাজনীতিক দাবাখেলায় মস্ত হইয়াছেন, তাহাও তৈলনিষেকে সিক্ত। সন্নিহিত প্রাচ্যখণ্ডে অধুনা যে অবস্থা-সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহাও তৈলঘটিত। পারস্য উপসাগর হইতে গোল্ডেন হরণ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি তৈলসিক্ত!

"জেনোয়ার বৈঠক যে ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার মূলেও তৈল। বাকু ও ককেশস্ প্রদেশের বিস্তৃত তৈলক্ষেত্রের প্রতি অনেকের লুব্ধদৃষ্টি রহিয়াছে। সোভিয়েটের কূটনীতি

উহাকেই কেন্দ্র করিয়া চালবাজী করিতেছে। রুমেনিয়া ও পোলাণ্ডেও প্রচুর তৈল বিদ্যমান। তাহারাও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। পারস্যের কোন কোন স্থলে পর্য্যাপ্ত তৈল আছে, এ জন্য ইংরাজ ও মার্কিণের স্বার্থের সংঘাত এখন হইতেছে। য়ুরোপের যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেইখানেই পেট্রলিয়মঘটিত ব্যাপারই প্রধান রাজনীতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

"য়ুরোপের কূটনীতিতে তৈল-সমস্যা প্রধান হইলেও আমেরিকাকে এ বিষয়ে উদাসীন বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সূচনা হইতেই দেখা যায় যে, আমেরিকা যে কয়টি বড় বড় রাজনীতিক চাল চালিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষেই হউক, তৈলের সংস্রব আছে। মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইনের তৈলক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসী যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ্'এর তৈলখনিপূর্ণ প্রদেশে আমেরিকা তৈলের ব্যবসায় করিতে পারিবেন না বলিয়া হলাণ্ড গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমেরিকা তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

"মেক্সিকো প্রদেশে মার্কিণের তৈলসংক্রান্ত স্বত্বের ক্ষতি হইবে বলিয়াই আমরা ওব্রোণ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কর্ণপাত করি নাই। তৈলের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যকে অনতিবিলম্বে হয় ত জাপানের সহিত চালবাজী করিতে হইবে। নিউইয়র্কের সিন্‌ক্লেয়ার তৈল-কোম্পানী, রুসীয় চিটা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সংপ্রতি উত্তর সাখালিনে তৈলখনির স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছেন; ঐ স্থানে জাপানী সৈন্য রহিয়াছে। জাপান পররাষ্ট্রবিভাগ বলিতেছেন যে, যে স্থান জাপানী সেনার অধিকারে আছে, তাহাতে অপরকে অন্য বিষয়ে অধিকার দিবার ক্ষমতা চিটা গবর্ণমেণ্টের নাই। রুসিয়ার আর একটি তৈলসংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের দৃষ্টিপাত হইয়াছে। সে ব্যাপার অবলম্বনেও যুক্তরাজ্যকে রাজনীতিক চালবাজী দেখাইতে হইবে। নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক 'ব্রান্‌সডল কর্পোরেশন' সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাকুপ্রদেশে ৫ শত একর পরিমিত তৈলক্ষেত্রে কায করিবার অধিকার পাইয়াছেন। এত দিন পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত কোনও মার্কিণের স্বত্বকে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন নাই। কিন্তু ব্রানসডল কোম্পানীর এই স্বত্বাধিকার ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, উহার সহিত যুক্তরাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সুতরাং সোভিয়েট ও মার্কিণের এই নূতন প্রস্তাবে নানা প্রকার অভিনব রাজনীতিক ব্যাপারের পরিণতি নির্ভর করিতেছে।"

সন্নিহিত প্রাচ্যদেশে তৈলসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনও কথার উল্লেখ না করিয়া হাউসটন্ (টেক্সাস্) হইতে প্রকাশিত 'দি অয়েল উইক্‌লি' পত্র লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক ও গ্রীসের রাজনীতিক চালবাজী অর্থাৎ জমীর অধিকারসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতে রাজি নহেন; কিন্তু এটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, "এশিয়া মাইনরে তুরস্কের বিজয়লাভে তত্রত্য তৈলক্ষেত্রের সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুর্কীকে য়ুরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা যে কেন, তাহাও এখন পৃথিবীর সকল জাতির নিকট প্রকট হইয়াছে।" উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশের পর উক্ত সাময়িক পত্র গ্রেট বৃটেনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া লিখিয়াছেন—

"যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার পর হইতেই গ্রেট বৃটেন চারিদিকেই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া নীরবে এই প্রদেশে বড় বড় তৈলক্ষেত্র অধিকার করিয়া আসিতেছেন। প্রথমেই গ্রেট বৃটেন, মিশরের তৈলক্ষেত্রগুলিকে সমুন্নত করেন। 'অ্যাংগ্লো-ইজিপ্সিয়ান' কোম্পানীর দ্বারা ইংরাজ মিশরের যাবতীয় মূল্যবান্ তৈলক্ষেত্র অধিকার করিয়াছেন এবং লোহিত-সমুদ্রের চারি পার্শ্বে যত তৈলক্ষেত্র আছে, তাহাতেও কায করিবার স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। তার পর 'অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান্' তৈল-কোম্পানীর নিমিত্ত পারস্যের যাবতীয় মূল্যবান্ তৈলক্ষেত্র যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। ভার্সেলসের সন্ধিসূত্রে ইংরাজ এখন মেসোপটেমিয়ার অভিভাবক। সেই সূত্রে উক্ত বিশালক্ষেত্রে তুরস্ক-পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীর অধিকারে হস্তনিক্ষেপের সুযোগও লাভ করিয়াছেন। 'অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান্' তৈল-কোম্পানী গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজার নিকট হইতে মেসিডোনিয়া ও থ্রেসের যাবতীয় তৈলক্ষেত্রে কায করিবার অধিকার মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে চারিদিকে ব্যবসায়ের সুবিধা করার

ফলে, শুধু বাকি রহিল, তুরস্ক, আর্ম্মেনিয়া, তুর্কীস্থান ও আরব দেশ। বর্ত্তমানে এই সকল দেশে তৈল উৎপাদনের সুবিধা তেমন নাই।

"গ্রেট বৃটেনের এইরূপ তৎপরতার ফলে, ফরাসী ও মার্কিণ দেখিলেন যে, তাঁহারা বোকা বনিয়া গিয়াছেন। যুক্তরাজ্য এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। শুধু একটা দেশ সর্ব্বত্রই কেন এমনভাবে ব্যবসায়ে একাধিপত্য করিবে? ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত, অশোভন। ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, যুক্তরাজ্যের সাহায্যে পারস্যকে কিছু টাকা ঋণ দিয়া সংপ্রতি পারস্যের উত্তরাঞ্চলে তৈল-ব্যবসায়ে অনুমোদনলাভের জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রব্যবহার করিতেছেন। আবার এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, তুরস্ক-পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীতে ফ্রান্সের যে স্বার্থসম্বন্ধ ছিল, ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী তাহার কিয়দংশ কিনিয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যুক্তরাজ্য এই সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডেও একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন।

"ফ্রান্সে কোনও দিন তৈলের খনি ছিল না। যুদ্ধের পর হইতেই ফরাসী তৈলক্ষেত্র লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ে ফ্রান্সের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও নাই। কি করিয়া কৌশলে তৈলক্ষেত্রের মালিক হওয়া যায়, সে বিদ্যা ফয়াসী কোনও দিন শিক্ষা করে নাই। ভার্সেলসএর সন্ধিসূত্রে সে সিরিয়া লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথায় ভাল তৈলক্ষেত্র নাই। তুরস্ক-পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীতে ফরাসীর পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও কিছু কম অংশ ছিল। যুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্স তুরস্কের সহিত মৈত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। তুরস্কের সেনাদলকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য ফ্রান্স তাহার সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে তুরস্কে রাখিয়াছে। বিমানপোত সরবরাহে ফরাসীই তুর্কীকে সাহায্য করিতেছে। ফরাসী এঞ্জিনীয়ার তুরস্কের যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। এইরূপ সাহায্যের ফলে তুরস্ক নিশ্চয়ই ফরাসীকে তাহার প্রার্থনীয় বস্তু অর্পণ করিবে।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতই ফরাসীর তৈলক্ষেত্র নাই। ফরাসী সংবাদপত্র পড়িলেও জানা যায় যে, ফরাসীরাজ্য প্রায় তৈলহীন। মোরক্কোর কোন কোন স্থানে সামান্য তৈল থাকিতে পারে; ফরাসীরা চেষ্টা করিতেছে যদি অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর ইহা স্থির যে, ফরাসীরাজ্য তৈলশূন্য। বিগত মহাযুদ্ধে সে কথাটা ফ্রান্স হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। এই ভীষণ অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের "ব্যাঙ্ক দে প্যারী" দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তথায় একটা ফরাসী শাখা খুলিয়াছে। "ব্যাঙ্ক দে প্যারী"র মূলধন অপর্য্যাপ্ত, মান মর্য্যাদা প্রতাপও যথেষ্ট। এই নূতন শাখা, ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহযোগে জগতের সমক্ষে ফ্রাঙ্কো-আমেরিকান পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীরূপে প্রতিভাত হইতে যাইতেছে। উক্ত কোম্পানীর নাম—"লা ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল ফ্রাঙ্কেজ।" উক্ত কোম্পানীর পরিচালক-সমিতির সভাপতির নাম মিঃ জুলে ক্যাঁবো। ইনি ওয়াশিংটনের ফরাসী রাজদূত, পরে বার্লিনেও ফরাসী-দূতরূপে কিছু দিন কায করিয়াছিলেন।

এ দিকে এমন সংবাদও পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রেট বৃটেনের সহিত ফ্রান্স তৈলসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কথা চালাচালি করিতেছেন। তাহার ফলে ফ্রান্স না কি মোসলের মহামূল্য তৈলক্ষেত্রের শতকরা ২৬ অংশ পাইয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত, ফরাসী ও মার্কিণ পরিচালিত দৈনিকপত্র "The Courrier des Etato-Unis"এ কোনও পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "যে জাতির পেট্রলিয়ম্ অধিক, সেই উত্তরকালে সমুদ্রে একাধিপত্য করিবে।" এই উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সমুদ্রে প্রবল হওয়া গ্রেট বৃটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তৈলসম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনকে আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। ইংরাজের নিজের প্রচুর তৈল থাকা চাই।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক মিঃ ফার্ণাণ্ড এঁন্জোরাও আরও লিখিয়াছেন:—"এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ৩০ বৎসর পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দূরদর্শী ইংরাজ রাজনীতিকগণ সেই জন্য ভূমধ্য-সাগরকে যেন ইংলণ্ডের—তথা য়ুরোপের তৈলভাণ্ডার বা চৌবাচ্চা করিয়া রাখিয়াছেন! সন্নিহিত প্রাচ্য ভূখণ্ডকে অধিকারে রাখিতে পারিলেই পেট্রলিয়ম্ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন

হওয়া যায়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরাজ পারস্যের দক্ষিণাংশে এবং মেসোপটেমিয়ায় তৈলসম্বন্ধে বিশেষ অধিকার যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দুই স্থান হইতে সংগৃহীত তৈল ইংলণ্ডে চালান দিবার সুবিধাও অত্যাবশ্যক। তাই আলেক্‌জান্দ্রেটা বন্দরের ব্যবস্থা! মোসল হইতে তৈল নলযোগে আলেক্‌জান্দ্রেটায় প্রেরিত হইয়া থাকে। বাগদাদ রেলপথের পার্শ্ব দিয়া নল প্রস্তুত। যে স্থান দিয়া উক্ত রেলপথ আলেক্‌জান্দ্রেটায় মিশিয়াছে, তাহা সিরিয়া অধিকারভুক্ত। সিরিয়ার অভিভাবক ফরাসী। এই সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাব্যাপারে মহাযুদ্ধ ইংলণ্ডের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছিল।"

গ্রেট বৃটেনের এই তৈলসংগ্রহপ্রচেষ্টায় ফরাসী ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন—তাহার প্রধান কারণ, সিরিয়া সম্বন্ধে ফরাসী তাহা হইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। লেখক বলিতেছেন:—"যুদ্ধের প্রারম্ভে মোসল ও বাগদাদের তৈলক্ষেত্র লইয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর প্রবল প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। তৈলক্ষেত্রের উপর দিয়া যে লাইট রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার পরিচালক জার্ম্মাণ। এ দিকে ইংরাজের স্বার্থরক্ষা করিতেছিলেন—অ্যাংলো-পার্শিয়ান কোম্পানী। সুতরাং ইংরাজ ও জার্ম্মাণ একযোগে উক্ত ভূখণ্ডের উপর ব্যবসায় চালাইতে অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুরস্ক পেট্রলিয়ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উভয় পক্ষের স্বার্থ সেই কোম্পানীতেই বর্ত্তিয়াছিল। উক্ত তৈল কোম্পানীর শতকরা ৫০ অংশ অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান কোম্পানীর, শতকরা ২৫ ভাগ রয়াল ডচ্‌দিগের এবং বাকি এক-চতুর্থাংশ Dentsche Bank তথা জার্ম্মাণীর ভাগে পড়িয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত অধিকার আদায় করিয়া লওয়া হয়। যুদ্ধের সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট; তুরস্ক-পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীর জার্ম্মাণ অংশে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং সেই অংশই অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান কোম্পানীকে দিতে উদ্যত হইলেন। রয়াল-ডচ্ কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ সে সংবাদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে দিলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বসিলেন যে, উহাতে তাঁহারও অধিকার আছে। কারণ, জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে হইলে, তুরস্ক পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীতে জার্ম্মাণীর যে অংশ আছে, নিয়ম অনুসারে তাহা ফরাসীরই প্রাপ্য।

"এই ব্যাপার লইয়া উভয় সরকারের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে লর্ড কার্জ্জন এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ফরাসী মোসলের উপর তাঁহার পূর্ব্ব-স্বত্বের অধিকার ত্যাগ করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তুরস্ক-পেট্রলিয়ম কোম্পানীর শতকরা ২৫ অংশ পাইবেন। ইহাতে ফ্রান্সের পর্য্যাপ্ত লাভ হইল। কারণ, তুরস্ক-পেট্রলিয়ম কোম্পানীতে ৫০ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ১ শত ৪০ কোটি মণ তৈল উৎপন্ন হইবার কথা।

"স্যান্-রেমো বৈঠকে এই বন্দোবস্ত পাকা হয়। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তৈল সম্বন্ধে এরূপ কোন চুক্তি করিতে পারেন না—তাঁহাদের এরূপ বন্দোবস্ত করিবার কোনও অধিকার নাই। তাঁহারা বলেন যে, যেখানেই তৈল আছে, যুক্তরাজ্যের স্বত্বও সেখানে অব্যাহত। এই ব্যাপার লইয়া সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে মেসোপটেমিয়া সম্বন্ধে ইংরাজের ব্যবস্থাকে মার্কিণ-গবর্ণমেণ্ট নাকচ করিয়া দিলেন।

"ওয়াশিংটন বৈঠকে ফরাসী প্রতিনিধিদিগের অগোচরে, অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান কোম্পানী ও আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হয়। তাহার ফলে, তুরস্ক-পেট্রলিয়ম্ কোম্পানীতে মার্কিণের যে অংশ আছে, তাহা স্বীকৃত হয়। কিন্তু কাহার অংশে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ভাগ বসাইবেন, তাহাই বিচার্য্য। সম্ভবতঃ ফরাসীর অংশেই আমেরিকার দাবী। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ ভাগই আমেরিকার অংশে পড়িবে। ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই।

"সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মেসোপটেমিয়ার তৈলে ফরাসীর যে অধিকার, তাহা উপহার বা দান হিসাবে প্রাপ্ত নহে। নানারূপ বাধ্য-বাধকতা ও ত্যাগের বিনিময়ে ক্রীত। মার্কিণগণ যদি ব্যবসায়ে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সে জন্য তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্ত চাঁদাও দিতে হইবে। ইহা ছাড়া, যখন অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান কোম্পানী ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের

নিজের অংশ হইতেই মার্কিণ কোম্পানীকে সুবিধা করিয়া দেওয়া ন্যায়ানুমোদিত। স্যান্-রেমোর নির্দ্ধারিত চুক্তির যদি এখন পুনঃসংস্কার হয়, তবে গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকা অন্যান্য স্থলে যে সকল চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারই বা পুনর্গঠন বা সংস্কার না হইবে কেন? ফরাসী নিশ্চয়ই তাহা দাবী করিতে পারে।"

গ্রেট বৃটেন স্বদেশের বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় তৈলখনিতে অসঙ্গতরূপে ইংরাজের অংশ সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া বৈদেশিক সংবাদপত্রনিচয় রটনা করিতেছেন। এ জন্য লর্ড কার্জ্জন তৈল সম্বন্ধে একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার এক খণ্ড ওয়াশিংটনস্থিত বৃটিশ দূতের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে এইরূপ লিখা আছে :—

"যুক্তরাজ্যের নিম্নেই গ্রেট বৃটেনের তৈলের ব্যয় অধিক। ইংরাজের নৌ-বিভাগে শতকরা ৯০খানা জাহাজ তৈলের দ্বারা চালিত হয়। বাণিজ্য-পোতগুলিও তৈল ব্যবহার করিতেছে। ইংলণ্ডের তৈল-খনিতে প্রত্যহ প্রায় ১ টন করিয়া তৈল উৎপন্ন হয়। স্কটলাণ্ডের তৈলের বাজারে বৎসরে ১ লক্ষ ৫ হাজার টন তৈল পাওয়া যায়।

"১৯২০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ৩৩ লক্ষ, ৬৮ হাজার ৬ শত টন তৈল রপ্তানী করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড বৎসরে ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার টন তৈল রপ্তানী করিয়াছিল। যুক্তরাজ্যের তুলনায় গ্রেট বৃটেনে লোক পিছু যে তৈল খরচ হয়, তাহা আমেরিকায় এক-ষষ্ঠাংশ; কিন্তু গ্রেট বৃটেনের মোট প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। আর এই প্রয়োজন অনুসারে কায করিতে গিয়া ইংলণ্ডকে অধিক অর্থ দিয়া তৈল ক্রয় করিতে হইতেছে।"

উক্ত সরকারী বিবরণে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোথায় কত তৈল আছে, তাহারও উল্লেখ আছে। গ্রেট বৃটেনে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন। স্কটলাণ্ডে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন; কিন্তু ঐ স্থানে তৈল উৎপাদনে যে ব্যয় পড়ে, তাহা অত্যন্ত অধিক। কানাডায় বৎসরে ৩৪ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা তথাকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও নিউফাউণ্ডলাণ্ড—বৈদেশিকগণ এই সকল দেশে আসিয়া তৈলের ব্যবসা করিতে পারিবেন না, এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা এখনও প্রচারিত হয় নাই। যুদ্ধের সময় শুধু অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ প্রজাকে খনির জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে, কানাডার মত রেজেষ্ট্রি করা বৃটিশ কোম্পানী ছাড়া আর কেহই জমীর ইজারা পায় নাই। উল্লিখিত স্থানে এ পর্য্যন্ত কোনও বিশিষ্ট তৈল-খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। নিউজিলাণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। নিউ ফাউণ্ডলাণ্ডে কোনও ইংরাজ কোম্পানীকে জমী ইজারা দিবার কল্পনা চলিতেছে।

ভারতবর্ষে পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে শুধু বৃটিশ প্রজা অথবা বৃটিশ প্রজার দ্বারা পরিচালিত কোম্পানীকেই খনি করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বৎসরে ১২ লক্ষ টন পেট্রলিয়ম্ উৎপন্ন হয়। ইহাতে এ দেশের অভাব দূরীভূত হয় না। যুক্তরাজ্যে ডচ্ ইষ্টইণ্ডিস এবং পারস্য হইতে প্রভূত পরিমাণে তৈল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে।

ট্রিনিডাডে সরকারী জমী ছাড়া অন্যত্র বিদেশীকে জমী ইজারা দিবার কোন বাধা নাই। শুধু একটি মার্কিণ কোম্পানীর সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। বে সরকারী ক্ষেত্র হইতে তৈল উৎপাদনে উক্ত কোম্পানী দক্ষতা প্রকাশ করায় সরকার তাহাদিগকে সরকারী ভূমিতে তৈল উৎপাদনের অধিকার দিয়াছেন। তথায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টন তৈল জন্মিতেছে।

বৃটিশ গায়না, বৃটিশ হন্‌ডুরাস্, নাইজিরিয়া ও কেনিয়া উপনিবেশ—ব্যবস্থা ট্রিনিডাডের মত। এ সকল স্থানে তৈলও নাই, বাধা-বিঘ্নও নাই। শুধু নাইজিরিয়ায় দুইটি ইংরাজ কোম্পানী খনির অধিকার পাইয়াছেন।

জেমেকা ও বারবাডোসে তৈল আছে কি না, জানা যায় নাই। ভবিষ্যতের আশায় একটি ইংরাজ কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

মিশরে যে কেহ তৈলের ব্যবসায় করিতে পারেন। এখানে বৎসরে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হয়। সংপ্রতি অনেকগুলি কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

সোমালীলাণ্ডে তৈল উৎপন্ন হয় না। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এখানে কায করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও বাধা এখানেও নাই। সকল জাতিই চেষ্টা করিয়া দেখিতে

পারেন। সারাওয়াকে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন তেল উৎপন্ন হয়। এখানেও কোন বাধা-বিঘ্ন নাই। ব্রুনেয়িতে এখনও তৈল উৎপাদিত হয় নাই। চেষ্টা চলিতেছে। যে কোনও জাতি ব্যবসা করিতে পারেন। বোর্ণিওর অবস্থাও তদনুরূপ।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে অতি অল্প তৈল উৎপন্ন হয়, এবং ভিন্ন জাতির তৈলব্যবসায় সম্বন্ধে বাধা-বিঘ্নও নাই। পারস্যের তৈলে ইংরাজের একাধিপত্য আছে বলিয়া চারিদিক্ হইতে তীব্র সমালোচনা হইতেছে; আলোচ্য বিবরণে লর্ড কার্জ্জন তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই তৈলব্যাপারে রুষের কি অভিমত, তাহাও দেখা যাউক। সেভিয়েটদিগের কোনও সরকারী মাসিক পত্রে পারস্যের তৈল-খনি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা বাহির হইয়াছে। এই মাসিকের নাম—"The annals of the Peoples Commissariat for Foreign Affairs" সুলতান জেদ্ প্রবন্ধের লেখক। তিনি বলেন যে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও রুষের যে সন্ধি হয়, তাহাতে পারস্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। পারস্য সরকার তখন 'অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান' তৈল-কোম্পানীকে দক্ষিণ-পারস্যের তৈলক্ষেত্রে কায করিবার অধিকার প্রদান করেন। উক্ত কোম্পানীতে ইংরাজের অর্থ ও প্রভাব উভয়ই ছিল। সেই সূত্রে পারস্য সর্ব্বপ্রকার তৈলের ব্যবসায়ে মন দেন। তৎপূর্ব্বে প্রকৃতই পারস্যে তৈল তেমন উৎপন্ন হইত না। কিন্তু ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত তৈল আছে, ইহা তৈল-সম্রাটগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ২০ লক্ষ পিপা তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ শতকরা ২০ বাড়িয়াছে। পারস্য দেশ এখন তৈল সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। কালে না কি ইহার অবস্থা আরও উন্নত হইবে।

মিঃ জেদ্ আরও বলেন যে, পারস্যের তৈলক্ষেত্রের প্রসার অনেক দূর পর্য্যন্ত। "ইংরাজ যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে পারস্য দেশে তৈলের সন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আমেরিকারও মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে।" মিঃ জেদের উক্তি অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকাও পারস্য-দেশে তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। তত্রত্য 'মেদ্জেলিস্' বা পার্লামেণ্টের একটা গোপন অধিবেশনে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর) উত্তর-পারস্যের তৈলক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড রয়েল কোম্পানীকে কায করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ৫০ বৎসরের জন্য উক্ত কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট স্থানে কায করিতে পারিবেন। যত টাকার তৈল উৎপন্ন হইবে, পারস্য-গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর শতকরা ১০ টাকা হারে কমিশনও পাইবেন। মিঃ জেদ্ বলেন যে, এইরূপ চুক্তিতে জমী বিক্রয় করায় পারস্য-সরকারের সুবিধাই হইয়াছে। দক্ষিণ-পারস্যের তৈলক্ষেত্রের বন্দোবস্ত-ব্যাপারে পারস্য গবর্ণমেণ্ট এমন সুবিধা পায়েন নাই। তাঁহার উক্তি অনুসারে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী পারস্য দেশের তৈলক্ষেত্রে ভাগীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া বৃটিশের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন তাঁহারাই এ প্রদেশের তৈলক্ষেত্রের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, এখন প্রবল প্রতিযোগী মার্কিণ তৈল-কোম্পানীর আবির্ভাবে বৃটিশ পক্ষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। মিঃ জেদ লিখিতেছেন—

"তিহারানস্থিত ব্রিটিশ দূত পারস্য পার্লামেণ্টের এই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উত্তর-প্রদেশের তৈলক্ষেত্র রুষ প্রজা খাস্তারিয়ার অধিকারে ছিল। সে উক্ত স্থান অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান্ অয়েল কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার ইতিহাস এইরূপ,—পারস্যের শাহ, উত্তর-পারস্যের তৈলক্ষেত্রে সেপেকশালার নামক জনৈক ধনী জমীদারকে ইজারা দেন। বৈদেশিক কোম্পানীকে তিনি তাঁহার নিজের স্বত্ব হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, পারস্যের শাহের এরূপ অনুমোদনও ছিল। উক্ত জমীদার ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ খাস্তারিয়ার নিকট অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে সেই স্বত্ব বিক্রয় করেন। রুষরাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় মিঃ খাস্তারিয়ার উহা ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে বিক্রয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই উহা লইতে চাহেন নাই। অবশেষে অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান তৈল কোম্পানী উহা ১৫ হাজার টাকা মূল্যে কিনিয়া লয়েন।"

মিঃ জেদের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, মার্কিণ কোম্পানীকে পারস্য পার্লামেণ্ট উত্তরপ্রদেশে তৈল উৎপাদন করিবার অধিকার দেওয়ায় উক্ত বিষয় লইয়া বহু

আলোচনা হয়। ইংরাজ বলেন যে, উত্তর-পারস্যের তৈল-ক্ষেত্রে তাঁহার অধিকার রহিয়াছে। ১৫ হাজার টাকায় যখন উক্ত প্রদেশের তৈলক্ষেত্রের স্বত্বাধিকার তাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন, তখন সে স্থানে অন্যের অধিকার থাকিতেই পারে না। পারস্য পার্লামেণ্ট (মেদ্‌জেলিস) ঘোষণা করিয়া বলেন যে, ইংরাজ কোম্পানীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই। পারস্য দেশে কোন বিষয়ে অধিকার পাইতে হইলে বৈদেশিককে পারস্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন লইতে হইবে। পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী না পাইলে তাহা অসিদ্ধ। এই ব্যাপারের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "Current History" নামক সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক মিঃ ক্লেয়ার প্রাইস্ লিখিয়াছেন—"ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহিত অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান্ কোম্পানীর পত্রব্যবহার হইতে থাকে। তাহার ফলে ইংরাজ তাঁহার আপত্তি তুলিয়া লয়েন। বিগত মার্চ্চ মাসে উভয় কোম্পানী একযোগে ১০ লক্ষ ডলার পারস্য পার্লামেণ্টকে রয়ালটি স্বরূপ প্রদান করেন। পারস্য সরকার তখন কপর্দ্দকবিহীন, কাযেই টাকাটা লইয়াই তাঁহারা খরচ করিয়া ফেলেন।"

যাহা হউক, উত্তর-পারস্যের তৈলক্ষেত্রে এখন মার্কিণের অর্থ খাটিতেছে। উহা দক্ষিণ-পারস্যের ন্যায় ইংরাজের এক-চেটিয়া অধিকারভুক্ত নহে। আমেরিকা তথায় কায করিতেছেন।

পেট্রলিয়ম অধুনা যাবতীয় রাজনীতিকের চিত্তক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রত্যেক কূটনীতিবিশারদ তৈল-ক্ষেত্রসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই চালবাজী করিতেছেন—ইহা এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। মস্কো হইতে প্রকাশিত "International Life" নামক কোনও অর্দ্ধ-সরকারী সাপ্তাহিক পত্রে মিঃ এডামোর নামক জনৈক লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জেনোয়া বৈঠকের সঙ্গে সঙ্গে তৈলসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াও একটা বৈঠক হইয়াছিল। উক্ত তৈলসংক্রান্ত আলোচনা সভায় কোন্ কোন্ তৈলব্যবসায়ী যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কোনও সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। তবে এইটুকু জানা গিয়াছিল যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, রয়াল ডচ্ এবং ফরাসী মার্কিণ তৈল-কোম্পানীর প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত ছিলেন। লেখকের উক্তিতে এইটুকু আরও প্রকাশ যে, "পরিদৃশ্যমান বাহ্য রাজনীতিক ঘটনা অপেক্ষা এই অদৃশ্য রাজ্যের ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করা অত্যাবশ্যক।" এই লেখকের কথা অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এবং রয়াল ডচ্ এই দুই কোম্পানীর প্রতিযোগিতার উপরেই যুক্তরাজ্য এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।" এই প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, শুধু পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় অস্থায়িভাবে বন্ধ ছিল।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুষসাম্রাজ্যে পর্য্যাপ্ত তৈল উৎপন্ন হইত। ১৮৫৭ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার শতকরা ২৫ অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ রুষিয়া উৎপন্ন করিয়াছিল। বাকু প্রদেশে তৈল আছে, এ কথা অনেকেই জানিতেন। কিন্তু পরিমাণ কিরূপ হইতে পারে, তাহা জানা ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল ভ্রাতৃবৃন্দ বাকু তৈলক্ষেত্র ইজারা লয়েন। ২ কোটী স্বর্ণ-রুবলমুদ্রা ঐ ব্যবসায়ে খাটিতে থাকে। সেই সময় হইতেই সমগ্র য়ুরোপের দৃষ্টি বাকুর স্বর্ণপ্রসূ তৈলক্ষেত্রের উপর নিবদ্ধ হয়। কালক্রমে এমন হইল যে, বাকু হইতে উৎপন্ন তৈল সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন তৈলের অর্দ্ধেক স্থান দখল করিল; কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরেই হঠাৎ বাকুর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া গিয়াছিল। রুষের অন্য তৈলক্ষেত্রও ছিল, সেই সকল স্থান হইতে তৈল উৎপাদন করিয়া রুষের তৈলের বাজার মোটের উপর ঠিক রহিল। নূতন নূতন প্রদেশেও তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইল। আস্ত্রাকান্, তুর্কীস্থান এবং ফার্গানা প্রভৃতি অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত তৈল পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন যে, রুষ যদি ঐ সকল ক্ষেত্রে কায আরম্ভ করিয়া দেন, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত তৈল উৎপন্ন হইবে—রুষিয়ায় তৈল সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কোনও কারণ নাই।

কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রাদুর্ভাবকালে রুষিয়ার যাবতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তৈল উৎপাদনব্যাপারে কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সোভিয়েট

কর্তৃপক্ষ তৈল ও কয়লার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বলশেভিকগণ রুষিয়ার প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্র পরিচালনের ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করেন।

রুষিয়ার উৎপন্ন তৈলের পরিমাণহ্রাসের প্রধান কারণ, শ্রমিকগণ সোভিয়েট-শাসনের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে দলে দলে ক্ষেত্রের কায পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাবও অন্যতম কারণ। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক সাহায্যগ্রহণের অভিপ্রায়ে বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নোবেল কোম্পানী ও অন্যান্য কতিপয় ধনী বণিকের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। "ভলিয়া রোসি" নামক রুষীয় সামরিক পত্রে এই ব্যাপারের আলোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সোভিয়েট পক্ষের এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, বিগত অক্টোবর মাসে প্যারীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তৈল-বণিক্‌গণের এক বৈঠক হয়। উহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, কোনও কোম্পানী রুষিয়ায় তৈলক্ষেত্র ইজারা লইবেন না। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব করিলে প্রত্যেকেই তাহাতে উপেক্ষা করিবেন। উক্ত বিষয়ে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, রয়াল ডচ্, ফ্রাঙ্কো-বেলজীয় তৈল-কোম্পানীর নোবেল ভ্রাতৃবর্গ, লিয়ানোজফ্, গুফাসভ্ প্রভৃতি তৈল ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য একটি সমিতিও গঠিত হইয়াছে। রুষিয়ার বিরুদ্ধে এইভাবে শ্রেষ্ঠ তৈল ব্যবসায়ীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

এ দিকে তুরস্কের যাবতীয় ঘটনার কথা আমেরিকাকে জানাইবার জন্য আঙ্গোরার জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নিউ ইয়র্কে একটি সংবাদ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। মোসলের তৈলক্ষেত্র সম্বন্ধে সংপ্রতি তথা হইতে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহা এইরূপ :—

"মেসোপোটেমিয়ায় যে তৈলক্ষেত্র আছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহা ফেরকুকের উত্তরে এবং মোসলের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আধুনিক প্রণালীতে ইরাকের তৈলখনিতে কায হয় নাই। তৈলখনির স্বত্বাধিকার তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের, তুরস্ক অপরকে শুধু কণ্ট্রাক্ট দিয়াছে। এঙ্গোরার জাতীয় সমিতি ব্যতীত অপর কেহ তৈলক্ষেত্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মত দিবার অধিকারী নহে। মোসলের তৈলক্ষেত্রে এডমিরাল চেষ্টারকে কায করিবার অধিকার দিতে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট অসম্মত নহেন। কিন্তু মিত্রশক্তির অন্যান্য যাহারা তৈলক্ষেত্রে কায করিবার দাবী করিতেছেন, তাহা আঙ্গোরা সরকার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। লুসেন বৈঠকে মোসলের তৈলক্ষেত্রের পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে। এ বিষয়ে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। মোসলে শ্রেষ্ঠ তৈলখনি আছে বলিয়াই তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট উহাতে দাবী করিতেছেন না। তত্রত্য অধিবাসীদিগের অধিকাংশই তুর্ক এবং খুর্দ্দ। তাহারা তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিতে চাহে। তুরস্কের এই দাবী যে, জমীর নীচে কি জিনিষ আছে, তাহা লইয়া অধিকারের নির্ব্বাচন করা চলে না। সেই স্থানের অধিবাসীদিগের মতামতই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থনীতিক স্বার্থরক্ষার জন্য তুরস্ক এই স্থানের দাবী করিতেছে না; জাতীয়তার আগুনেই তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। ইহা রক্ষা করাই তাহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য—তাহার পরে অর্থনীতিক স্বার্থ।"

আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর পরিচালক-সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ এ, সি, বেডফোর্ড আমেরিকায় পেট্রলিয়ম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিবার সময়, পৃথিবীব্যাপী তৈলক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কোথায় কত তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া অবশেষে বলেন,—"তৈলব্যবসায়ের যতই বিস্তৃতি ঘটুক না কেন, এই ব্যবসায় কাহারও একচেটিয়া হইতে পারে না। যে কেহ, যথা ইচ্ছা, স্বাধীন ভাবে ইহার ব্যবসা করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকাই সুসঙ্গত। কারণ, এ কথা কেহই বলিতে পারে না, আগামী কল্য কোথায় তৈল আবিষ্কৃত হইবে; অথবা তাহার পরিমাণই বা কত। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে কেহ কাহাকেও পৃথিবীতে তৈলসন্ধানে বাধা দিতে পারে না—সে অধিকার কাহারও নাই, থাকিতে পারে না।"

অতিকায় আর্ম্মাডিলো
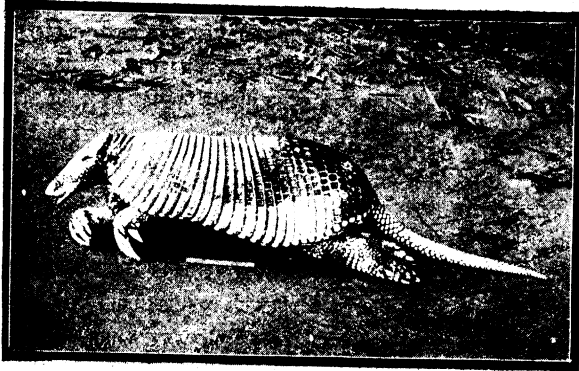
আর্ম্মাডিলো।

আমেরিকায় এক প্রকার চতুষ্পদ দন্তবিহীন জীব আছে, তাহার পৃষ্ঠদেশ কচ্ছপের আকারবিশিষ্ট। নিউ ইয়র্কের পশুশালায় এই অতিকায় প্রাণীটিকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অবশেষে উহাকে গুলী করিয়া মারা হয়। এই প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৪॥ ফুট এবং ওজনে প্রায় ৩৫ সের হইবে।

ঐ শ্রেণীর আর একটি বিরাট-দেহ চতুষ্পদ প্রাণীও যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহাকেও জীবিতাবস্থায় ধরা যায় নাই। ইহার জিহ্বা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় আড়াই লক্ষ সূক্ষ্ম দন্ত জিহ্বার চারি পার্শ্বে আছে। এই প্রাণীটির পায়ের নখরগুলি প্রায় ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। পৃষ্ঠের আবরণটিও সুদৃশ্য। এই অতিকায় আর্ম্মাডিলো প্রাচীন যুগের শেষ বংশধর ছিল।

দীর্ঘজিহ্বাবিশিষ্ট আর্ম্মাডিলো।

মধ্য আমেরিকার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প

মিঃ আল্‌ফ্রেড্ পি মড্‌স্‌লে নামক জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশান্ত মহাসাগরগর্ভস্থ দ্বীপপুঞ্জে বহু বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ সার আর্থার গর্ডনের অধীনে পররাষ্ট্রবিভাগে কায করিতেন। সরকারী কার্য্য ব্যতীতও তিনি প্রত্নতত্ত্বের অনুরোধে নানা স্থানে প্রায়ই পর্য্যটন করিতেন। ইংরাজ শিল্পী ক্যাথারউডের সুন্দর চিত্রাবলী দর্শনে তাঁহার চিত্তে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। দক্ষিণ-মেক্সিকোর গহন অরণ্যে প্রাচীন মেক্সিকো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে
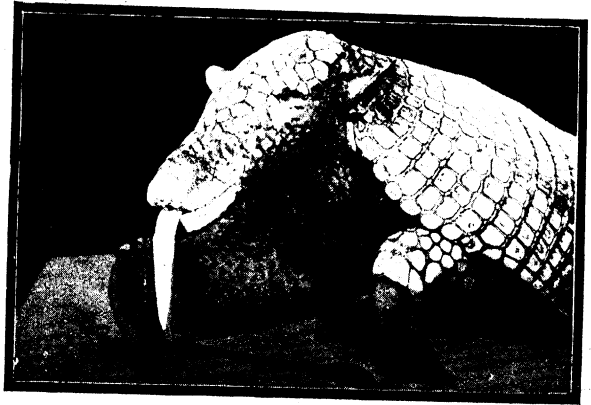
…রে — ধ্বংস-স্তূপের অন্তরাল হইতে মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন যুগের স্থাপত্য শিল্পের আবিষ্কার অসম্ভব নহে, এই-রূপ কল্পনার প্রভাবে তিনি অনুসন্ধানে রত হয়েন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সোয়াটেমালা ও হনডুরাস অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধান আরব্ধ হয়। অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মিঃ মড্‌স্‌লে পরিশ্রম করিতে থাকেন। ২০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি প্রাচীন মেক্সিকো-সভ্যতার স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল ও গবেষণাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। মধ্য-আমেরিকায় তিনি যে সকল শিলা-ফলক, প্রতিমূর্ত্তি এবং স্থপতিশিল্পের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি ও ছাপ সংগ্রহ করিয়া, তিনি সেগুলি বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। এতদিন সে সকল সাউথ কেনসিংটনের ভূগর্ভস্থ কক্ষে আবদ্ধ ছিল। অধুনা ব্রিটিশ যাদুঘরে সেগুলি সাধারণের গোচরার্থ রক্ষিত হইয়াছে। মিঃ মড্‌স্‌লে সুগভীর অরণ্যের প্রত্যেক অংশ পর্য্যটন করিয়া যেখানে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার আলোকচিত্র লইয়াছিলেন, জমী জরীপ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, শত শত বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অসহ্য গ্রীষ্ম, প্রবল বর্ষণ, কীট-পতঙ্গের দৌরাত্ম্য, ম্যালেরিয়াবাহী

প্যালেন্‌কোর আবিষ্কৃত সূর্য্যমন্দির।

চিচেন্ ইট্‌জার আবিষ্কৃত মন্দির।

[এই মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সোপানশ্রেণী মন্দির পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। টল্‌টেক্ জাতির রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।]

চিচেন্ ইট্‌জার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

প্যালেনকোয়ে আবিষ্কৃত প্রাসাদের একাংশ।

মশকের দংশনজ্বালা সহ্য করিয়া, পীতজ্বর জয় করিয়া তিনি সাফল্যের গৌরব-মুকুট লাভ করিয়াছেন।
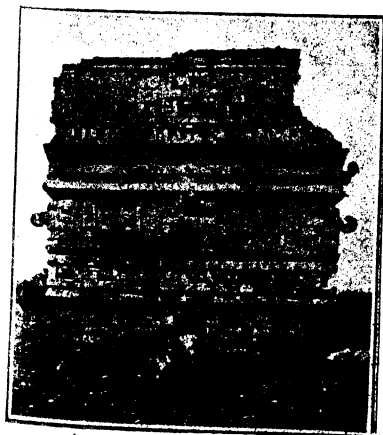
প্রাচীন মেক্সিকোর এই "মায়া" স্থাপত্যশিল্প ঘনারণ্যবেষ্টিত আটলান্টিক উপকূলস্থ প্রদেশে বিদ্যমান। দক্ষিণ-মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার এই ভূভাগটির পরিমাণ সামান্য নহে। ট্যাজাস্কো এবং চিয়াপাস্ হইতে ধ্বংস-ক্ষেত্রের আরম্ভ। গোয়াটেমালা এবং বৃটিশ অধিকৃত হন্ডুরাস্ ছাড়াইয়া উত্তর-হন্ডুরাস্ পর্য্যন্ত ইহার সীমা। অরণ্যবেষ্টিত এই বিস্তীর্ণ স্থানে প্রাচীন স্থপতিশিল্পের প্রমাণ বিদ্যমান। পাষাণনির্ম্মিত মন্দির, শিলাময় অট্টালিকা, নানাবিধ ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তিসম্বলিত সুদীর্ঘ শিলাস্তম্ভ, দেবদেবীর মূর্ত্তি অজস্র রহিয়াছে। "মায়া" জাতি যে প্রকৃতই উচ্চ দরের শিল্পী ছিল, এই সকল নিদর্শন হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

ইংরাজের ন্যায় মার্কিণ ও জার্ম্মান্ প্রত্নতাত্ত্বিকগণও "মায়া" শিল্পের কাল-নির্ণয়ের জন্য গবেষণা করিতেছেন। ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই স্থপতিশিল্প খৃষ্টজন্মের প্রথম শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। স্মৃতিসৌধগুলিতে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সে সময় মেক্সিকোর অধিবাসিগণ যে সূর্য্যোপাসক ছিল এবং দেবদেবীর পূজা করিত, তাহা তত্রত্য "সূর্য্যমন্দির" হইতেই প্রমাণিত হয়।

জবাকুসুম সদৃশ সূর্য্য প্রাচীনকালে নানা দেশেই পূজিত হইতেন। ভারতের নানা স্থানে সূর্য্যের মন্দিরও বিদ্যমান। সে সকলের মধ্যে কণারকের প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। উড়িষ্যার বালুকাস্তৃত ভূমিখণ্ডে এই বিরাট্ মন্দির আজও নানা দেশের শিল্পীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

মেক্সিকোর মেঞ্চএ আবিষ্কৃত প্রতিমূর্ত্তি।

[এই মূর্ত্তি দ্বারের উপর ক্ষোদিত। জনৈক ভক্ত দেবতার নিকট রক্ত উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে কণ্টকাকৃত রজ্জু মুখবিবর হইতে টানিয়া ফেলিতেছে]

কুইরিগুয়ায় আবিষ্কৃত ভূ-রাক্ষসের প্রস্তরমূর্ত্তি ।

[রাক্ষসটি আকাশ দেবতাকে দুই চোয়ালের দ্বারা যেন চাপিয়া ধরিয়াছে]

সূর্য্যমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তি।

প্রস্তর স্তম্ভ। কুইরিগুয়ায় আবিষ্কৃত। ২৫ ফুট লম্বা।
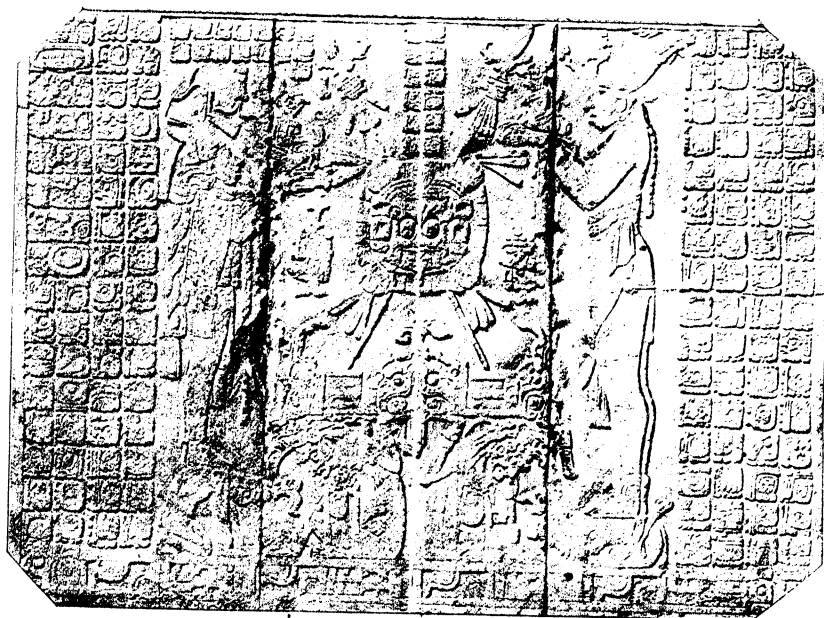
কোপানে আবিষ্কৃত গোধূম-দেবতা।

বিচিত্র ক্ষুর।

এক জন প্রতীচ্য শিল্পী সংপ্রতি এক প্রকার বিচিত্র ক্ষুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্ষুর তড়িৎশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। ঘাস কাটিবার যন্ত্র 'লন মোয়ার' সকলেই দেখিয়াছেন। এই তৃণচ্ছেদক যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রের তৃণ যে ভাবে ছাঁটিয়া ফেলা হয়, অনেকটা সেই প্রণালীতে এই অভিনব ক্ষুরের সাহায্যে ক্ষৌরকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই যন্ত্রটি বহু ফলাযুক্ত এবং একটি খাপের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। আধারের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম কৌশলসম্পন্ন যন্ত্রের

বিচিত্র ক্ষুর।

সমাবেশ আছে, তাহার ফলে ক্ষুরটি আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ক্ষুরের খাপের প্রান্তদেশে একটি বোতাম আছে। উহার সঞ্চালন দ্বারা ক্ষুরের আধারমধ্যে তড়িদ্ধারার গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। ক্ষুরের উদ্ভাবনকর্ত্তা স্বয়ং উহার সাহায্যে নিজ ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশের ধনি-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এই ক্ষুরের চলন হয় নাই।

স্বরবহ যন্ত্র।

এতদিনে বাকপটুতা, শব্দ উচ্চারণের মধুরতা য়ুরোপে ললিত-কলার অন্তর্গত হইতে চলিল। বালকরা বিদ্যালয়ে

উচ্চারণবিষয়ে অমনোযোগী ও মধুর বচন-বিন্যাসে উদাসীন শিক্ষকদিগের কথনভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া অনেক সময় বাক্‌পটুতা লাভ করিতে পারে না। এই অনুকরণের ফলে যে উচ্চারণঘটিত দোষ ও শব্দের অপপ্রয়োগ তাহাদের স্বভাবগত হইয়া দাঁড়ায়, পরিণত বয়সেও তাহারা সে দোষ সংশোধন করিয়া উঠিতে পারে না। লণ্ডনের কোন বিদ্যালয়ের এক জন বাক্‌পটু শিক্ষকের বালকদিগের এই দোষের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি বালকদিগের উচ্চারণগত দোষের পরিহার-কল্পে স্থির করেন, যদি বালকগণের কথোপকথনের অবিকল প্রতিধ্বনি কোন কৌশলে তাহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহাদিগের কণ্ঠস্বরের ও উচ্চারণগত দোষের সংশোধন ঘটিতে পারে। ইহার ফলে তিনি স্বরবহ বা 'ভইসকোপ' যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এই নবোদ্ভাবিত স্বরবহ-যন্ত্রের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার গঠনে কোন জটিলতা নাই। এই যন্ত্রে একটি মুখনল আছে, সেই মুখনলের দক্ষিণ ও বামদিকে দুইটি নমনশীল নল সংলগ্ন থাকে। নল দুইটির প্রান্তভাগ ইচ্ছানুসারে কর্ণে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায়। যাহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আপনাদিগের কণ্ঠস্বর ও কথন-ভঙ্গী লক্ষ্য করে, তাহারা অনায়াসে আপনাদিগের উচ্চারণদোষ ও কণ্ঠস্বরের ত্রুটি বুঝিতে পারে। কারণ, যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগের কণ্ঠধ্বনি বহুগুণ উচ্চ শুনা যায়; সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের ও উচ্চারণগত দোষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অর্দ্ধোচ্চারণ বা আধ আধ স্বরে উচ্চারণ, সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ও এক বর্ণের স্থানে অন্য বর্ণের উচ্চারণে যে ধ্বনিগত দোষ ঘটে, তাহা যন্ত্র-ব্যবহারকারীর মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই দোষ সংশোধনের জন্য তাহার মনে একটা প্রবল স্পৃহা জন্মে। ক্রমাগত ছেলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার উচ্চারণগত দোষ সংশোধনের যে ফল ফলে নাই, এই যন্ত্র উদ্ভাবনে ও ব্যবহারে সেই ফল হইয়াছে।

স্বরবহ যন্ত্র।

কাচের কলম।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুমান, প্রাচীন মিশরীয় লেখকগণ কাচের তীক্ষ্মমুখ লেখনীর সাহায্যে চিত্ররেখার কাজ সম্পন্ন করিতেন। সংপ্রতি বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার 'ফাউণ্টেন পেন' আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মুখে সাধারণ 'নিবের' পরিবর্ত্তে কাচের সূক্ষ্ম শলাকা সন্নিবিষ্ট।

কাচের কলম।

এই শলাকা বা 'নিব' স্বর্ণ-নির্ম্মিত 'নিব' অপেক্ষা দীর্ঘকাল-স্থায়ী। এই লেখনীর অন্যান্য অংশ বংশ-নির্ম্মিত, বেশ পালিশ করা। নলের মধ্যস্থলে কালি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, একটু চাপ পড়িলেই আপনা হইতে কালি ধীরে ধীরে নির্গত হয়। এই নূতন লেখনী এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, কালির অপচয় হয় না।

—

টীকা আবিষ্কার।

বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টীকার আবিষ্কারকের নাম মিঃ এডওয়ার্ড জেনার। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্লষ্টারশায়ারের অন্তর্গত বার্কলে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেই স্থানের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে গিয়া প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক জন হাণ্টা-রের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে তিনি স্বগ্রামে গিয়া চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করেন। বসন্তের মহামারীতে প্রায়ই শত সহস্র লোক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহার প্রতিষেধক কিছু আছে কি না, তাহা আবিষ্কারের জন্য তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ গো-বসন্ত লইয়াই তিনি গবেষণা করিতে থাকেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে তিনি কোন গোয়ালিনীর হাতের স্ফোটক হইতে রস লইয়া একটি সুস্থ সবল অষ্টমবর্ষীয় বালকের দেহে প্রয়োগ করেন। তাহার দেড়মাস ক্ষত হইতে পূয পরে ভিন্ন বসন্তের লইয়া সেই বালকের দেহে পরীক্ষা করিতে থাকেন। ফলে তিনি দেখিতে পায়েন যে, বালকটি সম্পূর্ণরূপে বসন্ত-রোগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এইরূপে তিনি টীকা দিবার পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। তাঁহার এ আবিষ্ক্রিয়ার কথা তিনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেণ্ট তাঁহাকে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। ডাক্তার মাগ পেইলী এই সামান্যপরিমাণ অর্থ-প্রদানের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখেন যে, ডাক্তার জেনার যদি তাঁহার গবেষণার ফল সাধা-রণে প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং বসন্ত-রোগের চিকিৎসা করিতেন, তাহা হইলে, অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন

অষ্টম বর্ষীয় বালকের দেহে প্রথম টীকা দেওয়া।

ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার।

করিতেন। কিন্তু তিনি অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সাধারণের উপকারের জন্য স্বীয় গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্তব্যের ফলে পার্লামেণ্ট পুনরায় ডাক্তার জেনারকে ৩ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মনীষী চিকিৎসক দেহত্যাগ করেন।

ডাক্তার জেনার স্বীয় পুত্রের দেহে, শূকর দেহের বসন্তের পুয প্রয়োগ করিতেছেন।

কাগজের পিপা।

আমেরিকায় সংপ্রতি এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে যে কোনও ব্যবসায়ী অল্পসময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক কাগজের পিপা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্বে জাহাজে মাল চালান দিবার সময় গুদামে পিপা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত, তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা ছিল। পিপাগুলি রাখিবার জন্য অনেকটা যায়গা লাগিত। এই নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর তাহার আর প্রয়োজন নাই।

এই কল তাড়িতশক্তির দ্বারা চালিত হয়। পিপাগুলি সাধারণ মোটা কাগজের স্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। একখানি কাগজের উপর আর একখানি কাগজ শিরীষ-আঠার দ্বারা আঁটিয়া গোল করিয়া দেওয়া হয়। যন্ত্রের সাহায্যেই সে কার্য্য হইয়া থাকে। কাগজের নির্ম্মিত বলিয়া পিপাগুলি
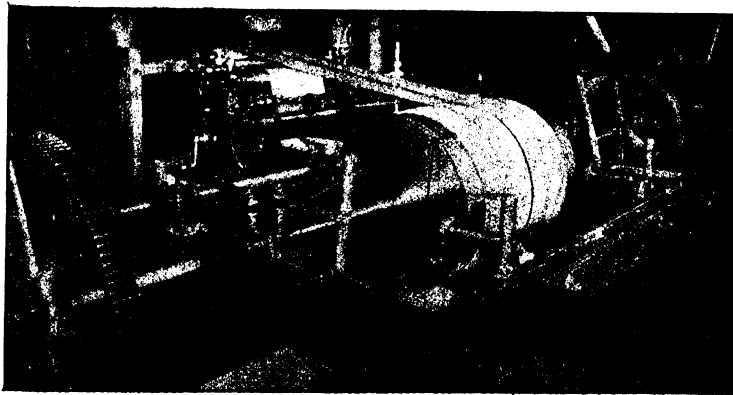
পিপার কল। ইহাতে পিপা প্রস্তুত হইতেছে।

অদৃঢ় নহে। প্রকৃতপক্ষে কাঠের পিপার মতই শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী; অথচ অত্যন্ত লঘুভার।

ভিন্ন ভিন্ন আকারের পিপা এই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে উচ্চতা অল্প বা অধিক করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। পিপা পুরু বা পাতলা করিতে হইলে যিনি যন্ত্র চালাইবেন, তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। যতগুলি কাগজের স্তর দিবার প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবে কাগজ সংস্থাপন করিলেই হইল। ইহাতে অতি সত্বর পিপা নির্ম্মিত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। প্রতি মিনিটে একটি করিয়া পিপা কল হইতে বাহির হইয়া আইসে। সুতরাং ২৭ ঘণ্টা কল চালাইলে যত বড় ব্যবসায়ীই হউন না কেন, তাঁহার মাল চালান দিবার জন্য গুদামে পিপা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

দুই প্রকার আকারবিশিষ্ট পিপা।

কাঠের পিপার অপেক্ষা কাগজের পিপা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট। কারণ, কাঠের পিপা ইচ্ছামত আকারবিশিষ্ট করা সহজ নহে। কাগজের পিপা ছোট, বড় ও ভিন্ন আকারের করা খুবই সহজ। ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্য—অর্থাৎ কাচের বাসন প্রভৃতি, কাঠের পিপা বা বাক্স অপেক্ষা কাগজের পিপার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে জাহাজে চালান দিবার সুবিধা। চূর্ণদ্রব্যাদি এতদিন কাঠের পিপায় পাঠাইতে হইলে পিপার মধ্যে অগ্রে কাগজ আঁটিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে ব্যবসায়ীর খরচ অধিক পড়িত, কিন্তু কাগজের পিপায় সে সব অসুবিধা আর হইবে না।

কাগজের পিপা করিয়া তরল পদার্থ জাহাজে চালান দেওয়ারও কোন অসুবিধা নাই। শুধু পিপার ভিতরে কলাই করিয়া দিলেই হইল।

কাগজের পিপা তৈয়ারের পরের দৃশ্য।

কাগজের পিপা কিরূপ দৃঢ় হয়, তাহার পরীক্ষা।
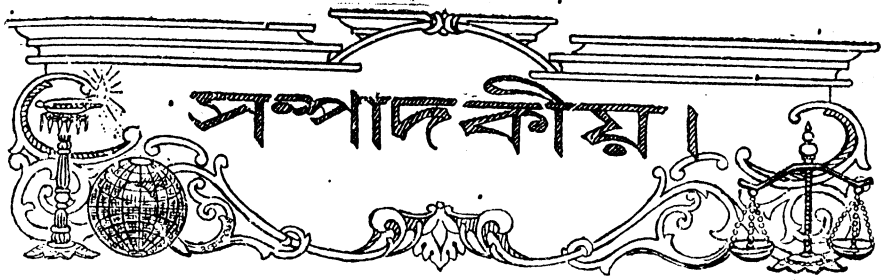
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল

কলিকাতা হইতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া জলপথে অনেক ষ্টীমার প্রধানতঃ মাল লইয়া খুলনা হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে গতায়াত করে। সুন্দরবনের মধ্যে যে সব খাল বা "খাঁড়ি" দিয়া এই সব ষ্টীমার যায়, সে সব পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহার অনেকগুলার বর্ত্তমান অবস্থাও ভাল নহে। এই সব কারণে একটা খাল কাটিয়া নূতন জলপথ রচনার একটা প্রস্তাব অনেক দিন হইতেই হইতেছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থ সচিব এই খালের কথায় বলিয়াছিলেন, এই খালের জন্য ভারত-সচিবের মঞ্জুরী প্রার্থনা করা হইয়াছে; ব্যয় পড়িবে —৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। তাহার পর সরকারের তহবিলে অর্থের অভাবই ঘটিয়াছে; সহসা যে আবার এই খাল কাটাইবার প্রস্তাব উঠিবে, এমনও কেহ মনে করেন নাই। কিন্তু গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে এক সভায় আহ্বান করেন—তাহাতে এঞ্জিনিয়ার মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামস্ সদস্যদিগকে এই খালের উপযোগিতা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, বহু চেষ্টায় তিনি ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় খাল রচনাকার্য্য শেষ করিবার উপায় করিয়াছেন।

মিষ্টার এডামস্ উইলিয়ামসের প্রথম বক্তব্য—কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গতায়াতের জলপথ প্রয়োজন এবং সে জলপথ রাখিতে হইলে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খালই কাটাইতে হইবে—তাহাতে লাভও হইবে।

তিনি জলপথে বাহিত মালের ও যাত্রীর হিসাব দেন—১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫ বৎসরে ষ্টীমারে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ মণ মাল বাহিত হইয়াছিল, আর ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাহিত মালের পরিমাণ—৪ কোটি ৯ লক্ষ মণ। এই কার্য্যে ব্যাপৃত যানের সংখ্যা প্রায় ৭ শত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ যাত্রী ষ্টীমারে গতায়াত করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ষ্টীমার যায়—পথ ১ হাজার ১ শত ৮ মাইল। বড় বড় ষ্টীমারে একসঙ্গে ৪ খানি "ফ্লাট"ও টানা হয়; তাহাতে যে মাল যায়, তাহা লইতে ১২খানি সাধারণ মাল ট্রেণ লাগিবে।

ষ্টীমারের পরিবর্ত্তে রেলই যদি ব্যবহার করা যায়, তবে অনেক নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, আর তাহার ব্যয়ও অত্যধিক। খুলনা হইতে মাদারীপুর হইয়া বরিশাল পর্য্যন্ত এক লাইন নির্ম্মাণের খরচ ৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমগ্র গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খালের ব্যয় অপেক্ষাও অধিক। আবার সে লাইন হইলে কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত প্রায় ১ শত মাইল পথ লাইন ডবল করিতে হইবে। সর্ব্বসমেত যে ব্যয় পড়িবে, তাহার অর্দ্ধেক খরচে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল রচিত হইতে পারে।

কাযেই দেখা গেল, খাল জলপথে খরচ কম হয়। কিন্তু জলপথ রাখিতে হইলে এই খাল কাটানই প্রয়োজন কেন? এই খাল কাটাইলে পথ ১ শত ৩৫ মাইল কমিবে। তাহাতে অল্প সময়ে মাল ও যাত্রী আসিবে এবং ভাড়াও কম পড়িবে। সুন্দরবনের যে অংশ এখনও আবাদ করা হয় নাই, সে অংশে কোন নদী হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে না। কিন্তু যে অংশে আবাদ হইতেছে, সে অংশে নদী অতি দ্রুত নষ্ট হইতেছে—বিদ্যাধরী নদী মজিয়া যাওয়াতে কলিকাতার সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। যতক্ষণ আবাদের জন্য নদীর দুই কূলে বাঁধ বা "ভেড়ী" বাঁধা না হয়, ততক্ষণ পলীভরা জল অধিকাংশ জমীর উপর ছড়াইয়া পড়িত—নদীগর্ভে যে পলী জমিত, তাহা স্রোতে সরিয়া যাইত। কিন্তু বাঁধ

বা ভেড়ী বাঁধা হইলে জল আর জমীতে যাইতে পারে না—পলী থিতাইয়া নদীগর্ভেই পড়ে—স্রোতে তাহা ধৌত করা অসম্ভব হয়। প্রমাণ—১ মাইলেরও কম দীর্ঘ দোয়া আগরা নদী। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহার বিস্তার ছিল ২ হাজার ৭ শত ৫০ ফুট; এখন ২ শত ফুট মাত্র। ১২ বৎসরে এই পরিবর্ত্তন! ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইহার সংস্কার করা হয়—৮ বৎসর পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আবার সংস্কার প্রয়োজন; এবার ২ বৎসরেই আবার সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব নদী যেরূপ দ্রুত মজিয়া উঠিতেছে, তাহাতে সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে বজায় রাখা অসম্ভব এবং সংস্কারের অর্থাৎ মাটীকাটা কলে মাটীকাটার খরচও অত্যন্ত অধিক, কারণ,তাহাতে অন্ততঃ ৫ বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা করিয়া খরচ করিতে হইবে এবং সে খরচও উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে। আর সে খরচ হইতে কোনরূপ আয় হইবে না। অতএব সে চেষ্টা না করাই সঙ্গত।

এইরূপে নূতন খাল কাটাইবার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়া মিষ্টার এডামস্ উইলিয়ামস বলেন, এই খালে ২ দিকে দরজা দেওয়া ৩০ মাইল কাটাখাল পাওয়া যাইবে—বরাহনগরে তাহা গঙ্গায় ও মালঞ্চে কালীনগর নদীতে আসিয়া মিলিবে—অবশিষ্ট অংশ ভাল ভাল নদী—সেই পথেই ষ্টীমার গতায়াত করিতে পারিবে। মোট পথ ১ শত ৩৫ মাইল কম হইবে।

মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামসের মতে ইহাতে লাভও প্রচুর হইবে। লাভ শতকরা ১৩ টাকা—তাহা হইতে সুদের বাবদে ৬ টাকা বাদ দিলেও বাঙ্গালা সরকারের শতকরা ৭ টাকা লাভ থাকিবে এবং ১৫ বৎসর ধরিয়া খাল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে আয় বাড়িবে।

বাঙ্গালা সরকারের অর্থের যেরূপ অনাটন, তাহাতে এমন একটা প্রস্তাবে সরকারের আগ্রহ হওয়া অসম্ভব নহে। শুনাও যাইতেছে, এইবার বাজেট পেশ হইবার পর সরকার খালের জন্য আবার ব্যবস্থাপক সভার কাছে খরচ মঞ্জুর চাহিবেন।

কিন্তু এই দুঃসময়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের এই প্রস্তাব বিশেষ সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামস জলপথে যাত্রীর গতায়াতের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা কোন্ পথের? আমরা যতদূর জানি—খুলনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাত্রীরা ষ্টীমারে গতায়াত করে না - রেলেই আইসে যায়। তবে এ হিসাব তিনি কোথায় পাইলেন?

খাল কাটিলে পথ কমিবে বটে, কিন্তু তাহাতে কতটুকু সুবিধা হইবে? মাল একবার ষ্টীমারে বোঝাই হইলে তাহা পৌঁছিতে ২৪ ঘণ্টা বিলম্বে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

আর এক কথা—৩০ মাইল খাল দরজা দেওয়া থাকিবে; অবশিষ্ট ৯৬ মাইল ষ্টীমার নদী দিয়াই আসিবে। মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামস বলিয়াছেন, সে সব নদী সহজে মজিয়া যাইবে না। কিন্তু সে কথা কিরূপে বলা যায়? তিনি যে দোয়া আগরা নদীর কথা বলিয়াছেন—পশুর নদীরও যে সেই অবস্থা হইবে না, তাহা কি দৃঢ়তাসহকারে বলা চলে? খাল কাটা হইলেই সুন্দরবনের পতিত জমী উঠিত করা বন্ধ হইবে না,; তখন পশুর প্রভৃতি নদীও হয় ত পলী পড়িয়া মজিয়া উঠিবে এবং বাঙ্গালার তহবিলের এই ৩ কোটি টাকা খরচ ব্যর্থ হইবে। তখনও এই কাযের জন্য বাঙ্গালা সরকারকে বৎসরে শতকরা ৬ টাকা হিসাবে প্রায় ৩ কোটি টাকার উপর সুদ টানিতে হইবে। তখন হয় ত ৩০ মাইলের পর অবশিষ্ট ৯৬ মাইলও খাল কাটিতে হইবে এবং সে জন্য আবার ৯ কোটি টাকা ঋণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে। খাল কাটা হইলে খালের কূলে যে বাঁধ দিতে হইবে, তাহাতে জমীর স্বাভাবিক জলনিকাশ-ব্যবস্থা প্রহত হইবে। ফলে যদি মাতলা নদী মজিয়া উঠে, তবে বিদ্যাধরীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে কলিকাতারও সর্ব্বনাশ হইবে।

মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামস বলিয়াছেন, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রেল-লাইন ডবল করিতে এবং খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত সিঙ্গল লাইন করিতে মোট যে খরচ পড়িবে, তাহার অর্দ্ধেক খরচে খাল কাটান যায়। তাঁহার মতই যদি যথার্থ হয়, তবুও বলিতে হয়—রেল-লাইন নিশ্চিত, খাল অনিশ্চিত। যে কারণেই হউক, বাঙ্গালা দেশের নদী-নালা যে ভাবে মজিয়া উঠিতেছে,অত্যল্প কালের মধ্যে দোয়া আগরা নদী যে ভাবে নষ্ট হইতেছে—তাহাতে যে সব নদীর মধ্য দিয়া খাল হইলে, ষ্টীমার গতায়া

করিবে, সেই ৯৬ মাইলব্যাপী নদীপথ যে অল্পদিনেই দুর্গম হইবে না—তাহা কিরূপে নিশ্চয় বলা যায়?

অগ্র-পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া—দূরদর্শনের অভাবে অনেক কায করিয়া আমরা যেরূপে ঠকিয়াছি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের জলনিকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া রেলপথ রচনার ফলে দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইয়াছে—আর কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবার উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবনে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। সব কথা বিবেচনা না করিয়া টালায় জলের যে চৌবাচ্ছা করা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার করদাতাদের অর্থ জলেরই মত ব্যয়িত হইলেও তৃষ্ণার সময় তাহাদের পক্ষে জললাভের সুবিধা হয় নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়।

তাই আমরা আশা করি, বাঙ্গালার এই অর্থকষ্টের সময়—যখন শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির কাযের জন্য আবশ্যক অর্থ মিলিতেছে না, তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা যেন বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা মিষ্টার এডামস্-উইলিয়ামসের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া প্রায় ৩ কোটি টাকা এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক খাল খননের জন্য মঞ্জুর না করেন।

আর এক দল

গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেই বুঝা গিয়াছিল, কংগ্রেসে আবার একটা দল হইবে এবং সে দল কংগ্রেসের বহুমত অনুসারে কায করিতে অসম্মত। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি সেই দলভুক্ত। সংপ্রতি সেই দল তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতিনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমে এলাহাবাদে এই দলের এক সভা হয় এবং সে সভায় এই দল আপনাকে "কংগ্রেস খিলাফৎ-স্বরাজ" দল বলিয়া অভিহিত করেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস রচিত কার্য্যপদ্ধতি প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে বলা হয়, ক্রমে এই আদর্শে উপনীত হইতে হইবে। সমগ্র পদ্ধতি ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। পরিশিষ্টে বিশেষ বিবরণ বিদ্যমান।

প্রথম কথা—যথাসম্ভব স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের কল্যাণকর কার্য্য করিবেন।

দ্বিতীয়—দেশকে শাসনকার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে বা কেন্দ্রে বিভক্ত করিতে হইবে।

তৃতীয়—শাসনের বিভাগ—

(১) শিক্ষা।

(২) (ক) পুলিস ও মিলিশিয়া সেনাদলের দ্বারা দেশরক্ষা, (খ) বিচার ও দলিল রেজেষ্টারী, (গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা।

(৩) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন। উপায়—(ক) কৃষির উন্নতি, (খ) পশুজনন, (গ) উৎপাদক শিল্পপ্রতিষ্ঠা, (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, (ঙ) রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি।

(৪) পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য আইন প্রণয়ন ও কর্ম্মচারিনিয়োগ।

চতুর্থ—পঞ্চায়েৎ।

পঞ্চম—পঞ্চায়েতের দ্বারা রাজস্ব আদায়।

ষষ্ঠ—ভূমিতে ও অর্থে স্বামিত্ব।

এই কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও সার আশুতোষ চৌধুরীর আহ্বানে এক পরামর্শ-সভা হয়। তাহাতে আর একখানি উদ্দেশ্যবিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে দলের নাম ছোট করিয়া "স্বরাজ দল" বলা হয়। তাহাতে দেখা যায়, দল যে উপায় সমীচীন বিবেচনা করিবেন, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যের সহায়তা করিবেন। এই দল ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সদস্য হইবার চেষ্টা করিবেন। নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতিনিধিরা দলের নির্দ্দিষ্ট দাবি উপস্থাপিত করিবেন এবং সে দাবি পূরিত না হইলে সরকারের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া শাসনকার্য্য অচল করিবেন। সভায় দাশ মহাশয় বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার বিনাশই করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে এই সব দাবির কথা উঠিতেই পারে না এবং এসেম্ব্লীতে দাবির প্রস্তাব গৃহীত হইলেও কার্য্যে পরিণত হয় না, পরন্তু অনুরোধমাত্র থাকিয়া যায়—সে কথার কোন সন্তোষজনক উত্তর দাশ মহাশয় প্রদান করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভার এরূপ নির্দ্ধারণ পদদলিত করিয়াও যে ব্যুরোক্রেশী দেশ-শাসন করিতে পারেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

কলিকাতায় সভার পর এলাহাবাদে এই দলের আর এক সভা হইয়াছে। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;—

(১) এই দল স্বরাজলাভেচ্ছায় উপায়স্বরূপ অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করিবেন। অহিংস অসহযোগের দ্বারা দেশে এমন অবস্থার উদ্ভব করা হইবে যে, এক দিকে প্রতিরোধের দ্বারা এবং অপর দিকে কোনরূপ সহযোগিতা-বর্জ্জনদ্বারা এ দেশে আমলাতন্ত্রশাসন অসম্ভব করা হইবে।

(২) দেশ প্রস্তুত হইলে এবং প্রয়োজন হইলে আইন অমান্য করিতে হইবে। কিন্তু দেশ এখনও তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। যোগ্যতা যেরূপ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহার উদ্ভব কবে হইবে স্থির করা যায় না; কাযেই কবে আইন অমান্য করা যাইবে, তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না।

(৩) দেশের সর্ব্বত্র এই দলের লোকরা ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন। নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত সদস্যরা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের দাবি উপস্থাপিত করিবেন। যদি তাঁহাদের দাবি পূরণ করা না হয়, তবে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা দেশশাসন অসম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্ববিষয়ে (consistent and continuous) সরকারের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন।

(৪) স্বরাজের জন্য সংগ্রামে এ দেশের শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে, এই দল শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন।

(৫) একটি শাখা-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে এই দল কতকগুলি বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিবেন।

(৬) কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যের মধ্যে, স্বদেশী, খদ্দর-ব্যবহার, আবকারী ত্যাগ, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, জাতীয় শিক্ষা-বিস্তার, সালিশ আদালত স্থাপন ও কংগ্রেসের সদস্য-বৃদ্ধি বিষয়ে এই দল যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন।

(৭) এই দল প্রত্যেক প্রদেশে—তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জাতীয় সঙ্ঘ গঠিত করিবেন।

যাহা হউক, ইহার পর ২ মাসের জন্য একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে। তাহার সর্ত্ত :—

(১) উভয় দলই আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন বা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্যে বিরত থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে দুই দল যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কায করিবেন—সে জন্য অপর দলের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৩) যাঁহাদের দলে সংখ্যাধিক্য, তাঁহারা অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধে গয়ায় কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করিতে পারিবেন।

(৪) গঠনকার্য্যের জন্য যে টাকা ও স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহে নূতন দল কংগ্রেসের নির্দ্ধারণমান্যকারী দলকে সাহায্য করিবেন।

(৫) ৩০শে এপ্রিলের পর দুই দল যে যাহার ইচ্ছামত কায করিতে পারিবেন।

(৬) যদি ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে কোন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ২ দলে এই চুক্তি আর বহাল থাকিবে না।

আমরা এ আপোষে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। যদি দুই দল এই ২ মাস কাল সর্ব্ববিষয়ে একযোগে কায করিতেন, তবে প্রকৃত ফলাফল বিচারের সুযোগ হইত। নহিলে কংগ্রেসের গঠনকার্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে, বলা সঙ্গত নহে।

চাকরী কমিশন

একটা ব্যয়বহুল চাকরী কমিশনের নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আবার একটা কমিশন বসিতেছে। ভারতে চাকরীর অবস্থা-ব্যবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই কমিশনের সৃষ্টি। ভারতবাসীর ইহাতে শঙ্কার বিশেষ কারণ আছে—হয় ত লোহার কাঠাম সিভিল সার্ভিসের বেতন আবার বাড়িয়া যাইবে এবং বিদেশী চাকরীয়ার আমদানী বাড়ান হইবে।

এই কমিশন গঠনের সংবাদ পাইয়া দিল্লীতে লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সদস্যরা ইহার প্রতিবাদ করেন। আর বাহিরে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা-সচিব সার তেজ বাহাদুর সপ্রুও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। যদি ১০ বৎসর ফল না দেখিয়া শাসন-সংস্কারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, তবে সে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে

া হইতে আবার একটা চাকরী কমিশন বসাইবারই বা প্রয়োজন কি ?

কিন্তু ভারতবাসীর কথায় কি আইসে যায় ? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম—কাযেই লয়েড জর্জ্জ যখন বলিয়াছেন, ভারতের শাসনকার্য্যে সিভিল সার্ভিসের প্রাধান্য রাখিতেই হইবে এবং এখনও যখন বিলাত হইতে বিশেষ সর্ত্তে এ দেশে ডাক্তার-চালানী কায চলিতেছে, তখন চাকরীতে ইংরাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার সম্ভাবনা অবশ্যই সুদূর-পরাহত।

রেলে আয়-ব্যয়

গত ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়---আলোচ্য বৎসর ১ শত ২৫ মাইল নূতন রেলপথ রচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রেল-বিস্তারে মোট ৬৫৬ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। আর স্থির হইয়াছে, আগামী ৫ বৎসরে রেলের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

আলোচ্য বৎসরে—

আয়	৮১,৯৪,০০,৯৫৭	টাকা
ব্যয়	৯১,২১,৩১,৪৫৮	”
মোট লোকশান...	৯,২৭,৩০,৫০১	টাকা

বিবরণে এই ৯ কোটি টাকা লোকশানের কৈফিয়ৎ দিবার বিশেষ চেষ্টা সপ্রকাশ। ৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিবরণে আরও নানারূপ ত্রুটি কৈফিয়ৎ আছে ; যথা—

(১) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধার

(২) কয়লার জন্য গাড়ীর অনাটনের

(৩) মাল চুরীর---ইত্যাদি

মোট কথা কোন ত্রুটিরই কৈফিয়তের অভাব নাই।

কিন্তু এই যে ৯ কোটি টাকা লোকশান, ইহার জন্য কত অমিতব্যয়িতা, কত ভুল, কত বে-বন্দোবস্ত দায়ী তাহা নির্দ্ধারণ করাই দুষ্কর। প্রকাশ—যুদ্ধজনিত কারণেই এই ক্ষতি। প্রমাণের জন্য দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার, কানাডার, ফ্রান্সের, ইটালীর, দক্ষিণ আফ্রিকার রেলপথে ক্ষতির নজীর উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু যত নজীরই কেন দাখিল করা হউক না, জিজ্ঞাসা করিতে প্রলোভন হয়—উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে কি এই লোকশানের পরিমাণ কমান যাইত না ? মাল কাটাইবার জন্য দোকানদার "সস্তায় মাল সাবাড়ের" বিজ্ঞাপন দেয়—রেলে তেমনই যাত্রীর ও মালের ভাড়া কমাইলে অধিক যাত্রী ও মাল পাওয়া যায়—তাহাতে মোটের উপর লাভ হয়। কিন্তু এ দেশে তাহা না করিয়া ভাড়ার হার বাড়ান হইয়াছে! এ দেশে রেল একচেটিয়া ব্যবসা---তাই এমন অব্যবস্থা সম্ভব ও শোভা পায়।

আয় বাড়াইবার জন্য ভাড়া কমাইয়া অধিক মাল ও যাত্রী আকৃষ্ট করিতে হইলে সুব্যবস্থার প্রয়োজন। এ দেশের রেলে তাহারই অভাব। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রত্যেক কর্ম্মচারী বৎসরে গড়ে ১ হাজার ১ শত ১৩ টন ওজনের মাল চালানীর কায করিয়াছিল। আর এ দেশে ? আলোচ্য বর্ষে কর্ম্মচারী ছিল ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪ শত ৭৮ জন ; আর মাল চালান হইয়াছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৮ টন, অর্থাৎ প্রতি কর্ম্মচারী বৎসরে ১ শত টন মাল চালানীর কাযও করে নাই। আমেরিকার রেলের কর্ম্মচারীরা যে ভারতের রেলে কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিতে ও বলে একাদশ গুণ শ্রেষ্ঠ, এমন মনে করিবার কোনই কারণ নাই—এরূপ তারতম্য সভ্য জগতে থাকিতে পারে না। এই যে ত্রুটি, ইহার জন্য শ্রমজীবীরা বা নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা দায়ী নহে ; দায়ী---ব্যবস্থা।

গল্প আছে, কোন দরিদ্র ভদ্রলোক বহু কষ্টে একটা ভাল অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়াছিলেন এবং বাজারে মাছ কিনিতে যাইয়া কেবলই সেই অঙ্গুরীয়-শোভিত অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ; তাহা দেখিয়া মেছোনী তাহার সোনা বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া উত্তর দিয়াছিল—"ছ' পয়সা।" তেমনই এ দেশের রেল-কর্ত্তারা বোধ হয় মনে করেন, এ দেশে যে ৫০ বৎসরে ৩৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত ৬৫ মাইল রেলপথ রচিত হইয়াছে, সে একটা অসাধ্যসাধন, আর সেই জন্য তাঁহারা সেই কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কি হইয়াছে ? ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রেলপথ ছিল, ৯ হাজার ২১ মাইল ; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, ৫২ হাজার ৯ শত ২২ মাইল ; ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯ শত ৬৪

মাইল;—আর তাহার পর ১০ বৎসরে বাড়িয়াছে ৫১ হাজার ২৮ মাইল। অথচ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যা মাত্র ১০ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ ভারতের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। কাযেই ভারতে রেল-বিস্তারে গর্ব্বের বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

আলোচ্য বৎসর লোকশান—প্রায় ৯ কোটি টাকা। কিন্তু যে সব কোম্পানী রেলের কায চালাইয়াছেন, তাঁহা-দিগকেই ১ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত ২২ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সরকার যদি আপনি রেলের কায চালাইতেন, তবে এই টাকাটা বাঁচিয়া যাইত। তাহা হয় না কেন?

পথ-বিস্তারের দ্বারা দেশের বল ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রেলপথই তাহার সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কারণ। এ বিষয়ে ভারতে যে স্বাভাবিক সুযোগ আছে, তাহার অবহেলা করা হইয়াছে ও হইতেছে। রেলপথের জন্য যে দুইটি উপকরণ অত্যাবশ্যক, ভারতে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান—লৌহ ও কয়লা। যদি রেলপথ রচনার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে রেলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইত, তবে রেলপথ-বিস্তারকার্য্য সহজসাধ্য হইত গাড়ীর অভাব হইত না—এঞ্জিনের জন্যও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। সকল দেশেই কায করিতে করিতে শিল্পী শিল্পকার্য্যে দক্ষ হয়; কোন দেশেই পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা লইয়া শিল্পী ভূমিষ্ঠ হয় না। আমেরিকা যদি উপকরণের সদ্ব্যবহার না করিত—কারখানা প্রতিষ্ঠিত না করিত, তবে কিসে দেশে রেলপথ এত বিস্তৃত করা সম্ভব হইত?

এ দেশে রেলে যে সময় সময় অত্যন্ত ভীড় হয়, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় না থাকিলেও এই বিবরণে তাহা প্রকারান্তরে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। বিবরণের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কোন ট্রেণে ৩ শতের অধিক যাত্রী লইবার ব্যবস্থা নাই, সুতরাং ভীড় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এমন বিস্ময়কর যুক্তি ও উক্তি সচরাচর দেখা যায় না। যেহেতু ট্রেণে ৩ শতের অধিক যাত্রী লইবার ব্যবস্থা নাই, সেই হেতু ট্রেণে ৪ শত লোক দিলেও ভীড় হইবে না, এমন কথা সত্যই হাস্যোদ্দীপক। অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে এবং যোগ বা মেলা প্রভৃতির সময় সকল ট্রেণে কিরূপ ভীড় হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সময় সময় যে খোলা মালগাড়ীতেও যাত্রী চালান দেওয়া হয় এবং যাত্রীদিগের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না—এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই ভীড়ের কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

এবার—এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বলিব। আমেরিকার রেলপথ পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। সে রেলপথে কর্ম্মচারীরা উচ্চহারে বেতন পায়, তবুও তাহাদের ভাড়ার হার অল্প। আর ভারতবর্ষে (বিশেষ ভারতবাসী কর্ম্মচারীর পক্ষে) সেরূপ বেতন স্বপ্নাতীত হইলেও রেলে যাত্রীর ও মালের ভাড়া অধিক। ইহার প্রতীকার অসম্ভব হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশে রেলে গতায়াত অত্যন্ত সময়সাধ্য। কলিকাতা হইতে দিল্লী ৯ শত মাইল পথ—যাইতে ৩০ ঘণ্টা লাগে; আর সিকাগো ফ্লাইয়ার ট্রেন ১৮ ঘণ্টায় ১ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। পাঞ্জাব ডাকগাড়ীতে আর এই সিকাগো ফ্লাইয়ারে বা নর্দার্ণ একসপ্রেসে তুলনা হয় কি?

—

ভারত সরকারের বাজেট

দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় আগামী বৎসরের জন্য ভারত সরকারের বাজেট পেশ হইয়াছে। গত বৎসরে বাজেটের পর কার্য্যকালে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ফাজিল ৯ কোটির স্থানে সাড়ে ১৭ কোটি বা প্রায় দ্বিগুণ হইবে। তবুও খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা ৪ কোটি টাকার উপর কমান হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধাংশ ঋণের সুদ, তাহা আগামী বৎসর দিতে হইবে। ওয়াজিরীস্থানে অভিযান ব্যাপারে খরচ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং সৈন্যদল বিদায় দিতে ২ কোটি টাকা খরচ হইলেও সামরিক ব্যয় মোট ৫০ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। অহিফেনে ও লবণে আয় বাজেট অপেক্ষা ১ কোটি টাকা অধিক হইলেও মোট রাজস্ব ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কম পাওয়া গিয়াছে। চিনির মূল্য কমিয়া যাওয়ায় শুল্কের হিসাবে আয় দেড় কোটি টাকা কমিয়াছে। ডাকে ও টেলিগ্রাফে ১ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে। রেলে যে স্থানে ৫ কোটি টাকা লাভের আশা করা হইয়া-ছিল, সে স্থানে ১ কোটি টাকা লোকশান হইয়াছে।

অর্থ-সচিব বলেন, ৫ বৎসরে রাজস্বের ঘাটতীর পরিমাণ ১ শত কোটি টাকা। নয় বৎসরে এ দেশে ঋণের পরিমাণ ১ শত ৪৬ কোটি হইতে ৪ শত ২১ কোটিতে উঠিয়াছে। আর, বিলাতে ঋণ ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২৪ কোটি পাউণ্ডে উঠিয়াছে। ইহাতে চারিদিকে যে অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে এই দুর্গতির অবসান হইবে।

আগামী বৎসরের বাজেটের আলোচনাপ্রসঙ্গে অর্থ-সচিব বলেন, সামরিক এবং ডাক ও তার বিভাগ ব্যতীত আর কোনও বিভাগে সময়াভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতির নির্দ্ধারণ গ্রহণ করা যায় নাই। তবে মোট ব্যয় কমাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সামরিক ব্যয় ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ৫ কোটি, ৭৫ লক্ষ টাকা কম করা গিয়াছে। ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতির নির্দ্ধারণ গ্রহণ করিতে পারিলে সামরিক ব্যয় ৫৭ কোটি ৬৫ লক্ষে দাঁড়াইত। মোট ব্যয় ১১ কোটি টাকা কম বরাদ্দ হইয়াছে। আশা করা যায়, রাজস্ব ১ শত ৯৮ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়াইবে।

আগামী বৎসরেও প্রাদেশিক সরকার-সমূহের নিকট হইতে ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা এক পয়সাও কমান চলিবে না। ফাজিল পূরাইবার জন্য লবণের শুল্ক চড়াইয়া মণকরা ২৷৷০ টাকা করা হইবে।

রাজস্ব-সচিব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, ভারত সরকারের দেউলিয়া হইবার মত বিপদ উপস্থিত।

বাঙ্গালার বাজেট

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালা সরকারের আগামী বৎসরের বাজেট পেশ হইয়াছে। পেশ করিয়াছেন অনারেবল মিষ্টার ডোনাল্ড।

তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্ব-সচিব গত বৎসর যখন বাজেট পেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আশা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে আর কাহাকেও ফাজিল দেখাইয়া শূন্য ভাণ্ড লইয়া ব্যবস্থাপক সভার দ্বারস্থ হইতে হইবে না। কিন্তু এবারও ঘাটতী হইয়াছে, আর ঘাটতীর পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা।

গতবার বাজেট পেশ করিবার সময় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন—আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াও এই দশা। তাই কর বসাইয়া আয় বাড়াইবার জন্য ৩ খানি নূতন আইন করা হয়—ষ্ট্যাম্প, কোর্টফী ও আমোদ-কর। আশা ছিল, ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফীতে আয় বাড়িবে—১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, আর আমোদ-করে ৩০ লক্ষ টাকা। ইহাতে মোট সব ঘাটতী পূরণ করিয়াও ২০ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে।

যখন নূতন কর নির্দ্ধারণের প্রস্তাব হয়, তখন কোন কোন সদস্য তাহাতে আপত্তি করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কর না বাড়াইয়া খরচ কমানই সঙ্গত। সেই জন্য ব্যয় সঙ্কোচের পন্থা-নির্দ্ধারণকল্পে এক সমিতি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখন সরকার মনে করিয়াছিলেন, খরচ আর কমান যায় না। আর এখন দেখা যাইতেছে, সরকারই ভুল করিয়াছিলেন। নূতন করে আশানুরূপ আয় হয় নাই, আর তদন্ত সমিতি দেখাইয়াছেন, ব্যয় অনেক কমান সম্ভব।

ষ্ট্যাম্প হইতে আয় আশানুরূপ হয় নাই—৭৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে; আমোদ-করেও আয় বোধ হয় ৫ লক্ষ টাকা কম হইবে।

আয় যাহাতে বাড়িয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কারণ আছে—আবকারীতে বাড়িয়াছে ৬ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক তহবিলে যে টাকাটার ওয়ারেশ পাওয়া যায় নাই, তাহাতে লাভ হইয়াছে—৮ লক্ষ টাকা।

এবার আয় হইবে —৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।

যে সব ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছিল, সে সবই খরচ হইলে ১ কোটি টাকা ঘাটতী হইত। কিন্তু সময় থাকিতে ভাব বুঝিয়া হাত গুটান হইয়াছিল—তাই রক্ষা। ইহাতে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

সব ধরিয়া এবার খরচের বরাদ্দ হইয়াছে—৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়াছে, সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকা। এই সব বিবেচনা করিয়া স্থির হইয়াছে :—

আগামী বৎসর কোন নূতন কর ধার্য্য করা হইবে না।

আগামী বৎসরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে—১০ কোটি ২১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

এই যে বাজেট, ইহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইহাতে কোন কল্যাণকর বা উন্নতিজনক অনুষ্ঠানের উপায় করা যাইবে না। It makes no provision for development and allows for no progress, তবে হয় ত ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতির নির্দ্ধারণ-ফলে ফাজিল কাটিয়া যাইবে—তখন সুরাহা হইবে। এ বাজেটে সে সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে বিশেষ কায করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

মেষ্টনী বন্দোবস্তে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রতি অবিচার হইয়াছে স্বীকার করিয়াও কিন্তু বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই—ইহার প্রতীকার কর। কারণ—ভারত সরকারেরও আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং এবারও বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার কোন লোকহিতকর অনুষ্ঠানে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন না।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কারবিধি আলোচিত হইতেছে। নূতন আইনে প্রত্যেক ভোটদাতার একটিমাত্র ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আইনের প্রণেতা সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতিবাদ করিয়াও শেষে মুসলমানদিগকে ৯ বৎসরের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া নিজমত পদদলিত করিয়াছেন।

মহিলাদিগকে ভোট দিবার ও কমিশনার হইবার অধিকার প্রদান প্রস্তাবে — পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইয়াছিল; শেষে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিষ্টার কটনের ভোটে সে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর মহিলারাও কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন ও কমিশনার হইতে পারিবেন।

কয় বৎসর হইতে বাঙ্গালার কতিপয় মহিলা মহিলাদিগের ব্যবস্থাপক সভায় ও মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিতে ভোট দিবার অধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমতী কামিনী রায়।

শ্রীমতী মৃণালিনী সেন।

'আলো ও ছায়া'র রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় তাঁহাদের সমিতির সভানেত্রী এবং ভূতপূর্ব্ব 'সুপ্রভাত' পত্রের সম্পাদিকা কল্যাণী শ্রীমতী কুমুদিনী বসু সম্পাদক। যাঁহাদের চেষ্টায় এই অধিকার লব্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ, এইবার ইঁহাদের চেষ্টায় মহিলারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও প্রবেশের অধিকার পাইবেন।

—

ভারতের রাজস্ব

গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই ৯ মাসে ভারতের রাজস্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ২ বৎসরের এই ৯ মাসের তুলনায় কিরূপ হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

রাজস্ব	১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দ	১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ	১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ
ভূমিরাজস্ব ...	১৭ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা	১৭ কোটি ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা	১৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা
লবণ ...	৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা	৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা	৫ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
ষ্ট্যাম্প ...	৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা	৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা	৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা
আবকারী ...	১৪ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা	১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা	১৩ কোটি ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা

গত বৎসর কাষ্টমে আয় হইয়াছে ৩০ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; আয়করে ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; বনবিভাগে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও অহিফেনে ২ কোটি ২২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

—

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

সমরবিভাগে ভারতবাসী

প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতীয় সেনাবিভাগের সকল অংশেই ভারতীয়দিগকে কর্ম্মচারীর পদ পাইবার অধিকার দেওয়া হউক। এবার অন্যপ্রসঙ্গে জঙ্গী লাট বলেন, সমরবিভাগে সকল ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অর্থাৎ এখনও ২৫.৩০ বৎসরকাল ভারতবাসীকে তাহার স্বদেশরক্ষার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। এখন কেবল বিলাতে শিক্ষালাভের জন্য এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পরও মিষ্টার ইয়ামিন খাঁ প্রস্তাব করেন, সেনাদলে কর্ম্মচারীর পদ শূন্য হইলে, ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে পদোন্নতির দ্বারা সে সব পদ পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হউক।

সেই প্রস্তাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে জঙ্গী লাট বলেন, ভারতে পদাতিক সেনাদলে মোট ১ শত ২০টি ও অশ্বারোহী দলে মোট ২১টি ভাগ আছে, এই ১ শত ৪১টি বিভাগের মধ্যে মোট ৮টি পদাতিকদলে ভারতবাসীকে "কমিশন" দিয়া অর্থাৎ উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া ফল পরীক্ষা করা হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে অবিলম্বে কায আরম্ভ হইবে। যে সব ভারতবাসী এখন সেনাদলে উচ্চপদে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এই ৮টি দলে সরাইয়া আনা হইবে।

ভারত সরকারের পক্ষে জঙ্গী লাট এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সরকার একটা অসাধারণ কায করিলেন এবং এরূপ উদারতা সচরাচর লক্ষিত হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত আর সব দেশেই দেশের লোককে দেশরক্ষার ও বিশৃঙ্খলা দমনের ভার দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সদস্য এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর ভয় নাই। আমরা কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতাফলে বলি—ভরসাও যে বড় আছে, এমন মনে করা যায় না; কারণ, এরূপ অনেক ব্যাপারে আমাদের ভাগ্যে আরম্ভ আরম্ভই রহিয়া গিয়াছে—আর অগ্রসর হয় নাই।

শিল্পে সংরক্ষণ

ভারতবর্ষের যখন শিল্প ছিল এবং শিল্প বিনিময়ে ভারতবাসী বিদেশ হইতে অর্থ আনিত, "সে দিনের কথা আজ হয়েছে স্বপন।" রোমক লেখক প্লীনি দুঃখ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ পণ্য দিয়া বৎসর বৎসর রোমসাম্রাজ্য হইতে বহু অর্থ লইয়া যায়। মুসলমানের অধীন হইয়াও ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই; কারণ, মুসলমানরা এ দেশেই বসবাস করিতেন। তাহার পর ইংরাজ সংরক্ষণনীতি অবলম্বনের ফলে স্বদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তন করেন এবং ফলে ভারতের শিল্প নষ্ট হইয়া ভারতবর্ষ কৃষিপ্রাণ দেশে পরিণত হইয়া কেবল বিদেশী কলকারখানার পণ্যের উপকরণ যোগাইতেছে। এক বৎসর অনাবৃষ্টিতেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

সংপ্রতি ফিশক্যাল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার যমুনাদাস দ্বারকাদাস প্রস্তাব করেন—ভারতের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া এ দেশে সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হউক—কেবল ভারত সরকার ব্যবস্থাপক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার প্রয়োগপ্রণালী স্থির করিবেন।

ইহাতে সরকারের পক্ষে মিষ্টার ইনিশ যে সংশোধক প্রস্তাব করেন, তাহাতে বলা হয়—ভারতে শিল্পের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের আর্থিক নীতি নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয় লইয়া প্রায় ৫ ঘণ্টা তর্কবিতর্ক হয় এবং অবশেষে মিষ্টার ইনিশের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অর্থাৎ স্থির হয়, সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য—তবে তাহাও অবাধ নহে, কেবল discriminating protection.

বলা বাহুল্য, সরকার ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করিতে বাধ্য নহেন—সে নির্দ্ধারণ অনুরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাযেই এই যে অসম্পূর্ণ সংরক্ষণপ্রস্তাব—এই প্রস্তাব অনুসারেও কায হইবে কি না, সন্দেহ।
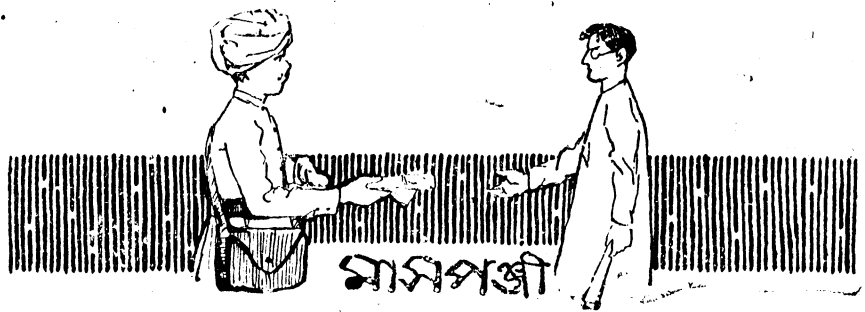
১৯শে অগ্রহায়ণ—

মীরাটে ১২৪ (এ) ও ১৫৩ (এ) ধারায় শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কাজী নজরুল ইসলামের "যুগবাণী"র জন্য কলিকাতার আর্য্য পাবলিশিং হাউস ও মুসলমান পাবলিশিং হাউসে খানাতল্লাস। কলিকাতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের বাটীতে খানাতল্লাস; আদালতে মৌলানা সাহেব যে একরার দিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাহার সব খণ্ডগুলি গৃহীত। নেলোরের সাব-কালেক্টর মিঃ ম্যাক নেলোর ষ্টেশনে একটি গর্ত্তে পড়িয়া গিয়া আহত হওয়ায় রেল-কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে মামলা আনিয়াছিলেন, তাহাতে পুরা তিন হাজার টাকারই ডিক্রী পাইয়াছেন। মালয় দ্বীপে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রত্যাবর্ত্তন; পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকদের নয় গুণ। কলিকাতা দর্জিপাড়ায় কায়স্থ সমাজে ৫৯ বৎসরের বরের (শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্রের) সঙ্গে একটি বালিকার (নাম বনপ্রভা) বিবাহ; পাত্র মফস্বলের সাব-জজ; পূর্ব্বপক্ষে ১১টি সন্তান বর্ত্তমান, দুইটি পুত্রের পুত্রসন্তানাদি হইয়াছে, একটি কন্যা বিধবা। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে গ্রীক ও আর্ম্মাণীদের জাহাজে উঠিবার সময় বাধা দেওয়ায় বৃটিশ কর্ত্তৃক পোরমিট দখল। গ্রীসের যুবরাজ এণ্ড্রুজ রোমে, তাঁহাকে গ্রীস হইতে লইয়া যাইতে বৃটিশের ১২ শত পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

২০শে অগ্রহায়ণ—

মুঙ্গেরে সারদাপীঠের জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার। চাঁদপুরের মৌলবী সাদেৎ হোসেন ও ঢাকা টাউন খেলাফতের সম্পাদক মৌলবী সামসুল হুদা রাজদ্রোহে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ফৈজাবাদের ত্রিভুবন দত্ত দেওয়ালে উলেমাদের ফতোয়া আটায় ১০৭ ধারায় এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, অন্যান্য কর্ম্মিগণের তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ। পাবনা, চান্দাইকোণার হাটের মারপিটের আসামীরা আপীলে খালাস; রায়—পিকেটিংয়ের জন্য লোক গ্রেপ্তার বেআইনী বলিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টাও অন্যায় নহে। আদালত অবমাননার জন্য বোম্বাই ক্রনিকেলের পাঁচহাজার টাকা অর্থদণ্ড। মাদ্রাজের এজেন্সী অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সহিত আর একটা যুদ্ধ,বহু বিদ্রোহী নিহত। মাদ্রাজে তামিল, তেলেগু, মালাবার ও কানারা জেলার কতকগুলি অনুন্নত শ্রেণীকে শিক্ষায় উৎসাহ দিবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শুল্ক না লইবার ব্যবস্থা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত কে সি চট্টোপাধ্যায় জাতিতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের শাসনতন্ত্র আইনে রাজসম্মতি। ট্রান্সভালের র‍্যাণ্ড খনির আট জন বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড।

২১শে অগ্রহায়ণ—

গুরুবাগের বন্দীদের মধ্যে যাঁহাদের বয়স আঠারো বৎসরের কম ও পঞ্চাশ বৎসরের অধিক, সরকার তাহাদিগকে মুক্তি দিতেছেন। কলিকাতায় খানসামা ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক মৌলবী সেরাজুদ্দীন রাজদ্রোহের অপরাধে আঠারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মাদ্রাজ সহরে দক্ষিণ-ভারতীয় ক্রীড়া-সমিতির মেলায় মাদকবর্জ্জন ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক স্থির। শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর গ্রেপ্তারে মুঙ্গেরে হরতাল। বেলিয়াঘাটায় মোটর ডাকাতি, ১৪ শত টাকা লুণ্ঠিত। সিঙ্গাপুরের ইংরেজ ভূ-পর্য্যটক মিঃ চার্লস ব্রাইদ বর্দ্ধমান যাইবার পথে শিমলাগড়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলে স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে লইয়া যান; শেষোক্ত স্থানে পর্য্যটকের মৃত্যু।

২২শে অগ্রহায়ণ—

কুম্ভকোণম আন্দুহুরাইয়ে মাদ্রাজের গবর্ণর গমনে হরতাল; হরতালের আশঙ্কায় ১৩৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল, নেতারা তাহা অমান্য করিয়া পূর্ব্বদিন বক্তৃতা করেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বাবুর লোকান্তর। মাদ্রাজ, ত্রিচুরের কোন গ্রামের এক নম্বুদ্রি (ব্রাহ্মণ) মহিলা তাঁহার নায়ার ভৃত্যের মাথা হইতে মোট নামাইয়া লওয়ায় এক-ঘরে হয়েন; মহিলাটি সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় প্রত্যেক মসজেদে নব-নির্ব্বাচিত খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। আইরিশ পার্লামেণ্টে যাইবার পথে সদস্য (পদস্থ সেনানী) মিঃ সিয়েম হেলস নিহত ও ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট মিঃ প্যাটরিক ওমালী আহত।

২৩শে অগ্রহায়ণ—

করাচী মিউনিসিপ্যালিটীতে মহিলাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান। মালাবার হাঙ্গামা সম্পর্কে যে সকল মোপলা তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য আন্দামানে উপনিবেশ গঠনের ব্যবস্থা। বোম্বায়ের সরকারী সংবাদে প্রকাশ, এ বৎসর তথায় আবকারী আয় শতকরা ২০ টাকা কমিয়াছে। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের পরলোক। বঙ্গীয় নাট্যশালার জুবিলী উপলক্ষে কলিকাতার ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে সভা ও রসরাজ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে অভিনন্দন। মধ্য-প্রদেশ রায়পুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘটে পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা; আসামীদিগকে একবার জামীন দিয়া আবার গ্রেপ্তারের সময় সমবেত শ্রমিকদের উপর গুলী; ১ জন নিহত, ১৩ জন আহত; শ্রমিকদের হরতাল; গুলী-বর্ষণে একটি নয় বৎসরের বালক আহত হইয়াছে।

২৪শে অগ্রহায়ণ—

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটীতে পণ্ডিত নেহরুর পদত্যাগ-পত্র গ্রহণে অসম্মতি, কার্য্যকরী সভার পরিবর্ত্তনবিরোধী সদস্যরা পদত্যাগ করিয়া নেহেরুজীকে নিজের ইচ্ছামত চার জন সদস্য বাছিয়া লইতে দিয়াছেন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মজহরুল হকের পদত্যাগ। আদমদীঘি, তালসন গ্রামের ইউসুফউদ্দীন প্রামাণিক নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া মনঃকষ্টে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। নাং-বা ও নাং-পো-নানা নামে দুই জন বার্ম্মা আন্দামান হইতে পলাইয়া

আসিয়া রেঙ্গুনে পুনরায় গ্রেপ্তার ; উহারা আর আট জনের সহিত প্রথমে আন্দামানের বনে পলায়, সেখানে নৌকা তৈয়ার করিয়া স্বদেশযাত্রা করে। রয়টার কোম্পানীর ভারতস্থিত জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কিংষ্টন দিল্লীর সন্নিহিত নরেলা ষ্টেশনের নিকটে চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে প্রকাশ, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রীকদিগকে যুদ্ধ অন্ততঃ কিছু দিন চালাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন ; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন না।

২৫শে অগ্রহায়ণ—

লালা লাজপৎ রায়ের পিতা লালা রাধাকিষণ রায়ের লাহোরে দেহত্যাগ ; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর যুদ্ধ ক্ষতিপূরণসম্বন্ধে লণ্ডনে মিত্রপক্ষের মজলিসে জার্ম্মাণ প্রস্তাবে ফ্রান্সের অসন্তোষ ; ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ রূঢ় প্রদেশের এসেন ও বোচাম অধিকার করিতে চাহিতেছেন, ফলে মজলিসের অধিবেশন মুলতুবী। লসেনে প্রণালীপথ সম্বন্ধে তুর্কের প্রস্তাবে মিত্রশক্তি সম্মত।

২৬শে অগ্রহায়ণ—

রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকাস্থ বেদান্ত-প্রচারক ও সানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু মন্দিরের সভাপতি, স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ ১৭ বৎসরব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারের পর বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; কলিকাতায় তাঁহার অবতরণের সময় পূর্ব্বাহ্ণে গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক সাদর সংবর্দ্ধনা। পার্লামেণ্টের প্রশ্নে প্রকাশ, গত সরকারী বৎসরে ভারতের রেলের জন্য ২ কোটা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড মূলধন হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে, তন্মধ্যে ই লণ্ড হইতে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হইয়াছে। অসহযোগী কয়েদীদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বাধা দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্টে কর্ণেল ওয়েজউডের প্রার্থনা ; সহকারী ভারত-সচিব বলেন, আইন অমান্য তদন্ত সমিতির অপর পক্ষ সভায় প্রবেশের প্রতিকূল থাকায় তিনি এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে সম্মত নহেন। অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় অধিবাসীদের জন্য সুব্যবস্থা করার চুক্তির জনরব স্থানীয় প্রধান মন্ত্রী অস্বীকার করিয়াছেন। ভারতে সংবাদপত্রের আক্রমণ হইতে সিবিলিয়ান ও পুলিসের বৃটিশ কর্ম্মচারীদের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে দাবী করায় সহকারী ভারত-সচিবের আশ্বাস ; মানহানির অভিযোগ আনয়নের ব্যবস্থাই আপাততঃ যথেষ্ট।

২৭শে অগ্রহায়ণ—

লাহোরে বোমা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে "মোসলেম আউটলুক" অফিস ও কতিপয় মুসলমান ভদ্রলোকের বাটীতে খানাতল্লাস ; মসজিদের এক এমামের বাটীতেও পদার্পণ। যারবেদা জেলে পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খাঁর সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎ ব্যবস্থায় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শেষ মুহূর্ত্তে অসম্মতি। ভূ-পর্য্যটক মিঃ মার্টিনেটের চীন দেশে মৃত্যুর সংবাদ ; গত ৩০শে সেপ্টেম্বর য়ুনান প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অল্পাহারে মৃত্যুমুখে পতিত ; মিঃ মার্টিনেট সমাধিস্থানে বাজার বসাইবার জন্য অর্থ দিয়া গিয়াছেন। ই, বি, রেলের সান্তাহার অঞ্চলে রঘুরামপুর ও রাণীনগরের মধ্যে দুইটি মালগাড়ীর সংঘর্ষ ; ডাউন ট্রেণের ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান জখম। ই, আই, রেলে এলাহাবাদের নিকটে রসুলাবাদ ষ্টেশনে একখানা যাত্রী ও মাল গাড়ীতে সংঘর্ষ ; দ্বিতীয় শ্রেণীর ২ জন মহিলা যাত্রী নিহত ও মধ্যম শ্রেণীর ৬ জন ভারতীয় পুরুষ আহত। ও আর রেলে মিলাক ষ্টেশনের নিকটে ১ নং আপ মেলের সহিত মাল গাড়ীর সংঘর্ষে ডাক গাড়ীর ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও এক জন ভারতীয় যাত্রী নিহত এবং চার জন ভারতীয় যাত্রী আহত।

২৮শে অগ্রহায়ণ—

শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার টাকা সাহায্য করায় বর্দ্ধমানের মৌলবী আবদুল হায়াত কর্ত্তৃক প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ। অম্বালার উকীল শ্রীযুত লালা দুনীচাঁদ ও এডভোকেট শ্রীযুত আবদুল রসিদকে তাঁহাদের কারাদণ্ডের জন্য কেন ব্যবহারাজীবের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শনে নোটীশ। সিন্ধু বোরসাদের মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রীযুত গান্ধী ও সর্ব্বত্যাগী তালুকদার শ্রীযুত গোপালদাস অম্বাইদাস দেশাইয়ের অভিনন্দন কালেক্টর কর্ত্তৃক বে-আইনী সাব্যস্ত।

২৯শে অগ্রহায়ণ—

ঢাকা জেল হইতে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হাকিম বজলাল রহমানের কারামুক্তি। মেদিনীপুরের অসহযোগী নেতা শ্রীযুত কিশোরীপতি রায় মহাশয়ের জরিমানার টাকা সরকার মকুব করিয়া দিয়াছেন ; ইতিপূর্ব্বে ছয় মাস কারাদণ্ড মকুব করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব কর্ত্তৃক বিলাত হইতে ৩০ জন ডাক্তারকে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ে আমদানী করিবার সংবাদ। ভারতের রাজনৈতিক কয়েদীদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের চেষ্টায় একটি ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠার সংবাদ ; অনেক বড় বড় মার্কিণের নামে এই ভাণ্ডারে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। বোম্বায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার বিষয়ে সরকারের সম্মতি। ভাওয়ালের রাণী সত্যভামা দেবীর লোকান্তর। ভারত সরকারের জন্য জার্ম্মাণী হইতে টায়ার ক্রয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আপত্তি, প্রায় দ্বিগুণ দাম দিয়াও কেন বিলাতী টায়ার কেনা হয় নাই!

১লা পৌষ—

জয়পুরের অন্যতম মন্ত্রী রায় অবিনাশচন্দ্র সেন বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ। বোম্বায়ের ভারতীয় বণিকসভা কর্ত্তৃক বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের দুর্দ্দশার প্রতীকারকল্পে সেই সব দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী বয়কটের প্রস্তাব। পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর গুলীতে নিহত। ঢাকা, শিবপুর থানার এক ডাকাতিতে ৮৫ হাজার টাকা লুঠ।

২রা পৌষ—

দেরাদুনের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ ; তিনি এই ঔষধালয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকার সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন।

৩রা পৌষ—

রেঙ্গুন হাইকোর্টের উদ্বোধন। কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটের প্যাকিং বাক্সে জোড়া শবের মামলায় আসামী দুই জন হাইকোর্টের দায়রায় দণ্ডিত।

৪ঠা পৌষ—

ডবলিনে সাত জন বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড।

৫ই পৌষ—

লাহোরে লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি সরাইবার সঙ্কল্প ; কংগ্রেস কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যালিটীকে ৩ সপ্তাহ সময় প্রদান। বিলাতে কুচবিহারের মহারাজের পরলোক। অন্ধ্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব স্থির। কলিকাতায় আবার ট্রাম ধর্ম্মঘট আরম্ভ।

৬ই পৌষ—

গয়া কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের গয়ায় গমন। বৃটিশ দ্বীপে ভীষণ ঝড় ; কয়েকখানি জাহাজ জখম।

৭ই পৌষ—

পাটনায় জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর কারাদণ্ড। গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। ছোটনাগপুর অঞ্চলের উরাও ও মুণ্ডাদের বাট জন প্রতিনিধির কংগ্রেসে যোগদান, ভারতে বলশেভিক তন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে বারলিন হইতে শ্রীযুত এম, এন্ রায়ের দ্বারা

কংগ্রেসে এক প্রস্তাব পাঠাইবার সংবাদ। বিলাত হইতে লর্ড সিংহের বোম্বায় প্রত্যাবর্ত্তন।

৮ই পৌষ—

কুইবেকে কানাডা ও যুক্তরাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের চক্তে বিখ্যাত গণিত-তত্ত্ববিদ্ শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৪৫ দিন আটক থাকার সংবাদ। ভবানীপুর পোড়াবাজারে প্রদর্শনীর উদ্বোধন। মোপলা ট্রেণ দুর্ঘটনার মামলায় আসামী সার্জেন এণ্ড্রুজ প্রভৃতির অব্যাহতি।

৯ই পৌষ—

গয়া কংগ্রেসে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল-গমন সমস্যা লইয়া সভাপতির সহিত মনোমালিন্য। শ্রীমতী গন্ধী কর্ত্তৃক নিখিল ভারত খদ্দর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন। চাঁদপুরের মাতলাবগঞ্জ থানার ডাকাতিতে ২৭ হাজার টাকা লুঠ, বাড়ীর দুই জন লোক আহত।

১০ই পৌষ—

শিখ গুরুদ্বার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সংবাদ। ভাওয়াল সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক রাণী সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান। কলিকাতাতেও কাপালিক অত্যাচারের অভিযোগ।

১১ই পৌষ—

গয়ায় জমায়েৎ উলেমার বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে কাউন্সিল-প্রবেশের চেষ্টাও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য স্থির। গুরুবাগের সম্পর্কে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বৃদ্ধ বলিয়া অব্যাহতি প্রদান।

১২ই পৌষ—

গয়ায় নিখিল ভারত খেলাফৎ কনফারেন্সের অধিবেশন। নাগপুরে ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশনের অধিবেশন, সভাপতি শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মুখেও সরকারের নানা কার্য্যের প্রতিবাদ। লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত খৃষ্টান কনফারেন্সে মহাত্মার প্রশংসা। ভারতের সহিত আবার জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-বিস্তারের সরকারী সংবাদ।

১৩ই পৌষ—

কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে কাউন্সিল-গমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য। কলিকাতায় সরকারী হাঁসপাতালগুলিতে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য রোগীর নিকট হইতে টাকাকড়ি লইবার ঘোষণা; ইংরেজী নব-বর্ষ হইতে এই অনুসারে কার্য্যারম্ভ। গুরুদাসপুর থানার বালসা গ্রামে শেকাৎ মোল্লা অনাহারে ও ভীষণ শীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

১৪ই পৌষ—

কংগ্রেস মহাসভায় বৃটিশ পণ্যবর্জ্জন প্রস্তাব অগ্রাহ্য। ফরিদপুরের বিখ্যাত দেশসেবক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের লোকান্তর।

১৫ই পৌষ—

লসেনে সন্ধিতে ব্যাঘাত ঘটার সংবাদে সর্ব্বত্র উদ্বেগ-আশঙ্কা। গয়ায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন; সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য। ত্রিবন্দ্রমে ছয় জন খৃষ্টানের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ, ইহারা প্রথমে হিন্দুই ছিল। গয়ায় নিখিল ভারত খেলাফৎ কনফারেন্সে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন উদ্দেশ্যে কমিটী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত।

১৬ই পৌষ—

গয়ায় দেশবন্ধু দাশ মহাশয় কর্ত্তৃক কংগ্রেস খেলাফৎ স্বরাজ পার্টি নামে কংগ্রেসের মধ্যে নূতন দল গঠন। কংগ্রেস মহাসভায় নূতন প্রস্তাব—ভারতের প্রজা অমিতব্যয়ী সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণের জন্য দায়ী নহে। মুসলমান পত্রের সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমানের কারামুক্তি। শ্রীহট্টের জনশক্তির সম্পাদক ও মুদ্রাকর দায়রার বিচারে ছিন্ন কোরাণের মামলা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কানাইয়ের হাট খুনের মামলায় অবশিষ্ট দুই জন আসামীরও অব্যাহতি।

১৭ই পৌষ—

ইংরেজী নব বর্ষ উপলক্ষে এসোসিয়েটেড প্রেসের শ্রীযুত কেশবচন্দ্র রায় ও ষ্টেটস্‌ম্যান্ সম্পাদক মিঃ জোন্স—সি আই ই। কনষ্টাণ্টিনোপলের বৃটিশ প্রজাদের প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহরত্যাগের নোটিশ; অনেকের মাল্টা যাত্রা।

১৮ই পৌষ—

পাঞ্জাবের রাজস্ব-সচিব মিঃ সি এম কিং ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বাউরিংয়ের দাবীতে লাহোরের আকালী পত্রের প্রতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ। ভবানীপুরে পোড়াবাজারের প্রদর্শনীতে অগ্নিকাণ্ড; ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা।

১৯শে পৌষ—

মাদ্রাজে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েক শ্রেণীর আসামীদের প্রতি জেলে বিশেষ ব্যবহারের ব্যবস্থা। কলিকাতা বেলেঘাটায় মোটর ডাকাতিতে পাঁচ জন গ্রেপ্তার। হায়দ্রাবাদে গো-হত্যা বন্ধে নিজাম বাহাদুরকে অভিনন্দন। ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের পরলোক। কেনিয়ায় ভারতবাসীদের জন্য সুব্যবস্থা না হওয়ার প্রতিবাদে টেকস্ বন্ধের আন্দোলন। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত বৃটিশ প্রস্তাব ফরাসী মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য।

২০শে পৌষ—

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কারামুক্তি। কলিকাতা হাই-কোর্টে সার্জেণ্ট মানহানি মামলায় বিচারপতি দুই জনের মতভেদ হওয়ায় মামলা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরিত। সুবলহাটীর কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরীর লোকান্তর। রাণীগঞ্জ পারবেলিয়া কয়লার খনিতে বিস্ফোরকের ফলে অনেকে হতাহত।

২১শে পৌষ—

কলিকাতা খেলাফৎ কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মৌলানা মহম্মদ সফী রাজদ্রোহজনক বক্তৃতার অপরাধে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কলিকাতার ট্রাম ধর্ম্মঘট নিবারণের জন্য গবর্ণরের নিকট প্রতিনিধিদের গমন, পদচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের দাবী পরিত্যক্ত না হওয়ায় গবর্ণর মধ্যস্থতায় অসম্মত। রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর দেহান্তর। মাল্টা হইতে সুলতানের মক্কা-যাত্রা।

২২শে পৌষ—

যুক্তপ্রদেশে সংশোধিত ফৌজদারী আইন রদ। কোলা-ঘাটাল অঞ্চলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা মোটর-লঞ্চের ব্যবস্থা করায় আবার বিদেশী জাহাজ-ওয়ালাদের অসম প্রতিযোগিতা। নারায়ণগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও চার জন মেথরের বিরুদ্ধে জোর করিয়া "চিত্তরঞ্জন তাঁতের কারখানা"র সাইনবোর্ড সরাইবার অভিযোগ। কলিকাতায় খাতার কুলীর ধর্ম্মঘট। য়ুনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামী প্রকাশানন্দের অভ্যর্থনা।

২৩শে পৌষ—

জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ে ফরাসীর আয়োজন। রাইন অঞ্চল হইতে মার্কিণ সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা।

২৪শে পৌষ—

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, করপোরেশনে তাহাদের জন্য অল্প ভাড়ার বাড়ীর ব্যবস্থা প্রস্তাব গৃহীত। সুধী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লোকান্তর। হাবড়া জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুই লাক টাকা ক্ষতি।

২৫শে পৌষ—

চৌরীচৌরার মামলায় ১৭২ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ; ৬ জন জেলে মারা গিয়াছে; ৪৭ জন বেকসুর খালাস পাইয়াছে। মোসলেম

জগতের রাজদ্রোহ মামলায় সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থনা করায় মামলা প্রত্যাহৃত। লক্ষ্ণৌয়ে সয়েস কংগ্রেসের অধিবেশন। জার্ম্মাণীর রূঢ় অভিমুখে ফরাসী সেনা অগ্রসর। ২০ জন ভারতীয় মুসলমানের এঁঙ্গোরা হইতে লসেন যাত্রা। কলিকাতার বড় ডাকঘর হইতে নব্বই হাজার টাকা চুরী। পুরাতন সংবাদপত্রসেবী বহুবাজারের দত্ত-পরিবারের যোগেশচন্দ্র দত্তের লোকান্তর।

২৬শে পৌষ—

গুরুকাবাগ ব্যাপারে ধৃত শিখ নেতাদের মুক্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত পণ্ডিত মালবাজী গুরুদ্বার পাণ্ডুলিপির ব্যবস্থায় সরকারকে সাহায্য করিতে অসম্মত। রাজপুতানায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প। কলিকাতায় ট্রাম ধর্ম্মঘটীদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাম চালাইবার চেষ্টায় নানাস্থানে গোলমাল, ট্রাম ও রোডে দুই জন ইন্সপেক্টার জখম। মালদহের জননায়ক বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পরলোক সংবাদ। ডাকের মাশুল বাড়াইয়া দেওয়ার প্রতিবাদে চীনে বে-সরকারী ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফরাসী ও বেলজিয়ান সেনার রূঢ় অধিকার।

২৭শে পৌষ—

ঢাকার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাকে কোন ওকালতীর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শনের নোটীশ। এসেনে ফরাসী সেনার গমনে হরতাল।

২৮শে পৌষ—

দেশবন্ধু দাশ মহাশয় পদত্যাগ করায় শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদে মনোনীত। মারী-পিণ্ডী রোডে তারাকাউ ডাক বাঙ্গলার মোটরচালককে নিহত করার সম্পর্কে অবিবেচনার কায করার অপরাধে লেপ্টেন্যাণ্ট চারলস্ লী লাহোর হাই-কোর্টের দায়রার বিচারে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত; তাও আবার হাজত-বাস কারাভোগের মধ্যে গণ্য। রূঢ়ে সামরিক আইন জারী।

২৯শে পৌষ—

ভাগলপুর বংশীর মেলায় পিকেটিং: ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্যে ছয় জন গ্রেপ্তার। জার্ম্মাণীর বোচাম সহরও ফরাসী সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত। রূঢ়ে ফরাসী অধিকারের প্রতিবাদে শ্রমিকদের সভা।

১লা মাঘ—

চৌরীচৌরার মামলায় প্রাণদণ্ডের বহর দেখিয়া বরিশালের শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায়োপবেশন করিতেছেন। কলিকাতায় ট্রাম কর্ম্মচারী সমিতির সহিত কোম্পানীর আপোষের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ; কোম্পানী নিজ ইচ্ছামত ব্যবস্থায় ট্রাম চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিংহলে প্রবল বন্যায় জাফার ডাকগাড়ী কলম্বো যাইবার পথে জলমগ্ন। যুক্তপ্রদেশে টাকার অনাটনে শাসন-পরিষদের সদস্য মামুদাবাদের রাজা বিনা বেতনেই কায করিতে সম্মত। এসেনে জার্ম্মাণদের সভাসমিতিতে কড়াকড়ি; ধর্ম্মঘটীদের সভা নিষিদ্ধ। রূঢ়ে ফরাসী অধিকারের প্রতিবাদে আধ ঘণ্টা হরতাল। ওদিকে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ফরাসীর এই ব্যবহারে ক্ষতিপূরণ প্রদানে অসম্মতি জানাইয়াছে; ক্ষতিপূরণ কমিশনেরও রায়;—জার্ম্মাণী ক্ষতিপূরণ করিতে অসমর্থ।

২রা মাঘ—

ধূমকেতুর সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের রাজদ্রোহ অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বাঙ্গালার ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ; ১৬৫ লক্ষ টাকা হ্রাসের বরাদ্দ, কয়টি বিভাগে ৩১ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধির এবং শিক্ষা ও কৃষি বিভাগে ৬ লক্ষ টাকা আয় কমিবার সম্ভাবনা। সালকিয়া হনুমান জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর। পেশোয়ার-কাবুল রোডে ইটালীয়-আফগান কোম্পানীর মোটর চলাচলের ব্যবস্থা।

৩রা মাঘ—

বর্দ্ধমানে গবর্ণর-গমনে হরতাল। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে মাদ্রাজ সরকারের প্রচার বিভাগ তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প। জার্ম্মাণী কাঠ সরবরাহ না করায় ফরাসী সরকার জঙ্গল মহাল অধিকার করিয়াছেন।

৪ঠা মাঘ—

ছাপরার উকীল শ্রীযুত মধু সিং ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সকল প্রকার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে নিষিদ্ধ। বংশীর পিকেটিংয়ে সাতাশ ব্যক্তি গ্রেপ্তার। বিহারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত মধুসূদন দাস বিনা বেতনে কাষ করিতে সম্মত। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ, ১৯২০-২১ ও ২১-২২ অব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামরিক বিভাগের ব্যয় যথাক্রমে ৬৮১ ও ৮ লক্ষ টাকা; ওয়াজিরিস্তান অধিকার করিতে ও ওবানা অঞ্চলের যুদ্ধে খরচ হইয়াছে ঐ দুই বৎসরে ২১৩২ লক্ষ টাকা। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারার অল্প সংশোধন। জার্ম্মাণীর কয়লার খনির মালিকরা ফ্রান্স-বেলজিয়ামকে কয়লা দিতে অসম্মত। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, ১৯২০ অব্দে বিলাতে রিভার্স কাউন্সিল বিল বিক্রয়ে ভারত সরকারের ৮ কোটী টাকা লোকসান হইয়াছে; আর, ২০-২১ ও ২১-২২ অব্দে সীমান্তে যুদ্ধব্যাপারে খরচ হইয়াছে ২৮ কোটী টাকা।

৫ই মাঘ—

ইরাকের হাই কমিশনার সার পার্শি কক্সের বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা; প্রাচী সমস্যার জন্য মন্ত্রি-সভা হইতে তাঁহার আহ্বান। জার্ম্মাণীর রাজস্ব বিভাগের প্রেসিডেণ্ট ফরাসী হস্তে গ্রেপ্তার; খনিসমূহের ডাইরেক্টার প্রভৃতি আরও কয় জন উচ্চ জার্ম্মাণ রাজকর্ম্মচারী কারাগারে নিক্ষিপ্ত। ডুসেলডর্ফের সরকারী ব্যাঙ্ক ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত।

৬ই মাঘ—

কলিকাতায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিকূল আন্দোলনের ফল; শতকরা ৩৯ জনের ভোট-প্রদান। মার্চ্চেণ্ট মেরিণ-কমিটী নিয়োগের সঙ্কল্প; বাঙ্গালা হইতে শ্রীযুত যদুনাথ রায় মহাশয় ও বোম্বায়ের শ্রীযুত লালুভাই শ্যামলদাস উহার সভ্য মনোনীত।

৭ই মাঘ—

মোকামায় হাজত-ঘর হইতে জোর করিয়া আসামী উদ্ধারে তথায় সশস্ত্র পুলিস প্রেরণ; সংঘর্ষে এক জন পুলিস জখম। জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চলে ডর্টমণ্ড ও বোচামে ফরাসীদের ব্যবহারের প্রতিবাদে রেল ও ডাকবিভাগে ধর্ম্মঘট আরম্ভ।

৮ই মাঘ—

বর্দ্ধমানের কমিশনার শ্রীযুত কে সি দে মহাশয়ের কাটোয়াগমনে হরতাল। কারারুদ্ধ পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের মানহানি মামলা বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহৃত। চৌরীচৌরার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষে হাইকোর্টে আপীল। নাইরোবীতে ভারতীয়দের সহিত সমান ব্যবহারের আশঙ্কায় যুরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্যের সংবাদ।

৯ই মাঘ—

মাদ্রাজে মেয়েদের জন্য মেডিক্যাল স্কুল খোলার ব্যবস্থায় সরকারের মঞ্জুরী। মুসলীপেটায় ভদ্রবংশের ছয় জন মহিলা সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ভারতীয় মহিলাদের জন্য কয়টি বৃত্তির ব্যবস্থা করার সংবাদ।

১০ই মাঘ—

ভারতের শাসন-সংস্কারের ভারত-সচিবের ঘোষণা; নূতন সংস্কারের সময় এখনও আসে নাই। অধ্যাপক রিস্ ডেভিডসের পরলোকগমনের সংবাদ।

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারি মেশিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণ-ঝঙ্কার

১৯২২ সনের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে মেডেল প্রাপ্ত

চিত্র-শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার
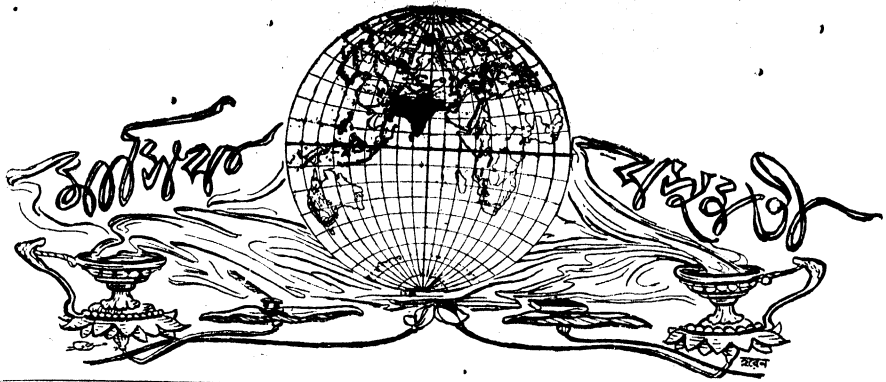
১ম বর্ষ } ২য় * চৈত্র, ১৩২৯ * খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বারাজ্য বনাম সাম্রাজ্য।

কথার কথা।

শিরোনামাটা মনের মত হইল না। যে ভাবটা প্রকাশ করিতে চাই, তাহা আমাদের দেশের ভাব নয়। আমরা আজিকালি যাহাকে স্বারাজ্য বলি, আর যাহাকে সাম্রাজ্য বলি, এ দুই-ই বিদেশী বস্তু। এ বস্তু আমাদের দেশে ছিল না। সুতরাং ইহার নামও আমাদের ভাষায় নাই।

স্বারাজ্য বলিতে এখন আমরা ন্যাশনাল ষ্টেট্ (National State) বুঝি। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আলোচনায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে দাদাভাই নৌরজী প্রথমে স্বরাজ কথাটার আমদানী করেন। স্বরাজ বলিতে দাদাভাই আত্ম-শাসন বা স্বায়ত্ত-শাসন বুঝিতেন। এই কথা দুইটাও আমাদের পারিভাষিক নহে। অহং-প্রত্যয়বাচক আত্মা শব্দ চিরাগতকাল হইতে আমাদের দেশে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, আত্ম-শাসন বা স্বায়ত্ত-শাসন বলিতে ঠিক সেই আত্ম-বস্তু বা স্ব-বস্তুকে বুঝায় না। ইংরাজীতে যাহাকে self-government বলে, আত্ম-শাসন বা স্বায়ত্ত-শাসন বলিতে আমরা তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই আত্ম-শাসন বা স্বায়ত্ত-শাসন ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের প্রতিশব্দ মাত্র। self-government বলিতেই ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট বুঝায়। কোনও দেশের লোক যখন নিজেরা নিজেদের রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, তখনই দেশে প্রকৃত self-governmentর বা ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা এই বস্তুকেই ন্যাশনাল ষ্টেট্ (National State) কহিয়া থাকে। এই বস্তুকেই দাদাভাই স্বরাজ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তদবধি আমরা এই বস্তুকেই স্বরাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, এবং ইহারই সাধনা করিতেছি।

স্বারাজ্য বলিতে এখন আমরা পরকীয়া রাষ্ট্রশক্তির অধীনতামুক্ত নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ন্যাশনাল ষ্টেট্ই (National State) বুঝিয়া থাকি। আর সাম্রাজ্য বলিতেও আধুনিক য়ুরোপে যাহার নাম empire, তাহাই বুঝি। পরকীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, সে সকল রাষ্ট্রে নিজেদের স্বেচ্ছা-তন্ত্র প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই আধুনিক য়ুরোপীয় empire গড়িয়া উঠিয়াছে। এই empireএরই আমরা বাঙ্গালায় এবং অপরাপর ভারতবর্ষীয় ভাষায় সাম্রাজ্য বলিয়া অনুবাদ করিতেছি। আমাদের প্রাচীন চিন্তাতে এবং পরিভাষায় যাহাকে স্বারাজ্য বলা হইয়াছে এবং যাহাকে সাম্রাজ্য বলা হয়, য়ুরোপের আমদানী

এবং য়ুরোপীয় ভাবের ছাঁচে ঢালাই করা আধুনিক বাঙ্গালার স্বারাজ্য এবং সাম্রাজ্য সে বস্তু নহে। আমাদের এখনকার স্বারাজ্য মানে—self-governing national state, আর সাম্রাজ্য মানে—empire। Empire মানে একটা প্রবলপরাক্রান্ত প্রভুশক্তি এবং তাহার অধীনে কতকগুলি দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় ও আত্মশাসনে অক্ষম দেশ ও সমাজ। এই অর্থেই এ স্থানে এই দুইটি কথা ব্যবহার করিলাম। আগেই বলিয়াছি—কথা দুইটা আমাদের মনঃপূত হয় নাই।

যেমন আমাদের স্বরাজ কথায় ঠিক ইংরাজী National state বুঝায় না, আমাদের সম্রাট্ বা সাম্রাজ্য কথাতেও তেমনই Emperor বা Empire বুঝায় না। National state বা Empire-এর ব্যঞ্জনা অপেক্ষা আমাদের স্বারাজ্যের এবং সাম্রাজ্যের ব্যঞ্জনা অনেক উদার ও বিশ্বতোমুখী। সেইরূপ আমাদের স্বাধীনতা শব্দের ব্যঞ্জনা ইংরাজী independence বা freedom বা liberty শব্দের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা বেশী উদার এবং বিশ্বজনীন।

আমরা আজিকালি স্বারাজ্য বলিয়া যাহার অনুসরণ করিতেছি, তাহার মূল প্রেরণা independence'র আকাঙ্ক্ষা; প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নহে। ইংরাজী independence, freedom, liberty প্রভৃতি শব্দ অভাবাত্মক। Independence অর্থ dependence বা পরানুবর্ত্তিতার অভাব। Freedom অর্থ প্রতিরোধের বা অবরোধের অভাব। Liberty অর্থ বন্ধন বা বশ্যতার অভাব। এই সকলই অভাবাত্মক বস্তু। আমাদের স্বাধীনতা ভাবাত্মক শব্দ।

অধীনতার অভাবকেই আমরা স্বাধীনতা কহি না। স্ব-এর অধীনতাই আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ। অধীনতার একান্ত অভাব এ সংসারে অসম্ভব। এই দেহটা পঞ্চভূতের অধীন। এই মন ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীন। ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়ের অধীন। এইরূপে মানুষ চারিদিকে অধীনতার জালে বাঁধা পড়িয়া আছে। এই অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোনও পথ নাই। আছে কেবল এক পথ। সে পথ স্ব-এর বা আত্মার পথ। বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় বড়; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন বড়; মন অপেক্ষা বুদ্ধি বড়; বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা বড়। আত্মার অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই। সুতরাং এই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই জীব বিষয়ের বশ্যতা, ইন্দ্রিয়ের দাস্যতা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই স্ব-এর বা আত্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াই জীব অনাত্মার অধীনতা-জাল কাটিতে পারে। ইহা ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই। এই মহাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের প্রাচীনরা স্বরাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতিকে মোক্ষ-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের জাতীয় চিন্তায় ও পরিভাষাতে স্বাধীনতা এবং স্বরাজ শব্দ মোক্ষপ্রতিপাদক। এই মোক্ষ বস্তু যে কি, তাহা না বুঝিলে আমাদের চিন্তাতে স্বাধীনতা এবং স্বরাজ বস্তু যে কত বড়, তাহা বুঝিতে পারিব না।

আমাদের সাধনায় ব্রহ্মাত্মৈকত্বসিদ্ধিকে মুক্তি কহে। অর্থাৎ জীব যখন আপনার অন্তরাত্মাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে পারে এবং বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়, তখনই কেবল তাহার মুক্তিপদ লাভ হয়। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লাভ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাধক বিশ্বের সঙ্গেও একাত্মতা লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ করিয়াই বেদে বামদেব ঋষি কহিয়াছিলেন,—আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছি। এই অবস্থাকেই আমাদের প্রাচীন সাধনায় স্বারাজ্য কহিয়াছেন। এই অবস্থালাভ যাহার হয়,—স স্বরাট্ ভবতি—তিনি স্বরাট্ হয়েন। এই স্বারাজ্য বিশ্বাত্মৈকত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম না হইলে কেহ স্বরাট্ হইতে পারে না। এই স্বারাজ্য বিশ্বমৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে যাহার একটিমাত্র শত্রু বা এক জন মাত্র প্রতিযোগী আছে,—সে এই স্বারাজ্য লাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ আমার এক জন শত্রু আছে, ততক্ষণ আমি স্বাধীন হইতে পারি না। তাহার সঙ্গে শত্রুতা করিতে যাইয়াই আমাকে পদে পদে তাহার অধীন হইয়া চলিতে হয়। আর শত্রুতা হয়, স্বার্থের প্রতিযোগিতা হইতে। আমার স্বার্থের সঙ্গে যাহার স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে-ই আমার শত্রু হইয়া উঠে। আর তাহার আততায়িতা হইতে আমার স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদা তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়। এইরূপে সে কি ভাবে চলে-ফিরে, তাহাই আমার কর্ম্মাকর্ম্মের নিয়ামক হইয়া উঠে। অর্থাৎ সে-ই আমাকে চালায়; আমি নিজের মতে নিজের পথে চলিতে

পারি না। আমি তখন নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া আমার শত্রুর অধীন হইয়া পড়ি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমাদের প্রাচীনরা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা বিশ্বাত্মৈকত্ব সিদ্ধির উপরেই জীবের মুক্তির বা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, এই বিশ্ব একটা অনাদ্যনন্ত সম্বন্ধের জালে বাঁধা পড়িয়া আছে। প্রত্যেক বস্তু অসংখ্য বস্তুর সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ। শিকলের আংটী যেমন পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, সেইরূপ এ সংসারের যাবতীয় জড় এবং জীব পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। এখানে কেহই, কিছুই স্বতন্ত্র নহে। সকলে সকলের অধীন। সুতরাং অধীনতা বা independence বলিয়া কোনও কিছু এ বিশ্বে নাই। 'এই জন্য independence কথার কোনও প্রতিশব্দ আমাদের কোষে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীনরা কোনও দিন এই অলীক আদর্শের অনুসরণ করেন নাই।

যেমন independence শব্দের কোন প্রতিশব্দ আমাদের কোষে নাই, সেইরূপ ইংরাজী nation শব্দেরও কোন প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই। আমাদের সমাজ ছিল, কিন্তু নেশন (Nation) কখনও ছিল না। নেশনের ধাতুগত অর্থ—এক দেশে যাহারা জন্মিয়াছে। এইভাবে য়ুরোপ অখণ্ড ধরিত্রীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার নেশন অভিমানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাহারা যে দেশে জন্মায়, তাহারা সেই দেশের রাজশক্তির বা রাষ্ট্রশক্তির অধীন হয়। এক রাজশক্তির বা এক রাষ্ট্রশক্তির অধীনতাই য়ুরোপের নেশন-অভিমানের বা নেশনত্বের বা nationality'র বনিয়াদ। সুতরাং নেশন শব্দ সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধবাচক। রাজায় রাজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, রাষ্ট্রশক্তিতে রাষ্ট্রশক্তিতে রেষারেষি জন্মে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির মূল সঙ্কীর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন স্বার্থবুদ্ধি। এক রাষ্ট্রের বা এক রাজ্যের ইষ্ট যাহা, অন্য রাজ্যের বা অন্য রাষ্ট্রের ইষ্ট তাহা নহে। সুতরাং একের ইষ্ট-সাধনে অপরের ইষ্ট-হানি—এই যে বুদ্ধি, ইহার প্রেরণাতেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া শত্রুতার সূত্রপাত করে। এইভাবেই নেশন-বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপেই য়ুরোপের আধুনিক nationality বা নেশন-অভিমানের বা নেশনত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে ইহার জন্ম; সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্ট স্বার্থের সাধনায় ইহার বৃদ্ধি। নেশনমাত্রই অপর নেশনকে আপনার সম্ভাবিত শত্রু বলিয়া মনে করে। আজ যে শত্রু নহে, আগামী কল্য সে শত্রু হইতেও পারে। এই ভাবে য়ুরোপের প্রত্যেক নেশন দুনিয়ার অপর সকল নেশনকে দেখে। এই জন্যই আধুনিক য়ুরোপে nationality বা নেশন-অভিমানের প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্ব্বজনীন সমর-চেষ্টা বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্য মিত্রতার অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন শত্রুভাব সর্ব্বত্রই অহর্নিশি জাগিয়া আছে। য়ুরোপ যাহাকে স্বারাজ্য বলে, অর্থাৎ যে স্বারাজ্যের আদর্শে জাতীয় রাষ্ট্রের বা ন্যাশনাল ষ্টেটের অক্ষুণ্ণ প্রতাপের প্রতিষ্ঠা, যাহার লক্ষ্য—অপর নেশনের অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিজের নেশনকে বড় করিয়া তুলা এবং অপর নেশনকে নিজের নেশনের অপেক্ষা সকল বিষয়ে ছোট করিয়া রাখা—এই স্বারাজ্যের কথা আমাদের শাস্ত্র-সাহিত্যে নাই। আমাদের রাজায় রাজায় লড়াই হইয়াছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই হইয়াছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের বা দেশের বা প্রদেশের মধ্যে য়ুরোপে নেশনে নেশনে যেরূপ রেষারেষি ও মারামারি চলিয়াছে, এরূপ রেষারেষি বা মারামারি কখনও হয় নাই। য়ুরোপের আমদানী এই স্বারাজ্য বা ন্যাশনাল ষ্টেট্ বস্তুটা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এবং সাধনাতে কখনও ছিল না। সুতরাং ইহার ঠিক প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় নাই।

য়ুরোপের সাম্রাজ্য বা empire বস্তুটাও আমাদের ছিল না। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়া নিজের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কখনও হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। রাজায় রাজায় লড়াই হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বিজেতা বিজিতের রাজ্যকে নিজের শাসনাধীনে আনিতেন বলিয়া মনে হয় না। সেই বিজিতেরই কোনও উত্তরাধিকারীকে তাহার শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া নিজের মিত্ররাজ্যের বা সামন্ত-রাজ্যের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন; পরাজিত রাজার অধীনস্থ রাষ্ট্রের বা রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিতেন না। আমাদের সাধনায় এবং ইতিহাসে চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, মহারাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন। বহু রাজার চক্র-মধ্যে সকলের সাধারণ অধিনায়ক হইয়া যিনি বিরাজ করিতেন, তাঁহাকেই চক্রবর্ত্তী বা মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিত। এই চক্রের অন্তর্ভুক্ত রাজন্যবর্গ সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে

স্বাধীন ছিলেন। এ সকল রাজার রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থার উপরে চক্রবর্ত্তী রাজার কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। চক্রবর্ত্তী রাজার চক্রের অন্তর্গত রাষ্ট্র বা রাজ্য সকল সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কেবল পরস্পরের আত্মরক্ষা এবং সকলের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া এই চক্রের প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং নিজেদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, তাঁহাকে সাধারণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, নায়করূপে বরণ করিয়া তাঁহার নায়কত্ব মানিয়া লইতেন। এই ভাবেই আজ আধুনিক য়ুরোপ যাহাকে সাম্রাজ্য কহে, আমাদের প্রাচীন সাধনাতে ও ইতিহাসে তাহার কতকটা অনুরূপ রাষ্ট্র-সম্বন্ধের বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলতঃ আমাদের এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে আধুনিক য়ুরোপের ভাষায় imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ বলা যায় না। কিছুদিন হইল, য়ুরোপে যে স্বাধীন-রাষ্ট্র-সমবায়ের বা Federation of Free Statesএর আদর্শ অল্পে অল্পে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সেই আদর্শ ই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের সাম্রাজ্য বা সম্রাট্ শব্দ প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী emperor বা empire শব্দ যে অর্থের ব্যঞ্জনা করে, সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। পররাষ্ট্রকে নিজের পদানত করিয়াই ইংরাজী empireএর প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের সাম্রাজ্য অর্থ ইহা নহে। সম্ উপসর্গের দুই অর্থ—এক সম্যক্, আর এক সঙ্গে। সাম্রাজ্য অর্থ সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যে রাজ্য, তাহাই সাম্রাজ্য। দশের উপরে একের রাজত্বকে সাম্রাজ্য কহে না। এক জন দশ জনের উপর আধিপত্য করিবে, দশ জনকে নিজের পদানত করিয়া রাখিবে, এই ব্যবস্থা বা অবস্থাকে আমরা কোনও দিন সাম্রাজ্য বলি নাই। এই ব্যবস্থার অধিনায়ককেও সম্রাট্ বলি নাই। স্ব-এতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনি স্বরাট্। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যিনি অধিষ্ঠান করেন, তিনিই সম্রাট্। এই জন্যই আমাদের বিবাহের মন্ত্রে বর বধূকে কহিয়া থাকেন—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননন্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥"

ইহার অর্থ এ নহে যে, শ্বশুরকে, শাশুড়ীকে, দেবর এবং ননন্দাকে তোমার অধীন করিয়া রাখ। ইহার অর্থ এই যে, ইঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, একাত্ম হইয়া তুমি পতিকুলে বিরাজ কর।

যে রাজা অন্য রাজার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, সখ্যবদ্ধ হইয়া দশটা রাষ্ট্রকে মিলাইয়া একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সংঘের নায়কত্বে বৃত হইতেন, তাঁহাকেই আমরা সম্রাট্ কহিতাম। আর এই স্বাধীন রাষ্ট্রসকলের যে সংহতি, তাহাকেই আমরা সাম্রাজ্য কহিতাম। আমাদের সাম্রাজ্য শব্দের অর্থ ইংরাজী empire নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে commonwealth বা federation; আর সম্রাট্ বলিতে আমরা ইংরাজী emperor বুঝিতাম না,—কিন্তু একটা স্বাধীন রাষ্ট্র-সংহতির বা Commonwealth of Free Statesএর প্রধান বলিয়া সকলে যাঁহাকে মানিতেন, তাঁহাকেই বুঝিতাম এবং এই সম্রাট্পদ লাভ করিবার প্রশস্ত পথ ছিল, যজ্ঞ; যুদ্ধ নহে। রাজসূয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আপনার গুণে যিনি রাজন্য সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইতেন, তিনি সম্রাট্ পদ লাভ করিতেন।

এ সকল কথা মনে হইয়াই "স্বারাজ্য বনাম সাম্রাজ্য" এই শিরোনামাটা ঠিক মনঃপূত হয় নাই। ভাবটা এখানে ইংরাজী। ইংরাজী কথাতেই তাহার যথাযোগ্য অভিব্যক্তি সম্ভব। ইংরাজীতে এই বিষয়টা Nationalism vs. Imperialism অথবা National Independence vs. International co-operation or Imperial Association এই ভাবেই ব্যক্ত হয়। এই মামলারই বিচারের চেষ্টা করিতে চাহি। যে কথাটা তুলিতে চাহি, তাহা আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা। এ স্থানে এই জন্যই স্বারাজ্য নামে য়ুরোপের ছাঁচে ন্যাশনাল ষ্টেটকে নির্দ্দেশ করিতেছি; সাম্রাজ্য বলিতেও য়ুরোপে যে আকারে empire গড়িয়া উঠিয়াছে,—তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ঝগড়াটা এই য়ুরোপের ছাঁচের ন্যাশনালিজিমের সঙ্গে ইম্পিরিয়ালিজিমের। আমরা এই বিজাতীয় ও বিকট সাম্রাজ্যের অধীনে পড়িয়াছি। য়ুরোপের শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় আমরা ইদানীং একটি ন্যাশনালিজিমের ধুয়াও ধরিয়াছি। য়ুরোপ যে ছাঁচে ন্যাশনাল ষ্টেট সকল গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা কি সেই ছাঁচেই আমাদের

দেশেও একটা পরিচ্ছিন্ন ন্যাশনাল ষ্টেট বা ভারত-রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিতে চাহিব, অথবা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা, সাধনা এবং শিক্ষার সঙ্কেত ধরিয়া একটা নূতন আদর্শে রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিব? ইহাই ভারতের আসন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যা।

আমাদের প্রাচীন পথ ছিল, সংগ্রামের পথ নহে, সন্ধির পথ; বিরোধের পথ নহে, সমন্বয়ের পথ; প্রতি-দ্বন্দ্বিতার পথ নহে, সহকারিতার পথ; পরিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের পথ নহে, সাম্যপ্রতিষ্ঠ সমবায়ের পথ। ধর্ম্মে এবং সমাজে আমাদের সনাতন সাধনা যুগে যুগে যে বিশ্বজনীন সমন্বয়ের ও সমবায়ের সন্ধানে চলিয়াছিল, আমরা বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সেই সনাতন নীতিকে বর্জ্জন করিয়া চলিব, না তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিব?—ইহাই আজিকার মূল প্রশ্ন। এই প্রবন্ধের শিরোনামায় স্বারাজ্য বলিতে আমরা বর্ত্তমানে আধুনিক য়ুরোপের ধাঁজের যে পরিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি, যাহার আদর্শ ইংরাজী কথায়—isolated national sovereign independence—তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। আর সাম্রাজ্য বলিতে য়ুরোপের ছাঁচের empireকেই নির্দ্দেশ করিতেছি।

আমরা এই পরিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আধুনিক জগতে যে সর্ব্বব্যাপী রেষারেষি চলিয়াছে, তাহারই মাঝখানে যাইয়া পড়িব এবং এই বিশ্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সমরানলে ইন্ধন যোগাইয়া এই শোভাসুখপূর্ণ আনন্দময় মানব-সমাজকে শৃগাল-শকুনির লীলাভূমি শ্মশানে পরিণত করিব, অথবা,—

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"

বলিয়া এই প্রধূমিত সমরানলকে নিবাইয়া বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় বিশ্বসেবাব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বর্ত্তমান বিশ্ব-মানবকে মাধুর্য্যময় ব্রজের পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিব, ইহাই বর্ত্তমানে ভারতের সমক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু প্রশ্ন। ভারতের মনীষা এবং ভারতের সাধনা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, তাহারই উপরে কেবল আমাদের নহে, সমগ্র আধুনিক সমাজের ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উদ্ভট-সাগর।

কোন রাজা এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার নগরে কোটীশ্বর (ক্রোরপতি) ভিন্ন আর কেহই বাস করিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া কোন মহা দরিদ্র কবি রাজাকে কহিয়াছিলেন :—

বাট্যাং বাট্যালকোটিঃ কুপিঠরজঠরে মক্ষিকানাঞ্চ কোটিঃ
কোটির্গণ্ডূপদানাং মম গৃহপটলে কুন্তলে যূককোটিঃ।
অঙ্গে বিস্ফোটকোটিঃ কটিতটবিলসৎকর্পটে গ্রন্থিকোটিঃ
যস্মাৎ কোটীশ্বরোঽহং কথয় নৃপ কথং তে পুরীভাগ্যহং ন॥

কোটি বেড়ালার গাছ বাটীর ভিতরে,
হাঁড়ীর ভিতরে কোটি মাছি বাস করে।
এক কোটি কেঁচো রয় ছাদের উপর,
কোটি উকুনের বাস চুলের ভিতর।
এক কোটি ব্রণ আছে গাত্রের উপরে,
এক কোটি গাঁট আছে বস্ত্রের ভিতরে।
ছয় কোটি ধন ল'য়ে থাকি অনিবার,
তবে কেন না রহিব নগরে তোমার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।

উপন্যাসে প্রেমচিত্র।

সাহিত্যে সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়। যে সকল কাব্যোপান্যাসে সমাজের হুবহু চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাকে realistic (বস্তুতন্ত্র) বলে। সমাজে যাহা সত্য, যাহা প্রকৃতরূপে বিদ্যমান আছে, এই শ্রেণীর কাব্যে তাহাই অঙ্কিত হয়। এক কথায় এই শ্রেণীর কাব্য সমাজের ফটোগ্রাফ। কিন্তু ফটোগ্রাফ প্রকৃত আর্ট নহে। আর্টিষ্ট স্বভাবের চিত্র অঙ্কিত করেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের মনোভাবও ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ স্বভাবের চিত্র তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহা শিল্প-কলার সাহায্যে বুঝাইয়া দেন। এই জন্য প্রকৃত আর্ট স্বভাব-সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা। Art is interpretation of Nature.

সেই ব্যাখ্যা কিরূপে হয়? তাহা শিল্পীর নিজের মানসিক গঠন (Mentality) নিজের চিত্তবৃত্তি, নিজের গূঢ় অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। ডিকেন্‌স্ তাঁহার ভুবনবিখ্যাত উপন্যাস সমূহে তদানীন্তন ইংরাজ সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আবার রেনল্‌ড্‌স্‌ও তাঁহার উপন্যাসে সেই একই ইংরাজ সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অথচ এই দুই জনের অঙ্কিত চিত্রে কত প্রভেদ! ডিকেন্‌স্ তাঁহার উপন্যাসে সমাজের প্রকৃত জীবন অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজ নর-নারী যাহা খাইত, যাহা পরিত, যাহা শিখিত, যাহা ভাবিত, যেরূপ আমোদ-প্রমোদ করিত ইত্যাদি বিষয় তিনি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে যে ভাবে সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাও দেখাইতে গিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশুদ্ধ শুভ্র হাস্য-কিরণের প্রভায় সেই সকল চিত্র উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, কোন একটি দৃশ্যের কৌতুকজনক অংশই (humorous aspect) তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্যদিকে অন্ধ ছিলেন না। সংসারে হাসির সঙ্গে কান্নার মেশামিশি রহিয়াছে, সেজন্য তাঁহার হাস্যরসমধুর চিত্রের পাশাপাশি করুণার অশ্রুবিগলিত চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি চিত্রের অন্তস্তলে তাঁহার সমাজসংস্কারস্পৃহা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। তাঁহার সমাজচিত্র সকল পাপ ও পুণ্যের মিশ্রণে কল্পিত হইলেও তদ্দ্বারা পুণ্যেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রেনল্‌ড্‌স্‌ও প্রধানতঃ সমাজসংস্কার-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি রচনা করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার মানসিক প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, পাপচিত্রগুলি নিতান্ত বীভৎস আকারে তাঁহার শিল্পচক্ষুতে ধরা পড়িয়াছে। তিনিও করুণরস সৃষ্টি করিতে সিদ্ধ-হস্ত, কিন্তু তাঁহার রচনার দোষে সেই করুণ রস পাঠকের চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক না করিয়া প্রবল ঘৃণার সঞ্চার করে। তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর সংসর্গে কিছু কাল থাকিলে তাহাদের কামকলুষভারাক্রান্ত সংস্পর্শ হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। মৃদুমধুর হাস্যরসপ্রকটনে তিনি ডিকেন্‌সের নিকট ঘেঁসি-তেও পারেন না।

আজকাল আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যেও এই realistic art এর ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিক-গণ আমাদের সমাজে যাহা আছে, তাহা চিত্রিত করিতে ততটা যত্ন না করিয়া, যাহা তাঁহাদের মতে সমাজে হওয়া উচিত, সেই দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেছেন। তাঁহারা মুখে বলেন, সত্যই আর্টের প্রাণ; কিন্তু চিত্রাঙ্কনের সময় সে কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যায়েন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে প্রেমচিত্রের উল্লেখ করিব।

আমাদের সমাজে সাধারণতঃ প্রেম দুই মূর্ত্তিতে দেখা যায়। একটা হইতেছে অনুরাগ। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে বিবাহের পশ্চাৎ (অনু) যে ভালবাসা জন্মে, তাহাকে অনু-রাগ বলা যায়। এতদ্ভিন্ন সেই প্রেমের একটা ব্যভিচারী ভাবও সমাজে চিরদিন প্রচলিত আছে, তাহাকে সাধুভাষায় কামজ বা রূপজ মোহ বলা যায়, গ্রাম্যভাষায় তাহার নাম "পীরিত।" এই কামজ মোহ সকল দেশে সকল

সমাজেই বিদ্যমান—এমন কি, পশুপক্ষীর মধ্যেও আছে। দাম্পত্য-প্রেম এই স্থূল মনোবৃত্তির অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। দাম্পত্য প্রেমের দৃষ্টান্ত আর কি দিব, পাঠক-পাঠিকা-মাত্রেই তাহা নিজের জীবনে আস্বাদ করিয়া থাকেন, বা করিতে পারেন। সাহিত্যে 'বিষবৃক্ষের' নায়ক নগেন্দ্র-নাথের প্রতি সূর্য্যমুখীর বা গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের ভালবাসা এই শ্রেণীর প্রেম। আবার সেই নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর প্রতি প্রেম বা গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি প্রেমকে রূপজ বা কামজ মোহের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। অমুক বিধবা বা সধবা রমণী তাহার প্রতিবেশী অমুকের সহিত গৃহত্যাগিনী হইল, অমুক লম্পটস্বভাব ধনী অমুক বারবনিতার রূপে মোহিত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব তাহার চরণে সমর্পণ করিল—এই প্রকার কথা সমাজে অনেক সময়ে শুনা যায়। বলা বাহুল্য, এগুলিও সেই স্থূল কামজ মোহের দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রেমাবলম্বনে যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন প্রেমের আর একটি মূর্ত্তি আছে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। বিবাহের পূর্ব্বে জাত বলিয়া তাহার নাম পূর্ব্বরাগ। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ পূর্ব্বরাগের অসদ্ভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাও রূপজ বা কামজ মোহ সন্দেহ নাই, তবে তাহা অনেকটা সংযত। আধু-নিক সাহিত্যে 'দুর্গেশনন্দিনীতে' জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ স্থলে প্রথমদর্শনে রূপের মোহে প্রেমসঞ্চার হইলেও তাহা প্রস্ফুটিত হইবার জন্য বিবাহের অপেক্ষা রাখে। উভয়ের মধ্যে পরিণয় সংঘটিত না হইলে সেই প্রেমমুকুল হয় ত ক্রমে শুকাইয়া যাইত। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে এই শ্রেণীর প্রেম আর সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তব (realistic) নহে, তাহার নাম romantic.

কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিকগণ, সমাজে যাহা আছে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চাহেন বিলাতী প্রেম (love) আমাদের সমাজে. আমদানী করিতে। এই জন্য তাঁহারা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসরবয়স্কা বালিকার পূর্ব্বরাগ ঘটান, অথবা সধবা, বিধবা বা বারবনিতাকে উপ-ন্যাসের মধ্যে টানিয়া আনেন। সধবা, বিধবা বা বারবনিতা পরকীয় প্রেমে আসক্ত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে; সেরূপ ঘটনা সমাজে যে না ঘটে, এরূপও নহে। কিন্তু তাহারা যেরূপ প্রেমে "পড়ে" তাহার নাম "পীরিত"। আমাদের ঔপন্যাসিকগণ সেই "পীরিত"কে বিলাতী পোষাক পরাইয়া সাহিত্যে চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রেমচিত্র সমাজের প্রকৃত চিত্র নহে, তাহা সমাজের পক্ষে অসত্য। রবীন্দ্রনাথের রচিত 'চোখের বালির' বিনোদিনী, 'ঘরে বাইরের' বিমলা, 'নষ্টনীড়ের' চারুলতা, শরৎ-বাবুর রচিত 'পল্লীসমাজের' রমা, 'বড়দিদির' মাধবী, 'দেবদাসের' পার্ব্বতী, 'স্বামীর' সৌদামিনী প্রভৃতি নায়িকার পরপুরুষাশক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা নামজাদা গ্রন্থকার, কেবল তাঁহাদের কয়েকখানা বিখ্যাত উপন্যাসেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিলাম, কারণ, সেগুলি অনেকেই পড়িয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আজকাল ইঁহাদের সার্থক ও ব্যর্থ অনুকরণে এই শ্রেণীর উপন্যাসে সাহিত্যের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, সেগুলির কথা আর কত কহিব ?

এই স্থানে হয় ত কেহ বলিবেন, ইঁহারা ত সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনই করিতেছেন। ইঁহাদের হাতে পড়িয়া যদি সেই স্থূল গ্রাম্য "পীরিত" refined হইয়া সভ্যভব্য বেশ ধারণ করে, তবে সে ত ভাল কথা ; সাহিত্যে কুরুচির পরিবর্ত্তে ইঁহারা সুরুচির আমদানী করিতেছেন। আমি বলি—আপনি তবে বিলাতী প্রেমকে চিনিতে পারেন নাই। বিলাতী প্রেম কেবল refined পীরিত নহে, ইহার নিজস্ব মূর্ত্তিও আছে। এই বিলাতী প্রেম দেশকালপাত্রের অপেক্ষা রাখে না, যুক্তির রাশ মানে না, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আরোহীকে প্রায়ই পগারে ফেলিয়া দেয়। উহাকে স্বাধীনপ্রেম বলিতে চাহ ত বলিতে পার, কিন্তু উহার স্বেচ্ছাচারিতাই বেশী। আর উহা বড়ই বিশ্বাসঘাতক, শনির ন্যায় অতর্কিতভাবে কাহার শরীরে কখন প্রবেশ করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং এরূপ প্রেম সভ্যভব্য বেশধারী হইলেও ইহাকে সাহিত্যে আমদানী করা নিরাপদ নহে। তবে সমাজে যদি ইহা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিত, তবে কোন কথা

ছিল না। আমাদের ঔপন্যাসিকগণ প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য ইহাকে বাহির হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরে বসাইতেছেন। তাঁহারা যদি এই শ্রেণীর প্রেমচিত্রকে বাস্তবচিত্র বলেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমাজের কোন খবর রাখেন না, অথবা জ্ঞাতসারে সমাজের অবমাননা করেন। সাহিত্য যদি "সত্য শিবসুন্দরের" অনুশীলন হয়, তবে তাঁহাদের এই সকল সমাজচিত্র সত্যের অপলাপ করে এবং শিবের অপমান করে। আর্টের দিক্ দিয়া এই বিচার হইতেছে, সুতরাং এখানে সমাজের উপকার অপকারের কোন কথা আইসে না।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার "সাহিত্যে স্বাধীনতা" প্রবন্ধে * লিখিয়াছেন, "সমাজের উপকার অপকারের মানদণ্ড লইয়া সাহিত্যের গুণবিচার করিলে সাহিত্যরসের অবমাননা করা হয়।"

এ কথা মানি, কিন্তু "সাহিত্যরস" কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সার ওয়াল্‌টার স্কট্, ডিকেন্‌স যে সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অমৃততুল্য আদরণীয় কেন? আবার রেনল্‌ড্‌স্-জোলা যে সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য কেন? আমার মতে প্রথমোক্ত সাহিত্যরসই প্রকৃত সাহিত্যরস, আর শেষোক্ত সাহিত্যরস তাহার ভেঙ্গ্‌চানি। সাহিত্যরস বৃষ্টিধারার ন্যায় আকাশ হইতে পড়ে না, তাহা ইক্ষুরসের ন্যায় সমাজক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হয়। সমাজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে অবশ্যই থাকিবে। আবার সাহিত্যের উপর সমাজের যে প্রভাব, সমাজের উপরও সাহিত্যের সেইরূপ প্রভাব। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত (action and reaction) চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আজ যে সাহিত্যরস সমাজশরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, কাল তাহা সাহিত্যকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। যে সাহিত্য এইরূপ বিষাক্ত হয়, ভবিষ্যতে রেনল্‌ডস্-জোলা রচিত গ্রন্থাবলীর ন্যায় শিষ্টসমাজে তাহার স্থান হইবে কি না সন্দেহ।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক আরও বলেন—"প্রকৃতির কোন নূতন ছন্দ, বা জীবনের কোনও নূতন প্রকাশে সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ—কোনও নূতন সত্য যদি আমার চক্ষে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকে, আমি যদি বেদের ঋষির মতই স্পর্দ্ধা করিয়া জগৎকে না বলিতে পারি যে, 'বেদাহং'—জানিয়াই আমি এই নূতন সত্য, চিররহস্যময়ী প্রকৃতির এক নূতন রহস্য, বৈচিত্র্যময় জীবনের এক নূতন কাহিনী, তবে আমার সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা নিষ্ফল।" বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আর জগতের সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা কলাবিৎ বা কবি উভয়কে এক আসনে বসাইলে ঋষির অবমাননা করা হয়। ঋষি ব্রহ্ম ও জগতের চরম সত্য দর্শন করেন, আর কবি প্রকৃতি ও মানব-জীবনের সত্য আবিষ্কার করিয়া তাহা সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। ঋষি সেই চরম সত্য আবিষ্কার করিয়া বলেন—

"বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানি, যিনি অজ্ঞানের পরবর্ত্তী—যিনি আদিত্যের ন্যায় উজ্জলবর্ণ প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু এক জন কবি অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির পরপারে স্থিত পরমপুরুষকে না জানিয়াও কবি হইতে পারেন। তিনি সেই জ্যোতিঃস্বরূপের যেটুকু জ্যোতিঃ জগতে ও মনুষ্যজীবনে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা লইয়াই সাধারণতঃ সন্তুষ্ট থাকেন। যাহা হউক, সেই চিররহস্যময়ী প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্যময় মনুষ্যজীবনের রহস্যই বা কয়জন কবি আবিষ্কার করিতে পারেন? আমাদের দেশে যাঁহারা কাব্য রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এইরূপ কবিপদবাচ্য? আমাদের কোন্ উপন্যাসলেখক মানব-জীবনের ও প্রকৃতির কয়টা নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন? আমি ত দেখিতে পাই, বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে এক জনও সেই উচ্চতম আদর্শ লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কারণ, আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্য উপন্যাসলেখকগণের অনুকরণের অনুকরণ, অনুবাদের অনুবাদ। তাহাতে এ দেশীয় নর নারীর জীবনের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা কমই দেখা যায়। এ দেশীয় নরনারী বিলাতী আদর্শে গঠিত হইলে ভবিষ্যতে যেরূপ প্রেমের খেলা খেলিবে, যেরূপ courtship, coquetry, flirtation, jilting &c. করিবে, ইহারই পূর্ব্বাভাষ দেখা যায়। প্রবন্ধলেখক বলেন,

* উপাসনা—কার্ত্তিক ১৩২৯, ২৬২ পৃষ্ঠা।

আনাতোলে ফ্রান্স জোলার (Zola) গ্রন্থসমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"জোলা ফরাসী নরনারীর জীবন যে ভাবে দেখিয়াছেন ও চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অসত্য এবং অসত্য বলিয়াই তাহা দুষ্ট।" আমিও বলি, আমাদের তথাকথিত Realistic নভেল-লেখকগণ বঙ্গীয় সমাজের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা অসত্য এবং সেই কারণেই তাহা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে দূষণীয়। সমাজ-রক্ষার খাতিরে, সমাজের কোনও সত্যকে উলঙ্গ করিয়া দেখাইলে আমরা তাহাতে ভয় করি না,—আমরা সত্যের নামে এই অসত্যের প্রচার জন্য ভয় করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

মন্ত্রীর আদর।

মিনিষ্টার—ধাই-মা'র কোলে বসে ধরেছ আবদার,—
কে রোধে তোমার গতি—আমি অতি ছার,
খাও যাছু, পেট ভরে, হাস হাসি মুখে—
চাকরী থাকিবে মোর—বল হবে বুকে।

দেব-রোষ।

১

গয়ারাম বাউরীর ছেলে প্রহ্লাদ ওরফে পেলারামকে লোক দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলিত। বাউরীর ঘরের আট বছরের ছেলে, ধুলা-কাদা ফেলিয়া, সঙ্গীদের সহিত গুলী-ডাণ্ডা, চোর চোর খেলার লোভ সংবরণ করিয়া যখন ঠাকুর ও ঠাকুর-সেবার উদ্যোগ লইয়া ব্যস্ত থাকিত, তখন লোক তাহাকে দৈত্যকুল সম্ভূত ভক্ত প্রহ্লাদের সহিত তুলনা না করিয়া থাকিতে পারিত না; আর সেই তুলনার মধ্যে প্রশংসার ভাব অপেক্ষা উপহাসের ভাবটাই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকিত। "নীচ"জাতির ছেলে— যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়, দেবতা দূরের কথা, দেবমন্দির পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকার যাহার নাই, তাহার দেবার্চ্চনা, দেবতায় ভক্তি—ইহা উপহাসের কথাই যে! অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। বৃদ্ধ করালী মুখুজ্যে বেশ জোর গলায় বলিতেন,—"বড় হ'লে ও বেটা ডাকাতের সর্দ্দার হবে।"

তা খুব ছেলেবেলা হইতেই পেলারাম যে ঠাকুরপূজা লইয়া ব্যস্ত থাকিত, তাহা নহে। তবে তাহার স্বভাবটা খুব নিরীহ ছিল এবং পাড়ার সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে না মিশিয়া একা থাকিতেই সে যেন ভালবাসিত। ছয় বৎসরের ছেলে, খেলাধুলা ছাড়িয়া, বাবাজীদের আখড়ায় বসিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন শুনিত, কপালে হাতে বুকে কাদার ছিটে-ফোঁটা কাটিয়া তুলসীতলায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, সন্ধ্যার পরে বাপের কাছে বসিয়া বাপের সঙ্গে গাহিত—

"বল্ মাদাই মধুল্ স্বলে!"

তাহার পর এক দিন গয়ারাম খালের ধারে মাটী কাটিতে কাটিতে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-মূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়া খেলিবার জন্য ছেলের হাতে আনিয়া দিল। এই মূর্ত্তিটি পাওয়ায় পেলারামের আনন্দের সীমা রহিল না। সে মূর্ত্তিটিকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিল, এবং তুলসীতলার কাছে একখানি ছোট পিঁড়ে পাতিয়া তাহার উপর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিল। নিজেই ডোবার ধার হইতে কাদা আনিয়া দেবমূর্ত্তির চারি পাশে অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমিত উচ্চ প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দিল। ইহাই হইল তাহার দেবতার ঘর। সে ঘরের ভিতরটা গোবরজল দিয়া নিকাইয়া লইল। সেই ঘরে নারিকেলের মালা, ভাঁড়, খুরী লইয়া পেলারাম তাহার ঠাকুরের পূজায় বসিত। জঙ্গল হইতে নানাবর্ণের ফুল তুলিয়া আনিত, সেই ফুলে মালা গাঁথিয়া সে ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিত। সকালে এক মুঠা চাউল বা নিজের জলখাবারের মুড়ী এক মুঠা ঠাকুরের ভোগ হইত, সন্ধ্যার সময় কেরোসীনের ডিবা জ্বালিয়া সে আরতি করিত। আরতির সময় পাড়ার দুই চারি জন ছেলে আসিয়া জুটিত, তাহারা পেলারামের খেলার ছোট ঢোলটি লইয়া আরতির বাজনা বাজাইত, কোন ছেলে কাঁসার থালা বাজাইয়া কাঁসরের কার্য্য সম্পন্ন করিত। ছেলের এই নূতন খেলা দেখিয়া গয়ারাম ও তাহার স্ত্রী হাসিয়া লুটাপুটি খাইত।

দিনকতক ইহা ছেলেখেলা বলিয়াই পরিগণিত হইল। তাহার পর পাড়ার বর্ষীয়সী দুই এক জন ভয়ে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া গয়ারামের স্ত্রীকে বলিল,—"না বাছা, এ সব ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা ভাল নয়, শেষে কি ঠাকুরের কোপে প'ড়ে যাবি? তোর তো সবে-ধন ঐ নীলমণি।"

শুনিয়া গয়ারামের স্ত্রী ভীত হইল, এবং আপনার ভয়ের কথা স্বামীকে জানাইল। গয়ারামও যে ভয় পাইল না, তাহা নহে, কিন্তু কি করিবে, ছেলে যে নাছোড়বান্দা, —সে কিছুতেই ঠাকুর ছাড়িতে চায় না। অগত্যা গয়ারাম স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভয় নেই, ছেলেমানুষের অপরাধ ঠাকুর নেবে না। আর ও তো সত্যিকার ঠাকুর নয়, সত্যিকার পূজোও নয়।"

কিন্তু পেলারাম যখন তাহার খেলার ঠাকুরটিকে ফুলমালায় সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে নিমীলিত-নেত্রে যেন

বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে বসিয়া থাকিত, তখন ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখিলেই পেলার মা শিহরিয়া উঠিত। কে বলে ইহা পেলার খেলার ঠাকুর? এ যে ঠিক সত্যিকার দেবতা; পেলারামের পূজা খাইয়া ঐ যে ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছে, ঐ যে ঠাকুরের চোখ-মুখ দিয়া কেমন যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে! ভয়ে ভক্তিতে পেলার মা'র শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

পেলার মা এক দিন স্বামীকে ইহা দেখাইল। দেখিয়া গয়ারাম ভয় পাইল এবং ঠাকুরটিকে বিদায় করিতে মনস্থ করিল। সে এক দিন পেলারামের অগোচরে ঠাকুরটিকে লইয়া ডোবার জলে ফেলিয়া দিল। পেলারাম ঠাকুর দেখিতে না পাইয়া কাঁদিয়া, মাথা কুটিয়া, অনর্থ জুড়িয়া দিল। গয়ারাম তাহাকে নানাপ্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিল,ভয় দেখাইল, ধমক দিল; পেলারাম কিন্তু কিছুতেই ভুলিল না। সে সারাদিন এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিল না, শুধু কাঁদিয়াই দিন কাটাইল, এবং রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে স্বপ্নের ঘোরে "আমার ঠাকুর, আমার ঠাকুর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দেখিয়া গয়ারাম ভীত হইল। সেই রাত্রিতেই সে ডোবার জলে ডুব দিয়া,পাঁক হাঁটকাইয়া ঠাকুর খুঁজিয়া আনিল। ঠাকুর পাইয়া পেলারামের মুখে আবার হাসি ফুটিল, এবং ঠাকুরের মাথায় ফুল দিয়া সে নিজে খাইতে বসিল।

ইহার পর গয়ারাম আর কোন দিন ঠাকুরকে বিদায় দিতে চেষ্টিত হইল না। সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিল,এবং ছেলেমানুষের অপরাধ না লইবার জন্য ঠাকুরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকিল।

"নীচ" জাতির ছেলে পেলারামকে ঠাকুর পূজা করিবার অনধিকারচর্চ্চা বশতঃ ঠাকুরের কোপে পড়িল কি না, বলা যায় না,তবে এই পূজা করিতে গিয়া সে আর এক জন যাঁহার কোপে পড়িল, তিনি ঠাকুরের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বাক্ বা সহিষ্ণু নহেন; তিনি মহাকুলীন শুদ্ধাচার করালীচরণ মুখোপাধ্যায়।

ষাট্ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মামলা-মোকর্দ্দমা আর সুদ-আসলের হিসাব লইয়া কাটাইয়া দিবার পর হঠাৎ এক দিন শ্বাস-রোগের প্রাবল্যে মুখুজ্যে মশায়ের যখন মনে পড়িয়া গেল যে, পরলোকে হিসাবনিকাশ দিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি মামলার কাগজ এবং সুদ আসলের হিসাব ফেলিয়া নিজের জীবনের হিসাব-নিকাশটা পরিষ্কার করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন; দিবসের কতকটা সময় সুদের চিন্তা ত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন; কেবল গায়ত্রীজপে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শেষ না করিয়া স্নানান্তে কোশাকুশী ও ফুল-তুলসী লইয়া বসিতে লাগিলেন, এবং মামলার কাগজ-পত্র দেখিবার সঙ্গে দুই একখানা পুরাণতন্ত্রও দেখিয়া লইতে থাকিলেন। বাড়ীর বাহিরে যে যায়গাটায় শাক, কুমড়া, বেগুণ প্রভৃতি গাছ প্রস্তুত করিয়া তরকারীর উপায় ও পয়সার সুসার করিতেন, তাহারই খানিকটা যায়গা বেড়া দিয়া ঘেরিয়া তিনি গোটাকয়েক ফুলগাছ বসাইয়া দিলেন। গৃহে একটি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় মনটাকে নিরত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং সে জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি ক্ষুদ্র শালগ্রাম-শিলার মূল্য পঞ্চাশটি টাকা শুনিয়া অগত্যা সে ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং উদ্দেশেই ঠাকুরের পায়ে ফুল চন্দন দিয়া পরলোকের দুর্গম পথটাকে সুগম করিয়া লইতে লাগিলেন।

পেলারামের লুব্ধ দৃষ্টিটা মুখুজ্যে মশায়ের এই ছোট বাগানটির দিকে পড়িল, এবং সে বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানে ঢুকিয়া ফুল সংগ্রহ করিতে লাগিল। ফুল চুরী যায় দেখিয়া মুখুজ্যে মশায় সতর্ক হইলেন এবং এক দিন পেলারামকে ধরিয়া ফেলিলেন। সে দিন তিনি পেলারামকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও পেলারাম যখন নিরস্ত হইল না, তখন ভৃত্যের দ্বারা এই 'দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে' প্রহার দিতে বাধ্য হইলেন। মার খাইয়াও পেলারাম কিন্তু ফুল চুরী করিতে ছাড়িল না। ঘেঁটু ফুল, কাঠমল্লিকা ফুলের পরিবর্ত্তে বেল, টগর দিয়া ঠাকুরকে সাজাইয়া সে যে তৃপ্তি লাভ করিত, সেই তৃপ্তিটুকুর লোভেই সে ফুল চুরী করিতে বিরত হইল না। ছোটলোকের এই স্পর্দ্ধা দর্শনে মুখুজ্যে মশায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ছেলের অপরাধে বাপকে পর্য্যন্ত শাস্তি দিয়া স্বীয় ক্রোধের উপশম করিতে মনস্থ করিলেন।

প্রজা ও খাতক গয়ারামকে শাসন করা মুখুজ্যে

মশায়ের পক্ষে যে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে, তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

২

"গয়ারাম, ওহে গয়ারাম !"

গয়ারামের জমীদার ও মহাজন করালী মুখুজ্যে গয়ারামের কুটীরসম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন, "গয়ারাম, ওহে গয়ারাম !"

গয়ারাম তখন ঘরে ছিল না, পেলারাম তাহার ঠাকুরের পূজা করিতেছিল। সে উত্তর দিল, "বাবা ঘরে নাই।"

মুখুজ্যে মশায় ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। পেলারামের ঠাকুরপূজার কথা মুখুজ্যে মশায় শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কৌতূহলান্বিত হইয়া পেলারামের পূজা দেখিবার জন্য তাহার নিকটস্থ হইলেন, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি কচ্চিস্ রে ?"

পেলারাম উত্তর দিল, "ঠাকুরপূজো কচ্চি।"

"কি ঠাকুর রে ?"

"কেষ্ট ঠাকুর।"

"কেষ্ট ঠাকুর ? কৈ দেখি।"

মুখুজ্যে মশায় আর এক পা' অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিলেন। ওঃ, এই ঠাকুরের জন্যই হতভাগা ফুল চুরী করে। তা মন্দ নয়, দিব্যি ঠাকুরটি, খুব ভাল কারিগরের হাতেই গড়া ; মুখখানি যেন হাসিতে ভরা। ছোঁড়া ফুলমালা দিয়া সাজাইয়াছেও বেশ। মুখুজ্যে মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন ঠাকুর কোথায় পেলি রে ?"

পেলারাম বলিল, "বাবা এনে দিয়েছে।"

"তুই কি ব'লে পূজো করিস্ ?"

"ঠাকুর ব'লে।"

"মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানিস্ ?"

"না।"

"আমাকে ঠাকুরটি দিবি ?"

"না।"

"আমি তোকে পয়সা দেব।"

"আমি পয়সা নিয়ে কি করবো ?"

"ঠাকুর নিয়েই বা কি করবি ?"

"পূজো করবো।"

"পূজো ক'রে কি হবে ?"

"কি আবার হবে !"

"তা হ'লে আমাকে দিবি নে ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া পেলারাম বলিল, "কাউকেই আমি দেব না।"

"আচ্ছা, তোর বাবা ঘরে এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্ একবার।"

বলিয়া মুখুজ্যে মশায় প্রস্থান করিলেন। পেলারাম বসিয়া পুনরায় পূজা করিতে লাগিল।

পেলারামের সহিত গয়ারামকে শাসন করিতে আসিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া মুখুজ্যে মশায় চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু মনে মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিয়াই গেলেন। বেশ বিগ্রহটি ! এই বিগ্রহটি যদি হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বহুদিনের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিনা পয়সাতেই পাওয়া সম্ভব, বড় জোর না হয় দুই এক সিকা দিলেই চলিবে। গয়া বাউরীকে আবার ঠাকুরের দাম দিতে হইবে ? ঠাকুরের মর্ম্মই বা সে জানে কি ? জানিলে কি এমন সুন্দর বিগ্রহটিকে ছেলের খেলনা করিয়া দেয় ?

তবে বাউরীর ছেলে পূজা করিয়াছে। তা পঞ্চগব্য করিয়া নিলেই চলিবে। পঞ্চগব্যে কি না শুদ্ধ হয় ? ঠাকুরের কি কৃপা ! চারিদিকে তিনি ঠাকুর খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, সাবলপুরের দীনুঠাকুর কি না একটা মুড়ীর দাম পঞ্চাশ টাকা চাহিয়া বসিল, আর ঘরের পিছনে এমন বিগ্রহ বিনা পয়সায় পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলই তাঁর কৃপা। ব্রাহ্মণের মনঃক্ষোভ ঠাকুর কি রাখিতে পারেন ? দীনবন্ধু হে, তুমিই সত্য !

ক্রোধের পরিবর্ত্তে খানিকটা উল্লাস লইয়া মুখুজ্যে মশায় ঘরে ফিরিলেন।

৩

হাতযোড় করিয়া গয়ারাম বলিল, "দোহাই বাবাঠাকুর, অমনতর হুকুমটি করবে না। ঠাকুর দিলে ছেলেটা চিল্লিয়ে চিল্লিয়েই মারা যাবে।"

ক্রোধগম্ভীরস্বরে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন, "তোমার ছেলে আকাশের চাঁদ না পেলে চিল্লিয়ে মারা যাবে ; তা

হ'লে তাকে আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে পার্‌বে তো?"

মুখুজ্যে মশায়ের এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গয়ারামের পক্ষে সহজ হইল না; সে চিন্তিতভাবে নীরবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। মুখুজ্যে মশায় তখন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "মনে ক'রো না গয়ারাম, তোমার ঐ ঠাকুরটি পাবার তরে আমি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি। আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি, ঐ ঠাকুরটিকে নেহাৎ খেলাঘরের ঠাকুর মনে ক'রো না, আমি একবার দেখেই বুঝেছি, উনি জাগ্রত দেবতা। অমন ঠাকুর নিয়ে খেলা করা, আর কালসাপ নিয়ে খেলা একই কথা। শেষে দেবতার কোপে ছেলেটিকে হারাবে কি?"

গয়ারামের বুকটা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; পেলারামের পূজার সময় ঠাকুরের যে মুর্ত্তি সে দেখিয়াছে, তাহা মনে পড়িল। সুতরাং সে বাবাঠাকুরের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাইল না, ভীতিবিবর্ণ মুখে মুখুজ্যে মশায়ের মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মশায় তাহার ভয়চকিত ভাবটা বুঝিয়া লইয়া তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "যা হবার হয়েছে, যদি ভাল চাও, অমন কালসাপকে আর ঘরে রেখো না। আমি বরং তোমার এ বছরকার খাজনার দেড় টাকা রেহাই দিচ্চি, চাও যদি, আরও দু'চার আনা দিতে পারি। ঠাকুরটি আমাকে দাও।"

ভীতিজড়িত স্বরে গয়ারাম বলিল, "আমি কিছু চাই নে, বাবাঠাকুর, ঠাকুরটি তুমি নিয়ে এস। কিন্তু না জেনে ছেলেটা যে অপরাধ করেছে, তার কি হবে?"

মুখুজ্যে মশায় বলিলেন, "আচ্ছা, অজ্ঞান বালকের অপরাধ ঠাকুর যাতে মার্জ্জনা করেন, আমি তার ব্যবস্থা কর্‌বো।"

গয়ারাম আশ্বস্ত হইয়া, ঠাকুর দিতে সম্মতি প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। মুখুজ্যে মশায় ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

গয়ারাম সম্মতি দিয়া আসিলেও পেলারাম কিন্তু ঠাকুর ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল না। গয়ারাম তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, পেলারাম কিন্তু কোন প্রলোভনেই ভুলিল না, সে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিল। গয়ারাম কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। পাড়ার পাঁচজন শুনিয়া আতঙ্কিত ভাবে বলিল, "ও প্যালার মা, ও কালসাপকে এক্ষুণি বিদেয় কর্‌, এক্ষুণি বিদেয় কর্‌।"

পেলারাম কাঁদিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া বলিল, "না গো না, ও সাপ নয়, ঠাকুর—আমার ঠাকুর।"

প্রতিবেশীরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "উনি ঠাকুর বটে, কিন্তু বামুনের ঘরে থাক্‌বার—বামুনের হাতে পূজো খাবার ঠাকুর। বাউরীর ছেলে পূজো কর্‌লে ঠাকুর রাগ করে।"

হাঁ ঠাকুর, বাউরীর ছেলের পূজোর তুমি রাগ কর? পেলারাম ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিল। কিন্তু কৈ, ঠাকুরের প্রসন্ন মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন ত একটুও নাই, তাহা যেমন প্রসন্ন, তেমনই মৃদুহাস্যরেখায় রঞ্জিত। না, না, কে বলে, ঠাকুরের রাগ হয়? না, ঠাকুর, তুমি আমার খেলার ঠাকুর; তোমাকে আমি কখনো ছেড়ে দেব না, আমার পূজোয় তুমি রাগ ক'রো না।

পেলারামের মনে হইল, ঠাকুর যেন তাঁহার পদ্মহস্ত উত্তোলন করিয়া, মৃদু-মধুর হাসিতে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "না পেলারাম, তোর পূজোয় আমার রাগ হয় না, আমি যে তোরি ঠাকুর।"

মুখুজ্যে মশায় ঠাকুর লইতে আসিলে পেলারাম দুই হাতে ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে যখন বলিল, "আমি কক্ষণো দেব না গো, কক্ষণো দেব না।" তখন তাহার সুদৃঢ় আবেষ্টন হইতে ঠাকুরটিকে ছিনাইয়া লওয়া গয়ারামের পক্ষে যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পরিশেষে মুখুজ্যে মশায়ের কঠোর আদেশে তাহাকে ঠাকুর ছিনাইয়া লইতে হইল। সে সময়ে গয়ারামের মনে হইল, কে যেন আজ বলপূর্ব্বক তাহার আদরের পেলারামের হৃৎপিণ্ডটা উৎপাটন করিয়া লইতেছে। গয়ারাম চোখের জল চোখে চাপিয়া মুখুজ্যে মশায়ের হাতে ঠাকুরটি তুলিয়া দিলে পেলারাম আছাড় খাইয়া পড়িল।

গয়ারাম তাহাকে নূতন কাপড় আনিয়া দিল, মুড়কী বাতাসা কিনিয়া খাইতে দিল; পেলারাম কিন্তু নূতন কাপড় পরিল না, মুড়কী-বাতাসা মুখে তুলিল না, তাহার ঠাকুরের শূন্য আসনের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মা তাহাকে টানিয়া ভাতের কাছে বসাইল,

ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিল, মুখের ভাত মুখে রাখিয়াই পেলারাম "আমার ঠাকুর, আমার ঠাকুর" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গয়ারামের স্ত্রী স্বামীকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "ওগো, যা হয় হবে, তুমি ওর ঠাকুর এনে দাও।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গয়ারাম বলিল, "তা যে আর হয় না, প্যালার মা, এখন হাজার টাকা দিলেও সে ঠাকুর পাবার পিত্যেশ আর নাই।"

গয়ারাম ছেলেকে বুঝাইতে লাগিল যে, তাহারা নীচ-জাতি, ঠাকুরের পূজায় তাহাদের অধিকার নাই। আর পূজা করিতে হইলে ঠাকুরের ভোগ চাই, নৈবেদ্য চাই, মন্ত্রতন্ত্র জানা চাই; এ সকল না থাকিলে পূজা হয় না, এবং সে পূজায় ঠাকুরের তৃপ্তি হয় না। মুখুজ্যে মশায়ের ঘরে ঠাকুরের কেমন সেবা-যত্ন হইতেছে! তাহারা গরীব—তেমন সেবা কিরূপে করিবে?

পেলারাম দেখিতে চাহিল, মুখুজ্যে মশায়ের ঘরে ঠাকুরের কিরূপ সেবা হইতেছে। গয়ারাম তাহাকে সঙ্গে লইয়া মুখুজ্যে মশায়ের ঘরে ঠাকুর দেখাইতে গেল।

৪

ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। সুসজ্জিত বিচিত্র সিংহাসনে ঠাকুর বসিয়া আছেন, তাঁহার অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, মাথায় সোনার মুকুট, তাহার উপর ময়ূরপাখা, ললাটে শ্বেত-চন্দনের অলকাবলী; ধূপধুনার গন্ধে গৃহ আমোদিত। যেন ব্রজের রাখাল মথুরায় আসিয়া রাজা হইয়াছে—রাজপাটে বসিয়াছে। পেলারাম মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই রাজবেশধারী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ও ঠাকুর, এখানে এসে এমন সাজে সেজেছ তুমি—এমন সুখে আছ? তোমার যে এমন সুখের দরকার, তা তো আমি জানতাম না; এমন ঘর, এত গহনা, এমন পূজা চাই তোমার; তুমি কি আমার কাছে সেই কাদার ঘরে ভাঙ্গা পীঁড়েয় এক মুঠা মুড়ী খেয়ে থাকতে পার? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঠাকুর, এই যে বড় লোকরা লুচি-মোণ্ডা খেয়ে পেট ভরায়, কিন্তু কেন ভাত খেয়ে কি আমাদের পেট ভরে না? জানি না, তুমিও বড়লোক কি না।

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, ঠাকুর দেখলি?"

পেলারাম উত্তর দিল, "দেখেছি, বাবা।"

"এমন ক'রে ঠাকুরের পূজো কত্তে হয়,—পারিস্?"

"না।"

"তবে ঘরে চল্।"

পথে যাইতে যাইতে পেলারাম পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, বড়লোকেরি ঠাকুর আছে, গরীবের কি ঠাকুর নেই?"

গয়ারাম বলিল, "আছে, আমি তোকে সে ঠাকুর গড়ে দেব।"

বাড়ী ফিরিয়া গয়ারাম কাদা দিয়া একটি ঠাকুর গড়িয়া দিল। কিন্তু সে ঠাকুর পেলারামের তেমন মনঃপূত হইল না; পূজা করিল বটে, কিন্তু পূজা করিয়াই তাহাকে জলে ফেলিয়া দিল।

অতঃপর পেলারাম সকাল হইলেই মুখুজ্যে মশায়ের ঠাকুরঘরের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া থাকিত। মুখুজ্যে মশায় পূজা করিতেন, স্তবপাঠ করিতেন, পেলারাম চুপ করিয়া বসিয়া পূজা দেখিত, স্তবপাঠ শুনিত। পূজান্তে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ হইত। পেলারাম ঘরে ফিরিত। আবার বৈকালে গিয়া বসিত এবং যতক্ষণ সান্ধ্য আরতি সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ সেখান হইতে নড়িত না।

এক দিন বৈকালে গিয়া পেলারাম দেখিল, ঠাকুরঘরের দরজা খোলা। উঠান হইতে ঠাকুরকে ভাল দেখা যায় না। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, পেলারাম আস্তে আস্তে ঘরের দাবার উপর উঠিল, এবং এক পা এক পা করিয়া দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। এই যে আমার সেই ঠাকুর! আহা, অলঙ্কারে, ফুলে, মালায় ঠাকুর কেমন সাজিয়েছে! পেলারাম নির্নিমেষনয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল, এই সাজানো ঠাকুরকে একবার তেমনই করিয়া বুকে তুলিয়া লয়। কিন্তু সাহসে কুলায় না। কি ঠাকুর, আমি ছোটলোকের ছেলে, আমার কোলে তুমি আর আসিবে কি? পেলারামের মনে হইল, ঠাকুর যেন মৃদু হাসিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া উত্তর দিলেন—হাঁ। পেলারাম হর্ষপুলকিত দেহে ঘরে ঢুকিবার উপক্রম করিল।

"কে রে ওখানে?"

চমকিয়া উঠিয়া পেলারাম উত্তর দিল, "আমি।"

বজ্রগর্জ্জনে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন, "তুই ওখানে কেন রে, হারামজাদা? বেটা ছোটলোকের ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখ, একেবারে ঠাকুরঘরের দোরে উঠে দাঁড়িয়েছে। বেরো, ব্যাটা, বেরো, নেমে যা।"

পেলারাম ভয়ে ভয়ে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাতেও মুখুজ্যে মশায়ের ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ব্যাটা চোরের মত ঘাপটি মেরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ফাঁকার ঘর দেখে দোরে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুক্‌লে এক্ষুণি সব জিনিষ নষ্ট হয়ে যেতো, ঠাকুরকে আবার পঞ্চগব্য ক'রে নাইয়ে নিতে হ'তো। দোরে গোবরজল ছড়িয়ে দে, গদা। বেরো, ব্যাটা এখান থেকে। খবরদার, এখানে আর আস্‌বি ত মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। ব্যাটা ডাকাত!"

হায় ব্রাহ্মণ, আমার ঠাকুর কাড়িয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, আর আমি ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেই যত দোষ। দোরে উঠিয়াছি বলিয়া সেখানে গোবরজল দিতে হইবে? ডাকাত আমি, না তুমি? আমার ঠাকুর তুমি কাড়িয়া আনিলে কোন বিচারে?

অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়ে পেলারাম ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পথে সঙ্গী বালকদের সহিত দেখা হইলে তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়েছিলি রে, প্যালা?"

পেলারাম উত্তর দিল, "ঠাকুর দেখ্‌তে।"

গোবে বলিল, "তা জানিস্ নে বুঝি, ও আজকাল সারাদিন সেখানে গিয়ে ব'সে থাকে।"

পেলারাম বলিল, "তা থাক্‌বো না? আমার ঠাকুর যে সেখানে রয়েছে।"

তিনকড়ি বলিল, "এতই যদি, তবে ঠাকুর দিলি কেন?"

পেলারাম বলিল, "কেড়ে নিয়ে গেল যে।"

গোবে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "ইঃ, কেড়ে নিয়ে যাবে! তুই নেহাৎ ভীতু কি না। আমি হ'লে এক ইট মেরে বামুনের—"

তিনকড়ি বলিল, "না রে না, আমি হ'লে কি কত্তুম জানিস্, ঠাকুরঘরে ত রাতদিন চাবী থাকে না; আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে ঠাকুরটিকে নিয়ে দৌড়—দৌড়।"

পেলারাম বলিল, "দূর, আমরা যে ছোটজাত, আমাদের কি ঠাকুরঘরে ঢুক্‌তে আছে?"

মাথা নাড়িয়া তিনকড়ি বলিল, "নাঃ, ঢুক্‌তে নাই। আমি কত দিন বুড়ো শিবের ঘরে ঢুকে চাল-কলা চুরী ক'রে খেয়েছি। তুই নেহাৎ বোকা কি না।"

পেলারামকে নিতান্ত নির্ব্বোধ সাব্যস্ত করিয়া সঙ্গীরা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। পেলারাম চিন্তিতমনে বাড়ী ফিরিল।

৫

রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পেলারাম স্বপ্ন দেখিল, যেন ঠাকুর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, "পেলারাম!"

পেলারাম বিস্ময়ের সহিত উত্তর করিল, "তুমি এখানে কেন এসেছ, ঠাকুর?"

ঠাকুর বলিলেন, "তুই আমার ওখানে যাস্ কেন, পেলারাম?"

পেলারাম বলিল, "আমি যে তোমাকে না দেখলে থাক্‌তে পারি নে।"

মধুর হাসি হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমিও যে তোকে না দেখলে থাক্‌তে পারি নে।"

পুলকজড়িত কণ্ঠে পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

ঠাকুর বলিলেন, "ঠাকুরে কি মিছা কথা বলে?"

সে কথা ঠিক, ঠিক যদি তবে—ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এদ্দিন এস নাই কেন?"

ঠাকুর বলিলেন, "আস্‌বার দরকার হয় নি, তুই রোজ যেতিস্ যে।"

সত্যই তো, তবে তাহার ঠাকুরের উপর অভিমান করা ঠিক হয় নাই। ঠাকুর বলিলেন, "আজ সারাদিন যাস্‌নি কেন পেলারাম?"

পেলারাম বলিল, "কি ক'রে যাই বল। বামুনঠাকুর যে যেতে বারণ করেছে। গেলে আমায় মারবে।"

ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, মারবে! মারের ভয়ে তুই গেলি নে, কিন্তু তোকে না দেখে আমার কত কষ্ট হয়েছে। তাই এই রাতে তোকে দেখতে এসেছি।"

দুঃখিতভাবে পেলারাম বলিল, "অন্ধকারে আস্‌তে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে?"

ঠাকু। তা হয়েছে বৈ কি।

পেলা। আচ্ছা, কাল থেকে আমি আবার যাব।

ঠাকু। কিন্তু বামুন যদি তোকে মারে?

পেলা। তা মারে মার্‌বে।

ঠাকু। তাও কি হয়, তোকে মার্‌লে আমার যে কষ্ট হবে।

পেলা। তা হ'লে কি কর্‌বো বল দেখি?

ঠাকু। এক কায কর্, আমাকে তুই ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

পেলা। বামুন দেবে কেন?

ঠাকু। না দেয়, চুরী ক'রে নিয়ে আসবি।

পেলা। এনে রাখ্‌বো কোথায়?

ঠাকু। খুব লুকানো যায়গায়—যেখানে কাকপক্ষী পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাবে না।

একটু ভাবিয়া পেলারাম বলিল, "কিন্তু তুমি থাক্‌তে পার্‌বে তো?"

ঠাকুর উত্তর করিলেন, "হাঁ, খুব পার্‌বো।"

উৎফুল্লস্বরে পেলারাম বলিল, "বেশ, তা হ'লে আমি চুরী ক'রেই নিয়ে আস্‌বো। কিন্তু তোমাকে ছুঁলে তো কোন দোষ হবে না?"

ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দোষ আবার কিসের?"

পেলারাম বলিল, "আমরা ছোট জাত কি না।"

"ঠাকুরের কাছে বুঝি আবার ছোট বড় জাত আছে? তুই কি বোকা রে।"

বলিয়া ঠাকুর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। সে উচ্চহাস্যধ্বনিতে ঘরখানা পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে পেলারাম চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর ঠাকুর!"

কিন্তু কোথায় ঠাকুর? অন্ধকার—অন্ধকার! ঠাকুর, ঠাকুর গো! পেলারামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। মা কাছে শুইয়াছিল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি রে, প্যালা, কি হয়েছে রে?"

পেলারাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার ঠাকুর,—আমার ঠাকুর কোথায় গেল?"

বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গয়ারামও জাগিয়া উঠিল, তখন স্বামিস্ত্রী উভয়ে পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া ঠাকুরের নিকট তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং ছেলের উপর উপদেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে ভাবিয়া ওঝার দ্বারা চিকিৎসা করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল!

৬

আস্তে—আস্তে; পায়ের শব্দ না হয়! আকাশের কালো মেঘটা ক্রমেই বেশী কালো হইয়া আসিতেছে; ঐ না ঝড় উঠিল? যাঃ, ঝড়ে প্রদীপটাও নিবিয়া গেল। যাক্, তুমি এস তো ঠাকুর, এই অন্ধকারের ভিতর দিয়া তোমাকে লইয়া পলাই। অন্ধকারে অন্ধকারে তোমাকে এমন যায়গায় লুকাইয়া রাখিব যে, কাকপক্ষীতেও জানিতে পারিবে না। গড়গড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সে শব্দে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, ঠাকুরকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া পেলারাম বাহিরে আসিল।

ঐ না আলো লইয়া কে এই দিকে আসিতেছে? সেই বামুনই বোধ হয়। পেলারাম ছুটিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার, মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুতের চমক, ঝটিকার আস্ফালন, সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পেলারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ঐ না কে পিছনে আসে? ঐ যে সেই আলোটা পিছনে পিছনেই আসিতেছে। ধরিল, এইবার বুঝি ধরিল। ঠাকুর, তোমাকে কোথায় লুকাইয়া রাখি, নিজেই বা কোথায় লুকাই? এই যে সাম্‌নে মাইতি পুকুর, পুকুরপাড়ের ঐ ঝোপটায় লুকাইব কি? তীব্র বিদ্যুতের স্ফুরণে পেলারামের চোখ দুইটা যেন ঝলসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিকট বজ্রধ্বনির সহিত বাজের আগুনে সম্মুখের তালগাছটা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পেলারাম গড়াইয়া পুকুরের জলে পড়িয়া গেল।

* * * *

সারারাত সারাদিন পেলারামের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে মাইতি পুকুরের জলে পেলারামের শব ভাসিয়া উঠিল। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, পেলারাম মরিয়াও ঠাকুরটিকে ছাড়ে নাই;

তখনও সে দুই হাতে ঠাকুরকে বুকের উপর ধরিয়া রহিয়াছে।

পেলারামের মা ছেলের বুকের উপর পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল; গয়ারাম, মুখুজ্যে মশায়ের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবাঠাকুর গো, আমার কি হ'লো গো!"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন, "যেমন কর্ম্ম, তেমনি হয়েছে। ঠাকুর নিয়ে খেলা! আমি তখনো বলেছি, গয়ারাম, এখনো বল্‌ছি, ছেলেটি তোমার মারা গেছে শুধু ঠাকুরের কোপে।"

উপস্থিত সকলেই এই মতে সায় দিয়া বলিল, "ঠিক ঠিক, দেবতার কোপ না হ'লে এমন হয়!"

ঠাকুর কিন্তু কোনরূপ মত প্রকাশ করিলেন না; তিনি পেলারামের বুকের উপর থাকিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"

[ঢাকা স্বদেশী ক্লথ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর সৌজন্যে।

সহজিয়া।

২

বৌদ্ধ সহজযান এখন রূপান্তরিত হইয়া হইল, ভৈরব-ভৈরবী ও বৈষ্ণবসহজী। আর এক দল বৌদ্ধ ছিল, তাহারা নাঢ়া ও নাঢ়ী বলিয়া খ্যাত। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র এই নেড়া-নেড়ীদের বৈষ্ণবদলভুক্ত করিয়া লয়েন—এ বিষয় আমরা পরে উল্লেখ করিব। ভৈরব-ভৈরবীরা তান্ত্রিক। তাহাদের কথা আমরা এ প্রবন্ধে কিছু বলিব না। সহজে বৈষ্ণবদের কথাই এখন বিবেচ্য। জয়দেব এক জন সহজিয়া বৈষ্ণব—সে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। পদ্মাবতী ও জয়দেবের কাহিনী তাঁহাকে সহজপথের পথিক বলিয়াই প্রমাণ করে। কবি গীতগোবিন্দে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়াছেন। প্রকৃতির পাদপদ্মের দাস বলিয়া আপনাকে পরিচিত করা সহজে বৈষ্ণবদের একটা রীতি ছিল—

শ্রীমতী মুঞ্জরীপাদপদ্ম করি ধ্যান।
শ্রীগোবিন্দদেব কহে রসের বিধান॥

বলিতে হইবে না যে, এই গোবিন্দদেবের প্রকৃতি মুঞ্জরী। এই সহজে বৈষ্ণবদের মধ্যে পাঁচ জন প্রধান ছিলেন—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ। ইঁহারা পঞ্চরসিক বলিয়া খ্যাত। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের এই জন্য আর একটি নাম—পঞ্চরসিকের মত। জয়দেবের পদ্মাবতী (মতান্তরে রোহিণী, কেন না, পদ্মাবতী ঠিক পরকীয়া নহেন; তথাহি "কেন্দুবিল্বসমুদ্ভবরোহিণীরমণেন"), বিদ্যাপতির লছিমা দেবী, চণ্ডিদাসের রামী রজকিনী, বিল্বমঙ্গলের বেশ্যা চিন্তামণি ও রায় রামানন্দের জগন্নাথদেবের সেবাদাসী প্রকৃতি বলিয়া কল্পিত। এই কয়জনের মধ্যে চণ্ডিদাসই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত—তাঁহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহজযানে এই সাধনার উদ্ভব। তাহা প্রথম অবস্থা বলা যায়। সহজসাধনার দ্বিতীয় স্তরে জয়দেব ও চণ্ডিদাসকে দেখি। চণ্ডিদাস এই রূপান্তরিত ধর্ম্মের দিক্-স্তম্ভবিশেষ। তাঁহার মধ্যে সহজসাধনার এক নূতন বিকাশ পাই। আধুনিক তান্ত্রিক-সাধনার ন্যায় সহজধর্ম্ম এতাবৎকাল একটা গুহ্য সাধন-প্রণালী (mystic cult) ছিল। গুরুর উপদেশ লইয়া কতিপয় প্রক্রিয়ার সাধন ও রমণী লইয়া কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ছিল। চণ্ডিদাসের রাগাত্মিক পদে দেখা যায় যে, বৌদ্ধভাব ও বৈষ্ণবভাব মিশিয়া পুরাতন সহজসাধনা এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। সহজসাধনায় গুহ্যপদ্ধতিবিশেষের (ritualism) অনুষ্ঠান প্রধান করণীয় ছিল। এই পদ্ধতিপ্রধান সহজসাধনার এখন প্রাণ হইল—রাগ বা emotion. এই রাগানুগ সাধনা (cult of emotion) বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। আমার মনে হয়, রাগানুগ সাধনা বা cult of emotionও মহাযানবৌদ্ধদিগের দান—ইহাও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীলোক, প্রকৃতি বা শক্তি এতাবৎকাল সাধনার করণ বলিয়া বিবেচিত হইত; তদীয় সহবাস ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ ছিল—প্রেমের ধারণা স্ফুটতর হয় নাই। চণ্ডিদাসের সাধনায় দেখা যায় যে, রমণীর প্রেমই সাধ্য—তাহাই জীবনের সার লক্ষ্য। সে প্রেম স্বকীয় স্ত্রীতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু, তাহাতে প্রেমের উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই, —সেটা স্বাভাবিক, "ব্রত রাখা মত"। প্রেমের সার পরকীয়া প্রেম, আর এই প্রেমের চরম উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও বৃকভানুকুমারী রাধা। ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় করিয়া, প্রেমের সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া এই সাধনা করিতে হয়। সাধনা বড় কঠোর, বন্ধুর, ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ, পদে পদে স্খলনের ভয়। এই সাধনা-সাগরমন্থনে বিষামৃত দুই-ই উঠে। নারী লইয়া সাধনা বড় কঠোর। চণ্ডিদাস বলিতেছেন :—

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষামৃতে একত্র রয়॥
যেমন দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।

পতঙ্গ দেখিয়া　　পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া　　তেমতি পুড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন　　সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক　　ছাড়িয়া উদক
মৃণাল-দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে　　কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়॥

আবার অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :—

রাগের ভজন　　শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমতে　　লোভ বাড়ে চিতে
সে সব গ্রহণ করে॥
যজিতে বিষম　　করণ তাহার
আচার বিষম বড়।
দেখিয়া শুনিয়া　　মায়াতে ভুলিয়া
করিতে না পারে দিঢ়॥

এই ইন্দ্রিয়সাধনার মোহে মুগ্ধ হইয়া কত লোক স্খলৎপদ হইত, তাহার উল্লেখ চণ্ডিদাস এইভাবে করিয়াছেন—

রসিক রসিক　　সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া　　বুঝিয়া দেখিলে
কোটীতে গোটিক হয়॥

অন্যত্র—

সখি হে পীরিতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে　　মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দড়॥
ভ্রমরা সমান　　আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীত।
মধুপান করি　　উড়িয়া পলায়
এমতি তাহার রীত॥

চণ্ডিদাস যে সাধনার সাধক ছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র প্রেম—সে প্রেমে খাদ নাই।

রজকিনী প্রেম　　নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডিদাস গায়।

এই সাধনার একটিমাত্র মন্ত্র—"আমি তোমার, তুমি আমার।" চণ্ডিদাস বলিতেছেন :—

আমার পরাণ-　　পুতলি লইয়া
নাগর করয়ে পূজা।
নাগর-পরাণ-　　পুতলি আমার
হৃদয়মাঝারে রাজা॥

চণ্ডিদাসের এই সহজসাধনার অপর একটি নাম রাগানুগ-সাধনা; যেহেতু, ইহা রাগের সাধনা, প্রেমের সাধনা, হৃদয়ের সাধনা। ঈশ্বরের প্রতি সাধারণতঃ যে প্রেম দেখান হয়, তাহা বড় কঠোর নহে,—সে প্রেমে বাধা-বিঘ্ন কি? প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান কর, পূজা-অর্চ্চা কর, সেবা কর, ভোগ দাও, আরতি কর—সে ত কঠোর নহে। কিন্তু সাধনার সার মানুষের হৃদয়-সাধনা। যে প্রেমে তুমি কৃষ্ণ-লাভ করিবে, মানুষের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে তাহার বিকাশ দেখাও। প্রত্যক্ষ ত্যজিয়া অপ্রত্যক্ষে তোমার অনুরাগ কেন? জগতে এক মানুষই সত্য, আর মানুষই সার—অতএব আইস, যাহা মানুষের মধ্যে সহজ ও সুলভ, তাহার সাধনা করি।

চণ্ডিদাস কহে শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপর　　মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই॥

এই মানুষের লীলা, হৃদয়ের খেলা, পীরিতির আবেগ উদ্দীপনায় চণ্ডিদাসের সাধনা। কি উদ্দাম স্রোতোগতিতে সে চলিয়াছে! তাহার কাছে শাস্ত্র নাই, সমাজ নাই, লোকাচার নাই, সে সাধনার পুরস্কার তিরস্কার; লোক-গঞ্জনা তাহার আভরণ। পদে পদে অপমান তাহার সঙ্গের সাথী। সহজিয়ার নিকট পরকীয়া প্রেমের এই জন্য শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্ম্মপত্নী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা তাহার ধর্ম্ম, সমাজে তাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা।

সতীত্ব রমণীর নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এ হেন রতন॥

কিন্তু সহজিয়া বলিবে, প্রেমের জন্য যে সর্ব্বত্যাগিনী,

লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পঙ্ক যাহার চন্দন-তিলক, সমাজের অপমান যে অঙ্গের আবরণ করিয়া লইয়াছে, কলঙ্কের কৃষ্ণকালিমা যাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত, আত্মীয়-স্বজনের কঠোর কশাঘাতে যাহার দেহ-মন জর্জ্জর—সেই কুলহীনা রমণীর ঐকান্তিক প্রেম—তাহা কি কেবল উপহাসের বস্তু হইবে? এই প্রেম লইয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়াছিলেন; এই প্রেমেই ব্রজের গোপীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পূজা করিয়াছিলেন। এ প্রেমের তুলনা নাই—"সো হি পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিল তিল নূতন হোয়"; এ প্রেমে "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"; এই প্রেমে বদ্ধ হইয়া গোপীবল্লভ বলিয়াছিলেন—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছমি। ব্রজের রাধাকৃষ্ণের লীলা চণ্ডিদাসের আদর্শ। ধন্য প্রেমিক চণ্ডিদাস, রসিক চণ্ডিদাস, কবি চণ্ডিদাস! তুমি কেবল ধন্য নহ—বাঙ্গালা তোমার মত সাধক প্রেমিক কবি পাইয়া ধন্য হইয়াছে—জগৎ ধন্য হইয়াছে। জানি না, দাঁতে বিয়াত্রিচের প্রেম কতদূর গিয়াছে, কিন্তু তোমার ব্যোমস্পর্শী প্রেম কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। জানি না, কোন প্রেমিক এমন করিয়া প্রিয়তম প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন কি না; কতবার শুনিয়াছেন, আবার শুনুন :—

এক নিবেদন করি পুনঃ পুন
শুন রজকিনী রামি।
যুগল-চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমার ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥
তুমি বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিকে না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি॥
ও রূপ-মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
ধোপানীচরণ সার॥

এতাবৎকাল আমরা দেখাইলাম যে, বৈষ্ণব সহজপন্থার মূল বৌদ্ধ সহজসাধনা। চণ্ডিদাসের সহজসাধনার মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, বৌদ্ধ সহজযানে যাইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক দেবদেবী হিন্দুমন্দিরে স্থান পাইয়াছিল। চণ্ডিদাসকে যে ঠাকুরুণ আসিয়া সহজ যজিতে বলিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুদেবী নহেন—বৌদ্ধ দেবতা নাম ভাঁড়াইয়া হিন্দুর ঘরে পূজা খাইতেছিলেন।

বাশুলি আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডিদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥

আমরা হিন্দু, জগতের দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণচেতাঃ বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু আমরাই হিন্দুধর্ম্মবিরোধী দেবদেবীকে ভক্তিসহকারে মন্দিরে বসাইয়া পূজা করিতেছি। এই বাশুলি—এখন বিশালাক্ষী বলিয়া পরিচিত। ইনিই মঙ্গলচণ্ডী নামে বাঙ্গালার পুরনারীর বিশেষ ভক্তিপাত্র। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই দেবতার কাহিনীসম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "এক সময়ে গৌড়বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধদিগের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাহার শক্তি কল্পনা করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। উচ্চারণবৈষম্যে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্রসরী—

বাজনরী—বাজসলী—বাসলী বা বাশুলিতে পরিণত হইয়া থাকিবে।" পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। সহজিয়ার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের সহজযান মূল; চণ্ডিদাসের সহজ-যাজন ইহার কাণ্ড; ইহার শাখাপ্রশাখা—কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, আউল, সাঁই, সাখিনী, সহজী প্রভৃতি সম্প্রদায়। শেষে লিখিত সম্প্রদায়গুলি প্রকৃতপক্ষে সহজধর্ম্মের তৃতীয় স্তর। এই তৃতীয় স্তরসম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু বলিব; কেন না, রাগানুগসাধনার সহিত তিনিও বিশেষভাবে বিজড়িত।

চরিতামৃতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নাটকগীতি, চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদ বড় ভালবাসিতেন। রায় রামানন্দ সম্বন্ধে একটু কলঙ্ক রটিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি দেবদাসীদের স্বীয় নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহাদের গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। লোকমুখে অপবাদকাহিনী চৈতন্যদেবের কর্ণে উঠিলে তিনি রামানন্দের পবিত্র চিত্তের সবিশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক তাহাদের নিবারণ করিলেন। মহাপ্রভু এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তিনি কদাপি রমণীর মুখাবলোকন করিতেন না এবং স্বীয় শিষ্যবর্গের মধ্যে কাহারও সামান্য ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সর্পদষ্ট অঙ্গুলিবৎ দূরে ত্যাগ করিতেন। তাঁহার শিষ্য ছোট হরিদাস শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাকে সম্মুখে আসিতে নিষেধ করেন। অভিমানে দুঃখে হরিদাস প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করেন। এই দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ভ্রষ্টাচার সম্প্রদায়বিশেষ তাঁহার অমলচরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপনে বিরত হয় নাই। সে কথা এখন থাকুক! চৈতন্যদেবের নাম রাগানুগসাধনার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষে যে শ্রী, সনক, রুদ্র ও মাধ্বী চারি সম্প্রদায় আছে, তাহা হইতে চৈতন্যসম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষীণবল হইয়া গিয়াছে। যদিও শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে চৈতন্যসম্প্রদায় মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত, তথাপি চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। চৈতন্যদেবের সাধনপদ্ধতি সাধারণ বৈষ্ণবসাধনপদ্ধতি হইতে কিছু বিভিন্ন ছিল। তাহার মূলমন্ত্র ছিল—ভক্তি। "সা হি পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মূলসূত্র। ভক্তি মনের ভাব—ইহাও cult of emotion. সহজী যে সুখ রমণীমধ্যে খুঁজিত, দেহের বিলাসে চরমানন্দ পাইত,—চণ্ডিদাস যে সুখ রমণী-হৃদয়মধ্যে খুঁজিতেন—কেবল দেহ লইয়া ব্যস্ত না হইয়া দেহাতীত ভাবে মগ্ন হইতেন,—চৈতন্যদেব তাহা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, অল্পে সুখ নাই, খণ্ডে সুখ নাই, ধর সেই রসের সাগর রসিকশেখর শ্যামনটবরকে। সম্মুখে সুখের সাগর, তুমি বিন্দু লইয়া কি করিবে? ওরে ঐ যে মূর্ত্তিমান্ রস—রসো বৈ সঃ—আর ঐ রসরাজের তনুখানি বসনের মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—আনন্দ, হ্লাদিনীশক্তি রাধা। রাধাকৃষ্ণে ত ভেদ নাই, দুই হয় লীলায়—তাহাতে মজ, তাহাতে ডুব,—সেই রসের সাগরে ডুবিয়া মর। রমণী-সঙ্গ সুখ? রমণীর খণ্ডহৃদয়ের প্রেম লইয়া সাধনা? সে কি কথা? সাধ্য এক ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই ভগবান্—তিনিই একমাত্র পুরুষ, রসের সার তিনি, মতিগতিরতি সমস্তই তাঁহার পাদপদ্মে। তিনি থাকিতে আবার পুরুষত্বের অভিমান, তাঁহার বিরহে আবার সুখ! প্রাণের আকুলতায় তাঁহাকে ডাকিতে হইবে—যেমন করিয়া ব্রজের গোপীবৃন্দ ও গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, সেই দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউল হইতে হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই মাধুর্য্যরসসাধনার সাধক ছিলেন—সে সাধনা স্বীয় জীবনে দেখাইয়াছিলেন। গগনে কৃষ্ণমেঘ দেখিয়া "ঐ কৃষ্ণ! ঐ কৃষ্ণ!" বলিয়া ছুটিয়াছেন, তমালতরু নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দেহকদম্ব পুলকিত হইয়াছে, সমুদ্রের কাল জল দেখিয়া "কৈ কৃষ্ণ! কৈ কৃষ্ণ" বলিয়া ঝম্প দিয়াছেন, "হরি হরি" করিয়া রাস্তায়, ঘাটে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়াছেন। সে প্রেমে দেহের কথা নাই—নিষ্কলঙ্ক হেম যাহা, তাহা এই। তাঁহার রাগানুগ-ভক্তি অপ্রাকৃত, দেহাতীত transcendental, চণ্ডিদাসের সাধনায় dawn of spirit in love প্রেমের প্রভাত, চৈতন্যদেবের সাধনায় সে প্রেম মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় ভাস্বর ও দীপ্তিমান্। প্রাকৃত জন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। চৈতন্যদেব যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেম স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি পরকীয়া স্বীকার করিয়াছেন, তবে তাহার লৌকিক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া ভুল। ব্রজের কথা লৌকিকবিচারের মাপকাঠি দিয়া মাপ করিতে

যাওয়া অন্যায়। কিন্তু সহজযানে যে দেহতত্ত্বের কথা, পঞ্চকামোপভোগের কথা এবং চণ্ডিদাসের সাধনায় যে প্রকৃতি-সাধনার কথা আছে, চৈতন্যের রাগানুগসাধনায় তাহার স্থান নাই। চৈতন্যের নিকট স্ত্রী-পুরুষভেদ পরমার্থতঃ নাই; কারণ, পুরুষ এক শ্রীকৃষ্ণ। সেই পরমপুরুষ থাকিতে পুরুষত্বের অভিমান বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চণ্ডিদাসের রাগানুগসাধনার যে সূত্র, চৈতন্যদেবের মধ্যে সেই সূত্রই রহিয়াছে। রসের উদ্দীপনা বা রসের আলম্বন এবং পরমরসিক ব্রজেন্দ্রনন্দনপ্রাপ্তি উভয়েরই উদ্দেশ্য। উভয় সাধনাই—রাগানুগ। সহজসাধনা এই রসের উদ্দীপনার জন্য রমণীর প্রয়োজন বোধ করিয়াছে, কিন্তু মহাপ্রভু খণ্ডের দিকে যায়েন নাই, তিনি একেবারেই অখণ্ডকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। চৈতন্যদেবে এই রাগানুগ-সাধনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজযানে ইহার উৎপত্তি, চণ্ডিদাসে পুষ্টি ও চৈতন্যদেবে ইহার চরম বিকাশ, চৈতন্যোত্তর যুগে ইহার বিকৃতি। আমরা এইবার সেই ইতিহাস বর্ণনা করিব।

বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য একটু অবান্তর কথা বলিব। ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সহিত বাঙ্গালাদেশের সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালাদেশের বৈশিষ্ট্য যেমন পরিস্ফুট, অন্যত্র সেরূপ নহে। আর্য্যগণ সর্ব্বশেষেই বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, কিন্তু এ দেশে আর্য্য আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্যসভ্যতা বেশ গড়িয়া বসিয়াছিল। আর্য্যগণ যখন এ স্থানে আসিলেন, তখন এ দেশের লোক আর্য্যসভ্যতার প্লাবনেও কিছু কিছু স্বীয় পূর্ব্বসভ্যতার নিদর্শন রাখিয়াছিল। একটা অসভ্য অশিক্ষিত জাতি যখন একটা সুসভ্য শিক্ষিত জাতির সংস্পর্শে আইসে, তখন অসভ্যজাতি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, অথবা সুসভ্যজাতির সহিত মিশিয়া যায়। ভারতবর্ষে শক, হূণ প্রভৃতি জাতি এই ভাবে আর্য্যজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রহ্মর্ষিদেশে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে অর্থাৎ পঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত অনার্য্যধর্ম্মের কোন নিদর্শনই নাই। ঐ সকল দেশে বৈদিক প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃত প্রভাবেই হউক, জাতির গুণেই হউক, অথবা আর্য্যগণের বিলম্বিত আগমনের কারণেই হউক, পূর্ব্বদেশ নিজের সভ্যতা, নিজের বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আর্য্যগণ যখন এ দিকে আইসেন নাই, তাঁহারা এ দেশকে অসভ্যদিগের দেশ ও দস্যুনিবাস বলিয়া জানিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বেদে চেরবঙ্গ মগধকে পাখীর দেশ বলা হইত। কি জানি, পাখী কি বাঙ্গালার totem ছিল? * আর্য্যসভ্যতা যখন প্রাচীন অনার্য্যসভ্যতার সহিত মিশিয়া গেল, তখন বাঙ্গালার সভ্যতা অন্যান্য দেশ হইতে একটু বিশিষ্ট হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী নিজের বৈশিষ্ট্য রাখিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে বেদপন্থী হয় নাই; এই অনাচার-দোষের জন্য বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের নিকট ঘৃণ্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যেমন আচারনিষ্ঠ ও সংযত, বঙ্গদেশ সেরূপ নহে, তাহার মূল ঐ ethnic influence বা জাতির বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বদেশ কিছুতেই তাহার বৈশিষ্ট্য ছাড়িতে পারে নাই। এই কারণে স্বাধীনচিন্তায় তাহার বেদপন্থার সহিত কখন কখন সংঘর্ষ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে সাংখ্য-কপিলের মূলানুসন্ধান করিতে হয়; সেই আদি-জ্ঞানীর স্বাধীনচিন্তার গোমুখী এই বঙ্গভূমি। এই পূর্ব্বদেশই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের দেশ, ইহাই জৈন তীর্থঙ্করগণের লীলাভূমি। বৌদ্ধধর্ম্মের বড় বড় শিক্ষক এই পূর্ব্বদেশ হইতে জগতের সর্ব্বস্থানে ধর্ম্মোপদেশ করিতেন। এই যে বৌদ্ধবিপ্লব, ইহাও পূর্ব্বদেশের বৈশিষ্ট্য। তাহার যে নানা সম্প্রদায়ভেদ, তাহাও এ দেশের বৈশিষ্ট্য, তৎসহ সম্প্রদায় বিকৃতির মূল ঐ অনার্য্য ethnic প্রভাব। সকল দেশেই বৌদ্ধপ্রভাব গিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালাদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল—শঙ্করের প্রভাব এ দেশে প্রবল হয় নাই। মুসলমান বিজয়ের সময় শতসহস্র মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু এ দেশে ছিল। বেদবিরোধিতা ও আচারহীনতার জন্য সংহিতাযুগে পর্য্যন্ত এ দেশ ঘৃণিত ও হেয় ছিল। স্মৃতিকার বলিতেছেন, বঙ্গদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বাঙ্গালাদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নাই বলিলে চলে, আর্য্যসভ্যতার শেষের দিকের যে স্মৃতি, তাহাই বাঙ্গালা

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধপাঠের পর বলেন, হয় ত বাঙ্গালা তখন tree dwllers বা বৃক্ষনিবাসীদের দেশ ছিল। পশু থাকিতে পাখী বলিয়া গালি দিবার হেতু কি? তখন বঙ্গদেশ যেরূপ জলপ্লাবিত থাকিত, তাহাতে ললিতবাবুর অনুমান একেবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয় না।

দেশকে বেদানুগ করিতেছে। বাঙ্গালায় তন্ত্রের প্রভাবই প্রবল এবং এই তান্ত্রিক সাধনপ্রণালী বিশেষভাবে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৌদ্ধযুগের শেষে যে তন্ত্রের প্রাধান্য আরম্ভ হয়, বাঙ্গালাদেশে এখনও সেই তন্ত্রের প্রাধান্য। বৌদ্ধপ্রভাব বাঙ্গালায় এমন প্রবল হইয়াছিল যে, এক সময়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ মিলে নাই, কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশ এত অসংযত, এরূপ অনাচারী, ভ্রষ্ট, বেদপথচ্যুত কেন? ইহার উত্তর—বাঙ্গালা স্বাধীনচিন্তার দেশ, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেশ, স্বাধীনসভ্যতার দেশ, বৌদ্ধপ্রাদুর্ভাবের দেশ—সুতরাং যাহা বাঙ্গালার জল-মাটী, তাহাকে চাপা দিয়া বৈদিক সভ্যতা এ দেশে প্রবল হইতে পারে নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইয়াছিল ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তখন বাঙ্গালাদেশে বহু বৌদ্ধ থাকিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ যুগে অত্যন্ত বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল—যাহা হউক, তথাপি বাঙ্গালায় বহু বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষভাগে সহজযানই প্রবল হয়, তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় নাড়া ও নাড়ী বা নেড়া-নেড়ী। এই নেড়া-নেড়ীরা সমাজে অতি হেয় ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া বাস করিত। 'চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার ধর্ম্ম ছয় গোস্বামী, নিত্যানন্দ প্রভু ও তদীয় পুত্র বীরভদ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন এই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রভাবে লুপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মে যে কি কুফল ফলে—কেমন করিয়া সম্প্রদায় মরণের বীজ আনে, তাহা বলিতেছি। এই নেড়ানেড়ীদের বৈষ্ণবধর্ম্মভুক্ত করিয়া বীরভদ্র এক প্রকার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নেড়ানেড়ীগণ তাহাদের কদর্য্য সহজ আচার ত্যাগ করে নাই। বীরভদ্রও সে দোষ নষ্ট করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই; দল পুষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত জুগুপ্সিত আচারে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম কলঙ্কের কথায় দাঁড়াইল। জানি না, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক তাহাদেরই মতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেম কি না; কারণ, এই বামাচারী বৈষ্ণবগণ যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব, তাঁহাদিগের দুগ্ধ-ধবল চরিত্রেও কালিমালেপনে কুণ্ঠিত হয় নাই। আনন্দ-ভৈরবে বীরভদ্রকেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে:—

বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
বার শত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিল কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইল প্রকৃতির মর্ম্ম॥

উল্লিখিত বচন হইতে মনে হয়, বীরভদ্রও ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। বীরভদ্রের এই নূতন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের ফলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাচীন 'সহজ' বিষে পুনশ্চ দুষ্ট হইয়া গেল। এই নব সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্বের কথা, সহজসাধনার প্রথা, প্রবৃত্তির অবাধ তৃপ্তি সহজেই অশিক্ষিত ইতরজনকে মুগ্ধ করিল। দল ক্রমশঃ পুষ্ট হইল, বৌদ্ধধর্ম্মের যে ভাবে পতন হইয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মও সেই পতনের পথে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মে যাহার উৎপত্তি, চণ্ডিদাসে যাহার পরিণতি, তাহা পুনশ্চ নূতন করিয়া এই নব-দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ প্রচার করিতে লাগিল। আউল, বাউল, সহজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী ও ধর্ম্মমত (Creed) সেই পুরাতন সহজযানের দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ ও Cult of emotionএর দ্বিতীয় সংস্করণ। সাধনার অঙ্গ—প্রকৃতি, এই দেহের বৃন্দাবন। গুরুই এক দেবতা। তিনি এই দেহ-বৃন্দাবনে বিহার করিবেন—রসিক পুরুষ রসের উদ্দীপনা করিবেন। ধর্ম্মের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না।

কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' বাউলমতের এইরূপ পরিচয় দিতেছে:—"মানবদেহে বিরাজমান পরম-দেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্য্যাপ্ত হয়। অতএব প্রকৃতিসাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনাতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধনপদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই;

জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নহে। কামরিপুর উপভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা উহার শান্তি-সাধনা করিয়া চরমে পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-মাত্র অনুভব করিতে থাকে। তখন 'আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি, নাইক জ্ঞান কিছুই স্থিতি, অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি,---বাক্য নাই'।"

যে চৈতন্যদেব ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যিনি প্রকৃতির মুখদর্শন পর্য্যন্ত মহাপাপ বলিয়া গণনা করিতেন, যাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রীরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরাবাইএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন নাই —তাঁহার ধর্ম্মে তাঁহার তিরোধানের পর প্রকৃতি-সাধনাই মুখ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস আউল-বাউলগণ মহাপ্রভুকেই তাহাদের জুগুপ্সিত ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল! চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম যে এই ভাবে বিকৃত হইল, তাহার জন্য মহাপ্রভু দায়ী নহেন; ছয় গোস্বামীও দায়ী নহেন,—দোষ হইয়াছিল—বীরভদ্রের অনধিকারীদের দীক্ষা দেওয়ায়। এই নেড়ানেড়ীগণ বৈষ্ণব হইলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—ইহারা ধর্ম্মে অনাচারী, চরিত্রে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মতবাদে দেহাত্মবাদী ও ভ্রষ্টাচার। এই সহজিয়া বৈষ্ণবনামধারী বৌদ্ধদের 'জ্ঞানাদিসাধনা' (অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে রচিত) পুস্তকে নাস্তিক্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব হইয়াও তাহারা পূর্ব্বজীবন ভুলিতে পারে নাই। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যেমন নানা লোকস্পর্শে আসিয়া দূষিত হইয়াছিল,—রোমক রাজনীতি, আসিরীয় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, গ্রীক সিদ্ধান্ত ও গথের কু-সংস্কার সরল খৃষ্টধর্ম্মকে যেমন জটিল ও অশেষ দোষদুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, এই বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই প্রকার সহজ বৌদ্ধসংস্পর্শে আসিয়া দূষিত হইয়া নষ্ট হইতেছিল। এই পরস্ত্রীধর্ষক, 'ভণ্ড, ভ্রষ্ট, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বৈষ্ণবগণ authority ধরিবার জন্য কিরূপ মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়া মহাপ্রভু, বিদ্যাপতি ও ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে কীদৃশ কলঙ্ক রটাইয়াছে, তাহা তুলিয়া কৃষ্ণমসীলিপ্ত লেখনীকে তদপেক্ষা কৃষ্ণতর কলঙ্কলিপ্ত করিব না—মহাজনের নিন্দা শুনাইয়া আপনাদিগকেও দোষভাগী করিব না।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এত শীঘ্র কেন বিকৃত হইল, এখন তাহা বুঝা যাইতেছে। যে সাধনার (cult) সংস্পর্শে আসিয়া চৈতন্যধর্ম্ম দূষিত হয়, তাহা এককালে সমগ্র বাঙ্গালা ব্যাপিয়া আধিপত্য করিত—তাহা অনার্য্যপ্রধান বাঙ্গালার বিশেষ সাধন-প্রণালী ছিল, তাহা তাহার জাতীয় ধারার (ethnic condition) অনুকূল ছিল—ব্রহ্মণ্যাভ্যুদয়ে সে ধর্ম্ম মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মে নূতন বৈষ্ণব নামের আবরণে সে ধর্ম্ম পুনরায় আত্মশক্তি প্রকাশ করিল। চৈতন্যধর্ম্ম যে নব-দীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের জুগুপ্সিত আচার দূর করিতে পারে নাই, ইহা তাহার দৌর্ব্বল্য। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মহাপ্রভু যে রাগানুগসাধনার ক্রম নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত--সাধারণের জন্য নহে। তাঁহার মধ্যে রস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মরধামে জন্মলাভ করিয়াছিল—যে রসের উদ্দীপনা তিনি স্বীয় জীবনে করিয়াছেন, অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এই অসাধারণ রাগানুগসাধনা বা cult of emotion বিশেষতঃ মধুর রসের সাধনা, সাধারণ ও সুলভ করিতে গিয়া চৈতন্যের পরবর্ত্তী প্রচারকগণ বিশেষ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান ও কর্ম্ম ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ভক্তির সাধনা করিতে গিয়া জ্ঞানও হারাইল, কর্ম্মও হারাইল, ভক্তিচিন্তামণিও হারাইল—ক্রমশঃ কদর্য্য প্রাণহীন আচারে পর্য্যবসিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম মধ্যে যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা দাশু রায়ের ছড়ায় দেখিবেন—বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া পাপভাগী হইব না।

বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আচণ্ডাল ইতরসাধারণকে আশ্রয় দিয়া পতিতপাবন হইয়াছিল, তাহাতে দেশের উপকার এবং অপকার দুই-ই হইয়াছে। যাহা পূর্ব্বে অসংযত অনাচার ছিল, তাহা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া সংযত অনাচারে দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে 'কণ্ঠীবদল', 'পরকীয়া আশ্রয়' প্রভৃতির একটা humanizing influence বা মানবত্ব-সম্পাদক ধর্ম্ম আছে বলা যায়। যাহারা অবাধ পাপের পথে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কতকটা সংযত হইয়াছিল।

উদাহরণস্বরূপ গণিকাদের কথা বলা যাইতে পারে। গণিকাগণ সমাজ বহির্ভূত, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও গুরু-পুরোহিতের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্ম্মে তাহাদেরও দীক্ষা-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মানুষ স্বর্ণপর্য্যায়ভুক্ত, যতই অশুচি হউক, তাহা পুনশ্চ শুদ্ধ হয়—মানুষ যত পাপী হউক, একেবারে নষ্ট হয় না, ফিরিবার পথ তাহার থাকে। কিন্তু সমাজ সকল সময় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে না; তাহার জন্য সমাজকে দোষও দেওয়া যায় না, কারণ,সমাজের ব্যবস্থার মূল সূত্র দশের উপকার—greatest good to the greatest number. এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া অনেক পতিত অধম উদ্ধার-লাভ করিয়াছে। কিন্তু কুফলের মধ্যে ইহাতে পাপকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের মধ্যে পাপের প্রশ্রয় বড় ভীষণ—licensed immorality, বড় কদর্য্য বস্তু। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পাপ যে ধর্ম্মের মধ্যে আইসে না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। সয়তান ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া থাকে। বহু দুষ্ট লোক ধর্ম্মের আবরণে স্বীয় পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পায় বলিয়া, এই সমস্ত দল বা চক্রের চক্রী বা দলপতি হয়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের উদ্দেশ্য উদার ও মহান্ ছিল—অনধিকারীর বহুল আগমনে সম্প্রদায় নষ্টপ্রায় হইয়াছিল।

সুখের বিষয়, কালচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুপ্রচারিত নির্ম্মল ধর্ম্মের কলঙ্কক্ষালনের বহুল চেষ্টা হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভা হইতে বহু ভাগবত গোস্বামী মহাশয়দিগের স্বাক্ষর-সংবলিত এক ব্যবস্থাপত্র বাহির হইয়াছে; তাহাতে স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—স্ত্রীলোককে যাহারা সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করে, তাহারা চৈতন্যদেবপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মভুক্ত নহে। সাধু তাঁহাদের সঙ্কল্প। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। বৈষ্ণবধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে—নানা সম্প্রদায়ের চেষ্টায় তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা হইতেছে। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনের চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয়। আমার আশা যে, সহজযানের বিষ কালে এ ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হইবে এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরায় শাস্ত্রপূত, আচারনিষ্ঠ, জ্ঞানগরিষ্ঠ ও ভক্তিকৌস্তুভে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালার পরমগৌরবের বস্তু হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

দেবীর করুণা।

জননী ইন্দিরা কভু কৃপা করি কননিক কথা
কখনো সুধান নাই অধমের কুশল-বারতা।

কুড়ায়ে খেয়েছি নিত্য মন্দিরের অন্নকণাগুলি
কৃপা করি' 'অন্নপূর্ণা' দেয়নিক ভরি মোর ঝুলি।

সুষমার অধিশ্বরী স্মরবধূ চাহি দীনপানে
করেননি ধন্য কভু লাবণ্যের এককণা দানে।

'ইন্দ্রাণীর' কৃপাকণা অধমের একান্ত দুর্লভ
লভিনিক এক বিন্দু গৌরবের মন্দার-সৌরভ।

'বাগ্দেবীর' আরাধনা করিয়াছি আবাল্য কতই।
প্রসন্না হলেন কই? কভু তাঁরো কৃপাপাত্র নই।

মা 'জাহ্নবী' সন্তানের একমাত্র তুমি আছ বাকী
অন্তিমে এ অভাগ্যেরে তুমি যেন দিও নাক ফাঁকি।

শ্রীকালিদাস রায়।

কৈলাস-যাত্রা।

নবম অধ্যায়

৯ই জুলাই প্রাতঃকালে ভোজনাদি করিয়া গারবাং হইতে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। ঘোড়ার কায না থাকিলে ভুটিয়ারা ঘোড়া জঙ্গলে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেয়। জঙ্গল হইতে ঘোড়া খুঁজিয়া আনিতে বিলম্ব হওয়াতে একটু অধীর হইলাম। খুঁজিয়া যদি আনিতে না পারে, তাহা হইলে ত আবার এক দিন বিলম্ব হইবে; এই চিন্তায় অধীর হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া আনিল। আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে আর অযথা বিলম্ব হইবে না, মনে করিয়া আনন্দিত হইলাম। ছেলেবেলা মা'র মুখে শুনিতাম, "অমুককে জগন্নাথ টেনেছে। সে ছেলে-মেয়ে ফেলে প্রভুর চাঁদমুখ দেখ্‌তে গিয়েছে।" আমিও কৈলাসের "টানে" ছুটিতেছি; বিলম্ব ভাল লাগে না। কখন্ কৈলাস দেখিয়া কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার সে সময়ের ধ্যান-ধারণার বিষয়।

ঘোড়ায় চড়িয়া, স্কুলের পাশ দিয়া রাস্তা যখন অতিক্রম করি, সে সময় মাষ্টার মহাশয় আসিয়া কুশলকামনা করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আর বিদায় দিল, পাঠশালার বালক-বালিকারা। তাহাদের অমায়িক দৃষ্টি—স্মিত-বদন—আর করযোড়ে অভিবাদন আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। ছোট ছোট বালক-বালিকাকে আমি বড় ভালবাসি। তাহাদিগকে দেখিলে আমার মনে কোনরূপ ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না। আমার এইরূপ ধারণা, যদি কেহ শ্রীভগবানের কমনীয় রূপের কণামাত্র দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন মুক্তদৃষ্টিতে শিশুর মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করেন। এইরূপ, ঐশ্বরিক গন্ধও শিশুর গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। যাযাবরদিগের মধ্যে এ ভাব থাকিলে তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ ও জনসাধারণের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কালীর তট দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কখন বা নেপাল, কখন বা ইংরাজরাজ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। এখন বৃক্ষের মধ্যে হিমালয়ের দেবদারুর সংখ্যাই অধিক। সময় সময় এই দেবদারুবনের মধ্য দিয়া পরম আনন্দে গমন করিতে লাগিলাম। এই রাস্তায় স্থানে স্থানে যেরূপ নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সেরূপ অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে পুষ্পিত ক্ষেত্র সকল দেখা গেল, তাহারা বনের বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। সেই তুলনারহিত নিস্তব্ধতা, হৃদয়মধ্যে এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাব আনয়ন করিয়া থাকে।

রাস্তায়, গুঞ্জী ও কুটী যাইবার রাস্তা অতিক্রম করা গেল। স্থানে স্থানে ২।১টি তিব্বতী শিলালেখও দেখিতে পাইয়াছিলাম। কালাপাণিতে বৃক্ষ বড় নাই, এ জন্য কুলীরা শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিল। কালাপাণিতে কাষ্ঠের যেমন অভাব, শীতের প্রতাপও তেমনই অধিক। বনস্পতি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া এখন তুষার-রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করা গেল। এই কালাপাণি পর্য্যন্ত ভুটিয়ারা চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। কালাপাণিতে অপরাহ্নে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ২।১টি ক্ষুদ্র পান্থনিবাস আছে, আর একটু অগ্রে রায় সাহেব গোবরিয়া পাণ্ডিতের একখানি বাংলা আছে। ইনি এক জন ব্যবসায়ী ভুটিয়া, তিব্বতীদের কাছে ইঁহার বহু সম্মান থাকায়, ইংরাজ সরকার ইঁহার দ্বারা তিব্বতী-দের নিকট অনেক কার্য্য হাসিল করিয়া থাকেন। নেপাল-দরবারেও ইঁহার প্রতিষ্ঠা বড় কম নহে। ইঁহার নামে আমার একখানি পরিচয়পত্র ছিল। শুনিলাম, তিনি নেপালে অবস্থান করিতেছেন। আমি আর তাঁহার বাড়ীতে গেলাম না, পান্থশালায় রাত্রিবাসের আয়োজন করিতে লাগিলাম। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশালা আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ থাকে, ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার কুলীরা গৃহ পরিষ্কার ও অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। আমার এই সায়ংগৃহের অনতিদূরে একটি পার্ব্বত্য নদী প্রবলবেগে বড় বড় পাষাণখণ্ডকে পদাঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছে। আমি ইহার তটে একটি বৃহৎ শিলার উপর উপবেশন করিয়া ভীতিপ্রদ নির্জ্জনতা উপভোগ করিতে লাগিলাম। আমি যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উপবেশন করিয়া কিছু লিখিতেছিলাম, তখন এক

জন সাধু জলপান করিতে আসিয়া একটি হিন্দী দোঁহা আবৃত্তি করিলেন। আমি চকিত হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তিনি সহাস্যবদনে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অগ্রে গমন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য অনেক দিন ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব মিলন ও বিয়োগ অনেককাল স্মরণ থাকিবে। আর স্মরণ থাকিবে, সেই সুন্দর দোঁহা! হিমালয়ের এই অপূর্ব্ব স্থানে দোঁহাটি পাইয়াছিলাম বলিয়া, বোধ হয়, এত ভাল লাগিয়াছিল। দোঁহাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

চরণ ধরত কম্পতে হিয়ো
ন হি শোহাবত সোর।
সুবর্ণ কো ঢুঁড়ত ফিরে,
কবি কামী ঔর চোর॥

যে কবি—কামী ও চোর সুবর্ণ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের পদন্যাস করিতে হৃদয় কম্পিত হয়; কোলাহল হইতে তাঁহারা দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সুবর্ণ-অর্থাৎ সুন্দর শব্দ, ধন ও কামিনী।

আরও কিছুক্ষণ নদীর ধারে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই এক ঘর ভুটিয়া থাকে। গৃহস্বামী এক বাঙ্গালী সাধুর কথা দুঃখের সহিত কহিতে লাগিল। প্রথম বাঙ্গালী, তাহার পর সাধু, এ জন্য কথাটা একটু আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলাম। সে কহিল, কয়েক বৎসর অতীত হইল, এক জন বাঙ্গালী সাধু যখন এই স্থানে আইসেন, সে সময় তাঁহার বোঝা কালীতে পড়িয়া যায়। সাধু বোঝার জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। বোঝা উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে, তিনি যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার প্রদান করিবেন, এই বলিয়া তিনি নিকটের লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার কথার কোন ফল ফলে নাই। সাধুমহাশয় দুঃখিত হইয়া গমন করেন। ভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমার এরূপ কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই।

অনেকে ভ্রমক্রমে এই স্থানকে কালীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে এ স্থানে স্নানাদি তীর্থকৃত্যও করিয়া থাকেন।

মোটা মোটা পরেটা ভোজন করা গেল। খানকতক পরদিবসের জন্যও রাখা গেল। এ দিন হাঁটিতে হইবে অনেক, এ জন্য ভোজ্যদ্রব্য কিছু সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

এই নির্জ্জন স্থানে কোন জীব-জন্তু দেখিতে পাইলাম না সত্য বটে; কিন্তু পিশুমহাশয়ের উপদ্রবের নিবৃত্তি নাই। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিকর হইল। ক্ষুদ্র গৃহ ধূমপরিপূর্ণ হওয়াতে চক্ষুর্দ্বয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীরে পিশু-ব্যাপ্ত হওয়াতে বড়ই কষ্টানুভব হইল। শরীর হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া এক বিষয়ে নিবদ্ধ করিলাম। শরীর শ্রান্ত ছিল, নিদ্রাদেবী দয়া করিয়া পার্থিব সুখ ও দুঃখ সব ভুলাইয়া দিলেন।

গারবাংএ ভুটিয়া বন্ধুরা উপদেশ দিয়াছিলেন, লিপুলেখ যত সকাল সকাল অতিক্রম করিতে পারিবেন, তুষারপাত, জল, ঝড় প্রভৃতি বিপদসম্ভাবনা ততই কম হইবে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নকাল হইতে দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় জল-ঝড় আরম্ভ হইয়া থাকে। সে সময় পথিক এ স্থানে উপস্থিত হইলে বিপন্ন হয়, সময় সময় তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অতি প্রত্যূষে কালাপাণি পরিত্যাগ করিলাম। আজ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপস্থিত হইব, এই চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কোন কোন স্থানে কোনরূপ বনস্পতির চিহ্নমাত্র নাই। ভূমিসহ মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ, তাহাতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত। এই সকল দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প উপরে উঠিতে লাগিলাম। ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ কঠোর চড়াই চড়িয়াছিলাম, এখন সেরূপ চড়াই নাই। অল্প অল্প চড়াই চড়িয়া সঙ্গচান নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে কোন লোকালয় নাই, স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড সাজান আছে, লিপুলেখ অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারায়, মেষাদি পশুসহ এই স্থানে যাহারা অবস্থান করিয়াছিল, তাহাদের আবর্জ্জনা সকল সঙ্গচানের নাম পথিকগণকে জ্ঞাপন করিতেছে। সমুদ্র হইতে সঙ্গচান প্রায় ১৫ হাজার ফিট উপরে।

সঙ্গচান অতিক্রম করিয়া, যে জলধারা লিপুলেখ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার তট দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইবার পর দেখিলাম, ঝব্বুর পৃষ্ঠে আমার যে বোঝা ছিল, তাহার একদিক্ ঝুলিয়া পাতরের সহিত ঘর্ষণ করিতে করিতে ঝব্বু যাইতেছে। ঝব্বুর সঙ্গের যে লোক ছিল, সে অনেক দূরে পিছনে ছিল—তাহার কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে ঘোড়া হাঁকাইয়া ঝব্বু ধরিবার জন্য গমন করিলাম। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল—ঝব্বু স্বল্পতোয়া নদী পার হইয়া একটা উচ্চ স্থানে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমার অনেক ডাকাডাকির পর ঝব্বুর লোক আসিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিল। তখন বোঝা ভাল করিয়া বাঁধিয়া ঝব্বুর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পাহাড়ের ঘেসড়ানিতে সতরঞ্চির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর বিশেষ কিছু লোকসান হয় নাই। আমার কৈলাস-যাত্রার সঙ্গী সতরঞ্চিখানি যখনই দেখি, তখনই লিপুলেখে তাহার যে ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লিপুর তুষার-দৃশ্য।

এখানকার দৃশ্য হৃদয় অদ্ভুতরসে পরিপূর্ণ করে। এ প্রদেশে কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিকে তুষার আর কঠিনতম প্রস্তর। তুষারের প্রভাবে শিলা সকলও যেন দগ্ধ হইয়াছে, জীবনী-শক্তি হারাইয়াছে। ইহাতে কোমলতার নামমাত্রও নাই। উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল যেন গর্ব্বোন্নত মস্তকে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। কত যুগ ধরিয়া এই উন্নত মস্তককে অবনত করিবার জন্য কত শত কুলিশপাত ইহার উপর হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা যদি কোমল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কত আলোড়ন, কত উত্তাপ, কত আকুঞ্চন সহন করিয়া হিমালয় এই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা আমরা উপর উপর দেখিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ি। ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতিও হিমালয়ের অনুরূপ। তপস্যা-বিমুখ, অধ্যবসায়বিহীন, কাতরতাপূর্ণ ব্যক্তি বা জাতি দুইটা ফাঁকা কথা কহিয়া বা জ্যাটামি করিয়া স্থায়িরূপে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না, যদি বা কিয়ৎকালের জন্য সমর্থ হয়, তবে নিদাঘের সূর্য্য-কিরণস্পর্শে তুষার যেরূপ বিগলিত হয়, বহু নিম্নে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, পরে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারায়, সেই জাতি বা পুরুষের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ আসিয়া আমাকে আকুলিত করিয়া দিল। যাউক্ সে সব কথা। ধীরে ধীরে যত আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই আমাদের মধ্যে একটা অসুখের ভাব আসিতে লাগিল। আমার ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল—সঙ্গের লোকেরা অবসন্ন ও শিরঃপীড়ায় অভিভূত হইল, যেন চলচ্ছক্তি লোপ পাইতে লাগিল। ভুটিয়া সহিস কহিল, নিকটে অত্যন্ত বিষাক্ত উদ্ভিদ্ আছে। সেই উদ্ভিদ্ সহ মিলিত বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে আমাদের এই দশা হইয়াছে।

সরল বিশ্বাসী ভুটিয়া পর্ব্বত-পীড়ার এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া নিবৃত্ত হইল। সমুদ্রে যেরূপ সমুদ্র-পীড়া আরোহীকে

বিবশ করিয়া ফেলে, এই পর্ব্বত-পীড়াও সেইরূপ যাত্রীকে শিরঃপীড়ায় অবসন্ন করিয়া ফেলে। উচ্চ হইতে অবতরণই ইহার প্রতীকারের একমাত্র ঔষধ। ভগবৎকৃপায় আমাকে এই ক্লেশদায়ক পর্ব্বত-পীড়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে বিশাল তুষারক্ষেত্র—ইহাকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। যতই উপরে উঠা গেল, আমার সঙ্গের লোকরা পর্ব্বত-পীড়ায় ততই বিবশ হইতে লাগিল—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আসিয়া শ্বাস-রোধে সহায়তা করিতে লাগিল। ঘোড়ার কষ্ট দেখিয়া আমি পদব্রজে তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করা গেল। চতুর্দ্দিকে তৃণশূন্য তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা বিরাটপুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া অতীত যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দেখিতে লাগিলাম। লিপুলেখ গিরি-বর্ত্ম, শ্রান্ত আমাদের কাছে যত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বাস্তবিকপক্ষে ততটা নিকট ছিল না; বায়ুমণ্ডল দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া প্রতারণা করিতে লাগিল।

লিপুলেখের নির্জ্জন রাস্তা।

বহু ক্লেশ, বহু পীড়ার পর যখন পর্ব্বতের উপর উঠিলাম, তখন বোধ হইল, যেন এক কুহকীর রাজ্যে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। বহুদূরের দৃশ্যকে নিকটবর্ত্তী করিয়া, অস্পষ্ট রেখাকে স্পষ্ট করিয়া, কিয়ৎকাল সূর্য্য-কিরণে দিক সকল উদ্ভাসিত করিয়া, কখন বা ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ঐন্দ্রজালিকপ্রবর যেন আপন মনে ক্রীড়া করিতেছেন! নানাবর্ণে রঞ্জিত তিব্বতের তৃণবিহীন পর্ব্বতমালা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক-হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে যখন তিব্বতের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করি, সূর্য্যকরোজ্জ্বল গরলামান্ধাতা, গৈরিকাদি রঙ্গে রঞ্জিত শৈল-শ্রেণী যখন প্রথম দর্শন করি, তখন বোধ হইল, নিপুণ কুহকী ব্যতীত এই মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কনে অন্য কেহ অধিকারী নহেন। মানুষের তুলিকা বা শব্দ এই অব্যক্ত বিষয়কে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।

তিব্বত দেখিয়া একবার চকিতহৃদয়ে, অনিমেষনয়নে ভারতের দিকে চাহিলাম। সমুদ্রে যেরূপ প্রবল ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা ব্যাপ্ত থাকে—সেই তরল তরঙ্গ পোত-যাত্রীর হৃদয় ভয়ে অভিভূত করিয়া থাকে; সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় এই বিশাল শৈলমালা হৃদয়কে অভিভূত করিল। যিনি ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হই-বেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোধ হইল, হিমালয় যেন আমন্ত্রণ করিতেছেন; আর কহিতেছেন, বৎসরের অধিকাংশ সময় আমার বক্ষ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পথ প্রদান করিব। ক্লেশসহ হও, উদ্যোগী হও, অসাধারণ হও, তাহা হইলে কুবেরের রত্নাগারের দ্বার অনর্গল হইবে।

ভারতের সুদূর দক্ষিণ সীমায় কন্যা কুমারিকায়

মাতৃতীর্থে উপবেশন করিয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনাও আর নাই। কিন্তু সে তরল-তরঙ্গ-দৃশ্য যেন স্ত্রীত্বব্যঞ্জক, তাহার কঠোরতার ভিতর কোমলতা আছে,— তাহার বিশালতার ভিতর সঙ্কীর্ণতা আছে—তাহা অপার হইলেও পার প্রদান করিয়া থাকে।

লিপুলেখের উপর উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। ভুটিয়া ভক্তরা চোকদান প্রস্তর-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ অনেকগুলি রহিয়াছে দেখিলাম। কোন ভক্ত রজ্জুতে বস্ত্রখণ্ড গ্রথিত করিয়া পথের দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া মালা পরাইয়া দিয়াছে। সমুদ্র হইতে লিপুলেখের উচ্চতা প্রায় ১৬ হাজার ৭ শত ৮০ ফুট হইবে। নেপাল-যুদ্ধের পর ভাগ্যবান্ ইংরাজ এই সুগম রাস্তা অধিকার করিয়াছেন। যখন এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম, তখন আমার ভুটিয়া সঙ্গী বলিল, "এ স্থানে বেশী বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। যে কোন সময় জল-ঝড় ও তুষারপাত হইতে পারে। তখন ইহা অত্যন্ত বিপদ্‌পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অতএব শীঘ্র গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" গমন করিবার পূর্ব্বে একবার ভারতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। কি জানি, যদি এ শরীর প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে এই দর্শনই আমার শেষ দর্শন হইবে বিবেচনা করিয়া, মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তিব্বতে নামিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

দশম অধ্যায়

ভুটিয়া সঙ্গীর কথা অনুসারে লিপুলেখে অধিক বিলম্ব না করিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও নামিবার উদ্যোগ করা গেল। লিপুলেখের ভারতের দিকটা বেশ ঢালু, তিব্বতের ভাগটা বিশেষতঃ লিপুর নিকট খাড়া চড়াই। ঘোড়ায় চড়িয়া নামা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া হাঁটিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছু দূর নামিতে না নামিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে শিলার আকার ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া আমরা রক্ষা পাইলাম। সময় সময় ইহা হংসডিম্বাকারেও হইয়া থাকে। শিলা-পাতের সহিত অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। ইহাতে রাস্তা পিছল হইয়াছিল, এ অবস্থায় এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সৌন্দর্য্যভোগ করিবার অবকাশ রহিল না। দীর্ঘ যষ্টির সাহায্যে "দৃষ্টি পূতং ন্যসেৎ পাদং" বাক্যের সার্থকতা করা গেল। লিপুলেখ হইতে অবতরণকালে একটি জলপ্রবাহের সঙ্গ লইয়াছিলাম। ইনি লিপুর নিকট হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিয়াছেন। ইহার তটে বহুদূর ব্যাপ্ত কৃষ্ণ-শিলা দেখিলাম। তাহা পাথুরিয়া কয়লা বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। আর ইহা পাথুরিয়া কয়লা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নে গমন করিতে উদ্যত হইলে, ভুটিয়া সঙ্গী বারংবার আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ধস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়াতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও পাথুরিয়া কয়লা বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

তিব্বত খনিজ-সম্পদে পরিপূর্ণ। মিষ্টার ওয়াডেল বলেন, তিব্বতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্বর্ণপ্রিয় স্বদেশবাসীকে তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন!

সোনার কথা যাউক্। নদীর তট অবলম্বন করিয়া প্রায় ৪ মাইল নিম্নে পালা নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। এ স্থানে ইহার নামের উপযুক্ত কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। আর আছে, যাহারা লিপুলেখ চৌকি দিবার জন্য এ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহার ভস্মাবশেষ মাত্র।

এখন আর বৃষ্টি নাই, করকাপাত নাই, সূর্য্যদেব তাঁহার কিরণে যেন সকলকে অভয় প্রদান করিতেছেন। এ স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলযোগ করা গেল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ২।২॥০টার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সকালবেলায় এগুলিতে বড় বেশী জল থাকে না। যত অপরাহ্ন হইতে থাকে, ততই প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, সূর্য্যের কিরণে বরফ গলিয়া জল বাড়িয়া থাকে। সে সময় এই সকল পার্ব্বত্য নদী পার হওয়া বিপজ্জনক

হয়। আমার ঝব্বুকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা যাইবার পর বেশ শস্য-শ্যামল ভূমিতে উপস্থিত হওয়া গেল। এই সকল ভূমি জলসিক্ত করিবার জন্য তিব্বতীরা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ভূমিকে সজল করিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মটর, যব, সর্ষপ প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে দুই একখানি কৃষকদের কুটীর দেখিতে পাওয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে তৃণ-হীন দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু যেন পীড়িত হইয়াছিল; এখন এই শস্য-শ্যামল নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লিপুলেথ হইতে দূরে তাকলাকোট দুর্গ অস্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলাম, এখন বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দেখিতে কর্ণালীর তটে উপস্থিত হওয়া গেল। নদীর তটে

তাকলাকোট ও কর্ণালী নদী।

একখানি বড় গ্রাম, ইহাও তাকলাকোট নামে পরিচিত। উচ্চপাড় হইতে নদী অনেক নিম্নে। আমি ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। নদীর বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ-মাইল হইবে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় বিভক্ত হইয়া কর্ণালী প্রবাহিত হইতেছে। এখন বেশ সজীবতা বোধ হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক ছাগ, মেষ, ঝব্বু, ঘোটক, নদী পার হইতেছে, বহু স্ত্রী-পুরুষ বস্ত্রাদি নদীতে কাচিতেছে, স্থানে স্থানে জলের শক্তিতে চাকা চালাইয়া যবাদি চূর্ণ করিতেছে। নদীর অপর পারে দুর্গের পাদদেশে উন্নত ভূমির উপর ভুটিয়ারা বাজার বসাইয়াছে।

কষ্টে সাবধানতার সহিত নদী পার হইয়া প্রায় ৬।০টার সময় তাকলাকোটে উপস্থিত হওয়া গেল।

নদী পার হইয়া উপরে উঠিয়া এক ভুটিয়া ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি যেন আমাকে আসিতে দেখিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম আলাপেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লালসিংহের ডেরা কোথায়? তিনি বলিলেন, "লালসিং এখনও আইসেন নাই। চলুন, তাঁহার দোকান দেখাইয়া দিতেছি।" লালসিং আইসেন নাই শুনিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম; পরে দোকানের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম! আজ প্রায় ১৭।১৮ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাস্তায় নানা অবস্থা ভোগ করাতে শরীরও খুব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় একটু থাকিবার আশ্রয় পাইয়া শ্রীভগবানের দয়ার কথা ভাবিতে লাগিলাম। খিচুড়ি প্রস্তুত করা গেল, গরম গরম খিচুড়ি খাইয়া প্রজ্বলিত জঠরানল নির্ব্বাপণ, আর শয়ন করিয়া বৌদ্ধের দেশে নির্ব্বাণসম সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। সকল সুখেই দুঃখ আছে, ভোজনের পর যখন ঠাণ্ডাজলে হাত ধুই, তখন বোধ হইল, হাতের উপর যেন অস্ত্র-উপচার হইয়াছে, সে হাত যেন কিছুতেই গরম হইতে চাহে না। যে ঘরে ছিলাম, তাহার উপরটা পাল-ঢাকা, প্রাচীর পাতর আর মাটী দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। এ দেশে দিবাভাগে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে এ বেগ থাকে না বলিয়া রক্ষা। এইরূপ ঘরে

তাকলাকোটে কয়েকদিন কাটাইয়াছিলাম। তাহাতে শীতের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করি নাই বা স্বাস্থ্যের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই।

একাদশ অধ্যায়

তাকলাকোট,তাকলা থর ও পুরাং নামেও পরিচিত। তিব্বতীরা শেষোক্ত নামই ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—বাহিরে গিয়া দেখি, কয়েকজন তিব্বতী রমণী ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গরু, ঝব্বু, ভেড়া প্রভৃতির পুরীষ সংগ্রহ করিতেছে। অল্পসময়ের মধ্যে সে স্থানে মেষাদি পশুর মলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। এ প্রদেশে জ্বালানী কাষ্ঠের অত্যন্ত অভাব। তাই স্ত্রীলোকরা শীতকালের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিতেছে।

যখন এই সকল দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তখন সানাইএর শ্রুতিমধুর শব্দ কানের ভিতর আসিল। কোন্ স্থান হইতে এই শব্দ আসিতেছে,তাহার সন্ধান লইবার জন্য যখন এদিক ওদিক দেখি, তখন শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। উপরদিকে চাহিয়া দেখিলাম,দুইটি লোক রৌপ্য-নির্ম্মিত সানাই বাজাইতে বাজাইতে দুর্গ-প্রাচীরের ধারে ধারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন আর তাঁহাদের পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রায় দুইশত পুরুষ সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ইহাঁরা সৈনিক লামা, কাওয়াজ করিতেছেন। যদি কখন ধর্ম্মের উপর কোনপ্রকার আপদ উপস্থিত হয়, সে সময় যাহাতে না তাঁহারা অলস হইয়া অবস্থান করেন, ইহা তাহার পূর্ব্ব-অনুষ্ঠান। লামা হউন, সন্ন্যাসী হউন বা ব্রাহ্মণ হউন, ধর্ম্মরক্ষা তাঁহাকে করিতে হইবেই হইবে। ধর্ম্ম যথায় সুরক্ষিত হয়, তথায় সকলই সুরক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকাররা কহিয়াছেন, "যথায় ধর্ম্মের অবমাননা হয়, তথায় দ্বিজগণ অস্ত্র গ্রহণ করিবেন।" পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের দেশে "দেশাত্মবুদ্ধি", "দেশানুরাগ" প্রভৃতি অহিন্দু ভাব ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। এ ভাব আমাদের বেদ-পুরাণে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে", "ধর্ম্মরক্ষার জন্য শুভ অবসর আসিলে বুঝিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে" ইত্যাদি ভাবনায় ভাবিত আমাদের পূর্ব্বজরা, অলিকসন্দরকে (আলেকজেণ্ডার) বাধা দিবার জন্য দলে দলে গমন করিয়াছিলেন। এই ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া শত শত বৎসর পূর্ব্বে অসংখ্য হিন্দু দূরপ্রদেশ হইতে গমন করিয়া সমুদ্রতটে সোমনাথের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-মণ্ডিত মন্দির রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। এ ভাবনা আমাদের হিন্দুর মর্ম্মে মর্ম্মে সুনিহিত আছে। দেশের নামে—হিন্দুর নিকট এই অস্বাভাবিক আহ্বানে কয় জন সমবেত হইবেন জানি না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে এখনও শত শত, সহস্র সহস্র, প্রয়োজন হইলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রস্তুত, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর নিকট সমস্ত বসুধাবাসী কুটুম্ব বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি জীবমাত্রকে শিবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রেমের চক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট সমস্ত পৃথিবীই স্বদেশ, আর সমস্ত পৃথিবীবাসী তাঁহার আত্মীয়। এরূপ অবস্থায় হিন্দুর বিশাল হৃদয়ে ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ দেশের কথা কখনও আসিতে পারে না। ইহার পরিবর্ত্তে যাহা তাঁহার ইহকাল ও পরকালের সুহৃৎ—যাহা তাঁহার সংস্কারকে গঠন করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

কেহ কেহ মনে করেন—ধর্ম্মগুরু সংসারবিরাগী লামাদের যুদ্ধ করাটা ভাল দেখায় না। আমার কাছে কিন্তু এ ব্যবস্থা খুব ভালই বোধ হইল। ইহাঁরা বর্ত্তমান প্রথানুসারে অর্থাৎ লোকের নির্দ্দয়ভাবে প্রাণসংহার বিদ্যায় অভ্যস্ত হইলে, পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, দুর্গের পাদদেশ ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নিম্নে কর্ণালীর দৃশ্য মন্দ নহে—দূরে লিপুলেখ—তুষারমণ্ডিত হিমালয় সূর্য্যোদয়ের সহিত আরক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমল-ধবল অম্বরে শোভিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে এই অদ্ভুত পটপরিবর্ত্তন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া আসিলাম।

আবাসস্থানে আসিয়া দেখি, ঘোড়াওয়ালা ভাড়ার জন্য

অপেক্ষা করিতেছে। সে গারবাংএ ফিরিয়া যাইবে। এ সময় ব্যবসায়ীরা তাকলাকোটে আসিবে, এ জন্য ঝব্বু প্রভৃতি ভাড়া দিয়া দুই পয়সা তাহারা রোজগার করিয়া থাকে। ঘোড়া দুই টাকা—ঘোড়ার সঙ্গের লোকও দুই টাকা, আর ঝব্বুর ভাড়া দুই টাকা হিসাবে দিয়াছিলাম। ইহার উপর কিছু বক্‌সীসও দিতে হইয়াছিল। ঘোড়াওয়ালার হাতে ২১।১খানি পত্র ডাকে দিবার জন্য দিলাম; আর বলিয়া দিলাম, আমার নামে পত্র আসিলে এ স্থানে যে ব্যবসায়ী আসিবে, তাহার হাতে যেন পাঠাইয়া দেন। এ জন্য পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

নদীর দিক দিয়া যদি কেহ তাকলাকোট দুর্গের দিকে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি প্রাচীর শ্রেণীর উপর পতিত হইবে। এই প্রাচীর দুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর তট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাকলাকোট দুর্গের জলের অভাব কর্ণালীর জলে দূর হইয়া থাকে। এ জন্য প্রতিদিন পালা করিয়া গ্রামবাসীরা জল যোগাইয়া থাকে। এই জল বন্ধ করিতে পারিলে দুর্গ জয় করিতে বিলম্ব থাকে না। কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাবসিংহের জোরাবরসিং নামে এক জন প্রতিভাসম্পন্ন সেনানী ছিলেন। ইংরাজ যখন পঞ্জাব গ্রাস করিয়া উদরস্থ করিতেছিলেন, সে সময় গোলাবসিংহের সেনানী হিমালয়ের উত্তরভাগ জয় করিয়া রণবিষয়ক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। জোরাবরসিং লাদাক জয় করিয়া তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে স্থানে তিনি উপস্থিত হয়েন, সেই স্থানেই বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কগতা হয়েন। এইরূপে দেশ জয় করিতে করিতে শতদ্রুর তটে তিব্বতীদের পবিত্র তীর্থ, তীর্থপুরীতে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার বিজয়-শিবির স্থাপন করেন।
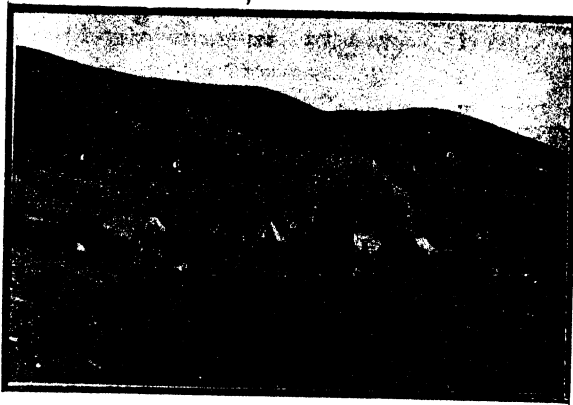
এক সময় তিব্বতী সেনাপতি ৮ হাজার সৈন্য লইয়া, জোরাবরসিংকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, জোরাবরসিং এ সংবাদ অবগত হইয়া, তিব্বতী সেনাপতিকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার জন্য অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জোরাবর, তড়িৎগতিতে গমন করিয়া বজ্রের ন্যায় প্রবল-বেগে বরখার প্রান্তরে তিব্বতী সৈন্য আক্রমণ করেন; ৮ হাজার তিব্বতী সৈন্য, দেড় হাজার ভারতীয় সৈন্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'য়। তিব্বত-বাসীদের হৃদয়ে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়; জোরাবরের নামের প্রভাবে যেন সকলে বিবশ হইয়া পড়ে।

তিব্বতে প্রথম শিবির।

তাকলাকোট অঞ্চলের শস্যশালিনী ভূমি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কেবলমাত্র তাকলাকোট দুর্গ তিব্বতীদের হস্তগত রহিয়া যায়। তাকলাকোট যখন অবরুদ্ধ হয়, সেই সময় জলাভাবে যাহাতে দুর্গ জোরাবরের হস্তগত না হয়, সেই জন্য জলগ্রাহীদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিব্বতীরা অতি দক্ষতার সহিত উভয়দিকে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জোরাবরের অপূর্ব্ব অবদানের কথা ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছে—তিব্বতীরাও তাহাদের সে দারুণ বিপদের কথা মনে আর স্থান দেয় না। কিন্তু এই প্রাচীর সেই অতীতের স্মৃতি লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বর্ত্তমান লেখক বহুদিন এই প্রাচীরের কাছে বসিয়া তিব্বতীদের দুর্গে জল

বহনের দৃশ্য দেখিয়াছেন, আর ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী যে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন— নানা প্রকার অভাবের মধ্যে থাকিয়াও অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন—দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণা বসুধা জয় করিয়াছিলেন, সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কৈলাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরবৎসর আমি কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন করিতে যে সময় গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় শ্রীনগরে জোরাবরসিংএর বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, মহারাজ প্রতাপসিংহকেও এ বিষয় জানাইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই। য়ুরোপের মাটীতে জন্মগ্রহণ করিলে, জোরাবর যে হানিবল বা নেপোলিয়নের সহিত তুলিত হইতেন, তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্য-পরম্পরা গর্ব্বের সহিত আলোচিত হইত,সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বীরবর জোরাবরসিং যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাকলাকোট দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও পতিত রহিয়াছে।

জোরাবরসিং তিব্বতীদিগকে নিপীড়িত করিলে, চীন-সম্রাট্ ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করেন এবং লাদাক হইতে তাকলাকোটে আসিবার রাস্তায় যাহাতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে গারতক পর্য্যন্ত গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে তাকলাকোটের ২ মাইল দূরে তোয় নামক স্থানে তিনি বীরাঙ্গনা-পরিচালিত এক তিব্বতীসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। যখন তিব্বতীরা হতবীর্য্য, নিরুদ্যম, কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সেই সময় এই বীররমণীর আবির্ভাব হয়। তিনি কতকগুলি বীরহৃদয় যুবক সংগ্রহ করিয়া জোরাবরসিংকে তাঁহার আগমনপথে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। এ দেশের স্ত্রীলোকরাও অস্ত্রচালনায় পটীয়সী। কথিত আছে যে, এই বীরাঙ্গনার বন্দুকের গুলীতে জোরাবরসিং আহত হইয়া ঘোটকপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। যে স্থানে বীরবর জোরাবরসিং পঞ্চত্বলাভ করেন, সে স্থানে পশ্চাৎকালে একটি সমাধি-স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়। বর্ত্তমানকালেও সেই স্তূপ তাঁহার স্বদেশ ও বিদেশবাসী উভয়ের কাছে সম্ভ্রম-শ্রদ্ধার সহিত দর্শিত হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংএর মৃত্যু-সংবাদে তিব্বতীরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া দারুণবেগে ভারতীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। জোরাবরের সহযোগী সেনানী বস্তিরাম এই আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া বিচলিত হইলেন। তিনি তিব্বতী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিব্বতীরা তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। যখন লাদাক হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নির্ম্মূল হইল, তখন তিনি লিপুলেখ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতে আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিব্বতীদের বাহুবল অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ আর জল-বায়ুর কঠোরতা তাঁহাকে অধিকতর বিপন্ন করিয়াছিল। বস্তিরাম তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া পালাতে গমন করেন। শত্রুবর্গ বস্তিরামের গমনকথা অবগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি নিপুণতার সহিত সৈন্য সকল পরিচালনা করিয়া পালায় শিবির সংস্থাপন করেন। তিব্বতীরা পলায়মান শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য উৎসাহের সহিত উপস্থিত হইতে লাগিল। যে সকল ভারতীয় সৈন্য শত্রুহস্তে পতিত হইল, তাহারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইতে লাগিল।

বস্তিরাম তিব্বতীদের চক্ষুতে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিলেন। তিনি অন্য রাত্রি অপেক্ষা তাঁবুতে অধিক-সংখ্যক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তিব্বতীরা মনে করিল, শত্রুসৈন্য সতর্কতার সহিত শিবির রক্ষা করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে লিপুলেখের দিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। দারুণ শীত, তুষারপাত, দুর্গম রাস্তা, আর তিব্বতীদের আক্রমণে ভারতীয় বীরগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন। তিব্বতীরা যাহাদিগকে বন্দী করিতে সমর্থ হইল, তাহারা অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত নিহত হইল। এরূপ কথিত আছে, তিব্বতীরা জোরাবরসিংএর কেশাদি শরীরের অংশ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে ঝুলাইয়া রাখিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, এরূপ অসাধারণ শত্রুর শরীরের অংশ যে গৃহে থাকে, সে গৃহে কখনও অমঙ্গল আসিতে পারে না। যাহারা হিমালয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা অস্ত্রাদির

বিনিময়ে একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিয়া জীবন রক্ষা করে। আসকোটে এরূপ অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সেনানী-পরিচালিত ভারতীয় সৈন্যের এই অভিযানের কথার সহিত আমরা পরিচিত নহি। ভারতের ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র অধ্যায়—বিস্মৃত, জীবনীপ্রদ এই ক্ষুদ্র অধ্যায় বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হউক। আত্মশক্তিতে প্রত্যয়হীন আমাদের শক্তি-সংগ্রহের পক্ষে উপযোগী এমন উদাহরণ আর নাই।

তিব্বতীরা নেপালী প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। নেপাল-দরবার নিজের প্রজারক্ষা করিবার জন্য কঠোরতার সহিত তিব্বতীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে নেপালী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ইহাই সদ্ব্যবহারের কারণ।

নিশীথে এ স্থান হইতে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য অদ্ভুত। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল—আর ঘোর তমসাবৃত রাত্রি উভয় সময় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিমূঢ় হইয়াছি। আকাশের দিকে যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছি, তখন নক্ষত্র সকল বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে—তাহাদের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় নীল আকাশ সুশোভিত হইয়া বিস্ময়প্রদ শোভার আধার হইয়াছে। তিব্বতে এইরূপ বহুরাত্রি শীতের কষ্ট ভুলিয়া আকাশ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

ব্যথা-গরব।

তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমায় সাজে?

কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুক্‌রে ওঠে,
চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে, কলজে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে,
এ অভিমান ব্যথাটি মোর
জানি, জান, হে মনচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝতে আমি পারি না যে!
অন্‌হেলা না পুজক-লাজে॥

যখন ভাবি আমার আদর কতই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছড়ে' পড়ে অসহায়ের হতাশ রোদন।
যতই আমায় সইতে নার
আঁক্‌ড়ে ততই ধরি আরো;
মারো প্রিয় আরো মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে॥

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়েছিলে অঘোর ঘুমে
এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রু-আঘাত লেগে
চম্‌কে তুমি উঠলে জেগে
চরণ আঘাত কর্‌লে রেগে—
সেই পরশের সান্ত্বনা যে
আজও আমার মর্ম্মে রাজে॥

এম্‌নি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরাণ-প্রিয়!
সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে—
'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে
কি কৌস্তভ এ হিয়ায় রাজে!'
মর্‌বে হরি হিংসা-লাজে॥

বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসার গর্ব্বে এ বুক উঠবে দুলে,
সর্ব্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে নাক চিত্ত-কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাট্‌বে বেলা,
হেলাফেলার বস্‌বে মেলা,
এক্‌লা আমার বুকের মাঝে।
সুখে দুখে সকল কাজে॥

কাজী নজরুল ইসলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি।

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলস্ ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণীর উদ্দেশে যখন বাষ্পীয় যানে আরোহণ করি, তখন রাত্রি ১১টা। গাড়ীখানি অষ্টেণ্ড-ওয়ারসা এক্সপ্রেস। ইহা বেলজিয়মের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ণিত অষ্টেণ্ড সহর হইতে সমগ্র জার্ম্মাণী অতিক্রম করিয়া পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। স্বাধীন-বিলাস-বিভবের লীলাভূমি য়ুরোপে রেল-ভ্রমণ যে কত সুখকর, তাহা দুর্ভাগ্য ভারতের রেল-যাত্রিগণের ধারণারও অতীত। গাড়ীর কক্ষগুলি যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন ইন্দ্রভবন। গৃহ ত্যাগ করিয়া রেলপথেও সে দেশের ধনকুবেরগণ গৃহের প্রায় সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই উপভোগ করিতে পারেন। ভারতে প্রচলিত তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায় কোনও প্রকার যান-সৃষ্টির কল্পনা এ পর্য্যন্ত তথাকার রেলকর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। আমি এই অমরাবতী তুল্য একটি কক্ষে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম।

বাষ্পীয় শকট দ্রুতগতি জার্ম্মাণী অভিমুখে ধাবিত হইল, স্থাণুর ন্যায় আমার দেহ কত দূর কোন্ বিদেশের কোন্ স্থানে পড়িয়া রহিল; কিন্তু মন আমার জড়দেহের জন্য যোড়শোপচারে পূজার সে সকল আয়োজন উপকরণ উপেক্ষা করিয়া, নিমেষে কত দেশ, সাগর, প্রান্তর, বনভূমি, পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া, দরিদ্রনারায়ণের দেশে আমার জন্মভূমি ভারতে যাইয়া উপস্থিত হইল। উপভোগ করে ত মন; সে মন আমার কিছুই উপভোগ করিল না।

মনে হইল, আমরা কি মানুষ! সুসভ্য য়ুরোপবাসী কি আমাদিগকে মনুষ্যপদবাচ্য বলিয়া মনে করেন? ভারতবাসীরই অর্থে পুষ্ট ভারতীয় রেলপথে ভারতীয় যাত্রীর এত দুর্দ্দশা, এমন লাঞ্ছনা কেন? এ "কেন" ভারতে থাকিতে কোনও দিন এমন করিয়া এত যাতনার কারণ হয় নাই। কে না জানে, ঈশ্বরের এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে জীবের এই মনুষ্য-সমাজে মনুষ্যের অবস্থাগত বৈষম্য চির-দিনই আছে। কোটিপতি ও নির্ধন, সম্পন্ন বা নিঃস্ব, ইহা ত কোনও দেশবিশেষের বৈশিষ্ট্য নহে; ভারতে ত এ বৈষম্যের অভাব নাই। ভারতেও স্বদেশে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, বিলাসী ধনকুবের নিরাশ্রয় দরিদ্রের সর্ব্বল ব্যথা উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে জীবনের সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। পথের শীতার্ত্ত অর্দ্ধ-নগ্ন কাঙ্গালের আর্ত্তনাদে সুখনিদ্রিত বিলাসীর নিদ্রাভঙ্গ হয় না; তবে আজ এত দূরে কাঙ্গাল দরিদ্রের দেশ-ছাড়া হইয়া কাঙ্গালের সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলাম কেন, সে করুণ সুরে হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিত হইতে লাগিল কেন, কে বলিবে? ভারতে থাকিতে দরিদ্র ভারতীয় ভ্রাতার দুঃখে হৃদয়ে এমন তীব্র বেদনার সঞ্চার ত কখনও হয় নাই! আজ এমন অধীর হইয়া উঠিলাম কেন? পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত ভারতবাসীর স্থান এ ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে কোথায়, কত নিম্নে? কি ভীষণ কি গুরু ভারে ভারতবাসী নিষ্পিষ্ট, এ দীনতা, এমন হীনতা ভারতের ভাগ্যে আর কত দিন আছে? বলদৃপ্ত, রাজশ্রীসম্পন্ন, রাজসিকতায় পূর্ণ য়ুরোপ কত দিনে ভারতকে মানুষের দেশ বলিয়া গ্রাহ্য করিবে, কত দিন পরে এই বিদেশেই আসিয়া ভারতবাসী স্বজাতির পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারিবে, কত দিনে স্বাধীন জাতির সমাজে সমান আসন পাইয়া ধন্য হইবে, কত দিন আর অর্থ-ব্যয় করিয়াও এমন ভাবে অবনতমুখে অন্তরগত হীনতায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হইবে, এই চিন্তায় যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, ছুটিয়া এই মুহূর্ত্তে স্বদেশে যাই, আমার মা'র কাঙ্গাল সন্তান আমার ভ্রাতৃস্থানীয় দরিদ্র ভারতবাসীকে প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলি; প্রাণ যেন সকল প্রবোধ উপেক্ষা করিয়া এমনই একটা গূঢ় যাতনায় অধীর হইয়া উঠিল। কি করিব, বসিয়াই রহিলাম।

যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম, তাহাকে সেখানে ওয়াগন লি বলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ; তাহাতে দুই জন মাত্র আরোহীর উপবেশন ও শয়নের ব্যবস্থা আছে। ওয়াগন লির যাত্রি-গণকে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। ইহার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। বসিবার আসন অতি কোমল নয়নাভিরাম

বার্লিন—প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।
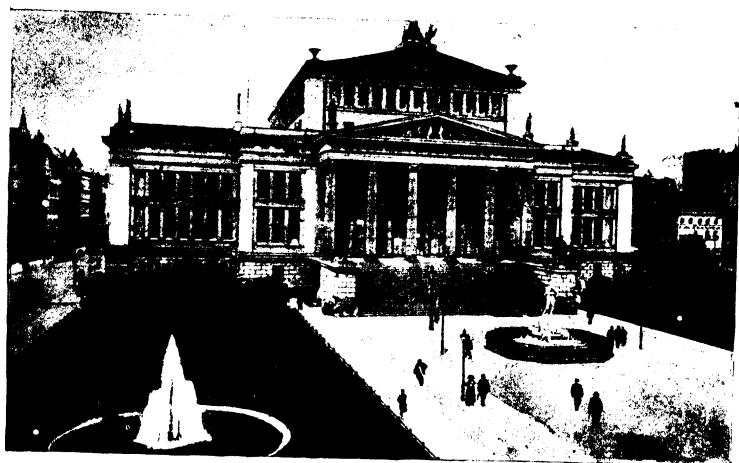
বার্লিন—থিয়েটার

মখমলে মণ্ডিত। পৃষ্ঠদেশের আশ্রয়স্থানটিও সুদৃশ্য ও আরামপ্রদ। বসিবার স্থানের নীচে রাত্রির ব্যবহারের জন্য শয্যা, উপাধান প্রভৃতি রক্ষিত থাকে। প্রত্যেক ওয়াগন লির জন্য স্বতন্ত্র বাথ-রুম। বাথে ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল; আয়না, চিরুণী, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি টয়লেটের নানা প্রকারের সরঞ্জাম। শয়নকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক জন রেল-ভৃত্য আসিয়া ওয়াগন লির যাত্রিগণের আদেশ অনুযায়ী তাঁহাদের শয্যা প্রস্তত করিয়া দিয়া যায়। উপবেশনকালে যাহাতে পৃষ্ঠদেশের আশ্রয়, রাত্রিতে সেইটিই শয্যায় পরিণত হয়। পিঠের ঠেসানটি হুকের দ্বারা উপরে সমতল ভাবে আটকাইয়া দেওয়া হয়। ভৃত্য তাহারই উপর পরম রমণীয় শয্যা রচনা করিয়া দেয়। অর্থ দিয়াছি, আমার জন্যও এ ব্যবস্থা করা হইল; খাতিরের কোনও ক্রটি হইল না।

ক্রমশঃ নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। উপরের শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ নিদ্রা হইল না। মাঝে মাঝে এক একটি ষ্টেশন চলিয়া যাইতেছে, শুইয়া শুইয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কতক্ষণ পরে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিস্মৃতি লাভ করিলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন নীচের আসনে আসিয়া দেখিলাম, ধরণীর পূর্ব্বপ্রান্ত সবিতার সেই বেদোক্ত চির আরাধিত পবিত্র স্বর্ণ-কিরণ চুম্বনাশায় নয়ন মেলিয়াছে। অগাধ অভিনব প্রেম-ভক্তি-রসে হৃদয় যেন আপ্লুত হইয়া উঠিল। দূরে দিক্‌চক্রবালের চমৎকারিত্ব মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম।

জার্ম্মাণ পারলামেণ্ট—সম্মুখে বিসমার্কের প্রস্তর-মূর্ত্তি।

গাড়ী দ্রুতবেগে কত পথই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে! এইবার একটা ষ্টেশনে পৌছিলে বুঝিলাম, বেলজিয়ম অতিক্রান্ত হইয়াছে; এখন জার্ম্মাণ অধিকারে প্রবেশ করিয়াছি। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। অপূর্ব্ব প্রভাতে উষা-রাগ-রঞ্জিত অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলাম।

যে দৃশ্য দেখিয়া এক দিন আমাদের জাতীয় মহাকবি ভাবের তুলিকায় অমর ছবি আঁকিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া ভাবের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে ছবি সমুদ্রের জলে নীলাম্বুরাশির কূলে কূলে ফলিয়াছিল; আমি—জলে নহে,—স্থলে বসিয়াই এই প্রভাতে যেন তেমনই একটা দৃশ্য দেখিলাম। নীল সাগরের ন্যায় দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। দূরে—বহুদূরে গোলাকার পৃথিবীর কোলে কোলে দিক্‌চক্রবালের তীরে তীরে জার্ম্মাণীর অভ্রভেদী শত শত কলের চিমনী মন্দ বায়ুপ্রবাহে ধূমরাশির অনতিচঞ্চল স্তূপগুলি শিরে ধারণ করিয়া, তালতরুর ন্যায় কখনও বা অঙ্কে ছিন্ন স্তূপের কালিমা মাখিয়া তমালের

ন্যায় শোভা পাইতেছিল। মন্দ মন্দ বায়ু-সেবিত আকাশে শস্যশ্যামলা ধরণীর সীমান্তে যেন সেই দৃশ্যই দেখিলাম। সেই—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী,
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

মনের ভ্রম অনতিবিলম্বেই ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বালসূর্য্যকিরণে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। "আধেক-আঁধার আধেক-আলোর" ইন্দ্রজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। শক্তির উপাসক জার্ম্মাণজাতির দেশ আমার মোহ দূর করিয়া দিল।

দেশ বটে, এমন দেশ, এমন জাতি না হইলে কি এমন কঠিন স্থানে এমন ভাবের ওলট-পালটের পর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? মনে হইল, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, এই ভাবে বাঁচিয়া থাকাই প্রার্থনীয়। মহা আহবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জার্ম্মাণী আজ দুর্ব্বল; কিন্তু সে দৌর্ব্বল্যে অবসাদের ছায়াপাত হয় নাই; রাজসিক শক্তির উত্তেজনায় জার্ম্মাণী আবার মাথা তুলিতেছে। গভীর অবসাদে জার্ম্মাণ বীর এখনও আত্মসমর্পণ করে নাই; মনে হইল, জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। আর আমরা? প্রাণ আছে, সাড়া নাই, যেন নিস্পন্দ জাগিয়া আছি; কিন্তু নেত্রোন্মীলন ঘটিল না! আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, কিন্তু বিরাট উদ্যমহীনতা—দেশ আছে, দেশাত্মবোধ নাই, এমন দেশ জগতে আর কোথায় সম্ভব! জার্ম্মাণী তাহার মৃতকল্প শিল্প-বাণিজ্য আবার সজীব সতেজ করিয়া তুলিয়াছে। অবিশ্রান্ত অবিরামগতি জার্ম্মাণীর কর্ম্মশক্তি-প্রবাহ আবার বহিয়া চলিয়াছে। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই এই প্রকার দৃশ্য!

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, য়ুরোপের সহিত ভারতের বৈষম্য যাতনার বিষয় হইয়া পড়িল। দেখিলাম, ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র যাত্রিগন, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনি-দরিদ্র সকলেই একটা ব্যবস্থামত আসিয়া—আপন আপন স্থান অধিকার করিতেছে। হৈ-চৈ তুমুল কাণ্ড, ঠেলা-ঠেলি কোথায়ও দেখিলাম না। এ দেশের মত তথায় গাড়ীতে বসিবার জন্য যাত্রীর একটা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে। পূর্ণ-সংখ্যক যাত্রী গাড়ীতে বা কামরায় থাকিলে অন্য যাত্রী আর তথায় উঠিবার চেষ্টা করে না; যে যাত্রী স্থানের অভাবে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে যে গাড়ীতে স্থান আছে, সেই গাড়ীর যাত্রিগণ ডাকিয়া লয় ও স্থান দেখাইয়া দেয়। সাধারণতঃ এক জন জার্ম্মাণ ভাবিতে পারেন না, কিরূপে তিনি অন্য এক জন জার্ম্মাণের অসুখের কারণ হইতে পারেন। বহুদিনের পরাধীনতার ফলে মনুষ্যের একটা হীনতা সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে; আমাদের অস্থি-মজ্জায় এই সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে; ইহা দূর করিবার মত শিক্ষার প্রভাব বা অবস্থা-বেষ্টনীও আমাদের নাই; কিন্তু যে দেশের লোক দেশহিতব্রতে সর্ব্বদা রত, দেশই যাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বদেশবাসী তাহাদের কত প্রিয়, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। তবে সাধারণতঃ তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাকে জীবের প্রতি প্রেম বলা যায় না। ইহা মহত্তর; ইহার স্থান অনেক উচ্চে সন্দেহ নাই, ইহাতে আবিলতা এবং সঙ্কীর্ণতাটুকুও নাই, কিন্তু এই আদর্শ-প্রেমের প্রবাহ ত এ দেশে শুকাইয়া গিয়াছে; ইহাও বোধ হয়, পরাধীন দুর্ব্বল জাতির ধর্ম্ম নহে।

জার্ম্মাণীর একটা ষ্টেশনে এক জন জার্ম্মাণ ফলব্যবসায়ী ফেরিওয়ালা আমাকে প্রতারিত করিয়াছিল। আমি পঞ্চাশ মার্কের কতকগুলি ফল ক্রয় করিয়া, লোকটিকে এক শত মার্কের একখানি নোট দিয়া আমার পাওনা বাকী মার্ক চাহিলাম। লোকটি আনিতে গেল। দেখিলাম, দূরে যাইয়া সে একটা থামের অন্তরাল হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল; নোট ভাঙ্গাইবার কোন চেষ্টাই করিল না। গাড়ীখানি ছাড়িয়া গেলে সে বাহিরে আসিল। সামান্য এক জন ফেরিওয়ালার এই দোষের জন্য সমগ্র জাতির প্রতি দোষারোপ করা অসঙ্গত বটে; কিন্তু ইংলণ্ডে যত দিন ছিলাম, কোথায়ও এরূপ কোনও হীনতা দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। ইংরাজ জাতির ব্যবসায়গত সততার অভাব কখনও দেখি নাই। ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবামাত্র এক জন সামান্য কুলীর উপর মূল্যবান্ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা কোনও স্থলে পৌছাইয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়। যথাসময়ে এক জন অপরিচিত কুলী আর এক জনের মালপত্র যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়; দুর্ভাবনার কোনও কারণই নাই। ইংলণ্ডের বড় বড় রাস্তায় বাড়ীর সম্মুখে ঢাকা এক একটা গভীর গর্ত্ত আছে। দেখিতাম, অতি প্রত্যুষে বড় বড় কয়লার গাড়ী আসিয়া গর্ত্তের পার্শ্বে দাঁড়াইত ও গাড়ী হইতে গর্ত্তে কয়লা ঢালিয়া দেওয়া হইত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানি, কয়লার দোকানে গৃহস্থগণের স্থায়ী অর্ডার দেওয়া আছে। দোকানদার গাড়ী করিয়া অর্ডারমত কয়লা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ ভাবে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কখনও কয়লা পরিমাণে কম বা নমুনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। এ ব্যাপারে বেশী লিখা, রসিদকাটা প্রভৃতি অবিশ্বাসজনিত উপদ্রব নাই। আরও এক বিষয়ে ইংরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেটি য়ুরোপের আর কোথাও দেখিলাম না। স্ত্রী-স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই আছে; ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ। অন্তঃপুরচারিণী বঙ্গমহিলাগণ আমাদের দেশে "সাহেব মেমের" অবাধ বিচরণের বিবরণ শুনিয়া চমকিয়া উঠেন; কিন্তু এ দেশে আসিয়া দেখি, ইংরাজ সমাজেই বরং একটু আধটু অবরোধের ছায়া আছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে কিছুমাত্র নাই। রেলগাড়ীতে অপরিচিত যুবক-যুবতী কি দিবসে কি রাত্রিতে একসঙ্গে নিতান্ত অকারণ ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া যাতায়াত করিতেছে, অন্যান্য যাত্রীর সে দিকে লক্ষ্যও নাই এবং তাহা সমাজে দূষণীয় বলিয়া কেহ মনেও করেন না। এ সব দেশে অবরোধ প্রথা নাই বলিয়া মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীরও ব্যবস্থা নাই; বরং কেহ কেহ ধূমপান করেন না বলিয়া প্রত্যেক ট্রেণেই তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট থাকে। তবে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই ধূমপান করিয়া থাকেন।

বার্লিনে কাইসারের প্রাসাদ—সম্মুখে রণদেবতার প্রস্তর-মূর্ত্তি।

জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন সহরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। একখানি দ্রুতগামী রেলগাড়ী অষ্টেণ্ড হইতে মাত্র ১৯ ঘণ্টায় বার্লিন পৌঁছিতে পারে! জার্ম্মাণীর একটা বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, এ স্থানে বিদেশীর সংখ্যা খুব বেশী। বার্লিনে আসিয়া একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এমন সুসজ্জিত হোটেল পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। সকল বিষয়ে এমন অসামান্য পারিপাট্য, বিজ্ঞানের এমন পূর্ণ ব্যবহার অন্য কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রতি কামরায় টেলিফোনের ব্যবস্থা; কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাইলাম না। এত বৈজ্ঞানিক আড়ম্বরের মধ্যে পড়িলে অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে যেন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশের মত ঝাঁটা বা বুরুসের ব্যবহার নাই; dust sucker ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একটা নল মেজের উপর ধরিতেই ভিতরের হাওয়ার টানে ধূলি ও অন্যান্য ময়লা প্রায় ৩ ফুট দূর হইতে সজোরে ভিতরে প্রবেশ করে, মেজে পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাতে ধূলা একেবারেই উড়িতে পারে না। এমন সুদৃশ্য, এমন আরামপ্রদ হোটেলে আহারাদির জন্য দৈনিক ব্যয় দেখিলাম কেবল ৪৷৷০ টাকা। ইহার উপর শতকরা আরও ১০ টাকা ট্যাক্স দিতে হইয়াছে।

মার্কের মূল্য কম হইয়া গিয়াছে দেখিয়া অনেক মার্কিণবাসী জার্ম্মাণীতে জমী পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া বসিয়াছেন; মার্ক লইয়া তখন রীতিমত ফাটকাবাজী চলিত। সে সময় কেবল ৭৲ টাকা খরচ করিয়া প্রায় সমস্ত দিন অর্থাৎ সকাল ৯টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ট্যাক্সিতে বেড়ান চলিত। সহরের রাস্তাগুলিও অতি সুদৃশ্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে একটি করিয়া বৃহৎ নগর এবং সেটি রাজধানী; সেই একটির অব্যবহিত নীচে যাহার স্থান, সেটি তুলনায় নিতান্ত সামান্য; জার্ম্মাণীতে কিন্তু বার্লিনের ন্যায় ৫।৬টি বড় বড় নগর আছে। নগরগুলির রাজপথ অতি চমৎকার। দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, তাহার পর ফুটপাথ, তাহার পরেই আবার বৃক্ষশ্রেণী ও মধ্যে গাড়ী-ঘোড়ার রাস্তা।

বার্লিনের লুনা পার্ক একটা বিশাল স্থান। তথায় দিবারাত্রি আমোদ-প্রমোদ চলিতেছে। সে স্থানের বিচিত্র বিলাস-ব্যসন প্রত্যক্ষ করিলে আর মনে হয় না যে, কিছুদিন পূর্ব্বেই এই জার্ম্মাণ জাতি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিল এবং এখনও অনন্ত ঋণজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই আতসবাজি আরম্ভ হইল। এ সকল আতসবাজির বৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। কোথায়ও সারকাস, কোথায়ও সিনেমা, কোথায়ও বা জুয়া চলিতেছে। বাধা কিছুতেই নাই। যাহাতে আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে তাহাই কর্ত্তব্য। এমন আলোকমালা, এমন মর্ম্মর বা ধাতুমূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই।

ভূতপূর্ব্ব কাইসার এখন নির্ব্বাসিত। তাঁহার প্রাসাদে এখন মিউজিয়ম খোলা হইয়াছে। কি প্রকাণ্ড অট্টালিকা! তবে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ যেমন অতি মনোহর একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত, কাইসারের প্রাসাদ সেরূপ ছিল না। ইহা একেবারে রাজমার্গের উপর অবস্থিত। সকল দিকেই রাজপথ। যে কক্ষ কাইসারের শয়নমন্দির ছিল, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ঘরটিতে একটা হাট বসান যায়। ঘরটি কাচে নির্ম্মিত। তাহার দেওয়াল, ছাত, তাহার মেজে, আসবাব, প্রত্যেক পদার্থটি কাচ-নির্ম্মিত। এমন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার জগতে কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। বার্লিন প্যারী সহরের ন্যায় সুদৃশ্য না হইলেও একটা প্রকাণ্ড সহর। দেখিলেই মনে হয়, এ জাতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ নহে; ইহারা প্রকৃত কর্ম্মী। বর্ত্তমান বার্লিন সহরটি আমাদের এই কলিকাতার ন্যায় ভাঙ্গাগড়ার ফলে জন্মিয়াছে।

বার্লিন হইতে প্রায় ১৭।১৮ মাইল দূরে পট্‌সডাম। এখানে একটি উদ্যান আছে ও উদ্যানমধ্যে প্রাসাদ। ইহাই ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাটের বাগানবাড়ী ছিল। ভূতপূর্ব্ব কাইসার মাসের মধ্যে প্রায় ২০ দিন এই বাগানবাড়ীতেই বাস করিতেন। প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটা ফোয়ারা দেখিলাম। ফোয়ারা অনেকেই দেখিয়াছেন, যথা—কোনটি পেন্সিলের ন্যায় মিহি ধারায় ২।৩ ফুট উচ্চে জল নিক্ষেপ করিতেছে, কোনটি বা তদপেক্ষা কিছু বড়। এ ফোয়ারা সে ফোয়ারা নহে; ইহা একটা অভূতপূর্ব্ব অমানুষিক ব্যাপার। ফোয়ারা হইতে যে জলস্তম্ভ উঠিতেছে, তাহার পরিধি অন্ততঃ ৯ ফুট; এই প্রকাণ্ড জলরাশি ভীমবেগে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিতেছে, উঠিয়া পড়িয়া একটা প্রকাণ্ড জলাশয়ে যাইয়া আবার ছুটিয়া আসিতেছে। এই স্থানেই একটা বাগান দেখিলাম, সেটি পঞ্চতল। দ্বিতল ত্রিতল গৃহই অনেকে জানেন। পটস্‌ডামে কাইসারের পাঁচতলা বাগান দেখিয়া আসিলাম। প্রত্যেক তলায় একখানি করিয়া বাড়ী ও তাহার চারিদিকে মনোহর উদ্যান। এই রাজবাটীর নিকটেই রাজবংশীয়দিগের মৃগয়ার জন্য অতি ভীষণ বন। এ বন এত ঘন যে, রাস্তা ভিন্ন সহজে যদৃচ্ছা গমন করা একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

সামর্থ্যের অপচয়।

সঞ্চিত জিনিষের অপব্যয় এক কথা, আর আবশ্যক জিনিষ যাহা সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তাহার সঞ্চয় না করা, স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ই সংসারের পক্ষে অহিতকর। সমাজ ও জাতির পক্ষে ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। অপব্যয়নিরত লোককে চলিত কথায় "লক্ষ্মীছাড়া" বলে। লক্ষ্মীছাড়ার শ্রেয়ঃ নাই। এত বড় বাঙ্গালীজাতিরও প্রায় সেই দশা ধরিয়াছে। সুতরাং এমনই ভাবে চলিলে এ জাতিরও আর শ্রেয়ঃ নাই।

পুরাকালে যখন এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ আইসে নাই, অন্ততঃ আমাদের কাছে যখন এ ভাবটা অজ্ঞাত ছিল, যখন জগতের অপর জাতিদের সহিত পাল্লা দিবার দুর্ভাগ্য ভারতের অদৃষ্টে উদিত হয় নাই; তখনকার কথা স্বতন্ত্র ছিল। তখন আমরা উন্নত ছিলাম কি অবনত ছিলাম, হীনবল ছিলাম কি অমিতসামর্থ্যশালী ছিলাম, সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। সে যুগের এখন হয় ত তুলনা হয় না। কিন্তু তাহার জন্য এখন আর অনুশোচনা বৃথা। এখন সময়ের স্রোতে গা ভাসাইয়া যদি পাঁচজনের সঙ্গে দাঁড়াইতে হয়, যদি চারিদিকের বিবিধ সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতিগত অপব্যয় ও অপচয়ের হিসাব যে আর না দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও উদাসীনভাবে কাটান চলে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় তথাকার লোক তাহাদের নিজ নিজ শক্তি পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করিয়াও মনুষ্যেতর জন্তু সকল ও পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, তাড়িত প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদি হইতে কিরূপ সঞ্চয় দ্বারা প্রতিনিয়ত আপন আপন সম্পদবৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা বিলাস-ব্যসনে নিরত থাকিয়া তাঁহাদের অনুকরণে সর্ব্বতোভাবে অভ্যস্ত হইলেও, প্রকৃতি ও অন্যত্র হইতে সম্পদ্ আহরণের দ্বারা সম্পদ্ বৃদ্ধি ত দূরের কথা, যে ভাবে আমাদের নিজস্ব সামর্থ্য হেলায় নষ্ট করিতেছি, তাহা অধিকতর বিস্ময়ের কথা!

জাতির পরম বল মানুষ, মানুষের সামর্থ্য বা শক্তিই শ্রেষ্ঠ বল। এই শক্তি দৈহিক ও মানসিক। আমাদের এই উভয় শক্তিই যে বিপুল পরিমাণে নষ্ট হইতেছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার সকল করায়ত্ত করিতে উৎসুক হইয়াছি; কিন্তু শক্তিহীন আমাদের কতটা শক্তি অপব্যয় হইতেছে, তাহা ভাবিয়া কায করিবার জন্য কয়জন আছেন? আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই বা কি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

নারী ও পুরুষ লইয়াই জাতি, তন্মধ্যে নারীর সংখ্যা মোটামুটি অর্দ্ধেক। এই অর্দ্ধেকের নিকট হইতে সংসারের নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থালী কায ভিন্ন আমরা আর কি পাইতে পারি বা কিছু পাইতে পারি কি না, সে বিষয় কিছু ভাবিবার আছে বা ভাবিতে হয়, তাহাই আমাদের যেন অজ্ঞাত। রমণী আমাদের ভিতরবাটীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সংসারের এক অংশের রাণী। কবির কথায় রমণী শোকের সান্ত্বনা, অসুখের শান্তি। রমণী আমাদের জননী। সম্পদে গৃহের লক্ষ্মী। কিন্তু ইহাই কি নারীর সর্ব্বস্ব, চরমকর্ম্ম? তাঁহাদের কাছে আমাদের বহিঃসংসারের কি কিছুই পাইবার নাই? পুরুষ যাহা পারে, নারীতেও যে তাহার অধিকাংশই সম্ভব, এ কথা একরূপ প্রমাণিত সত্য। আমরা সেই নারীশক্তিকে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করিয়া পুরুষের কর্ম্মময় জীবনের পার্শ্বে দাঁড়াইবার অবসর দিতে পারিলে আমাদের শক্তি কতটা বাড়িতে পারে, তাহা যেন আমাদের ভাবনার অন্তর্গত নহে। একটা জাতির অর্দ্ধেক সামর্থ্য এমনই ভাবে অপচয় হইতেছে।

আবার যে সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল হইতে ব্যবসায়ীরা এ দেশে আসিয়া আমাদের দেশের পণ্য, দেশের লোক, এমন কি, আমাদেরই অর্থ লইয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া স্ব স্ব দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে, সেই সময় আমরা আমাদের আশা, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের সর্ব্বস্ব আমাদের তরুণ যুবকগণের সমস্ত শক্তিটুকু সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে বিদেশীয়ের চরণে

উৎসর্গ করিতেছি। আমাদের দেশে অর্থ যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে একটা বড় অংশ সরকারের হাত-চিঠাতে কর্জ্জ দিয়া, না হয় বিদেশী বণিকগণের কারবারে শেয়ার কিনিয়া তৎপরিবর্ত্তে সামান্য সুদ বা লাভাংশ পাই-য়াই পরিতৃপ্ত হইতেছি। এই ত আমাদের অবস্থা, অথচ এই আমাদেরও এখন জীবন যাপন করিতে সব জিনিষই দরকার। আমরা শিক্ষিত, তাই নিজের অতি আবশ্যক কাযও বুঝি না; কিন্তু হাজারিবাগ, নাগপুর, রাঁচি প্রভৃতি স্থানের ওঁরাও, ধাঙ্গড় প্রভৃতি বা উড়িষ্যার দরিদ্র উড়িয়া-গণ যাহারা আমাদের দাসের কায করিতে আসিয়াছে, তাহারাও বুঝে। তাহারা তাহাদের অভাবের জন্যই এখানে আইসে। বৎসরের মধ্যে আট দশ মাস এখানে কায করিলেও, আবাদের সময় তাহারা দেশের চাষই আগের কায মনে করিয়া চলিয়া গিয়া সে কায করিয়া আইসে। তাহাদের অভাব, তাহাদের দারিদ্র্য যে আমাদের দারিদ্র্য, এমন কি, সামান্য গৃহস্থদের তুলনায় অধিক, তাহা নহে। আমরা সভ্যতার উপর দুই বেলা পেটভরা আহার পাই না, তাহারা অসভ্য বর্ব্বরতার উপর তুলনায় আমা-দের অপেক্ষা সে অভাব হইতে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত।

সারা জাতির মধ্যে ধনী ও অতি দরিদ্রের কথা না হয় বলিলাম না, বালক ও বৃদ্ধের কথাও ছাড়িয়া দিলাম। বাকি রহিল মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ ঘরের যুবকগণ। তাহারাই আমাদের বল, আমাদের প্রধান ভরসাস্থল, জাতির সার সামগ্রী। এ হেন যুবকদের উপর দাসত্ববৃত্তির দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া আমরা আমাদের কতটা সামর্থ্যই না নষ্ট করিতেছি! আমরা কত শত উৎকৃষ্টমস্তিষ্ক আমাদের ত্রুটিতে, আমাদের বিবেচনার ভুলে বিদেশীয়ের ভাগ্যমন্দিরে বলি দিতেছি! কত অমূল্য শক্তি শক্তিধর জাতির কর্ম্মশালায় পড়িয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাই-তেছে! বাঙ্গালীর ছেলেরা পারে না কি? বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র উল্লিখিত যুবকদের সর্ব্ব-প্রকার শক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে নিয়োজিত করিতে পারিলে আমাদের কিসের অভাব থাকে?

বাঙ্গালীর সর্ব্বজনবিদিত জাতিগত বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি-গত স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতা অভ্যুদয়ের পথ ছাড়িয়া ক্রমে এমন ম্লান-ভাবাপন্ন হইতেছে কেন? হাজার বৎসরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্প, সাহিত্যের কথা যে জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, যাহার শিল্প সুদূর পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিশেষ লোভের সামগ্রী ছিল; বাণিজ্যবিস্তার ব্যপদেশে বা দিগ্বিজয়ে যে জাতি জলে স্থলে অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই, যে জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য সাত শত বৎসরের পরাধীনতায়ও একেবারে তিরোহিত করিতে পারে নাই, এখনও সময় ও সুযোগ পাইলেই যে জাতি আপনার কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হয় না, যাহার সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, জাতীয়তা বহু ঘাত প্রতিঘাতের পর আজিও বিলুপ্ত হয় নাই, যে জাতির বিদ্যাবুদ্ধির মহিমা আজিও ভারতাকাশে দীপ্ত-তারকা-সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে,—সে জাতির এতটা দুর্গতির কারণ কি?

এখনও বাঙ্গালায় রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের মত মহাশক্তিশালী পুরুষের উদ্ভব সময় সময় দেখা যাইলেও, জাতির সমষ্টি-জীবনে যে মহা অধঃপতন হইতে বসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবে কে? বাঙ্গালার নদ-নদী আজও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। বাঙ্গালার আকাশ এখনও আবশ্যক বারি দান করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করে না। বাঙ্গালার মাঠে আজও আমা-দের খাদ্যশস্য ও পরিধেয়ের উপকরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের মা মেয়েদের লজ্জানিবারণের একটু বস্ত্রের জন্য, জল-পান বা ভোজনপাত্রের জন্য, স্ত্রীলোকদের হাতে পরি-বার একগাছি রুলির জন্য, বিনামা প্রস্তুতের চামড়ার জন্য পরের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকি কেন? আমাদের সব থাকিতে আজ আমরা পরান্নভোজী, ভিক্ষাজীবী দাসের জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি! এ কি অবসাদ, নিদ্রা না মরণের পূর্ব্বের অবস্থা? মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মত জাতিরও বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে; ইহা কি তাহাই?

জাতিগত না হইলেও যে ভাবে বহু দিকে বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের বিকাশ এখনও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা একটা অবসাদ বা নিদ্রা বলি-য়াই মনে হয়। যদি বাঙ্গালীর নাম ইতিহাসের লুপ্ত পরি-চ্ছেদের মধ্যে মিশাইয়া যাইতে দিতে প্রবৃত্তি না হয়, এমন কি, শুধু বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে এ ব্যাধির বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন। প্রথম, সত্যকার বাঁচিবার উপায় স্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে। দেশের বিজ্ঞ ভিষক্‌গণ হয় ত

বড় রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসার চেষ্টায় নিমগ্ন আছেন, কিন্তু উপসর্গগুলির দিকে আপাততঃ লক্ষ্য না করিলে, ক্ষুদ্র বিষফোড়াটিকে উপেক্ষা করিলে, বড় রোগের চিকিৎসার যে আর সুযোগই পাওয়া যাইবে না! ঔষধ ও পথ্যের দ্বারা অতিরিক্ত বল বা দৈহিক সৌন্দর্য্য সঞ্চয়ের চেষ্টার পূর্ব্বে, সঞ্চিত শক্তিক্ষয় হইতে না দেওয়া এবং সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি না, দেখি না, দেখিবার চেষ্টা করি না, আমাদের এই বাঙ্গালায় কি অসীম বল হেলায় নষ্ট হইতেছে। বল বলিতে জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল, দেহবল ইহাই প্রধানতঃ বুঝায়। আমরা ধনবলহীন, কিন্তু প্রয়োজন বা ইচ্ছার অভাবে ক্রমে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইলেও আর কোন বলে আমরা অপরের অপেক্ষা ছোট নহি।

আমাদিগকে এখন সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, যাহার দ্বারা কোন মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, আমাদের কাছে তাহা অসম্ভব থাকিবে না। এই সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক, জাতির সার রত্ন যুবকদের অমূল্য জীবন, অফিসের টেবলে পাখার তলায় হেলায় নষ্ট হইতে দিলে চলিবে না। আমাদের যাহা কিছু সামান্য অর্থ বিদেশীয় কোম্পানীর অতি সামান্য লাভাংশ বা সুদের প্রত্যাশায় শেয়ার বা লোনের হাতচিঠায় নিয়োগ করিয়া যথেষ্ট মনে করিলে চলিবে না। দৈন্যের কথা, যাহা কিছু ত্রুটি তুচ্ছ করিয়া যুগগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের অমরগান স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র আমাদের সংহতিবল মনে রাখিয়া উদ্দামগতিতে অপরিসীম অধ্যবসায় ও উৎসাহে জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই নিদ্রালস জাতির দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া, আজ বৃদ্ধ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সারাজীবনের সাধনাকে সরাইয়া সেই ক্ষীণদেহে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অক্লান্ত আয়াসে যে বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই একই কথা বলিতেছে না কি? বাঙ্গালীর অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান জাতি জগতে বিরল, বাঙ্গালীর সামর্থ্যেরও অভাব নাই। আলস্য-ঔদাস্যাদিতে ডুবিয়া সেই সামর্থ্যের অপব্যয়ই আমাদের এই অন্নহীনতা,বস্ত্রহীনতা,এক কথায় এই সর্ব্বস্বহীনতার একটি প্রধান কারণ। অপরে কোন দিনই কিছু দিবে না; আপনি অর্জ্জন করিতে হইবে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

বসন্ত-সমাগমে।

আবার কাব্য-লক্ষ্মী সাদরে
　　কোকিলকণ্ঠে ডেকেছ মোরে;
মলয় হরষে আবার আমার
　　পরশ দিয়েছ অঙ্গ ভ'রে।

চারুকিসলয় আঙুল নাড়িয়া
ডাকিলে আমায় হাতছানি দিয়া,
চাঁপার গন্ধে চমকায়ে দিলে
　　ছিলাম কিসের আবেশ-ঘোরে।

অন্তরে আজ চেনা মন্তরে
　　পড়িয়াছে পুনঃ আকুল সাড়া,
অকারণে বুক করে দুরু দুরু
　　উড়ু উড়ু মন উদাস পারা।

ভাল লাগে নাক শুধু কায কায
হিসাব-নিকাশ দূরে গেল আজ,
কে যেন ভিতরে প্রবেশ মাগিছে
　　দাঁড়ায়ে রয়েছে হিয়ার দোরে।

অকারণে আসে নয়নে অশ্রু
　　অকারণে আসে অধরে হাসি,
কত দিন যেন হেরিনি আকাশ
　　কত দিন যেন শুনিনি বাঁশী।

বন ম'র-ম'র নদী কলতান
চাঁদের জ্যোছনা বিহগের গান,
নবীন মাধুরী বিলায়ে, আমার
　　মন-প্রাণ সব নিতেছে হ'রে।

আজিকে জননী বড় লাজ দিলে
　　কেন দিলে মোর আবেশ টুটে?
বলিবার মত কোন' কথা নাই
　　ছন্দ বিরহে কাঁদিয়া উঠে।

নাহি কোন গান গাহিবার মত
গুণ গুণ শুধু করি অবিরত,
চ'ষি মালঞ্চ বুনিয়াছি পাট
　　পূজিব তোমায় কেমন ক'রে?

শ্রীকালিদাস রায়।

সংস্কৃত-চর্চ্চা।

আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সব চাইতে যা' প্রয়োজন, সে হচ্ছে সংস্কৃত-চর্চ্চা।

এ কথা শুনে অনেকে হয় ত চম্‌কে উঠবেন, বিশেষত: আমার মুখে।

আমি যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নই, তা আমার ভাষাতেই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আমি যে বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধুভাষার বিরোধী, তা ত সর্ব্বলোকবিদিত।

তবে সাধুভাষার বিরোধী হওয়ার অর্থ সংস্কৃতভাষার বিরোধী হওয়া নয়। সাধুভাষা ও সংস্কৃতভাষা এক ভাষা নয়। সুতরাং একই লোকের মনে সংস্কৃতভাষার প্রতি অতি শ্রদ্ধা ও সাধুভাষার প্রতি ততোঽধিক অশ্রদ্ধা, একসঙ্গে দিব্যি বাস করতে পারে।

আমি বহুকাল পূর্ব্বে বলেছি যে, যা'কে আমরা শ্রদ্ধা করি, তারই যে শ্রাদ্ধ কর্‌তে হবে, ভগবানের এমন কোনও নিয়ম নেই। আর সাধুভাষায় যা নিত্য করা হয়, তার নাম হচ্ছে সংস্কৃতের শ্রাদ্ধ।

আমাদের মুখের কথা আধা-বাঙ্গলা, আধা-ইংরাজী—ফলে উক্ত ভাষা বাঙ্গলাও নয়, ইংরাজীও নয়। সাধু-ভাষাও তেমনি আধা-বাঙ্গলা আধা-সংস্কৃত—অতএব তা বাঙ্গলাও নয়, সংস্কৃতও নয়।

এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে, কথোপকথনে আমরা যতদূর যথেচ্ছাচারী হয়েছি,—লেখায় ততদূর যথেচ্ছাচারী হবার অধিকার আমাদের নেই। ওরকম অধিকারের মূল কি জানেন? সকল ভাষায় সমান অনধিকার।

আর সবাই জানেন যে, অনধিকারচর্চ্চা করা, "প্রবৃত্তি-রেষা নরাণাং"। অতএব এ বিষয়েও "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

আমার বিশ্বাস যে, বিধিমত সংস্কৃত-চর্চ্চা কর্‌লে,—যা করা অতি সহজ, অর্থাৎ যা করা কিছু না করারই সামিল; তা কর্‌বার প্রবৃত্তি আমাদের আপনা হতেই কমে আস্‌বে।

সংস্কৃতশিক্ষা ক্লেশসাধ্য, অতএব সে শিক্ষার ফলে আমরা মনের সংযম ও শক্তি যুগপৎ দুই-ই লাভ কর্‌ব।

সংস্কৃত পলিটিকস্ নয় যে, তা'তে মানুষমাত্রেরই জন্ম-সুলভ সমান অধিকার আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা কর্‌তে হ'লে যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের চর্চ্চা আমাদের ত্যাগ কর্‌তে হবে, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনও ভুলেও বেরবে না।

সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং অতীতের দোহাই দিয়ে বর্ত্তমানকে প্রত্যাখ্যান, আর অতীত জীবনের দোহাই দিয়ে বর্ত্তমান জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা একই কথা।

তার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাক্‌লে, আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাণের সন্ধান পাব না, সে সাহিত্য আমাদের কাছে মৃত শব্দরাশি মাত্র থেকে যাবে; যেমন টোলের পণ্ডিতদের কাছে চিরকাল তা রয়ে গিয়েছে।

অপর পক্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাণে অনুপ্রাণিত না হ'লে, য়ুরোপীয় সাহিত্যও আমাদের কাছে মৃত শব্দরাশি মাত্র হয়ে থাক্‌বে। ও হবে শুধু মুখস্থ করার বিদ্যা—যেমন হয়েছে একালের কলেজের B. A., M. Aদের কাছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশে দু'টি মারাত্মক ভুল বিশ্বাস আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ও বস্তু অমর; অতএব তা আজও পূরো বেঁচে আছে। অপর পক্ষে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, ও সাহিত্যের কস্মিন্‌কালেও জীবনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না,—অতএব পুরা-কালেও ও সাহিত্য মৃত ছিল।

ঐতিহাসিক হিসেবে ও দু'টিই সমান মিথ্যা কথা। এককালে ও সাহিত্য সম্পূর্ণ জীবন্ত ছিল; কেন না, মানব-জীবনের সঙ্গে উক্ত সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আজও যে তা একেবারে মরেনি, তা'র কারণ মানসিক সৃষ্টি কখনই মরে না। ও সৃষ্টির জন্মের তারিখ আছে, কিন্তু মৃত্যুর তারিখ নেই। কেন না, মন, প্রাণের অতিরিক্ত।

যদি বলেন যে, দেশে ত সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে, স্কুল-কলেজে ত ও ভাষা পড়ান হয়।

তার উত্তর—আমাদের স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শেখানো হয় শুধু একটা ভাষা হিসাবে।

আমার মতে ভাষাশিক্ষাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। ভাষাশিক্ষার সার্থকতা তাকে উপায় হিসাবে গণ্য করায়।

তা'র পর সংস্কৃত ভাষাকে একটি মৃতভাষা হিসাবেই শেখানো হয়। সংস্কৃত-সাহিত্য জীবন্ত, কিন্তু সংস্কৃতভাষা যে মৃত, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। সংস্কৃত-সাহিত্যকেও যে স্থূলদর্শী লোক মৃত মনে করে, তার কারণ সংস্কৃতভাষা মৃত।

অবশ্য, মৃত-ভাষার জ্ঞানলাভ করারও সার্থকতা আছে, কিন্তু সে শুধু ভাষার অস্থিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে, যাঁদের কাম হচ্ছে তা'র শবচ্ছেদ ক'রে তা'র গঠনের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা।

কিন্তু অধিকাংশ লোকের যখন মৃতদেহ disscet কর্‌বার প্রবৃত্তিও নেই প্রয়োজনও নেই, তখন সংস্কৃত-সাহিত্যের মৃতদেহের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার স্বসার কি?—এই কারণেই অধিকাংশ লোকের পক্ষে সংস্কৃত-চর্চ্চা প্রেয়ও নয় শ্রেয়ও নয়।

আমার মতে সংস্কৃত-চর্চ্চার অর্থ হচ্ছে—শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ ক'রে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা উক্ত শিক্ষার বলে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবেশলাভ কর্‌বার জন্য। আমাদের অতীতে মনের ভাণ্ডারে ঢোক্‌বার চাবি।

বলা বাহুল্য যে, চাবি জিনিষটে আঁচলে বেঁধে বেড়াবার জন্য তৈরী হয়নি, তা'তে অঞ্চলের যতই শোভাবৃদ্ধি হোক্ না কেন।

আর ও চাবি দিয়ে আমরা আমাদের অতীতের বন্ধ ঘর খুল্‌তে জানি নে অথবা চাইনে ব'লে, আমাদের অতীত সম্বন্ধে যে যা বলে, আমরা তাই বিশ্বাস করি। কখনও ভাবি তা'র ভিতর শুধু ভূত-প্রেত আছে, কখনও ভাবি আছে সেখানে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর—যা একবার হাতাতে পার্‌লে আমরা অনন্তকাল না খেটে মনোরাজ্যে নবাবী কর্‌তে পার্‌ব।

সংস্কৃত-সাহিত্য যে আমাদের মোটেই পড়ানো হয় না, তা নয়। আমাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে সংস্কৃত-কাব্যের সঙ্গে।

কাব্য-চর্চ্চা করারও অর্থ যে শিক্ষালাভ করা, এ জ্ঞান দেখতে পাই বহু লোক হারিয়ে বসে আছেন। আর অনেকে কাব্য-রস উপভোগ করার অর্থ বোঝেন, তার কোমল-কান্ত পদাবলীতে শ্রবণ তৃপ্ত করা। আর বহু কাব্যামোদী লোকের যে "বিলাসকলাসু কুতূহলং" নেই, এমন কথাও বলা যায় না।

এখন আমার কথা হচ্ছে, আমাদের পক্ষে আপাততঃ ভাববিলাস ও কলাবিলাসের লোভ একটু সংবরণ কর্‌তে হবে—এবং তা কর্‌বার প্রবীণ উপায় হচ্ছে সংস্কৃত-শাস্ত্রের চর্চ্চা করা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অথবা মেধাতিথির মনুভাষ্যের স্পর্শমাত্র আমাদের তন্দ্রাসুখ যে ভেঙ্গে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাগরণ জাগরণ ব'লে আমরা দু'বেলা চীৎকার করি; আর আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত-শাস্ত্রের মত জীবন-কাঠি আমাদের হাতে আর দ্বিতীয় নেই। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার সংস্কৃতের মত দ্বিতীয় শাস্ত্র নেই। আর সে শাস্ত্রের ভাষ্যকাররা আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে পদে পদে ব্যায়াম করাবেন।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা মহা দোষ হচ্ছে এই যে,—সকলেই তা লেখে, এবং তা'র মধ্যে অনেকেই অনর্থক বেশী বকে। "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।" এ কথা বহু য়ুরোপীয় আচার্য্যদের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। ইকনমিক্‌স্ পলিটিক্‌স্ প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজীতে এ যুগের খুব কম বই আছে, যার একশ' পাতার ভিতর পঁচাত্তর পাতা ছেঁটে দিলে তার অঙ্গহানি হয়। আর জার্ম্মাণ লেখকদের এমন পুস্তক নেই, পুস্তিকা কর্‌লে যার শ্রীবৃদ্ধি না হয়। উক্ত সাহিত্যের প্রভাবে আমরাও মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছি। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাচার্য্যরা গ্রীকদের মত চিত্তবৃত্তিকে সংহত, অতএব বাক্যকে সংক্ষিপ্ত কর্‌তেও জান্‌তেন। সংস্কৃত-চর্চ্চা কর্‌লে আশা করি আমাদের বাচালতা কিঞ্চিৎ কমে আস্‌বে।

সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার উদ্দেশ্য, সে শাস্ত্রের মত গ্রাহ্য করা নয়। মানব-জীবনের এক যুগে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় যে মত সৃষ্ট হয়েছিল, আর এক যুগে সামাজিক আর এক অবস্থায় সে মতের কোনও ব্যবহারিক সার্থকতা নেই। মনের সন্ধান না নিয়ে, মতের মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করায় আর মাথার সন্ধান না নিয়ে টিকির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করায় একই বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়।

কিন্তু ঐ সব মতের পিছনে যে মন আছে, তা অমর। অতএব আমি যেরূপ সংস্কৃত-চর্চ্চার পক্ষপাতী, তা'র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মনকে ভারতের আর্য্য-মনের সঙ্গে সম্পর্কে আনা, সংস্কৃত মন থেকে আমাদের বাঙ্গালী মনের প্রদীপ ধরিয়ে নেওয়া। সে মনের চিরন্তন অনুশাসন হচ্ছে :—

"সত্যান্নপ্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।"

বলা বাহুল্য, সকল শিক্ষার সার কথা উক্ত অনুশাসনের মধ্যে বজ্রকঠিন হয়ে রয়েছে। যুগে যুগে অবশ্য সত্যের অর্থ, ধর্ম্মের অর্থ, কুশলের অর্থ, বিভূতির অর্থ ও বিদ্যার অর্থ মানুষের অন্তরে নব নব আকার ধারণ করতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ যদি প্রমাদগ্রস্ত হ'তে না চায়, তা হ'লে সে উক্ত অনুশাসন অমান্য করতে পারবে না; কেন না, ঐ হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, এবং আমার বিশ্বাস সংস্কৃত-সাহিত্য এ আদর্শ কখনও বিস্মৃত হয় নি। অনেকে মনে ভাবতে পারেন যে, এ আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ, আধ্যাত্মিক জীবনের নয়; এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ যা'র বিশেষ সাধনা করেছিল, সে হচ্ছে জীবন নয়, মোক্ষ। এর উত্তরে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। এ সকল উপনিষদেরই অনুশাসন।

শঙ্কর বলেন, "অনুশাসনশ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থাৎ।" এখন আমাদের পৌরুষের যে সংস্কার আবশ্যক, সে কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

অতএব এ অনুশাসন আমাদের মনে বসা দরকার, আর আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের সম্যক্ চর্চ্চা করলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শও আমাদের মনে ব'সে যাবে, ও জীবনের উপর সেই সংস্কৃত মনের কিছু না কিছু প্রভাব থাকবেই থাকবে। আর কিছু না হোক্, Sentimentalism নামক হৃদ্‌রোগ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব। সংস্কৃত শাস্ত্রের তুল্য, ও রোগের অপর অব্যর্থ ঔষধ আমার জানা নেই; এ ঔষধ অবশ্য একটু কড়া।

আর আমাদের ধাত থেকে Sentimentalism বহিস্কৃত না হ'লে, আমরা কাব্যকলারও মর্ম্মগ্রহণ করতে পারব না। দুর্ব্বল মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারে না, কেন না, সুন্দর হচ্ছে শক্তির পূর্ণ পরিণতি। কাব্যকলা উপভোগ করা ও মিষ্টান্নভোজন একই ক্রিয়া নয়।

কাব্য ও কলাসৃষ্টির অন্তরে ও দুয়ের স্রষ্টার যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দের আস্বাদ পাওয়ার নামই কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করা। এ রসাস্বাদ করবার জন্যও পাঠকের কবির অনুরূপ সাধনা থাকা চাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে—কিন্তু তা'র ফলে আমাদের অধিকার নেই। এ অতি কঠিন মত। কিন্তু তাই ব'লে যদি কেউ মনে করেন যে, ওর উল্টোটাই সত্য, অর্থাৎ—ফলে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মে নেই,—তা হ'লে তিনি সংসার-বিষবৃক্ষের অন্যতম অমৃতোপম ফল কাব্যের শুধু গাত্র লেহনই করবেন, তা'র অন্তরের রস কখনো আস্বাদন করতে পারবেন না। কোনও জিনিষে দাঁত বসাতে পারে না, শুধু শিশু ও বৃদ্ধ।

অতএব আমরা যদি আমাদের ভাববিলাস থেকে মুক্ত হ'তে চাই, তা হ'লে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতশাস্ত্রের বিধি-মত চর্চ্চা করা দরকার; কেন না, তাতে কোনরকম মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিলাসের প্রশ্রয় দেয় না, মানুষকে শুধু সাধনা করতে শেখায়। আর সেই সঙ্গে শেখায় যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আর যে জন্যেই আসুক, বায়স্কোপ দেখতে আসে নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অবৈতনিক আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি।

বাঙ্গালাদেশে এক কালে ব্যায়ামের বিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং পূজাপার্ব্বণে ও মেলা প্রভৃতিতে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতিযোগিতাও হইত। তখন বাঙ্গালায় শারীরিক শক্তির যেমন অনুশীলন ছিল, তেমনই আদরও ছিল। সে অবস্থা দূর হওয়া আমাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক।

আজ কোথাও বাঙ্গালীকে ব্যায়ামে—শারীরিক শক্তির অনুশীলনে রত দেখিলে আমরা পরম আনন্দ লাভ করি। তাই বাঙ্গালী কুস্তীগীর "গোবরের" গৌরবে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাই "ভীম ভবানীর" অকাল মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, যে জাতি রেলে, ষ্টীমারে আপনার কন্যা, ভগিনী, পত্নীকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে জাতির প্রথম প্রয়োজন—শারীরিক শক্তির সাধনা।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয় "অবৈতনিক আদর্শ ব্যায়াম সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতার অন্তর্গত মণ্ডল-ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, সিমলা, বহুবাজার প্রভৃতি বিশিষ্ট পল্লীতে; হাওড়া জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া, বালি, গরলগাছা, শিবপুরে; ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগর, বেলঘরিয়া, ডাকুরিয়া প্রভৃতি গ্রামে এবং যশোহর, বারাণসী, হায়দ্রাবাদে আচার্য্য মহাশয়ের সুশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের তত্ত্বাবধানে ইহার বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সমিতির একটি প্রধান বিভাগ গৌরহরি বাবুর প্রধান শিষ্য ডাক্তার বামাচরণ মিত্রের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বেনিয়াটোলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সগৌরবে চলিয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক স্থানে ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া এই সমিতি বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছে। মাষ্টার বসন্ত এই সমিতির এক জন উদীয়মান ছাত্র। তাহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। এই বয়সে বসন্ত যে সকল ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে এত অল্প বয়সে একত্র এতগুলি ক্রীড়া আর কেহ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ তাহার একপদোপরি বংশদণ্ডের উপর বালক ক্ষীরোদের অত্যদ্ভুত ক্রীড়া বিশেষ প্রসংশার্হ।

মাষ্টার বসন্তের একপদোপরি মইয়ের খেলা।
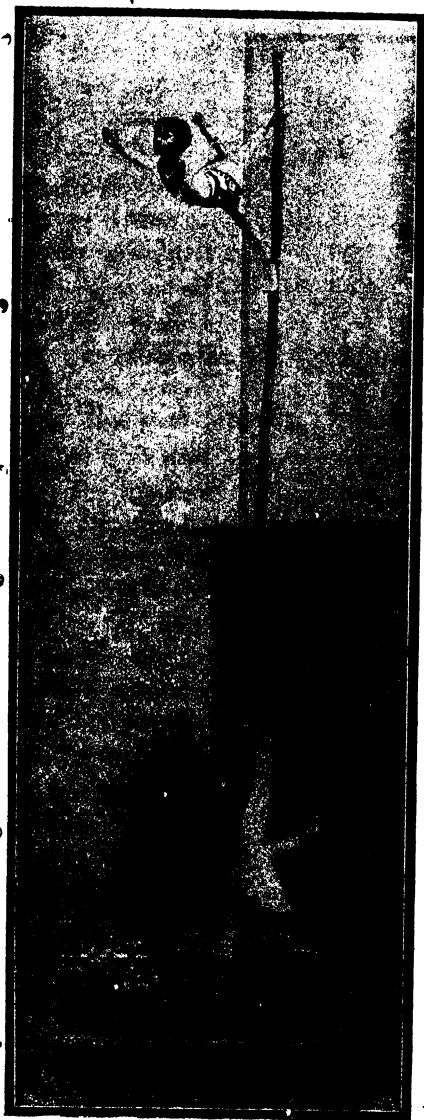
মাষ্টার বসন্তের
একপদোপরি অদ্ভুত বংশক্রীড়া।

মাষ্টার বসন্তের ললাটোপরি দ্বাদশবর্ষীয়
ক্ষীরোদলালের শরীরাবর্ত্তন।

কবি শেখ সাদী ও তাঁহার বুস্তাঁন কাব্য।

বঙ্গদেশের ন্যায় দ্রাক্ষা-খর্জ্জুর-হেনা-গোলাপ-কুঞ্জ-শোভিত, বুলবুল-ঝঙ্কৃত বিশ্বের রম্য উদ্যান পারস্যদেশও এক সময়ে কবি-বুলবুলের প্রাণোন্মাদক অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ন্যায় পারস্যদেশেও এত অধিক-সংখ্যক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাহার কবি-তালিকা প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পণ্ডিতরা বলিয়াছেন,—"কবিত্ব নরের দুর্লভ বস্তু।" যেখানে কবির সংখ্যা অধিক, সেখানে নরের দুর্লভ "কবি-যশঃ" লাভ করা আরও কঠিন। পাঠান-শাসনকালের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এই সময়ে বঙ্গদেশের সাহিত্য-প্রতিভার জাগরণ হয়। এ জাগরণের শুভ মুহূর্ত্তে জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অসংখ্য কবির বীণার ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ মুখরিত হয়; কবি-প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বহু কবির অদৃষ্টে "নর-দুর্লভ-কবি-যশঃ" অর্জ্জন ঘটে নাই। পারস্য-দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের মত পারস্যদেশের কবিগণেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

কবি-প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে পারস্যের যে সকল ভাগ্যবান্ কবি কবি-যশঃ অর্জ্জন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা,—(১) যাঁহাদের কবিতা ভাষান্তরিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; (২) যাঁহাদের কবিতা কেবল-মাত্র স্বদেশেই আবদ্ধ। প্রথম দলের কবিগণের মধ্যে শেখ সাদী, হাফেজ, ওমরখৈয়ম, জলালুদ্দিন রুমি, ফির্দৌসী, নুরুদ্দিন জামী প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের কবিতা পৃথিবীময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে পারস্যের কবিশ্রেষ্ঠ শেখ সাদীই সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্। তাঁহার কাব্য যেরূপ বহুল প্রচারিত, যথেষ্ট অধীত ও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত, পূর্ব্বোক্ত প্রথম দলের কবিগণের কবিতা সেরূপ নহে। পারস্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত সাদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিতনামা হইতে পারেন নাই। কবির যশঃ কেবলমাত্র তাঁহার স্বদেশেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্যভাষার আলোচনা হয়, সেই দেশেই তাঁহার যশোবিস্তৃতি ঘটিয়াছে। *

য়ুরোপের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রোমের অধঃপতনে ছয় শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত য়ুরোপ অসভ্যতা ও অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ঠিক সেই সময়ে আরব্য ও পারস্যের সাহিত্য-বিজ্ঞান শিল্প-কলার চরম বিকাশ ও উন্নতি হয়। পারস্য কবিগণের বীণার মধুর ঝঙ্কারে সমগ্র পারস্য মুখরিত হয়; পারস্যের কবি-প্রতিভার জাগরণের সময় মহাকবি শেখ সাদী প্রতি-ভার মূর্ত্ত অবতাররূপে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান। রোম-নগরীর অবনতির পর বিরাট গরিমাময় গ্রীক সাহিত্যকে আদর্শ করিয়া, যে সময় য়ুরোপে প্রণষ্ট শিল্প-সাহিত্য-কীর্ত্তির উদ্ধারের সূচনা হয়,—যে সময় কবি দান্তে সবেমাত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, কবি চশার সবেমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রথম কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় —নবগঠিত য়ুরোপীয় সাহিত্যের সূচনার শুভ মুহূর্ত্তে মহা-কবি শেখ সাদী জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দার্শনিকত্ব ও কবিত্বের উচ্চতম শিখরে সমাসীন। কবি দান্তে তাঁহার স্বর্গ ও নরক বর্ণনার মধ্যে য়ুরোপের সাময়িক ধর্ম্ম ও চিন্তার ধারা প্রকট করেন; কবি দান্তে বর্ণিত চিত্রের সহিত মহাকবি শেখ সাদীর সদ্ভাব পূর্ণ চিত্রের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পারস্য-সাহিত্য কত উন্নত, সংস্কৃত ও জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে কিরূপ মণ্ডিত।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই মহাকবি শেখ সাদীর কাব্য ভাষান্তরিত হইয়াছে। প্রাচ্যভাষাবিৎ জার্ম্মান-পণ্ডিতদ্বয় অধ্যাপক ডাক্তার ই, ডি, স্যাচু (Prof. E. D. Sachu), অধ্যাপক ডাক্তার হারম্যান এথ্ (Prof. Harman), প্রাচ্যভাষাবিৎ ফরাসী পণ্ডিতযুগল

* Literary History of Persia, vol. II. 1906.

ডি, হাঁরবেলট (D. Herbelot) ডি সেসী (Antony Slvester De Sacy), ইংরাজ মনীষী চার্লস্ রিউ (Charles Rieu). ডাক্তার এ, স্প্রেঙ্গার (Dr. A. Sprenger M. D.), সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones), মেজর জেনারেল সার উইলিয়ম গোর আউসূলী (Major General Sir H. William Gour Ausely), অধ্যাপক ব্রাউন (Prof. E. G. Brown), এডমণ্ড গস্ (Edmond Gosse), অধ্যাপক নিকল্সন্ (R. A. Nicholson) ও ই, ডি, রস (Sir E D Ross) প্রণীত আরব্য ও পারস্যভাষার পাণ্ডুলিপি-তালিকা, পারস্যভাষা ও সাহিত্য বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, কবি শেখ সাদীর কাব্য লাতিন, জার্ম্মাণ, ফরাসী, পোল, রুষ ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায়ও কবির কাব্যের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ অসাধারণ অনুবাদ ও প্রচার-সৌভাগ্য পারস্য কবিগণের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই।

শেখ সাদী সর্ব্বশুদ্ধ ২২খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ৬খানি রিশাল্লা (প্রবন্ধ পুস্তিকা), ৭খানি গজল, ১খানি রোবাইয়াৎ (চতুষ্পদী কবিতা), ১খানি মুফরিদায়াৎ (দ্বিপদী কবিতা), গুলিঁস্তা ও বুস্তাঁন প্রভৃতি ৯খানি কাব্য। কবির রচনাবলীর মধ্যে প্রতিভার চরমোৎকর্ষ ও প্রচার হিসাবে গুলিস্তাঁ প্রথম ও বুস্তাঁন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রলব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পর্য্যটনকালীন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন ও ইহাদের সহিত ঈশ্বরানুরাগ, পবিত্র রুচি কবির আজন্ম-প্রকৃতিগত ছিল বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত কাব্য রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। বাল্যে কবির তরুণ-হৃদয়-ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরানুরাগ ও জ্ঞানান্বেষণের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, পরে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হয়। গুলিস্তাঁ কবির জীবন-বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ও বুস্তাঁন ইহার সুরভিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প। কবির জগদ্বিখ্যাত কাব্য বুস্তাঁন-পুষ্পের সৌরভ বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর চারিধার আমোদিত করিয়াছে।

শেখ সাদী।

কবি বুস্তাঁন কাব্যের জন্মেতিহাস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অনেক দেশ পর্য্যটন ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে

কাল কাটাইয়া আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি। প্রিয় বন্ধুগণের নিকট জগৎরূপ বাগান হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে ভাবিয়া, আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিলাম,—"প্রত্যেক পর্য্যটক তাহার বন্ধুগণের প্রীতির জন্য মিশরের মধুর ইক্ষু উপহার আনিবে। আমার নিকট যদিও সুমিষ্ট ইক্ষু নাই, তাহা হইলেও ইক্ষু অপেক্ষাও অধিকতর মধুর এবং সদ্ভাবপূর্ণ কাব্য (বুস্তাঁন) আছে। আমি যে সুমিষ্ট দ্রব্য আনিয়াছি, যদিও তাহা ভক্ষণ করা যায় না, তথাপি সত্যান্বেষীরা পরমশ্রদ্ধাভরে ইহা গ্রহণ করিবেন।" করিলাম। হিজরীর ৬৫৫ বৎসরে এই ঐশ্বর্য্য-রত্নাগার মুক্তারূপ বাগ্মিতায় পূর্ণ হয়।"

যে যুগে কবি তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ কাব্য বুস্তাঁন ও গুলেস্তাঁ রচনা করেন, সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। তখনও প্রতীচ্যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হয় নাই ;—কবি শেখ সাদীর রচনাবলী-নিহিত স্বর্গীয় ভাব বুঝিবার মত জ্ঞান য়ুরোপের ছিল না।* গুলেস্তাঁ কাব্যকে কবি যেরূপ নন্দন-কাননের মত অষ্টম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাসাদরূপ বুস্তাঁন কাব্যকেও মুক্তারূপ বাগ্মিতায় পূর্ণ করিয়া দশ দরজারূপ দশম অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ;—
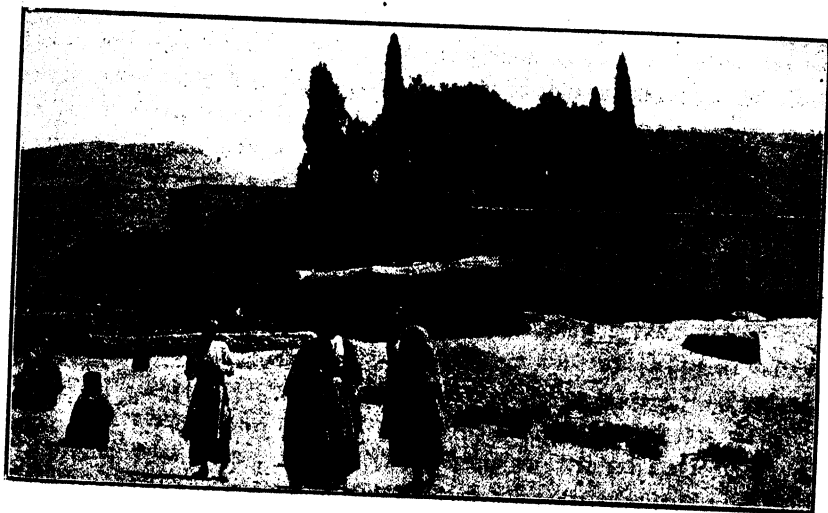
শেখ সাদীর সমাধি-ক্ষেত্র। [বেঙ্গল পাবলিসিং হোমের সৌজন্যে।

এই সময় হইতে পর্য্যটক সাদী মুনি-ঋষির মত জ্ঞানী হইয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানবজাতিকে কর্ম্মক্ষেত্র-লব্ধ জ্ঞান ও নিজ অভিজ্ঞতা বিতরণ করেন। পাছে তাঁহার উপদেশ ঔষধের মত তিক্ত হয়, সেই জন্য কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-উপদেশ শর্করা-মিশ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। বুস্তাঁন কাব্য রচনার সমাপ্তি-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন,—"ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদরূপ বুস্তান কাব্যকে শিক্ষাপূর্ণ দশ দরজারূপ দশম অধ্যায়ে বিভক্ত

* When we consider indeed, the time at which it was written, the first half of thirteenth century a time when gross darkness brooded over Europe, at least darkness which might have been, but alas ! was not felt, the justness of many sentiments and the glorious vews of the divine attributes in it are truly remarkable.—Prof. Eastwick.

(১) ন্যায়বিচার, (২) পরোপকার, (৩) প্রেম, (৪) দীনতা, (৫) আত্মসমর্পণ, (৬) সন্তোষ, (৭) শিক্ষা, (৮) কৃতজ্ঞতা, (৯) অনুতাপ, (১০) উপাসনা।

বুস্তাঁনের পূর্ব্বাভাস চিত্রটি অতি চমৎকার ও উপভোগ্য। ভগবৎচরণে উৎসৃষ্টপ্রাণ কবি প্রথমে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহিমা-গীত বিদ্রোহী মানব-হৃদয়কে সেই বিশ্বস্রষ্টার চরণ-প্রান্তের দিকে অগ্রসর করে। অতি বড় পাপী, যে কদাচ ভুলিয়াও শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করে না, সেও পাপকার্য্য ভুলিয়া ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। এই কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি বলিয়াছেন, "রাজন্যবর্গের গুণগান না করিয়া আমার এই কাব্য এক জন বাদশার নামে উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে বোধ হয়, ধার্ম্মিকগণ বলিবেন যে, সাদের পুত্র সুলতান আবুবকরের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত কবি শেখ সাদী প্রতিভা ও বাগ্মিতায় অন্যান্য কবিগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছে। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য আকাশ-সাগরে ভাসমান থাকিবে, তত দিন এই কাব্যের সহিত, হে সুলতান! আপনার স্মৃতি অক্ষয়, চিরস্মরণীয় ও জয়যুক্ত হইয়া থাকিবে। শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করুন, জগদ্বাসী আপনার বন্ধুমধ্যে পরিগণিত হউক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা আপনাকে সতত মঙ্গলে রাখুন।"

বুস্তাঁনকাব্যে মানব-জীবনের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় অবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে কবির জীবন ও পর্য্যটন-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। বুস্তাঁনকে সাদীনামা অর্থাৎ কবির আত্মজীবনী আখ্যা দেওয়া যায়। পর্য্যটন-ক্লান্ত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের সায়াহ্নে নন্দনকাননের মত সুষমাপূর্ণ সিরাজের এক নিভৃত পল্লীতে বসিয়া ৮০ বৎসর বয়সে কবি বুস্তাঁন কাব্য রচনা করেন। বুস্তাঁন পাঠে জানা যায় যে, এই কাব্য রচনা করিতে কবির জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছে। এই কাব্য রচনা করিয়া কবির ধারণা হয় যে, তাঁহার অনিত্য জীবনের শেষ হইবে; মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে। কিন্তু কবির অমূল্য উপদেশপূর্ণ কাব্য কবির অক্ষয় স্মৃতি-রক্ষায় সহায় হইবে। যদিও তিনি জানিতেন যে, পার্থিব জগতের কোন বস্তুরই স্মৃতি চিরস্থায়িনী নহে, তথাপি কবি আশা করেন যে, এই পবিত্র কার্য্যের জন্য কেহ না কেহ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে।

গুলেস্তাঁর মত বুস্তাঁন কাব্যের অধ্যায়গুলি উপদেশ ও উদারনীতিকথায় পূর্ণ; জটিল ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা গল্প-চিত্রের মধ্য দিয়া দ্যোতনাপূর্ণ ভাষায় অতি সুচারুরূপে লিখিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুস্তাঁনের দশ অধ্যায়ের পরিচয় দিলাম।

প্রথম অধ্যায়ে কবি সুলতান আবুবকরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, হে সুলতান! ভজনার সময় আপনার চিত্তকে বিনীত ও নম্র করিবেন। ভক্তের মত সানুনয় প্রার্থনা করিয়া বলিবেন, 'হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, হে বিশ্বস্রষ্টা, হে জগৎপতে! তুমিই বিশ্বসম্রাট্, আমি তোমার স্নেহ-কণার ভিখারী। তোমার স্নেহ-হস্ত ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমার প্রতি সদয় হও, আমার হৃদয়ে ধর্ম্ম-বল দাও, তুমি শক্তি না দিলে কেমন করিয়া আমি প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিব?' এই অধ্যায়ে কবি রাজাকে কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতে হইবে, গল্প-চিত্রের মধ্য দিয়া তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। একটি গল্প-চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। এক রাজাকে সামান্য মূল্যের মোটা পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া রাজার কোন বন্ধু রাজাকে বলেন, 'হে রাজন্! এই সামান্য মূল্যের সামান্য পোষাক পরিধান করিয়া আপনি আপনার রাজমর্য্যাদার হানি করিতেছেন। রাজার উপযুক্ত চীনদেশস্থ মূল্যবান্ রেশমী পোষাক পরিধান করুন।' রাজা বলিলেন, 'বন্ধু! আমি যে পোষাক পরিধান করি, তাহাতে ত কোন প্রকার অসুবিধা দেখি না; আমি বেশ আরামেই আছি। বিলাসিতার চরমসীমায় পৌঁছিতে, অথবা আড়ম্বরপূর্ণ বহুমূল্য পোষাক পরিধান করিয়া সাধারণের স্তুতিলাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। স্ত্রীলোকের মত যদি আমিও বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে নিজদেহ সুজ্জিত করি, তাহা হইলে শত্রুদমন করিব কি উপায়ে? রাজকীয় ধনাগার আমার জন্য নহে, অথবা আমার ব্যবহারার্থ অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য নহে, পরন্তু সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্য।' 'পরোপকার'

নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের গল্প-চিত্রে কবি বিখ্যাত দানবীর হাতেমতাইয়ের পরোপকার ও উদারতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি গল্প-চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। আরবদেশের দক্ষিণদিকে ইয়ামন রাজ্যে তাইদলের সর্দ্দার হাতেম বাস করিতেন। এই কারণে তিনি হাতেমতাই নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। তাই-সর্দ্দার সদাশয়তার জন্য এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, এখনও আরবদেশের লোকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়া থাকে। হাতেমের একটি প্রিয় ঘোটক ছিল। এই ঘোটক পবনের মত দ্রুতগতিতে ছুটিত। এক দিন রুমের সুলতান, হাতেমের সদাশয়তা ও অপূর্ব্ব ঘোটকের বিষয় শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, হাতেমকে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে; তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তুমি যদি তোমার প্রিয় ঘোটকটি আমাকে উপহার দিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে, তুমি শ্রদ্ধার ও প্রশংসার যোগ্য পাত্র। আর যদি দেখি যে, ঘোটকটিকে উপহার দিতে অস্বীকার করিতেছ, তাহা হইলে বুঝিব, যে সদাশয়তার জন্য চারিধার হইতে তোমার প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হয়, সে সমস্তই মিথ্যা—ঢাকের বাজনার মত।

সুলতান পত্রসহ এক সুচতুর দূতকে হাতেমের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। দূত হাতেমতাইয়ের গৃহে পৌঁছিল। অত্যন্ত সম্মানের সহিত হাতেম দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রীতি-ভোজনের আয়োজন করিলেন; অতিথির সম্মানের জন্য হাতেম একটি ঘোটক-হত্যার ব্যবস্থা করিলেন। পরদিবস প্রাতে দূত সুলতানের স্বাক্ষরিত পত্রখানি হাতেমের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, 'দেখুন, আমি সুলতানের আদেশক্রমে আসিয়াছি। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনি সুলতানের সহিত বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আপনার প্রিয় ঘোটককে উপহার দিতে স্বীকৃত আছেন কি না।'

হাতেম অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'রাজদূত! গতকল্য আমাকে সুলতানের অভিপ্রায় জানান উচিত ছিল। গতকল্য প্রীতি-ভোজনের জন্য ঘোটকটিকে হত্যা করা হইয়াছে। এই ঘোটকটিই আমার প্রিয়তম ছিল এবং এইটি ব্যতীত আর আমার কোন ঘোটক ছিল না। মেষ বা ছাগের মাংস দিয়া রাজদূতের সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না ভাবিয়া আমি আমার একমাত্র প্রিয় ঘোটকটিকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ সেই ঘোটকটি সুলতানকে উপহার দিতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।' হাতেম, দূতকে প্রচুর অর্থ ও নানাবিধ মূল্যবান্ পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিয়া বিদায় দিলেন। দূত সুলতানের নিকট সমস্ত কথা বলিল। হাতেম তাঁহার প্রিয় ঘোটকটিকে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন শুনিয়া সুলতান মুগ্ধ হইয়া মনে মনে বার বার বলিলেন, 'হাতেম কি মহৎ! কি উদার!'

হাতেমের উদারতাসম্বন্ধে কবি আর একটি গল্প-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেইটি এইরূপ :—

আরবদেশের দক্ষিণে ইয়ামনের রাজা উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রাজা যখনই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তখনই জনসাধারণ হাতেমতাইয়ের সাধু অনুষ্ঠানের সহিত রাজার কার্য্যের তুলনা করিত।

যখন তখন হাতেমতাইয়ের প্রশংসা শুনিয়া রাজা হিংসায় অন্ধ হইয়া এক দিন স্থির করিলেন, ধরাপৃষ্ঠ হইতে হাতেমতাইয়ের নাম মুছিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তির রাজত্ব নাই, যাহার কোন ধনবল কি জনবল নাই, লোক কি বলিয়া সেই ভিখারীর সহিত তাঁহার তুলনা করে? এক দিন রাজা এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন, রাজ্যের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতেমতাইয়ের কার্য্যাবলীর সহিত রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যের তুলনা করিতে ভুলিলেন না। স্বনামধন্য হাতেমতাইয়ের সহিত রাজার প্রীতি-ভোজনের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া রাজাকে অধিকতর সম্মান দেখান হইতেছে ভাবিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এইরূপ তুলনা করিলেন। রাজা কিন্তু হাতেমের প্রশংসা শুনিয়া হিংসায় উন্মত্ত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, গোপনে হাতেমকে হত্যা করিতে হইবে। তৎপরদিবস প্রাতে রাজা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এক জন গুপ্তঘাতুক প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এক যুবকের সহিত রাজ-প্রেরিত গুপ্তঘাতুকের বন্ধুত্ব হইল। গুপ্তহত্যাকারী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, যুবক তাহাকে রাত্রিযাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। তখন সে বন্ধুর প্রীতি ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া

তথায় রাত্রিযাপন করিল। তৎপরদিবস পুনরায় বিদায় চাহিলে যুবক পুনরায় তাহার অতিথি বন্ধুকে কিছুদিন তাহার বাটীতে থাকিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিল।

রাজ-প্রেরিত গুপ্তঘাতুক বলিল, "ভাই, আমাকে বিদায় দাও, আমি বিশেষকার্য্যে বাহির হইয়াছি, আর আমার থাকিবার উপায় নাই।"

যুবক বলিল, "তোমার বিশেষ দরকারী কাযটি কি, আমাকে বলিবে, বন্ধু? তোমাকে সাহায্য করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিব।"

অতিথি বলিল, "ভাই, আমার কাযটি অতিশয় গোপনীয়—তবে আমার ভরসা আছে যে, তোমার মত বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলে, অন্যত্র প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। বলি শুন, তুমি নিশ্চয়ই হাতেমতাইয়ের নাম শুনিয়াছ। যে হাতেমতাইয়ের প্রশংসা দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, আমি জানি না, কি কারণে আমাদের রাজা সেই হাতেমের প্রশংসায় হিংসায় অন্ধ হয়েন। হাতেমতাইকে হত্যা করিবার জন্য রাজা আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি কি বলিতে পার, বন্ধু, কোথায় যাইলে সেই হাতেমতাইয়ের সন্ধান পাইব?"

যুবক তাহার অতিথির কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, আমিই সেই হাতেম।" বলিয়া অতিথির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হাতেম মাথা পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি যাহাকে খুঁজিতেছিলে, আমি সেই হাতেম, আমাকে হত্যা করিয়া তোমার রাজাজ্ঞা পালন কর।"

রাজ-প্রেরিত গুপ্তঘাতুক তৎক্ষণাৎ হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল, "বন্ধু! তোমায় হত্যা করা ত দূরের কথা, তোমার মস্তকের একগাছি কেশ উৎপাটনও আমার দ্বারা হইবে না। বন্ধু, তুমি এত উদার! তুমি এত মহৎ!"

সে হাতেমকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিল। তাহার পর সে ইয়ামনরাজ্যের দিকে চলিয়া গেল; তাহার গমনভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, যেন সে কোন পাপকার্য্য করিতে গিয়া ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে। ঘাতুক ইয়ামনরাজ্যে ফিরিয়া আসিল। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হয় নাই দেখিয়া, রাজা ভ্রূকুটীর সহিত বলিলেন, "হাতেমের ছিন্নমুণ্ড কোথায়?"

ঘাতুক রাজাকে কুর্নিশ করিয়া বলিল, "সুলতান! হাতেমতাইয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারি নাই। সেই আমাকে তাহার সৌজন্য-তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়াছে। সুলতান! হাতেম কিরূপ বিনয়ী, উদার, জ্ঞানী, তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। যে মহৎ উদার ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, সে রাজাজ্ঞা শুনিয়া স্বেচ্ছায় তাহার মস্তক তরবারির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'আমাকে হত্যা করিয়া তোমার রাজাজ্ঞা পালন কর, নহিলে তুমি রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িবে।' এরূপ জ্ঞানী, মহৎ, উদার ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন! আবার বলি, সুলতান! তাহাকে হত্যা করিতে পারি নাই, সে-ই আমাকে হত্যা করিয়াছে!"

ঘাতুকের কথা শুনিয়া রাজসভা নির্ব্বাক্—নিশ্চল! হাতেমের উদারতার ও মহত্ত্বের প্রশংসায় রাজা এতদিন অন্ধ ছিলেন; ঘাতুকের কথা শুনিয়া এতদিন পরে তিনি হিংসা ভুলিয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন।

বুস্তাঁনের তৃতীয় অধ্যায় প্রেমতত্ত্ব-বিষয়ক। এই অধ্যায় কবি যেরূপ প্রকৃত প্রেমিকের অভিজ্ঞতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহা পাঠ না করিলে অনুভব করা যায় না। ভগবৎপ্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কবি বলিতেছেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছেদজনিত পীড়া অনুভব করুন, অথবা (তাঁহার সঙ্গলাভজনিত) উপশম আরাম উপভোগ করুন। যাহারা একবার পরমেশ্বরের প্রেমে পাগল হইয়াছে, তাহাদের সম। সর্ব্বদাই সুখে কাটিয়া যায়। বুস্তাঁনের প্রেম-অধ্যায় হইতে সাধারণ প্রণয়ীরাও অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন; যথা,—

(১) যথার্থ প্রেমিক হইলেও তুমি কখনও তোমার প্রেমের অহঙ্কার করিও না। কেন না, এই গর্ব্বজনিত পাপ শুধু তোমাকেই নহে—তোমার প্রণয়িনীকেও ভোগ করিতে হইবে।

(২) যতক্ষণ পার, যুদ্ধ কর; প্রণয়-রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইও না। প্রেম-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সাদী এখনও বাঁচিয়া আছে।

ঈশ্বর-প্রেম নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের প্রেমে উন্মত্ত, তাহারাই যথার্থ সুখী,

তাঁহারাই শ্রীভগবানের সহিত আত্মসংযোগ করিতে পারিলে উৎফুল্ল। যত দিন না ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতেছেন, তত দিন তাঁহারা তাঁহার বিচ্ছেদে মুহ্যমান। যাঁহারা সত্য-শিব-সুন্দরের প্রেমে মস্‌গুল হয়েন, তাঁহারা কখনও তাঁহার প্রেমরজ্জু ছিন্ন করিতে পারেন না। অন্যের নিকট তিরস্কৃত হইলেও তাঁহারা ধ্যান-রাজ্যের রাজা; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য সকলের সুপরিচিত নহে। বাহিরে ইঁহারা ঠিক জামেলের মন্দির, ভিতরে সব আছে, কিন্তু দিনের পর দিন যতই যাইতেছে, মন্দিরের বাহির ধ্বংসও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাঁহারাই পতঙ্গের মত প্রেমময়ের প্রেম-দীপশিখায় আত্মাহুতি প্রদান করেন। এই অধ্যায়ের একটি গল্প-চিত্র পাঠকগণকে উপহার দিলাম;—

এক ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেমে পাগল হইয়াছিল। সে দিবসে বা রাত্রিকালে কিছুই আহার করিত না; সর্ব্বদাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিত। তাহার পিতা পুত্রের এই অবস্থার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। এক দিন এক ব্যক্তি এই যুবককে ভৎ‌সনা করিল। প্রেমোন্মত্ত যুবক তাহার কথার উত্তর করিল, "যে দিন হইতে প্রেমময় দয়াল বন্ধু আমাকে পরম বন্ধুর মত তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে লইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমি আর কোন বন্ধু চাহি না। তিনি যখন তাঁহার করুণ হস্ত আমার গায়ে বুলাইয়া দিয়াছেন, তিনি যখন তাঁহার স্বরূপ আমাকে দেখাইয়াছেন, তখন আমি আর কিছুই চাহি না।" প্রেমোন্মত্ত যুবকের কথা বুঝিতে না পারিয়া সকলে তাহাকে ভৎ‌সনা করিল।

দীনতা নামক অধ্যায়ে কবি মানবকে উপদেশ দিয়াছেন, "হে মানব! দম্ভগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিও না, তোমার ধূলার শরীর, সুতরাং ধূলার মত দীন হও! অগ্নির মত উত্তেজিত হইও না। দীনতার সোপান অবলম্বন করিয়া সাধুতার উচ্চস্তরে যাওয়া যায়। গর্ব্বই মানুষকে অধোগামী করে।"

আত্মসমর্পণ নামক অধ্যায়ে কবি মানুষকে পরম কারুণিক শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; সন্তোষ নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, যে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, সে কখনও ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে না। সন্তোষই মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে। শিক্ষা-সম্পর্কীয় অধ্যায়ে কবি মানবজাতিকে বলিয়াছেন, সৎ ও অসৎ লোকপূর্ণ একটি নগরের মত তোমার দেহ; তুমিই এ দেশের রাজা, বিবেক তোমার জ্ঞানী মন্ত্রীর মত কায করিবে। জ্ঞানীরা এই নগরে লোভের এবং লালসার ব্যবসা করে; সংযম এবং আত্মসমর্পণ এই নগরের যশ ও ধর্ম্ম। কামুক এবং কামুকতা এই নগরের চোর এবং গাটকাঁটাস্বরূপ জানিবে।

কৃতজ্ঞতা নামক অধ্যায়ে কবি মানব-জাতিকে কায়মনোবাক্যে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অনুতাপ নামক অধ্যায়ে কবি বিগত পাপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রার্থনা নামক অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন, "আজ হইতেই ভগবানের উপাসনা কর; কারণ, আগামী কল্য তুমি শক্তিহীন হইতে পার।"

বুস্তাঁনের উপক্রমণিকায় কবি বলিয়াছেন, "যাঁহারা দীন লেখকের দোষসমূহ গোপন করেন এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না, সেই সকল উন্নতমনা ব্যক্তির উদার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এই কাব্য প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।" কবি পরচ্ছিদ্রান্বেষণকারিগণকে ছিদ্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকিতে এবং গুণগ্রাহীর মত গুণ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—চীনের সূচিকার্য্যখচিত রেশমী পরিচ্ছদের মধ্যে কার্পাস-বস্ত্রের গদীর প্রয়োজন হয়। যদি তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসক হও, তাহা হইলে রেশমী পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া কার্পাস বাহির না করিয়া বরং সযত্নে সেই কার্পাসবস্ত্রকে লুকাইবে অর্থাৎ উদারচিত্ত ব্যক্তিগণের মত এই কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া গুণভাগের প্রশংসা করিবে। মানব অপূর্ণ—দোষ গুণসম্পন্ন। মানব চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দোষ ও গুণ দুইই বাহির হইবে; মানব-চরিত্র ত কোন্ ছার, নীলাকাশ-সাগরে ভাসমান পূর্ণচন্দ্রও কলঙ্কশূন্য নহেন। যদি তুমি আমার এই কাব্যমধ্যে রুচিবিগর্হিত কোন চিত্র দেখিতে পাও, তাহা হইলে গুণগ্রাহী সুধীর মত মন্দ অংশ ত্যাগ করিয়া, ভাল অংশের প্রশংসা করিও। এই সহস্র শ্লোকের মধ্যে যদি একটি শ্লোকও তোমার চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে, তাহা হইলে দয়া করিয়া তুমি এই কাব্যের দোষ-রূপ ছিদ্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকিবে। ইহাও ঠিক যে, আমার রচনাবলী খুতানের মৃগনাভির অপেক্ষা অমূল্য। প্রস্ফুটিত গোলাপের দ্বারা সাদী এই

বাগানের শোভা-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা খর্জ্জুরের মত মিষ্ট ও রসপূর্ণ; যতই চিবাইবে, ততই সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর রসে স্নিগ্ধ হইবে।

কবি শেখ সাদীর বুস্তাঁন মিলযুক্ত যুগ্মচরণে ও একাদশ মাত্রায় রচিত। যে ঈশ্বরানুরাগ, সাধুতা, পবিত্র রুচি সাদীর চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ, বুস্তাঁনের প্রতি কবিতা তাহার পবিত্রভাবে পূর্ণ; উপদেশ ও উদার নীতি-কথা শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হইয়া গুলেস্তাঁর মত বুস্তাঁনকেও নীতি-বিজ্ঞানে (moral philosophy) পরিণত করিয়াছে। এক জন পারস্য-সাহিত্য-রসিক বুস্তাঁন কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যুগ্মচরণে রচিত ও দশ সর্গে বিভক্ত বুস্তাঁন কাব্য নীতি-উপদেশপূর্ণ মহাকাব্যবিশেষ।

কবি গুলেস্তাঁ কাব্যে অফুরন্ত অনাবিল হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বুস্তাঁন কাব্যে হাস্যরস সংযত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক কবিতার মধ্যে ধর্ম্ম-পালন,মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের স্বরূপ,অদৃষ্ট-বাদের কথা, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরানুরাগ নির্ঝরমুক্ত বারি-রাশির মত তর তর বেগে প্রবাহিত।

বুস্তাঁন কাব্য পাঠ করিলে একটি বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় যে, কবি ইহার মধ্যে অতিশয়োক্তি, উপমা ও রূপক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ঘটাইয়াছেন। অধ্যাপক এডওয়ার্ড (Prof. A. H. Edward) বলেন, কবি শেখ সাদী যদি কেবলমাত্র বুস্তাঁন রচনা করিয়া যাইতেন,তাহা হইলেও তিনি নিশ্চয়ই সাহিত্যজগতে অমর হইতেন। * ইংরাজ মনীষী ক্লষ্টেন কবি শেখ সাদীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—A deep insight into the secret springs of human actions, an extensive knowledge of mankind, fervant piety, without a taint of bigotry, a poet's keen appreciation of the beauties of nature together with a ready wit and lively sense of humour, are the characteristics of Sadi's masterly compositions, অর্থাৎ মানবের কার্য্যের নিগূঢ় উৎপত্তিতত্ত্বে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মানবজাতিগত সুদূরপ্রসারিত জ্ঞান, অন্ধ গোঁড়ামী-শূন্য প্রগাঢ় ধর্ম্ম নিষ্ঠা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কবি-সুলভ অনুভূতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সজীব হাস্যরসবোধ প্রভৃতি গুণই শেখ সাদীর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

* If the Bustan were the only monument that remained of his genius, his name would assuredly still be inscribed in the roll of immortals—Introduction to Bustan by A. H. Edward.

অতীতের স্মৃতি।

ধূ-ধূ-ধূ কোচ্ছে ও যে মাঠ!
ঐখানেতে ছিল আমার, বড় সাধের হাট॥
সে হাট কোথায় গেল আজি, হ'লো যেন ভোজের বাজী,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে পারের মাঝি, ভেঙ্গে দিল ঠাট।
ছিল যারা, কোথায় তারা, পালিয়ে গেল কেমন ধারা,
খুঁজে আমি দিশেহারা,—হায় রে জীবন নাট॥
ভাঙ্গা-গড়া-মিলন যেমন, ফুঁ-মন্তোরে উড়্‌লো তেমন,
ঘুম-ভেঙ্গে ঠিক দেখা স্বপন, র'ইলো প'ড়ে বাট্।

শূন্য বাটে একা আমি, ডাকি কোথা অন্তর্য্যামি,
দাও হে দেখা—কেমন তুমি, গুটাই দোকান-পাট॥
আছে এখন যে ক'টি ধন, সঁপে দিছি গুরুর চরণ,
তাঁরি হাতে জীবন-মরণ, বাঁচুক—বালাই—ষাট্।
এই সুযোগে বিদায় মাগি, আসক্তিতে হোয়ে ত্যাগী,
আর না আসি কিছুর লাগি, ঘটিও না বিভ্রাট॥
(মা গো, তোর, মাভি পায়ে ঘাট্!!)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

রায়তের কথা।

আজ দু' তিন বছর বাঙ্গালাদেশের নানা যায়গায় রায়তেরা মাঝে মাঝে সভা-সম্মিলনে জমা হয়ে তাদের দুঃখ-দুরবস্থা ও তার প্রতীকারের উপায় আলোচনা আরম্ভ করেছে। এই ঘটনায় কোনও কোনও সম্প্রদায়ের কতক লোক বেশ একটু চিন্তিত ও ভীত হয়েছেন। তাঁদের ভাবনা ও আশঙ্কার অনেক অংশই অমূলক এবং রায়তদের এ সব সভা-সমিতির কি লক্ষ্য এবং কি লক্ষ্য নয়, তা জান্‌লেই এই অকারণ চিন্তা ও ভয় দূর হওয়া উচিত।

দেশের জমীদার সম্প্রদায়ের অনেকে এই ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন যে, রায়তদের এই আন্দোলন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন। তাঁদের এই আশঙ্কার একেবারে কোনও মূল নাই। বাঙ্গালাদেশের প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রদ ঘটাতে চায় না, তাকে বহাল রাখ্‌তেই চায়। তার সোজা কারণ, ও-বন্দোবস্ত রদ হ'লে চাষী প্রজার কোনও স্বার্থ-লাভের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু স্বার্থহানির আশঙ্কা আছে পুরো মাত্রায়। প্রতি বছর মাটী চ'ষে চাষী যে ফসল উৎপন্ন করে, তার কতক রাখে সে নিজে, আর কতক দিতে হয় খাজনা ব'লে জমীদারকে। জমীদার এই প্রাপ্য খাজনার এক অংশ নিজে রাখেন, বাকী অংশ রাজস্ব-রূপে গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, জমীদারের কাছে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব আর বৃদ্ধি হয় না। এই বন্দোবস্ত রদ হয়ে যদি গভর্ণমেণ্ট জমীদারের দেয় রাজস্ব ক্রমাগত বাড়াতে পারেন, তবে যে প্রজার জমীদারকে দেয় খাজনা ক্রমে কমে আসবে, তার সম্ভাবনা নাই, বরং এ আশঙ্কা খুবই আছে যে, সরকারের দৃষ্টি চাষের জমীর উপর একবার পড়লে, চাষী তার উৎপন্ন ফসলের যে অংশ এখন পায়, তারও এক ভাগ, জমীদারের মারফৎ তহবিলে এনে ফেল্‌বার লোভ খরচের টানাটানির দিনে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে, এবং প্রজার দেয় খাজনায় এখন গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ নাই ব'লে, ঐ খাজনা অবাধে বৃদ্ধির যে সব আইনত বাধা আছে, তা দূর করার দিকেই গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা হবে। অর্থাৎ জমীদারের রাজস্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজার খাজনাও ক্রমে বেড়ে চল্‌বে। সুতরাং বাঙ্গালার জমীদার সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর আক্রমণ প্রজার তরফ থেকে হবে না। সে আক্রমণ যদি আসে, তবে আস্‌বে মহাজন, কলওয়ালা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সম্প্রদায় থেকে—চাষের জমীর সঙ্গে মুখ্যত যাদের সম্বন্ধ নেই। যদি গভর্ণমেণ্টের দেশশাসনের খরচ এখনকার মত ক্রমাগত বেড়েই চলে, আর সে খরচ যোগাবার জন্য বেশী রকম টেক্স বাড়ান কি বসানর দরকার হয়, তবে ঐ সব সম্প্রদায় নিজেদের ঘাড়ের চাপ লঘু কর্‌বার জন্য সে টেক্সের কতক চাষের জমীর উপর চাপাতে চেষ্টা কর্‌বেই কর্‌বে। জমীদারের সে দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার প্রজা তাদের সপক্ষ হবে। কেন না, চাষের জমীর উপর রাজকরের ভার না বাড়ে, এ স্বার্থ জমীদার ও চাষীর এক। যদি না ইতিমধ্যে বাঙ্গালার জমীদার সম্প্রদায় নিজেদের ষোল আনা স্বার্থকে সাড়ে ষোল আনা বজায়ের চেষ্টায় প্রজার এক আনা স্বার্থকে আধ আনা কর্‌তে কুণ্ঠিত না হন, এবং স্বার্থ ও সুবিধার এক চুলও ছাড়তে হয়, এই আশঙ্কায় প্রজাদের দুঃখ-দৈন্য মোচনের সমস্ত চেষ্টার বিরোধী হয়ে তাদের মন এমন তিক্ত ক'রে তোলেন যে, নিজের হিতাহিতের কথা ভুলে গিয়ে জমীদারের অহিতকেই তারা নিজেদের মঙ্গল মনে করে।

গভর্ণমেণ্টের ছোট বড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ রায়তদের সভা-সমিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের বিভীষিকা দেখেছেন। বাঙ্গালার চাষী প্রজারা খুব সরল মনে ও সত্য কথায় তাঁদের নিশ্চিন্ত হ'তে বল্‌তে পারে। কারও শান্তিভঙ্গ করা কি কোনও শৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা করা তাদের একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। যারা দু'বেলা খেটে খায়, কারও গায়ে প'ড়ে ঝগড়া বাধাবার তাদের শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই। তারা যে দল বাঁধার চেষ্টা কর্‌ছে, সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। কাকেও মার্‌তে নয়, নিজেদের বাঁচাতে। দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার চাপ থেকে প্রাণ বাঁচানর উপায় করাই এ সব সভা-সমিতি-সম্মিলনের লক্ষ্য। রায়তের দুঃখ-দুর্দ্দশার উপর বাঙ্গালাদেশের কোনও শান্তি

ও শৃঙ্খলার আসনই অটল থাক্‌তে পারে না। কারণ, এদেশের প্রতি এক শ' জন লোকের মধ্যে আশী জনেরও উপর রায়ত ও তার পরিবারের লোক; এবং দেশের শাসন যদি সুশাসন হয়, তবে তার একটা সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যই হবে রায়তের মঙ্গলসাধন।

সুতরাং কি জমীদার, কি সরকার রায়তদের আন্দোলনে শঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন হবার কারও কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট ক'রে বলাই ভাল, দেশে এমন লোক আছে, যার পক্ষে এ আন্দোলন প্রকৃতই চিন্তা ও ভয়ের কারণ। যে মনে করে, যারা প'ড়ে আছে, চিরদিন তাদের প'ড়ে থাকাই উচিত, তাদের মাথা তোলা একটা অপরাধ; যারা ভাবে, দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার একটা ভয়ের কথা, কারণ, তাতে নিজেদের স্বার্থহানির আশঙ্কা,—রায়তদের আন্দোলনে তাদের মন বেজার হবেই হবে। যারা নিজে আধপেটা খেয়ে পরের মুখে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্ন যোগাচ্ছে, তারা নিজের তৈরী অন্ন ক্ষুধার জ্বালায় একটু বেশী ভাগ দাবী কর্‌লে, যারা শান্তি ও শৃঙ্খলার অছিলায় তাদের টুঁটি চেপে ধর্‌তে চায়; তিন কোটি লোকের মরণ-বাঁচনের চেয়ে নিজের দলের তিন কুড়ি লোকের সামান্য একটু ভাল মন্দ যাদের কাছে বড় কথা, এ আন্দোলনে তারা অনিষ্ট আশঙ্কা কর্‌বেই কর্‌বে। স্বার্থের ছানিতে দুই চোখ-ঢাকা, এই সব লোক ছাড়া দেশের আর সবাই—যারই একটু হৃদয় ও বুদ্ধি আছে, যে দেশের হিত চায় এবং কিসে দেশের হিত, তা সামান্যও বোঝে,—সে রায়তদের এই আন্দোলনকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ কর্‌বে।

হিমালয় পর্ব্বতের তলা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত আমাদের এই বাঙ্গালাদেশ প্রকাণ্ড চাষের ক্ষেত। এর কোথাও একখানি পাতর নেই, যা কৃষকের হাল-লাঙ্গলকে একটুকুও বাধা দেয়। পাতর-কাঁকরশূন্য এই জমীকে ভগবান্ আশ্চর্য্য উর্ব্বরতা দিয়েছেন এবং প্রতি বর্ষার পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিতে তাকে সরস কর্‌ছেন। ভগবানের এই দান বাঙ্গালার চাষীই মাথা পেতে নিয়ে নিজের পরিশ্রমে তাকে সফল করেছে। তাদেরি হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে প্রতি বছর বাঙ্গালার মাটীতে ধান, পাট, সরষে, কলাই, তামাক, আলুর যে ফসল জন্মে, দেশ-বিদেশের লোককে তা অন্ন ও ঐশ্বর্য্য যোগায়। এরি লোভে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, মগ, কাবুলী, আর্ম্মাণী, ইহুদী, ইংরাজ, জার্ম্মাণ বাঙ্গালায় এসে বাসা বাঁধে; লোটা-কম্বল সম্বল নিয়ে এসে লক্ষপতি হয়ে যায়; টুপী-লাঠীর মালিক কোটি টাকার মালিক হয়। কিন্তু যারা গায়ের রক্ত জল ক'রে বছর বছর সোনা ফলায়, সেই বাঙ্গালী চাষীর নিজের কি হাল? তাদের দু'বেলা পেট পূরে খাবার ভাত নাই, তাদের পরণে নেংটি, গায় ছেঁড়া কাঁথা, তাদের ঘরের চালে বর্ষার বৃষ্টি মানে না। বন্যায় যদি একটা ফসল ডুবে যায়, সমস্ত দেশে চাঁদা তুলে তাদের প্রাণ বাঁচাতে হয়। তাদের হাড়ের ভিতর রোগের বাসা, জ্ঞানের অভাবে তাদের চোখ অন্ধ। এ অবস্থা কখনও স্বাভাবিক হ'তে পারে না। এর এক দিকে আছে অন্যায়, অন্য দিকে জড়তা ও অজ্ঞান। এর পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে; এ অবস্থার প্রতীকার চাই। বাঙ্গালার চাষীকে কোনও রকমে ম'রে বাঁচা নয়, ভাল ক'রে বাঁচ্‌তে হবে। তার পেট থেকে ক্ষুধা, হাড় থেকে রোগ, মাথা থেকে অজ্ঞতা দূর কর্‌তে হবে। তার কি উপায়, সে জন্য কেমন মাল-মস্‌লা দরকার, কোন্ পথে কায আরম্ভ কর্‌তে হবে—তাই আলোচনার জন্যই আপনাদের এই সম্মিলন।

বাঙ্গালার রায়তেরা যদি তাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘুচিয়ে শরীর ও মনে জীয়ন্ত মানুষ হ'তে চায়, তবে কালবিলম্ব না ক'রে তিনটি কাযে তাদের সচেষ্ট হ'তে হবে। ১,—চল্‌তি আইনে রায়তী জোতে রায়তের যা স্বত্ব আছে, তাকে বাড়াবার জন্য ঐ আইনের কতক অংশে পরিবর্ত্তন ঘটান। ২,—রায়তের উপর যে সব বে-আইনী দাবী ও জুলুম এখনও চল্‌ছে, তা বন্ধ করা। ৩,—নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলের ব্যবস্থার জন্য দেশের সব যায়গায় রায়তদের স্থায়ী সমিতি গঠন করা।

রায়তদের মঙ্গলের জন্য রায়তী জোতের বর্ত্তমান আইনের যে সব পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তার মধ্যে এই তিনটি প্রধান;—জমীদারের বিনা সম্মতিতে রায়তী জোত হস্তান্তরের যোগ্য করা; রায়তী জোতে পাকা বাড়ী, ইন্দারা, পুকুর দেবার অধিকার এবং গাছ কেটে নিজের কাযে লাগাবার স্বত্ব রায়তকে দেওয়া; রায়তী জোতের খাজনা-বৃদ্ধি বন্ধ করা।

সকলেই জানে, হস্তান্তরের অযোগ্য রায়তী জোত

বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র প্রতিদিন হস্তান্তর হচ্ছে এবং রায়তী জোতের যত বেচা-কেনা হয়, জমীদারদের ততই লাভ। কারণ, কবালা-খরিদদারকে উচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে, মোটা নজর আর খাজনা বৃদ্ধি আদায় করা চলে। ফলে রায়তী জোতের দাম থেকে এই নজরের টাকা ও বৃদ্ধি খাজনা বাবদ আরও কিছু কাটা যায়। কেন না, দামের উপরে আরও এই টাকা খরচ করতে হবে জেনেই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মূল্য স্থির হয়। এর উপর অবশ্য নায়েব বাবুর সেলামী, মুহুরীর তহুরী, পাইক-বরকন্দাজের ভালমানুষী আছে। নাম খারিজ উপলক্ষে জমীদার-কাছারীতে দরবার, ঘোরা-ঘুরি ও হয়রাণীর ত কথাই নেই। অর্থাৎ রায়তী জোত হস্তান্তরে জমীদারের সম্মতির প্রয়োজন না থাক্‌লে তার জোত বিক্রী ক'রে রায়ত যে দাম পেত, এখন সেই পুরো দাম রায়তের ট্যাঁকে আসে না, একটা অংশ যায় জমীদারের সিন্দুকে। অধিকন্তু এই সম্মতি অসম্মতির ক্ষমতা জমীদার বাবু ও তাঁর কর্ম্মচারীদের হাতে, প্রয়োজন হ'লেই রায়তকে জব্দ করার একটা চমৎকার যন্ত্রের মত রয়েছে। এ রকম আইনের সপক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাক্‌তে পারে না। জমীদারপক্ষ থেকে মাঝে মাঝে বলা হয় যে,এই হস্তান্তরের আইনে রায়তেরই হিত হচ্ছে। কারণ, বাঙ্গালাদেশের রায়ত যেমন বে-হিসাবী ও নিজের ভাল-মন্দের জ্ঞানশূন্য, তাতে রায়তী জোত জমীদারদের বিনা সম্মতিতে হস্তান্তর করতে পার্‌লে, বাঙ্গালার সব রায়ত মহাজনদের জমী বেচে ফেলে নিজের জমীতে শেষটা মজুরী ক'রে দিন গুজরান কর্‌ত। এ যুক্তিটা এমনই হাস্যকর যে, যাঁরা এটা উপস্থিত করেন, সম্ভব তাঁরাও মনে মনে হাসেন। কেন না, বাঙ্গালাদেশে এমন জমীদার কে আছেন, যিনি রায়তের হিতের জন্য কবালা-খরিদদারের উপর কোনও রাগ না থাক্‌লে বা অন্য কাকেও পত্তন দিয়ে, বেশী লাভের আশা না পেলে, ভাল রকম নজর পেয়েও কবালা-খরিদদারকে প্রজা স্বীকার করেন না? সত্য কথা যে কি, তা সবাই জানে। রায়তেরা তাদের জোত যত বেচা-কেনা করে, জমীদারের ততই আনন্দ, কারণ, তত বেশী নজরের টাকা ঘরে আসে। আর বে-হিসাবী বদখেয়ালী লোক রায়তের মধ্যেও আছে, জমী-দারের মধ্যেও আছে। তাদের সংখ্যাটা যে রায়তের মধ্যেই বেশী, তার প্রমাণ নাই। বাঙ্গালাদেশের খুব বড় জমীদারও নিজেকে জমীদারী রক্ষার অযোগ্য প্রচার ক'রে কোর্ট অব ওয়ার্ডএর হাতে জমীদারী তুলে দেন; না ভেবে চিন্তে ঋণ ক'রে ক'রে শেষে ঋণের দায়ে ডোবার মত হ'লে ইংরাজ কোম্পানীকে জমীদারী ইজারা দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন—কিন্তু জমীদার সম্প্রদায় ত এ প্রস্তাব কখনও করেন না যে, গভর্ণমেণ্টের বিনা সম্মতিতে জমীদারী হস্তান্ত-রের অযোগ্য করা হোক্। যে হিতটা তাঁরা নিজেদের জন্য চান না, সেই হিতই তাঁরা রায়তকে দেবার জন্য ব্যস্ত, এই অতি-প্রেম দেখে যদি রায়তদের মনে সন্দেহ হয়, তবে তাদের একটুকুও দোষ দেওয়া যায় না। এর চেয়ে বরং যে সব জমীদার স্পষ্ট বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যখন তাদের জমীর মালিক করা হয়েছে, তখন রায়তী জোত বেচা-কেনায় তাদের সম্মতির অপেক্ষা না রাখ্‌লে মালিকী স্বত্বের হানি হয়, তাদের সরলতার প্রশংসা করা চলে, যদিও যুক্তিটা সমানই অসার। কেন না, যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন তাদের মালিক বানিয়েছে, সেই আইনেরই ৭ ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, সকল শ্রেণীর লোককে,বিশেষতঃ যারা দুর্ব্বল, তাদের রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যখনই প্রয়োজন মনে করবেন, তখনই জমীর চাষীদের রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য যেমন আইনের দরকার, তা বিধিবদ্ধ কর্‌তে পার্‌বেন; জমীদারদের কোনও আপত্তি চল্‌বে না। জমীদার রায়তী জোতের যেমন মালিক, মধ্যস্বত্ব জোতেরও তেমনি মালিক। অথচ মধ্যস্বত্ব জোত তাদের বিনা সম্মতিতে হস্তান্তর করা যায় এবং তাতে তাঁদের মালিকী স্বত্বের হানি হয় না। কেবল রায়তী জোতের বেলাতেই এর কেন ব্যতিক্রম হবে, তা বোঝা যায় না। এর কি একমাত্র কারণ যে, চাষী প্রজা যখন সব চেয়ে গরীব ও দুর্ব্বল, তখন তারই জোত বিক্রীর দাম থেকে একটা ভাগ জমীদারকে দেওয়া হোক্ আর মধ্যস্বত্ব জোতদারদের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত একটু ভাল, আর জমীদারদের মত যখন তাদেরও গতর খাটিয়ে জমীতে ফসল আবাদ করতে হয় না, তখন মধ্যস্বত্ব জোত বিক্রীর সমস্ত টাকাটা জোতদারদেরই থাকুক! মোট কথা—রুক্ষ মাথাকে আরও রুক্ষ ক'রে তেলো মাথায় আর একটু বেশী তেল ঢালার আইন অবিলম্বে রদ হওয়া প্রয়ো-জন। বাঙ্গালার চাষীরা চায় মধ্যস্বত্ব জোতের যে হস্তান্তরের আইন,রায়তী জোতের হস্তান্তরেরও ঠিক সেই আইন হোক্।

আপনারা সকলেই জানেন, বর্ত্তমান 'খাজনার আইনের' কি পরিবর্ত্তন দরকার, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য বাঙ্গালাদেশের গভর্ণমেণ্ট সরকারী, বে-সরকারী লোকের এক কমিটী করেছেন। ঐ কমিটীর সভ্যরা তাঁদের লিখিত পরামর্শ গভর্ণমেণ্টে পেশ করেছেন। সাধারণের সমালোচনার জন্য ঐ সব পরামর্শ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয়েছে। ঐ কমিটীর অধিকাংশ সভ্য এই মত দিয়েছেন যে, রায়তী জোতের বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকা জমীদারকে নজর দিলে জমীদার কবালা-খরিদদারকে প্রজা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন এবং জমীদার যদি ইচ্ছা করেন, তবে জোত কেনার সমস্ত দামটাও আরও শতকরা ১০৲ টাকা, কবালা-খরিদদারকে দিয়ে জোত খাস করতে পারবেন। আইনের এ রকম পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার রায়তেরা কখনই স্বীকার হ'তে পারে না। যে চাষী নিজের অর্থে ও পরিশ্রমে জমী থেকে ফসল তোলে, অথচ দু'বেলা খেতে পায় না, অবস্থার ফেরে সেই জমী বিক্রী করতে হ'লে দামের এক পোয়া কেন তার হাত থেকে ছিনিয়ে যে জমীদার ঐ ফসল আবাদের কাযে, টাকা, মাথা, শরীরের কিছু ব্যয় করেন না—তাঁর থলিতে তুলে দিতে হবে, এর স্পষ্ট জবাব বাঙ্গালার রায়তরা শুনতে চায়, তারা গরীব ও দুর্ব্বল ব'লে নির্ভয়ে তাদের উপর জুলুম করা চলে মনে করেই কি এই জবরদস্তী? আর ঐ যে দাম দিয়ে কবালা-খরিদদারদের কাছ থেকে জোত খাস করার প্রস্তাবও একেবারে সর্ব্বনেশে প্রস্তাব। আর সব কথা ছেড়ে দিলেও ওরকম আইন কাযে চালাতে হ'লে যে সব জটিল বিধিব্যবস্থার দরকার হবে, তাতে ক্রমাগত কেবল মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টি হয়ে জমীদারের খরচান্ত এবং রায়তের প্রাণান্ত ঘটবে। লাভ হবে একমাত্র উকীল বাবুদের। জমীদারের টাকা ও রায়তের পয়সা দুই তাঁদের ঘরে আসবে। রায়তী জোত এ রকম হস্তান্তরের যোগ্য করা রায়তরা চায় না। মোটা নজর দিলে ত আইনে না হোক্, প্রকৃত কাযে এখনও হস্তান্তরের যোগ্য। সুতরাং আইনের এ পরিবর্ত্তনে প্রজার বিশেষ কিছু হিত হবে না। রায়তী জোতের হস্তান্তরের বর্ত্তমান আইন এই জন্যই অন্যায় যে, প্রতি বেচা-কেনায় গরীব রায়তের ঘরের পয়সা নজর বাবদ বিনা কারণে বড়-মানুষ জমীদারের ঘরে যায়। সেই মোটা নজরই যদি বহাল থাক্‌ল, তবে আইনের পরিবর্ত্তন ঘটল কেবল কথায়, কাযে নয়। বাঙ্গালার রায়তের দাবী যে, রায়তী জোত মধ্যস্বত্ব জোতের মত সোজাসুজি হস্তান্তরের যোগ্য করা হোক্। অর্থাৎ রায়তী জোত ইচ্ছামত দান, বিক্রয়, রেহাণ, উইলের ক্ষমতা রায়তের থাকবে। প্রতি হস্তান্তরে যেমন মধ্যস্বত্ব জোতে, তেমনি রায়তী জোতে জমীদার সেলামী বাবদ জোতের বার্ষিক খাজনার শতকরা ২৲ টাকা হারে পাবেন এবং ঐ সেলামী ১৲ টাকার কম কি ১০০৲ টাকার বেশী হবে না। এই হ'ল রায়তী জোতকে যথার্থ হস্তান্তরের যোগ্য করা। আর সব প্রস্তাব কেবল কথার মারপ্যাচ ক'রে পরিবর্ত্তনের অছিলায় বর্ত্তমান অবস্থাকেই বজায় রাখার চেষ্টা।

যেমন রায়তী জোত হস্তান্তরের আইন, তেমনি রায়তী জোতে রায়তের পাকা বাড়ী, পুকুর, ইন্দারা দেবার অধিকারের আইন। ও সবই হচ্ছে রায়তের কাছে থেকে জমীদারের নজর আদায়ের যন্ত্র। জমীদারের জমীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যে চাষী পুরুষানুক্রমে ঐ জমীর জন্য প্রাণপাত করছে, তার একটু অবস্থা ফিরলে জমীতে একটা পাকা ঘর তুলতে গেলেই জমীদার-কাছারী থেকে তলব, নজর চাই। নিজের ও পরের জলকষ্ট মোচনের জন্য কোন রায়ত ইন্দারা দেবার কি পুকুর কাটার যোগাড় করেছে—অমনি নজর চাই। না দিলে উচ্ছেদ ও ক্ষতি-পূরণের নালিস। ব্যাপার কি? না চাষের জমী চাষের অনুপযোগী করা হয়েছে। অবশ্য মনের মত নজর পেলেই জমী আর কিছুতেই চাষের অনুপযোগী হয় না। অথচ নিজেদেরই পূর্ব্বপুরুষের কাটা যে সব পুরাতন দীঘি, পুষ্করিণী ছিল, তা ম'রে বুজে যাচ্ছে, সে দিকে জমীদারদের দৃকপাত নেই। প্রজাস্বত্ব আইনের' ৯ অধ্যায়ে রায়তী জোতের 'উন্নতি' নামে এ সব বিষয়ে রায়তদের যা একটু স্বত্ব দেওয়া হয়েছে, তার ফল প্রায়ই রায়তেরা পায় না। কেন না, সে স্বত্বের মধ্যে নানা রকম জটিল ঘোরপ্যাচ। তা দাবী করতে গেলেই মামলা-মোকদ্দমা অনিবার্য্য। প্রবল জমীদারের সঙ্গে গরীব প্রজার মামলা জিনিষটি অতি ভয়ানক। ওতে হারলে তার সর্ব্বনাশ এবং জিতলেও সে জেরবার। ও সব জটিল আইন রদ ক'রে পাকা বাড়ী, পুকুর, ইন্দারা দেবার সোজাসুজি অধিকার রায়তকে না দিলে, আইনের কাঠামটা

ঐ রেখে অল্প একটু আধটু পরিবর্ত্তনে রায়তের কোন মঙ্গল হবে না।

রায়তী জোতের গাছকাটার বর্ত্তমান আইনটি বড়ই বিচিত্র! স্থানীয় কোন বিপরীত প্রথা না থাক্‌লে রায়ত গাছ কাট্‌তে পার্‌বে, কিন্তু কাটা গাছটা নিয়ে যাবেন জমীদার। অর্থাৎ যার ষোল আনা আছে, তার সেটা সোয়া ষোল আনা হোক, আর যার কিছুই নাই, সে আর একটা পয়সা নিয়ে কি কর্‌বে? যে কমিটীর কথা পূর্ব্বে বলেছি, তার অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাব করেছেন, গাছটা প্রজা কেটে নিতে পার্‌বে, কিন্তু মূল্যবান্‌ গাছের অর্থাৎ আম, জাম, কাঁঠাল,তাল প্রভৃতি গাছের দামের সিকি অংশ জমীদারকে নজর দিতে হবে। রায়তদের কথা ওর মধ্যে যেন আর ভাগ-বাটোয়ারা না হয়। ও গাছের এক পোয়া দাম ধনী জমীদারের কাছে কিছুই নয়, কিন্তু গরীব রায়তের কাছে খুবই মূল্যবান্‌।

রায়তী জোতের খাজনাবৃদ্ধি বন্ধের কথা শুন্‌লেই জমীদাররা ভয়ানক চম্‌কে ওঠেন এবং ও কথা যে বলে, তার জবান বন্ধ হোক, মনে মনে কামনা করেন। গভর্ণ-মেণ্ট তাঁদের রাজস্ব আর বাড়াতে পারেন না, এ ব্যবস্থাটা তাঁদের যেমন প্রিয়, রায়তের খাজনা তাঁরা আর বাড়াতে পার্‌বেন না, এ প্রস্তাবটা তাঁদের তেমনি অপ্রিয়! সুতরাং জমীদারদের অতটা চম্‌কে না দিয়ে আমার মতে রায়তেরা একটা রফার প্রস্তাব কর্‌তে পারে। আপ-নারা জানেন, বর্ত্তমান আইনে রায়ত যদি আপোষে জমা বৃদ্ধি না দেয়, তবে জমীদার নালিশ ক'রে চারটি কারণে জমা বৃদ্ধি করিয়ে নিতে পারেন। (১) যদি জোতের খাজনা পার্শ্ববর্ত্তী একই রকম জমীর জোতের খাজনার চেয়ে হারে কম থাকে, (২) যদি বর্ত্তমান খাজনা চল্‌তি থাকার সময়ে খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে থাকে, (৩) যদি জমীদার নিজের খরচে জমীর এমন উন্নতি ঘটিয়ে থাকেন যে, তাতে জমীর উর্ব্বরাশক্তি হয়েছে, (৪) যদি কোনও নদীর চলাচলে জমীর উর্ব্বরতা বেড়ে থাকে। এখন রায়তরা এই প্রস্তাব কর্‌তে পারে যে, এই চারটি কারণের একটি অর্থাৎ তৃতীয়টি বহাল থাক, বাকী তিনটি রদ করা হোক। জমীদার যদি নিজের চেষ্টায় ও অর্থে জমীর উর্ব্বরতা বাড়ান, তবে যে রায়তেরা কেবল সেজন্য খাজনা বৃদ্ধি দিতে আপত্তি কর্‌বে না, তাই নয়, দু হাত তুলে তাঁদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। তাঁরা জমীর জন্য নিজের কিছু করুন এবং সে কাযের ফল ভোগ করুন, তাতে রায়তের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখনকার মত জমীর জন্য কিছুমাত্র না ক'রে চাষ ও চাষীর কোনও ভাল-মন্দে না থেকে, অনর্থক খাজনাবৃদ্ধির দাবীতেই রায়তের আপত্তি। তাদের বিশেষ আপত্তি খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাজনা-বৃদ্ধিতে। চমৎকার এই ব্যবস্থাটি। খাদ্য-শস্যের মূল্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এ ঠিক। কিন্তু রায়তের যে সব জিনিষ কিন্‌তে হয়, তারও যে প্রায় সবারই দাম বেড়ে চলেছে। খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ধান বিক্রি করে রায়তের ঘরে যে টাকাটা বেশী আসে, তাব সবই বেরিয়ে যায় চড়া দামে আর সব জিনিষ কিন্‌তে। বৃদ্ধি খাজনার টাকা রায়ত যোগাবে কোথা থেকে? জমীদার বলেন, তাঁরা চাষের জমীর মালিক, আর সেই জন্যই রায়তী জোতের উপর তাঁদের নানা রকম দাবী। কিন্তু চাষের জমীর উপর তাদের মালিকের দরদ কোথায়? এ দেশের জমীর ও চাষের উন্নতির জন্য তাঁরা কি করেছেন, এবং কি কর্‌ছেন? একটা প্রশ্ন তুল্‌লেই এর পরিষ্কার জবাব পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইনের সুরু থেকে এ পর্য্যন্ত কজন জমীদার নিজের চেষ্টায় এবং খরচে জমীর উর্ব্বরতা বাড়ানোর দাবীতে কয়টা খাজনাবৃদ্ধির নালিশ করেছেন, আর খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খাজনাবৃদ্ধির নালিশ এ পর্য্যন্ত কয় লাখ হয়েছে? আসল কথা, জমীদার জমীর মালিক হ'তে চান না; হ'তে চান কেবল খাজনার মালিক। রায়ত যেমন ক'রে পারে,ম'রে বেঁচে জমী চষুক, তার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই; পুরো খাজনা আদায় হলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু রায়তের আয় না বাড়লে আর বৃদ্ধি খাজনার ভার সে কোনও মতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। জমীদাররা যদি নিজের আয় বাড়াতে চান, তবে রায়তের আয় কিসে বাড়ে, সেই চেষ্টা করুন। জমী-দারের চেষ্টায় জমীর ফসলবৃদ্ধি ভিন্ন খাজনাবৃদ্ধির আর যে সব কারণ বর্ত্তমান আইনের আছে, বিশেষ ক'রে ঐ খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাজনাবৃদ্ধির দাবী, রায়তের ও দেশের মঙ্গলের জন্য তা অবিলম্বে রদ হওয়া দরকার; এবং সে জন্য বাঙ্গালাদেশের রায়তদের বিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

চাষের জমীতে চাষীর স্বত্বের বর্ত্তমান আইন নিজেদের অনুকূলে পরিবর্ত্তনের জন্য রায়তদের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? এই বিষয়টি আপনাদের বিশেষ বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হবে। বাঙ্গালাদেশের রায়তেরা চুপ ক'রে থাকলেও এ আইন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব, বাঙ্গালার আইন-সভায় উপস্থিত হবে। সেজন্য গভর্ণমেণ্ট কমিটী বসিয়েছেন। এখন রায়তদের প্রথম কায আইনের কি কি পরিবর্ত্তন তারা চায়, তা খুব স্পষ্ট ক'রে সমস্ত দেশের লোক, গভর্ণমেণ্ট ও আইন-সভার সভ্যদের জানান। রায়তদের মনের কথা ও তাদের দাবী যেন কারও অজ্ঞাত না থাকে। সুতরাং প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্ত্তন কমিটীর পরামর্শ ও মতামত সম্বন্ধে রায়তদের কি বক্তব্য, তা বিচার ও প্রকাশের জন্য দেশের সমস্ত যায়গায় রায়তদের সভা-সমিতি হওয়া দরকার। এ যুগে যে চুপ ক'রে থাকে, সে যে আছে, তা কারো মনে হয় না। সুতরাং এই হ'ল এ সম্বন্ধে প্রথম কায। কিন্তু আইনের কি রকম পরিবর্ত্তন শেষ পর্য্যন্ত হবে, তা নির্ভর করে আইনসভার সভ্যদের উপর। তাঁদের অধিকাংশের যা মত, সেই অনুসারে কায হবে। কিন্তু বর্ত্তমান আইনসভার অধিকাংশ সভ্য রায়তদের সপক্ষ হবে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। যে নির্ব্বাচনের ফলে বর্ত্তমান আইনসভা গঠিত হয়েছে, তাতে অধিকাংশ রায়ত যোগদান করেন নি। তার কারণ, ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস ঐ নির্ব্বাচনে দেশের লোককে যোগ দিতে নিষেধ করেছিল। সে নিষেধ অধিকাংশ রায়তই মান্য করেছে; কিন্তু অনেক লোক, বিশেষ ক'রে জমীদার সম্প্রদায় ঐ নিষেধ মানে নি। তার ফল হয়েছে—বর্ত্তমান আইনসভায় রায়তদের পক্ষসমর্থন করবে, এমন সভ্যের সংখ্যা কম, জমীদারপক্ষের লোকই সম্ভবত বেশী। বর্ত্তমান সভ্যদের নিয়ে আইনসভার আয়ু আর এক বছর আছে। তার পর নূতন নির্ব্বাচন হয়ে নূতন সভ্যদের নিয়ে ঐ সভার পুনর্গঠন হবে, এবং তিন বছর চলবে। খুব সম্ভব, এই নূতন আইনসভাতেই প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন প্রস্তাব উঠবে। কিন্তু আপনারা অবশ্যই শুনেছেন, এবারও কংগ্রেস অধিকাংশ সভ্যের মতে দেশের লোককে উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন আইন-সভার আগামী নির্ব্বাচনেও কোনও যোগ না দেয়। অর্থাৎ রায়তেরা যেন ভোট দিয়ে তাদের সপক্ষের লোক যাতে বেশী সংখ্যায় ঐ সভায়, যেতে পারে ও তাদের বিপক্ষের লোকের সংখ্যা বেশী না হয়, সে চেষ্টা না করে। কংগ্রেসে যে সব সভ্যের মতে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তাঁরা মত দেবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোনও কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করেন নি। এতে রায়তদের স্বার্থের কি হানি হবে না হবে, সে সম্বন্ধে কোনও বিচার বা আলোচনা তাঁরা করেছেন ব'লে শোনা যায় নি। যদিচ চাষীই হ'ল এদেশে সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং কংগ্রেসের কর্ম্মীরা যখন এই উপদেশ আপনাদের মধ্যে প্রচার করতে আসবেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন, দেশের জমীদার সম্প্রদায় এই উপদেশমত চলবে, এ তাঁরা বিশ্বাস করেন কি না? যদি না করেন, তবে শুধু রায়তরা এ উপদেশ মানলে, তার ফল রায়তের উপর কি রকম হবে? আগামী আইন-সভায় প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পরিবর্ত্তন প্রস্তাব উঠবে জেনে নিশ্চয়ই জমীদার সম্প্রদায় চেষ্টা করবেন এবং গেল বারের নির্ব্বাচনের চেয়ে অনেক বেশী চেষ্টা করবেন, যাতে তাঁদের পক্ষের লোকই বেশী সংখ্যায় সভ্য হ'তে পারে এবং ভোটের জোরে পরিবর্ত্তনগুলি জমীদারদের অনুকূলে করিয়ে নিতে পারে। এখন কংগ্রেসের উপদেশ যদি রায়তদের বেঁধে নিশ্চেষ্ট ক'রে রাখে, তবে আইনসভার ভোটে জমীদারেরা তাদের টুঁটি চেপে ধরলে, রায়তদের বাঁচাবে কে এবং কেমন ক'রে? আসল-কথা, এই আইন-সভাগুলির আপনাদের হিত করবার ক্ষমতা অতি কম, নাই বললেই চলে, কিন্তু অহিত করবার ক্ষমতা অসীম। রায়ত জমীদারের স্বত্বের তর্কে যে সব লোকের রায়তদের বিরুদ্ধে যাওয়াই সম্ভব, যদি বাঙ্গালাদেশের রায়তের আইন সভা থেকে বাইরে রেখে নিজ পক্ষের লোক দিয়ে ঐ সভা পূর্ণ করার চেষ্টা না করে, যদি পড়ে মার খাওয়াই তাদের পরামর্শ হয়, তবে দুর্দ্দশার হাত থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। কংগ্রেস যখন আইনসভার প্রথম নির্ব্বাচনে দেশের লোকদের যোগ দিতে নিষেধ করেছিল, তখন কংগ্রেসের আশা ছিল, বছরখানেকের মধ্যেই দেশের শাসনপ্রণালীর বদল হবে, সুতরাং এর মধ্যে ঐ আইন-সভা যদি কিছু দেশের অহিত করে, তাতে যাবে আসবে না। কিন্তু এবারকার কংগ্রেস দেশের লোককে সে আশা দিতে

পারেন নি। ধীরে-সুস্থে কায চলারই বন্দোবস্ত করেছেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান দেশশাসনপ্রণালী যে দীর্ঘ দিন ধ'রে থাকবে না,এ আশা কংগ্রেস এখন কাউকে কর্ত্তে বলেন না; এবং যদি তা হয়, তবে দীর্ঘকাল আইনসভাগুলি জমীদারদের ও তাঁদের সপক্ষের লোকের হাতে থাকলে রায়তদের কি সর্ব্বনাশ হবে না? তাদের বাঁকা মেরুদণ্ড কি একবারে চূর্ণ হয়ে যাবে না? সুতরাং আইনসভার আগামী নির্ব্বাচনে বাঙ্গালার রায়তদের কোন্ পথে চলা উচিত, তা সমস্ত দেশের রায়তদের মধ্যে আন্দোলন ও আলোচনা হয়ে স্থির হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

আইনের চাপে রায়তদের যে অসুবিধা ও বদ্‌হাল, তা ছাড়াও যে তাদের উপর নানারকম বে-আইনী দাবী,আদায় ও আবুয়াব আছে, তা দেশের সকলেই জানে। রায়তদের মধ্যে একটু আধটু আন্দোলন সুরু হওয়া ও প্রজাস্বত্ব আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের কথা ওঠামাত্রই আমাদের দেশের জমীদারেরা দল বেঁধে লাট বড়লাটের বাড়ী গিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন—তাঁরা বড় রাজভক্ত লোক, আইন ও শৃঙ্খলার গোঁড়া ভক্ত; তাঁদের সুবিধা ও অধিকারে যেন কোনও হাত না পড়ে। রায়তেরা কি বলতে পারে না বাঙ্গালার জমীদারদের যদি আইন শৃঙ্খলায় এতই ভক্তি, তবে আইনের পর আইন হওয়া সত্ত্বেও বে-আইনী আদায় ও আবুওয়াব দেশে এখনও চলছে কেন? নিজের স্বার্থে ঘা লাগলেও আইনে যার ভক্তি থাকে, তারই আইনভক্তি যথার্থ। নইলে যে আইনের সবটা মধু নিজের মুখে আর সমস্তটা হুল পরের পিঠে, সে আইনের কে না ভক্ত? সে যা হোক, আমাদের দেশের রায়তরা যদি এ সব জুলুম বন্ধ করতে চায়, তাদের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, কোনও অন্যায় ও অত্যাচার তাঁরা সহ্য করবেন না; বে-আইনী কোনও আদায় বা আবুওয়াব তারা কখনও দেবে না। এ কায সহজ নয়। এতে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। কারণ, অনেক দিন যারা বে-আইনী অত্যাচার সহ্য করেছে, তারা যদি বলে, 'আমরা আর সহ্য করব না', তবে অত্যাচারীরা তাকেই আইন অমান্য ও শান্তিভঙ্গ ব'লে প্রচার ক'রে, আইন ও শৃঙ্খলার পাহারাওয়ালাদের লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের অত্যাচারকে কায়েম রাখতে চায়। কিন্তু এ সব আশঙ্কা সত্ত্বেও অন্যায়কে বাধা দেওয়ার অন্য পথ নাই। কারণ, যারা নির্ব্বিরোধে অত্যাচার সহ্য করে, তাদের উপর অত্যাচার হবেই; কোনও আইন বা ব্যবস্থা তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু এ সব অন্যায় বা বে-আইনী জিনিষে রায়তেরা কখনই প্রত্যেকে আলাদা থেকে, বাধা দিতে পারবে না। তারা দুর্ব্বল, গরীব, অজ্ঞান। যারা প্রবল, ধনশালী ও পৃথিবীর হাল-চাল জানে, তাদের সঙ্গে লড়তে তাদের একমাত্র বল—তারা সংখ্যায় বহু। কিন্তু সংখ্যায় বেশী থাকার ফল পাওয়া যায় একমাত্র দল বাঁধলে, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে নয়।

এই দল বাঁধার কাযই আজ বাঙ্গালাদেশের রায়তদের প্রথম ও প্রধান কায। কি নিজেদের অনুকূলে আইন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা, কি অন্যায় ও বে-আইনীকে বাধা দেওয়া কিছুই সম্ভব হবে না—যদি সমস্ত দেশের রায়তরা দল বেঁধে এ কাযে হাত না দেয়। প্রত্যেক জেলাকে সুবিধামত ভাগে ভাগ ক'রে প্রত্যেক ভাগে রায়তদের একটি স্থায়ী সমিতি গড়তে হবে ও এই সমিতিগুলির মধ্যে যোগস্থাপনের জন্য একটি জেলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং দেশের সমস্ত জেলার রায়তদের একত্র করার জন্য এই জেলা-সমিতিগুলি নিয়ে বাঙ্গালা-জোড়া একটি রায়ত-সমিতি গ'ড়ে তুলতে হবে। যদি এ কায রায়তরা ক'রে উঠতে পারে, তবে তাদের এই মহাসমিতির ক্ষমতা হবে অসীম। তখন সমস্ত দেশের ৩ কোটি সঙ্ঘবদ্ধ রায়তের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ এবং তাদের মতামত কেউ তুচ্ছ এবং উপেক্ষা করতে সাহস করবে না।

কিন্তু কেবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইএর জন্যই যে রায়তদের এই দল বাঁধা প্রয়োজন, তা নয়। আমি খুব ভেবে দেখেছি এবং আপনাদের সরলভাবে স্পষ্ট ক'রে বলছি, আপনারা জমীতে যে সব স্বত্বধান, আইন পরিবর্ত্তন ক'রে সেই সবই স্বত্ব আপনাদের দেওয়া হয়, সমস্ত বে-আইনী জুলুম ও আদায় যদি বন্ধ হয়, তবুও আপনাদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না! রায়তদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘোচাতে হ'লে চাই তাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার। তাদের বাসস্থান বাঙ্গালার গ্রামগুলি থেকে রোগ ও সব রোগের কারণ দূর করা, রায়তের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটান। রায়ত-সমিতিগুলিকে বিশেষ ক'রে এই তিন কাযে হাত দিতে হবে;

এবং এই তিন কায যত সফল হবে, রায়তদের দুর্দ্দশাও তত মোচন হবে। রায়তদের এই সব মঙ্গল-কাযে গভর্ণমেণ্ট ও জমীদার এঁদেরই অগ্রণী হওয়া উচিত; এবং এজন্য নানা সরকারী বিভাগ ও কর্ম্মচারী আছে। কিন্তু জমীদাররা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সরকারী বিভাগগুলির কল চালাতে যত খরচ হয়, তার সিকি মূল্যেরও কায আদায় হয় না। কিন্তু সেজন্য কেবল রাগ ক'রে কোনও লাভ নাই। মর্‌তে যখন রায়তই মর্‌ছে, তখন বাঁচার চেষ্টাও নিজেদেরই কর্‌তে হবে।

রায়ত-সমিতিগুলির চেষ্টা হবে, যেন তাদের এলাকার মধ্যে কোন রায়তের ছেলে এবং সম্ভব হ'লে মেয়ে নিরক্ষর না থাকে। এজন্য সমিতির সভ্যদের নিজেদের চেষ্টায় ও অর্থে উপযুক্ত সংখ্যায় পাঠশালা ও স্কুল বসাতে হবে। এ যুগে যার বিদ্যা নাই, তার বল নাই। যে পৃথিবীর খোঁজখবর রাখে না, পৃথিবীও তার খোঁজখবর রাখে না; এবং সাংসারিক সুখ-সুবিধার জন্যই যে কেবল লেখা-পড়া দরকার, তা নয়। পৃথিবীতে যাদের মন বড়, তাদের বড় মনের বড় কথা, যাঁরা ধার্ম্মিক, তাঁদের ধর্ম্মের কথা, যাঁরা মানুষের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দকে চিরস্থায়ী আকার দিয়ে রচনা করতে পারেন, তাঁদের রচনা, যারা জ্ঞান আবিষ্কার করেছে, তাদের জ্ঞানের কথা—লেখার আকারেই প্রাচীনকাল থেকে জমা হয়ে আস্‌ছে। এর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে মানুষ এমন বড় জিনিষ থেকে বঞ্চিত থাকে যে, সাংসারিক লোকসানের চেয়েও তা বেশী লোকসান। শিক্ষার অভাব যে কত বড় অভাব, তা যদি একবার দেশের রায়তরা ভেবে দেখেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা কর্‌বেন, বিদ্যাশিক্ষার অভাবে যে অসুবিধা ও লোকসান তাঁরা নিজেরা ভোগ করেছেন, তাঁদের ছেলেদের ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের তা কখনই ভুগতে দেবেন না।

বাঙ্গালাদেশের সব গ্রাম থেকে যাতে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ দূর হয়ে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ফিরে আসে, সে কাযে রায়ত-সমিতিগুলিকে প্রাণপণে লাগ্‌তে হবে। শরীর খাটিয়ে রায়তকে ভাত কর্‌তে হয়। সুতরাং রোগ কেবল তার শরীরকে কষ্ট দেয় না; তার দারিদ্র্য আনে, তার নিজের ও তার স্ত্রী-পুত্রপরিবারের অন্নাভাব ঘটায়। ডোবা, জল, জঙ্গল যেখানে রোগের কারণ, সেখানে ওগুলিকে দূর কর্‌তে হবে, স্নান ও পানের জলের অভাবে যেখানে রোগ হয়, সেখানে পুকুর কাট্‌তে হবে, ইন্দারা দিতে হবে। কি ক'রে রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়, তা না জানাই রোগের কারণ হ'লে সে জ্ঞান প্রচার কর্‌তে হবে এবং স্বাস্থ্যের সে সব নিয়ম যাতে সকলে মান্য করে, তা দেখতে হবে। সমিতিগুলির সাহায্যে দল-বদ্ধ হয়ে যদি রায়তরা এ সব কাযে মন ও হাত দেন, তবে প্রত্যেকের সামান্য পরিশ্রম ও সাহায্যেই তাঁরা নিজেদের গ্রাম ও শরীরকে রোগমুক্ত কর্‌তে পার্‌বেন। যে কায বহু আড়ম্বরে এবং মাহিয়ানা বাবদ অনেক খরচ ক'রে গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি কিছুই কর্‌তে পারেন নি, অতি সহজে ও অল্প খরচে সে কায সম্পন্ন হবে। রোগ হ'লে রায়তরা চিকিৎসা ও ঔষধ পায়, সে কাযের ভারও এই সমিতিগুলির নিতে হবে। চেষ্টা কর্‌লেই প্রতি সমিতির বা দু' তিন সমিতির একত্রে একটি ছোট ঔষধখানা ও একজন উপযুক্ত ডাক্তার, কবিরাজ কি হকিম রাখা অসম্ভব হবে না। সমিতি থেকে কিছু সাহায্য পেলে, সমিতির সভ্যদের চিকিৎসক হিসাবে সমিতির এলাকার মধ্যে এসে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাবার উপযুক্ত যথেষ্ট চিকিৎসক পাওয়া যাবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

রায়তদের দুরবস্থা দূর করতে হ'লে সব চেয়ে প্রধান কায তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা। কারণ, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি স্বাস্থ্যরক্ষা সবার জন্যই পয়সা চাই; এবং অনেক রোগেরই কারণ না খেতে পেয়ে শরীরের দুর্ব্বলতা। রায়তদের আর্থিক উন্নতির উপায় ফসল বেশী করা এবং যাতে সে ফসলের উপযুক্ত ও ন্যায্য দাম রায়তরা পায়, তার ব্যবস্থা করা। কিসে ফসল বাড়ে ও ভাল হয়, রায়ত-সমিতিগুলি সে জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে রায়তদের মধ্যে প্রচার কর্‌বে, এবং সমিতির সভ্যরা যাতে সে জ্ঞান কাযে লাগাতে পারে, তার সাহায্য কর্‌বে। রায়তরা যে সব সময় তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত দাম পায় না, তা পাটের দামের ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন। পাট এক বাঙ্গালী চাষীর জমীতেই হয়। পাট না হ'লে এখন পৃথিবীর অনেক ব্যবসাবাণিজ্যই চলে না। অথচ এমনও ঘটে, বাঙ্গালার চাষী পাট বিক্রী ক'রে তার চাষের খরচের

টাকাটাও পায় না। এর কারণ—যারা পাট কেনে, তারা দল বেঁধেছে। কত পাট পৃথিবীর কাযের জন্য কোন্ বছর দরকার, তারা তা জানে। সুতরাং তারা দল বেঁধে চেষ্টা করে, যত কম দামে সম্ভব, চাষীর কাছ থেকে পাট কিন্‌তে। এর প্রতীকার করতে হ'লে চাষীদেরও দল বাঁধতে হবে; এবং তাদেরও খোঁজ রাখতে হবে, কোন্ বছর কত পাট বিক্রী হওয়া সম্ভব। সেই অনুসারে তাদের জমীতে পাট দিতে হবে, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট না হয়। কারণ, তা হ'লে পাটের দাম কম হবেই হবে। রায়ত-সমিতিগুলির প্রতি বছর এই খবর সংগ্রহ ও প্রচার করতে হবে। দেখতে হবে, ঠিক উপযুক্ত পরিমাণ জমীতে পাট বোনা হয় এবং উপযুক্ত দামের চেয়ে কম দামে কেউ পাট না বেচে বা বেচ্‌তে না বাধ্য হয়। যদি বাজারে ন্যায্য দাম ওঠার জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়, তবে যারা দারিদ্র্যের জন্য তাতে অসমর্থ, তাদের সাময়িক সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও সমিতিগুলির করতে হবে।

এ সব কাযই কঠিন এবং একদিনে হবে না। কিন্তু কোনও বড় বা ভাল কাযই সহজ নয়, এবং এক দিনের কায নয়। আজ আপনাদের প্রথম চেষ্টা হবে দল বাঁধা, রায়ত-সমিতিগুলি গ'ড়ে তোলা। দল বাঁধার কথা মুখে বলা যত সোজা, কাযে অত সোজা নয়; এবং দল বেঁধে তাকে বাঁচিয়ে রাখা আরও কঠিন। কারণ, দল বাঁধতে ও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে, দলের লোকদের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়, এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হয় ও পরস্পরের বিশ্বাসের উপযুক্ত হ'তে হয়। এ না হ'লে দল বাঁধা যায় না ও বাঁধা দল টিঁকে থাকে না। তার পর কায থাকলেই তবে দল থাকে। যে সব কাযের জন্য দল বাঁধা, দলের লোকের সে সব কাযে যত দিন উৎসাহ থাকে, তত দিনই দল বেঁচে থাকে। এই উৎসাহের অভাব ঘটলে নামে থাকলেও কাযে সে দল মরা। অর্থাৎ রায়ত-সমিতিগুলি গড়তে হ'লে ও তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে এই সমিতিগুলিরও কাযে সমস্ত সভ্যের উৎসাহ থাকা চাই। সাময়িক উৎসাহকে স্থায়ী করা সব চেয়ে কঠিন কায। কিন্তু রায়তরা যদি তাঁদের মঙ্গল চান, তবে এই কঠিন কাযেই তাঁদের হাত দিতে হবে। অন্য কোনও সোজা রাস্তা তাঁদের জন্য খোলা নাই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। সে হ'ল হিন্দু-মুসলমানে মিলনের কথা। আপনারা আজ দেশের সবার মুখে শুনছেন, হিন্দু-মুসলমান একমন হয়ে কায না করলে কোন কাযই হওয়া সম্ভব নয়; এবং উভয়ে বিরোধ হ'লে হিন্দুরও মঙ্গল নাই, মুসলমানেরও মঙ্গল নাই। যারা এক দেশে থাকে, এক ভাষায় কথা বলে, তাদের অমিল ঘটতে পারে—যদি তাদের কোনও স্বার্থের বিরোধ থাকে। আপনারা জানেন, হিন্দু-মুসলমান বাবু লোকরা কে কয়টা সরকারী চাকরী পাবেন, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বিরোধ করেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের হিন্দু চাষী ও মুসলমান চাষীর মধ্যে স্বার্থের কোনও বিরোধই নাই। যে জমী আপনাদের জীবন, তাতে হিন্দুর ব'লে শস্য বেশী হয় না। মুসলমানের ব'লে কম হয় না। বর্ষার বৃষ্টি মুসলমানের জমীতে বেশী ও হিন্দুর জমীতে কম বর্ষে না। মুসলমানের পাট ও হিন্দুর পাট একই দামেই বিক্রী হয়। গ্রামে রোগ আসলে হিন্দুও যেমন ভোগে, মুসলমানও তেমনি ভোগে। বন্যা যখন আসে, তখন হিন্দুমুসলমানে ভেদ করে না। আপনাদের সমস্ত স্বার্থ এক, কোনও যায়গায় বিরোধ নাই। যারা হিন্দু চাষী ও মুসলমান চাষীর মধ্যে বিরোধ ঘটাতে চায়, বেশ জানবেন, তারা হিন্দুর স্বার্থও চায় না, মুসলমানের স্বার্থও চায় না। তারা খোঁজে নিজেদের স্বার্থ। সেই সব লোককে হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক, আপনারা দূরে রাখবেন। যদি ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান চাষীর মধ্যে বিরোধের কোন কারণ থাকে, আপনারা আপোষে তা মিটিয়ে নেবেন। সামান্য একটু স্বার্থত্যাগ করলেই এ কায সম্ভব হয়। আমার ভরসা আছে, বাঙ্গালাদেশের হিন্দু চাষী ও মুসলমান চাষী পরস্পরে মিলের আদর্শ দেখিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে জানাবে, কেমন ক'রে হিন্দুমুসলমানের মিলন সম্ভব। *

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

* বগুড়া রায়ত কন্‌ফারেন্সে পঠিত।

দুরাকাঙ্ক্ষা।

১

কুন্দ তাহার স্বামীকে ভালবাসিতে পারিল না। স্বামীর "অপরাধ"—স্বামী ধনী নহে, স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে অনিচ্ছুক, স্বামী আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট।

রূপ কুন্দ তাহার জননী মহামায়ার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল এবং মহাজনের চতুর পুত্রের অংশে যেমন পিতার সঞ্চিত অর্থ বাড়িয়া যায়—তাহার দেহে রূপ তেমনই অসাধারণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মহামায়ার পিতা ধনী না হইলেও তাঁহার জ্ঞাতিদিগের মধ্যে এক ঘর বড় জমীদার এবং তাঁহাদেরই সঙ্গে কুটুম্বিতায় তাঁহারও বহু ধনী কুটুম্ব ছিলেন। মহামায়া আপনি যে গৃহস্থঘরে পড়িয়াছিলেন, সে জন্য একটা আক্ষেপ তাঁহার মনে ছিল; তিনি কেবল অদৃষ্টে বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরিয়া সে আক্ষেপটাকে প্রবল হইতে দেন নাই। তাঁহার মেয়ে কুন্দকে দেখিয়া লোক যখন বলিল, "এ মেয়ে হাজারে একটি—এর বিয়ে বড়ঘরেই হবে," তখন তিনি আশার আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলেন। তিনি মেয়েকে আদর করিয়া বলিতেন—

> শোন কুন্দকলি, তোমায় বলি,
> হবে রাজার গলার মালা;
> ফেলে মুক্তো-হীরে, আদরক'রে,
> নেবে তোমায় রূপের ডালা।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল মহামায়া আশার আকাশ-কুসুমটিকে যেরূপ যত্নে রাখিয়াছিলেন, তাহা কুন্দও লক্ষ্য না করিয়া পারে নাই। মা'র মনের ইচ্ছাটা মেয়ের মনেও স্থান পাইয়া পুষ্ট হইয়াছিল। মহামায়ার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার পিতা যে দুই একটি ধনীর গৃহে দৌহিত্রীর বিবাহের সম্বন্ধচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধনী জ্ঞাতির একমাত্র পুত্র কুমারনাথের সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব যে কেবল গুরুঠাকুরের আপত্তিতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পারিয়াছিল।

মহামায়ার স্বামী বিশ্বেশ্বরের প্রকৃতিটার সহিত স্ত্রীর প্রকৃতির একেবারেই মিল ছিল না। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত গণ্ডপ্রবণ লোক—জমী-জমা ধান গ্রামের ঘোঁট এই সব লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে—সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু মহামায়ার অন্তরে যে আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল ছিল, তাহাকে তিনি দুরাকাঙ্ক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন—মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবিত হইলে অবশ্যম্ভাবী ফল—অসাফল্য। মেয়ে রূপসী হইলেও যখন সাধারণ চেষ্টায় কোন ধনীর গৃহ হইতে সম্বন্ধে আগ্রহের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তিনি "মোটা গৃহস্থ" সচ্চরিত্র সুশীল প্রিয়নাথকে সুপাত্র বিবেচনা করিলেন এবং স্ত্রীর বিশেষ আপত্তি থাকিলেও তাহারই হাতে কন্যাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আবার জমী-জমা ধান ও ঘোঁট লইয়া ব্যস্ত হইলেন। মহামায়ার মনে হইল, যে মালা তিনি রাজপুত্রকে উপহার দিবার জন্য গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেই হইতে স্বামিস্ত্রীতে মনোমালিন্য ফুটিয়া উঠিল।

এই সব জানিয়া ও বুঝিয়া কিশোরী কুন্দ স্বামীর ঘর করিতে আসিল। সে ঘরে স্বামী আর শাশুড়ী। শাশুড়ী বধূকে যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না—স্বামীর ভালবাসা প্রবলই ছিল। কিন্তু কুন্দ সে সব উপেক্ষা ও অবহেলা করিত।

দৈহিক শ্রম সে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল—অথচ গৃহস্থের ঘরে বধূকে সর্ব্ববিধ দৈহিক শ্রম পরিহার করিলে চলে না। সকলেই বলিত, প্রিয়নাথের যে বুদ্ধি ছিল, তাহাতে বিদেশে যাইলে সে হয় ত দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু সে স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। কুন্দর মনে পড়িত, তাহার মাতামহ তাহাকে ঠাট্টা করিতেন, "কুন্দকলি, তোমার একটা খোঁড়া বর দেব, যে তোমার কাছেই থাক্‌বে, কোথাও যেতে পার্‌বে না।" এ যে প্রায় সেইরূপ! প্রিয়নাথ যে কেমন করিয়া নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল, কুন্দ তাহা বুঝিতেই পারিত না—

দুইখানিমাত্র পাকা ঘর—আর সব খড়ের চাল, দাসদাসীর বাহুল্য নাই—এই অবস্থায় মানুষ কেমন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে ?

প্রিয়নাথ স্ত্রীকে এতই ভালবাসিত যে, তাহার বিরক্তিতেও সে বিরক্ত হইত না। আর বক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া কুন্দ কেবলই অসন্তোষের জ্বালায় জ্বলিত। সেই দুরাকাঙ্ক্ষার অনলে স্বামীর উপর তাহার ভালবাসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কুন্দ তখনও মনে করিতে পারিত না যে, দুরাকাঙ্ক্ষার অনল একবার প্রজ্বালিত করিলে, ইন্ধনের অভাব ঘটিলে তাহা যে প্রজ্বালিত করে, তাহাকে দগ্ধ করিয়া তবে নির্ব্বাপিত হয়।

২

পরিপূর্ণ যৌবনে কুন্দ মা হইতে পিত্রালয়ে আসিল। তাহার প্রথম সন্তান পুত্র যেন মাতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কুন্দ তাহাকে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহভাণ্ডের পুণ্যসুধা দিতে পারিল না—তাহার সে ভাণ্ড যে সে পূর্ণ হইতেই দেয় নাই। যাহারা পুত্রকে রাজপুত্রের মত রাখিতে না পারে, সেই দরিদ্রদের ঘরে পুত্র জন্মে কেন ? বিশেষ পুত্রের আবির্ভাবে তাহার স্বামীর ও শাশুড়ীর আনন্দের আতিশয্যে সে যেন চেষ্টা করিয়া তাহার হৃদয়ে স্নেহপ্রস্রবণের মুখ রুদ্ধ করিয়া দিল। মাতৃত্ব তাহার উজ্জ্বল রূপে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিতে পারিল না। সে রূপ বিদ্যুতের মত প্রবল, উজ্জ্বল; বিদ্যুতেরই মত মনোহর। কন্যার দিকে চাহিয়া মহামায়া আপনার অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিতেন, কন্যার অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিতেন—প্রাসাদের মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহে স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ স্ফটিকাধার ব্যতীত আর কোথাও কি এ বিদ্যুৎ শোভা পায়, না এ বিদ্যুৎ রাখা যায় ?

পুত্রের বয়স যখন ছয় মাস হইল, তখনও "যাইবে—যাইবে" করিয়া নানা ছলে মহামায়া কন্যাকে কাছে রাখিলেন; কন্যাও স্বামীর গৃহে যাইতে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না। সেই সময় মহামায়ার পিতৃগৃহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের আয়োজন হইল। মহামায়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। দাদামহাশয়ের ও দিদিমা'র আহ্বান ছিল; কুন্দ মা'র সঙ্গে গেল।

বিবাহের সময় দাদামহাশয়ের ধনী জ্ঞাতি কুমারনাথ বংশের প্রধানরূপে আসিয়া "দাঁড়াইয়া" কায করিয়া গেল—তাহার বিধবা জননীও কয় দিন আসিয়া উপদেশ ও দ্রব্যাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

বিবাহের পর এক দিন মহামায়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কুমারনাথের মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় কি একটা কাযে বা কাযের ছলে কুমারনাথ সেই ঘরে আসিয়া ডাকিল—"মা !"

অপরিচিতাদিগকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে মা মহামায়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন,"তোর পিসী।" কুমারনাথ প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "অনেক দিন দেখিনি কি না !" মা বলিলেন, "নইলে আর ছেলের আর মেয়ের লোক তফাৎ মনে করে কেন ?" কুমারনাথ আর কোন কথা বলিল না; তাহার দৃষ্টি কুন্দের মুখে পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে যেন একটু বিলম্ব করিল।

কুমারনাথ বাহির হইয়া যাইতেছিল; মা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় ডাকছিলি কেন ?"

সে বলিল, "বল্‌তে এসেছিলাম, আমার নূতন গাড়ী এইবার এসে পৌছবে।"

দ্বারের কাছে সে মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটি কে ?"

"তোর পিসীর মেয়ে।"

"দিব্যি মেয়েটি।"

পুত্র চলিয়া গেল; মা ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, "আমি ত মনে করেছিলাম, ওকেই ঘরে আন্‌ব; কর্ত্তারও মত ছিল; কেবল গুরুঠাকুর আপত্তি কর্‌লেন। ও-ও তেমন ঘরে পড়্‌ল না; আমারও—"

মহামায়া ও কুন্দ উভয়েই সব কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মা'র কথার মধ্যে যে আশঙ্কা ও আক্ষেপ ছিল, তাহার স্বরূপ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিয়া মা শঙ্কিতা হইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যে সব সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইত, তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি কুন্দর মত রূপসী স্ত্রী পাইয়া পুত্রের রূপতৃষ্ণা নিবারিত হইত, তবে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

অল্পক্ষণ পরেই কুমারনাথের স্ত্রী সেই কক্ষে আসিলেন। তখনও কুমারনাথের প্রশংসাবাদ কুন্দর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল—"দিব্যি মেয়েটি"। কুমারনাথের পত্নীকে সে বিবাহের দিনও দেখিয়াছিল—আজ ভাল করিয়া দেখিল। রূপের বাহুল্য কোন দিনই তাঁহার ছিল না—যেমন কেবল "দু' কুড়ি সাতের খেলা" রাখা,তেমনই চলনসই রূপসী; আবার দুইটি সন্তান প্রসব করিবার ফলে সে রূপ ধূমমলিন কাচাবরণের মধ্যস্থ দীপশিখার মত হৃতশ্রী দেখাইতেছিল। সযত্নে সজ্জা করিবার সময় দর্পণে তাহার আপনার যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহার কথা কুন্দর মনে পড়িল। তাহার সঙ্গে তুলনায়—? সঙ্গে সঙ্গে কুন্দর মনে পড়িল, বিবাহের দিন নিমন্ত্রণ-সভায় সে ইহারই অঙ্গে যে সব মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিয়াছিল—সেই মুক্তার মালা, হীরার বালা, চুণীর চুড়ী। সে সব কি ইহাকে তেমন মানাইয়াছিল? তাহার বুকে ব্যথা ও চক্ষুতে অশ্রু সে যেন আর রোধ করিতে পারিতেছিল না।

পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "বৌমা, আজ কি চুল শুকাবারও সময় পাও নি?"

পুত্রবধূ তথায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আর পারি নে, মা! দু'টো যে দুষ্টু হয়েছে; মেয়েটা আবার ছেলের চেয়েও দুষ্টু! এই এতক্ষণে ঘুম পাড়িয়ে এলাম—যেন পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'ল।"

মহামায়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এ যে ভিজে একেবারে গোবর, বৌমা! নইলে চুলটা বেঁধে দিয়ে বাড়ী যেতাম।"

সেই অবসরে কুন্দ চাহিয়া দেখিল—চুল "গোছে" সরু—লম্বাও যৎসামান্য; বোধ হয়, প্রসবের পর অযত্নে উঠিয়া গিয়াছে। এই চুলে খোঁপা বাঁধা! খোঁপা যে ডবল পয়সার মত হইবে! তাহার মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার কেশ বন্ধনমুক্ত করিলে তরঙ্গায়িত হইয়া গুল্‌ফ ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু—কুন্দ মনকে যেন একটা আঘাত করিয়া বলিল, এ সব তুলনায় ফল কি? যে নারীর প্রিয়তম, তাহার তৃপ্তিতেই যে নারীর রূপের সার্থকতা—সে কথা কুন্দ মনে করিতে পারে নাই; দরিদ্র প্রিয়নাথকে সে যে ভালবাসিতে পারে নাই।

কুমারনাথের মাতা, বোধ হয়, সকলকে শুনাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়াই, বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুমার ব'লে গেল, তা'র নতুন গাড়ী আসছে।"

বধূ কোন উত্তর না দিলেও তিনি বলিলেন, "সেই যে হাওয়াগাড়ী নতুন উঠেছে; ঘোড়া নেই—কলে চলে। কল্‌কাতায় কেবল আমদানী হচ্ছে। বলে বারো হাজার টাকা দাম! কি যে করে—টাকাগুলো যেন ঘণ্ট করছে।"

মহামায়া ও কুন্দ সবিস্ময়ে সব শুনিলেন। মহামায়া বলিলেন, "এত দাম!"

"হ্যাঁ, ভাই; তবে ভাবি, ওর ত আর সরিক নেই; যদি ও আনন্দ পায়, করুক খরচ; কেবল বেহিসেবী না হ'লেই হ'ল। এ দিকে মনটা তোমার দাদার মনের মত সাদা—বলেছে, গাড়ী এলে পাড়ার সবাইকে আগে চড়াব।"

মহামায়া সায় দিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক। সে দিন দেখলাম, কাযের সময় নিজে গিয়ে যেমন করা কর্ত্তব্য, তা' করলে।"

"আশীর্ব্বাদ কর, ভাই, বেঁচে থাক্, ভাল থাক্।"—বলিয়া কুমারনাথের মাতা কি একটা কাযের জন্য উঠিলেন; মহামায়াও বিদায় লইয়া কুন্দকে সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন।

তাঁহারা গৃহে ফিরিলে মহামায়ার মাতা বলিলেন, "ও বাড়ী থেকে এলি? তখন চেষ্টা করেছিলাম—যদি ও বাড়ীতে কুন্দর বিয়ে হ'ত, আমার কাছেই থাকত। তা' গুরুঠাকুর বল্লেন—এ বিয়ে হ'বে না।"

মহামায়া বলিলেন, "বৌঠাকরুণও সেই জন্যে দুঃখ করছিলেন—কুন্দও তেমন ঘরে পড়ল না, তাঁরও তেমন বৌ হ'ল না।"

মা বলিলেন, "ও সব অদৃষ্ট; যা'র হাঁড়ীতে যে চাল দেয়। বৌর অদৃষ্টে ছিল—ঐ ঘরে পড়েছে।"

"সে দিন বৌ এসেছিল, সেজেগুজে—অত ভাল ক'রে দেখিনি। আজ দেখলাম, শ্রী নেই—বৌ ভাল হয় নি।"

"তা' জানি। ছেলেরও, বোধ হয়, বৌ পসন্দ হয় নি। সেই ভয়েই ত মা যেন কাঁটা হয়ে আছে। এক ছেলে—থাকে থাকে কলকাতায় যায়—সেখানে অনেক টাকা খরচ ক'রে আসে। লোক কানাকানি করে।"

সেই দিন কুন্দ কেবলই ভাবিতে লাগিল—অদৃষ্ট! অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার কিসের বিরোধ যে, অদৃষ্ট তাহার সঙ্গে

বিমাতার মত ব্যবহার করিল? রূপ—সে সম্পদ তাহার ছিল—আছে;—কিন্তু তাহাতে তাহার কি হইয়াছে? অদৃষ্ট! আর ঐ যে বধূ, ও কি কারণে সুখের সংসারে সম্পদ সম্ভোগ করিতে পাইতেছে?

সে রাত্রিতেও কুন্দ বহুক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না—ভাবিতে লাগিল।

৩

মহামায়া যে দিন কন্যাকে লইয়া কুমারনাথের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহার পরদিনই কুমারনাথ মা'কে বলিল, "মা, মায়া পিসী এসেছিলেন; ওঁকে আর ওঁর মেয়েকে ত কাপড় আর মিষ্টি দিতে হবে?"

মা বলিলেন, "দিলে প্রশংসা, না দিলে নিন্দে নেই—কেন না, ওঁরা ত বেড়াতেই এসেছিলেন।"

"দিলে যদি প্রশংসা, তবে না হয় দাওই।"

পরদিন মা'র কাছ হইতে একখানা থালায় মিষ্টান্ন আর একখানা থালায় দুইখানা কাপড় ও একটু সিন্দুর লইয়া হারার মা আর বিন্দী ঝি মহামায়ার পিত্রালয়ে চলিল। হারার মা বুড়ী—গৃহিণীর খাস দাসী; আর বিন্দী বালবিধবা—গ্রামের কামারদের মেয়ে—বয়স বেশী নহে। তাহার কানে মাকড়ী আছে, হাতে কয় গাছা করিয়া বেলোয়ারী চুড়ী—পরণে ধুতিপাড় কাপড়। সে গ্রামের মেয়ে, তাই মাথায় বড় কাপড় দেয় না—কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও একটু গাপড়া হইয়া কথা কহে। যাইবার পথে সে হারার মা'কে বলিল, "মাসী, তুমি এগোও—মা বলেছেন, কাপড় দাদাবাবুকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে।"

বিন্দী কাপড় লইয়া উপরে বৈঠকখানার পাশে কুমারনাথের বসিবার ঘরে গেল। কুমারনাথ কাপড়ের আলমারী খুলিল—কুন্দর জন্য মা যে কাপড়খানা দিয়াছিলেন, সেখানা তুলিয়া লইয়া আলমারী হইতে একখানা শান্তিপুরে শাড়ী বাহির করিয়া দিল। সেখানার পাড়ে—গান লিখা। বিন্দী একটু মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

হারার মা মিষ্টির থালা খালি করিয়া লইয়াই ফিরিল; বিন্দী কুন্দর সঙ্গে গল্প ফাঁদিয়া বসিল। কুন্দ ঘরে একাই ছিল। বিন্দী নানা কথার মধ্যে বার দুই বলিল, দাদাবাবু মা'কে বলিয়াছেন, কুন্দ যে অমন রূপসী, তাহা ত তিনি জানিতেন না। সে কথায় কুন্দ যখন কোনরূপ লজ্জা প্রকাশ করিল না, তখন সে শুনাইয়া দিল, মা যে কাপড় দিয়াছিলেন—দাদাবাবু সেখানা না দিয়া এইখানা দিয়াছেন—"যা'কে যা' মানায়।"

যাইবার সময় বিন্দী কুন্দর মাতামহীকে বলিয়া গেল—"চল্লাম, ঠাকুমা। দিদিমণির সঙ্গে গল্পে গল্পে অনেক দেরী হয়ে গেল। দিদিমণির কথা এমন মিষ্টি!"

তাহার পর সে দিকে যাইবার পথে বিন্দী আরও কয় দিন কুন্দর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। কয় দিন পরেই গ্রামে একটা রব উঠিল—কুমারনাথের নূতন গাড়ী আসিয়াছে—এমন অদ্ভুত গাড়ী আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই—রেলের মত কলে চলে, অথচ রেলের মত রাস্তা লাগে না!

কুমারনাথের মাতা পাড়ার সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন—গাড়ীতে চড়িবেন। ছেলেরা ত আসিলই, বুড়ীরাও বাদ গেলেন না। এক একবারে কয়জনকে গাড়ীতে লইয়া কুমারনাথ খানিকটা করিয়া ঘুরাইয়া যাহাকে যাহার বাড়ীতে নামাইয়া আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে কুমারনাথের প্রশংসা—অমন ছেলে দেখা যায় না।

আর সকলের যখন মোটরগাড়ী চড়া হইয়া গেল, তখন অবশিষ্ট—কুন্দ, কুমারনাথের শিশু পুত্র আর বিন্দী। ছেলেটিকে কোলে করিয়া বিন্দী বসিল—আর তাহার পার্শ্বে কুন্দ। দেখিতে দেখিতে গাড়ী গ্রাম ছাড়াইয়া গেল, তখন গাড়ী থামাইয়া কুমারনাথ কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গাড়ী চালাবে?"

কুন্দ কোন উত্তর দিল না—লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিন্দী বলিল, "যাও না, দিদিমণি!"

কুমারনাথ নামিয়া দ্বার খুলিয়া কুন্দকে নামাইয়া সম্মুখের আসনে পার্শ্বে বসাইল; তাহার হাত গাড়ী চালাইবার চাকার উপর দিয়া হাত ধরিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। কুন্দ যেন কেমন বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কুমারনাথ আবার গাড়ী থামাইল—কুন্দ পশ্চাতের আসনে বিন্দীর পাশে আসিয়া বসিল। সে বিন্দীর মুখে যে হাসি দেখিল, তাহাতে যেন তাহারই অপরাধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে মেয়েকে লইয়া মহামায়ার স্বামীর গৃহে যাইবার কথা। পূর্ব্বদিন পাল্কী বেহারা আসিল—রাত্রিশেষে যাত্রার সময়।

মধ্যরাত্রি অতীত হইবার পর কুন্দর পুত্রের ক্রন্দনে মহামায়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, কুন্দ শয্যায় নাই—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সে ফিরিল না, তখন তিনি কন্যার সন্ধানে গমন করিলেন। গৃহের পশ্চাতের দ্বার মুক্ত—জ্যোৎস্নালোকে রাস্তার ধূলার উপর মোটর-গাড়ীর চাকার দাগ!

মহামায়া পিতামাতাকে ব্যাপার জানাইলেন। সর্ব্বনাশের স্বরূপ বুঝিতে বিলম্ব হইল না—কুমারনাথ পূর্ব্বদিন কলিকাতায় গিয়াছিল। সে নিশ্চয়ই আসিয়া রাত্রিকালে মোটর লইয়া আসিয়াছিল। গ্রাম হইতে রেল ষ্টেশন পাঁচ মাইল পথ—রাত্রির গাড়ীও চলিয়া গিয়াছে।

এ কথা ত ফুটিবারও উপায় নাই! মহামায়া শিরে করাঘাত করিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন, "চুপ কর, মা, যেন জানাজানি না হয়।"

স্থির হইল, মহামায়া কুন্দর পুত্রকে লইয়া রাত্রি থাকিতেই চলিয়া যাইবেন—স্বামীর গৃহে যাইয়া প্রকাশ করিবেন, বিসূচিকায় কুন্দ মরিয়াছে। মহামায়ার মনে স্বামী বিশ্বেশ্বরের উপর রাগটা যেন ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল—তাহার কথা না শুনিয়া স্বামী যে ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, সে ঘর কি তাহার উপযুক্ত! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, সে ঘর মেয়ের উপযুক্ত হউক বা না হউক—সে কেমন করিয়া এমন কায করিল! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। বেদনায় মহামায়ার বুকটা টনটন করিয়া উঠিল।

মহামায়ার পিতা যাইয়া বাহকদিগকে ডাকিয়া তুলিলেন—"ওঠ্ রে—সব ওঠ্। সকাল হ'ল ব'লে। যাত্রার সময় কেটে যাবে যে!"

বাহকরা উঠিয়া ধূমপান করিল—পাল্কী বাহির করিল। বেদনায় কাতর বুকে কুন্দর পুত্রকে লইয়া মহামায়া একখানা পাল্কীতে উঠিয়া বসিলেন। মহামায়ার এক ভ্রাতা দ্বিতীয় পাল্কীতে উঠিলেন—সঙ্গে যাইবেন।

বাহকরা পাল্কী তুলিল—মহামায়ার পিতা কন্যার যাত্রাকালে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

স্বামীর গৃহে পাল্কী প্রবেশ করিলেই পাড়ায় মহামায়ার ক্রন্দনশব্দ শ্রুত হইল—"কি কুক্ষণেই পা বাড়িয়েছিলাম গো! আমার সোনার কমল ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।"

৪

সংবাদ পাইয়া প্রিয়নাথ শ্বশুরালয়ে আসিল। এ আঘাতটা এমনই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত যে, অভাবের স্বরূপটা সে তখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিল না। যত দিন যায়, অভাব তত অনুভূত হয়।

মহামায়া জামাতাকে দেখিয়া আবার একবার কাঁদিয়া পাড়া জানাইলেন; তাহার পর প্রস্তাব করিলেন, ছেলে তাঁহার কাছে থাকুক—তিনি তাহাকে বুকে করিয়া "মানুষ" করিবেন। প্রিয়নাথ কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না—সে বুঝিয়াছিল, তাহার এই বই ত আর অবলম্বন নাই! তাহার ছেলে সে "মানুষ" করিবে। সে যদি মরিয়া যাইত, তবে কি কুন্দ আর কাহাকেও ছেলে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত? সে ছেলেকে লইয়া যাইবে।

শ্বশুর জামাতার কথায় সম্মতি দিলেন—তাঁহার মনে হইল, যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন—এখন যাহার ভার, সে বহুক, তিনি আর ও ঝঞ্ঝাট রাখিবেন না।

কেমন করিয়া এ দুর্ঘটনা ঘটিল, জানিবার জন্য প্রিয়নাথের কৌতূহল এত অধিক হইয়াছিল যে, সে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। সত্যকে মিথ্যা দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া পড়ে। শ্বশুর-শাশুড়ীর কথার মধ্যে কেমন যেন অবিশ্বাসের কারণ উঁকি দিতেছে বলিয়া প্রিয়নাথের মনে হইতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিয়াই আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না—একান্ত চেষ্টায় মনে এই বিশ্বাসই আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করিল যে, কুন্দ মরিয়াছে। প্রিয়নাথ মনে করিতে লাগিল—ইহজন্মে কুন্দ সুখী হইতে পায় নাই, জন্মান্তরে সে যেন সুখী হয়। এই অল্পবয়সে—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে চলিয়া গেল, তাহার জন্য করুণায় প্রিয়নাথের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল—তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে বুকে লইয়া প্রিয়নাথ যখন তাহার শূন্য গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন সে একবার আকাশের দিকে

চাহিয়া কুন্দর উদ্দেশে বলিল—"তুমি যেখানেই থাক, তোমার এই ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, সে যেন মানুষ হয়—যেন আমাকে তোমার এই স্মৃতি-চিহ্ন হইতেও বঞ্চিত হইতে না হয়।"

গৃহে আসিয়া মা'র সাহায্যে প্রিয়নাথ পুত্রকে লালন-পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাযের যেন কোন অভাবই রহিল না—একটি ছেলে "মানুষ" করার এত কায!

কুন্দর গর্ব্বিতভাবের জন্য শ্বশুরবাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাহার প্রশংসা ছিল না। তাই তাহার মৃত্যু-সংবাদে কেহ কেহ মুখে দুঃখ প্রকাশ করিলেও কেহই আন্তরিক দুঃখানুভব করিলেন না। আর সকলেই প্রিয়নাথকে "সৎপরামর্শ" দিলেন—"অদৃষ্টে যা' ছিল, হ'ল; এখন আবার বিয়ে কর, সংসারী হও।" বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বুঝাইলেন—"বুড়ী মা ছাড়া সংসারে ত আর কেউ নেই; এক দিন মাথা ধর্‌লে ছেলেটার দুধ গরম ক'রে দেবারও লোক থাক্‌বে না। বিয়ে কর।" সকলের পরামর্শে মাও যখন ছেলেকে সেই কথা বলিলেন, তখন প্রিয়নাথ বলিল, "কেন মা, তোমার কি ঐ অতটুকু একটা ছেলে 'মানুষ' কর্‌তে বড়ই কষ্ট হচ্ছে? যদি হয়—আমাকে বল্‌লে আমি আরও কায কর্‌ব।" ছেলে যে শিশুটির জন্য কত কায করে, তাহা মা'র অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বলিলেন, "তা নয়, বাবা, সবাই বলে, তুমি কি সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বে?"

প্রিয়নাথ হাসিয়া বলিল, "সন্ন্যাসীই বটে! আমি ত আমি, তোমাকেও এমনই জড়িয়ে ফেলেছি যে, তুমি ঠাকুর-পূজায় বস্‌তে সময় পাও না।"

সেই দিন হইতে মা আর সে কথা তুলিতেন না। প্রিয়নাথ নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলেটিকে লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। এক এক বার তাহার মনে হইত, এই ছেলেটিকে না পাইলে সে কি করিত; কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিত; শূন্য হৃদয় কিসে পূর্ণ করিয়া সে বাঁচিয়া থাকিত? সে যত তাহা মনে করিত, ততই নিবিড়তর স্নেহে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিত। পাড়ার লোক—আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই বলিত, "ছেলে 'মানুষ' কর্‌তে হয় ত প্রিয়নাথের মত। মাও এমন ক'রে ছেলের লালনপালন কর্‌তে পারে না। ধন্য মানুষ!"

ছেলেও রূপেগুণে যেন অতুলনীয় হইয়া উঠিল। বিদ্যায় সে গ্রামে আর কোন বালক তাহার সমান ছিল না। ক্রমে গ্রামের পার্শ্বেই জিলার সদর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বালক দেবদত্ত যখন সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল, তখন প্রিয়নাথের আনন্দের আর অবধি রহিল না। সেই আনন্দের মধ্যে তাহার কেবল কুন্দকে মনে পড়িতে লাগিল—সে বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাহার মাতৃ-হৃদয় কি আনন্দেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিত!

এইবার কিন্তু ছেলেকে ছাড়িতে হইল। পিতাকে ও পিতামহীকে ছাড়িয়া যাইতে দেবদত্ত যেমন কাঁদিল, তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে মনে করিয়া পিতামহী ও পিতাও তেমনই কাঁদিলেন। স্থির হইল, দেবদত্ত প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিবে। প্রিয়নাথ প্রথমে মনে করিয়াছিল, সপ্তাহের মধ্যে এক দিন যাইয়া ছেলেকে দেখিয়া আসিবে; কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিল, মা'কে ত সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না; কাযেই সে ইচ্ছা সে দমন করিল।

দেবদত্ত জানিত, ঠাকুরমা ও বাবা সপ্তাহ ধরিয়া তাহার আগমনপথ চাহিয়া থাকেন; কাযেই সে প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিত। সে দিন বাড়ীতে কি আনন্দ! যেন কত যুগ পরে সে ফিরিয়া আসিল। ছুটীর সময় সে কখন বাড়ী-ছাড়া থাকিত না; কেবল একবার সকলে পূজার ছুটীতে কাশী বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর এবং তাহার পর আরও দুই বৎসর কাটিল—উভয় পরীক্ষাতেই দেবদত্ত সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল। তখন পিতামহী তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন; গ্রামেই পরিচিত পরিবারের একটি সুন্দরী মেয়ে তিনি বাছিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার সহিত দেবদত্তের বিবাহ দিলেন। অনেক দিন পরে আবার ঘরের শূন্যতা পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, এইবার তাঁহার কায শেষ হইল।

তাহার পর এম, এ, ও আইন পরীক্ষায় প্রথম হইয়া দেবদত্ত জিলায় আসিয়া ওকালতী করিতে লাগিল। বোধ হয়, পিতামহীর ও পিতার আশীর্ব্বাদেই দেখিতে দেখিতে তাহার পশার জমিয়া গেল—শত ধারায় অর্থ আসিতে লাগিল।

তিন বৎসরের মধ্যে বাড়ী ভাঙ্গিয়া গড়া হইল—

পুষ্করিণীর সংস্কার হইল; প্রিয়নাথ গ্রামের সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার স্বভাবমাধুর্য্যে কেহ তাহাকে ঈর্ষ্যা করিত না।

এই সময় পরিপূর্ণ সুখের সংসার রাখিয়া পিতামহী দুই দিনের জ্বরে দেহরক্ষা করিলেন। গ্রামের লোক বলিল, তাঁহার মত ভাগ্যবতী নারী তাহারা কেহ কখন দেখে নাই।

৫

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়িকা কান্তিময়ীর বাড়ীতে দুই জন লোককে লইয়া এক জন দালাল উপস্থিত হইল—লোক দুই জন মফঃস্বলে একটা বড় শ্রাদ্ধে কীর্ত্তনের জন্য গায়িকাকে "বায়না" করিতে আসিয়াছিল। গায়িকা প্রৌঢ়া—যে জীবনযাপন করিয়াছে, তাহার নানা অত্যাচারও তাহার অসামান্য রূপের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে শ্রীহীন করিতে পারে নাই। কাহারও কাহারও দেহের গঠন এমনই যে, রূপের চিহ্ন কিছুতেই মুছে না।

গায়িকা প্রথমে মফঃস্বলে যাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহার পর—গ্রামের নাম শুনিয়া সে যেন কেমন অন্যমনস্ক হইল, একটু ভাবিয়া বলিল—"ভাল, যাইব।"

যখন পারিশ্রমিকের কথা উঠিল, তখন সে আর এক জনের উপর তাহা স্থির করিবার ভার দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

গ্রামের লোক প্রিয়নাথকে ধরিয়াছিল, তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে ভাল কীর্ত্তন শুনাইতে হইবে। প্রিয়নাথের সম্মতি পাইয়া দুই জন কলিকাতায় বায়নার জন্য আসিয়াছিল। কান্তিময়ী মফঃস্বলে বড় যাইত না; কিন্তু সে যখন গ্রামের নাম শুনিল, তখন আজিকার এই কীর্ত্তনগায়িকা কান্তিময়ীর ছদ্ম-আবরণ পড়িয়া গেল—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কুন্দ চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহার পরিচিত—যে গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল—যে গ্রামে সে পত্নী ও জননী হইয়াছিল—যে গ্রাম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এ যে সেই গ্রাম! সে যাইবে?—দেবদত্ত উকীলের বাড়ী; কেহ তাহাকে চিনিবে না। সে ত মরিয়াছে—এখন একবার প্রেতপুরী হইতে যাইয়া দেখিয়া আসিলে হয় না, সেই গৃহে কি হইয়াছে? ত্রিশ বৎসর—হয় ত সে সব কিছুই আর নাই। সে যাইবে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে—মৃত্যু যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে—কোন অজ্ঞাত শক্তি যেন তেমনই বলে তাহাকে আকৃষ্ট করিল। সেই আকর্ষণের প্রভাবে সে সম্মতি দিল—সে যাইবে।

ত্রিশ বৎসর!

যে মোহে কুমারনাথ ডাকিলেই কুন্দ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, সে মোহ নষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই। নারীর হৃদয়ে যে ভালবাসা থাকে, তাহা "পরকে আপন করে, আপনারে পর।" সে ভালবাসা সে ভাগ্যদোষে স্বামীকে দিতে পারে নাই; মনে করিয়াছিল, কুমারনাথ সে ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিবে। তাহার সে ভুল ভাঙ্গিতেও বিলম্ব হয় নাই; পরন্তু বড় শীঘ্রই—অপ্রত্যাশিত অল্পকালের মধ্যেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসা ভাবিয়াছিল, তাহা পিশাচের পিপাসা—সে যাহাকে কোমলা লতা মনে করিয়াছিল, তাহা বিষধর সর্প। তাহার দংশনে তাহার সমস্ত জীবন বিষাক্ত—তাহাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। তাহার পর?—মৃত্যুর পরও যদি কিছু থাকে? সে আর ভাবিতে পারিত না। যে উত্তেজনায় সে সেই ভাবনা ডুবাইতে পারিত, সে উত্তেজনা আবার তাহার সংস্কারের বিরোধী ছিল। কাযেই প্রফুল্লতা তাহাকে পরিহার করিয়া গিয়াছিল। আর তাহার সেই যে বিষণ্ণভাব, তাহা কুমারনাথের ভালই লাগিত না—যে তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া কুলে কালি দিয়া আসিয়াছে, সে তাহার কাযে এমন যাতনা পায় কেন? সে কায সে ত জানিয়াই করিয়াছে। কুমারনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে কুমারনাথের বিরক্তি যখন তাহার রূপতৃষ্ণাকে জয় করিল—সে চলিয়া গেল, তখন অসহায় হইয়াও কুন্দ যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল। জোয়ারের জল যেমন বৃন্তচ্যুত ফুলকে কূলে কর্দ্দমে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া যায়—কুমারনাথের রূপতৃষ্ণা তেমনই এই হতভাগিনীকে পাপের পিচ্ছিল পঙ্কে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। তখনও কুন্দের দেহে রূপ। আর শিক্ষায় ও অনুশীলনে তাহার কণ্ঠ মধুময়। সে যে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পথে এই দুই সম্বল বড় সাধারণ নহে। কিন্তু সেই দুই সম্বলের যেরূপ অপব্যবহার সাধারণতঃ সে পথে

হইয়া থাকে, সে ততটা অপব্যবহার করিতে পারিত না; পারিত না বটে, কিন্তু তবুও ঘৃণা পরিহার করিয়া—ঐ কণ্ঠের শ্রম করিয়া তাহাকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইত। সে যে লজ্জা, তাহাতে প্রথম প্রথম সে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত; কিন্তু অভ্যাসে সে লজ্জা দূর হইয়া গিয়াছিল। জীবিকার্জ্জন ছাড়া আরও একটা কারণে সে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে বাধ্য হইত। নহিলে সে কেমন করিয়া আপনার কাছে আপনার বেদনা গোপন রাখিবে—কেমন করিয়া অনুতাপের ও অনুশোচনার আক্রমণ প্রহত করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে?

প্রথম প্রথম সময় সময় কুন্দর মনে হইত, হয় ত সে স্বামীর প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই—প্রিয়নাথ যে কখন তাহার কোন দোষ দেখে নাই, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাই—সে হয় ত গভীর ভালবাসারই পরিচায়ক; সে হয় ত সে ভালবাসায় চাঞ্চল্যের অভাবই তাহার অস্তিত্বের অভাব বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু সে মনে করিত, এখন আর সে কথা ভাবিয়া কায কি?

স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। পিতাকে সে ভক্তি করিতে পারে নাই; কেন না, মা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, পিতার চেষ্টার অভাবেই সে দরিদ্রের গৃহিণী হইয়াছিল। সে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্যবহারের প্রতিশোধ লইয়াছে। পুত্রকেও সে ভালবাসে নাই—বলপূর্ব্বক মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের উৎস বন্ধ করিয়া দিয়াছিল—কেন না, সে দরিদ্র স্বামীর দরিদ্র পুত্র। এখন সে আর মা'কেও ভালবাসিতে পারিত না; মা তাহাকে কি ভুলই বুঝাইয়াছিলেন। তিনি তাহার হৃদয়ে যে দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন—তাহাতেই যে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহার বিষফল ভক্ষণ করিয়াই সে আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সংসারে মানুষকে ভালবাসিবার কেহ তাহার আর ছিল না।

প্রথম প্রথম কুন্দর মনে কৌতূহল হইত—সে চলিয়া আসিলে তাহার মা কি মনে করিয়াছিলেন, সে সংবাদ পাইয়া প্রিয়নাথ কি করিয়াছিল? কিন্তু ত্রিশ বৎসরে সে সব কথা বিস্মৃতির অতলতলে পড়িয়া গিয়াছিল। সে যেন তাহার হৃদয় হইতে সে সব স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছিল।

এত দিন পরে, এ আহ্বান কোথা হইতে আসিল? সেই গ্রাম! কিসের জন্য—কি ভাবিয়া সে যাইতে সম্মত হইল? গল্পে আছে, মৃত্যু প্রেতরূপে যাহাকে ডাকিয়া লয়, সে সব বাধা অবহেলা করিয়া তাহার অনুসরণ করে—আপনাকে ফিরাইতে পারে না। বুঝি এও তাহাই? নহিলে এত দিন পরে সেই গ্রাম হইতেই তাহার আহ্বান আসিবে কেন? আর কেনই বা অকারণ কৌতূহলে প্রলুব্ধ হইয়া সে সেই আহ্বানে তথায় যাইতে সম্মত হইবে? কুন্দ ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

যাত্রার দিন নিকট হইয়া আসিল।

৬

রাত্রিকালে কুন্দ যখন আর এক জন কীর্ত্তনগায়িকার সহিত রেলষ্টেশন হইতে শ্রাদ্ধবাড়ীতে পৌঁছিল, তখন সে স্থানটি চিনিতে পারিল না। পথে সে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও সামান্য—দেবদত্ত উকীল যুবক; রূপে গুণে সে অঞ্চলে তাহার মত ছেলে দুর্লভ। সে শৈশবে মাতৃহীন, পিতা আর বিবাহ না করিয়া ছেলেকেই "মানুষ" করিয়াছেন। পিতা ও পিতামহী গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন নাই বলিয়াই সে হাইকোর্টে ওকালতী না করিয়া জিলায় ওকালতী করিতেছে। ইহার মধ্যেই সে জিলায় সব পুরাতন উকীলকে পরাভূত করিয়া শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে—কয় বৎসরের মধ্যে অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারই পিতামহীর শ্রাদ্ধ।

দিবালোকবিকাশের পর কুন্দ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—বাড়ী চিনিতে পারিল না, কিন্তু যায়গাটা যেন চিনি-চিনি করিতে লাগিল। যেন নিশীথে দূরাগত বংশীরবে পরিচিত সুর শুনা যাইতে লাগিল—গানের কথাগুলা মনে পড়িতেছে না, কিন্তু পরিচিত সুরটা মনের মধ্যে "গুঞ্জরিয়া উঠে" মনে হইতেছে। শেষে রাজপথের পরপারে বিততশাখ অশোক গাছটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে বাড়ীর কাছে—রাস্তার পরপারে একটা বড় অশোক গাছ ছিল—ফাল্গুন চৈত্রে তাহার শ্যামপত্রমধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকুসুম ফুটিয়া উঠিত—প্রিয়নাথ সে দুই মাস প্রতিদিন সে ফুল আনিয়া ঘরে রাখিত—প্রথম মুকুল দেখা দিলেই মা'র ও স্ত্রীর "অশোকষষ্ঠীর" জন্য কতকগুলি আনিয়া রাখিয়া দিত। কুন্দ মনে মনে আপনাকে বিদ্রূপ

করিল—অশোকগাছ কতই আছে! কিন্তু আজ—ত্রিশ বৎসর পরে সে সব বিস্মৃত কথা কেবলই মনে হয় কেন?—বিস্মৃতির রুদ্ধ দ্বার কেমন করিয়া অনর্গল হইল?

কিছুক্ষণ পরে এক জন লোক আসিয়া কুন্দ প্রভৃতিকে "সভা" দেখিতে লইয়া গেল। পূর্ব্বমুখ দ্বার অতিক্রম করিয়া সকলে মধ্যে প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। গৃহখানি যে নূতন, তাহার পরিচয় তাহার সর্ব্বাঙ্গে সপ্রকাশ। উঠানখানি সিমেণ্ট করা—মধ্যে একটি বকুল গাছ। কুন্দ ও অপর গায়িকা সেই গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। কুন্দর মনে পড়িল, সে বকুলফুল ভালবাসিত বলিয়া প্রিয়নাথ বাড়ীর উঠানে একটা বকুল গাছ বসাইয়াছিল—বাড়ীর মধ্যে বকুল গাছ বসাইতে নাই বলিয়া যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মত-প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কুন্দ মনকে তিরস্কার করিল—সে সব কথা আজ মনে পড়ে কেন?

উত্তরদিকে ঠাকুরদালানে শ্রাদ্ধের "দান" সাজান—নিম্নে উঠানে সভা। ঠাকুরদালানের সিঁড়ির উপর যাঁহার শ্রাদ্ধ, তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি—ফুল দিয়া সাজান। কুন্দ চমকিয়া উঠিল—তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এ যে শাশুড়ীর ছবি—যে শাশুড়ীর আদরযত্ন সে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—তাঁহারই চিত্র! পার্শ্বে চন্দনচর্চ্চিত এক জোড়া খড়ম। কুন্দর মনে পড়িল—বিধবা শাশুড়ী প্রতিদিন স্বামীর এই খড়ম পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। দালানের কাছে—কুসুমোপম বালক ক্রোড়ে মুণ্ডিতকেশ ও কে? ত্রিশ বৎসর—তবুও যে চিনিতে পারা যায়! বালক "দাদা! দাদা!" বলিয়া প্রিয়নাথের গলা জড়াইয়া আদর করিতেছে! তবে কি, তাহার মাতৃ-পরিত্যক্ত পুত্র পিতার বুকে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়াছিল?

প্রিয়নাথ তাহার দিকে চাহিতেই কুন্দ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। অদূরে এক জন যুবক আর একখানি প্রতিকৃতি পুষ্প দিয়া সজ্জিত করিতেছিল। সে প্রতিকৃতি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের—; আর মা'র মুখ দেখিলে ছেলেকে চিনিতে ত এতটুকুও বিলম্ব হয় না! কুন্দর মাথাটা ঘুরিয়া গেল। সে বকুল গাছের মূলে বাঁধান স্থানটায় বসিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গা?" সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টিও সেই যুবকের মুখ হইতে কিছুতেই ফিরিতে চাহিতেছিল না।

আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কুন্দ উঠিল—তখন তাহার বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছে; আর কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—দারুণ আশঙ্কা, যদি প্রিয়নাথ তাহাকে চিনিতে পারে—যদি সে ধরা পড়ে। চেষ্টা করিয়া সে প্রিয়নাথের দিকে চাহিল। মুখখানা যেন বড় চিন্তাচ্ছায়াচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল! তবে কি প্রিয়নাথ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে? শঙ্কাতাড়িতার মত সে তথা হইতে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় ফিরিয়া গেল এবং বড় অসুখ করিতেছে বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

কুন্দ যে গাহিতে পারিবে না, সে কথাটা দেখিতে দেখিতে যখন রাষ্ট হইয়া পড়িল, তখন অনেকে হতাশ হইল—কেন না, কলিকাতার নামজাদা গায়িকা কান্তিময়ীর কীর্ত্তন শুনিবার আশায় অনেকে উৎফুল্ল হইয়াছিল। কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এই ত বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিল—এরই মধ্যে এমন অসুখ হ'ল যে, গাইতে পারে না! ও সব চালাকী। না গাইবে, তবে এল কেন?"

শুনিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "যদি অসুখই ক'রে থাকে, গাইবে কেমন ক'রে?"

প্রিয়নাথ যে কুন্দকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু গায়িকার মুখ দেখিয়া আর একখানা মুখ তাহার মনে পড়িয়াছিল—সে মুখ যে সে ত্রিশ বৎসর দেখে নাই, তবু এক দিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। সে যে সে মুখ স্মৃতির জপমালা করিয়া রাখিয়াছে!

শয্যায় পড়িয়া কুন্দ যখন বুকের মধ্যে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল, সেই সময় কে বলিল, "কর্ত্তার ছেলে এসেছেন।"

কুন্দ চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে—দেবব্রত, তাহার—তাহারই—। কিন্তু পুত্র বলিবার অধিকার যে আর তাহার নাই; বুকের ধনকে বুকে ধরিবার অধিকার যে সে পাপের পঙ্কে ফেলিয়া গিয়াছে! সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা।

সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদের এক জন বলিল, "দেখুন দেখি—কি এমন অসুখ যে গাইতে পারে না?"

দেবব্রত বলিল, "বাবা কি বল্লেন?"

"তোমার বাবার কাউকে অবিশ্বাস নেই, দয়া করতে

পার্‌লেই তাঁ'র আনন্দ। তিনি বলেন, অসুখ হ'লে ত গাইতে পার্‌বেই না।"

দেবব্রত মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাপের কথার উপর কি ছেলের কাছে আপীল হয় ?"

কুন্দ সব ভুলিয়া গেল—সেই মিষ্ট কথা, সেই মিষ্ট হাসি! বুকের মধ্যে সে কি তুমুল আন্দোলন—কি ভীষণ যন্ত্রণা !

দেবব্রত কুন্দর সঙ্গীদের বলিল, "আমি ডাক্তার বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ; তিনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

সে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, কুন্দ তাহাকে দেখিল।

৭

দীর্ঘ দিন কোথা দিয়া—কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, কুন্দ বুঝিতেই পারিল না। তুষার গিরিশিরে পাষাণেরই কাঠিন্যের অনুকরণ করিয়া পাষাণ হইতে চাহে ; কিন্তু সে কতক্ষণ ? নিদাঘের মার্ত্তণ্ডতাপ তাহাকে কোমল করিয়া—দ্রবীভূত ধারায় ধরায় পাতিত করিয়া ধরার শুষ্ক ভূমি স্নিগ্ধ করে। এক দিন সে যে মাতৃ-হৃদয়কে আমল দেয় নাই, আজ তাহার বুকের মধ্যে সেই মাতৃ-হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া যে স্নেহের উৎস উৎসারিত হইল, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি ত তাহার নাই! আজ তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সে ছুটিয়া যাইয়া প্রিয়নাথের পদতলে পতিত হয়—"আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা লইয়া আমাকে মরিতে দাও ; তোমার ক্ষমা পাইলে আমি সব পাইব।" আর মনে হইতে লাগিল—একবার—শুধু একবার তাহার পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিবে। কিন্তু হায়, সে যে একেবারেই অসম্ভব। এক দিন তাহার মাতা তাহার হৃদয়ে দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাই "রাজার গলার মালা" হইবার প্রলোভনে সে দেবপূজায় আপনাকে উৎসৃষ্ট হইতে দেয় নাই—আর তাই আজ সে পাপের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে পতিত। আর আজ—আজ এ আবার কি দুরাকাঙ্ক্ষা!

আজ অনুতাপ ও আত্মগ্লানি দুরন্ত কীটের মত তাহার বুক যেন কুরিয়া কুরিয়া কাটিতে লাগিল। অথচ সে যাতনায় আর্ত্তনাদ করিবারও উপায় নাই—শঙ্কা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—পাছে সব প্রকাশ পায়, আর সর্ব্বনাশী সে তাহার জন্য এই পুণ্যের সংসারের—এই সোনার সংসারের সর্ব্বনাশ হয়।

ডাক্তার আসিয়া কুন্দকে দেখিয়া গেলেন—সে রোগের কোন কথাই বলিতে পারিল না। সঙ্গীরা পুনঃ পুনঃ তাহাকে কি অসুখ জিজ্ঞাসা করিল—সে কেবল বলিল, "বড় যন্ত্রণা।"

সন্ধ্যার পর এক জন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দেবব্রত খবর লইতে পাঠাইয়াছে, ডাক্তার বাবু কীর্ত্তন-গায়িকাকে দেখিয়া গিয়াছেন কি না।

কুন্দ শুনিল। তাহার বুকের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহাতে যেন ইন্ধনযোগ হইল। যে ছেলে শ্রাদ্ধবাড়ীর শত কাযের মধ্যেও বাড়ীতে এক জন কীর্ত্তন-গায়িকার সংবাদ লইতে ভুলে নাই, সেই ছেলে—তাহার। সে যে সুখের সংসার এক ঝলক দেখিয়াছে, সে সংসার তাহারই ছিল ; সে যদি আপনি ভুল না করিত, তবে পতিপুত্র লইয়া সে সেই সংসারে রাজরাণী রাজমাতার মত পুণ্যে, সুখে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিত। আর তাহার পর সে মরিলে শাশুড়ীর মত ছেলের পিণ্ড পাইত। সে কি করিয়াছে—কি ভুল করিয়াছে—কি হারাইয়াছে—সে সব সে আজ যেমন করিয়া বুঝিল, এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বুঝি এক দিনও তেমন করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

একবার—শুধু একবার কি সে তাহার ছেলেকে তাহার বলিতে পারিবে না ? না। একবার—আর একবার দেখিতে পাইবে না ?

কুন্দ বুঝিল—সে আর যেন আপনাকে সামলাইতে পারিতেছে না। তখন তাহার ভয় বাড়িতে লাগিল—সে যদি কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে ? তখন দেবদত্ত কি ভাবিবে ? পিতার কাছে শুনিয়া যে মা'কে সে দেবতার মত মনে করিয়া আসিয়াছে—পূজা করে, সে কি তাহার সেই মা ? না। সে মা মরিয়াছে। আর সে ? সে পিশাচী—সে কেবল আজ এই অনুতাপে দগ্ধ হইবার জন্যই এত দিন বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু তাহার অপরাধের তুলনায় কি এই এক দিনের অনুতাপদহনই যথেষ্ট ? হয় ত নহে। কিন্তু তবুও—এ কি যন্ত্রণা! তুষানলও দগ্ধ করে, আর প্রবল অগ্নি ত দেখিতে দেখিতে গৃহ, গ্রাম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

কুন্দর মনে হইতে লাগিল, সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল, যদি সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে?

তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে—সমস্ত দিনের পর শ্রাদ্ধবাড়ীর গোলমাল থামিয়া গিয়াছে—সকলে নিদ্রিত। রজনী ঝিল্লীমন্দ্রমুখরিত, আর মধ্যে মধ্যে কোলাহলরত উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের চীৎকার। কুন্দ উঠিয়া বসিল—দীপালোকে দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া আছে। সে বারান্দায় আসিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আকাশ চন্দ্রের কিরণে ভরা—চারিদিকে গাছের মধ্যে কেবল অন্ধকার যেন নীরবে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। চারিদিকে কি স্নিগ্ধ—মধুর—শান্তভাব!

আর তাহার বুকের মধ্যে যাতনার কি অস্থিরতা! সে যে আর সে যাতনা সহ্য করিতে পারে না! সে ত মরিয়াছে—যদি তাহাই সত্য হইত!

তাহার পর তাহার মনে হইল—কাল সে কোথায় যাইবে? সেই পরিচিত—পুরাতন পাপের পথে! সে চমকিয়া উঠিল। এত দিন সে যে পরিবেষ্টনে বাস করিয়াছে, তাহা যে এত ভীষণ—এমন বিকট, তাহা সে এক দিনও বুঝিতে পারে নাই। সে এই জীবনে বাস করিয়াছে! আর কি জীবন তাহার হইতে পারিত—কি জীবন সে পরিহার করিয়া গিয়াছে! এই স্বামী—এই ছেলে! তাহার বুকের মধ্যে যে ক্রন্দন যেন উথলিয়া উঠিতেছিল—তাহা আপনার প্রাচুর্য্যে আপনি বাহির হইতে পারিতেছিল না—বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সেই পাপ জীবন!—সে আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না—না—না—না।

তবে সে কোথায় যাইবে? আপনার অবস্থা সে উপলব্ধি করিল। তাহার কোন অবলম্বন নাই। যাহার সব অবলম্বন থাকে, সে সব এমন করিয়া হারায় কেন? কিন্তু এমনভাবে সে ত আর বাঁচিতে পারিবে না—স্বর্গের ছবি দেখিয়া সে ত আর নরকে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না! সে কি করিবে?

কুন্দর মনে পড়িল, বাড়ীর খিড়কীতে একটা পুকুর ছিল। সে পুকুরে জল আনিতে যাইয়া সে কত দিন পাড়ার মেয়েদের বলাবলি করিতে শুনিয়াছে—"ভাগ্য বটে প্রিয়নাথের স্ত্রীর। স্বামীর কি ভালবাসা—এক দণ্ড ছেড়ে থাকতে চায় না!" সে কথা শুনিয়া সে কেবল স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়াছে!

কুন্দ ঘুরিয়া খিড়কীতে গেল। সেই পুষ্করিণী—কেমন সংস্কৃত হইয়াছে—দুই দিকে বাঁধা ঘাট—জলের উপর চন্দ্রকর যেন লুটাইয়া পড়িয়া মিশাইয়া গলিত রজতের মত দেখাইতেছে। এ জল কি স্নিগ্ধ? এ জলে কি মানুষের জ্বালা জুড়ায়?

এক পা এক পা করিয়া কুন্দ অগ্রসর হইল—সে কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে, নিজেই বুঝিতে পারিল না। জ্বালা জুড়াইবার দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষায় সে কি সেই জলমধ্যে কাহারও কোন আহ্বান শুনিতে পাইল?

৮

সকালে কুন্দর সঙ্গীরা তাহাকে না পাইয়া শঙ্কিত হইল এবং তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।

শেষে খিড়কীর পুকুরে তাহার শব ভাসিয়া উঠিল। প্রিয়নাথ ও দেবব্রত ডাক্তার আনাইল—যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস করাইয়া তাহার মৃতদেহে জীবন ফিরান যায়, তাহা হইল না।

পূর্ব্বদিন গায়িকাকে দেখিয়া প্রিয়নাথের মনে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হারান একখানি মুখের স্মৃতি উদিত হইয়াছিল। কিন্তু সে দিন সে কুন্দ বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারে নাই। আজ আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। কুন্দর বামবাহুতে উল্কীতে একটি কুন্দফুল অঙ্কিত ছিল—উল্কীওয়ালী আসিলে তাহারই কথায় কুন্দ সেই চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিল।

লোক বলাবলি করিতে লাগিল, কোনরূপে গভীর জলে যাইয়া পড়িয়াছিল,—সাঁতার জানিত না, তাই মরিয়াছে। প্রিয়নাথ কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিল। পূর্ব্বদিন তাহাদের দেখিয়া অভাগিনী কিরূপ অনুতাপযাতনায় জর্জ্জরিত হইয়াছে এবং শেষে সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য মৃত্যুর আশ্রয় লইয়াছে—ভাবিয়া প্রিয়নাথের হৃদয় কেবল অনুকম্পায় ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কুন্দর কোন দোষ সে কোন দিন লয় নাই। আজ—সব অবস্থা উপলব্ধি করিয়াও দোষ লইতে পারিল না—তাহার মনে যদি বা সে ভাবের উদয় হইত, অনুকম্পার প্রবল প্রবাহে তাহা স্থান পাইতে পারিল না।

কুন্দর সৎকারের সব ব্যবস্থা সে করিয়া দিল এবং গৃহে শত কায থাকিলেও শবের সঙ্গে শ্মশানে গেল।

চিতায় যখন অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—কুন্দর দেহের অবশেষ ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন প্রিয়নাথ একবার সজলনেত্রে সেই চিতার দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"অনুতাপের আগুনে তোমার ত্রুটিও এমনই পুড়িয়া ছাই হইয়াছে—এখন তুমি শান্তি লাভ কর। জীবনে যাহা পাও নাই—মৃত্যুতে তাহা লাভ করিয়া ধন্য হও।"

ধীরপদে প্রিয়নাথ শ্মশান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সে যখন গৃহে ফিরিল, তখন দেবদত্ত পিতামহীর প্রতিকৃতিখানি ফুল দিয়া সাজাইয়া আসিয়া জননীর প্রতিকৃতির মূলে বাসিফুলগুলি ফেলিয়া দিতেছিল।

প্রিয়নাথ শুনিল, দেবদত্তের পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বড়মা'কে খাটে ক'রে কোথায় নিয়ে গেলে? তিনি এখন কোথায়?"

দেবদত্ত উত্তর দিল, "তিনি স্বর্গে গেছেন।"

"তোমার মা কোথায়, বাবা?"

"তিনিও গেছেন।"

প্রিয়নাথ অগ্রসর হইয়া পৌত্রকে বুকে তুলিয়া লইল—দেবদত্ত মাতার প্রতিকৃতির পাদদেশে ফুল সাজাইয়া দিল।

দান-মাহাত্ম্য।

শাস্ত্রী—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, তাই ভাবি দেখি মনে!"
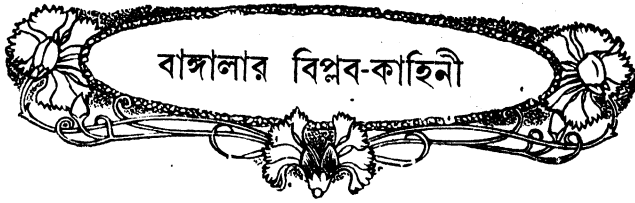
তৃতীয় পরিচ্ছেদ (অবশিষ্টাংশ)

"মনে হয়, ১৯০৩ সালের শেষে একবার কলিকাতায় গিয়ে দেখ্‌লাম, কলিকাতার কেন্দ্র সারকিউলার রোড থেকে গ্রেষ্ট্রীটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দোতলার উপর ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে একগাদা কবিরাজী বিজ্ঞাপন, আর ঘিয়েভাজা আমাদের বারীন ও তদ্রূপ আর দু তিনটি যুবক। তার মধ্যে ছিল এক জন জাপানী। তাকে দেখে, মনে ক'রে নিয়েছিলাম, কি দেবব্রত বাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখন ঠিক মনে পড়ে না, যে আমাদের এই ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টাতে জাপানীজাতির ভিতরে ভিতরে যোগ আছে।

তার নাম যেন 'হোরে' কি এই রকম একটা কিছু ছিল। ওকাকুরা ও আরও জনকতক জাপানী রাজনীতিক মাতব্বরের নাম ক'রে দেবব্রত বাবু আমাদের এমনি তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, সমিতির কায কোথাও কিছু হচ্ছে না ব'লে এর আগে যা বুঝেছিলাম, সে ধারণা ভুল ব'লে মনে কর্‌তে তখন বাধ্য হলাম। কলিকাতার কেন্দ্রে আগে যে কায দেখেছিলাম বা তখন গ্রেষ্ট্রীটে যে কায দেখ্‌লাম, তা' কেবল সন্দেহজনক অনুসন্ধিৎসাকে ব্যর্থ করবার, বিশেষতঃ মফঃস্বলের সভ্যদিগের সহিত সাক্ষাতের সুবিধার জন্যই একটু প্রকাশ্যভাবে করা হয়েছে ব'লে মনে ক'রে নিলাম। এ ছাড়া সম্পূর্ণ গোপনভাবে যে বিপুল আয়োজন চল্‌ছিল, এ কথা ধ্রুব সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা থাক্‌ল না।

এই ধারণার ফলে তখন মনে হয়েছিল, আমাদের মেদিনীপুরে ত তা হ'লে এর তুলনায় কিছুই হয়নি। আমাদের মিইয়ে যাওয়া উদ্যম এই জাপানীকে উপলক্ষ ক'রে আবার তাজা হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সেই জাপানী হোরের যে শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল, তা আর মনে পড়ে না। যাই হোক্, এ কথা নিশ্চয় যে, জাপানীজাতির বা কোন জাপানী সমিতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না।

আবার দিনকতক পরে যখন আমাদের আশা উদ্যম মিইয়ে আস্‌ছিল, তখন আবার একটি ঘটনা ঘ'টে আমাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

এক দিন স্থানীয় বেলীহলে বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরকারের বিরুদ্ধে এমন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে, 'মেদিনী-বান্ধবের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দেবদাস বাবু নাকি পুলিস হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখে তাঁকে সাবধান হ'তে অনুরোধ কর্‌লেন। তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় এমন সব কথা সরকারের বিরুদ্ধে বল্‌লেন যে, আমরা তাঁকে আমাদের মতাবলম্বী ব'লে ধ'রে নিলাম। কাযেই তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিবার ভার নিলাম। সুবিধামত নিরিবিলিতে আমাদের গুপ্তসমিতির আভাস তাঁকে দিলাম। প্রবীণ স্বদেশপ্রাণ তাই না শুনে, তাঁর কত কালের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে ব'লে কত আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন! বিপ্লব আন্‌তে হ'লে লোকের মন বিপ্লব অনুযায়ী ক'রে আগে হ'তে গ'ড়ে তুলা যে উচিত, আর প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে এই গঠনের কায হ'য়ে থাকে, তা বুঝাতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। আর তাঁর প্রণীত বইগুলি যে সেই উদ্দেশ্যে লিখিত, তাও বলেছিলেন। তাঁর নিজের লিখিত বই যে কয়খানি কাছে ছিল, তা তিনি দিয়েছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী বই আমাদের পড়বার জন্য বিশেষ ক'রে বলেছিলেন। তার মধ্যে 'নীল-দর্পণ' ও 'কুলী-কাহিনী'র নাম মনে আছে। তাঁর বই পড়িয়ে লোককে আমাদের মতে আনা তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। কলিকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা তাঁকে দিয়েছিলাম; আর দেবব্রত বাবুকে তাঁর কথা লিখেছিলাম। এই সাক্ষাতের দিনকতক পরে তিনি বদ্‌লি হয়ে চ'লে গেলেন। তার মাসকতক পরে শুন্‌লাম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মাঝে একবার গ্রেষ্ট্রীটের কেন্দ্রে তাঁকে অত্যন্ত রুগ্ন শরীরে দেখেছিলাম।

বোধ হয়, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে শুনলাম, গ্রেষ্ট্রীটের আড্ডা ভেঙ্গে গেছে। তার কারণ সঙ্ক্ষেপতঃ এই :—গুপ্ত-সমিতিতে যাঁরা প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের স্বভাবের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, অন্যের মন্তব্য বা উপদেশ (Suggestion) সহ্য কর্‌তে একেবারে পার্‌তেন না। অধিকন্তু যারা তাঁদের আধিপত্য বা মতামত অবনতমস্তকে স্বীকার না কর্‌ত, তাহাদিগকে লোকের কাছে ছোট কর্‌বার অথবা তাড়াবার জন্য নিতান্ত হীনতম উপায় অবলম্বন কর্‌তেও দ্বিধা বোধ কর্‌তেন না। এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আমাদিগকে কর্‌তে হবে।

এই সময় উপনেতাদের মধ্যে খ-বাবুই সব চেয়ে কর্ম্ম-প্রবণ ছিলেন ব'লে তখনকার নেতাদের,বিশেষতঃ ক-বাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাই এ কাল পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা খুব প্রবল ছিল। তার উপর তিনি ছিলেন মিলিটারী ম্যান অর্থাৎ সৈনিকপুরুষ। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা এমনই অভাবনীয় ব্যাপার যে, তিনি সামান্য সেনামাত্র হ'লেও তাঁর মেজাজ ছিল 'জান্দ্রেলের' মত। চেলাদের উপর তিনি তাঁর এই 'জান্দ্রেলী' পূরামাত্রায় চালাতেন।

কলিকাতা কেন্দ্রের সহকারী নেতাই যে পরে বাঙ্গালা-দেশের, চাই কি নিখিল-ভারতের সেনাপতিতে পরিণত হবে, আর যুদ্ধশেষে ইচ্ছা কর্‌লে ভারতের সম্রাট, অথবা অন্ততঃপক্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বিরাজ কর্‌বেই, কল্পনার দৌলতে অনেকেই তাহা স্থিরনিশ্চয় ক'রে বসে-ছিলেন এবং এই সহকারী নেতার পদটির দিকে লোলুপ-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

যোগ সাধনায় সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তপুরুষ না হ'লে যে সহ-কারী নেতা হওয়ার, আর সাধনা বড় না হ'লে যে চেলা হওয়ার অধিকারী হ'তে পারে না, এ বিধান তখনও প্রব-র্ত্তিত হয়নি। নিষ্কাম কর্ম্মের বড়াই কর্‌বার ফ্যাসন্ তখনও প্রচলিত হয়নি। কাযেই কলিকাতা কেন্দ্রের লোভনীয় এই উপনেতার পদটি নিয়ে যে ঝগড়া-ঝাটি চল্‌বে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

আমাদের বারীন অন্যের প্রদর্শিত পথে চল্‌তে দুনিয়ায় আসেনি, অন্যকে পথ দেখাতেই এসেছে। এই প্রকারের কথা বারীনের মুখে অনেকবার আমরা শুনেছি। কাযেও তাই ঘটেছিল। ক-বাবু ক্রমে ক্রমে বারীনের চোখে দেখ্‌তে, বারীনের কান দিয়ে শুন্‌তে এবং বারীনের মুখ দিয়ে বল্‌তে সুরু ক'রে দিলেন।

বারীন এ যাবৎ খ-বাবুর কর্ত্তৃত্ব মেনে চল্‌তে বাধ্য হয়ে-ছিল। এখন যদিও সকল নেতা, উপনেতা, এমন কি, হবু-নেতা পর্য্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু খ-বাবুকে তাড়ান তার প্রধান কায হয়ে দাঁড়াল। সুযোগও জুটে গেল।

খ-বাবুর নাকি এক সুন্দরী আত্মীয়া সারকিউলার রোডের কেন্দ্রে থাকৃত। তার স্বভাব-চরিত্র শুনেছিলাম ভাল ছিল না; তাই খ-বাবু তাকে সুমতি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টায় ছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই যুবতী নাকি কারো কারো পরকীয়া সাধনের সুযোগ দিতে চেষ্টা করেছিল। সে কালে রাজনীতির ভিতর এত ধর্ম্মভাব ঢুকেনি। তাকে নিয়ে একটু-আধটু প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাকি চলেছিল। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী খ-বাবুকে ঘায়েল কর্‌বার জন্য খ-বাবু ও ঐ যুবতীর মধ্যকার সম্বন্ধটা দূষিত ব'লে ক-বাবুর কাছে বারীন যথারীতি রিপোর্ট করেছিল। একতরফা বিচারে ক-বাবু খ-বাবুকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। ফলে সার-কিউলার রোডের আড্ডা উঠে গেল। খ-বাবু অন্যত্র পৃথক্‌ভাবে দলগঠন কর্‌তে লাগ্‌লেন। আর বারীনের নেতৃত্বে গ্রেষ্ট্রীটে নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। এই প্রকারে বারীনের সহিত ঝগড়ার একতরফা রায়ের ফলে ক-বাবুর সঙ্গ যাঁরা ত্যাগ কর্‌তে সুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার নেতা এক জন। মেদিনীপুরের অ-বাবু ও সত্যেন বারীনকে আগে থেকে জান্‌তেন। সত্যেন বারী-নের মামা। বারীনের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার ক'রে চলা তাঁদের পক্ষে হয়ে উঠ্‌ত না। তা ছাড়া এঁদের মধ্যে বারীন হবু প্রতিদ্বন্দ্বীর বীজ বোধ হয় দেখ্‌তে পেয়েছিল। তাই সত্যেনকে ঘায়েল কর্‌বার জন্য উক্ত যুবতীকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়নি।

মেদিনীপুর কেন্দ্রের সভ্যরা এই সকল ব্যাপারে যদিও বড়ই বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি ক-বাবুর উপর অগাধ ভক্তিবশতঃই বারীনকে একবারে ত্যাগ কর্‌তে পারেননি। অথচ অন্য দলের সঙ্গেও এঁদের মেলা-মেশা ও খাতির বেশ চল্‌ছিল। যাই হোক্, বারীনের উপনেতৃত্বে ক-বাবুর উপর যে অনেকের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তা একটু